একটি সোনার প্রদীপ

গল্প-ভারতী

'গল্পভারতী' বিংশতিতম বছরে পদার্পণ করেছে। একটি সোনার প্রদীপ হাতে নিয়ে বঙ্গভারতীর কমল-কাননের পথ ধরে 'গল্পভারতী'র প্রথম পদক্ষেপ। তা'র প্রদীপের শিখা লক্ষ্যে স্থির, আদর্শে উজ্জ্বল।

ভারতের চিরন্তন চিন্তাধারা, ভারতের সত্যের ঐতিহ্য, ভারতের যুগ-যুগান্ত সঞ্চিত মহৎ মূল্যবোধগুলি, নতুন করে প্রতিষ্ঠিত করতে, ভারতের তথা সমগ্র বিশ্বের অমর জীবনের কাহিনী আর অমৃতের বাণীগুলি নতুন করে শোনাতে, 'গল্পভারতী'র আবির্ভাব।

তারপর এই দীর্ঘ উনিশটি বছর ধরে শান্ত সাধনার মধ্য দিয়ে সে তা'র লক্ষ্য পথে এগিয়ে চলেছে সেই উজ্জ্বল আদর্শটিকে আশ্রয় করে।

ব্যবসায়িক সাফল্যের রঙিন আলোর হাতছানি তা'কে ক্ষণকালের জন্যও বিভ্রান্ত করতে পারেনি, স্বধর্মচ্যুতির পথে টেনে নিয়ে যেতে পারেনি।

পত্র পত্রিকার এই প্রাদুর্ভাবের যুগে, জনপ্রিয়তা অর্জনের বহুবিধ সস্তা কৌশলের দৃষ্টান্তের নাকখানে তার এই অবিচল সংযম 'আশ্চর্য্য' বললেও অত্যুক্তি হয় না।

এ সংযম শুধু প্রশংসার যোগ্যই নয়, শ্রদ্ধার যোগ্য।

'গল্পভারতী'র সাধনা যে গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নয়, বাংলা সাহিত্যের মর্য্যাদা বৃদ্ধির লক্ষ্যে তার প্রমাণ আঁকা আছে এই সুদীর্ঘ কালের প্রতিটি পৃষ্ঠায় প্রতিটি ছত্রে

একটি চরিত্রবান কাগজের যে যে গুণ থাকা আবশ্যক, 'গল্পভারতী'র সে গুণগুলি আছে। আর আছে প্রতিনিয়তের চেষ্টা। বাস্তবিকই অসংখ্য পত্র পত্রিকার মধ্যে 'গল্পভারতী' একটি সোনার প্রদীপ।

'গল্পভারতী'র সঙ্গে আমার সম্পর্ক তা'র প্রথম প্রকাশ কাল থেকেই। সে সম্বন্ধ একান্ত আন্তরিক। বরাবরই তাকে দেখে এসেছি আত্মীয়ের দৃষ্টি নিয়ে, প্রীতির দৃষ্টি নিয়ে। এবং আনন্দের সঙ্গে লক্ষ্য করছি এই উনবিংশতি বছরের পরিপূর্ণতা নিয়ে সে দিন দিন আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠছে।

হাতের কাছে রয়েছে বর্তমান সংখ্যাখানি। কেবল মাত্র একটি (সাধারণ সংখ্যা) সংখ্যা দেখলেই বোঝা যায় এর মধ্যে রয়েছে কতখানি চেষ্টা ও নিষ্ঠা। এই নিষ্ঠাহীন যুগে, একটি সত্যকার নিষ্ঠার দৃষ্টান্ত শুধু আশারই নয় গৌরবেরও।

'গল্পভারতী'র দীর্ঘজীবন কামনা করি।

—আশাপূর্ণা দেবী—

CALCUTTA UNIVERSITY

সম্পাদকীয়

গল্পভারতী বিশ বছরে পদার্পণ করলো। বিশ বছর আগে আষাঢ়ের এমনি একটি দিনে জাতির সমস্যাবহুল জীবনের সন্ধিক্ষণে এক মহান্ আদর্শ বুকে নিয়ে 'গল্পভারতী' আত্মপ্রকাশ করে।

ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ এবং তাঁর মানস-সন্তান স্বামী বিবেকানন্দকে স্মরণ করে সেদিন 'গল্পভারতী' যাত্রা সুরু করেছিলো। এই সুদীর্ঘ দিন বহু বাধা, বহু বিঘ্ন, ঝড়, ঝঞ্ঝা, ও দুঃখের মধ্য দিয়েও গল্পভারতী তার আদর্শকে নিয়েই এগিয়ে চলেছে। দুর্দিনে, দুর্বিপাকে, বিকৃত রুচির পরিবেশে, দুর্বার প্রলোভনেও 'গল্পভারতী' কখনও তার মহান্ আদর্শকে এতটুকু ম্লান হতে দেয়নি।

আজকের দিনে 'গল্পভারতী'র মতন একটি আদর্শবাদী পত্রিকার পক্ষে সক্রিয় হয়ে এই দীর্ঘ দিন বেঁচে থাকা এবং এগিয়ে যাওয়া যে কত কঠিন তা অনেকে কল্পনাও করতে পারবেন না।

যেদিন আমরা যাত্রা সুরু করি, সেদিন আমরা ছিলাম পরাধীন, আর আজ আমরা স্বাধীন। অথচ সেদিন যেসব সমস্যা দেখা দিয়েছিলো, যে অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছিলো তা বহুগুণে জটিল ও ঘনাট হয়ে দেখা দিয়েছে আজ জাতির জীবনে। সেদিন আমরা মনে মনে এই আশাই পোষণ করেছিলেম যে কখনও যদি দেশ স্বাধীন হয়, তবে দেশের কোটি কোটি দুঃস্থ নর-নারীর অবস্থার হবে পরিবর্তন। দুঃখের রাত্রি শেষ হবে—দেখতে পাবে তারা নব-প্রভাতের সূর্যালোক। দেশে শান্তি, সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য ফিরে আসবে।

কিন্তু তা হয়নি। বরং সাধারণ লোকের দুঃখ কষ্ট হাজার গুণে বেড়ে গিয়েছে। নিত্যনতুন সমস্যা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে।

স্বাধীনতা পাওয়ার পর দেখতে দেখতে দীর্ঘ সতের বছর কেটে গেলো, কিন্তু কত বড় দুঃখের কথা যে দু'বেলা দু'মুঠো অন্ন এবং পরণে একখানা জীর্ণ বস্ত্রও অনেকের ভাগ্যে আজও জুটলো না। মানুষের সুখ-শান্তি নষ্ট প্রায়, সভ্যতাও আজ বিপন্ন! সারা দেশে দুর্নীতির তাণ্ডবলীলা। মানুষ আজ আর মানুষ নেই। নীতি-ধর্ম আজ অতীতের কথা। জাতির এই সঙ্কটতম মুহূর্তে গল্পভারতী আজ আবার নূতন করে তার যাত্রা সুরু করলো। যে অমৃতবাণী উদাত্ত কণ্ঠে গত উনিশ বছর ধরে সে প্রচার করে এসেছে, সঙ্কট ত্রাণের তাই হচ্ছে মূলমন্ত্র। আমরা সব সময়ই বলে এসেছি জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ

সম্পদ হচ্ছে তার চরিত্র—তার মনুষ্যত্ব—তার আদর্শ। দেশের প্রতিটি মানুষের চরিত্রের বিকাশ সাধনই জাতিগঠনের প্রধান সোপান। চরিত্রই মানুষের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। সেই চরিত্রই যদি গেল মরে তবে মানুষের আর রইল কি? আজ আমরা হারিয়েছি আমাদের চরিত্র, হারিয়েছি আমাদের মনুষ্যত্ব। তাই কালো বাজারীর লোভ, তাই খাদ্যে বিষ, তাই ঔষধেও ভেজাল, তাই পরস্পরের মধ্যে বিরোধ, অসহিষ্ণুতা,—জীবনের মূল্যবোধে বিকার।

এই দেশের মানুষই একদিন তাদের চারিত্রিক দৃঢ়তা এবং বিপুল আত্মত্যাগের দ্বারা মৃত্যুঞ্জয়ী হয়েছিলো এবং সারা দেশকে জীবনময়ী উদ্দীপনায় উদ্বুদ্ধ করতে পেরেছিলো।

স্বাধীনতার পূর্ব যুগে ঊনবিংশ শতকের শেষে এবং বিংশ শতকের প্রারম্ভে ভারতবর্ষে মানুষ তৈরীর যে বেদ-মন্ত্র উচ্চারিত হয়েছিলো, তারই ফলে ফাঁসীর মঞ্চেও জীবনের জয়গান গাইবার লোকের অভাব হয়নি। দেশ-মাতৃকার মুক্তিপণে যে কোন প্রকার ত্যাগ স্বীকারে কুণ্ঠা দেখা যায়নি। সে-মন্ত্র উচ্চারিত হয়েছিলো দেশের কবি সাহিত্যিকদের লেখনীর মুখে। আর সে-মন্ত্র হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত নিনাদিত হয়েছিলো দেশের সংবাদ পত্র ও সাহিত্য পত্রের মাধ্যমে।

আমাদের কত বড় দুর্ভাগ্য যে স্বাধীনতা লাভের পর ভাগ-বন্টনে আত্মহারা হয়ে আমরা আমাদের মহান্ কর্তব্যে অবহেলা করেছি। বাণিজ্যিক লাভের অঙ্কে স্ফীত হয়ে আমরা আমাদের চরিত্রকে হারিয়েছি—আমাদের জাতীয় আদর্শের অপমৃত্যু ঘটিয়েছি।

আমাদের জাতীয় চরিত্রের মধ্যে আবার আদর্শবাদকে ফিরিয়ে আনতে হবে। অবক্ষয়ের মধ্যে জীবন নেই, জীবনের মূল্যায়নে চরিত্রই প্রধান—এই কথাই বারংবার ভারতবর্ষে বলতে হবে। এইকথা বলতে পারেন যাঁরা—তাঁরা হচ্ছেন দেশপ্রেমিক সর্বত্যাগী সাহিত্যিক কবি, শিল্পী, এবং তাঁরাই ঋষি।

দেশের এই ঋষিগণকে আজ আমরা এই মহা সংকট মুহূর্তে আহ্বান জানাই, তাঁদের অমৃত লেখনী হতাশার মধ্যে আশাবাদের সঞ্চার করুক!

আমরা তাঁদের উদাত্ত আহ্বানে দেশের শিরায় শিরায় সঞ্চারিত করার সৌভাগ্য অর্জন করি। বজ্রকণ্ঠে বিঘোষিত হউক—

'শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ।'

হরিসাধন দাশগুপ্ত

ভবিষ্য ভারত

এই সেই প্রাচীন ভূমি অন্যান্য দেশে যাইবার পূর্বেই তত্ত্বজ্ঞান যে স্থানকে নিজ প্রিয় বাসভূমি রূপে নির্দিষ্ট করিয়াছিল ; এই সেই ভারতভূমি, যে ভূমির আধ্যাত্মিক প্রবাহ জড়রাজ্যে সাগর-সদৃশ প্রবহমান স্রোতস্বতী সমূহের তুল্য, যেখানে অনন্ত হিমালয় স্তরে স্তরে উত্থিত হইয়া হিম-শিখররাজির দ্বারা যেন স্বর্গরাজ্যের রহস্য নিচয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছে।

এই সেই ভারত, যে ভারত ভূমির ধূলিকা শ্রেষ্ঠতম ঋষি মুনিগণের চরণ-রজে পবিত্রীকৃত হইয়াছে। এই খানেই সর্বপ্রথম অন্তর্জগতের রহস্য উদ্ঘাটনের চেষ্টা হইয়াছিল—এই খানেই মানব-মন নিজ স্বরূপানুসন্ধানে প্রথম অগ্রসর হইয়াছিল।

এই খানেই জীবাত্মার অমরত্ব অন্তর্যামী ঈশ্বর এবং জগৎ প্রপঞ্চেও মানবে ওতপ্রোত ভাবে অবস্থিত পরমাত্মা-সম্বন্ধীয় মতবাদের প্রথম উদ্ভব। ধর্ম ও দর্শনের সর্বোচ্চ আদর্শ-সকল এখানেই চরম পরিণতি প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই সেই ভূমি যেখান হইতে ধর্ম ও দার্শনিক তত্ত্বসমূহ বন্যাকারে প্রবাহিত হইয়া সমগ্র জগৎকে প্লাবিত করিয়াছে, আর এখান হইতেই আবার তদ্রূপ তত্ত্বের অভ্যুদয় হইয়া নিস্তেজ জাতি সমূহের ভিতর জীবন ও তেজ সঞ্চার করিবে। এই সেই ভারত, যাহা শত শত শতাব্দীর অত্যাচার শত শত বৈদেশিক আক্রমণ ও শত শত প্রকার রীতিনীতির বিপর্যয় সহিয়াও অক্ষুণ্ণ আছে। এই সেই ভূমি যাহা নিজ অবিনাশী বীর্য ও জীবন লইয়া পর্বত হইতেও দৃঢ়তর ভাবে এখনও দণ্ডায়মান। আমাদের শাস্ত্রোপদিষ্ট আত্মা যেমন অনাদি, অনন্ত ও অমৃতস্বরূপ আমাদের এই ভারত ভূমির জীবন ও তদ্রূপ। আর আমরা এই দেশের সন্তান।

হে ভারত-সন্তানগণ, আমি তোমাদিগকে আজ কতকগুলি কাজের কথা বলিতে আসিয়াছি আর ভারতভূমির পূর্ব গৌরব স্মরণ করাইয়া দিবার উদ্দেশ্য-কেবল তোমাদিগকে প্রকৃত পথে কার্যের আহ্বান করা ব্যতীত আর কিছু নহে। আমাকে লোকে অনেকবার বলিয়াছে, পূর্ব গৌরব স্মরণে কেবল মনের অবনতি হয় মাত্র, উহাতে কোন ফলোদয় হয় না—সুতরাং আমাদিগকে ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কার্য করিতে হইবে। সত্য কথা। কিন্তু ইহা ও বুঝিতে হইবে, অতীতের গর্ভেই ভবিষ্যতের জন্ম। অতএব যতদূর পার, পশ্চাদ্দৃষ্টি কর, পশ্চাতে যে অনন্ত নির্ঝরিণী প্রবাহিত

প্রাণ ভরিয়া আকণ্ঠ তাহার সলিল পান কর, তারপর সম্মুখ-প্রসারিত দৃষ্টি লইয়া সম্মুখে অগ্রসর হও ও ভারত প্রাচীনকালে যতদূর উচ্চ গৌরব শিখরে আরূঢ় হইয়াছিল, তাহাকে তদপেক্ষা উচ্চতর, উজ্জ্বলতর, মহত্তর, মহিমাশালী করিবার চেষ্টা কর। আমাদের পূর্ব পুরুষগণ মহাপুরুষ ছিলেন। আমাদিগকে প্রথমে ইহা জানিতে হইবে। আমাদিগকে প্রথমে জানিতে হইবে, আমরা কি উপাদানে গঠিত, কোন রক্ত আমাদের ধমনীতে প্রবহমান।

তারপর সেই পূর্ব পুরুষগণ হইতে প্রাপ্ত শোণিতে বিশ্বাসী হইয়া তাঁহাদের সেই অতীত কার্যে বিশ্বাসী হইয়া, সেই বিশ্বাস বলে, সেই অতীত মহত্ত্বের জলন্ত ধারণা হইতেই পূর্বে যাহা ছিল, তাহা হইতেও শ্রেষ্ঠতর নূতন ভারত গঠন করিতে হইবে। অবশ্য মধ্যে মধ্যে এখানে অবনতির যুগ আসিয়াছে আমি উহা বড় বর্তব্যের মধ্যে আনি না; আমরা সকলেই সেকথা জানি—উহার ও আবশ্যকতা ছিল। এক প্রকাণ্ড মহীরুহ হইতে সুন্দর সুপক্ক ফল জন্মিল—সেই ফল মাটিতে পড়িয়া পচিল—তাহা হইতে আবার অঙ্কুর জন্মিয়া হয়ত প্রথম বৃক্ষ হইতেও মহত্তর বৃক্ষের উদ্ভব হইল। এইরূপ যে অবনতির যুগের মধ্য দিয়া আমাদিগকে আসিতে হইয়াছে তাহার ও প্রয়োজনীয়তা ছিল। সেই অবনতি হইতেই ভাবী ভারতের অভ্যুদয় হইতেছে। এখনই উহার অঙ্কুর দেখা যাইতেছে উহার নব-পল্লব বাহির হইয়াছে—এক মহান্ প্রকাণ্ড ঊর্দ্ধমূল বৃক্ষ উদ্গত হইতে আরম্ভ হইয়াছে-আর আমি অদ্য তাহারই সম্বন্ধে তোমাদিগকে বলিতে অগ্রসর হইয়াছি।

অন্যান্য দেশের সমস্যা সমূহ হইতে এই দেশের সমস্যা জটিলতর, গুরুতর। জাতীয় অধ্যায়ের বিকাশ, ধর্ম, ভাষা, শাসন প্রণালী—এই সমুদয় লইয়াই একটি জাতি গঠিত। যদি একটি একটি করিয়া জাতি লইয়া এই জাতির সহিত তুলনা করা যায়, তবে দেখা যাইবে, অন্যান্য জাতি যে যে উপাদানে গঠিত, তাহা অপেক্ষাকৃত অল্প-সংখ্যক। আর্য, দ্রাবিড়ী, তাতার, তুর্ক, মোগল, ইউরোপীয় যেন জগতের সকল জাতির শোণিত এদেশে রহিয়াছে, এখানে নানা ভাষার অপূর্ব সমাবেশ-আর আচার-ব্যবহারে দুইটি ভারতীয় শাখা-জাতির যে প্রভেদ, ইউরোপীয় ও প্রাচ্য জাতির মধ্যে ও তত প্রভেদ নাই। কেবল আমাদের পবিত্র পরম্পরাগত উপদেশ আমাদের ধর্মই আমাদের সম্মিলন ভূমি—ঐ ভিত্তিতেই আমাদিগকে জাতীয় জীবন গঠন করিতে হইবে। ইউরোপে রাজনীতি জাতীয় ঐক্যের ভিত্তি। এশিয়ায় কিন্তু ধর্মই ঐ ঐক্যের মূল। অতএব ভাবী ভারত-গঠনে ধর্মের ঐক্য-সাধন অনিবার্য রূপে প্রয়োজন। এই ভারত ভূমির পূর্ব হইতে পশ্চিম, উত্তর হইতে দক্ষিণ, সর্বত্র একধর্ম সকলকে স্বীকার করিতে হইবে। একধর্ম—একথা আমি কি অর্থে ব্যবহার করিতেছি? খৃষ্টান, মুসলমান বা বৌদ্ধগণের ভিতর যে হিসাবে এক ধর্ম বিদ্যমান, আমি সে হিসাবে "একধর্ম" কথা ব্যবহার করিতেছিনা। আমরা জানি আমাদের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত সমূহ যতই বিভিন্ন হউক, উহাদের যতই বিভিন্ন ভাবী থাকুক তথাপি কতকগুলি সিদ্ধান্ত এমন আছে যাহাতে সকল সম্প্রদায়ই একমত। অতএব আমাদের সম্প্রদায় সমূহের ঐরূপ কতকগুলি সাধারণ সিদ্ধান্ত আছে, আর এগুলি স্বীকার করিবার পর আমাদের ধর্ম সকল সম্প্রদায় ও সকল ব্যক্তিকে বিভিন্ন ভাব পোষণ করিবার, ইচ্ছামত চিন্তা ও কার্যের পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করিয়া থাকে। আমরা সকলেই ইহা জানি, অন্ততঃ আমাদের মধ্যে যাঁহারা একটু চিন্তাশীল, তাঁহারাই ইহা জানেন। আর আমরা চাই—আমাদের ধর্মের এই জীবনপ্রদ সাধারণ তত্ত্বসমূহ সকলের নিকট, এই দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলের নিকট প্রচারিত হউক—সকলেই সেইগুলি জানুক, বুঝুক, আর নিজেদের জীবনে পরিণত করিবার চেষ্টা করুক। সুতরাং ইহাই আমাদের প্রথম কার্য। আমরা দেখিতে পাই—এশিয়ায় বিশেষতঃ ভারতবর্ষে, জাতি, ভাষা, সমাজ-সম্বন্ধীয় সমুদয় বাধা, ধর্মের সম্মিলনকারিণী শক্তির নিকট উড়িয়া যায়। আমরা জানি ভারত-বাসীর ধারণা—আধ্যাত্মিক আদর্শ হইতে উচ্চতর আদর্শ আর কিছুই নাই—ইহাই ভারতীয় জীবনের মূলমন্ত্র আর ইহাও আমরা জানি, আমরা সরলতম ভাষায় পথেই কার্য করিতে সমর্থ।"

স্বামীবিবেকানন্দ

উদাত্ত আহ্বান

শাশ্বত ভারত

"ভারতবর্ষের প্রধান সার্থকতা কী, এ কথার স্পষ্ট উত্তর যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন, সে উত্তর আছে, ভারতবর্ষের ইতিহাস সেই উত্তরকেই সমর্থন করিবে। ভারতবর্ষের চিরদিনই একমাত্র চেষ্টা দেখিতেছি প্রভেদের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করা, নানা পথকে একই লক্ষ্যে অভিমুখীন করিয়া দেওয়া এবং বহুর মধ্যে একের নিঃসংশয়রূপে অন্তরতররূপে উপলব্ধি করা,—বাহিরে যে সকল পার্থক্য প্রতীয়মান হয়, তাহাকে নষ্ট না করিয়া তাহার ভিতরকার নিগূঢ় যোগকে অধিকার করা।

এই একের প্রত্যক্ষ করা এবং ঐকান্তিক বিস্তারের চেষ্টা করা ভারতবর্ষের পক্ষে এমন্ত স্বাভাবিক। তাহার এই স্বভাবই তাহাকে চিরদিন রাষ্ট্র গৌরবের প্রতি উদাসীন করিয়াছে! কারণ রাষ্ট্রগৌরবের মূলে বিরোধের ভাব। যাহারা পরকে একান্ত পর বলিয়া সর্বান্তঃকরণে অনুভব না করে, তাহারা রাষ্ট্র-গৌরব লাভকে জীবনের চরম লক্ষ্য বলিয়া মনে করিতে পারেনা। পরের বিরুদ্ধে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার যে চেষ্টা, তাহাই পোলিটিক্যাল উন্নতির ভিত্তি এবং পরের সহিত আপনার সম্বন্ধ-বন্ধন ও নিজের ভিতরকার বিচিত্র বিভাগ ও বিরোধের মধ্যে সামঞ্জস্য-স্থাপনের চেষ্টা, ইহাই ধর্ম নৈতিক ও সামাজিক উন্নতির ভিত্তি। য়ুরোপীয় সভ্যতা যে ঐক্যকে আশ্রয় করিয়াছে, তাহা বিরোধ-মূলক। ভারতবর্ষীয় সভ্যতা যে ঐক্যকে আশ্রয় করিয়াছে, তাহা মিলনমূলক। য়ুরোপীয় পোলিটিক্যাল ঐক্যের ভিতরে যে বিরোধের ফাঁস রহিয়াছে, তাহাকে পরের বিরুদ্ধে টানিয়া রাখা যায়, কিন্তু তাহাকে নিজের মধ্যে সামঞ্জস্য দিতে পারা যায় না।

এইজন্য তাহা ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, রাজায় প্রজায়, ধনীতে দরিদ্রে, বিদ্বেষ ও বিরোধকে সর্বদাই জাগ্রত করিয়াই রাখিয়াছে।

ভারতবর্ষ বিসদৃশকেও সম্বন্ধ-বন্ধনে বাঁধিবার চেষ্টা করিয়াছে। যেখানে যথার্থ পার্থক্য আছে, সেখানে সেই পার্থক্যকে যথাযোগ্য স্থানে বিন্যস্ত করিয়া—সংযত করিয়া তবে তাহাকে ঐক্য দান করা সম্ভব।

বিধাতা ভারতবর্ষের মধ্যে বিচিত্র জাতিকে টানিয়া আনিয়াছেন। ঐক্যমূলক যে সভ্যতা—মানব জাতির চরম সভ্যতা, ভারতবর্ষ চিরদিন ধরিয়া বিচিত্র উপকরণে তাহার ভিত্তি নির্মাণ করিয়া আসিয়াছে। পর বলিয়া সে কাহাকেও দূর করে নাই, অনার্য বলিয়া সে কাহাকেও বহিষ্কৃত করে নাই, অসঙ্গত বলিয়া সে কিছুই উপহাস করে নাই। ভারতবর্ষ সমস্ত গ্রহণ করিয়াছে, সমস্তই স্বীকার করিয়াছে। এত গ্রহণ করিয়াও আত্মরক্ষা করিতে হইলে এই পুঞ্জীভূত সামগ্রীর মধ্যে নিজের ব্যবস্থা নিজের শৃঙ্খলা স্থাপন করিতে হয়—ইহাদিগকে একটি মূল ভাবের দ্বারা বদ্ধ করিতে হয়।

উপকরণ যেখানকারই হউক, সেই শৃঙ্খলা ভারতবর্ষের, সেই মূল ভাবটি ভারতবর্ষের। য়ুরোপ পরকে দূর করিয়া, উৎসাদন করিয়া, সমাজকে নিরাপদ রাখিতে চায়।...হয় পরকে কাটিয়া

—মারিয়া-খেদাইয়া নিজের সমাজ ও সভ্যতাকে রক্ষা করা নয় পরকে নিজের বিধানে সংযত করিয়া সুবিহিত শৃঙ্খলার মধ্যস্থান করিয়া দেওয়া, এই দুই রকম হইতে পারে।

য়ুরোপ প্রথম প্রণালীটি অবলম্বন করিয়া সমস্ত বিশ্বের সঙ্গে বিরোধ উদ্যুক্ত করিয়া রাখিয়াছে—ভারতবর্ষ দ্বিতীয় প্রণালী অবলম্বন করিয়া সকলকেই ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে আপনার করিয়া লইবার চেষ্টা করিয়াছে। যদি ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা থাকে, যদি ধর্মকেই মানব-সভ্যতার চরম আদর্শ বলিয়া স্থির করা যায়, তবে ভারতবর্ষের প্রণালীকেই শ্রেষ্ঠতা দিতে হইবে।

পরকে আপন করিতে প্রতিভার প্রয়োজন। অন্যের মধ্যে প্রবেশ করিবার শক্তি এবং অন্যকে সম্পূর্ণ আপন করিয়া লইবার ইন্দ্রজাল ইহাই প্রতিভার নিজস্ব। ভারতবর্ষের মধ্যে সে প্রতিভা আমরা দেখিতে পাই। ভারতবর্ষ অসঙ্কোচে অন্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে এবং অনায়াসে অন্যের সামগ্রী নিজের করিয়া লইয়াছে। ভারতবর্ষ পুলিন্দ, শবর, ব্যাধ প্রভৃতিদের নিকট হইতেও বীভৎস সামগ্রী গ্রহণ করিয়া তাহার মধ্যে নিজের ভাব বিস্তার করিয়াছে—তাহার দ্বারা দিয়াও নিজের আধ্যাত্মিকতাকে অভিব্যক্ত করিয়াছে। ভারতবর্ষ কিছুই ত্যাগ করে নাই এবং গ্রহণ করিয়া সকলই আপনার করিয়াছে।

এই ঐক্যবিধান ও শৃঙ্খলা স্থাপন কেবল সমাজ ব্যবস্থায় নহে, ধর্মনীতিতেও দেখি; গীতায় জ্ঞান, প্রেম ও কর্মের মধ্যে যে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য স্থাপনের চেষ্টা দেখি তাহা বিশেষরূপে ভারতবর্ষের।

পৃথিবীর সভ্য সমাজের মধ্যে ভারতবর্ষ নানাকে এক করিবার আদর্শরূপে বিরাজ করিতেছে, তাহার ইতিহাস হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হইবে। একেকে বিশ্বের মধ্যে ও নিজের আত্মার মধ্যে অনুভব করিয়া সেই একেকে বিচিত্রের মধ্যে স্থাপন করা, জ্ঞানের দ্বারা আবিষ্কার করা, কর্মের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করা, প্রেমের দ্বারা উপলব্ধি করা এবং জীবনের দ্বারা প্রচার করা—নানা বাধা-বিপত্তি-দুর্গতি-সুগতির মধ্যে ভারতবর্ষ ইহাই করিতেছে। ইতিহাসের ভিতর দিয়া যখন ভারতবর্ষের সেই চিরন্তন ভাবটি অনুভব করিব তখন আমাদের বর্তমানের সহিত অতীতের বিচ্ছেদ বিলুপ্ত হইবে।"

রবীন্দ্রনাথ

চিঠি-শুধু চিঠি নয়

"শশী তোকে একটা নূতন মতলব দিচ্ছি। যদি কার্য্যে পরিণত করতে পারিস তবে জানব তোরা মরদ, আর কাজে আসবি। হরমোহন, ভবনাথ, কালীকৃষ্ণ বাবু, তারকদা প্রভৃতি সকলে মিলে একটা যুক্তি কর। গোটা কতক কাগজের, কতকগুলো ম্যাপ, গ্লোব কিছু Chemicals (রাসায়নিক) দ্রব্য ইত্যাদি চাই। তারপর একটা মঠ খুঁড়ে চাই। তারপর কতকগুলি গরীব-গুরবো জুটিয়ে আনা চাই তারপর তাদের Astronomy, Geography (জ্যোতিষ, ভূগোল) প্রভৃতির ছবি দেখাও, আর রামকৃষ্ণ পরমহংসের উপদেশ কর। কোন্ দেশে কি হয়, কি হচ্ছে, এ দুনিয়াটা কি, তাদের হাতে চোখ খোলে তাই চেষ্টা কর। ০০ পুঁথি-পাতড়ার কর্ম্ম নয়—মুখে মুখে শিক্ষা দাও। তারপর ধীরে ধীরে centre extend (কেন্দ্রের প্রসার) কর। পারবো কি? না, শুধু ঘণ্টা নাড়া? ০০০ উঠে পড়ে লেগে যাও দিকি। গল্প-মারা, ঘণ্টা-নাড়ার কাল নেছে কে বাপু, ০০০ দেখি বাঙালীর ধর্ম্ম কতদূর গড়ায়। ০০০ কতকগুলো চেলা চাই—fiery young men (অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত যুবক). বুঝতে পারলে? Intelligent and brave (বুদ্ধিমান ও সাহসী), মনের মুখে যেতে পারে, সাঁতার দিয়ে সাগর পারে যেতে প্রস্তুত, বুঝলে? Hundreds (শত শত) ঐ রকম চাই. মেয়ে মদ both (দুই)—প্রাণপণে তারই চেষ্টা কর—চেলা বানাও আর আমাদের purity drilling (পবিত্রতা সাধন) ঘরে ফেলে দাও।০০০ সব ঠিক আসবে ধীরে ধীরে। আমার বড্ড চিঠি লেখবার সময় বড় একটা হয়না। Lecture কেক্‌চার (বক্তৃতা) তো কিছু লিখে দিই না, একটা লিখে দিয়েছিলুম, যা ছাপিয়েছে। বাকী সব দাঁড়াও পি. যা মুখে আসে গুরুদেব জুটিয়ে দেন। কাগজ পত্রের সঙ্গে কোন সম্বন্ধই নেই। একবার ছেলেবেলা তিন ঘণ্টা ধরে বুলি ঝেড়েছিলুম। আমি নিজে অবাক হয়ে যাই সময় সময়, 'মণ্টো', তোর পেটে এতও ছিল!!'০০০

সমাজকে, জগৎকে Electrify (বৈদ্যুতিক শক্তি সম্পন্ন) করতে হবে। বসে বসে গল্প-বাজীর আর ঘণ্টা নাড়ার কাজ? ঘণ্টা নাড়া গৃহস্থের কর্ম্ম, মহীন্দ্র মাষ্টার, রামবাবু করুন গে। তোমাদের কাজ Distribution and propagation of thought currents (ভাবপ্রবাহ-বিস্তার)। ০০০ Character formed (চরিত্র গঠিত) হয়ে যাক্, তারপর আমি আসছি, বুঝলে? দু'হাজার, দশ হাজার, বিশ হাজার সন্ন্যাসী চাই, মেয়ে-মদ—বুঝলে? গৌরী-মা, যোগেন-মা, গোলাপ-মা কি করছেন? চেলা চাই at any risk (যেকোন রকমে হোক)। ০০০ বুদ্ধু চেলার কাজ নয়, ত্যাগী—বুঝলে? এক এক জনে এক শত মাথা গুড়িয়ে ফেল, young educated men not fools (শিক্ষিত যুবক—আহম্মক নয়), তবে যদি বাঁচাতে পার। হনুমান হতে হবে, হুঁকো-হুঁকো ফেলে কোমর বেঁধে খাড়া হয়ে যাও। তারক দাদা মাদ্রাজ কলিকাতার মাঝে বিদ্যুতের মত চক্র মারো দিকি,

যায় কতক। আয়গায় আয়গায় centre (কেন্দ্র) কর, খালি চেলা কর, যায় মেয়ে-মদ, যে আসে যে মাথা মুড়িয়ে, তারপর আমি আসছি। মহা Spiritual tidal wave (আধ্যাত্মিক বন্যা) আসছে —নীচ মহৎ হয়ে যাবে, মূর্খ মহা পণ্ডিতের গুরু হয়ে যাবে তাঁর কৃপায়—'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত'। ... এই Test (পরীক্ষা), যে রামকৃষ্ণের ছেলে সে আপনার ভাল চায় না, 'প্রাণাত্যয়েঽপি পরকল্যাণচিকীর্ষবঃ' (প্রাণ দিয়েও পরের কল্যাণাকাঙ্ক্ষী) তারা। .. তাঁর চরিত্র, তাঁর শিক্ষা, বর্ম—চারিদিকে ছড়াও—এই সাধন, এই ভজন ; এই সাধন, এই সিদ্ধি। ওঠ, ওঠ, মহা তরঙ্গ আসছে, onward onward (এগিয়ে যাও, এগিয়ে যাও), .. মায়ের সময় নাই, যশের সময় নাই, মুক্তির সময় নাই, ভক্তির সময় নাই, সেবা যাবে পরে। এখন এজন্মে, অনন্ত বিস্তার, তাঁর মহান চরিত্রের, তাঁর মহান জীবনের, তাঁর অনন্ত আত্মার। ... যেখানে তাঁর নাম যাবে, কীট পতঙ্গ পর্যন্ত দেবতা হয়ে যাবে, হয়ে যাচ্ছে, দেখেও দেখছনা ? ... যে যে এই চিঠি পড়বে তাদের ভিতর আমার spirit (শক্তি) আসবে, বিশ্বাস কর। ... আমার হাত ধরে কে নেবাচ্ছে। Onward, ধরে ধরে। সব ভেসে যাবে -হুঁসিয়ার—তিনি আসছেন। যে যে তাঁর সেবার জন্য—তাঁর সেবা নয়—তাঁর ছেলেদের গরীব-দুঃখী, পাপী-তাপী, কীট পতঙ্গ পর্যন্ত, তাদের সেবার জন্য যে যে তৈরী হবে, তাদের ভেতর তিনি আসবেন— তাদের মুখে সরস্বতী বসবেন, —তাদের বক্ষে মহামায়া মহাশক্তি বসবেন।"

[১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে নিউইয়র্ক নগর থেকে তাঁর গুরুভ্রাতাকে লেখা স্বামী বিবেকানন্দের পত্র]

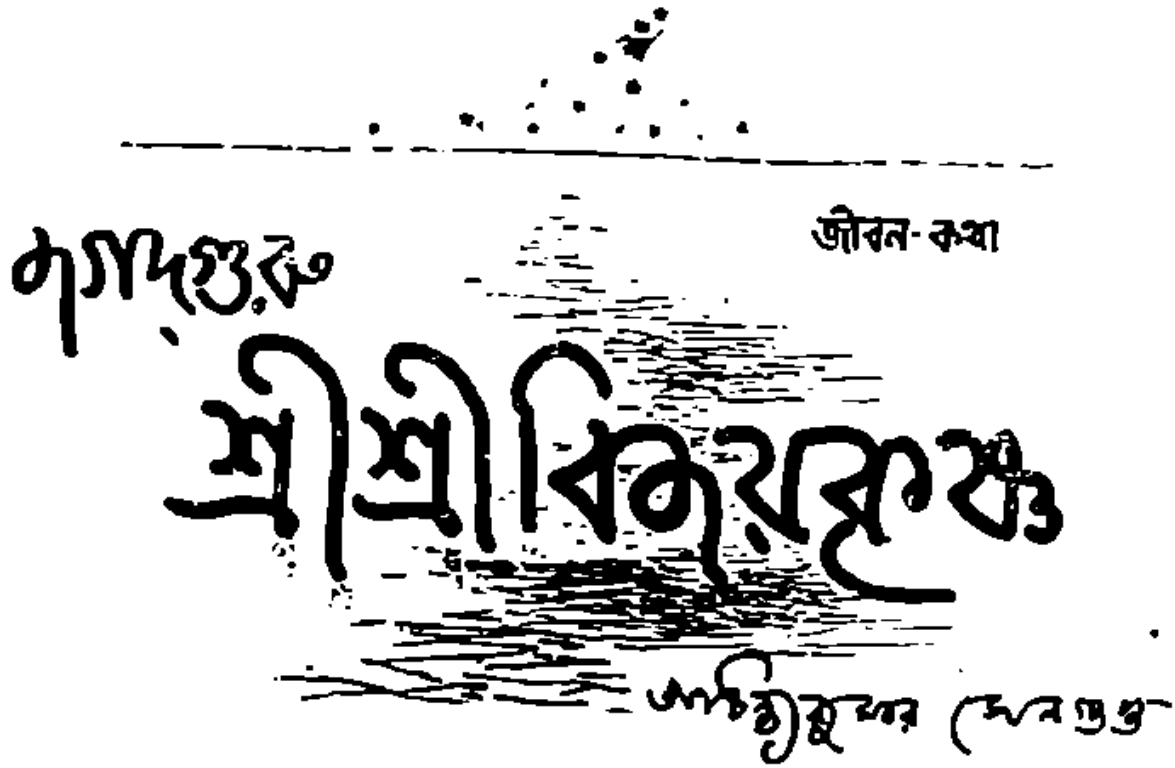

২৩

আগে শ্রদ্ধা। সর্বপ্রথমেই শ্রদ্ধা, শাস্ত্রে ও সদাচারে বিশ্বাস। তারপরেই সাধুসঙ্গের অধিকার। সাধুসঙ্গ থেকে আকাঙ্ক্ষা জাগে আমিও অমনি জীবন লাভ করি। তখন শুরু হয় ভজনক্রিয়া। ভজনের ফলে অনর্থনিবৃত্তি, সমস্ত প্রতিকূল অবস্থার অবসান। সেই থেকে নিষ্ঠা রুচি ভক্তি। তারপরেই ভাব। সর্বশেষে প্রেম।

প্রকৃত সাধুর লক্ষণ কী?

বলছেন বিজয়কৃষ্ণ, 'প্রকৃত সাধু কখনো আত্মপ্রশংসা করে না। পরনিন্দা করে না। কোনোরকম বুজরুকি দেখায় না। কারু বিশ্বাসে আঘাত দিয়ে কথা বলে না। কাউকে নিজের মতে টানতে চেষ্টা করে না। সর্বদা ভগবানে নির্ভর করে থাকে। অনাহারে প্রাণ গেলেও কারু কাছে কিছু যাচ্ঞা করে না। কায়মনোবাক্যে শাস্ত্র ও সদাচারের মর্যাদা রক্ষা করে চলে। সর্বজীবে দয়া করে, মানুষ পশুপাখি কীটপতঙ্গ তো বটেই, বৃক্ষলতার দুঃখেও সহানুভূতি করে, অন্যের সমস্ত অবস্থা নিজের বলে অনুভব করে, কারুই উদ্বেগের কারণ হয় না। আর সর্বদা সন্তুষ্ট থাকে, কখনো কোনো কারণে চঞ্চল হয় না।'

আশ্চর্য জায়গা এ বৃন্দাবন।

ময়ূর-ময়ূরী খেলা করছে, আনন্দে নাচছে পেখম মেলে। মানুষ দেখেও ভয় নেই এতটুকু। হরিণ তো একেবারে নিঃসঙ্কোচ, মানুষকে মানুষই মনে করে না। কেন অমন হবে না? বৃন্দাবনে যে হিংসা নেই। কোথাও একটা কাক দেখা যাচ্ছে না। আমিষ ভক্ষণ নেই বলে কাকও দেশান্তরী। সব গাছেরই ডালপালা নিম্নমুখী। কোথাও পাতার শিরায় শিরায় দেবনাগরী

অক্ষরে রাধাকৃষ্ণ লেখা। গাছের গায়ে কোথাও 'র', কোথ'ও বা 'ক্ষ' মাত্র হয়ে আছে, পরে ধীরে ধীরে পুরো নাম স্পষ্ট হবে।

আর পাখি দেখেছ? রাধাশ্যাম পাখি?

কোন উত্তর দেশ থেকে উড়ে আসে আর রাধ'শ্যাম রাধ'শ্যাম বলে ডাকে।

একবার এক ব্রজবাসী ছোটো পাখি ধরল। একটা উড়ে গেল। অন্যটাও উড়ে যায় সেই ভয়ে সেটাকে খাঁচায় পুরল। ব্যস, সে পাখির আর ডাক নেই। খেতে দিলেও কিছু খায় না, চায় না মুখ তুলে। কী হল রাধাশ্যামের?

পরদিন সকালে ঝাঁকে-ঝাঁকে রাধাশ্যাম পাখি ব্রজবাসীর কুঞ্জে এসে হাজির। সমস্বরে তাদের ডাক শুধু রাধাশ্যাম, রাধাশ্যাম। সে আর কলস্বর নয় আর্তনাদ।

পড়শীরা সবাই ধিক্কার করল ব্রজবাসীকে। রাধাশ্যামকে কখনো খাঁচায় পোরে? শিগগির ছেড়ে দাও, নইলে তোমার সর্বনাশ হবে।

ব্রজবাসী ভয় পেল। খুলে দিল খাঁচার দরজা। বন্দী পাখি মুক্তি পেল। নিমেষে বন্ধ হল কোলাহল।

পুলিশ সাহেব ঘোড়ায় চড়ে যমুনা পার হয়ে চলেছে বেলবাসের দিকে। মহলোর সেখানকার জঙ্গলে পাখি শিকার করবে। বৃন্দাবনে শিকার করা সরকারের বারণ, সেটা সাহেব গ্রাহ্যের মধ্যেই আনল না। বৃন্দাবনে কাউকে আঘাত করতে নেই, গ্রামের লোক অনেক নিষেধ করল, কিন্তু একে ইংরেজ, তায় পুলিশ, সমস্ত উড়িয়ে দিল।

একটা যুবো ওরোয় দেখে বন্দুকের ঘোড়া টিপল সাহেব। গুলি খেয়ে দুই লাফে সাহেবের সামনে এসে পড়ল ওরোয়। তাকে দেখে ঘোড়া ভীষণ ঘাবড়ে গেল। সাহেবকে মাটিতে ফেলে দিয়ে চার পা তুলে ছুট দিলে। আর দেখতে হলনা, সাহেবকে ওরোয় টুকরো টুকরো করে ফেলল।

কেমন, তখন বলেছিলাম না? বৃন্দাবনে হিংসা করেছ কি মরেছ।

কুঞ্জের একটি গাছকে কুঞ্জের কর্তা কেটে ফেলবে ঠিক করল। কাঠের দরকার।

রাত্রে কর্তা স্বপ্ন দেখল একটি বৈষ্ণববেশধারী ব্রাহ্মণ তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। বলছে, 'আমি তোমার কুঞ্জে ঐ বৃক্ষরূপে অনেকদিন ধরে আছি। শুধু বৃন্দাবনের রজলাভের জন্যে। তুমি গাছটাকে কেটে ফেললে আমি নিরাশ্রয় হয়ে যাব। আমার আর রজলাভ হবে না।'

'তোমার কথা বিশ্বাস করি না।' স্বপ্নের মধ্যেই কর্তা বললে।

'বেশ, তোমার বিশ্বাসের জন্যে কাল সকালে গাছের নিচে আমি একবার দাঁড়াব। ইচ্ছে করলেই আমাকে দেখতে পাবে।'

খুব ভোরেই কর্তা সেই গাছের কাছে এসে দাঁড়াল। দেখল একটী বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ দাঁড়িয়ে আছে।

চোখে দেখেও বিশ্বাস করতে চাইল না। ভাবল কে না কে দাঁড়িয়ে আছে।

যেমন সঙ্কল্প করেছিল, গাছ কেটে ফেলল। দেখিনা কী হয়।

যারা স্বপ্নকে অমূলক ভেবে গাছের গায়ে কুড়ুল চালিয়েছিল তারা আগে মরল। পরে কয়েক দিনের মধ্যে একে-একে মরল কর্তার স্ত্রী পুত্র কন্যা। কর্তা দর্শনশাস্ত্রে পণ্ডিত। কত আলোচনা কথকতা করত, হাবা হয়ে গেল।

'মশাই, যেখে থাকতে বৃন্দাবনের কত মাহাত্ম্যের কথা শুনেছি', এক বাঙালি ভদ্রলোক বলতে এসে গোঁসাইকে, 'কিন্তু কই কিছুই তো দেখতে পেলাম না।'

'কী দেখতে পেলেন না?'

'রজের কত গুণ শুনেছিলাম, কিছুই তো বুঝতে পারলাম না।'

'আপনি একবার রজে পড়ে দেখুন দেখি।'

'এই তো পড়লাম।' ভদ্রলোক কিছু হয়ে রজে মাথা ঠেকাল: 'কই, কী হল? কিছুই হলনা।'

'গায়ের জামাটা খুলে ফেলুন দেখি।'

'খুলে ফেলব?' ভদ্রলোক দোনামনা করতে লাগল।

'হ্যাঁ, খুলে ফেলে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে রজে একবার গড়াগড়ি দিন', গোঁসাই বললে, 'ফলের দেখুন কী হয়?'

'কী আবার হবে! কিছু হবে না।' ভদ্রলোক গায়ের জামা খুলে ফেলল। যা থাকে অদৃষ্টে, রজে লুটিয়ে পড়ল, গড়াগড়ি খেতে লাগল।

ও মা, কতক্ষণ পরেই ভদ্রলোক হাউ-হাউ করে কাঁদতে লাগল। আমার-এ কী হল? আমি তো ঘোর অবিশ্বাসী। আমার এ কী আনন্দ! আমার এ কী রোমাঞ্চ! আনন্দরোমাঞ্চে তো তুমি কাঁদছি কেন? জয় রাধারাণীর জয়!

সতীশ মুখুজ্জে, জামালপুর স্কুলের শিক্ষক, উপবীত ত্যাগ করে ব্রাহ্ম হয়েছিল। বাপের মৃত্যু-সংবাদ শুনে বৃন্দাবনে এসে মিলল গোঁসাইয়ের সঙ্গে। কিন্তু শান্তি নেই, রোজই গোঁসাইয়ের সঙ্গে ঝগড়া করতে লাগল।

গোঁসাই বললে, 'তোমার পিতার প্রেতাত্মা সর্বদা তোমার উপর রয়েছে, তাই এই অশান্তি।'

'কী করে এই অশান্তি যাবে?'

'শাস্ত্রমত শ্রাদ্ধ করলে যাবে।'

'শাস্ত্রমত করব কী করে? পৈতে কই?'

'আবার উপবীত গ্রহণ করো।' গোঁসাই বললে গম্ভীরস্বরে।

সতীশ হাসল। বললে, 'যা একবার ছেড়েছি তা আবার নিই কী করে?'

'না, নাও। উপবীতের অনেক গুণ।'

'বাজে কথা। যদি গুণই থাকত তবে আর তা ত্যাগ করা যেত না। গুণ ছিল না বলেই—'

'গুণ ছিল না যেহেতু তেমন ব্রাহ্মণের কাছ থেকে পাওনি। তেমন ব্রাহ্মণের কাছ থেকে পেলে আর ছাড়তে পারতে না।'

'ছাড়বার মালিক তো আমি, ব্রাহ্মণ কী করবে।' সতীশ আবার হাসল।

'বেশ, আমি তোমাকে দিচ্ছি,' গোঁসাই হুঙ্কার করে উঠল: 'দেখি কেমন ওটা তুমি ত্যাগ করতে পারো।'

একটা পৈতে গোঁসাই নিজের হাতে করে সতীশকে পরিয়ে দিল। সতীশ তখুনি তা ছিঁড়তে গেল। কিন্তু কী আশ্চর্য, তার হাত বেঁকে গেল, উপবীত স্পর্শ করতে পারলনা। আবার চেষ্টা করল, আবার বেঁকে গেল হাত। এ কী দুর্বলতা! সতীশ সর্বশক্তিতে ধরতে গেল উপবীত, হাত অসহ্য ব্যথা করে উঠল, যন্ত্রণায় বেরিয়ে এল আর্তনাদ।

না, থাক। ছিঁড়ব না, ছাড়ব না। শ্রাদ্ধ করব।

আর যন্ত্রণা নেই। বুঝতে পারল সূত্রের মাহাত্ম্য। গোস্বামীপ্রভুর পায়ে প্রণত হল সভাই। ঘোর দুঃস্বপ্নেও কখনো ভাবতে পারেনি আর উপবীতধারীদের কথা।

'আমাদের খুব কষ্ট।'

তোমরা কারা? গোঁসাই ফিরে তাকাল।

'আমরা কতগুলি প্রেতাত্মা। কিছুতেই আমরা মুক্তি পাচ্ছি না। আপনি যদি দয়া করেন—' ছায়ামূর্তিগুলি গোঁসাইকে ঘিরে ধরল।

'আমি কী করতে পারি?'

'আপনি শুধু যমুনায় নামুন। আমরা জানি কিসে আমরা উদ্ধার পাব।'

যমুনায় নামতে আর দোষ কী। গোঁসাই যমুনায় ডুব দিয়ে সিক্ত গায়ে উঠে এল। প্রেতাত্মারা তার পাদোদক সেবন করল। সঙ্গে-সঙ্গেই তাদের ঘুচে গেল প্রেতত্ব। জ্যোতির্ময় দেহ ধরে আকাশে অন্তর্হিত হল।

আরেকদিন যমুনায় স্নান করতে যাচ্ছে গোঁসাই দেখল চড়ায় একখণ্ড অস্থি পড়ে আছে। কুড়িয়ে নিয়ে দেখল অস্থির গায়ে 'হরে কৃষ্ণ' দেবনাগরী অক্ষরে আঁকা হয়ে আছে। সন্দেহ নেই, এই অস্থি কোনো এক উচ্চস্তরের মহাজন বৈষ্ণবের। সকলকে দেখাল গোঁসাই। দেখ কী অপূর্ব কীর্তি। শ্বাসে-প্রশ্বাসে এ মহাপুরুষের নাম অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। সেই নাম রক্তে মিশে শিরায়-শিরায় প্রবিষ্ট হয়ে মেদ মাংস ভেদ করে অস্থি স্পর্শ করেছিল। দেখ নামের কী নিদারুণ শক্তি! নামের নাম হাড়ে এসে বাসা বেঁধেছে।

বৈষ্ণবের দল কীর্তন লাগাল। অস্থিকে সমাধি দিল।

গোপীনাথজীর মন্দিরে কীর্তন-মহোৎসব হচ্ছে, গোঁসাই নর্তনোন্মত্ত, দেখা গেল যোগজীবন ছুটে আসছে। ছুটে আসছে দু হাত প্রসারিত করে গোঁসাইকে আলিঙ্গন করবার জন্যে। গোঁসাই উচ্চকণ্ঠে হরিধ্বনি করে উঠল। যোগজীবন ভাবাবেশে মূর্ছিত হল।

ঢাকা থেকে চলে এসেছে যোগজীবন। একা নয়, সঙ্গে মা আর ছোট বোন কুন্তু, প্রেমলতা।

যোগমায়াকে দেখে গোঁসাই কি খুব প্রসন্ন নন? যোগমায়া চলে এলে গেওরিয়া আশ্রম কে দেখবে? শাশুড়ি ঠাকরুন অসুস্থ, যোগজীবনের স্ত্রী ছেলেমানুষ, এই অবস্থায় চলে আসা কি ঠিক হয়েছে?

তবু ব্রজপরিক্রমায় গোঁসাই যোগমায়াকে ডেকে নিল।

জন্মাষ্টমীর পরে দশমী তিথি থেকে পরিক্রমণ সুরু। বৃন্দাবন থেকে প্রথম এল মথুরায়। মথুরায় ভূতেশ্বর মহাদেব, অম্বরীষ, ধ্রুবটিলা, বিশ্রামঘাট দেখল। পরদিন তালবন মধুবন কুমুদবন দেখে শান্তনুকুণ্ড। এইখানেই গঙ্গাদেবীকে আরাধনা করে শান্তনু ভীষ্মকে পেয়েছিল। জলাশয় ভরে পদ্ম ফুটে আছে, মাঝখানে উঁচু টিলা আর তার উপরে মন্দির। মন্দিরে রাধাকৃষ্ণের যুগল বিগ্রহ। জীবন্ত সজল বিগ্রহ, দেখলেই মনে হয় এখুনিই কথা কয়ে উঠবে।

কে এক গোপবালা ফল আর দধি-দুগ্ধ নিয়ে এসেছে। এ কার জন্যে? আর কার জন্যে! আমার কৃষ্ণ-রাধাদের জন্যে। গোপবালা গোঁসাইকে সহস্তে খাইয়ে দেয়, কতক্ষণ ধরে পথ চেয়ে বসে আছি সুক্ষমনে। মাঠে-মাঠে কোথায় খেলা করছিলি এতক্ষণ?

সেখান থেকে বেহলাবন।

এক বৃদ্ধা গোঁসাইয়ের সঙ্গ ধরল।

'কে মা তুমি?' জিজ্ঞেস করল গোঁসাই।

'আমি শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাপ্রার্থী, তাপোক, আমি তোমার সঙ্গে যাব।'

'তুমি যে মা খুব অসুস্থ, জরাজীর্ণ, কী করে হাঁটবে?"

'তুমি ভরসা করবে।' বৃদ্ধা সাহসে বললে, 'তুমি সঙ্গে থাকলে আমার আর ভয় কী!'

'চলো।'

বেহলাবনে রাত কাটিয়ে চলল রাধাকুণ্ডের দিকে। অন্য রাধে শ্রীরাধে শ্রীকৃষ্ণপ্রার্থনারতে।

পথে রাঢ়গ্রাম অতিক্রম করে প্রথমে সূর্যকুণ্ডে উপস্থিত হলেন। অদ্বৈত আচার্য ভারতবর্ষের চারধাম ঘুরে এই কুণ্ডে এসে বিশ্রাম করেছিলেন। তাঁর বংশের বিজয়কৃষ্ণ এই কুণ্ডে স্নান করে তীরে বসে স্মরণ করল পূর্বকথা। সেখান থেকে বিশ্রামে রাধাকুণ্ডে এসে পৌঁছুল। রাধাকুণ্ডে ও শ্যামকুণ্ডে দুকুণ্ডেই স্নান করল নতুন করে। প্রদক্ষিণ করল। দেখল রঘুনাথের ভজন-কুটির। আর এই সেই কবিরাজ গোস্বামীর কুঞ্জ, এইখানে বসেই তিনি চৈতন্যচরিতামৃত লিখেছিলেন।

তারপর সদলে গিরিগোবর্ধনে চলে এল। দলছাড়া হয়ে একা হয়ে গেল গোঁসাই। হঠাৎ পর্বতের নির্জনে একটা গোফার কাছে এসে দেখলেন একটা কঙ্কাল তাঁকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। এগিয়ে গেল গোঁসাই। দেখল কঙ্কালের চোখ দুটো জ্বলছে আর মুখগহ্বরে জিভ নড়ছে। এ কী রকম কঙ্কাল! কঙ্কাল তো চোখ আর জিভ জীবন্ত কেন?

কঙ্কাল কথা কয়ে উঠল। বললে, 'চোখ রেখেছি রূপ দেখতে লীলা দেখতে আর জিভ রেখেছি হরিনাম করতে।'

'কত কাল আছেন এমনি?' জিজ্ঞেস করল গোঁসাই।

'চারশো বছরেরও বেশি।' বললে কঙ্কাল, 'মহাপ্রভুকে দেখেছি, নিত্যানন্দকে দেখেছি। দেখেছি অদ্বৈতকে, হরিদাসকে। গৌরাঙ্গ লীলাদর্শনের পর আরেক অবতারলীলা দেখবার আশায় বসে আছি।' বলেই সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করল গোঁসাইকে।

বছরের মধ্যে একদিন একবার সেই কঙ্কাল উচ্চস্বরে হরিবোল বলে ওঠে—সে ধ্বনি সাত-আট মাইল দূর থেকে শোনা যায়।

ব্রজের সঙ্গে এসে মিলল বিজয়কৃষ্ণ। গোবর্ধন প্রদক্ষিণ করতে বেরুল। পথিমধ্যে 'হাউজী'র পদাঙ্ক দেখল। কেউ কেউ বললে শিশু বলরামের পদচিহ্ন এত প্রকাণ্ড হয় কী করে? গোঁসাই বললে, না, এ গৌরপদচিহ্ন। হ্যাঁ, পাষাণের বুকেও পা রাখতে কুণ্ঠা করেন নি গৌরহরি। নীলাচলে জগন্নাথমন্দিরেও তাঁর পদচিহ্ন পাবে। আর ঐ ঘাটে এই যে দেখছ প্রস্তরখণ্ড, এইখানে শ্রীকৃষ্ণ বসেছিল আর তাই ধরে কত কেঁদেছিলেন মহাপ্রভু। এখন আবার কাঁদতে বসল বিজয়কৃষ্ণ।

সেখান থেকে বলদেবকুণ্ড থেকে গোবিন্দকুণ্ড। এই গোবিন্দকুণ্ডেই মাধবেন্দ্র পুরী গোপাল-দেবের মন্দির স্থাপন করেছেন। নিকটেই তাঁর সমাধি। কাছাকাছি এক মন্দিরে রাধিকাপ্রসাদ দাস নামে এক বৈষ্ণব মহাজন বাস করছেন। গোবর্ধনে একাসনে চল্লিশ বছর সাধন করে সিদ্ধ হয়েছেন! গোঁসাইকে দেখেই সানন্দে বলে উঠলেন, 'আমাকে কৃপা করে একবার দর্শন দিলেন, আরো একবার দেবেন। সেই আশায় দেহ ধরব।'

কী এক অপূর্ব দর্শন হল গোঁসাইয়ের। হৃদে পুলকিত হল। কতক্ষণ পরে দেখল লোকসমাগম হচ্ছে। তার সম্বরণ করে উঠে পড়ল।

গোবর্ধন পরিক্রমা শেষ করে দেখতে চলল মানসী গঙ্গা। সেখান থেকে যশোদাকুণ্ড, হরদেবজী, ওলালকুণ্ড, সাক্ষীগোপাল আর রূপসরোবর। শেষে অলকানন্দায়।

অলকানন্দায় যোগমায়া দেখতে পেল এক বৃহৎকায় বহুমান যাত্রীদের সঙ্গে ঘুরছে।

'ইনি কে?' জিজ্ঞেস করল গোঁসাইকে।

'ইনি মহাবীর। অলক্ষ্যে যাত্রীদের রক্ষক হয়ে চলেছেন। যাঁর অন্তশ্চক্ষু খুলে গেছে সেই শুধু দেখতে পায় তাঁকে।'

সেখান থেকে আদিবদ্রী হয়ে কামাবনে গেল সকলে। কামাবন থেকে বিমলাকুণ্ড, লুকলুকি-কুণ্ড। লুকলুকিকুণ্ডে শ্রীকৃষ্ণ বয়স্যদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলত। সেখান থেকে সঙ্কাকুণ্ড হয়ে চরণপাহাড়ী।

চরণপাহাড়ীতে পাথরে গরু বাছুর মানুষের অসংখ্য পদচিহ্ন। ত্রিভঙ্গমানসাকর্ষী শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনিতে প্রেমাবিষ্ট হয়ে পাহাড় দ্রবীভূত হত, আর যারা তখন পাহাড়ে থাকত তাদের পায়ের চিহ্ন বসে যেত পাথরে। তখন আর পাথর কোথায়, তখন মোম। বাঁশী নীরব হলে গলা মোম আবার শক্ত পাথর হয়ে উঠত, কাঁচা পায়ের দাগ পাকা হয়ে যেত। দেখে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে এ সব পদচিহ্ন মানুষের খোদা নয়। কতগুলি পদচিহ্নে স্পষ্ট অষ্টদল-চক্র। সন্দেহ কী, সেগুলি বৃন্দাবনচন্দ্রের। গোঁসাই পদচিহ্নগুলি পরীক্ষা করে দেখছে আর যেখানেই অষ্টদল-চক্র পাচ্ছে পড়ে পড়ে প্রণাম করছে। আর কাঁদছে। কী আনন্দ এই প্রণামে, এই প্রেমে, এই প্রেমাশ্রুতে।

সেখান থেকে চলো যাই কদমখণ্ডী। দোনা বা ঠোঙার গাছ দেখে আসি। একবার বন্ধুদের নিয়ে খেলতে-খেলতে বৃন্দাবনবিহারী তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়েছিলেন। কদমগাছের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন, দুধ খাব, পানপাত্র পাঠাও। বলতে বলতে গাছের অনেক পাতা নিজের থেকে সঙ্কুচিত হয়ে দোনা বা ঠোঙার আকার ধারণ করল। দুধ খাওয়া হয়ে গেলে গাছের পাতা আবার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে পেল।

খুঁজে খুঁজে সকলে হয়রান, দোনার গাছ কই? একটা কদম গাছকে প্রণাম করে সবাই প্রার্থনা করল, সেই গাছ দেখাও। অমনি সেই গাছে পাতায়-পাতায় দোনা বা ঠোঙা ফুটে উঠল।

চলে এল মানসকে। সেখানে সারি-সারি অনেক নূপুরের গাছ। যশোদাদুলালের ইচ্ছে হল ব্রজবালকদের সঙ্গে নাচে, কিন্তু নূপুর কই? বৃন্দাকে বললে, নূপুর জোটাও। বৃন্দাদেবীর ছড়ার মত ছড়া বের হল বৃন্দা থেকে, ছড়ার অগ্র ও অন্তভাগ জুড়ে গেল মুখোমুখি। ডিমরের বীজগুলো খেকে আলগা হয়ে খসে পড়ল ডিমরে আর হাওয়ায় দোলায় বাজতে লাগল রুনুর-রুনুর। স্বভাবশিশুদের ঐ স্বভাবনূপুর।

কখন থেকে একটা ময়ূর সঙ্গ নিয়েছে। গোঁসাই যদি কোথাও বসে, শিখি নৃত্য করে। যদি চলে শিখিও পিছু ধরে। গোঁসাইয়ের মনোরঞ্জন করবার জন্যেই তার আসা। বহুদূর এসে পরে সে অদৃশ্য হল—সে ময়ূর না কে, আর দেখা হল না।

চলে এল নন্দঘাট, রামঘাট, বলরামকুণ্ড, পাবিগ্রাম। অবশেষে তাণ্ডীরবন। সেখানে পৌঁছে গোঁসাই হঠাৎ 'শ্রীরাম' 'শ্রীরাম' বলে চেঁচিয়ে উঠল। 'আমি আছি' 'আমি আছি' উঠল এই প্রতিধ্বনি। কিছুই হারায়নি, সবাই আছি, সব কিছুই আছে।

সেইখান থেকে লৌহবন। লৌহবন থেকে নন্দের রাজধানী মহাবন। মহাবনে রাত কাটিয়ে পরদিন সকালে ব্রহ্মাণ্ড ঘাট। এই ব্রহ্মাণ্ড ঘাটেই শ্রীকৃষ্ণ মা-যশোদাকে মুখমধ্যে ব্রহ্মাণ্ড দেখিয়েছিল। তারপর ঘণ্টিমন্থনের স্থান দেখলেন, সেখান থেকে যমলার্জুন হয়ে চলে এল মধুবন গোকুলে। তারপর যমুনা পার হয়ে আবার মথুরা।

যাদবী তিথিতে গোসাই আবার বেরুল। এবার ব্রজমণ্ডল নয় এবার শুধু বৃন্দাবন পরিক্রমা। কেশীঘাট, জ্ঞানগোদরী, রাধাবাগ হয়ে রাধাঘাটে উপস্থিত হল। পরে ক্রমে ক্রমে দাবানলকুণ্ড, কালীয় হ্রদ, কিশোরঘাট, শৃঙ্গারঘাট। শৃঙ্গারঘাটে প্রভু নিত্যানন্দের বিগ্রহ দর্শন করল। সেখান থেকে বস্ত্রহরণ ঘাট, গোবিন্দঘাট ও ভ্রমরঘাট দেখে কেশীঘাটে ফিরে এল।

মুখে প্রত্যাবর্তন করে বিজয়কৃষ্ণ যোগমায়াকে বললে, 'তুমি এবার ঢাকায় ফিরে যাও।'

'তা কী করে হয়? স্বামীই স্ত্রীর চরম আশ্রয়, তোমাকে ছেড়ে আমি কোথায় যাব?' যোগমায়া মূঢ় হল।

'তবে আলাদা বাড়িতে গিয়ে থাকো। আমার কাছে তোমার থাকা হবে না।'

'না, না, আমি তোমার কাছেই থাকব।'

'আমি যে আশ্রম নিয়েছি তুমি আমার সঙ্গে থাকলে সে আশ্রমের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হবে। এ কুঞ্জে তোমার স্থান নেই।' বিজয়কৃষ্ণ কঠিন হল: 'তবু যদি তুমি জেদ করো, আমি অন্যত্র চলে যাব, উত্তরকূলতে চলে যাব।'

যোগমায়া স্তব্ধ হয়ে গেল। আলাদা একটা ঘরে রাত কাটাল। যোগজীবনকে বললে, যত শিগগির সম্ভব তুই কুতুকে নিয়ে ঢাকায় চলে যা।

ভোর হতে যোগমায়া নিরুদ্দেশ।

কোথায় আর যাবে, যমুনায় স্নান করতে গিয়েছে হয়তো। যোগজীবন শ্রীধর সতীশ কুলদা কত ঘাটে-অঘাটে খোঁজাখুঁজি করল, সন্ধান পেলনা। দিন গিয়ে সন্ধ্যা হয়ে এল তবু ফিরলনা যোগমায়া।

সন্ধ্যায় 'হরিবংশ' পাঠ করতে বসেছে কুলদা, পুঁথির মধ্যে দেখতে পেল একটা চিরকুট। তাতে যোগমায়ার নিজের হাতে লেখা: 'আমি চললাম, আমার কেউ অনুসন্ধান কোরো না।'

'তবে আর সন্দেহ নেই', যোগজীবন কেঁদে উঠল: 'মা যমুনায় ডুবে আত্মহত্যা করেছেন।'

কুলদা বললে, 'ঠাকুরকে তো জানাতে হয়। শ্রীধর, তুমি গিয়ে বলো।'

শ্রীধর বললে, 'আমার সাহস হয় না। তুমিই যাও।'

কুলদা গোসাইয়ের কাছে গিয়ে বসল। অনেকক্ষণ পর গোসাই চোখ মেলল। কুলদা বললে, 'মা ঠাকরুনকে পাওয়া যাচ্ছে না। কুঞ্জ থেকে একলা তো কোনদিন যান না কিন্তু জানিনা আজ কোথায় চলে গেছেন। সারা বৃন্দাবন আমরা খুঁজেছি, কোথাও সন্ধান পেলাম না।'

গোসাই নির্বিচল রইলেন। সহজ সুরে বললেন, 'কোথায় আর যাবেন! যমুনাতীর দেখেছ?'

'কোথাও দেখা আর কিছু বাকি নেই।'

গম্ভীর হয়ে গেল গোসাই। জিজ্ঞেস করল, 'তুমি আজ পাঠ শুনতে যাবে?'

'যাব।'

'যখন যাবে কুতুকে হাতে ধরে নিয়ে যেও।' গোসাইয়ের স্বরে কেমন যেন একটু উদ্বেগ ফুটে উঠল। 'যখন পাঠ শুনতে বসবে কুতুকে কাছে বসিও। সবসময় দৃষ্টি রেখো ওর উপর। ওকে আবার নিয়ে না যান।'

কেমন ভয় হল কুলদার। কিন্তু কুতুর এতটুকু ভয় নেই, উদ্বেগ নেই, বিমর্ষতা নেই। সে যেমন হাসি-গল্পে ছিল তেমনি হাসি-গল্পেই আছে।

এ অন্তর্ধানের কী রহস্য তা কে বলবে। [ক্রমশঃ

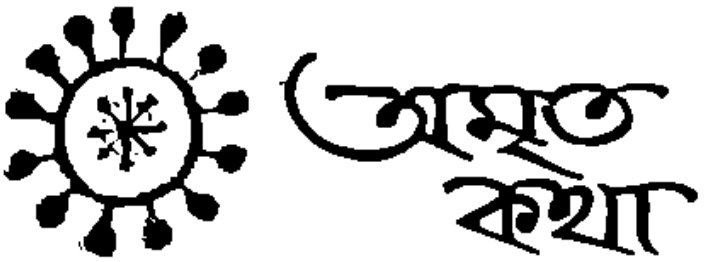

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথা—

সব ঘরকে নমস্কার করবে তবে, একটি আছে নিষ্ঠা ভক্তি। সবাইকে প্রণাম করবে বটে, কিন্তু একটির উপর প্রাণঢালা ভালবাসাই নাম নিষ্ঠা। রামরূপ যদি আর কোনরূপ হনুমানের ভাল লাগত না। নিষ্ঠা ভক্তির আর একটি নাম অব্যভিচারিনী ভক্তি। যেমন একডেলে গাছ, সোজা উঠেছে। ব্যভিচারিণী ভক্তি, যেমন পাঁচ ডেলে গাছ। গোপীদের ভক্তি, প্রেমাভক্তি, অব্যভিচারিণী ভক্তি, নিষ্ঠা ভক্তি। ব্যভিচারিণী ভক্তি কাকে বলে জান? জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি। যেমন কৃষ্ণই সব হয়েছেন। তিনিই পরব্রহ্ম, তিনিই রাম, তিনিই শিব, তিনিই শক্তি। কিন্তু ও জ্ঞানটুকু প্রেমাভক্তির সঙ্গে মিশ্রিত নাই। দ্বারকায় হনুমান এসে বলে, সীতারাম দেখব। ঠাকুর রুক্মিণীকে বলেন, তুমি সীতা হয়ে বস, তা না হলে হনুমানের কাছে রক্ষা নাই। পাণ্ডবেরা যখন রাজসূয় যজ্ঞ করেন, তখন যত রাজা সব যুধিষ্ঠিরকে সিংহাসনে বসিয়ে প্রণাম করতে লাগল। বিভীষণ বল্লেন, আমি এক নারায়ণকে প্রণাম করব, আর কাকেও করব না। তখন ঠাকুর নিজে যুধিষ্ঠিরকে তুমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করতে লাগলেন। তবে বিভীষণ রাজমুকুট শুদ্ধ মাটোদ হয়ে যুধিষ্ঠিরকে প্রণাম করে। কি রকম জান? যেমন বাড়ীর বউ। দেওর, ভাসুর, শ্বশুর, স্বামী সকলকে সেবা করে, পা ধোবার জল দেয়, গামছা দেয়, পিঁড়ে দেয়, কিন্তু এক স্বামীর সঙ্গেই অন্যরকম সম্বন্ধ। গোপীদের কি নিষ্ঠা! যমুনায় স্বামীকে অনেক কাকুতি-মিনতি করে সভায় ঢুকলো। স্বামী কৃষ্ণের কাছে তাদের নিয়ে গেল। কিন্তু পাগড়ী বাঁধা শ্রীকৃষ্ণকে দেখে তারা হেট মুণ্ড হয়ে রইল। পরস্পর বলতে লাগল, এ পাগড়ী বাঁধা আবার কে? এঁর সঙ্গে আলাপ করলে আমরা কি শেষে বিচারিণী হব? আমাদের পীতধড়া মোহন চূড়া পরা সেই প্রাণবল্লভ কোথায়? দেখেছ, এদের কি নিষ্ঠা! বৃন্দাবনের ভাব আলাদা। শুনেছি দ্বারকার কাছে লোকেরা অর্জুনের শ্রীকৃষ্ণকে পূজা করে। তারা রাধা চায় না।

ঈশ্বরের কাছে ভোগের কামনা করলে শেষে বিপদে পড়তে হয়। মনে কতরকম বাসনা কামনা উঠছে, সব বাসনাতে তো মন দেয় না। ঈশ্বর কল্পতরু—তাঁর কাছে কামনা করে যা চাইবে তা এসে পড়ে। শেষে বাঘও আসে। মানুষ কি কর্ম্ম? ঈশ্বর চিন্তা করতে পারে, অন্যকে চিন্তা করতে পারে, অন্য জীবজন্তু পারে না। বেশী খোরোনা আর শুচিবাই ছেড়ে দাও। যাদের শুচিবাই, তাদের জ্ঞান হয় না। আচার যতটুকু দরকার, ততটুকু করবে। বেশী বাড়াবাড়ি করো না।

———

দু'দিন বৈ তো নয়

সুবোধ বসু

'যাক, করবেন, চুনীবাবু, ধারে আর চা দিতে পারবনা। আপনার হিসেবে ইতি মধ্যে একচল্লিশ টাকার ওপর পাওনা দাঁড়িয়ে গেছে, গীটের পয়সা খরচা করে' আর কতদিন খাওয়াই বলুন ?...'

প্রবীণ ভ্যানি কাফের মালিক মহাবেরবাবুর কণ্ঠ আমার সুপরিচিত। প্রতিদিন সকাল ৭টায় এখান হইতে গরম চা ও তথাকথিত মাখনমাখা খাস্তা টোস্ট খাইয়া বাসবাজারের মোড় হইতে ইছাপুর বন্দুক তৈরীর কারখানার উদ্দেশে বাস্ ধরি। সকাল বেলায় তার গলায় একটা নিরস আওয়াজ শুনিয়া কাফের ক্যাশ কাউন্টারের দিকে তাড়াতাড়ি দৃষ্টি প্রেরণ করিলাম। সবিস্ময়ে দেখিলাম, আমাদের চুনীদা বকুনি-খাওয়া ছাত্রের মতো মুখ নত করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন, জবাব দিবার মতো কথা খুঁজিয়া পাইতেছেন না।

'এই যে, চুনীদা, শুনছেন ?' হাঁকিয়া কহিলাম। 'তবে বেয়ারার হু বলতে পারেন ? ও চুনীদা !'

অনতি বৃহৎ ভোজন কক্ষটিতে আরও দুপাঁচজন খদ্দের বসিয়াছিল। তারা চোখ উঠাইয়া আহ্বায়ক ও আহূতকে লক্ষ্য করিল। চুনীদাও চোখ তুলিয়া তাকাইয়া দেখিলেন, তারপর ধীরে ধীরে আমার টেবিলের দিকে আগাইয়া আসিলেন।

আমার সঙ্গে চুনীদার সামান্যই পরিচয়। বন্ধু সমরেশ এই রেস্তরাঁতেই প্রথম তাঁর সঙ্গে চেনা করাইয়া দেয়। তারপর আরও কয়েকবার এখানেই দেখাসাক্ষাৎ হইয়াছে। সমরেশ উপস্থিত থাকিলে একসঙ্গে কয়েকবার বসিয়া খাইয়াছি। সমরেশের মুখেই চুনীদার ইতিহাস শুনিয়াছি। মস্ত ধনী ছিল তাঁর বাবা ধনওয়ারী কালবার। বালতি তৈরীর কারখানা হইতে লাখ লাখ টাকা উপার্জন করিয়া গেছেন। কলকাতা শহরে চারটি বাড়ী ছিল। কাঁড়ি কাঁড়ি নগদ টাকা ছিল ব্যাঙ্কে। শেষ বয়সে তাঁকে ঘোড়া রোগে ধরে। মদে, মেয়েমানুষে এবং ঘোড় দৌড় ও নানাবিধ জুয়ায় সম্পত্তি উড়াইয়া দিবার উপক্রম করেন। কিন্তু একেবারে শেষ করিতে পারেন নাই। তার আগেই তাঁর মৃত্যু হয় জুয়ার আড্ডায় সন্দেহজনক ভাবে। যাই হোক, তাঁর একমাত্র ওয়ারিশ চুনীদা দু'চার লাখ টাকা হাতে পান। বাপ্‌কা বেটা আর সিপাহীকা ঘোড়া। চুনীদারও বেশিদিন লাগিলনা। দু'চার লাখ দু'চার বছরের মধ্যেই নিঃশেষ হইল। তারপর দালালি। দালালি প্রধানতঃ লটারীর টিকেটের। পৃথিবীর এমন জায়গার লটারী নাই যার খুঁটিনাটি খবর না রাখেন। এমন বাজি নাই যার টিকিট তিনি না বেচেন। আমার মত বাজি-বিমুখ লোকেরও তিনি দু-দশ টাকা না খসাইয়া ছাড়েন নাই।

'কি খবর রে, মন্তু ? এরই মধ্যে হাজির হয়ে গেছ ? কাজের সাজে দেখছি ? কোথায় কাজ করিস যে এত সকালে যেতে হয় ?'

'বসুন। এক পেয়ালা চা খান।' তার প্রশ্নের জবাব দিবার চেষ্টা না করিয়া কহিলাম।

চুনীদা বিনা আপত্তিতে বসিয়া পড়িলেন। কহিলেন, 'ভালই হলো। নইলে আজ ঘুমিয়েই পড়তে হ'তো। পকেট পড়ের মাঠ! কিন্তু কি রকম ছ্যাঁচোড় লোক দেখলি তো। পুরানো খদ্দের, এতদিনের আনাগোনা। এক পেয়ালা চায়ের দাম তলব করে ছাড়তে পারলি নে।'

একচল্লিশ টাকার দেনার কথাটার তিনি আর উল্লেখ করিলেন না।

'দুনিয়াটা টাকা ছাড়া আর কিছুই চেনে না, বুঝলি ভাই।' আমার দ্বিতীয় টোস্টটা প্লেট হইতে তুলিয়া তাহাতে এক সুধার্ত কামড় বসাইয়া চুনীদা দার্শনিকের কণ্ঠে মন্তব্য করিলেন। 'অথচ টাকার দেনা আমিই কি কম দেখিয়েছি? হাতের মলো। লাখ, করে ঘুরে ফেলেছি। সাহেবের হোটেলে ছাড়া খাইনি; সাহেবের দোকান ছাড়া জামা তৈরি করিনি। জুড়ি গাড়ী চড়েছি। জোড়া মোটর দরজা খুলে খেকেছে। নাচ, গান, বাগান বাড়িতে মুঠো মুঠো টাকা ছড়িয়েছি…'

'তখন অতটা বেহিসেবী না হলে এখন জীবনটা অনেক সহজ হতো না কি?'

চুনীদা এমন অতর্কিত আক্রমণের জন্য বোধহয় প্রস্তুত ছিলেন না। আবার সেই মায়-খাওয়া দৃষ্টিটা তাঁর দুই চোখে ভাসিয়া উঠিল। যেমন অসহায়, তেমনি করুণ। একটু ব্যথা বোধ করিলাম, কিন্তু অনুতপ্ত বোধ করিলাম না। অনেকদিন ধরিয়াই ভাবিয়াছি, এই অপ্রিয় সমালোচনাটা তাঁকে শোনাইয়া দেওয়া দরকার। সকলেই তাঁকে উস্কাইয়া তাঁর অমিতব্যয়িতার কাহিনী শুনিতে চায় ইহাই লক্ষ্য করিয়াছি। সমরেশকে বলিলে সে বলিত, 'উপদেশ দিয়ে আর কার কি লাভ হচ্ছে। ওড়ানো টাকা ফিরে পাবে কি? শুধু শুধু মনে কষ্ট পাবে।'

'অত হিসেবী হওয়া আমার রক্তের মধ্যে নেই।' একটু গম্ভীরভাবেই চুনীদা কহিলেন। 'যখন পাচ্ছ, ভোগ করে নাও, প্রাণভরে ভোগ করে নাও। অত ভয় ধরুর্ণঃ আমার চলবেনা। মানুষের জীবন, কবে আছে কবে নেই ঠিক কি। যতক্ষণ খাস আছে, দুনিয়ার মজা লুঠে নাও। তবে হ্যাঁ, যা বলেছিস ভাই, একটু বুদ্ধিসে পড়া গেছে। পকেটে পয়সা না থাকলে বন্ধু-ইয়ার সব স্বপ্নের মতো হাওয়া হয়ে যায়। দুনিয়াটা টাকাই চেনে, আর কিছু চেনে না। সত্যি ভাই, একটু আফশোষ যে না হয়, এমন নয়। অতটা বাড়াবাড়ি না করলে কিছু মন্দ হ'তো না। আবার যদি পেয়ে যাই, হুঁসিয়ার হ'তে হবে। নিদি একটা টিকিট—ব্রিটিশ হসুরাস ন্যাশনাল ল্যাকেল—প্রথম প্রাইজ টাকার হিসেবে হুলাখের ওপর। মাত্র পাঁচ টাকা। আমি নিজে দুটো টিকেট কিনে রেখেছি…'

'আমার ভাগ্যে বাজী জেতা নেই। এই আপনার চা টোস্ট এসে পড়েছে—নিন্, খান।' আমি টিকিট ক্রয় প্রসঙ্গকে আমল না দিয়া কহিলাম। সৌভাগ্যক্রমে রেজাল্টের ফল সম্বন্ধে আমার প্রশ্নটি তিনি শুনিতে পান নাই।

ব্যবস্থা করিতে না পারায় চুনীদা একটু হতাশ হইলেন। বিরক্তির কয়েকটা কুঞ্চন তাঁর চোখের তলায় ঘুরী খেলিয়া গেল। কিন্তু সাগ্রহেই তিনি সদ্য-আনীত আহার্যের প্রতি মনোযোগ দিলেন এবং আমার যে টোস্টটি তিনি ইতিমধ্যে উদরসাৎ করিয়াছেন, সেটি ফেরৎ দিবেন কিনা তাহা জিজ্ঞাসা করিতে ভুলিয়া গেলেন।

'দেখিয়েছিলাম হাতটা উমাশঙ্কর জ্যোতিষার্ণবকে। বলেন, প্রাপ্তিযোগ আছে। আমার নিজের মনও বলছে পাবই।' পরিতৃপ্তিসহকারে তৃতীয় টোস্টটি চর্বণ করিতে করিতে আকস্মিক

বিশ্বাসের সঙ্গে চুনীদা করিলেন। 'তখন দেখবি, এই চুনীদার অত চেহারা! আর এই যে দুই ডেকে আজ চা খাওয়াল, তাও তার মনে থাকবে।'

চুনীদা বড় ঘরের ছেলে। কৃতজ্ঞতা জানাইবার ভঙ্গিটা যাহাতে সহজ তাহা অস্বীকার করিবার উপায় কি? কিন্তু কারখানায় হাজিরার সময় আটটা। এই কথাটা তাহাকে স্মরণ করাইয়া দিবার অনুমতি গ্রহণ করিলাম।

ইহার অল্পদিন পরেই আমি অম্বরনাথের কারখানায় বদলি হইয়া সেখানে চলিয়া যাই। কলিকাতা ছাড়িতে প্রথম কষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু মহারাষ্ট্রের এই ছোট বসতিটির উদার প্রান্তর ও ঢেউ খেলানো ঘাস শীঘ্রই আমার মন কাড়িয়া লইল। কিন্তু বদলির চাকরির ট্র্যাডিশন এই যে, মন যেই শিকড় গাড়িয়া বসিয়াছে, তখনই হুকুম আসিবে, মূল উৎপাটন কর; অন্য চারণায় যাইতে হইবে। দু'বছর যাইতে না যাইতে কাটনী যাইবার আদেশ হইল। চার্জম্যান হইতে অ্যাসিসটাণ্ট, ফোরম্যানের পদে উন্নতি হইয়াছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও মন বড় খারাপ হইল। এমন সময় কলিকাতা ঘুরিয়া যাইবার সুযোগ হইল বিনা খরচে অর্থাৎ অফিসের কাজে। কিছুটা চাঙ্গা বোধ করিলাম।

কলিকাতার অফিসে কাজ পৌঁছাইয়া দিতে একদিন মাত্র যাইতে হইল। হাতের বাকি তিনটাদিন সারাটা শহর চষিয়া বেড়াইলাম। কত যে ইতিহাসখ্যাত রাস্তার নাম বদল হইয়াছে! ভাবিয়া ভীত হইলাম, একদিন কলিকাতা শহরটার নামই না বদলাইয়া রাখা হয়। যাই হোক, চৌরঙ্গী এখন পর্যন্ত চৌরঙ্গীই আছে। এই রাস্তা ধরিয়া বেলা সাড়ে বারোটা নাগাদ একটা আধাআধি সিনেমার ম্যাটিনী শোর টিকিট কিনিবার জন্য আগাইয়া চলিয়াছি। সহসা পিছন হইতে ডাক শুনিলাম, 'কে, নন্দ না?'

চমকাইয়া ফিরিয়া তাকাইলাম। প্রকাণ্ড বড় নতুন চকচকে মোটর হইতে ফুটপাথে নামিয়া পড়িয়াছেন ভদ্রলোক। গাড়ী হইতে তাঁরই মত সাহেবী পোষাক পরা আরও জনপাঁচেক লোক নামিবার উদ্যোগ করিতেছে। প্রকাণ্ড একদল। ক্ষণকালের জন্য সংশয় হইল, ভুল করি নাই তো। ইতিমধ্যে ভদ্রলোক সহাস্যমুখে কাছে আগাইয়াছেন। কহিলেন, 'কিরে, চিনতে পারছিস না! তোদের চুনীদা। আয়, আমার সঙ্গে আয়। কে ভেবেছিল, এমন আকস্মিক দেখা হয়ে যাবে!' বলিয়া সবল হস্তে তিনি আমার হাতের ডানা ধরিয়া আকর্ষণ করিলেন।

চিনিতে মুহূর্ত বিলম্ব হইয়াছিল, কিন্তু দেরি হইলেও বিস্ময়ের কিছু হইত না, তাঁর পরিবর্তন এমনই বিস্ময়জনক। দামী সিল্কের স্যুট, দামী টাই, পায়ে ঝিলিমিলি জুতো, বয়স ছেলে! হাতের আঙুলে নানারকম পাথর বসানো একাধিক আংটি এবং হাতে রেস-টিপস্-এর বই। এতক্ষণে মনে পড়িল বারটা শনিবার। রেসের দিন। চুনীদা সবান্ধবে রেসে যাইবার জন্য প্রস্তুত তাহা সহজেই বুঝিলাম। কিন্তু এই রকম দামী সাজপোষাক এবং ধনীশ্রেষ্ঠীর সঙ্গী কোথা হইতে জোগাড় হইল বুঝিতে পারিলাম না।

'খুব অবাক হচ্ছিস, কেমন। আয়, সঙ্গে চলে আয়। সব বলব'খন। রাস্তায় দাঁড়াবার সময় নেই। তাড়াতাড়ি খাওয়াটা সেরে নিতে হবে। আবার সাধোপতিরে আবার সাধোপতি।' বলিয়া আমার অনুমতির অপেক্ষামাত্র না করিয়া তিনি আমাকে টানিয়া লইয়া চলিলেন।

সামনেই রিয়্যুপোর রেস্তরাঁর ঘোতলায় উঠিবার সিঁড়ি। অবলীলাক্রমে তাহার দুটো ধাপ উঠিয়া

গেলাম। আমার ওজরে চুণীদা কর্ণপাত মাত্র করিলেন না। পিছনে তাঁর আর ওজন সঙ্গী। তাহারা আমাদের প্রায় ঠেলিয়া লইয়া চলিলেন।

—আহার পর্ব যথাসম্ভব দ্রুত সমাপ্ত হইল। চুণীদার বন্ধুদের খাওয়ার পার করিতে দু' দু' বোতল বীয়ারের প্রয়োজন হইল। আমাকেও তিনি দু'বোতল লিমনেডোপাশ একই প্রয়োজনে পান করিতে বাধ্য করিলেন। বেলে যাইবার তাড়া। আহার্য্য লইয়া বিলাস করা চলিবে না।

'যাবি বেলে? আনাড়ীর ভাগ্য জোর ভাগ্য। ট্রিপল টোট্ পাইবে দেব বেধিস···ওরে, তোমরা যাও, গাড়ীতে গিয়ে বসো। আমি বিল মিটিয়ে আসছি কি বলিস, যাবি?' চুণীদা বিলের অঙ্কটা পড়িয়া মণিব্যাগ হইতে একশো টাকার একটা নোট বাহির করিয়া ওয়েটারের ট্রেতে রাখিয়া আবার আমাকে সম্বোধন করিলেন।

'সত্যিকে আর হাতি রোগ ধরাবেন না, চুণীদা।' সহাস্যেই কহিলাম। 'কিন্তু এসব আবার সম্ভব হলো কি করে? গোপন পৈতৃক সম্পত্তির সন্ধান পাওয়া গেছে নাকি?···'

'বাপের টাকা নয়, এ খোদ নিজের টাকা।' চুণীদা কৃতী ব্যক্তিসুলভ আত্মতৃপ্তির সঙ্গে কহিলেন। 'পর পর দু'বার বরাতের শিকে মাথায় ছিঁড়ে পড়ল। প্রথমে হতুয়াস ফ্রাণ্যানাল র‍্যাফেল —দু'লাখ; তার পর দু'মাসের মধ্যেই রয়েল ম্যানিলা—প্রায় লওয়া লাখ। তোরা বিশ্বাস করতিস নে। আমি আগে থেকেই জানতুম। সবির হয়ে আমার থাকা পোষাবে না। তোর কথা অনেকদিন ভেবেছি। ঠিকানা জানিনে, তাই যোগাযোগ করতে পারিনি। আজ দেখা হয়ে যাওয়ায় বড় আনন্দ বোধ হচ্ছে। এই নে আমার কার্ড। আসিস একদিন। তোরা হলি অসময়ের বন্ধু। কিন্তু আজ আর সময় নেই। বন্ধুরা গাড়ীতে বসে আছে। এবার টালিগঞ্জ ছুটতে হবে···।'

তাঁর পিছনে পিছনে নিচে নামিয়া আসিলাম। ফুটপাথে পা দিবার সঙ্গে সঙ্গেই অপেক্ষমান গাড়ীর ভিতর হইতে সঙ্গীদের অকথ্য তাড়া আসিল। আমার দিকে চাহিয়া 'যাস্ একদিন' বলিয়া চুণীদা তাড়াতাড়ি সেদিকে আগাইয়া গেলেন।

আশ্চর্য্য মানুষ। আবার ঘোলাহের জুটাইয়াছেন। আবার টাকা দু'হাতে ওড়াইতেছেন। আবার ঘোড়দৌড় চলিতেছে! কতুর হইবার করুণ অভিজ্ঞতা বেমালুম ভুলিয়া গিয়াছেন। তাঁর রক্তের মধ্যেই এই জুয়াড়ী মিশাইয়া আছে—এই সর্বনাশা উন্মাদনা না হইলে তাঁর চলে না।

'ওরে নন্দ, শোন্ শোন্।'

ফিরিয়া দেখিলাম, চুণীদা পিছনে পিছনে প্রায় ছুটিয়া আসিতেছেন। গাড়ীর দরজা খোলা; ঘোলাহেবদের ভ্রূকুঞ্চনে বিরক্তির আভাস। অর্থাৎ গাড়ীতে চড়িয়া চুণীদা আবার নামিয়া আসিয়াছেন! 'কি ব্যাপার?' ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিলাম।

চুণীদা আমার আরও কাছে ঘেঁষিয়া দাঁড়াইলেন। কণ্ঠস্বর ফিস্‌ফিসানির পর্য্যায়ে নামাইয়া আনিলেন। চারদিকে একবার সন্ত্রস্তভাবে তাকাইয়া লইয়া কহিলেন—'তাবিসনি, সব উড়িয়ে দিচ্ছি। আগের বারের কথা খুবই মনে আছে। দশ দশ হাজার টাকা সরিয়ে রেখে দিয়েছি।' বলিয়া মুক্ত বিবেক ধর্মাত্মার ধর্ম্মাদার সঙ্গে একবার আমার চোখে চোখে চাহিয়া অ্যা-মুক্ত তীরের মত রেসের উদ্দেশে ছুটিলেন।

—ইহার পর চার বছর আর কলিকাতা আসিতে পারি নাই। আমার পক্ষে সেটা প্রায়

চৌদ্দ বছর বনবাসের মতো। এই বনবাসের অবসান ঘটিল আপাতত ভাবে। কলিকাতায় বদলির আদেশ আসিল।

অতএব পোঁটলা-পুঁটলি বাঁধিয়া বম্বে-হাওড়া ডিসাপ্তাহিক জনতা ট্রেনে চাপিয়া হাওড়া স্টেশনে রাত আটটায় আসিয়া হাজির হইলাম। ট্যাক্সি জোগাড় করিয়া বওনা হইতে আরও আধঘণ্টা। কিন্তু তা হইলে কি হয়। রাত সাড়ে আটটায়ও বড় বাজারের ভিড়ের কমতি নাই। ট্রাম-বাস-ট্রাক-ঠেলাগাড়ীর অসাধিচুড়ী। আমার অধৈর্য্য উপেক্ষা করিয়া আমার ট্যাক্সি মহাত্মা গান্ধী রোডের উপর এক দুর্ভেদ্য ও বহুদূর প্রসারী ট্রাফিক 'জাম্'এর পিছনে দাঁড়াইয়া গেল।

অস্থির হইয়া লাভ নাই। অদৃষ্টকে মানিয়া লইয়া বহুদিন না দেখা বড় বাজারের রূপ নিরীক্ষণে প্রবৃত্ত হইলাম। আকাশচুম্বী বাড়িগুলির বারান্দায় আগের মতই চটের পর্দার প্রাচুর্য্য-স্বাধীনতা লাভের পরও ইহারা মুক্ত হইতে পারে নাই। সুতরাং ইহাদের সম্বন্ধে আর মাথা না ঘামাইয়া নিরুপায় দোকানের দিকে নজর দিলাম। গলির মোড়টায়ই হালওয়াইয়ের দোকান—পরোটা, বরফি, কচুরী জেলিপী হাতছানি দিয়া ডাকিতেছে। ক্রেতার ভিড়ও প্রচুর। তারপরই মোহালক্ষ্মীর দোকান—শহরের যত ভাঙা জিনিষের আখড়া। এরপর প্রকাণ্ড এক আড়ত বস্তা বস্তা মালে ঠাসা। তারপর ছোট একটি সোনারূপার দোকান; শো কেস্ হইতে নানারকম রূপোর বাসন উঁকি মারিতেছে। তারপর কোনও দোকান নাই, ভিতরে যাইবার একটি অনতিউন্নত সরু পথ দেখা যাইতেছে। কিন্তু রাস্তার মাথার উপর একটা রুচ ধাতুর তলায় ছোট একটি সাইন বোর্ডে হিন্দীতে লেখা—'সস্তা ভোজনালয়।' ইহার পর রাস্তা হইতে হাত চারেক উঁচুতে ফ্লুরোসেন্ট আলোয় চকমক করিতেছে বাণারসী মিঠা পানের দোকান। রূপালী সোনালী তবকে মোড়া কত রকম পান সাজা আছে; কাচের বৈয়ামে বৈয়ামে কত রকম মসলা। আর ভিড়ও তাতে কত! আদ্দির কর্সা পাঞ্জাবি ও মাথায় কাপড়ের টুপি পরা দোকানদার বাবি মিটাইতে হিমসিম্ খাইয়া যাইতেছে। ইহার পরে কাটা কাপড়ের দোকান চোখে পড়িল, কিন্তু পানের দোকানটি এমনি জীবন্ত ও চমৎকার যে, তাহাতেই দৃষ্টি ফিরাইয়া আনিতে হইল।

সস্তা ভোজনালয়ের গলি হইতে কয়েকটি লোক বাহির হইয়া পানের দোকানের সামনে হাজির হইয়াছে। সহসা ইহাদের একজনের প্রতি নজর পড়ায় চমকাইয়া উঠিলাম। পায়ে ঘোরালো রঙের বিবর্ণ ক্যান্ভাসের জুতো, কোঁচানো ধুতিতে যেন গঙ্গার পলিমাটি পড়িয়াছে, ছিটের সার্টের ডবল-ব্রেস্ট প্রত্যন্ত-দেশে মহলার ঘসি খেয়া! কিন্তু তাহাতে চিনিতে কষ্ট হইল না। চুণীদা! একি হাল চুণীদার! গতবার তাঁকে দামি স্যুট পরিয়া দামি বিলিতি হোটেলে একদল বন্ধুবান্ধবকে আপ্যায়ন করিতে দেখিয়া গেছি।

ভিড় সরিয়া গেছে। আমার ট্যাক্সি-চালক স্টার্টার টিপিয়া গাড়ীতে জীবন সঞ্চার করিয়াছে। চুণীদা পান হাতে আমারই ট্যাক্সির পাশ দিয়া রাস্তা পার হইবার উপক্রম করিয়াছিলেন, গাড়ীর দরজা খুলিয়া 'চুণীদা' বলিয়া ডাকিয়া ধপ্ করিয়া তার হাত ধরিয়া তাঁকে টানিলাম। সবিস্ময়ে একবার তাকাইয়া দেখিলেন চুণীদা। তারপর 'কি খবর তোর? কোথায় যাচ্ছিস? শ্যামবাজারের দিকে যাচ্ছিস তো পথে নামিয়ে দিস।' বলিয়া যেন খুশি হইয়াই তিনি ট্যাক্সির ভিতরে প্রবেশ করিলেন।

'এ কি হাল আপনার?' প্রায় ভিরমীর ঘোরে কহিলাম। 'আপনার সর্ব্বস্ব উড়িয়ে দিয়েছেন নাকি?'

'কি করব ভাই। হাতে টাকা থাকলে তখন খরচা না করে পারি না।' চুনীদা আরাম করিয়া পিছনের সীটে পিঠ ঠেস দিয়া কহিলেন। 'যেমন হঠাৎ এসেছিল, তেমনি হঠাৎ উড়ে গেল।'…

'গতবারের কথা এখনও মনে পড়েনি?' ভেবে চিন্তে কি আর কূল কিনারা করা যায় বে ভাই,' চুনীদা দার্শনিকের কণ্ঠে কহিলেন। 'ও আমার ধাতে নেই। আমার রক্ত বেহিসেবীর রক্ত। 'তোরা ভাবিস, বন্ধ সঙ্গে পড়ে সব উড়িয়ে দিই। আমি কি জানিনে বন্ধুবান্ধব কেউ কিছু নয়। ভাত ছড়াচ্ছি, কাক আসছে। হাল্লোড় করতে হলে বল চাই যে রে!' বলিয়া চুনীদা তার দর্শন উড়াইয়া দিবার ইতিহাস সবিস্তারে বিবৃত করিয়া গেলেন। পরিতৃপ্ত কণ্ঠস্বর বিবৃতিটা যেন বেশ উপভোগ করিতেছেন।

'তবে হাঁা, একটু কষ্টে পড়েছি, বেশ একটু কষ্টেই পড়েছি।' আমার মুখের দিকে চাহিয়া সহসা তিনি নিজেকে সংশোধন করিয়া লইলেন। 'কিন্তু আফশোষ করে লাভ নেই। কোনও লাভ নেই। জীবনটাকে উপভোগ করেছি, এটা কম কথা নয়। ক'জন এমন পারে? আর কই? সুখ দুখ চক্রবৎ পরিবর্তন্তে। এটা আমি খুব বিশ্বাস করি। কে জানে, আগামীকাল আবার দু'লাখ পেয়ে যাব না। হাওড়ার পুলের মোড়ে ফুটপাথে মিসিরজীকে হাত দেখিয়েছিলাম। বল্লে তো, নির্ঘাৎ প্রাপ্তি যোগ। দুটো টিকেট কিনেছি ইসরাইল গ্র্যাণ্ড লটারীর। দুলাখের ওপর দু'দুটো প্রাইজ। কিনবি একটা? সেবার 'যতে চেয়েছিলাম। নিলি নে। পরে আমিই নিয়েছিলাম। দু লাখ পেয়ে গেলাম।' বলিয়া তিনি পকেটে হাত ঢুকাইয়া টিকিটের বই অবলীলাক্রমে বাহির করিয়া আনিলেন।

'ও থাক, চুনীদা,' তাঁকে নিরস্ত করিয়া কহিলাম। 'লটারী জেতা আপনার ভাগ্যে আছে। একবার রাজা হবেন, তারপর ক'বছর যেতে না যেতেই ফকীর!'…

'তা যা বলেছিস!' রসিকতাটা সম্পূর্ণ উপভোগ করিলেন চুনীদা। 'পরের বার যখন দেখা হবে, কে জানে হয়তো আবার…এই রোখ্‌কে, রোখ্‌কে সর্দারজী। এই মোড়ে আমাকে নামিয়ে দাও।… চলিরে, নন্দ। ভাগ্যে থাকলে আবার এমনি দেখা হয়ে যাবে। হৃষীকেশবাবু একটা টিকিট যেন বলেছিলেন, কিন্তু তাঁকে ধরতেই পারছি নে। এতক্ষণে নিশ্চয়ই বাড়ী ফিরেছেন…'

গ্রে ষ্ট্রীট ও চিত্তরঞ্জন অ্যাভিন্যুর মোড়ে দাঁড়াইয়া-পড়া ট্যাক্সিটা হইতে নামিয়া পড়িবার জন্য তাড়াতাড়ি দরজা খুলিলেন চুনীদা।

'দুদিনের জন্য দশ হাজার টাকা লুকিয়ে রেখেছেন বলেছিলেন না, তার কি হলো?' কৌতূহল দমন করিতে না পারিয়া পিছন হইতে প্রশ্ন করিলাম। 'সেটা আছে, না তাও গেছে?'

প্রায় আহতস্বরে প্রতিবাদ করিলেন চুনীদা। অনধিকার চর্চায় অসন্তুষ্ট হইলেন। মুখটা পিছন দিকে সামান্য বাঁকাইয়া বেশ বিরক্তির সঙ্গেই কহিলেন, 'দশ হাজার। লুকিয়ে রাখবার অভ্যেস থাকলে এমন বহু দশ হাজার টাকা চুনী হালদার লুকিয়ে রাখতে পারত!' বলিয়া হাতে একটা অধৈর্য্য বিদায়-সূচক ভঙ্গি করিয়া ফুটপাত ধরিয়া হনহন করিয়া আগাইয়া গেলেন চুনীদা। আর ফিরিয়া তাকাইলেন না।

———

জীবনবেদের সন্ধানে

সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার

হিমাদ্রি বিপ্লববাদের দীক্ষা নিয়েছিল অনেক আগে। তখনও সে কৈশোর থেকে যৌবনে পা দেয়নি। সেই সময় থেকে কবিগুরুর একটি গানের দুটি ছত্র প্রায়ই তার মনে জাগত। "ওজানাতে করবি পাহন, ঝড় সে পথের হবে বাহন। ওরে আপনারে তুই শেষ করে দেরে, প্রলয় রাতের ক্রন্দনে।" যে ঝড়ের পথ চেয়ে থেকেছে এতদিন, তার সূচনা হল সাইমন কমিশন বর্জনের আন্দোলনে। দেশব্যাপী বিক্ষোভের রূপ নিয়ে হল তার আগমন। তখন ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে সার জন সাইমনের নেতৃত্বে একটি কমিশন গঠনের কথা ঘোষণা করে। ভারতবাসী স্বায়ত্তশাসন লাভের যোগ্যতা অর্জন করেছে কিনা তা যাচাই করে দেখবে কমিশন। ভারতের জনমত সেই ঘোষণাকে গ্রহণ করল চূড়ান্ত জাতীয় অবমাননারূপে।

স্বাধীনতা আমাদের জন্মগত অধিকার। সেই অধিকার লাভের জন্য যোগ্যতার পরীক্ষা দিতে হবে? পরীক্ষা নেবে বিদেশী প্রভু? দেশের সমস্ত রাজনৈতিক দল ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদে গর্জন করে ওঠে। কমিশন ভারতের মাটিতে পা দেওয়ার সাথে সাথে বর্মঘট এবং বিক্ষোভ মিছিলের তুফান তোলার জন্য দেশবাসীকে ডাক দেয়।

উত্তরবঙ্গের সেই শহরেও পৌঁছে যায় কটকা সঙ্কেত। ভুবনমোহন পার্কের জনসভায় বক্তাদের কণ্ঠে আগুন ঝরে। হিমাদ্রির মত ছেলেরা যেন সারা দেশের মানুষের উত্তেজনা নিজের ধমনীর রক্তস্রোতে অনুভব করে। কিছুদিনের মধ্যে গোটা দেশ জুড়ে শিকেটিং, বর্মঘট আর বিক্ষোভ মিছিলের তরঙ্গ ছড়িয়ে পড়ে। সবখানের উত্তেজনা লাভাস্রোতে মেটে পড়ে। জন্ম নেয় সংগঠিত ছাত্র আন্দোলন। সারা বাংলা জোড়া ছ'অর্বর্মঘটের ঢেউ হিমাদ্রিদের কলেজেও এসে পৌঁছায়। এই ভাবেই তার গণ আন্দোলনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সুরু হল। অসহযোগ আন্দোলনের সময় তাতে অংশগ্রহণের বয়েস ছিল না। তবু সেই অধ্যায়ের যতটুকু দেখেছে তা তার স্মৃতিতে স্থায়ী চিহ্ন রেখে গেছে। বড় হওয়ার পর সে কতদিন ভেবেছে, আবার কবে সেই দিনগুলি ফিরে আসবে? সেদিন এলে আর শুধু দর্শক হয়ে থাকবে না, ঝাঁপিয়ে পড়বে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হওয়ার মুহূর্ত বুঝি এবার সমাগত। সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ আন্দোলন অবশ্য দুদিন পরে তিমিত হয়ে আসে। তা সত্ত্বেও সেই আন্দোলনকে এক ব্যাপক সংগ্রামের পূর্বাভাস বলে বুঝতে কারুরই ভুল হয় না। জনসভায় সবাই আগামী দিনের কর্তব্যের নামে শপথ গ্রহণ করে। দিন কাটে অধীর প্রতীক্ষায়।

প্রতীক্ষার সঙ্গে চাই প্রস্তুতি। স্বপ্নের জগৎ ছেড়ে এসে দাঁড়াতে হবে বাস্তবের সিংহদ্বারে। কিন্তু বাইরের জগতে ঝড়কে আবাহন করতে যেয়ে মনের জগতে তুফান ওঠে। সেখানে ঝড়ের মাতন সুরু হলে সে কথা কি আগে ভেবেছিল? সুরু হয় মত ও পথ নিয়ে দ্বন্দ্ব। বন্ধুর সাথে মতান্তর, কখনও বা বন্ধুবিচ্ছেদ। নিজের অন্তর প্রশ্নের পর প্রশ্নে উত্তাল হয়ে ওঠে। আসন্ন সংগ্রামের প্রস্তুতি করতে যেয়ে নানা প্রশ্ন জাগে। সবাই মিলে এতদিন যা করে চলেছে তা'হল প্রধানতঃ যুবশক্তিকে সংগঠিত করার কাজ। তারপর কি হবে? সংগ্রামের ধরণ কি হবে? কবে এবং কিভাবে সুরু হবে সশস্ত্র বিপ্লবের সেই আকাঙ্ক্ষিত অভিযান!

আগের যুগের কর্মীদের এসব প্রশ্ন করার কোন অধিকার ছিল না। তারা জানত যে নেতাদের কাছ থেকে যে আদেশ আসবে তাকে নির্বিচারে পালন করতে হবে। সে শিক্ষা হিমাদ্রিও পেয়েছে। তাকেও নিতে হয়েছে সামরিক শৃঙ্খলা মেনে চলার শপথ। প্রথম যুগের মত বুকের রক্তে প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করতে হয়নি বটে। তবু ত শপথ। কিন্তু, শৃঙ্খলাবোধের চেয়ে বড় হয়ে ওঠে যুগচেতনা। সে ত' একলা নয়, অনেকেই প্রশ্ন করছে। আবার রঘু রামকৃষ্ণের মত লোক ও' আছে। তারা নেতাদের প্রতি অন্ধ আনুগত্যের মনোভাব আঁকড়ে ধরে রয়েছে। অসহিষ্ণু গোঁড়ামি তার মধ্যে উগ্রভাবে আত্মপ্রকাশ করে। বিতর্ক হয় প্রধানতঃ সংগ্রামের পদ্ধতি নিয়ে।

হিমাদ্রি দেখে যে তার সহকর্মীদের এক অংশ আগের যুগের অনুসৃত পদ্ধতি সমর্থন করে না। রাজনৈতিক ডাকাতি এবং গুপ্তহত্যাকে তারা নিষ্ফল বিবেচনা করে। বীরেনদা নিজেও তার পক্ষপাতী নন। তিনি বলেন যে ব্যক্তিগত সন্ত্রাস হল আন্দোলনের শৈশবের ধর্ম। আজ গণমনের জাগরণ যখন অনেকদূর অগ্রসর হয়েছে তখন আর সে পদ্ধতি অনুসরণ করা চলে না। রামকৃষ্ণের মত ছেলেরা সে কথা মানতে চায় না। তার কাছে জনজাগরণের চেয়ে বড় হল প্রতিশোধের স্পৃহা। বিদেশী শাসকের অত্যাচার সীমা ছাড়িয়ে গেছে। তার আশু জবাব দিতে হবে। সাইমন কমিশন বর্জনের আন্দোলনে অনেকে বর্বর পুলিশ-জুলুমের শিকার হয়েছে। দেশবরেণ্য নেতারাও বাদ যাননি। ব্যক্তিগত সন্ত্রাস ছাড়া প্রতিশোধ নেওয়ার আর কি উপায় আছে? বীরেনদা বলেন যে তাদের সমিতি অনেকদিন হল ব্যক্তিগত সন্ত্রাসের পথ বর্জন করেছে। কিন্তু হিমাদ্রি আসল প্রশ্নের উত্তর পায় না। সে জানে যে প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের সময় এদেশে সেনাবাহিনীর মধ্যে বিদ্রোহ সংগঠিত করার চেষ্টা হয়েছিল। বৈদেশিক শক্তির সাহায্য নিয়ে সশস্ত্র অভ্যুত্থান প্রচেষ্টার ইতিহাসও তার জানা। বীরেনদা বলেন, সমিতির দাদারা সেই পরিকল্পনা নিয়ে রয়েছেন।

মহাযুদ্ধ আবার কবে সুরু হবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। সেই অনিশ্চিত ভবিষ্যতের প্রতীক্ষায় দিন কাটানোই কি তাহলে তাদের কাজ? তরুণ মন কি সেই ভরসায় শান্ত হয়ে থাকতে পারে? হিমাদ্রি বিশেষভাবে জানতে চায়, গণআন্দোলন সম্বন্ধে তাদের মনোভাব কি হবে? তারা অহিংসা মন্ত্রে বিশ্বাসী নয়। কিন্তু দেশজোড়া গণবিক্ষোভের তরঙ্গ উত্তাল হয়ে উঠেছে। ওরা কি শুধু সেই সাগরের তীরে দর্শক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে?

ইতিমধ্যে সুরেন দাশগুপ্ত বলে একটি ছেলের সঙ্গে হিমাদ্রির অন্তরঙ্গতা গড়ে উঠেছে। সুরেনকে সমিতির নেতারাই এখানে পাঠিয়েছেন। বীরেনদা কলেজের পড়া শেষ করে চলে যাবেন। সুরেন তাঁর স্থান গ্রহণ করবে। সে পূর্ববঙ্গের একটি জেলায় সংগঠক হিসাবে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে। সুরেন দাদাদের অন্ধ ভক্ত নয়। সে বলে কবে মহাযুদ্ধ বাধবে তার অপেক্ষায় বসে থাকা মানে কিছু না করা। দাদারা আসলে কিছু করতে চাননা, কর্মীদের ভুলিয়ে রাখার জন্য ঐসব কথা বলেন। হিমাদ্রি ভাবে, সুরেনই বা কি চায় তাহলে?

ইতিমধ্যে বিনা বিচারে আটক রাজবন্দীরা মুক্তিলাভ করেছেন। স্বদেশী পত্র পত্রিকায় তাঁদের জীবনী প্রকাশিত হয়। হিমাদ্রিদের চোখে মুক্তবন্দীরা সবাই মহাবীর। সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর চেয়েও তাঁরা মহীয়ান। এইরকম দুজন খ্যাতনামা মুক্ত বন্দীর সম্বর্ধনা সভায় যোগদানের সুযোগ পেয়ে সে নিজেকে ধন্য মনে করে। স্থানীয় কংগ্রেস এবং যুব সংগঠনের পক্ষ থেকে তাঁদের সম্বর্ধনা করা হয়। হিমাদ্রি

পায় অভিনন্দন পত্র রচনার ভার। মনের আবেগ লেখনীর মুখে নির্ঝর ধারায় যতই উৎসারিত হয়। সে শোনে যে ওদের একজন হলেন তাদের সমিতির সর্বোচ্চ নেতাদের অন্যতম। সভাস্থলে দাঁড়িয়ে নেতার বক্তৃতা শুনতে শুনতে তার মন চলে যায় বহুদূরে। এঁরাই ত অগ্নিমন্ত্রের উদ্গাতা, মুক্তিপথের অগ্রদূত। এঁরাই ত পরাধীন দেশের রাজবিদ্রোহী। এঁদের জীবনের উপাদান দিয়েই ত রচিত হয়েছে সন্ন্যাসীর মত মহাশক্তিধর চরিত্র।

তখন হিমাদ্রি দিবাস্বপ্নেও ভাবতে পারেনি যে তার জন্য কি বিস্ময় আর আনন্দ অপেক্ষা করে আছে। নিশুতি রাতে নির্মল এসে বলে 'বীরেনদা ডেকে পাঠিয়েছেন। জরুরী কথা আছে।' এত রাতে হঠাৎ কি কথা? নতুন কোন পরীক্ষা? অথবা কোন 'অ্যাকসনের' ডাক? বীরেনদার বৈঠকখানার কক্ষের ভিতরে ঢুকেই হিমাদ্রি থমকে যায়। পা যেন সরতে চায় না। নির্মলেরও সেই অবস্থা। বিকেলের সভায় দেখা নেতা দুজন বসে রয়েছেন।

বীরেনদা তাদের পরিচয় দিয়ে বলেন এবার যা কিছু জিজ্ঞাসা করার আছে প্রাণ খুলে জিজ্ঞাসা করে নিন। কিন্তু বেশী কিছু জিজ্ঞাসা করা হয়ে ওঠে না। এক বিচিত্র রোমাঞ্চকর অনুভূতি হিমাদ্রির সমস্ত চেতনাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। রাত্রির অন্ধকারে সবার নজর এড়িয়ে দুজন মার্কামারা রাজবিদ্রোহীর সাথে কথা বলেছে। এ সম্পূর্ণ নতুন অভিজ্ঞতা। যাঁরা এতদিন ছিলেন শুধু বই বা পত্রিকার পৃষ্ঠায় অথবা বন্ধুদের মুখের কাহিনীতে বিরাজমান, তাদের সঙ্গে একাসনে বসেছে। শুনেছে তাঁদের জীবনের দুই একটি উদ্দীপনাময় ঘটনার বিবরণ। পুণ্যলোভীরা তীর্থদর্শনে যে আনন্দ লাভ করে তার চাইতে অনেক বেশী আনন্দের অধিকারী হয়েছে।

সেই সময়ে বাংলার চরমপন্থী তথা বিপ্লবী আন্দোলনে রোমান্টিক আবেগটাই প্রবল। সভা ও সমাবেশে বক্তাদের কেউ হয়ত ভাষণ সুরু করেন রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করে "উদয়ের পথে শুনি কার বাণী, ভয় নাই ওরে ভয় নাই। নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান, ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।" কেউ বা 'পথের দাবীর' কথা উদ্ধৃত করে বিপ্লবের বক্তব্যকে। পথে চলার আহ্বান জানান, বলেন "মহামানবের মুক্তি লাগবে মানুষের রক্তধারা চেউ তুলে ছুটে যাবে।" যুবশক্তিকে জাগ্রত করার জন্য তারুণ্যের প্রতিনিধি নেতা তুলে ধরেন জার্মান দার্শনিক নীটশের উক্তি "live dangerously"।

সংগঠিত ছাত্র আন্দোলন কণ্ঠে তুলে নিয়েছে বিদ্রোহী কবির গান "ধারুণ রাতে আমরা তরুণ রক্তে করি পথ পিছল—মোরা তাজা খুনে লাল করেছি সত্যবতীর শ্বেতকমল।" শিকল ছেঁড়ার জন্য অধীর উন্মাদ যৌবন। সব বাঁধনকে ভেঙে চুরমার করে দেওয়ার সঙ্কল্পকে বড় করে দেখে। মত আর পথ নিয়ে বিতর্ক পিছনে ফেলে রাখতে চায়।

কলেজের মুসলিম ছাত্রাবাসের বার্ষিক অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হয়ে আসেন বিদ্রোহী কবি। সভার সমস্ত ছেলেরা ভীড় করে। কবির মেঘমন্দ্রস্বরে আবৃত্তি শোনে তারা "বল বীর! চির উন্নত মম শির"। কবি বজ্রকণ্ঠে গেয়ে ওঠেন, "কাণ্ডারী মরু গেয়ে গেল যারা জীবনের জয়গান, আসি অলক্ষ্যে দাঁড়ায়েছে তারা দিবে কোন্ বলিদান।" হিমাদ্রির বুকের আড়ালে রক্তের প্রবাহ দুর্বার হয়ে ওঠে। কর্মের আবর্তে নিজেকে ডুবিয়ে দিতে না পারলে ধমনীতে রক্তের মাতন শান্ত হবে না। কাজ আর কাজ। হিমাদ্রি শোনে যে সহকর্মীদের কেউ কেউ বলতে সুরু করেছে যে আর কথা নয়, এবার কিছু করতে হবে। তাই বলে কি মনের প্রশ্নকে চাপা দেওয়া যায়? হিমাদ্রি বন্ধুদের কথা শোনে আর

ভাবে কি করতে চায় তারা? কোন পথে? কাজের উদ্দেশ্য কি হবে শুধুই আত্মধ্বংসের অনুষ্ঠান অথবা সাফল্যের সম্ভাবনা বিচার করেই কর্মপন্থা নির্ধারণ করতে হবে? দাদাদের নিষ্ক্রিয়তার বিরুদ্ধে ভাইদের বিদ্রোহের আগুন ভিতরে ভিতরে ধূমায়িত হয়ে উঠছে। কিন্তু তাদের সামনে পথের দিশা পরিষ্কার নয়।

শুধু বিপ্লবী আন্দোলনের সেই অধ্যায়ে এক সঙ্কট দেখা দিয়েছে, যুগসন্ধির সঙ্কট। সেই সাথে সাথে হিমাদ্রির অন্তরে প্রবল হয়ে দেখা দেয় নিজের সাথে বোঝা পড়ার আকাঙ্ক্ষা। যাত্রা পথের প্রতি মোড়েই হয়ত দেখা দেবে এমনি কত সংঘাত। হয়ত মাঝে মাঝে জাগবে নিত্যনূতন সংশয় আর জিজ্ঞাসা। কখনও হয়ত মনের আকাশ জুড়ে নামবে অমানিশার অন্ধকার, নেমে আসবে হতাশার অবসাদ। তার মধ্য দিয়ে কোন আলোতে প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে পথের সন্ধান করবে? এগিয়ে চলবে সম্মুখে?

সেই অধ্যায়ে বিপ্লবীদের চিন্তার উপর ধর্ম তথা অধ্যাত্মবাদের প্রভাব ক্ষীণ হয়ে এসেছে। প্রথম যুগে সে প্রভাব খুবই বেশী ছিল। সে সম্বন্ধে হিমাদ্রি অনেক কিছু শুনেছে। তবে একথাও শুনেছে যে সেই প্রথম যুগেও বিপ্লবীদের কাছে ধর্মের বহিরঙ্গ দিকটার কোন মূল্য ছিল না। ছাঁচি টিকটিকি, যাত্রা অ-যাত্রা, প্রভৃতি কুসংস্কার এবং জাত অজাত, ছোঁয়াছুঁয়ি, বাছ-বিচার ইত্যাদিকে অস্বীকার করেই তাদের পথ চলা সুরু হত। তারা যে ছিল অ-যাত্রা পথের যাত্রী।

বীরেনদা নিজের মনের বিকাশের কাহিনী বর্ণনা করে শোনান। তিনি বলেন যে বিপ্লবীদের কাছে যেমন ঈশ্বর এবং দেশের মুক্তি সংগ্রামই ধর্ম। গোড়ার অধ্যায়গুলিতে তাঁদের বেশীর ভাগের কাছে বিপ্লবের ধারণা ছিল অস্পষ্ট। আবেগই ছিল প্রধান সম্বল। তাই তারা আধ্যাত্মিকতার খুঁজে পেতেন মৃত্যুকে তুচ্ছ করার প্রেরণা। এখন ইতিহাসের ধারাকে বোঝার প্রয়োজনীয়তা ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠছে। আধ্যাত্মিকতার প্রভাব এসেছে ক্ষীণ হয়ে। কিন্তু আবেগপ্রবণতা অব্যাহত রয়েছে। হিমাদ্রির নিজের মনে অধ্যাত্মবাদের প্রভাব বিলুপ্তির পথে। পথের দিশা ত' ধ্যানে মিলবে না, মিলবে না কোন অদৃশ্য প্রেরণায়। সে চায় কর্মের মাধ্যমে অন্তরজীবনে পরিপূর্ণতা লাভ করতে। কর্ম মানেই ত' বাস্তবমুখীনতা। কলেজে আসার আগে স্বামীজীর 'কর্মযোগ' বইখানি পড়ে সে প্রেরণা লাভ করেছিল। কিন্তু এখানে এসে 'জ্ঞানযোগ' পড়ে যেন হতাশ হয়। দর্শনের তত্ত্ব বোঝার মত যোগ্যতা হয়নি বটে কিন্তু সুরু হয়েছে জীবনদর্শনের সন্ধান। 'মায়াবাদ' কি কর্মের দিগন্ত নির্দেশ করতে পারে? স্বামীজীর জীবনেও কি ছিল কর্ম এবং অধ্যাত্ম প্রেরণার সংঘাত আর তার ফলে তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্ব?

কলেজে বিবেকানন্দ জন্মতিথি উপলক্ষ্যে সভা হয়। গণ্যমান্য বক্তারা সবাই তাঁর শিক্ষা থেকে ব্রহ্মচর্য আর অধ্যাত্ম প্রেরণার দিকটিকেই তুলে ধরেন। হিমাদ্রির ইচ্ছা হয় জিজ্ঞাসা করে, কোথায় সেই সর্বমানবে সমজ্ঞানের উদার বাণী? কোথায় ভীরুতা, কুসংস্কার, অন্যায় অবিচার এবং পরাধীনতার বিরুদ্ধে সংগ্রামের সেই উদাত্ত আহ্বান?

সহকর্মীরা এসব প্রশ্ন নিয়ে মাথা ঘামাতে চায় না। কিন্তু হিমাদ্রির অন্তরমুখীন স্বভাব তাকে অশান্ত করে তোলে। বীরেনদার কাছে গেয়ে প্রশ্ন করে। তিনি নিজে কোন উত্তর না দিয়ে তার হাতে 'দি বেডোলিউশানারি' বলে একটি বে-আইনী পুস্তিকা তুলে দেন। তাতে বিপ্লববাদের একটি দার্শনিক ভিত্তি রচনার চেষ্টা হয়েছিল। সেখানে প্রধান আক্রমণ ছিল 'মায়াবাদের বিরুদ্ধে' এবং কর্মকেই জ্ঞানের ভিত্তি বলে ঘোষণা করা হয়। হিমাদ্রি চিন্তার নূতন উপাদান খুঁজে পায়। মনে এমন এক জীবন

দর্শনের অন্বেষণের আকাঙ্ক্ষা জাগে যার আলোকে চলার পথের প্রতিটি পদক্ষেপ দিনের আলোর মত উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। নিছক আবেগের বন্যায় গা ভাসিয়ে সে চলবে না। নিজের সাথে দ্বন্দ্বে নিজের অন্তর জীবনকে গড়ে তুলবে। সেই সন্ধান নিয়ে সে দেশবিদেশের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের দিকে হাত বাড়ায়। বাণীর বরপুত্রদের থেকে পরশমণি সংগ্রহ করে আনতে হবে। ইংরাজীর তরুণ অধ্যাপকের সস্নেহ সহায়তায় সন্ধানে এগিয়ে চলে। ভারতের প্রাচীন সাহিত্য বর্ণনায় সে খুঁজে পায় হৃদয়াবেগ এবং সংযমের অপূর্ব সমন্বয়। মহাকাব্যের মহামানব চরিত্রগুলি কর্তব্য কঠোর অথচ প্রেমে মমতায় কুসুমকোমল। একাধারে রুদ্র ও শিব। ইংরাজী সাহিত্য তত্ত্বের আলোচনায় 'ক্লাসিসিজম্' এবং 'রোমান্টিসিজম্' এই দুই ধারার সাথে পরিচয় হয়। অধ্যাপক বলেন, ক্লাসিসিজমের দৃষ্টিকোণ নিশীথনিস্তব্ধ জীবনশিখার মত প্রশান্ত, আত্মসচেতন। তার মধ্যে উন্মাদের আতিশয্য নেই। আছে অতলস্পর্শী গভীরত্ব। দিবাস্বপ্নের মানস নেত্রের সামনে ভেসে ওঠে দেবদারুকুঞ্জছায়াতলে ধ্যানমগ্ন মহাদেবের ছবি।

রোম্যান্টিসিজম্ এর ঠিক বিপরীত। তা ছুটে চলতে চায় এক অজ্ঞাত দেশে অজানার সন্ধানে। কোথায় সেই অনাবিষ্কৃত দেশ? কে সে অজানা? এসব হিসাব নিকাশের অপেক্ষা রাখে না। পথে তার ভয় নয়। আশে পাশে যা কিছু আছে খুঁটিয়ে দেখার অবসর নেই। দিবাস্বপ্নে এই বর্ণনার মধ্যে বাংলার তখনকার যুবমানসের প্রতিচ্ছবিকে যেন জীবন্ত হয়ে উঠতে দেখে। যারা অজানার আহ্বানে সাড়া দিয়েছে তারা ত অমনিভাবেই ছুটে চলতে চায়। ছুটে চলতে হবে, এইটুকুই শুধু তারা জানে।

অধ্যাপক বুঝিয়ে দেন, রোম্যান্টিসিজমের মধ্যে দুটি স্বতন্ত্র ধারা আছে। একটি অজানার সন্ধানের নামে ছায়ালোকে পলায়নের পথ খুঁজে ফেরে। তার দৃষ্টি মুখ অতীতের দিকে। সময় কাটায় আকাশকুসুম চয়নে। অন্য ধারাটি ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখে। বর্তমানের বাধাবিপত্তি ঠেলে উন্মাদের মত এগিয়ে চলতে চায়। চায় নবসৃষ্টির সম্ভাবনাকে বরণ করে আনতে। তাই ত' তার কণ্ঠে ধ্বনিত হয় ক্ষমাহীন সংগ্রামের আহ্বান। সংগ্রাম অন্যায়ের বিরুদ্ধে। সংগ্রাম অসত্য ও অসুন্দরের বিরুদ্ধে। দিবাস্বপ্নে ভাবে, রবীন্দ্রনাথের কাছে ত' এরই প্রেরণা পেয়েছে। এই আহ্বানেরই প্রেরণায় ধ্বনিত হয়েছে 'অচলায়তন' 'মুক্তধারা' 'তাসের দেশ' নাটকে। শেলীর 'প্রমেথিউস্ আনবাউণ্ড' এ শুনেছে তারই জয়ধ্বনি। শুনেছে 'ওড টু ওয়েস্ট উইণ্ড' এ।

তার সঙ্গী-সাথীরা শুধু জয়ধ্বনি শুনে পাগল হয়ে উঠেছে। এক এক সময় সেও স্রোতে গা ভাসাতে চায়। কিন্তু শুধু মাত্র রোম্যান্টিসিজমের আবেদনে ত' সে তৃপ্তি খুঁজে পাবে না। সে চায় জ্ঞান। কীটসের 'অ্যাপোলো' ত' জ্ঞানের সাহায্যেই দেখা লাভ করেছিল। একদিকে 'অ্যাপোলো', অন্যদিকে 'ওয়েস্ট উইণ্ড'—দুইয়ের ভিতরে সমন্বয় করতে হবে। ছুটে চলতে হবে সাগরের অশান্ত তরঙ্গ জয়ের শিখরে শিখরে। অথচ হৃদয় থাকবে প্রশান্ত, সন্ধানে ধৈর্যশীল। লক্ষ্য হবে ধ্রুবতারার মত অচঞ্চল, চির অম্লান। কি ভাবে হবে সেই সমন্বয়?

সংগ্রামের দেবতা অলক্ষ্যে বসে হাসেন। যে পথ দিবাস্বপ্নে বেছে নিয়েছে তা ত' সহজ নয়। প্রতিপদে কঠিন মূল্য দিতে হবে। আঘাতের পর আঘাতে অন্তর ক্ষতবিক্ষত হবে। আঘাত নামে হৃদয়ের কোমলতম স্থানে। মতান্তর হয়েছে অনেকের সাথে। তার ফলে মুখে চিহ্ন রয়েছে। তবে সে আঘাত হৃদয়ের গভীরে পৌঁছাতে পারেনি। এবার সংঘাত সুরু হয় সেই বন্ধুর সাথে যে সকল বন্ধুর মধ্যে অধিতীয়।

সে চেয়েছে নির্মলকে প্রীতি ভালবাসার পাত্র উজাড় করে ঢেলে দিতে। চায় অন্তরের সমস্ত নিকৃত কল্পনার ভাগ দিতে। হৃদয়ের মণিকোঠার যে দ্বার অন্য সবার কাছে রুদ্ধ করে রাখে তা উন্মুক্ত করে দেবে। কিন্তু দুটি স্বতন্ত্র সত্তা কখনও সম্পূর্ণ এক হতে পারে না। তফাৎ থাকে সৃষ্টি তত্ত্বীতে। মনোবৃত্তিতে পার্থক্য থাকে। তাকে অস্বীকার করে মিলতে গেলে দ্বন্দ্ব বাধে। এসব কথা বোঝার মত অভিজ্ঞতা হিমাদ্রির হয়নি। হয়নি নির্মলেরও।

প্রথম যৌবনের কোন কোন বন্ধুত্বে প্রথম প্রেমের মত মাদকতা থাকে। হিমাদ্রি চায় বন্ধুর সমস্ত সত্তাকে গ্রাস করে নিতে। নির্মলের দিক থেকে প্রথমে কোন বাধা আসেনি। সেও নিজেকে বন্ধুর হাতে ছেড়ে দিয়েছে। ফলে তার ব্যক্তিত্ব চাপা পড়ে যায়। এক এক সময় সে বন্ধুর ভালবাসার গ্রাস থেকে নিজ ব্যক্তিত্ব উদ্ধারের চেষ্টায় বিদ্রোহ করে বসে। হয়ত অকারণেই মতপার্থক্য আহির করে। হিমাদ্রির মত সে অত অন্তর্মুখীন নয়। হিমাদ্রির অন্তর্মুখীনতাকে সে স্বপ্নবিলাস বলে বিদ্রূপের কশাঘাত করে। হিমাদ্রি প্রতিশোধ নেয়, নির্মলের মনের দুর্বল জায়গায় আঘাত করে। তখন 'পথের পাঁচালী' বইটি সদ্য প্রকাশিত হয়েছে। বইটি হিমাদ্রিরও খুব ভাল লাগে। তার মধ্যে সে খুঁজে পায় প্রকৃতিকে আর জীবনকে জানার অদম্য কৌতূহল। পায় পরিচিতের গণ্ডী ছাড়িয়ে অপরিচিত পরিবেশের দিকে যাত্রার অজেয় আগ্রহ। শিশুমনের বিকাশের কাব্যময় চিত্ররূপে নিজের মানস প্রতিচ্ছবি দেখে। কিন্তু তার মনে হয় যে নির্মলের ভাললাগাটা মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। পৌঁছেছে মেয়েলি উচ্ছ্বাসে। নির্মলের কাছে 'অপু' প্রায় আদর্শ। সে বলে 'পথের পাঁচালী' বুকে নিয়ে মরবে।

হিমাদ্রি বলে 'অপু বড় দুর্বল। কোথায় আছে তার মধ্যে খ্রীষ্ট ক্রিস্তকের সেই সংগ্রামশীলতা'! হয়ত নির্মলকে প্রতি-আঘাত দেওয়ার উদ্দেশ্যে সে 'অপু'র সমালোচনায় বড় বেশী কঠোরতা প্রকাশ করে ফেলে। ফলে বন্ধুর সাথে কয়েকদিন কথাবার্তা পর্যন্ত বন্ধ থাকে। পরে আবার মিটমাট হয়ে যায়। প্রণয়কলহের মত বন্ধুত্বের এই কলহ স্থায়ী হয় না। কিন্তু কিছুদিন পরে হিমাদ্রি লক্ষ্য করে যে নির্মলের ভাবান্তর ঘটছে। সে ক্রমে সরে যায় বহু দূরে। হিমাদ্রি খোঁজ নিয়ে জানে যে নির্মল একটি মেয়ের প্রেমে পড়েছে। জেনে সে মর্মাহত হয়। যৌবনের সোনার কাঠির ছোঁয়া লাগার সময় থেকে তার নিজের মনেও নারী সম্বন্ধে আগ্রহের উদয় হয়নি তা নয়। মাঝে মাঝে কল্পলোকবাসিনী এক রহস্যময়ীর দেখা পাওয়ার আকুল আকাঙ্ক্ষা জাগে। আবার জোর করে মনের টুঁটি চেপে ধরে। তারা যে জীবন বেছে নিয়েছে সেখানে ত' নারীর কোন স্থান নেই। রমণীর প্রেমকে তারা মনে করে মৃত্যু পথের পথিকদের পক্ষে পিছুটান। নির্মলের কথা ভেবে সে যেমন দুঃখ পায় তেমনি নিজেকে বড় নিঃসঙ্গ বোধ করে। চলার পথে যাকে চিরদিনের মত পাশে পাবে ভেবেছিল সে সরে গেছে। আর কি এমন কাউকে খুঁজে পাবে যে হবে 'আত্মার আত্মীয়', যার কাছে পাবে অসীম প্রশ্রয়? বন্ধুবিচ্ছেদের বেদনায় মন মুষড়ে পড়ে।

সেই বিষণ্ণ মুহূর্তে খ্রীষ্ট ক্রিস্তোফ যেন জীবন্ত হয়ে পাশে এসে দাঁড়ায়। যেন হিমাদ্রির কাণে কাণে বলে 'সংগ্রামের দেবতার কাছে যে মন্ত্র নিয়েছে তার কি দুর্বলতা সাজে?' হিমাদ্রি ভাবে, সত্যই ত'। যে শুনেছে রক্তের আহ্বান, সে কি ব্যক্তিগত জীবনের বেদনায় ভেঙে পড়ে থাকতে পারে? দেশের মানুষের দুঃখকে আপন করে নিয়েছে তারা, পুড়ে খাঁটি সোনা হবে বলে। সেই ব্রতের অগ্নিপরীক্ষায় নিজের উপরে জয়লাভ করতে হবে। একান্ত নিজস্ব ব্যথাকে অতিক্রম করতে হবে তারই প্রেরণায়। ব্যর্থতাবোধের কাছে হার মানবে না।

বনস্পতি

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

পিছন দিকে শব্দ হতেই রাজীববাবু বই থেকে মুখটা তুললেন। হুঙ্কার দেবার একটা চেষ্টা করে বললেন, কে?

চেষ্টা করলেন বটে কিন্তু গলার স্বর ঠিক ফুটল না। আগেকার মতন তো নয়ই। এক সময় এক একটা হুঙ্কারে গোটা বাঘাযতনা হাই স্কুল থর থর করে কেঁপে উঠত। ছেলের দল জোরে নিশ্বাস ফেলতে সাহস করত না।

সেদিন আর নেই। এখন আয়না খুললে পাঁজর-প্রকট দীর্ঘ একটা দেহের কাঠামো দেখা যায়। দীর্ঘ দেহটা বয়সের ভারে নুয়ে পড়েছে। সারা মাথা জুড়ে কাশ ফুলের রং। সামনের অনেকগুলো দাঁত নেই। কবিতা পড়তে রীতিমত অসুবিধাই হয়।

এ বয়সে, এত বয়সে, জীর্ণ শরীরে রাজীববাবুর শিক্ষকতা করার কথা নয়। অবসর নিয়ে বাড়ীতে বসে থাকতেন। পুকুরের মাছ, চাষের ধান, তার ওপর জোয়ান রোজগেরে ছেলে। পরিপূর্ণ অবকাশ। পরকালের চিন্তা করতে পারতেন। গীতা বেদান্ত নিয়ে নাড়াচাড়া।

কিন্তু একেবারে আচমকা। এ গাঁয়ে কোনদিন উপদ্রব হয় নি। দূরে দূরে মানুষ হিংসায় নীল হয়ে উঠেছিল, ভিন গাঁয়ে নিষ্ঠুর উন্মত্ততার হোলিখেলা চলেছিল। লোকের মুখে মুখে, খবরের কাগজের পাতায় কিছু কিছু আভাস পেয়েই রাজীববাবু শিউরে উঠেছিলেন। মানুষ নয়, মানুষ নয়, প্রেত। চারদিকে প্রেতের তাণ্ডব শুরু হয়েছে। বাঘাযতনায় কোন গোলমাল হয় নি। রহিম মহিম পাশাপাশি নির্বিবাদে বাস করছে।

সেই বাঘাযতনার আকাশও একদিন লাল হয়ে উঠল। মাঝরাতে বিকট হল্লা। মানুষ কিছু বোঝবার আগেই চারদিকে কান্নারোল শুরু হয়ে গেল। এ গাঁয়ের কেউ নয়, সব বাইরের আমদানী, কিন্তু এ গাঁয়ের কোন লোক এতদিনের প্রতিবেশীর পাশে এসেও দাঁড়াল না। বাইরের শত্রুকে বুক দিয়ে ঠেকাবার চেষ্টাও করল না।

সব যেন স্বপ্নের মতন। যখন ঘোর কাটল, রাজীববাবু দেখলেন জোয়ান ছেলেটা বোনের ইজ্জৎ বাঁচাতে গিয়ে বুকে ছুরি বিঁধে উঠানের ওপর পড়ে রয়েছে। মেয়েটা নিখোঁজ। কলাই অঞ্চলের মধ্যে প্রৌঢ়া স্ত্রী আর নাবালক দুটি ছেলে মেয়ে নিয়ে রাজীববাবু অর্ধচেতন অবস্থায় বসে আছেন।

পর পর তিন রাত অত্যাচার চলল। তারপর রাজীববাবু আর থাকতে সাহস করলেন না। সাত পুরুষের ভিটে পিছনে ফেলে, ছেলে মেয়ের হাত ধরে, স্ত্রীকে পিছনে নিয়ে হাঁটা পথে পাড়ি দিলেন।

দুদিন দু'রাত হেঁটে, রাস্তে রাস্তে বিশ্রাম নিয়ে যখন সীমান্তে এসে পৌঁছলেন, তখন তাঁর আর কথা বলার শক্তি নেই।

তারপর এক ঘুটো অন্ধকার দিন। এক আস্তানা থেকে আর এক আস্তানা। এক জায়গা

থেকে আর এক জায়গা। সরকারের অনুগ্রহের মুষ্টিভিক্ষা নির্ভর জীবন। তারপর আস্তে আস্তে মেঘ কেটে গেল। আলো ঝলমল সূর্যের বিকাশ হয়তো হল না, কিন্তু ওরই মধ্যে একটু আশার ঝিলিক, আশ্বাসের কণা দেখা দিল।

চণ্ডীগড় কলোনী। টিনের দেয়াল, টিনের ছাদ। কোন রকমে মাথা গোঁজা চলে। তারই মধ্যে রাজীববাবুর আশ্রয় মিলল। চাকরির সন্ধানও এসেছিল, কিন্তু রাজীববাবুর এক গোঁ। মাষ্টারের চাকরি ছাড়া অন্য চাকরি তিনি করবেন না, জীবনে করেন নি।

কিছু অপেক্ষা করার পর শিক্ষকতা করার আহ্বান এল। তাঁরই আশপাশের গাঁয়ের লোকেরা চেষ্টা চরিত্র করে এক স্কুলের পত্তন করেছিল। বাদামতলা হাই স্কুলের রাজীববাবুর নাম তাদের খুব পরিচিত। তারা রাজীববাবুকে ডেকে নিল।

এতদিন পরে রাজীববাবু যেন অকূলে কূলের নিশানা দেখতে পেলেন। আসলে অধ্যয়নরত এক রাশ ছাত্র, শিক্ষাগারের পূত পরিবেশ এমন একটা স্বর্গের কল্পনাই তিনি মনে মনে করেছিলেন।

দিন কয়েকের মধ্যেই কিন্তু রাজীববাবুর স্বপ্নভঙ্গ হ'ল। সে ভক্তি, সে আনুগত্য, সে নিয়মানুবর্তিতা, পুরাণো দিনের কিছুই অবশিষ্ট নেই। আজকালকার ছাত্রেরা শুধু কোনরকমে পরীক্ষায় বেড়া উত্তীর্ণ হতে চায়। তার জন্য যেটুকু শ্রম প্রয়োজন, তার বেশী কিছু করতে তারা নারাজ। মনচ্ছন্দে অন্য দেশের ইতিহাস, অন্য যুগের কাহিনী শোনাতে গেলে তারা চঞ্চল হয়ে ওঠে। নকল কাশির শব্দে ক্লাসরুম প্রতিধ্বনিত হতে থাকে।

সেই সময় রাজীববাবু হুঙ্কার দিয়ে ওঠেন, কিন্তু ক্ষীণ কণ্ঠে আগের সে তেজ, সে জোর পান না।

মনে মনে রাজীববাবু বিশ্লেষণ করেন। এই ক'বছরে বয়স এমন কিছু বেড়েছে তা নয়, কিন্তু শক্তি কমেছে। আঘাতের পর আঘাতে সমস্ত কাঠামোটা যেন নির্জীব হয়ে পড়েছে। সামান্য উপায়, চারটি প্রাণীর জীবনধারণের পক্ষে যথেষ্ট নয়। বেশীর ভাগ দিনই শরীর খারাপের অজুহাতে নিজের আহার্য তিনি সরিয়ে রাখতেন, যাতে ছোট ছেলে মেয়ে দুটোর ক্ষুন্নিবৃত্তি হয়। মাঝে মাঝে শরীর দুর্বল বোধ হয়। ক্লাসে অনেকক্ষণ চেঁচামেচি করার পর চোখের সামনে পুঞ্জ পুঞ্জ অন্ধকার দেখেন।

তবু এই ক্লান্ত শরীরে রাজীববাবু অনাবাসাধন করেন। কোন অন্যায়, কোন ফাঁকি দেখলেই জ্বলে ওঠেন। টেবিল চাপড়ে পনেরো মিনিট ধরে ছাত্রের দায়িত্ব সম্বন্ধে গুরুগম্ভীর বক্তৃতা দেন।

কিন্তু অনুযোগ আসে অন্যদিক থেকে

প্রৌঢ়া গৃহিণী মনোরমা অনুযোগ করেন। মাষ্টারির এই কটা টাকায় কি চলে? একি তোমার বাদামতলা পেয়েছ, যে পুকুরের মাছ আছে চাষের ধান, বাগানের ফল পাকুড়। এদেশে সবই তো কিনতে হয়। তুমি অবনীবাবুর মতন করলেও তো পার।

গামছা ঘুরিয়ে হাওয়া খেতে খেতে রাজীববাবু বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, অবনীবাবুর মতন।

হ্যাঁ, ভদ্রলোক সকালে একটা টিউশনি করেন, দুপুরে স্কুলে পড়ান, তারপর রাত নটা পর্যন্ত আরো দুটো টিউশনি। জানো, এর মধ্যেই জমি কিনেছেন। ইঁটেরও নাকি অর্ডার দিয়েছেন। এতটা তোমার শরীরে সম্ভব নয়। কিন্তু তুমি সকালে একটা, বিকালে একটা টিউশনি করলেও তো পার।

রাজীববাবু কোন উত্তর দিলেন না। চুপচাপ বসে রইলেন। অবনীবাবুকে তিনি চেনেন, খুব ভাল করেই চেনেন বছরের প্রথমে কোন ক্লাসে কে বড়লোকের ছেলে ভর্তি হ'ল, তার খোঁজেই তিনি

যাত্ত। উঁচান পাড়ার স্কুল, কিন্তু বাবে কাছে স্কুল না থাকায়, একটু দূরের ধনী গৃহের কয়েকটি ছেলেও প্রত্যেক বছর ভর্তি হয় এখানে। বেশীর ভাগই ভাল ভাল স্কুল ফেরত।

রাজীববাবু বারান্দা থেকে নেমে পথের ওপর গিয়ে দাঁড়ালেন। এত সব কথা মনোরমাকে বলা চলে না। প্রথম প্রথম রাজীববাবুর হাতের মুঠোতেও দু'একটা টিউশনি এসেছিল। স্কুলের সেক্রেটারিই জুটিয়ে দিয়েছিলেন! কিন্তু রাজীববাবু রাখতে পারেন নি সে টিউশনি। যেখানে শুরুর মর্যাদা নেই, শিক্ষক শুধু বেতনভুক কর্মচারী মাত্র, যার একমাত্র কর্তব্য ছেলে, বলে, কৌশলে ছাত্রকে দুস্তর পরীক্ষা বৈতরণী পার করা, সে রকম জায়গায় মাথা নোয়াতে রাজীববাবুর সম্মানে আঘাত লেগেছিল। তিনি দু'একদিন পরেই ইস্তফা দিয়ে পালিয়ে এসেছিলেন।

একটু কষ্ট, তা'হোক, তেমনই স্কুলের কোন ছেলে পরীক্ষায় ফল ভাল করলে, বিশেষ করে ইংরাজী কিংবা ইতিহাসে, গর্বে রাজীববাবুর বুক ফুলে উঠে। দুঃখ, দৈন্য, দারিদ্রের কথা তিনি বিস্মৃত হ'ন। ছেলেটির পিঠ চাপড়ে বলেন, সাবাস, শুধু স্কুলের মধ্যে ভাল পড়লেই তো হবে না, সারা দেশের সামনে এসে দাঁড়াতে হবে। বাঙালী পিছিয়ে আছে, হটে আছে এ অপবাদ ঘোচাতে হবে।

মনোরমা ওর মধ্যেই আবার মনে করিয়ে দিয়েছেন, ছেলেদের পিঠ চাপড়ালেই দিন চলবে। অন্য মাষ্টাররা কেমন ছোটখাটো সব বাড়ী করে ফেলল, সেদিকে নজর আছে?

রাজীববাবু হেসেছেন, বাড়ী? বাড়ী তো আমিও করেছি। পাকা ইমারত। অশোককুমার রায় পেল সতেরো, ইন্দ্রজিত ঘোষাল পেল তেইশ, ভাল রেজাল্ট করেছে। স্কুলের নাম রাখবে। আসল ইমারত তো এরাই। ওদের দিকে চেয়েই মানুষের আমাদের কথা মনে পড়বে। তোমার মাটির দেয়াল আর টিনের চালের চেয়ে অনেক বেশী মজবুত।

মনোরমা আর কিছু বলেন না। এমন মানুষকে বলেও লাভ নেই। চোখ তুলে কোন দিকে চাইলেন না। পাঠ্যপুস্তকের বাইরে যে আর একটা জগৎ আছে, সে বিষয়ে সচেতনই নন।

চণ্ডীগড় স্কুলেরই দু'একজন শিক্ষক অন্য স্কুলে চলে গেল, প্রায় দেড়গুণ মাইনেয়। এক মাড়োয়ারী ব্যবসায়ী দিদিমার নামে এক স্কুল খুললেন। জমকালো বিল্ডিং। কেতাদুরস্ত সাজপোষাক। ত্রিশ হাজারী বাস। এদিক ওদিক থেকে মাষ্টার টানতে লাগলেন।

মনোরমা আবার রাজীববাবুকে ব্যতিব্যস্ত করে তুললেন।

এ স্কুলের তো এই বরাদ্দ, বাঁধে আনতে ভাইনে কুলোয় না। তার চেয়ে দেখ না ওই বড় স্কুলে। ছেলেমেয়ে বড় হচ্ছে, সে খেয়াল আছে। ছেলের লেখাপড়া, মেয়ের বিয়ে থা এ সবের কথা তো ভাবতে হবে।

রাজীববাবু বসে বসে পরের দিনের পড়ার ওপর চোখ বোলাচ্ছিলেন, মুখ না তুলেই বললেন, মাথা খারাপ তোমার। আমি ছেড়ে গেলে, ছেলেগুলো যে অকূলে পড়বে। আমার ওপর কতটা ওরা নির্ভর করে জানো? যে সব ছেলেগুলো আগে ইতিহাস ক্লাসে জানলা দিয়ে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করত, আজকাল তারাই সামনের বেঞ্চে বসবার জন্য ঠেলাঠেলি শুরু করে দেয়। শিবাজীর পালিয়ে যাওয়ার গল্পটা জানো মনোরমা, সেই ঝুড়ির মধ্যে বসে সরেপড়া, একেবারে খোদ দিল্লীশ্বরকে ফাঁকি দিয়ে।

মনোরমা পালিয়ে বাঁচলেন। এখনই হয়তো লোকটা ইতিহাসের গল্প ফেঁদে বসবে। তা'হলেই সর্বনাশ। প্রাণ যাবে আহার বন্ধ?

কিন্তু না, রাজীববাবু মনোরমার দিকে চেয়ে বললেন, আরে পালাচ্ছ কেন? সবাই যদি বড় স্কুলে যাবে, ছোটা ছোটা মাইনের দিকে লোলুপ দৃষ্টি মেলে, তাহলে এসব স্কুল বাঁচাবে কে? মনে আছে তোমার বাদামতলার হাইস্কুলের কথা? ফুটো টিনের ঘর আর চারটে বেঞ্চ, এই তো সম্বল ছিল। বুকের রক্ত ঢেলে আমরা কজন সেই টিনের চালাকে পাকা ছতলা করলাম। দু ক্লাশ থেকে একেবারে হাইস্কুল। কই কখনও তো আমরা বেশী মাইনের লোভে অন্য স্কুলের দিকে ছুটে যাইনি! পাশের গাঁয়েই তো অভয়াচরণ হাইস্কুল ছিল। কতবার ডাকতে এসেছে আমাকে।

কথা বলতে বলতে রাজীববাবু হঠাৎই থেমে গেলেন। উদাসদৃষ্টি মেলে চুপচাপ বসে রইলেন। চোখের সামনে বুঝি বাদামতলা হাইস্কুলের প্রজ্বলিত রূপটাই ভেসে উঠল। দুর্বৃত্তরা অত কষ্টের স্কুলটা পুড়িয়েই দিল।

ছেলেকেও রাজীববাবু চণ্ডীগড় স্কুলেই ভর্তি করে দিলেন। যাবার সময় নিজে হাত ধরে দিয়ে যান। ফেরার সময় সঙ্গে আনা সম্ভব হয় না, কারণ ছেলের ক্লাস অনেক আগেই শেষ হয়ে যায়।

পথে যেতে যেতে বাপ বেটার নানা কথা হয়। রাজীববাবু আবোল তাবোল বলেন, ছেলে ঘাড় নাড়ে। মাঝে মাঝে ছেলে মনের আনন্দে যা খুশী বলে যায়, বাপ নির্বিষ্টচিত্তে শোনেন।

একদিন বাড়ী ফিরে ছেলের নাম ধরে ডাকতেই মনোরমা বেরিয়ে এলেন, খোকার শরীরটা ভাল নয়। গাটা একটু গরম হয়েছে।

ঘরের কোণে ছাতাটা আর টেবিলের ওপর বইটা রেখে রাজীববাবু তক্তপোষের কাছে এসে দাঁড়ালেন।

বুক পর্যন্ত কাঁথা ঢাকা, ছেলে চুপচাপ শুয়ে আছে। কপালে হাত দিয়ে দেখলেন, হ্যাঁ, বেশ একটু গরমই বোধ হচ্ছে।

একবার কবিরাজ মশাইকে খবর দেব নাকি? রাজীববাবু রান্নাঘরের উদ্দেশে বললেন।

কবিরাজ মানে, পাড়ারই দীনদয়ালবাবু। বিটায়ার্ড মানুষ। শখের কবিরাজী করেন। দায়ে বিপদে ছুটে আসেন। যতটা সাধ্য করেন, না পারলে বলে যেন বিজ্ঞ ডাক্তার দেখাতে।

রান্নাঘর থেকেই মনোরমা উত্তর দিলেন, এত তাড়াহুড়োর দরকার কি? আজ তো সবে জ্বরটা হয়েছে। আজ রাতটা দেখি। কাল যা হয় একটা করা যাবে।

এই একটি কথাতেই রাজীববাবু নিশ্চিন্ত হলেন। জলখাওয়া সেরে লাঠিটা হাতে নিয়ে সামনের রাস্তায় বেড়াতে বের হলেন। অন্যদিন খোকা সঙ্গে থাকত। আজ যেন কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগল।

মাঝরাতে মনোরমা রাজীববাবুকে ঠেলে তুললেন।

তুমি একবার খোকার গায়ে হাত দিয়ে দেখ তো! জ্বরটা যেন বড্ড বেশী বলে মনে হচ্ছে।

রাজীববাবু ছেলের কপালে, গালে হাত রাখলেন। গায়ে হাত ছোঁয়ানো যায় না, এমনই উত্তাপ।

কপালে জলপটি দাও। জ্বরটা খুব বেড়েছে বলেই মনে হচ্ছে।

ভীত, সন্ত্রস্তকণ্ঠে রাজীববাবু ধীরে ধীরে কথাগুলো উচ্চারণ করলেন।

মনোরমা কপালে জলপটির ব্যবস্থা করলেন।

ভোর ভোর রাজীববাবু কবিরাজকে ধরে নিয়ে এলেন। কবিরাজ বুক, পিঠ, জিভ দেখে খুব গম্ভীর করে ফেললেন। বাক্স থেকে একটা পুরিয়া বের করে দিয়ে গেলেন। বললেন, বিকেলের দিকে যেন একবার খবর দেওয়া হয়।

মনোরমা বারণ করেছিলেন, কিন্তু রাজীববাবু স্কুলে গেলেন। এই সময় না গেলে ছাত্রদের বড় ক্ষতি হবে। আর ক মাস পরেই পরীক্ষা। তবে প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেলেন, একটু তাড়াতাড়ি ফিরবেন। অন্যদিনের মতন স্কুলের পরে বসে বসে ছাত্রদের খাতা দেখবেন না।

বিকেলে বাড়ী ফিরেই রাজীববাবু শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। খোকার দৃষ্টি ঘোলাটে। আবোল তাবোল বকছে। অরক্তপ্ত মুখের দিকে চাওয়া যায় না।

মনোরমা মাথার হাত দিয়ে বিছানার পাশে বসেছিলেন। রাজীববাবুকে দেখে কান্নায় ভেঙে পড়লেন, ওগো খোকা কেমন করছে? কি হবে গো, আমার বড্ড ভয় করছে!

হাতের ছাতিটা কোনরকমে মেঝের ওপর আছড়ে ফেলেই রাজীববাবু বেরিয়ে গেলেন। একেবারে কবিরাজকে সঙ্গে করে নিয়ে ফিরলেন।

হীরেনবাবু এবার আর রোগীর চৌকাট পার হলেন না। রোগীর মুখ চোখের চেহারা দেখেই নিজের মুখ বিকৃত করলেন।

রাজীববাবুকে একান্তে ডেকে বললেন, মাষ্টারমশাই, আমি বড় ভাল বুঝছি না, আপনি বরং আর কাউকে ডাকুন।

আর কাউকে মানে, চৌরাস্তার জীবন ডাক্তারকে। জীবন রতন ঘটিক। রোগী ছুঁলেই দু টাকা, আর তার যাতায়াতের সাইকেল রিক্সা ভাড়া।

কবিরাজ চলে যেতে রাজীববাবু নিজের থলিটা পেড়ে দেখলেন। যা আছে, তাতে ডাক্তারের ফি হয়ে যাবে। একবার নয়, বার কয়েক। তারপর সংসারের চিন্তা পরে। সব কিছু বাঁধা দিয়ে খোকার পরমায়ু রক্ষা করতে হবে।

জীবন ডাক্তার এলেন সন্ধ্যার পর। ডাক্তারখানায় অনেক রোগী ছিল। তাদের একটা ব্যবস্থা না করে উঠতে পারলেন না।

জীবন ডাক্তারের এ তল্লাটে পশার খুব। দম আহারের সময় পান না। পশার যেমন আছে, তেমনই পোষাকেরও চটক খুব। পরণে প্যান্ট, ঝলমলে সার্ট, পায়ে চপ্পল। বাঁধা একটা সাইকেল রিক্সা আছে, কিন্তু তবু ভিজিটের সঙ্গে রিক্সাভাড়া আদায় করেন।

বুকে নল বসিয়ে অনেকক্ষণ ধরে খোকাকে দেখলেন। খুব মনোযোগ দিয়ে শুনলেন রোগের বিবরণ তারপর পকেট থেকে কলম বের করে কাগজের ওপর খস খস করে প্রেসক্রিপশন লিখে দিলেন।

রাজীববাবুর দিকে ফিরে বললেন, ওষুধগুলো আমার ডিসপেনসারী থেকেই নিয়ে আসবেন। অন্য কোথাও থেকে আনতে যাবেন না। আজকাল ভেজালের যুগ চলেছে। কেমন থাকে কাল সকালে খবর দেবেন। দরকার হলে আসব।

লোকটার হাত যশ আছে। ওষুধে কাজ হ'ল। সকালের দিকে জ্বর অনেকটা কম। চোখের ঘোলাটে দৃষ্টি অনেক পরিষ্কার, থমথমে মুখের ভাবও কিছুটা স্বাভাবিক।

স্কুল যাবার মুখে রাজীববাবু জীবন ডাক্তারকে খবরটা দিয়ে গেলেন। জীবন ডাক্তার বললেন, আজ বিকেলেও একবার যাব। একবার দেখে ওষুধগুলো পাল্টে দেব।

দিন তিনেক জীবন ডাক্তারের আসা যাওয়া চলল। ডিজিটে, ওষুধে, পথ্যে বেশ খরচ হ'ল। তা হোক, রাজীববাবু নিজের মনকে সান্ত্বনা দিলেন, নিজের সন্তানের আয়ুর চেয়ে জগতে আর কিছু বেশী মহার্ঘ নয়।

খোকার অবস্থা সামান্য ভাল। তবে জ্বরটা একেবারে ছাড়ল না।

জীবন ডাক্তার অভয় দিলেন, জ্বরটা একেবারে ছাড়া কি ভাল? একটু একটু করে ছেড়ে যাবে। আমি সেই রকম ওষুধই দিচ্ছি।

রাজীববাবু নিশ্চিন্ত হলেন। মনোরমাও।

চার দিনের দিন রাজীববাবু ক্লাসে পড়াচ্ছিলেন, হঠাৎ বেয়ারা দিয়ে হাতে একটা স্লিপ দিল। হেডমাস্টার ডাকছেন।

একটু বিরক্ত হয়েই রাজীববাবু পড়া বন্ধ করে বেরিয়ে এলেন। হেডমাস্টারের ঘরে পা দিয়েই চমকে উঠলেন। তার সামনের চেয়ারে রাজীববাবুর প্রতিবেশীর ছেলে চিনু বসে আছে।

হেডমাস্টার রাজীববাবুকে দেখে বললেন, আপনার ছেলে অসুস্থ ছিল একথা তো বলেননি রাজীববাবু?

রাজীববাবু হেডমাস্টারের দিকে না চেয়ে চিনুর দিকে চোখ ফেরালেন। কি সর্বনেশে খবর বহন করে এনেছে চিনু? আসবার সময়ও তো খোকাকে রাজীববাবু ভালই দেখে এসেছিলেন। কি ঘটল এর মধ্যে।

শুধু বুকটা নয়, সর্বশরীর কাঁপছে ঠক ঠক করে। একটা চেয়ারের হাতল ধরে রাজীববাবু টাল সামলালেন।

আপনি বাড়ী যান রাজীববাবু, আপনার ছেলের অসুখ বেড়েছে।

কণ্ঠস্বর নিজের আয়ত্তের মধ্যে নয়, তবু খুব মৃদুকণ্ঠে রাজীববাবু, বললেন, কিন্তু ক্লাস?

ঠিক আছে, সে ব্যবস্থা আমি করছি।

হেডমাস্টারের কথা শেষ হবার আগেই রাজীববাবু চিনুর একটা হাত আঁকড়ে ধরে চলতে শুরু করলেন। কেমন একটা ভয়ের ছায়া যেন তাঁকে আক্রমণ করার জন্য এগিয়ে আসছে। মনকে বার বার আশ্বস্ত করেও রাজীববাবু নির্ভয় হতে পারলেন না।

যেটুকু শক্তি অবশিষ্ট ছিল, খোকার ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে সেটুকুও নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

সমস্ত দেহটা যেন ধনুকের মতন বেঁকে রয়েছে। ঠোঁটের দু'পাশে ফেনার বিন্দু। শিরনেত্র।

বিছানার ওপর আছড়ে পড়ে মনোরমা কাঁদছেন। রাজীববাবুর মেয়ে কোণের দিকে নির্বাক, নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে।

রাজীববাবু সকলের দিকে একবার চোখ ফিরিয়ে দেখেই ছুটে বেরিয়ে গেলেন।

ফিরলেন জীবন ডাক্তারের সাইকেল-রিক্সায়। তাঁকে নিয়ে।

জীবন ডাক্তার রোগী দেখে ভ্রূকুঞ্চিত করলেন। একটা ওষুধ লিখে তখনই রাজীববাবুকে ডিসপেনসারিতে পাঠিয়ে দিলেন।

ওষুধে কাজ হ'ল। বন্ধুকের মতন দেহ সরল, মুখচোখের ভাব অনেক সহজ। তবু জীবন-ডাক্তার অভয় দিতে পারলেন না।

আপনি বরং বড়ো কাউকে দেখান মাষ্টারমশাই। এ রোগী হাতে রাখতে আমি আর ভরসা পাচ্ছি না।

রাজীববাবু শুষ্ককণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, বড় কাকে আনব বলুন তো?

ডাক্তারের অভাব? জীবনডাক্তার মুচকি হাসলেন, কলকাতা শহরে রোগের যেমন কমতি নেই, ডাক্তারও তেমনই আছেন। আপনি ডাক্তারবাবুকে কল দিতে পারেন। ইদানীং খুব নাম করেছেন। সকালে চৌরঙ্গীতে বসেন, বিকালে ভবানীপুরে।

ভিজিট কত তাঁর? রাজীববাবুর কণ্ঠস্বর ক্ষীণতর।

তাঁর ভিজিটটা এখনও কম আছে। ষোল। তবে শীঘ্রই বোধ হয় বত্রিশ হয়ে যাবে। আপনি দেরী করবেন না, কাল সকালেই চলে যান। এর মধ্যে ওষুধ দিয়ে আমি রোগীকে চাঙ্গা করে রাখব।

জীবনডাক্তার চলে যাবার পর অনেকক্ষণ পর্যন্ত রাজীববাবু চুপচাপ এক জায়গায় দাঁড়িয়ে রইলেন। হাতে মাত্র আজকের রাতটা। তার মধ্যেই বেশ কয়েক মুঠো টাকা যোগাড় করতে হবে না হলে হয়তো খোকাকে হারাতে হবে।

রাজীববাবু মনোরমার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখলেন। এক হাতে শুধু একটি শাঁখা। এয়োতীর চিহ্ন। সারাদেহে কোথাও অলঙ্কারের সামান্যতম টুকরোও নেই। নিজের দিকে রাজীববাবুর দেখবার প্রয়োজন নেই। হাতে একটা আংটি ছিল। জীবন-সংগ্রামে সেটিও শেষ হয়ে গেছে। তিনি একেবারে নিঃস্ব।

সারা বাড়ী আঁচড়ে ফেললেও কি ভিজিটের টাকা জুটবে না। মেয়ের হাতে রঙীন কাচের চুড়ি। এগুলোও মনোরমা কিনে দেননি। প্রতিবেশীদের সঙ্গে কালিঘাটে গিয়েছিল, তারাই কিনে দিয়েছে।

রাজীববাবুর চিন্তার ছায়া বোধ হয় তাঁর মুখেই ফুটে উঠেছিল। সেটা মনোরমার নজর এড়াল না।

তিনি চিন্তাকুল মুখে রাজীববাবুর দিকে চোখ তুলে চেয়ে বললেন, কি হবে গো?

কি হবে তাকি রাজীববাবুরই জানা আছে। যেদিকে চোখ যেখান, কেবলই সূচিভেদ্য অন্ধকার। কোথাও আলোর সামান্য ইশারাও নেই।

তবু ডুবন্ত মানুষের কুটো আঁকড়ে ধরার চেষ্টায় রাজীববাবু বললেন, দেখি চেষ্টা করে। উপায় একটা করতেই হবে।

কতক্ষণ নিজের অজ্ঞাতেই হাঁটতে হাঁটতে রাজীববাবুর খেয়াল হল, স্কুলের সেক্রেটারীর বাড়ীর কাছ বরাবর এসে দাঁড়িয়েছেন।

একটু দ্বিধা, একটু সঙ্কোচ, তারপর জোরে জোরে পা ফেলে রাজীববাবু উঠানে গিয়ে দাঁড়ালেন। গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে ডাকলেন, বিনোদবাবু, বিনোদবাবু।

সেক্রেটারি বাড়ীতেই ছিলেন। রাজীববাবুর ডাকে হন্তদন্ত হ'য়ে বাইরে এসে দাঁড়ালেন কি ব্যাপার রাজীববাবু?

রাজীববাবু এর আগে আর কোনদিন সেক্রেটারির বাড়ী আসেন নি। আসার প্রয়োজন হয়নি। অন্য শিক্ষকেরা দরকারে-অদরকারে, স্বার্থের তাগিদে বার বার এসেছেন।

তাই বিনোদবাবু একটু বিস্মিতই হলেন।

কি ব্যাপার রাজীববাবু বললেন। সামনের মাসের মাইনেটা যদি আগাম পাওয়া যায়। এ অনুরোধের কারণও বললেন।

বিনোদবাবু মুখটা গম্ভীর করলেন, তাইতো রাজীববাবু, আপনি যে বড় মুস্কিলে ফেললেন। মাইনে আগাম দেওয়া, বা আগাম মাইনে বাবদ টাকা দেবার নিয়ম তো নেই। আপনি বরং কিছু টাকা নিয়ে যান আমার কাছ থেকে, মাইনে পেলে শোধ দিয়ে দেবেন।

বিনোদবাবু বাড়ীর মধ্যে চলে গেলেন, একটু পরেই বাইরে এসে দাঁড়ালেন, হাতে দু'খানা দশ টাকার নোট।

রাজীববাবু একটু ইতস্তত করলেন। এ যেন অনুগ্রহের দান। হাত পেতে নিতে আত্মসম্মানের একটা কাঁটা কেবলই খচ্‌ খচ্‌ করে এসে বিঁধছে। কিন্তু তিনি মনকে বোঝালেন। আর কটা মাত্র দিন, তারপর মাইনের টাকা হাতে এলেই শোধ দিয়ে দিতে পারবেন।

কিন্তু এ কটা টাকা কিই বা হবে! তবে কুড়িটা টাকা বর্তমান সময়ে কুড়িটা মোহরের সামিল।

রাজীববাবু এগোতে গিয়েই দাঁড়িয়ে পড়লেন। বিনোদবাবু ডাকছেন।

আপনি হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলছেন রাজীববাবু। শশধর সামন্ত অত করে আপনাকে বললেন, আপনি রাজী হলেন না। ভাল মাইনে ভবিষ্যতে বাড়িয়ে নিতে পারতেন। এখনও দেখুন, শশধরবাবু কালও আমার কাছে খোঁজ করছিলেন।

রাজীববাবু আর দাঁড়ালেন না। কোন উত্তরও দিলেন না। হন হন করে এগিয়ে গেলেন।

পরের দিন ডাক্তার বাবু এলেন। দামী ঝকঝকে গাড়ী। তার চেয়েও ঝকঝকে পোষাক।

প্রায় আধঘণ্টা ধরে গভীর মনোযোগসহকারে রোগীকে দেখলেন। নানা প্রশ্ন করলেন। জীবন ডাক্তারের সঙ্গে আলোচনা, তারপর খস খস করে লম্বা এক প্রেসক্রিপশন লিখে রাজীববাবুর হাতে তুলে দিলেন।

ডাক্তারবাবু পরের দিন সকালে খোঁজ নিতে বলে গাড়ীতে গিয়ে উঠলেন। রাজীববাবু জীবন-ডাক্তারের সঙ্গে তাঁর ডিসপেনসারিতে গিয়ে দাঁড়ালেন। ওষুধগুলোর জন্য।

জীবনডাক্তার নিজেই বললেন, ডাক্তারবাবু খুব আশা দিতে পারছেন না। রোগটা একটু বাঁকা পথই নিয়েছে। কালকে ওঁকে খবর দেওয়া নয়, একেবারে সঙ্গে করে নিয়ে আসুন।

রাজীববাবু প্রেসক্রিপশন দেখিয়ে কম্পাউণ্ডারের কাছে ওষুধগুলোর দামের একটা ফিরিস্তি নিচ্ছিলেন। সাত টাকা আট নয়া পয়সা। জীবনডাক্তারের কথায় তিনি চমকে উঠলেন। আবার আসবেন ডাক্তারবাবু, তার মানে আবার কুড়ি বাইশ টাকার ধাক্কা!

সত্যিই পরের দিন আসতে হ'ল। রোগীর অবস্থা মোটেই ভাল নয়। বাড়ীতে কতকগুলো পুরনো কাঁসার বাসন ছিল। তাদি কাঁসার বাসন, অনেক পুরনো, সেগুলো আর রাজীববাবুর একটা গরম গায়ের কাপড় দোকানে বিক্রি করে আসা হ'ল। কিন্তু তাতেও পরিত্রাণ নেই। বিকেলেও ডাক্তারবাবু আসবেন। একটা ইনজেকশন দেবেন। ইনজেকশনটা যেন কিনে রাখা হয়।

রাজীববাবুর চোখের সামনে অনেকদিন আগে অনেক পিছনে ফেলে আসা এক রাতের তাণ্ডব নৃত্য ভেসে উঠল, বৈশাখনের মেলিহান শিখার পটভূমিকায়। যন্ত্রিক ক্রোধে, ক্রোধে তেমনি মানবের

উন্মত্ততা সুরু হয়েছে। আর একবার বুঝি গোটা সংসার ছত্রখান হয়ে পড়বে। ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়বে একজন মানুষ।

কানের কাছে ভ্রমরগুঞ্জনের মতন কেবল একটা নাম বারবার উচ্চারিত হ'ল। শশধর সামন্ত।

বলরাম সামন্ত। রোল নম্বর তেত্রিশ। তারই বাপ শশধর সামন্ত। ছেলের জন্ত ভাল একটা গৃহশিক্ষকের প্রয়োজন। রাজীববাবু দেখাও করেছিলেন শশধর সামন্তের সঙ্গে। কিন্তু তাঁর সর্তে রাজী হ'তে পারেন নি। রাজীববাবু ইংরাজী আর ইতিহাস পড়ান। বলরাম ওই দুটো বিষয়েই কাঁচা। রাজীববাবু একটু ইঙ্গিত করলেই ছেলেটাকে উত্তরে দিতে পারেন। প্রশ্নপত্র যখন তিনিই করবেন, তখন আর অসুবিধাটা কোথায়! টেষ্টে পাশ করে গেলে তারপর শশধর সামন্ত চেষ্টা করবেন। বড় মাছ ধরার জন্ত বড় জাল। ভাল চায় কেললে মাছ না ঠুকরে যাবে কোথায়।

রাজীববাবু কানে আঙুল দিয়ে বেরিয়ে এসেছেন। আর পিছন ফিরে দেখেন নি পর্যন্ত। যেতে যেতেই শশধর সামন্তর ছুঁড়ে দেওয়া কথার টুকরোগুলো কানে এসেছিল।

ভেবে দেখবেন মাষ্টার মশাই। আপনাকে অখুশী রাখব না। বলেন তো ছ মাসের মাইনে আগাম দিয়ে দিচ্ছি।

রাজীববাবু দাঁড়ান নি। এমন পাপ কথা কানে গেলেও বিবেক সঙ্কুচিত হয়।

রাজীববাবুর যখন খেয়াল হল, তখন দেখলেন মনোরমা তাঁর একটা হাত আপটে ধরে কাঁদছেন, কি হবে গো, খোকাকে কি করে বাঁচাব? কোথা থেকে টাকার জোগাড় করব?

আবার দু কানে সেই ভ্রমরগুঞ্জন। শশধর সামন্তর দেহটা চোখের সামনে ভেসে উঠল। খুব আবছা।

একটা ছেলে হিংসার আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। আর একটি মাত্র সম্বল। শিবরাত্রির সলতে। জীবনের শেষ আশা আর আশ্বাস।

এতদিন তো বিবেকের নির্দেশ মেনে চলেছেন রাজীববাবু। চোখে ঠুলি পরা ঘোড়ার মতন ধর্মের ঘাঁধা সড়কে ছুটে ছুটে মুখে ফেনা বের হয়ে গেছে। কি পেয়েছেন তিনি? এই কঠোর কৃচ্ছসাধন কতটুকু তাঁকে দিয়েছে? আত্মার শান্তি! ওতো অলীক কল্পনা। ভীরুর শেষ আশ্রয়। অর্ধাশনে, জন্তুর মতন জীবনযাপন করে চলেছেন, মনে মনে শুধু এই মিথ্যা উল্লাস ঘোষণ করে, যে তিনি সৎ তিনি কর্তব্যনিষ্ঠ।

খোকা চীৎকার করে উঠতেই রাজীববাবু চমকে উঠলেন। আবার খোকার দু চোখে সেই ঘোলাটে দৃষ্টি। দেহটা শক্ত হয়ে আসছে। সৎ-অসতের এই দ্বিধায় আরো সময় কাটালে রাজীববাবুকে সারাটা জীবন হয়তো অনুতাপ করতে হবে।

ঘরের কোন থেকে লাঠিটা নিয়ে রাজীববাবু পথে নামলেন।

ছ মাসের আগাম, তার মানে অনেক টাকা। মাইনের অঙ্কটাও লোভনীয়। শুধু শুষ্ক নীরস পথ থেকে সামান্ত বিচ্যুতি।

রাজীববাবু আর চিন্তা করলেন না। চিন্তা করলেই বিপদ। এক চিন্তার জাল থেকে আর এক চিন্তার জালে জড়িয়ে পড়বেন। ছাড়াতে পারবেন না নিজেকে। আটকৈশোর যে সব ভাল ভাল কথা শুনে এসেছেন, সেগুলো তাঁর রক্তকণিকার সঙ্গে মিশে গেছে, তারাই পথরোধ করে দাঁড়াবে।

শশধর সামন্তর বাড়ীর কাছাকাছি এসেই রাজীববাবু থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। তাঁর বুঝি দিকভুল হয়ে গেল। হাঁটতে হাঁটতে এক দেশ থেকে অন্য এক দেশে এসে হাজির হলেন।

বিরাট কৃষ্ণচূড়া গাছ। অজস্র শাখা প্রশাখা। ঠিক এমনই এক গাছ ছিল রামমহলা হাইস্কুলের প্রাঙ্গণে। ক্লাসে পড়াতে পড়াতে মাঝে মাঝে রাজীববাবু জানলা দিয়ে সেই শুধু উন্নতশীর্ষ গাছটার দিকে চেয়ে দেখতেন। গ্রীষ্মে, বর্ষায়, হেমন্তে, শীতে অচল অটল।

একটা শব্দ হতেই রাজীববাবু সম্বিত ফিরে পেলেন। একদল কুলি ভারে দড়ি বেঁধে টেনে ধরে রয়েছে। আর দুজন খপ খপ করে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপ দিয়ে চলেছে। শাখা থেকে শুরু হয়েছে, কয়েকদিনের মধ্যেই গোটা গাছটা হয়ত লুটিয়ে পড়বে মাটিতে।

বুকের মাঝখানে অসহ্য এক যন্ত্রণা। এই শহরের হাজার প্রয়োজনে তাই তো হয়। যত গৌরব বিবেকবান মানুষকে এরা এমনি করেই পথের ধুলোয় টেনে নামায়। এমনি আঘাতে আঘাতে।

মুমূর্ষু খোকার কথা রাজীববাবু বিস্মৃত হলেন। দু হাতে লাঠিটা চেপে ধরে শশধর সামন্তদের আওতা থেকে দ্রুতপায়ে সরে যাবার চেষ্টা করলেন। মাথা উঁচু করে।

* * *

কলিকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন! অবিস্মরণীয় দিন। কংগ্রেসের নব অভ্যুদয়।

নিখুঁত সাহেবী পোষাকে সামনের আসনে আর নেই রাজনীতি বিলাসীর দল। তার পরিবর্তে শুভ্র খদ্দর পরিহিত রাজনৈতিক কর্মীর দল।

ভাষা আজ ইংরেজী নয়··· দেশজ···প্রস্তাব আজ নয়। নিবেদন। প্রস্তাব আজ কঠোর কর্মের। ত্যাগের সুনিশ্চিত ঘোষণায়। মন্ত্র আজ অসহযোগ। তন্ত্রকে জয় করবার সময়—আয়োজন।

অন্ধ · দিব্যাস্ত্র···কবির কল্পকহীন সুনিয়ন্ত্রিত আত্মবর্জন।

যাত্রা আজ কণ্টক পথে···কারাগারে নূতন যাত্রির ভিড়—মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যুবকের দল··· নেতা আজ অর্ধনগ্ন ফকীর।

অধিবেশন অন্তে জওহরলাল মহাত্মাজীর সঙ্গে চললেন বিদায় পথযাত্রী এক মহাপুরুষের দর্শনে। মতিলাল ঘোষ তখন শেষ শয্যায়। শয্যার পাশে গিয়ে বসলেন দুজনে। অস্তাচল-পথযাত্রী বৃদ্ধ সাংবাদিক মস্তক স্পর্শ করে মহাত্মাজীকে আশীর্বাদ করলেন।

বললেন, আজ আমার একমাত্র শান্তি। আমি চলেছি একা এমন এক দেশে যেখানে নেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্য।

ঘট বা কুম্ভ মানুষের সভ্যতার অগ্রগতির অন্যতম নিদর্শন। প্রতিবার জলপান করবার জন্য আদিম মানুষকে অন্যান্য পশুর মতই প্রস্রবণ বা নদীতে যেতে হত। ক্রমে মানুষ আধারে পানীয় জল সংগ্রহ করতে শিখল। যে আধার সর্বপ্রথমে মানুষ ব্যবহার করেছিল তার উপকরণ ছিল গাছের বাকল; ক্রমে পশুচর্মের আধারেরও ব্যবহারের চলন হয়। শেষ পর্যন্ত মানুষ মাটিতে ভাঁড় তৈরী করে পুড়িয়ে নিতে শিখল। চাকা থেকে মৃৎপাত্র নির্মাণের কৌশল আবিষ্কার মানুষের এক বিশেষ কীর্তি। পৃথিবীর কোথায় যে মানুষ প্রথম চাকা আবিষ্কার করেছিল তার কোন স্থির সিদ্ধান্ত এখনও হয় নাই। এক দিকে কুমোর যেমন চাকার ব্যবহার করেছে মৃৎ পাত্র নির্মাণে অন্যদিকে এই চাকাই মানুষের সভ্যতাকে গতি দিয়ে এগিয়ে নিয়ে এসেছে। তাতে আশ্চর্য হতে হয় যে আমেরিকার আদিবাসীরা সভ্যতায় বেশ অগ্রসর হয়ে থাকলেও ইউরোপীয়দের সংস্পর্শে আসবার পূর্বে চাকার ব্যবহার জানতো না। এ থেকে মনে হয় যে চাকার ব্যবহার সমস্ত মানুষের সমাজে স্বতঃই প্রবর্তিত হয় নাই। সিন্ধু তীরবর্তী প্রাচীন সভ্যতার উদ্ভাবকেরা চাকায় মৃৎপাত্র নির্মাণ করত এবং চাকার সাহায্যে গাড়ি চালাবার কৌশলও জানত। প্রাচীন মিশর, সুমের ও বাবীলোনিয়া, এবং ক্রীট দ্বীপেও চাকার ব্যবহার প্রচলিত ছিল। ঋগ্বেদে যেমন চাকার ব্যাপক ব্যবহারের উল্লেখ পাওয়া যায় তেমনই সমাজে ঘট নির্মাতা কুম্ভকার শ্রেণীর লোকেরও উল্লেখ আছে। ভারতীয় সমাজে কুম্ভকে যেমন গৃহস্থালীর এক অতি আবশ্যকীয় উপকরণ রূপে গণ্য করা হয়েছে, তেমনি প্রাচীনকাল থেকেই এর ইঙ্গিত পূর্ণ রূপ সম্বন্ধেও সচেতনতা দেখা যায়। ভারতীয় মানসে পূর্ণ কুম্ভ এক অতি মঙ্গলজনক ইঙ্গিতগর্ভ জিনিষ; ভারতীয় মন ব্রহ্মাণ্ডরূপী বিশ্ব চরাচরের প্রতিবিম্ব সাব্যস্ত করে পূর্ণ কুম্ভকে একটি বৈশিষ্ট্য আরোপ করেছে।

নদীমাতৃক দেশে মৃৎভাণ্ডের প্রচলন স্বভাবতঃই একটু বেশী হয়ে থাকে দেখা যায়। নীল নদ বিধৌত দেশে, টাইগ্রীস ও ইউফ্রেটিসের তীরে, সিন্ধু কূলে এবং গঙ্গার অববাহিকা পথে মৃৎভাণ্ডের প্রভূত জনপ্রিয়তা সেই সেই অঞ্চলের সভ্যতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য বলেই গণ্য হয়েছে। নরম পলিমাটির দেশ বাংলারও এর ব্যতিক্রম হয় নাই। আজ থেকে আড়াই হাজার বছর আগেও বাংলায় যে এক অগ্রসর সভ্যতার অস্তিত্ব ছিল তার প্রমাণ এখন ক্রমশঃই আবিষ্কৃত হচ্ছে। ধ্বংসাবশিষ্ট অট্টালিকা, পরিত্যক্ত দুর্গ প্রাকার, পরিখের অবশেষ, মাটিতে তৈরী পুতুল এবং অন্যান্য নানা পুরাবস্তুর সঙ্গে এই সব প্রাচীন নগর ও জনপদের ধ্বংসাবশেষ থেকে আবিষ্কৃত হচ্ছে অসংখ্য মৃৎভাণ্ডের টুকরো। এখনকার

খুবই নানা সাংসারিক কাজে এই সব মৃৎভাণ্ডের ব্যবহার প্রচলিত ছিল। খুব প্রাচীন আর ভারী সোল আটোর মত খুব সঙ্গতি বড় বড় ভাণ্ড যা জালা নাম আর জল রাখবার জন্য ব্যবহৃত হত। তার থেকে কিছু খর্বায়তন ভাণ্ডও প্রচলিত ছিল, ঠিক যেমনটি এখনও দেখা যায় আর যাকে বলা হয় কলসী। খেজুরের রস সংগ্রহের জন্য, গুড় রাখবার জন্য বা জল ধরে রাখতে এই ধরণের কলসীর ব্যবহার রয়েছে। এই ধরণের কলসীর মুখ ছোট, কানা উঁচু আর চ্যাটাল, শরীর গোল, সামান্য তলার দিকে সরু (bulb-এর মত), এবং ঠিক এই আকৃতিটিই হাজার হাজার বছর কিছুমাত্র পরিবর্তিত না হয়ে বাংলাদেশে প্রচলিত রয়েছে দেখা যায়। এ ছাড়া খোলা মুখ চওড়া শরীর রান্না করার হাড়ীর চেহারাও বাংলাদেশে খুব বদলায় নাই : এর পরেই উল্লেখ করা যেতে পারে থালা বা সামান্য উঁচু কানা বেকাবি বা থালার কথা যাকে উল্টে দিলে সরা বা ঢাকনা হিসেবেও ব্যবহার করা চলে। আর আছে ছোট আকারের খুন্তি আর গেলাস, যার ব্যবহার পানপাত্র হিসেবে। আকৃতির তারতম্যে মাটির ভাণ্ডের যেমন অসংখ্য বৈচিত্র্য, তেমনি বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায় এর অঙ্গ সজ্জায় আর ব্যবহারে। আর এটাও লক্ষ না করে পারা যায় না যে বাংলার সঙ্গে প্রতিবেশী উড়িষ্যা এবং বিহারে প্রচলিত মাটির ভাণ্ডের আকৃতি, অঙ্গসজ্জা এবং ব্যবহারে খুব বেশী সঙ্গতি নাই। সামাজিক ছকও জীবন যাত্রার বৈশিষ্ট্য থেকে যে মানসিক বৈচিত্র্য জন্মায় তার কিছুটা আভাস সমাজে প্রচলিত ব্যবহারিক উপকরণেও বিধৃত হয়। এত নিকট সান্নিধ্য সত্ত্বেও বিহার ও উড়িষ্যার মৃৎভাণ্ডের সঙ্গে বাংলার মৃৎভাণ্ডের বৈশিষ্ট্য সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের পরিচয়ই বহন করছে বলা যায়।

প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানে যে সব সুপ্রাচীন যুগের মাটির পাত্র পাওয়া গেছে তাতে ক্বচিৎ কিছু কিছু অলঙ্করণের চিহ্নও আছে। এই সব অলঙ্করণের মধ্যে রঙের প্রলেপ বা নক্সা, কাঠি দিয়ে আঁকা দাগ আর নক্সা কাটা ছাপই প্রধান। রঙের প্রলেপ আর নক্সা কাটা ভাণ্ড বাংলাদেশে এখনও খুব বেশী পাওয়া যায় নাই ; তবে যা পাওয়া গেছে সেগুলি খুবই পুরোনো এবং অনেক ক্ষেত্রে হয়ত প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতার পরিচায়ক। অভিজ্ঞানের ছাপ দেওয়া (stamped) মুদ্রাকৃতি অলঙ্কার কিছু কিছু ভাণ্ডে হয়ত নির্মাতা বা ব্যবহারকারীর পরিচয় বহন করত। এখনকার আমলে ঐ ধরণের অভিজ্ঞানের ছাপ মাটির পাত্রে আর দেখা যায় না। তবে কাঠি দিয়ে আঁকা দাগ কলসী বা হাড়ী জাতীয় ভাণ্ডে এখনও প্রচলিত রয়েছে। আর রঙের প্রলেপ আর নক্সা নানা উপলক্ষে এখনও বেশ চলে। এর মধ্যে অনেক জায়গায় নক্সা আঁকা জাতীয় রঙিন ঘটে পূজাও হয় যদিও আগে এর প্রচলন ছিলনা। নক্সা কাটা রঙিন ঘট আর সরা শুভকর্মে, বিশেষ করে বিয়েতে এখনও বেশ ব্যাপক ভাবেই ব্যবহার হয়। এই সব ঘটে সজ্জা পাতার নক্সাই এখন বেশী, তবে কিছুকাল আগেও তাতে পশু-পক্ষী আর মানুষের আকৃতির নক্সাও দেখা যেত। জ্যামিতিক রেখার নক্সারও চলন এতে আছে। তবে এখনকার আঁকা নক্সা প্রায়ই অর্থহীন আলঙ্কারিক নক্সা, তাতে ইঙ্গিতগর্ভ (symbolic) কোন ব্যোতনা থাকে না। প্রাচীন ইঙ্গিতময় অলঙ্কারের প্রচলন যেমন চলে গিয়েছে তেমনি ইঙ্গিত থেকে অর্থ বুঝবার সামর্থ এবং চেষ্টাও এখন আর

দেখা যায় না। ঘট ও সরার নক্সার সঙ্গে আলপনার নক্সার যথেষ্ট যোগ আছে—ঘটের উপরের অংশের গায় পদ্মের পাপড়ির নক্সা ও পরে আঁকা বাঁকা রেখায় সূচীত নদী, ফল পর্বত, চন্দ্র সূর্য ইত্যাদি নক্সার মধ্যে ব্রহ্মাণ্ডের ইঙ্গিত এখনকার পড়াশোনা জানা মানুষেরা আর বুঝতে পারে না। তেমনি বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্য আছে অদ্ভুত কৌশলে ঘটকে দেবতার মুখ বা সম্পূর্ণ দেব মূর্তিতে পরিণত করার মধ্যে। এখন দেব প্রতিমার মুখ কুমোরেরা ছাঁচ থেকেই তৈরী করেন—তাতে কিছুটা ঘটের আদল থাকলেও সেই যোগাযোগটি খুব স্পষ্ট নয়। তবে এখনও অনেক জায়গায় যেখানে প্রতিমার কেবলমাত্র মুখই পূজার জন্য ব্যবহৃত হয় সেখানে কলসী বা ঘটের গায় ভুরু, চোখ, নাক ঠোঁট বসিয়ে বা এঁকে নিয়ে কাজ চালান হয়। অনেক জায়গায় মৃৎভাণ্ডের অনুরূপ পেতলের হাড়ী বা কলসীরও ব্যবহার দেখা যায়। অধুনালুপ্ত মজিলপুর অঞ্চলের দক্ষিণরায়ের মুখ, এই ধারারই সৃষ্টি। আবার বরিশাল অঞ্চলে দেখা যায় ঘটকে মনসার মূর্তিতে রূপান্তরিত করে নেওয়ার প্রচলন। আবার ঘটের গায় চিত্র করে পরিপূর্ণ মনসার মূর্তিও বরিশাল অঞ্চলে প্রচলিত ছিল। দেশ বিভাগের পর কিছু কুম্ভকার কলকাতার আশে পাশে এই উভয় ধরণের মনসার ঘট এখনও কিছু তৈরী করছেন। লক্ষ করবার বিষয় এই যে মুখ বা প্রতিমা নির্মাণের প্রায় প্রত্যেক ক্ষেত্রেই ঘটটিকে ওল্টান অবস্থায় ব্যবহার করা হয়। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে মানুষের মাথাকে ওল্টান ঘটের সঙ্গে তুলনা করবার যে প্রচেষ্টা দেখা যায় তার মূলে কুম্ভকারের মূর্তি নির্মাণের এই কৌশলের প্রভাব থাকা কিছু আশ্চর্য নয়। চিত্রিত ঘটের মতই চিত্রিত সরাও বাংলার লোক সমাজে অপরিচিত নয়। প্রায় সব অঞ্চলেই মাঙ্গলিক ক্রিয়া কর্মে চিত্রিত সরা দিয়ে অনির্বাণ প্রদীপ ঢেকে রাখার রেওয়াজ প্রচলিত আছে। কিন্তু চিত্রিত সরার বিশেষ উল্লেখযোগ্য ব্যবহার ছিল পূর্ববঙ্গে যেখানে আড়ম্বরপূর্ণ দুর্গা বা লক্ষ্মীপ্রতিমার পরিবর্তে মাটির সরার উপর আঁকা পিঠের উপর আঁকা দুর্গা বা লক্ষ্মীর পট প্রতি গৃহস্থের অতি আদরের ধনে গণ্য হত। দরিদ্র ব্রাহ্মণ ও সাধারণ মানুষের দেবতার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের প্রয়াসকে কুম্ভকারেরা এমনি করে সার্থক করে তুলত। প্রতিমার অঙ্গে যে পারিপাট্য, যে রূপবোধের পরিচয় অদ্ভুত কুশলতার সঙ্গে শিল্পী এই সরার গায় তার সব বৈশিষ্ট্যই বজায় রেখে দেবতাকে দরিদ্র ও সাধারণ মানুষের অনায়াস লভ্যতার মধ্যে এনে তাদের পরিতৃপ্তি বিধান করত, বিনিময়ে লাভ করত তাদের অকুণ্ঠ আশীর্বাদ।

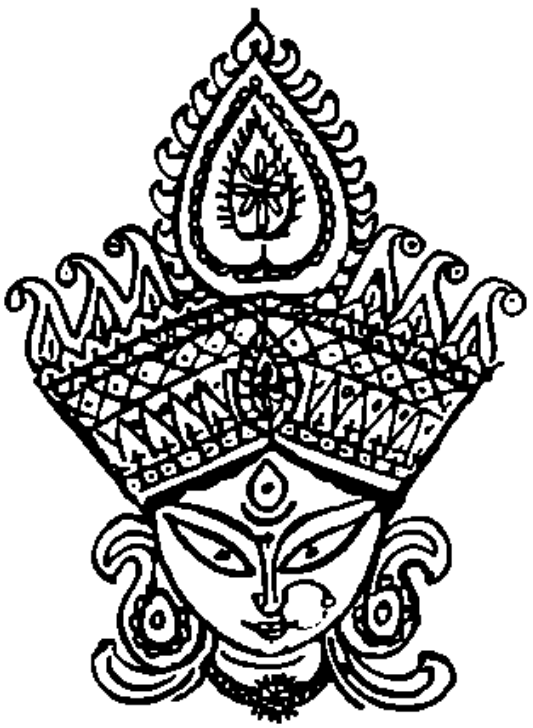

যে কৌশলে তারা হাঁড়ি বা সরার গায় রং আর রেখা দিয়ে চিত্র আঁকত সেই কৌশলের মূল পরিবেশ ছিল পটচিত্রে। বলতে কি পটের সমতল জমি থেকে রঙ আর রেখাকে ঘট আর সরার বাঁকানো জমির ওপর দিয়ে আনাতে কারুশিল্পীর যথেষ্ট কৃতিত্ব ছিল এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আর ঘট এবং সরার ইঙ্গিতগর্ভ রূপটিই যে তাদের একাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল তাও ঠিক। তবে পটের প্রকৃত আধার কিন্তু দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে নির্মিত একটি সমতল ক্ষেত্র। এবং চিত্রের এই মৌলিক আধারসম্পর্কে বাংলার কারুশিল্পীর সচেতনতা কিছু কম ছিল না। অনুমান করা যেতে পারে যে স্মরণাতীত কাল থেকেই বাংলার শিল্পীদের পটচিত্র অঙ্কনে যথেষ্ট পারদর্শিতা ছিল। প্রত্যক্ষভাবে বাংলার না হলেও বহু অতীতকালে ভারতে যে পটচিত্রের প্রচলন ছিল প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের খ্যাতনামা বহু লেখকের রচনা থেকে তা জানতে পারা যায়। বাণভট্ট প্রণীত 'হর্ষচরিতে' রাজপথের পাশে জনৈক পটুয়ার পটচিত্র প্রদর্শনের এক প্রত্যক্ষ বর্ণনা পাওয়া যায়। তারও বহু আগে প্রাচীন পালি সাহিত্যে মঞ্চ ও চরণচিত্র নামে দুইপ্রকার ছবির উল্লেখ পাওয়া যায়। অনেক পণ্ডিত মঞ্চ ও চরণচিত্রকে সেই আমলের পটচিত্র বলে অনুমান করেন।

খ্রীষ্টজন্মের প্রায় দু'দুই বছর আগে মালব অঞ্চলের ভারহুত ও গুপালের সন্নিকটবর্তী সাঁচীতে যে স্তূপ নির্মিত হয়েছিল সেই স্তূপগুলির প্রাচীরে ও তোরণের স্তম্ভ ও কড়ির গায় খুব বিস্তৃত ধরণের খোদাই করা ছবি দেখা যায়। ভারহুতের স্তূপ প্রাচীরে পর পর চৌকো চৌকো খোপে সাজান ভগবান বুদ্ধের অতীত ও বর্তমান জীবনের অনেক কাহিনী উৎকীর্ণ রয়েছে। সাঁচীর স্তূপ তোরণের স্তম্ভের গায়ও এই ধরণের খোপে খোপে সাজান অনেক ছবি আছে। এই ছবিগুলিতে কাহিনী সাজাবার রীতি, আকৃতি ও বস্তুর বিন্যাস ও বর্ণনার নাটকীয়তায় বর্তমান আমলের পটচিত্রের সঙ্গে বহুলাংশে মিল আছে। এই প্রসঙ্গে অনেকেই অনুমান করেছেন যে এই ছবিগুলি কোন অনুরূপ ধরণের ওটোমোরীতির পটচিত্রের অনুকরণেই পরিকল্পিত হয়েছিল। সাঁচীর স্তূপ তোরণের শীর্ষে আড়াআড়ি স্থাপিত যে কড়ি আছে তার গায়ও অনুরূপ কাহিনীর চিত্ররূপ শোভা পাচ্ছে। এ চিত্ররূপের বিন্যাস খোপে খোপে ওপর থেকে নীচের দিকে সাজান পটচিত্রের অনুরূপ নয়। এই ছবিগুলি তোরণশীর্ষের বিস্তৃত সমুখভাগকে একটি ক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে, যেখানে ঘটনার গতি বাঁদিক থেকে ডানদিকে চলেছে দেখা যায়। তোরণশীর্ষের দুই প্রান্তভাগ যেন জড়ান। অনেকে এই জড়ান অংশগুলিকে পারসিক ধরণের স্তম্ভশীর্ষের (volute) বিকল্প বলে অনুমান করেছেন। এই

অংশগুলি নিঃসন্দেহেই বিস্তৃত পটের দুই প্রান্তভাগের অনুকরণে রচনা করা হয়েছিল যাতে করে প্রলম্ব ধরণের চলমান ছবির প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্টভাবেই উপলব্ধি করা যায়। এখনও গুজরাট অঞ্চলে জৈনদের বিজ্ঞপ্তিপত্রে অনেকটা ঐ ধরণের পটচিত্রের ব্যবহার দেখা যায়। বাংলাদেশের দুর্গা প্রতিমার মাথায় যে চালচিত্র বিন্যস্ত হয় তার সঙ্গে এই ধরণের ছবির খুব নিকট সম্পর্ক আছে। প্রথম এই ধরণের চলমান পটের নামই ছিল সেই বৌদ্ধ সাহিত্যে উল্লিখিত চয়ণচিত্র; এবং এই চয়ণচিত্রই পরে চলচ্চিত্র ও শেষ পর্যন্ত বাংলায় চালচিত্র নাম নিয়েছিল।

বাংলাদেশের এই চিত্রকল্পে যে একটা অতি প্রাচীন সংস্কৃতি ধারার প্রভাব আছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। পটচিত্রগুলি খোপে খোপে সাজান; এইসব খোপে ঘটনা বিন্যাস করে পটুয়ারা এক সুন্দর নাটকীয় পরিবেশ সৃষ্টি করতেন। প্রায়ই স্বরচিত গান বা ছড়ার সঙ্গে এইসব ছবি দেখান হত। যদিও ধর্মে এইসব পটুয়ারা সবই প্রায় মুসলমান, পটের বিষয়বস্তুতে কৃষ্ণলীলা ও রামায়ণের ব্যবহারই অত্যন্ত ব্যাপক। বাংলাদেশে কৃষ্ণলীলার জনপ্রিয়তা পাহাড়পুরের বৌদ্ধ মন্দিরের কাল থেকেই লক্ষ্য করা যায়। রামায়ণের ধারাও বাংলায় বেশ প্রাচীন এবং মুসলমান আমলে নির্মিত মন্দিরগুলিতে রামায়ণ ও কৃষ্ণলীলার নানা ছবির সমাবেশ আছে। কিন্তু পটচিত্রীরা তাদের শিল্পে সমসাময়িক কালে যেসব বিষয় জনপ্রিয়তা লাভ করে সে সম্বন্ধেও যথেষ্ট সচেতনতা দেখিয়েছেন। তাঁদের ছবিতে তাই মধ্যযুগে যেসব মঙ্গলকাব্য জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল সেই মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, চৈতন্যমঙ্গল ইত্যাদি বিষয়বস্তুর সমাবেশ দেখা যায়। দুর্গা প্রতিমার চালচিত্রেও বিষয়বস্তু কালিকামঙ্গল। মুসলমান সমাজে দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চলে গাজীর পট নামে পরিচিত গাজী কালুর কাহিনী নিয়ে আঁকা পটও খুব সমাদর লাভ করেছিল।

পটের বিষয়বস্তু যেমন আবেগপ্রবণ ও নাটকীয়তা গুণে সমৃদ্ধ, এর বর্ণ ও রেখার রচনাত্মক বৈশিষ্ট্য ও কম উল্লেখযোগ্য নয়। বাংলার পাল রাজাদের আমলে পুথির পাতায় আঁকা ছবি খুব উৎকর্ষ লাভ করেছিল। এই সব ছবিতে সূক্ষ্ম রেখার বিন্যাস ও অত্যন্ত মার্জিত কিন্তু উজ্জ্বল বর্ণবিন্যাস দেখা যায়। পটের রেখা পটোপযোগী স্থূল কিন্তু অত্যন্ত বেগমান দৃঢ় এবং প্রতিকৃতি রচনায় এই রেখার উপযোগীতা অস্বীকার করা যায় না। মৌলিক গুণে এই রেখাকে অজন্তার সুপরিণত ও অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও প্রকাশ প্রবণ রেখারই উত্তরাধিকারী বলা চলে। বর্ণের দিক থেকে ছবিগুলি অত্যন্ত উজ্জ্বল এবং সাধারণের চিত্তাকর্ষণের উদ্দেশ্যেই যে এই বর্ণের উজ্জ্বলতা তা বেশ উপলব্ধি করা যায়। দীর্ঘকাল এই পটকে অবলম্বন করে বাংলায় লোকশিক্ষার একটা ধারা প্রবাহিত ছিল। বর্তমানে ভারতবাসীদের মধ্যে অক্ষর জ্ঞানের নিতান্তই অভাব দেখা যায়। এই অক্ষর জ্ঞানের অভাবটা অনেকে একটা চিরকেলে ব্যাপার বলে মনে করলেও ইতিহাস কোথাও সে সাক্ষ্য দেয় না। ইংরাজ শাসনের গোড়ার দিকেও বাংলাদেশে অসংখ্য পাঠশালা ব্যাপক অক্ষর পরিচয় প্রবর্তনার ব্রতী ছিল বলে জানা যায়। অক্ষর পরিচয় ইংরাজ আমলে যে শতকরা দশ বা আটজনের মধ্যেই সীমিত ছিল তেমনটি থাকলে আকবরের আমল থেকে গুপ্ত আমল বা তার পরেও সাধারণ মানুষের উদ্দেশ্যে উৎকীর্ণ পথপ্রান্তস্থিত শিলালেখ গুলি নিরর্থক বলে গণ্য হত। মুসলমান আমলে অক্ষর পরিচয় হয়ত কমতে থাকে। তাই জনসাধারণের উদ্দেশ্যে প্রাচীন ধরণের প্রচার-লেখা প্রবর্তন বন্ধ হয়ে যায়। আক্ষরিক জ্ঞানের পরিপূরক রূপে শিক্ষা প্রচারের নানা ধারা দেশে প্রচলিত ছিল। এর মধ্যে যাত্রা, নাটক, রামলীলা, পাঠ, কথকতা ইত্যাদির প্রচলন ছিল। কিন্তু চোখে দেখে শেখা জ্ঞান যে গভীর ও সুদূর প্রসারী হয় সে সম্বন্ধেও এদেশে সচেতনতা কম ছিল না। এই পদ্ধতি যাকে এখন visual .education বলে, এই পটচিত্রকে তারই সগোত্র বলা চলে। পট চিত্র বাংলার লোকজীবনের এক বিশিষ্ট অঙ্গ। বাংলার সমাজ মনের পরিচয়ে সমৃদ্ধ ঘট ও পট বাংলার সংস্কৃতি জীবনের অমূল্য সম্পদ রূপেই চিরকাল গণ্য হবে এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

কোম্পানি আমলের কাহিনী

অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

ঠগীদের দৌরাত্ম্য

কোম্পানী আমলের অনেক আগে থেকেই ভারতের উত্তর ও মধ্যপ্রদেশের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে একটা বড় ডাকাত-দলের উপদ্রব বহুদিন পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। সেদলের নাম ছিল ঠগী।

সাধারণত লোকালয়ের বাইরে বনে বা পাহাড়ে যেসব ডাকাত-দলের গতিবিধির বা কার্যকলাপের কথা শোনা যায় ঠগীরা সে ধরণের ডাকাত ছিল না।

তারা গুপ্তভাবে ছদ্মবেশে লোকালয়ের মধ্যেই ঘোরাফেরা করত এবং সুযোগ বুঝে দলবদ্ধ হয়ে লুঠতরাজ খুনজখম করে পালাতো। সময় সময় তারা গ্রামকে গ্রাম লুঠ করত। তাদের নৃশংস অত্যাচারে বহু লোক জখম হত। প্রাণহানিও হয়েছে কম নয়।

এক সময় উত্তর ও মধ্য প্রদেশের অনেক জায়গায় ঠগীদের নামে এমনি আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছিল যে দিনের বেলাতেও লোকজন একা একা এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে যেতে সাহস করত না।

ঠগীদের প্রধান লক্ষ্য ও শিকার ছিল তীর্থযাত্রী বা ঐ ধরণের দূরপাল্লার অভিযাত্রীরা।

দল বেঁধে ঐসব যাত্রীরা যাতায়াত করত। পথে ঠগীরা ছদ্মবেশে তাদের সঙ্গে মিশত, তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়ে তাদের বিশ্বাস উৎপাদন করত, তারপর সময় বুঝে তাদের মেরেধরে সর্বস্ব লুঠ করে নিয়ে সরে পড়ত।

তখনকার দিনে দূরের যাত্রীরা পায়ে হেঁটেই তীর্থ পর্যটন করত, এক রাজ্য থেকে আর এক রাজ্যে যাতায়াত করত। দল বেঁধে বোঁচকাবুঁচকি কাঁধে নিয়ে দিনের পর দিন চলত তাদের পথপরিক্রমা।

যেতে যেতে তারা হয়ত দেখল, পথের ধারে গাছের তলায় তিনচারজন সৌম্যদর্শন গুপ্তবেশ তীর্থযাত্রী বিশ্রাম করছে। তাদের গলায় স্ফটিকের মালা, কপালে ত্রিপুণ্ড্রক, মুখে হরিনাম।

যাত্রীদের দেখে তারা হাসিমুখে তাদের অভ্যর্থনা জানিয়ে সেই ছায়াচ্ছন্ন পথপ্রান্তে কিছুক্ষণ বিশ্রামের জন্যে আমন্ত্রণ জানাল।

বিশ্রামের পক্ষে স্থানটি মনোরম। যাত্রীরা পথশ্রমে ক্লান্ত। তাই তারা সে আহ্বান উপেক্ষা করতে পারল না। বসল সবাই। সাধুবাবাদের মুখে ভগবানের নাম শুনে তীর্থযাত্রীদের মন প্রসন্ন হল। সাধুবাবারা সত্যিই চমৎকার লোক। কী সুন্দর কথাবার্তা, কী মধুর ব্যবহার। যাত্রীরা সাধুবাবাদের নিজেদের দলে আপন করে নিলে।

তারপর আবার সুরু হল যাত্রা। সঙ্গে সাধুবাবারাও চলল।

সাধুবাবারা বড় ভাল লোক। নানাভাবে যাত্রীদের সাহায্য করছে।

এইভাবে সারাদিন কাটল।

সন্ধ্যার পর একটি সরাইখানার কাছে এসে তাদের যাত্রা স্থগিত হল। রাত্রিটা সেইখানেই অতিবাহিত হবে।

সরাইখানার বাইরের দিকে যে বড় ঘরখানা ছিল সেইটার মধ্যে যাত্রীরা ঢুকল। যে যার জায়গা ঠিক করে নিলে। তারপর আহারাদি সেরে শুয়ে পড়ল। সারাদিন ধরে বহু ক্রোশ পথ হেঁটে যাত্রীরা খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। তাই শয়নের সঙ্গে সঙ্গেই তারা গভীর নিদ্রায় অভিভূত হল।

ঝিমঝিম করছে নিঝুম গহন রাত।

হঠাৎ এ কী হল? যাত্রীদের ঘরে যেন ধস্তাধস্তি সুরু হয়ে গেল!

তাদের কোমরে আঁট করে বাঁধা টাকার থলি কারা যেন ছিনিয়ে নিচ্ছে, জিনিষপত্র তছনছ করে তাদের ভিতরকার মূল্যবান জিনিষগুলো কারা যেন অপহরণ করছে। কারা? ডাকাত! ডাকাত!

চিৎকার করবার আগেই তাদের মাথায় লাঠির ঘা পড়ছে। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটছে। যাত্রীরা সব বিহ্বল বিমূঢ় রক্তাক্ত ধরাশায়ী, তাদের মুখ দিয়ে আর কথা বেরুচ্ছে না। ভয়ে বিস্ময়ে তারা সব জড় স্তব্ধ হয়ে গেছে।

তাদের সামনে দাঁড়িয়ে চারজন ভীমকায় ডাকাত! তাদের লাল লাল চোখ দিয়ে যেন আগুন ঠিকরে বেরুচ্ছে। বীভৎস মুখে নিষ্ঠুর হিংসার ছায়া।

কী আশ্চর্য! এ যে সেই চারজন সাধুবাবা! এখন তাদের অন্য মূর্তি, অন্য বেশ!

চোখের পলকে যাত্রীদের সর্বস্ব লুণ্ঠন করে নিয়ে তারা অদৃশ্য হল।

* * *

ভারতবর্ষের ইতিহাসে মুসলমান রাজত্বের প্রথম যুগ থেকেই ঠগীদের অস্তিত্বের কথা জানা যায়। পুরুষানুক্রমে তারা ঠগীগিরি চালিয়ে এসেছিল বহু বছর।

আকবরের সময়ে তাঁর আরক্কীবাহিনীর কর্মকুশলতায় প্রায় পাঁচশ ঠগীকে ধরে ফাঁসিকাঠে লটকানো হয়েছিল। কিন্তু তাহলেও তাদের বংশ লোপ পায়নি।

কোম্পানীর আমলে ১৮১২ সালে ঠগীদের ব্যাপক অত্যাচারে বিচলিত হয়ে ইংরেজ সরকার হ্যালহেড্ নামে এক অবসরপ্রাপ্ত সেনানায়ককে ঠগী উচ্ছেদের কাজে সর্বশক্তি নিয়োগ করবার আদেশ দিলেন।

এটোয়া, সিন্ধৌর প্রভৃতি স্থানে অবস্থিত ঠগীদের বড় বড় ঘাঁটিগুলোর উপর প্রচণ্ড অভিযান চালিয়ে হ্যালহেড ঠগীদের ঘাঁটিগুলো বিধ্বস্ত করে ফেললেন। কিন্তু তারা নিশ্চিহ্ন হল না। ভারতের চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে তারা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে তাদের কাজ চালিয়ে যেতে লাগল।

রাজপুতানা এবং মধ্য ভারতের নানা জায়গায় ঠগীরা দলে দলে দেখতে দেখতে জড়ো হতে সুরু করল। বহু ধনী সওদাগর এক দেশ থেকে অন্য দেশে যাবার পথে প্রাণ হারালো, সরকারী রাজস্ববাহী শকট লুণ্ঠিত হল, আন্তঃপ্রাদেশিক টাকার লেনদেন বন্ধ হবার উপক্রম হল।

অবশেষে ১৮৩০ সাল নাগাদ ইংরেজ সরকার রীতিমত উচ্চ পর্যায়ের আলোচনার পর সারা-দেশব্যাপী এক ঠগী বিতাড়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন। সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রত্যেক প্রদেশের বিভিন্ন জেলায়, বিশেষ করে অরণ্য পর্বত বেষ্টিত এলাকাগুলিতে ঠগী প্রতিরোধ বাহিনী গড়ে তোলা হল।

দূর-পথযাত্রীদের সঙ্গে এইসব বাহিনীর সশস্ত্র কর্মীরা যাত্রীর ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়াতে লাগল এবং বহু ঠগীকে ধরা গ্রেপ্তার করল, না হয় একেবারে পরপারে পাঠিয়ে দিল।

সেই ব্যাপক অভিযানের সর্বাধিনায়ক ছিলেন কর্ণেল স্লীম্যান। মধ্যপ্রদেশের সাগর জেলায় ছিল তাঁর প্রধান কর্মকেন্দ্র। সেইখানে বসে, নানা কৌশল এবং কর্মধারা অবলম্বন করে তিনি দেশব্যাপী ঠগীদের বিরুদ্ধে বিশেষ দক্ষতার সঙ্গে অভিযান চালিয়েছিলেন এবং অল্প সময়ের মধ্যেই তাদের উচ্ছেদ করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

যাত্রী, পথিক এবং ধনী ব্যক্তিদের ছলনার দ্বারা ভুলিয়ে বনের ধারে নিজেদের সুবিধামত জায়গায় নিয়ে যাবার জন্যে ঠগীরা বহু সুন্দরী মেয়েদের কাজে লাগিয়েছিল। রাস্তার ধারে তারা ওৎ পেতে অপেক্ষা করত। শিকারের সাক্ষাৎ পেলেই তারা তাদের ছলাকলা মায়াকান্নায় ভুলিয়ে ঘুরে বনের ধারে নিরালায় নিয়ে যেত। সেখানে অপেক্ষা করত সেই দলের সর্দার আর তার অনুচরবৃন্দ।

কর্ণেল স্লীম্যান এই রকম প্রায় একশ সুন্দরী মেয়েকে নানা জায়গা থেকে গ্রেপ্তার করেছিলেন।

১৮৩৩ থেকে ১৮৩৭ সালের মধ্যে ইন্দোর, হায়দ্রাবাদ, সাগর এবং জব্বলপুর অঞ্চলে কর্ণেল স্লীম্যান ঠগীদের বিরুদ্ধে যে সুপরিকল্পিত এবং সুদক্ষ অভিযান চালিয়েছিলেন তার ফলেই ঠগী নামে এই দুর্ধর্ষ দস্যুদলের অত্যাচার বন্ধ হয়েছিল এবং ক্রমে তারা লোপ পেয়েছিল।

* * *

"এ মেয়ে শুধু কবিতাই লেখে,—সংসারে ওর উপযুক্ত স্বামী মেলা ভার।" —সকলের মনেই একথা জেগেছিল একদিন।

এলিজাবেথ ব্যারেট কিন্তু কবিতা ছাড়লেন না। কবি হিসাবে বেশ খ্যাতিও হোল তাঁর।

বিয়ের আশা ছেড়েই দিয়েছিল সকলে, এমন কি পরিবারের সব লোকই এ বিষয়ে এক রকম হতাশ হয়ে পড়েছিলেন।

হঠাৎ লোকে জানতে পারল দেশের একজন খুব বড় কবি এলিজাবেথকে বিয়ে করতে চান।

আশ্চর্য্য হলেন অনেকেই। এলিজাবেথ কিন্তু হাসিমুখেই বললেন—"জানি, আমাকে যদি বিয়ে করতে কেউ এগিয়ে আসেন ত একজন বড় মোহের কবিই আসবেন।"

রবার্ট ব্রাউনিং ও এলিজাবেথ ব্রাউনিং জগৎ বিখ্যাত কবি দম্পতি।

প্রেমেন্দ্র মিত্র

স্মৃতি দোলায়

এখানে প্রতিদিন সকালে উঠে বেশ এসব্যাঙ্কমেণ্ট পর্যন্ত একবার বেড়িয়ে আসি।

সেদিন ঘুমটা একটু আগেই ভেঙেছিল। সূর্য ওঠবার আগেই বেরিয়ে পড়তে পেরেছিলাম। যে এসব্যাঙ্কমেণ্ট পর্যন্ত গিয়ে রোজ ফিরে আসি তার চেয়ে দিয়ে সেদিন তাই নদীর ধার পর্যন্ত চলে গেছলাম।

নদী বলতে বেশীর ভাগই বিস্তীর্ণ বালুকা শয্যা। তারই ভেতর দুটি শাখায় ভাগ হয়ে দুটি অল্প ধারা মন্থর স্রোতে বইছে। একটি শাখাই তার মধ্যে একটু গভীর। অপরটি পার হতে পায়ের হাঁটুও ডোবে না। এপার থেকে ওপারের দূরত্ব কিন্তু কম নয়। বর্ষার দিনে এ নদী পাহাড়-ভাঙা জলের স্রোতে কি রূপ যে নেয় তা দুই পাড়ের এই ব্যবধান থেকেই কল্পনা করা যায়।

এখন শীতের শেষ। নদীটির তাই নিতান্ত দুখিনী চেহারা। বসন্ত ও গ্রীষ্মে আরো শুকিয়ে গিয়ে তারপর বর্ষা সমাগমে সে তার গৌরব ফিরে পাবে।

নদীর সে প্রলয়ঙ্করী মূর্তির একটা মহিমা নিশ্চয় আছে। আমার কিন্তু তার এই বিরহদীর্ণা রূপটিই ভালো লাগে। বেশ কিছুক্ষণ নদীর ধারে শুকনো বালির ওপর বসে রইলাম।

এ দিকটায় কাছাকাছি কোনো বসতি নেই। নদীর তীরে শুধু একটি প্রাচীন মন্দির বিশাল এক বটগাছের আচ্ছাদনে নিজেকে যেন গোপন করে রেখেছে।

মন্দিরটি পুরাতন কিন্তু অনাদরে পরিত্যক্ত নয়। আশপাশের অনেকখানি জায়গা বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে রাখা হয়েছে। মন্দিরে ঢোকবার রাস্তাটুকুর ধারে ধারে সযত্নে বেল, জোপাটি ও সূর্যমুখীর চারা লাগানো।

এরকম জায়গায় এই বিজন মন্দিরটি কোন্ দেবতার আর কে বা কারা সেটির এমন পরিচর্যা করে জানবার কৌতূহলে সে রাস্তা দিয়ে মন্দিরের প্রবেশদ্বার পর্যন্ত এগিয়ে গেলাম।

মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে তার বয়স অনুমান করবার চেষ্টা করছি এমন সময়ে পেছন থেকে সম্ভাষণ শুনলাম,—নমস্তে বাবুজি।

ফিরে তাকিয়ে দেখলাম অন্য দিকের আর একটি সঙ্কীর্ণ পথ দিয়ে নদীর পাড় থেকে প্রৌঢ় একজন ব্রাহ্মণ তাঁদার কোশাকুশি ও একটি কমণ্ডলু নিয়ে এগিয়ে আসছেন।

প্রতিনমস্কার জানিয়ে তাঁর জন্যে অপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে রইলাম।

প্রৌঢ় কাছে এসে স্মিতমুখে জিজ্ঞাসা করলেন মন্দিরের ভেতরে যাবার ইচ্ছে আছে কি না।

সে রকম কোন বাসনা ঠিক ছিল না। তবু প্রৌঢ় ব্রাহ্মণকে খুশি করবার জন্যেই জুতো খুলে তাঁর পিছু পিছু ভেতরে গিয়ে ঢুকলাম।

প্রৌঢ়ই যে পূজারী হিসাবে এ মন্দিরের তত্ত্বাবধান করেন তা অবশ্য আগেই বুঝেছি। মন্দিরের গায়ে লাগান একটি ছোট কুটীরে তিনি থাকেন। সকালে পূজার নৈবেদ্যপত্র যুগিয়ে মেজে আনতে নদীতে গেছলেন।

মন্দিরের দেবীমূর্তি কালিকার। এ অঞ্চলে কালিকার পূজা তেমন প্রচলিত বলে জানা ছিল না। দেবীকে প্রণাম জানিয়ে সেই বিষয়েই প্রৌঢ়কে দু-একটা প্রশ্ন করলাম।

প্রৌঢ় সে বিষয়ে বিশেষ কিছু জানেন বলে মনে হ'ল না। পুরাতন দেবস্থান সম্বন্ধে যে কোন কাল্পনিক কিংবদন্তী সাধারণতঃ প্রচলিত থাকে তেমনি একটি কাহিনী আমায় সংক্ষেপে শোনালেন। সে কাহিনীর আসল প্রতিপাদ্য বিষয় হ'ল এই যে উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের কোন এক প্রাচীন রাজ্যে দেবী পূর্বে অধিষ্ঠিতা ছিলেন। সেখানকার রাজার কোনো এক অপরাধে কুপিতা হয়ে এক অমাবস্যার রাত্রে দেবী এই নির্জন নদীতীরে এসে আত্মগোপন করেন। অনুতপ্ত রাজা ও তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর বংশধরেরা অনেকদিন পর্যন্ত সারা দেশময় নাকি দেবীকে সন্ধান করে ফেরে। দেবী কিন্তু তখন এই প্রাচীন ঘট যেখানি থেকে উঠেছে সেই গভীর মাটির তলায় নিজেকে লুকিয়ে রেখেছিলেন। সেই রাজবংশ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার পর দেবীর সেখানকার পুরোহিত-বংশের একজন স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে দেবীকে এখানে পুনরাবিষ্কার করে। সেই থেকে দেবী এই নির্জনতাতেই বিরাজ করছেন। দেবী অত্যন্ত জাগ্রতা। ভক্তিভরে পূজা দিলে মনস্কামনা পূর্ণ না হয়ে যায় না। দেশবিদেশের বহু কৃতজ্ঞ রাজা মহারাজা ধনকুবের নাকি দেবীর জন্যে সুবিশাল মন্দির গড়ে দিতে চেয়েছেন, চেয়েছেন তাতে স্বর্ণচূড়া লাগাতে। কিন্তু দেবীর অলঙ্ঘ্য আদেশ এই যে তাঁকে নিয়ে কোন আড়ম্বর কেউ যেন না করে। তিনি এই নির্জনে নিতান্ত সাধারণ ভাবেই থাকতে চান। তাঁর সত্যিকার ভক্ত তাঁকে নিজের গরজে খুঁজে বার করবে এই তাঁর ইচ্ছা।

দেবী মাহাত্ম্যের এ সব মামুলী গল্প এক কান দিয়ে ঢুকে আর এক কান দিয়েই বেরিয়ে যেত। কিন্তু পূজারী শেষ কালে যা বললেন, তাইতেই কথাগুলো দামী হয়ে উঠল।

পূজারী আমার কাছে দেবীর অলৌকিকতা প্রমাণ করবার জন্যে বললেন, জানেন বাবুজি! আজ রাত্রেই দেবীর কাছে মানৎ করে একজন খুব খরচ করে পুজো দিচ্ছেন। আপনার মত তিনি বাঙালী। তবে উত্তর মুলুকের লোক। পূর্ব জন্মের পুণ্য ছিল তাই ভাগ্য তাঁকে কোন মুলুক থেকে কোথায় টেনে এনে দেবীর দেখা পাইয়ে দিয়েছে।

বাঙালী ও উত্তর মুলুক শুনেই কৌতূহলী হয়ে উঠেছিলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, এ বাঙালী বাবু থাকেন কোথায়?

এই ত কাছেই হাজিপুরে যাবার সড়কের ধারে লাল উদয় চাঁদের বাগিচা বাড়ি ভাড়া নিয়ে আছেন।—জানালেন পূজারী।

সবিস্ময়ে এবার জিজ্ঞাসা করলাম,—তিনি নিজে পূজা দিতে আসছেন?

না বাবুজি! তিনি একটু বেমারী মানুষ! এ ত সারারাতের পুজো। তাই তিনি নিজে আসতে পারবেন না। তাঁকে যিনি দেখা শোনা করেন তাঁর সেই জানিকা চম্পা দেবীই তাঁর হয়ে উপস্থিত থাকবেন।

মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর প্রতি যথাবিহিত ভক্তি দেখিয়ে তারপর চলে এলাম। ব্যাপারটা এমন কিছু অস্বাভাবিক না হলেও মনের মধ্যে কেমন একটা সংশয় কিন্তু জাগিয়ে রাখল।

বাসায় যখন ফিরলাম তখনও এমন কিছু বেলা হয় নি। নিখিল এখনো বিছানা ছেড়ে ওঠে নি জানি। এ বাসার কাজকর্ম যে করে সেই দুখনরাম সাইকেল নিয়ে শহরের কাছের বাজারে সবে যাচ্ছে। আমায় ফিরতে দেখে সাইকেলটা থামিয়ে গেটের ধারে হেলান দিয়ে রেখে কুণ্ঠিতভাবে জানালে যে আমায় ফিরতে দেরী দেখে ভেবেছিল আমিও বুঝি ছোটা মাইজির সঙ্গে হাজিপুরে গেছি। তাই আমার সকালের খাবারের ব্যবস্থা না করেই বাজারে যাচ্ছিল। সে এখুনি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছে।

তাকে বাধা দিয়ে একটু অবাক হয়েই জিজ্ঞাসা করলাম।—তোমার ছোট মাইজি কখন হাজিপুরে গেছে।

তা খুব সবেরে হজুর,—জানালে দুখন। দুখনই টাকা বলে রেখে দিয়েছিল কাল রাত্রে। ভোরে সে যখন গোয়ালার কাছে দুধ আনতে গিয়েছিল তখনই তার মাইজি বোধহয় বেরিয়ে গেছেন। দুধ এনে ফিরে আমাদের দুজনকেই দেখতে না পেয়ে আমিও সঙ্গে গিয়েছি ভেবে নিয়েছে।

দুখন আমার খাবার ব্যবস্থা করবার জন্যেই ভেতরে যাচ্ছিল। নিজেই সে ব্যবস্থা করে নেব বলে তাকে নিরস্ত করে বাজারে পাঠিয়ে দিলাম।

সত্যিই বেশ একটা উত্তেজনা অনুভব করছিলাম। এতদিন বাদে একটা সুযোগ মিলেছে রহস্য যবনিকা একটু তুলে ধরবার।

কিন্তু সে সুযোগ কি সত্যিই পাবো। চম্পা কি কাজে হাজিপুরে গেছে জানি না। কিন্তু ফিরতে তার কতক্ষণ হবে? তার আগেই নিখিলের সঙ্গে নিভৃতে মিনিট দুটো কথা বলবার অবসর কি মিলবে!

নদীর তীরের মন্দিরে অতক্ষণ সময় নষ্ট করার জন্যে আফসোস হচ্ছিল। আর একটু আগে ফিরলে সময়টা একটু বেশী পাওয়া যেত।

নিখিল অবশ্য তখনও থাকত ঘুমিয়ে। তাকে জাগাতে হত নিজের গরজে। এখনও অবশ্য তাই করতে হবে।

অসুস্থ দুর্বল মানুষ বলে মনে একটু দ্বিধা হয়। এখনও হ'ল। কিন্তু সে দ্বিধা অগ্রাহ্য করে নিখিলের ঘরের দিকে এগিয়ে গেলাম।

ভেতরের একটা বেশ বড় বাঁধানো উঠোন ঘিরে সামনে ও দুপাশে সব শুদ্ধ পাঁচটি বড় বড় ঘর। সামনেরটা হলঘর গোছের। নানা উদয় চাঁদ এখানকার অত্যন্ত ধনেশী জমিদার ছিলেন বলে জেনেছি। তাঁর পয়সা ছিল যেমন, রুচি ও সখও ছিল তেমনি। এই বাসিচা বাড়িটিতেও তার কিছু পরিচয় আছে। হলঘরের নানা আসবাবপত্র ও দেওয়ালের সরঞ্জামে তাঁর রুচিটা বোঝা যায়। সেকালের ইংরেজ ঘেঁষা বড়লোকের রুচি কিন্তু বিদেশী বলেই যা কিছু নির্বিচারে সাহেবে জড় করেন নি। হলঘরের পর উঠোন ঘিরে দুপাশে দুটি করে শোবার ঘর। একদিকের পাশাপাশি দুটি ঘরে নিখিল ও চম্পা থাকে। অন্য দিকের একটি এখন আমার জন্যে নির্দিষ্ট। বাকি শোবার ঘরটি এখন এ বাড়ির বাড়তি জিনিষপত্র ভরে তালা দিয়ে রাখা আছে। মাঝখানের প্রশস্ত উঠোনটা গ্রীষ্মকালের রাত্রে শোওয়ার পক্ষে উপাদেয়। এই প্রচণ্ড গরমের দেশে সেটা একান্ত প্রয়োজন।

নানা উদয় চাঁদ অনেকদিন আগে মারা গেছেন। তাঁর জমিদারীও নতুন রাজত্বে লোপ পেয়েছে। তাঁর বংশধরদের অবস্থা পড়ে গেছে বলেই তারা এ বাসিচা-বাড়ি বাধ্য হয়ে ভাড়া দিয়েছে।

নিখিলের মত খেয়ালী মানুষ না হলে এই নির্জনে এ বাড়ি ভাড়া নেবার মত মানুষও সহজে খোঁজের মিলত না।

হলঘরের ভেতর দিয়ে ওদিকের বারান্দা ঘুরে নিখিলের ঘরের দরজার সামনে এসে দাঁড়ালাম।

একটু দ্বিধা তখনও মনে ছিল না এমন নয়। নিখিলকে হয়ত জোর করে জাগিয়ে তুলতে হবে না। বিছানা না ছাড়লেও এতক্ষণে হয়ত সে জেগেই শুয়ে আছে। বেলার তাগিদ সে তাই থাকে বলে জেনেছি।

এরকম সকালে তার ঘরে এ ক'দিনের মধ্যে কখনো নিজে থেকে ঢুকিনি। বাইরের বারান্দায় পাতা আরাম কেদারায় বসে বসেই সকাল বেলাটা আমার কেটেছে। চম্পা দু একবার আসা যাওয়া করলেও নিখিল বেশ বেলায় ছাড়া কোন দিন সেখানে এসে বসে নি। নিখিলের সঙ্গে সঙ্গে চম্পাও এসে বসেছে প্রত্যেকবার। ব্যবহারে প্রকাশ না পেলেও সেটা নিখিলকে আগলে রাখবার চেষ্টা বলেই সন্দেহ হয়েছে।

আজ চম্পার অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে নিখিলের শোবার ঘরে গিয়ে চড়াও হওয়াটা, তাই এক হিসেবে মোটেই অন্যায় নয়। বন্ধুর সম্বন্ধে যে দায়িত্ব আছে তার জন্যেই এটা বরং করণীয়। তবু মনের ভেতরকার খটকাটা যেন থেকেই যায়। শুধু বন্ধুত্বের খাতিরে না নিজের মনের অদম্য কৌতূহলে এ কাজ করতে যাচ্ছি সে বিষয়ে নিজের মন যদি সম্পূর্ণ নিঃসংশয় হ'ত!

নিখিলের কাছে প্রসঙ্গটা কি ভাবে তুলব সেটাও তখনও ভেবে পাইনি।

হঠাৎ সকালের মন্দিরের কথাটা স্মরণ ক'রে একটা রাস্তা যেন পেয়ে গেলাম।

নিখিলের ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ নয়। শুধু ভেজানো।

আস্তে দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে যা অনুমান করেছিলাম তাই দেখলাম। নিখিলের ঘুম ভেঙেছে, কিন্তু বিছানা থেকে ওঠে নি। মাথার দিকে দুটো বালিশ হেলান দিয়ে অর্ধশায়িত অবস্থায় হাতের দিকে যেন শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে আছে।

আমি ঘরে ঢোকবার পরও তার চটকা ভাঙল না। একেবারে তার বিছানার কাছে গিয়ে দাঁড়াবার পর হঠাৎ যেন চমকে সন্ত্রস্ত ভাবে বলে উঠল,—কে?

পর মুহূর্তেই আমায় চিনতে পেরে একটু যেন লজ্জিত হয়ে বললে,—কখন এসেছ দেখতে পাইনি ভাই। তুমি ত' এ ঘরে কখনো আসো না।

না, তুমি অসুস্থ মানুষ জেনে সকালে তোমায় বিরক্ত করি না।—আলাপের একটা সূত্র পেয়ে আমি যেন বেঁচে গেলাম,—আজ চম্পা বৌদি বাড়িতে নেই শুনে দেখতে এলাম তুমি উঠেছ কি না?

নিখিল একটু বিস্মিতভাবে আমার দিকে চেয়ে বললে,—চম্পা বাড়িতে নেই?

বিছানার ধারেই একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে যথাসম্ভব সহজভাবে বললাম,—না, তোর বেলাতেই টাকা ভাঙিয়ে হাজিপুরে গেছে বলে শুনলাম। তুমি জানতে না?

আমি!—নিখিল একটু যেন অস্বস্তির সঙ্গে বললে, হ্যাঁ, কাল যেন কি বলেছিল মনে হচ্ছে। আমার আবার আজকাল কিছু মনে থাকে না।

আজ রাত্রের পূজার জন্যেই কিছু কিনতে কাটতে গেছে বোধ হয়।—বলে একটু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতেই নিখিলের দিকে চাইলাম।

বাসিশের হেলান ছেড়ে নিখিল সোজা হয়ে উঠে বসল হঠাৎ। তার মুখে একটা বিমূঢ় বিস্ময়ের ছায়া আর অস্পষ্ট নয়।

বেশ একটু উদ্বিগ্ন স্বরেই জিজ্ঞাসা করলে,—কি পুজো?

ওই ত নদীর ধারে যে কালিকার মন্দির আছে, সেখানে আজ রাত্রে তুমি পুজো দেওয়াচ্ছ না?—

গলাটা আমি যথাসম্ভব স্বাভাবিক রাখলাম,—মন্দিরের পূজারীর কাছেই ত খানিক আগে শুনে এলাম।

আমি! আমি! নিখিল যেন কি বলতে গিয়ে থেমে গেল। তার ফ্যাকাশে মুখের কাতরতা দেখে অত্যন্ত খারাপ লাগছিল। একবার মনে হ'ল কৌতূহল আমার যত প্রচণ্ডই হোক নিখিলের জীবনের রহস্য উদ্ঘাটন করতে এ রকম যন্ত্রণা তাকে দেব না। কিন্তু নিজেকে সংবরণ করতে পারলাম না।

বললাম,—তুমি তাহলে পুজো দিতে বলো নি! আমিই তাহলে হয়ত ভুল শুনেছি, কিংবা পূজারীও চম্পা দেবীর কথা ভুল বুঝে থাকতে পারে।

নিখিল ইতিমধ্যে নিজেকে কিছুটা সামলে নিয়েছে মনে হ'ল। ম্লান ভাবে একটু হেসে বললে ভুলই বুঝুক আর ঠিকই বুঝুক এমন কিছু মাথা খাবারার মত ব্যাপার নয়। চম্পা হয়ত আমার হয়েই পুজো দেবার ব্যবস্থা করেছে। যেখানে সেখানে পুজো দেওয়া ওর এক বাতিক। আমি ঠাট্টা করি বলে আমার বলাও দরকার বোধ করেনি।

নিখিলের মিথ্যে কথাটা সহজে আসে না। আসত না আমাদের সেই কলেজে পড়ার সময়েও। সহজ হবার চেষ্টা সত্ত্বেও তার মুখের ম্লান হাসিটা কথার মাঝখানেই মিলিয়ে গিয়ে কেমন একটা অস্বস্তি ফুটে উঠল সমস্ত ঘরে। পুজো দেওয়ার ব্যাপারটা যে তাকে বেশ একটু বিচলিত করেছে তা ভালো করেই বুঝলাম। কারণটা জানবার জন্যে উদ্গ্রীব হলেও প্রসঙ্গটা তখনকার মত একটু বদলাতে হ'ল।

তার ব্যাখ্যাটা যেন অনায়াসেই মেনে নিয়েছি, ও ব্যাপারটা যেন সত্যিই মাথা খারাবার মত নয় এই ভাব দেখিয়ে হঠাৎ যেন কথাটা মনে পড়ার ভাণ করে বললাম,—তোমার সেই প্রথম চিঠিতে যা লিখেছিলে তা কিন্তু এখনো আলোচনার সময়ই একদিন হ'ল না। তুমি কি বলতে চেয়েছিলে আমি ভালো করে বুঝতেই পারিনি।

কথাটা শুনেও নিখিল যেভাবে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে চুপ করে রইল তাতে কোন উত্তরই সে দিতে চায় না বলে প্রথম মনে হ'ল। তারপর বেশ কিছুক্ষণ বাদে সে ধীরে ধীরে বললে,—তোমার সব কথা বলবার জন্যেই এখানে এবার ডেকেছিলাম ভাই। কিন্তু বলতে গিয়ে কেবলি একটা ভয়ে এ ক'দিন পিছিয়ে গেছি। প্রথমতঃ গুছিয়ে সব কথা আমি বলতে পারব না। দ্বিতীয়তঃ আমার কথা শুনলে তুমিও হয়ত ভুল বুঝবে ওই ডাক্তারদের মত।

ডাক্তাররা তোমায় ভুল বুঝেছেন বলছ কেন? তাঁদের পরামর্শ শোনবার জন্যে, তুমি অপেক্ষাও করো নি। তা সত্ত্বেও তাঁদের চিকিৎসাতে তোমার কিছু উপকার যে হয়েছে তা'ত অস্বীকার করবার নয়। নার্সিংহোমে যে অবস্থায় তোমাকে দেখেছিলাম,—

আমার কথার মাঝখানেই বেশ একটু উত্তেজনার সঙ্গে বাধা দিয়ে নিখিল বললে, সে অবস্থা

আরো নবীন হ'ত চম্পা যদি জোর করে আমায় নিয়ে চলে না আসত। যেটুকু উন্নতি আমার হয়েছে তা ডাক্তারদের চিকিৎসায় কি ওষুধে নয়, শুধু চম্পার চেষ্টায়।

খোঁচা দেওয়া কথাটা যেন আপনা থেকেই মুখ থেকে বেরিয়ে গেল,—তাই যদি হয়, কলকাতায় নার্সিং হোমে আসবার আগেও চম্পাদেবী সে চেষ্টা করতে পারতেন না কি! তিনিই ত তোমার দেখাশোনা করেন বলে বুঝেছি।

নিখিল কতখানি ক্ষুণ্ণ হ'ল ঠিক বুঝতে পারলাম না। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে উত্তর যা দিলে তাতে বিষাদের সুর। বললে,—সমস্ত ব্যাপারটা ভুল বোঝা তোমার পক্ষে খুব স্বাভাবিক। সব কথা শুনলেও বুঝতে পারবে না এই আমার ভয়!

তবু সব কথা শুনতেই চাই। যে বিশ্বাসে ঠিকানা না জেনেই একদিন আমার আষাঢ়ে চিঠি দিয়ে ছিলে তা কি আর তোমার মনে নেই!

আছে! আছে! সত্যিই আছে।—নিখিলের স্বরে কাতরতা ফুটে উঠল। কিন্তু আমায় আর দু'একটা দিন সময় দাও ভাই। নিজের সম্বন্ধেই আমি যেন কি একটা আবিষ্কারের মোহনায় এসে দাঁড়িয়েছি বলে মনে হচ্ছে। পুরানো কথা বলতে গিয়ে এই সময়টায় নিজেকে বিচলিত করতে চাই না।

একটু থেমে নিখিল একটু কুণ্ঠিত ভাবে আবার বললে,—তোমার অবশ্য এখানে খুব একঘেয়ে লাগছে বুঝতে পারছি। আর কয়েকটা দিন কি থাকতে পারো না?

কেন পারব না!—নিখিলকে হেসে আশ্বস্ত করে বললাম,—যতদিন বলো ততদিন থাকব। এমন নিশ্চিন্ত একঘেয়েমির সুযোগ কি সহজে মেলে!

নিখিলের কাছে তখনকার মত বিদায় নিয়ে বেরিয়ে আসার পথেই বারান্দায় চম্পার সঙ্গে দেখা।

আমায় নিখিলের ঘর থেকে বার হ'তে দেখে একটু যেন চমকে দাঁড়িয়ে পড়লেও পরের মুহূর্তে নিতান্ত স্বাভাবিক প্রসন্ন স্বরে চম্পা বললে,—নবীর বাবের মন্দিরে আজ রাত্রে পুজোর আয়োজন করেছি। যাবেন দেখতে?

কোথায় কোন মন্দিরে তার পূজা জিজ্ঞাসা করে অজ্ঞতার ভাণ করবার কথা ক্ষণেকের জন্যে মনে হয়েছিল। হাজিপুর থেকে ফেরবার পথে চম্পা সম্ভবতঃ মন্দির থেকেই ঘুরে এসেছে সন্দেহ করে সে ভাণ আর করলাম না। চম্পার অনুরোধে বেশ একটু বিস্মিত হলেও তাতে তৎক্ষণাৎ সম্মতি জানিয়ে বললাম, যাবো।

কেনই বা চম্পা হঠাৎ এ অনুরোধ করল, আর আমার কাছে এই উত্তরই সে আশা করেছিল কি না, সারা সকাল বাইরের বারান্দার আরাম কেদারায় বসে বৃথাই ভেবে মরলাম।

[ক্রমশঃ

চিত্র বিচিত্র

মৃত্যুঞ্জয় ভরদ্বাজ

শ্রেষ্ঠ দান

ইতালীর অভ্যন্তরে একটি গণ্ডগ্রাম।

গ্রামের নাম মাস্‌কাদিকো।

বিংশ শতাব্দীর অত্যুগ্র সভ্যতার চোখ ধাঁধানো আলো সেখানে এখনো পুরোপুরী প্রবেশ করেনি। দেবতাদের সম্বন্ধে এখনো সেখানকার মানুষের মনে নানা অন্ধবিশ্বাস আছে। সেই অখ্যাত গ্রামের মানুষগুলো এখনো ধর্মকে ভয় করে। মিথ্যা দিয়ে পৃথিবীকে জয় করতে চায় না।

সেই গ্রামের দেবতা সেন্ট গন্‌সেল্‌ভো।

ভারী জাগ্রত দেবতা।

প্রবাদ আছে, পুরাকালে এই দেবতার কৃপায় এক নৃশংস শত্রুর সর্বনাশা অত্যাচার থেকে এই গ্রাম আশ্চর্য উপায়ে রক্ষা পেয়েছিল। সেন্ট গন্‌সেল্‌ভো নাকি প্রতিরাত্রে নিঝুম নিস্তব্ধ গ্রাম যখন গভীর ঘুমে অভিভূত তখন গির্জা থেকে বেরিয়ে গ্রামটি পরিক্রমা করেন। বহিঃশত্রু আর চোর-ডাকাত তাই এই গ্রামের ত্রিসীমানায় কোনদিন ঘেঁষতে পায় না।

সেই দেবতার বার্ষিক মহোৎসব।

খবরের কাগজে তার রিপোর্ট বড় বড় হরফে বেরোয় না। দুর্ঘটনকারীরা সেখানে ভীড় করে না। উৎসবস্থলে সমবেত হয় আশপাশ গ্রামের পড়শিরা আর গ্রামের নরনারী নির্বিশেষে সবাই।

সেন্ট গন্‌সেলভোর গির্জার চারিদিকে বসে মেলা। রঙীন বেলুন, ভেঁপু, কাঠের ঘোড়া, ঝুলুরি ভাজা, নাগর দোলা!

গ্রামের মাঝখানে একটি মাঠে এক মণ্ডপ তৈরী হয়েছে। উৎসবের দিন ভোরে গির্জা থেকে গন্‌সেলভোর মূর্তিকে সেই মণ্ডপে নিয়ে যাওয়া হবে। সারাদিন সেখানে চলবে পূজা অর্চনা নাচ গান। সন্ধ্যায় তিনি ফিরে আসবেন গির্জার স্থানে। প্রতি বছর এই ভাবে উৎসব হয়। স্মরণাতীত কাল থেকে এই উৎসব চলে আসছে।

সেন্ট গন্‌সেলভোর মূর্তিটি বিরাট। আস্তাগোড়া পাথরের। তার ওজন যে কত তা নির্ণয় করা হয় নি কোনদিন।

সেই প্রকাণ্ড ভারী মূর্তিকে বহন করে নিয়ে যাওয়া সহজ কাজ নয়। পথও অনেকখানি।

গ্রামের আটজন সবচেয়ে বলশালী বীরের উপর অর্পিত হয়েছে বহন করার সেই গুরু দায়িত্ব।

সেন্ট গন্‌সেলভোর বাহক হওয়া এক দুর্লভ সম্মান। এর চেয়ে বড় গৌরব জীবনে আর নেই।

তাই প্রতি বছর এই নিয়ে প্রতিযোগিতা চলে। যে আটজন নির্বাচিত হয়, উৎসবের শেষ দিনে সারা গ্রামের লোক তাদের সম্বর্ধনা জানায়, নানা জিনিস উপহার দেয়, ভূরিভোজে আপ্যায়িত করে।

• • • •

গির্জার সামনে প্রকাণ্ড শোভাযাত্রা অপেক্ষা করছে। বাজনা বাজছে। কোলাহল আর উত্তেজনার অবধি নেই।

"সর সব। রাস্তা দাও। বাহকরা আসছে।"

উত্তেজিত জনতা সরে দাঁড়ালো। তাদের মাঝখান দিয়ে আটজন বাহক ধীর পদক্ষেপে গির্জার দিকে এগিয়ে চলেছে। তাদের সুসজ্জিত বলিষ্ঠ শরীরের দিকে সকলের প্রশংসমান দৃষ্টি পড়ছে। খর তাদের চোখের দৃষ্টি, মুখে প্রশান্ত হাসির রেখা। সারা অবয়বে শক্তি বিচ্ছুরিত হচ্ছে।

প্রধান পুরোহিত হাঁক দিলেন—"সব প্রস্তুত। এগিয়ে এসো তোমরা।"

শান্ত পদক্ষেপে বাহক আটজন মর্মরমূর্তির সামনে এগিয়ে গেল। পুরোহিত তাদের মাথায় পাপ্পিজল ছিটিয়ে দিলেন। বাজনা বেজে উঠল জোরে।

চারিদিকে তুমুল জয়ধ্বনি—"জয় সেণ্ট সনসেলভোর জয়।"

বাহকদের মধ্যে একজনের নাম উমালিয়ো। এ বছর সে-ই বাহকদলের নায়ক নির্বাচিত হয়েছে। সামনের সারিতে দক্ষিণ দিকে তার স্থান।

"ওঠাও।" আদেশ দিলেন পুরোহিত।

"ওঠাও।" হাঁক দিল উমালিয়ো।

অস্ফুট শব্দ করে বাহক আটজন মূর্তির-তলার-বাঁধা কাঠের তক্তার আটদিক ধরে মূর্তিকে কাঁধে তোলবার চেষ্টায় নিয়োজিত হল।

পাহাড়ের তার নিচে দেবমূর্তি অনড় স্তব্ধ হয়ে আছে।

উমালিয়ো হাঁক দিলো—"আরও জোরে ভাই সব। মারো টোরান হেইও! জয় সেণ্ট সনসেলভো।"

"উঠেছে। উঠেছে।" গর্জন উঠল চারিদিকে। "দেবতা উঠেছে।"

অকস্মাৎ কী যেন হল! কারুর পা বুঝি পিছলে গেল।

"সাবাশ, সাবাশ।"

"গেল, গেল। ভগবান রক্ষা কর, ভগবান রক্ষা কর।"

"সর্বনাশ, সর সব।"

মূর্তি হেলে পড়েছে। সাবধান। গেল বুঝি সব।

উমালিয়োর ঠিক পিছন দিকে যে দুজন বাহক ছিল তারা তার সায়েস্তাতে না পেরে কিছুটা কাৎ হয়ে পড়েছে, তাই এই বিপর্যয়।

উমালিয়ো প্রাণপণে চিৎকার করে উঠল—"সামাল।"

কিন্তু ততক্ষণে মূর্তি হেলে পড়েছে উমালিয়োর দিকে। দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে উমালিয়ো মূর্তিকে ধরে রেখেছে। তার সারা শরীর যেন লোহার মতো কঠিন হয়ে উঠেছে। শিরাগুলো ফুলে উঠেছে—সেগুলোও যেন লোহায় পরিণত হয়েছে।

বিস্ময় স্তব্ধতায় কয়েক মুহূর্ত কেটে গেল। তারপর ওধার থেকে ছুটে এলো প্রয়োজনে-সাহায্যকারী বাহকের দল। দু'তিনজন এসে উমালিদোর দিকে দাঁড়াল। দু'জন দাঁড়ালো তার পিছনে।

মূর্তি আবার সোজা হয়ে বসল।

পুরোহিত হাঁক দিলেন—"ওঠাও। আর দেরী করো না। লগ্ন বয়ে যায়।"

কিন্তু একী! উমালিদোর এ কী অবস্থা!!

মূর্তিকে বয়ে রাখতে গিয়ে তার ডান হাতখানা মূর্তির নীচে চেপে গেছে। উমালিদোর শরীর ধনুকের মতো বেঁকে রয়েছে। কিন্তু তার মুখে এক ফোঁটা কাতরোক্তি নেই।

বাহকরা হায় হায় করে উঠল।

উমালিদো বললে—"ভাই সব। লগ্ন বয়ে যায়। আমি পারলাম না। আমার জায়গায় তোমরা এসো।"

একজন এসে তার জায়গায় দাঁড়ালো। যন্ত্রণায় উমালিদো তখন ছটফট করছে। তোল মূর্তি। উমালিদোকে তার নিষ্পিষ্ট হাতখানা বার করতে দাও।

"জয় সেণ্ট গণসেলভো।"

মূর্তি উঠল। বাইরের কেউ কিছু জানতে পারলো না। বাজনা বাজতে লাগলো আরও জোরে। অনন্তার কোলাহলে আকাশ প্রকম্পিত হল।

—"ইস! হাতের কব্জি পর্যন্ত যে একেবারে চেপ্টে গেছে।" একজন বাহক বললে।

যন্ত্রণাকাতর মুখে উমালিদো নিজের হাতখানা দেখতে লাগল।

তারপর মুখ তুলে তাকালো দেবতার দিকে।

মূর্তির চোখেও কী জল!

উমালিদো বললে,—"ঠাকুর! এ বছর তোমায় নিয়ে যেতে পারলাম না। আর কোনদিন পারবোও না। অনেকদিন তোমার পায়ে কিছু অর্ঘ্য নিবেদন করব ভেবেছি, আজ নাও!"

এই বলে উমালিদো কোমর থেকে শাণিত ছুরিকা বার করলে। রক্তাক্ত নিষ্পেষিত ডান হাতখানা রাখলে বেদীর পাথরের ওপর। তারপর বাঁ হাত দিয়ে ডান হাতের কব্জির উপর ছুরি চালালে। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটল। দেখতে দেখতে দু'টুকরো হয়ে গেল হাতখানা।

কিছুক্ষণ যন্ত্রণায় চোখ বুজে রইল উমালিদো। তারপর সেই ছিন্ন হাতের অংশটুকু দেবতার পায়ের কাছে রেখে বললে,—"এই আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য আজ তোমায় নিবেদন করলাম। তুমি গ্রহণ কর।"

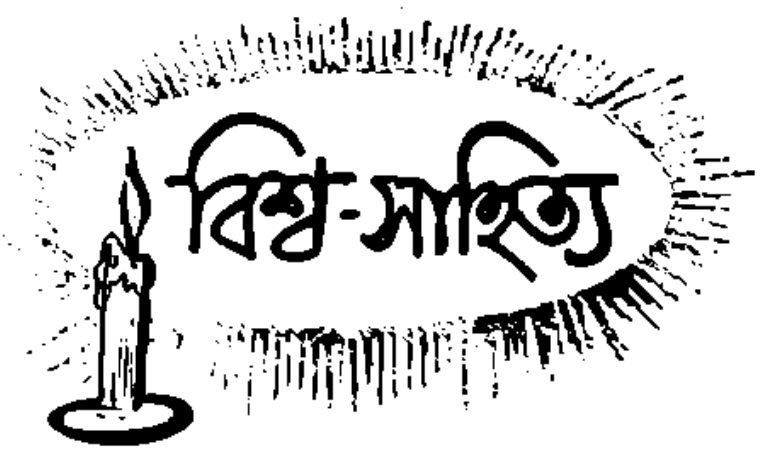

আডালবের্ট স্টিফটের

গৌরীশংকর দে

"এখনো এখানে এক সুন্দরের জন্ম হ'য়ে গেছে," আডালবের্ট স্টিফটের-এর রচনা সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন নীটশে। স্টিফটের-এর জন্ম ১৮০৫ সালে। দক্ষিণ বোহেমিয়ার ওবেরপ্লান নামে একটা জায়গায়। লিনেনের কাপড় বুনে সংসার চালাতেন তাঁর বাবা। প্রকৃতি-বিজ্ঞান বিভিন্ন শাখা, গণিত, আর চারুকলা সংক্রান্ত বিষয়ে পড়াশুনো করেছিলেন স্টিফটের। অভিজাত পরিবারগুলিতে গৃহ-শিক্ষকতার কাজ জীবিকা হিসেবে নিয়েছিলেন কিছুকাল। উত্তর অস্ট্রিয়ার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরিদর্শকের পদ পেয়েছিলেন বেশ কিছুদিন পরে। দুরারোগ্য ব্যাধির যন্ত্রণা সইতে না পেরে স্টিফটের আত্মহত্যা করেন ১৮৬৮ সালে। 'ডের নাকসোম্মের' ('গ্রীষ্ম যামিনী') আর 'হিটিকো' নামে দু'খানি মহৎ উপন্যাস ছাড়াও তিনি লিখে গেছেন বেশ কয়েকটি দীর্ঘ ছোটগল্প। বৃক্ষ-চিত্র এঁকেও বেশ সুনাম অর্জন ক'রেছেন স্টিফটের। এক অর্থে, তিনি জার্মানীর বিষয়বাদী বা ইমপ্রেশনিষ্ট শিল্পীদের পূর্বসূরী।

স্টিফটের ছিলেন প্রকৃতির রূপ-পিয়াসী। তাঁর রচনায় জীবন্ত হ'য়ে উঠেছে জার্মানী, হাঙ্গারী আর ইটালীর নিসর্গ-সৌন্দর্য। তাঁর গল্পের চরিত্রগুলি ফুলের সরলতায় মণ্ডিত; তাঁর রচিত পৃথিবী স্নিগ্ধ। তাঁর রচনায় লক্ষ্য করা যায় নির্জনতা প্রয়াস, অকারণ বিষণ্ণতা। পরে অস্ট্রিয়ার অনেক লেখকের রচনাতেই তাঁর এই বিষাদ সঞ্চারিত হয়েছিল। স্টিফটের-এর সাহিত্যে নর-নারীর প্রেম হ'য়ে উঠেছে গানের মতো, স্তবের মতো।

প্রকৃতির বর্ণনা যে নিজেই প্রকৃতির স্তব হ'য়ে উঠতে পারে স্টিফটের রচিত ছোট উপন্যাস 'রিগিটা' না পড়লে তা অনুমান করা দুঃসাধ্য। উপন্যাসটির অনেক অংশ পড়তে—পড়তে মনে হয় যেন একজন কবির গদ্যে লেখা কবিতা পড়ছি। সাধারণ পরিচিত পৃথিবীর ওপর এসে পড়েছে অজানা আলোক। উষর সীমাহীন প্রান্তর। বাতাসে ভেসে আসছে ঘোড়ার গন্ধ। বিস্তীর্ণ নির্জনতা। সন্ধ্যাকাশে কিরণ দিয়ে যাচ্ছে সূর্য আর তার আলোতে অবিরাম ঝিকমিক করছে ঘাস। ছোটো-বড়ো নদী। ঘন সোমে ঢাকা কুহুর সঙ্গে মিশে মাঠে ঘুরে বেড়াচ্ছে পশু-পালকেরা। ঘুরে ঝিকমিক করছে ঘোড়ার সহিসদের শাদা কোট। সারাদিন চকল ঘোড়ের রক্তাভ—নীল কম্পন। অসংখ্য ঘোড় চ'রে বেড়াচ্ছে অপরূপ শ্বেত বিন্দুর মতো। পায়ের তলায় মাটি কালো আর উর্বর। সেখানে জন্মাচ্ছে সবুজ উদ্ভাস গাছপালা। পাহাড়ের ধার পর্যন্ত চ'লে গেছে আঙুরের ক্ষেত। বন-বাগড়ার ঢেকে আছে যতো

সব জলাভূমি। আর সব কিছুকে ছবির ফ্রেমের মতো ঘিরে আছে দূরের সারি সারি নীল পাহাড়। তাদা-চোরা গ্রামগুলির গায়ে অদ্ভুত রক্তাভা। সমতলের যেন শেষ নেই। কোথাও একেবারেই শুকিয়ে যেছে নদী। মাঝে-মাঝে চৌনাট বন আর শাদা বাড়ি। ভেসে আসে সোহার ওপর হাতুড়ি পেটানোর মতো ঝনঝন শব্দ যার মধ্য দিয়ে রূপ নিচ্ছে এখানকার লোকদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ।

কোথাও শেষ বিকেলের আলো প'ড়ে লাল হ'য়ে উঠেছে ভুট্টা-ক্ষেত। একেবারে পাহাড় পর্যন্ত চলে গেছে বন। শস্তে ঝলমল করছে মাঠ। সবুজ পল্লবের মাঝখান থেকে উঁকি দিচ্ছে রসে টইটম্বুর বেরীফল। সবুজ নরম ঘাস যেন বিছিয়ে রাখা সাটিন। সোহগুলি ঘাস খেয়ে বেড়াচ্ছে শান্ত ভঙ্গিতে ঠিক হরিণের মতো।

পীতাভ চন্দ্রালোকে হঠাৎ দেখা যায় ফাঁসির মঞ্চ। পায়ের তলায় ছড়িয়ে আছে হাজার হ'ঘার নুড়ি পাথর। জলজ উদ্ভিদের মাঝখান দিয়ে সাপের মতো এঁকেবেঁকে চলেছে ঝিকিমিকি ছোট নদী। ঘন সবুজের মাঝে মাঝে অসংখ্য পীচ গাছ। বাদাম গাছ।

সেখানকার সূর্যাস্ত আশ্চর্য। আকাশের বিরাট গম্বুজ যেন প্রান্তরকে ঢেকে দেয় রক্ত—পীত শিখায় বিশাল যবনিকায়। সেই দীপ্তি এত উজ্জ্বল যে মাটির ওপরকার সবকিছু মনে হয় কালো আর অদ্ভুত। আলোর পটে দীর্ঘ তৃণ যেন অসংখ্য তীক্ষ্ণ রশ্মি। জলজলে সোণালি আলোতে অদৃশ্যমান গতগুলিকে দেখায় প্রাগৈতিহাসিক কালের অতিকায় সুপ্তজন্তুর মতো। ঝুনিপার আর ব্ল্যাকথর্নের ঝোপগুলি যেন আত্মরক্ষার জন্ত তৈরি প্রাচীর। আকাশের উজ্জ্বলতার ক্রমে দেখা যায় কালো কালো ছায়া। জুন মাসে এই আশ্চর্য দৃশ্য টিঁকে থাকে অনেকক্ষণ। মধ্য রাতে চাঁদ ওঠার পরেও পশ্চিম আকাশে লেগে থাকে এই হরিদ্রাভ আলো।...এই হল স্টিফটের-এর দুনিয়া। বর্ণনার সজীবতায় অসাধারণ হ'য়ে উঠেছে 'ব্রিগিটা'। তাছাড়া এই ছোট উপন্যাসটিতে একটি মিষ্টোল স্নিগ্ধ প্রেমের গল্পও উপহার দিয়েছেন স্টিফটের।

তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা 'কাঁচের পাহাড়' গল্পে প্রকৃতির নির্জনতা আরো তীব্রভাবে উপস্থিত। দুটি ছোট ভাইবোন কেমন ক'রে পথ হারিয়ে ফেলেছিল প্রবল তুষার-পাতের দিনে, পথ খুঁজতে গিয়ে উঠে পড়েছিল আগাগোড়া বরফে ঢাকা পাহাড়ের চূড়ায় যেখান থেকে চারদিকে শুধু চোখে পড়ে শাদা তুষার আর তুষার আর মাথার ওপর নীল তারা, শেষ পর্যন্ত দুজনে প্রাণপণ চেষ্টায় বেঁচে গিয়ে গ্রাম-বাসীদের তৎপরতায় কেমন ক'রে ফিরে এসেছিল মা-বাবা আর পাড়া পড়শীদের মাঝখানে তারই খাস রোমাঞ্চকর কাহিনী 'কাঁচের পাহাড়'। গল্পটি তুষারের মতোই নির্মল, সুন্দর আর শুভ্র।

স্টিফটের-এর সঙ্গে খানিকটা মিল খুঁজে পাওয়া যায়—আমাদের প্রিয় কথাশিল্পী বিভূতিভূষণের। দুজনই পৃথিবীকে দেখেছেন কবির চোখে অথচ লিখে গেছেন গদ্যে। প্রকৃতির নির্জন সৌন্দর্য আকণ্ঠ পান ক'রেছেন দুজনেই। এঁদের গল্প পৃথিবীতে সরলতাই বেশি পড়ে চোখে। দুজনেরই মন আকর্ষণ ক'রেছিল সাধারণ খেটে-খাওয়া মানুষ, ভবঘুরে, যাযাবর মানুষ ইত্যাদি। শিশু—চরিত্র অঙ্কনে স্টিফটের আর বিভূতিভূষণ আশ্চর্য কুশলতা দেখিয়েছেন। 'কাঁচের পাহাড়' গল্পের ভাই-বোনের কথা পড়তে-পড়তে মনে প'ড়ে যায় অপু আর দুর্গার কথা। তবে স্টিফটের-এর গল্পের পরিবেশ সুন্দর হলেও বিপদের সংকেতে নিঃশব্দ।

উনিশ শতকের জার্মানীতে জন্মাননি টোমাস মান—এর মতো ঔপন্যাসিক। কাব্যিক সৌন্দর্যে ভরপুর বড়ো গল্প কিংবা দার্শনিক উপন্যাস লিখেই নিজেদের শক্তি ব্যয় করেছেন এই শতকের জার্মান লেখকেরা। মনে হয় খাঁটি উপন্যাস কিংবা কবিতা লেখার চেষ্টা করলেই যেন তারা ভালো করতেন। তাঁদের ক্ষমতা থেকে গেছে অনেকখানিই যেন অব্যবহৃত, অপ্রকাশিত। স্টিফটের সম্পর্কেও এ কথা অংশত প্রযোজ্য। ছোট পরিসরের ভেতরেই নিজেকে আবদ্ধ রেখেছিলেন তিনি। তাঁর রচনা প'ড়ে তাঁকে যত বড়ো শিল্পী মনে হয় আসলে তিনি তার চাইতে অনেক বড়ো শিল্পী ছিলেন।

———

বিশ্বের সেরা গল্প

গাঁয়ের বধূ

(ফরাসী সাহিত্যরথী ব্যালজাকের 'কানট্রি ডাক্তার'এর ছায়া অবলম্বনে)

[পরিচয়ঃ ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে ২০শে মে ফ্রান্সের টুরস্ নামক পল্লীতে ব্যালজাক্ জন্মগ্রহণ করেন। তার আসল নাম Honore de Balzac. তিনি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত লেখনী চালনা করে ফরাসী সাহিত্য, তথা বিশ্বসাহিত্য সমৃদ্ধ করে গেছেন। তাঁর লেখা প্রায় আশীখানা উপন্যাসে ফ্রান্সের সমসাময়িক ঐতিহাসিক, সামাজিক ও গার্হস্থ্য জীবনের রূপরূপ চিত্র দেখতে পাওয়া যায়। তার চরিত্রচিত্রগুলি এরূপ বাস্তব যে, মনে হয় এখনও সেগুলি যেন চোখের সামনে জ্বল্ জ্বল্ করছে! স্বদেশে-বিদেশে অতুল সাহিত্যকীর্ত্তি অর্জ্জন করে ব্যালজাক ১৮৫০ খৃষ্টাব্দের ১৮ই আগষ্ট তারিখে পরলোকগমন করেন।]

সকাল থেকেই বসন্তের হাওয়া বইতে সুরু করেছে। সালটা হবে ১৮২৯। যে পাহাড়ে-পথটা প্রান্তি চার্টুঁফ গাঁয়ের দিকে এঁকে বেঁকে এগিয়ে গেছে, সেই পথে দেখা গেল সকাল বেলাতেই লোকটী ঘোড়ার পিঠে চড়ে বেশ আরামেই চলেছেন। বয়সটা হবে পঞ্চাশ, কিম্বা তার কাছাকাছি। যে গাঁয়ে তিনি যাচ্ছেন সেটা কিছুদিন আগে সৈন্যদলের ছাউনি ছিল, আর হাটবাজার বেচা-কেনা নিয়ে এখন অল্পদিনেই বেশ জমজমাট হয়ে উঠেছে। পাহাড়ে উপত্যকার অনেকখানি পথ যেতে হবে ওঁকে।

বরফ সবে গলতে সুরু করেছে, তাই পাথরের চাইগুলোর আশেপাশে এখন জলধারার সৃষ্টি হয়েছে। দু'পাশের খাড়া পাহাড় সাজর আর ডোঙ্গিনী আকাশে অনেকদূর পর্য্যন্ত মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। পথের প্রাকৃতিক দৃশ্যগুলি সবই এক ধরণের, বিশেষতঃ পাহাড়ের আশেপাশের। পথটা অনেকটা চড়াই-উৎরাই হওয়াতে, তার কোথাও বা রৌদ্র, কোথাও বা ছায়া। পথটা যেখানে সোজা আর চওড়া হয়ে গেছে সেখানে যেন শ্যামল তৃণগুচ্ছের কার্পেট বিছানো। বরফ গলে ছোট ছোট ঝরণা নেমে এসেছে পাহাড় থেকে। সেই জলে উপত্যকার শ্যামশোভা আরও বেড়েছে।

পথে যেতে যেতে নজরে পড়ে এখানে-ওখানে ছড়িয়ে-থাকা দু'চারটে কুঁড়ে ঘর। সেই সব ঘরের চারপাশে ছোট ছোট ফলের বাগান দেখে মনে হয়, বাসিন্দারা দারিদ্রের সঙ্গে লড়াই করেও ফলের বাগান করতে ভোলেনি। মাঝে মাঝে এমন ছোট ছোট বাড়ীও চোখে পড়ে, যার ছাদ লাল টালিতে তৈরী। বোধ হয় দারিদ্রের মধ্যেও একটু বিলাসিতার আমেজ এসেছে। দেওয়ালের গা বেয়ে উঠেছে আঙুরলতা। এ অঞ্চলটায়ও ইটালীর মতই আঙুরের গাছ জন্মে। প্রায় প্রত্যেক ঘরদোরেই পনির শুকোবার ছোট ছোট ঝুড়ি ঝুলানো। আঙুরলতা থেকে আঙুরগুলো ছিঁড়ে নিয়ে শুকনো গাছটাকে জ্বলতে থাকবার এ দেশের পরিবেশ।

ঘোড়ার পিঠে লোকটি চলেছেন বেশ মন্থর গতিতে। অবশ্য ওঁর চেহারার কথাটা এখনও বলা হয়নি। লম্বা গড়ন, গায়ের নীল রংয়ের লম্বা কোটটি পুরানো হলেও বেশ ভালভাবে মুরুশ করা।

ঘোড়ার উপরে সোজা হয়ে বসে বেশ তারিক্কি চালেই চলেছেন লোকটি। তাঁর দৃঢ়তাব্যঞ্জক মুখ, নির্বিকার চাহনি, আর বেপরোয়া চালচলন দেখে মনে হয় তিনি একসময়ে সৈন্যদলে ছিলেন। যদি ধরে নেওয়া যায় লোকটি সৈন্যদলের ভূতপূর্ব অফিসার গোছের একজন, তা'হলেও বোধ হয় ভুল করা হবে না।

আল্‌পস পাহাড়ের এ অঞ্চলের প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে যে কোন পথিক অবাক হয়ে থমকে দাঁড়ায়, কিন্তু লোকটির মনে তিলমাত্রও বিস্ময়-সৃষ্টি হোল না।

যদি সত্যই লোকটি সৈন্যদলের কেউ হন, তা'হলে বলতেই হবে, সম্রাট নেপোলিয়ঁ আল্‌পস্ পার হবার সময়ে এমন সামরিক কঠোরতা বজায় রেখেছিলেন, যাতে করে সৈন্যেরা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের দিকে কোনদিনই ফিরেও তাকাতে পারতোনা। লোকটি হয়ত সেই ধারাই মেনে চলেছেন—সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্যকে বিশেষ কোন আমলই দিচ্ছেন না।

লোকটির নাম কিন্তু এখনও বলা হয়নি, এইবার বলছি। নামটি হো'ল পিয়ারে জোসেফ জেনেস্‌টাস্। আগে সৈন্যদলের অফিসার ছিলেন, এখন পেন্সন পাচ্ছেন। লোকটিকে দেখে ভাবপ্রবণ বা সৌন্দর্য পিয়াসী বলে মনে হয় না। সাধারণ গোছের কর্মঠ লোক, পেন্সনের টাকা ছাড়া অন্য বিশেষ কিছু আয় না থাকলেও তিনি ধনীর চালে চলেন। দু'বছরের পেন্সন নেননি, ওতে যখন ইচ্ছা তখনই একটা মোটা টাকার চেক্ হাতে আসতে পারে।

জেনেস্‌টাস্ আগে ভাবতেই পারেন নি যে এতটা পথ চলতে হবে। তা ছাড়া পথের কড়িয়া বা চাষীদের কাছ থেকে সঠিক দূরত্ব জানতেও তিনি পারেননি। অত পথ চলতে চলতে বেশ ক্ষুধা পেয়ে গেল। কিছু পেটে না পড়লে আর চলতেও পারছেন না। সামনেই কতকগুলি কুটীর দেখে এগিয়ে গেলেন সেদিকে। অবশ্য কোনদিকে-বেড়া না থাকাতে অনধিকার প্রবেশের কোন অপরাধ হয়নি তাঁর।

কুটীরগুলির আশপাশদেশ পরিচ্ছন্ন। আইভিলতা, গোলাপফুলের চারা আর লম্বা লম্বা ঘাসে স্থানটি পরিপূর্ণ। একধারে কতকগুলি কাপড় শুকুচ্ছে আর একটা মুরগীছানা একপায়ে খড়ের ওপর শুয়ে খোঁৎ খোঁৎ করছে। জেনেস্‌টাস্ সেদিকে আসতেই একটা কালো বিড়াল লেজ দুলিয়ে ম্যাও, ম্যাও করতে লাগল।

হঠাৎ তাঁর সামনের এক কুটীর থেকে এক বৃদ্ধা বেরিয়ে এল। তাঁকে দেখে জেনেস্‌টাস্ তাঁরই দিকে এগিয়ে গেলেন।

এখানে একটু গরম দুধ পাওয়া যাবে?—প্রশ্ন করলেন জেনেস্‌টাস্।

বৃদ্ধার সবেগে ঘাড় নাড়া দেখেই তিনি বুঝলেন, দুধ পাওয়া যাবে না এখানে। তা'ছাড়া বৃদ্ধার যুক্তি এই যে দুধের ওপর এখন মাখন জমতে সুরু করেছে, দুধ নাড়লেই মাখন নষ্ট হয়ে যাবে। অতটা পরোপকার করবার মহত্ত্বও নেই তার।

—বেশ ত, সব মাখনটার দামই না-হয় দিয়ে দিচ্ছি।—জেনেস্‌টাসের কণ্ঠস্বরে একটু বিরক্তি ফুটে উঠল।

ঠিক এই সময় গোটা চারেক বাচ্চা ছেলে ছুটে এসে বৃদ্ধার কাছ ঘেঁসে দাঁড়াল। বয়স কিন্তু সব কটিরই এক, তারপর এলো আর একটি বাচ্চা, তার বয়স কিছু কম, দেখতে রোগা-রোগা। বৃদ্ধা তাকে বুকের কাছে টেনে নিল।

ঘরের মধ্যে এক পাশে একটা টুলের ওপর বসতেই জেনেস্‌টাসের চোখে পড়ল তাকের উপর রাখা শিশু-যীশুকে কোলে নিয়ে থাকা তাজিন মেরীর একটা ছোট-চটা পুতুল। তিনি পুতুলটার দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে রইলেন।

এর মধ্যে বুড়ী কখন গিয়ে এক মগ্ দুধ এনে জেনেস্‌টাসের সামনে রেখে একটা পায়াভাঙা চৌকীর উপর বসল। বোগা বাচ্চাটি তার কোলের কাছে আরও এগিয়ে গেছে তখন। চট্ করে একটা চিরুণী নিয়ে বুড়ী চুল আঁচড়াতে লাগল ছেলেটির।

—এগুলি তোমার ছেলেপুলে বুঝি? প্রশ্ন করলেন জেনেস্‌টাস্।

—আমার?—বিস্মিত হয়ে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ বুড়ী। তারপর বলল, না, না, এরা আমার কেউ নয়, তবে আমার কাছেই মানুষ হচ্ছে, অবশ্য তার জন্যে আমি টাকা পাই,—টাকাটা এমন কিছু বেশী নয়, প্রত্যেকের জন্যে মাসে মাত্র তিন ফ্রাঙ্ক।

—খুব কমই বলতে হবে,—গম্ভীরভাবে বললেন জেনেস্‌টাস্।

—কম বলে কম,—বছরে বছরে খরচও বাড়ছে এদের জন্যে। এই ধরুন না কেন, মরদা-গুলাই পাবে পঁচাত্তর ফ্রাঙ্ক। তা'ছাড়া শীতটা কি রকম পড়েছে, দেখছেন ত। আমাদের পরম হিতৈষী গাঁয়ের বড়ি মিঃ বেনাসীস অবশ্য সে ভার শেষের ভার নিয়েছেন।

—তিনি এ গাঁয়েই থাকেন বুঝি?

—অমন লোক আর হয় না মশাই। একে ত রোগী দেখে তাদের ওষুধ দিয়ে এক পয়সাও নেন না, তার ওপরে তাদের পথ্যিও জোগান। লোকে গীর্জায় প্রার্থনা করবার সময়ে প্রতিদিন তারও মঙ্গল কামনা করে থাকে।

—মিঃ বেনাসীসের বাড়ী কি দূরে না-কি? যাক্, লোকটাকে তা' হলে একবার দেখেই আসি। আচ্ছা, এই নাও দুধের দাম।

কয়েকটা টাকা জেনেস্‌টাস্ বুড়ীর হাতে গুঁজে দিলেন। বুড়ী ত এতগুলো টাকা পেয়ে অবাক্! এক মগ্ দুধের দাম এত? সেকি?

জেনেস্‌টাস্ তাঁর ঘোড়ার পিঠে উঠ্‌তেই বুড়ী বললে—বেশী দূর যেতে হবে না তোমাকে, ঐদিকে একটু গেলেই তার বাড়ী। দূরেনেই দেখতে পাবে।

জেনেস্‌টাস্ ঘোড়ার পিঠে এগিয়ে চলল একটা পথ দিয়ে। কিছুদূর যেতেই মিঃ বেনাসীসের বাড়ী তাঁর চোখে পড়ল। কাছে গিয়ে খবর নিতেই জানলেন, মিঃ বেনাসীস্ মরদাকলে গেছেন একজন মুমূর্ষু লোককে দেখতে। জেনেস্‌টাস্ ঘোড়া চালালেন মরদা কলের দিকে।

মরদাকলটা বেশীদিনের পুরানো নয়। একটা ছোট জলপ্রপাতের ঠিক পাশেই। চারদিকের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোরম। জায়গাটার ওপাশেই প্রায় জঙ্গল খানেক ছেড়ে যাওয়া কুটীর। চারদিকে এক অস্বাভাবিক নির্জনতা।

মরদাকলের সামনেই একটা বস্তার উপরে বসেছিল একটা ছোকরা, জেনেস্‌টাস্ তাকে জিজ্ঞাসা করলে—মিঃ বেনাসীস্ এখানে আছেন তো?

ছোকরাটি বললে, এখানে তো নেই,—ঐ যে দূরে দেখছেন একটা ভাঙা কুঁড়ে, ঐখানে তার দেখা পাবেন।

—আচ্ছা, কুঁড়ে ঘরগুলোতে কেউ থাকে না কেন? ব্যাপারটা কি বল ত?

ছোকরাটি তার কাঁধটা একটু বাঁকিয়ে নিয়ে বললে, আপনি যাচ্ছেন ত মিঃ বেনাসীসের কাছেই? তার কাছে শুনবেন সবকিছু।

আর বাক্যব্যয় না করে জেনেস্টাস্ এগিয়ে চললেন নির্দিষ্ট কুটীরের দিকে।

ছোট খড়ের ঘরখানিতে গভীর নিস্তব্ধতা। বৃদ্ধ লোকটি শান্তভাবে শুয়ে আছে একখানা আরাম-চেয়ারে। তার পাশে এক বুড়ী হাঁটুগেড়ে বসে আছে। আর একজন লোক চুপ করে দাঁড়িয়ে লোকটির দিকে চেয়ে আছে। ঘরের মধ্যে আসবাবপত্র বিশেষকিছু নেই। দারিদ্র ও অভাব যেন মূর্ত্তিমান্ হয়ে রয়েছে সেখানে।

যে লোকটি দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁর দিকে চেয়ে বিস্মিত হলেন জেনেস্টাস্। মাঝারি গড়ন, রুক্ষ চেহারা, বেশ চওড়া। মোটের উপর স্বাস্থ্য মন্দ নয়। গায়ে একটা সবুজরঙের ওভারকোট, সেটা তাঁর গলা পর্য্যন্ত বোতাম আঁটা। বেশ শান্তভাবেই দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। মুখ গম্ভীর হলেও তাতে উৎকণ্ঠার আভাস ফুটে উঠেছে। দোমরানো চিবুক ও দীর্ঘ নাসায় মুখখানা একটু অস্বাভাবিক দেখালেও অল্পজ্বলে চোখ দুটিতে তীক্ষ্ণবুদ্ধির ছাপ বেশ পরিস্ফুট। মাথার চুলে পাক ধরেছে, আর কপালের রেখাগুলিও বেশ স্পষ্ট, জেনেস্টাস্ আন্দাজ করলেন, বয়স ষোলর পঞ্চাশের কাছাকাছি হবে। লোকটিকে দেখে তাঁর মনে হোল কি যেন একটা রহস্য ঘিরে আছে তাঁকে।

জেনেস্টাস্ বিনীতভাবে প্রশ্ন করলেন—"ক্ষমা করবেন, আপনিই কি ডাঃ বেনাসীস্?

"হ্যাঁ—বলিয়ে"—বলেই লোকটি আবার ঘুরে দাঁড়ালো রোগীর দিকে।

রোগীর জীবনপ্রদীপ তখন ধীরে ধীরে নিভে আসছিল। একটা শান্ত নির্ব্বিকার অসহায় ভাব তার নিষ্প্রভ চোখদুটিতে ফুটে উঠেছে। চেতন থেকে অচেতনে যাবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে যে নির্ব্বাক মুক্তির ভাব আসে, মুমূর্ষু লোকটির মুখমণ্ডলে তার পুরো ছাপটি সুস্পষ্ট। আর হয়ত কয়েক মিনিট মাত্র পৃথিবীর সঙ্গে তার সম্পর্ক।

যে বুড়ী রোগীর পাশে হাঁটুগেড়ে বসে ছিল, সে তখনও তার নিশ্চল পায়ের উপর হাত বসে বসে পা একটু গরম রাখবার চেষ্টা করছিল।

ডাঃ বেনাসীস্ এবার রোগীর নাড়ি দেখে ধীরে ধীরে বললেন,—"এবার একে বিছানায় শুইয়ে দেওয়াই ভাল।"

আরাম-চেয়ার থেকে সন্তর্পণে তুলে রোগীকে বিছানায় শুইয়ে দেওয়া হোল। তার পা দুটী তখন ঠাণ্ডা হতে সুরু করেছে। বেনাসীস্ শান্ত স্বরে বললেন—"আর বেশী দেরী নেই।"

বুড়ী তখন একদৃষ্টে রোগীর মুখের পানে চেয়ে আছে, তার চোখবেয়ে গড়ছে ফোঁটা ফোঁটা জল।

এ অবস্থায় হঠাৎ এখানে এসে পড়ে জেনেস্টাসের খুবই অস্বস্তি বোধ হতে লাগল। অথচ হঠাৎ চলে যাওয়াটাও অশোভন। তিনি শান্তভাবে দাঁড়িয়ে এদের বেদনার অংশ গ্রহণ করলেন।

একটু পরেই রোগীর মৃত্যু হোল। সংবাদটা গ্রামে ছড়িয়ে পড়বার সঙ্গে সঙ্গেই ছোট গ্রাম্য-গির্জ্জার ঘণ্টা বাজতে লাগল। সে শব্দ শুনে কয়েকজন প্রতিবেশী সেই কুটিরের দরজায় এসে জমায়েৎ হোল। সকলেই নির্ব্বাক। তারপর তারা টুপি খুলে হাঁটুগেড়ে বসে তাদের মৃত প্রতিবেশীর জন্যে নীরবে কি যেন প্রার্থনা করল।

এইবার বেনাসীস্ সমবেত লোকগুলির দিকে ফিরে শান্তস্বরে বললেন—"ভগবান ওকে কাছে ডেকে নিয়েছেন,—এবার তোমরা তোমাদের কর্ত্তব্য পালন কর।" তারপর জেনেস্টাসের দিকে ফিরে বল্লেন,—"আপনি আমাকে এখানে এ অবস্থায় দেখবেন, এটা আমি ভাবিনি।" এই কথা বলে তিনি

জেনেস্‌টাস্‌কে সঙ্গে নিয়ে কুটীর থেকে বেরিয়ে এলেন। তাঁর সম্বন্ধে কোনকিছু প্রশ্ন করবার সুযোগ না দিয়েই তিনি ধীরে ধীরে বলে চল্লেন—"আপনাকে এখনি কথাগুলো না বলে থাকতে পারছিনা, যদিও এই আমাদের প্রথম সাক্ষাৎ। এখানে যখন ডাক্তারি করতে আসি, তখন মেয়ে-পুরুষে জন বারো লোক ছাড়া কেউ ছিল না এ গাঁয়ে। অবশ্য গাঁ বলতে খানকয়েক কুঁড়ে ঘর, তবুও বাজারহাট ও বাগান নিয়ে একটা ছোট গাঁ ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে? বিয়ে জিনিষটা ওদের মধ্যে ছিল না, যে যাকে পারে জুটিয়ে নিয়ে থাকত। ধর্ম্মাধর্ম্ম বা কোন নীতির ধার ওরা ধারত না। মেয়ে-পুরুষের এই বাগছাড়া অবৈধ সম্পর্কটা আমার মনে প্রথমে খুবই আঘাত দিয়েছিল। তাছাড়া যে জন্যে আমাকে প্যারিস থেকে এখানে আনা হয়েছিল সেটা হোল ওদের একটা কুৎসিত ব্যাধি। আমি প্রথমে ওদের খুবই সাবধান করে দিলাম, কিন্তু মেয়ে-পুরুষে মিলে আমাকে বাদ করতে লাগল। ওদের ধারণা ও ব্যাধিটা হবেই। আমি তখন গাঁয়ের মোড়লকে অনেক রকম বোঝাতে সুরু করলাম। মোড়ল মশাই অবশ্য শেষে আমার মতেই মত দিলেন। নতুন নতুন বাসিন্দা আমদানি করে' গাঁটাকে ক্রমে বড় করা হোল। অনেক লোকের বাস হোল এখানে। একজন মেয়রও ঠিক হোলেন, সে মেয়র আমি নিজে। মেয়রের কথা সকলে যাতে বাধ্য হয়ে শোনে তার ব্যবস্থাও করতে হোল। এইভাবে মাস ছয়েক কাটল।

এবার আমি গাঁয়ের উন্নতির দিকে মন দিলাম। ভাল ভাল বাড়ী দু'চারটে তৈরী হোল। আমার প্রধান লক্ষ্য ছিল তাদের নৈতিক উন্নতির দিকে। মেয়েপুরুষের এতখানি নৈতিক অধঃপতন অসহ্য! সে বিষয়ে আমি সফলতা লাভ করেছিলাম। সিৰ্জ্জাও একটা তৈরী হো'ল আর বিয়ের ব্যাপারটাও বাধ্যতা-মূলক করা হোল। যাতে বিয়েটা বাদ দিয়ে মেয়েপুরুষে একসঙ্গে স্বামীস্ত্রীর মত বসবাস করতে না পারে।

অবশ্য নানা কারণে কোন কোন গ্রামবাসীর আমি বিরক্তির কারণ হয়েছিলাম। অনেকেই আমার মতবাদ পছন্দ করত না। আমি ভাল কাজ করলে, তারা সেটা কেমন যেন সন্দেহের চোখে দেখতে লাগল। শেষে ব্যাপারটা এমনি দাঁড়াল যে আমি দুষ্টপ্রকৃতির ও নষ্ট চরিত্রের জনকয়েককে গ্রাম থেকে না তাড়িয়ে পারলাম না। এতে অবশ্য আমি ভাল লোকদের কাছ থেকে যথেষ্ট সাহায্য পেয়েছিলাম।"

জেনেস্‌টাস্‌কে একটু অন্যমনস্ক দেখে ডাঃ বেনাসীস্ তাঁর কথা থামিয়ে তাঁকে সঙ্গে করে একটি বাড়ীতে উপস্থিত হলেন। বাড়ীর কর্ত্তা একটু আগে মারা গেছেন, গিন্নির সে কি করুণ কান্না! সকলেরই শোকমলিন মুখ। দুঃখ স্বামীর দেহ আঁকড়ে ধরে গিন্নি মৃতের হাতে নিজের মাথার কেশগুচ্ছ কাঁচি দিয়ে কেটে গুঁজে দিলেন। ডাক্তার জেনেস্‌টাস্‌কে বুঝিয়ে দিলেন, এর মানে এই যে, গিন্নি প্রতিজ্ঞা করলেন আর কখনো অন্য স্বামী গ্রহণ করবেন না।

সেখান থেকে চলে আসবার পথে জেনেস্‌টাস্‌কে ডাক্তার বললেন: এবার শুনুন আমার জীবনের শেষ কাহিনীটুকু। অবশ্য এতে হয়তো আপনি আমাকে আর ততটা ভুল বুঝবেন না, বা আশ্চর্য্য হবেন না আমাকে এখানে দেখে।

জেনেস্‌টাস্ সম্মতি জানালে ডাক্তার আবার বলতে সুরু করলেন—"প্যারিসে থাকতে নানা ভাবে আমি আমার প্রথম যৌবনে আমার বাবার বিরক্তির কারণ হয়েছিলাম। ভাবলাম দিন কয়েক গা ঢাকা দিয়েই থাকি। এ বয়সের যা দোষ, অর্থাৎ একটি সুন্দরী কিশোরীকে বিয়ে করবার

প্রলোভন দেখিয়ে তার বাসাতেই আমি হাজির হলাম। ক্রমে আমার মন সেই মেয়েটির দিকে আকৃষ্ট হতে লাগল। কি সুন্দরী মেয়েটি আর কি চমৎকার শান্ত তার স্বভাব। শুধু আমার কথার উপর বিশ্বাস করেই সে তার সবকিছু আমাকে দিয়েছিল। আমি কিন্তু বিয়ে করিনি তাকে, দিনের পর দিন স্তোকবাক্য বলে এসেছি। কিছুদিন পরে আমাদের একটি ছেলে হোল। ছেলেটি চমৎকার দেখতে। সে যেন ভয়ে ভয়ে ছেলেটিকে আগলে থাকত। আর বার বার আমাকে বলেছিল, তার ছেলে যাতে জারজ বলে পরিচিত না হয়, তার জন্যে আমাদের বিয়েটা খুব শীঘ্র সেরে ফেলা দরকার। আমি শুধু তাকে মৌখিক স্বীকৃতি দিচ্ছিলাম, কিন্তু কাজে কিছুই করিনি।

এই সময়ে খবর এল আমার বাবা হঠাৎ মারা গেছেন ও তাঁর বিপুল সম্পত্তির মালিক হয়েছি আমি। মেয়েটিকে কোন কথা না জানিয়েই আমি তাড়াতাড়ি তার কাছ থেকে একটা বাজে অছিলায় চলে এলাম। অনেক টাকা হাতে এলে তরুণ যুবকের যে সব দোষ আসে," আমার সেই সব দোষ এল। আমি প্যারিসের বিলাসের স্রোতে গা ঢেলে দিলাম। মেয়েটির কাছে আর একদিনও গেলাম না, বা ছেলেটির খবর রাখলাম না। ইচ্ছা করেই ভোলবার চেষ্টা করলাম। এরপর আর কোনদিন তাঁর সঙ্গে দেখা পর্য্যন্ত করিনি।

এই সময়ে এক বিলাসিনী তরুণীর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হ'ল ও আমি তাকেই বিয়ে করবার জন্যে ঝুঁকে পড়লাম। অবশ্য শেষে হঠাৎ একদিন আমার পূর্বজীবনের কথা কেমন করে তার আত্মীয়স্বজনের কানে এসে পৌঁছল। বিয়েটা অবশ্য ভেঙ্গে গেল কিন্তু আমি এরপর থেকে চেষ্টা করতে লাগলাম, যাতে আমি প্যারিসের মধ্যে একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি হতে পারি। আমি ডাক্তারী পড়তে লাগলাম খুব মন দিয়ে। কিছুদিন পরে আমার পূর্বকৃত অপরাধগুলি ক্রমশঃ আমার কাছে ছোট হতে লাগল। আমি মানুষের মত মানুষ হবার আন্তরিক চেষ্টা করতে লাগলাম। ডাক্তারীতে যথেষ্ট সুনামও অর্জন করলাম।

হঠাৎ একদিন আমার প্রথম প্রণয়িনী সেই শান্ত স্বভাবা সুন্দরী মেয়েটির কাছ থেকে একখানা চিঠি এলো। চিঠিখানি এই :—

"তুমি আমাকে সেই যে কতদিন আগে ছেড়ে চলে গেছ, আর একটি বারও আমার কাছে এলেনা কেন? আমি এখন মৃত্যুশয্যায়। আর বাঁচব না, বাঁচবার সাধও নেই। আমার ছেলেটির কি হবে? তাকে কি সমাজে অবহেলিত করেই রাখতে চাও? ভগবান্ সাক্ষী, তুমি ত জান সে তোমারই ছেলে। একদিন আমার জন্যে তোমাকে কাঁদতেই হবে। লক্ষীটি, তুমি একটিবার এসো।"

চিঠি পড়ে আমার দুঃখ ও পরিতাপের সীমা রহিল না। আমি বিহ্বলের মত তখনি ছুটলাম তার কাছে। তার তখন গোনা দিন শেষ হয়ে এসেছে। অনেক চেষ্টা করেও তাকে বাঁচানো গেল না। ছেলেটিকে নিয়ে আমি ফিরে এলাম। মেয়েটির প্রতি অবিচার করার জন্যে আমার মনে অনুতাপের আগুন জ্বলতে লাগল। আমি আমার ছেলেটিকে মানুষ করবার জন্যে কি চেষ্টাই না করতে লাগলাম। শেষে আমারই একান্ত চেষ্টায় সে একজন আদর্শ যুবক হোল। আমি তখন প্যারিসের একজন শ্রেষ্ঠ ডাক্তার। ছেলেকে মনের মত করে গড়ে তোলবার চেষ্টা করছি। আমার প্রতি ছেলের শ্রদ্ধার ছিল অপরিসীম। কিন্তু ভগবানের কি ইচ্ছা জানি না, হঠাৎ এক ভয়ানক রোগে সেও আমার কাছ থেকে চিরবিদায় নিল। তখন শোকে আমি প্রায় পাগলের মত হলেম। আমার চোখে সমস্ত পৃথিবী যেন শূন্য বলে মনে হতে লাগল। আমি প্যারিসের প্রতিপত্তি, অর্থ, যশ সব ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে এলাম

এখানে। হাঁ, এই ছোট্ট গ্রামে, পরের সেবায় আমার শেষ জীবন উৎসর্গ করতে, আর আমার অতীতের সব কিছু ভুলতে।

ডাক্তার যেন হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেলেন। এইবার জেনেস্‌টাস্ মুখ খুললেন—"ডাক্তার আপনার কাহিনীর সঙ্গে আমার জীবনের কাহিনীও অনেকটা মেলে, শুনুন,—"আমার স্ত্রী আমাকে ছেড়ে পালিয়ে যায় আমার ছোট্ট ছেলেটিকে সঙ্গে নিয়ে। তারপর কয়েক বৎসর পরে হঠাৎ আমি আমার স্ত্রীর চিঠি পাই। তার মৃত্যুশয্যায় সে আমার হাতে আমার ছেলেকে ফিরিয়ে দিয়ে গেল। অনুতাপের আগুনে সে তখন একেবারে পুড়ে পুড়ে নিঃশেষ হয়ে গেছে। আমি আমার ছেলেটির স্বাস্থ্য দেখে খুব হতাশ হয়ে পড়লাম। অতি দুর্বল, অতি নিরীহ সে। তাকে নিজের কাছে রাখতে কেমন যেন সাহস হয় না, এত কোমল, এত অসহায় সে। তাই তাকে রাখতে চাই আপনার কাছে।"

ডাক্তার বললেন,—"বেশ ত, এই গ্রামে আর একটি তরুণবয়স্কা মেয়ে লা-কোসু আমার চিকিৎসাধীন আছে। আমি আপনার ছেলের চিকিৎসা তা'হলে ঐ মেয়েটির সঙ্গেই করব। তাকে নিয়ে আসুন আমার কাছে।"

ক'দিনের মধ্যে জেনেস্‌টাস্ তার ছেলেটিকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে এলেন। প্রথম থেকেই ডাক্তার ছেলেটিকে যেন অতি আপনার করে নিলেন। এ যেন তাঁরই সেই হারানো ছেলে।

দিনরাত ছেলেটির দিকে নজর রাখতেন তিনি। তরুণী মেয়ে লা-কোসুর সঙ্গে তার বেশ ভাব হয়ে গেল দেখে ডাক্তার খুব খুশী। তবুও আপনভোলা মন নিয়ে ডাক্তার কাজের মধ্যেই যেন সব কিছু ভুলে থাকতে চাইতেন।

এরপর দু'এক বছর কেটে গেছে। হঠাৎ জেনেস্‌টাস্ তার ছেলের কাছ থেকে এক চিঠি পেলেন, তাতে লেখা ছিল ডাক্তারের মৃত্যু সংবাদ। চিঠি পেয়েই জেনেস্‌টাস্ ছুটে গেলেন সেই গ্রামে। ছেলেটির স্বাস্থ্য দেখে খুবই খুশী হলেন তিনি কিন্তু ডাক্তারের মৃত্যুতে তাঁর মনে যেন এক বেদনার পাথর চেপে বসল। মনে হোল, একটি মহান্ আত্মা,—একটি অনুতপ্ত দীর্ঘ আত্মা এতদিন পরে শান্তি পেল।

সারা গ্রাম জুড়ে ডাক্তারের জন্যে সে কি হাহাকার! সকলেরই তিনি ছিলেন বন্ধু, পিতা, উপকারী চিকিৎসক। এমন কেউ সে গ্রামে ছিল না, যে ডাক্তারের দয়ার স্পর্শ পায়নি। সকলের সঙ্গে জেনেস্‌টাস্ ডাক্তারের সমাধিস্থলে গেলেন। খানিকটা মাটির ঢিবি উঁচু হয়ে আছে, তাকে সমাধি বলে সহজেই চেনা যায়। আর তার চারপাশে জমেছে অনেক লোক, তাদের মধ্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যাই বেশী। অঝোর ধারে দু'পিয়ে দু'পিয়ে কাঁদছে সকলেই। সকলেরই যেন বিহ্বলভাব।

জেনেস্‌টাস্ দেখতে পেলেন ডাক্তারের সমাধিস্থানে একখণ্ড লম্বা কাঠের উপর বড় বড় করে লেখা রয়েছে :—

"সত্যিকারের ভালমানুষ ব'লিয়ে বেনাসীস্ এখানে চির নিদ্রায় নিদ্রিত। তিনি আমাদের সকলের পিতা, তাঁর আত্মার জন্য প্রতিদিন আমরা যেন একবারও প্রার্থনা করি।"

জলভরা চোখে জেনেস্‌টাস্ বিড় বিড় করে কি যেন প্রার্থনা করলেন, তারপর ধীরে ধীরে শুধু বললেন,—"আমার কাজ শেষ হয়ে যাবার পর আমি এখানেই চলে আসব। জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত থাকব এদের মধ্যেই, আর কোথাও যাব না। ডাক্তারের অসমাপ্ত কাজ আমাকেই গ্রহণ করতে হবে।"

শ্রীকৃষ্ণধন দে

সাহিত্য ও সাহিত্যিক

জেলে থেকে যশ

বার্থড লেপটিন

যে মানুষ একদিন জেল খেটেছিল, আজ খ্যাতিমান ঔপন্যাসিক হিসেবে তার নাম সকলের মুখে মুখে। এই প্রতিভার স্ফুরণ ধরা পড়ে একটু দেরীতে। ছাত্রাবস্থায় সে সৈন্য দলে যোগ দিতে বাধ্য হয়। যুদ্ধ থেকে মুক্তি পেয়ে কোন কাজকর্ম না পেয়ে এক কুখ্যাত প্রতিষ্ঠানে মোটরচালক হিসেবে সে যোগ দেয়। এখানে চাকরী করার সময় তার প্রথম জেল হয়। জেলের বাইরে এসে আর কোন কাজ যোগাড় করতে না পেরে সে নিজেই এক গুণ্ডার দল গড়ে তোলে। দু'বছরের মধ্যেই দলটি ৫০টি চুরি ও দুটি ডাকাতি করে। এমনি চাতুর্যের সঙ্গে সে তার দলবল নিয়ে চুরিডাকাতি চালাতো যে পুলিশ তাদের কোন হদিশ পেত না। একবার দলের একজন সাতস্বরকে পরামর্শ না কোরে চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে যায় এবং সেই থেকেই পুলিশ সর্দার সমেত সকলকে পাকড়াও করে। বিচারে সর্দারের বারো বছর জেল হয়। নাম তার ইয়েগার, হেনরি ইয়েগার, বয়স মাত্র ৩৮ বছর।

জেলে থাকার সময় ইয়েগার গোপনে লিখতে শুরু করে। কাগজের অভাবে শৌচ-কাগজে লিখতো সে। এইভাবে ২০০০ পাতা লেখার পর জেলের ধর্মযাজক ডাঃ কুইহলেরের কাছে ব্যাপারটা সে প্রকাশ করে। রচনা পড়ে ডাঃ কুইহলেরের ভালো লাগে ও তাঁর সুপারিসে জেল কর্তৃপক্ষ ইয়েগারকে লেখার অনুমতি দেন। ১৯৬১ সালে ইয়েগার দুর্গ নামে সম্পূর্ণ উপন্যাসটি ডাঃ কুইহলারকে দিলে তিনি সেটা পশ্চিম জার্মানীর একটি সুবিখ্যাত পুস্তক প্রকাশকের কাছে পাঠিয়ে দেন।

জেলে থাকতে থাকতেই ইয়েগার তার দ্বিতীয় উপন্যাস "নিরুদ্দিষ্টের বিদ্রোহ" লিখতে শুরু করে। তার আচার-ব্যবহারে সন্তুষ্ট হয়ে কর্তৃপক্ষ তাকে মুক্তি দেয়। আজ ইয়েগার সাহিত্যিকরূপে দেশবিদেশে সুপরিচিত। বিভিন্ন ভাষায় তার উপন্যাস "দুর্গ" অনুবাদ হয়েছে। সম্প্রতি এটি চিত্রে রূপায়িত করার ব্যবস্থা হচ্ছে।

বর্তমানে ইয়েগার 'কারাগারের অন্তরালে" নামে তার আত্মজীবনী লিখছে। আগামী বছরে এটি প্রকাশিত হবে। ইতিমধ্যে সে বিবাহ করেছে এবং আরও মজার কথা তার শ্বশুর আদালতের একজন বিচারপতি।

সাহিত্য-সংবাদ

লেখক, কবি, সাংবাদিক—এরিখ কেস্টনার

এরিখ কোর্টে

এরিখ কেষ্টনার এমন একজন সাহিত্যিক যাঁর লেখা ছোটদের সবচেয়ে প্রিয়, আবার যাঁর লেখা ছোটদের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখতে হয়; এমন সব কবিতা তাঁর কলমের মুখে বেরিয়েছে যার নগ্ন বাস্তবতায় জীবনে বিতৃষ্ণা আসে। "রাগী তরুণ" কথাটা চালু হবার অনেক আগেই মূর্তমান হয়ে কথাটা তাঁর মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর অকপটতা আগের মত এখনো অস্বস্তিকর, তাঁর মনোভাব মর্মান্তিক। সমভাবে তিনি পেয়েছেন মানুষের প্রশংসা ও ধিক্কার। তাঁর রচনা একদিকে পুরস্কার পেয়েছে, অন্যদিকে পুড়েছে।

কে বলবে "এমিল ও গোয়েন্দার" লেখক একজন ৮২ বছরের পক্ককেশ বৃদ্ধ। সরস লেখার জন্যে সাংবাদিক—লেখক কিম্বা লেখক সাংবাদিকরূপে পরিচিত কেষ্টনার আজও মনেপ্রাণে তরুণ রয়ে গেছেন।

কেষ্টনারের জন্ম হয় ড্রেসডেন শহরে। লাইপৎসিক শহরে লেখাপড়া ক'রে কেষ্টনার জার্মান সাহিত্যে ডক্টরেট হন এবং ২৭ বছর বয়সে বেলিনের এক সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদনা বিভাগে যোগ দেন। পাঠকদের ধৈর্যচ্যুতি না ঘটিয়ে এই সময় তিনি একজন আবেগ প্রবণ শিক্ষাদাতা ও সংস্কারক-রূপে আত্মপ্রকাশ করেন। হাল্কা প্রসেপ মাখানো তাঁর রচনার নীতিগুলি পাঠকমনে লেখকের প্রতি দরদী ভাব জাগাতে সক্ষম হয়েছিল। সে সময় অনেকেই ভুল করে ভাবতো যে কেষ্টনারের এই শালীনতার মুখোস বুঝি একটা ভাঁওতা। কিন্তু কেষ্টনারের মধ্যে ভাঁওতাবাজি নেই।

কেষ্টনারের কবিতার দুটি প্রকাশভঙ্গি দেখে অবাক হতে হয়। কিন্তু একজন জানে এরজন্যে কেষ্টনারকে কি অমানুষিক পরিশ্রম করতে হয়েছে। ধাতুধর্মী এই কবিকে এর জন্যে রাতের পর রাত বেলিনের কফি-হাউসে বসে কাটাতে হয়েছে। সেদিনের মত আজও তাঁর রচনার উৎস রাজপথ। যেদিন ঘরে বসে লেখেন, সেদিন জানালার পাশে বসে রাজপথের দিকে চেয়েই তাঁর লেখনী চলে। কিন্তু সে কদাচিৎ। আজও তাঁকে বেশিরভাগ দেখতে পাওয়া যায় মিটনিখের কফিখানায় কিম্বা পানশালায়। লিখতে লিখতে সেখানেই রাত পড়িয়ে ভোর হয়ে যায়।

আজ অনেকেই মনে করে কেষ্টনারের লেখার স্রোত বুঝি স্তিমিত হয়ে এসেছে কিন্তু যে মানুষটি জার্মানীর আধুনিক সাহিত্যের রচয়িতা, তাঁর কাছ থেকে পাঠক আজও অনেক কিছু আশা করতে পারে।

উপন্যাস

শৈলানন্দ মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

তেইশ ॥

লালু এখানে এলো কেমন করে ?

চারু ডাক্তার কথাটা প্রথমে বুঝতে পারেন নি। ভেবেছিলেন—পারুলের কোন চাকরের নাম বুঝি লালু।

কথাটা ভাল করে জিজ্ঞাসা করবার জন্যে পারুলের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন চারুবাবু।

"কাঁদছিস কেন ? ওঠ্। উঠে বোস্।"

পারুল উঠে বসলো, "কাঁদবো না ? তুমিই তো এই কাণ্ডটি করলে বাবা। প্রথম দিন থেকেই ছেলেটা হলো তোমার চক্ষুশূল। ছেলেটাকে নিয়ে তোমার কাছ থেকে লুকিয়ে পালিয়ে এলুম, তোমার তাও সহ্য হলো না।"

কথাগুলো অভিমানের কথা।

চারুবাবু বললেন, "সহ্য হলো না কী বলছিস ? আমি বলি—পরের ছেলে—"

কথাটা পারুল তাঁকে শেষ করতে দিলে না। বললে, হোক্ না পরের ছেলে ! সে হেফাজৎ আমি পোষাবো সে ঝক্কি-ঝঞ্ঝাট আমি সহ্য করবো। তাই বলে লালু একবার তোমার পাকীটা নিয়ে এসেছে ভামনগরে—অপরাধের মধ্যে কী, না আমি ছেলেটাকে নিয়ে পালিয়ে এসেছি। সেটা কি লালুর অপরাধ হলো বাবা ? সে দোষ তো আমার।"

চারুবাবু বললেন, "তোর কথাগুলো আমি ঠিক বুঝতে পারছি না পারুল।"

"তোমার মাথায় তো হোমিওপ্যাথি ছাড়া আর কিছু নেই বাবা, বুঝতে পারবে কেমন করে ? চব্বিশ ঘণ্টা শুধু ওষুধ আর রুগী ! রুগী আর ওষুধ।"

পারুল অনেকদিন তার বাবার সঙ্গে এরকম করে কথা বলেনি। মেয়ের তিরস্কার বাপের ভালই লাগছিল। চারু ডাক্তার হাসছিলেন পারুলের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে।

পারুল কিন্তু থামলো না। বললে, "লালু তোমার অতদিনের পুরণো ড্রাইভার, তাকে তুমি

মেয়ে তাড়িয়ে দিলে বাড়ী থেকে ? লালু যখন কেঁদে কেঁদে সেই কথা আমাকে এসে বললে তখন আমার মনের অবস্থাটা কিরকম হলো বল তো বাবা ?"

এতক্ষণ পরে কথা বললেন চারুবাবু।

"লালুকে আমি মেয়ে তাড়িয়ে দিয়েছি ?"

"হ্যাঁ।"

"সেই কথা এইখানে এসে সে বললে ?"

"হ্যাঁ।"

"তোকে জামবনীতে নিয়ে আসার জন্যে ?"

"হ্যাঁ বাবা হ্যাঁ। তোমার জামাইএর সামনে আরও কী সব কথা বলেছে শুনবে ?"

চারুবাবু বললেন, "হ্যাঁ বল্ তুই।—আমি শুনবো।"

পারুল বললে, "তুমি নাকি লালুকে বলেছো—'গাড়ী কি তোর বাবার ? আমাকে না বলে যেখানে খুশী নিয়ে চলে যাবি ?' লালু বলেছিল—'দিদিমণি বললেও যাব না ?' তুমি বলেছিলে—'না যাবি না। যে মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে—বাপের জিনিসের ওপর তার কোনও অধিকার নেই। জামাই বড়লোক, তাকে একটা গাড়ী কিনে নিতে বলবি।'

"এই কথা বলেছে লালু ?"

"হ্যাঁ। সেই জন্যেই তো ওকে এখানে চাকরি দিলাম। তোমার জামাই বললে, গাড়ি আমি কিনবো। যতদিন না কিনি, তুমি অজয়কে নিয়ে ঘুরে বেড়াও।"

পারুলের কথা বোধ হয় তখনও শেষ হয়নি। ঘরে ঢুকলো জামাইবাবু।

"না কোথাও নেই। আমি ষ্টেশনে গিয়েছিলাম। ষ্টেশন মাষ্টার বললেন—সন্ধ্যের ট্রেনে একখানা পুরো আর একখানা হাফ্ টিকিট বিক্রি হয়েছে সেয়ালদার। লালু কি ছেলেটাকে নিয়ে পালিয়ে গেল ?"

"নিশ্চয়ই গেল।" বলতে বলতে চারুবাবু উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, "লালু আমাকে ছাড়া মিছে কথা বলেছে। আমি তাকে তাড়াইনি, কিন্তু বলিনি। সে আমার কাছ থেকে ছুটি নিয়ে চলে এসেছে। এখন আমি বুঝতে পেরেছি তার মতলব।"

বলেই তিনি তার পকেট থেকে খবরের কাগজের ছাপা বিজ্ঞাপনটা বের করে জামাইএর হাতে দিয়ে বললেন, "পড়ে ছাখো। এই বিজ্ঞাপন লালু নিশ্চয়ই পড়েছে। এখন আমি সব বুঝতে পারছি।"

"কই, দেখি কি বিজ্ঞাপন ?"

পারুল একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়ে কাগজটা কেড়ে নিলে জামাইএর হাত থেকে। পড়ে দেখলে। বললে—

"এক হাজার টাকা পুরস্কার দেবে ? হুঁ, লালু ঠিক এই মতলব নিয়েই এসেছিল এখানে।—তাহ'লে কি হবে বাবা ?"

চারুবাবু বললেন, "এখন বুঝলি তো ?"

পারুল বললে, "বুঝেছি বাবা। লালু একটা পাকা শয়তান। ওকে আমি ভাল লোক ভেবেছিলাম। এই এক হাজার টাকার লোভে অজয়কে নিয়ে ও ঠিক পালিয়েছে। এখন কি হবে বাবা ?"

বিজ্ঞাপনের কাগজটা পারুলের হাত থেকে নিয়ে চারুবাবু বললেন, "আমি চললাম।"

পারুল জিজ্ঞাসা করলে, "তুমি কোথায় যাবে বাবা ?"

"লালুকে আমি খুঁজবো। এই টাকা ওকে আমি পেতে দেবো না কিছুতেই।"

পারুল বললে, "লালুকে পুলিশে খুঁজিয়ে দিতে পার না বাবা ?"

"চেষ্টা করবো।"

বলেই তিনি দোরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন, পারুল তার পিছু পিছু গিয়ে বললে, "কিন্তু ছেলেটার ব্যবস্থা কি করবে বাবা ?"

চারুবাবু বললেন, "যা হোক্ ব্যবস্থা একটা করবো নিশ্চয়ই।"

চারুবাবু আর এক মুহূর্ত দাঁড়ালেন না। হন্ হন্ করে বেরিয়ে গেলেন রাস্তায়।

পারুল তার স্বামীর হাতে ধরে বললে, "হ্যাগা, কি হবে ? এক হাজার টাকা পুরস্কার দিতে চেয়েছে। নিশ্চয় ওরা বড়লোক। ছেলে তাহ'লে ওরা আর দেবে না।"

"পরের ছেলে—না দিলেই বা কি করবে তুমি ?"

"তাহ'লে অজয় যে বলতো অনাথ-আশ্রমে ছিল। বড়লোক হলে অনাথ-আশ্রমে থাকবে কেন ?"

"জানি না বাপু, ছেলেটার জন্যে ঘুরে ঘুরে আমি হায়রাণ হয়ে গেছি। আমি আর ভাবতে পারছি না কিছু।"

এই বলে সে খাটের ওপর শুয়ে পড়লো।

চারু ডাক্তারের বয়স হয়েছে, কিন্তু আশ্চর্য্য, ক্লান্তি কাকে বলে তা যেন তিনি জানেন না।

ভায়নগরে ট্রেন ধরে এলেন তিনি শেয়ালদহ ষ্টেশনে। শেয়ালদহ ষ্টেশনে একটা ট্যাক্সি নিয়ে গেলেন সেই হোটেলে। হ্যারিসন রোডে যে-হোটেলটির ওপরের একটি ঘরের দরজায় তিনি তালাবন্ধ দেখে গেছেন।

চাকরটি তাঁকে দেখেই চিনেছে। বললে, আসুন বাবু আপনি একবার এসেছিলেন আমি বলেছি আমাদের ছোট ম্যানেজারকে। আপনি ওঁর সঙ্গে কথা বলুন।"

এই বলে সে দেখিয়ে দিলে তাদের ছোট ম্যানেজারকে। রোগা বিটবিটে কমবয়সী একজন ছোকরা চেয়ারে বসে বসে বিড়ি টানছিল। বললে, "নমস্কার। বসুন।"

চারুবাবু বসলেন। বসেই জিজ্ঞাসা করলেন, "আজ কোনও লোক এখানে এসেছিল একটি ছোট্ট ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে ?"

ছোট ম্যানেজার বললে, "আজ্ঞে না। হারানো ছেলে খুঁজে পাওয়া অত সহজ নয় মশাই। আমার ভাগ্নেটা হারালো, তাকে আর পাওয়াই গেল না। হাজার টাকার লোভ যেখানে কি হবে ?"

চারুবাবু বললেন, "যাঁরা বিজ্ঞাপন দিয়েছেন তাঁরা গেলেন কোথায় ?"

"চুলোয় যাবগে মশাই, আমার কি ? বসে থেকেই বা কি করবে বলুন। সেই যে বাড়িওলা লোকটা—নামটা ভুলে গেছি—তিনি গেলেন কাশী, আর বড়বাবু গেলেন বর্ধমান জেলায় ওঁর কলিয়ারী কলিয়ারী কি সব আছে বললেন—"

"কবে ফিরবেন ?"

"দু'চারদিনের ভেতরেই যে হোক একজন ফিরে আসবে নিশ্চয়ই। এদিকে তো আমার কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে কিনা!"

চারুবাবু বললেন, "আচ্ছা ধরুন, এর মধ্যে কেউ যদি ছেলের খোঁজ-খবর নিয়ে আসে তো কি হবে?"

ম্যানেজারবাবু বললেন, "আমি আছি কি জন্যে? ছাই ফেলতে ভাঙ্গা কুলো। সেই সকালে এসেছি—বাড়ী ফিরবো কত রাত্রে তার কোনও ঠিক ঠিকানা নেই। ওদিকে যান না, একবার ওপরে উঠে গিয়ে দেখে আসুন—ম্যানেজারবাবু গিন্নী খেয়ে-দেয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছেন।"

"আপনিই তো ম্যানেজারবাবু?"

"আজ্ঞে না। আমি ছোট। তিনি বড়। ওই নামেই ছোট ম্যানেজার। খেটেই মরি শুধু সারার মতন। তা ওই হারানো ছেলের সম্বন্ধে কি বলছিলেন?"

বলেই তার হাতের বিড়িটা ফেলে দিয়ে একটা বাতা টেনে এনে কলমটা হাতে নিয়ে ছোট ম্যানেজার বললে, "বলুন এইবার আপনার বক্তব্য—লিখে রাখি।"

"লিখে রাখবেন?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। আমার ওপর ওই হুকুম। পরের হুকুম তামিল করতেই তো জন্মেছি।"

চারুবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "ছেলেটাকে যদি আমি সঙ্গে আনতুম—কি করতেন আপনি?"

ছোট ম্যানেজার বললে, "আপনি তো দেখছি ভারি বোকা! বলছি—আমার কোনও হাত নেই, আমাকে যা বলে গেছেন আমি তাই করছি। আমার ওপর হুকুম হচ্ছে লিখে—নাম-ঠিকানা নিয়ে রাখা। তা সে ছেলেই আসুক আর ছেলের বাপই আসুক। বিন বলুন কি লিখবো।"

চারুবাবু একটু ভেবে বললেন, "আমার নাম-ঠিকানা লিখে রাখুন। যাঁদের ছেলে হারিয়েছে তাঁরা এলে বলবেন—আমার এই ঠিকানায় খোঁজ করতে। আর এর মধ্যে যদি কোনও লোক ছেলেটাকে নিয়ে এখানে আসে তো ছেলেটাকে রেখে দিয়ে লোকটাকে পুলিশের হাতে ধরিয়ে দেবেন।"

পুলিশের কথা শুনেই বোধকরি ছোট ম্যানেজারের চোখ দুটো বড় বড় হয়ে গেল। হাতের কলমটা নামিয়ে রেখে বললে, "দেখুন, পুলিশ-ফুলিশের হাঙ্গামায় আমি নেই। আপনি আসুন। নমস্কার।"

চারুবাবু ভাবলেন সেই ভাল। তাঁর নাম-ঠিকানা দিয়েই-বা কি করবেন? ছেলে তো তিনি দিতে পারবেন না। উঠে দাঁড়ালেন তিনি। বললেন, "নমস্কার। আমি আবার আসবো।"

ছোট ম্যানেজার আর অধিক বাকব্যয় করলে না। বললে, "আসবেন। আমি এইখানেই থাকবো। সকাল আটটা থেকে রাত্তির এগারোটা বারোটা পর্যন্ত।"

ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে ছিল। চারুবাবু উঠে বসলেন। বললেন "চলো হাওড়া ষ্টেশনে।"

শেষ ট্রেণটা তখন প্ল্যাটফর্মে এসে দাঁড়িয়েছে। বস্তিবাটির টিকিট করতে গিয়ে হঠাৎ তিনি থমকে দাঁড়ালেন। তাহ'লে হলোটা কি? ছেলেটাকে নিয়ে লালু তাহ'লে গেল কোথায়? কাশী যাবার কথা বলেছিল, কাশীই চলে গেছে নিশ্চয়। এদিকে তিনি চলে যাচ্ছেন বস্তিবাটি, ওদিকে পাকল বসে রইলো হাঁ করে। মাঝখান থেকে হারানো ছেলেটাকে পৌঁছে দিয়ে লালু এক হাজার টাকা পুরস্কার নিয়ে তার দেখানে খুশী চলে যাবে। মিথ্যাবাদী, বিশ্বাসঘাতক, শয়তান লালু। না, তা কখনই হতে পারে না। হতে দেওয়াটাও অন্যায়।

চারু-ডাক্তারের বস্তিবাটি যাওয়া হলো না। কাশীর ঠিকানা তাঁর পকেটেই রয়েছে। কাশীর একখানা সেকেণ্ড ক্লাসের টিকিট কিনে চারুবাবু ট্রেণে চড়ে বসলেন।

সারাটা রাত এই ট্রেণেই কাটাতে হবে তাঁকে। সঙ্গে কাপড় জামা কিছু নেই। যা পরে আছেন তাই। তা হোক্। টাকা আছে পকেটে। দরকার হয়—কিনে নিলেই চলবে।

কাশী। বারাণসী। বাবা বিশ্বনাথের লীলাক্ষেত্র। মা অন্নপূর্ণার রাজত্ব। চারুবাবু কাশী কখনও দেখেননি। যাবার সুযোগ এই প্রথম ঘটলো। দু'একদিন কাশীতে থেকে সব দেখেশুনে আসতে হবে।

ট্রেণে তাঁর ঘুম কখনও আসে না। জেগে জেগেই চলেছেন। ষ্টেশনে গাড়ী দাঁড়াচ্ছে আর তিনি নেমে পড়ছেন। এদিক-ওদিক তাকাচ্ছেন। যদি দেখা হয়ে যায় লালুর সঙ্গে। এই গাড়ীতেই তারা কাশী যাচ্ছে কিনা তাই-বা কে জানে।

কিন্তু না, মোগলসরাইএ নামলেন। গাড়ী বদল করলেন। বেনারস ক্যান্টনমেণ্ট ষ্টেশনে গাড়ী এসে দাঁড়ালো। কোথাও তাদের দেখতে পেলেন না।

তবে কি ছেলেটাকে নিয়ে সে অন্য কোথাও চলে গেল? তাই-বা কেমন করে সম্ভব?

এমনি-সব নানান্ কথা ভাবতে ভাবতে চারুবাবু ঠিকানায় গিয়ে পৌঁছোলেন।

গিয়ে দেখেন, যা ভেবেছিলেন ঠিক তাই। নীচের বারান্দায় লালু বসে রয়েছে।

চারুবাবু ভেবেছিলেন তাঁকে দেখে লালু হয়ত চমকে উঠবে। কিন্তু চমকানো দূরে থাক্ লালু দিব্য সহজ মানুষের মত উঠে এসে তাঁকে প্রণাম করলে।

চারুবাবু ঠিক পাথরের মত দাঁড়িয়ে রইলেন।

লালু গড় গড় করে বলে যেতে লাগলো—"আমি কাশী আসবো সে তো আপনাকে বলেইছিলাম। তা ভাবলাম হয়ত কাকা মরে গেলে দেশে আর ফিরতেই পারব না, তাই গেলাম একবার দিদিমণির সঙ্গে দেখা করতে। দিদিমণি তখন ছেলে হারানোর বিজ্ঞাপনটা দেখেছেন। বললেন, 'তুমি যখন কাশী যাচ্ছ তখন নিয়ে যাও ছেলেটাকে সঙ্গে করে।' একহাজার টাকা বক্‌শিস্ হয়ত তোমার কপালেই নাচছে।"

চারুবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "টাকা পেলে?"

লালু বললে, "আর বলেন কেন বাবু, সেদিক দিয়ে এক মুস্কিল হয়ে গেছে। যিনি টাকা দেবার মালিক—যিনি বড় কত্তা—এখানে এসে শুনছি তিনি নাকি বর্ধমান জেলায় কোথায় যেন গেছেন। এখানে যিনি রয়েছেন তিনি সেই তাঁকেই টেলিগেরাপ্ করতে গেলেন।

"ছেলেটা কোথায়?"

"ওই যে এ-বাড়ীর একজন চাকর আমাকে বসিয়ে রেখে অজয়কে নিয়ে কোথায় যেন গেল।"

চাকর গিয়েছিল দোকান থেকে মিষ্টি আনতে। হারানো ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে যিনি এসেছেন কলকাতা থেকে, সে সম্মানিত অতিথিকে মিষ্টি খাওয়াতে হবে বই-কি! উমেশ গেছে জয়নারায়ণবাবুকে টেলিগ্রাম করে সুখবরটা জানিয়ে দিতে এবং অবিলম্বে কাশী চলে আসতে। এক হাজার টাকা পুরস্কার যাকে দিতে হবে, হাতে-হাতে টাকাটা যখন সে তাকে দিতে পারছে না, তখন জয়নারায়ণবাবু এখানে

না আসা পর্য্যন্ত উমেশ লালুকে বলে গেছে, 'টেলিগ্রাম পেয়েই বড়বাবু এখানে চলে আসবেন। টাকার জন্যে ভাববেন না। এলেই টাকাটা পেয়ে যাবেন।'

লালু সেকথাও জানালে চারুবাবুকে।

বললে, 'এখানে খাওয়া দাওয়া করেই আমি কাকাকে একবার দেখতে যাব। তারপর—'

চারুবাবু বললেন, "না তারপর নয়, তুমি এক্ষুনি যাও।"

এতক্ষণ পরে লালু কেমন যেন একটু চম্‌কালো। এতক্ষণ সে হেসে হেসে কথা বলছিল, "এবার যেন তার মুখের হাসিটা হঠাৎ করে মিলিয়ে গেল। বললে, 'এক্ষুনি যেতে বলছেন?"

"হ্যাঁ এক্ষুনি যাও। তোমাকে আমি সহ্য করতে পারছি না।"

"এ কী বলছেন আপনি?"

চারুবাবু বললেন, "ঠিকই বলছি। পারুলকে বলেছ—তোমাকে আমি মেরে তাড়িয়ে দিয়েছি। আজও আমি তোমাকে মেরেই তাড়িয়ে দিতাম, কিন্তু তোমার গায়ে হাত তুলতে আমার ঘৃণা বোধ হচ্ছে। তুমি দূর হও।

লালু বুঝতে পারলে পরিস্থিতি সুবিধের নয়। চারুবাবু বোধহয় ওঁর মেয়ের সঙ্গে দেখা করেই এসেছেন।

লালুর মুখ দিয়ে আর কথা বের হচ্ছিল না।

চারুবাবু আবার বললেন, "পুলিশের হাতে যদি যেতে না চাও তো তুমি চলে যাও আমার সুমুখ থেকে।"

চাকর এলো অজয়কে সঙ্গে নিয়ে। চাকরের হাতে একটা খাবারের ঠোঙা। অজয়ের হাতে একটি চম্‌চম্।

চারুবাবু বললেন, "এই যে অজয়, আমাকে চিনতে পারছো?"

অজয় হাঁ করে তাকিয়ে রইলো চারুবাবুর মুখের দিকে। চেনা-চেনা মনে হচ্ছে, অথচ চিনতে পারছে না।

অজয় জিজ্ঞাসা করলে, "আমার মা কোথায়?"

অজয়ের মুখে আজ দু'দিন ধরে সেই এক প্রশ্ন—"আমার মা কোথায়?"

কোন্ মাকে খুঁজছে সে? পারুলকে না সরমাকে?

চারুবাবু জবাব দিতে পারছিলেন না। রাত্রি জেগে এসেছেন। দাঁড়িয়েও থাকতে পারছেন না। অজয়কে কাছে টেনে নিয়ে বসলেন সেইখানে।

অজয় এদিক ওদিক তাকিয়ে বললে, "লালু কোথায় গেল?"

চারুবাবু এতক্ষণ অজয়ের দিকেই তাকিয়েছিলেন। লালু কি করছে না করছে তিনি দেখেননি।

চাকর এলো একগ্লাস জল আর ডিস হাতে নিয়ে। ডিসের ওপর কয়েকটি চমচম।

সেও এসে বোধকরি লালুকেই খুঁজতে লাগলো।

"কোথায় গেলেন উনি?"

"কে?" চারুবাবু মুখ তুলে তাকালেন।

চাকর বললে, "অভয়কে যিনি এনেছেন—"

চারুবাবু দেখলেন, লাভু সত্যিই পালিয়েছে।

চাকর বোধকরি লাভুর সন্ধানে দোরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, সুমুখে দেখলে প্রকাশ এসে দাঁড়িয়েছে।

"শ্বশুরমশাই এসেছেন নাকি?"

চাকর বললে, "না তো! উমেশবাবু এসেছেন।"

চারুবাবুর দিকে নজর পড়লো প্রকাশের। অপরিচিত ভদ্রলোক। সঙ্গে একটি ছেলে।

প্রকাশ বললে, "এ কি সেই অভয় নাকি? যে ছেলেটি হারিয়ে গিয়েছিল?"

চাকরটা ভারি বিপদে পড়ে গেল। কি জবাব দেবে বুঝতে পারছিল না। চারুবাবু বললেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ, এই সেই অভয়।" [ক্রমশঃ

গল্পভারতীর নববর্ষ আরম্ভ হবার আগেই 'জীবনের যজ্ঞশালায়' শেষ করার কথা ছিল। কিন্তু গল্প-উপন্যাস এমনি জিনিস—যাকে থাম্ বললেই থামে না, জোর করে থামানও যায় না। কাজেই শেষ করা গেল না।

আশাকরি আগামী মাসেই শেষ হবে।

এবারে নববর্ষে 'শুভবিবাহ' নামে নূতন উপন্যাস আরম্ভ করলাম।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

পুরাতন পাতা

খেয়াল খাতা

[বাট বছর আগে 'ভারতী' পত্রিকায় একটি বিভাগ খোলা হয়। নাম দেওয়া হয়—"খেয়াল খাতা।" এই বিভাগে লেখকদের খেয়ালখুশীতে লেখা ছোটো ধরণের ছোট ছোট সরস রচনা মুদ্রিত করবার ব্যবস্থা করা হয়। সেই সব অমূল্য মুক্তাদানা লেখার ভিতর থেকে দুটি ছোট রচনা এই সংখ্যায় সংকলন করে দেওয়া হ'ল।]

ছুটকী সাহিত্য

সকল দেশের সাহিত্যেই ছুটকীর আদর আছে। বিশেষত ফরাসী ভাষায় এই ধরণের সাহিত্য অতুলনীয়। সেখানকার বহু রসিক লেখকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্প-ছুটকী ফরাসী ভাষার অলংকার বিশেষ। দেখা যেছি ইংরাজী ভাষায়ও এই ধরণের সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়াস হইয়াছে। বেকনের মত মহাজ্ঞানীও এই প্রণালীতে কতকগুলি লেখা লিখিতে ত্রুটি হন নাই। তবে সেগুলিতে ফরাসী সাহিত্যোচিত সরসতা নাই। সুইফট্-এর রসাল লেখনীও এই ধরণের ছুটকীর সৃষ্টি করিতে অগ্রসর হইয়াছিল। সেগুলি বেকনের রচনা অপেক্ষা সুপাঠ্য হইলেও ফরাসী ভাষার ছুটকীর স্থান অধিকার করে নাই। ইংরাজী গল্প কিছু কঠোর, কিছু একঘেয়ে, ইহাতে ফরাসী সাহিত্যের বিচিত্র ভঙ্গী নাই। বোধ হয় এই জন্যই ফরাসী ভাষায় ছুটকী সাহিত্যের এতটা ছড়াছড়ি হয়। আমার বিশ্বাস, বাংলা ভাষার সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে নিকট সম্বন্ধ থাকার দরুণই হোক অথবা অন্য কোন অনির্দিষ্ট কারণ বশতই হোক, বাংলা ভাষারও ফরাসী ভাষার ন্যায় কোমলতা সরসতা ও ভাষা-লীলার বিচিত্র ভঙ্গী যথেষ্ট পরিমাণ আছে। আশা হয় প্রতিভাশালী লেখকের হাতে পড়িলে এ ধরণের সাহিত্য খুলিবে ভাল। অতি অল্প কথায় নরচরিত্রের বা মনুষ্য-জীবনের কোনও একটি জটিল তত্ত্ব সরস ভাষায় প্রকাশ করাই এই প্রকার সাহিত্যের বিশেষত্ব; একটু রসিকতা থাকিবে কিন্তু তাহা হাল্কা হইবে না। ভাবটি গভীর হইবে অথচ তাহাতে বিকট গাম্ভীর্য থাকিবে না, চাই কি একটু বিদ্রূপের কটাক্ষ থাকিবে অথবা করুণার অন্তঃসলিল প্রবাহ ধীরে বহিয়া যাইবে। এইরূপে উজ্জ্বলে মধুরে মিশিলেই এই প্রকারের সাহিত্য সার্থক হয়। আমাদের কেমন প্রকৃতি, আমরা লিখিতে গেলেই লম্বাচওড়া গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ বা ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, সাহিত্যিক গবেষণা আসিয়া পড়ে, অথবা কবিতার আবেগ উচ্ছ্বাস দশ যোজন ধরিয়া উদ্গীর্ণ হইয়া পড়ে। ছুটকী লেখাটা আমাদের মাথায় আসে না। আমরা স্কাল্ ক্যাপ (Skull Cap)-এর আদর বুঝি না। মস্তকের শোভা সমৃদ্ধি বেশাইতে চল্লিশ গজ থান দিয়া পাগড়ী বানাই, সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বার বন্ধ করিয়া বিরাট বুদ্ধিমান "হবুচন্দ্র রাজার গবুচন্দ্র মন্ত্রী" সাজিয়া বসি।

চুটকী লিখিতে কেমন মায়া করে, এত বড়ো প্রতিভাটা দু'হাতে মাটি করিব। আমরা ভুলিয়া যাই যে, মাধ্যাকর্ষণ শক্তির বলে শূন্যে ভ্রাম্যমান সৌর জগৎ সৃষ্টি করিয়া বিধাতা যে কৌশলের পরিচয় দিয়াছেন, সুন্দরীর নাসিকার দোদুল্যমান ক্ষুদ্র মুক্তাটির নির্মাণে তাহা অপেক্ষা কম কৌশলের পরিচয় দেন নাই।

পাঁপর ভাজা

বিদ্রূপরসাত্মক কাব্য (Satire) সাহিত্যকলার পাঁপর ভাজা। বেশ মুখরোচক বটে কিন্তু অধিক খাইলে পেট গরম ও বদহজম হয়, রুচিবিকার ঘটে, সাধারণ খাদ্য আর ভাল লাগে না। আরও দেখুন, পাঁপর কাঁচা অবস্থায় অখাদ্য, মুখে তুলিতে ইচ্ছা করে না, দাঁতে জড়াইয়া যায়। কিন্তু ঘিয়ে বা তেলে ভাজিয়া পাতে দিলে তোফা কুড়মুড় করে, খাইতে বড় আরাম। ব্যঙ্গ বিদ্রূপ জিনিষটারও সামাজিক কদাচার, পারিবারিক কুৎসা, ব্যক্তি বিশেষের কুচরিত্র ইত্যাদি কদর্য উপকরণ। সেই কাঁচা অবস্থায় ঐ সব কুৎসা শুনিলে ভদ্রলোক কানে আঙুল দেন, শুনিতে কেমন যেন বাধ বাধ ঠেকে ; কিন্তু যখন সাহিত্যে সিদ্ধহস্ত হাসুইকরের আটকল ঘিয়ে ভাজিয়া সেই পরনিন্দারূপ কদর্য মাল পাঠকের পাতে দেওয়া হয় তখন সেটা বড় উপাদেয় লাগে।

—ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতী। ভাদ্র—কার্তিক। ১৩১২।

আজকের পাঠক-পাঠিকাদের বোধ করি জানিয়ে দেওয়া দরকার যে ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সে-যুগের শুধু যে একজন শ্রেষ্ঠ হাস্যকৌতুককথাশিল্পী ছিলেন তাই নয়, ওঁর ছিল অগাধ পাণ্ডিত্য ও সর্বশাস্ত্রজ্ঞানও বিরল ছিল। সে-সময়কার নবীন সাহিত্যিকদের তিনি ছিলেন গুরু স্থানীয়।

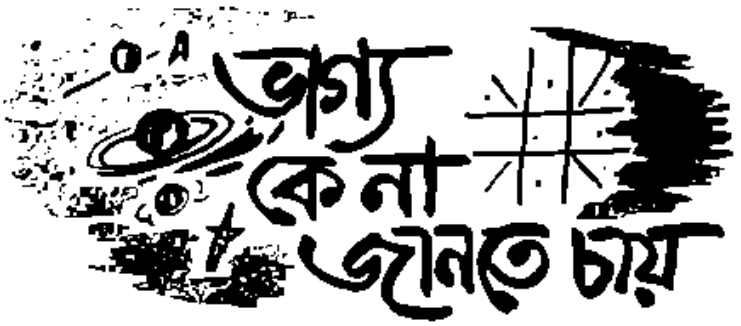

মহাশ্বেতা শর্মা

মানুষের যে সকল ইচ্ছা ও কৌতূহলের পেছনে শঙ্কিত অনিশ্চয়তা থাকে জ্যোতিষগণনা তার মধ্যে অন্যতম এবং প্রধান। অনিশ্চিত ভবিষ্যৎকে নিশ্চিতরূপে জানবার আগ্রহ সম্ভাব্য বিপদ বা অসুস্থতা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য হলেও কৌতূহল ঐ আগ্রহের অন্যতম অংশ। কবে এবং কে প্রথম এই জানার উৎসস্বরূপ আকাশের গ্রহ নক্ষত্রের দিকে দৃষ্টি দিয়েছিল কেউ জানে না। কিন্তু প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য জগৎ উভয়েই এই প্রথম সন্ধানের দাবীদার।

পাশ্চাত্য জগৎ বলতে যে ইয়োরোপকে বুঝায় তাঁরা অবশ্য নিজেরা এ বিদ্যার দাবীদার নয়। তাঁরা ভারতবর্ষ ও চীনের বিরুদ্ধে ব্যাবিলনকে দাঁড় করায়। তাঁরা বলেন, ব্যাবিলনীয়েরা প্রথম উপলব্ধি করে যে মানুষের ভাগ্য ও কর্ম গ্রহউপগ্রহের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। তাঁরা ভগবানের ইচ্ছা জানবার জন্য গ্রহনক্ষত্র আর বলি দেওয়া পশুর যকৃত দেখত। গ্রীস এই বিদ্যা ব্যাবিলন থেকে পায়। এর কিছু উন্নতি করে। গ্রীস থেকে মিশর ভারতবর্ষ প্রভৃতি এই বিদ্যা শেখে। সপ্তম থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী অবধি এই বিদ্যার চর্চা করে আরবরা। তাদের কাছ থেকে জ্যোতিষশাস্ত্র ইয়োরোপে ছড়িয়ে পড়ে এবং চতুর্দশ পঞ্চদশ শতাব্দীর ইয়োরোপের রাজসভাতে জ্যোতিষীরা প্রচণ্ড সম্মানের অধিকারী হয়।

চীন মনে করে খ্রীষ্টের জন্মের ২৮৫৭ বৎসর পূর্বে তাঁরা এই শাস্ত্র আবিষ্কার করেছিল। ভারতবর্ষ কোন সন তারিখ নির্দিষ্ট করে কিছু বলেনা। কিন্তু আদি গ্রন্থ ঋক্ বেদের দুটি সূক্ত (১।১।৬১।১৩ এবং ১০।৮৬।৪-৫) উল্লেখ করে দেখায় যে সেখানে গ্রহ নক্ষত্রের কথা আছে। সেখানে বলা হয়েছে, সূর্য মৃগশিরা সংক্রমিত হলে উত্তরায়ণ আরম্ভ হয়।

যাঁরাই এই শাস্ত্রের প্রথম আবিষ্কারক হোক না কেন অন্ত একটি কথাও এই প্রসঙ্গে পরে বুঝা গেল। অঙ্ক শাস্ত্রে প্রচুর জ্ঞান না থাকলে জ্যোতিষশাস্ত্র যথার্থরূপে আয়ত্ত করা যায় না। জ্যোতিষ-শাস্ত্রের নানা শাখা পাঠের জন্য অঙ্ক শাস্ত্রের ব্যক্ত আর অব্যক্ত অংশ, পাটিগণিত আর বীজগণিত সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অবশ্য প্রয়োজন। যাঁদের ঐ অভিজ্ঞতা হয়নি তাঁরা জ্যোতিষী নামধারী মাত্র, যথার্থ শাস্ত্রবিদ্ নন। কেন না, জাতকের ওপর গ্রহনক্ষত্রের প্রভাব স্থির করতে অতি সূক্ষ্ম গণনার প্রয়োজন হয়। বারটি রাশি ও বারটি গ্রহ উপগ্রহের সঙ্গে সাতাশ নক্ষত্রের স্থান ও দৃষ্টি শুধু নয়, প্রত্যেকটি রাশির ভগ্নাংশও বিচার সাপেক্ষ। লগ্নের অবস্থান হিসাবে মূল রাশিকে গ্রহণ করলেই হয় না। রাশির কোন ডিগ্রিতে হোরায় বা ড্রেকাণে লগ্নের অবস্থান এবং অন্যগ্রহের সঙ্গে যুগ্মত্ব বা নৈকট্য কতটা তাও লক্ষণীয়। অঙ্কশাস্ত্রে জ্ঞান না থাকলে এ ধরণের সূক্ষ্ম বিচার প্রায় অসম্ভব।

আরও একটি বিষয় অনুধাবনযোগ্য। হিন্দুদের জ্যোতিষশাস্ত্র দেবভাষা সংস্কৃতে লেখা। সকল লেখাই প্রাচীন যুগের। তখন বিভিন্ন শব্দের যে অর্থ ছিল কোন কোন ক্ষেত্রে তার পরিবর্তন ঘটেছে। অনেকক্ষেত্রে বাচ্যার্থের পরিবর্তে ব্যঙ্গার্থের প্রভাব বেশী। এ সকলও বিচারকালে লক্ষ্য করা উচিত, বুঝে নেওয়া উচিত। পাঞ্জিতে প্রতিমাসের জ্যোতিষ বিচারে দেখা থাকে, হাতে বা মুখে বা শরীরের

অন্য কোন অংশে কোন নক্ষত্রের প্রভাবে ফল মৃত্যু—কিন্তু এ মৃত্যু যথার্থ নয়। প্রায় মরণের ন্যায় কোন ঘটনা ঘটতে পারে এমন কিছু বুঝায়। প্রসঙ্গতঃ এখানে একটি ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রায় পনর বৎসর পূর্বে দক্ষিণ কলকাতার এক বিশিষ্ট নাগরিক তাঁর জ্যোতিষীর সঙ্গে আলোচনায় জানলেন যে তাঁর ওপর বজ্রপাতের সম্ভাবনা। তিনি চিন্তিত হয়ে সাবধানতার জন্য বাড়ীর ছাদে বাজ পড়লে ক্ষতি না হয় এজন্য লাইটনিং কনডাকটর বসালেন। কিন্তু অল্পকাল পরেই তাঁর কর্মক্ষেত্রে অভাবনীয় গোলযোগ দেখা দেয়। বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রচণ্ড আলোড়ন হয় এবং তাঁর মান মর্যাদা নষ্ট হয়ে যায়। এ ঘটনা তাঁর ওপর বজ্রপাতের সমতুল্য।

জ্যোতিষ শাস্ত্রের প্রতি আগ্রহ সাধারণ লোক অপেক্ষা ধনবান ও প্রভাব প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিদের অধিক। সাধারণ লোকে প্রতিদিন এ নিয়ে মাথা ঘামায় না। বিশেষ কোন উপলক্ষ্যে, বিবাহের ঘোটক বিচারে কিম্বা অসুস্থতার কারণে হয়ত জ্যোতিষীর নিকট যায়। তাঁর কথা শোনে। কখনও কখনও তুকতাক বা তান্ত্রিক ব্যবস্থাও অবলম্বন করে। প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে বরিশাল জেলার তেলা মহকুমার এক বিশিষ্ট ব্যবসায়ীর একটিমাত্র কন্যার ভাগ্য বিচারে বৈধব্য যোগ দেখা গেল। স্থানীয় সকল জ্যোতিষীই এই অভিমত দিলেন। কন্যার পিতার একান্ত আগ্রহে সেখানকার অন্যতম এক জ্যোতিঃশাস্ত্রবিদ কিছু তুকতাকের ব্যবস্থা করেন। অত্যন্ত গোপনে একরাত্রে পুরোহিত দিয়ে মেয়েটির সঙ্গে একটি বটগাছের বিয়ে দেওয়া হয়। পরদিন অতি প্রত্যূষে ঐ গাছটি বহুদূরে রোপণ করা হয়। এক বৎসর পরে মেয়েটির বিবাহ হয়েছিল এবং এখনও তাঁর স্বামী জীবিত আছেন।

প্রায় অনুরূপ একটি ঘটনা কলকাতা সহরেও ঘটেছিল। হাইকোর্টের একজন অ্যাডভোকেট তিনবার বিপত্নীক হন এবং প্রতিবারই বিয়ের অল্পকাল মধ্যেই দুর্ঘটনা ঘটে। তিনি আর বিয়ে করবেন না এমনই সঙ্কল্প করলেন। কিন্তু ঘটনা ঘটল অন্যরকম। একটি মেয়ের কঠিন ভৌমদোষের জন্য বিয়ে হচ্ছিল না। বিয়ের পরেই মেয়েটি বিধবা হবে জেনে শুনে তার মা বাবা অস্বস্তিতে ছিলেন। তারপরে কিভাবে যোগাযোগ ঘটল। অ্যাডভোকেট নিজের ভাগ্য যাচাই করতে বিয়েতে পুনরায় রাজী হলেন। তাঁদের বিয়ে হল। বিশ বৎসরের অধিককাল তাঁরা সুখে জীবিত আছেন। উভয়ে উভয়কে প্রতিনিয়ত ভৌম দোষ থেকে রক্ষা করে আসছেন।

জ্যোতিষী বিচারের পর অভীষ্ট ফল লাভের জন্য তান্ত্রিকতার ব্যবস্থাও অবলম্বিত হয়। এখানেও তেলা সহরের একটি ঘটনা উল্লেখ করা হল। কঠিন রোগে এক ভদ্রলোকের মৃত্যু নিশ্চিত জেনে তাঁর রোগমুক্তি সম্ভব কিনা এক জ্যোতিঃশাস্ত্রবিদকে প্রশ্ন করা হয়। তিনি উত্তর দেন যে ছিন্নমস্তার পূজায় রোগীর জীবন রক্ষা পেতে পারে। কিন্তু এ পূজার অনুষ্ঠান অত্যন্ত কঠিন এবং পূজক পাওয়া আরো কঠিন। কারণ রোগী ভাল হয়ে উঠলে পূজক এক বৎসরের মধ্যে মারা যাবে। কোন পুরোহিত এ পূজায় রাজী হলেন না। অবশেষে সেই জ্যোতিঃশাস্ত্রবিদ নিজে সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। নিশুতি রাত্রিতে ছিন্নমস্তার পূজা অনুষ্ঠিত হল। রোগী ক্রমশঃ সুস্থ হয়ে উঠলেন। তিনি এখন অশীতিপর বৃদ্ধ—তথাপি সুস্থ শরীরে আছেন। কিন্তু সেই জ্যোতিঃশাস্ত্রবিদ সে বৎসরই মারা গেলেন।

শুধু বিবাহে বা রোগমুক্তিতে নয়। প্রেমের ব্যাপারে, ব্যবসা বাণিজ্যে, মামলা মোকদ্দমায়, শেয়ার বাজারে, ঘোড়দৌড়ে, নির্বাচনে, নানাভাবে জ্যোতিষ শাস্ত্র আলোচনা করা হয়। গত নির্বাচনে

বিধান রায়, মহম্মদ ইসমাইলের নিকট পরাজিত হবেন এমন একটা অবস্থা দেখা দিল। বিধানবাবু প্রায় নিরুদ্বিগ্ন ভাবেই বলেছিলেন। মহম্মদ ইসমাইলের সাফল্যের সম্ভাবনাদ্বারা বলছিলেন তাদের তিনি বললেন, কিন্তু দেখ, জ্যোতিষী আমাকে বলেছে অল্প ভোটে হলেও আমি জিতব। আমাকে কাগজে লিখে দিয়েছে এ কথা।—বলে তিনি একখানা কাগজের লেখা দেখালেন। জ্যোতিষীর ভবিষ্যদ্বাণী অবশ্য সফল হয়েছিল। এই কলকাতা সহরেই জ্যোতিষীরা এরকম অসংখ্য ঘটনা বলতে পারেন। অর্থ ও প্রতিপত্তি লাভের জন্য, অভীষ্ট উন্নতির ইচ্ছায় সকল স্তরের লোক জ্যোতিষীর শরণাপন্ন হন। জ্যোতিষির নিকট হাইকোর্টের কেরানী তাঁর চাকুরীর উন্নতি হবে কিনা জানতে গিয়ে দেখে তাঁর জজসাহেবও সেখানে উপস্থিত। তাঁর প্রশ্ন তিনি এবার চিফ্ জাষ্টিস হবেন কিনা।

এ প্রশ্ন সকল দেশের মানুষের—একটু উচ্চস্তরের মানুষের মনে পরিব্যাপ্ত। যুক্তরাষ্ট্রের দেশ আমেরিকা—সেখানে এ ব্যাপারও প্রায় মাত্রা ছাড়িয়ে যাবার মত হয়েছে। সেখানে একজন জ্যোতিষী, ক্যারল রাইটার, তাঁর চেম্বারের সম্মুখে সূর্যের সিংহরাশিতে (আমাদের ভাদ্র মাসে) সংক্রমণকালে সিংহ বেঁধে রাখতেন। দু'হাজার ছয় পাউণ্ড ওজনের প্রকাণ্ড ষাঁড় থাকত বৃষ রাশিতে সূর্য গেলে (জ্যৈষ্ঠ মাস)। অথবা তিনটি বৃহৎ মেষ বাঁধা থাকত মেষ রাশিতে (বৈশাখ মাসে) সূর্য প্রবেশ করলে। ব্যবসায়ের প্রচারের পক্ষে অব্যর্থ বিজ্ঞাপনের মত এ সকল পন্থা কাজ করত। কোন কোন জ্যোতিষী বড়লোকদের জন্মদিন ও সময় সংগ্রহ করে তাদের সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করে তাক লাগিয়ে দিত। কিন্তু যেচ্ছায় জ্যোতিষীর নিকট যায়, তাদের অপর্যাপ্ত টাকা যেন এমন লোক সেখানে প্রচুর। ব্যবসায়ী, রাজনীতিবিদ এবং সিনেমার অভিনেতা অভিনেত্রী এদের মধ্যে সংখ্যায় অধিক। সেখানে বৃত্তিতে জ্যোতিষীর সংখ্যা পাঁচ হাজারের বেশী। আর প্রবৃত্তিতে বা পার্ট-টাইম জ্যোতিষীর সংখ্যা লক্ষাধিক। এদের সম্মিলিত উপার্জন বৎসরে দশকোটি ডলারেরও বেশী। কোন সময়ে যা হলে সন্তান জননীর ইপ্সিত খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠার অধিকারী হবে তাও মেয়েরা জ্যোতিষীকে জিজ্ঞাসা করে।

জ্যোতিষ শাস্ত্রের প্রতি আগ্রহ সমাজের উচ্চস্তর স্তরে ক্রমশঃ বাড়ছে। ইয়োরোপে, আরব দেশগুলিতে, দক্ষিণ আমেরিকায়, জাপানে সর্বত্র এর প্রভাব প্রকট হয়ে উঠছে। সিকিমের মহারাজা অলডুপ নামগিল সেদিন (১৯৬৩) আমেরিকার মেয়ে হোপকুককে বিয়ে করলেন। কিন্তু এক বছর আগেই মহারাজের বিয়ে করবার ইচ্ছে হলেও সিকিমের জ্যোতিষীরা তা তখন হতে দেয়নি। জাপানের যুবরাজ আকিহিতোর বিয়ের সময় অত্যন্ত যত্ন ও সতর্কতার সঙ্গে তাঁর কোষ্ঠি পরীক্ষা করা হয়। শিল্পপতিরা কোষ্ঠি অনুসারে শুভদিন না স্থির করে নূতন শিল্পে হাত দেয়না। দক্ষিণ আমেরিকায় বিশিষ্ট বিশিষ্ট পরিবারে এমন কি পরিচারিকা নিয়োগের সময়েও জ্যোতিষীর পরামর্শ নেওয়া হয়।

জ্যোতিষী কি নির্ভুল শাস্ত্র? বিশ্বাসীর নিকট নির্ভুল শাস্ত্র। অবিশ্বাসীর নিকট নয়। এবং একথা ঠিক যে; বিশ্বাস প্রবণতা জ্যোতিষ শাস্ত্রের অন্যতম প্রধান অবলম্বন। গণনার ভুলের জন্য দায়ী জ্যোতিষী—জ্যোতিষশাস্ত্র নয়। ভাল মন্দ চিকিৎসকের ন্যায় ভাল মন্দ জ্যোতিষী আছেন। তাঁদের বিদ্যা এবং গণনা; ক্ষমতার ওপর এ শাস্ত্রের প্রত্যক্ষতা নির্ভর করে। এখানে অনুরূপ একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করা হল। এর থেকে বুঝা যাবে এ শাস্ত্র মিথ্যা নয়।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের বিশিষ্ট অধ্যাপক ডা: নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই শাস্ত্রে বিশেষ দখল ছিল। তিনি নিজে গণনা করে নিজের মৃত্যুর দিন ক্ষণ জেনেছিলেন। তাঁর জানা সেই নির্দিষ্ট দিনে ও সময়ে তিনি অপেক্ষা করে আছেন। আহার্য প্রস্তুত। তাঁর স্ত্রী বার বার অনুরোধ করছেন ব'সে যাবার জন্য। অপেক্ষা করে করে সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেলে নারায়ণবাবু খুসী হয়ে উঠলেন। এ যাত্রা তিনি বেঁচে গেলেন। তাঁর মৃত্যুর সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। হাসিমুখে গৃহিণীকে বললেন সে কথা। তারপর স্নানের প্রাথমিক আয়োজনে তেলের বাটি নিয়ে বসলেন।

কিন্তু একটু পরেই যেন অসুস্থবোধ করলেন। স্তব্ধ হয়ে অপেক্ষা করলেন, গণিতই মনের ভুল না যথার্থ অসুস্থতা। বুঝলেন যে অসুস্থই তিনি বোধ করছেন; মনের ভুল নয়। তখনই সকলকে ডাকলেন। তারা ছুটল ডাক্তার ডাকতে। কিন্তু ডাক্তার যখন এসে তাঁকে দেখল, তাঁর দেহ তখন প্রাণহীন।

অধ্যাপক নারায়ণবাবুর গণনায় আংশিক ভুল ছিল—মাত্র অল্প ক'টি মিনিটের ব্যবধান।

জ্যোতিষ শাস্ত্রের প্রয়োজন সাধারণ লোকের হয়ত আছে। হয়ত নেই। কিন্তু বড়লোকের, বিত্তবানের, প্রতিপত্তিশালীর এতে অবশ্য প্রয়োজন। তাদের কাছে এ শাস্ত্র বাসন নয়, অস্ত্রাস্ত্র নিরূপক। সঙ্কট হলে তারা পয়সা দিয়ে জ্যোতিষীকে বাড়ীতে 'কল' দেন। নইলে নিজেরা তাঁর কাছে যান। এঁদের কাছে মনের কথা খুলে বলেন। জ্যোতিষীরাও উকিল আর ডাক্তারের ন্যায় মক্কেলের কথা সবই জানতে পারেন।

জ্যোতিষীরা তাঁদের শাস্ত্রের প্রভাবে হয়ত মক্কেলের না-বলা কথাও জানতে পারেন।

* * *

আর্মোনিয়ার যুবরাজ টাইগ্রেনস বন্দী হয়েছেন সাইরাসের হাতে। তাঁর প্রিয়তমা পত্নীও বন্দিনী।

পরে তাঁরা মুক্তি পেলেন।

কৃতজ্ঞ টাইগ্রেনস স্ত্রীকে প্রশ্ন করলেন, সাইরাসকে তোমার কি মনে হয়! তাঁর মহত্ত্ব আছে, তাই না আমরা মুক্তি পেলাম।

—সত্য বলতে কি, রমণী উত্তর করলেন, সাইরাস কি প্রকৃতির লোক তা আমি জানি না, কেননা আমি তার দিকে একবারও দৃষ্টিপাত করিনি।

—তাহলে তুমি সর্বক্ষণ কার দিকে তাকিয়েছিলে? টাইগ্রেনস উৎসুক হয়ে উঠলেন।

—আমি সর্বদাই চেয়েছিলাম। আমার স্বামীর দিকে যিনি আমার মুক্তিমূল্য হিসাবে আপন প্রাণ উৎসর্গ করেছিলেন সাইরাসের কাছে।

স্বগতোক্তি

ব্যাপার স্যা চলছে

চক্রপাণি

নানাদেশের নানাসংবাদ ও দুঃসংবাদের উপর টিকাটিপ্পনি। এই লেখার মতামতের জন্য গল্প-ভারতী-সম্পাদকের কোন দায়িত্ব নেই।

'মাম্বি তো মওার, বুটি তো ভাতার'—রাজারাজড়ার কথা দিয়েই সুরু করা যাক। ইংলণ্ডের রাজপরিবারে মহা দুশ্চিন্তা আর সমস্যা দেখা দিয়েছে। রাণীর বড়ছেলে দিন দিন বড় বেয়াড়া হয়ে উঠছে। কিছুদিন আগে তার ইস্কুলের হেড্‌মাস্টার তাকে বেত মেরেছিলেন। তা নিয়ে মহা হুলুস্থুল। ভাবী ইংলণ্ডেশ্বর বেত্রাহত !! রাণী বললেন, ঠিক হয়েছে, ছেলে বেয়াড়াপনা করলে শিক্ষক শাসন করবেন বৈকি। সাম্প্রতিকতম সংবাদে প্রকাশ যুবরাজ 'বিট্‌লেমি' সুরু করেছে, মাথায় বাবরি রেখেছে, যা নাকি গুরুদের ক্যাশানের পক্ষে (বিশেষ করে অভিজাতদের ঘরে) অতীব নিন্দনীয়। যুবরাজের বাবরি !! খবরটা বিশ্বয় রাষ্ট্র হতে আদৌও লাগল না। নানা পত্রিকায় নানা টিকাটিপ্পনি। অবশ্য মহলের খবর এখনো জানা যায় নি। রাণী সবে আঁতুড়ঘর থেকে বেরিয়েছেন। স্বামী নানা কাজে ব্যস্ত। খবরটা তাই চাপা আছে।

• • • •

আমাদের দেশে সংবাদপত্রের সম্পাদক হওয়া সোজা কথা নয়। তাঁর আর কোন গুণ থাকুক আর নাই থাকুক, তাঁকে দক্ষ অভিনেতা হতে হবে। দরকার হলেই মুখে করুণ কাতর ভাব ফুটিয়ে তুলতে হবে আবার প্রয়োজন দেখা দিলেই পরমুহূর্তেই সরস মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলতে হবে। কিছুদিন পূর্বে এক প্রখ্যাত ইংরেজি দৈনিকের একটি পাতায় তার সম্পাদকের দুটি ছবি বেরিয়েছে (স্মরণ রাখা দরকার, এই সব অভিনয়ের ছবি কাগজে ছাপ করবার জন্যে সম্পাদকের ফটোগ্রাফার পাশেই অপেক্ষা করে)—একটিতে তিনি শোকে কাতর, অন্যটিতে আনন্দে গদগদ। দুটি ছবির অভিব্যক্তিই চমৎকার।

• • • •

সাধাস ম্যাসিনার পোস্টমাস্টার জেনারেল বেলারমিনো মোজারো! একটি বোমা ছেড়েছেন বটে! সত্যি-কথার অ্যাটমবোমা। কথার চাবুক চালিয়েছেন তিনি! ব্যাপারটা ঘটেছে মার্কিনি সাপ্তাহিক সুখ্যাত 'টাইম' পত্রিকাকে নিয়ে। এই পত্রিকায় বিখ্যাত শিল্পী গয়া (Goya)-র একটি বস্ত্রনারীচিত্রের প্রতিলিপি যে সংখ্যার প্রচ্ছদপটে ছাপা হয় সেই সংখ্যাটির প্রচলন মোজারো বন্ধ করে দিয়েছেন—অর্থাৎ ডাকযোগে সেই পত্রিকা তাঁর এলাকায় কোথাও যাবে না। আর যায় কোথায়। চারদিকে হৈ-হৈ পড়ে গেছে। ডাক-বন্ধ করে দিয়েই এই ডাক-কর্তা ক্ষান্ত হন নি। তিনি যা বলেছেন তা আরও মারাত্মক। তিনি বলেছেন—"অনেক সাংবাদিক আমার কাজের প্রতিবাদ করেছেন। তাঁদের কথাবার্তা শুনে মনে হয় যেন ন্যাংটো ছবি ছাড়া পৃথিবীতে আসল শিল্পকর্ম বুঝি আর কিছু নেই। বলাবাহুল্য এই যে এই সব সাংবাদিক উত্তেজনার বেসাতি করেন, দুষ্কৃতিকারীদের তাঁরা কলাও করে প্রচার করেন, পাঠকমনে উত্তেজনার সঞ্চার করাই তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য, বিশেষ করে দেশের যুবক-যুবতীর

মনে হিংসা উৎপাদন করে তাঁদের কাগজের বিক্রি বাড়ানোর চেষ্টাই তাঁদের একমাত্র কাজ। অধুনা সভ্য-সমাজের পয়লা নম্বরের গুণ্ডাদল হচ্ছে এইসব সাংবাদিক। তাঁরা যা লেখেন তা বিশ্বাস করা যায় না। তাঁরা সংবাদ বিকৃত করেন, পাঠকদের বিভ্রান্ত করেন, অধম রুচি পরিবেশন করেন। রাজ্যের যত বদমাস আছে তাদের সকলের চেয়ে খারাপ হচ্ছে এইসব সাংবাদিক।"

ব্যস! যাকে বলে মৌচাকে ঢিল। চতুর্দিকে দারুণ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। উচ্চতম সরকারি পর্যায়ে পর্যন্ত কথা চলছে। আশ্চর্য নয়, এর ফলে হয়ত মোডারোকে চাকরিটি খোয়াতে হবে। তা যদি হয় তাহলে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শহীদদের মধ্যে হবে তাঁর স্থান।

• • •

"এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি।" সত্যিই পাওয়া যাবে না এমন দেশ, যে-দেশের লোক স্বদেশবাসীর নিত্য-আহার্য বস্তুতে অকাতরে বিষ মেশাচ্ছে, বিষ মেশাচ্ছে, শিশুদের খাদ্যে পর্যন্ত এমন ভেজাল দিচ্ছে যার বিষক্রিয়া "এটম-বমের" মতোই মারাত্মক! সমগ্র জাতির প্রাণশক্তিকে নষ্ট করবার এই যে বিবেকহীন অর্থগৃধ্নু চক্রান্ত, নৃশংসতায় তা হিটলারের ইহুদি নিধন-যজ্ঞকেও হার মানিয়েছে। অতএব এ জাতির মোক্ষলাভের আর বিলম্ব নেই। সম্প্রতি ভারত সেবক সমাজের রিপোর্টে জানা গেছে, মনে নাযক যে মশলা আমরা নিত্য উদরস্থ ক'রছি. তার মধ্যে আছে ঘুষিত ঘাস, গুঁড়ো মশলার মধ্যে ঘোড়ার বিষ্ঠা, টোমাটো সস-এর মধ্যে পচা অলাবুর রস, তিসিদানার মধ্যে অ্যাসেটিক অ্যাসিড, চালের মধ্যে পাথরকুচি, দুধের মধ্যে চকখড়ি, শুকনো লাল লঙ্কার গায়ে লেড অক্সাইড, হলুদের নামে বিষাক্ত গাছের শিকড়, তার গায়ে লেড ক্রোমেট লাগানো। এ ছাড়া ওষুধের মধ্যে স্বাস্থ্যহানিকর ভেজাল, দুধের মধ্যে পচা পুকুরো ফেলে-দেওয়া মিল্ক পাউডার। এইসব ঘুষিত পদার্থ যে জাতির জঠরে নিত্য প্রবেশ করছে সে জাতির জীবনে 'বিপ্রহরের ঘণ্টাধ্বনি' যে শীঘ্রই শোনা যাবে তাতে আর আশ্চর্য কি। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী তো স্বীকার করেই ফেলেছেন যে সরিষার তেলের নামে আমরা মদনের তেল খাচ্ছি। এই নিধন-ব্যবসায়ে যারা লক্ষ লক্ষ টাকা কামাচ্ছে তারা আছে লোকচক্ষুর অন্তরালে, প্রাসাদের অন্তঃপুরে, টাকার গদীতে সমাসীন—যে টাকা দিয়ে তারা রাজশক্তিকে পর্যন্ত কিনে ফেলেছে। সমস্ত দেশব্যাপী এই যাগযজ্ঞ চলেছে। দেশের অঙ্গে রন্ধ্রে প্রবেশ করেছে অনাচারের এইসব কালসাপ। এই সংখ্যায় 'অন্তরীক্ষে' প্রকাশিত ব্যঙ্গচিত্রটিতে তারই প্রতিফলন। বোম্বাইএর এক পত্রিকা সংবেদে লিখেছে: "This is nothing short of murder by adulteration. Yes, M-U-R-D-E R of the middle and poor classes. It is a story of bloody, shoddy, silent murder all round—murder by artificially-created scarcity, murder by exhorbitant prices, murder by poisonous foodgrains unfit for human consumption, murder at the hands of villainous profiteering swine!"

চেঁচালে কী হবে বন্ধু! চক্রীর রথ কী তাতে থামবে? "এ আমার এ তোমার পাপ।" তোমার পাপে আমার মৃত্যু, আমার পাপে তোমার। পিয়ে করেছে সর্পাঘাত, তাগা বাঁধবে কোথায়?

ফল ফলতে সুরু করেছে এরই মধ্যে। সাম্প্রতিক এক সংবাদে প্রকাশ, বর্তমানে বাজারে যে সরষের তেল বিক্রি হচ্ছে তা খেয়ে কলকাতায় এক ধরণের বিপজ্জনক রোগের প্রকোপ দেখা দিয়েছে। সুস্থ সবল লোক রাস্তায়-ঘাটে আফিসে-বাড়িতে হাত-পা ঠাণ্ডা বমি ও মাথা-ঝিমঝিমের

সঙ্গে অবশ হয়ে পড়ছে, এক কথায় চোখে সরষে ফুল দেখছে। জনৈক খ্যাতনামা চিকিৎসক এইরূপ কয়েকজন রোগীর চিকিৎসা করে অভিমত দিয়েছেন যে বর্তমানে বাজারে যে সরষের তেল বিক্রি হচ্ছে তা খেয়েই তাঁর রোগীরা এই রোগে আক্রান্ত হয়েছেন। এমন কি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীঅশোক সেন পর্যন্ত এই রোগে কাবু হয়েছেন। এই সংবাদ কাগজে বেরিয়েছে।

• • •

আমেরিকার বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি সুপ্রশস্ত কক্ষ। কয়েকটি পুতুল নিয়ে বসে আছেন অধ্যাপক মিস্ লুই কিংস্ল্যান··· শৈশবে মিস্ কিংস্ল্যান্ পুতুল নিয়ে প্রতি-বেশীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে আনন্দ বিতরণ করতেন; প্রচুর আনন্দ পেতেন নিজেও। পরিণত জীবনে পুতুল-নিয়ে-খেলাই হল তাঁর কাজ···তাঁর জীবনের পূর্ণ ব্রত।

কথা বলতে পারে না সহজভাবে কত ছেলে মেয়ে, কথা তাদের জড়িয়ে যায়, কথা বলার প্রয়াস হয় ব্যর্থ। মিস্ কিংস্ল্যানের ব্রত এই সব ছেলেমেয়েদের কথার জড়তা, ভাষার জড়তা দূর করে তাদের জীবনকে স্বাস্থ্যে ও আনন্দে ভরিয়ে তুলবেন, স্বাস্থ্য শুধু তাদেরই নয় সমাজেরও। কিন্তু কি করে উদ্‌যাপন করবেন তিনি এই মহৎ ব্রত?·····

মিস্ কিংস্ল্যানের স্মৃতিতে ভেসে উঠল তাঁর শৈশব। বুঝলেন তিনি সৃষ্টির আনন্দের প্রবল বন্যায় খড়কুটোর মত ভেসে যাবে সব বাধা, ভাষার জড়তা আর একালের সমস্যা। ·····সুরু হ'ল সাধনা, পরীক্ষা নিরীক্ষা চিন্তা এবং গবেষণা। ছাত্র-ছাত্রী জুটতে দেরী হল না; তাদের সকলকে নিয়ে তিনি প্রথমেই সুরু করে দিলেন পুতুল গড়া আর সেই পুতুলকে দিয়ে অভিনয় করানোর কাজ। লেখা হলো কাহিনী, তৈরী হলো মঞ্চ, কাহিনীতে সংযোজিত হোলো সংলাপ। মিস্ কিংস্ল্যানের পরিচালনায় ছাত্র-ছাত্রীরাই কিন্তু করল সব কিছু। সামনেই অভিনয়ের দিন; অভিনয়ও সুরু হলো। আশ্চর্য। দেখা গেলো প্রত্যেকেই তাদের জড়তাকে অনেক পরিমাণে কাটিয়ে উঠে আবৃত্তি করে চলেছে সংলাপ।·····

দুরারোগ্য ব্যাধি, কিন্তু কি সহজ অপূর্ব অনাড়ম্বর তার চিকিৎসা।

(উপন্যাস)

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

কে একজন বন্ধু নাকি হরেনবাবুকে বলেছিল—শীতকালে সবাই তো চেঞ্জে যায়, আপনি একবার গ্রীষ্মকালে গিয়ে দেখুন না!

কথাটা মনে ধরেছিল হরেনবাবুর। মধুপুরে তাঁর নিজের একখানা চমৎকার বাড়ী আছে, কিন্তু গ্রীষ্মকালে কখনও তিনি সেখানে যাননি।

বন্ধুর কথা শুনে যাবার ইচ্ছে হলো। গিয়ে একবার দেখাই যাক্ না! ভাল না লাগলে ফিরে আসতেই বা কতক্ষণ!

কলকাতা থেকে মধুপুর। কতটুকুই-বা পথ!

মধুপুরের বাড়ীর দোতলার চাবি নিয়ে একজন কর্মচারী গেল সেখানে। ঘরদোর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে রাখবে। যে মালীটা বাড়ী আগলায় তাকে একখানা চিঠি লিখে দিলেন হরেন চাটুজ্যে।

ঠিক হলো হরেনবাবু যাবেন, তাঁর স্ত্রী বরদাসুন্দরী যাবে আর যাবে তাদের ছোট ছেলে রবি।

ছবি আর রবি—দুটিমাত্র ছেলে। ছবি বড়, রবি ছোট। ছবির বয়স ষোলো-সতেরো, আর রবির বয়স বারো। ছবি থাকবে কলকাতার বাড়ীতে। তাকে নিয়ে গেলে তার পড়ার ক্ষতি হবে। রবিই চলুক সঙ্গে।

বরদাসুন্দরী বললেন, "রোজ রোজ আমি রান্না করতে পারব না কিন্তু। একে খোটা মানুষ, তার ওপর এই দুর্দান্ত গরম! একজন রাঁধুনী বামুন সঙ্গে নাও।"

রাঁধুনী বামুনের অভাব হলো না। পুরনো রাঁধুনী রইলো কলকাতার বাড়ীতে। একজন রাঁধুনী, একজন চাকর, আর ওঁরা তিনজন—স্বামী স্ত্রী আর ছোট ছেলে রবি।

"বই খাতা সঙ্গে নে। পড়তে হবে সেখানে গিয়ে।"

রবি বললে, "নিয়েছি বাবা।"

মানুষ মাত্র তিনটি, কিন্তু তাদের লট-বহর বাঁধা ছাঁদা হতে লাগলো তিনদিন ধরে। বড়লোকের চেঞ্জে যাওয়া। এলাহি কাণ্ড-কারখানা। হাওড়া ষ্টেশনে ফার্ষ্ট ক্লাস কামরা রিজার্ভ করা হলো। ট্রেনে যাতে কোনোরকম কষ্ট না হয় অনেকদিনের পুরনো চাকর মতি তার ব্যবস্থা করলে।

তারপর ভাল একটি দিন দেখে হরেনবাবু মধুপুর রওনা হয়ে গেলেন।

মধুপুরে বর্ষা তখনও নামেনি। বর্ষা নামবার সময় নয়। জ্যৈষ্ঠের মাঝামাঝি। দিনের বেলা অসহ্য গরম। বরদাসুন্দরীর কষ্টটাই যেন সব চেয়ে বেশি। গায়ের জামা খুলে ফেলে ঠাণ্ডা মেঝের ওপর গড়াগড়ি দেন আর বলেন, 'কীরকম মানুষ গো তুমি? যে যা বললে তাই শুনলে? না বাপু, আমার আর শরীর ভাল হয়ে কাজ নেই, চল কলকাতায় ফিরে চল।'

ফিরেই রওনা যেতে হতো কলকাতায় যদি-না মধুপুরের আকাশে মেঘ উঠতো।

মধুপুরটা কোনোরকমে পার করে দিতে পারলেই ব্যস্ বিকেল থেকে আর কোনও চিন্তা নেই। প্রতিদিন ঠিক একই সময়ে আকাশ অন্ধকার করে মেঘ উঠতে লাগলো। ঝির ঝির করে ঠাণ্ডা হওয়ায় শরীর যেন জুড়িয়ে যেতে লাগলো।

হরেনবাবু বললেন, 'হয়েছে তো?'

বরদাসুন্দরী বললেন, 'হয়েছে আর কোথায়? ঝম্ ঝম্ করে বৃষ্টি নামে—তবে তো!'

বৃষ্টি আর নামে না কিছুতেই!

তিন দিন পরে ঝড় উঠতে লাগলো রোজ। প্রচণ্ড ঝড়। বাগানে ছুটো বড় বড় আমের গাছ ছিল। আম ধরেছিল অনেক। কিন্তু একটি আমও আর গাছে রইলো না। ঝড়ের দাপটে সবই ঝরে পড়লো মাটিতে।

চার-চারটে পেয়ারা গাছে পেয়ারা ধরেছে প্রচুর। সেগুলো কিন্তু পড়লো না।

দিনের পর দিন ঝড় ক্রমশ বাড়তে লাগলো। ঝড়ের সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ চমকাতে লাগলো আকাশে, আর প্রচণ্ড মেঘের গর্জন।

শুধু ঝড় আর ঝড়!

ঝড় ঝড় করে গাছের ডালপালা ভেঙে পড়তে লাগলো। এমন ঝড় নাকি কেউ কখনও দেখেনি।

পাথরচাপটির বুড়ো বটগাছটা তো সেদিন মোটা মোটা শেকড়সুদ্ধ উপড়ে হুমড়ি খেয়ে পড়লো পথের ধারে। ভাগ্যিস্ লোকজন কেউ ছিল না কাছাকাছি। নইলে তারাও চাপা পড়ে মরতো।

বরদাসুন্দরী বললেন, রোজ রোজ এ কী হচ্ছে বল তো? আমার তো ভয় করছে—বাড়ীটাও কেন্‌দিন হুড়মুড় করে পড়ে যাবে না তো?'

হরেনবাবু বলেন, 'কাল বৈশাখী।'

'কাল বোশেখী না আমার মুণ্ডু! কাল বোশেখী তো বোশেখ মাসে হয়।'

'এবার একটু দেরিতে হলো।'

ঝড়ি চা দিয়ে গেল। দোতলার বারান্দায় বসে হরেনবাবু চা খাচ্ছেন, এমন সময় বৃষ্টি নামলো।

চোখ-ধাঁধানো বিদ্যুৎও নয়, বুক-কাঁপানো মেঘের গর্জনও নয়।

বরদাসুন্দরীর মুখে হাসি ফুটলো। বললেন, 'এতদিন পরে দেবতা মুখ তুলে চাইলেন। বাঁচলাম বাবা।'

বৃষ্টি আর থামে না কিছুতেই।

বরদাসুন্দরী বললেন, 'আজ শনিবার। শনির সাত, মঙ্গলের তিন। এ বাদল সাতদিনের আগে থামবে না দেখো।'

বরদাসুন্দরীর কথাই বুঝি সত্যি হলো।

সন্ধ্যা নামলো, রাত্রি হলো, বৃষ্টি তখনও চলছে।

মাঝে মধ্যে একবার একটু থানি থামে, আবার ঝম্ ঝম্ করে নামে।

সারারাত বৃষ্টি চললো। তার পরের দিন সকালেও দেখা গেল—বৃষ্টি বন্ধ হয়নি।

মাঝখানে একটুখানি থামলো। লোকজন বাটবাজার করে আনলে। তারপর আবার।

তিনদিন ধরে সমানে বৃষ্টি!

সাঁওতাল-পরগণার শুকনো মাটি—পাতাল খুঁড়েও যেখানে জল পাওয়া যায় না, গ্রীষ্মকালে বড় বড় ঁদারার জলও যেখানে শুকিয়ে যায়, সেই মধুপুরেও দেখা গেল পথের ধারে জল জমে গেছে।

হরেনবাবু বললেন, 'কড় কড় করে ব্যাং ডাকছে। মনে হচ্ছে যেন সকাল সকাল বর্ষা নামলো।'

মতিলালকে ডেকে বরদাসুন্দরী বললেন, 'বাজার থেকে ভাল দেখে মাংস নিয়ে আয় বাবা। বাদলার দিনে খিঁচুড়ি আর মাংস খেয়ে শুয়ে পড়ি। শীত-শীত করছে।'

খিচুড়ি আর মাংসের নামে উল্লসিত হয়ে উঠলেন হরেনবাবু। বললেন, 'ঠিক বলেছ। কিন্তু ঠাকুরের হাতে ছেড়ে দিলে সব মাটি হয়ে যাবে। মাংস তুমি নিজে রান্না কর।'

শেষ পর্যন্ত তাই হলো।

বরদাসুন্দরী নিজেই মাংস রান্না করলেন।

খাবার জন্য তৈরি হয়ে বসেছিলেন হরেনবাবু। এমন সময় এক দারুণ দুঃসংবাদ!

বরদাসুন্দরী হন্তদন্ত হয়ে দোতলায় উঠে এলেন।

'ওগো শুনছো? রবিকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।'

'সে কি কথা?'

হরেনবাবু বললেন, "বাড়ীতেই কোথাও আছে ভাখো। হয়ত ঘুমিয়ে টুমিয়ে পড়েছে। বৃষ্টি বাদলার দিন—"

বরদাসুন্দরী বললেন, "হন্য হন্য করে খুঁজেছি। কোথাও নেই। সকালে দুধ খেয়েছে, রুটি খেয়েছে, তারপর থেকে আর দেখিনি তাকে।"

"মতিকে বল একটু খুঁজে দেখুক। হয়ত রাস্তায় বেরিয়ে গেছে।"

"মতি চারবার খুঁজে এসেছে রাস্তায়। তোমাকে এতক্ষণ বলিনি।"

"তাহ'লে সে গেল কোথায়?"

ছাতিটা খুঁজতে লাগলেন হরেনবাবু।

বরদাসুন্দরী জিজ্ঞাসা করলেন, "ছাতি কি হবে?"

"নিজেই একবার খুঁজে দেখি।"

"খেয়ে গেলে হতো না? সব যে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।"

"তা হোক্।"

হরেনবাবুর খাওয়া আর হলো না। ছাতি হাতে নিয়ে নিজেই বেরিয়ে গেলেন ছেলের খোঁজে।

এই ছেলের খোঁজ করতে গিয়েই হরেনবাবুর পরিচয় হলো বরেনবাবুর সঙ্গে।

বরেনবাবুও বেরিয়েছেন ছাতি হাতে নিয়ে। তিনিও কাকে যেন খুঁজে বেড়াচ্ছেন।

"আপনি কাকে খুঁজছেন দাদাই?"

বরেনবাবু বললেন, "আর বলেন কেন দাদা, আমি আমার মেয়েটাকে খুঁজে পাচ্ছি না। এই বৃষ্টি-বাদলার দিন—কোথায় যে গেল হতভাগা মেয়ে!'

এই বলে তিনি এদিক-ওদিক তাকিয়ে চীৎকার করতে লাগলেন, "লক্ষ্মী! লক্ষ্মী!"

হরেনবাবু ম্লান একটু হাসলেন।

"দু'জনেরই দেখছি সমান অবস্থা। আমিও আমার ছেলেকে খুঁজে পাচ্ছি না।—কোথায় থাকেন আপনি?"

বরেনবাবু আঙুল বাড়িয়ে দেখিয়ে দিলেন, "ওই তো পাথরচাপটির ওই গলির ভেতর—'বিশ্বনাথ ভিলা'।"

হরেনবাবু বললেন, "তাহ'লে আমার বাড়ীর কাছেই বলুন। আমি থাকি গোপালকুটীরে। তা মশাইএর নাম ?"

বরেনবাবু বললেন, "আমার নাম শ্রীবরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

"বা-বা-বা, বেশ মিল হয়ে গেল তো! আমার নাম হরেন চাটুজ্যে আর আপনি বরেন বাঁড়ুজ্যে ?"

এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে দু'জনেই পথ চলতে লাগলেন। পথের ধারে এখানে ওখানে খানা-ডোবায় জল জমে গেছে। তারা গাছের ডাল পড়ে রয়েছে যেখানে সেখানে।

"তাইতো। কোথায় গেল বলুন দেখি।"

দু'জনেরই সেই এক প্রশ্ন!

বরেনবাবু বললেন, 'থানায় খবরটা দিলে হয় না ?

হরেনবাবুর তখন মাথা খারাপ হয়ে গেছে। একে তখনও খাওয়া হয়নি। খাবার ফেলে তিনি উঠে এসেছেন, তার ওপর ছেলের কোনও সাড়াশব্দ কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। বললেন, "থানায় কি করবে? তারা আমার ছেলেকে খুঁজে বের করে দেবে ?"

বরেনবাবু বললেন, "দেওয়া তো উচিত।"

"চলুন তাহ'লে থানাতেই যাই।"

থানাটা কোন্‌দিকে তাও তো জানা নেই!

পথে লোকজনও কেউ নেই যে জিজ্ঞাসা করে। বৃষ্টি-বাদলার দিনে কেই-বা বেরুচ্ছে বাড়ী থেকে।

অনেকক্ষণ সাঁওতাল আসছিল। হরেনবাবু তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, "হাঁরে পুলিশ থানা কোন্‌খানে জানিস ?"

একজন সাঁওতাল থমকে দাঁড়ালো। —"কি বলছিস্ বাবু ?"

"থানা কোন্‌দিকে বলতে পারিস্ ?"

"না বাবু, বলতে পারবো।" বলেই সে চলে গেল।

রাস্তার ধারে একটা ফটকওলা বাড়ী। বরেনবাবু বললেন, "এই বাড়ীতে জিজ্ঞাসা করি—আসুন।"

ফটকে হাত দিতেই কোথায় ছিল একটা প্রকাণ্ড কুকুর, ঘেউ ঘেউ করে এমন তেড়ে এলো যে বরেনবাবু পালাতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে রাস্তার ওপর উল্‌টে পড়ে গেলেন। হরেনবাবু এগিয়ে গেলেন তাঁকে তুলতে।

কাদায় পড়েছিলেন বরেনবাবু। জলে কাদায় জামাটা গেছে নষ্ট হয়ে।

বরেনবাবু বললেন, "মরুক্ হতভাগা মেয়ে। চলুন বাড়ী যাই।"

হরেনবাবু বললেন, "বাড়ী যাব কি মশাই, ছেলেকে না নিয়ে গেলে গিন্নি আমাকে আস্ত রাখবে ভাবছেন ? আসুন—দেখি।"

দেখবার প্রয়োজন হলো না। একটি ছেলের হাত ধরে একজন ভদ্রলোক আসছিলেন।

হরেনবাবু এগিয়ে গিয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "থানাটা কোন্‌দিকে বলতে পারেন ?"

ভদ্রলোক বললেন, "এখান থেকে একটু দূর হবে। এই রাস্তা দিয়ে সোজা চলে যান। ওই যে দেখছেন বাগানওলা বাড়ীটা—ওর পাশ দিয়ে যে রাস্তাটা বেরিয়ে গেছে সেই রাস্তা ধরে একটু গিয়েই দেখবেন—বাঁদিকে একটা দেবদারু গাছ—সেই গাছের কাছে একটা টিনের বাড়ী—সেইখানে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেই দেখিয়ে দেবে থানাটা।"

হরেনবাবু আর বরেনবাবু চললেন থানার দিকে।

কাদামাখা জামা গায়ে দিয়ে যাবার ইচ্ছা ছিল না বরেনবাবুর। তবু তাঁকে যেতে হলো।

খুঁৎ খুঁৎ করতে করতে সারাটা পথ মেয়েকে গালাগালি দিতে দিতে বরেনবাবু গেলেন হরেনবাবুর পিছু পিছু।

রাস্তাটা কম নয়। চলছেন তো চলছেন।

হরেনবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "কোত্থেকে এসেছেন আপনি?"

"আরে মশাই, বলছি তো—'বিশ্বনাথ ভিলা'। নামেই 'বিশ্বনাথ ভিলা'—তিনখানা ঘর। কুড়ি টাকা ভাড়া। তাও তো দুখানা ঘর খোলার খাপ্‌রা দিয়ে তৈরী। একটাতে তো ঝম্ ঝম্ করে জল পড়েছে কাল সারা রাত। এখান থেকে পালাতে পারলে বাঁচি।"

হরেনবাবু বললেন, "আমি সেকথা জিজ্ঞাসা করছি না। মধুপুরে এসেছেন কোত্থেকে?"

"এসেছি কলকাতা থেকে। আর মশাই, এসেছি প্রাণের দায়ে। স্ত্রীকে নিয়ে আজ তিনটি বছর একেবারে নাস্তানাবুদ হয়ে গেলাম। ডাক্তার কোবরেজ—সব জবাব দিয়ে দিলে। হোমিওপ্যাথি ডাক্তার তো ওর পান-জরদা খাওয়া দেখে বললে—আমার ওষুধ ধরবে না। আপনি অন্য চেষ্টা দেখুন। পান মুখে না থাকলে ঘুম হয় না—শুনেছেন কখনও? রাত্রে বার-পাঁচেক উঠতে হয় পান-জরদা খাবার জন্যে। সবাই বললে—পশ্চিমে কোথাও চেঞ্জে নিয়ে যাও—ভাখো যদি সারে। তাই নিয়ে এলাম এইখানে। নইলে এসময় কেউ চেঞ্জে আসে—কই, আপনিই বলুন না!"

হরেনবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনার ছেলে মেয়ে ক'টি?"

বরেনবাবু বললেন, "ছেলে একটি, মেয়ে একটি। এই মেয়েটিই ছোট—ছেলেটি বড়। তাও আবার দেখুন কিরকম খোয়ার দেখুন! আচ্ছা, মেয়েটা গেল কোথায় বলুন দেখি!"

"আমারও তো সেই ভাবনা! আমারও তো এইটি ছোট ছেলে।"

বরেনবাবু বললেন, "খবরের কাগজে একবার ছেলেধরার কথা পড়েছিলাম। সেইরকম কিছু হলো না তো?"

হরেনবাবু বললেন, "তার মানে—আপনি বলতে চান—ছেলেটাকে আর মেয়েটাকে ছেলেধরায় ধরে নিয়ে চলে গেল?"

বরেনবাবু বললেন, "তবে আর থানার কথাটা আমার মনে হলো কেন? পুলিশে খবর দিলে দেখি যদি কিছু সুরাহা হয়!"

"অসম্ভব ছেলেটাকে আর মেয়েটাকে ধরে নিয়ে চলে যাবে? তারা চেঁচাবে না?"

"চেঁচালেই বা শুনছে কে? বৃষ্টি পড়ছে না ঝম্ ঝম্ করে?"

হরেনবাবু এবার থেমে গেলেন। ছেলেধরার কথাই ভাবতে লাগলেন বোধহয়। খানিক পরে বললেন, "তাহ'লে ট্রেনে একবার গেলে হতো না? ছেলেধরারা তো ট্রেনে চড়েই যায়—"

বরেনবাবু ঘাড় নেড়ে বললেন, "উঁহুঁ। আমার মেয়েটা খুব চালাক। লোকজন দেখলেই চেঁচামেচি করবে। না মশাই, আমার মাথাটা গোলমাল হয়ে গেছে। আমি কিছু ভাবতে পারছি না। এই তো আপনার সেই টিনের ঘর। এইখানেই জিজ্ঞাসা করতে বলেছিল না?"

সুমুখে তাকিয়েই হরেনবাবু বলে উঠলেন, "ওই তো থানা। আসুন।"

সম্পূর্ণ পরিচিত বরেনবাবুকে সঙ্গে নিয়ে হরেনবাবু ঢুকলেন গিয়ে থানায়।

থানার দারোগাবাবু তো মুখ টিপে টিপে হাসতে লাগলেন।

হরেনবাবু বললেন, "আমাদের এইরকম একটা বিপদ, আর আপনি হাসছেন মনে হচ্ছে।"

দারোগাবাবু বললেন, "এরকম তো আজকাল হামেশাই হচ্ছে। এর জন্যে থানায় এসেছেন কেন? চিঠিপত্র কিছু লিখে যায়নি?"

"চিঠিপত্র!"

হরেনবাবু তাকালেন বরেনবাবুর দিকে, বরেনবাবু তাকালেন হরেনবাবুর দিকে।

দারোগাবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "কতদিনের পরিচয়?"

"কার?"

দারোগাবাবু বললেন, "এই ছেলের আর মেয়ের?"

হরেনবাবু বললেন, "পরিচয় কি বলছেন? কেউ কাউকে চেনেই না।"

দারোগাবাবু আর একবার হাসলেন। বললেন, "ওই আনচেই থাকুন। কাছাকাছিই বাড়ী তো?"

হরেনবাবু বললেন, "হ্যাঁ তা কাছাকাছিই বলতে পারেন।"

বরেনবাবু বললেন, "বিশ্বনাথ চিলা' আর কেষ্টকুটীর—"

হরেনবাবু তাঁর ভুল সংশোধন করে দিলেন। "কেষ্টকুটীর নয়, গোপালকুটীর।"

দারোগাবাবু বললেন, "আপনারা হয়ত জানেন না—এমনও হ'তে পারে।"

হরেনবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "কী হতে পারে?"

দারোগাবাবু বললেন, "এই ধরুন, আজকাল এরকম প্রায়ই হয়। এই সেদিন—বুঝলেন কিনা—রেল-ষ্টেশনও-পার থেকে ভবতোষবাবু বলে' এক ভদ্রলোক এলেন ছুটতে ছুটতে—কি? না তাঁর মেয়েকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ঠিক আপনাদের মতন কেস্। তার তিনদিন পরে ধরা পড়লো গিয়ে বর্ধমান ষ্টেশনের ওয়েটিং রুমে। তা ওদের দোষ কি বলুন! আপনারা সব আজকাল মেয়েদের বিয়েই দিতে চাইবেন না—বড় বড় মেয়ে রেখে দেবেন বাড়ীতে। আগেকার দিনে—একরকম ধরতে গেলে নিয়মটা ভালই ছিল। মেয়েদের ন' দশ বছর হয়েছে কি—খোঁজ, খোঁজ, পাত্র খোঁজ,—ঠিকবলেছি কিনা?"

এই বলে নিজের রসিকতায় নিজেই হাসতে লাগলেন দারোগাবাবু।

হরেনবাবু বুঝতে পারলেন তিনি কি বলতে চান। বললেন, "আপনি ঠিক বুঝতে পারেননি দারোগাবাবু। আমাদের ছেলেমেয়ে ছুটে। প্রেম-ফ্রেম করে পালায়নি বাড়ী থেকে।"

দারোগাবাবু বললেন, "তবে?"

হরেনবাবু বরেনবাবুকে দেখিয়ে বললেন, "এঁর মেয়ের বয়েস—কত হবে বলুন না!"

বরেনবাবু বললেন, "ন' বছর পেরিয়ে সবে দশে পড়েছে।"

হরেনবাবু বললেন, "আর আমার ছেলের বয়েস হলো গিয়ে বারো।"

দারোগাবাবু তখন তাঁর ডায়েরীর খাতাটা টেনে নিয়ে বললেন। বললেন, "বসুন। এসেছেন যখন, ডায়েরী একটা লিখে নিই।"

দারোগাবাবু ডায়েরী লিখে দু'জনকে সই করিয়ে নিয়ে বললেন, "আসুন এবার। নমস্কার।"

হরেনবাবু বললেন, "বাস্? হয়ে গেল?"

বরেনবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "এবার আমরা কি করবো বলুন।"

"কী আবার করবেন? বাড়ী যাবেন।"

বরেনবাবু তাকালেন হরেনবাবুর দিকে। হরেনবাবু তাকালেন বরেনবাবুর দিকে।

[ক্রমশঃ

আজও যা ভুলিনি

সভাপতিত্বের মাসুল

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

বয়স হল ৮০ বছর। এই সুদীর্ঘ জীবনে সংসারের নানা পথে বিচরণ করেছি। সামাজিকক্ষেত্রে, রাজনীতিক্ষেত্রে, সাহিত্যের ক্ষেত্রে, নাট্যপীঠ এবং সিনেমারক্ষেত্রে—সকল ক্ষেত্রেই উল্লেখযোগ্য ঘটনা কিছু কিছু ঘটেছে, সেসব ঘটনার কথা আড়ালে—ইঙ্গিতে নানা রচনায় প্রকাশ করেছি। আজ যে ঘটনার কথা উল্লেখ করছি, তার মধ্যে একটু মজা আছে—এবং একথা ছাপার অক্ষরে আজ এই প্রথম প্রকাশ করছি।

ইংরেজি ১৯২২ সালের কথা। তখন আমার বয়স ৩৮ বছর—ওকালতি-পেশা চালাবার সঙ্গে সঙ্গে ভারতী পত্রিকার সম্পাদনা করছি। সে বছর সরস্বতী পূজার সময় তমলুক-এর এক ভদ্রলোক এলেন—সঙ্গে মুকুন্দি আমাদের বন্ধু কবি গিরিজাকুমার বসুকে নিয়ে। তিনি বল্লেন—সরস্বতীপূজার দিন তমলুকে তাঁদের Association-এর সারস্বত সম্মিলন (Anniversary) আমাকে সেই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করতে যেতে হবে। বন্ধুবর গিরিজাকুমার বল্লেন,—তাঁর স্ত্রী তমাললতার পিসেমশায় ওখানকার খুব বড় উকিল,—তাঁর গৃহে আতিথ্য, কোনও কষ্ট হবেনা। তাঁরা নাছোড়-বান্দা—আমাকে যেতেই হবে। বুঝলুম, আমি যখন পত্রিকার সম্পাদক, তখন সভায় সভাপতিত্ব করবার অধিকার এবং শক্তি আমার পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান।

অনেকের ধারণা যাঁরা পত্রিকার সম্পাদনা বা পরিচালনা করেন, তাঁদের মত সর্বজ্ঞ আর কেউ নেই। এ ধারণা এখনও অনেকের মনে বেশ বদ্ধমূল আছে। আমাকে রাজী হতে হোল; এবং স্থির হলো সরস্বতী পূজার দিন সকাল সাতটার ট্রেনে যাত্রা করতে হবে, তোরে গিরিজাকুমার, তমাললতা এবং সেই ভদ্রলোক ট্যাক্সি নিয়ে আমার বাড়ীতে আসবেন, এসে আমার ট্যাক্সিতে তুলে ষ্টেশনে যাওয়া করবেন।

সরস্বতী পূজার দিন ভোরের আলো ফোটবার আগে—অর্থাৎ ছটা বাজবার আগেই ওঁরা এসে হাজির। এলেই তাড়া। তাঁদের তাড়ার চোটে আমার মনে হল না, একটু চা পর্যন্ত পান করবার সুযোগ পেলুম না—একটা কিট ব্যাগে কাপড় চোপড় কিছু পুরে তাঁদের সঙ্গে রওনা হলুম। কিন্তু দুর্দৈব! পথে ঘোষের গাড়ির ভীড় এবং অন্যান্য বাধা অতিক্রম করে বেলা সাতটা দশ মিনিটে ষ্টেশনে পৌঁছে শুনি ট্রেন সাতটায় ছেড়ে গেছে। Next train বেলা আটটায় ছাড়বে। আমার ছোট ভাই তখন Howrah Hospitalএ Resident Surgeon। আমি বল্লুম, এখনও হাতে একঘণ্টা সময় আছে, আমি চট্ করে আমার ছোট ভাইয়ের কোয়ার্টারে গিয়ে এক পেয়ালা চা খেয়ে আসি। হাসপাতাল এই ষ্টেশনের গায়েই। তাঁরা যেতে দিলেন না, বল্লেন,—ষ্টেশনের ভাঁড়ের চা আপনাকে আনিয়ে দিচ্ছি খান। আমি বল্লুম,—না, দোকানের তৈরী চা আমি খাইনা, চায়ের আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে প্ল্যাটফর্মে একটু পায়চারী করে যথা সময়ে ট্রেনের কামরায় চারজনে উঠে বসলুম।

ট্রেনে তমলুক যেতে হলে পাঁশকুড়া ষ্টেশনে নামতে হয়। সেখান থেকে তমলুক ১৫ মাইল —এই পথ যেতে হয় বাসে চড়ে।

পাঁশকুড়া ষ্টেশনে পৌঁছলুম, বেলা তখন এগারোটা। প্ল্যাটফর্মে নামলুম। যে ভদ্রলোক আমাদের নিয়ে চলেছেন, ষ্টেশনে অফিসারদের সঙ্গে তাঁর বেশ পরিচয় আছে, দেখলুম। থাকবারই কথা, কারণ তিনি তমলুকের লোক এবং ট্রেনে প্রায়ই যাওয়া-আসা করেন। তাঁকে দেখে ষ্টেশন-ষ্টাফের এক কর্মচারী বল্লেন—তমলুকের বাস এখনও আসেনি—একঘণ্টার উপর Late নিশ্চয় পথে কোথাও Break-down হয়েছে। চায়ের পিপাসায় আমি আকুল, তার উপর এই খবর,—আমার একেবারে চক্ষুস্থির। ষ্টেশনে ভাঁড়ে চা বিক্রি হচ্ছে, সেই ভদ্রলোক এবং গিরিজাকুমার দুজনে দু'ভাঁড় চা কিনে খেলেন; আমাকে এক ভাঁড় offer করলেন। আমি বল্লুম, না। প্ল্যাটফরমে দেখলুম বিক্রি হচ্ছে লাল লাল জিলিপি আর নাড়ু—দেখলে মনে হয় যে সব যাত্রীর ক্ষিদের জ্বালায় মরণাপন্ন অবস্থা,—এমন অবস্থা যে কিছু না খেলে মারা যাবেন এবং এই বিষবৎ নাড়ু খেলেও মৃত্যুর আশঙ্কা ৫০% percent, তাঁরাই শুধু বরাত ঠুকে খেতে পারেন—নাড়ুর আর জিলিপির উপর মাছি বসছে, দেখলে খাবার প্রবৃত্তি হয় না—আর বিক্রি হচ্ছে দেখলুম বিস্কুট—এই বিস্কুট বোধহয় এই সব ছোটখাট রেল-ষ্টেশনেই পাওয়া যায়। কাজেই কণ্ঠে পিপাসা এবং উদরে ক্ষুধা নিয়ে প্ল্যাটফরমে পায়চারী করা এবং ষ্টেশন থেকে পূর্বদিকে যে পথ বন বাগানের মাঝ দিয়ে তমলুক গিয়েছে বাসের প্রত্যাশায় সেইদিকে নজর চালানো ছাড়া আর কোনও উপায় ছিল না। এইভাবে বেলা বারোটা পর্যন্ত কাটলো। দু'একখানা "Up" এবং "Down" প্যাসেঞ্জার ট্রেন ষ্টেশনে এসে দাঁড়ালো তারপর বাঁশী বাজিয়ে যে যার গন্তব্য পথে চলে গেল। আমি ক্ষুব্ধ নেত্রে চেয়ে চেয়ে দেখলুম।

বেলা একটা বাজে, তবু বাসের দেখা নেই। কাতর কণ্ঠে সেই ভদ্রলোককে নিবেদন জানালুম—আমি খুব অপয়া মানুষ,—আমায় ছেড়ে দিন।

আমি একটা ডাউন ট্রেন ধরে কলকাতা ফিরে যাই। আপনারা অন্য কাকেও ধরে সভাপতির গদিতে বসিয়ে দিন গিয়ে। তাঁরা বল্লেন,—পাগল! তাও কখনও হয়! বাস কত Late করবে আর? তাকে আসতেই হবে।

নিরুপায়—নিশ্বাস ফেলে প্ল্যাটফরমের বাইরের পথে এসে দাঁড়ালুম। ষ্টেশনের বাইরে খুব বড় এক কাঠের গোলা এবং গোলার একটু দূরে ছোট একটি দোকান। সে দোকানে পান, বিড়ি বিক্রি হয়—পান বিড়ি ছাড়া দেখলুম কিছু ডাল চাল তার আর এক অংশে মজুত আছে। মাথায় মতলব এল। দুঃখের কাহিনী দোকানীকে বলে তার কাছ থেকে চাল, ডাল কিনলুম, তাকে বল্লুম চারজনে খিচুড়ী পাকিয়ে খাব। নুন, তেল, মসলা দিতে পার? আর একটা হাঁড়ি? দোকানী বল্লে,—আজ্ঞে, না এই সামান্য, চাল ডাল পড়ে আছে এই আপনাকে দিতে পারি। তারপর পথের ডানদিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে দোকানী বল্লে,—ঘুরে ওই গাছপালার আড়ালে ওই বাড়ী ঘর দেখছেন—ওটা ছোট একখানি গ্রাম—ওই গ্রামে বারোয়ারী সরস্বতীপূজা হচ্ছে। ওখানে চাল, ডাল, নুন, তেল আমি সাপ্লাই করেছি। এই সামান্য চাল ডাল পড়েছিল, আমিও ওই গ্রামে থাকি।.....হাঁ হাঁড়ি আপনাকে দিতে পারবোনা—তবে একটা কলসী দিতে পারি, তার কানা ভেঙে হাঁড়ির মত করে নেবেন। আর রান্না? ওই যে কাঠের গোলা দেখছেন,

ওঁরা জাতে ব্রাহ্মণ। ওঁদের ওখানে গিয়ে বললেই ঘি, তেল, নুন, মসলা সব পাবেন এমন কি তরিতরকারীও পাবেন। ওঁরা ওখানেই সপরিবারে থাকেন। রাঁধবার জন্য উনুনের ব্যবস্থাও করে দেবেন। তখন মুদীর কাছ থেকে চাল, ডাল আর কাঁচা-তাজা কলসী নিয়ে কাঠের গোলায় গেলুম। মালিকের কাছে দুর্দশার কথা জানিয়ে খিচুড়ী রাঁধবার সুযোগ প্রার্থনা করলুম। বললুম,—আপনারা শুধু ঘি, তেল, নুন আর দু-চারটে আলু দিয়ে সাহায্য করুন, আমাদের সঙ্গে বৌদি আছেন তিনি রাঁধবেন, আপনাদের রাঁধবার কষ্ট দেবোনা।

চল্লিশ পয়তাল্লিশ বছর পূর্বেকার কথা,—তখনও মানুষের বুকে প্রাণটুকু বিলুপ্ত হয়নি এবং কালোবাজারের মহিমায় মানুষ লাভের অঙ্ক কষিয়ে অপরকে দয়াধর্ম করতো না। মালিক বল্লেন,—আপনারা?

গলায় পৈতে দেখিয়ে আমি বললুম,—ব্রাহ্মণ।

মালিক বল্লেন,—আমরা উনুন খরিয়ে দিচ্ছি মাটির নতুন হাঁড়ি দিচ্ছি,—ঘি, তেল, নুন আর কিছু সব্জী দিচ্ছি আপনারা রান্না করে খান। নাটকে নভেলে, কবিতায়, গানে পড়েছি লেখকরা একটা কথা লিখেছেন,—"অকূলে কূল" পাওয়া। এইটনার পূর্বে কখন অকূলে পড়িনি তাই তাঁদের একথার মর্ম কখনও উপলব্ধি করিনি, সেদিন করলুম। দ্রুত পায়ে প্ল্যাটফরমে এসে সকলকে একথা বলুম এবং তমালদাকে বলুম—পৈতে দেখিয়ে ওদের কাছে পরিচয় দিয়েছি আমরা ব্রাহ্মণ। সাবধান, আপনারা যে কায়স্থ সে পরিচয় ওঁরা না জানতে পারেন। জানলে উনুনের জলন্ত কাঠ সেটা করে জাত হারানো পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে পারেন। আমরা গোলায় এলুম, ওঁরা সব ব্যবস্থা করে দিলেন এবং বৌদি উনুনে খিচুড়ীর হাঁড়ি চাপালেন। গোলায় বসে মালিকদের সঙ্গে আমরা নানা রকমের গল্প করতে লাগলুম—পল্লী সংস্কারের কথা, কৃষি উন্নয়নের কথা এমনি গবেষণা মূলক উপদেশও পরামর্শ বর্ষণে ওঁদের তাক লাগাতে লাগলুম ওদিকে হাঁড়ির খবর নিয়ে জানলুম খিচুড়ীতে ঘুট ধরেছে···এমন সময় বাসের ভেঁপুরব। রবীন্দ্রনাথের গান মনে পড়ল।

"এখনও তারে চোখে দেখিনি-
শুধু বাঁশি শুনেছি।"

বাস চোখে না দেখলেও ওই হর্ণ শুনেই আমাদের মন প্রাণ আনন্দে অধীর হয়ে উঠল। গোলা থেকে বেরিয়ে এসে দেখি বাস ততক্ষণে তার waiting stand এ এসে দাঁড়িয়েছে। বাসের কণ্ডাকটর হাঁকছে,—বাস ভয়ানক লেট ১৫ মিনিট, ১৫ মিনিটের মধ্যেই বাস ছাড়বে। উঠে পড়ুন উঠে পড়ুন যে যে যাবেন। আমরা তখন খিচুড়ীর মায়া ত্যাগ করে বাসের কাছে ছুটে এলুম। গোলদারকে বলে এলুম, ক্ষমা করবেন আমাদের আর খিচুড়ী খাওয়া হল না। দয়া করে আপনারা খেলে কৃতার্থ হব।

জাত যাবেনা, আপনাদের এ দয়া কখনও ভুলবোনা। বাসের কাছে এসে দেখি যে ভদ্রলোক আমাদের নিয়ে এসেছেন তিনি ড্রাইভার আর কণ্ডাকটরকে দুটি টাকা দিয়ে বাসের সামনে ড্রাইভার এর পাশে আমাদের তিনজনকে বসবার ব্যবস্থা করেছেন। আমরা তিনজনে সামনে ড্রাইভারের পাশে বসলুম আর সে ভদ্রলোক ভেতরে বসলেন।

বাস চলে। বাস চলার সঙ্গে সঙ্গে কণ্ঠে পিপাসা এবং উদরে ক্ষুধার যে জ্বালায় জর্জরিত হচ্ছিলুম সে জ্বালার যেন কতক উপশম হলো। মনে হলো, আর কিসের চিন্তা বাস যখন পেয়েছি তখন, তমলুকে পৌঁছুবার আর বাকি কি। মনের সে আশা টুকুর আভাস পেয়ে ভগবান বোধহয় অলক্ষ্যে হেসেছিলেন! কেন একথা বলছি, আপনারা পরে বুঝবেন। বাস চলেছে। ভিতরে ঠাসাঠাসি গাদাগাদি যাত্রির দল—আমরা তিনজনে ড্রাইভারের পাশে বসে আরামে চলেছি। পথের দুধারে বনভূমির বিচিত্র দৃশ্যাবলী···পরে প্রতিফলিত আমার চোখে যেন স্বপ্নপুরীর ছবি জাগিয়ে তুলছিল। প্রায় ঘণ্টা দেড়েক পরে সাড়ে সাত মাইল দূরে Halting station-এ এসে বাস দাঁড়াল। পথের ডান দিকে হাট, হাটে তরিতরকারি, মাছ-কলমূল, পাঁঠা, ভেড়া, হাঁস প্রভৃতি বিক্রি হচ্ছে—লোকের খুব ভিড়। station-এ পেট্রোলের টিন, মোটরের যন্ত্রপাতি, টিউব vulcanise করবার সরঞ্জাম, পুরানো টিউব, টায়ার প্রভৃতি মজুত করা আছে। এখানে বাসে পেট্রোল ভরা হল, তারপর মিস্ত্রিরা গাড়ীর কলকব্জা প্রভৃতি পরীক্ষা করতে লাগল। আমরা হাটে ঢুকলুম, দুটি বালু হাঁস দেখে একটাকা দাম দিয়ে সেই দুটি কিনে তাদের ঠ্যাঙে দড়ি বেঁধে গাড়ীতে এনে সীটের তলায় রাখলুম। ১৪।১৫ মিনিট পরে বাস আবার চল্ল। এর পরের station তমলুক। মনে হলো এসে গিয়েছি! তখনও দিনের আলো নিভে যায়নি—সূর্য্য ডুব্-ডুব্ করছে।

দিব্যি চলেছি। আর ঘণ্টা পরে হঠাৎ···বোমা ফাটার শব্দ···চমকে উঠলুম—হ-য়-ব-র—যেন দৈত্যের নিঃশ্বাস। গাড়ী থামলো। ড্রাইভার এবং কণ্ডাক্টর বাস থেকে নামল। আমরা ভয়ে কাঁটা! গাড়ী প্রদক্ষিণ করে অত্যন্ত চিন্তাকুল ভাবে ওরা জানালো, পেছনের বাঁদিকের ডবল টায়ার ফেটেছে—পিছনে ফেলে আসা সেই Halting station-এ গিয়ে টায়ার মেরামত করতে হবে। আমরা জিজ্ঞাসা করলুম—কতক্ষণ সময় লাগবে? তারা বল্লে—আজ্ঞে তা—তিন, চার ঘণ্টা-তো লাগবেই।

সর্বনাশ! তার মানে, (তখন বেলা সাড়ে চারটে) রাত ৮টা ৯টা পর্যন্ত এখানে অচলায়তন হয়ে থাকতে হবে। jack-এ গাড়ী তুলে টায়ার খুলে গড়াতে গড়াতে তারা গেল Halting station-এ আমরা বাস থেকে নেমে রাস্তায় পায়চারি করতে লাগলুম। কারো মুখে কথা নেই। বাসের যাত্রীরাও পথে নেমে পায়চারি আরম্ভ করল। একজন তারস্বরে গান ধরল।—

যত দুখ দিয়েছো, দিয়েছো তারা
সে কেবলি দয়া তব জানি গো
মা, দুখ হরা···

আমার মনে হোল এ গানের অর্থ হয় না, কেন না, তোর থেকে তারা-মা যে দুঃখ দিয়েছেন এবং দিচ্ছেন সেকি তাঁর দয়া বলে মানতে হবে? আমাদের গায়ক ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করলুম,—বন থেকে সন্ধ্যার পর হাতীরা বেরুবে না ত? অপ্রতিভ কণ্ঠে আশ্বাস দিয়ে তিনি বল্লেন,—না—না, সে সব ভয় নেই। আমি বল্লুম,—ভোর থেকে যে রকম অঘটন ঘটছে, এখানকার মাটি খুঁড়ে যদি হাতীরা বেরোয় তবে আশ্চর্য হব না। প্রায় আধঘণ্টা পরে হঠাৎ দেখি তমলুকের দিক থেকে একখানা কালো রংয়ের Tourer Ford গাড়ী আসছে। ভাবলুম, নিশ্চয় কোন ভদ্রলোক তাঁর Private motor-এ করে পাশকুড়া ষ্টেশনে চলেছেন ট্রেন ধরতে। গাইড, ভদ্রলোক এবং গিরিজা কুমারকে উদ্দেশ করে

আমি বল্লুম—তোমরা আমাকে অভদ্র বলো, আর যাই বল, ওঁদের হাতে পায়ে ধরে আমি প্রার্থনা জানাবো আমাকে ওঁদের গাড়ীতে তুলে স্টেশনে নিয়ে যাবার জন্যে। এমন করে পথে পড়ে মরতে পারবো না। তাঁরা কোন জবাব দিলেন না। আমি মনে মনে ভগবানকে ডাকতে লাগলুম ওই ভদ্রলোকদের মনে করুণার সঞ্চার হয়, ওঁরা যেন আমাদের বিপন্ন দেখে পরিত্রাণ করেন। ভগবান আমার প্রার্থনা শুনলেন! দেখি গাড়ী থামল এবং দুজন ভদ্রলোক গাড়ী থেকে নেমে আমাদের কাছে এসে প্রশ্ন করলেন—কলকাতা থেকে সভাপতি হবার জন্য সৌরিন মুখুজ্যে মহাশয় এ বাসে আছেন কি? অমনি এগিয়ে গিয়ে আমি বল্লুম,—আমি···আমি···আমি সৌরিন মুখুজ্যে···কলকাতা থেকে আসছি। তাঁরা যেন চাঁদ হাতে পেলেন মনে হোল। বল্লেন,—বেলা একটার সময়ও যখন তমলুকে বাস পৌঁছলনা তখন বাস অফিসে খবর নিয়ে জানলুম যে বাস পথে Break down হয়েছে। বাস কোথায় আছে, কখন আসবে তাঁরা জানেন না। এ খবর শুনে ওখানকার মিশনরি সাহেবদের তা জানালে তাঁরা বল্লেন,—মিষ্টার মুখার্জি আমাদের দেশের লোক এ গাড়ী করে তাঁকে নিয়ে আসুন। পরমানন্দে তাঁদের সঙ্গে আমরা চারজনে তাঁদের গাড়ীতে গিয়ে উঠলুম—অবশ্য নিজেদের লগেজ আর হাঁস দুটিকে নিয়েই। ফোর্ড গাড়ী চলল তমলুক। তখনও সন্ধ্যার অন্ধকারে একফালি চাঁদ তার কিরণ সারা পৃথিবীর গায়ে ছড়াতে পারেনি। বনভূমি পেরিয়ে গাড়ী এক তেমাথায় এলো। সেখান থেকে দেখলুম সামনের পথে বহুদূরে আলোর ছটা। আলো দেখে মনে পড়ল রবীন্দ্রনাথের দুটি ছত্র—

আজি যত তারা তব আকাশে
সবে মোর প্রাণ ভরি বিকাশে॥

অচিরে আলোর রাজ্যে এসে পৌঁছলুম! গাড়ী থামলো। দেখি পথের ধারে বিস্তীর্ণ মাঠ কানাতারা দিয়ে ঘেরা মাথার প্রকাণ্ড সামিয়ানা খাটানো আর মধ্যে একটা বড় ফটক। দুচারটে বড় পাম্প লাইটও লাগানো। আর ফটকের ওপর সাতটা অ্যাসিটিলিন ল্যাম্প—প্রত্যেকটির মাথায় একটি করে ঘসা কাচের ডোম তাতে লেখা WELCOME. গাড়ী থামতেই কজন ভদ্রলোক এগিয়ে এসে Volunteer রা চিৎকার করে উঠল হিপ্ হিপ্ হুররে···থ্রি চিয়ার্স ফর দি প্রেসিডেণ্ট। গাড়ী থেকে নেমে করজোড়ে সকলের উদ্দেশে আমি বল্লুম,—এতক্ষণ যদি আপনারা আমাদের জন্য কষ্টভোগ করলেন আর আধঘণ্টা এ কষ্ট সহ্য করুন। আমি সেই ভোরে বেরিয়েছি, এক পেঁটা চা গলায় দিতে পারিনি, খিদের বেশ যাতনা বোধ করছি আর আধঘণ্টা ধৈর্য্য ধরুন। আমাকে এখন একটু আশ্রয় দিন যেখানে গিয়ে আমি এক পেয়ালা চা খেতে পারি। স্নানাহ্নে এক পেয়ালা চা খেয়ে সভায় এসে বসবো। সারারাত যদি আপনাদের সভা চলে আমি সভাপতির গদি ছেড়ে উঠব না। আমার প্রার্থনা তাঁরা শুনলেন। গাড়ী করে তমলুকের সিনেমাহাউসের বাড়ীতে নামলুম। সেখানে স্নান করে খানা লুচি, আলুভাজা, কপিভাজা, চা খেয়ে সভায় এসে বসলুম। তারপর সভার কার্য্য সম্পাদন। অর্থাৎ আবৃত্তি, গান, বক্তৃতা এবং নাট্যাভিনয়। জীবনে এর পূর্বে এবং পরে অনেক সভায় সভাপতির গদিতে বসবার সৌভাগ্য লাভ করেছি—ভোগাস্থি যে দু-চার জায়গায় ঘটেনি তা নয়, কিন্তু তমলুকের সেই সভারোহন পর্ব—সে পর্বের কথা চিরস্মরণীয় হয়ে আছে।

চলতি দুনিয়া

রোগের চিকিৎসায় রহস্য কাহিনী

আগেকার দিনে ডাক্তাররা রুগীদের চুপচাপ শুয়ে থাকতে বলতেন কিন্তু এখনকার মত হচ্ছে এভাবে মুখ বুজে থাকলে রুগীরা ঝিমিয়ে পড়ে ও তাতে রোগ চট্ করে সারতে চায়না।

হাসপাতালে ইষ্টগোল প্রায় সর্বত্রই সমান। ভোর পাঁচটা না বাজতে বাজতেই হাসপাতালের কাজকর্ম শুরু হয়ে যায়। থালা বাটীর ঝনঝনানি জমাদার মেথরের ছুটোছুটি, ডাক্তার নার্সদের আনা-গোনায় হাসপাতাল মুখর হয়ে ওঠে। তাদের কাজ চুকলে রুগীদের সামনে পড়ে থাকে লম্বা টানা দিন। তখন তাদের যদি কিছুই করার না থাকে, তবে তারা সারাদিন শুধু রোগের কথা ভাবতে থাকে এবং তাতে রোগ সহজে সারতে চায় না। এই সময়টা তাই বেশিরভাগ রুগী বই পড়ে কাটাতে চায়। পশ্চিম জার্মানীর হাসপাতালে পুরুষ রুগীরা পছন্দ করে রহস্য ও গোয়েন্দা কাহিনী এবং মেয়েরা ভালোবাসে প্রেমের কাহিনী।

পশ্চিম জার্মানীর চিকিৎসকদের মতে যেসব রুগী বই পড়তে চায়, তারা নিজেরাই নিজেদের তাড়াতাড়ি সেরে উঠতে সাহায্য করে। তবে রোগমুক্তি ও স্বাস্থোদ্ধারের সময় ভারি কোন বিষয় পড়া ঠিক নয়। তখন গোয়েন্দা কাহিনীর মত হাল্কা কাহিনীই টনিকের কাজ করে।

• • • •

মানুষের মনে গন্ধের প্রভাব

জার্মান বিজ্ঞাপনদাতারা এখন এক নতুন "আশ্চর্য অস্ত্র" আবিষ্কার করেছে এবং সেই অস্ত্র হচ্ছে সুগন্ধ। মানুষের অবচেতন মনে গন্ধের প্রভাব লক্ষ্য ক'রে তারা বিজ্ঞাপনে গন্ধের কৌশল অবলম্বন করেছে।

কিছুদিন আগে এক দোকানে দু'জাতের মোজা বিক্রি হয়েছিল। মোজাগুলি আসলে ছিল একজাতের কিন্তু কিছু মোজায় একরকম গন্ধ, লাগানো ছিল। শতকরা আশীজন মহিলা কিনলেন সেই গন্ধ লাগানো মোজা।

বিজ্ঞাপনের দৌলতে শুধু যে গন্ধের কাটতি বেড়েছে, তা নয়, অন্তর্বাস, মোজা, মনিব্যাগ, বেল্ট, জুতো, দস্তানা, স্যুটকেশ, লেখার কাগজ, বই, আলপিন, আসবাবপত্তর সবেতেই এখন বিক্রির জন্যে গন্ধ ব্যবহার হচ্ছে। বাবার দাবারের এখন গন্ধের অঢেল ব্যবহার। গন্ধ বিশেষজ্ঞদের সীমাহীন কল্পনার সঙ্গে এখন রাসায়নিক শিল্পকে তাল বজায় রেখে চলতে হচ্ছে। "নিউকার" বলে একরকম গন্ধ তৈরী হচ্ছে যা পুরোনো গাড়ীতে ছিটিয়ে দিলে ভালো বিক্রি হবে এই আশায়।

গন্ধের যাদুতে জিনিষপত্তরের কাটতি বেড়েছে তো বটেই, মানুষের কর্মশক্তির ওপরও গন্ধের প্রভাব খুব সুস্পষ্ট। মনোবিজ্ঞানীরা তাই এখন কারখানায়, অফিসে সুগন্ধময় আবহাওয়া সৃষ্টি করার

পরামর্শ দিচ্ছেন। চিকিৎসকরাও পিছিয়ে নেই। তারাও রুগীদের প্রচুর রাখার জন্যে "গন্ধ চিকিৎসার" আশ্রয় নিচ্ছেন।

তবে একটা কথা আমাদের নাক বড় সৌখীন। একই গন্ধ, তা সে যত ভালোই হোক, রোজ রোজ আমাদের নাকের পছন্দ হয় না। তাই নাকের মারফৎ বিজ্ঞাপনের প্রচার বিস্তার করতে গেলে তাকে নিত্য নতুন গন্ধের সন্ধান করতে হবে।

• • • •

আকাশমুখেই সমস্যার সমাধান

শহরের যেখানে সেখানে একতলা দোতলা বাড়ী তুলে মূল্যবান জমি নষ্ট করাটা পশ্চিম জার্মানীতে অনেকেই সঙ্গত মনে করছেন। একদল লোক তো ক্ষেপেই গেছে। তারা বলছে শহর এবং শহরের মানুষকে বাঁচাতে হ'লে এইসব বাড়ী ভেঙে ফেলে মাল্টিনী ছাঁচে আকাশচুম্বী সৌধ তৈরী করতে হবে। নগর পরিকল্পনায় বিশ্ববিখ্যাত ৭৭ বছরের অভিজ্ঞ অধ্যাপক আর্নষ্টমে এদের মতে সায় দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে যত্রতত্র ছোট ছোট বাড়ী তুলতে দিলে শহরের মূল্যবান জমি-তো নষ্ট হবেই, সাথে শহরের উপকণ্ঠগুলি বেহাত হয়ে যাবে। বিভক্ত জার্মানী এখন ক্ষুত্রকায়, সেখানে যদি এখন বসবাসের জন্যে কেবল ছোট ছোট বাড়ী ওঠে, তা'হলে আর চাষের জমি থাকবেনা।

তা'ছাড়া কাজকর্ম আজকাল সবই শহরকেন্দ্রিক। তাই কর্মক্ষেত্রের কাছে থাকাই সুবিধে। দূর দূর থেকে রোজ আসা-যাওয়া করা আজকাল এক ঝকমারি। সে জন্যে মফস্বল থেকে যারা রোজ শহরে আসে, তাদের শহরের থাকার ব্যবস্থা করাই ভালো। এতে যাতায়াতের হাঙ্গামা বাঁচবে এবং মফস্বলে ও শহরের উপকণ্ঠে চাষের জমি বৃদ্ধি পাবে।

পশ্চিম জার্মানীর সর্বত্রই এবং সব মহলেই এখন আকাশচুম্বী সৌধ তৈরী করার আন্দোলন প্রবল হয়ে উঠেছে। পশ্চিম বার্লিনে একলক্ষ মানুষ থাকার জন্যে যে দুটি সৌধ পরিকল্পনা করা হয়েছিল, পরিকল্পকরা এখন সে দুটি সৌধে আরও দুটি তলা যোগ করে আরও চারহাজার মানুষের থাকার ব্যবস্থা করতে উদ্যোগী হয়েছে। পশ্চিম জার্মানীর অন্যান্য শহরেও একই ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে।

বর্তমান আকাশচুম্বী সৌধ নির্মাণ আন্দোলন সফল হলে দুটি প্রয়োজন মিটবে। প্রথমত মানুষ কর্মক্ষেত্রের কাছে থাকতে পারবে এবং দ্বিতীয়ত চাষের জমি সমস্যার সমাধান হবে। আজকের এই জনসমস্যা কণ্টকিত পৃথিবীতে এই ধরণের সমাধান ছাড়া উপায়ই বা কি!

• • • •

জেলখানার মানুষঘর

পশ্চিম জার্মানীর ম্যানহাইমের মানুষঘরের সঙ্গে জনসাধারণের পরিচয় না থাকলেও পোরেবা ও কারাধ্যক্ষদের সঙ্গে তার পরিচয় গভীর। "কালো মানুষঘর" নামে এটি পরিচিত। বিনা পারমিটে এই মানুষঘরে কেউ প্রবেশ করতে পারে না। এর পাশেই রয়েছে ম্যানহাইমের জেলখানা।

জেলের বন্দীদের কীর্তি এই মানুষঘরে জেলারবাবুরা দু'পুরুষ ধরে সযত্নে সংগ্রহ কোরে রেখে দিয়েছেন। বন্দীদের আঁকা ছবি, চোরাইমাল আনার কৌটো, বন্দী অবস্থায় সময় কাটাবার জন্যে তৈরী

কতরকমের খেলনা, জেল ভেঙে পালাবার জন্যে বন্দীদের উদ্ভাবিত কত হাতিয়ার, হাতে-লেখা খবরের কাগজ, কয়েকটা অশ্লীল বই, কিছু খোদাই মূর্তি, কিছু সস্তা ব্যক্তিগত প্রিয় জিনিষপত্র, কিছু কবিতা। আর আছে বন্দীদের চুপিসারে হাতে গড়া ইয়ারফোন, রেডিও যার ষ্টেশন পর্যন্ত।

জেলের নির্জন ঘর থেকে হাসপাতালের যাবার অছিলায় যারা ছুরি কাঁচি—ব্লেড খেয়ে ফেলতো, অস্ত্রোপচারের পর সেগুলি উদ্ধার করে এই যাদুঘরে যত্নে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। আজকাল অবশ্য বন্দীরা এইসব উপায়ের জিনিষ আর খায়না, তারা কব্জির শিরা কেটে ফেলে হাসপাতালে আশ্রয় পায়। কেউবা যায় সেখানে একটু দৃশ্যের পরিবর্তন দেখতে, আবার কেউবা হাসপাতালে যায় জেল থেকে পালাবার ফিকিরে। ছুঁরি-কাঁটা খাওয়ার বন্দীরে অ্যাডলফ নামে বন্দীকে আজও কেউ টেক্কা দিতে পারেনি, ১৯৫০ সনে সে আটটা ছুরির হাতল গিলেছিল।

জেলখানায় নিষিদ্ধ দ্রব্য যেসব আবার ব্যবহার হয়, সেগুলি আর এক আকর্ষণ। তামাক দিয়ে আলা হয়েছে ডিমের খোলা, বাদাম ইত্যাদির মধ্যে পুরে। ছোট ছোট করাত চিরুণী, বইয়ের মলাট, ব্রাশ, টুথপেষ্টের টিউব এবং কেকের মধ্যে লুকিয়ে। এই সমস্ত জিনিষের সাহায্যে জেল থেকে পালাবার একটা ধারাবাহিক ইতিহাস পড়ে তোলা যায়।

কিন্তু সবচেয়ে আকর্ষণ বন্দীদের নিজস্ব পদ্ধতিতে সৃষ্ট বিশ্ববিখ্যাত শিল্পীদের ছবির নকল। আর সেসবের মশলা হচ্ছে পাউরুটির মণ্ড।

* * *

সভ্যতা গর্বী মার্কিন দেশে মেয়েদের সাঁতারের পোষাকে নতুন ফ্যাসনের সৃষ্টি হয়েছে। দুরতম পোষাক, আগের বিকিনি কেও হার মানিয়েছে। এই পোষাকের নাম "টপলেস্—অর্থাৎ উর্দ্ধ অঙ্গ সম্পূর্ণ অনাবৃত একজন চায়নেজ-সাঁতারু মহিলার মতে" চমৎকার পোষাক (পোষাক আর কই ছোট একটি স্যাণ্ডোট বই তো নয়)।

* * *

অনাবৃত পৃষ্ঠদেশ প্রদর্শনী! সংবাদের শিরোনামা পড়ে চমক লাগল। নিউজীল্যাণ্ডের এক শহর থেকে ১৬ই জুলাইএর খবরে প্রকাশ, সেখানকার মেয়েদের টপলেস্ পোষাকের প্রতিবাদে ছেলেরা একটি আন্দোলনের সূত্রপাত করেছে—তারা বিনা প্যাণ্টালুনে দলবদ্ধ হয়ে রাস্তায় ঘুরে ঘোরে মোড়ে ট্রাফিক-জ্যাম-এর সৃষ্টি করছে। ক্যাশান বিপনির পোকেসে টপলেস পোষাকের জীবন্ত মডেল, অবশ্য তাদের নিম্নাঙ্গে অন্তর্বাস। তেমনি প্যাণ্ট-বিহীন ছেলেদের অর্ধেক সার্ট! দুপক্ষই কিন্তু রেখে ঢেকে কাজ করেছে। কিন্তু সে আর কতদিন। দুনিয়ার দিকে দিকে মানুষের মাথা খারাপ হবার যে সব লক্ষণ দেখা যাচ্ছে তাতে রাখা-ঢাকা বোধ করি আর কিছুই থাকবে না।

যেখানে চণ্ডাশোক রূপান্তরিত হয়েছিলেন ধর্মাশোকে

তরুণ চট্টোপাধ্যায়

আজকের মহাশূন্য বিজয়ের উপক্রমণিকার যুগে আমাদের জীবনের সবচেয়ে বড় সার্থকতা কি চন্দ্রলোকের বা মঙ্গলগ্রহের যাত্রী হতে পারা! মহা ব্যোমযানের সওয়ার হওয়ার রোমাঞ্চ আছে নিশ্চয়ই কিন্তু সেটাই তো মানব জন্মের চরম সার্থকতা হতে পারেনা। আজকের এই বিরোধ বিভেদ বিদীর্ণ দুনিয়ায় মানব সমাজের এক মস্তবড় সার্থকতা রয়েছে জাতিতে জাতিতে মিলেমিশে বন্ধুভাবে বসবাস করার মধ্যে, শুধু আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নয়, প্রতিটি দেশের অধিজাতিগুলির পারস্পারিক সমপ্রীতি নিয়ে বাস করার মধ্যেও বটে। ধরুণ উড়িষ্যা আমাদের প্রতিবেশী হলেও তার সম্বন্ধে, তার গৌরবময় ইতিহাস সম্পর্কে আমরা বাংলা দেশের সাধারণ লোক কতটুকুই বা জানি। আমাদের ছোটবেলায় আমরা উড়িষ্যার যে ইতিহাস পড়েছি তা ব্রিটিশরাজের প্রয়োজন মত লেখা এক বিকৃত ইতিহাস। আজও স্বাধীন ভারতে সেইসব পাঠ্যপুস্তকের বিশেষ কোনো পরিবর্তন হয়েছে বলে জানিনা। শুনেছি আজও আমাদের দেশে ভিলাইএর মত কারখানা রাশিয়ার সাহায্যে নির্মিত হওয়ার পরেও এমন ভূগোল পড়ানো হয় যাতে লেখা আছে যে রাশিয়া এক অনুন্নত কৃষিপ্রধান দেশ। তাই আজও আমাদের যদি জানা না থাকে এই উড়িষ্যাতেই ভারতের নিজস্ব যুদ্ধবিদ্যা যেমন সর্বোচ্চ শিখরে উন্নীত হয়েছিল তেমনিই আবার বুদ্ধের শান্তিবাণীও এইখানেই প্রতিষ্ঠালাভ করে বহির্বিশ্বের দেশে দেশে পক্ষ বিস্তার করেছিল এবং চণ্ডাশোক এইখানেই রূপান্তরিত হয়েছিলেন ধর্মাশোকে। উড়িষ্যার ইতিহাস চরম ও প্রতিচরমের উত্থান পতনের ইতিহাস, হিংসা ও অহিংসা, যুদ্ধ ও শান্তির পালাবদলের ইতিহাস।

পুঁথির পাতায় লিখিত ইতিহাসের তখনো জন্ম হয়নি। তখন ভারতে বাস করত যে আদিমতম জাতি তার নাম ছিল উদ্র। উদ্রদের বাসভূমি ওড়িয়ানাই আজ উড়িষ্যা নামে খ্যাত। ওড়িয়ানা রাজ্যের যুগে যুগে একাধিকবার নাম পরিবর্তন হয়েছিল—এক মহর্ষির যোদ্ধাপুত্রের নামে প্রথমে ওড়িয়ানার নাম হয় কলিঙ্গ, তারপর কলিঙ্গ থেকে কোদ্রম, কোদ্রম থেকে উৎকল, উৎকলের পর মহাকান্তার এবং মহাকান্তারের পরে কোশল।

উৎকল শব্দের অর্থ যে দেশের কলা উৎকৃষ্ট। উৎকলের প্রতিটি ক্ষোদিত শিলা তার নামের সার্থকতার সাক্ষ্য।

কলিঙ্গের অধিবাসীদের জীবনে শান্তি ও সমৃদ্ধি, বীরত্ব ও স্বার্থত্যাগে মুগ্ধ হয়ে স্বয়ং শিবাজী কলিঙ্গকে দেবভূমি নামে অভিহিত করেন। শুধু তাই নয়, আন্তর্জাতিক ব্যবসাবাণিজ্যের দিক থেকেও কলিঙ্গবাসীরা ছিল সকলের সেরা। গ্রীক দার্শনিক টলেমির লেখায় উৎকল উপকূলে বহু কর্মমুখর বন্দরের অস্তিত্বের উল্লেখ পাওয়া যায়। সে সময়ে যবদ্বীপ, লংকা ইত্যাদি বহু সুদূর দেশ ও দ্বীপের সঙ্গে উৎকলের বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল।

খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে কলিঙ্গ সম্রাট খারভেলা দক্ষিণ-ভারত এবং উত্তর ভারতের ব্যাপক অঞ্চলে তাঁর রাজ্য বিস্তার করেছিলেন। এই রণবিশারদ সম্রাট শেষ বয়সে জৈনধর্ম গ্রহণ করে উদয়গিরি ও খণ্ডগিরির গুহামালায় জৈনমন্দির নির্মান করান। উদয়গিরি ও খণ্ডগিরি ছাড়াও ধওলিগিরি, রত্নগিরি, ললিতগিরি ও পুষ্পগিরিতে কতকগুলি বিশ্ববিখ্যাত বিদ্যাপীঠ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সেগুলিতে যোগশাস্ত্র এবং অন্যান্য বিদ্যা আহরণ করার উদ্দেশ্যে চীন, লংকা, যবদ্বীপ, সুমাত্রা, কাম্বোজ ইত্যাদি দেশ থেকে বিদ্যার্থীরা ভারতে আসতেন যেমন পুষ্পগিরিতে এসেছিলেন চীনা পরিব্রাজক হিউএনসাং।

একাদশ ও দ্বাদশ শতকে কলিঙ্গের এক রাজবংশ সিংহলের একাংশে রাজত্ব কায়েম করেছিলেন। এমন কি ডাঃ রমেশ মজুমদারের ইতিহাসে দেখাযায় যে যবদ্বীপের একটি অঞ্চলে কলিঙ্গের কিছু অধিবাসী উপনিবেশ স্থাপন করেছিল এবং আজও সেখানকার অধিবাসীরা কলিং নামে পরিচিত।

বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের প্রভাব ম্লান হয়ে যাওয়ার পর কেশরী নামে এক শৈব রাজবংশ কলিঙ্গের রাজদণ্ড গ্রহণ করেন। শৈব রাজবংশের আমলেই ভুবনেশ্বরে কলিঙ্গের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সেখানে নির্মিত হয় বিখ্যাত লিঙ্গরাজ মন্দির দশম খৃষ্টাব্দে।

দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতকেই উৎকলে শিল্পকলা, স্থাপত্য, চারুর্য, বিজ্ঞান ও সাহিত্যের চরম বিকাশ হয়েছিল। তখন শৈব রাজবংশের সিংহাসন দখল করেছেন বৈষ্ণব রাজবংশ। কোনার্কের সূর্যমন্দির ও পুরীর জগন্নাথ মন্দির নির্মিত হয়েছিল বৈষ্ণব শাসনের আমলে। বৈষ্ণব বা জগন্নাথ যুগে কলিঙ্গের দিগ্বিদিক সাম্যের মন্ত্রে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠেছিল। জাতি-উপজাতি সম্প্রদায়ের ভেদাভেদ দূর করে জগন্নাথের মন্দিরের দরজা হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন আদিবাসী, শবর ও দ্রাবিড় সকলের জন্য উন্মুক্ত হয়। সেই সময়েই কলিঙ্গের কণ্ঠেই উচ্চারিত হয়েছিল ভারতের বিবিধের মাঝে মিলনের বার্তা। অর্ধশতাব্দীর মধ্যে কলিঙ্গের প্রতিটি গ্রামে গ্রামে ভাগবত মন্দিরের প্রতিষ্ঠা হয়। বৈষ্ণব ধর্মের এই ব্যাপক প্রচার উৎকলের জাতীয় জীবনকে ষোড়শমনোভাব থেকে মুক্ত করে।

ষোড়শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে কালাপাহাড়ের অভিযানের ফলে উড়িষ্যা মুসলমান সুলতানের পদানত হয়। মুসলমান আমলের পর উড়িষ্যা দখল করে মারাঠারা। ইসলাম ও মারাঠা শাসনের সময় উড়িষ্যার সাংস্কৃতিক উন্নতি ব্যাহত হয়।

মুসলমান ও ব্রিটিশ রাজের কাছে পরাজয় বরণ করেছিল উড়িষ্যা সকলের শেষে। ১৮১৭ সালে উড়িষ্যার আদিবাসীরা ব্রিটিশের বিরুদ্ধে এক সশস্ত্রবিদ্রোহ করেছিল বলে ব্রিটিশ শাসকরা উড়িষ্যাকে চার টুকরো করে প্রতিশোধ নেয়। ৩০ বছর আন্দোলনের পর উড়িষ্যার জনগণ তাদের জন্মভূমির একীকরণ করে ১৯৩৬ সালে। এই হচ্ছে সংক্ষেপে উড়িষ্যার ইতিহাস।

উড়িষ্যার স্থাপত্য সম্পর্কে এবার কিছু বলা যেতে পারে। উড়িষ্যার স্থাপত্য প্রধানত ধর্মমূলক, তাজমহলের মত স্মৃতিমূলক নয়। দেওয়ানি খাসের মত রাষ্ট্রপরিচালনামূলক বা লালকেল্লার মত সমরমূলক নয়। দক্ষিণ ভারতে তিনরকম স্থাপত্য দেখা যায়—দ্রাবিড়, চালুক্য ও আর্য। উড়িষ্যার স্থাপত্য শেষোক্ত শ্রেণীতে পড়ে।

উড়িষ্যার মন্দিরগুলির দুটি থেকে চারটি করে অঙ্গ—বিমান বা প্রধান বিগ্রহ-মন্দির, জগমোহন অর্থাৎ মন্দিরের যে অংশ থেকে বিগ্রহ দর্শন করা হয়, নাট মন্দির অর্থাৎ যেখানে দেবতার জন্য নাচ গান হয় এবং ভোগ মন্দির অর্থাৎ যেখানে বিগ্রহের ভোগ রক্ষিত হয়।

গোটা ভারতে একমাত্র উড়িষ্যাতে অবিমিশ্র আর্যশিল্প দেখা যায়। উড়িষ্যার কোথাও কোথাও মন্দিরের কোনো গোড়া নেই। (যেমন লিঙ্গরাজ মন্দির)। এই সব মন্দিরের আর একটি বিশেষত্ব হচ্ছে যে মন্দিরের বিমান প্রথমে আয়তাকারে কিছু দূর উঠে সেখান থেকে ধীরভাবে ক্রমান্বয়ে ক্রমে ক্রমে পিরামিডের মত উঠে গিয়েছে। এই স্থাপত্যকে আজকাল বলা হয় 'Corbelling'। বিমানের মাথার উপর থাকে একটি বিরাট আমলক শিলা যার চেহারা অনেকটা আমলকির মত। মূলদেশের মধ্যে সিংহ বা অন্য কোন একটি পশুমূর্তি স্থাপিত।

উড়িষ্যার মন্দিরের আর একটি নিজস্ব বিশেষত্ব হচ্ছে সেগুলি পূর্বদ্বারী যার ফলে পূজারীকে পশ্চিমদিকে মুখ করে পূজা করতে হয় অথচ হিন্দুধর্মে সাধারণত পূর্বদিকে মুখ করে পূজা করাই নিয়ম।

উড়িষ্যার অধিকাংশ মন্দিরের বিমান গুম্ভ বিহীন। উড়িষ্যার কারিগরেরা লোহা ও সীসার ব্যবহার জানতেন। পাথর জোড়ার জন্য কোথাও কোন মশলা ব্যবহার তাঁরা করেন নি।

উড়িষ্যার শিল্পীরা মন্দির নির্মাণের মর্মর পাথর পান নি। বেলে পাথর দিয়েই সমস্ত মন্দির তৈরি। বেলে পাথরের বুকে তাঁরা যে পদ্মফুল খোদাই করেছেন, মর্মর পাথর পেলে তার বাহার আরো অনেক বেশী খুলত।

উড়িষ্যার মন্দিরগুলি দেখলে মনে হবে সেখানকার শিল্পীরা শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রে আয়তনের চেয়ে সূক্ষ্ম শিল্প নৈপুণ্যের দিকেই মনোযোগ দিতেন। একমাত্র পুরীর জগন্নাথ মন্দির তার ব্যতিক্রম। ইতিহাসের পণ্ডিতরা বলেন যে পুরীর জগন্নাথ মন্দির উড়িষ্যার স্থাপত্য কলার নিম্নতম নিদর্শন।

ভুবনেশ্বরে অতীতে ৭ হাজার মন্দির ছিল। বর্তমানে সেগুলির মধ্যে কয়েক শতের অস্তিত্ব আছে। লিঙ্গরাজ মন্দির বাদে রাজারাণী, মুক্তেশ্বর ও পার্বতী মন্দিরও তুলনায় অতীত।

উদয়গিরি, খণ্ডগিরি, ধবলগিরি ইত্যাদি গিরিগুম্ফাগুলি পূর্বঘাট পর্বতমালার অংশ বিশেষের উপর নির্মিত। সেগুলিতে যে পালি ভাষায় খোদিত শিলালিপি আছে তা থেকে বোঝা যায় যে গুম্ফাগুলি বুদ্ধের তিরোধানের ঠিক পরেই নির্মিত হয়েছিল। তখনো মহাবীর আলেকজাণ্ডার ভারত বিজয়ে বার হননি।

কোনার্ক মন্দিরের অত্রভেদী বিমান আজ আর নেই, আছে শুধু জগমোহন (বিমানের উচ্চতা ছিল ১২০ ফুট)। তবু এই জগমোহনের কারুকার্য দেখলে বিশপ হেলারের সঙ্গে গলা মিলিয়ে বলতে ইচ্ছে করবে "The Indians built like Titans finished like jewellers." কোনার্কের জগমোহনের মাথায় যে লোহার কড়ি আছে সেগুলি সেকালের কারিগরদের ব্যবহারিক বিজ্ঞানে পারদর্শিতার সাক্ষ্য।

উৎকলের মহাপ্রাচীন সংস্কৃতির চমাবশেষের প্রতিটি উৎকীর্ণ শিলা একটি জাতির পূর্ণাবয়ব ইতিহাস। কোনার্কের অগমোহন ও হয়ত ভবিষ্যতে মহাকালের গর্ভে বিলীন হয়ে যাবে। কিন্তু উড়িষ্যার মানুষ আজ স্বাধীনতার বেদীমূলে দাঁড়িয়ে আবার এক নতুন ইতিহাস রচনা করবে।

ভারতের আদি শিল্পকলা, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য উৎকলে তার গৌরীশৃঙ্গ স্পর্শ করেছিল। দেশ বিদেশ থেকে পর্যটক ও পরিব্রাজকেরা ভারতীয় কলার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হিসাবে দেখতে যান তাজমহল ও কুতুবমিনার। তাজমহল নিঃসন্দেহে পৃথিবীর সপ্তাশ্চর্যের একটি। কিন্তু তাজমহলের শিল্পকলা মঙ্গোলীয়। ভারতের নিজস্ব শিল্প শৈলীর সঙ্গে পরিচয় করতে হলে যেতে হবে উড়িষ্যায় ও দক্ষিণ ভারতে। সেখানেই পাশ্চাত্যের সংস্কৃতির সন্তানেরা ভারতের আদি সংস্কৃতির উপকরণ দিয়ে পাশ্চাত্য সংস্কৃতিকে অভিষিক্ত করার সুযোগ পাবেন। কোনারক, ভুবনেশ্বর ও পুরীর মন্দিরে মন্দিরে তাঁরা দেখতে পাবেন পরিকল্পনার বাহাদুরী, অনুপ্রেরণার বিশ্বস্ততা এবং অনাগতের ইঙ্গিত। এইগুলিই হচ্ছে শিল্পকলার মূল নীতি। কোনারকের সূর্য মন্দিরের রথচক্রের মধ্যে তাঁরা দেখবেন কারিগরের পিকাসো প্রতিম নৈপুণ্যের সঙ্গে তার সত্যনিষ্ঠা ও বিষয়বস্তুগত উপলব্ধির মহামিলন কিভাবে মূর্ত হয়ে উঠেছে। আরো দেখবেন কারিগর তার সৃষ্টির মধ্যে কিভাবে মহামিলন ঘটিয়েছে কলার সঙ্গে বিজ্ঞানের, দৃশ্যের সঙ্গে অদৃশ্যের।

ফরাসী বিপ্লবের সূচনায় ফ্রান্সের ধনবতী ও রূপবতী তরুণী ম্যাডাম রোঁলা বিপ্লবের সহায়ক ছিলেন। কিন্তু যখন তিনি দেখলেন স্বাধীনতার ধুয়া তুলে এখন সব পৈশাচিক কাণ্ড হচ্ছে ফ্রান্সে, যাতে বিপ্লবকে আর সমর্থন করা চলে না, তখন তিনি ফ্রান্সের সংস্কৃতি ও অভিজাত সমাজকে রক্ষা করার জন্যে বদ্ধপরিকর হলেন। ভাগ্যের পরিহাসে তিনি বিপ্লবীদের হাতে ধরা পড়েন ও তাঁর শিরশ্ছেদ হয়।

মৃত্যুর আগের দিন তাঁর এক বাল্য সহচরী তার সঙ্গে গোপনে শেষ দেখা করতে এসে তাঁর জায়গায় নিজেকে বন্দী রাখতে চাইলেন। অবশ্য এতে পোশাক বদলাবার সুযোগ ছিল।

ম্যাডাম রোঁলার চোখে জল এল—"এত ভালবাসো তুমি আমায়?"—বাল্য সহচরীকে জড়িয়ে ধরে তিনি আবেগ চঞ্চল কণ্ঠে একথা বললেন।

—"তোমার জীবন আমার চেয়ে অনেক মূল্যবান"—বললেন সহচরী।

—"কিন্তু আজ তুমি আমাকে যে অনুরোধ করতে এসেছ, তাতে তোমার জীবনের মূল্য যে আমার চেয়ে অনেক গুণ বেশী হয়ে গেছে বন্ধু"

ম্যাডাম রোঁলা অনেক কষ্টে বুঝিয়ে তাঁর বাল্য সহচরীকে ফিরিয়ে দিলেন কারাকক্ষের দ্বার থেকে।

মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে তিনি শুধু বলেছিলেন—"O liberty, what crimes are committed in thy name!"

দেশ-বিদেশ

খেলার মেলা

ছোটদের স্বপ্নের দেশ

ছোটদের খেলনা বানাতে নুরেনবার্গের জুড়ি নেই। এইতো কিছুদিন আগে সেখানে হপ্তাখানেক ধরে খেলনার এক মেলা হয়ে গেল। দেশবিদেশের খেলনাওয়ালা ১০৪০টি দোকানে পসরা সাজিয়ে বসেছিল। দেশবিদেশের হাজারখানের মানুষ এসেছিল মেলা দেখতে এবং খেলনার সওদা করতে।

সব খেলনাই প্রায় কাঠ, টিন আর প্লাস্টিক দিয়ে তৈরী; তবে প্লাস্টিকের খেলনাই বেশি। কিছুদিন আগে মনে হয়েছিল যে প্লাস্টিক বুঝি কাঠের খেলনাকে কোনঠাসা করে ফেলবে, কিন্তু মেলা দেখে তা মনে হ'ল না। কাঠের খেলনাও অনেক রয়েছে এবং অনেক খেলনায় কাঠ এবং প্লাস্টিক দুটোই ব্যবহার করা হয়েছে।

ইয়োরোপের খেলনার বাজারে পশ্চিম জার্মানী সবাইকে টেক্কা দেয়। ১৯৫০ এর পর থেকে জার্মানীর তৈরী খেলনার কাটতি পাঁচগুণ বেড়ে গেছে। এবারের মেলায় জার্মানী ছাড়া যোগ দিয়েছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, অষ্ট্রিয়া, সুইজারল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, জাপান, ডেনমার্ক, স্পেন, সুইডেন, আয়ারল্যাণ্ড, গ্রীস, কানাডা, চেকোস্লোভাকিয়া, পোল্যাণ্ড, চেকোস্লোভাকিয়া, হংকং এবং নরওয়ে।

অনেক নতুন নতুন খেলনা এবারের মেলায় দেখা গেছে বটে, তবে পুরোনো খেলনার আদর একটুও কমেনি। সেই পুতুল আর পুতুলের গাড়ী, রেলগাড়ী, ঘর বানাবার খেলনা, খেলনা দোকান আর টেডি ভালুক। তবে বছর বছর এসব খেলনার খোলস পালটাচ্ছে বেশ। তার ওপর অনেক খেলনায় যন্ত্র লাগিয়ে অনেক রকম কেরামতি দেখাবার ব্যবস্থা হয়েছে। কেউ কথা বলছে, কেউ সাজপোশাক খুলে আবার পরছে। জার্মানীর তৈরী খেলনাগুলো তো একেবারে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মত বড়সড়। সেসব দেখে বড়রাই মুগ্ধ হয়ে যায়, তো ছোটদের কথা আর বলে কি লাভ। আর একটা জিনিষ এবারের মেলায় লক্ষ্য করা গেল যে তৈরী খেলনার চেয়ে যেসব খেলনা নিজেরা জুড়ে জুড়ে একটা গোটা খেলনা করা যায়, সেগুলোর চাহিদাই বেশী। তাছাড়া সত্যিকারের যেসব জিনিষ বাজারে এখনো বেরোয়নি, যেমন সুপারসনিক বোয়িং ৭২৭ বিমান, তার খেলনার মডেল কিন্তু এই মেলায় এসে গেছে এবং তার বিক্রিও প্রচুর।

লেনিনগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্য-বিভাগ

লেনিনগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে যেসব প্রাচ্য ভাষা শেখানো হয়, তার মধ্যে বাংলা ভাষার এক বিশেষ স্থান আছে।

বাংলা ভাষা (ব্যাকরণ, রচনারীতি ও অলঙ্কার) শেখার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীদের কিছুটা সংস্কৃত ভাষাও শিখতে হয়—যার ফলে বাংলা ভাষার ওপরে তাঁদের দখল বাড়ে। এইভাবে তাঁরা সাধু ও চলতি বাংলা ভাষাকে আয়ত্ত করার পর, বাংলাভাষার সাহিত্যিক প্রকাশভঙ্গীকে আয়ত্ত করার দিকে অগ্রসর হন।

ছাত্রছাত্রীদের কয়েকটি দলে (গ্রুপ) ভাগ ক'রে দেওয়া হয়—প্রত্যেকটি দলে ৩ বা ৪ জন ক'রে শিক্ষার্থী থাকেন। এই দলগুলি বাংলা থেকে রুশ ভাষায় এবং রুশ ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন, বাংলা বাক্যরীতির প্রকাশভঙ্গী খুঁটিয়ে অনুশীলন করেন এবং নিজেদের মধ্যে বাংলায় কথাবার্তা বলেন। সেই সঙ্গে তাঁরা নির্বাচিত বাংলা রচনাবলী (গদ্য ও কবিতা) মুখস্তও করেন।—একটি বিদেশী ভাষাকে ও তার সাহিত্যিক প্রকাশভঙ্গীকে আয়ত্ত করার পক্ষে এই রীতিটি খুব ফলপ্রসূ।

সেই সঙ্গে, সঠিক বাংলা উচ্চারণ শেখার কাজ চলে। এই উচ্চারণ শেখার শুরুতে প্রধানতঃ গ্রামোফোন-রেকর্ডের সাহায্য নেওয়া হয়। টেপ রেকর্ড করা বাংলা পাঠ ও আবৃত্তি প্রথমে শিক্ষার্থীদের শোনানো হয়। তারপর ছাত্রছাত্রীদের নিজেদের সেই অংশটুকু পাঠ ও আবৃত্তি করতে হয় এবং সেটা টেপ রেকর্ড করা হয়। তারপর দুটি টেপ রেকর্ড পরপর বাজিয়ে, উচ্চারণের ভুলত্রুটি দেখিয়ে দিয়ে শিক্ষার্থীদের যতোদূর সম্ভব সঠিক উচ্চারণে অভ্যস্ত ক'রে তোলা হয়।

বাংলা পাঠ ও আবৃত্তির রেকর্ডই শুধু নয়, বাংলা বক্তৃতার রেকর্ডও তাঁরা শোনেন। কারণ, মুখে মুখে রচিত বক্তৃতায় ("এক্সটেম্পোর"।) উচ্চারণ ও ধরাবাঁধা বিদেশী-ভাষা-শিক্ষার্থীদের পক্ষে বিশেষ মূল্যবান। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে সফরে এসে যেসব ভারতীয় অতিথি লেনিনগ্রাদে আসেন, বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় প্রদত্ত তাঁদের বক্তৃতা রেকর্ড ক'রে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্য ভাষা ও সাহিত্য বিভাগে রাখা হয়। অনেক ক্ষেত্রে তাঁদের অনুরোধ করা হয় তাঁদের নিজ নিজ ভাষায় কিছু পাঠ বা আবৃত্তি করতে—সেগুলিও টেপ রেকর্ড করে রাখা হয়। এইভাবে, লেনিনগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্য ও ভাষা সাহিত্য বিভাগের ভারতীয় শাখায় সমস্ত আধুনিক ভারতীয় ভাষার সঙ্গে বাংলা ভাষারও খুব ভালো রকম একটি রেকর্ড-সংগ্রহ হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের কতকগুলি স্বরচিত রচনার আবৃত্তির রেকর্ডও এখানে আছে।

এখানকার ছাত্রছাত্রীদের বাংলা ভাষা অনুশীলনের একটা খুব উল্লেখযোগ্য দিক হল বাংলা নাটক অভিনয় করা। এব্যাপারে এই বিভাগে ছাত্রছাত্রীদের খুব উৎসাহী এবং সোভিয়েত অধ্যাপকদের সঙ্গে অন্যান্য বিভাগে অন্যান্য বিষয়ে শিক্ষারত ভারতীয় ছাত্রছাত্রীরাও এই বাংলা নাটক মঞ্চস্থ করার ব্যাপারে সোৎসাহে সহযোগিতা করেন। ১৯৬১ সালে, রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে, এখানকার বাংলাভাষাশিক্ষার্থী এই সোভিয়েত তরুণ-তরুণীরা অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের "তাসের দেশ" মঞ্চস্থ করেছিলেন।

সাংস্কৃতিকী

মিউনিখে ভারতীয় নৃত্যকলা

পশ্চিম জার্মানীতে বিশেষতঃ ব্যাভেরিয়ার জনসাধারণের কাছে ভারতীয় নৃত্যের সমাদর চিরকাল। তাই ইণ্ডো-জার্মান সোসাইটির আমন্ত্রণে বোম্বাই থেকে আগত আচেরী সম্প্রদায়ের নৃত্যের আসরে দর্শক সমাগমের অভাব হয়নি। এই সম্প্রদায় ব্যাভেরিয়ার রাজধানী মিউনিখে মনিপুরী নৃত্য পরিবেশন করেন এবং সবকটি নৃত্যই দর্শকবৃন্দের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা লাভ করে।

অন্তরীক্ষে

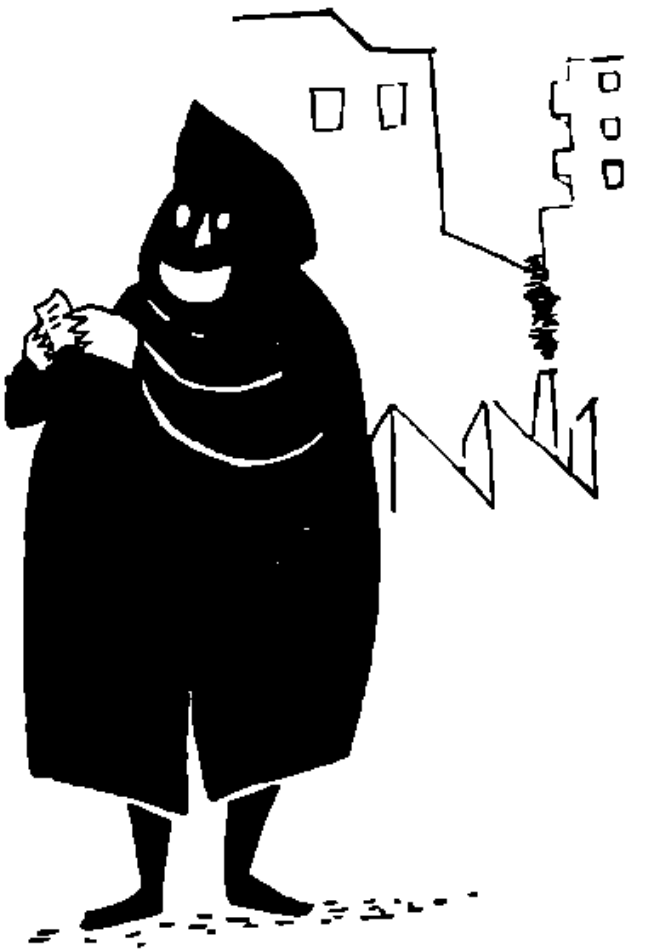

হ্যাঁ, আমি কালোবাজারী। তা'বলে অত হৈ চৈ কিসের?
.....তোমরা আছ বলেই তো আমি।

পরিকল্পনার ব্যয়
ঘুমিয়ে পড়লো নাকি ?
পরিকল্পনা
না না আমি জেগেই আছি

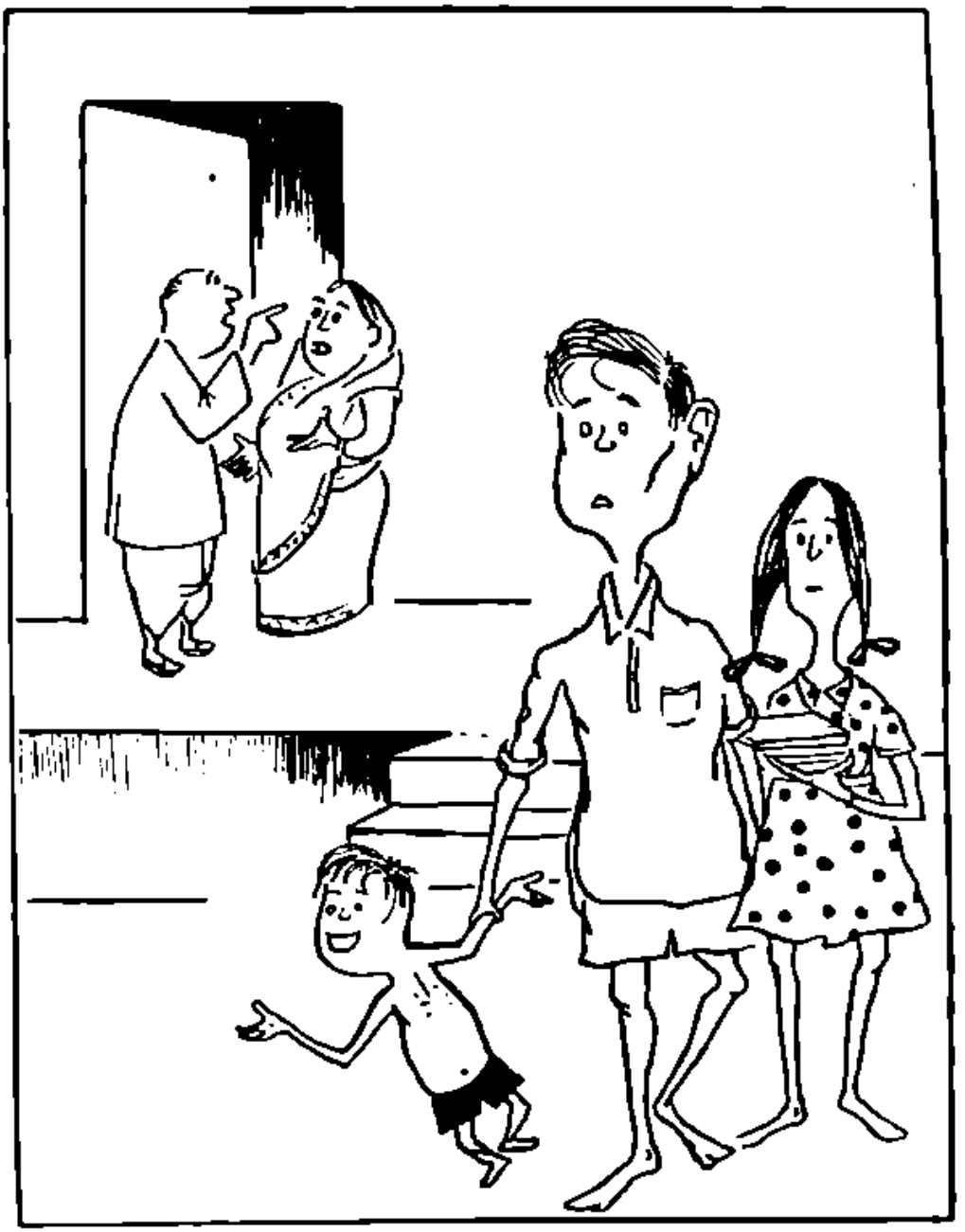

ডাক্তার বল্লেন—ভেজাল একেবারেই চলবে না।

.....তবে ওরা খাবে কি গো, আর বাঁচবেই বা কি করে?

ছুটকি

অঃ কুঃ গুঃ

আজকাল টেলিফোন করতে গিয়ে নিত্য যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা যায় তা যেমন অভিনব তেমনি বৈচিত্র্য পূর্ণ। আপনার হয়ত খুবই জরুরি ফোন। বাড়িতে স্ত্রীর খুব অসুখ, এখুনি ডাক্তারকে খবর দিতে হবে।

রিসিভার তুললেন, ডায়েল করলেন কিন্তু যিনি চিকন গলায় আওয়াজ এলো ওপার থেকে আর ক্রিয় টেলিফোন। আর একজন কথা বলছেন একবার, দুবার, তিনবার পাঁচ মিনিট থেকে পরের মিনিটের ধাক্কা।

এর মধ্যে কতকি শুনলেন।

শুনলেন 'হ্যালো, মণিকা'দি'!

কে অপোকা? বলো।

'অনিমার ছেলে হয়েছে, না মেয়ে হয়েছে?'

'ছেলে।'

'কবে হলো? কোথায় হলো?'

'বাঃ, তুমি কিছুই জানো না। নার্সিং হোমে।'

'আই সি। কোন কষ্ট হয়নি তো?'

'না, কোয়াইট নর্মাল।'

'বেবি ক'পাউণ্ডের হ'য়েছে?'

'ছ' পাউণ্ড।'

'বাঃ! আচ্ছা, এর আগের মেয়েটির কত ওয়েট হয়েছিল?'

'সাড়ে ছ' পাউণ্ড।'

'আর তার আগে যেটি মারা গেল?'

'ধুর। অত কী মনে থাকে?'

'যাক্। এবার কিন্তু একটা মোটা রকমের ভোজ চাই।'

'কী খাবে? মাছ নেই, তেল নেই, চাল নেই।'

'তা বললে শুনছি যে।'

টেলিফোন রাখা হয়েই ছেড়ে দিতে হলো। শুধু তাই নয়। বাড়িতে স্ত্রীর অসুখ যে ভাবনার সঙ্গে যুক্ত হলো চাল, তেল, মাছের ভাবনা!

আবার একবার চেষ্টা করে দেখা যাক? টেলিফোনের ডায়েল ঘোরাতেই এবারও ধাক্কাটা আরো কঠিন, আরো সবুজ।

বিলিতার মেরে দিয়ে অবশেষে ওয়ান হানড্রেড নাইনটি নাইন-এর খরগোশ হলাম। কিন্তু তাতেই বা রেহাই কোথায়?

• • •

বাসে চলেছেন।

ঠাসাঠাসি ভিড়। এ-ওর ঘাড়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ছে। জীবণ-চেঁচামিচি।

'ট্যাক্সিতে গেলেই তো পারেন।'

'উপদেশটুকুর জন্যে ধন্যবাদ।'

বাস স্টপেজে থামতে না থামতেই কণ্ডাক্টর ঘন্টা দিয়ে দিচ্ছে। তিল ধারণের স্থান নেই। তবু লোক হুমড়ি খেয়ে উঠছে পড়ি কি মরি করে।

'একী মশাই, কাপড়টা যে দু'টুকরো হয়ে গেল?'

'উঠবার জায়গায় দাঁড়িয়ে আছেন কেন?'

'ভেতরে যাবো কোথায়?'

'তা বলে আমি উঠবো না? ঘন্টাখানেক দাঁড়িয়ে আছি।'

'উঠবেন বলে কী এমনিভাবে উঠতে হবে?"

'উপায় কী?'

'লোকের কাপড় ধরে উঠবেন তা বলে?'

'আমি তো মশাই পরণের কাপড় ধরে উঠেছি। সেদিন এক ভদ্রলোক আমার কান ধরে উঠেছিলেন। এক সপ্তাহ তার জন্যে ই. এন. টি. ইনডোরে থাকতে হয়েছিলো।'

বাস চলেছে।

সীটে বসে একজন ঝিমুচ্ছিলেন। চেঁচামিচিতে হঠাৎ উঠে পড়লেন: চলন্ত বাসে গতির মাঝে পরস্পর যাত্রী কলহের মধ্যস্থ করলেন তিনি—'হাত থাকতে মুখে মুখে কেন?'

• • •

বাঁ কানটায় কিছুদিন ধরে যন্ত্রণা।

ডাক্তার বললেন, ই. এন. টি. স্পেসালিস্ট দেখান।'

ই. এন. টি. স্পেসালিস্ট কেস শুনে বললেন, 'দাঁতগুলো আগে দেখিয়ে আসুন?'

সবিনয়ে বললাম, 'আজ্ঞে দাঁত নয় কান।'

'ওই তো গণ্ডগোল। আগে দাঁতের রিপোর্ট চাই।'

সপ্তাহখানেক ধরে দাঁত ধরে চললো টানা হ্যাঁচড়া।

সেখান থেকে রিপোর্ট নিয়ে আবার ই. এন. টি.।

'আচ্ছা ব্লাডটা একবার টেষ্ট করান। লিখে দিচ্ছি, যান প্যাথোলজিষ্টের কাছে।'

আবার তিনদিনের ধাক্কা। কানে তখন অসহ্য যন্ত্রণা।

'যা হোক করুন ডাক্তার। কানের যন্ত্রণায় সারারাত ঘুম নেই।'

'আচ্ছা দেখি, কোন কান?'

'আজ্ঞে এই বাঁ কান।'

'সরি, আমি ডার্ন কানের স্পেসালিষ্ট।'

* * * *

হেডমিস্ট্রেস বসে আছেন স্কুলের অফিসের ঘরে।

ঘরের বাইরে লাইন দিয়ে অভিভাবকদের কতো আবেদন নিবেদন, দয়া করে আমার মেয়েকে নিন্। কোথাও জায়গা পাচ্ছে না।

সন্ধ্যার সময় হেডমিস্ট্রেস জবাব দিচ্ছেন,—

'পরীক্ষার মার্কসীট দেখে বিচার করা হবে।'

এক ভদ্রলোক ঢুকলেন, তাঁর সঙ্গে একটি বাচ্চা মেয়ে।

'কী চান?'

'আজ্ঞে, একে ভর্তি করতে চাই।'

'আপনি ওর কে হন?'

'মামা।'

'হবে না।'

'কেন?'

'রেজুলেশন জানেন না।'

'ওর বাবা যে বিদেশে থাকেন।'

'ওর মা?'

'তিনি বাইরে বেরুতে অত্যন্ত নন।'

'ওর ঠাকুরদা। অর্থাৎ ওর বাবার অভিভাবক যিনি?'

'সে কী বলছেন?'

'সরি, কাণ্ট হেল্প।'

টিং টিং। ঘণ্টির বেল বাজলো। হেডমিস্ট্রেস ডাকলেন 'Next!'

মডার্ণ ডেকরেটরস
৬৫ এ, ডব্লু, সি, ব্যানার্জী ষ্ট্রীট কলিকাতা ৬ ফোন ৫৫-২৩৪৮

গল্প-ভারতী
শ্রাবণ ১৩৭১

UNIVERSITY LIBRARY

সম্পাদকীয়

খাদ্য দৈহিক ও মানসিক

মানসিক খাদ্য জোগায় গল্পভারতীর মত মাসিক পত্র। তবে দৈহিক খাদ্য সঙ্কটেও তার বক্তব্য আছে। আমাদের পাঠক পাঠিকাদের সঙ্গে পূর্ণ সহানুভূতি জানিয়ে বলছি যে খাদ্য সমস্যা উৎকট আকার ধারণ করেছে কারণ ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষ "man made" স্বীকৃত হলেও এ বছরের খাদ্য-সঙ্কটও তদ্রূপ এবং তার চেয়ে অধিক তা স্বীকার করতে হয়। স্বাধীন ভারতের সরকার যে এতটা অসহায় এবং পুঁজিবাদীরা এমন দুর্দম তা আমাদের জানা ছিল না। মুখের অন্ন কেড়ে সে ধন ও ধান্য কতদিন থাকবে, বিধাতার অভিশাপ কীভাবে নামে সবই আমাদের দেখে যেতে হবে।

খৃষ্ট-পূর্ব ৬৩৬/৫১ সালে ১০ লক্ষ মানুষ মরেছিল শুনেছি বিরাট রোমক রাষ্ট্রে ; ক্ষুধার জ্বালায় টাইবার নদীতে ঝাঁপ দিয়ে মানুষ মরেছিল। ইউরোপেও বহুবার খাদ্যাভাবে বহু মানুষ মরেছে দুর্ভিক্ষের সময় আর—

"ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা
আমাদের এই বসুন্ধরা"

গান-মুখরিত ভারতেও দুর্ভিক্ষের ইতিহাস মারাত্মক। ১৮৯১ সালের ইংরেজ সভর্ণর হিসাব করে লিখে গেছেন মাত্র এক আনা খরচ করলেই মানুষ কোনক্রমে বাঁচতে পারে অথচ সেই একআনাও পায় নি। এখন Statistical income দাঁড়িয়েছে তিন থেকে ছয় আনা অর্থাৎ ১২ থেকে ২৪ পয়সা মাত্র। তাতে কত সের চাউল মেলে জানতে বাকী নেই। মা বোনেরা তাত বাড়বার সময় প্রত্যহ হিসাব রাখছেন। এ দুর্গতি যে তাঁরা দেখছেন তেবে মনটা ব্যথিত হয়। ছোট ছেলে-মেয়েরা কী খেয়ে ক্ষুধার নিবৃত্তি করছে ভাবতেও মনটা উতলা হয়—অথচ সেদিনও রবীন্দ্রনাথ গেয়ে গেছেন—

"চির কল্যাণময়ী
তুমি ধন্য
দেশে বিদেশে বিতরিছ অন্ন।"

আজ সেই বাঙলার ছেলে-মেয়েরা খাদ্যাভাবে কষ্ট পাচ্ছে—রবীন্দ্রনাথ দেখে গেলেন না! তাঁর জোড়া-সাঁকোর বাড়ীতে আত্মীয় পরিজন চাকর-বাকর নিয়ে কতগুলি পাতা পড়ত। এখন এ সঙ্কটে কী হত?

সবই ভাবতে হচ্ছে।—কাগজে পড়লাম ঠাকুর পরিবারের শেষ ঠাকুর অতীন্দ্র ঠাকুর (দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রপাতি) কাকমুল্যে বাড়ীর অংশ রবীন্দ্র ভারতীকে দিয়ে বেরিয়ে গেছেন। দ্বারকানাথ ঠাকুর লেনে ঢোকবার সময় ভেবে চমকে উঠলাম। তাঁর পুত্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৬) পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন। কত বিরাট তাঁদের কীর্তি প্রত্যেক বাঙালী তা জানেন। আমাদের "রবীন্দ্র-যুগ" প্রবন্ধে সবিস্তারে তা প্রকাশ করছি। রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণ ২২শে শ্রাবণ তারিখে মনে করালে যে ৮০ বছরের কবি ঐতিহাসিকরূপে সাক্ষ্য দিয়ে গেছেন তাঁর (১৯৪০ মার্চ্চ) বাঁকুড়া খেলাসমবর্ধনার প্রতিভাষণে "আমি যখন এসেছি আমাদের পরিবারে, তখন আমাদের অর্থ সম্বল হয়ে এসেছে রিক্ত-চলা নৈকতিনী। থাকতুম গরীবের মতো কিন্তু নিজেকে জানিনি গরীব বলে। আমার বরাইয়ে আজ যা কিছু ফসল জমেছে তার বীজ বোনা হয়েছে সেই প্রথম বয়সে। প্রথম ফসল অঙ্কুরিত হয় মাটির মধ্যে ভূগর্ভে। ভোরের বেলায় চাষী তার বীজ ছড়ায় আপন মনে। অঙ্কুরিত না-হলে সে বীজ ছড়ানোর বিচার হয় না। ফসল কি পরিমাণ হয়েছে প্রত্যক্ষ হলে মহাজন তবে দাদন দিতে আসে। যে মহাজনের ক্ষেতের উপর নজর পড়েনি তাদের ঋণের আশ্বাস আমি পাইনি। একান্তে নিভৃতে যা ছড়িয়েছি তাবিওনি ধরণী তা গ্রহণ করেছিলেন।

প্রত্যেক কথাটি কবি নয় ঋষি রবীন্দ্রনাথের অমর সাক্ষ্য বহন করছে। সেই চাষী বাঙালী কেন আজ দুর্ভার্ত? তার সাহিত্য ও ইতিহাসে ত দৈন্য নেই তবে ভিক্ষাপাত্র কেন শূন্য? পুণ্যাত্মা জমিদার রবীন্দ্রনাথ তা দেখে গেলেন না—আমরা দেখছি।

তাঁর বহু সাহিত্য ক্ষেত্রে "গীতাঞ্জলি" ১৯১৩ সালে যখন ১ লক্ষ বিশ হাজার টাকার নোবেল প্রাইজ এনেছিল সে টাকা ঠাকুর পরিবারের জমিদারীর তহবিলে জমা হয়নি। প্রতিবার গ্রামীণ ব্যাঙ্কের মারফৎ গরীব প্রজা চাষীদের উন্নতির জন্য রবীন্দ্রনাথ তাঁর একমাত্র পুত্র রথীন্দ্রনাথকে সেই টাকা দিয়ে গিছলেন তা আমি দেশের লোকও জানেন। স্বদেশী সমাজ প্রবন্ধে যে পরিকল্পনা রবীন্দ্রনাথ দিয়েছিলেন তা আজও প্রবর্তিত হয়নি কেন। ১৭ বছর স্বাধীন ভারতের বিকাশের পরও এ দৈন্য দুর্নীতি ও অভাব কেন তা অন্য ভারতবাসী না বুঝুক বাঙালী অর্থনীতির ছাত্ররা আশা করি বুঝতে চেষ্টা করবেন রবীন্দ্র ভারতীর ছাত্র-ছাত্রীরা সন্ধান করবে এই আশায় লিখলাম।

গোপালকৃষ্ণ গোখলে—জি, কে, গোখলে (১৮৬৬-১৯১৫) ও জামশেদজী টাটার মতন অর্থ-নীতিজ্ঞ বাংলার বা অন্যান্যেও মনীষী রমেশচন্দ্র দত্তের পদানুসরণ করে বাঙালী কেন বাঙলার অর্থনৈতিক ইতিহাস লেখেননি—এখনো কি সময় হয়নি—ব্যথিত চিত্তে আজ সেই কথাই ভাবি অথচ রমেশচন্দ্রের সাহিত্যগুরু বঙ্কিমচন্দ্রই (১৮১৮—১৮৯৪) তার ইতিহাস তথা সাহিত্য চেতনা জাগিয়ে দিয়ে গেছেন রমেশ তখন প্রতিষ্ঠার সময় রবীন্দ্র সাহিত্য পরিষদে এ কথা তুলেছিলাম।

শ্রীবিনয় সরকার

দারিদ্র্যের যে কঠিন বল, মৌনের যে স্তম্ভিত আবেগ, নিষ্ঠার যে কঠোর শান্তি এবং বৈরাগ্যের যে উদার গাম্ভীর্য, তাহা আমরা কয়েকজন শিক্ষাচঞ্চল যুবক বিলাসে অবিশ্বাসে অনাচারে অনুকরণে এখনো ভারতবর্ষ হইতে দূর করিয়া দিতে পারি নাই। * * * আমরা আজ যাহাকে অবজ্ঞা করিয়া চাহিয়া দেখিতেছি না, জানিতে পারিতেছি না, ইংরেজী স্কুলের বাতায়নে বসিয়া যাহার সজ্ঞাহীন আভাসমাত্র চোখে পড়িতেই আমরা লাল হইয়া মুখ ফিরাইতেছি, তাহাই সনাতন বৃহৎ ভারতবর্ষ, * * * তাহা বলিষ্ঠভীষণ, তাহা দারুণ সহিষ্ণু, উপবাসব্রতধারী ; তাহার কৃশপঞ্জরের অভ্যন্তরে প্রাচীন তপোবনের অমৃত অশোক অভয় হোমাগ্নি এখনো জ্বলিতেছে।

*　　*　　*　　*

জয় হইবে, ভারতবর্ষেরই জয় হইবে। যে ভারত প্রাচীন, যাহা প্রচ্ছন্ন, যাহা বৃহৎ, উদার, যাহা নির্বাক, তাহারই জয় হইবে ; * * * ভস্মাচ্ছন্ন সৌম্য ভারত চতুষ্পথে মৃগচর্ম পাতিয়া বসিয়া আছে—আমরা যখন আমাদের সমস্ত চটুলতা সমাধা করিয়া বিদায় লইব, তখনো সে শান্তচিত্তে আমাদের পৌত্রদের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকিবে। সে প্রতীক্ষা ব্যর্থ হইবে না, তাহারা এই সন্ন্যাসীর সম্মুখে করজোড়ে আসিয়া কহিবে—"পিতামহ, আমাদিগকে মন্ত্র দাও।"

তিনি কহিবেন—"ওঁ ইতি ব্রহ্ম।"

তিনি কহিবেন—"ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি।"

তিনি কহিবেন—"আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্
ন বিভেতি কদাচন।"

রবীন্দ্রনাথ

আত্মপরিচয়

নিজের সত্য পরিচয় পাওয়া সহজ নয়। জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার ভিতরকার মূল ঐক্যসূত্রটি ধরা পড়তে চায় না। বিধাতা যদি আমার আয়ু দীর্ঘ না করিতেন, সত্তর বৎসরে পৌঁছিবার অবকাশ না দিতেন তাহলে নিজের সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা করিবার অবকাশ পেতাম না। নানা ধারা করে নিজেকে দেখেছি, নানা কাজে প্রবর্তিত করেছি, ক্ষণে ক্ষণে তাতে আপনার অভিজ্ঞান আপনার কাছে বিক্ষিপ্ত হয়েছে। জীবনের এই দীর্ঘ চক্র পথ প্রদক্ষিণ করতে করতে বিরামকালে আজ সেই চক্রকে সমগ্ররূপে দেখতে পেলাম, তখন একটা কথা বুঝতে পেরেছি যে, একটি মাত্র পরিচয় আমার আছে, সে আর কিছু নয়, আমি কবি মাত্র। আমার চিত্ত নানা কর্মের উপলক্ষ্যে ক্ষণে ক্ষণে নানাজনের গোচর হয়েছে। তাতে আমার পরিচয়ের সমগ্রতা নেই! আমি তত্ত্বজ্ঞানী শাস্ত্রজ্ঞানী গুরু বা নেতা নই—একদিন আমি বলে ছিলাম, "আমি চাইনে হতে নরনারীর নয়নমনের চালক"। সে কথা সত্য বলেছিলাম। শুভ্র নিরঞ্জনের যাঁরা দূত তাঁরা পৃথিবীর পাপক্ষালন করেন, মানবকে নির্মল নিরাময় কল্যাণ ব্রতে প্রবর্তিত করেন, তাঁরা আমার পূজ্য, তাঁদের আসনের কাছে আমার আসন পড়েনি। কিন্তু সেই শুভ্র জ্যোতি যখন রহু বিচিত্র হয়, তখন নানা বর্ণের আলোকরশ্মিতে আপনাকে বিচ্ছুরিত করেন, বিশ্বকে রঞ্জিত করেন; আমি সেই বিচিত্রের দূত। আমরা নাচি নাচাই, হাসি হাসাই, গান করি ছবি আঁকি, যে আদিঃ বিশ্বপ্রকাশের অহৈতুক আনন্দে অধীর আমরা তাঁরই দূত। বিচিত্রের লীলাকে অন্তরে গ্রহণ করে তাকে বাহিরে লীলায়িত করা—এই আমার কাজ। মানবকে সমাহারে চালাবার দাবি রাখিনে, পথিকের চলার সঙ্গে চলার কাজ আমার, পথের দুইধারে যে ছায়া, যে তরুর ঐশ্বর্য, যে ফুলপাতা, যে পাখির গান, সেই রসের রসদে জোগান দিতেই আমরা আছি। যে-বিচিত্র ঘর হয়ে হেসে খেলে বেড়ান দিকে দিকে সুরে গানে নৃত্যে চিত্রে, বর্ণে বর্ণে রূপে রূপে, সুখ দুঃখের আঘাতে-সংঘাতে, ভালোমন্দের দ্বন্দ্বে—তাঁর বিচিত্র রসের বাহনের কাজ আমি গ্রহণ করেছি, তাঁর রথ সাজার বিচিত্র রঙগুলিকে সাজিয়ে তোলবার ভার পড়েছে আমার উপর, এই-ই আমার একমাত্র পরিচয়।

অন্য বিশেষণও লোকে আমাকে দিয়েছেন; কেউ বলেছেন তত্ত্বজ্ঞানী, কেউ আমাকে ইস্কুল মাষ্টারের পদে বসিয়েছেন। কিন্তু বাল্যকাল থেকেই কেবল মাত্র খেলার ঝোঁকেই ইস্কুল মাষ্টারকে এড়িয়ে এসেছি—মাষ্টারি পদটাও আমার নয়। বালো নানাসুরের ছিদ্র-করা বাঁশি-হাতে যখন পথে বেরলুম তখন ভোর বেলার অস্পষ্টের মধ্যে স্পষ্ট ফুটে উঠতে চাচ্ছিল, সেদিনের কথা মনে পড়ে। সেই অন্ধকারের সঙ্গে আলোর প্রথম শুভদৃষ্টি; প্রভাতের বাণী বন্যা আমার মনে তার প্রথম বাঁধ ভেঙেছিল দোল লেগেছিল চিত্ত সরোবরে। ভালো করে বুঝি বা না বুঝি, বলতে পারি বা না পারি, সেই বাণীর আঘাতে বাণীই জেগেছে। বিশ্বে বিচিত্রের লীলায় নানা সুরে চঞ্চল হয়ে উঠছে নিখিলের চিত্ত, তারই তরঙ্গে বালকের চিত্ত চঞ্চল হয়েছিল।

এই আশ্রমে প্রাণ সম্মিলনের যে কল্যাণময় সুন্দর রূপ জেগে উঠেছে, সেটিকে প্রকাশ করাই আমার কাজ।

এর বাহিরের কাজ ও কিছু প্রবর্তন করেছি, কিন্তু সেখানে আমার চরম স্থান নয়, এর যেখানটিতে রূপ সেখানটিতে আমি। গ্রামের অব্যক্ত বেদনা যেখানে প্রকাশ খুঁজে ব্যাকুল, আমি তাঁর মধ্যে। এখানে আমি শিশুদের যে-ক্লাস করেছি সেটা গৌণ—প্রকৃতির লীলাক্ষেত্র শিশুদের সুকুমার জীবনের এই যে প্রথম আরম্ভ-রূপ, এদের জ্ঞানের অধ্যবসায়ের আদি সূচনায় যে উদ্বোধন নীতি যে সংযোগসেতু উদ্যমের অঙ্কুর, তাকেই অবারিত করবার জন্যে আমার প্রয়াস, না-হলে আইন-কানুন-সিলেবাসের জঞ্জাল নিয়ে মরতে হত। এই সব বাইরের কাজ গৌণ, সেজন্য আমার বন্ধুরা আছেন। কিন্তু লীলাময়ের লীলার ছন্দ মিলিয়ে এই শিশুদের নাচিয়ে গাইয়ে, কখনো ছুটি দিয়ে এদের চিত্তকে আনন্দে উদ্বোধিত করার চেষ্টাতেই আমার আনন্দ আমার সার্থকতা। এর চেয়ে গম্ভীর আমি হতে পারব না; শঙ্খ ঘণ্টা বাজিয়ে যাঁরা আমাকে উচ্চ মঞ্চে বসাতে চান, তাঁদের আমি বলি, আমি নিচেকার স্থান নিয়েই জন্মেছি, প্রবীণের প্রবাসের আসন থেকে খেলার ওস্তাদ আমাকে ছুটি দিয়েছেন। এই ধূলো-মাটি-ঘাসের মধ্যে আমি হৃদয় ঢেলে দিয়ে পেলাম, বনস্পতি-ওষধির মধ্যে। যারা মাটির হাতে মানুষ, যারা মাটিতেই হাঁটতে আরম্ভ ক'রে শেষকালে মাটিতেই বিশ্রাম করে, আমি তাদের সকলের বন্ধু, আমি কবি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বর্ষামঙ্গল

শান্তিনিকেতনের অবারিত আকাশ এবং দিগন্ত প্রসারিত প্রান্তর যথার্থই ঋতুরঙ্গ-ভূমি। এখানে আমাদের ছাত্র-ছাত্রীরা যে আতিথ্য লাভ করেছে তার ভোজের ক্ষেত্রে নব নব রস পরিবেষণ করে ঋতুর দল। আনন্দের গুণ আমরা শোধ করে থাকি, গড়ে সুরে নাচে। তাকেই বলে উৎসব। বৎসরে বৎসরে এই উৎসবে প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের হৃদয়ের মিলন ঘটে।

সহরের মধ্যেও ঋতু আসে, কিন্তু তার প্রকাশে বাধা থাকে বিস্তর, তাই এখানে উৎসবের সৃষ্টি সহজে হয় না।

কিছুকাল পূর্বে কোন এক বর্ষায় সহরবাসীকে আমাদের আশ্রমের উৎসবের ভাগ দিতে এসেছিলুম। সেদিনকার সেই বর্ষামঙ্গলের কথা হয়তো কারো কারো মনে আছে। কেবলমাত্র কয়েক ঘণ্টা আমাদের মধ্যে সেই অনুষ্ঠানের অবসান হয়েছিল বলে মনে হয় না। আমার বিশ্বাস সেই উপলক্ষে গীত-ভারতীর বীণায় বাংলা সুরের বিশেষ একটি তার চড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। সেই তারের ঝঙ্কার আজো চলেছে। আজ বাংলা দেশ বাংলা গানে মুখরিত।

এই নবজাগ্রত বাংলা গানের ভরা বাদরে আমাদের আশ্রমের উৎসবকে আর একবার লোকালয়ে এনে উপস্থিত করেছি, মনে করিয়ে দিতে এসেছি বর্ষা এলো, ভারতবর্ষের কবিদের বর্ষা, যে বর্ষার হৃদয় থেকে মেঘদূতের বিরহ গান উৎসারিত হয়ে নিত্য কালকে অভিষিক্ত করেছে।

১৯শে ভাদ্র, ১৩৪৪

রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় এলেন বিশ্বভারতীর জন্য অর্থ সংগ্রহ করতে। শান্তিনিকেতনের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে বর্ষামঙ্গল উৎসবের আয়োজন করলেন সহরের বিভিন্ন স্থানে। এই উপলক্ষে প্রকাশিত সূচনীয়ে এই লেখাটি প্রথম বেরোয়।

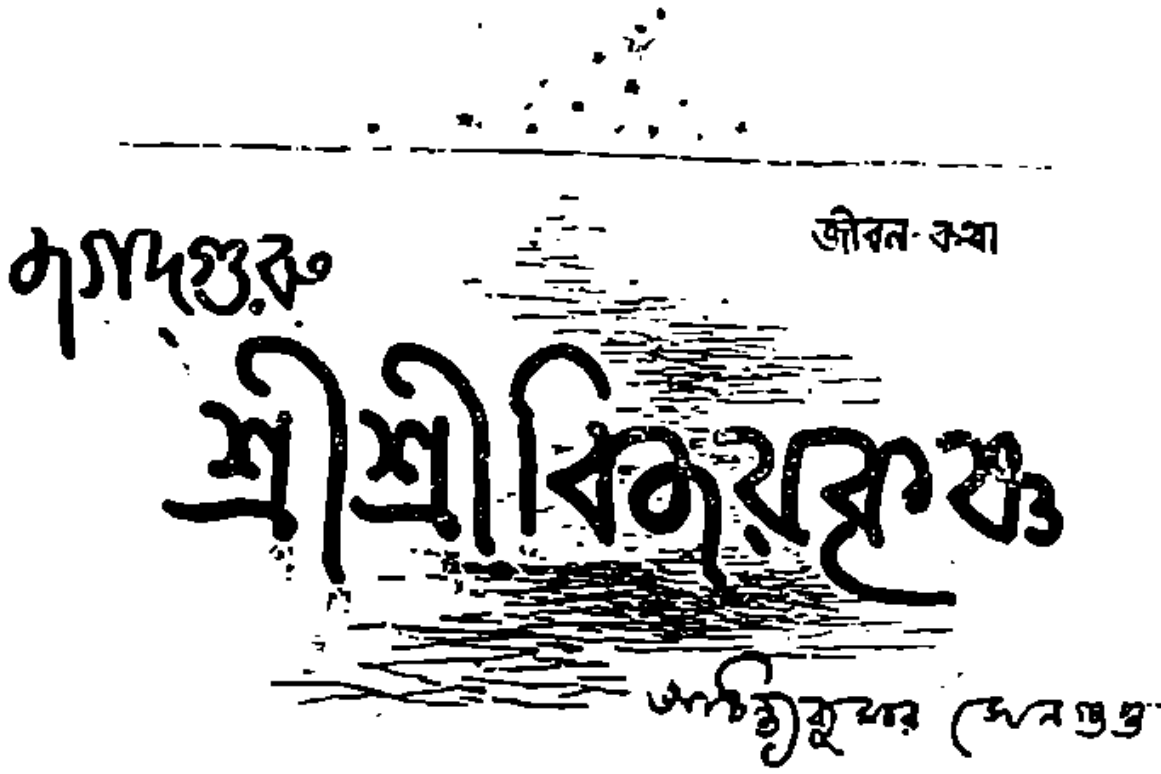

২৪

'কুতু, তোর কি যার জন্যে কষ্ট হয়?'

'বা, কষ্ট হবে কেন? মা যে পাঠ শুনতে আসেন। যাকে দেখতে পেলে আর কষ্ট কোথায়?'

পাঠ শুনতে আসেন! সবাই নিদারুণ অবাক মানল। কই আর তো কেউ দেখতে পায় না তাকে।

কুতুর চোখ আনন্দে উজ্জ্বল হল: 'আজও তো এসেছিলেন।'

'কোথায় বসেছিলেন?' জিজ্ঞেস করল গোঁসাই।

'আমার পাশটিতে।'

'কেমন দেখলি?'

'এই শরীরে নয়।' কুতু গম্ভীর হল।

কী ব্যাপার? কুসদা ঝিনুতে গিয়ে ধরল গোঁসাইকে।

কী আর ব্যাপার! আমার পরমহংসজী সূক্ষ্ম শরীরে এসে তাঁকে নিয়ে গেছেন।

'কিন্তু মা তো আর সূক্ষ্ম শরীরে যাননি?' কুসদা অভিভূত হল: 'পরমহংসজী স্থূল শরীর নিয়ে গেলেন কী করে?'

'যোগীরা সবই পারেন।' বললে গোঁসাই, 'ইচ্ছেমাত্র স্থূলকে সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্মকে স্থূল করতে পারেন। দেহের পঞ্চ ভূতকে পঞ্চতন্মাত্রে মিলিয়ে স্থূলকে সূক্ষ্মে পরিণত করে মুহূর্তমধ্যে তাঁকে নিয়ে গিয়েছেন।'

'কোথায় নিয়ে গিয়েছেন?'

'মানসসরোবরে।'

'তিব্বতের মানসসরোবরে ?'

'সে তো 'মানতলাও।' সে মানসসরোবরে নয়।' বললে গোঁসাই, 'এ মানসসরোবর অনেক দূরে, হিমালয়েরও উপরে। কৈলাস যাবার পথে।'

'সেখানে কি আমি যেতে পারি না ?'

'এই শরীরে কী করে যাবে ? অনেক যোগৈশ্বর্য হলে তবে যাওয়া যায়।'

কিন্তু দামোদর পুজুরী দাউজির যা ভোগ লাগাচ্ছে তার প্রসাদে তুল শরীরই টিকিয়ে রাখা অসম্ভব হয়ে উঠছে। শুকনো খরখরে আটার রুটি আর কুমড়ো-সেদ্ধ। অথচ গোঁসাইয়ের সেবার যে টাকা আসে তার সমস্তই দামোদরকে দাউজির ভোগে ব্যয় করতে দেওয়া হয়। পাথরের ঠাকুর, তার কুমড়ো-সেদ্ধতে অরুচি নেই, কিন্তু গোঁসাইয়ের শিষ্যরা এই অত্যাচার সহ্য করতে আর রাজি হল না।

গোঁসাইয়ের শরীরও কেমন দিন-দিন কাহিল হয়ে যাচ্ছে।

'তোমার ভোগ তো আর দেখা যায় না।' দামোদরকে গিয়ে ধরল চেলারা।

দামোদর বিরক্ত হয়ে বললে, 'ভক্তভক্ত সোভ নেহি চাহি।'

কুমড়ো সেদ্ধ না দিয়ে কুমড়োর চোকলা সেদ্ধ দিতে লাগল দামোদর। বললে, যা টাকা আসছে তাতে ওর বেশি পোষায় না।

বটে ? হিসেব দাও। নয়তো এবার থেকে টাকা পয়সা নিজেদের হাতে রেখে নিজেরাই ভোগের ব্যবস্থা করব।

দামোদর তখন নিজে বাজারে গেল। বাছা-বাছা সোকারদের শুকনো বেগুন আর 'বারো-মিশালি' শাক কিনে আনল। তাই সেদ্ধ করে ভোগ লাগাল। উল্লাস করে বললে, 'কায়সা খিলায়া।'

সবাই গিয়ে তখন গোঁসাইকে ধরল। এর একটা বিহিত করুন।

গোঁসাই মিষ্টি হেসে বললে, 'দাউজি আগ্রত দেবতা। তিনিই বিহিত করবেন।'

তোমরা পাবও। তোমরা আবার গোঁসাইকে লাগাতে গিয়েছ। তাঁর ক্লেশ তোমাদের একটু প্রাণে লাগে না ? বলছি বাঙলা মুলুকে চিঠি লাঠাও, আরো টাকা আনাও, তা নয়, উলটে যত সব পেট পাকানো। ভজন ছেড়ে যত সব ভোজনবাদী হয়ে উঠেছ।

দামোদর মালা নাড়ে আর বুলি ঝাড়ে।

কিন্তু পাথরের দেবতাও বুঝি আর নিশ্চল থাকতে প্রস্তুত নয়।

দু গালে হাত বুলুতে-বুলুতে দামোদর এসে হাজির। মুখখানি কাঁদো-কাঁদো।

'কী হল ?' জিজ্ঞেস করল গোঁসাই।

'বাবা, দাউজি দামকো বহুত মারা হ্যায়।'

'কেন, মারলেন কেন ?'

দামোদর তখন আদ্যোপান্ত বললে।

শেষ রাত্রে ঘুমিয়ে আছে, দাউজি এসে দামোদরকে চেপে ধরল। দুই গালে চড় মারতে লাগল। তাতেও হল না। সর্বাঙ্গে মারতে লাগল। চড় কিল ঘুষি।

কী করেছি ?

কী করেছিস ? পাষণ্ড, ভালো করে ভোগ দিচ্ছিস না। সব নিজে খাচ্ছিস, আমার গোঁসাই শুকিয়ে যাচ্ছে, তোকে আজ কিলিয়েই শেষ করব।

দেব, দেব, ভালো করে খেতে দেব।

তখন দাউজি ছেড়ে দিল। দেখুন গাল দুটো ফুলে রয়েছে। সর্বাঙ্গে ব্যথা।

গোঁসাই বললে, 'তুমি ভাগ্যবান। দাউজি তোমাকে শাসন করেছেন। আর কী, প্রাণ ঢেলে সর্বস্ব দিয়ে দাউজির সেবা করো, তিনি তোমার কোনো অভাব রাখবেন না।'

স্বপ্নের প্রহার শরীরে ফোটে—সকলে দেখে অবাক হয়ে গেল। অবাক হয়ে গেল ভোগের ব্যবস্থা দেখে। এখন থেকে পেট ভরে দুটি খেয়ে 'হরেকৃষ্ণ' বলা যাবে।

কুতুবুড়ি এসে বললে, 'মা আজ আসবেন।'

'কী করে বুঝলে?'

'জানিনা। আমি যেন দিনের বেলাতেও স্বপ্ন দেখি।' গোঁসাইয়ের কাছে এসে কুতু বললে, 'আমার এমন কেন হয় বাবা?'

'কী হয়?'

'মনে হয় যা কিছু দেখছি শুনছি করছি, সব মিথ্যে, সব স্বপ্ন।'

'তোর খুব সৌভাগ্য তুই ঠিক—ঠিক দেখছিস।' গোঁসাই বললে, 'সমস্তই মিথ্যে সমস্তই স্বপ্ন। পরিচ্ছন্ন জ্ঞানে এ জানতে পারলেই তো হয়ে গেল।'

সন্ধের কিছু আগে বৃদ্ধা অনঙ্গ বৈষ্ণবী এসে হাজির। ওগো মা-গোঁসাই যে আমাদের ঘরে। কোত্থেকে এলেন? কার সঙ্গে এলেন?

তা কে জানে।

যোগজীবন ছুটল মাকে দেখতে। ছুটল শ্রীধর আর সতীশ।

কী আশ্চর্য, দেবী ফিরে এসেছেন। যোগজীবন মায়ের পায়ে পড়ল। মা গো, ঘরে চলো।

যোগমায়া ফিরে এল। পরনে গেরুয়া বসন। গোঁসাইকে প্রণাম করল। পাশে বসে বাতাস করতে লাগল। যেন আগে যেমন ছিল তেমনিই আছে। গোঁসাই একবার জিজ্ঞেস করল না, কোথায় ছিলে, কী করে ফিরে এলে?

কিন্তু যোগজীবন পেড়াপেড়ি সুরু করল—বলো, কী করে অদৃশ্য হয়ে গেলে?

'পরমহংসজী এসেছিলেন।' বললে যোগমায়া, 'সঙ্গে পাঁচজন মহাপুরুষ। সবাই ছ-সাত হাত লম্বা। মাথায় পাগড়ি বাঁধা। আমাকে বললেন, যমুনায় স্নান করবে চলো। যমুনায় স্নান করতে নামলাম। তারপর কী করে কী হল কিছুই বুঝতে পারলাম না। দেখলাম একটা পাহাড়ের উপরে আছি। সে যে কী আনন্দের স্থান কী বলব! ফিরে আসতে ইচ্ছে করে না, শুধু কুতুর কথা মনে করেই মাঝে মাঝে উতলা হয়ে উঠি।' কুতুকে কাছে টেনে নিল যোগমায়া।

'বৃন্দাবন থেকে আর উনি নড়বেন না কোথাও।' বললে গোঁসাই, 'তাই ওঁকে এখানে আসতে বারণ করেছিলাম।'

পাঁজি দেখে দিন ঠিক করল যোগমায়া। নিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাবের দিন মাঘী ত্রয়োদশী তিথিটি শুভ। সকালে তার দেহে বিসূচিকা প্রবেশ করল আর সন্ধ্যায় সে প্রবেশ করল নিত্যলীলায়।

ব্যাধির প্রকোপে দেহ অবসন্ন হয়ে এসেছে, পাশে বসে আছে গোঁসাই, হঠাৎ পরমহংসজী আবির্ভূত হলেন। গোঁসাইকে বললেন, 'তুমি কুঞ্জ ছেড়ে বাইরে কোথাও যাও। তুমি এখানে থাকলে ওকে নিয়ে যাওয়া যাবে না। দেহত্যাগ হয়ে গেলে পর এস।'

কিন্তু যোগমায়া ছেড়ে দিতে রাজি নয়। গোসাই উঠি-উঠি করছে দেখে হাত ধরল। তুমি চলে যেও না।

কিন্তু পরমহংসজীর আদেশ। ভোর বেলাই উঠে পড়ল গোসাই। কুঞ্জ ছেড়ে চলে গেল অন্যত্র।

যোগমায়ার দেহাবসান হল।

গোসাই ফিরে এসে দেখল সবাই কাঁদছে, বেশি কাঁদছে কুহুকুড়ি, যেন শোকে মুহ্যমান হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এটা তো শোকের ব্যাপার নয়, এটা উৎসবের ব্যাপার।

যোগজীবনকে লক্ষ্য করে বললে, 'মৃতদেহ এখানে এতক্ষণ রেখেছিস কেন? যা যমুনার তীরে নিয়ে সংস্কার করে আয়।

যোগমায়ার দেহ কেশীঘাটে নিয়ে যাওয়া হল।

আসনে প্রশান্ত মূর্তিতে স্থির হয়ে বসল গোসাই। শুধু কুহুকুড়িরই বিন্দুমাত্র ধৈর্য নেই, আর্তনাদ করে কাঁদছে।

'আর্তনাদ করে কাঁদা ভালো, তাতে শোক পাতলা হয়ে যায়।' বললে গোসাই। কুহুকে কাছে ডাকল, পিঠে রাখল সান্ত্বনার হাত।

হাত রাখতেই যন্ত্রণায় চমকে লাফিয়ে উঠল কুহু। সত্যি সে শোকে মুহ্যমান হয়ে যাচ্ছে—হাত রাখতেই তার পিঠে আগুনে-পোড়া ফোস্কার মত পাঁচটা আঙুলের দাগ বসে গেছে।

'এ হচ্ছে ভক্ত বিচ্ছেদের জ্বালা।' বললে গোসাই. 'মহাপ্রভুর অন্তর্ধানের পর রূপ সনাতনের এরকম হয়েছিল। বাইরে কারো কোনো শোক নেই দেখে অনেকের সন্দেহ হয়েছিল এরা কেমন ভক্ত। একদিন বৃক্ষতলে বসে ভাগবত পাঠ হচ্ছে, অনেকে শুনছে। গাছের একটা শুকনো পাতা হাওয়ায় উড়ে এসে রূপ গোস্বামীর গায়ে পড়ল। গায়ে পড়েই ধপ করে জ্বলে উঠল। পুড়ে ছাই হয়ে গেল। তখন সকলে বুঝল কাকে বলে বিরহদহন!'

ঢাকায় কুঞ্জ ঘোষকে চিঠি লিখল গোসাই :

'গত ১০ই ফাল্গুন সন্ধ্যাকালে শ্রীশ্রীমতী যোগমায়া দেবী তাঁহার চির প্রার্থনীয় সিদ্ধদেহ লাভ করিয়াছেন। অবিশ্বাসী লোকে ইহাকে মৃত্যু বলে, কিন্তু একবার বিশ্বাস নয়নে চাহিয়া দেখ। যোগমায়া আজ সখীবৃন্দের মধ্যে কি অপূর্ব শোভা সৌন্দর্য লাভ করিয়াছেন। শ্রীমতী শান্তিসুধাকে বলিবে যে, যেন শোক না করে, ইহা শোকের ব্যাপার নহে, বহু সৌভাগ্যে মনুষ্য ইহা প্রাপ্ত হয়। আগামী ২১শে ফাল্গুন এখানে তাঁহার নামে মহোৎসব হইবে। তাহার পর আমরা ঢাকায় যাত্রা করিব।

শ্রীমতী শান্তিসুধা যদি শ্রাদ্ধ করিতে চায় তবে আনন্দ উৎসব করিয়া যেন দুঃখী কাঙালীদিগকে খাওয়ায়।

মা, শান্তি, শোক করিও না, আনন্দ কর। যত শীঘ্র পারি আমরা ঢাকা যাইতেছি।'

উৎসবশেষে গোসাই বৃন্দাবন ছেড়ে হরিদ্বার এল। যোগমায়ার একখানা অস্থি বৃন্দাবনে সমাধিত করা হয়েছে, আরেক খানা ব্রহ্মকুণ্ডের ঘাটে এসে গঙ্গা গর্ভে বিসর্জন দিল। তৃতীয়খণ্ডটি নেওয়ারিয়া আশ্রমে সমাধিত করে তার উপরে সমাধিমন্দির স্থাপিত করতে হবে।

সে বছর কুম্ভমেলা, লক্ষ-লক্ষ সাধু আর ধর্মার্থীর সমাগম হয়েছে হরিদ্বারে। ব্রহ্মকুণ্ডের কাছে এক পাণ্ডার বাড়িতে আছে গোঁসাই। সঙ্গে যোগজীবন, প্রিয়ব্রত, শ্যামাকান্ত, আরো অনেকে। হরিদ্বার আর হরিদ্বার নেই, হরিঘর হয়ে উঠেছে।

কনখলে সাধুদর্শন করছে গোঁসাই, দূর থেকে একজন বৈষ্ণব বাবাজী গোঁসাইকে লক্ষ্য করে গেয়ে উঠল :

যাদের হরি বলতে নয়ন ঝরে
ঐ দেখ তারা দুভাই এসেছে রে।
যারা প্রেমে জগৎ ভাসাইল
যারা নামে জগৎ মাতাইল
তারা দুভাই এসেছে রে॥

গোঁসাই উদ্দণ্ড নৃত্য করতে সুরু করল। মুহূর্তে চারদিকে ভাবের প্রবল স্রোত উদ্বাহিত হল—কেউ ঐ কীর্তনে যোগ দিল কেউ বা তুলল তারক ব্রহ্ম হরিনামের জয়ধ্বনি। নানা দেশের নানা মতের নানা সাধু—যারা সমবেত হয়েছিল—তারা বিস্ময় মানল, এমন নাচ এমন ভাব এমন দৃশ্য দেখিনি তো কোনোদিন। কে এ উজ্জ্বলস্ত পুরুষ। চলো কাছে গিয়ে দেখি।

যাযাকুণ্ডবাসী বেনীমাধব পাণ্ডা কাছে গিয়ে দেখল গোঁসাইয়ের বুকে স্বর্ণাক্ষরে হরিনাম প্রস্ফুটিত।

লক্ষসাধুর মধ্যে কজন বা তত্ত্বদর্শী। গোঁসাই ঘুরে ঘুরে শুধু তিনজনকে আবিষ্কার করল। একজনকে জিজ্ঞেস করল, 'এত কাঠখড় করছে তবু সাধুদের তত্ত্বলাভ হচ্ছেনা কেন?'

সাধু দ্বিধিতে বললে, 'আমি কীটানুকীট আমি কী করে বলব?'

'না, আপনি বলতে পারবেন।'

শেষকালে সাধু বললে, 'আজকাল সাধুরাও ভগবান চায়না। মান মর্যাদা মোহান্তগিরি চায়। আর কেবল সম্প্রদায় আর মতামত নিয়ে মাতামাতি করে। কিন্তু যৎসত্যং নিহিতং গুহায়াং।'

একদিন নিমাই-নিতাই অদ্বৈতের কথা হচ্ছে হঠাৎ এক শুভ্রকাচী প্রাচীন সাধু গোঁসাইকে লক্ষ্য করে বললে, 'প্রায় চারশো বছর আগে আমাদের মেশে এক বাঙালী সাধু গিয়েছিল তার নাম কমলাক্ষ।'

'চারশো বছর আগে!' সবাই চমকে উঠল : 'আপনার তখন বয়েস কত ছিল?'

'আমার বয়েস তখন কত আর হবে! পনেরো-ষোলো।'

গোঁসাই জিজ্ঞেস করল : 'সেই সাধুর বাড়ী কোথায় ছিল?'

'বলেছিল নদীয়া শান্তিপুর। তাঁর একখানা পীতা আমার কাছে আছে।'

সেই কমলাক্ষই তো অদ্বৈত।

'কী উপায়ে এত দীর্ঘজীবন লাভ করেছেন?'

'হঠযোগে।' প্রাচীন সাধুটি উঠে দাঁড়াল। বললে, 'নির্জনে চলো, তোমাকে প্রক্রিয়া দেখিয়ে দিচ্ছি। এমন সাধু আছে যারা আমারও বয়োজ্যেষ্ঠ।'

কিন্তু শুধু দীর্ঘজীবন লাভ করলেই কি ঈশ্বর মিলবে?

তিনটে স্কুলে-পড়া ছেলে সন্ন্যেসী হতে এসে এক সাধুর-খপ্পরে পড়েছে। বাইরের ভেক দেখে ভেবেছিল এ না জানি কত বড় মহাপুরুষ! বললে, আমরা ভগবানের জন্যে ঘর ছেড়েছি, আমাদের দীক্ষা দিন।

সাধু সানন্দে দীক্ষা দিল ও ছোকরা তিনটেকে কৌপীন পরিয়ে চাকরের কাজে লাগাল। কেউ বাসন মাজো, কেউ লাকড়ি ফাড়ো, কেউ জল টানো। কখনো বা গা-হাত পা টেপো। ঘাটতে-

খাইতে ছেলে তিনটে রোগা হয়ে গেল। অসুস্থতারও রেহাই নেই। কাজ না করলে প্রহার পড়তে লাগল। যাতে পালিয়ে না যায় তার জন্যে দলের আর-আর সাধুরা নিযুক্ত করলে। বিপন্ন ছেলেগুলো চারদিকে অন্ধকার দেখল।

কেউ খবর দেয়নি, সহসা গোঁসাই একদিন সেই আশ্রমে এসে উপস্থিত হল। ছেলেগুলো যেন দুস্তর সমুদ্রে ভেলা পেল। ছেঁকে পড়ল গোঁসাইয়ের কাছে। আমাদের উদ্ধার করুন।

গোঁসাই সাধুকে বললে, বাচ্চা কটাকে ছেড়ে দিন।

সাধু তেড়ে এল, ঠেলে গালাগাল দিল গোঁসাইকে। বললে, 'এ লোগ মেরা চেলা হুয়া হ্যায়, মন্ত্র লিয়া হ্যায়, এ লোগোঁকো কভি নেহি ছোড়েঙ্গে।'

এই কথা? গোঁসাই পুলিশকে খবর দিল। পুলিশ এসে উদ্ধার করল ছেলেগুলোকে। গোঁসাই বললে, 'যাদের ছেলে তাদের কাছে ফিরে যাও।'

আরেক দিন মেলার মধ্যে গিয়েছে একটি নেংটি-পরা পাহাড়বাসী সন্ন্যাসী গোঁসাইকে দেখতে পেয়ে দূর থেকে ছুটে এগিয়ে আসতে লাগল। ভিড়-ভাড় কিছু মানছে না, একে-ওকে ঠেলে ধাক্কা মেরে পথ করে নিচ্ছে। আর মুখে উন্মত্ত চিৎকার—আজ মেরা মিলা রে মিলা! আজ আমি পেয়ে গেছি রে পেয়ে গেছি।

কী পেয়েছ? কাকে মিলেছে?

পাহাড়বাসী সাধু কোনো উত্তর করে না, গোঁসাইকে ঘিরে ঊর্ধ্ব বাহু হয়ে নাচতে লাগল: মেরা মিলা রে মিলা! আজ আমি পেয়ে গেছি রে পেয়ে গেছি।

প্রদক্ষিণ করছিল, নাচছিল, হঠাৎ আর সাধুকে দেখা গেল না। হারাধন পেয়ে আবার কোথায় নিঃস্ব হয়ে হারিয়ে গেল। কেউ সন্ধান পেল না।

আরেক সাধু গোঁসাইকে দেখে টলতে টলতে এগিয়ে আসতে আসতে স্তম্ভের মত দাঁড়িয়ে পড়ল। কাঁদতে লাগল আকুল চোখে। গদগদ স্বরে বলল, 'সব মেরা আজ পূরণ হো গিয়া, আজ হাম ধন্য হো গিয়া। আমার সমস্ত আজ পূরণ হয়ে গিয়েছে, আমি কৃতার্থ হয়েছি।'

শ্রীধর সেই সাধুকে নমস্কার করে বললে, 'মহারাজ, আমাদের আশীর্বাদ করুন।'

সাধু বললে, 'তোমাদের মহাভাগ্য, তোমরা ভগবানের সঙ্গ পেয়েছ। আর কী চাই? সব চেয়ে যা দুর্লভ তাই পেয়ে গেছ। সব সময় পিছু-পিছু থাকো। সঙ্গ কখনো ছেড়ো না। ধন্য হয়ে গেছ, কৃতকৃতার্থ হয়ে গেছ।'

এ সব সাধুরা লোকালয়ে থাকে না, পাহাড়ে জঙ্গলে সাধন ভজন করে, অথচ গোঁসাইকে দেখে এমন করছে যেন গোঁসাই সকলের কত অন্তরঙ্গ প্রিয়জন। কত জনের নিকট আত্মীয়।

কুম্ভমেলা যেখানেই হোক, হরিদ্বারে কি প্রয়াগে, নাসিকে কি উজ্জয়িনীতে, এত সাধু-সমাগম হয় কেন? শুধু স্নানের জন্যে?

গোঁসাই বললে, 'আরো এক উদ্দেশ্য আছে। সাধুদের সাধন-ভজনে যে সমস্ত সঙ্কট ও সংশয় দেখা দেয় তারই নিরাকরণের জন্যে এই সাধুসভা। কখনো কখনো উপযুক্ত উপদেশ বা শিক্ষা দানের জন্যেও নানা জিজ্ঞাসা ও মীমাংসা চলে। কোন অঞ্চলে কী রকম ধর্মভাব চলছে তারও খবর নেওয়া হয়। কোন অঞ্চলের ভার কোন মহাত্মার উপর দেওয়া হবে তারও সিদ্ধান্তের দায়িত্ব এই সভার। এবার যেমন, চুরাশি ক্রোশ ব্রজমণ্ডলের ভার রামদাস কাঠিয়া বাবাকে দেওয়া হয়েছে।'

'আর বাঙলা দেশের ভার?'

গোস্বামী প্রভু কিছু বললেন না, ম্লানমুখ হয়ে রইলেন। [ক্রমশঃ

চিঠিশুদ্ধু চিঠি নয়

৮ জানুয়ারী ১৯০৮
সিলাইদহ

বন্ধু,

তোমার চিঠি পাইয়া বিশেষ সান্ত্বনা অনুভব করিয়াছি। আমাদের চারিদিকেই এত দুঃখ এত অভাব এত অপমান পড়িয়া আছে যে নিজেরদিকে লইয়া অভিভূত হইয়া এবং নিজেকেই বিশেষরূপ দুর্ভাগা কল্পনা করিয়া পড়িয়া থাকিতে আমার লজ্জা বোধ হয়। আমি যখনই আমাদের দেশের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের কথা ভাবিয়া দেখি তখনি আমাকে আমার নিজের দুঃখতাপ হইতে টানিয়া বাহির করিয়া আনে। আমাদের অসহ্য দুর্দ্দশার মূর্ত্তি ঘরে ও বাহিরে আজকাল এমনি সুপরিস্ফুট হইয়া দেখা দিয়াছে যে নিজের ব্যক্তিগত ক্ষতি লইয়া পড়িয়া থাকিবার সময় আমাদের আর নাই।

এবারকার কন্‌গ্রেসের বক্তৃতার কথা ত শুনিয়াছই—তাহার পর হইতে দুই পক্ষ পরস্পরের প্রতি দোষারোপ করিতে দিনরাত্রি নিযুক্ত রহিয়াছে। অর্থাৎ বিচ্ছেদের কাটা ঘায়ের ওপর দুই দলে মিলিয়াই নুনের ছিটা লাগাইতে ব্যস্ত হইয়াছে। কেহ ভুলিবে না, কেহ ক্ষমা করিবে না—আত্মীয়কে পর করিয়া তুলিবার যতগুলি উপায় আছে তাহা অবলম্বন করিবে। কিছুদিন হইতে গবর্মেণ্টের ঘাড়ে বাতাস লাগিয়াছে—এখন আর সিডিশনের সময় নাই—যেটুকু উত্তাপ এতদিন আমাদের মধ্যে জমিয়াছিল তাহা নিজেদের ঘরে আগুন দিতেই নিযুক্ত হইয়াছে। বহুদিন ধরিয়া "বন্দে মাতরম্" কাগজে স্বাধীনতার অভয় মন্ত্রপূর্ণ কোন উদার কথা আর পড়িতে পাই না, এখন কেবলই অন্য পক্ষের সঙ্গে তাহার কলহ চলিতেছে। এখন দেখি দুইপক্ষ হইতে তিন পক্ষ দাঁড়াইয়াছে—চরমপন্থী, মধ্যমপন্থী এবং মুসলমান—চতুর্থ পক্ষটি গবর্মেণ্টের প্রাসাদ-বাতায়নে দাঁড়াইয়া মুচ্‌কি হাসিতেছে। ভাগ্যবানের বোঝা ভগবানেই বয়। আমাদিগকে নষ্ট করিবার জন্যে আর কাহারও প্রয়োজন হইবে না—মন্দিরও নয় কিচেনারেরও নয়—আমরা নিজেরাই পারিব। আমরা "বন্দে-মাতরম্" ধ্বনি করিতে করিতে পরস্পরকে ভূমিসাৎ করিতে পারিব।

সহসা বহুদিন পর তোমাদের ওখানে খিচি রান্না খাইয়া এবং বউ ঠাকুরাণীর শাড়িপরা স্নিগ্ধ মূর্ত্তি দেখিয়া ভারি খুশি হইয়া বেলাকে চিঠি লিখিয়াছে।

কারখানা ঘরের কাজ চালাইবার উপযুক্ত Engine lathe প্রভৃতির কথা তোমার চিঠিতে পড়িয়া বিশেষ লোভ জন্মিতেছে। আমি যেমন করিয়া পারি বোলপুরে টেক্‌নিকাল বিভাগ খুলিব। ধর্ম্মপাল আমাকে গোটা কতক কল দিতে স্বীকার করিয়াছে। তাহার কতকগুলি কৃষিব্যাপারের যন্ত্র আছে, একটা কাপড় কাচিবার আমেরিকান কল আছে। সে বলে আমি যদি টেক্‌নিকাল বিভাগ খুলি তাহা হইলে আমাকে সাহায্য যোগাড় করিয়া দিবে। কিন্তু তাহার condition এই যে এই টেক্‌নিকাল বিভাগের নাম রাখিতে হইবে Indo-American Industrial School। আমি তাহাকে

শিখিয়াছি সাহায্যের পরিমাণ যদি যথেষ্ট এবং যথার্থ কাজের হয় তাহা হইলে আমেরিকার ঋণ স্বীকার করিতে আপত্তি করিব না। আচ্ছা, তোমাকে যদি হাজার খানেক টাকা সংগ্রহ করিয়া পাঠাই তবে সুরেশকে দিয়া আমার workshop এর মাল মসলা কিনাইয়া পাঠাইয়া দিতে পারিবে কি? এ সম্বন্ধে তোমার উত্তর পাইলে টাকা যোগাড়ের চেষ্টা দেখিব।

বন্ধুর চিঠি প্রায়ই পাই। তাহারা সেখানে আনন্দ ও উৎসাহের সঙ্গে পড়াশুনা করিতেছে। বলা বাহুল্য তুমি আমেরিকায় গেলে তাহাদের অত্যন্ত আনন্দ হইবে—নিশ্চয়ই তাহারা তোমাকে তাহাদের কলেজে টানিয়া লইয়া যাইবে। তোমার সঙ্গে আমি ও জুটিতে পারিলে কত খুশি হইতাম। মৌঠাকরুণকে আমার কথাটা স্মরণ করাইয়া দিয়ো—সমুদ্রের এপারের কালো বন্ধুদের ভাগে দুধের একটা অংশ রাখিয়া দেন যেন।

২৩শে পৌষ,
১৩১৪

ইতি,
তোমার রবি
চিঠি পত্র-এর সৌজন্যে

[আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসুকে লিখিত]

• • • •

এই চলমান নদী, জীবন যার নাম……

ইতালীর এক দূর পাড়াগাঁয়ে, গাঁয়ের কামারশালায় কামারের ছোট ছেলেটী হাপরের ধারে বসে তার বাবাকে সাহায্য করে। বিকেল বেলা গাঁয়ের নদীর ধারে বসে, বালিতে বড় বড় করে লেখে, রোম…তার মায়ের কাছে শুনেছে রোমের গল্প…কতদূরে সে রোম?

একদিন বাড়ী থেকে পালিয়ে সে যাত্রা করলো রোমের দিকে…পঁচিশ বছর পরে সেই রোমে এসে সে পৌছল…রোমের—সর্বময় কর্তা… মুসোলিনী…

তার দশ বছর পরে…সেই রোম থেকে কিছু দূরে সমুদ্রের তেতরে ফেলে, সেই কামারের ছেলের দেহকে তারা টুকরো—টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে দিল…

জলে পুড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল একটা উল্কা…

নীল সমুদ্রের ডানা

চিত্রিতা দেবী

গল্পটা শুনেছিলাম রাজীবরায়ের কাছে। রাজীবরায় লোকটাকে প্রায় অসাধারণ বলা চলে। যেমন চেহারা তেমনি কথ্যবার্তা। তাছাড়া লোকটা জীবনে করেছেও অনেক কিছু; আর সেই অভিজ্ঞতার ছাপ ওর ব্যক্তিত্বের উপরে বেশ বড় রকম একটা প্রভাব রেখে গেছে। আগে ছিল জাহাজের ইঞ্জিনীয়ার। এখন সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে আমাদের পাড়ায় এসে বসেছে। পৈতৃক যা কিছু ছিল তাই দিয়েই এই ছোট-খাটো বাড়ীটি করেছে, অন্ততঃ তাই তো বলে। কিন্তু বাড়ী ভাড়া আজকাল যে rateএ বাড়ছে, তাতে ভদ্রলোকের এমনিতেই চলে যায়। বিশেষ কিছু আর করতে হয় না। বিয়ে থা করেনি,—একা মানুষ খরচটাই বা কি! শুধু একটা আর্টের কোচিং ক্লাস চালায়। লোকটা জাত-শিল্পী। আর শুধু শিল্পীই বা বলি কি করে?—কথা শিল্পীও বটে। অন্তত অন্তরে তো নিশ্চয়ই।—নইলে কি আর অমন সুন্দর করে গল্প বলতে পারে?—

আমাদের বৈকালিক চায়ের আসরে, যেদিন রাজীব রায় উপস্থিত থাকতো, সেদিন সত্যিই ঘণ্টাগুলি যেন পাখা মেলে উড়ে যেত।

এমনি একটা আসরে রাজীব রায় এই গল্পটি আমাদের বলেছিলেন। অবশ্য গল্প হিসেবে এটা এমন কিছুই নয়,—না আছে কোন ঘোর প্যাঁচ, কোন জটিল মনস্তত্ত্ব; না আছে কোন প্রমত্ত প্রেমের প্রমুক্ত আখ্যান। তবু ওর সব গল্পগুলির মতো এটার মধ্যেও কেমন যেন একটা মন কেমন করা ভাব লুকিয়ে আছে। যাক্, গল্পের আলোচনার চেয়ে গল্পটা বলে ফেলাই ভালো। আমি কিন্তু গল্পটা রাজীব রায়ের কাছে যেমনটি শুনেছিলাম, আপনাদের কাছেও ঠিক তেমনি ভাবেই বলবার চেষ্টা করছি। অবশ্য গল্পটার মধ্যে রাজীব রায় নিজে একটা বেশ বড়ো ভূমিকাই নিয়েছিলো,—আর সেই জন্যেই এই ভণিতাটা করতে হোল।

রহিম সুখানি, জাতে মুসলমান বটে, কিন্তু ধর্মে নাবিক আর অন্তরে মানুষ। ক্যাপ্‌টেন মুলও তাই।—যদিও অবশ্য জাতে খৃষ্টান। দুজনের মধ্যে অনেক মিল। বাইরে থেকে দেখলে কিন্তু ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ হবে না যে, দুজনের মধ্যে কোথাও কোন মিল আছে। একজনের রং কালো,—বাংলা দেশের মাটির মত; পরণে নীল লুঙ্গি ও কামুয়া। মুখে দাড়ি, মাথায় কদম ছাঁট চুল। অন্যজনের টক্‌টকে রং, দাড়ি-গোঁফ কামানো।—পরণে ধবধবে পাটভাঙা সর্টস ও সার্ট। যখন কোন বন্দরে জাহাজ থামে,—পাইলট সাহেব এসে ক্যাপটেন সাহেবের সঙ্গে হ্যাণ্ডসেক করে। তারপরে কাইমস্ অফিসার ইত্যাদিরা আসে। কতবার কত খোঁজ তল্লাসও হয়, কিন্তু ক্যাপটেন মুলের জাহাজে কেউ কখনো দাগটীও দিতে পারেনি।

বন্দরে বন্দরে কত ধনী ব্যবসায়ী। কত সাহেব, নানা কাজে ক্যাপটেনের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে আসে।—রহিমকে কেউ তখন নজরই করে না। ক্যাপ্‌টেন মুলেরও তখন তাকে মনে পড়ে না। নানা কথা, নানা কাজ, নানা ব্যবস্থা, তখন তাঁর মাথার মধ্যে ফিশিয়ার ঘরে ঘুরতে থাকে।

রহিমেরও অবশ্য তখন সময় থাকে না। হাতে স্টিয়ারিং হুইল,—সামনে কখনো দিগন্ত, কখনো সমুদ্র মোহানার প্রান্ত। কানে পাইলটের আদেশ নিয়ে সে তখন চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। পাইলটের ইঁসিয়ারী মনে মনে তারিফ করে। মাস্তসমুদ্র থেকে পথ করে বিশাল সামুদ্রিকটাকে ডকের মধ্যে ঢুকিয়ে আনা কম কথা নয়। তবু মাঝে মাঝে কেমন যেন নিরর্থক মনে হয় নিজেকে। যেন সে মানুষ নয়,—ঐ স্টিয়ারিং হুইলেরই আর একটু ভালো সংস্করণ,—একটা যন্ত্রমাত্র। পাইলটের হাতে যন্ত্রের সুইচ্; যেমন টিপছে তেমনি চলছে।

ক্যাপটেনের আদেশ মানতে কিন্তু দ্বিধা হয় না রহিমের। ক্যাপটেনের সঙ্গে যে ওর অন্তরের যোগ আছে।—চারঘণ্টা করে ডিউটী।—ব্রীজের উপরে দাঁড়িয়ে দুজনে একসঙ্গে জাহাজ চালিয়েছে। একজনের হাতে স্টিয়ারিং।—আর একজনের মুখে নির্দেশ। সামনে খোলা ম্যাপ; পাশে কম্পাস। আগেকার জাহাজগুলিতে আবার ব্রীজের মাথায় ছাতও ছিল না। ঝড় জল সূর্য্য সমানে মাথার নিয়ে স্টিয়ারিং ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে হোত। আফ্রিকার পাশ দিয়ে যেতে যেতে,—লাল সমুদ্রের বুকের উপরে সূর্য্যদেব যখন আগুন হয়ে জলতেন,—সুখানির কালোরক্ত যখন সাহেবের সাদা রক্তের মত একভাবেই ঘাম হয়ে ঝরে পড়ত, তখন দুজনের মধ্যে কেমন একটা আত্মীয়তা ধীরে ধীরে গড়ে উঠত।

সব ক্যাপটেন অবশ্য এরকম নয়। এক একজনকে দেখলে রাগ হোত। ঘরে বসে সারাদিন মদ খাবে, আর পড়ে পড়ে ঘুমুবে—কিন্তু তারাও যখন সুখানির মত ডিউটিতে থাকত,—আর রোদের তেজ তরোয়ালের মত দুদিকে টুকরো টুকরো করে কাটত। তৃষ্ণায় বুকের ছাতি শুকিয়ে আসত, তখন, কিম্বা যখন হাওয়া উঠত জোরে,—ঢেউগুলো পাগলের মতো ছুটে আসত,—জলে আর আকাশে জোর খেলা জমে উঠত।—মুহুর্মুহু আকাশ সাগরকে মুছে দিতে চাইত আর সাগর আকাশকে। জাহাজ একবার এদিকে হেলে নীচে নেমে যেত,একবার ওদিকে,তখন সেই রাগী মাতাল ক্যাপ্‌টেনগুলোর মুখের দিকে চেয়েও সুখানির মনে হোত, ওদের দুজনের মধ্যে এক রক্তই সমুদ্রের মত দুলছে।—ওরা একই জাতের মানুষ,—কিম্বা একই ধর্ম্মের। অবশ্য ক্যাপ্‌টেন বুলের সঙ্গে তার বিশেষ আত্মীয়তা। ওর জাহাজ পাবার আশায় সুখানি অনেক সময় দু তিন মাস বসেই কাটিয়ে দিয়েছে।

ক্যাপটেন বুল ভালোমানুষ লোক; ঘরে স্ত্রী আছে, ছেলে মেয়ে আছে—মাসের পর মাস,—কখনো বা বছরের পর বছর বাইরে বাইরে ঘুরেও তিনি তাদেরই অন্তরের মানুষ। তাঁকে দেখলেই বোঝা যায়, কাপ্তেনগিরি করা তাঁর ধাত নয়। মদ খান না বললেই হয়,—এমন কি সিগারেটও নয়। বারোটা থেকে চারটে রোদে জলা দুপুরে ব্রীজের উপরে তাঁর ডিউটি। আবার সেই বারোটা থেকে চারটে তারা জলা রাতে। সবচেয়ে কঠিন সময় ভাগ দুটী তিনি নিজেই নিয়েছেন। তরদুপুর কিম্বা রাতে। ঘুমে যখন চোখ ঢুলে আসে, তখন ছোকরা অফিসারদের বিশ্বাস করেন না তিনি; ওরা হয়ত ঘুমিয়ে পড়বে। অন্য অনেক ক্যাপটেনই এসব গ্রাহ্য করে না,—ডিউটীর সময়ও ঘরে বসে মদ খায়।

ক্যাপ্‌টেন বুল কিন্তু ঠিক ব্রীজের উপরে হুইল ঘরে দাঁড়িয়ে আছেন,—কখনো সুখানির পাশে,—কখনো ম্যাপ ঘরে। সারা দুপুর ম্যাপ ঘরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ছবি আঁকে ক্যাপ্‌টেন। ঐ তাঁর একটী মাত্র শখ। মাঝে মাঝে ক্রী পোর্টে যখন জাহাজ থামে, অফিসার, খালাসী সকলের মধ্যে জিনিস কেনার ধুম পড়ে যায় ক্যাপ্‌টেন সাহেব হয়ত কিনে আনেন এক বাক্স রং, কিম্বা তাঁর গাঁয়ের জন্যে নতুন একটী খাঁচা।—

ছইল ঘরেই সাহেবের ইজেল পাতা আছে। সারা দুপুর ঐখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ছবি আঁকে সাহেব। রাতের বেলা ঘরের মৃদু আলোতেও তাঁর বিরাম নেই।—সুখানিরও একটা ছবি এঁকেছেন সাহেব। নীল লুঙ্গি আর কতুয়া পরা। ছবিটা দেখতে বেশ হয়েছে। কিন্তু ঠিক সুখানির মত যেন হয়নি।—রহিম তাই ছবিটা চাইতে গিয়েও চায়নি, ঘরে নিয়ে গেলে, তার বিবি হয়ত বলবে,—দূর তোর সাহেবের চক্ষু নাই। তোর রং কি অতটাই কালো? কিছুদিন অপেক্ষা করে সাহেব একদিন নিজেই বলেছিলো,—"কি সুখান্। ছবিটা তুমি নেবে নাকি? চাও তো তোমায় দিতে পারি;—আমি না হয় পরে আর একটা আঁকব। রহিম বলেছিলো,—"না সাহেব,—ওরা নিয়া আমাগো কি কাম হইব? আমাগো ঘরে কি ওই জিনিস মানায়?—তুমি এত শ্রম কইরা, এত পয়সা খরচা কইরা যা বানাইছ তা তোমারই থাক।

রহিমের যে ভিতরে ভিতরে একটু ভয়ও হয়নি তা নয়।—তার বিবি যদি ছবি দেখে বলে,—"বাঃ চমৎকার ছবি হইছে। একেবারে যেন তোমার লখেন লাগতে আছে।" না: রহিমের নাকটা একটু উল্টোদিকে বটে, কিন্তু অতটা নয়। গালটাও অত ফুলো নয়;—কেমন যেন রহিমকে চেনা গিয়েও চেনা যায় না। তবু রহিম উৎসাহ ভরে ক্যাপ্টেনকে বলে,—"চমৎকার হইছে সাহেব,—একেবারে যেন সাক্ষাৎ আইন্না দিছ।" সাহেবের এই একটীমাত্র সখ। একটীমাত্র নেশা।—তাতে আঘাত করতে ইচ্ছে করে না রহিমের।

রহিমের নিজের তেমন কোন সখ নেই। ছোটবেলায় মাছ ধরত,—ব্যাস ঐ পর্যন্ত।—যদিও চিরজীবন জলেই কাটল, তবু মাছ ধরা আর হোল না।—মাঝে মাঝে খালাসীদের মধ্যে তাসের আড্ডা বসে।—রহিম কিন্তু যায় গিয়েও যায় না।—ভালো লাগে না বলে বসে তাস পিটতে। হয়রানি মনে হয় আরো।—না: কোনরকম নেশা নেই রহিমের,—এক নেশা জলের দিকে তাকিয়ে বসে থাকা।—ওপরের ডেক থেকে একটা চেয়ার এনে লুকিয়ে রেখে দেয়।—অবসর সময়ে তার উপরে পাতুলে উবু হয়ে বসে বসে জল দেখে। সাঁঝের বেলা যখন চাঁদ ওঠে, পূর্ণিমার দিনে যখন ষোলো কলায় ভরা হয়ে উপচে উপচে পড়তে পড়তে পূর্বদিক পেরিয়ে এসে আকাশের গায়ে আটকে যায়,—আর সাগরে আকাশে মিলে চারদিক ঝল্‌মল্ করতে থাকে,—জলের উপর ছল্‌ছল্ করে চাঁদ যেন গলে গলে পড়ে। জ্যোৎস্নায় যেন ফুল ফুটতে থাকে।—ছোটবেলায় না শেখা গানগুলি তখন রহিমের প্রাণের মধ্যে উদাস হয়ে ওঠে। ছোটবেলার কত কথা,—ঘরের কথা, বউ ছেলের কথা, উড়ে উড়ে মনে পড়ে। সমুদ্রের গন্ধ ছাপিয়ে ওদের সেই গাঁয়ের পাশের ভিজে মাটির গন্ধ আসে যেন নাকে। রহিম বলে,—"সাহেব এত ঘাস দেখলাম, এত রাজরাজড়ি সহরপাট ঘোরলাম। আমার দেশ গাঁয়ের সেই ঘর দুটির সাথান জায়গা কোথাও দেখলাম না।"

সাহেব হেসে বলেন,—ইংরেজীতে একটা কবিতা আছে জানো সুখানি? সাহেব ইংরেজী লাইন দুটী বলে, ভাঙা হিন্দী আর ভাঙা বাংলায় মানেটা বুঝিয়ে দেন; "There is no place like home".—সুখানি অনেক ইংরিজী বয়ান বুঝতে পারে আজকাল। সাহেবও বাংলা মন্দ বোঝে না।

সাহেবের বয়স প্রায় পঞ্চাশের দিকে চলেছে। তাকেও রহিমের মতই নতুন যেন দেখার নেশা সমুদ্রে টেনেছিল।—এ্যাপ্রেন্টিস হয়ে ঢুকেছিলেন। নিজের হাতে ডেরা বাঁট ধোয়া থেকে রং করা, ইঞ্জীন চালানো থেকে অঙ্ক কষা, এ্যাস্ট্রনমি সব করেছেন। আস্তে আস্তে পরীক্ষা দিয়ে ধীরে ধীরে

নিজের ভাগ্য গড়ে তুলেছেন। আধুনিক যুগের নূতন ইতিহাসের সঙ্গে তাঁর জাহাজ ভাসিয়েছেন তুপোলের পাতায় পাতায়। তারি মধ্যে কবে একবার দেখে গিয়ে, বিয়ের যোগ্য একটী মেয়ের সঙ্গে প্রেমে পড়েন। পরের বারে গিয়ে তাকে বিয়ে করে আসেন। তখন মাঝে মাঝে সমুদ্রের উপরে খুব রাগ হোত। অনেক চেষ্টা করেছিলেন, ডাঙায় কোন চাকরীর জন্যে ;—কিন্তু পাননি। ধীরে ধীরে মনকে সইয়ে এনেছেন। কবে যে সাহেব রং তুলির খেলা ধরেছেন,—রহিমের ঠিক মনে পড়ে না,—আর কবেই বা যোগাড় করেছেন পাখীদের। একটা বেশ বড়ো খাঁচায় দুজোড়া বজরীগড় আরো একটা ঐ ধরণের সুন্দর খাঁচায় তেমনি সুন্দর একটা সবুজ রঙের টিয়ে। তাই মাথায় লাল টিপ, গলায় লাল কালো ডোরা, পাখায় লাল কালো ছিট্। নির্জনতার এমন সঙ্গী নাবিকের পক্ষে আর কী থাকতে পারে। জাহাজ থামলে নাবিক ইচ্ছে করলে অনেক মেয়ে সঙ্গী পেতে পারে। কিন্তু নৌকা একবার চলতে সুরু করলে তারা অচল।

তাই সাহেব খুব বুদ্ধি করেই এই সঙ্গী বেছেছিলেন। সাহেবের সঙ্গে শিষ্ দিয়ে দিয়ে টিয়াটা ছটিশ সুরের একটা প্রেমের গান পুরোপুরি গেয়ে যেতে পারে। সুখানি ওকে আল্লার নাম বলতে শিখিয়েছে ; হেসে বলছে,—"সাহেব তুমার পাখী মুসলমান হইয়া গেছে।" সাহেব হাসেন,—"সুখানি যদি মুসলমান হয় তো টিয়াই বা হবে না কেন?"

বুল্ সাহেবের সঙ্গে রহিম সুখানির জমে ভালো। দুজনের রক্তে আছে সমুদ্রের নোনা ;—কিন্তু আজকালকার ছোকরা সাহেবদের পছন্দ করে না সে। এরা সাহেব না হয়েও তাদের বাবা হয়ে বসে আছে। জাহাজের কাজ শিখতে এসেছে না সাহেবিয়ানা শিখতে এসেছে বুঝে উঠ্তে পারে না রহিম।—নিজের হাতে কুটোটী নাড়েন না বাবুরা। সন্তায় মদ সিগারেট পান, আর বসে বসে তাই ওড়ান। আর তাদের মধ্যে পালের গোদা হচ্ছে ঐ সেকেণ্ড ইঞ্জিনীয়ার রাজীব রায়।

রাজীব রায় এতক্ষণ পরে নিজের নামটা উল্লেখ করে। এ গল্পের মধ্যে তাঁরও যে একটু ভূমিকা আছে এইবারে সেটা বোঝা যায় একটু একটু।

নাঃ রাজীব রায় লোকটাকে একেবারেই পছন্দ করে না রহিম। কারণ মাতাল মানুষকে দেখলে তার কেমন যেন লাগে। আর শুধু কি মাতাল, আনুষঙ্গিক সব গুণেরই সে অধিকারী,—এই পর্য্যন্ত বলে রাজীব রায় আমাদের দিকে চেয়ে হেসেছিলো! বলেছিলো,—এখন অবশ্য রাজীবের ঐ এক 'পানদোষ' ছাড়া দোষ নেই।—তাও এই হার্টের খাতিরে নেহাৎই পরিমিত। তখন বয়স কম। হার্ট খারাপ কি ভালো—কে আর কেয়ার করত?

বন্দরে বন্দরে নাবিকদের জন্যে নানা আমোদের ব্যবস্থা। এটুকু লাইসেন্স বেচারাদের প্রাপ্য। না হলে সমুদ্রের এক ঘেয়ে জীবনের দম আটকে আসবে যে। উৎসবের আয়োজন হোত লাউঞ্জ জুড়ে ; বাকসে সেসব বর্ণনা এখানে অবান্তর। আসল কথা হচ্ছে, রাজীব রায়ের একটা গোপন সখের কথা রহিম জেনে ফেলেছিল। রাজীবও ছবি আঁকত। তার খরখর ছবি ছড়িয়ে পড়ে থাকত। তা থেকে দুচারটে চুরি গেলেও তার খেয়াল থাকত না। রাজীব যেমন জীবনে, তেমনি শিল্পেও ছন্নছাড়া ছিল। ক্যাপ্টেন বুল্ সবদিকে গোছানো। যেমন সংসারটী গুছিয়ে রেখেছেন,—ছবিগুলিও তেমনি সাজিয়ে গুছিয়ে ফ্রেমে বাঁধিয়ে বা কেস ভরে রাখতেন। রাজীব রায় যে চুপিচুপি বন্ধুদের কাছে বলেছিলো, যে লোকটা দুতোর ঘটে,—ফ্রেমগুলি ভালোই করে, কিন্তু ছবি আঁকতে জানে না, সে কথা শুনে রহিম

মনে মনে ভেবেছিল বটে, কিন্তু কথাটার মধ্যে সত্যের খোঁচাটা ওকে আরো বেশী বিঁধেছিল।—যাক্‌গে, এ গল্পকে কিন্তু দুই প্রতিদ্বন্দ্বী শিল্পীর গল্প হিসেবে নেবেন না," রাজীব রায় বলে,—এর শেষটা বড় করুণ।

রহিম সুখানি ক্যাপ্‌টেন বুলকে অন্তরের সঙ্গে শ্রদ্ধা করত। অবশ্য উনি অনেকেরই শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। আজ এতদিন ধরে আহমেদের লাইনে আছেন। কোনদিক থেকে কেউ তাঁর নামে কালীর আঁচড় কাটতে সাহস পায় নি। তেমন লোককে নিয়ে যে রাজীব রায়ের মত একটা চ্যাংড়া ছোঁড়া হাসি ঠাট্টা করছে এটা রহিমের সহ্য হোত না।

আর সেই জন্যেই রহিম বাড়ী ফিরবার জন্যে ব্যস্ত হয়েছিল। মুখে যা বলতে পারত না, তার ক্ষোভ ওর ভিতরটাকে নিয়ে টানা হ্যাচড়া লাগিয়ে দিয়েছিলো। জাহাজের লস্কর হলে কি হবে। মনে মনে রহিম ভারী emotional.

বম্বাইতে জাহাজ দুতিনদিন থাকবে শুনে তাই আরো মনটা খারাপ হয়েছিল তার। আগে শুনেছিল জাহাজ সোজা কলকাতায় যাচ্ছে।

ওর সঙ্গীরা হেসেছিল।—রহিমের বুঝি তার বিবির কথা মনে পড়ছে!

রহিম বলেছিলো,—"হাসি নয় রে, সত্যই মনটা বড় পোড়তে আছে।"

সাহেব শুনে বলেছিলো—"তোমার কটা বিবি রহিম? শুনেছি, তোমাদের সকলেরই গোটা তিনচার থাকে।"

রহিম জিব কামড়ে বলেছিল,—"করেন কি সাহেব। বলে একজনেই খাইতে দিতে পারি না।—ঘরে ফিরলেই কোন্দল করে।—তবো তো ঘর!"

জাহাজ যত বোম্বাইর দিকে এগিয়ে আসছিলো, তত যেন রহিমের মনের ভিতরে কি রকম করছিলো, সেবারে। এসব কথা রাজীব বহু পরে একদিন রহিমের কাছে শুনেছিল। কারণ তারপর থেকে বহুদিন আর ওদের মধ্যে দেখা সাক্ষাৎ ছিল না। রহিম জাহাজের কাজ ছেড়ে ঘরে ফিরে গিয়েছিল।—

সেবারে কেন যে রহিমের মনটা অমন হু হু করছিল তা সে বুঝতে পারে নি,—বোধ হয় তার বড় সাধের তাদের প্রাসাদটা যে ভেঙে যাবে তা সে আগেই বুঝেছিল।

ভারতবর্ষ সেখান থেকে আরো একদিনের পথ। প্রায় পুরো চব্বিশ ঘণ্টা। আরব সমুদ্রের নীল জলে থেকেই থেকেই কালার রং ভেসে আসছে।—ঝাঁক ঝাঁক ঢেউয়ের উপরে ডানা ঝাপটে ছুটে আসছে নানা জাতের পাখী। সন্ধ্যার আবছায়া নিঃশব্দ অন্ধকারের মধ্যে কখন যেন হারিয়ে গেছে। জমাট একটা কুয়াশায় তারাগুলিও যেন আচ্ছন্ন। আকাশটা যেন হঠাৎ লোকালয়ের কাছাকাছি এসে কেমন একটা অস্বস্তিতে ভরে গেছে।—সেই অপরিচ্ছন্ন দিগন্তের দিকে চেয়ে মোটা পাইপটার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিল রহিম।

ওর উল্টো দিকে যে কারা এসে দাঁড়িয়ে কথাবার্তা বলছে, তা এতক্ষণ খেয়াল করেনি যেন। হঠাৎ মনে হোল রাজীব রায়ের গলা!—ফিস্ ফিস্ করে চাপা গর্জন করে উঠল। কী একটা ইংরেজী খণ্ড উচ্চারণ করে বলল,—"এবারে আর ছবির ফ্রেম নয়,—'পাখীর খাঁচা'। মনে থাকে যেন, পাখীর খাঁচা!"

রহিম খানটার সঙ্গে গা মিশিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। উদ্যুক্ত আকাশটা যেন ক্রমশঃ জমাট ধোঁয়ার মত রহিমের বুকের উপরে চেপে বসল। কি করে তাকে সড়াবে ভেবে পেল না রহিম। পাখীর খাঁচা দিয়ে কি করবে রাজীব রায়? হঠাৎ রহিমের মনের মধ্যে বিদ্যুতের মত একটা সন্দেহ চিড় খেয়ে গেল।—রাজীব রায় কি গুপ্তচর?

ঠিক সেই সন্দেহটাই অবশ্য সেই সময়ে আমাদেরও মনের মধ্যে কাটল ঘরিয়ে দিয়েছিল,—রাজীব রায় কি গুপ্তচর? এখনও?

রাজীব রায়ের মত চালাক লোক হঠাৎ আমাদের ঘরকে যাওয়া চেহারা দেখে যে আমাদের মনের কথা টের পায়নি, সেকথা অবশ্য ঠিক নয়।—কিন্তু সেকথা আমাদের বুঝতে দিল না সে। তার বদলে, গল্পটা শেষ করল।

রহিম খুব ভালো করেই বুঝতে পারল, এ খবরটা এখনি ক্যাপটেনকে শোনান উচিত। রাজীব রায়ের সাড়া মিলিয়ে যেতেই সে ক্যাপটেনের ঘরের দিকে ধীর পায়ে এগিয়ে গেল। কিন্তু দরজা বন্ধ। চকিতে ঘুরে এসে ডেকের যে জায়গায় পাখীর খাঁচাটা ঝোল খায় সেদিকে একবার যন্ত্রচালিতের মত তাকিয়ে দেখল,—খাঁচাটা তার আপন জায়গায় নেই।—আশ্চর্য্য! হঠাৎ পাখী নিয়ে কি একটা ব্যাপার ঘুলিয়ে উঠছে।—ক্যাপটেন কি জানে এসব কথা? সেই বা এই ভর সন্ধ্যেবেলায় ঘোরে খিল দিয়ে কি করছে? অবশ্য পোর্টের আগের দিন সব সময়েই ক্যাপটেন নানা জরুরি কাজে ব্যস্ত থাকে।—

কিন্তু কি খেয়াল হোল,—কে যেন রহিমকে টেনে নিয়ে গেল। তার ভালের বাড়ী ভেঙে দেবে বলে,—আদর্শের স্বপ্ন চুরমার করবে বলে,—কে যেন তাকে পোর্ট হোলের দিকে টেনে নিয়ে গেল। কোনদিকে খেয়াল না করে, সে দেয়ালে দাঁড় করানো মই বেয়ে উঠে পোর্ট হোলের ফাঁক দিয়ে দৃষ্টি চালিয়ে দিল। পোর্টহোলের মুখটা সাহেব যথাসম্ভব বন্ধ করবার চেষ্টা করেছে। তবু তার ফাঁক দিয়ে যা দেখা গেল,—দেখবার পক্ষে সেইটুকুই যথেষ্ট।

রহিম দেখল পাখীর খাঁচার তলাগুলো খুলে,—পাতলা কাগজে মোড়া কি যেন বিছিয়ে বিছিয়ে পেতে রাখছে সাহেব। সাহেব করতে লটছে কী? রহিম আরো নেমে এল।

প্রথমটা চমকে গেলেও জাত নাবিক রহিমের বুঝতে দেরী হোল না, পাতলা কাগজে মোড়া জিনিষগুলি কী? সাহেব হংকং থেকে আফিম্ এনেছে বোম্বাইতে পাচার করবে বলে। আর সেই জন্যেই জাহাজ বোম্বাইতে থামল। কলকাতায় অত বেশী দর পাকড়ের ঘুঘু লেগেছে হঠাৎ।

কতদিন থেকে সাহেব এ ব্যবসা করছে কে জানে?—উপর ডেকের আলোটা নিবিয়ে দিয়ে রহিম সাহেবের কেবিনের দিকে চেয়ে রইল। ওর বুকের মধ্যে সমুদ্রের মত কান্নার ঢেউ উঠতে লাগল।—কিন্তু চোখ দিয়ে এক ফোঁটা জল বেরুল না।

ক্যাপটেন ঘুণাক্ষরেও জানে না, কাল সে ধরা পড়বে। তার জন্যে ফাঁদ পাতা হয়েছে।

রহিম অনেকদিন ক্যাপটেনের নুন খেয়েছে, সে দোষী হলেও তাকে ওর সাবধান করে দেওয়া উচিত। কিন্তু কি করে সে তাকে গিয়ে একথা বলবে? দোষীর সাজা হওয়া অবশ্যই উচিত। কিন্তু কাল এই এক জাহাজ লোক ক্যাপটেন ঘুণের চূড়ান্ত অপমান দাঁড়িয়ে দেখবে।—যাকে তারা দেবতার মতো মনে করত। আর তারপরে কোন আদর্শের কোন মানে থাকবে কি কার কাছে।

কিন্তু তবু রহিম এখন গিয়ে সাহেবকে বলতে পারবে না যে,—"সাহেব তোমার চুরি ধরা পড়ে গেছে শুধু রাজীব রায়ের কাছেই নয়, রহিমের কাছেও।

রাজীব রায়ের উপরে একটা অন্ধ অভিমান ওকে ভিতরে ভিতরে মারতে লাগল। রাজীবের শিল্পী সত্তাকে শ্রদ্ধা করত রহিম। কিন্তু রাজীবের এই যুক্তি ওর মন বরদাস্ত করতে পারল না।—ক্যাপ্‌টেন খুন চোর, আর রাজীব রায় গুপ্তচর। এই দুটো অদ্ভুত জিনিষ আবিষ্কার করে রহিম যেন কেমন হয়ে গেল।

কিন্তু তবু রহিম বুদ্ধি হারায় নি,—বরং ওদের দুজনকেই হারিয়ে দিয়েছিল,—আর সেই জন্যেই এই সত্যি গল্পটা আমার ভালো লেগেছিল। রাজীব রায় মন্তব্য করল।

তারপরে বলল।

তখন রাত প্রায় সাড়ে দশটা এগারোটা হবে। রহিম তাকিয়ে দেখল,—কুয়াশার সেই আচ্ছন্নতাটা হঠাৎ কখন বেমালুম উড়ে গেছে।—আর বেশ বড়ো সড়ো একটা চাঁদ মাথার উপরে জ্বল জ্বল করছে। দাসরে জোয়ার এসেছে। বোটের গতি ধীর; তার নীচে ঢেউগুলি ছলাৎ ছলাৎ করে ভাঙছে!

পাখীর খাঁচা দুটী অনেকক্ষণ আগে আবার নিজের জায়গায় ফিরে এসেছে। রহিম খাঁচা খুলে পাখীদের ডাকল,—"আয় আয়।"

ওরা ঘাড় বাঁকিয়ে খোলা দরজাটার দিকে তাকিয়ে রইল। অযাচিত স্বাধীনতাকে ঠিক যেন বিশ্বাস করতে পারল না। রহিম তখন বাকী আলো দুটোও জ্বেলে দিল। কড়া আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে গেল।—ওরা ডানা ঝটপট করতে করতে এক সময়ে খোলা দরজা দিয়ে বেরিয়ে এসে রহিমের দুই কাঁধের উপরে বসল।

আরব সমুদ্রে জোয়ার এসেছে! সাধারণতঃ, রাতের বেলা জলকে দেখায় কালো। এবং আকাশের বিদ্যুৎ আর চাঁদের আলোয় জলের রং মনে হচ্ছিল যেন গভীর নীল।

আর কিছুক্ষণের মধ্যেই বোট খেমে যাবে। তারপরে আসবে পাইলটের বোট। বোট থামার আগেই রহিম কার্যসিদ্ধি করতে চায়। খাঁচা দুটীর দরজা বন্ধ করে রহিম তাদের ছুঁড়ে ফেলে দিল দূর সমুদ্রের জলে।

দেখতে দেখতে ভাসতে ভাসতে হেলতে দুলতে, দূর হতে দূরে যাবার চেষ্টা করতে করতে কখন একসময়ে যে ডুবে গেল তারা, তা টেরও পেল না রহিম। দুই কবজীতে দু'জোড়া বজরীগর (ইংরেজীতে যার নাম প্রেমের পাখী।) আর কাঁধের উপরে টিয়া নিয়ে রহিম বলছিল। "চলিয়া যারে পাখী, চলিয়া যা"।

রাজীব ফিরছিল রাউণ্ড দিয়ে। রহিমের কাণ্ডে পাখী দেখে চমকে উঠল। বলল "একী এদের খাঁচা কোথায়?"

রহিম তার তর্জনী হেলিয়ে সমুদ্র দেখাল,—"ওই জলের তলে।"

রাজীব বলল,—"তুমিও তাহলে এর মধ্যে আছ?"

রহিম চুপ করে রইল। উত্তর দেবার কিছু নেই।—"You fool", বলে নিরুপায় ক্রোধে ঠোঁট কামড়ে ফিরতে গিয়ে ক্যাপ্‌টেনের সঙ্গে ঠোকাঠুকি হয়ে গেল রাজীবের।

রাত প্রায় পৌনে বারোটা।—ক্যাপ্‌টেন ডিউটীতে চলেছে,—পরণে তেমনি পাইজামা স্যুট আর সুট! হাসতে হাসতে বলল,—"ব্যাপার কী?"

রাজীব রায় বলল,—"রহিম আপনাকে মুক্তি দিল। পাখীদের দিতে পারছে না।" পাখীরা বার বার ডানা ঝাপটে এর ওর কাঁধে গিয়ে বসছিল, পরিচিত খাঁচাটী কোথাও দেখতে পাচ্ছিল না। অতবড় আকাশটা যে ওদের ছোট ছোট ডানার আঘাতের জন্যে অপেক্ষা করে আছে একথা হয়ত ওদের বিশ্বাস হচ্ছিল না। কিন্তু এতক্ষণ বাইরে থাকার ক্রমে খোলা হাওয়ার ছোঁয়ায় ওদের ডানায় জোর ফিরে এল। সমুদ্রের দিকে চেয়ে চেয়ে হঠাৎ দূরের তৃষ্ণা ওদের বুকের মধ্যে আর্ত্ত হয়ে উঠল। বার দুই ডানা ঝাপটে টিয়াটা হটাৎ উড়ে গেল।—দেখাদেখি বন্ধুগুলিও ফুরুৎ ফুরুৎ করে পালাল।

কিন্তু রহিমের বিশ্বাস হোল না ওরা কি এই সাগর পেরিয়ে ভারতবর্ষের মাটিতে গিয়ে আর পৌঁছুতে পারবে? ডানার যার জোর নেই স্বাধীনতার মূল্য সে কি দিতে পারবে?

ক্যাপ্‌টেন এক মুহূর্ত্ত তাকিয়ে দেখে গম্ভীর হয়ে উপরে উঠে গেল।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে রহিমের সঙ্গে রাজীবও তাকিয়ে দেখল।—দূরে জলের কাছাকাছি আলো পড়ে টিয়ার বিস্তৃত ডানা দুটী ঝল্ ঝল্ করে উঠল। কিন্তু বিচিত্র আলো ও জলের ছায়ায় তার সবুজ রংকে যেন নীল। মনে হোল, নীল সমুদ্রই যেন দুটী ছোট ডানা মেলে উড়ে যেতে চাইছে আকাশে। ও দুটী যেন টিয়ার নয়, সাগরেরই ডানা।

* * * *

শিল্পোভানি লাটির তখন চিত্রকর হিসাবে খুবই নাম। কিন্তু মনে তাঁর সুখ নেই, ছেলেটার ছবি আঁকার দিকে তেমন মন নেই। রং তুলি হাতে নিয়ে সে শুধু বসে বসে ভাবে।

বাপ চটে উঠে একদিন বকুনি দেন তাকে,—"কি ভাবিস্ বল ত?"

ছেলে উত্তর দিলে,—"আমি যা আঁকতে চাই, সেটা পুরোপুরি ধরতে পারছি না।"

—"বেশ, চেষ্টা কর।"

বাপ হতাশ হয়ে পড়লেন, কিন্তু ছেলের প্রতিভা তাঁর অজ্ঞাত নয়। রং তুলি হাতে নিয়ে ছেলের নিশ্চেষ্ট ভাব দেখে তিনি একরকম হাল ছেড়ে দিলেন।

মাস তিনেক পরে তিনি তাঁর অঙ্কন কক্ষের একপাশে একখানি ছবি টাঙানো দেখে চমকে উঠলেন,—এ ছবি কে এঁকেছে? এ যে অপূর্ব্ব সৃষ্টি! এ প্রতিভা যে স্বর্গের দান!

এবার রাফেল এসে তাঁর বাপের পায়ের কাছে বসলেন, বললেন, এরই কল্পনায় আমি ত অপেক্ষা করছিলাম বাবা।

পথের সন্ধান

সত্যেন্দ্র নারায়ণ মজুমদার

বিপ্লবের সাধনাকে হিমাদ্রি সত্যের সাধনা হিসাবেই গ্রহণ করেছিল। বাইরে পথের সন্ধান আর অন্তরে সন্ধান জীবন-বেদের। জ্ঞান ও কর্মের ঐক্যতান। তরুণ বয়স থেকেই সে খুঁজেছে এমন এক পরশমণি যার ছোঁয়ায় চলার পথের প্রতিটি মুহূর্ত সার্থকতার অনুভূতিতে ভরে উঠবে। কলেজে ইংরাজীর প্রধান অধ্যাপক পড়াতেন শেকসপীয়ারের ট্রাজিডি। তিনি বুঝিয়েছিলেন যে মৃত্যুই ট্রাজিডি নয়। তার মর্মকথা হল বিরাট সম্ভাবনার ব্যর্থতায় পরিসমাপ্তি। ভুল পথ বেছে নেওয়ার বেদনা দেয় এমন তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্ব যার আঘাতে সমস্ত জীবন বিস্বাদ হয়ে ওঠে। অনুশোচনার তুষানলে হয় পদ স্খলনের প্রায়শ্চিত্ত। তাই শুনে হিমাদ্রি সঙ্কল্প করেছিল যে নিজের জীবনকে কিছুতেই ট্রাজিডিতে পরিণত হতে দেবে না। বিপ্লবের পথ পতন—অভ্যুদয় বন্ধুর। সেখানে কাঁটায় পা ক্ষতবিক্ষত হয়, পাথরে হোঁচট লেগে হয় রক্তাক্ত। শত্রুর আক্রমনের আশঙ্কা প্রতিপদে। কিন্তু বিষ বিষাদ দুঃখ দহনেই ত' শুধু সে পথের সঙ্গী নয়। বন্ধুরা ভুল বোঝে, সঙ্গীদের সঙ্গে সংঘাত বাধে। ডাইনে বাঁয়ে চোরা গলি, পথ ভুল হলে ঘুরে মরতে হবে বিফলতার বনভূমিতে। সেই অপঘাতের গ্লানি যেন তাকে সইতে না হয়। হৃদয়ে যেন কখনও না নেমে আসে ব্যর্থতাবোধের ঘন কালো অন্ধকার। দেশের মানুষের দুঃখবেদনাকে তারা আপন করে নিয়েছে, প্রায়শ্চিত্তের জন্য নয়, পুড়ে খাঁটি সোনা হবে বলে। ডস্টয়েভস্কীর একটি বিখ্যাত উপন্যাসের একটি ছত্র তার খুব ভাল লেগেছিল "I kiss suffering humanity at your feet"—সেটিও তার কাছে প্রায় মন্ত্রের মত হয়ে উঠেছে। দুঃখী মানবতার ব্যথার সমুদ্রকে সে নীলকণ্ঠের মত পান করবে। সেই প্রেরণা যেন অন্তরে চির ভাস্বর হয়ে থাকে। যেন কখনও লক্ষ্য ভ্রষ্ট হতে না হয়।

অনভিজ্ঞ হৃদয়। তখনও জানে না যে এই সঙ্কল্পের জন্য কি কঠিন মূল্য দিতে হবে। সমুদ্র মন্থন করে আগে ওঠে হলাহল। তারপরে অমৃত। জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপ সাদায় কালোয় আলো আঁধারে মেশানো। অন্ধকারকে এড়িয়ে গেলে আলোর সন্ধান পাওয়া যায় না। ঘন তমসার মাঝখানে বসেই বলতে হয় 'জ্যোতির্গময়'।

তখন বাংলার গুপ্ত বিপ্লবী আন্দোলনে এক সঙ্কট দেখা দিয়েছে, মুলসন্ধির সঙ্কট। মত ও পথ নিয়ে দ্বন্দ্ব সুরু হয়েছে। হিমাদ্রি ভাবে যে সে দ্বন্দ্ব ত' সত্যের সন্ধানেরই অঙ্গ। তাতে মনের জগতে টানা পোড়েনের খেলা সুরু হলেও দ্বন্দ্বোপশম ঘটে না। কিন্তু তার কাছে গুপ্ত সমিতিগুলির সঙ্কীর্ণ গোষ্ঠিগত মনোভাব অত্যন্ত বে-সুরো ঠেকে। বন্ধুদের কাছে সে শুনেছে যে পূর্ববাংলার জেলা-গুলিতে বিভিন্ন সমিতির কর্মীদের মধ্যে ঝগড়া এবং বিসম্বাদ অনেক সময় আত্মঘাতী কলহের রূপ নিয়ে দেখা দেয়। দলীয় রাজনীতির বীভৎস প্রকাশে শুধু যে শক্তির অপচয় হয় তাই নয়। এর ফলে অনেক কর্মী পুলিশের চোখে মার্কামারা হয়ে যায়। হিমাদ্রির কর্মক্ষেত্র উত্তরবঙ্গের সেই শহরটির আবহাওয়া এদিক থেকে অপেক্ষাকৃত ভাল ছিল। তবু সেখানেও দলাদলির যেটুকু অভিব্যক্তি হয় তা

দেখে সে ক্ষুব্ধ না হয়ে পারে না। সমিতিগুলি গুপ্ত হলেও প্রধান কর্মীদের মধ্যে অনেকে বেশ পরিচিত হয়ে যান। অন্ততঃ রাজনৈতিক কর্মীদের পক্ষে তাঁদের চিনে নেওয়া কঠিন হয় না। হিমাদ্রি দেখে যে ঐ সব কর্মীদের সকলের মধ্যেই রয়েছে দেশপ্রেমের প্রেরণা, রয়েছে কর্মের প্রতি নিষ্ঠা। তবে তাঁরা মিলে মিশে কাজ করতে পারেন না কেন? সকলেই ত' দেশজননীর মুক্তিব্রতে নিজেকে উৎসর্গ করেছেন। মত বা পথ নিয়ে তাঁদের ভিতরে খুব যে একটা পার্থক্য আছে তা নয়। বরং সেই সময়ে প্রত্যেক দলের ভিতরে তরুণ আর প্রবীণ কর্মীদের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে। তবে কেন এই বিরোধ? কেন নিজেদের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে বদ্ধ করে রাখা?

দলগত বিরোধ হিমাদ্রিকে এক অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে ফেলে দেয়। কালুদাকে নিয়ে সে এক দোটানায় পড়ে। কালুদা তখন উত্তরবঙ্গের অন্যতম জননেতারূপে প্রতিষ্ঠালাভ করেছেন। তাঁর পাণ্ডিত্য, ত্যাগ এবং অমায়িক আচরণ সকলেরই শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। কলেজ জীবনের গোড়ার দিকে সে তাঁর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে দেখে যে তাঁর কাছে যাওয়ার পথে এক প্রায় দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। কেন না তিনি হলেন প্রতিদ্বন্দ্বী সমিতির নেতা। তবু যখন কলেজক্রে তাঁর সংস্পর্শে আসতে হয়েছে তখন সে কালুদার উদার মনোভাবেরই পরিচয় পেয়েছে। কিন্তু একটি অতি-উৎসাহী সহপাঠি তাকে খুব বে-কায়দায় ফেলে দেয়। সেই সহপাঠিটি ছিল হিমাদ্রিদের প্রতিদ্বন্দ্বী সমিতির সভ্য। হিমাদ্রি তখনও মার্কামারা হয়ে ওঠেনি। তাই ঐ ছেলেটি তাকে নিজেদের দলে টানার আশায় উঠে পড়ে লেগে যায়। সুযোগ পেলেই বিপ্লব, আত্মদান প্রভৃতি প্রসঙ্গ উত্থাপন করে। অবশেষে ছেলেটি একদিন হিমাদ্রিকে অত্যন্ত খোলাখুলি ভাবে জিজ্ঞাসা করে বসে যে সে কোন দলের সাথে জড়িত আছে কিনা। এরকম প্রশ্নের জবাব দেওয়াটা সমীচীন হবে না ভেবে হিমাদ্রি জানায় যে সে কোন দলেই নেই, সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ। সহপাঠিটি তখন তাকে একজন সন্তাব্য রিক্রুট ভেবে একটা উপলক্ষ্য করে কালুদার কাছে টেনে নিয়ে যায়। কালুদার কাছে মিথ্যে বলতে হিমাদ্রির মন চায় না। দুই তিনবার যাতায়াতের পর সে মনের ইতস্ততভাব ঝেড়ে ফেলে। কালুদাকে একদিন একলা পেয়ে নিজের সত্য পরিচয় জানায়। তিনি বলেন 'তাতে কি হয়েছে! তুমি খাঁটি দেশকর্মী, যে দলেই থাকো না কেন, দেশের সম্পদ তোমরা!'

হিমাদ্রি প্রশ্ন করে 'আমরা সব দল এক হয়ে কাজ করতে পারি না কেন?' কালুদা বলেন 'যে সে উদ্দেশ্যে যে কোন চেষ্টা হয় নি তা নয়। সমস্ত বিপ্লবী দলগুলিকে মেলাবার জন্য সম্প্রতিও একটা প্রচেষ্টা হয়েছিল কিন্তু তা স্থায়ী হয় নি। ব্যর্থতার জন্য এক দলের নেতারা অন্য দলের নেতাদের উপর দোষারোপ করেন। তাতে তিক্ততাই বেড়েছে। আসলে হয়ত তাঁদের কেউই একচ্ছত্র নেতৃত্বের অধিকার ক্ষুণ্ন হতে দিতে চান না। কালুদার কাছে সব কথা শুনে হিমাদ্রির অন্তর আলোড়িত করে প্রশ্ন জাগে। যাদের নীতি হল 'মুরকে করিলে নিকট বন্ধু, পরকে করিলে ভাই' তারা একই পথের পথিকদের মাঝে এমন ব্যবধান খাড়া করে কেন? 'দাদা'-দের প্রতি অটল বিশ্বাসের ভিত্তিতে ফাটল ধরে।

সমিতির নেতাদের প্রতি অন্ধ বিশ্বাসের ভিতটাকে সজোরে নাড়া দিয়ে যায় একজন খ্যাতনামা রাজনৈতিক নেতার দাহচর্য। জেলা যুব সম্মেলনের সভাপতি হয়ে আসেন ডাঃ ভূপেন দত্ত। তাঁর অভিভাষণে রোম্যান্টিসিজমের লেশমাত্র ছিল না। বরং ছিল একদিকে জাতীয় কংগ্রেসের

দক্ষিণপন্থী নেতৃত্ব এবং অন্যদিকে গুপ্ত বিপ্লবী সমিতির 'দাদা'দের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা। তিনি তরুণদের সামনে সমাজতন্ত্রের আদর্শকে দৃঢ়ভাবে তুলে ধরেন। সেই সময়ে সমাজতন্ত্রী তথা সাম্যবাদী সাহিত্যের সাথে বিপ্লবী তরুণদের কিছু কিছু পরিচয় ঘটতে শুরু করেছিল। 'থ্রু দি রাশিয়ান রেভোলিউশান'; 'টেন ডেজ দ্যাট শুক্ দি ওয়ার্ল্ড', 'এ, বি, সি অফ কমিউনিজম' প্রভৃতি কিছু কিছু বই হিমাদ্রির হাতেও এসে পৌঁছেছে। সেই সাহিত্যের অন্তর্নিহিত সমাজ বিপ্লবের বাণী তখনও ঐ সব ছেলেদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি। তারা তাকে 'গণবিপ্লবের' রোম্যান্টিক দৃষ্টি দিয়েই বুঝতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু ডাঃ মন্ত্রের মতামত তার মত ছেলেদের রাজনৈতিক ধারণার ভিত্তিমূল নড়িয়ে দেয়, প্রচণ্ড আঘাত করে সংস্কারের একেবারে মূলদেশে। তাঁর বক্তব্য প্রথমটা হিমাদ্রির কাছে নেতিবাচক বলেই মনে হয়েছিল অথচ তাঁকে একেবারে অগ্রাহ্য করাও সম্ভব নয়। একে ত' তিনি স্বামী বিবেকানন্দের ভাই, তার উপরে রয়েছে তাঁর সুদীর্ঘ বিপ্লবী ঐতিহ্য। আর রয়েছে অগাধ পাণ্ডিত্যের খ্যাতি। তরুণ মনকে আকর্ষণ করার পক্ষে যথেষ্ট বই কি! হিমাদ্রিরা দেখে যে সেই মানুষটির কাছে যাওয়াটাও অত্যন্ত সহজ, যাকে ঘরে অবারিত দ্বার। সে যাওয়ার রোম্যান্টিক আবেগ নেই, নেই রহস্যের পরিবেশ। কাছে গেলে তিনি সরল অনাড়ম্বর ব্যক্তিত্বের দ্বারা অতি সহজে সকলকে আপনার করে নেন। সহিষ্ণুভাবে আলোচনা করেন, প্রশ্নের উত্তর দেন। তাঁর সংস্পর্শে এসে অন্তরে জিজ্ঞাসুর মনোভাব শক্তিসঞ্চয় করে। যুক্তি আর বিচার বিশ্লেষণের প্রবণতা বড় হয়ে ওঠে।

ইতিমধ্যে জাতির জীবনে ঘটে গেছে কত যুগান্তকারী ঘটনা। ১৯২৮ সাল শেষ হয়ে এসেছে ১৯২৯ সালের অগ্নিগর্ভ দিনগুলি। হিমাদ্রির কর্মের ক্ষেত্র আরো বিস্তৃত হয়েছে, প্রসারিত হয়েছে মনের দিগন্ত। অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারে অনেক কিছু জমা হয়েছে, স্মৃতির পটে আঁকা হয়ে গেছে কত নতুন মুখের রেখা। ওরা দল বেঁধে কলকাতায় এসেছে নিখিলবঙ্গ ছাত্র সমিতির প্রথম অধিবেশনে যোগ দিতে। সম্মেলনের সভাপতি জওহরলাল নেহরু, তরুণ ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি। সেখানে যেন হিমাদ্রির সাথে সারা বাংলার জাগ্রত যৌবন শক্তির মুখোমুখি পরিচয় হয়। সমস্ত পরিবেশ জুড়ে যেন বে-পরোয়া অভিযানের ঘোষণা উদ্ধতভাবে আত্মপ্রকাশ করে। জাতীয় কংগ্রেসের ভিতর তখন দক্ষিণ ও বামপন্থীর সংঘাত নতুনভাবে দেখা দিয়েছে। ছাত্র সম্মেলনের মঞ্চে অভিনন্দন জানাতে উঠে বামপন্থী নেতারা পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য আপোষহীন সংগ্রামের আহ্বান জানান। মনের রক্ত সাময়িকভাবে চাপা পড়ে যায়। উদ্দীপনার পাত্র আকণ্ঠ পূর্ণ করে নিয়ে ওরা ফিরে আসে।

এরই কিছুদিন পরে কলকাতায় অনুষ্ঠিত হল জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন। সেখানে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গৃহীত হয় না বটে কিন্তু বিদেশী গভর্ণমেণ্টকে এক বৎসর সময় দেওয়া হয়। যদি তারা এই সময়ের মধ্যে ভারতকে ডমিনিয়ন স্ট্যাটাস বা ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসন দিতে রাজী না হয় তাহলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার সঙ্কল্প ঘোষণা করা হবে। পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গৃহীত না হওয়ায় তরুণদল বিক্ষুব্ধ। বামপন্থী নেতারা বলেন যে এই এক বছরকে প্রস্তুতির বছর হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। প্রত্যেকটি সভা ও সমাবেশ থেকে আওয়াজ তুলতে হবে যে পূর্ণ স্বাধীনতা ছাড়া অন্য কিছুতে দেশবাসী সন্তুষ্ট হবে না। সংগঠনকে প্রসারিত করতে হবে দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে।

কংগ্রেস অধিবেশন উপলক্ষে সুভাষচন্দ্রের অধিনায়কত্বে সম্পূর্ণ সামরিক কায়দায় যে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠিত হয়েছিল তা তরুণমনে উন্মাদনার আলোড়ন সৃষ্টি করে। মফঃস্বল শহর গুলিতেও অমনি ধরণের স্বেচ্ছাসেবক দল গড়ে ওঠে। বিপ্লবী সমিতিগুলিই সে সংগঠনের প্রাণশক্তি। হিমাদ্রির মত ছেলেদের মনে একটি কথাই শুধু ঝঙ্কারিত হয়ে উঠতে থাকে 'সময় হয়েছে নিকট এবার, বাঁধন ছিঁড়তে হবে।'

ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের তরফ থেকে প্রতি-আক্রমণ সুরু হয়ে যায়। নতুন বছর সুরু হয় দেশব্যাপী ধর পাকড়ের মধ্য দিয়ে। একদিকে লাহোর এবং অন্যদিকে মীরাট ষড়যন্ত্রের মামলা সারা দেশে বিরাট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে।

ঘটনা প্রবাহের সন্নিবেশ বিস্মিত হয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে চিন্তায় ক্লান্ত নানা তরঙ্গের আঘাতে উদ্বেল হয়ে উঠতে থাকে। চূড়ান্ত সংগ্রামের দিন যত কাছে এগিয়ে আসে ততই তার প্রকৃতি ও ধরণ সম্বন্ধে প্রশ্ন ওঠে। জাতীয় কংগ্রেসের ভিতর যে দক্ষিণ ও বামপন্থীর সংঘাত দেখা দিয়েছে তার মূল কি আরো গভীরে নিহিত? হিমাদ্রি ভাবত যে দল বুঝি শুধু ডমিনিয়ন স্ট্যাটাস বনাম পূর্ণ স্বাধীনতার দফা নিয়ে। বস্তু তাদ্বত্ত বলে যে বিরোধের মূলে আরো কারণ রয়েছে। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের সাথে আপোষ বা আপোষহীন সংগ্রামের প্রশ্নের পিছনে রয়েছে স্বাধীনতার রূপ সম্বন্ধে পরস্পর বিরোধী ধারণা। স্বাধীনতা অর্জনের পর দেশে কি কি পরিবর্তন ঘটবে সে সম্বন্ধে দক্ষিণপন্থী নেতারা বিশেষ কিছু বলতে চান না। অন্যদিকে যারা পূর্ণ স্বরাজের শপথ গ্রহণের কথা বলছেন তাঁদের মধ্যে স্বরাজের সামাজিক প্রকৃতি রূপায়ণের চেষ্টা দেখা দিয়েছে। জওহরলাল নেহরু এবং সুভাষচন্দ্রের যুগ্ম-সম্পাদকত্বে গঠিত হয়েছে 'ইণ্ডিপেণ্ডেন্স অফ ইণ্ডিয়া লীগ'। তার ঘোষণাপত্রে স্বাধীন ভারতে সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিবর্তনের কর্মসূচীর এক খসড়া দেওয়া হয়েছে। সে কর্মসূচী কতখানি সঠিক তা বোঝার মত বিচারশক্তি হিমাদ্রি বা তাদ্বত্ত কারুরই নেই। কিন্তু তার সাহায্যে ওরা যেন পায়ের তলায় মাটি খুঁজে পায়।

বিভিন্ন বিপ্লবী সমিতির উদ্যোগে তখন কয়েকটি সাময়িক পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করেছে। 'স্বাধীনতা', 'আত্মশক্তি', 'বাংলার বাণী', 'বেণু'। পত্রিকাগুলিতে তখনও রোমান্টিক ভাবপ্রবণতাই প্রধান তবু স্বাধীনতার পথ এবং স্বরূপ সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনার সূত্রপাত হয়েছে। কিন্তু হিমাদ্রি লক্ষ্য করে যে ঐ পত্রিকাগুলির প্রায় অধিকাংশই সমাজতন্ত্রবাদী এবং সাম্যবাদী মতের প্রতি খুব বিরূপ মনোভাব পোষণ করে। ফলে তার জানার আগ্রহ আরো বেড়ে যায়। ওরা দুই বন্ধুতে স্থির করে যে সাম্যবাদী সাহিত্যের সঙ্গে ভালভাবে পরিচিত না হয়ে তারা কোন মত গঠন করবে না।

সেই অধ্যায়টিতে মুক্তি সংগ্রামী তরুণদের সামনে আরো নানা ধরণের প্রশ্ন উঠছে। বিপ্লবের মূল শক্তি কে? বিপ্লবী কর্মীদের অধিকাংশই বিশ্বাস করে যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর তরুণেরাই হল প্রধান শক্তি। তারাই নব চেতনার বাহক, তারাই সংগ্রামের অগ্রবাহিনী। যারা গণবিপ্লবের আদর্শের দিকে আকৃষ্ট হচ্ছে তারা শ্রমিক কৃষককে স্বাধীনতা সংগ্রামে টেনে আনার পক্ষপাতী। তবে তারাও ভাবে যে মধ্যবিত্ত তরুণেরাই বিপ্লবের প্রাণশক্তি। নেতৃত্ব দিয়ে পথ দেখাতে পারে তারাই। তবু নিশ্চিত বলে সম্পূর্ণ অন্তকথা। সে হাত সম্মিলনে যোগদান করতে গিয়ে দুই একজন সাম্যবাদী কর্মীর সংস্পর্শে এসেছিল। তাদের কথার প্রতিধ্বনি করে সে বলে যে শ্রমিক শ্রেণীই হল বিপ্লবের প্রধান শক্তি।

সেই মুহূর্তটিতে সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলন সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। দেশের নানা শিল্পকেন্দ্রে কয়েকটি বড় বড় শ্রমিক ধর্মঘট হয়ে গেছে। সেগুলি বহন করে এনেছে এক নতুন শক্তির আবির্ভাবের ইঙ্গিত। সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে সংগঠিত শ্রমিকেরা অংশগ্রহণ করেছে। ধর্মঘটগুলির সময় তাদের পাশে রয়েছে বিদেশী রাজশক্তির প্রকাশ্য মোকাবিলা। হিমাদ্রি আর দাশগুপ্তর সহানুভূতি স্বভাবতই তাদের দিকে। ঐ শক্তির সম্ভাবনা নিয়েও তারা জল্পনা করে। কিন্তু তবু নিশীথের মতেও তারা সায় দিতে পারে না।

হিমাদ্রি সাম্যবাদী মতবাদের দিকে ঝুঁকেছিল অনেকটা দাশগুপ্তর প্রভাবে। দুজনে বহু আলোচনা করে লেনিনের 'সাম্রাজ্যবাদ' বইখানা নিয়ে। সাম্রাজ্যবাদের স্বরূপ বোঝার সাথে সাথে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রকৃতি সম্বন্ধে তারা নতুন আলোক লাভ করে। সমিতির 'দাদা'রা জাতীয় কংগ্রেসের অহিংস আন্দোলন আর সাম্যবাদীদের পরিচালিত শ্রমিক আন্দোলন দুটোকেই আমল দিতে চান না। সাম্যবাদীদের সম্বন্ধে 'দাদা'দের ধারণা যে তারা দেশের স্বাধীনতার সংগ্রাম সম্বন্ধে আদৌ উৎসাহী নয়।

মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা সুরু হওয়ার পর হিমাদ্রি 'দাদা'দের মত মেনে নিতে পারে না। সাম্যবাদীদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে বিস্তৃত জানার আগ্রহ তাকে পেয়ে বসে। কিন্তু সে নিশীথের মতামত শুনে হতাশ না হয়ে পারে না। নিশীথ জাতীয় কংগ্রেসের দক্ষিণ ও বাম উভয় নেতৃত্বেরই তীব্র সমালোচনা করে। গুপ্ত বিপ্লবী সমিতিগুলির সম্বন্ধেও তার খুব বিরূপ মনোভাব। হিমাদ্রি জিজ্ঞাসা করে 'এ ত' শুধু নেতিবাচক সমালোচনা। আসল যে সংগ্রামের জন্য দেশবাসী প্রস্তুত হচ্ছে তার সম্বন্ধে তোমাদের কি পরিকল্পনা আছে?' নিশীথ কোন সন্তোষজনক জবাব দিতে পারে না। হিমাদ্রি তবু থামে না, সরাসরি প্রশ্ন করে 'আগামী আন্দোলনে সাম্যবাদীরা যোগ দেবে কিনা?' নিশীথ প্রসঙ্গটিকে এড়িয়ে যেতে চায়। ফলে হিমাদ্রির মন বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে।

দাশগুপ্ত কোথা থেকে যেন 'হিন্দুস্থান সোশিয়ালিস্ট রিপাবলিকান আর্মি'র একটি ইস্তাহার সংগ্রহ করে আনে। তাতে স্বাধীনতা সংগ্রামের সাথে সাথে সামাজিক বিপ্লবের কর্মসূচীর একটা রূপরেখা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। তারই ভিত্তিতে শ্রমজীবি জনগণকে সশস্ত্র বিপ্লবের অভিযানে টেনে আনা যাবে। ঘোষণা পত্রটি তখনকার যত দুই বন্ধুর চিন্তাধারার উপর গভীর রেখাপাত করে।

তখন ভগৎসিং আর বটুকেশ্বর দত্ত বিপ্লবী তরুণদের হৃদয়ে একচ্ছত্র আসন অধিকার করে বসেছে। জনের মন্ত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে ঐ দুটি নাম। তাদেরই দল 'হিন্দুস্থান সোশিয়ালিস্ট রিপাব্লিকান আর্মি'। হিমাদ্রি বলে ওরাই দিয়েছে পথের সন্ধান। সেই পথ অনুসরণ করে চলতে হবে।'

ততদিনে লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার বন্দীদের ঐতিহাসিক অনশন ধর্মঘট সুরু হয়ে গেছে। বিদ্রোহী যৌবনশক্তি শৃঙ্খলিত হয়েও অমানুষিক নির্যাতনের সামনে মাথা নোয়ায় নি। বন্দীশালার অন্ধকার কক্ষেও তারা সংগ্রামের পতাকা উর্ধে তুলে ধরে রেখেছে! তাদের সেই তিলে তিলে মৃত্যুবরণের সংকল্প সমস্ত দেশে দারুণ আলোড়ন সৃষ্টি করে।

অনশনব্রতী যতীন দাসের আত্মদানের সংবাদে দেশবাসীর উত্তেজনা ঝড়ের হুঙ্কারে ফেটে পড়ে। ব্রিটিশ গভর্নমেন্টকে মাথা নোয়াতে হয় জনমতের সেই অভিব্যক্তির সামনে। শহীদের শবদেহ কলকাতায় আনার অনুমতি দিতে গভর্নমেন্ট বাধ্য হয়।

লাহোর থেকে কলকাতা পর্যন্ত স্টেশনে স্টেশনে বীরের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য উদ্বেল জনসমুদ্র। দেশবরেণ্য নেতারা ঘোষণা করেন 'শহীদের শবযাত্রার স্কন্ধে বহন করে ধন্য হয়েছি।' সেই ঐতিহাসিক শবযাত্রার যোগ দেওয়ার জন্য হিমাদ্রিরা দল বেঁধে কলকাতায় ছুটে আসে। হাওড়া স্টেশন থেকে কেওড়াতলা। অগণিত মানুষের পদধ্বনির সঙ্গে তাল রেখে আকাশে ওঠে বজ্রনির্ঘোষ 'বন্দে মাতরম্', 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ', 'ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক্'। মিছিল ত' শুধু বিষণ্ণ শোকের নয়। সঙ্কল্পের দৃঢ়তা সকলের চোখে মুখে প্রতিফলিত। লক্ষপ্রাণে স্বতস্ফূর্ত শপথ 'স্বাধীনতার জন্য হৃৎপিণ্ডের শেষ রক্তবিন্দু অকাতরে উৎসর্গ করতে হবে।'

হিমাদ্রি ভাবে, এসে গেছে সেই ঝড় যার প্রতীক্ষায় ছিলেছে এতদিন। মহাপ্রাবনের গর্জন ঐ শোনা যায়। পরীক্ষার দিন সমাগত।

* * * *

ইংলণ্ড থেকে আমেরিকাগামী জাহাজে এক ভদ্রলোক উঠে বসলেন। এদেশে আর আয়ের সংস্থান হোল না, বহুবার বহুস্থানে তিনি ভাগ্যপরীক্ষা করেছেন।

হাঁ, রীতিমত পরীক্ষা বই কি! পুস্তকের পাণ্ডুলিপি নিয়ে প্রকাশকের দোরে দোরে ঘোরা! আর কত প্রকাশকের কাছে যে গিয়েছেন তার কোন ইয়ত্তা নেই। সর্বত্রই হলেন তিনি উপেক্ষিত, প্রত্যাখ্যাত হল তাঁর পাণ্ডুলিপি।

আমেরিকায় এসে ভদ্রলোক থিয়েটারের সিন্ পেন্টার হিসেবে সুরু করলেন তার পেশা, একঘেয়ে পুনরাবৃত্তিতে জীবন কেটে যায়! কোথায় হারিয়ে গিয়েছে ভেতরের লেখক মানুষটি।

একদিন ছুরার ধার দিতে দিতে স্ত্রীর হাতে এল একতাড়া পুরাণ আর ময়লা কাগজ।

—এগুলো আবার এখানে কোত্থেকে এল! আপন মনেই বলেন তিনি, খুলে দেখেন বহুদিন আগেকার প্রায় ভুলে যাওয়া সেই পাণ্ডুলিপি।

তাঁর মনে হঠাৎ বিশ্বাস জেগে ওঠে, এ একেবারে ফেলবার জিনিস নয়। আর একবার পরীক্ষা করা যাক।

প্রকাশক স্যাম্পসন লোর কাছে পাঠালেন সেই পাণ্ডুলিপি।

সাহিত্য জগতে হৈ চৈ পড়ে গেল। জনসাধারণের কাছ থেকে উচ্ছ্বসিত অভিনন্দন এলো 'দি গ্রড হাইওয়ে'র লেখকের কাছে।

আবার নিজেকে খুঁজে পান জেফ্‌রি ফার্নল।

পুরাতন পাতা

ভিক্টর হুগোর প্রণয় কাহিনী

সুরেশচন্দ্র সমাজপতি

ক্রতকীর্তি সাহিত্য-সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মাসিকপত্রিকা সম্পাদনায় যে নিষ্ঠা ও আদর্শের পরিচয় রেখে গেছেন তা চিরকাল স্মরণীয়। তাঁর "সাহিত্য" পত্রিকায় শুধু যে উচ্চাঙ্গের গল্প-প্রবন্ধ প্রকাশিত হত তাই নয়, প্রচুর পরিশ্রমে তিনি বিদেশের পত্র-পত্রিকা ও গ্রন্থ থেকে বহু দুষ্প্রাপ্য ও সুপাঠ্য উপকরণ আহরণ করে পাঠকদের পরিবেশন করতেন। সেইরকম কয়েকটি রচনা "পুরাতন পাতায়" পত্রস্থ করবার আয়োজন করা হয়েছে। আশা করি, লেখাগুলি পাঠকদের আনন্দ দেবে। —সম্পাদক।

"রিভিউ ডি প্যারিস" নামক পত্রে জুলিয়েট ড্রৌ সম্বন্ধে একটি অতি মনোজ্ঞ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। এই রমণী অর্দ্ধ-শতাব্দীর অধিককাল সুপ্রসিদ্ধ লেখক ভিক্টর হুগোর প্রিয়তমা বান্ধবী ছিলেন। তাঁহাদিগের এই প্রীতি কিরূপ প্রগাঢ়তা প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহা কেহই অবগত নহেন। বোধ করি, ভাবীকালেও কেহ তাহা জানিতে পারিবেন না।

১৮৩৬ খৃষ্টাব্দের মে মাসে কবিবর যখন জুলিয়েটের সমভিব্যাহারে তাঁহার জন্মনগর কৌজারে নামক স্থানে অবস্থিতি করিতেছিলেন, ঐ সময় তিনি বন্ধুবর্গ ও সহধর্ম্মিণীর নিকট লিখিত লিপিসমূহে উক্ত ক্ষুদ্র ও সুন্দর নগরের বিস্ময়োদ্দীপক বিচিত্র বর্ণনা সন্নিবেশিত করিয়াছেন। সৌহৃদ্যের সেই প্রথম অবস্থাতেও জুলিয়েট এই মহাকবির জীবনে প্রভূত পরিমাণে আত্মপ্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। যে মঠে অবস্থিতি করিয়া জুলিয়েট শিক্ষাপ্রাপ্ত হন, তৎসংক্রান্ত বহুবিধ হৃদয়গ্রাহী বিবরণ অবলম্বন পূর্ব্বক হুগো "Les Miserables" নামক উপন্যাস-গ্রন্থে বিচিত্র বর্ণনানৈপুণ্য প্রকাশ করিয়াছেন।

যখন হুগোর সহিত জুলিয়েটের প্রথম সাক্ষাৎকার ঘটে, সে সময় তিনি কোনও নাট্যশালার অভিনেত্রীর কার্য্যে নিযুক্ত, তাঁহার নবযৌবন-প্রফুল্ল দেহ লাবণ্যে উছলিতেছে। তরুণী অভিনেত্রীরা তখনকার দিনে ফরাসী দেশেও "মক্ততারিনী" নামে অভিহিত হইত। সুতরাং হুগো এই সুন্দরীকে সমাজ মধ্যে অপেক্ষাকৃত গৌরবাবহ পদে সংস্থাপিত করিবার সংকল্প করিলেন। পরবর্ত্তী পঞ্চাশবর্ষকাল তাঁহাদিগের মধ্যে প্রায় অবিশ্রান্তভাবে প্রাত্যহিক পত্র ব্যবহার চলিয়াছিল। সেই অপূর্ব্ব ও সাহিত্যের হিসাবে বহুমূল্য পত্রাবলী জুলিয়েটের ভ্রাতুষ্পুত্রের সম্পত্তি হইয়াছে। শুনা যায়, তিনি নাকি উক্ত পত্র বিক্রয় করাসী জাতীয় পুস্তকাগারে প্রদান করিবেন।

অবসর পাইলেই হুগো প্রভাতে ও প্রদোষে জুলিয়েটের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। দিবসের অবশিষ্ট সময় উভয়ে উভয়ের নিকট লিপি প্রেরণ করিয়া অতিবাহিত করিতেন। "রিভিউ" পত্রে তাঁহাদিগের অপূর্ব্ব ও মনোজ্ঞ লিপির কয়েকখানি নমুনা প্রকাশিত হইয়াছে।

বর্ষের পর বর্ষ অতীত হইবার পর অবশেষে দুর্দ্দিন আসিয়া উপস্থিত হইল। হুগো সপরিবারে স্বদেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইলেন। জুলিয়েটও তাঁহার নির্ব্বাসন-সহচরী হইলেন। তখন ম্যাডাম হুগো বিষণ্ণচিত্ত স্বামীর বিংশ বর্ষের বাগ্দত্তা জুলিয়েটকে সখীত্বে বরণ করিলেন।

১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে হুগোর পত্নী বিয়োগ ঘটিলে সকলেই মনে করিয়াছিল যে, তিনি এইবার জুলিয়েটের পাণিগ্রহণ করিবেন। ইদানীং জুলিয়েট জনসাধারণের নিকট ভদ্রমহিলা বোধ্য সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। প্রকৃত প্রস্তাবে যেরূপ ঘটিয়া থাকে, এক্ষেত্রেও তাহাই হইল। জুলিয়েটের সহিত হুগোর পূর্ব্ব সম্বন্ধের অণুমাত্র বৈলক্ষণ্য ঘটিল না। যাহারা আপনাদিগকে সর্ব্বজ্ঞ মনে করে, প্রকৃতপক্ষে তাহারা কিছুই অবগত নহে।

হুগোর ভক্তাগণের মুখ্য হইলে জুলিয়েট হুগোর অভিভাবিকা ও গৃহকর্ত্রীরূপে তাঁহার সহিত এক গৃহে অবস্থিতি করিতে সম্মত হইলেন। তাঁহাদিগের জীবনে পূর্ব্ববৎ অপূর্ব্ব কাব্য-বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হইতে লাগিল।

বহুকাল একত্রবাসের পর হুগো জুলিয়েটকে লিখিয়াছিলেন,—"প্রতি রাত্রি শয্যায় প্রবেশের পূর্ব্বে আমি ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, যতদিন আমি বাঁচিয়া থাকি, ভগবান যেন তোমাকেও ততদিন জীবিত রাখেন এবং অন্তিমেও উভয়ে একসঙ্গে প্রাণত্যাগ করিয়া স্বর্গধামে চিরমিলনে সম্মিলিত হইতে পারি।"

হুগোর এই প্রার্থনা পূর্ণ হয় নাই। ম্যাডাম হো দারুণ জ্বরোগে আক্রান্ত হন, কিন্তু তিনি বহু যত্নে এই রোগের কথা তাঁহার লোকবিখ্যাত বন্ধুর নিকট গোপন করিয়া রাখিয়াছিলেন। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার লোকান্তর প্রাপ্তি ঘটে।

ইহার অত্যল্পকাল পরে হুগো তৎপ্রণীত এক পুস্তকে নিম্নোদ্ধৃত কথা কয়েকটি লিখিয়াছিলেন। ঐ পুস্তকখানিকে তাঁহার সাংবৎসরিক বহি বলিতেন। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে এই পুস্তকখানি প্রথম উদ্ঘাটিত হয়।

ইহাতে লিখিত ছিল :—'প্রেম—এই কথাটি অতি বড় কথা। ঈশ্বর বিশ্বের প্রতি এই কথার প্রয়োগ করিয়াছেন। আমার বিশ্ব ভগবানের নিকট এই কথা পুনঃ প্রেরণ করিয়াছে। হে আমার হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী! আমি তোমায় ভালবাসি। এস, "আমি তোমায় ভালবাসি" এই স্বর্গীয় বাণী উচ্চারণ করিয়া আমাদের সম্মিলিত জীবনের পঞ্চাশৎ বর্ষ আরম্ভ করি।"*

* সাহিত্য, অগ্রহায়ণ ১৩০৯

পুতুল খেলা

চিত্তরঞ্জন মাইতি

প্রথম দিনেই ভালোবাসি পড়ে গিয়েছিল। নরম চিবুকটা ধরে বলেছে, খুকুমণি, খেলার পুতুল রেখে এখন আসল পুতুলটিকে নিয়ে একটু খেলাও দেখি ভাই।

ভাস্বতী মুখ তোলেনি। বয় বৌ পুতুল দুটীকে ভাতের থালার কাছে বসিয়ে মিছিমিছি খাইয়ে কোলের ওপর তুলে নিয়েছিল।

স্নেহপ্রবণ যাঁরা তাঁরা ভাবলেন, ছেলেমানুষ বৌ, খেলাঘরটাকে ভুলতে পারছে না, সময়ে আপনি সব ঠিক হয়ে যাবে।

আবার কেউ বা মনে মনে বললে, ভেতরে ভেতরে বয়স তো আর কম হয়নি, এ সব বয়স থেকে ছেলেমানুষটি সাজার অছিলা।

যাকে নিয়ে এ সব ভাবনা সে কিন্তু নির্বিকার। কে কি ভাবল না ভাবল এত ভাবনায় তার কাজ নেই। যত ভাবনা ঐ দুটি পুতুলকে নিয়ে। নাওয়ানো, খাওয়ানো, ঘুম পাড়ানো কি কম ঝক্কি! আবার গানের সুর না শুনলে ঘুম আসে না বুমলের।

ভাস্বতী রাতে ওদের খাইয়ে দাইয়ে রেডিওটা খুলে দেয়। কিছুক্ষণ গান শোনায়, তারপর এক সময় ওরা ঘুমোলে রেডিওটা বন্ধ করে ওদের পাশেই শুয়ে পড়ে। এ হোল ভাস্বতীর বাপের বাড়ীর অভ্যেস।

এই যুগল পুতুলের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আছে।

পাশাপাশি বাড়ী ছিল ভাস্বতী আর গোপালের। দুজনে ছেলেবেলার বন্ধু। মেলা থেকে দুজনে দুটি পুতুল কিনল একসময়। তারপর ছেলে আর মেয়ে পুতুলের বিয়ে দেওয়া হল ঘটা করে। নাওয়া খাওয়া ভুলে চলল কেবল পুতুল খেলা। একসময় গোপাল বাবা কাজ নিয়ে চলে গেলেন বাংলা দেশের বাইরে। কয়েক ফোঁটা চোখের জলের সঙ্গে গোপাল কাছ থেকে ভাস্বতী পেল এই বরবধূ পুতুল দুটি। সেই থেকে যুগলমূর্তি ভাস্বতীর নয়নমণি।

দুজনের কাজ এখন এসে পড়ল একার ঘাড়ে। স্কুলের বইপত্রের সঙ্গে চলল পুতুল। ধরা পড়ে যত বকুনি খেল মিস্ট্রেসের কাছে তার বেশী সোহাগ পড়ল পুতুল দুটোর ওপর।

বিয়ের কথাবার্তা চলল যখন থেকে, গুরুজনেরা বলতে লাগলেন, ছাড় ওসব বাতিক। আজ বাদে কাল যেতে হবে শ্বশুরবাড়ী তখন হবে কি?

হিতে হল বিপরীত। বেঁকে বসল ভাস্বতী, বিয়েই করবে না সে।

মা বললে, খাটিও না বাপু ওকে; ও রোগ আপনিই সেরে যাবে বিয়ের পর।

ঘরে শুয়েছিল অখিলেশ, ঘোর ভেঙ্গিয়ে খাটে এসে বসল ভাস্বতী। কি যেন করল ও, অন্ধকারে দেখা গেল না। অখিলেশ শুনল শুধু নরম চুড়ির টুং টাং। এক সময় খাট থেকে উঠে গেল ও। রেডিওটা চালিয়ে দিল। একটা মিষ্টি সুরের ঝঙ্কার ছড়িয়ে পড়ল ঘরের ভেতর।

আবার ঘাটে এসে বসল ভাস্বতী। অখিলেশ আবদোরা হয়ে বলল।

গান খুব ভালবাস তুমি, তাই না?

ওদিক থেকে কোন সাড়া এলনা। কিছুক্ষণ চুপচাপ। আবার বলল অখিলেশ,—সত্যি রবিশঙ্কর যাদু জানে।

নিখিল সরকারের তবলার জবাব চলেছে তখন। জমজমাট আসর। এবারও কথা নেই কারো মুখে।

এক সময় বাজনা থামল। ভাস্বতী বন্ধ করে দিয়ে এলো রেডিওটা।

খুব সাবধানে একপাশে শুয়ে পড়ল ও।

অখিলেশ একটু অভিমানের সুরেই বলল, তাহলে কথা বলবে না আমার সঙ্গে?

চুপ, আস্তে; জোরে কথা বলো না। ওরা গান শুনে এই সবে ঘুমোল।

অখিলেশ সোৎসাহে চাপা গলায় বলল, স্বাতী আর তাদু তোমার আমার কথা শুনবে বলে ত কান পেতেই আছে সারাক্ষণ। যা লেগেছে ওরা তোমার পেছনে।

নিরিকার ও পক্ষ। অখিলেশ ধমকার পাত্র নয়। বলল, বোধহয় ওরা দুটিতে ঘুমিয়েছে এতক্ষণে।

এমন করে কথা বললে কি ঘুমুতে পারে কেউ। নিশ্চয়ই জেগে উঠেছে ওরা।

মৃদু ক্ষোভের সঙ্গে কথাগুলো বলে আবার বিছানা ছেড়ে উঠল ভাস্বতী। আবার রেডিওটা চালালো। অখিলেশ এবার সত্যিই একটু রাগ করেছে। নিজের বউএর সঙ্গে দুটো কথা বলতে পারবে না। চুপচাপ রাগ করে একপাশে সরে পড়ে রইল ও। ঘুমিয়ে গেছে কখন অখিলেশ। বেচারা মনে করেছিল, এবার ডাক আসবে ও পক্ষ থেকে! কিন্তু কথাটা ভাবতে ভাবতেই ঘুমিয়ে পড়েছে ও।

কে যেন জোরে ঠেলছে অখিলেশকে। ঘুম ভেঙে গেল অখিলেশের।

চাঁদের আলো এসে পড়েছিল বিছানায়।

অখিলেশ দেখল বিছানার ভেতর উঠে বসে কি যেন করছে ভাস্বতী।

অখিলেশকে জেগে উঠতে দেখে কান্নায় ভেঙে পড়ল ও।

এত নিষ্ঠুর তুমি, এমন করে আঘাত দিলে।

ঘুমের আবেশ সম্পূর্ণ ভেঙে গেছে অখিলেশের। মনে পড়ল তার প্রথম শয়ন পর্বের কথা। সত্যিই ত, মিথ্যা অভিমান দেখাতে গিয়ে কখন ঘুমিয়ে পড়েছে সে। ভাস্বতীর ওপর এ এক নিষ্ঠুর অবিচার বই কি। সেই থেকে বেচারা একা একা বসে কেঁদেছে নিশ্চয়। মনটা গলে জল হয়ে গেল অখিলেশের। অনুশোচনায় সে ভাস্বতীর কাছে আজ ক্ষমাপ্রার্থী।

বিছানায় উঠে বসে মুখটি তুলে ধরতে গিয়ে থমকে গেল অখিলেশ। ও কি ও ভাস্বতীর কোলে। দুটি পুতুল শুয়ে আছে। ভাস্বতী হাত বুলিয়ে দিচ্ছে ওদের গায়ে।

অখিলেশ বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল। ভাস্বতীকে আপন মনে কথা বলতে শুনল সে।

আহা, কতই না লেগেছে। এত বড় মানুষের চাপ পড়লে কি আর বাঁচতে পারে এরা।

শুনেছিল ঘটে অখিলেশ পুতুলের কথা। বোনেরা নতুন ঘর-এর পুতুল-প্রীতি নিয়ে একটু

হাসাহাসিও করেছিল। কিন্তু বাড়াবাড়িটা যে এতদূর গড়িয়েছে তা একবারও ভাবেনি সে। তখন ভাস্বতী অন্ধকারে তার বয়সী পুতুল দুটিকে এনে শুইয়েছে তার পাশে। রেডিও খুলে গান শুনিয়েছে তাদের।

অখিলেশকে কথা বলতে বারণ করেছে। কিন্তু এ সবের কিছুই বোঝেনি অখিলেশ। সে শুধু নিরবধি সংগীত প্রীতি আর ননদিনীদের কাছে ধরা পড়ে যাওয়ার সঙ্কোচ বলেই মনে করেছে। এ কি দেখছে সে! মানসিক রোগে ভুগছে নাকি ভাস্বতী।

বিয়ের পর প্রথম প্রথম এই নিয়ে অখিলেশ রোকাল অনেক। কাজ হল না, বরং বারণে খিদটা বেড়ে গেল একটু বেশীমাত্রায়।

চলল লক্ষণ বুঝে শুধু প্রয়োগ। অগত্যা হাসিমান চার মানলেন।

শাশুড়ী, সতী সাবিত্রীর মাতৃলী, শেকড়, জটাজুটের বাঁধন দিলেন, তাতে সোনার তাবিজের সংখ্যা বাড়ল ভাস্বতীর, কিন্তু পুতুল খেলায় ছেদ পড়ল না।

অবশেষে অখিলেশকে আত্ম সমর্পণই করতে হল। বন্ধুরা বলল, চল্ বেরি মন ভুলিয়ে কিছুদিন, তাহলে যদি মন পাওয়া যায় ও পক্ষের।

ঘটা করে হল ওদের বিবাহ-বার্ষিকীর আয়োজন। এল সব নিমন্ত্রিতেরা নানান উপহার নিয়ে। সান বাঁধনা খাওয়া দাওয়া হল।

নিমন্ত্রিতেরা বিদায় নেবার সময় বলল, শতবর্ষ এমনি চলুক তোমাদের বিবাহ-বার্ষিকী।

ভাস্বতী অমনি বলল, করুণ ওদের আশীর্বাদ, যেন সুখে কেটে যায় ওদের বিবাহিত জীবন।

ভাস্বতীর অর্থ ইঙ্গিতে সকলেই তাকাল ঘরের এক কোণে। সেখানে অতি সুন্দর স্তবকের ভেতর দাঁড়িয়েছিল দুটি সজ্জিত পুতুল।

নিমন্ত্রিতেরা এ ওর মুখের দিকে তাকাল। তবে কি বিবাহ-বার্ষিকীর নামে ঐ পুতুল-খেলা।

যাবার সময় পিসতুতো বোন বলে গেল অখিলেশকে, কাদার একটা ঢেলা এনেছ অখিলেশদা, ইচ্ছে মত পুতুল বানাও ওকে দিয়ে।

ঘরে বাইরে সজনায় অস্থির হয়ে উঠল অখিলেশ। শাসন, সোহাগ, কিছুতেই কিছু হোলনা; বন্ধ হোল শুধু স্বামীস্ত্রীর কথাবার্তা।

অখিলেশ ভাবল সাময়িক কথাবন্ধে যদি কিছু সুফল ফলে।

কয়েকদিন এমনি কেটে যাবার পর এক অপরাহ্নে অখিলেশের কাছে এসে দাঁড়াল ভাস্বতী।

বলল, যাবে একটু গঙ্গার ধারে, গরমে সব যে কেমন হাঁপিয়ে উঠেছে।

অখিলেশ মনে মনে প্রচুর খুশি হল। গাড়ীটা বের করল সে। গঙ্গার ধারে ভাস্বতী আর অখিলেশকে বেড়তে দেখল বাড়ীর সকলে। খুশি হল সবাই। মন ফিরল বুঝি বধূর।

ফিরে এল যখন ওরা তখন সন্ধ্যা ঘন হয়ে উঠেছে, সবাই দেখল ঘনতর অন্ধকার নেমেছে অখিলেশের মুখে। শোনা গেল, সারাক্ষণ পুতুল দুটিকে কোলে বসিয়ে হাওয়া খাইয়েছে ভাস্বতী। গরমে ওদের অস্থিরতার জন্যেই এত আয়োজন।

এরপর অখিলেশ যদি জীর্ণ হয়ে যায়, বেশবাসে যদি সে বিশৃঙ্খল হয়, আচরণে যদি হয় উদ্‌ভ্রান্ত তাহলে নিশ্চয়ই দোষী করা যাবে না ওকে।

কি নিষ্ঠুর নির্বিকার ভাস্বতী। যখন না করুক, একটুও কি ছায়া ফেলতে নেই।

একটি দিনের ঘটনা। কে যেন চেঁচিয়ে উঠল, আগুন, আগুন। সারা বাড়ীটাতে হৈ হৈ পড়ে গেল। ইলেক্‌ট্রিক ওয়ারিংএ কেমন করে না জানি আগুন ধরে গেছে। জিনিষপত্র টানাটানি, টেলিফোনে ডাকাডাকি দমকলের চং চং ঘণ্টাধ্বনি, সব কিছু মিলে আবহাওয়াটাকে ভারী করে তুলল। সবাই বেরিয়ে এসেছে কোনরকমে, কিন্তু ভাস্বতীর পুতুল। কেঁদে আছড়ে পড়ল ভাস্বতী। অখিলেশ মুহূর্তে ছুটে গেল ঘরের ভেতর। কিন্তু ততক্ষণে আগুন গ্রাস করেছে একটি পুতুল। সঙ্গীরা বধূটিকে নিয়ে কোনরকমে ফিরে এল সে।

আগুন নিভল, আবার স্বাভাবিক জীবন ফিরে এল ও বাড়ীর, কিন্তু আগুন নিভলনা একটি মনে। রাতদিন জ্বলে পুড়ে যেতে লাগল ভাস্বতীর বুকের ভেতরটা।

বধূ পুতুলটি পড়ে আছে নিঃসঙ্গ। ভাস্বতীর মনে হয় সকরুণ দৃষ্টিতে কাকে যেন খুঁজছে সে। চোখ ছাপিয়ে জল নামে ভাস্বতীর। কত সুখে দুঃখে সঙ্গী হয়ে ছিল ওরা দুটিতে, আর আজ! আর যেন ভাবতে পারে না সে। হু-হু করে ওঠে বুকের ভেতরটা।

আজ অনেক রাত হল অখিলেশের ফিরতে। মাঝে মাঝে ওর ফিরতে একটু রাত হয়ে যায় আজকাল। খাবার ঢাকা থাকে। খাওয়া শেষ করে বিছানায় উঠে দেখে পুতুলটিকে পাশে নিয়ে শুয়ে আছে ভাস্বতী। কখনো বা দীর্ঘশ্বাস পড়ে অখিলেশের। একপাশে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ে ও।

আজ এসে তেমনি শুল অখিলেশ। শুতে এসে দেখল ভাস্বতী তখনও শোয়নি, দাঁড়িয়ে আছে জানালার ধারে।

অবাক হল অখিলেশ। শুতে যাবে কি যাবে না ভাবছে, ফিরে তাকাল ভাস্বতী। চাঁদের আলোয় অখিলেশ দেখল ভাস্বতীর চোখে জল।

এত দেরী করে ফিরলে যে, কান্নায় ভেঙে পড়ছিল ভাস্বতীর গলা।

একি শুনছে অখিলেশ। নিজের কানকে যেন বিশ্বাসই করতে পারছেনা সে। ভাস্বতী কি তবে এতরাত তারই জন্য প্রতীক্ষা করে আছে। এত উদ্বেগ কি তারই জন্য জমিয়ে রেখেছিল ভাস্বতী। কথার উত্তর দিচ্ছনা কেন? বল না; বল না বলতে বলতে অখিলেশের বুকের ওপর যেন আছড়ে পড়ল ভাস্বতী।

বল, কথা দাও, কোনদিন আর এত দেরী করবেনা তুমি।

অখিলেশ নির্বাক। শুধু কান্নায় ভেঙে পড়া ভাস্বতীর মাথায় হাত রাখল সে।

এক সময় ভাস্বতী চোখ তুলে তাকাল অখিলেশের মুখের ওপর।

আচ্ছা, বল তো, আমাদের কেউ যদি হারিয়ে যাই তাহলে খুব কষ্ট হবে, তাই না?

অখিলেশ ভাস্বতীর মুখে হাত চাপা দিয়ে বলল, ছিঃ একথা এখন থাক্ লক্ষীটি।

নিবিড় আলিঙ্গনে আবদ্ধ হয়ে একটি জীবন্ত পুতুল আর একটি পুতুলের মধ্যে সহসা হারিয়ে গেল।

বিজ্ঞানের জয়যাত্রা

টেলিপ্রিণ্টার

শ্রীক্ষিতীশনারায়ণ ভট্টাচার্য

ভোর বেলা ঘুম থেকে উঠেই দেখি দরজার পাশে পড়ে আছে। গত কাল পৃথিবীর কোথায় কি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটল সব কলম করে লেখা আছে তাতে। ভিয়েৎনামের কোন্ অঞ্চলে নতুন করে লড়াই শুরু হয়েছে, মেক্সিকোতে কোথায় ধর্মঘট বসেছে, প্যাটাগোনিয়ার জঙ্গলে কোথায় কোন্ দুষ্প্রাপ্য জন্তু ধরা পড়েছে, আফ্রিকার কোথায় কোন্—নতুন—স্বাধীনতা পাওয়া রাষ্ট্রে বিদ্রোহের লক্ষণ দেখা দিয়েছে, ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট কোথায় কি গরম গরম বক্তৃতা দিয়েছেন, নরওয়ের কোথায় তুষার-ঝড় চলছে, কিংবা আমাদের প্রতিবেশী আমাদের ডিরুগড়ের কোথায় ব্রহ্মপুত্রে বান ডেকেছে—ওঃ, কোন্‌টা ছেড়ে কোন্‌টা পড়ব। অথচ খবরগুলি একেবারে টাটকা, ঘটনাগুলি সবই ঘটেছে মাত্র গত কাল! এত অল্প সময়ের মধ্যে এত রকম ঘটনার খবর সংগ্রহ করে খবরের কাগজের আপিসে কি করে পাঠানো হ'ল আর তারাই বা তা সাজিয়ে গুছিয়ে এক রাত্রের মধ্যে কি করে ছেপে ভোরবেলা জনসাধারণের হাতে পরিবেশন করলেন—ভাবতেও যেন কূল কিনারা পাওয়া যায় না।

এর হুবহু বিবরণ খুঁজতে গেলে সে এক সপ্তকাণ্ড রামায়ণ শোনাতে হয়। কারণ বহুলোকের সম্মিলিত চেষ্টার ধাপে ধাপে নানান্ প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে তবেই সমস্ত কাজটা হাসিল করা সম্ভব হয়েছে। একটার সঙ্গে একটার হয়তো প্রত্যক্ষ কোন সম্পর্ক নেই, কিন্তু এমন এক একটা যোগসূত্র রয়েছে যার ফলে শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা সম্ভব হয়েছে। তবে মোটামুটি আমরা তিনটে ধাপে ব্যাপারটাকে ভাগ করে নিতে পারি। প্রথম—সংবাদ সংগ্রহ, দ্বিতীয়—সংবাদ খবরের কাগজের আপিসে পাঠানো, তৃতীয়—সংবাদ সাজিয়ে গুছিয়ে কাগজে ছাপার ব্যবস্থা। প্রথম এবং শেষের ধাপটির কথা আর একদিনের জন্য রেখে আজ মাঝেরটার অর্থাৎ কি করে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় খবর পাঠানো হয় সে সম্পর্কে একটু আলোচনা করা যাক।

সাঙ্কেতিক উপায়ে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় তাড়াতাড়ি খবর পাঠাবার চেষ্টা মানুষ বহু শতাব্দী ধরে করে আসছিল। উঁচু জায়গায় উঠে নানা রকম নিশানা—ধোঁয়ার সঙ্কেত, আলোর সঙ্কেত এ সব এই বিজ্ঞানের প্রথম যুগেও মানুষ হামেশাই করেছে। সাঙ্কেতিক উপায় বলতে সশরীরে লোক না পাঠিয়ে যে সব উপায়ে খবর পাঠানো যায় তারই কথা বলছি। এর মধ্যে আলোর নিশানাটাই ছিল সবচেয়ে জোরদার—বিশেষ করে রাত্রে। কিন্তু মানুষের সমস্ত ইন্দ্রিয়েরই ক্ষমতার একটা সীমা আছে, দৃষ্টিশক্তিও তার অসীম নয়। তাই আলোর সঙ্কেত আর কতটুকু দূর পর্যন্ত যেতে পারে? হাজার হাজার মাইল নিশ্চয়ই নয়। তাই মানুষ চেষ্টা করেছে—অন্য কোনও বৈজ্ঞানিক উপায়ের সাহায্য পাওয়া যায় কিনা।

গত শতাব্দীতে যখন বিদ্যুতের শক্তি মানুষের হাতে এল তখন থেকেই ব্যাপারটার মোটামুটি একটা সুরাহা হল বলা যেতে পারে। আর এই বিদ্যুতের শক্তির সাহায্য নিয়েই মর্স সাহেব তাঁর

টেলিগ্রাফ পদ্ধতির আবিষ্কার করলেন মর্সের সেই যুগান্তকারী আবিষ্কার আজ সারা পৃথিবী গ্রহণ করেছে। টেলিগ্রাফের চাইতেও সহজ উপায়ে সংবাদ আদান প্রদান আজ সম্ভব হলেও টেলিগ্রাফের জনপ্রিয়তা কিছুমাত্র হ্রাস পায়নি—যদিও মর্সের প্রক্রিয়ার ওপর, স্বভাবতঃই, একটু অদল বদল করে তাকে যুগোপযোগী করে নেওয়া হয়েছে। টেলিপ্রিন্টার পদ্ধতিও এরই একটি।

মর্সের প্রক্রিয়াটি আগে সংক্ষেপে বলে না নিলে ব্যাপারটা বুঝতে অসুবিধা হবে। বিজ্ঞানীরা দেখেছিলেন কোন তারের ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহ চালিয়ে দিলে সেই তারের চারদিক্ ঘিরে একটা চুম্বকের আবহাওয়া—সাধু ভাষায় যাকে বলা যায় চৌম্বক ক্ষেত্র, তৈরী হয়। বিজ্ঞানের ভাষায় একে বলে "ম্যাগ্‌নেটিক ফিল্ড"। যদি একটা নরম লোহার পায়ে তারটি বেশ ভাল করে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে জড়ানো যায় তা হলে ঐ চৌম্বক শক্তি অনেক গুণ বেড়ে যায় এবং তখন সেই তারের কাছে কোন লোহার জিনিষ রাখলে চুম্বকের ধর্ম অনুযায়ী সে সেটাকে টেনে নেয়। তারে জড়ানো ঐ লোহাটাকে বলে বৈদ্যুতিক চুম্বক বা ইলেক্‌ট্রোম্যাগ্‌নেট্। বিদ্যুতের আর চুম্বকের এই গুণটি কাজে লাগিয়েই মর্সের টেলিগ্রাফের সৃষ্টি। ব্যাপারটা এই রকম: ধরা যাক্ একটি লম্বা তারের এদিক্ ওদিক্ দুই প্রান্তে দুটি যন্ত্র বসানো আছে। একটি সঙ্কেত পাঠাবার, অপরটি সঙ্কেত ধরবার। পাঠাবার, অর্থাৎ প্রেরক যন্ত্রটির সঙ্গে একটি টিপবার চাবি লাগানো আছে। চাবি টিপলেই যন্ত্রটির সঙ্গে একটি বৈদ্যুতিক ব্যাটারির পূর্ণ যোগাযোগ ঘটে, আর সঙ্গে সঙ্গে ঐ চাবির সঙ্গে লাগানো তারের ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহ চলতে থাকে। এখন, ঐ চাবিটির সঙ্গে লাগানো থাকে একটা ইলেক্‌ট্রোম্যাগনেট্। যখন বিদ্যুৎপ্রবাহ চলতে থাকে তখনই ওটা চুম্বকের শক্তি পায়। ঐ ইলেক্‌ট্রোম্যাগনেটের কাছেই আবার রাখা হয় স্প্রিং দিয়ে মোড়া একটা লোহার পাত। সুতরাং চাবি টিপলেই সেই লোহার পাতটা ইলেক্‌ট্রোম্যাগনেটের চুম্বক-শক্তির টানে সজোরে গিয়ে লাগে চুম্বকের সঙ্গে লাগানো আর একটা পাতে আর সঙ্গে সঙ্গে ক্লিক্ করে একটা শব্দ হয়। চাবি টেপা ছেড়ে দিলেই বিদ্যুতের ব্যাটারীর সঙ্গে তার যোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তারের ভিতর দিয়ে আর বিদ্যুৎপ্রবাহ যায় না, ইলেক্‌ট্রোম্যাগনেটটাও তখন তার চুম্বক-শক্তি হারিয়ে ফেলে। ফলে স্প্রিংএ লাগানো লোহার পাতটাকে আর সেটা টেনে রাখতে পারে না, স্প্রিংএর টানে তা সজোরে ফিরে যায় স্বস্থানে। এখন, তারের অপর দিকে, অর্থাৎ সঙ্কেত ধরবার গ্রাহক যন্ত্রেও অবিকল ঐ রকম ব্যবস্থা থাকে! এদিক্ থেকে চাবি টিপলেই বিদ্যুৎপ্রবাহ চলে যায় তারের অপর দিকে এবং গ্রাহক যন্ত্রের ইলেক্‌ট্রোম্যাগনেটও সঙ্গে সঙ্গে চুম্বক-শক্তি পেয়ে ওদিককার লোহার পাতকে টেনে ধরে। সুতরাং তারের এদিকে যদি ক্লিক্ করে একটা শব্দ হয়, তারের অপর দিকেও ঠিক সেই রকম আর একটি ক্লিক্ শব্দ হবে। চাবি ছেড়ে দিলেই গ্রাহক যন্ত্রের দিককার ইলেক্‌ট্রোম্যাগনেটও এদিককার ইলেক্‌ট্রোম্যাগনেটের মত তার চুম্বক-শক্তি হারিয়ে ফেলবে, সেদিককার লোহার পাতও স্প্রিংএর টানে স্বস্থানে ফিরে যাবে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, মর্সের আবিষ্কৃত এই প্রক্রিয়ার দু'টি বহু দূরবর্তী জায়গা যদি তার দিয়ে সংযুক্ত থাকে তবে চাবি টিপলে তারের এদিকে যেমন ক্লিক্ শব্দ হবে অপর দিকেও ঠিক তেমনি ক্লিক্ শব্দ হবে। এই হচ্ছে টেলিগ্রাফের মূল তত্ত্ব। মর্স তাঁর প্রথম যন্ত্রে লোহার পাতটার সঙ্গে একটা কলমের মত কাঁটা এঁটে দিয়েছিলেন। উদ্দেশ্য, পাতটা যেই একবার শব্দ করবে অর্থাৎ চুম্বকের টানে আকৃষ্ট হবে, অমনি কলমও একটা ফিতের গায়ে একটা আঁচড় টানবে। যেই সেটা সরে যাবে,

আঁচড় কাটাও বন্ধ হবে। যদি চাবি একটু বেশীক্ষণ টিপে রাখা যায় তা হলে আঁচড়টা লম্বা 'ড্যাশ' চিহ্নের (—) মত দেখাবে। যদি ধরেই ছেড়ে দেওয়া যায় তবে তা দেখাবে একটা 'ডট' বা বিন্দু (•) চিহ্নের মত। এই ড্যাশ আর ডট্ দিয়ে সমস্ত বর্ণমালায় একটা সাঙ্কেতিক প্রতিরূপ দেওয়া যেতে পারে এবং তাই দিলেন তিনি। যেমন ধরা যাক্, একটা ডট্ দিয়ে তার পর একটা ড্যাশ দিলে তা হল A। একটা ড্যাশ দিয়ে তিনটে ডট্ দিলে সেটা হ'ল B। তিনটে ডট্ হ'ল C, ইত্যাদি। এইভাবে ডট্ আর ড্যাশ দিয়ে সমস্ত বর্ণমালার সাঙ্কেতিক চিহ্ন তৈরী করা হ'ল এবং তারের ভিতর দিয়ে পাঠাবার সঙ্কেত অনুযায়ী ডট্ আর ড্যাশের সংখ্যা দেখে কি সঙ্কেত পাঠানো হচ্ছে তা বলে দেওয়া সম্ভব হ'ল। পরে অবশ্য টেলিগ্রাফের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কলমের সাহায্য নেওয়ার আর দরকার রইল না। অভ্যস্ত অপারেটার শব্দ কানে শুনেই বলে দিতে শিখল কোন্‌টা ডট্ আর কোন্‌টা ড্যাশ হবে। এই টারে টক্কা শব্দ শুনে সঙ্কেত ধরবার ব্যবস্থা হলেও ডট্ আর ড্যাশ বলতে মর্স যা বোঝাতে চেয়েছিলেন তা কিন্তু রয়েই গেল, কাজেই ডট্ আর ড্যাশ কথা দু'টোও লোপ পেল না। মর্সের এই সাঙ্কেতিক লিপি বা "কোড্" অবশ্য পরে কিছু অদল-বদল করে আর একটা সাঙ্কেতিক লিপি করা হয়েছে—যাকে বলা হয় "কন্টিনেন্টাল কোড্"। পৃথিবীর বেশীর ভাগ দেশেই আজকাল এই শেষোক্ত কোড্‌টি ব্যবহার করা হয়, যদিও ২।১ জায়গায় মর্সের কোড্‌ও চালু আছে। দু'টি কোডেরই একটু নমুনা এখানে দেওয়া হ'ল।

কিন্তু যাই বলুন, হাতে টিপে আর কানে শুনে কাজ খুব তাড়াতাড়ি এগোতে পারেনা। এ ভাবে অপারেটার বড় জোর মিনিটে গোটা তিরিশেক শব্দ ধরে লিখে নিতে পারে। তা ছাড়া মানুষের কান, ভুলচুক হওয়াও বিচিত্র নয়। টেলিগ্রাফে ভুলচুক আমাদের চোখে অনেক সময়েই পড়ে,—কারণ এখনও বহু ছোট খাট জায়গায় এই রকম হাতে টিপে এবং কানে শুনে টেলিগ্রাফ পাঠানো এবং ধরার ব্যবস্থা চালু আছে। কিন্তু যেখানে কাজ খুব বেশী—অনবরত সংবাদ আসছে যাচ্ছে,—সেখানে এ রকম সাবেকি নিয়ম চালালে কাজের খুবই অসুবিধা হয়। সেই জন্যই আজকাল ঐ সব জায়গায় হাতে কাজ না করে প্রায় সমস্তটাই স্বয়ং ক্রিয় যন্ত্রে করা হচ্ছে—যাতে কাজ তাড়াতাড়ি হয় এবং নির্ভুল ভাবে হয়। এই স্বয়ং ক্রিয় যন্ত্রের একটিই হচ্ছে টেলিপ্রিন্টার।

টেলিপ্রিন্টার প্রক্রিয়ায় যে সংবাদ পাঠাবে তাকে দেওয়া হয় একটা টাইপ রাইটারের মত যন্ত্র। এটা কিন্তু সাধারণ টাইপ রাইটার নয়। এর ভিতরে ভরা থাকে একটা লম্বা কাগজের ফিতে। টাইপ রাইটারে চাবি টিপলে ঐ ফিতের গায়ে টেলিগ্রাফের কোড্ অনুযায়ী কতকগুলো ফুটো হয়ে যায়। সমস্ত সঙ্কেত অর্থাৎ সংবাদটা তখন ঐ কাগজের ফিতের গায়ে আসে কতকগুলো ছিদ্রের আকারে। বলা বাহুল্য এক এক রকম ছিদ্রের সমষ্টি এক এক রকম বর্ণের বা অক্ষরের প্রতীক।

এর পর সেই সছিদ্র কাগজের ফিতেটা আর একটা যন্ত্রের ভিতর চালিয়ে দেওয়া হয়। অনেক সময় আপনা আপনিই সোজা চলে আসে টাইপরাইটার থেকে এই যন্ত্রে। এই যন্ত্রটিই হচ্ছে প্রেরক যন্ত্র বা ট্রান্সমিটিং মেশিন,—সংক্ষেপে ট্রান্সমিটার। এর মধ্যে থাকে ছোট ছোট কতকগুলি পিন। পিনগুলো আছে কাগজের ফিতের ওপর চাপ দিতে থাকে। যেখানে যেখানে ছিদ্র থাকে সেখান দিয়ে পিন গলে যায় আর ছোট ছোট বৈদ্যুতিক বোতাম বা সুইচ্‌কে টিপে ধরে। এরই ফলে সেই চাপ অনুযায়ী বিদ্যুতের ধাক্কা এসে তারের ভিতর দিয়ে চলে যায় বহুদূরের গ্রাহক যন্ত্রে,—

যার ইংরেজী নাম রিসিভিং মেশিন বা সংক্ষেপে রিসিভার। এই রিসিভারের সঙ্গেই আবার যুক্ত থাকে একটি স্বয়ং ক্রিয় টাইপ রাইটার, যেটি হচ্ছে আসল টেলিপ্রিন্টার। রিসিভার যন্ত্রে ট্রান্সমিটার থেকে পাঠানো বিদ্যুতের ধাক্কা অনুযায়ী সাঙ্কেতিক লিপি এসে হাজির হয়—ঠিক যে ভাবে তা পাঠানো হয়েছিল সেইভাবে। ধরণটা যাই হোক না কেন, প্রক্রিয়াটা কিন্তু সেই মর্সের যন্ত্রের মত। রিসিভার থেকে তা সটান চলে আসে টেলিপ্রিন্টারে যন্ত্রে। কিন্তু—এবারে তা থেকে—যখন কাগজের ফিতে বেরিয়ে আসে তখন আর তা আগের মত কতকগুলো ছিদ্রের চেহারা নিয়ে আসে না। আসে একেবারে সোজা অক্ষরের রূপ নিয়ে—বড় হাতের অক্ষর। টেলিপ্রিন্টারের ভিতরই এই কাগজের ফিতে ভরা থাকে। অর্থাৎ ওখানে প্রেরক যন্ত্রে যা টাইপ করা হয়েছিল তাই ফুটে ওঠে টেলিপ্রিন্টারের ফিতের গায়ে একেবারে সোজাসুজি অক্ষরে রূপান্তরিত হয়ে। কৌশলটি অবশ্য এখানে অল্প কথায় বোঝানো সম্ভব নয়। যাই হোক, সেই ফিতে কেটে নিয়ে কাগজে সেঁটে দিলেই কার্যোদ্ধার হয়ে গেল।

এই হচ্ছে সংক্ষেপে এ যুগের সংবাদ প্রেরণের কৌশল। সত্যি, অদ্ভুত বিস্ময়কর যন্ত্র এই টেলিপ্রিন্টার। খবর কাগজওয়ালাদের এত বড় বন্ধু আর নেই।

এখানে একটা কথা বলা দরকার। টেলিগ্রাফ অফিসে একই সঙ্গে হাজার হাজার সংবাদ আসছে নানা দিক্ থেকে। একই তারের ভিতর দিয়ে তাকে পাঠাতে হবে। যদি একটা একটা করে পাঠাতে হয় তাহ'লে হয়তো তা কোন দিনই শেষ করা যাবে না। তাই একই তারের ভিতর দিয়ে একই সঙ্গে বিভিন্ন খবর পাঠাবার ব্যবস্থা হয়েছে। এ কাজটা একাধিক ভাবে করা যেতে পারে, তবে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই যে পদ্ধতিটি ব্যবহার করা হয় তাকে বিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় ফ্রিকোয়েন্সি ডিভিশন্ মাল্টিপ্লেক্স, এ ব্যাপারটা ও একটু জটিল তবে মোটামুটি ভাবে বলা যায় বিভিন্ন সঙ্কেতের বেলায় বিভিন্ন মাত্রার বৈদ্যুতিক তরঙ্গ ব্যবহার করে এ কাজটা হাসিল করতে হয়।

* * * *

এক বিরাট ভোজসভা চলেছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংলণ্ডে অভিজাত সমাজের প্রতিনিধিগণ সমবেত হয়েছেন। কেবলমাত্র পানাহারই তাঁদের মুখ্য উদ্দেশ্য নয়, আর একটি লক্ষ্য, একটি গোপন বাসনা তাঁদের আছে, সেটি হচ্ছে—ওই যে কোণের দিকে এক ভদ্রলোক বসে আছেন তাঁর কাছ থেকে কখোপকথন উপলক্ষ্যে কিছু শোনা। নিশ্চয় উনি নানাপ্রসঙ্গে মুখর হয়ে উঠবেন। কারণ এত বিশিষ্ট ব্যক্তিবৃন্দের সমাবেশে কথা বলার সুযোগ বড় দুর্লভ। সময় বয়ে যাচ্ছে। অনেকেই অধীর অস্থির হয়ে উঠলেন। কই, উনি তো কিছু বলছেন না। এত বড় সুযোগ হেলায় হারাচ্ছেন! অনেকে অবাক হয়ে তাকালেন ভদ্রলোকটির দিকে। কোনদিকে লক্ষ্য নেই তাঁর। নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দিয়েছেন তাঁর বোবা ছেলেটীর কাছে। হাতের নানা মুদ্রার সাহায্যে নীরবে তার বিনিময় করে যাচ্ছেন।

একজন অতিথি বলে উঠলেন, ইউরোপের শ্রেষ্ঠ বক্তার সঙ্গে আহারে মিলিত হয়ে তাকে কেবলমাত্র আঙুলের সাহায্যে কথা বলতে দেখা একটা বিস্ময়ের ব্যাপার। একটি ছোট ছেলের মনোবেদনার কথা ভেবে বিশ্বের অন্যতম সেরা তার্কিক চার্লস জেমস ফক্স সেদিন নিজেকে এমনি করেই সংযত রেখেছিলেন।

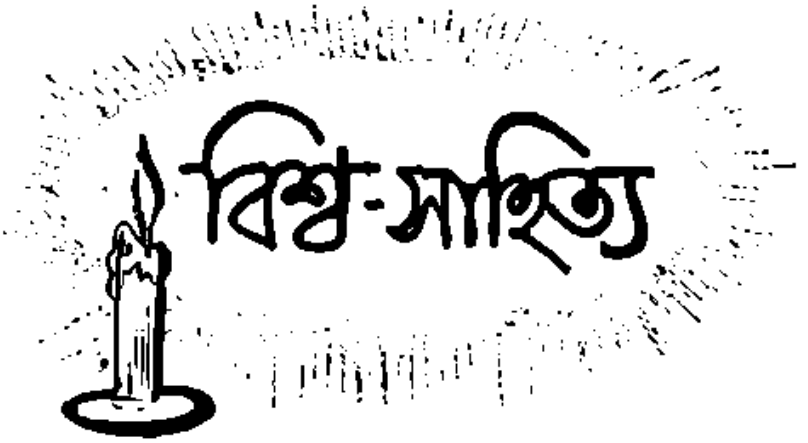

আর্থার সি. ক্লার্ক

গৌরীশংকর দে

সাহিত্যের অপেক্ষাকৃত আধুনিক একটি শাখা বিজ্ঞান-ভিত্তিক গল্প। বেশ কিছুদিন আগেই ভূমিষ্ঠ হ'য়ে এই ধারাটি পশ্চিমে পরিণত অবস্থায়ই পৌঁছেছে এবং প্রচণ্ড জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। একজন বিদেশী সাহিত্যিক এই জনপ্রিয়তার কারণ স্পষ্ট ভাষায় ব্যাখ্যা করেছেন: "বিজ্ঞান-ভিত্তিক গল্প বৈজ্ঞানিক-পাঠকদেরই জন্য নয়, যেমন ভূতের গল্প লেখা হয় না ভূতদের পড়বার জন্য। নেরী ওলস্টোন, জুল ভর্ণ, ওয়েল্স, কোনান ডয়েল, জর্জ অরওয়েল, এলডুস হাক্সলী, ইয়েফ্রেমভ, অবরুচভ প্রভৃতি প্রখ্যাত সাহিত্যিকদের হাতে প'ড়ে বিজ্ঞান-ভিত্তিক গল্প পাঠকের মুক্ত স্বীকৃতি অর্জন করেছে।

বিজ্ঞান-ভিত্তিক কাহিনীর নিজস্ব বক্তব্য রয়েছে। বাস্তব পৃথিবীকে অস্বীকার ক'রে পলাতক মনের মরুস্থান রচনা কিংবা শুধু লোমহর্ষক ঘটনা সৃষ্টি ক'রে পাঠকের মনে শিহরণ জাগানো এই কাহিনীর অভিপ্রায় নয়। আসলে সাহিত্যের এই বিভাগটির মধ্য দিয়েও আমরা চিনে নিই নিজেদের, খুঁজে পাই আমাদেরই চেনা-জানা বর্তমান আর আগামীকাল। অতলস্পর্শী মানবিক বিষয়, প্রখর কৌতূহল, সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রচ্ছন্ন সমালোচনা, সমসাময়িক পৃথিবী ইত্যাদি সবই অন্তর্ভুক্ত হতে পারে বিজ্ঞান-ভিত্তিক কল্প-কথার।

বিজ্ঞান-ভিত্তিক কাহিনী লিখে একেবারে যাঁরা জনপ্রিয় হয়েছেন তাঁদের একজন হলেন আর্থার. সি. ক্লার্ক। গত বছরের সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান-নির্ভর কাহিনীর লেখক হিসেবে কলিঙ্গ পুরস্কার পেয়েছেন তিনি। আর্থার সি. ক্লার্ক একাধারে বিজ্ঞানী, অধ্যাপক, ঔপন্যাসিক এবং আবিষ্কারক। বিজ্ঞান তাঁর এতখানি দখলে যে কোনো বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের ভুল ধরিয়ে দে'বার ক্ষমতা তিনি রাখেন। আবার তিনি যে একজন অসাধারণ সাহিত্যিক তাঁর রচনা পড়লেই সে—কথা নিশ্চিতভাবে জানা যায়। একই মানুষের মধ্যে বিজ্ঞানী আর সাহিত্যিকের এই সংমিশ্রণ সত্যি আমাদের অবাক ক'রে দেয়। তাঁর বয়েস এখনো চল্লিশের নিচে। অথচ এরি মধ্যে তিনি গল্প আর প্রবন্ধের বই লিখে একজন প্রথম শ্রেণীর বিজ্ঞানী আর সাহিত্যিক হিসেবে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। 'হরিজন' নামে একটি সাময়িকী তাঁকে বলেছে "বিজ্ঞান-ভিত্তিক সাহিত্যের বিকাশ।" 'দি এক্সপ্লোরেশন অব স্পেস' নামে যে সুখ-পাঠ্য

প্রবন্ধের বইটি লিখেছিলেন তার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা বেরিয়েছিল 'দি অ্যাটলান্টিক মান্থলী' সাময়িক পত্রে। আগামী কালের মানুষের চেহারা কী হবে এই নিয়ে লেখা তাঁর 'চাইল্ড হুডস্ এণ্ড' উপন্যাস প্রসঙ্গে 'দি নিউইয়র্ক' মন্তব্য ক'রেছিল যে আজকের সমস্যা সংকুল দুনিয়ার প্রতিটি চিন্তাশীল নাগরিকের উচিত এই বইখানি প'ড়ে দেখা।

আর্থার সি. ক্লার্ক প্রথমে ব্রিটিশ ইন্টারপ্ল্যানেটরি সোসাইটির সভাপতি ও পরে রয়্যাল অ্যাস্ট্রনমিক্যাল সোসাইটির সদস্য নির্বাচিত হন। তীব্র কল্পনা-শক্তির সঙ্গে বিজ্ঞানের পুঙ্খনা তাঁর রচনায় যুক্ত হ'য়েছে বলে তা হয়ে উঠেছে বিশিষ্ট, আমাদের কালের সঙ্গে সম্পৃক্ত।

আর্থার ক্লার্ক বিজ্ঞানের প্রতি আকৃষ্ট বোধ করেছিলেন একেবারে ছেলেবেলা থেকেই। তিনি নিজেই বলেছেন: "আমার বয়েস তখন দশ বছরেরও কম। কার্ডবোর্ডের টিউব আর কতগুলো লেন্স দিয়ে বানিয়েছিলুম একটা টেলিস্কোপ; অনেক রাত কাটিয়েছি তখন চাঁদের পিঠের আঁকিবুকি দেখে··"

বিজ্ঞান-ভিত্তিক গল্পের ভূত তাঁর ঘাড়ে চেপে বসে চোদ্দ বছর বয়সে। "অ্যামেজিং স্টোরিজ' আর 'অ্যাস্টাউণ্ডিং' নামে দুটো কাগজের প্রতিটি সংখ্যা কিনে গোগ্রাসে গিলতে শুরু করেন। 'ওয়াণ্ডার স্টোরিজ' নামে আরেকটি কাগজের অনেকগুলি সংখ্যা সংগ্রহ ক'রে আনতে আটখানা হয়ে গিয়েছিলেন। এই সময় থেকেই তিনি ধীরে ধীরে পরিচিত হন জুল ভর্ণ, কোনান ডয়েল, হর্ড ডানসেনি, এডগার হাম্বলি, হর্ড অয়েলস প্রভৃতি বিখ্যাত সাহিত্যিকদের রচনার সঙ্গে। তাঁর চোখের সামনে যেন তখন একসঙ্গে উন্মোচিত হয়েছিল অসংখ্য সোনার দুয়ার।

আর্থার ক্লার্ক লিখতে শুরু করেন, যখন তাঁর বয়েস পনেরো। স্কুল ম্যাগাজিনেই লেখার হাতে-খড়ি। দু এক বছর পরে তিনি এর সহ-সম্পাদকও হয়েছিলেন।

লণ্ডনে গিয়ে বেশ কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হলেন সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায়। ইংরেজী 'সায়েন্স ফিকশনে'র জগতের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ট পরিচয় এখানেই। ব্রিটিশ ইন্টারপ্ল্যানেটরি সোসাইটি তখন সবে মাত্র গড়ে উঠছে। ক্লার্ক এর কোষাধ্যক্ষ হলেন; পরে সভাপতিও। লিখলেন অজস্র বিজ্ঞান-ভিত্তিক গল্প। তাঁর প্রথম প্রবন্ধ বেরুলো মহাকাশ যাত্রা সম্পর্কে।

যুদ্ধ এসে সব ওলট-পালট ক'রে দিল। ক্লার্ক যোগ দিলেন বিমান বাহিনীতে। এই সময়কার অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে গেলেন সত্যিকারের বৈজ্ঞানিক মন। যুদ্ধের স্মৃতি ঘুরে ঘুরে নানা ভাবে এসেছে তাঁর বহু গল্প উপন্যাসে। এর পরে বৃত্তি পেয়ে ভর্তি হলেন লণ্ডনের কিংস কলেজে। প্রথম শ্রেণীর অনার্স নিয়ে উত্তীর্ণ হলেন বি. এস. সি. পরীক্ষায়। পদার্থ বিদ্যা এবং বিশুদ্ধ আর ফলিত গণিত নিয়েছিলেন পাঠ্য বিষয় হিসেবে।

ইতিমধ্যে আমেরিকার 'সায়েন্স-ফিকশন'-এর পত্রিকাগুলিতে গল্প লিখে তিনি বেশ দু পয়সা রোজগার করতেও শুরু করেছেন। সাহিত্যের দিকে ঝুঁকে পড়লেন ক্লার্ক।

১৯৫০ সালে প্রকাশিত হল তাঁর প্রথম বই 'ইন্টারপ্ল্যানেটরি ফ্লাইট'। বইটির এমন কাটতি হল যে অনুরোধে প'ড়ে তাঁকে লিখতে হল 'দি এক্সপ্লোরেশন অব স্পেস।' তারপর থেকে তিনি একটানা লিখেই চলেছেন। তবে বিজ্ঞান-ভিত্তিক গল্প লিখেই সব চেয়ে বেশি আনন্দ পান আর্থার সি. ক্লার্ক।

একটানা লিখে চললেও ক্লার্কের বইয়ের সংখ্যা কিন্তু খুব বেশি নয়। যে বইগুলি লিখে তিনি খ্যাতিমান হয়েছেন তাদের নাম: (১) ইন্টারপ্ল্যানেটরি ফ্লাইট; (২) দি এক্সপ্লোরেশন অব স্পেস; (৩) সাণ্ডস অব মার্স; (৪) আইল্যাণ্ডস ইন দি স্কাই; (৫) এগেন্স্ট দি ফল অব নাইট; (৬) চাইল্ডহুডস্ এণ্ড; (৭) এক্সপিডিশন টু আর্থ। জন উইণ্ডহাম, রে ব্র্যাডবুরি, ক্লেড হ্যাল, এরিক ফ্রাংক রাসেল, আইজাক আসিমভ, থিয়োডর স্টার্জিয়ন, ইভান ইয়েফ্রেমভ প্রভৃতি যাঁরা বিজ্ঞান-ভিত্তিক গল্প লিখে হালে খ্যাতি অর্জন করেছেন আর্থার ক্লার্ক তাঁদের শুধু একজন নন, একজন বিশিষ্ট লেখক। আজকের বিজ্ঞান-ভিত্তিক গল্পের লেখকদের কথা বলতে হলে তাঁর নাম করতেই হবে।

কয়েকটি ওকগাছ

মূল: ইভান বুনিন

অনুবাদ: নক্ষত্র রায়

[লেখক পরিচয়:—ইভান বুনিনের জন্ম ১৮৭০ সালে রাশিয়ায়। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত চেষ্টা করেছেন টলষ্টয়-টুর্গেনিভ প্রমুখ সাহিত্যিকদের এই সুরোপীয় কথার ঐতিহ্যের প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে। সেই মহৎ পূর্ব-সুরীদের মতো তিনিও আসলে পৃথিবীর সব দেশের মানবিক। মানুষের যে জটিল মন মানবিক জীবনের বাঁধা বৃত্তকে প্রতিমুহূর্তেই অতিক্রম ক'রে যেতে চায়, কোনো-কোনো মুহূর্তে ভেঙে চুরমার ক'রে দেয় সব নিয়ম, বিধি, আনুষ্ঠানিকতা, মনের সেই জটিল প্রক্রিয়া বুনিনেরও গল্প-উপন্যাসের কেন্দ্র-বিন্দু। রাশিয়ার কৃষক জীবনের বিশ্বস্ত চিত্র তুলে ধরার জন্য তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন গোর্কি। কিন্তু সামাজিক সমস্যা উত্থাপনের মধ্যে বুনিনের কৃতিত্ব নিহিত নয়। তাঁর লেখায় টলষ্টয়ের বিকল্প স্থাপত্যও অনুপস্থিত। পৃথিবীর সাহিত্যে ইভান বুনিনের স্থায়ী আসন তাঁর কাব্যপ্রতিম চমৎকার গদ্য আর ছোট গল্প রচনায় তাঁর অসাধারণ দক্ষতার জন্য। তাঁর প্রতিটি গল্পের খুঁটিনাটি অত্যন্ত বাস্তব। অথচ বর্ণনা করতে গিয়ে কখনো তিনি অসংযত হয়ে পড়েননি। ১৯১৭ সালে রুশ-বিপ্লবের পরে দেশ ত্যাগ করে চলে যান ফ্রান্সে। কিন্তু তা ব'লে লেখা খামানমি কখনো সাধারণ নর-নারীর কামনা-বাসনা আর সমস্যা তাঁর গল্পে অত্যন্ত সজীব আর বলিষ্ঠ রূপে উপস্থিত। তাঁর গল্প শুরু করা মাত্রই পাঠক নিজের অজান্তে ঢুকে পড়েন সরাসরি গল্পের পরিবেশ আর চরিত্রের মাঝখানে।]

তখন আমার বয়েস মাত্র বাইশ। অনেক দিন আগের কথা। প্রথম নিকোলাস রাশিয়ার সম্রাট। সবে মাত্র রক্ষীবাহিনীর হাবিলদার হয়েছি। সেই বছরটির কথা চিরকাল মনে থাকবে। রিয়াজান-এর কাছে পৈতৃক সম্পত্তি তালারক করার জন্য আমার দু সপ্তাহের ছুটি মঞ্জুর হয়েছিল। বাবা মারা যাওয়ার পর মা সেখানে একা থাকতেন। ওখানে গিয়েই ভালোবেসে ফেলুম একটি মেয়েকে। পেট্রোভস্কী গ্রামের ধারে ঠাকুরদার যে জমি-জমা অযত্নে পড়েছিলো নানা ছুতায় তা দেখার জন্য বেশ কয়েকবারই সেখানে গিয়েছি। রাশিয়ার গ্রাম অঞ্চল চিরকালই একটু বনাকীর্ণ। আমাদের গ্রাম এর ব্যতিক্রম ছিল না। গ্রামের শেষ প্রান্তে ছিলো একটা ওক বন। ওক গাছগুলো যেমন বিরাট তেমনি পুরোনো। গাছগুলির তলায় একটা শ্রীহীন কুঁড়ে ঘর, বাগান ঘেঁসে। বাগানের গাছগুলি কেটে ফেলা হয়েছিল। এখন তার মাটি ঢাকা পড়েছিলো বরফে। কিছু দূরেই ম্যানর-হাউসের ধ্বংসাবশেষ; দেখা যাচ্ছে তার পুড়ে-কাটা অন্ধকার জানালাগুলি ওকগাছের তলার এই কুঁড়ে ঘরেই আমি প্রত্যেকদিন এসে বসতুম। কুঁড়ে ঘরটির মালিক আমাদের গ্রামের চৌকিদার। কৃষি সম্পর্কিত নানা বিষয়ে তার সঙ্গে অনর্গল বকে যেতুম। তাকে বন্ধু হিসেবেও পেতে চেয়েছিলুম।

কিন্তু গোপনে আমি তার স্ত্রী আনফিসার দিকে কামনার চোখে তাকাতুম। তাকে স্নেহময়ীর বয়সী বলে আমার মনে হতো। তার বয়েস ছিলো চৌকিদারের বয়সের অর্ধেক। চৌকিদারের দেহ বেশ শক্ত সমর্থ। পোড়া ইটের মতো লাল মুখ। একদল ছন্নছাড়া চোরের দলের নেতা হ'লে তাকে বেশ ভালোই মানাতো। সকাল বেলা তাদের কাছে যা-ই পেতুম পাঁড়ে সেলতুম। আর কিছুক্ষণ কাটিয়ে দিতুম পিয়ানোর ওপর আঙুল চালিয়ে আর গুণগুণ গান ক'রে।

একদিন দুপুরের খাওয়া দাওয়ার পর রওয়ানা হলুম গুক বনের দিকে। খানিকক্ষণ কাটাব বলে। সারাটিভ স্তেপ থেকে যে ঝড়—যাতাস অনবরত আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে সে দিকে থাকতনা লক্ষ্য।

আস্তে আস্তে বড়দিনের ছুটি কেটে গেল, ঘনিয়ে এল কাজে ফিরে যাওয়ার দিন।

একদিন আনফিসাকে বললুম আমি দু একদিনের মধ্যেই চলে যাচ্ছি।

চৌকিদার মন্তব্য করল সব কিছুর আগে সম্রাটের কাজ করতে হবে বৈকি। এই বলে কী আনার জন্ত চলে গেল কুটীরের ভেতরে। আনফিসা কোলের ওপর সেলাইয়ের জিনিষ পত্র নিয়ে বসেছিল। তাকিয়ে দেখল স্বামীর চলে—যাওয়া। যে মুহূর্ত স্বামী দরজা বন্ধ ক'রে ভেতরে ঢুকে গেল সে আমার দিকে কামনাতুর চোখে তাকিয়ে ফিসফিস ক'রে বলল :

"আগামী কাল রাতে তুমি শহরে থাকবেন। চলে যাওয়ার আগে অন্তত একটি সন্ধ্যা আপনি আমার সঙ্গে কাটিয়ে যান। এতদিন মনের কথা মনেই রেখেছি; কিন্তু আজ আর না ব'লে পারছিনা। আপনি চলে গেলে আমার জীবন খারাপ লাগবে।"

তার এই স্পষ্ট স্বীকৃতিতে অভিভূত হ'য়ে পড়লুম। কোনো কথা বলা হল না, কেবল মাথা নেড়ে সম্মতি জানাতে পারলুম। চৌকিদার আবার ফিরে এসেছিল।

সেই মুহূর্ত থেকেই শুরু হল আমার অপেক্ষা; আমি অধীর হয়ে উঠলুম। আগামী সন্ধ্যা পর্যন্ত কেমন ক'রে সময় কাটাবো জানি না। শুধু একটা কথাই ভাবছিলুম; জীবনে উন্নতির আর কোনো প্রয়োজন আমার নেই। রক্ষীবাহিনীর কাজ ছেড়ে দিয়ে এই গ্রামেই জীবনের বাকী দিনগুলি কাটিয়ে দেবো। যে মুহূর্তে চৌকিদার মারা যাবে আমার ভাগ্য মিলিয়ে নেবো আনফিসার ভাগ্যের সঙ্গে! চৌকিদারটি তো এর মধ্যেই বুড়ো হ'য়ে উঠেছে। তখন কিন্তু একবারও ভাবছিলুম না যে তার বয়স মাত্র পঞ্চাশ। ভাবছিলুম তার তাড়াতাড়ি মারা যাওয়া উচিত! শেষ পর্যন্ত রাত শেষ হল। ভোর পর্যন্ত কাটিয়ে দিলুম ঘুমপান ক'রে, রামপান করে। উদ্ভট কল্পনা ক'রে ক'রে এমনিতেই উত্তেজিত ছিলুম। শীতের ছোটো দিন শেষ হয়ে আবার নেমে এল অন্ধকার। বাইরে শোনা যাচ্ছে ঝড়ের ভয়ংকর হাঁক ডাক। বাড়ি থেকে যে বেরুবো মাকে কী বলে যাবো? কোনো উপায় খুঁজে পাচ্ছিলুম না। হঠাৎ একটা সাধারণ বুদ্ধি মাথায় এল: "আমি গোপনে বাড়ি থেকে বেরুবো। এ ছাড়া আর গতি নেই।"

মাকে বললুম শরীর খারাপ করেছে। রাতে আর খাবো না। শোবা ঘরে পড়লুম বিছানায়। কিন্তু যেই মাত্র মা খাওয়া-দাওয়া সেরে নিজের ঘরে চলে গেলেন বিদ্যুৎগতিতে পোষাক প'রে নিলুম। তখন শীতের রাত্রির প্রথম প্রহর। সহিসদের ঘরের দিকে ছুটে গিয়ে তাদের বললুম স্লেজগাড়ি সাজাতে।

বাইরে তখন প্রচণ্ড তুষারের ঝড়। এক ইঞ্চি সামনেও কিছু দেখার জো নেই। কিন্তু

ঘোড়া ঠিক মতোই রাস্তা চিনে যাচ্ছে। রাশ একটু আলগা ক'রে দিলুম; আধঘণ্টার মধ্যেই হাজির হলুম বাতাসে আন্দোলিত ওকবনের সামনে। কুঁড়ে ঘরটি অন্ধকারে ঢাকা প'ড়ে গেছে। সেই অন্ধকারের ভেতর থেকে দেখা যাচ্ছে আরো কালো-কালো ওক গাছগুলি। তুষারের ভেতর দিয়ে চোখে পড়ছে কুড়ে ঘরটির জানালার আলো। একটা ওক গাছের সঙ্গে ঘোড়াটাকে বেঁধে রাখলুম, ঘোড়াটাকে ঢেকে দিলুম কম্বলে তারপর দেহ সঞ্চিত হারিয়ে সেই তুষার-বৃষ্টির মধ্য দিয়ে চললুম অন্ধকার বারান্দার দিকে! দরজায় হোঁচট খেয়ে কোনোরকমে চৌকাঠ ডিঙিয়ে ভেতরে ঢুকলুম। আর সেখানেই মেয়েটি বসে আছে একটা বেঞ্চির ওপর। পোষাক পরিচ্ছদে সেজে, পাউডার মেখে। কাছেই কাঠ পুড়ছে। সেই আগুনের শিখা থেকে ছোটো ছোটো কোটার মতো লাল ছায়া এসে পড়েছে তার মুখে। তার হাতের কাছেই একটা টেবিল, সাদা চাদরে ঢাকা। সে সারাক্ষণ তাকিয়ে আছে আমারই পথের দিকে। সেই ধোঁয়া আর আলোতে মনে হল সব কিছু স্তিমিত হ'য়ে পড়েছে, কাঁপছে; তবু সেই অস্পষ্টতার মধ্যেও দেখা যাচ্ছে তার চোখ দুটি। বড়ো বড়ো, মর্মভেদী! বাসনটা একটা জল পাত্রের ওপরকার দণ্ডের ওপর দাঁড় করানো। মাঝে মাঝে তা থেকে চড়চড় শব্দ হচ্ছে। তপ্ত ফুলিঙ্গ ওপরের দিকে উঠে হিস শব্দ ক'রে জলের ভেতর পড়ছে। টেবিলের ওপর রাখার আর হাতে-গড়া বিস্কুটের থালা, বাড়িতে তৈরী, মদের একটা বোতল আর দুটো গ্লাস। সে বসে আছে টেবিলের ধারে, তুষারে ঢাকা সাদা জানালার দিকে পেছন ফিরে। তার পরনে ঘোলাটে রেশমের সায়াকোন আর ঢিলে হাতা ক্যালিকো ব্লাউজ; গলায় প্রবালের মালা। তার সাদা কালো চুল শহরের যে কোনো সুন্দরীকেও লজ্জা দিতে পারে। মাঝখানে সিঁথে রেখে চুল পরিপাটি ক'রে বাঁধা। কানে কণোর ইয়ারিং। আমাকে দেখেই সে লাফ দিয়ে দাঁড়াল, এক পলকের মধ্যে খুলে দিল আমার তুষারে ঢাকা টুপি, ছোটো পশমী কোট তারপর তেমনি উত্তেজিত অবস্থায় হাত ধরে আমাকে বসিয়ে দিল বেঞ্চিতে। এর আগে তাকে মনে হতো সংযত, ধরা ছোঁয়ার একেবারে বাইরে। কিন্তু আমার আগেকার সেই ধারণা ধূলিসাৎ ক'রে দিয়ে সে আমার সামনে মাটিতে নতজানু হয়ে বসে, জড়িয়ে ধরে তার তপ্ত গাল দুটি চেপে ধরল আমার গালের সঙ্গে।

"যাবার—সময় ঘনিয়ে আসার আগে এই দর এমন ক'রে গোপন ক'রে রেখেছিলে কেন?" শুধালেম।

তার আবেগ-তপ্ত উত্তর এলো:

"কী করতে পারতুম! এখানে আসার সঙ্গে সঙ্গেই তুমি আমার মন জয় করে নিয়েছিলে। আমি জানতুম তুমি কী জন্য কষ্ট পাচ্ছো! তবু আমি মনকে শক্ত ক'রে রেখেছিলুম, এক মুহূর্তের জন্যই মনের ভাব প্রকাশ হতে দিইনি! তাছাড়া মনের কথা জানালেও যে তুমি তাতে সাড়া দেবে এমন কোনো নিশ্চিত সম্ভাবনা তো ছিল না! তাছাড়া এতদিনের মধ্যে একদিনও তোমাকে একাসনে কখনো একা পাইনি। যখনই তোমার সঙ্গে দেখা হতো তখনই আমার স্বামী কাছে থাকতেন। আর তিনি কাছে থাকলে এমনকি চোখের ভাষাতেও মনের কথা জানানো শক্ত—ঈগলের মতোই তীক্ষ্ণ তার নজর। কিছু টের পেলে সঙ্গে সঙ্গে তিনি আমাকে খুন ক'রে ফেলতেন।"

মেয়েটি আবার আমাকে জড়িয়ে ধ'রে আমার ডান হাতখানি চেপে ধরল তার বাহুর ওপর। তার আটো-সাঁটো সায়াকোন-এর মধ্য দিয়ে তার দেহ আমার পা দুটি স্পর্শ করল। মনে হল সব

সংযম এবার হারিয়ে যাবে। কিন্তু সেই মুহূর্তে হঠাৎ সে লাফ দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। কী যেন সে টের পেয়েছে। আমার দিকে তাকাল ভবিষ্যৎ বক্তার চোখের দৃষ্টি নিয়ে: "কিছু শুনতে পাচ্ছো?"

কান পেতে শুনবার চেষ্টা করলুম, কিন্তু বেয়ারা দুয়ার—ঝড়ের ঝাপটের শব্দ ছাড়া আর কিছুই কানে এলোনা; আর কীই বা হতে পারে?

"কেউ এসেছে! এই রাত্রে একটা ঘোড়া ডেকে উঠল! উনি!"

ছুটে গিয়ে সে বসল টেবি-টার ধারে। চেষ্টা করল স্বাভাবিক ভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে। তারপর থরথর কেঁপে-ওঠা হাতে বোতল থেকে মদ ঢালতে ঢালতে স্বাভাবিক গলায় বললো:—

"বাড়িতে তৈরী মদ একটু পান ক'রে দেখুন। কিছু খাবার নিন—আপনি যে নীতে কাঁপছেন…"

সেই মুহূর্তে মেয়েটির স্বামী ঘরে এসে ঢুকল। তার টুপি আর কোট খাদা হ'য়ে গেছে তুষারে। টুপি খুলে, কোটের হাতা দিয়ে মুখ মুছে বলল: "কী বিশ্রী আবহাওয়া! ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে ভালোয় ভালোয় ঘরে ফিরে আসতে পেরেছি।"

আমরা দুজনে তবু একটি কথাও মুখ দিয়ে উচ্চারণ করতে পারলুম না। বসে রইলুম কাঠের পুতুলের মতো। একেবারে হতভম্ব অবস্থায়। আমরা তো বুঝতেই পেরেছি এক নজরে তাকিয়েই তিনি ধ'রে ফেলেছেন ব্যাপারটা। মেয়েটিও তাকাতেও পারছিল না চোখ তুলে। কেবল আমি ভদ্রলোকের দিকে তাকাচ্ছিলুম মাঝে মাঝে। সত্যি তিনি সুদর্শন। দেহটি লম্বা, চওড়া কাঁধ। ইটের মতো লাল মুখ আরো উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে ঘোড়ো বাতাস লেগে। চোখ দুটিতে ফুটে উঠেছে মনের দৃঢ়তা। মদের ছোট গ্লাসটা শক্ত ক'রে ধ'রে পান ক'রে নিল শেষ ফোঁটাটিও যেন। বলল:—

"বুঝতে পারছি না মশাই এই দুর্যোগের মধ্যে কী ক'রে আপনি বাড়ি ফিরবেন। কিন্তু আর তো অপেক্ষা করা ঠিক নয়। আপনার ঘোড়াটার গায়ে পুরু হয়ে উঠেছে তুষারের আস্তরণ, ঘোড়াটা অনেই গেছে বোধ হয় ঠাণ্ডায়। আপনাকে খানিক দূর এগিয়ে দিতে পারছি না বলে চটবেন না। সারাদিন ঘোরাঘুরি ক'রে আমি বড় ক্লান্ত। তাছাড়া সারাদিনের মধ্যে একবারও সাক্ষাৎ হয়নি স্ত্রী-র সঙ্গে। তার সঙ্গে কিছু কথাবার্তা বলার জন্যও আমি উৎসুক…"

একটি কথাও না ব'লে উঠে পড়লুম। টুপি আর কোট প'রে বেরিয়ে এলুম বাইরে।

পরদিন ভোরের আলো ফুটে উঠতে না উঠতেই সেই গ্রাম থেকে একজন ঘোড়ায় ক'রে ছুটে এসে আমাদের চৌকিদার তার কোমরের সবুজ বেল্টটা দিয়ে গলা আটকে মেরে ফেলেছে স্ত্রীকে। ঠিক চৌকাঠের ওপর মৃতদেহটা ঝুলিয়ে রেখেছে ওপরের দিকের একটা লোহার হুকের সঙ্গে। ভোরবেলা অন্য চাষীদের কাছে গিয়ে বলেছে:—"তোমরা আমার প্রতিবেশী। তাই জানাতে এসেছি। আমার সর্বনাশ হ'য়ে গেছে। আমার স্ত্রী গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। মাথা বিগড়ে গেছিল নিশ্চয়ই। ঘুম থেকে উঠে দেখি সে চৌকাঠের ওপর ঝুলছে, নীল হ'য়ে গেছে তার মুখ, মাথাটা নেতিয়ে পড়েছে বুকের ওপর। আমি না কেন সে অমন সাজ-পোশাক ক'রেছিল। গাল দুটি লাল ক'রে ফেলেছিল রং মেখে। এখন সে ঝুলছে, পা দু'টি অল্পের জন্য ছোঁয়নি মাটি। ধর্মের ভাই সব, আমার সাক্ষী থেকো।"

চাষীরা তার দিকে তাকিয়ে বলল:—"আর তুমি তোমার শরীর নিয়ে কী কাণ্ড করেছ! চৌকিদার মশাই, তোমার সব দাড়ি এমন উপড়ানো কেন, তোমার সারাটা মুখে কেন অত আঁচড়ের দাগ, তোমার চোখ থেকেই বা রক্ত বেরুচ্ছে কেন? ভাইসব, ওকে পিছমোড়া ক'রে বেঁধে ফেল।"

তাকে কষে চাবুক মারবার পর সাইবেরিয়াতে চালান ক'রে দেওয়া হল খনিতে কাজ করতে।

বিচিত্র সাহিত্য

আদালত-কক্ষ লোকে লোকারণ্য। সবাই উৎকর্ণ হ'য়ে আছে বিচারক কী রায় দেন তা শুনবার জন্য। সবারই দৃষ্টি বিচারকের মুখের ওপর নিবদ্ধ। আসামীরও বুক কাঁপছে ভয়ে। বিচারক ব'লে উঠলেন: আসামী হয় কবিতা লিখবেন, নয়তো তাকে ভোগ করতে হবে আজীবন কারাদণ্ড।" বিচারকের রায় শুনে সমস্ত সভা চমৎকৃত।

আসামী আরব দেশের কবি আবুল আতাহিয়ার। আরেকবারও তিনি কারাদণ্ড ভোগ ক'রেছিলেন। কবিতা লেখা ছেড়ে দিয়ে ধরবেশ হতে চেয়েছিলেন ব'লে তাঁকে এই সাজা দিয়েছিলেন ইতিহাস-বিশ্রুত খলিফা হারুণ-অল রসিদ্।

• • • •

গুরু নিশীথ রাত। সবাই গভীর ঘুমে অচেতন। হঠাৎ অন্ধকারের বুক চিরে ধ্বনিত হল এক আর্ত চিৎকার। শব্দটা আসছে কবরখানার দিক থেকেই। কী ব্যাপার! সবাই ছুটে গেল, খুঁড়ে ফেলল সেই কবরটা যেখান থেকে ভেসে আসছিল চীৎকার। শবটি তুলে পরীক্ষা ক'রে বুঝতে পারল কবর দেবার সময় লোকটা আসলে মারা যায়নি। কোনো কারণে অচৈতন্য হ'য়ে প'ড়েছিল। কবরের অন্ধকারে হঠাৎ সে ফিরে পায় তার চেতনা। পরে চীৎকার করতে করতে মারা যায় ভয়ে। যিনি এই ভাবে প্রাণ হারালেন তিনিও আরব দেশের একজন বিশিষ্ট কবি। নাম: বাদী অল্-জামান্ অল্-হমদানীর।

• • • •

আরব দেশের আরেকজন খ্যাতনামা কবি ছিলেন ইব্ন্-অল খারাদা। লোকে তাঁকে পাগল ব'লেই জানত। তাঁকে হামেশাই ঘুরে বেড়াতে দেখা যেত রাস্তায়। সঙ্গে থাকত একটা থলি। রুটি বা সুতো পেলেই থলিটার মুখ শক্ত করে বেঁধে ফেলতেন। ঘুরে বেড়াতেন যত্রতত্র। বলতেন থলের মধ্যে নাকি তাঁর লেখা হাজার দুই বই আছে। কবি যখন মারা গেলেন তখন কিন্তু সত্যি তাঁর সেই থলের মধ্য থেকে আবিষ্কৃত হল চমৎকার সব কবিতা।

• • • •

বাগদাদের খলিফা একজন বিখ্যাত পণ্ডিতকে নিযুক্ত করেছেন নিজের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখাবার জন্য। কিন্তু পণ্ডিতের চেহারা এমনই কুৎসিৎ যে দুচার দিনের মধ্যেই দশ হাজার স্বর্ণমুদ্রা পুরস্কার দিয়ে তাঁকে বিদায় দিলেন খলিফা। অথচ আজো অসংখ্য আরব শিশুকে আনন্দ দিচ্ছে তাঁর লেখা অজস্র গল্প।

কোম্পানি আমলের কাহিনী

অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

যাদু : ভোজবাজি : ইন্দ্রজাল

আমাদের দেশে প্রাচীনকাল থেকেই যাদুবিদ্যার প্রচলন ছিল। শহরে এবং গ্রামাঞ্চলেও ভোজবাজি অনেক ক্ষেত্রে মানুষকে আনন্দ দান করবার একটা বড় উপকরণ বলে গণ্য হত।

ভারত ইতিহাসের বিখ্যাত বিদেশী পর্যটক ইবনবতুতা তাঁর ভারত ভ্রমণ বৃত্তান্তের এক স্থানে লিখেছেন :—

"একবার আমি হিন্দুস্থানের বাদশার দরবারে উপস্থিত ছিলাম। সেই সময় দু'জন যোগী বাদশার কাছে এলো। তাদের গায়ে আলখাল্লা ধরণের পোষাক, মাথায় কাপড়ের ফেট্টি বাঁধা; তারা চমৎকার পুস্ত ভাষায় বাদশাকে অভিবাদন জানাল। বুঝলাম বাদশার কাছে তারা অপরিচিত নয়! বাদশা তাদের বিশেষভাবে আপ্যায়ন করলেন, তারপর আমায় দেখিয়ে তাদের বললেন, "ইনি একজন মান্যগণ্য বিদেশী, এঁকে তোমাদের কিছু খেলা দেখাও।"

তারা বললে—"বহুৎ আচ্ছা জনাব। এখনি দেখাবো।"

দু'জনে কিছুক্ষণ কি বলাবলি করলে, তারপর একজন মাটিতে শুয়ে পড়ে বিড়বিড় করে আপন মনে বকতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সবিস্ময়ে দেখলাম, তার দেহটা বেঁকতে লাগল, হাতপা গুটিয়ে ছোট হল, সারা শরীরটা তালগোল পাকিয়ে গেল, তারপর সেটা একটা চৌকো পিণ্ডের মতো আকার ধারণ করল।

দেখে আমি তো হতভম্ব—মানুষের দেহ যে এমন চারকোণা মাংসপিণ্ডের আকার ধারণ করতে পারে তা কখনো স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারিনি। তারপর, আরও অবাককাণ্ড! সেই চৌকোণা দেহটা ধীরে ধীরে মাটি থেকে শূন্যে উঠতে লাগল। ক্রমে সেটা আমাদের মাথা ছাড়িয়ে উঠল, তারপর শূন্যেতেই স্থির হয়ে রইল।

ব্যাপার দেখে ভয়ে বিস্ময়ে আমার হাতপা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। আমি অজ্ঞানের মতো হয়ে মাটিতে বসে পড়লাম। বাদশা আমার অবস্থা দেখে তখুনি দাওয়াই আনিয়ে দিলেন। ওষুধ খেয়ে আমি চাঙ্গা হয়ে উঠে দেখলাম যোগীর সেই চতুর্ভুজ মূর্তি তখনো তেমনি শূন্যে ভেসে রয়েছে।

কিছুক্ষণ পরেই অপর যোগীটি একজনের কাছ থেকে এক পাটি নাগরা চেয়ে নিয়ে দুটোটা তিনবার মাটিতে ঠুকলো। তারপরেই, কী আশ্চর্য ব্যাপার, নাগরার পাটি যোগীর হাত থেকে ছিটকে বেরিয়ে গিয়ে আপনা আপনি শূন্যে উঠতে লাগল এবং ক্রমে উঠতে উঠতে সেই শূন্যে ভাসমান যোগীর মাথায় গিয়ে লাগল। নাগরার সঙ্গে সঙ্গে সেই লোকটির বাঁকাচোরা শরীর ধীরে ধীরে মাটিতে নেমে এলো, এবং যোগী সটান হয়ে দাঁড়িয়ে হেসে বাদশাকে অভিবাদন করল।

দেখে শুনে আমি তো তাজ্জব বনে গেলাম। অনেক দেশ ঘুরেছি, অনেক রকম ভোজবাজি দেখেছি, কিন্তু চোখের সামনে এত কাছে দাঁড়িয়ে এরকম অদ্ভুত অবিশ্বাস্য ব্যাপার কখনো দেখিনি।"

এদেশের অনেক পুরণো দলিল ও পত্রাদি থেকে জানা যায় ইন্দ্রজাল ও ভোজবাজি বহুকাল ধরে এদেশে চলে এসেছে। কোম্পানীর আমলের কিছু কিছু কাহিনী সম্প্রতি জানা গেছে।

সেই আমলের স্বনামখ্যাত লেখক ও সাংবাদিক ডব্লু, এইচ, কেরি এ সম্বন্ধে কয়েকটি চিত্তাকর্ষক ঘটনা বিবৃত করেছেন।

একটি ঘটনার আমরা পড়ছি :

"কলকাতার রাস্তায় চৌমাথায় দাঁড়িয়ে একদল বেদে বেদেনী ভোজবাজি দেখাচ্ছে। হঠাৎ একজন বেদের মাথায় একটা বড় চাদর চাপা দেওয়া হল। বেদেটা মাটিতে শুয়ে পড়ল চাদর ঢাকা অবস্থায়। আর দু'তিনজন তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে যেন খুব মারতে লাগল। তারপর তারা উঠে দাঁড়িয়ে চাদরখানাকে টান মেরে তুলে ফেললে। চাদরের তলায় সে লোকটা নেই, সে অদৃশ্য হয়েছে। এদিক ওদিক দেখা হল, বেদেদের ঝুলি ঝোলা কাপড়-চোপড় তল্লাস করা হল, কিন্তু না:, সেই লাল আঙিয়া পরা লোকটা কোথাও নেই !! বেদে-বেদেনীরা সেলাম করে পয়সা চাইল। একজন দর্শক সামনের বেদেনীকে বলল, 'লোকটাকে দেখাও, তাকে বার কর।' রসসী বেদেনীটি হেসে বলল, 'সে তো স্বর্গে চলে গেছে। আসবে কি করে ? স্বর্গ থেকে আসতে গেলে দুশো টাকা লাগবে, দেবে ?' প্রত্যেকের কাছ থেকে কিছু কিছু পয়সা আদায় করে তারা খোলাকুলি কাঁধে ফেলে অন্য পাড়ার দিকে চলল।

অদৃশ্য লোকটি কোথায় গেল, কেমন করে কখন্ ফিরলো, তা আর জানা গেল না। তা না জানা যাক, কিন্তু এমন করে কড়া রশ্মুরের মধ্যে খোলা জায়গায় সকলের চোখের সামনে জলজ্যান্ত একটা মানুষ কর্পূরের মতো উবে গেল—এ দৃশ্য তো কখনো কোথাও দেখিনি।"

১৭৯৭ সালের এক পুরণো সাময়িক পত্রে একটি অত্যাশ্চর্য ভোজবাজির বর্ণনা পাওয়া গেছে :

"একটা বড় ঘরের এক ধারে অনেকগুলি দর্শক বসে আছে। ঘরের অন্য প্রান্তের দরজা দিয়ে বাজিকর ঘরে ঢুকল।

দুচার কথার পর সে হাততালি দিয়ে কাকে যেন ডাকল। সঙ্গে সঙ্গে একটি মেয়ে প্রবেশ করল। তার গায়ে রঙীন ঝলমলে পোষাক, সর্বাঙ্গে চকচকে গয়না,—যেন বিয়ের কনে। বাজিকরের নির্দেশে মেয়েটি মেঝের উপর বসল। বাজিকর ঘরের বাইরে গিয়ে মস্ত একটা চ্যাঙাড়ির মধ্য ঢুবড়ি আর একটা চাদর নিয়ে এলো। ঢুবড়ি দিয়ে বাজিকর মেয়েটিকে ঢেকে দিলে, তার পর সেই ঢুবড়ির উপর চাদরখানা ছড়িয়ে দিলে। মেয়েটি সম্পূর্ণ ঢাকা পড়ে গেল।

তখন বাজিকর আর সেই ঢুবড়ি-ঢাকা মেয়েটির মধ্যে কথা হতে লাগল। বাজিকর যেন স্বামী আর মেয়েটি যেন তার স্ত্রী ! বাজিকর মেয়েটিকে খুব গালমন্দ করতে লাগল—খুব রেগে রেগে

কথা শুরু করল, বলল যে সে বিশ্বাসঘাতিনী, ভ্রষ্টা। তার সেই কথা শুনে মেয়েটি খুব চোটপাট করতে লাগল। ক্রমে বাজিকর রেগে কাঁপতে লাগল, তার পর হঠাৎ সকলের ভয়চকিত দৃষ্টির সামনে ঘরের কোণ থেকে একটা মস্ত তলোয়ার এনে সেটা ঘোরাতে লাগল। ঘোরাতে ঘোরাতে মারলে এক কোপ চুবড়ির ওপর। তারপর সেই তলোয়ার দিয়ে চুবড়ির চতুর্দিক এফোঁড় ওফোঁড় করতে লাগল।

চুবড়ির ভিতর থেকে করুণ আর্তনাদ উঠল। ক্রমে আর্তনাদ গোঙানীতে পরিণত হল, তারপর কাতরানি সম্পূর্ণ থেমে গেল। দেখা গেল চুবড়ির তলা দিয়ে রক্ত গড়িয়ে আসছে। তলোয়ারটাও তাজা রক্তে লাল। দর্শকরা তো আতঙ্কে বিহ্বল। খুন করলে লোকটা চোখের সামনে!!

খুনে-বাজিকর তলোয়ারটা নিজের কাপড়ে মুছলে, তারপর সেটা রেখে দিলে ঘরের কোনে। দর্শকরা স্তব্ধ হয়ে বসে আছে। বাজিকর এগিয়ে এসে তাদের সামনে দাঁড়াল। সেলাম করে বললে, তার পাপিষ্ঠা স্ত্রীকে শেষ করে সে আজ খুব আনন্দ বোধ করছে, এই নৃশংস কাজ করে সে একটুও অনুশোচনা বোধ করছে না, এমনি বজ্জাত ছিল তার স্ত্রী!

দর্শকরা তখন মহাতাজ্জব। এ তো এক আচ্ছা ফ্যাসাদে পড়া গেল। চোখের সামনে খুন! থানা পুলিশ। বাপে ছুঁলে আঠারো ঘা। এখন এখান থেকে পালাতে পারলে হয়।

এদিকে আপনমনে বকতে বকতে বাজিকর হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে চুবড়িটার গায়ে সজোরে মারলে এক লাথি। চুবড়িটা একধারে ছিটকে গিয়ে পড়ল। তলোয়ারের ঘা খেয়ে সেটা এমনিতেই ছিন্নভিন্ন হয়েছিল, এখন লাথির চোটে টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ল। কিন্তু চুবড়ির ভিতরকার সেই মেয়েটা কোথায় গেল? কোথাও তো তার কোন চিহ্ন নেই! এ কী অঘটনকাণ্ড! দর্শকদের চোখ যাকে বলে ছানাবড়া, তাদের গায়ের লোম পর্যন্ত বোধ করি খাড়া হয়ে উঠেছে।

কিছুক্ষণের জন্য অটুট নিস্তব্ধতা চারিদিকে।

মেয়েটার কোন চিহ্ন না দেখে যাদুকরও যেন খুব অবাক হয়ে গেল। 'কাঁহা গিয়া', 'কাঁহা গিয়া' বলে সে খানিকক্ষণ তারস্বরে চিৎকার করল। তারপর কাঁদতে সুরু করল এবং কপাল চাপড়াতে চাপড়াতে তার স্ত্রীর নাম ধরে ডাকতে লাগল। সে যা বলতে লাগল তার মর্ম হচ্ছে এই যে, 'হে আমার প্রাণাধিক প্রিয়া, তোমায় তলোয়ারের চোট মেরে বেহেস্তে পাঠিয়ে আমি বড়ই ভুল করেছি, আমি বড় কষ্ট পাচ্ছি, তোমায় না পেলে আমি বাঁচবো না, অতএব তুমি যেখানেই থাকো সেখান থেকে ফিরে এসে আমার প্রাণ বাঁচাও, তোমা বিহনে আমার প্রাণ যায় যায়!'

তারপর আরও তাজ্জব কাণ্ড, ঘুরে দরজার বাইরে থেকে নারীকণ্ঠ ভেসে এলো, কে যেন বাজিকরের আহ্বানে সাড়া দিলে, কে যেন এই দিকেই আসছে। দর্শকদের মুণ্ড ঘুরে গেল—দরজার দিকে। তাদের অবস্থা তখন সঙ্গীন—এ কী ভূতপ্রেতের কাণ্ড নাকি রে বাবা। দরজার সামনে ও কে?...এ যে সেই মেয়েটা—বাজিকর যাকে চুবড়ির মধ্যে ঢুকিয়ে তলোয়ার দিয়ে খুঁচিয়ে রক্তগঙ্গা বইয়ে দিয়েছিল!...গায়ে সেই ঝলমলে পোষাক ...সেই সব গয়না হাতে কানে গলায়। হাসতে হাসতে মেয়েটা ছুটে গিয়ে যাদুকরের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। তার অঙ্গের কোন স্থানে কোন আঘাতের এতটুকু চিহ্ন পর্যন্ত নেই। দর্শকরা এবার আনন্দে আবেগে কলরব করে উঠল। বাজিকর আর মেয়েটা হেসে হেসে দর্শকদের সেলাম জানালো।"

১৮১৪ সালে একদল বাজিকর (দু'জন পুরুষ ও একজন অল্পবয়সী মেয়ে) লণ্ডনে গিয়েছিল।

"মনার্ক" নামে এক বিলাতী জাহাজের কাপ্তান যাত্রাকে তাদের খেলা দেখে আকৃষ্ট হয় এবং তাদের জাহাজে তুলে নিয়ে অদেশে পাড়ি দেয়।

বাজিকর দু'জনেও ছিল তেমনি তুখোড়। তারা একটুও ঘাবড়ালো না। তাদের সেই আবরুলা কদর্যলে পোষাক আর মুখে দুবোধ্য মাতৃভাষার বুলি নিয়ে তারা দাঁড়ালো গিয়ে লণ্ডনের চৌমাথায়। ভিড়ে ভিড়। তারও পেকে তুতের খেলা দেখাবার জন্যে রিয়ালয়ের রোগীরা এসেছে!

হ্যাঁ, খেলা দেখালে বটে। এক-একটা খেলা শেষ হয় আর আনন্দে চিৎকারে দর্শকরা ফেটে পড়ে! রোপ ট্রিক্—অত্যাশ্চর্য যাদুর খেলা সেই প্রথম দেখানো হয় লণ্ডনে। একটা সরু কাঠি একজন বাজিকর ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ছুঁড়ে দিলে আকাশে—ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে কাঠিটা শক্ত হয়ে সোজা একটা উঁচু বাঁশের মতো খাড়া হয়ে রইল। বাজিকর তখন দলের ছেলেটাকে বললে—উঠে যা ওপরে। স্যাতোট-পরা ছেলেটা অমনি তড়াক করে সেই যাদু বেয়ে উপরে উঠতে উঠতে ভলায় উঠল, তারপর অদৃশ্য হয়ে গেল! কী আশ্চর্য ব্যাপার!! কোথায় গেল ছেলেটা! আরে ঐ যে ভীড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে!! বাজিকর তাকে টেনে এনে দাঁড় করালে, তারপর তাকে হাঁ করতে বললে। ছেলেটা হাঁ করে দাঁড়াল। বাজিকর একটা লম্বা সরু তলোয়ার নিয়ে তার মুখের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলে—তলোয়ারটা ক্রমে তার পেটের মধ্যে সেঁধিয়ে গেল! চতুর্দিকে চীৎকার। মেলার মেয়েরা খেলা দেখছিল, তারা হায় হায় করতে লাগল।

বাজিকর তখন ছেলে তলোয়ারটা টেনে বার করে নিলে! কী ধারালো তলোয়ার—তুখারে ধার! কিন্তু ছেলেটার গলায় মুখে একটু আঁচড় লাগল না—এক ফোঁটা রক্তপাত হল না! এই বাজিকরদের খেলা দেখিয়ে জাহাজের সেই কাপ্তান মোটা লাভ করেছিল—একমাসে তাদের রোজগার হয়েছিল ১৬৩৮ পাউণ্ড। এক মাস পরে বাজিকরদের নিয়ে সেই কাপ্তান যাত্রাকে ফিরে এসেছিল।"

মিঃ স্মাইথ নামে কোম্পানী আমলের এক নীলকরের মুখে নিম্নোক্ত ঘটনাটি শোনা গেছে:

"একবার এক যাদুকর স্মাইথের বাড়িতে এসেছিল খেলা দেখাতে। বড় ড্রয়িং রুমের দেওয়ালের একধারে একটা সাদা চাদর মাটিতে বিছিয়ে যাদুকর বসল। অন্যধারে একটা চেয়ারে গৃহস্বামী, অন্য একটায় তার বান্ধবী মিস ইডেন। তাদের পাশে এক পার্শি দোকানদার, দরজার কাছে তিন-চারজন চাকর-খানসামা দাঁড়িয়ে। চাদরের উপর বসে বাজিকর খানিকক্ষণ চোখ বুজে রইল, তারপর পার্শি দোকানদারের কাছে একটি টাকা চাইল। দোকানদার টাকা বার করে বাজিকরের হাতে দেবার জন্যে এগিয়ে যাবার উপক্রম করতেই বাজিকর বললে টাকাটা সে স্মাইথ সাহেবের বেয়ারার হাতে দিক। বেয়ারা টাকাটি নিলে, বাজিকর বললে, "দেখ, ঠিক একটা টাকা বটে তো?"

বেয়ারা বললে "হ্যাঁ, ঠিক একটা টাকা।"

তখন বাজিকর সেই রৌপ্যমুদ্রাটি তার মনিবকে দিতে বলল। স্মাইথ টাকাটি হাতে নিলে। বাজিকর বললে, "সাহেব, আপনার হাতে ওটা কি?"

স্মাইথ জবাব দিলে—"একটা টাকা।"

বাজিকর বললে, "দুহাতের তালুর মধ্যে টাকাটা চেপে ধরুন, আচ্ছা, এইবার কোন একটা দেশের নাম ভাবুন, ফ্রান্স, জার্মানী, রাশিয়া, আমেরিকা, তুরস্ক, ইতালী, যে কোন দেশের নাম।"

স্মাইথ একটু ভেবে নিয়ে বললে, "দেশের নাম ভেবেছি।"

বাজিকর বললে, "এইবার মুঠো খুলে দেখুন, আপনি যে দেশের নাম ভেবেছেন, সেই দেশের টাকা আপনার হাতে।"

সাইখ ফ্রান্সের নাম ভেবেছিল। মুঠো খুলে দেখল, আমাদের দেশের টাকার বদলে তার মুঠোর মধ্যে রয়েছে ফরাসী দেশের একটি মুদ্রা। সাইখ সেটি বাজিকরকে দিতে গেলে সে বললে, "এবার ওটা মেমসাহেবের হাতে দিন আর মেমসাহেব একটি দেশের নাম ভাবুন।"

মিস ইডেন রাশিয়ার নাম ভাবল এবং মুঠো খুলে দেখল, তার হাতে একটি রাশিয়ার মুদ্রা। আবার সেটি সাইখের হাতে এলো, সাইখ মনে মনে আমেরিকার নাম ভেবে মুঠো খুলে দেখল, তার মুঠোয় রাশিয়ার বদলে মার্কিন মুদ্রা!"

সেই সময়কার ইংলিশম্যান নামে দৈনিক পত্রিকায় একটি ইন্দ্রজালের কাহিনী ছাপা হয়েছিল :

"হাসান খাঁ নামে এক যাদুকর আগার সার্কুলার রোডে এক ইউরোপীয় ভদ্রলোকের বাড়ী একদিন খেলা দেখাচ্ছিল। সেই খেলায় সে একটি মহিলার কাছ থেকে তাঁর হাত ঘড়িটি চেয়ে নিল। তারপর সকলের সামনেই সে বারান্দা থেকে ঘড়িটি ছুঁড়ে দিল।

বারান্দার সামনেই ছিল একটা পুকুর। ঘড়িটা সেই পুকুরে গিয়ে পড়ল। সকলের চোখের সামনেই ঘটনাটা ঘটল।

কিছুক্ষণ পরে মহিলা ঘড়িটা ফেরৎ চাইলেন। তখন হাসান খাঁ তাঁকে পাশের ঘরে গিয়ে ঘরের ভিতর হাত বাড়িয়ে দাঁড়াতে বললে। মহিলাটি তাই করলেন, এবং কি আশ্চর্য, সোনার চাওে সমেত সেই ঘড়িটা তাঁর হাতে এসে পড়ল।

... আর একদিন আর একটা খেলায় হাসান খাঁ এক ভদ্রলোকের কাছ থেকে তাঁর ঘড়িটা চেয়ে নিয়ে নিজের পকেটে রাখল। কিছুক্ষণ কাটবার পর ভদ্রলোক যখন তাঁর ঘড়ি ফেরৎ চাইলেন তখন হাসান খাঁ বললে যে সে সাহেবের কাছ থেকে কোন ঘড়ি নেয় নি, ভদ্রলোক কোন ঘড়ি সঙ্গে আনেন নি, তাঁর ঘড়ি তিনি এখানে আসবার সময় তাঁর আপিসঘরের টেবিলের দেরাজে বন্ধ করে রেখে এসেছেন। হাসান খাঁর কথা শুনে সকলে তো অবাক। ভদ্রলোকের পকেটেই তাঁর আপিসের চাবি ছিল। সকলে বললে, তাঁর আপিসে গিয়ে দেখা যাক, হাসান খাঁর কথা সত্যি কি না। আপিস সেখান থেকে বেশি দূরে নয়। সকলে দলবদ্ধ হয়ে ভদ্রলোকের আপিসে গেল। চাবি লাগিয়ে টেবিলের দেরাজ খোলা হল। দেখা গেল, সত্যিই সেই ঘড়িটা দেরাজের মধ্যে রয়েছে।

এই ধরণের অনেক আশ্চর্য খেলা দেখাতো হাসান খাঁ। কয়েকজনকে সামনে বসিয়ে কার কি খেতে ইচ্ছে করছে জেনে নিয়ে সে যেন মন্ত্রবলে পরদার আড়াল থেকে সেইসব জিনিষ তাদের সামনে এনে হাজির করত।"

যে কাহিনীগুলি উপরে বলা হল, তাদের প্রত্যেকটির ভিত্তি প্রত্যক্ষদর্শীর সত্যভাষণের উপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং স্বীকার করতে হবে যে অতীতকালে আমাদের দেশে এমন অনেক যাদুকর ছিল যারা বিনা আড়ম্বরে, মঞ্চের কলা-কৌশলের সাহায্য ছাড়া, খোলা জায়গায়, দর্শকদের খুব কাছে দাঁড়িয়েই এমন সব আশ্চর্য অবিশ্বাস্য ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করত যা এখন আর দেখা যায় না এবং যাদের অবিশ্বাস্য কার্যকলাপের কাহিনী কোনদিন ব্যাপকভাবে আমাদের গোচরে আসেনি।

উপন্যাস | শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

॥ চব্বিশ ॥

এদের ভেতরের রহস্য চারুবাবুর জানবার কথা নয়। সবই তিনি বললেন প্রকাশকে। বলতে বলতে হঠাৎ একসময় পকেট থেকে বিজ্ঞাপনের কাগজটি বের করে প্রকাশের হাতে দিয়ে বললেন, 'এইটি যদি আগে আমি দেখতাম তাহ'লে কি আমার ড্রাইভার এই কাণ্ড করতে পারতো? ছেলে আমি কবে পৌঁছে দিতাম।'

প্রকাশ বললে, 'ড্রাইভারকে আপনি তাড়ালেন কেন? ব্যাটাকে পুলিশে দেওয়া উচিত ছিল।'

চারুবাবু বললেন, 'আমি তো তাকে তাড়াইনি প্রকাশবাবু, আমি তাকে দুটো কড়া কড়া কথা বলেছিলাম শুধু। ব্যাটা আমাকে দেখে আর থাকতে পারে কখনও? নিজেই পালিয়ে গেল।'

প্রকাশ বললে, 'যাকগে। পুরস্কারের টাকাটা আসলে কিন্তু আপনারই প্রাপ্য।'

চারুবাবু হাঁ হাঁ করে উঠলেন, 'এ কী বলছেন আপনি? আমি কি টাকা নেবার জন্যে এসেছি এখানে? টাকা আমি চাই না—আমার টাকার অভাব নেই। হারানো ছেলে আমি ঠিক জায়গায় পৌঁছে দিতে পেরেছি—এই যথেষ্ট।'

বাড়ীর পুরনো চাকর—ভেতরের ব্যাপার সবই জানে। কি যে সে করবে কিছুই বুঝতে পারছিল না। উমেশবাবু থাকলেও-বা সামলে নিতে পারতেন। একটা টেলিগ্রাম করতে তাঁর এত দেরিই বা হচ্ছে কেন?

অজয়কে সে বাড়ীর ভেতর সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। অজয় ছিটকে বেরিয়ে এলো সেখান থেকে। চারুবাবুর কাছে এসে সে আবার বললে, 'আমার মা কোথায়?'

প্রকাশ হাত বাড়িয়ে তাকে নিজের কাছে টেনে আনলে। বললে, 'এসো তুমি আমার কাছে। উমেশবাবু এখনও কেন আসছেন না দেখি।'

এই বলে সে অজয়কে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো।

চারুবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমি কি এইখানে বসে থাকবো?'

প্রকাশ বললে, 'না। আপনিও আসুন আমার সঙ্গে।'

বাঙ্গালীটোলার গলির ভেতর চলতে চলতে চারুবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোথায় যাচ্ছ আমরা ?'

প্রকাশ বললে, 'আসুন না আমার সঙ্গে।'

'আপনার বাড়ীতে ?'

প্রকাশ বললে, 'আপনি আমাকে আপনি বলবেন না। তুমি বলুন।'

প্রকাশের ভদ্র ব্যবহারে চারুবাবু অত্যন্ত খুশী হয়েছিলেন। বললেন, 'আমি কিন্তু আজই একবার বিশ্বনাথ অন্নপূর্ণা দর্শন করে বাড়ী ফিরে যাব। আমার অনেক কাজ আছে সেখানে।'

'আপনি ডাক্তার ?'

'হ্যাঁ বাবা আমি হোমিওপ্যাথী চিকিৎসা করি।'

প্রকাশ জিজ্ঞাসা করলে, 'কাশী বুঝি এর আগে আপনি কখনও আসেন নি ?'

চারুবাবু বললেন, 'না বাবা, এই প্রথম।'

প্রকাশ বললে, 'আপনাকে কিন্তু আজ আমি যেতে দেবো না। কাশীর সবকিছু আপনাকে আমি নিজে দেখিয়ে দেবো।'

'কিন্তু আমি যে বাবা কাপড় জামা এমনকি একটা গামছা পর্য্যন্ত সঙ্গে আনিনি।'

'মাই-বা আনলেন। সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে। আপনি আসুন। অজয়, তোমার হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে না তো ?'

অজয় বললে, 'না। আমি খুব হাঁটতে পারি। অনাথ-আশ্রমের গাড়ীতে আমি চড়তুম না। হেঁটে হেঁটে অনেক দূর চলে যেতুম।'

বড় রাস্তায় এসে একটা টাঙ্গা ধরলে প্রকাশ।

তারপর সবাই মিলে সোজা একেবারে ভেলুপুরা।

বাইরের ঘরে চারুবাবুর কাছে অজয়কে বসিয়ে রেখে প্রকাশ বললে, 'একটু বসুন এইখানে। আমি আসছি।'

বাড়ীর ভেতরে গিয়ে দেখে সরমা এরই মধ্যে স্নান করেছে। একপিঠ ভিজে চুল পিঠের ওপর ছড়িয়ে পড়েছে। জানলার কাছে চুপ করে বসে বসে কি যেন ভাবছে।

মতিয়া এসেছিল সরমার জন্য চা নিয়ে।

সরমা বললে, 'না, চা আমি এখন খাব না। তোর দাদাবাবু আসুক—'

বলে যেই মুখ ফিরিয়েছে, দেখলে প্রকাশ দোরের কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছে।

'এই তো তুমি এসে গেছ। কি হলো ? বাবা ফিরেছে ?'

সরমা এই খবরটাই নিতে পাঠিয়েছিল প্রকাশকে। রোজই একবার করে পাঠায়। কিন্তু কোনও খবর পায় না। কলকাতার মতন শহরে অজয় হারিয়ে গেছে। কি যে হলো কিছু বুঝতেও পারছে না।

'খবর কিছু পেলে ?'

প্রকাশ সরমার কাছে এসে বসলো। মতিয়া দাঁড়িয়ে ছিল চেটা হাতে নিয়ে। তার দিকে একবার তাকিয়ে সরমা উঠতে যাচ্ছিল। প্রকাশ বললে, 'উঠো না। বোসো।'

মতিয়াকে বললে, 'ওটা দুই টেবিলের ওপর রেখে দিয়ে যা।'

মতিয়া হাসতে হাসতে আদেশ পালন করে চলে গেল। সরমা বললে, 'তোমাকে চা তৈরী করে দিই?'

প্রকাশ বললে, 'না।'

'ঠাণ্ডা হয়ে যাবে যে?'

'হোক্।'

মুখের চেহারা দেখে কেমন যেন সন্দেহ হলো সরমার।—তবে কি অজয় সম্বন্ধে সব-কিছু জেনে এসেছে নাকি?

'ঠাণ্ডা হবে কি গো? তুমি তো চা খেয়ে বেরোওনি বাড়ী থেকে!'

প্রকাশ বললে, 'তাহ'লে এক পেয়ালা চা তৈরী করে দাও। একজন ভদ্রলোক এসেছেন আমার সঙ্গে। তাঁকে আমি দিয়ে আসি।'

এক পেয়ালা চা আর টোষ্ট্ হাতে নিয়ে প্রকাশ বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। চারুবাবুর হাতের কাছে চা-টোষ্ট্ নামিয়ে দিয়ে বললে, 'আগে চা খান। তারপর কথা হবে।'

বলেই সে অজয়কে কোলে তুলে নিয়ে বললে, 'এসো তুমি আমার সঙ্গে।'

অজয় বললে, 'কোথায় যাব?'

'চুপ। এখানে বেশি কথা বলতে নেই।'

'কেন?'

প্রকাশ হাসলো একটুখানি। বললে, 'এ-বাড়ীতে একটা মেয়ে আছে বেশি কথা বললে সে ব তোমাকে।'

এই বলে অজয়কে চুপিচুপি দোরের কাছে নিয়ে এসে হাতের ইসারায় ভেতরে ঢুকতে বলে প্রকাশ দাঁড়িয়ে রইলো পর্দার আড়ালে।

সরমা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চা তৈরি করছিল। হঠাৎ পরিচিত কণ্ঠস্বরে চম্‌কে উঠেই তাকিয়ে দেখে, দু'হাত বাড়িয়ে হাসতে হাসতে ছুটে আসছে অজয়।—'মা!'

'অজয়!'

সরমা তাকে কোলে তুলে নিলে। কে যে তাকে এখানে আনলে, হারানো ছেলেকে কেমন করে খুঁজে পেলে সে-সব কথা ভাববার তখন অবসর নেই। আদরে চুমনে ছেলেকে একেবারে বিহ্বল করে দিয়ে সরমা শুধু বলতে লাগলো, 'অজয়! অজয়! কোথায় ছিলে বাবা তুমি? কে তোমাকে আনলে এখানে?'

অজয় মুখ ফিরিয়ে তাকালে দোরের দিকে। দেখলে পর্দার আড়ালে মানুষটি তখনও দাঁড়িয়ে আছে। বললে, 'ওই তো—'

প্রকাশ আর লুকিয়ে থাকতে পারলে না। হাসতে হাসতে বেরিয়ে এলো।

অজয়কে কোল থেকে নামিয়ে দিয়ে সরমা ছুটে গিয়ে প্রকাশের পায়ের কাছে যেন আছাড় খেয়ে পড়লো!

'আমাকে তুমি ক্ষমা কর।'

প্রকাশ বললে, 'না। ক্ষমা তোমাকে আমি করবো না। এই সামান্য কথাটা তুমি আমার কাছে চেপে রেখেছিলে এতদিন?'

সরমা কোনও কথা বলে না! প্রকাশের পা দুটো জড়িয়ে ধরে শুধু কাঁদতে থাকে।

'ওঠো।'

দু'হাত বাড়িয়ে প্রকাশ তাকে তুলে বসিয়ে দিলে।—'ছি! ছেলের কাছে কাঁদে না! চুপ কর।'

অজয় কিছু বুঝতে পারছিল না। ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে অবাক্ হয়ে তাকিয়ে দেখছিল শুধু। প্রকাশ তাকে কাছে টেনে নিলে।

'মাকে পেয়েছ অজয়?'

অজয় বললে, 'হ্যাঁ।'

প্রকাশ বললে, 'আমি কে বল তো?'

অজয় তা কেমন করে জানবে?

সরমা কিছু বলবার আগেই প্রকাশ বললে, 'আমি বাবা।'

অজয় তার মার মুখের দিকে তাকালে। বললে, 'আমাকে বলনি যে?

সরমার চোখদুটি আবার জলে ভরে এলো। 'আমার বাবা বারণ করেছিল তাই বলিনি। পায়ে হাত দিইয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছিল—'

অজয়কে লক্ষ্য করে কথাটা যেন সে প্রকাশকে বললে। বলেই আবার যেন সে ছেলেমানুষের মত কেঁদে ফেললে।

অজয় বললে, 'তুমি কাঁদছো কেন মা?'

প্রকাশ বললে, 'আনন্দে কাঁদছে। আমাকে কষ্ট দিয়ে তোমার মা যে খুব আনন্দ পায়। নাও, চোখের জল মোছো। মুছে ছেলেকে নিয়ে চল—বাইরের ঘরে। একজন অতিথিকে বসিয়ে রেখে এসেছি। উনি ছিলেন বলেই তুমি তোমার ছেলেকে ফিরে পেয়েছ।'

সরমা চোখের জল মুছে বললে, 'ওঁর খাবার ব্যবস্থা করে দাও।'

প্রকাশ বললে, 'শুধু খাবার ব্যবস্থা কি বলছো? ওঁকে আমি এখন ছাড়বো নাকি? ওঁর মেয়েকে টেলিগ্রাম করবো। সে আসবে এখানে। তার মুখ থেকে শুনবো সে তোমার ছেলেকে কিরকম আদর যত্ন করেছিল। এসো, সেই সব গল্প শুনবে ওঁর মুখ থেকে।'

অজয়কে সঙ্গে নিয়ে ফিরে সরমা প্রণাম করলে চারুবাবুকে।

চারুবাবু সরমার মুখের দিকে তাকিয়েই বলে উঠলেন, 'আরে! এ যে ঠিক দেখছি আমার মেয়ে পারুলের মত দেখতে।'

প্রকাশ হাসতে হাসতে বললে, 'মেয়েগুলো সব একই রকম হয় বোধহয়। ছেলের জন্যে সব-কিছু করতে পারে।'

বস্তিবাটির চারু-ডাক্তার হো হো করে হেসে উঠলেন।

'ঠিক বলেছ বাবা। এই ছেলেটাকে নিয়ে পারুল আমার সঙ্গে কম লুকোচুরি খেললে না!'

সমাপ্ত

"চাল"

শক্তিপদ রাজগুরু

নগেনবাবু অনেকক্ষণ ধরে লাইনে দাঁড়িয়ে আছেন। বয়স হয়ে গেছে চাকরী থেকেও অবসর নিতে বাধ্য হয়েছেন, কিন্তু তবু বাড়ীর সব ঝামেলা এসে ধীরে ধীরে ঘাড়ে চেপেছে।

বড় ছেলে কেশব তো প্রায়ই বলে,

নিজেরা চাকরী বাকরী নিয়েই ডুবে আছি, উনি না হয় ঘরের কাজকর্মে একটু দেখলেন। বসে থাকলে যাতে ঘরবে যে।

পাশের ঘর থেকে কেশবের কথাগুলো শোনেন নগেনবাবু। ঘুম আসেনি, ইদানীং ঘুমও কমে গেছে। কাশিটাও বেড়েছে সেই সঙ্গে দু একটা সিগারেট খেতে তবু সব যায়—অনেকদিনের অভ্যেস ছাড়া যায়না এত সহজে।

কিন্তু খেলে কাশিটা বাড়ে। কেশব গজগজ করে,

—খরচ তবু করা চাই। দুটো সিগ্রেটের দাম দশনয়াপয়সা, সেটাও তবু বাঁচে। কাশিটাও কমে।

ভুলে যান নগেনবাবু যে তিনি এখন সংসারের কর্তা নন, পোষ্য বোঝামাত্র।

তাই ওদের পয়সায় একটু সাশ্রয় করবার জন্যই এসব কাজ তুলে নিয়েছেন। কিন্তু কাজ কি একটা!

দিনে দিনে দেখছেন জীবন যাত্রা কি জটিল হয়ে উঠেছে। বাজার হাটতো আছেই। মাছ মেলে না—যদিও মেলে গলা পচা, তাও লাইন দিতে হবে। তরকারী দুর্মূল্য।

তার উপর আছে চাল তেল চিনির সমস্যা।

ওঁদের জীবনে এসব সমস্যা আসেনি কোনদিন। মাহুষ অনেক শান্তিতে বাস করেছিল। নগেনবাবুর নীল জীর্ণ চোখের সামনে এখনও ওঁর জীবনের অতীতের ছবিটা ফুটে ওঠে।

মার্চেন্ট অফিসের কেরানী, মাইনে পেতেন তখন বত্রিশ টাকা, তাতেই সংসার চলেছে। দুই ছেলে, কেশব আর মাধবকে পড়িয়েছেন। মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন: কোঅপারেটিভ থেকে ধার নিয়ে জাবদাকিমে যেমন হোক একটু বাড়ীও করেছেন।

মাছ! বাজারে গেলে এ সে ডাকাডাকি করতো। রুই-কাতলা-মৃগেল ঘরে ঘরে সাজানো: চাল!

সেই চালের স্বাদ ভুলে গেছেন আজ! ধানাম, সীতাশাল, গোবিন্দ ভোগ যা মেলে। বুদ্ধি মোকদিয়ে বাড়ী পাঠিয়ে দিতো: মাস মাস কাবারে মিটবে।

বাজারে তাতেই কত খাতির।

—ও দাদু!

নগেনবাবু ছাতাটা মেলে লাইনে দাঁড়িয়ে আছে, দীর্ঘ লাইন।

রোদে যাচ্ছেন তিনি। পা দুটো কেমন টনটন করছে বেদনায়। গলা শুকিয়ে আসছে।

চালের লাইনে এসে দাঁড়াতে হয়েছে।

ক'দিন থেকে বাড়ীতে চালের একটানা অভাব লেগেই আছে।

কেশব সেদিন শোনায়,

বসে আছেন, এদিকটা একটু দেখুন। রেশনকার্ডে কুলোচ্ছেনা। এদিক ওদিকের অনেক দোকানে চাল দিচ্ছে নাম্য দামে।

নগেনবাবু ছেলের কথায় আমতা আমতা করেন।

—অনেক বড় লাইন হয়।

—কাযতো নেই একটু দাঁড়াবেন। কত আচ্ছা আচ্ছা লোক দাঁড়াচ্ছে।

নগেনবাবু আর কথা বাড়ালেন না। দেখেছেন ছেলেদের মতি গতি। ওরাও সব বদলে গেছে।

মনে পড়ে যুদ্ধের সময়ও চালের এমনি আকাল হয়ে ছিল, সেবার মন্বন্তরের সময়ও ছেলেদের লাইনে চাল আনতে পাঠাননি তিনি।

—কোম্পানীর রেশনেই চলে গেছে—অন্তত্রও কিছু চাল পেয়েছিলেন। আজ!···কে জানে দিন বদলের সঙ্গে চালে পড়ে মানুষও বদলায়।

···সকালে ওরা অফিসে বের হয়ে যায়, নগেনবাবুও পাশের একতলার প্রায়ান্ধকার ঘর খানায় বসে আছেন।

—বৌমা!

এসময়টা একটু চায়ের তেষ্টা পায়। আগে স্ত্রী বেঁচে থাকতে ওটা সময় মতই আসতো, এখন ওষের দয়া।

ললিতাও শুনেছে শ্বশুর মশায়ের ডাকটা।

কেন ডাকছে তা জানে। কিন্তু চিনি একেবারে মাপ বাঁধা। রেশনের চিনি এলে যত্নে তুলে রাখে চায়ের হিসাবে বের করে চায়ে দেয়। সকালে একবার মাত্র চা হয়, আর সন্ধ্যায় বড়বাবু ফিরলে এক কাপ।

···তবু মায়া হয় বুড়ো শ্বশুরের জন্য। কেমন যেন লোভী ছোট ছেলের মত চেয়ে থাকে।

—একটু চা!

ললিতা না দিয়ে পারেনা। তার ছেলে মনু আর বুড়ো ওই নগেনবাবু কোথায় যেন এক রকমই অসহায়।

চাল আনবার থলি হাতে নিয়ে বের হবার আয়োজন করছেন নগেনবাবু।

—চাল!

সংসারে আজ যেন ওইটাই একমাত্র কাম্য বস্তু।···ভাবতেও খারাপ লাগে!

ক'দিন এক বেলা মাত্র ভাত খেয়েছেন। রুটি খাওয়ার অভ্যেস এখনও তার হয় নি।

কেমন সহ্য হয় না। পেট গোলমাল হয়।

···তাই রাত্রে একখানা রুটি কোনরকমে আলু ছেঁচকি দিয়ে খেয়ে উঠে পড়েন।

—দুধ!

ললিতার কথায় মুখ তুলে চাইলেন, সাদা জলবৎ একটু পদার্থ মাপমত একটা গ্লাসে এনেছে ললিতা।

নগেনবাবু তাই পরম তৃপ্তিভরে একটু একটু চুমুক দিয়ে পান করেন। উষ্ণ একটু স্বাদ সারা শরীরের জীর্ণ কোষে কোষে কেমন যেন একটা চেতনা-আনে।

হাসি পায়, বুড়োর মুখের রেখাগুলোয় ফুটে ওঠে অতীতের সেই সমৃদ্ধির দিন। নিজের বাড়ীতেই দুটো গাইগরু পুষতেন।

বালতি ভর্তি দুধ দুই ছেলে আর স্বামী স্ত্রী তারা চারজনে খেয়ে উঠতে পারতেন না। সেই বট আঠার মতপুরু মিষ্টি সরগুলা দুধ কোথায় আজ হারিয়ে গেছে।

কি যেন নির্মম ব্যঙ্গ করে তাকে শেষ জীবনে এই বস্তুটুকু দিয়ে চলেছে। ললিতাই এরপর এনেছে,

—রেশনকার্ড আর তিনটে ছোট বড় থলে। চাল-গম আর চিনি আনতে হবে। সেইসঙ্গে নাতিদুটিকেও পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে ইস্কুলে।

বেলা হয়ে গেছে চিন্ চিন্ করছে ভাদুরে রোদ, জীর্ণ ছাতাটা বগলে নিয়ে পথে বের হলেন নগেনবাবু; চোখে ভালো ঠাওর হয় না তার নিজের সঙ্গে ওই দুটি নাবালক নাতি।

এমনিতেই মা বাপের মমতা এড়িয়ে এপাড়া সে পাড়া লাট্টু-গুলি ফুটবল খেলে বেড়ায়। ঘুড়ির মাঞ্জা কিনতে হাটখোলা থেকে বিশপয়সার ট্রামে ওঠানামা করে কড়েপুকুর অবধি যেতে দেয়।

ললিতা তবু সাবধান করে।

—দেখে শুনে নিয়ে যাবেন বাবা, যা ট্রামবাসের ভিড়।

—নগেনবাবু কোনরকমে ওদের সামলাবার চেষ্টা করেন।

—ও দাদু!

নগেনবাবু চমকে ওঠেন চাল! গম-চিনি-সবই চাই বাবা।

কার্ড আর টাকাটা এগিয়ে দেন কম্পিত হাতে।

চাল! মসৃণ সোনালী দানাদানা বস্তুগুলোর সঙ্গে বাড়ীর যেন অচ্ছেদ্য সম্পর্ক, ওরই উপর মরণ বাঁচন নির্ভর করছে। একজনের কাছে ওর দাম প্রাণের চেয়েও বেশী, অন্যজনের কাছে ওর দাম শুধু টাকার অঙ্কেই। অনেক টাকা।

…সব মায়া বাঁধন আত্মীয়তার সূত্রেও মানুষকে বেঁধে রেখেছে ওই বস্তুটুকু, যুগে যুগে মানুষকে বিপর্যয়ের সম্মুখীন করেছে, কত রাজা ভাঙ্গাগড়া চলেছে ওকে কেন্দ্র করেই। গড়ে উঠেছে কত সোনার সংসার আর তারই অভাবে সংসার ভেঙ্গে তছনছ হয়ে গেছে, নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে জনপদ।

থলির কোনে লেগে রইল ও দানা ক'টা। গম আর এইটুকু চিনি। সারাসপ্তাহের দিন গুজরাণের আয়োজন।

নগেনবাবু লাইন থেকে সরে এলেন। রোদে ধুঁকছেন।

কোন রকমে তিনটে থলে নিয়ে এগিয়ে আসেন বাড়ীর দিকে। রাস্তার ধারে কোথাও এতটুকু ছায়া নেই।

ছায়ার আশ্বাসও নেই। পায়ের তলে রাস্তা তেতেউঠেছে, মাথার টাকটা চিন্ চিন্ করছে রোদের তাতে, ঘেমে নেয়ে উঠেছেন, কম্বুরাটা লেপটে লেগে গেছে গায়ের সঙ্গে। হাতটা টনটন করছে।

একটা বাড়ীর রকে থলেগুলো রেখে একটু দম নিচ্ছেন। ভেষ্টাও পেয়েছে মনে হয় একটু জিরোতে

পারলে ভালো হতো। হাঁটবার শক্তি নেই ওই কয়েক কে-জি বোঝা বয়ে। কে-জি; নগেনবাবু আজীবনের খেয়া মন সের ছটাকও ভুলে যেতে বসেছেন, আবার নোতুন করে হিসাব শিখতে হয়েছে।

এখনও বাঁচতে হবে।

হাসিও পায়। কে বলে ওঠে,

—চাল কোত্থেকে আনলেন দাদু? কেশনে? কেমন চাল দিচ্ছে?

চাল্লি চাল! তাই নিয়ে এত প্রশ্ন উৎকণ্ঠা। লোকটার চাহনি কেমন ভালো লাগেনা। নগেনবাবু থলেগুলো তুলে নিয়ে চলতে থাকেন লোকটা কাছে এসে বলে।

—চাল চাই?

নগেনবাবু অবাক হয়ে ওর দিকে চাইলেন। চাল আবার চাই না?

সেদিনই তো ললিতা কেশব সবাই কতকরে বকলে ওঁকে। কত লোক বাইরে থেকে চাল যোগাড় করে আনছে আর তিনি কিনা বসে বসে ভোগ লাগাচ্ছেন, কেশবের চালে চলে এতবড় মেয়েরে! তার ওপর আবার একটি কুকুর? সব বিদায় করে দেবে কেশব চাল না পেলে।

ভুলো কুকুরটা কেশবের ওসব কথা ঠিক বুঝতে পারেনি, তবে এটা বুঝেছে কিছু দিন থেকে তার আহার ঠিকমত জুটছে না।

নগেনবাবুই ওকে এনেছিলেন আজ প্রায় আট বছর আগে এই এতটুকু থেকে মানুষ করেছেন।

তখন প্রাচুর্য ছিল, চাকরীও ছিল তাঁর। সংসারে অভাবের কালো ছায়া নামেনি আজকের মত এমনি হৃদয় হীন হয়ে ওঠেনি মানুষ। তাই জীবে দয়া কেউ এক আধটু দেখাতো।

নগেনবাবু লোকটার দিকে চেয়ে থাকেন। বলে ওঠেন।

—চাল পাওয়া যাবে?

হাসে লোকটা ওর কথায়! মনে হয় বুড়ো নেহাৎ সাবেকেই। তখন নেই বললে তাই সত্যি থাকতো না। লোকটা জবাব দেয়,

পাবেন। তবে একটাকা বিশ নয়াপয়সা কেজি। দরকার হ'লে সন্ধ্যার দিকে পার্কের ওই কোনে আসবেন। হরিলালের নাম করবেন পানের দোকানে তা বলেই হবে।

—একটাকা বি—শ নয়া পয়সা কেজি!

বিড় বিড় করছেন নগেনবাবু, কথাটা কেমন প্রচণ্ড একটা চড়ের মত এসে গালে লেগেছে বোধহয়। হক চকিয়ে গেছেন তিনি। হরিলাল অবশ্য এসব দেখবার জন্য দাঁড়িয়ে নেই।

নগেনবাবু কত মাইনে পেতেন আজ ঠিক মনে পড়েনা। তবে একটাকা বিশনয়া পয়সার অনেক গুণ বেশী নিশ্চাই। কিন্তু চাকরী থেকে রিটায়ার করার পর ক্রমশঃ সব সম্বল নিঃশেষ হয়ে গেছে।

…দুপুরে বাড়ী ফিরতেই ললিতা একটু বিরক্তই হয়।

—এত বেলা অবধি লাগলো কেশন আনতে?

—দেরী হয়ে গেল বৌমা। এখুনিই চান করে নিচ্ছি।

নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। ঘর ঠিক বলা যায় না। সিঁড়ির নীচেকার একটা অংশ। এতদিন পড়েই ছিল, ওটাকে পাঁচইঞ্চি পার্টিশান ওয়াল দিয়ে একটা ঘরের মত করা হয়েছে, সামনেতে

বাই চারহাত একটা খুপরী। তার ঘর খানা ওরা ভাড়া দিয়ে দিয়েছে একটা সেলাই এর কল মিস্ত্রীকে। বাইরের ঘর থেকে তিনি এসে সিঁড়ির তলাকার খুপরীতে আশ্রয় নিয়েছেন।

প্রায়ান্ধকার ঘর খানা, ফাউণ্ডেশনে ঘরে ঢুকতেই ল্যাজ নেড়ে কুকুরটা একবার উঠে দাঁড়াল, এগিয়ে এল ওর দিকে।

—খাস্‌নি খুলো ?

কুকুরটা একবার ওর দিকে চাইল। কেমন বুড়ো কদাকার হয়ে গেছে বলিষ্ঠ কুকুরটা, তার মতই ও আজ বাতিল—জরাজীর্ণ।

দুচোখের কোলে কেমন জলের দাগ।

নীরব আকুতি ভরা চাহনিতে চেয়ে থাকে কুকুরটা ওর দিকে।

নগেনবাবুর ঘরের এককোণেই পড়ে থাকে। বাইরে অন্য কোনদিকে গেলেই তেড়ে আসে ললিতা না হয় নাতিরা। কেশব তো সেদিন ওটাকে এমন লাথি মেরেছিল যে বেচারা ঘুরে পড়ে গিয়ে ছিল, নগেনবাবু ছুটে গিয়ে জলটল দিতে থাকেন।

কেশব গজরায়।

—মরেওনা। বুড়ো হয়ে গেছে চোখ গতর গেছে তবু এবাড়ীথেকে যাবার নাম নেই। বসে বসে খাওয়াও ওই সব অপোগণ্ডদের।

নগেনবাবুও এবাড়ীর পোষ্য। কোম্পানীর চাকরী, পেন্সান নেই।

নগদ যাহিল ভাগিয়ে বাড়ীটা করে আজ তিনি এদের হাতের তলেই পড়ে আছেন।

কুকুরটার মত ওদের কাছে তিনিও আজ বোঝামাত্র। তবু নিজের গতর দিয়ে যতটুকু পারেন চেষ্টা করেন কায় করবার।

তবু ও মনে হয়, এই দুর্দিনের বাজারে অনেক বেশীই নিচ্ছেন তিনি ছেলের কাছ থেকে।

দেওয়ালে টাঙানো ছবিটার দিকে চেয়ে থাকেন নগেনবাবু, ময়লা হয়ে গেছে। ঠিক আসল চেনা যায় না সুমিতার। অনেকদিন আগেকার ছবি।

আজ সুমিতা অমনি সেপা পোছা একটু স্মৃতিতেই পর্যবসিত হয়েছে। ঠিক চেনা যায়না অনেক কষ্টে কল্পনা করে নিতে হয় অতীতের সেই দিনগুলোকে—তার স্ত্রীকে।

—হয়েছে আপনার ? ললিতার কণ্ঠে বিরক্তির সুর ফুটে ওঠে।

—এত বেলা অবধি হেঁসেল আগলে থাকতে পারবো না !

সাফ জবাব দেয় ললিতা। অপ্রস্তুত হয়ে ওঠেন নগেনবাবু।

—যাই মা।

...সামান্যই উপকরণ। এক কোণে চাটি ভাত আর খান দুয়েক রুটি। রুটির ব্যবস্থা করেছে কেশবই। নগেনবাবু কিছু বলতে পারেন নি। একবেলা ভর পেট ভাতও খাবার অধিকার তার নেই।

কেশব ওকে সান্ত্বনা দেবার সুরেই বলেছিল,

—তবু বয়স হয়েছে। রুটিটা খাওয়া ভালো। বড্ড কিট্ থাকবে।

হাসেন নগেনবাবু মনে মনে। এখনও দেহটাকে ফিট্ সুস্থ কর্মক্ষম রাখতে হবে। সত্তর বছর পার হয়ে গেছে।—এখনও চায় কায় করাতে।

ভাতের গ্রাস তামতে গিয়ে থামলেন নগেনবাবু।

কুকুরটা কাতর নয়নে চেয়ে আছে তাঁর মুখের দিকে, জীর্ণ দেহের চোখের কোণে কীসের কি একটু মিনতি।

মুখে তুলতে গিয়ে পারলেন না। একটু আলুর তরকারী মাছ এর নাম গন্ধও নেই। ক'দিন হলে হয়ে ফিরেছেন। বাজারে মাছ নেই।

অলি গলিতে যদি বা মেলে ছটাকা কিলো। থালিহাতে চুপকরে সরে এসেছেন তিনি ও কেনার সাধ্য নেই। ছ'টাকার চালে কিনলে তবু···ফেনে ভাতে খাওয়া যাবে।

—আর একমুঠো ভাত দিও মা!

নগেনবাবু ভাত চাটি নাড়াচাড়া করতে করতে অনুনয়ের সুরে কথাটা বলেন। আর একমুঠো ভাত হলে, নিজের তুপ্রাস হবে; কুকুরটাকেও দেওয়া যাবে চাটি।

···সলিতার কানে কথাটা গেছে। শুনে ও শোনেনা সে।

—বৌমা!

বুড়ো কেমন ভিখেরীর মত কাতর স্বরে ডাকছে। হাড়িতে ভাত আর অবশেষ নেই। ওদের দিয়ে যুয়ে যা ছিল তাই পড়ে আছে এককোনে।

রেগে উঠেছে সলিতা। মুখ গোঁজ করে ওর পাতের উপর ভাত কটা এনে নামিয়ে দেয়।

ডালের জলটুকু মাখিয়ে একগ্রাস ভাত নগেনবাবু মুখে তুলে তৃপ্তিভরে চিবোতে থাকেন। একটা অতি পরিচিত স্মৃতি জাগে মনে।

আগে ছুটির দিন তিনবার ভাত চেয়ে নিতেন। সুমিতা হাসতো।

—এই তো খাওয়ার মুরোদ!

···ডাল আর মাছের ঝাল দিয়ে বাড়তি ভাত চাটি খেয়ে শেষপাতে একটু দইও খেতেন, আমের সময় আম।

সলিতা চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখছে ওদিক থেকে। বুড়োর জীর্ণ মুখে কেমন যেন আনন্দের একটা আভা ফুটে উঠেছে। গজগজ করে সলিতা। ওর নিজের মুখের ভাতগুলো তুলে দিয়েছে আর একজনকে।

হঠাৎ অবাক হয়!

নগেনবাবু ভাতগুলো খেলেন না। থালা সমেত তুলে নিয়ে বের হয়ে গেলেন উঠানে। বুড়ো কুকুরটা উঠে আসে।

মুঠো করেক ভাত ওকে নামিয়ে দিয়েছেন বুড়ো কুকুরটা পরম তৃপ্তিভরে লাজ নেড়ে খেয়ে চলেছে ভাতগুলো। ওর গায়ে পিঠে হাত বোলাচ্ছেন নগেনবাবু।

সলিতার সর্বাঙ্গ জ্বলে ওঠে। শেষ মুঠোখানেক ভাত থালায় নিয়ে একটু তরকারি মাখিয়ে খেয়ে বেশ খানিকটা জল গিলে ঘরে গিয়ে শুলো।

নগেনবাবুর এই ব্যবহার আজ সলিতার মাথায় আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। তার চেয়ে বেশী হল ওই কুকুরটা। এতবড় অপমান সলিতা চুপ করে সইবে না কোনমতেই।

বৈকালের দিকে সলিতার কাছে কথাটা পাড়েন নগেনবাবু।

নিজের পুঁজি হাতড়ে দেখেছেন মাত্র বারো আনা আছে একটা টিনের কৌটায়। অনেক সঙ্গোপনে রাখতে হয়েছে সেই পয়সা ক'টিকে। বংশধর নাতিদের যদি সন্ধান পায় তখুনি তার ব্যবস্থা করে দেবে।

বাজার থেকে দুএক আনা বাঁচিয়ে ওই এখন তার সঞ্চয় ওতে এক কেজি চালও হবে না। তাই কথাটা বলে।

চাল আছে মা! একজন বলেছে তবে দর বেশী চাইছে।

একটাকা চার আনা কেজি।

ললিতা চটেই ছিল। জবাব দেয়।

এতদাম দিয়ে চাল কিনে ভূতভোজন করাতে পারবো না। চালে দরকার নেই। আটা খেয়েই থাকবো।

থেমে গেলেন নগেনবাবু ওর থমথমে মুখের দিকে চেয়ে। অন্যদিন বৈকালে একটু চা দেয় ললিতা, আজ সে দিকেই গেল না।

একটু অপেক্ষা করে ব্যর্থ হয়ে নিজেই বের হয়ে পড়লেন নগেনবাবু হরমথাদের বাড়ীর দিকে। সন্ধ্যের মুখে গেলে তবু একটু চা হয়তো মিলতে পারে সেখানে। চোখে ভালো ঠাওর হয় না তবু লাঠিটা হাতে নিয়ে বের হয়ে পড়েন তিনি।

নাতিরা তখন বাড়ীতে ফুলক্রাম বাধিয়েছে। পাউরুটি সেঁকার গন্ধ উঠছে, মাখনও পড়েছে গরম রুটির গায়ে। সুমিতা তাকে মাঝে মাঝে টোস্ট করে দিত। বেশ মিষ্টি লাগতো গন্ধটা।

ওই গন্ধটা তার চেনা।

কুকুরটা একবার ল্যাজ নাড়ে ওর মাথায় গায়ে হাত বুলিয়ে বের হয়ে পড়েন নগেনবাবু।

কথাটা কদিন ধরে কেশবও ভাবছিল।

বাইরে যা পায় তাতে কোন মতে টেনেটুনে তাদের সংসার চলে মাত্র ডাল ভাত খেয়ে। তার উপর এমনি বাজারে চাল সংগ্রহ করা সমস্যা—মাচ তো নেই। তেলও তেমনি।

এতটাকা কোথায় তাদের। কুকুরটাকে আজ সত্যই বোঝা বলেই মনে হয়। ওর জন্য চার পয়সার বিস্কুট আনেন নগেনবাবু বাজার থেকে।

ললিতা বলে।

—ছেলেদের না খাইয়ে কুকুরকে বিস্কুট খাওয়ানো হয়। আজ আমার ভাতগুলো চেয়ে নিয়ে খাওয়াচ্ছেন দেখি ওই কুকুরটাকে।

কেশব সবে অফিস থেকে ফিরেছে। ট্রাম বন্ধ। সারাপথ হেঁটে এসেছে, হাঁপাচ্ছে। অফিসেও গোলমাল লেগেই আছে। মন মেজাজ এমনিতেই ভাল নেই ললিতার কথাগুলো শুনে রেগে ওঠে।

—দিন গেলে একপোয়া চাল লাগে কুকুরটারই। আজ বলছে চাল বাইরে কেনা যায়। এক টাকা চার আনা সের কিছু আনতে হবে।

কেশব গর্জে ওঠে।

—মুখ করতে পারো না আপদ বিদেয়!

ললিতা বেশ ঝোঁঝের সঙ্গেই চলেছে তবু কড়াইএ'

—তোমার বাবা। আমি কি বলবো!

কেশব কি ভেবেছে। হঠাৎ ছোট ছেলের চীৎকার শোনা যায়।

বের হয়ে আসে কেশব।···কুকুরটা গোঁ গোঁ করছে ঘরের মধ্যে আর কেশবের ছোট ছেলে মদন দাদুর বালিশের তলে থেকে ওর সঞ্চিত শেষ বারোআনা পয়সা চাতিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বেরবার পথ নেই।

কুকুরটা আগলে রেখে গোঁ গোঁ করছে।

ললিতা চীৎকার করে ওঠে—খেয়ে ফেললে গো মদনকে।

কেশব ছুটে এসেছে একটা ছাতার বাঁট সামনে ছিল তাই নিয়েই। যা কতক কসে দিতে কুকুরটা সরে দাঁড়াল, আর্তনাদ করছে।

কেশব আজ মনস্থির করে ফেলেছে। এতদিন ভেবেছে কথাটা, আজ সব বাবস্থাই করে ফেলবে। ললিতা বলে ওঠে।

—কোথায় বের হচ্ছো? এই এলে।

কেশব একটা দড়ি দিয়ে কুকুরটাকে বেঁধে নিয়ে তৈরী হয় বাইরে যাবার জন্য। অন্ধকার রাত। চোখেও ভালো দেখতে পায় না কুকুরটা।

ওকে নিয়ে গিয়ে দু একটা রাস্তা পার হয়ে ভাববাজারের মুখে ছেড়ে দিয়ে আসবে।

কেশব স্ত্রীর কথায় জবাব দেয়—আসছি।

ললিতা মনে মনে খুশী হয়। তবু একটা আপদ যা হোক বের হল বাড়ী থেকে।

নগেনবাবু বাড়ী ফিরছেন খুশিমনে।

মহাজনশাহ কিছু চালের সন্ধান দিয়েছেন, দর একটু কমই এক টাকা কেজি। তবু কিছু কিনতে বলবে কেশবকে।

তাঁর ঘরটা ভাড়া দিয়েছে মাসে তিরিশটাকা আসে, ন্যায়তঃ সেটা তাঁরই প্রাপ্য, আজ সেই কথা বলবেন তিনি। তবু ও টাকাতে চালটা হলে বেশ চলে যাবে।

আবছা অন্ধকার লাগে পথে। কেমন ঝাপসা ঝাপসা ঠেকে। একটা হর্নের শব্দ কানে আসে, ছিটকে লাফ দিয়ে ওঠেন নগেনবাবু। লাঠিটা রাস্তায় পড়েছে।

একটা কলরব ওঠে। পাশ দিয়ে গা ঘেঁসে লরীটা বেগে বের হয়ে গেল, মালবোঝাই বিরাট একটা লরি। ড্রাইভার গালাগাল দিচ্ছে—শালা বুড্ডা অন্ধা বাহের হ্যায়।

লোকজনও সাবধান করে।

—এমনি সময় আর পথে বের হতে আছে দাদু। গেছলেন তো গাড়ীর তলায়।

কে লাঠিটা কুড়িয়ে দেও ওর হাতে। গাড়ীর একটা চাকা চলে গেছে তার ওপর দিয়ে। মুচকে গেছে এতদিনের সঙ্গী লাঠিটা। কোনরকমে বাড়ী ফেরেন নগেনবাবু। হাঁটতে কষ্ট হয়। বুকের ভিতর একটা অসহ্য বেদনা, কেমন ঘম বন্ধ হয়ে আসে। পা পা করে এসে ঢুকল।

শুন্য বাড়ীটা।

নিজের ঘরের দিকে এগিয়ে যান নগেনবাবু। ভাঙা লাঠিটা রেখে বিছানাতেই শুয়ে পড়েন। কেমন জলতেষ্টা পায়।

মদন !

মদন যেন তৈরী হয়েই ছিল, ঘরে ঢুকতে নগেনবাবু বলেন,—একগ্লাশ খাবার জল দিবি ভাই।

জলটা এগিয়ে দিয়ে মদন বলে চলে,

বুঝলে দাদু, বাবা ফুলোকে দড়ি বেঁধে টানতে টানতে বাইরে নিয়ে গেছে। বলেছে ওকে নাকি খাল পার করে ছেড়ে দিয়ে আসবে।

নগেনবাবু জলটা খেতে গিয়ে থামলেন, এদিক ওদিকে চাইছেন। সত্যিই কোনটা খালি, ফুলো নেই।

বুকের মাঝে কেমন একটা আতঙ্ক আর ঘৃণার পুঞ্জীভূত বিক্ষোভ ওঠে।...ওরা ওকে এই বৃদ্ধ বয়সে অসহায়ের মত কোথায় দূর করে দিয়ে এল।

কেন তা জানে !...চাষি মাত্র চালের সাম্রাজ্যের জন্য আজ ওরা অমানুষ হয়ে উঠেছে। কে জানে ওকেও তারা এমনি অসহায়ের মত রাতের আঁধারে ফেলে দেবে হয়তো।

কেশব বাড়ী ফিরেছে।

নগেনবাবুর চোখে ভয়ের চিহ্ন। নীরবে ছেলের দিকে চাইলেন।

কেশব ভিতরে চলে গেল গম্ভীর ভাবে।

রাত কত জানেন না নগেনবাবু।

জানলা দিয়ে একফালি আকাশ দেখা যায়, তারা জ্বলা আকাশ। ওরই অসীমে কোথায় তার স্বপ্নমন ব্যর্থ হয়ে কেঁদে ফেরে অতীতের সন্ধানে। কোণের জায়গাটা ফাঁকা।

তার বহুদিনের সঙ্গী বুড়ো কুকুরটাও আর নেই। রাতের আঁধারে পথ খুঁজে খুঁজে ফিরছে সে—অসহায় একটি প্রাণী। কোথাও আপনজন নেই, তাঁবাহীন ক্রন্দনে রাতের নির্জন অন্ধকার ব্যথাতুর হয়ে উঠেছে।

...না হয়...চোখে দেখতে পায় না, কোন গাড়ীর হেডলাইটের আলো এসে চোখে পড়েছে, সরে দাঁড়াবার অবকাশ নেই। বিশাল দুর্মদ কোন লরী এসে পড়বে ওর ঘাড়ে।

একটা প্রাণ নিংড়ানো আর্তনাদ। রাস্তায় পড়ে থাকবে খানিকটা রক্তের দাগ, তাও মুছে যাবে !

...চাল !

নগেনবাবুর জন্য দুবেলা কাল থেকে রুটির বরাদ্দ হয়েছে। ওতে নাকি শরীর ভাল থাকে —কেশব তাই বলেছে।

রাত কত, জানেন না নগেনবাবু। এক অসহায় একটি প্রাণী রাত্রির নিঃশেষে অন্ধকারের দিকে চেয়ে থাকেন। এ আঁধারের যেন শেষ নেই।

———

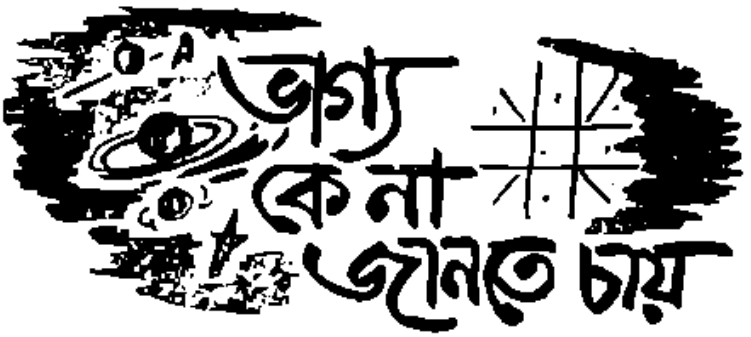

মহাভারত শর্মা

অজানাকে জানবার যে চিরন্তন আগ্রহ এবং অদম্য ইচ্ছা মানুষের মনে থাকে তা-ই ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশান্বিত হবার অন্যতম কারণ। ইংরাজ কবি পোপ বলেছিলেন, মানুষের হৃদয়ে আশা জাগে চিরদিন (Hope springs eternal in human breast)। বস্তুতঃ এই আশা আছে বলেই মানুষ নানাপ্রকার অভাব অসুবিধা দুঃখ কষ্টের পীড়ন সহ্য করে। অপেক্ষা করে থাকে কবে পুনরায় সুদিন আসবে। তার ভাগ্য গ্রহ নক্ষত্রের সংস্থানে কতটা আশার আশ্বাস রেখে সে কথা জেনে নিয়ে অগ্রসর হবার মত মানসিক শক্তি সঞ্চয় করে। জ্যোতিষ শাস্ত্র এখানেই তার উপকারে আসে। মানুষের নিজের কথা, তার স্ত্রীর স্বাস্থ্য, পুত্রের বিদ্যা ও কর্ম, কন্যার উপযুক্ত পাত্রে বিবাহ সবই ঐ গ্রহ নক্ষত্রের দ্বারা কিভাবে প্রভাবিত হয়েছে পূর্বাহ্নে জানতে চায়। এ জানাতে তার নিশ্চিন্ততা আসে। সংসারী মানুষের মন দুশ্চিন্তামুক্ত হলে তার সুখ শান্তি এবং আয়ু বৃদ্ধি পায়। জ্যোতিষশাস্ত্র মানুষকে দুশ্চিন্তামুক্ত হতে সাহায্য করে।

এ হল জ্যোতিষ শাস্ত্রের সাধারণ প্রয়োজনের দিক। অপর দিকে বহু ব্যবসায়ী তাঁর ব্যবসায়ের প্রয়োজনে, শেয়ার বাজারের ঘাপাস অথবা সট্টাকারক অর্থবিনিয়োগের প্রশ্নে, অন্তহীন শত আহত নরনারী তাদের ইচ্ছার সার্থকতার সন্ধানে জ্যোতিষীর শরণাপন্ন হন। বিগত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কালে এক বিশিষ্ট ব্যাঙ্কার কলকাতার ওয়েলিংটন স্কোয়ারের নিকটে অনেক জ্যোতিষীর নিকট যেতেন। তাঁর নানাপ্রকার প্রশ্ন মহাভারত শর্মা শুনতেন। একটি প্রশ্ন ছিল, কলকাতার শিয়ালদহে অবস্থিত শ্রীদুর্গা কটন মিল তিনি কিনবেন কিনা। মিলটি তখন হস্তান্তরিত হবার কথা চলছিল। শেয়ার বাজার সম্বন্ধেও তিনি নানাপ্রকার প্রশ্ন করতেন। কলকাতা নিবাসী রাজস্থানের এক বিখ্যাত ব্যবসায়ী পরিবার তাঁদের শিল্প সম্বন্ধীয় নানাপ্রকার প্রশ্ন জ্যোতিষীকে দিয়ে বিচার করেন। প্রমিক সোসাইটির সময় তাঁদের উদ্বিগ্নভাব জ্যোতিষীর গণনার উপলক্ষ হয়। আর, অন্তহীন শত ব্যথিত নরনারীর অসংখ্য কাহিনী সকল জ্যোতিষীই বলতে পারেন।

ভাগ্য জানবার ইচ্ছা সমাজের স্তরভেদে অল্পাধিক যা-ই থাক না কেন এর প্রয়োজন কতখানি মনের উপর নির্ভরশীল। মনের অস্থিরতা যাঁদের আছে তাঁদের মধ্যে অনেকে নানাপ্রকার ব্যর্থতা ও হতাশার ফলে ভাগ্য-নির্ভর মনোবৃত্তির হয়ে পড়েন। অন্য অনেকে তাঁদের অর্জিত সাফল্য বজায় থাকবে কিনা অথবা আরও উন্নতি হবে কিনা জানতে চান। আবার কেউ কেউ নিছক কৌতূহলের বশে কিংবা একটি বিশেষ ব্যাপারে নিশ্চিত হবার জন্য জ্যোতিষীর নিকটে যান এবং এ যাওয়া তাঁদের ক্রমশঃ বেড়ে চলে। পরে তা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যায়। এরাই বৃত্তিধারী জ্যোতিষীদের

প্রধান অবলম্বন। জ্যোতিষী ভাল হলে মন্ত্রীসভাকে স্পষ্টভাবে সহজ কথায় তাঁর বিচার ফল বলে দেন। কিন্তু অধিকাংশ জ্যোতিষী এই শাস্ত্রের ব্যবসায়ী—তাঁরা পরিষ্কার ভাবে সব কথা খুলে বলেন না। মন্ত্রীসভা যা শুনলে খুসী হবে এমন কথা বলেন। দুষ্টগ্রহের কুপ্রভাব বা ক্রোধ উপশমের জন্য কবচ মাদুলী, পাথর মুক্তা প্রভৃতিরও বিধান দেন। ফল হয় না এমন নয়। কিন্তু দেখা গেছে এতে অন্যান্য ক্ষতিও হয়ে পড়ে।

তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় রাত্রি আনোয়ার। শোলদিঘীর পূব দিকের ফটকে, সন্ধ্যাবেলা কাশীরামের সঙ্গে দেখা হল হঠাৎ। সে বলল, দাদা শুনেছ? শঙ্কর মারা গেছে?

বজ্রাহতের ন্যায় স্তব্ধ হয়ে গেলাম। শঙ্কর মারা গেছে? ছাব্বিশ বছরের দৈত্যাকার যুবক যে নিগ্রো সৈন্যদের সঙ্গে সমানভাবে পাল্লা কষত আর শিশুর ন্যায় সরল-প্রাণ ছিল। এই তো সে দিন ছ সপ্তাহ হয় নি, সে আসামে গেল তার কাজে যোগ দিতে। এরই মধ্যে কি হয়ে সে মারা গেল?

কাশীরামের কাছে শোনা গেল সব কথা। মণিপুর ইম্ফল যাবার পথে মোটর দুর্ঘটনায় সে মারা গেছে। গাড়ী উলটে পাহাড়ের নীচে পড়ে বুকের পাঁজর ভেঙে ফুসফুস হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে যায়। খবর পেয়ে শঙ্করের দাদা শ্রীপতি গিয়েছিল সেখানে। তার জামাকাপড় সুটকেস নিয়ে এসেছে। আর এনেছে একটা নীলার আংটি। শ্রীপতি তাঁর আঙুল থেকে আংটিটা খুলে কাশীরামকে দেখিয়েছে। বলেছে, দুর্ঘটনার সময় শঙ্করের আঙুলে ঐ আংটি ছিল।

মুহূর্তের মধ্যে সব ঘটনা মনে পড়ে গেল। আসাম যাবার আগে শঙ্কর কোন জ্যোতিষীকে হাত এবং কুষ্ঠি দুই-ই দেখিয়েছিল। তার পরামর্শে সে কুগ্রহের প্রভাব কাটাতে একটি নীলার আংটি ধারণ করে মনে পড়ল, তাকে নিষেধ করেছিলাম যে, নীলা পাথর না ধারণ করাই ভাল।

কাশীরামকে বললাম, শ্রীপতি আবার ঐ আংটি হাতে দিতে গেল কেন?

আমিও শ্রীপতিকে সেকথা বলেছি। বলেছি ওটা খুলে রাখতে।

পাঁচদিনের দিন সকালে কাশীরাম এল। বলল, কাল বিকেলে শ্রীপতি মারা গেছে। সেদিন রাত্রেই জ্বর হয়—মেনিনজাইটিস। চারদিন সে ভুগেছিল।

জিজ্ঞাসা করলাম, আংটিটা?

আংটিটা শ্রীপতির হাতেই ছিল। দাহ করবার সময় শ্রীপতির ছোট ভাই বলাই ওটা সঙ্গে ফেলে দিয়েছে।

জ্যোতিষী উপযুক্ত না হলে, তাঁর গণনা নির্ভুল না হলে ব্যক্তির জীবনে যে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে রাষ্ট্রের জীবনেও তা সম্ভব। আন্তর্জাতিক জ্যোতিষও একটি বিশেষ কৌতূহল জনক বিষয়। জাতির ভাগ্য নিয়ে এ বিষয়ে বিচার চলে। ভবিষ্যৎ জানবার আগ্রহ মহাশক্তিধর দুর্ধর্ষ বীরেরও থাকে। অ্যাডলফ হিটলার রহস্যে অধিত ছিলেন। তাঁর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, অপরিমেয় সংগঠনী ক্ষমতা, ইচ্ছাশক্তির তীব্রতা এবং সর্বোপরি বিপদবরণ করবার অসীম সাহস প্রশ্নাতীত। তিনি পৃথিবী জয়ের আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন। অথচ জ্যোতিষীর সঙ্গে তিনি তাঁর কর্মের সম্বন্ধে আলোচনা করতেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আরম্ভকাল তিনি তাদের পরামর্শ অনুসারে স্থির করেছিলেন, একথাও শোনা যায়।

অনুরূপ ইচ্ছায় হিটলারের অগ্রজ নেপোলিয়নের নামও এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে। তিনি হাতের রেখা আলোচনা করতে ভালবাসতেন। তাঁর তর্জনী মধ্যমিকার অপেক্ষা দীর্ঘ ছিল, অঙ্গুলির এবং অঙ্গুষ্ঠ লক্ষণ পৃথিবীর ইতিহাসে আর শোনা যায় নি। হিটলার জ্যোতিষীর বিচার ও বচন মানতেন এবং ঐ সর্বনাশা যুদ্ধ আরম্ভ করবার দিনক্ষণ জ্যোতিষীর পরামর্শ অনুসারে নির্দিষ্ট করেছিলেন, এমন কথা শোনা গেছে। কিন্তু এ কথা কোনদিন জানা সম্ভব হবে না, জ্যোতিষীরা তাকে ঐ পরামর্শ নির্ভয়ে দিতে পেরেছিল কিনা!

এমনই এক রাজনৈতিক ঘটনা জ্যোতিষীর পরামর্শে প্রভাবিত হয়ে বাঙ্গালীর ভাগ্য নির্ধারণ করেছিল বহু শতাব্দী পূর্বে। মহারাজ লক্ষ্মণসেন তখন বাংলার অধিপতি। বখতিয়ার খিলজী বিহার জয় করেছেন। বাংলার দিকে তিনি অগ্রসর হবেন এমন সংবাদ মহারাজের নিকট এসে পৌঁছেছে। কিন্তু "রাষ্ট্রের প্রধান প্রধান ব্যক্তি, মন্ত্রীবর্গ এবং জ্যোতিষীরা তখন লক্ষ্মণসেনকে পরামর্শ দিলেন, তুর্কী অভিযাত্রীকে বাধা দিয়ে কাজ নাই দেশ পরিত্যাগ করাই যুক্তিযুক্ত, কারণ শাস্ত্রে লেখা আছে এই দেশ তুর্কীদের দ্বারা বিজিত হইবে!···ব্রাহ্মণ জ্যোতিষীদের জ্যোতিষগণনা···জ্যোতিষে সমসাময়িক জন সাধারণের অত্যধিক বিশ্বাসই সূচিত করে।···রাজারা স্বয়ং জ্যোতিষচর্চা করিতেছেন, বল্লাল ও লক্ষ্মণসেন দু'জনেই জ্যোতিষের গ্রন্থ লিখিতেছেন ···" (ডক্টর নীহার রঞ্জন রায়—বাঙ্গালীর ইতিহাস) বখতিয়ারের বাংলা জয়ের অন্যান্য কারণের সঙ্গে এ কারণও অবশ্য স্বীকার্য যে জ্যোতিষী তখন রাষ্ট্রবুদ্ধির নিয়ামক ছিল।

জ্যোতিষ চর্চার প্রভাব জীবনের সর্বক্ষেত্রেই দেখা যায়। ইহার প্রয়োজন সব অবস্থার লোকেরই সমান।

ইহা মিথ্যা বা অবিশ্বাস্য নয়। দক্ষ ও অভিজ্ঞ জ্যোতিষী কখনও বৃথা আশ্বাস দেন না।

মৃত্যু সম্বন্ধে গণনা করে বলেন না। মক্কেলকে অযথা ভয় পাইয়ে দেন না। তাছাড়া, পরামর্শ দেন সর্বদা কর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকতে। তাঁরা শাস্ত্রকারদের উক্তি উদ্ধৃত করে বলেন যে, মানুষ খোঁটায় বাঁধা গরুর ন্যায় জন্মের প্রাক্কালে সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকলেও ঐ সীমার কোন্ অংশে সে থাকবে তা তার ইচ্ছাধীন। সে চেষ্টা তার সর্বদা করা উচিত।

• • • •

বর্ধমানের মহারাজা নয়, জোড়াসাঁকোর জমিদার নয়, একজন সামান্য গৃহস্থ প্রতাপচন্দ্র রায় নিজের অন্তরের নিষ্ঠায় একা ইংরাজীতে অনুবাদ করেছিলেন মহাভারত, চুয়াল্লিশ খণ্ড। শেষ কয়েক খণ্ডের মুদ্রণ বাকী থাকতে প্রতাপ চন্দ্র মৃত্যুশয্যায় শুতে বাধ্য হলেন। চোখে নেমে আসছে শেষ ঘুম। প্রতাপচন্দ্র স্ত্রীকে ডেকে বললেন আমার শেষ অনুরোধ, আমার শ্রাদ্ধে একটি পয়সাও খরচ করো না, সেই পয়সা দিয়ে মহাভারতের অবশিষ্ট অংশগুলি প্রকাশ করো। তাঁর মৃত্যুর এক বছরের মধ্যে স্ত্রী স্বামীর শেষ অনুরোধ রক্ষা করেন। ইতিহাসে কিন্তু প্রতাপের নাম নেই।

মহাকাব্যে হয় দেব-মানবে যুদ্ধ ; এখানে যুদ্ধ প্রাণের সঙ্গে জড়ের। মহাকাব্যের মানব-চরিত্রে দেবগুণের বিকাশ ঘটে, আর এখানে যে প্রাণের কথা আছে, তার ঘটেছে প্রজাপতিতে উত্তরণ। তাই বলা চলে, বিজ্ঞানরসিক রামেন্দ্রসুন্দর গদ্যে মহাকাব্য লিখেছেন। অসৎ পরিক্রমায় বেরিয়ে বিজ্ঞানের যে মহাভাষ্য তিনি রচনা করেছেন, তা' মহাকাব্যের গৌরবে অভিষিক্ত হয়েছে। কিন্তু মনে রাখি মহাকাব্যের এই গৌরবটুকুই রামেন্দ্রসাহিত্যের একমাত্র পাওনা নয়। গীতিকবির সম্মান থেকে বঞ্চিত করলে রামেন্দ্রসুন্দরের প্রতি আমরা অবিচার করব। প্রবন্ধী রামেন্দ্রসাহিত্যে গীতিকবির তন্ময়তা ও আত্মগত ভাবনাকে আমরা যদি উপেক্ষা করি তো সাহিত্যের যথার্থ মূল্যায়ণ সম্ভব হবে না। রামেন্দ্র-সাহিত্যের স্বরূপ বুঝতে হলে, দার্শনিক রামেন্দ্রসুন্দরের যে ব্যক্তিগত ধ্যান-ধারণাগুলো তাঁর বিজ্ঞান-ভাষ্যের মধ্যে আত্ম প্রকাশ করেছে, তাদের জানতে হবে। কারণ, রামেন্দ্রসুন্দর আর দশ জন বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধকারের মতো বিজ্ঞানকে বাইরে থেকে দেখেন নি। দেখেছেন একেবারে ভিতর থেকে,—নিজের বিশ্বাস-অবিশ্বাস, সুখ-দুঃখ এবং আনন্দ-নিরানন্দের সঙ্গে মিলিয়ে। তাই তিনি বিজ্ঞানবিদ্যাকে ভাল লাগা বা মন্দ লাগার কথাটা যেমন অকপটে বলতে পেরেছেন, তেমনি পেরেছেন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সম্বন্ধে তাঁর নিজস্ব বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কথাগুলো খোলসা করে জানাতে। তাই বলা চলে, বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক-প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে মহাকবি ও গীতিকবির যুগ্ম সম্মান রামেন্দ্রসুন্দরের প্রাপ্য।

অন্য কারণেও বাংলা সাহিত্যে রামেন্দ্রসুন্দর এক বিশিষ্ট সম্মানের অধিকারী। মননশীল সাহিত্য জগতে রাজসম্মানে তাঁর প্রাপ্য। একমাত্র রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিলে বাংলার মননশীল সাহিত্যিকদের আর কারও সঙ্গে রামেন্দ্রসুন্দরের কোনো তুলনা চলে না। আর বিজ্ঞান নিয়ে সাহিত্য-রচনার প্রশ্ন যেখানে, সেখানে তিনি অতুলনীয়। বিজ্ঞানের দুরূহ ও জটিল তত্ত্বকে এমন অনুপম করে বাংলা সাহিত্যে আর কেউ লিপিবদ্ধ করেন নি। ইয়োরোপীয় মিশনারীরা বাংলা সাহিত্যে বিজ্ঞান-চর্চার গোড়াপত্তন করেছিলেন। অক্ষয়কুমার করেছিলেন সার-সংযোজন। কিন্তু সেই ক্ষেত্রে ফুল ফুটিয়েছেন যিনি, যাঁর চেষ্টায় যেখানে ফসল ফলেছে, তিনি হলেন রামেন্দ্রসুন্দর। বাংলা ভাষায় যে উচ্চাঙ্গের বিজ্ঞানালোচনা করা যেতে পারে, তা' রামেন্দ্রসুন্দরই প্রথম দেখালেন। বিজ্ঞান-চর্চার ক্ষেত্রে মাতৃভাষার দৈন্যকে দূর করে উচ্চাঙ্গের সাহিত্য সৃষ্টি প্রথম করলেন তিনিই। মাতৃভাষায় বিজ্ঞান-চর্চার গণ্ডী যে শুধু পাঠ্যপুস্তকের মধ্যেই সীমিত নয়, সাহিত্যে বিজ্ঞানালোচনা মানেই যে কিছু নিতান্ত সহজ-সরল বালকপাঠ্য রচনা নয়, তা' তিনিই প্রথম প্রমাণ করলেন। তাঁরই প্রচেষ্টায় বিজ্ঞানচিন্তার আসরে বাংলা সাহিত্যের সংকুচিত পদক্ষেপের ঘুম কাটল। বিজ্ঞান-চেতনার অনুপালোকে বাংলার মননশীল সাহিত্য সংসার উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। উচ্চাঙ্গের বিজ্ঞান-চর্চায় বাংলা ভাষা সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত, এই মনে করে বাংলাকে যাঁরা অশ্রদ্ধার নির্বাসন-জগতে নির্বাসিত করেছিলেন, তাঁরাও অচিরেই রামেন্দ্রসাহিত্যের মধ্যে মাতৃভাষার বলিষ্ঠতা ও প্রকাশ-ভঙ্গীর দৃঢ়তা আবিষ্কার করে বিস্মিত হলেন। 'প্রকৃতি'র (১৮৯৬) লেখক রামেন্দ্র-সুন্দরের হাতে রহস্যময় জগতের কয়েকটি কালো পর্দা উত্তোলিত হ'ল। 'জিজ্ঞাসা'র (১৯০৪) জড় ও জীব-জগতের নতুন এক রহস্য সন্ধানীকে আবিষ্কার করল বাঙালী পাঠক সমাজ। 'বিচিত্র জগতে' লেখক, এই বিজ্ঞানভিক্ষু সাহিত্যিক প্রাণ থেকে জ্ঞানের জগতে অবতরণ করেছেন, এবং এখানে বসে বিজ্ঞানবিদ্যার সত্যি-মিথ্যে ও ক্ষমতা-অক্ষমতা নিয়ে যে বিচার-বিশ্লেষণ করছেন, বিজ্ঞানীর কর্মশালায় তা' কোনোদিন বসা পড়ে না। সুগভীর এক দার্শনিক-বোধের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির সম্মিলন না ঘটলে, সাহিত্যিক প্রতিভার সঙ্গে বিজ্ঞান-চেতনার ঘনি-কাঞ্চন যোগ না ঘটলে এমন রচনা সম্ভব নয়।

রামেন্দ্রসুন্দরের প্রচেষ্টায় অসম্ভব সম্ভব হয়েছে। বাংলা ভাষার সবচেয়ে উপেক্ষিত একটি দিক সাহিত্য সভার গৌরবের আসন লাভ করেছে। উচ্চাঙ্গের বিজ্ঞান-চিন্তা ও নব নব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার মাতৃভাষায় প্রকাশের পথ খুঁজে পেয়েছে। এ পথ উন্মুক্ত করেছিলেন বলেই বাংলার সাহিত্য-সংসারে রামেন্দ্রসুন্দর নূতন পথের পথিক। এ পথ ধরে মহাবিশ্বের রহস্য অনুসন্ধানে বেরিয়েছিলেন বলেই তিনি জগৎপথিক। এ ছাড়া পথ-পরিক্রমার মতো অনুকূল পরিবেশ রামেন্দ্র জীবনে ছিল। একদিকে তিনি ছিলেন বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাবান ছাত্র, অপরদিকে সাহিত্য-জগতে তাঁর প্রথম পদক্ষেপ-কালে বিজ্ঞান-জগতে ঘটছিল নব নব আবিষ্কার। নূতন নূতন বিজ্ঞানীরা বিশ্বপ্রকৃতির নূতন এক একটি রহস্য-দ্বার উন্মুক্ত করছিলেন তখন। একদিকে বাইরের এই আলোড়ন, অপরদিকে ভিতরের অনুপ্রেরণা রামেন্দ্রসুন্দরকে মাতৃভাষায় বিজ্ঞান-চর্চায় উদ্বুদ্ধ করেছিল। কিন্তু এমন ঘটনা অনেকের জীবনেই তো ঘটে। অনেকেই তো নূতন আবিষ্কারের উত্তেজনায় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচনা করেন। বিজ্ঞান-জগতের সমসাময়িক ঘটনা ও আবিষ্কারকে নিয়ে বিজ্ঞান সাহিত্য সৃষ্টি করেন। সে সব রচনার স্থায়ী কোনো মূল্য আছে কি? অকাতরে বলব, নেই। সাময়িক ঘটনা নিয়ে চিরন্তন সাহিত্য-সৃষ্টি গল্প-উপন্যাসের বেলায় বরং হতে পারে, কিন্তু বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের বেলায় তা' হওয়া খুব কঠিন। কারণ, সময় এগোবার সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানও এগোচ্ছে। নতুন যুগের বিজ্ঞানীরা পুরনো দিনের বৈজ্ঞানিক ধারণাগুলোকে বাতিল করে দিচ্ছেন। তাই একশ' বছর আগেকার অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধই আজকের দিনে অচল। কেননা, যে সব বৈজ্ঞানিক ধারণার উপর ভিত্তি করে ওদের লেখা হয়েছিল, আজ সে সব বাতিল হয়ে গেছে। তবে তো বলতে হয়, সাহিত্যে বিজ্ঞান-চর্চার ক্ষেত্রে চিরন্তনত্ব বলে কিছু নেই। কথাটা সাধারণভাবে হয়তো সত্যি; কিন্তু রামেন্দ্রসুন্দরের মতো লেখকদের ক্ষেত্রে সত্যি নয় কোনোমতেই। রামেন্দ্রসুন্দরের বৈজ্ঞানিক রচনা পাঠ করলে মনে হয়, সমসাময়িক আবিষ্কার ও বৈজ্ঞানিক ধারণাগুলো তাঁর বক্তব্যপ্রকাশে সাহায্য করেছে মাত্র; মূল বক্তব্যের বিষয়বস্তু হতে পারে নি। তার কারণ, রামেন্দ্রসুন্দর জগৎ ও জীবনের এমন সব রহস্য নিয়ে আলোচনা করেছেন, সেগুলো চিরকালের। চিরদিন বিশ্বের মনীষীরা যাদের রহস্য অনুসন্ধান করেছে এবং অনাগত কালেও সে সব রহস্যের সমাধান সুদূর পরাহত, এমন সব দুর্জ্ঞেয় ও রহস্য-ঘেরা চিরন্তন 'জিজ্ঞাসা' গুলোই হ'ল রামেন্দ্রসুন্দরের আলোচ্য বিষয়। তাই মনে হয়, বিজ্ঞানচিন্তার পরিবর্তন ঘটলেও রামেন্দ্র সাহিত্যের চিরন্তনত্ব ক্ষুণ্ণ হবে না কোনোদিন। বরং বাংলার এক অনন্য সাহিত্য-সাধক হিসেবে রামেন্দ্রসুন্দর চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। অতীত থেকে প্রাণ ও প্রাণ থেকে জ্ঞানের জগতে চির-ভ্রমণরত এক মহাপথিক সাহিত্য রসিকদের শ্রদ্ধা ও বিস্ময় উদ্রিক্ত করবেন চিরদিন।

আজ রামেন্দ্রসুন্দরের জন্মশত বার্ষিকী উপলক্ষ্যে চিন্তানায়ক এই জগৎপথিকের উদ্দেশে অন্তরের অকুণ্ঠিত শ্রদ্ধা নিবেদন করি; এবং সেই সঙ্গে প্রশ্ন উত্থাপিত করি;—রামেন্দ্রসুন্দরের স্বপ্ন কবে সফল হবে? উচ্চাঙ্গের বিজ্ঞান-চর্চায় মাতৃভাষার ব্যবহার কবে সুরু করব আমরা? দুর্বলতা, আলস্য ও সংস্কারের মোহপাশ অতিক্রম করে কবে আমরা মাতৃভাষায় বিজ্ঞান-চর্চার মাধ্যমে বাংলার মননশীল সাহিত্য-সাধনার জীর্ণ, ভীরু ও মুমূর্ষু ধারাতে প্রাণসঞ্চার করব?

অমৃত কথা

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথা

—"নারদ রামকে বল্লেন, 'রাম তুমি অযোধ্যায় বসে রইলে, রাবণ বধ কেমন করে হবে? তুমি যে সেইজন্য অবতীর্ণ হ'য়েছ। রাম বল্লেন, 'নারদ, সময় হোক, রাবণের কর্মক্ষয় হোক, তবে তার বধের উদ্যোগ হবে।' সময় না হলে কিছু হয় না। যখন রোগ ভাল হয়ে এল, তখন কবিরাজ বলে, 'এই পাতাটি মরিচ দিয়ে বেঁটে খেও।' তারপর রোগ ভাল হ'ল। তা মরিচ দিয়ে ঔষধ খেয়ে ভাল হ'ল, না আপনি ভাল হল, কে বলবে? লঙ্কায় সব কুশকে বল্লেন, 'তোরা ছেলে মানুষ, তোরা রামচন্দ্রকে জানিস না। তাঁর পাদস্পর্শে অহল্যা পাষাণী মানবী হয়ে গেল।' 'ঠাকুর, সব জানি, সব শুনেছি; পাষাণী যে মানবী হ'ল সে মুনিবাক্য ছিল; গৌতম মুনি বলেছিলেন যে, ত্রেতাযুগে রামচন্দ্র ঐ আশ্রমের কাছ দিয়ে যাবেন, তাঁর পাদস্পর্শে তুমি আবার মানবী হবে। তা এখন রামের গুণে না মুনিবাক্যে, কে বলবে বল?' ভোগ আর কর্ম শেষ না হলে ব্যাকুলতা আসে না। বৈদ্য বলে, দিন কাটুক—তার পর সামান্য ঔষধে উপকার হবে।"

• • • •

শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্য্যের কথা

—"এক সময়ে একবার একটি অদ্ভুত ঘটনা ঘটে। একদিন শঙ্কর এক দরিদ্র ব্রাহ্মণীর গৃহে ভিক্ষার্থে গমন করেন। ব্রাহ্মণীর গৃহে সেদিন এক মুষ্টি তণ্ডুলও ছিল না। তিনি শঙ্করের হস্তে একটি আমলকী ফল দিয়া স্বীয় দুরবস্থার কথা বলিতে বলিতে অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। শঙ্কর ব্রাহ্মণীর দুঃখ শুনিয়া অতিশয় বিচলিত হইলেন। ব্রাহ্মণীর দুঃখমোচনের জন্য তাঁহার স্পৃহা অতিশয় বলবতী হইল। কিন্তু কি করিবেন? একে বালক, তাহাতে গুরুগৃহে ব্রহ্মচারী। তখন তিনি নিরুপায় হইয়া সেই নিরুপায়ের উপায় ভগবানের শরণ গ্রহণ করিলেন। তিনি ব্রাহ্মণীর জন্য কাতর ভাবে দারিদ্র্য দুঃখ ভঞ্জন সেই জগজ্জননী লক্ষ্মীদেবীর শরণাপন্ন হইলেন। তিনি অযোধ্যনে স্থিরভাবে দণ্ডায়মান হইয়া মনে মনে লক্ষ্মীদেবীর উদ্দেশে স্তব করিতে করিতে ব্রাহ্মণীর জন্য ধন প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। এবং কণকাল এইভাবে অতিবাহিত করিয়া ব্রাহ্মণীকে শীঘ্র ধনপ্রাপ্তির আশ্বাস দিয়া গুরুগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। আশ্চর্যের বিষয়- পরদিন প্রভাতে উঠিয়া ব্রাহ্মণী দেখিলেন—গৃহের সর্বত্র সুবর্ণময় আমলকীর যেন বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। ব্রাহ্মণীর দারিদ্র্য দুঃখ ইহজীবনের মত বিদূরিত হইল। ব্রাহ্মণী অতুল ধনের অধিকারিণী হইলেন। তিনি বুঝিলেন, ইহা সেই ব্রহ্মচারীর আশীর্বাদের ফল এবং ইহা লোকসমাজে অকপটভাবে প্রকাশ করিতে লাগিলেন।"

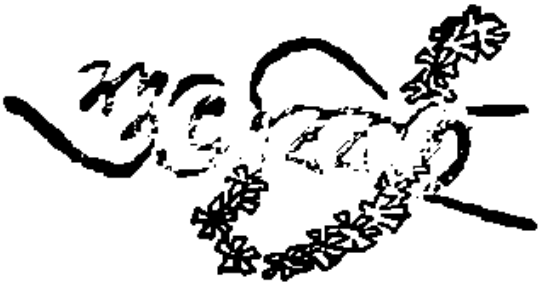

॥ ২ ॥

'খানায় এলাম কি জন্যে ? না এলেও চলতো বোধহয়।'

হরেনবাবুর মুখে কোনও কথা নেই। ঘন ঘন তাকাচ্ছেন তাঁর কাদা-লাগা জামা-কাপড়ের দিকে।

'ভদ্রলোক একটু রসিকতা করলেন, তার পর বাস্, হয়ে গেল তাঁর কাজ! আর কিছু করবেন বলে মনে হয় না। কী ? চুপ করে কি ভাবছেন ? কথা বলুন।'

'কি বলবো ?'

হরেনবাবু এমন ভাবে কথা বললেন, মনে হলো তিনি যেন ঘুম থেকে উঠলেন।

হরেনবাবু বললেন, 'কি ভাবছেন আপনি ?'

হরেনবাবু বললেন, 'একবার হেঁশনে গেলে হতো না ?'

হরেনবাবু বললেন, 'যেতে হয় আপনি যান। আমার এখনও খাওয়া হয়নি। খিদে পেয়েছে।'

হরেনবাবু আর কোনও কথা বললেন না। কিন্তু হরেনবাবুর কথা যেন আর ফুরোতেই চায় না।

'রাস্তার ধারে একটা দোকানও নেই যে কিছু কিনে খাব।'

'কি খাবেন ?'

'ছোলা ভাজা, বাদাম,—যাহোক্ কিছু পেলে হতো। চিবোতে চিবোতে চলে যেতাম।'

হরেনবাবু বললেন, 'হুঁ।'

'খেয়েদেয়ে আর-একবার বেরুবেন নাকি ?'

হরেনবাবু আবার চুপ!

আচ্ছা মানুষ তো! কথার জবাব দেয় না যে!

'জামায় কাপড়ে কাদা লেগে গিয়েছে সেই কথা ভাবছেন নাকি ?'

'হুঁ।'

'ও সাবান দিয়ে কেচে দিলেই উঠে যাবে।'

হরেনবাবু বললেন, 'না।'

'না কি বলছেন ? উঠবে না ?'

হরেনবাবু বললেন, 'আমাকেই কাচতে হবে।'

'আপনি কাচবেন কেন ? চাকর নেই ?'

'আছে। সে কাচবে না। কাপড় কাচে না, এঁটো বাসনে হাত দেয় না—'

'এখনকার চাকরগুলোই এমনি। স্ত্রী আছে তো ?'

বরেনবাবু বললেন, 'আছে। তার কাপড় চোপড় আমাকেই কেচে দিতে হয়।'

হরেনবাবু হাসলেন।

'খুব কুঁড়ে বুঝি ?'

বরেনবাবু বললেন, 'না অসুখ। তবে আর শুনলেন কি ?'

'ছেলে নেই ?'

'আছে। একটা। ইস্কুলে পড়ে।'

'মেয়ে বুঝি ছোট ?'

'হুঁ।'

কিছুক্ষণ দু'জনেই চুপ। কারও মুখে কোন কথা নেই।

আকাশটা মেঘলা হয়েই ছিল। মাঝে-মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। আবার ঘোরহর বৃষ্টি নামবে।

তা নামুক্। কিন্তু ছেলের কোনও হদিস পেলেন না। একা-একা বাড়ী ফিরছেন। গিন্নিকে গিয়ে কি বলবেন—সেইটেই হরেনবাবুর সব চেয়ে বেশি ভাবনা।

খেয়েদেয়ে একটু গড়িয়ে নেওয়া হরেনবাবুর চিরদিনের অভ্যেস। ষ্টেশনে একবার খবর নেওয়া ভাল। বরেনবাবু ঠিকই বলেছেন।

'যাবেন নাকি ষ্টেশনে ?'

বরেনবাবু বললেন, 'উঁ।'

'ষ্টেশনে যাবেন ?'

বরেনবাবু বললেন, 'কাপড় চোপড় ছেড়ে বেরুবো।'

হরেনবাবু বললেন, 'আমাকে ডাকবেন। আমি তৈরি হয়ে থাকবো।'

'বাড়ীতে কুকুর নেই তো ?'

একবার কুকুরের তাড়া খেয়ে বরেনবাবুর জামাকাপড় নষ্ট হয়েছে। কুকুরকে তাঁর বড় ভয়।

হরেনবাবু বললেন, 'না কুকুর নেই। আমার গিন্নি কুকুর পছন্দ করে না।'

বরেনবাবু বললেন, 'আমার একটু দেরি হবে কিন্তু। কাপড় জামার সাবান দিয়ে—'

হরেনবাবু বললেন, 'আমিও খেয়েদেয়ে একটু গড়িয়ে নেবো।'

'গড়িয়ে নেবেন মানে ঘুমোবেন ?'

'আজ্ঞে না। ছেলেটাকে খুঁজে না পাওয়া পর্য্যন্ত ঘুম আসবে না।'

'তাই বলুন।'

আবার ঝিম্ ঝিম্ করে বৃষ্টি নামলো। আবার দু'জনে ছাতা মাথায় দিয়ে পথ চলতে লাগলেন।

'কলকাতায় কোথায় থাকেন আপনি ?' হরেনবাবু জিজ্ঞাসা করলেন বরেনবাবুকে।

বরেনবাবু বললেন, 'ভবানীপুর—চক্রবেড়িয়ায়।'

হরেনবাবু বললেন, 'আমি থাকি শ্যামবাজারে।'

ব্যস্, আর কোনও কথা নেই! বৃষ্টি বেশি হচ্ছে না, কিন্তু হাওয়ার ঝাপ্টায় উল্টে উল্টে ফেলে দিচ্ছিল দু'জনকে। ছাতিদুটো প্রাণপণে চেপে ধরে এগিয়ে চললেন তাঁরা।

হরেনবাবু বললেন, 'কিরকম হাওয়া দেখেছেন ?'

বরেনবাবু তখন ছাতি নামাচ্ছেন। কথা বলবার অবসর নেই।

হরেনবাবু বললেন, 'বাড়ীতে গিয়ে কি বলবো মশাই? গিন্নি তো রেগে কাঁই হয়ে যাবে।'

হরেনবাবুর গিন্নিকে বড় ভয়।

এতক্ষণে বোধহয় মনের মত কথা বলেছেন হরেনবাবু।

বরেনবাবু ছাতিটা নামিয়ে নিয়ে হরেনবাবুর কাছে এগিয়ে এলেন। বললেন, 'আমাকে বোধ হয় বাড়ীতে ঢুকতে দেবে না। বলবে—তুমি আবার যাও।'

হরেনবাবু বললেন, 'যাব তো বলছি। আপনি কাপড়জামা পরিষ্কার করে নেবেন। আমি ততক্ষণ খেয়েদেয়ে একটু জিরিয়ে নেবো।'

বরেনবাবু বললেন, 'আমি যে আমার ছেলেটাকে বলবো—একটু রেখে আয়, তারও উপায় নেই।'

'কেন?'

বরেনবাবু বললেন, 'ছেলেটা পাজির পা-ঝাড়া! একটা কথা যদি শোনে! বলবামাত্র বলবে—পারবো না। আমি পড়ছি।'

হরেন চাটুজ্যে বললেন, 'আমার ছেলে দুটো কিন্তু ভাল। কথা শোনে।—আচ্ছা, কিরকম ভাবনায় ফেললে বলুন তো! অলক্ষ্যে ছেলে—কোথায় কোন্‌দিকে চলে গেল কিছু বুঝতেও তো পারছি না।

বরেন বাঁড়ুজ্যে বললেন, 'ভাবনাটা আমারই বেশি মশাই! আপনার তো ছেলে। আমার যে মেয়ে। আবার দেখতে শুনতেও ভাল।'

বাড়ীর কাছে এসে পড়েছিলেন দু'জনেই।

বরেনবাবু বললেন, 'আসি তাহ'লে। আপনি ঠিক থাকবেন। আমি আপনাকে ডাকবো।'

হরেনবাবু বললেন, 'হ্যাঁ ডাকবেন। আমি ঘুমোব না। জেগেই থাকবো।'

তারপর দু'জন গেলেন দু'দিকে।

একজন 'গোপাল কুটীরে'র দিকে, আর একজন—'বিশ্বনাথ ভিলা'র দিকে।

ডাকতে কিন্তু হলো না বরেনবাবুকে।

হরেনবাবু বাড়ী ফিরতেই বরদাসুন্দরী হাসতে হাসতে এগিয়ে এলেন।

'এসো খাবে এসো। পাওয়া গেছে।'

হরেনবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোথায় ছিল?'

'খেতে খেতে শুনবে এসো। বেলা কি আর আছে? সাধ করে খিঁচুড়ি মাংস খাবে বললে। নিজে রান্না করলাম। মেলা লব্‌ চাঁতা হয়ে।'

হরেনবাবু বললেন, 'তুমি খেয়েছ?'

'বাঃ, যেন কথা যাহোক্! তুমি না খেলে আমি কোনোদিন খাই? হতভাগা ছেলে—দিলে লব্‌ মাটি করে!'

'ঘবি কোথায়?' হরেনবাবু দেখতে চাইলেন ঘবিকে।

'তুমি খেয়ে নাও তো। তার পর দেখবে। আমার বাপু খিদে পেয়েছে—সত্যি বলছি।'

হরেনবাবু বললেন, 'আর একটা মজা হয়েছে শোনো। এইখানে একটা বাড়ী আছে—'ভোলানাথ ভিলা' না কী নাম বললে, সেই বাড়ী থেকে আর-এক ভদ্রলোক বেরিয়েছিলেন তাঁর মেয়েকে খুঁজতে। তাঁর মেয়েটিও হারিয়ে গেছে।'

বরদাসুন্দরী বললেন, 'কেউ হারায়নি। সে মেয়েটাও রয়েছে আমাদেরই বাড়ীতে। তারি সুন্দর ফুটফুটে মেয়েটি। দু'জনকে খেতে বসিয়েছি নীচে।'

হরেনবাবু খেতে খেতে শুনলেন।

শুনলেন—

তাঁরই বাড়ীর পেছনে বাগানের পাশ দিয়ে জল যাবার সিমেন্ট দিয়ে বাঁধানো বড় যে নালাটা আছে না—সেই নালার জল বেয়োচ্ছিল হু হু করে। এদিক-ওদিক খুঁজতে খুঁজতে মতি দেখে কিনা সেই নালার ভেতরে নেমেছে দু'জন। আমাদের রবি আর ওদের মন্টী। সেই নালার জলে হাতড়ে হাতড়ে কি যেন খুঁজছে তারা।

'মাছ ধরছিল না কী?'

'না না মাছ নয়। ওইখানে নাকি ওরা রোজ খেলা করে ওই নালাটা হয়েছে ওদের নদী। সেই নদীর জলে কাগজের নৌকো ভাসায়।'

খেতে খেতে হরেনবাবু হাসতে লাগলেন।

বরদাসুন্দরী বললেন, 'আজ আবার কি মজা করেছে শোনো। সেই কাগজের নৌকোয় দুটো পুতুল চড়িয়েছে। একটা পুতুল হয়েছে বর, আর একটা কনে। কিন্তু ওই জলের তোড়ে কাগজের নৌকো কতক্ষণ ভেসে থাকবে? জলের মধ্যি খানে টুপ্ করে ডুবে গেছে। বরও ডুবেছে। কনেও ডুবেছে। তাই জলে নেমে হাতড়ে হাতড়ে বর কনে খুঁজছিল তারা।'

হরেনবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'পেলে বর কনে?'

'তাই পায়! ওরা ছেলেমানুষ, ওরা ওই জলের তোড়ে পাবে কেন খুঁজতে। মতি গিয়ে খুঁজে দিয়েছে। জলের তলায় গড়াতে গড়াতে তখন অনেক দূরে চলে গিয়েছিল বর আর কনে। কনেটা ছিল প্লাস্টিকের তৈরি। শাড়ী পরিয়ে জামা পরিয়ে কী সুন্দর করে সাজিয়েছিল—তোমাকে দেখাবো, খেয়ে নাও। কিন্তু বরটি ছিল মাটির তৈরি। জলে ভিজে তার তখন আর কোনও পদার্থ নেই। জামাও নেই, কাপড়ও নেই, মাটির একটা ঢেলা। তাই না দেখে মেয়েটার সে কী কান্না। বলে, আমার বর দাও। আমি হেসে বললাম, দেবো। বললাম-তোমার বাবাকে বলবো—তোমার জন্যে একটি বর এনে দেবে।'

হরেনবাবু বললেন, 'আহা বেচারাকে বাড়ী পাঠিয়ে দিলে না কেন? ওদিকে ওর বাপ-মা ভেবে সারা হচ্ছে।'

বরদাসুন্দরী বললেন, 'পাঠাব কেমন করে? দাঁড়াও। ভিজে একেবারে চুইটুর হয়ে গিয়েছিল যে। গা মাথা মুছিয়ে রবির একটা প্যাণ্ট, পরিয়ে সার্ট পরিয়ে একেবারে ব্যাটাছেলে সাজিয়ে দু'জনকে খেতে বসিয়েছি। খাওয়া হোক্ তারপর মতিকে সঙ্গে দিয়ে পাঠিয়ে দেবো।'

মতিকে যেতে হলো না।

হরেনবাবু বললেন, 'আমি নিজে সঙ্গে করে নিয়ে যাব।'

দেখলেন তিনি লক্ষ্মীকে।

ওই রকম বাপের এত সুন্দরী মেয়ে তা তিনি ধারনাই করতে পারেননি। বব্ করে কাটা মাথায় একমাথা চুল। ধপ্ ধপ্ করছে গায়ের রং। টল্ টলে দুটি চোখ, তেমন নাক, তেমনি মুখ আর তেমনি হাসি। ঝক্ ঝক্ করে দাঁতগুলি। হাসতে গেলে গালে টোল্ পড়ছে।

সাট পরে তাকে মানিয়েছে চমৎকার।

হরেনবাবু বললেন, 'বাঃ, এ যে বড় সুন্দরী মেয়ে গো! এর বিয়ের জন্যে বরেনবাবুকে ভাবতে হবে না।'

এই বলে লক্ষ্মীকে তিনি কাছে টেনে নিলেন।

বিয়ের নামে লক্ষ্মী এখন লজ্জায় চোখ নামিয়েছে।

বরদাসুন্দরী বললেন, 'বাপের নাম বরেনবাবু?'

'হ্যাঁ গো, বরেন বাঁড়ুজ্যে। ভবানীপুর থেকে এসেছেন। স্ত্রীর অসুখ। ডাক্তার বলেছে নাকি চেঞ্জে গেলে সেরে যাবে!

'হ্যাঁ সারবে! না সারলেই নয়!' বরদাসুন্দরী বললেন, 'আমারও তো অম্বলের অসুখ। ভাবলুম বুঝি এখানে এলেই সেরে যাবে। তা দেখ্‌ছি এমনি করে যদি যায় সারে তো সারে কখনও? বর্ষাকালে তেঁতুলিতেই বাত বৃদ্ধি হয়।'

লক্ষ্মীকে জিজ্ঞাসা করলেন বরদাসুন্দরী—'কী অসুখ তোমার মায়ের?'

লক্ষ্মী বললে, 'মা কিছু খেতে পারে না। দিনরাত শুধু পান খায় আর জর্দা খায়।'

বরদাসুন্দরী বললেন, 'ঠিক আমারই মতন। যাব একদিন দেখতে।'

হরেনবাবু বললেন, 'আজই চল না! দু'জন একসঙ্গেই যাই লক্ষ্মীকে দিয়ে আসিগে।'

'কথাটি বলেছ ভাল! নিজের পেটটি তো দিব্যি খেয়ে মেয়ে ঠাণ্ডা করলে। আমি এখন বসে বসে খাব, তার পর পান খাব জর্দা খাব, তারপর একটু ঘুমিয়ে না নিলে গা চিস্ চিস্ করবে। আজ আর আমার যাওয়া হয় না। আর তুমি যাও। আমি কাল যাব। আমার একটা কথা আছে—বলে আসবো গিয়ে।'

হরেনবাবু বললেন, 'এখনও আলাপ হলো না পরিচয় হলো না, আগে আলাপ-পরিচয় করো, তারপর তো কথা!'

'কী কথা কই বল দেখি আস্তে করে?'

'তা আমি কেমন করে বলবো?'

বরদাসুন্দরী বললেন, 'পরে বলবো তোমাকে চুপি-চুপি। এখন আমাকে ছুটি দাও। আমি খেয়ে আসি।'

বরদাসুন্দরী খেতে গেলেন। হরেনবাবু লক্ষ্মীকে বললেন, 'চল মা, আমি তোমাকে দিয়ে আসি। তোমার বাবা ভাবছেন হয়ত।'

লক্ষ্মী বললে, 'না।'

'মা কি রে? যাবি না?'

লক্ষ্মী তার গায়ের জামার দিকে তাকিয়ে সলজ্জ হাসি হেসে বললে, 'না।'

রবি একটু দূরে দাঁড়িয়ে ছিল। বললে, 'আমার জামা পরে যেতে ওর লজ্জা করছে।'

হরেনবাবু বললে, 'লজ্জা কিসের? চমৎকার মানিয়েছে। চল।'

মতি তার ইজের-ফ্রক একটা খবরের কাগজে মুড়ে এনে দিলে। বললে, 'এগুলো এখনও শুকোয়নি।'

'তা হোক্। যে।' বলে কাগজের মোড়কটা হাতে নিয়ে হরেনবাবু উঠে দাঁড়ালেন।

লক্ষ্মী দেখলে এমনি সাট পরে নিয়েই তাকে যেতে হবে। বড় বড় চোখদুটি তুলে সে রবির দিকে একবার তাকালে।

হরেনবাবু তার হাতখানি ধরে বললেন, 'চল।'

ঘর থেকে তখনও তারা বেরোয়নি।

মনে হলো দূরে ফটকের কাছে কে যেন ডাকলে, 'হরেনবাবু! হরেনবাবু আছেন?'

মতি এসে খবর দিলে, 'এক ভদ্রলোক আপনাকে ডাকছেন।'

'ওই তোমার বাবা এসেছেন!'

হরেনবাবুর আর যাওয়া হলো না। মতিকে বললেন, 'ডাকো ওঁকে পথ দেখিয়ে এইখানে নিয়ে এসো। এসেন যখন—আমার বাড়ীটা একবার দেখেই যান।'

রবিকে বললেন, 'তোমার মায়ের খাওয়া হলো কিনা ভাখো। খেয়ে দেয়ে যেন এখানে একবার আসে। বল—লক্ষ্মীর বাবা এসেছেন।'

(ক্রমশঃ)

উত্তাপ ছিল কিন্তু আগুন ছিল না···অস্তিত্ব ছিল কিন্তু গতি ছিল না···ভাষা ছিল কিন্তু প্রাণ ছিল না···যাদুকর আসিয়া নিমেষে তাহাতে প্রাণ দিল···যাহা ছিল অচল, সহসা তাহা তীব্র বেগময় হইয়া উঠিল···বন্যা উত্তাপের বুকে ভিসিরবিদারী পাবকশিখা জ্বলিয়া উঠিল।

জাতির ভাষা জাতির সাহিত্যে রূপান্তরিত হইল। জাতি পাইল তাহার সর্বশ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য, তাহার সাহিত্য।

সে যাদুকর হইলেন বঙ্কিমচন্দ্র।

ছুটকি

অ: কু: ভ:

তবু বলতে এসেছিলেন খুড়োমশাই।

আত্মীয়-স্বজন বা জ্ঞাত গোষ্ঠির মধ্যে তিনিই প্রবীণতম। ঘটনাটি তিনি কানে শুনেছেন; কিন্তু চোখে না দেখা পর্যন্ত বিশ্বাস করতে পারছেন না।

ঘর ভাঙে সংসারগত পরের ঘরের মেয়ে এলে, তা ছাড়া ভাই-ভাই-এ বিরোধ করে বড় একটা কেউ ভিন্ন সংসার পাতে না।

খুড়োমশাই জানেন রমেশ আর পরেশে কত মিল। আর যৌবনকাল পার হয়ে দু'জনেই এখন প্রৌঢ়ত্বের সীমায়। রমেশ আর পরেশের দুই বউ-এর মধ্যেও কোনো মনকষাকষি নেই। দু'জনে যেন এক মায়ের পেটের দুই বোন।

রমেশের দুই ছেলে এক মেয়ে। আর পরেশের দুই ছেলে। কেউই খারাপ নয়। য়ুনিভারসিটির ছাত্র-জীবনের গরমায় এইবারে পা দেবে সব।

দুই ভাইয়ের সংসারে একটি মাত্র মেয়ে আদুরে দুলালী। রমেশের না পরেশের, বড়বৌ-এর না ছোট বৌ-এর মেয়ে অনীতা তা বোঝবার উপায় নেই।

রমেশ এবং পরেশ দু'জনেই মোটামুটি চাকরি করে। তবে এতদিন বাদে কিসের বিরোধ?

খুড়োমশাই এ-সংসারে থাকেন না। তবুও তিনিই এদের অভিভাবক।

খুড়োমশাই এসেছেন শুনে দুই-ভাই-ই এগিয়ে এলো। দুই বউ এবং ছেলেদের দল ও মেয়ে।

'হ্যাঁ হে রমেশ! লোকে বলে রাম-লক্ষ্মণ দুই ভাই, কিন্তু তোমরা নাকি পৃথক হচ্ছো?'

'কী বলবো বলুন!'

রমেশের কথায় খুড়োমশাই বিরোধের 'কোনো' হদিশই খুঁজে পেলেন না।

'পরেশ তোমার কি বক্তব্য?'

'আজ্ঞে এক অন্নে আর থাকা চললো না।'

'কেন, ব্যাপার কি?'

পরেশের গলা ধরে এসেছে।

বড় বৌমা বললেন, 'এতদিন পাড়া প্রতিবেশির চোখ টাটাতো—আহা, এরা কি সুখী পরিবার!'

'তা অসুখের কারণটা হলো কি?'

ছোট বৌমা বললেন, 'রেশনের কার্ড।'

'রেশনই আজ আমাদের মধ্যে পাঁচিল তুলেছে!'

• • •

খবরের কাগজের অফিসে হুলুস্থুল ব্যাপার! রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে একজন তরুণী ভদ্র মহিলা সম্পাদকের ঘরে ঢুকেছেন।

পরণে টকটকে লালপাড়ি। চোখের সুর্মার রেখায় ঘনো অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। ঘরোলের তুলনায় কণ্ঠের আওয়াজ তীক্ষ্ণতর।

'আপনি কে?'

'আজ্ঞে আমি প্রধান সম্পাদক।'

'আপনার কাজ কি?'

'সম্পাদকীয় লেখা।'

'খবর বার করেন কে তবে?'

'তিনি বার্তা-সম্পাদক।'

'তাঁকে কোথায় পাবো?'

'আজ্ঞে, তাঁর দপ্তর স্বতন্ত্র জায়গায়।'

ভদ্র মহিলা ছুটলেন বার্তা-সম্পাদকের ঘরে।

'একি হয়েছে মশাই?'

'কি হয়েছে?'

'কি ছেপেছেন?'

'কি ছেপেছি?'

'আমি ঘোষ?'

'মানে?'

'আঃ, ন্যাকামী! কিছুই যেন জানেন না!!'

বার্তা-সম্পাদক সত্যিই বিস্মিত।

মহিলা-মঙ্গল সমিতির সম্পাদিকা প্রতিভা ঘোষ,—সংবাদ বিবরণীতে ছাপা হয়েছে প্রতিভা ঘোষ।

'আমার কি পিং আছে?'—সম্পাদিকার কণ্ঠস্বরে আগুনের হলকা!

'দুঃখিত, প্রিন্টার্স ডেভিল! আজই ভ্রম-সংশোধন কলমে ছেপে দিচ্ছি।'—

বার্তা-সম্পাদক সহানুভূতি জানালেন।

• • • •

'কিউ মানে জানিস্?'

'কিউ মানে আবার কি? লাইন দেওয়া।'

'ধুর!'

'তবে কি?'

'কিউ হচ্ছে কনকার। অর্থাৎ জয় করা।'

'আজ মাইরি কিউ-এর কৌশলেই দিনটা কাটলো বেশ।'

কথা হচ্ছিল চলতি ট্রামে দু'টি উঠতি বয়সের ছেলেদের মধ্যে।

অফিস থেকে বাড়ি ফিরছিলাম। বর্ষার সন্ধ্যা। কোন রকমে ভাগ্যবাজারগামী একখানি ট্রামে দাঁড়াবার জায়গা করে নিয়েছিলাম। পাশে সহযাত্রী দু'টি ছোকরা। সারাটা দেহ বৃষ্টির জলে ভেজা; পরণের ট্রাউজার এবং কামিজ ভিজে সপসপ করছে। পায়ে 'টো-সু' জুতি কাদা। মহাবিক্রমে খেলার মাঠ থেকে ফিরছে।

'ভোরে দিলাম দুধের লাইনে কিউ। আধেক দুধ দিলাম বেচে।'

'বাড়িতে ধরতে পারলে না?'

'ধুর বোকা! রাস্তায় টিউবকল আছেনা?

সেই জলে আধেক বোতল ভর্তি করে গেলো।

'কতো রোজগার হলো?'

'এক আধুলি।'

'তারপর?'

'উড়িষ্যার চাল। তাতে মোটামুটি পেলাম।'

'তারপর?'

'—সিনেমার লাইন। বারটি নয়া পয়সার টিকিট বাড়লাম একটাকার।'

'তারপর?'

'তারপর খেলার মাঠ। শালা কি খেলাই দেখালে আজ!'

'আমি তো ভাই ইস্কুলের লাইনে নিয়ে পরে আকার। ভাবনা হচ্ছিল এরপর ম্যানেজ করবো কি করে? তোর পলিসিই ভালো। কাল থেকে লাইনে দাঁড়াবো।'

কিউ! কিউ মানে কনকার।

চলন্ত ট্রামে আফিসের ভাবনা থেকে ফিরে এলাম বাড়ির ভাবনায়।

গিন্নী বলেন, 'অমন ছেলে থাকতে ভাবনা কি তোমার? রেশনের কলাণে যাদব ওরা। ওরাই হবে আসল সেশান।'

* * *

গলায় পৈতে দেওয়া পাচক-ঠাকুর আজ গৃহস্থের সংসারে বিরল। জাতিভেদ নেই। এখন কলবাইও ছাও—পাচক কাম পরিচারক।

পরিচারক এসে বললে, 'কাল থেকে আর কাজ করতে পারবো।'

গিন্নীর মাথায় আকাশ ভেঙে পড়বার উপক্রম। তিনি আশঙ্কিলেন তাকেই চার্জ করতে। এখন উল্টো উৎপত্তি।

'কেন রে! ব্যাপার কি?'

'আজ পনের দিন মাছের আঁশটুকু দেখি নি। এতো যে খাটবো, পলীলে বল পাবে কোত্থেকে?'

'মাছ কী আমরা খাচ্ছি? মাছের আকাল। বেড়ালগুলো পর্যন্ত ডাক ছেড়ে কান্না সুরু করেছে।'

'তাহলে দুধের যোগান দিন।'

'দুধ? পাঁচসিকে সের।'

'সের না হোক্, পোয়াটাক্ দিন।'

গিন্নী এবার ক্ষেপে উঠলেন, হ্যাঁ, দুধ দিয়েই তো কাল সাপ পুষতে হবে।'

'কেন কি করনু আমি?'

'কি করছো তা নিজে জানো না?—রাঁধতে গিয়ে তরকারি চুরি করে খায় কে?'

'উ বাবা উ কি কথা!'

'কি কথা? এই তো কালই দিদিমণি দেখেছে যে রান্না ব্যঞ্জন চুরি করে খাচ্ছো। তার আগে দাদাবাবু দেখেছে ডিমের ডালনা থেকে—'

'সে কি চুরি করে খাই? কর্তাবাবুর বেলাড প্রেসার। ডাক্তার হাজার করেছিলেন নুন খাবেন না। তাতে তো তিন মাস বন্ধ ছিলো। এখন করেছেন একটুকুন করে খাবেন, তাই তো চেখে দেখি বেশি হলো কি কম হলো। এই কি চুরি করে খাওয়া?'

আজও যা ভুলিনি

আমার বেঁচে উঠেছি !

নরেন্দ্রদেব

গল্প ভারতী পত্রিকার জন্য জীবনের কোন অবিস্মরণীয় ঘটনার কাহিনী শোনাবার অনুরোধ এসেছে।

আমার এই সুদীর্ঘ জীবনের মধ্যে এমন কত ঘটনাই ঘটেছে যা সহজে ভোলা যায় না। তবে তার মধ্যে সব ঘটনাই সকলকে ডেকে বা লিখে জানানো যায় না। যে সব অপ্রত্যাশিত ঘটনা জীবনের সুখ-স্মৃতির সঙ্গে জড়িত ছিল তা বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে অস্পষ্ট হয়ে আসছে। মন ক্যামেরার প্লেট খানিতে যে সব ছবি একদা তাদের উজ্জ্বল ছাপ ফেলেছিল তারা যেন ক্রমে জ্ঞানের আলোক স্পর্শে একে একে মিলিয়ে যাচ্ছে। জানিনা কেমন করে কবে তাদের যেই হারিয়ে ফেলেছি।

সংসারে সুখের স্মৃতি চিরদিনই ক্ষণিকের। কেন না, অপরিণত হৃদয়ের ক্ষেত্রে কোনও এক নূতন প্রাতে যে রেখা একদা তার স্মৃতির ফলকে রেখাপাত করে, প্রবীনতার পলি মাটি চাপা পড়ে কবে যে তা মন থেকে মুছে যায় তার হিসাব খুঁজে পাইনা কেউ। মনে করবার চেষ্টা করলেও তার একটা আবছা-আবছা ম্লান রূপের প্রতিবিম্ব কতকটা স্বপ্নাবেশে দেখার মতো মনে হয় বটে, কিন্তু, স্পষ্ট ছবি কিছুই ফুটে ওঠেনা। অথচ, এক একটা ঘটনা হঠাৎ এমন অপ্রত্যাশিত ভাবে ঘটে যায় যে মানুষ সেটা ভুলতে চাইলেও কিছুতেই বিস্মরণীর ওপারে সে যেতে চায় না। মনের মণি কোঠায় সে স্মৃতি যেন চিরন্তনী হয়ে জেগে থাকে।

এমনিই একটি ঘটনা বা দুর্ঘটনার কথা আজ লিখতে বসেছি শনভারতী পত্রিকার জনক সম্ভোষ্ট ভায়ার অনুরোধে।

সেবার আশ্বিন মাসেই পুজো। প্রতিবারেই পুজোর ছুটিতে কিছুদিন বাংলার বাইরে ঘুরে আসার একটা যেন প্রবল উৎসাহ ছড়িয়ে পড়েছিল বয়সুখো বাঙালীদের ঘরে ঘরে। আমরা কটি স্বপ্ন-বিলাসী তরুণও এই শহরব্যাপী ছোঁয়াচে রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েছিলুম। বছর বছর এই নেশার টানে ঘর ছেড়ে আমরা বেরিয়ে পড়তুম এক এক বছর এক একদিকে। সেবার স্থির হয়েছিল উড়িষ্যা ভ্রমণে যাওয়া হবে। কটক, ভুবনেশ্বর, উদয়গিরি, খণ্ডগিরি, সাক্ষী গোপাল, পুরী, কোনারক, চিল্কাহ্রদ এমন কি সম্ভব হলে বালেশ্বর ও সম্বলপুরও ঘুরে আসবো।

যথা নির্দিষ্ট দিনে দুর্গা বলে বেরিয়ে পড়লুম আমরা পাঁচজনে 'জয় জগন্নাথ' স্মরণ করে। শ্রীদুর্গা বা জগন্নাথের নাম যাই করিনা কেন, সেদিন কিন্তু যৌবনের উদ্ধত তেজে আমরা ঠাকুর দেবতা কিছুই মানতুম না। তার কারণ এ নয় যে, আমরা নাস্তিক বা অবিশ্বাসী ছিলুম। তবে, সে বয়সে ঠাকুর দেবতা আর শাস্ত্র পুরাণ মেনে চলতে গেলে জীবন উপভোগে অনেক বাধা এসে পথ আগলে দাঁড়াতো বলে ওই সংস্কার গুলোকে যতটা সম্ভব এড়িয়ে চলবারই চেষ্টা করতুম। সব সময় যে দৈবকে একেবারে অস্বীকার ক'রে চলতে পারতুম একথাও জোর করে বলতে পারবোনা।

থাক সে কথা। এখন যে ঘটনা লিখতে বসেছি তারই সূত্র পাত করা যাক। আমরা পাঁচজন কে কে ছিলুম বলে দিলে নাম করলেই চিনতে পারবেন আপনারা। কারণ, এঁরা সবাই খ্যাতিমান আমাদের দলের সর্দার ছিলেন প্রেমাঙ্কুর আতর্থী। যাঁরা তাঁর 'অলস্বরিয় আতক' পড়েছেন তাঁরা জানেন কত অল্প বয়স থেকেই তিনি অজানার আহ্বানে সুরের হাত চানিতে সাড়া দিয়ে বার বার বাড়ী ছেড়ে পালিয়েছিলেন। ভারতবর্ষের অনেক প্রদেশই ছিল তাঁর নখদর্পণে। কাজেই দেশের বাইরে যাবার সময় এঁরই নেতৃত্ব আমরা মতশিরে মেনে নিতুম। ইনি যেমনি সকল বিষয়ে অভিজ্ঞ ছিলেন তেমনি ছিলেন অসাধারণ রসিক। এর সঙ্গ পেলে নিরেরসপ্রীয়াও বোধ করি নিরানন্দ হবেন না। শিল্পী চারুরায় ছিলেন আর একজন আনন্দময় পুরুষ। তিনি শুধু কলা-বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেননা, সঙ্গীতে সুকণ্ঠ ও রন্ধনেও সুপটার ছিলেন। প্রেমাঙ্কুরেরও রন্ধন বিদ্যায় পটুত্ব ছিল। এ বিদ্যায় অনভিজ্ঞ ছিলুম আমি এবং আমাদের অপর দুই সঙ্গী 'মৌচাক' সম্পাদক সুধীরচন্দ্র সরকার-পুস্তকপ্রকাশক ও বিক্রেতা এম, সি, সরকার এণ্ড সন্সের মালিক। আর একজন সম্প্রতি স্বর্গগত সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক দেবেন্দ্র কুমার রায়।

আর্থিক অবস্থা আমাদের যে খুব খারাপ ছিল তা' নয়। সবাই মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। বয়োপ্রাপ্ত হ'য়ে পর্যন্ত সকলেই কিছুনা কিছু উপার্জন করি। অন্যান্য নেশার মতো আমাদের এই দেশ ভ্রমণের নেশার ব্যয়ও আমরা নিজেরাই নির্বাহ করতুম। পরিবারের কোষাগারে হাত বাড়াতুম না কেউ। তবে কারুর কম পড়লে পাঁচজনে তা ভাগ করে দিয়ে একত্রে যাত্রার বাধা অপসারিত করতুম। সুতরাং গোড়া থেকেই আমাদের লক্ষ্য থাকতো যত কম খরচে পারা যায় দেশভ্রমণ সারতে হবে। যাবার আগে তাই একটা সম্ভাব্য ব্যয়ের হিসাব করে নেওয়া হ'ত এবং সেই অনুপাতে যাবা পিছু দেয় অংশ নির্দ্ধারিত হত। সুধীর সরকার ছিলেন আমাদের ক্যাশিয়ার। ধনরক্ষক হিসাবে তাঁর কাছেই আমাদের সমস্ত টাকা জমা রাখা হত। এর একটা মস্ত সুবিধা ছিল এই যে, হিসাবের বহির্ভূত অতিরিক্ত টাকা ব্যয় হয়ে গেলে ধনরক্ষক তাঁর নিজ ভাণ্ডার থেকে সেটা চালিয়ে দিতেন, কারণ, আমাদের মধ্যে লক্ষ্মীর কৃপা তাঁরই উপর ছিল বেশি। বেড়িয়ে ফিরে এসে আমরা কেউ কেউ তাঁর ঋণ শোধ করতুম, কেউ বা করতুমনা বা করতে পারতুম না। তিনি সেটা বুঝতেন, তাই অকপট বন্ধুদের ঋণ পরিশোধের জন্য উৎপীড়িত করতেন না।

এরপর আর একথা বলাই বাহুল্য যে আমরা যদিও নিজেদের তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত মানুষ বলে স্বীকার করতুম না, কিন্তু ট্রেনযাত্রী ছিলুম বরাবরই তৃতীয় শ্রেণীর। হোটেলে থাকা ও খাওয়ার খরচ বেশি; তাই, যেখানেই যেতুম নিজেরাই রসাকে আহারের ব্যবস্থা করতুম এবং ভালো ধর্মশালা পেলে আর ঘর ভাড়া করতুমনা। আর আমাদের একটা সুনির্দিষ্ট নীতি হিসেবেই কোনো পাণ্ডাবাড়ীতে গিয়ে উঠতুমনা কখনো। তার কারণ এ নয় যে পাণ্ডাদের প্রতি আমাদের কোনো বিরাগ বা বিদ্বেষ ভাব ছিল। বরং আমরা মনে করতুম বিদেশে নির্বান্ধব পুরে ওরাই তীর্থযাত্রীদের একমাত্র সহায় ও প্রকৃত বান্ধব। অসুস্থ হয়ে পড়লে পাণ্ডারা তীর্থযাত্রীদের চিকিৎসা ও সেবা শুশ্রূষার ব্যবস্থা করে, কপর্দক শূন্য হয়ে পড়লে তারা বিনা সুদেই টাকা ধার দেয়। বিনিময় পত্র সামলায়। ট্রেনে তুলে দিয়ে আসে। তবু যে আমরা তাদের এড়িয়ে চলতুম, তার কারণ, পাণ্ডারা বসিয়ে বসিয়ে বিগ্রহের পূজা ও ভোগ চড়াবার জন্য এমন ঘোরপাক করতো যে

তা থেকে পরিত্রাণের কোনও উপায় ছিলনা। অবশ্য তীর্থযাত্রীর আর্থিক অবস্থা অনুসারেই তাঁরা পূজার ব্যবস্থা করাতেন। ষোল আনার পূজা চড়াতে যাঁরা অক্ষম তাদের বেলা সওয়া পাঁচ আনার পূজারও ব্যবস্থা ছিল। তবে দক্ষিণাটা দিতে হত পুরোপুরি। মন্দিরে গিয়ে দেব দর্শন আমরা অবশ্যই করতুম, কিন্তু সেটা কেবল মাত্র মন্দিরের স্থাপত্য কলার আর মূর্তিশিল্পের কারুকৃতী দেখবার জন্য। দেব দেবীর প্রতি ভক্তির টানে বা পুণ্যার্জনের লোভে নয়।

ভুবনেশ্বরে দিন দুই থেকে ওখানকার মন্দিরগুলি সব দর্শন করে উদয়গিরি খণ্ডগিরি দেখে পৌঁছলুম এসে পুরী। সেবার পুজোর ঘরতুমে পুরীতে প্রচুর জনসমাগম হয়েছিল। কোথাও মাথা গুঁজে থাকার স্থান পাওয়া গেলনা। ধর্মশালার পাণ্ডাবাড়ী সব যাত্রী ভর্তি। আমরা বড় সাধ করে বেরিয়ে ছিলুম পুরীতে এসে একেবারে সমুদ্রের ধারে থাকবো। কিন্তু, প্রাণতো সবের বটে, টাঁ্যাক যে গড়ের মাঠ! তবু নিরাশ হলুম না। সাগর তীরে আশ্রয় খুঁজে একেবারে শঙ্খ'ন ঘাট থেকে স্বর্গদ্বার পর্যন্ত চষে বেড়াতে লাগলুম। চেষ্টার অসাধ্য কিছুই নেই একথা মানতেই হবে। ঘুরতে ঘুরতে সমুদ্রের ধারের দ্বিতীয় সারিতে একখানি সুন্দর ছোট্ট কুটীর পাওয়া গেল। পাশাপাশি দু'খানি ঘর। সামনে একটু দালান। বেশ উঁচু ভিত। চারিদিকে পাঁচিল ঘেরা। দরজা দিয়ে ঢুকে সামান্য একটু উঠোন। একপাশে ইঁদারা। জলের কল নেই। আর এক পাশে কয়েক ধাপ সিঁড়ি বেয়ে উঠে পরিচ্ছন্ন পৌচাগার। বাড়ীখানির ভাড়া শুনে আজ হয়ত অনেকেই অবাক হবেন। কিন্তু, সেদিন সেই ভাড়াই আমাদের কাছে খুব বেশি মনে হয়েছিল। দৈনিক দুটাকা হিসেবে সাতদিনের ভাড়া আগাম দিতে হবে তবে বাড়ীর চাবি পাওয়া যাবে। সাতদিনের কমে কাউকে দেওয়া হবেনা। আমরা তখন নিরাশ্রয়। কাজেই আর বাক্যব্যয় না করে টাকা দিয়ে চাবি নেওয়া হল। যিনি টাকা নিলেন ও চাবি দিলেন তিনি কিন্তু বাড়ীওয়ালা নন। তত্ত্বাবধায়ক মাত্র। পাশের বাড়ীতেই থাকেন। তাঁর নিজের কিন্তু পাকাবাড়ি নয়। মেটে ঘর। লোকটির উড়িষ্যাই জন্মভূমি। কিন্তু, বেশ বাংলা বলতে পারেন। মানুষটিও ভালো। নাম উদ্ধব। উদ্ধব মিশ্র। গলায় পৈতে রয়েছে দেখে বুঝলুম তিনি দ্বিজ কুলোদ্ভব।

বাড়ী খুঁজতে বেলা হয়ে গিয়েছিল অনেক। বাজার হাট তো কিছু করা হয়নি। কোথায় কাঠ? কোথায় কয়লা? চাল ডাল নুন তেলও সংগ্রহ করতে হবে। বেজায় রদ্দুর। বালি তেতে উঠেছে। সবাই ক্লান্ত। মিশ্র মশাই বললেন মন্দির থেকে প্রভু জগন্নাথের ভোগের প্রসাদ আনিয়ে দিচ্ছি। বলরামের ভোগ নেন ত' দশআনা মানসা আর জগবন্ধুর প্রসাদ নেন তো আট আনা মানসা। দুটো বড় মানসা নিলে আপনাদের ক'জনের পেটভরে খাওয়া হয়ে যাবে। এখন ভাবতে অবাক লাগবে যে মাত্র একটাকায় পাঁচজনের পেট ভরে খাওয়া! সেই ব্যবস্থাই হ'ল। স্থির-হ'ল রাত্রে মাংস ভাত রেঁধে খেয়ে সকালের এই নিরামিষ খাওয়ার প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। সমুদ্র স্নান সেরে আসতেই বেলা দুটোর মধ্যেই মন্দিরের ভোগ এসে গেল। ক্ষুধার মুখে সেই নিরামিষ ভোগ রাগ যেন অমৃত প্রসাদ বলে মনে হয়েছিল।

আমরা এই দেশভ্রমণের সময় পর্যটন সংক্রান্ত আনুষঙ্গিক ব্যয় যতই কম করিনা কেন খাই খরচে কৃপণতা করতুম না একটুও। বরং প্রয়োজনের অতিরিক্ত খরচই হয়ে যেতো অনেক ক্ষেত্রে। কারণ, আমরা এই পর্যটনেই ছিলুম ভোজন-বিলাসী। তার মধ্যে আবার দুর্নাম ছিল

ভোজনে বুকোদর। খাওয়া-দাওয়াটা ভাল হওয়া চাই-এটা ছিল আমাদের মটো। কাজেই—পরের দিন সকালে পুরীর বাসায় যেন ঘাটের ভেয়ান বসে গেল! আগের দিন বিকেলে অনেক কিছু বাজার করে রাখা হয়েছিল। চারু ও প্রেমাঙ্কুর সকালে চা ও প্রাতরাশ সেরেই কোমরে তোয়ালে জড়িয়ে লেগে গেল যেন বিরাট রান্নার পাকশালায় একেবারে ঘুসল দুপকার বল্লভের আবির্ভাব। ওরা দু'জনে মিলে অনেককিছু রেঁধে ফেললে। কটকী সরু চালের পোলাও। সমুদ্রের ধার থেকে জেলেদের কাছে কেনা টাটকা পমফ্রেট মাছের ঝাল। সীতাপতি বিজয় পাওয়া গিয়েছিল তার কারি'। বুদি আলু ভাজা। ডোলার ডাল। চাটনি, পাপর আর দোকানের দই এবং অমৃতি জিলিপী। একেবারে ভুরি ভোজের ব্যবস্থা।

রান্না শেষ ক'রে, পাঁচ থালি পাতা সাজিয়ে, সব কিছু দিয়ে, পোলাওয়ের হাঁড়ির মুখে, চাপা দিয়ে আমরা সমুদ্রে স্নান করতে চলে গেলুম।

পুরীতে আমার এই প্রথম আসা নয়। বাড়ীর সকলের সঙ্গে আরও একাধিকবার এসেছি। অপার সমুদ্রের গভীর জল ও বিপুল গর্জন শুনে প্রথমটা অনেকেরই জলে নামতে আতঙ্ক হয়। ফেনিল অট্টহাস্যে সমুদ্রের বিরাট ঢেউ যখন ছুটে এসে বালু বেলার আছড়ে পড়ে' তীরে অপেক্ষমানদের পা দুটি ছুঁয়ে বেশ একটু টান দিয়ে তর তর করে আবার ফিরে যায় তখন প্রথম সমুদ্র দর্শনে ভয় কার না হয়? অনন্ত প্রসারিত পারাবারের নীলাম্বুরাশির সঙ্গে যেখানে অসীম আকাশ গিয়ে মিলেছে মনে হয় এ মিলনের বুঝি শেষ নেই! এই নিখিল বিশ্বের একটা বিরাটত্বের ধারণা অন্তরে উদ্ভাসিত হয়ে উঠে সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত করে তোলে!

কিন্তু, একবার ডুলিয়াদের সাহায্য নিয়ে সাহস করে সমুদ্রের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারলে আনন্দ-বিহ্বল সেই মাদকতার মুখ দিয়ে আপনিই উচ্চারিত হবে হয়তো "হে আদি জননী সিন্ধু! বসুন্ধরা সন্তান তোমার!" সমুদ্রের সঙ্গে পূর্ব পরিচয় থাকায় আমার আর সাগর-ভীতি ছিলনা। সাত আটটা 'ব্রেকার' বা ঢেউ পার হয়ে চলে যেতুম সমুদ্র বক্ষে আর মাইল দূরে। সেখানেও দেখি হয় কোমর জল নয় বুক-জল! তাই সমুদ্রের ভয় আমি জয় করে ফেলেছিলুম। সমুদ্রস্নানের দু'টি নিরাপদ সহজ উপায় আছে। উত্তাল ফুলে ওঠে যখন পর্বতের মত ফুলে উঠে এগিয়ে আসে তখন ঈষৎলাফ দিলেই একেবারে তরঙ্গ চূড়ায় উঠে যাবে এবং ঢেউয়ের গতির সঙ্গেই আবার মাটিতে নেমে আসবে যেন নাগর দোলায় চড়ে ওঠানামার মতো। আর এক উপায় হল কান দুটি দুহাতে চেপে ধরে সমুদ্রকে ভূমিষ্ঠ প্রণতি জানাবার মতো মস্তকটিকে তরঙ্গের চরণনিম্নে নত ক'রে দাও। তোমার পৃষ্ঠ দেশে সাদরে শীকর করস্পর্শ বুলিয়ে দিয়ে ঢেউগুলি চলে যাবে তটভূমির কাছাকাছি আছড়ে ভেঙে পড়বার জন্য। পড়েই সে কি খিল খিল অট্টহাসি—শুভ্র ফেনরাশি বিকীর্ণ করে!

আমি তাই আনন্দে মত্ত হ'য়ে নাগর দোলায় দোলখাওয়ার মতো ঢেউয়ের মাথায় চড়ে ওঠানামা করছিলুম। আশে পাশে আমার ভ্রমণ-সঙ্গী বন্ধুরাও আরামে স্নান করছিলেন। প্রায় সপ্ত তরঙ্গ মালা পার হ'য়ে আমি সেই ঢেউয়ের মাথায় চড়ে দুই ছেলের মতোই বলিষ্ঠ বেহে মস্তি পনা করছিলুম। উঠছি-নামছি-ভাসছি-ভাসছি সে কি উদ্ভট উল্লাসে সমুদ্র মন্থন। বোধ করি আমার সে ঔদ্ধত্য ও দুঃসাহসিকতা সাগরশায়ী নারায়ণের কাছে পীড়াদায়ক হয়ে উঠেছিল। তিনি তাই আমাকে

একটু কঠিন শাস্তিই দিলেন। ধামাল ছেলের মতো ধার ধার নিজ বক্ষে এই দৌরাত্ম্য করছিলুম কিনা!

হঠাৎ একবার ঢেউয়ের মাথা ছুঁয়ে পড়ার সঙ্গে আমিও লম্বিয়ে মেয়ে এসে পায়ের নিচের আর নিজবক্ষের স্পর্শ পেলুম না। কোথায় মাটি? হাতু পাতু করে উঠলুম পায়ের তলার মাটি ছুঁয়ে সমুদ্রের কোলে মুহূর্তের জন্ত মেয়ে দাঁড়াবার চেষ্টায়। কারণ, তখনই তো আবার লাফ দিয়ে তরঙ্গ মাথে উঠতে হবে। সাগর তরঙ্গের তো রসনুত্যের বিরাম নেই। ঢেউয়ের পেছনে ঢেউ। কিন্তু, মাটি কই? সমুদ্রতল কি অতলে তলিয়ে গেল হঠাৎ, প্রাণপণে যতই চেষ্টা করি মাটিতে আর পা ছোঁয়াতে পারিনি! একটা কি যেন অদৃশ্য শক্তি আমার পা দুটোকে ছেপে ধ'রে সমুদ্রের মধ্যে টেনে নিয়ে চলেছে। ওপরে মাথাটা তুলে ভেসে থাকবার চেষ্টা করছি কিন্তু মুহূর্তে সে মাথা ঘাড় ধরে জলের মধ্যে নামিয়ে দিচ্ছে পরমুহূর্তেই ছুটে আসা সমুদ্রবক্ষের প্রচণ্ড ঢেউ! সাঁতার সামান্ত যেটুকু জানি তা' না জানার মধ্যেই। দশ বারো হাত মাত্র দূরত্ব তীরের মতো। হাত পা ছুঁড়ে এগোতে পারি কিন্তু আমি যে তখন সাগর বেলা ছেড়ে অন্ততঃ একশো হাত দূরে এসে পড়েছি! তবু অসহায় বিপন্ন অবস্থায় মরিয়ার মতো একবার চেষ্টা করতে ক্ষতি নেই যদি কিছুটা এগিয়ে সমুদ্রবক্ষে ক্ষণকালের জন্তও দাঁড়িয়ে হাঁফ নিতে পারি। কিন্তু উন্মত্ত সমুদ্র বিপন্ন মানুষকে সে অবসরটুকুও দিচ্ছে না। অবিরাম মুহূর্তে মুহূর্তে উত্তাল তরঙ্গ তুলে ছুটে আসছে সে, তৃণখণ্ডের মতো তোলপাড় খাইয়ে দিচ্ছে আমাকে। ক্ষুদ্রশক্তি সামান্ত এক মানুষ সেই বিরাট সমুদ্রের বিপুল শক্তির সঙ্গে কতক্ষণ যুঝতে পারে? যুঝতে পারছিলুম ক্রমেই প্রান্ত ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে পড়ছি। আর বুঝি আত্মরক্ষা করা সম্ভব নয়! মুহুর্মুহু উত্তাল তরঙ্গাঘাতে বিপর্যস্ত দেহমন যেন পরাস্ত হ'য়ে আত্মসমর্পণ করতে চায় সেই প্রলয় নৃত্যরত মহাসিন্ধুর সর্বসংহারিণী চরণে। সাঁতারের চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। পায়ের তলায় জমি পাবার সকল প্রয়াস বিফল। ভেসে থাকবারও আর সামর্থ্য নেই। অবশ দেহটাকে নিয়ে সমুদ্র যেন ছিনিমিনি খেলছে। বুঝতে পারছিলুম আমার সমুদ্রগর্ভে সমাধি সন্নিকট! তবু জলমগ্ন প্রায় মানুষের শেষ চেষ্টার মতো জলের ওপর দু'হাত তুলে ধরে কতক জানিত বন্ধুদের এবং তীরের মানুষদের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করলুম। কোনদিক থেকে কোন সাড়া পাওয়া গেল। না মনটা হতাশায় একেবারে মুষড়ে পড়লো! মাথা ঘুরছে। শরীর টলছে। চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসছে। হঠাৎ যেন সিনেমার সচল ছবির মতো চোখের ওপর ভেসে উঠলো জগন্নাথের মন্দির চূড়ার সেই ধ্বজপতাকা যুক্ত আমলকী শীর্ষ—ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজের মন্দির—উদয়গিরি খণ্ডগিরি—ভেসে উঠলো আমার আজন্মের লীলানিকেতন কালীতলার বাস্তু নিবাস—সিদ্ধেশ্বরী কালীমূর্তি—চলচ্চিত্রের ছবির মতই ঘুরে গেল দৃষ্টিপথে স্নেহময় জনক জননীর মুখ আর আমার ভাইবোনেদের মুখগুলি—যেমন কণিকের নিমেষ দর্শন—বিদ্যুৎ চমকের মতো।

তারপরই মনে হ'ল আমি যেন শূন্যে ভেসে চলেছি—কোথায় কোন অজানা লোকে—আমার চারিদিকে শুধু আলোকোজ্জ্বল দীপ্ত পরিমণ্ডল। যেন কোন জ্যোতির্ময় লোকের নিস্তব্ধ ভিতর দিয়ে নিরলম্বন ভেসে চলেছি কোন প্রভাময় যোগের কিরণদ্যুতি বিকীর্ণ শূন্যে। প্রসন্ন চিত্ত আমার এখন ভয় লেশশূন্য। কী যেন এক পরমানন্দে হৃদয় পরিপূর্ণ। চলেছি—চলেছি—কোন অন্তরঙ্গ নয়ন-বিহঙ্গের মতো ধীর ও স্থির গতিতে ভেসে চলেছি বিস্তীর্ণ জ্যোতি পরিব্যাপ্ত ঊর্ধ্বাকাশের দিকে। আনন্দ-বিহ্বল আমার সর্বদেহ মন। মনে হল আমার শরীরটা যেন সম্পূর্ণ ভারমুক্ত হয়ে গেছে। সামান্ত একটু বাতাসে হয়ত' কচি

ভূপতিত্বের মতো কেঁপে উঠবে, দুলে উঠবে, নেচে উঠবে শতঃস্ফূর্ত এক প্রচণ্ড হিল্লোলে! আমি চলেছি—ভেসে চলেছি সেই আশ্চর্য আলোক রাজ্যের ভিতর দিয়ে। তারপর, যেন কি এক অপরিসীম আরামে সমাধি মগ্ন হয়ে আমার চেতনা লুপ্ত হ'ল!

কতক্ষণ এ অবস্থায় ছিলুম জানি না। যখন আবার জ্ঞান ফিরে এলো দেখি আমি পুরীর স্বর্গদ্বারে সাগরতীরের বিস্তীর্ণ বালুরাশির ওপর চিৎপাত হয়ে পড়ে আছি। আমার ভ্রমণসঙ্গী বন্ধুরা আমার পাশে ব্যগ্র ব্যাকুল উৎকণ্ঠিত দৃষ্টি নিয়ে অপলকে আমার মুখের পানে চেয়ে আছে। একজন অপরিচিত স্যুটপরা ভদ্রলোক আমার পা দুটো ধরে ক্রমাগত ঝোমড়াচ্ছিলেন। তাঁর গলায় 'স্টেথিস্ কোপ' ঝুলছে দেখে বুঝতে পারলুম তিনি একজন ডাক্তার। চোখ তুলে দেখি আমার চারিদিকে মেয়ে মদ্দ ছেলে বুড়ো মিলে বোধকরি দু হাজার লোকের ভিড় জমে গেছে। সমুদ্রের দিকে এবার চোখ পড়লো—ঠিক তেমনিই ঢেউ তুলে গর্জন করে ফেণ-হাস্যে খিল খিল্ করে হেসে এসে পড়ছে তীরে বালির বিস্তৃত বেলাভূমে। কিন্তু, একেবারে অকারণ তার সে বিশাল বক্ষ। যখন নাইতে নেমেছিলুম সাগর জলে অসংখ্য স্নানার্থীর ভিড় দেখেছিলুম! বোধকরি সমুদ্র একজনকে গ্রাস করেছে দেখে সবাইভয়ে জল ছেড়ে তীরে উঠে এসে আমাকে ঘিরে তামাসা দেখছে!

আমার ঠিক মাথার শিয়রেই দেখি অনেকগুলি মাড়োয়ারী মহিলা বেশ উৎকণ্ঠিত দৃষ্টি নিয়ে আমার দিকে বিস্ফারিত নয়নে চেয়ে রয়েছেন। ব্যাপার দেখে আমার কেমন যেন একটু কৌতুকবোধ হ'ল। আমার মুখ দিয়ে প্রথম বাক্য স্ফূর্ত হ'ল—"হাম রাম সহী হায়!" মাড়োয়ারী মহিলার দল আমার সে নবজন্মের প্রথম স্ফুরিত বাণী শুনে বিরক্ত এবং কিছুটা হতাশ হ'য়ে এই বলতে বলতে চলে গেলেন—ইয়ে লৌণ্ডেকে কুছ নেই হুয়া। বেটা কুটমুট দিল্লাগী করতা!

বোধকরি সমুদ্রতীরে সমবেত সেই বিরাট জনতা এই মাড়োয়ারী মহিলাদের মন্তব্যটাই সত্য বলে মেনে নিলেন। দেখতে দেখতে 'স্বর্গদ্বার' শূন্য হয়ে গেল। সম্ভবতঃ বেলাটা ভাল জমেছে না দেখে সবাই ক্ষুণ্ণ মনে যে যার ডেরায় ফিরে গেল। পড়ে রইলুম আমি, আমার সঙ্গী চার বন্ধু আর সেই কর্তব্য পরায়ণ ডাক্তারবাবু। আরও একটি অপরিচিত কৃষ্ণকায় তরুণকে দেখলুম ডাক্তারবাবুর পাশে দাঁড়িয়ে আছে। আমি তখন উঠে বসেছি। সেই ছেলেটিকে দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম—উনি বুঝি আপনার কম্পাউণ্ডার?

ডাক্তারবাবু হেসে বললেন, না উনিই আপনার 'ত্রাতিয়র!' আপনার প্রাণরক্ষা করেছেন উনিই। আপনি যখন বিপন্ন হয়ে ক্রমাগত হাত তুলে সংকেত করছিলেন আপনার সঙ্গী বন্ধুরা ভেবেছিলেন আপনি যে রকম বজ্জাত লোক হয়ত ওদের ঠকাবার জন্য বিপদের সংকেত দেখিয়ে তামাসা করছিলেন। কিন্তু, ইনি শ্রীমান বিমল গুহ আপনার সংকেত চোখে পড়বামাত্র আপনাকে বাঁচাবার জন্য দ্রুত আপনার দিকে এগিয়ে গিয়েছিলেন। ইনি একজন ভাল সাঁতার। সমুদ্রে সাঁতার দেওয়া শেখাচ্ছিলেন কয়েকজন উৎসাহী ছাত্রদের। এখানে 'লাইফ্ বেল্টের' বদলে ওই যে মোটা কাড়কাঠের টুকরো'র মতো লম্বাটা দেখছেন; ওরই সাহায্যে সাঁতার শেখান। দেখতে ও কাঠখানি যত ভারি এক গাছের কড়ির মতো বটে, কিন্তু বাঁ হাতে তুলে নিয়ে দেখুন একেবারে শোলার মত হালকা। ওরাটার প্রুফ কাঠ। এর ভিতর জল ঢোকেনা! সারাদিন জলে ফেলে রাখলেও ভিজবেনা একটুও। শুনে সাগ্রহে তুলে নিলুম সেই মোটা বড় কড়িকাঠের টুকরোটি। বাঁ হাতেই নিলুম।

ওমা কী হবে! সত্যিই সেটাকে মৃতদেহের মতো ভারি বোধ হয়েছিলুম! সেদি পালঙ্কের চেয়ে হালকা!

বিমল ওস্তার সঙ্গে অতঃপর আলাপ হ'ল। তিনি বললেন আর এক সেকেণ্ড দেরি হলে আপনাকে আর বাঁচাতে পারতুম না। ঠিক সেই অজ্ঞান হয়ে সমুদ্রগর্ভে তলিয়ে যাচ্ছিলেন আমি গিয়ে আপনাকে ধরে ফেলি। ভাগ্যে এই কাঠখানা সঙ্গে নিয়েছিলুম। এরই ওপর তুলে আপনার ভারি দেহ ভাসিয়ে নিয়ে তীরে এনে ফেলেছি।

বিদ্যুৎবেগে উঠে দাঁড়ালুম। ডাক্তার হাঁ হাঁ করে উঠলেন! বন্ধুদের ডেকে বললেন ওঁকে ধরুন। হাঁটিয়ে বাড়ি নিয়ে যাবেন না। একখানা পালকি বা ঘোড়ার গাড়ীতে করে নিয়ে যান। আজ আর কিছু খেতে দেবেন না। শুধু একটু দুধ আর বার্লি; চুপ করে বিছানায় শুইয়ে রাখবেন। সম্পূর্ণ বিশ্রাম দরকার। বাঁচবার জন্য সমুদ্রের সঙ্গে struggle করে ওর সমস্ত নার্ভ ভীষণ strained হয়ে পড়েছে। কিন্তু, আশ্চর্য হলুম দেখে-ভদ্রলোকের পেটে এক ফোঁটাও নোনা জল ঢোকেনি! এ এক অবাক কাণ্ড!

ডাক্তার চলে গেলেন। গাড়ী পালকী কিছুই পাওয়া গেল না। বন্ধুদের কাঁধে ভর দিয়ে এক পা এক পা করে হেঁটেই বাড়ী ফিরলুম। ফিরে দেখি, হায়! হায়! বেড়ে রেখে যাওয়া সাজানো পাতা কুকুর ঢুকে সব চেঁচে পুঁচে খেয়ে গেছে। ভাগ্যি পোলাওয়ের হাঁড়িটা ঢাপা ছিল। তাতেই বন্ধুদের নিষ্ঠি রক্ষা করতে হল। আবার ওঁরা বিছানা করে শুইয়ে দিলেন। আড়াইশো টাকা দিয়ে পূজোর আগে সখ করে একটি সোনার রিস্টওয়াচ কিনেছিলুম। প্রাণদাতা বিমল ওস্তাকে সেটি উপহার দিয়ে বললুম সঙ্গে টাকা নেই। কিছু মনে করবেন না। এই আমার কলকাতার ঠিকানা দিয়ে রেখা করবেন। প্রাণ দাতার ঋণ শোধ হয় না জানি তবু যদি কলকাতায় আসেন দেখা করবেন অতি অবশ্য। বিমল ওস্তা চলে গেলেন। বেশ খুশী হয়েই মনে হ'ল। সেইদিনই আমার টেম্পারেচার উঠলো ১০৫ ডিগ্রী জ্বর। রইলো পড়ে কোমারক চিন্তা—সাক্ষী গোপাল। বন্ধুরা পরদিনই আমাকে নিয়ে কলকাতায় ফিরে বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে গেলেন। সেই থেকে আবার বেঁচে উঠেছি। পঞ্চাশ বছর আগের ঘটনা। সেদিনের কথা আজও ভুলিনি।

* * * *

লোকশিক্ষা বড় কঠিন।

যদি তিনি আদেশ দেন, তা হলে হতে পারে। আদেশ না হলে কে তোমার কথা শুনবে? আর যদি আদেশ হয়, তখন সে কথার জোর কত? পর্বত টলে যায়।

শুধু লেকচার? দিনকতক লোকে শুনবে, তারপর ভুলে যাবে।

—ঠাকুর রামকৃষ্ণ

চিত্র বিচিত্র

মৃত্যুঞ্জয় ভরদ্বাজ

সুসভ্য দেশের অদ্ভুত আইন

আমেরিকার প্রাক্তন সেনানী হেনরি গার্ডনার। অনেকদিন জাপানে থাকাকালে তার সঙ্গে ভ্যালেন্টিনা নামে একটি রুশমেয়ের আলাপ হয়। কিছুদিন কাটবার পর গার্ডনার ভ্যালেন্টিনাকে বিবাহ করে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষের দিকের ঘটনা।

যুদ্ধ শেষ হবার পর গার্ডনার দেশে ফিরে তার বৃদ্ধ পিতামাতা এবং বৌকে নিজের দেশে আনবার উদ্যোগ করল।

স্বামীর কাছে ভ্যালেন্টিনা "স্বাধীনতার পূজারী" আমেরিকার বহু সুখ্যাতি শুনেছিলো। অনেক আশা নিয়ে সে মার্কিন দেশের কূলে এসে দাঁড়াল।

কিন্তু স্বামী-স্ত্রীতে মিলন হ'ল না। তাদের জীবনে নামল কালো দুঃস্বপ্ন, 'ইমিগ্রেশন সার্ভিসের' রূপ ধরে। সানফ্রান্সিস্কোর বন্দরে জাহাজের মধ্যেই ভ্যালেন্টিনাকে গ্রেপ্তার করা হ'ল। তারপর তাকে চালান দেওয়া হল এক অবরোধ শিবিরে। সেখানে সে বিনা বিচারে বন্দিনী রইল তেরোমাস।

কেন? সে প্রশ্নের জবাব দিতে পারে একমাত্র সেই স্বেচ্ছাচারী শাসন বিভাগ, 'ইমিগ্রেশন সার্ভিস'।

বিনাবিচারে আটক ক'রে রাখা, সন্দেহের অবকাশ থাকুক আর নাই থাকুক, নিজেদের খেয়ালখুশীমত মানুষকে সন্দেহের পাত্র সাব্যস্ত ক'রে তাকে অমানুষিক হয়রানি বরদাস্ত করতে বাধ্য করা এবং আরও নানাভাবে তাকে অকথ্য লাঞ্ছনার মধ্যে নিক্ষেপ করা—'কালা কানুনের' জোরে এই ধরণের মনুষ্যত্ব-বর্জিত কাজ করতে পটু শাসন বিভাগের অস্ত্র শুধু যে আমাদের দেশেরই শাসন-তন্ত্রের শোভা ও গৌরব বর্ধন করছে তাই নয়, "ব্যক্তি-স্বাধীনতার পীঠস্থান সুসভ্যতম" মার্কিন মুলুকেও এমনি একটি শাসন বিভাগ আছে—যার কাজ হচ্ছে ব্যক্তি-স্বাধীনতা লাভের আশায়, স্বাধীন ভাবে বসবাস ক'রে শান্তিপূর্ণ জীবন যাপনের প্রত্যাশায় যে সব বিদেশী নরনারী আমেরিকায় গিয়ে সেখানকার নাগরিক অধিকার পাবার চেষ্টা করে, তাদের প্রতি যথেচ্ছ নির্মম ব্যবহার ক'রে ইচ্ছামত তাদের উৎখাত করা, বিতাড়িত করা অথবা দীর্ঘদিন কারারুদ্ধ করা। এই সংস্থার নামটি জেনে রাখা ভাল: "ইউ, এস, ইমিগ্রেশন সার্ভিস।" বিরাট এর ক্ষমতা, অবাধ কর্তৃত্ব; ১৯৯১ সালে এক বিশেষ আইনের দ্বারা এর সৃষ্টি, কারুর কাছে কৈফিয়ৎ দেবার দায় এর নেই।

সানফ্রান্সিস্কো ক্রনিকেলের বিশেষ লেখক হে ক্যাম্পবেল ক্রস কিছুদিন আগে উক্ত সার্ভিসের কীর্তিকলাপ প্রকাশ করেছেন। দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন সুপ্রতিষ্ঠিত সাংবাদিক তিনি। তাই ওঁর উক্তি নিঃসন্দেহে প্রণিধানযোগ্য।

প্রতিনিয়ত এই শাসনযন্ত্রের কবলে পড়ে বহু মানুষকে নিগ্রহ ভোগ করতে হচ্ছে। দীর্ঘদিন ধরে তাদের অসহনীয় শারীরিক ক্লেশ আর মানসিক যেদনা সহ্য করতে হচ্ছে, তাদের সেই লাঞ্ছনার ইতিবৃত্ত ক্যাম্পবেল ক্রস নজির দিয়ে বিবৃত করেছেন।

একটি করুণ কাহিনী শুনুন। পিটার নিকোলেস নামে একজন নামকরা বেহালাদার ছিলেন। ইউরোপজোড়া তাঁর খ্যাতি। বুলগেরিয়ায় তাঁর জন্ম বটে, কিন্তু দেশের সঙ্গে জন্মাবধি কোন সম্পর্ক ছিল না এবং কোন বিশেষ দেশের নাগরিকত্বও তাঁর ছিল না। তিনি ছিলেন সঙ্গীতকারের বিশ্বনাগরিক।

দক্ষিণ-চীন সঙ্গীত বিদ্যালয়ে কাজ করবার সময় যখন কম্যুনিষ্টরা সেই প্রদেশ অধিকার করল তখন পিটার পালিয়ে প্রাণে বাঁচলেন এবং ফিলিপাইন দ্বীপের এক আশ্রয় শিবিরে অত্যন্ত অবস্থায় ও পরিবেশে দু'বছর অতিবাহিত করলেন।

অবশেষে একটি ভিসা অর্থাৎ ছাড়পত্র পাওয়া গেল এবং ১৯৫১ সালের ২৫শে জানুয়ারী তিনি একটি সরকারী জাহাজে চেপে আমেরিকা অভিমুখে রওনা হ'লেন। তাঁর মনে বিশেষ আশা জাগল যে, এইবার আমেরিকায় একটি স্থায়ী বাসস্থান সংগ্রহ ক'রে তিনি জীবনের বাকী দিনগুলি সঙ্গীত সাধনায় অতিবাহিত করবেন। জাহাজ যথা সময়ে সানফ্রান্সিস্কোর বন্দরে ভিড়ল। সঙ্গে সঙ্গে "দেশান্তরাগমন" দপ্তরের একজন কর্মচারী এসে তাঁকে জানাল—"আপনার সম্বন্ধে গোপনীয় আদেশ আছে। কেবিনে গিয়ে অপেক্ষা করুন।"

পিটার নীরবে কেবিনে ঢুকলেন। তারপর সারাদিন গেল অপেক্ষায়। ছাড়পত্র সই না হ'লে নামবার উপায় নেই, প্রহরী আটকাবে। রাতের বেলায় এক সেপাই এসে তাঁকে জাহাজ থেকে নামিয়ে এক অবরোধ-শিবিরে পৌঁছে দিলে।

হয়ত কাল সকালেই ছাড়া পাবেন, হয়ত সামান্য একটু কষ্টের পর এই বৃহৎ দেশে তিনি আকাঙ্খিত সুখশান্তি লাভ করবেন, এমনি মন নিয়ে পিটার সে রাত অতিবাহিত করলেন।

তারপর দিন গেল, দিন এলো। কোথায় মুক্তি? শুধু প্রশ্ন আর প্রশ্ন। ঘণ্টায় ঘণ্টায় বিভিন্ন রাজকর্মচারীর প্রশ্নবাণে জর্জরিত হলেন। কিন্তু মুক্তির কোন ব্যবস্থা হল না। তাঁকে জানানো হল, পনের দিনের মধ্যে তাঁর সম্বন্ধে ওয়াশিংটন থেকে চূড়ান্ত নির্দেশ আসবে। এলো নির্দেশ সাত মাস পরে। আমেরিকায় পিটারের স্থান নেই। অবিলম্বে তাঁকে মার্কিনের মাটি ছাড়তে হবে।

প্রতিবাদ করলেন পিটার। আজীবন তিনি শুধু সঙ্গীতের সাধনা করেছেন। রাজনীতির ধারে কাছেও ঘেঁষেননি কোনোদিন। রাজনৈতিক অছিলায় তাঁর প্রতি এই আচরণ সভ্য দেশের পক্ষে কি করে সম্ভব হোতে পারে?

অরণ্যে রোদন।

আমেরিকা ছাড়ো। জলদি ছাড়ো। কিন্তু যাবেন কোথায়? দক্ষিণ চীনের বাস তো চিরতরে ঘুচেছে। নিজের দেশের সঙ্গে তো জন্মাবধিই কোন সম্বন্ধ নেই। তাহ'লে কোথায় তাঁর স্থান? বিশ্ব নাগরিকের আজ এ কী অবস্থা হ'ল? পিটার ১৪টি দেশের কনসালদের কাছে পত্র দিলেন তাঁদের দেশে স্থান পাবার আবেদন জানিয়ে। কাকস্য পরিবেদনা। অনেকেই জবাব দিলে না। কেউ বা লিখলে —"আপনার ন্যায় সঙ্গীত-জগতের বিরাট পুরুষকে স্থান দিতে পারে, আমার দেশ তেমন বড় নয়।"

আমেরিকায় সিভিল লিবার্টিজ ইউনিয়ন নামে একটি প্রতিষ্ঠান আছে। বত্রিশ বছর তার বয়স। জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে প্রত্যেক মানুষের স্বাধিকার রক্ষায় এই প্রতিষ্ঠান সর্বপ্রকার সাহায্য করবেন, এই তার মূল উদ্দেশ্য। পরিচালকদের মধ্যে আছেন পার্ল বাক, হ্যারিংকলডিক, ক্লাডিন বীডস প্রমুখ কয়েকজন বিশেষ নামকরা আমেরিকান নাগরিক। সেই প্রতিষ্ঠানের খোঁজ পেয়ে পিটার সেখানে তাঁর মামলা পেশ করলেন।

আর্নেষ্ট বেদিন নামে একজন অবসরপ্রাপ্ত পরিচালক ছিলেন স্থানীয় কোর্টের কর্তা।

তিনি পিটারের মামলা ফেডারেল কোর্টে দায়ের করলেন। শুনানীর দিন ধার্য্য হল। চারিদিকে সাড়া পড়ে গেল। কাগজে কাগজে ফলাও ক'রে ব্যাপারটা ছাপা হ'ল। ওয়াশিংটনের টনক নড়ল। শুনানীর আগের দিন নির্দ্দেশ এলো, পিটার নিকোলস আমেরিকায় প্রবেশ করবার, বাস করবার এবং যথেচ্ছ বিচরণ করবার পুরো অধিকার পেয়েছেন।

যদিও কেন তাঁকে সুদীর্ঘ ১৪ মাস বিনা বিচারে আটক ক'রে রাখা হ'ল সে সম্বন্ধে পিটার কোন রাজপুরুষের কাছ থেকে কোন সদুত্তর পান নি, তাহ'লেও মনে মনে তাঁর একটা ধারণা ছিল, দক্ষিণ চীনের এক সহরে যখন তিনি বাস করছিলেন তখন সেখানকার একজন ঘুষখোর ও কুকর্মা মার্কিন রাজকর্মচারীকে পিটার ধরিয়ে দেন। ফলে লোকটার শাস্তি হয়। সেই কর্মচারী পিটারকে শাসিয়েছিল, এই অপমানের প্রতিশোধ সে একদিন নেবে। পিটারের বদ্ধ ধারণা, তাঁর লাঞ্ছনার সেই রাজপুরুষ-পুঙ্গবের হাত ছিল।

তবু পিটার নিকোলসের ভাগ্য ভাল ছিল বলতে হবে। শেষ পর্য্যন্ত তিনি আমেরিকায় থাকবার অধিকার পেলেন। কিন্তু তাঁর সঙ্গে যে আর এক রূপ দম্পতি এসেছিল, কম্যুনিষ্টদের হাত থেকে কোন রকমে প্রাণ বাঁচিয়ে আমেরিকার ঘর বাঁধবার বাসনা নিয়ে, একবছর অপেক্ষা ক'রেও তারা সে দেশে প্রবেশাধিকার পেল না। একবছর পরে বন্দী শিবির থেকে তাদের বার ক'রে দিয়ে বলা হ'ল আমেরিকায় তারা ঢুকতে পাবে না। শেষ পর্য্যন্ত কোনক্রমে তারা একটি মালবাহী জাহাজে চেপে নিঃসম্বল অবস্থায় তন্ন দেহমন নিয়ে হংকং অভিমুখে রওনা হ'ল। সেখানে তাদের কী হল কে জানে?

প্রথম অনুচ্ছেদে বর্ণিত গার্ডনার দম্পতির কথা বলে এই নিবন্ধ শেষ করা যাক। কয়েক সপ্তাহ অবরোধ শিবিরে থাকবার পর ভ্যালেন্টিনাকে এক বিচার পরিষদের সামনে হাজির করা হ'ল।

ঘণ্টা কয়েক ধরে চলল নানা কূটকচালে প্রশ্ন।

ভ্যালেন্টিনা তো স্ত্রীলোক, বড় বড় উকিল ব্যারিষ্টারও সেই সব ফাঁদে-ফেলা প্রশ্নের ঠিকমতো উত্তর দিতে হিমসিম খেয়ে যাবে। বিচারে সাব্যস্ত হ'ল, ভ্যালেন্টিনাকে এই দণ্ডে আমেরিকা ছাড়তে হবে। গার্ডনার আপিল করলে। সুতরাং ভ্যালেন্টিনাকে আবার বন্দীশালায় ঢুকতে হ'ল।

বেচারা গার্ডনারের কী অবস্থা। স্ত্রী রইল সানফ্রান্সিস্কোর বন্দী-শিবিরে আর তার চাকরীগেল হ'ল মিউইয়র্কে। টানা-পোড়েন অসম্ভব হ'ল। স্ত্রীর কাছে থাকবার জন্য গার্ডনার চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে সানফ্রান্সিস্কোয় গিয়ে বাসা নিলে। স্ত্রীর সঙ্গে দেখা হ'ত সপ্তাহে মাত্র দুবার। শুক্রবার কারাগারের মোটা গরাদ দেওয়া জানলার বাইরে দাঁড়াতো গার্ডনার। ভিতরে দাঁড়িয়ে থাকতো অশ্রুমুখী ভ্যালেন্টিনা। অল্প সময়। অল্প কথা। দীর্ঘনিঃশ্বাস আর চোখের জল।

স্বামী হাঁক দিত, সময় পার হয়েছে।

মাসের পর মাস কেটে যেতে লাগল। বিচার আর শেষ হয় না।

অবশেষে সানফ্রান্সিস্কোর সংবাদপত্রে গার্ডনার-দম্পতির নির্য্যাতনের খবর ছাপা হল এবং তারপর আপীলের শুনানী শেষ হোতে রায় বেরুলো, ভ্যালেন্টিনাকে আমেরিকায় থাকতে দিলে মার্কিন দেশ বিপন্ন হবে না। আমেরিকায় না ঢোকার বিশমাস পরে ভ্যালেন্টিনা কাদা কানুনের হাতুড়ে হাত থেকে অব্যাহতি পেয়ে স্বামীর কাছে যাবার অনুমতি পেলে।

প্রেমেন্দ্র মিত্র

সৃষ্টি দোলায়

রাতটা যে অমাবস্যার তা আমার আগেই বোঝা উচিত ছিল।

নদীর ধারের সেই মন্দিরে যাবার জন্যে সন্ধ্যার আগেই বেরিয়েছিলাম।

চম্পা তখনও বাড়িতে। ইচ্ছে করেই তাকে কিছু তখন জানাইনি। সে মন্দিরে আসবার আগে আমার খোঁজ করত কি না বলতে পারি না। কিন্তু তার জন্যে অপেক্ষা করে থাকার প্রয়োজন বোধ করি নি।

প্রথমটা নদীর ধারে ধারেই অনেক দূর পর্যন্ত হেঁটে গিয়েছিলাম।

শীতের শেষের দীর্ঘ নদীর ধারের প্রায় শুকনো বালির চড়ার ওপর দিয়ে হাঁটবার বিশেষ অসুবিধা নেই।

সময়ের খেয়াল না থাকায় বেশ একটু বেশী ঘুরেই গিয়ে পড়েছিলাম।

নদী সেখানে বাঁক নিয়েছে একটা ছোটখাটো পাহাড়ের পাদদেশ দিয়ে।

সেখানে কিছুক্ষণ বালির ওপরে বসে থাকবার পরেই অন্ধকার ঘনিয়ে এল। হঠাৎ অমাবস্যার কথাটা মনে পড়ল তখন।

রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার যেরকম গাঢ় হবে তাতে ত পথ চিনে যাওয়াই কঠিন।

ভরসার মধ্যে এই যে নদীর ধার ধরে বহুদূর পর্যন্ত যাওয়া যাবে।

উঠে পড়ে হাঁটতে সুরু করলাম। ঘরটা সুবিধে হবে মনে করেছিলাম তা কিন্তু হল না। সন্ধ্যার আগে পর্যন্ত ময়লা আলোয় বালির চড়াটা অন্ততঃ অস্পষ্ট ভাবে দেখা যাচ্ছিল। অন্ধকার গাঢ় হওয়ার সঙ্গে অনভ্যস্ত চোখে চারিদিকেই যেন কালি মেড়ে দিয়েছে মনে হ'ল। টর্চটা না আনার জন্যে তখন আফসোস হচ্ছে। অন্যমনস্কতার ফল অবশ্য আমবার কথা মনেই ছিল না।

সমুদ্র তীরের মত মসৃণ সমতল বালি ত নয়। উঁচু নীচু ঢিবি আছে, কিছু ভিজে নরম বালির গর্তও আছে এখানে সেখানে।

বার কয়েক হোঁচট খেয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়লাম, দু একবার নরম ভিজে বালির মধ্যে পাও ডুবে গেল।

মনে তখন একটু আশঙ্কাও দেখা দিয়েছে।

চোরা বালির কাহিনী অনেক শুনেছি। সে রকম কোন বালির ফাঁদে তলিয়ে যাবো নাকি! নদীর এই ধরণের চড়াতেই ত সে রকম চোরাবালি থাকে বলে শুনেছি। এই অন্ধকারে একবার সে রকম জায়গায় পড়লে আর ত রক্ষা নেই। চীৎকার করে কাউকে ডাকাও বৃথা। শোনবার মত কেউ কোথাও নেই।

চোরা বালিতে অবশ্য পড়ি নি। তবে বেশ সতর্পণে প্রায় এক পা এক পা করে যেতে হওয়ায় দরুণ সময় খুব বেশীই লাগল।

কিছুক্ষণ হাঁটবার পর অন্ধকার অবশ্য চোখে একটু সয়ে গেল।

একটু কুয়াশার ভাব থাকলেও আকাশের তারা গুলোর ক্ষীণ আলোতেও অন্ধকার তখন একটু ফিকে মনে হচ্ছে।

দূরে রেলওয়ে ব্রীজের আয়তনটা আকাশের গায়ে অস্পষ্ট কালির ছাপের মত দেখে মনে হল মন্দিরের কাছাকাছিই এসে পড়েছি। এবার নদীর পাড় ছেড়ে মন্দিরে যাবার পথটা খুঁজে বার করাই সমস্যা।

গতকাল যে জায়গা দিয়ে নেমেছিলাম উঠেছিলাম তার কিছু চিহ্ন মনে করবার চেষ্টা করলাম। তা মনে পড়ল না। মনে পড়লেও অবশ্য এই অন্ধকারে তা চিনতে পারতাম কিনা সন্দেহ।

নদীর পাড় ধরে ধীরে ধীরে হাঁটতে হাঁটতে ওপরে ওঠার রাস্তা কোথাও পাই কিনা লক্ষ করছি হঠাৎ দূরে এক বিন্দু আলো দেখে উৎসাহিত হয়ে উঠলাম।

আলোর বিন্দুটা দুলতে দুলতে এগিয়ে আসছে।

খানিকটা কাছে আসার পর সেটা একটা লণ্ঠন বলে বুঝতে পারলাম। লণ্ঠনটা নিয়ে যে আসছে তার চেহারা দেখা না যাক তার আন্দাজটা কিছু পাওয়া গেল খানিক বাদে।

একেবারে ধুতি পরা গায়ে কোট ও মাথায় টুপি লাগানো প্রৌঢ় গোছের একটি মানুষ।

নদীর পাড় যেখান থেকে সুরু হয়েছে সেখানে এসে দাঁড়িয়ে লণ্ঠনটা একটু তুলে এদিকে ওদিকে কয়েকবার নেড়ে কি যেন দেখছে মনে হল।

বালির চড়ার মধ্যে যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম পাড় থেকে সে জায়গাটা বেশ একটু দূর। তার লণ্ঠনের আলো অতদূরে পৌঁছোয় না। সে আমায় দেখতে না পেলেও লণ্ঠনটা তুলে ধরার দরুণ লোকটির মুখের আভাস আমি একটু পেলাম।

এ রকম বিপদের মধ্যে লণ্ঠনধারী একজনের দেখা পেয়ে সাড়া দিয়ে এগিয়ে যাওয়াই আমার উচিত ছিল।

কিন্তু তা পারলাম না। না পারবার কারণ একটি নয় দুটি। প্রথমতঃ দূর থেকে লণ্ঠনের আলোয় যেটুকু দেখেছি তাতে চেনা কেউ বলে না বুঝলেও লোকটিকে যেন কবে কোথায় দেখেছি মনে হ'ল। কোথায় কি ভাবে দেখেছি সেইটে স্মরণ করতে না পারাটাই তখন অস্বস্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ লোকটির অদ্ভুত ব্যবহারে তখন আমি একটু বিস্মিত ও সন্দিগ্ধ না হয়ে পারি নি।

লণ্ঠনের আলোয় যেটুকু দেখেছি তাতে লোকটিকে এ দেশের সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর বলেই মনে হয়েছে। লণ্ঠন নিয়ে এরকম জায়গায় তাঁর মত লোকের আসবার কারণ কি?

এ পথে লণ্ঠন নিয়ে রাত্রে কারুর নদী পার হবার কথা নয়। অনভিদূরে গ্রাম থাকতে এ রকম মূঢ়তা কেউ দেখায় না নিশ্চয়।

তাহলে লণ্ঠন নিয়ে একলা ওখানে কি সখ করে বেড়াতে এসেছে লোকটি। সাধু সন্ন্যাসী হলেও না হয় বুঝতাম। কিন্তু তাঁরা ও লণ্ঠন নিয়ে নির্জনে ধ্যান করতে আসেন বলে জানি না।

আর রসিক তান্ত্রিক গোছের হতে পারে! কিন্তু চেহারা পোষাক তার সাক্ষ্য দেয় না।

লোকটি এবার যা করলে তাতে আরো বিস্মিত হলাম। লণ্ঠনটা নিয়ে পাড়ের কাছে একটি

বড় গাছের তলায় সে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর লণ্ঠনটা নামিয়ে সেই খানেই গাছের একটা মাটি থেকে ঠেলে ওঠা শিকড়ের উপর বসল।

ইচ্ছে করলে তখনও লোকটির কাছে গিয়ে তার এই অদ্ভুত খেয়ালের মানে হয়ত জিজ্ঞাসা করা যেত।

কিন্তু শুধু সঙ্কোচের বশেই নয়, সে জিজ্ঞাসা নিষ্ফল হবে অনুমান করেই নিরস্ত হলাম। সন্দেহের দোলা কিছু যদি সত্যিই লোকটির আচরণে থাকে তাহলে আমার জিজ্ঞাসা করবার অপেক্ষায় প্রাণ খুলে সব কথা বলবার জন্যে সে নিশ্চয়ই বসে নেই।

লোকটিকে কিছু না বুঝতে দিয়ে অন্য কোন জায়গা দিয়ে পাড়ে উঠে মন্দিরে যাওয়াই এবার যুক্তি-যুক্ত মনে করলাম।

সুবিধেমত জায়গাও একটা পাওয়া গেল।

তারার আলোয় চোখ অভ্যস্ত হওয়ার দরুণ একটু আধটু তখন দেখতে পাচ্ছি। পাড়ে উঠে খানিকটা হাঁটবার পরই মন্দিরে যাবার পাকা চলা রাস্তাটা পেয়ে গেলাম। মন্দিরের চূড়োটা তারাভরা আকাশের গায়ে কালো অস্পষ্ট রেখায় তখন দেখা যাচ্ছে। চারিদিকের নিস্তব্ধতার মধ্যে মন্দির থেকে মন্ত্রোচ্চারণের ধ্বনিও কানে এসে বাজছে।

পূজা তাহলে সুরু হয়ে গেছে!

[ক্রমশঃ

* * * *

ডাক্তারী করে বিশেষ পয়সা জোটে না, এমন কি সংসার খরচটাও ঠিক মত চলে না, তাই নিরুপায় হয়ে শিক্ষকতা করেন কানাডার এক তরুণ শল্যচিকিৎসক।

ডায়াবিটিসের ওপর বক্তৃতা দিতে হবে ছাত্রদের সামনে, তরুণ শিক্ষকটি প্রাণপণে পড়াশোনা করে চলেন।

১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবরের একটি রাত……পরদিনের বক্তৃতার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন তিনি, ঘণ্টার পর ঘণ্টা পড়ে চলেছেন, নানা তত্ত্ব আর তথ্যে, নানা রোগ বিবরণের জটিলতায় মাথা ঝিম্ ঝিম্ করছে।

কখন শয্যায় আশ্রয় নিয়েছেন জীবন যুদ্ধে ক্লান্ত আহত সৈনিক……তখনও ভাবনার বিরাম নেই……

গভীর রাত্রিতে বিছানা ছেড়ে দাঁড়ালেন, আলো জ্বাললেন, খস্ খস্ করে কাগজের ওপর লিখলেন তিনটি কথা: কুকুরের প্যান্‌ক্রিয়াটিক নালী বেঁধে দাও। ছয় থেকে আট সপ্তাহ অপেক্ষা কর। পরিত্যক্ত অংশ সরিয়ে দাও ও সারাংশ নিষ্কাষণ কর।

এরপর বিছানায় গিয়ে ধীরে ধীরে ঘুমিয়ে পড়লেন।

ইনসুলিন আবিষ্কৃত হোল। চিকিৎসা জগতে নবযুগ এল। সেদিনের তরুণ চিকিৎসকটির নাম আজ সকলেই জানে—ফ্রেডরিক ব্যাণ্ট ব্যাটিং।

অধ্যয়নের পরেও আরো একটি কথা থাকে—আত্মসমাহিত গভীর চিন্তা।

ব্যাপার যা চলছে

চক্রপাণি

ধরা পড়ে গেলেন বেচারা খাদিওয়ালা। ঠক বাছতে গাঁ উজোড়—কিন্তু সে তো পরের কথা, এখন, যখন তুমি ধরা পড়ে গেছ তখন আর তুমি আমাদের কেউ নও—এই হচ্ছে আধুনিক-কংগ্রেসের মনোভাব। কে এই খাদিওলা? যে-সে নন। যথা প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি।

রাজ্যের কংগ্রেস কমিটির কর্তাই তো সব—সবাই তাঁর তাবে—অপরিসীম তাঁর ক্ষমতা—রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রী সবাই তাঁর পরে। এহেন প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি স্বভাবতই ১৯৫১ সালের ভারতীয় কংগ্রেসের নাগপুর অধিবেশনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হয়েছিলেন এবং সংবাদে প্রকাশ ঐ পদের অপব্যবহার করে তিনি প্রকাণ্ড কালোবাজারী ব্যবসা চালিয়ে লাখ লাখ টাকা কামিয়েছেন। এসব কথা ফাঁস হয়েছে আদালতে। এক পত্রিকার বিরুদ্ধে মানহানির মামলা আনতে গিয়ে খাদিওয়ালা নিজেই ফেঁসেছেন—তাঁর কীর্তিকলাপ ফাঁস হয়ে গেছে · তা সে যাই হোক্···আমরা ভাবছি, শুধু তো তিনি নন, তাঁর মতো মানুষ তো সব রাজ্যেই ছড়িয়ে পড়েছে। অতীতকালের নাট্যকার লিখে গেছেন—'ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষ লক্ষ বীরের জন্মভূমি। আজকের নাট্যকার লিখবেন—"ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষ লক্ষ কালোবাজারীর লীলাভূমি।

• • •

সাম্প্রতিকতম সুসংবাদ।

সরকারী রসায়নাগারে চেম্বাল সরষের তেলের নমুনা বিশ্লেষণ করে তার মধ্যে সায়েনাইডের মতো মারাত্মক বিষের সন্ধান পাওয়া গেছে! সরকার বিক্রেতার নামে নাকি মামলা রুজু করেছেন। বিধান সভার সংবাদ। কিন্তু ভাবছি, মামলা কেন? যারা অনেক মাথা খাটিয়ে এমন ভেজাল বার করেছে, গোটা জাতটার মোক্ষ লাভের এমন সুব্যবস্থা করেছে, তাদের তো সরকারী খেতাব দেওয়া উচিৎ। ভেজালশ্রী অথবা ঐ ধরণের কোন একটা গালভরা শ্রী।

• • •

গণতন্ত্রের আকাশছোঁয়া দাম শুধু মানুষকেই উপোস দিতে বাধ্য করছেনা, মন্দিরে থাকিয়ে দেবতারাও আজ তাঁদের নিত্য ভোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। সংবাদে প্রকাশ বিখ্যাত সোমনাথ মন্দিরের বিগ্রহ গত একমাস-যাবৎ তাঁর ভোগ পাচ্ছেন না। সংবাদে আরও প্রকাশ, তৈলাভাব প্রভু বীর হনুমানও কষ্টে পড়েছেন। আগের মতো দর্শনার্থীরা আর তাঁর জন্যে তাঁড় তাঁড় তেল আনছেনা, শুধু হাতেই পেন্নাম ঠুকে চলে যাচ্ছে। হায় ভগবান! এও দেখতে হ'লো—

• • •

দেশ-বিদেশে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জোয়ার বইছে। এদেশ থেকে অনেক রামবাবু শামবাবু যদুবাবু দিব্যি নিখরচায় বিদেশ ঘুরে আসছেন। কিছু একটা জোটাতে পারলেই হ'ল—থিয়েটার, সিনেমা, নাচ, ইতিহাস, ভূগোল, শোভন, অশোভন,—শেষ পর্যন্ত শুভেচ্ছাশুভ। তা যাঁরা যাচ্ছেন তাঁদের

কেরামতি আছে বৈকি। আগামী সেপ্টেম্বরের প্রথম দিকে দিল্লীতে একটা নতুনতর সম্মেলন বসছে। কমনওয়েলথ সাহিত্য সম্মেলন। এই মজলিশে পনেরোটি দেশের লেখক আর পণ্ডিতরা আসর গুলজার করবেন। ভারত থেকেও অনেকে যাবেন। লিষ্টিতে দেখছি, ঔপন্যাসিক আর কে নারায়ণ, অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বালচাঁদ রাজন ও এ এন কাউল, পুণা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ নাগরাজন এবং লেখক কুশবন্ত সিং। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন অধ্যাপক বা বাংলার কোন মনীষী বা লেখক ওই তালিকাভুক্ত হননি দেখে আমরা আনন্দিত হয়েছি।

• • •

উড়িষ্যার ডি আই পি হয়েছেন মহতাবের শনির দশা চলেছে। অনেক চেষ্টা করছেন কিন্তু ছত্তগৌরব কিছুতেই আর ফিরে পাচ্ছেন না। সম্প্রতি তিনি এক মহা বিপাকে পড়েছেন। তিনি নাকি উড়িষ্যার বর্তমান সংকট ও দুর্গতি মোচনকল্পে উড়িষ্যায় রাষ্ট্রপতির শাসন চালু করবার জন্যে দিল্লীর দরবারে আর্জি পেশ করেছিলেন। ব্যস। আর যায় কোথায়। উড়িষ্যার কংগ্রেস-প্রধান তাঁকে চেপে ধরেছেন, কর্তাদের কাছে নালিশ করেছেন, কেন শৃংখলা ভঙ্গের অপরাধে মহতাবের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে না। দুঃখ আর কাকে বলে! এক সময়ের উড়িষ্যার হর্তাকর্তাবিধাতা, মুখ্য মন্ত্রী, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, রাজ্যপাল—কত কী!—তাঁকে আজ নিজের জাতভাইদের কাছেই আসামীরূপে দাঁড়াতে হচ্ছে। সাম্প্রতিকতম সংবাদে দেখা যাচ্ছে—আঠারোজন বিশিষ্ট আইনজীবী মহতাবের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ করে রাষ্ট্রপতির কাছে স্মারকলিপি পেশ করেছেন। কোথাকার জল এখন কোথায় গিয়ে গড়ায়।

• • •

ঘুষ করে খাও, কিন্তু ঘুষ হিসেবে খাও—কখনো না! দৃষ্টান্ত : নাগপুরের রায়রা জজ এক বিচার প্রার্থীর কাছ থেকে পাঁচসের ঘী নিয়ে তার ফলে দুর্নীতির দায়ে তাঁর চাকরিটি খুইয়েছেন। এই রায়রা জজ ঐ এস এস আলতী যাকে প্রাণ থাক মান তবে বোম্বাই হাইকোর্টে আপীল করেছিলেন। কিন্তু হাইকোর্টের দুই বিচারপতি তাঁর আপীল নামঞ্জুর করেছেন। ঘী আর ঘুষ—অনেক সময়েই হজম করা ভারী শক্ত।

• • •

মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেনের সভাপতিত্বে কয়েক দিন আগে মহাজাতিসদনের প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত হল। ঐদিন মহাজাতি সদনে এক সভায় বেশ কয়েকজন ডি. আই. পি. সমবেত হলেন। তাঁদের ছবি কাগজে বেরুলো। প্রচুর বক্তৃতা, নাচ গান হল। প্রফুল্লবাবু বললেন, মহাজাতি সদন একটি পবিত্র তীর্থস্থান।—

কিন্তু তীর্থস্থানটির কার্যক্রম আমরা কি দেখছি? দিনের পর দিন এই সদনে থিয়েটারওয়ালা ও নাচগানওয়ালাদের ভিড়। বেক একটি থিয়েটার হল ছাড়া মহাজাতি সদনের অন্য কোন মহত্তর কর্ম-প্রচেষ্টার পরিচয় এতাবৎ এমন কি পাওয়া গেছে? কর্তারা সদনের দেওয়ালে দেওয়ালে কয়েকজন দেশকর্মী ও বরেণ্য দেশনায়কের ছবি টাঙিয়েই যত কাজ করেছেন বলে আত্ম-প্রসাদ বোধ করছেন।

রবীন্দ্রনাথের আদর্শ, সুভাষচন্দ্রের স্বপ্ন এই মহাজাতি সদন; মানুষের মিলন ক্ষেত্র। বিভিন্ন দেশ বিদেশ ও প্রদেশের মানুষের সমাবেশ হবে এখানে, হবে ভাবের ও সংস্কৃতির আদান প্রদান,

দেশের সর্বস্তরের মানুষের সঙ্গে এখানে সংযোগ ঘটবে। এখানকার উৎসবে অংশ গ্রহণ করে মানুষ মনে করবে, মানুষে মানুষে কোন ভেদ নেই, দেশের ঐতিহ্যগত সম্পদের তারাও সমান অধিকারী।

কোথায় সেই আদর্শ আর সেই স্বপ্ন? এখন ওখানে কেবল থিয়েটার। সম্প্রতি দেখছি কয়েকজন নাট্য-শিল্পীদের নিয়ে দু'একটি নাটুকেদল "সম্মিলিত অভিনয়ের" ফিরিস্তি লাগিয়ে মহাজাতি সদনের মহৎ ঐতিহ্য রক্ষা করছে।

মহাজাতি সদনকে যদি সত্যিই জনসাধারণের কাছে সংস্কৃতির তীর্থভূমি করে তুলতে হয় তাহ'লে ফাঁকা বুলি দিয়ে তা হবে না। কিছু চিন্তা ও পরিকল্পনার প্রয়োজন যাতে জনসাধারণ মনে করতে পারে যে এটি একটি সত্যিকার জাতীয় পীঠস্থান।

• • •

'ছেড়ে দেনা কেঁদে বাঁচি'।

কোন এক অসতর্ক মুহূর্তে ওড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রী বীরেন মিত্র ঘোষণা করলেন যে তিনি তাঁর ও তাঁর স্ত্রীর স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি এক টাকার বিনিময়ে লেখাপড়া করে দিতে রাজী আছেন। তাঁর নামে সম্প্রতি দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। তাই বোধ করি তিনি একটা চমক লাগাবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু ফ্যাসাদ ঘটেছে। উক্ত সম্পত্তির ক্রেতারূপে দেবেন মহান্তি নামে এক সাংবাদিক বীরেন মিত্রকে একটি টাকা পাঠিয়ে দিয়েছেন, এখন আইন মাফিক বেচাই হবার অপেক্ষা। আমরা পরবর্তী সংবাদের জন্যে সাগ্রহে অপেক্ষা করছি।

• • •

আজকের সব চেয়ে বড় ব্যথা

নব-পরিণীতা কন্যা বিবাহের পর শ্বশুরবাড়ী যাচ্ছে। মা কাঁদছেন।

প্রতিবাসিনীরা সান্ত্বনা দিয়ে বলে, কেঁদোনা দিদি.....সবারই একদিন এমনি .....

ক্রন্দনরতা জননী বলেন, সেজন্য কাঁদছিনা।.....তবে, কিসের জন্য?

একটা রেশনকার্ড যে কমে গেল আজ থেকে!

মজার ডেকরেটরস
৬৩ এ, জন্ম. সি. ব্যানার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬-ফোন-৫৫-২৩৪৮

অন্তরীক্ষে

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

গল্প-ভারতী
ভাদ্র, ১৩৭১

সম্পাদকীয়

স্বাধীনতা দিবসের শপথ—

এই তো সেদিন চির-চর্চিত প্রথায় স্বাধীনতা দিবস প্রতিপালিত হলো। জাতির নায়ক এবং দেশ নায়কদের কণ্ঠে আমরা স্বাধীনতা-দিবসের সঙ্কল্পবাণী উচ্চারিত হতে শুনলাম। তাঁদের কাছ থেকে আমরা সঙ্কল্পের পাঠও গ্রহণ করলাম। প্রতি বৎসরই এই দিনে প্রতিপালিত হয়; কিন্তু জাতির জীবনে তা কার্যকরী হয় কতটুকু? সত্যিকারের সঙ্কল্প কি আমরা গ্রহণ করি? না, শুধু একটি নিয়ম-তান্ত্রিক খসড়া আমরা শুনে যাই মাত্র; কাজেই তা আমাদের মনে কোনও স্থায়ী রেখাপাত করে না।

ভারতের সন্ন্যাসী কণ্ঠে যেদিন আমরা শুনেছিলাম "আজ থেকে পঞ্চাশ বছর তোমার সামনে তোমার একমাত্র উপাস্য দেবতা হলো তোমার স্বদেশ।" সেদিন স্বামী বিবেকানন্দের এই কথায় জাতীয় সঙ্কল্প-বাণীই উচ্চারিত হয়েছিলো। সেই বাণীর স্বাক্ষর জাতীয় জীবনে চিহ্নিত হয়েছিল। তাই না আমাদের পঞ্চাশ বছরের স্বাধীনতা সংগ্রাম অত তীব্র আকার ধারণ করতে পেরেছিল।

যিনি ছিলেন মন্ত্রদাতা,—তিনিই হয়েছিলেন জীবনে তারই আচরণে শুদ্ধ। তাই তাঁর মন্ত্র জাতির জীবনে আচরিত হয়েছিল। তাঁর মন্ত্র-শিষ্যদের উদ্ভবেও বিলম্ব হয় নি। আসমুদ্র হিমাচল সেই ভাবের বন্যায় প্লাবিত হয়েছিল.

স্বাধীনতার শপথ বাক্যে শুদ্ধতার সেই হোমাগ্নি আজ কে জ্বালবে? সন্ন্যাসী কণ্ঠ নিরুদ্ধ। স্বাধীনতা দিবসে সেই মন্ত্রকণ্ঠকে যদি আশ্রয়িত করা যায়—জীবন দিয়ে সেই আচরণের সত্যতাকে যদি মেলে ধরা যায়,—তবেই হবে সত্যিকারের শপথ গ্রহণ; তা না হলে শপথ এবং সঙ্কল্প শুধু থাকবে কথার কথা। শুধু একটা বিশেষ দিনের নিয়ম পালন মাত্র। আজকের এই দুর্দিনে, জাতির এই মহা সংকট-মুহূর্তে জাতির নায়কেরা নূতন করে জাতিকে গড়ে তোলবার এক দৃঢ় সঙ্কল্প গ্রহণ করুন। এবং জীবন দিয়ে তা প্রতিপালিত করুন। তবেই হবে দেশে নব জাগরণ। মৃতপ্রায় দেশবাসীর জীবনে নূতন প্রাণ সঞ্চারিত হবে।

কংগ্রেস ও জনসাধারণ—

আজ কংগ্রেসকে বুঝতে হবে যে স্বাধীনতা লাভের পর সতর বৎসর কেটে গেল—কিন্তু কংগ্রেস কোন ভাবোদ্দীপক জাতীয় আন্দোলন সুরু করতে পারলেন না। ভারতের মত একটা বিরাট দেশ অনুপ্রাণিত হতে পারে এমন কোন আদর্শই কংগ্রেস দেশবাসীর সম্মুখে তুলে ধরতেও পারছেন না।

আদর্শের বিভ্রান্তি ও গোজামিল আদর্শের স্থান অধিকার করতে পারেনা। স্বদেশী যুগের ভারত-সাধনার যে আদর্শকে স্বাধীনতা পাবার পর কংগ্রেস এতদিন ফিরে দেখে নি। আজ সময় এসেছে সে ভারত-সাধনার আদর্শকে আবার দেশবাসীর সামনে তুলে ধরার ও ভারতবাসীকে আবার ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র, স্বামী বিবেকানন্দ, অরবিন্দ ও রবীন্দ্রনাথের ভারতবর্ষের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার। কারণ সেইখানেই আছে এই বিরাট মহাদেশের মিলনকেন্দ্রবিন্দু; সেইখানেই অন্তর্নিহিত আছে এই বিরাট মহাদেশের প্রাণবহ্নি। আজ কংগ্রেসকে দলগত বাদ বিসম্বাদ পরিহার করে নূতন এক ভাব-আন্দোলন দ্বারা সারা দেশকে প্লাবিত করতে হবে।

রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেছিলেন যে "দেশের কল্যাণের একটা বিশ্বরূপ মনের সম্মুখে উজ্জ্বল করে রাখলে দেশের লোকের শক্তির বিচিত্রধারা সেই অভিমুখে চলবার পথ সহজ হয়ও বুদ্ধিশক্তির দ্বারা যখন করতে পারে।" কংগ্রেস জনসঠনের প্রতিষ্ঠান। কংগ্রেসের হাতে শাসনভার। এই দুই দায়িত্বের মাঝে দাঁড়িয়ে জাতীয় কংগ্রেস কি জন-কল্যাণের আদর্শ খুঁজে ধরতে পেরেছেন? দেশ শাসনের ভার এই সাতের বছর ধরে গ্রহণ করেও দেশের মানুষের মনের চেহারারও কোন পরিবর্তনের যুক্ত হাওয়া কি প্রসারিত করতে পেরেছেন? না, তা পারেন নি। নেতারা মুখে অনেক কথা বলেছেন, সেই কথায় শুধু আন্তরিক বাহার,—অন্তরের একনিষ্ঠতায় এবং গভীর উপলব্ধিতে তা ধ্যানের ধারণায় জন-সাধারণের মনের পলিমাটিতে ছাপ রাখেনি। তাই আজ অসন্তোষ, বিক্ষোভ এবং এত ভয়, ভয়, আশঙ্কা। জনসাধারণের মধ্যে যে শক্তির বিচিত্রধারা তা বহুকালে আবদ্ধ, তা মরণ-কাঠির হিমশীতলতায় জড়। এই জড়কে চেতনায় জাগিয়ে তুলতে হলে যে ভাব-আন্দোলনের প্রয়োজন যে বোধের জীবন-কাঠির স্পর্শ লাগাবার প্রয়োজন,—কংগ্রেস তা থেকে অনেক পিছিয়ে আছেন। রবীন্দ্রনাথ একদিন বলেছিলেন —"পৃথিবীতে যারা দেশের জন্য মানুষের জন্য দুঃসাধ্য ত্যাগ স্বীকার করেছে,—তারা দেশের বা মানুষের কল্যাণ ছবিকে উজ্জ্বল আলোয় বিরাট রূপে ধ্যান নেত্রে দেখেছে। মানুষের ত্যাগকে যদি চাই, তবে তার সেই ধ্যানের সহায়তা করা দরকার।" একমাত্র একটা বৃহৎ ভাব-আন্দোলনই পারে সেই ধ্যানের সহায়তা করতে।

শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ

আগে মানুষ তারপর মতবাদ

অনেকের ধারণা যে জনসাধারণকে বা তরুণ সমাজকে জাগাতে হলে রাষ্ট্র বা সমাজ সম্পর্কীয় মতবাদ প্রচার করতেই হবে। সমাজ ও রাষ্ট্রের আদর্শ কি হওয়া উচিত এ বিষয়ে আজকাল অনেক প্রকার মতবাদ বা 'ইজিম' প্রচলিত আছে। এক একটি 'ইজিম'-এর গোঁড়া ভক্তেরা মনে করেন যে ঐ মতের প্রতিষ্ঠা হলে পৃথিবীর সকল দুঃখ দূর হবে। আজকাল তাই কোন কোন দেশে 'ইজিম'-এর লড়াই খুব। আমার নিজের কিন্তু মনে হয় যে কোনও 'ইজিম'-এর বা মতবাদের দ্বারা মানব জাতির উদ্ধার হতে পারে না, যদি সর্বাগ্রে মানুষোচিত চরিত্রবল লাভ না করা যায়। স্বামী বিবেকানন্দ তাই বলতেন Man-making is my mission—মানুষ তৈরী করাই আমার জীবনের উদ্দেশ্য। জাতিগঠনের এবং 'ইজিম' প্রতিষ্ঠার ভিত্তি—খাঁটি মানুষ। খাঁটি মানুষ সৃষ্টি করা যুব-আন্দোলনের প্রধান উদ্দেশ্য। খাঁটি মানুষ সৃষ্টি করতে হলে সব দিক দিয়ে তার বিকাশ হওয়া চাই।

আজ ভারতের এই হীন অবস্থা কেন? আছে তো সবই—প্রকৃতি, সৌন্দর্য, শারীরিক বল, শিক্ষা, দীক্ষা, শৌর্য, বীর্য, বিদ্যা, বুদ্ধি—এর কোনটির তো অভাব নেই। এ সব উপাদান নিয়ে আমরা এক নিখুঁত মূর্তি রচনা করতে পারি। কিন্তু প্রাণ প্রতিষ্ঠার আয়োজন কোথায়? আমাদের আছে সবই, নাই শুধু এক বস্তু—নিঃশেষে আত্মবলিদান—সকল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করে যাবতীয় বিঘ্ন তুচ্ছ করে একটি আদর্শের পশ্চাতে সারাটি জীবন অনুধাবনের ক্ষমতা। এই ক্ষমতা আমাদের নেই, আমরা অন্তরের সঙ্গে দেশকে ভালবাসি না, স্বজাতিকে ভালবাসি না। আমরা যদি দেশকে ভালবাসতে শিখি তা হলে আত্ম-বলিদানের ক্ষমতা লাভ করব, আমাদের চরিত্রে অবিরাম ও অশ্রান্ত পরিশ্রমের ক্ষমতা ফিরে আসবে। এই দুইটি বল—tenacity of purpose ও moral stamina কোথায় পাব? বনে জঙ্গলে যুগ যুগান্তর ধরে তপস্যা করলেও পাব না। পাব নিষ্কাম কর্মের মধ্যে জীবন ঢেলে দিলে—অবিরাম সংগ্রামে লিপ্ত হলে। ঘরের কোণে বসে উপাসনা করলে বা সংসার ত্যাগ করলে—সাধনা বা শক্তি সঞ্চয় হয় না।

শত শত মহাপুরুষ এই দেশে আবির্ভূত হয়েছেন। অথচ তাঁদের আবির্ভাব সত্ত্বেও জাতি আজ কিরূপ শোচনীয় অবস্থায় পড়ে রয়েছে। জাতিকে বাঁচাতে হলে সাধনার দ্বারা আবার অন্য দিকে পরিচালিত করতে হবে। জাতিকে বাদ দিয়ে ব্যক্তিত্বের সার্থকতা নেই—একথা আজ সকলকে হৃদয়ঙ্গম করতে হবে।.....যে যুগে আমাদের বাস, সে যুগের পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য সাধন করা আমাদের কর্তব্য। ভারতবর্ষকে কল্যাণে, মুক্তিতে, মহিমায় গরীয়সী করে তুলতে হলে এ যুগের প্রয়োজন—একটি কর্মবাদের দর্শন।

—সুভাষচন্দ্র

জীবন কথা

শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ

অনিন্দ্যসুন্দর সেনগুপ্ত

২৫

হরিদ্বার থেকে গোঁসাইজি ফিরে এলেন গেণ্ডারিয়া।

কোলে ছেলে, বাম হাঁটুতে শান্তিসুধা এসে কেঁদে পড়ল : 'বাবা, মা কই ?'

'তোমার মাকে বৃন্দাবনে রেখে এলাম।' গোঁসাইজি বললেন স্নিগ্ধকণ্ঠে, 'তিনি এলেন না, ওখানেই থেকে গেলেন। তার কী, আমরা একদিন সবাই যাব সেই বৃন্দাবনে।'

শান্তিসুধা ভেঙে পড়ল।

গোঁসাইজি তাকে স্পর্শ করলেন। সেই স্পর্শে সমস্ত তাপদাহের নিবৃত্তি হল, শান্তিসুধা শান্ত শীতল হয়ে গেল। মৃত্যু নেই সর্বত্র মধু, শোক নেই সর্বত্র সুধা।

কুলদানন্দ গোঁসাইজির কাছ থেকে ব্রহ্মচর্যের প্রথম দীক্ষা নিয়েছিলেন বৃন্দাবনে। এক বছরের জন্যে। বৎসর পূর্ণ হতে এসেছে গেণ্ডারিয়ায়, দ্বিতীয় বৎসরেও দীক্ষা পাবে কিনা।

'শিখামাত্র অবশিষ্ট রেখে মস্তক মুণ্ডন করো।' বৃন্দাবনে থাকতে বললেন গোঁসাইজি, 'তারপর ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করে এসে আমার সামনে পূর্বমুখ হয়ে আসনে বসো, আমি তোমাকে এক বছরের জন্যে ব্রহ্মচর্যে দীক্ষা দেব।'

যথাবিধি আসনে বসে হু-হু করে কাঁদতে লাগল কুলদা। পারব কি ব্রত রাখতে ?

'নিষ্ঠাই ব্রহ্মচর্যের মূল। যে সব নিয়ম বলে দিচ্ছি গভীর নিষ্ঠায় সেগুলি রক্ষা করে চলবে। নিয়মগুলি শুনে রাখো।'

ব্রাহ্মমুহূর্তে উঠে সাধন করবে। শৌচের পর আসনে বসে গায়ত্রী জপ করবে। তারপর গীতা অন্তত এক অধ্যায় পড়বে। পাঠান্তে আবার সাধন করবে। স্নানান্তে আবার গায়ত্রী জপ আর তর্পণ।

স্নান করে অথবা সদ্যস্নান দিয়ে রান্না করিয়ে খাবে। বেশি ঝাল অম্ল মিষ্টি মদ্য ও ঘি খাবেনা। আহার পরিমিত ও শুদ্ধ হবে। আর যা খাবে তাই ইষ্টদেবতাকে নিবেদন করে খাবে। আহারান্তে কিছুক্ষণ বসে বিশ্রাম করবে। শোবেনা, ঘুমুবেনা দিনের বেলায়। বিশ্রামান্তে ভাগবত, মহাভারত বা রামায়ণাদি পড়বে। পাঠের পর নির্জনে কিছুক্ষণ ধ্যান করবে। বিকেলে, যদি ইচ্ছে করে, একটু বেড়াবে।

সন্ধ্যায় আবার গায়ত্রী জপ। পরে যেমন সাধন করো তেমনি করবে। খুব ক্ষুধাবোধ হলে সামান্য জলযোগ করবে। দুবেলা অন্নগ্রহণ করবে না।

নিতান্ত সামান্য বসন পরবে। সামান্য শয্যায় শোবে। বসন আর শয্যা নির্দিষ্ট রাখবে। মাঝে মাঝে সাধুসঙ্গ করবে, সাধুদের উপদেশ প্রশ্রদ্ধ হয়ে শুনবে।

পরনিন্দা করবেনা, পরনিন্দা শুনবেনা। যে স্থানে পরনিন্দা হচ্ছে সে স্থান ত্যাগ করবে। কোনো সাম্প্রদায়িক ভাব রাখবে না, যে যেভাবে সাধন করছে তাকে সেইভাবে সাধন করতে উৎসাহ দেবে।

কারু মনে কষ্ট দেবে না। সকলকে সন্তুষ্ট রাখতে চেষ্টা করবে। মনুষ্য পশু পাখি বৃক্ষলতা সকলেরই যথাসাধ্য সেবা করবে। নিজেকে অন্যের চেয়ে ছোট মনে করে অন্যকে মর্যাদা দেবে। প্রত্যেকটি কাজ বিচার করে করবে। বিচার করে করলে কোনো বিঘ্ন হবে।

সর্বদা সত্য কথা বলবে, সত্য ব্যবহার করবে। অসত্য কল্পনা মনে আসতে দেবে না। কথা কম বলবে।

যুবতী স্ত্রীলোক স্পর্শ করবে না। দেবস্থানে পথেঘাটে অজ্ঞাতে স্পর্শ হয়ে গেলে গ্রাহ্য করবে না। সর্বদা শুচিশুদ্ধ হয়ে থাকবে। পবিত্র স্থানে পবিত্র আসনে বসবে। নিজের যা কাজ তা অতি গোপনে করে যাবে।

এ সব নিয়ম রক্ষা করে চলতে পারলে আগামী বছর আরো নিয়ম বলে দেব।

দ্বিতীয় বৎসরের জন্যেও কুলদাকে ব্রহ্মচর্য দিলেন গোঁসাইজি। এ বৎসরে তোমার বিশেষ নিয়ম, জিজ্ঞাসিত না হলে কথা বলবে না। জিজ্ঞাসিত হলেও প্রয়োজনবোধে উত্তর দেবে। উত্তর সংক্ষিপ্ত হবে। আর তুমিও প্রয়োজনীয় বিষয়েই কেবল জিজ্ঞাসা করবে। সর্বদা পদানুষ্ঠের দিকে দৃষ্টি রাখবে। অন্ধকারেও তাই। তারপরে নিত্য হোম আর গায়ত্রী।

'ব্রহ্মচর্য কি এক বছর করে নিতে হয়?'

'তার কোনো নিয়ম নেই। ব্রহ্মচর্যের মেয়াদ বারো বৎসর! তবে এবারও তোমাকে এক বছরের জন্যে দিলাম। বেশিদিনের জন্যে দিতে সাহস হয় না যদি নিয়ম ভেঙে ফেল। নিয়ম ভেঙে গেলে বিঘ্ন হোম। নিয়ম রেখে চলতে পারলে পরের বছর আবার দেব।'

ভজন কুটিরের গর্তের মধ্যে একটা সাপ এসে ঢুকেছে। গোঁসাইজি তাকে দুধ-কলা খেতে দেন। মাঝে মাঝে সাপ গর্ত থেকে বেরিয়ে এসে গোঁসাইজির জটা বেয়ে একেবারে মাথায় উপর উঠে বসে আবার নিজের থেকেই নেমে যায়। সাপ যে বিষধর তাতে সন্দেহ কী। কুণ্ডু ঘোষ একদিন একটা সুন্দর রক্তপদ্ম নিয়ে এসেছিল, দিয়েছিল গোঁসাইজিকে, গোঁসাইজি সেটিকে তার প্রণয়ের উপর রেখেছিলেন। রাত্রে বেরিয়ে সাপ সেই ফুলটিকে জড়িয়ে ধরল। দেখা গেল বিষস্পর্শে সেই রক্তপদ্ম কালো হয়ে গিয়েছে।

কিন্তু সাপের আলিঙ্গন সত্ত্বেও গৌসাইজির গাত্রবর্ণ যেমন উজ্জ্বল তেমনি উজ্জ্বল।

'সাপ আপনার গায়ে-মাথায় ওঠে কিন্তু আমাদের তো ধারে কাছেও আসে না। এর রহস্য কী?' একজন ভক্ত জিজ্ঞেস করল।

'নামের সঙ্গে স্বাভাবিক প্রাণায়ামের ক্রিয়া যখন চলতে থাকে তখন শরীরের মধ্যে একটা অব্যক্ত মধুর ধ্বনির সৃষ্টি হয়।' বললেন গোসাইজি, 'সেটা ভ্রূমধ্যের মধ্যবর্তী স্থান থেকে শোনা যায়। সে ধ্বনিতে আকৃষ্ট হয়ে সাপ মাথায় চড়ে বসে। সাপ বুঝতে পারে এ দেহে হিংসার স্থান নেই, তাই নিশ্চিন্ত হয়ে বিস্তৃত ফণা গুটাতে উঠে পড়ে সাধকের উপর।'

'এ সাপ কে?'

'একজন কর্মির সাধক।' গৌসাইজি বললেন, 'কাল বশে দেহ নষ্ট হয়ে যাবার পর সর্পদেহ ধরে সাধন করছে। আমাকে বললে, মনোমত আসন পাচ্ছি না, তাই সাধনায় ব্যাঘাত হচ্ছে। আপনি যদি কৃপা করে আমাকে আশ্রয় দেন আমি রক্ষা পাই। সেই থেকে ওকে থাকতে দিয়েছি ভজন কুটিরে।'

দুটো কোলাব্যাঙ আসত। গৌসাজির আসনের কাছাকাছি এসে নিশ্চেষ্ট হয়ে পড়ে থাকে। শত সোদমাদেও নড়ে না। অব্যক্ত স্বর করে গলা ফুলিয়ে। তারপর স্তব্ধ হয়ে পড়ে থাকে যেন সমাধি হয়েছে।

আর কুকুর কালু তো আছে চেয়ারে শুয়ে। তারই জন্যে তার নাম চেয়ারম্যান।

একটি গরু আছে আশ্রমে। দেখতে রাঙা বলে নাম ছিল 'রাঙা'—'রাঙা' থেকে দাঁড়াল 'রাণী'তে। গরু গর্ভ ধরেনি কোনোদিন অথচ প্রয়োজনমত দোহন করলেই দুধ দেয়। আরো এক আশ্চর্য গুণ, কেউ মন্দ অভিসন্ধি নিয়ে আশ্রমে ঢুকলে রাণী তাকে তেড়ে যায়। সেবার একটা কীর্তনের দল এসেছে আশ্রমে, বিকৃত স্বরে সুরু করেছে কীর্তন। কারু কাছেই সুরকর্ণ রসায়ণ বলে লাগছেনা, তবু কীর্তন, উচ্চবাচ্য করতে পারছেনা কেউ। রাণীর কাছে অসহ্য লাগল। সে সহসা ঘাড় নিচু করে উর্ধ্বপুচ্ছ হয়ে কীর্তনের দলকে আক্রমণ করল দল ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। বন্ধ হল কীর্তন।

এ আবার কে এল আশ্রমে। রাণী যে তাকে দেখে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। শিঙ বাগিয়ে চাইছে আক্রমণ করতে। কী ব্যাপার?

লোকটা পালিয়ে যাবার পর গৌসাইজি বললেন, 'রাণীর পূর্বজন্মের স্মৃতি আছে। ঐ লোকটি পূর্বজন্মে কসাই ছিল তাই গোজন্মের সংস্কারবশে ক্রোধে ওকে তাড়া করেছিল।'

আশ্রমে একটি আমগাছ আছে, তারই নিচে গৌসাইজি অনেক সময় পূজা পাঠ সাধন ভজন করেন। একদিন দেখা গেল সে গাছের সর্বাঙ্গে পিঁপড়ে জমেছে, কোত্থেকে ভ্রমরের দল পাখায়-পাখায় সুরু করেছে সুরঝঙ্কার।

কী ব্যাপার? গাছ হতে মধু ঝরছে। হরিনাম শুনে শুনে কঠিন বৃক্ষদেহ থেকেও আনন্দরস উথলে উঠেছে।

'আমগাছ থেকে যে মধুক্ষরণ হচ্ছে দেখতে পাচ্ছ?' গৌসাইজি শিষ্য ভক্তদের জিজ্ঞেস করলেন।

শিশিরবিন্দুর মত গাছ থেকে ঝরে পড়েছে ফোঁটা ফোঁটা। যেখানে পড়ছে পিঁপড়েরা ভিড় করছে, ছুটে আসছে মৌমাছি। গাছের নিচে শুকনো ঘাস ভিজে উঠেছে। তুলসী গাছগুলোও সিঞ্চিত।

'কী, মধু বলে বুঝতে পারছ?'

আমগাছের পাতায় জিভ ঠেকাল শ্রীধর। বললে, 'সত্যিই তো, বেশ মিষ্টি।' আরেক পাতা চুষতে চাইল অশ্বিনী। 'সত্যিই তো, মধু, খাঁটি মধু।'

কুলদা অসন্তুষ্ট হতে চায়। গাছের দুটো পাতা সে সহসা টেনে ছিঁড়ে নিল।

গৌসাইজি শিউরে উঠলেন: 'উঃ, এ কী করলে? ওভাবে কি পাতা ছিঁড়তে আছে?'

ছিঁড়েছি তো ছিঁড়েছি। পাতা দুটো হাতে নিতেই দেখা গেল তাতে তরল আঠার মতন কী মাখানো আছে। কুলদা একটা পাতা লেহন করল জিভ দিয়ে। মধু মধু, নিদারুণ মিষ্টি। আরেকটা পাতা টুকরো করে ছিঁড়ে উপস্থিত দশ-বারো জনের মধ্যে বিলিয়ে দিল। সবাই লেহন আম পাতার মধুর স্বাদ।

'বৃন্দাবনে দেখেছি নিমগাছ থেকে মধু ঝরছে।' বললেন গৌসাইজি, 'দেখলাম তার নিচে বসে একজন অকিঞ্চন ভক্ত ভজন করছেন।'

'সব গাছ থেকেই মধু ঝরে?'

'যে সব গাছের নিচে বহুদিন ধরে প্রেম ভক্তি সাধন ভজন তপস্যা হয়, কিংবা যে সব গাছের নিচে ভক্ত মহাত্মাদের আসন থাকে সে সব গাছ মধুবর্ষী মধুময় হয়ে যায়।' বললেন গৌসাইজি 'ভক্তির সঙ্গে পুজো করলে জলও মধুময় হয়। একবার শান্তিপুরে গঙ্গাজলে তৈরি করলাম মধুপেয়—জল তুলে নিয়ে খেয়ে দেখলাম, মিষ্টি। শোননি সেই বেদমন্ত্র—ওঁ মধুবাতা ঋতায়তে, মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ। মাধ্বীর্নঃ সন্তোষধীঃ। ওঁ মধু নক্তমুতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ। মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা। মধুমান্নো বনস্পতির্মধুমাঁ অস্তু সূর্যঃ। মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ। কী মানে? বায়ু মধু বহন করছে। সমুদ্রগুলি মধু ক্ষরণ করুক, আমাদের ওষধিগুলি মধুময় হোক। রাত্রি উষা পার্থিব ধূলি ও আকাশ মধুময় হোক। মধুময় হোক, আমাদের পিতৃগণ আমাদের সূর্য ও বনস্পতি। আমাদের ধেনুগণ মধুমতী দুগ্ধবতী হোক।'

শুধু তাই নয়, কুলদা ও অন্যান্য ভক্তরা লক্ষ্য করে দেখল, গাছের গায়ে চটা উঠে নানা জায়গায় ঔকার ফুটেছে, কোথাও বা দেবদেবীর মূর্তির আভাস। গ্রীষ্মকালের প্রচণ্ড রোদ অথচ গাছের তলটি কী ঠাণ্ডা! উদরান্ত শীতল ছায়া বিছানো। সর্বত্র শান্তি আর স্নিগ্ধতা।

'আমার মাথাটা একবার দেখ তো।' গৌসাইজি বললেন কুলদাকে, 'বড্ড পিঁপড়ে কামড়াচ্ছে।'

প্রভুর জটা থেকে অনেক সময় উকুন ও ছারপোকা বার করেছে কুলদা—পিঁপড়ের কথা এই নতুন শুনছে। মাথায় হাত দিয়ে দেখে ভিজে চপচপ করছে। এ তো চেনার অবস্থা নয়। তাছাড়া মাথা ভরা অদ্ভুত সুগন্ধ।

'এ কিসের গন্ধ?' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল কুলদা।

'বুঝতে পারছিস না এ পদ্মগন্ধ। এ গন্ধেই পিঁপড়ে এসেছে।'

'কিন্তু চুলের গোড়ায় এসব কী? সাদা সাদা পাতলা মোমের মত দেখছি—'

'হ্যাঁ, মোম। অঘাট হয়ে রয়েছে।'

'ঘাম জমে হয়েছে?'

প্রভু হাসলেন। বললেন, 'ব্যাঘ্র ভয়ে কি মোক্ষ হয়? ও মধু।'

'মানুষের শরীর থেকে কি মধুক্ষরণ হয়?'

'হাঁ, সাধের যেমন হয় তেমনি মানুষেরও।'

শিষ্য মহাবিষ্ণু জ্যোতি গোস্বামি প্রভুকে নিয়ে গান বেঁধেছেন:

অপরূপ শ্রীগুরুরূপ হৃদয়ে সদা ভাব না রে
তবে মন সমান হবে, শমন ভয় আর রবে না রে।
তরুণ-রবি-কিরণ ছুটি চরণ পাশে পরকাশে
যত সে জন ও-চরণ (যার) ছবি-সরসে সদা ভাসে,
তাটি ভবের পাপ, নাশে, ও রাঙা-পদ-পরশে
মজ ও পদে মন-ভৃঙ্গ রস-রঙ্গ ছাড় না রে॥
কটিতে কাঁসি কৌপীন বহির্বসন শোভে সুন্দর
দণ্ড-কমণ্ডলু করে শোভে কিবা মনোহর
জিনি মদমত্ত কুঞ্জর, গমন কিবা মন্থর,
মধুর হাস মধুর ভাষ, মধুমাখা সব ব্যবহারে॥
সুবিশাল বক্ষে শোভে রত্ন-লহরী মাল
ঊর্দ্ধ তিলক-রেখা ভালে কিবা শোভে ভাল
নীলী রচিত চূড়া, বেশ শ্যামের মোহন চূড়া
কিবা রূপি রূপ যেন ধরে গঙ্গাধর শিবে।
পৃষ্ঠে দোলে বেণী—যেন তাহে রাজনন্দিনী
প্রেম-নীরে ভাসে সদা, শ্রীমুখ-কমল খানি
আনন্দময় সদ, আনন্দ-রস-খনি
মগন দিবা-রজনী কিবা আনন্দ সাগরে।'

বুধু ঘোষের বাড়ি রক্তবৃষ্টি হল, গোঁসাইজি তাকে কালীপূজা করতে বললেন। তোষার পাণ্ডড়ি কালীকে বাঁটা মেরেছে তাই এই উৎপাত।

বৃদ্ধা পাণ্ডড়ি বললে, 'আমি কৃষ্ণ ভজনা করি, কালী আমার কাছে আসে কেন? তাই বাঁটা ছুঁড়ে মেরেছি।'

ঠিক করলি। তারই জন্যে এই রক্তবৃষ্টি।

কালীপূজা করল বুধু। গোঁসাইজির নির্দেশে আখ আর কুমড়ো বলিদান হল। করজোড়ে দাঁড়িয়ে দেবীকে দর্শন করলেন গোঁসাইজি।

বললেন, দেখলাম মা কালী নৈবেদ্যের আমটি মাথায় নিয়ে বসে আছেন। পরে দেখলাম রামচন্দ্রকে কাঁধে নিয়ে মহাবীর দাঁড়িয়ে আছেন। তারপর দেখলাম, বিষ্ণু দাঁড়িয়ে গরুড়ের স্কন্ধে। তারপরে দেখি মহাদেবের উপরে কালীমূর্তি। শেষে দেখলাম বলদেবের বুকের উপর রাধাকৃষ্ণ। মায়ের অনন্ত ভাব, কে বোঝে!'

কে বোঝে!

গোঁসাইজি অসুখে পড়লেন। সামান্য সর্দি থেকে হেঁপো গিয়ে দাঁড়াল নিউমোনিয়ায়। বড় ডাক্তার নবীনকৃষ্ণ ঘোষকে ডাকা হল। সে বললে, দুটো ফুসফুসই ধরে গিয়েছে, বাঁচবার আশা নেই।

নয় দিন কেটে গেছে, জীবনদীপ প্রায় নির্বাপিত, গোঁসাইজি বললেন, 'খই খাব।'

সর্বনাশ! ডাক্তার বললে তাহলে এ মুহূর্তেই শেষ।

ডাক্তারের নিষেধ শুনলেননা গোঁসাইজি। জোরজার করে খই খেলেন।

তারপর দিনেই অন্য পথ। (ক্রমশঃ)

যে ছেলেটি এই রকম বীরত্বের পরিচয় দিলেন তিনি হলেন প্রাতঃস্মরণীয় যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। সেদিন থেকেই তাঁর নাম হল 'বাঘা-যতীন।' তাঁর সঙ্গে যে ভদ্রলোক বাঘ শিকারে গিয়েছিলেন তিনি তাঁর মাসতুতো ভাই ধনীভূষণ।

যতীন্দ্রনাথের পৈতৃক বাসভূমি ছিল যশোহর জেলার ঝিনাইদহ গ্রামে। কয়াগ্রামে ছিল তাঁর মাতুলালয়। তাঁর জন্ম ইংরেজী ১৮৮০ সালের ৭ই ডিসেম্বর মাতুলালয়ে। তাঁর বয়স যখন মাত্র পাঁচ তখনই তাঁর বাবা উমেশচন্দ্র লোকান্তরিত হন। যতীন্দ্রনাথের মায়ের নাম ছিল শরৎশশী দেবী। তিনিও মারা গেলেন কিছুদিন পরে। যতীন্দ্রনাথ হ'য়ে পড়লেন অনাথ। তা ব'লে তিনি ভেঙ্গে পড়লেন না। ছেলেবেলা থেকেই দৌড়াদৌড়ি, লাফালাফি, সাঁতার কাটা, ঘোড়ায় চড়া, বন্দুক চালানো ইত্যাদি বিষয়ে হ'য়ে উঠলেন দক্ষ। সঙ্গে সঙ্গে পড়াশুনোও শিখতে লাগলেন মন দিয়ে। কিছুদিন পরে আরো লেখাপড়া শেখার জন্য কৃষ্ণনগর শহরে গেলেন তাঁর বড় মামা বিখ্যাত উকিল রসন্তবাবুর বাড়িতে। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন কৃষ্ণনগর এ ভি. স্কুল থেকে। কৃষ্ণনগরে থাকার সময় তাঁর মন উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে কবি দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশী কবিতা আর গানের প্রেরণায়। কলকাতায় এসে এফ. এ. পড়তে লাগলেন সেণ্ট্রাল কলেজে। সঙ্গে সঙ্গে চলল মহানগরীর বিখ্যাত কুস্তিগীর ক্ষেত্রনাথ গুহের আখড়ায় কুস্তির চর্চা। এর পরে তিনি বাংলা সরকারের স্টেনোগ্রাফার হিসেবে শুরু করেন কর্ম-জীবন। কিন্তু বৈপ্লবিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থাকার অপরাধে পদচ্যুত হলেন ১৯১১ সালে। যতীন্দ্রনাথের সহধর্মিণী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন ইন্দুবালা দেবী।

যতীন্দ্রনাথের জীবন এক রোমাঞ্চকর নাটক। বহু ঘটনায় সমৃদ্ধ ও সমুজ্জ্বল—চমকপ্রদ ও অলৌকিক। তিনি জীবিত ছিলেন মাত্র পঁয়ত্রিশ বৎসর। তার মধ্যে ১৩ বৎসর ছিল সক্রিয় বৈপ্লবিক জীবন। ধর্ম জীবনেও তিনি ছিলেন উন্নত। তিনি দীক্ষা নিয়েছিলেন লোকোত্তর মহাপুরুষ স্বামী ভোলানন্দ গিরি মহারাজের কাছ থেকে। পরে যারা এই আশ্রমের পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন তাঁরা ছিলেন তাঁর বন্ধু স্থানীয় অনেকে সহকর্মীও। জীবনের প্রেরণা তিনি পেয়েছিলেন এই আশ্রমের কাছ থেকে। প্রাণবস্তু এখানে প্রজ্জ্বলিত হয়েছিল তাঁর প্রথম। স্বামী ভোলানন্দ গিরি যতীন্দ্রনাথকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। একদিন তিনি সস্নেহে বলেছিলেন "আমি হচ্ছি স্বামী রামদাস আর তুই হবি শিবাজী।"

যতীন্দ্রনাথের ছিল রাজোচিত দেহাকৃতি। শক্তি আর দীপ্তি যেন স্ফুরিত হত সেই দেহ থেকে। তাঁর আয়ুষ্কাল দীর্ঘ নয়। তবু জীবনের সেই স্বল্প আয়তনের মাঝখানে দাঁড়িয়েই নিজেকে যে ভাবে তিনি দেশ-মাতৃকার পায়ে উৎসর্গ ক'রে দিয়েছিলেন তা শুধু ভারতের ইতিহাস নয়, পৃথিবীর ইতিহাসেও বিরল।

গভীর রাত্রি। কোথাও জনমানবের সাড়া নেই। যতীন্দ্রনাথ আগে আগে চলেছেন। আর তাঁকে অনুসরণ ক'রে পিছে পিছে চলেছে পুলিসের এক গুপ্তচর। একটা গলিতে সে ঢুকে পড়তেই যতীন্দ্রনাথ গিয়ে তার টুঁটি চেপে ধ'রে বললেন: "এখন যদি তোমাকে মেরে ফেলি?" এ জন্য গোয়েন্দাগিরি ছেড়ে অন্য কাজ করবে এই প্রতিশ্রুতি দেবার পর লোকটিকে ছেড়ে দিলেন যতীন্দ্রনাথ।

কুমারীর ঘাটে খেয়া পার হয়ে কয়াগ্রামে মামার বাড়িতে যাচ্ছেন যতীন্দ্রনাথ। দেখলেন পথের ধারে বসে আছে এক ক্লান্ত বৃদ্ধা মুসলমান। সামনে তার বড় একটা ঘাসের বোঝা। পথিকেরা যে যার মনে চ'লে যাচ্ছে। কেউ তার দিকে ফিরেও তাকাচ্ছে না। বোঝাটি মাথায় তুলে দেবার জন্য

বৃদ্ধাটি যে কাজের অঙ্গীকার করছে তা কাউকে এতটুকুও বিচলিত করছে না। বৃদ্ধাকে যেতে হবে এক মাইল পথ। অথচ বোঝাটি রীতিমতো ভারি। একথা শোনার পর যতীন্দ্রনাথ নিজের মাথায় বোঝাটি নিয়ে পৌঁছে দিলেন বৃদ্ধার বাড়িতে।

যতীন্দ্রনাথ যখন সরকারী চাকুরে তখন এক বার যাচ্ছিলেন দার্জিলিং। মাঝপথে দাঁড়িয়ে ছিলেন শিলিগুড়ি রেল স্টেশনের প্লাটফর্মে। ট্রেনের কামরায় একটি শিশু 'জল জল' ক'রে কান্না জুড়ে দিয়েছে। অথচ গাড়ি ছাড়ার সময় হ'য়ে গেছে বলে শিশুটির বাবা জল আনতে যেতে ভরসা পাচ্ছেন না। যতীন্দ্রনাথ নিজে গিয়ে শিশুটির জন্য জল নিয়ে ফিরে আসছেন ছুটে। পথে লাগল এক গোরা সৈন্যের সঙ্গে ধাক্কা। গ্লাসটা পড়ে তো ভাঙলই, তার ওপর গোরা সৈন্যগুলি তাঁকেও ফেলে দিল ধাক্কা দিয়ে। উঠে প্রতিবাদ জানাতেই এক যোগে তারা আক্রমণ করল যতীন্দ্রনাথকে। একদিকে একজন কৃষ্ণকায় ভারতীয় অন্যদিকে চারজন শ্বেতাঙ্গ। চলেছে ঘুষি যুদ্ধ। ঘুষিযুদ্ধে সুবিধা করতে না পেরে একজন শ্বেতাঙ্গ ছোরা দিয়ে আক্রমণ করল যতীন্দ্রনাথকে। তিনি আহত হয়েও ঘুষি মারতে লাগলেন সোদরের। ঘুষি খেয়ে খেয়ে চারজন শ্বেতাঙ্গই প্লাটফরমে পড়ে গেল। পুলিশ এসে তাদের হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয়।

শৃঙ্খলিতা দেশমাতার বন্ধন-মুক্তি ছিল যতীন্দ্রনাথের ত্যাগপূত জীবনের লক্ষ্য ও আদর্শ। যৌবনের প্রথম দিকে বাইশ বৎসর বয়সে তিনি আত্মনিয়োগ করলেন বৈপ্লবিক সাধনায়। বিপ্লবী মহানায়ক শ্রীঅরবিন্দের দূত-রূপে যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (পরে স্বামী নিরালম্ব) কলকাতায় আসেন ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে। শ্রীঅরবিন্দের কনিষ্ঠ সহোদর বারীন্দ্রকুমারের সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ হ'ল। অরবিন্দ ঘোষের লেখা পরিচয়-পত্র পেয়ে বিপ্লবী সাধুর অন্যতমা শিষ্যা সরলা দেবী তাঁকে সাহায্য করেন। কিন্তু উৎসাহের সেবারকার মিলন সফল হয়নি আশানুরূপ। এই ধরণের ভাঙা-গড়ার মধ্য দিয়ে গঠিত হ'ল শ্রীঅরবিন্দের নেতৃত্বে মানিকতলা বাগানের বোমার দল। বিপ্লবী নেতা যতীন্দ্রনাথ যুক্ত হলেন শ্রীঅরবিন্দ পরিচালিত বৈপ্লবিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে। যে রাত্রিতে পুলিশবাহিনী বাগান ঘেরাও করেছিল, সে রাত্রিতে যতীন্দ্রনাথ কার্যোপলক্ষ্যে কলকাতায় তাঁর এক ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের বাড়িতে ছিলেন। সেজন্য সেই রাত্রায় তিনি ওই বোমার মামলায় জড়িত হবার বিপদ থেকে বেঁচে গেলেন।

বিপ্লবী মহানায়ক অরবিন্দ ঘোষের আদেশে যতীন্দ্রনাথ ব্যবস্থা করলেন কলকাতা পুলিশ বিভাগের কুখ্যাত ডেপুটি সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট শামসুল আলমকে নিধন করার। ওই দুঃসাহসিক কার্যের ভার ন্যস্ত হ'ল বীরেন্দ্রনাথ দত্তগুপ্ত নামক একজন যুবকের ওপর। ১৯১০ সনের ২৪ শে জানুয়ারী কলকাতা হাইকোর্টের সিঁড়ির ওপর দিনের বেলায় বীরেনের রিভলভারের গুলীতে নিহত হলেন ওই পুলিশ কর্মচারী। বীরেন ঘটনা স্থলেই হাতেনাতে ধরা পড়ল। বিচারে ফাঁসী হল তার। পুলিশী জুলুমের বৈশাচিকতা থেকে রেহাই পাবার জন্য বীরেনকে স্বীকারোক্তি করতে হয়েছিল। তা' থেকে উদ্ভব হ'ল হাওড়া ষড়যন্ত্রের বিরাট মামলা। বাংলার নানা জেলার অধিবাসী ছিলেন আসামীর দলে—তাঁদের সংখ্যা ছিল পঞ্চাশ, যতীন্দ্রনাথ দলের নায়ক হ'লে হলেন প্রধান আসামী। তাঁর মামুল সলিল চট্টোপাধ্যায়, সুরেশ চন্দ্র মজুমদার (আনন্দ বাজার পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা), তারানাথ রায়চৌধুরী (নোয়াখালী) প্রভৃতিও আসামী ছিলেন।

এক বৎসরের বেশি সময় মামলা চলে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত টেঁকেনি।

প্রথম মহা বিশ্বযুদ্ধ যে আসন্ন, তা ভারতীয় বিপ্লবীরা জেনেছিলেন যুদ্ধ আরম্ভ হবার এক বৎসর পূর্বে। যতীন্দ্রনাথ ও স্বামী প্রজ্ঞানন্দ সরস্বতী (বরিশাল শঙ্কর মঠের প্রতিষ্ঠাতা) পরিচালিত বিপ্লবী দল স্থির করল যে, বৃটিশের শত্রু জার্মানীর সাহায্যে ও সহযোগিতায় অস্ত্রশস্ত্রাদি আমদানী ক'রে যুদ্ধ চলতে থাকা কালে ভারত-ব্যাপী সশস্ত্র বিপ্লব ঘটাবে। একটি বিদেশী বিভাগও খোলা হ'ল এবং তার ভার ন্যস্ত হ'ল মেডিকেল কলেজের তৎকালীন ছাত্র যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের ওপর। ভারতের বাইরের বিপ্লবী ভারতীয়দের সঙ্গেও যোগাযোগ হ'ল। অর্থ সংগ্রহের জন্য তৎকালে যতীন্দ্র নাথের নেতৃত্বে দুইটি সশস্ত্র ডাকাতি সম্পন্ন হল। একটি গার্ডেনরিচে এবং অপরটি বেলিয়াঘাটায়। দুইটিতেই ট্যাক্সি-ক্যাব্ ব্যবহৃত হয়েছিল। দুইটি ডাকাতিতে (১৯১৪ খ্রীঃ ফেব্রুয়ারী) চল্লিশ হাজার টাকা সংগৃহীত হয়।

যতীন্দ্রনাথ বৈদেশিক বিপ্লবীদলের সঙ্গে যোগাযোগ ক'রে অস্ত্রশস্ত্র আমদানীর ব্যবস্থা স্বরান্বিত করবার জন্য নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যকে (এম. এন. রায়) এবং ভূপতি মজুমদারকে বহির্ভারতে পাঠান। দুর্ভাগ্য বশতঃ ওই বিরাট প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়। যতীন্দ্রনাথ এতে না দমে গিয়ে নূতন পরিকল্পনা ক'রে বিদেশ থেকে অস্ত্রশস্ত্রাদির আমদানীর চেষ্টা করলেন। সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তিনি চলে গেলেন বালেশ্বর জেলায় এক গুপ্ত আশ্রয় স্থলে। ১৯১৫ সালের মার্চ মাসের শেষ ভাগে কলকাতার পোর্টেন্সা পুলিশ তা জানতে পারল। কলকাতায় বিপ্লবী দলের একটা আমদানী রপ্তানীর ব্যবসা সংস্থা ছিল হ্যারি ব্যাণ্ড্ সন্স্ নামে। এখানকার অফিস খানাতল্লাস ক'রে সন্ধান পেল বালেশ্বরের ইউনিভার্সাল এম্পোরিয়াম নামে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের। সেখানে খানাতল্লাসের ফলে যতীন্দ্রনাথের আশ্রয়স্থানের সন্ধান পাওয়া গেল।

বালেশ্বর থেকে বিশ মাইল দূরে কাপ্তীপোদার জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়েছিলেন যতীন্দ্রনাথ, চিত্তপ্রিয় রায় চৌধুরী, মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত, নীরেন্দ্রচন্দ্র দাশগুপ্ত ও জ্যোতিষ পাল। তাঁদের সকলের সঙ্গেই ছিল কার্তুজ-ভরা রিভল্ভার ও পিস্তল। জ্যোতিষ অসুস্থ ছিলেন, তাঁর বাড়ী নদীয়া জেলায়, অন্য তিনজনের বাড়ী ফরিদপুর জেলার মাদারীপুরে। তিন জনই স্বর্গত বিপ্লবী নেতা পূর্ণচন্দ্র দাসের হাতে গড়া স্বাধীনতার জন্য আত্মবলিদানে প্রস্তুত যুবক। বিদায় বেলা পূর্ণচন্দ্র আশীর্বাদ ক'রে বলেছিলেন, বাঘের সঙ্গে খিলাম, বাঘের মতোই কাজ করবে সবাই।

কলকাতা পোর্টেন্সা পুলিশের বড় কর্তা টেগার্ট, বালেশ্বরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সশস্ত্র পুলিশ নিয়ে জঙ্গল ঘেরাও করলেন। চারদিকে জঙ্গল ও গাছগাছড়ায় ঢাকা একটা খালের ভিতরে আশ্রয় নিলেন যতীন্দ্রনাথ ও তাঁর সতীর্থ বিপ্লবী চারজন। পুলিশ গুলী ছুড়তে ছুড়তে এগুতে লাগল। দুই পক্ষে চলল গুলী বর্ষণ। একদিকে বাংলা তথা ভারতের অবিস্মরণীয় বিপ্লবী বীর পঞ্চক, অন্য দিকে পরাক্রমশালী বৃটিশ রাজের বহু অস্ত্রধারী পুলিশ।

যতীন্দ্রনাথ উরু-দেশে গুলী-বিদ্ধ হয়েও সংগ্রাম থেকে বিরত হ'লেন না। চিত্তপ্রিয় আহত হয়ে পড়ে গেলে তাঁকে কোলে নিয়ে নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দিতে গেলে তিনি তলপেটে গুলী-বিদ্ধ হয়ে পড়ে গেলেন। কার্তুজও ফুরিয়ে গেল। যতীন্দ্রনাথের আদেশে শেত উত্তরীয় উড়ানো হল। পুলিশ বাহিনীর গুলী বর্ষণ বন্ধ হয়ে গেল তৎক্ষণাৎ। রাজপুরুষেরা খালের ভিতরে এসে দেখতে পেলেন— চিত্তপ্রিয়ের নিষ্প্রাণ দেহের পার্শ্বে রক্তাক্ত কলেবরে শায়িত মুমূর্ষু যতীন্দ্রনাথ। জ্যোতিষ পাল আহত হন

নি, অপর দুজন পেয়েছেন সামান্য আঘাত। বালেশ্বরের সরকারী হাসপাতালে যতীন্দ্রনাথের অন্তিম শয্যা রচিত হ'ল। মহাবীরের অমর আত্মা আশ্রয় নিল বীরবাঞ্ছিত ধামে।

বিচারে মনোরঞ্জন, বীরেন ও জ্যোতিষ চরম দণ্ডে দণ্ডিত হলেন।

বালেশ্বরের সেই সংগ্রামের দিনটি ছিল ১৯১৫ সনের ৯ই সেপ্টেম্বর—যে-তারিখটি ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের পাতায় একটি সমুজ্জ্বল অধ্যায়, যে তারিখ দেশ-জননীর পুণ্য নামে শপথ গ্রহণ করার দিন।

টেগার্টের গুলিতে আহত বিপ্লবী বীর যতীন্দ্রনাথ মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে শেষ-তৃষ্ণা মেটাবার জন্যে জল চাইলেন।

বুড়ীবালাম নদীর জল নিজের টুপিতে ভরে নিয়ে টেগার্ট তাই দিতে ছুটে এলেন যতীন্দ্রনাথকে।

—জল!

—এই নাও!

যতীন্দ্রনাথ দেখলেন টেগার্টকে। ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করলেন তিনি সেই জল। না, আজও পিপাসা নিয়ে তিনি মরতে চান। তৃষ্ণা—সে তৃষ্ণা স্বাধীনতার।

• • • •

লণ্ডনের নোংরা গলীর পাশ দিয়ে চলেছেন এক দীর্ঘ শ্মশ্রু ভদ্রলোক। সামনে টেমস্ নদীর তীরে অগণ্য ভেটী। আলো-আঁধারি পথে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছেন তিনি। হঠাৎ দেখা হোল তার এক পুরাতন বন্ধুর সঙ্গে সেই অস্বস্তিকর পরিবেশের মধ্যে। ভদ্রলোক বিস্মিত ভাবে বললেন: আরে! জোন্স্ যে! এখানে ঘুরে বেড়াচ্ছ কেন?

—মহাশয় নিশ্চয় ভুল করেছেন, আমার নাম জোন্স নয়।

—দেখ জোন্স, ঠাট্টারও একটা সময় অসময় আছে, আমি নিশ্চিত বলতে পারি তুমি জোন্স ছাড়া আর কেউ নও।

—আপনিও ঠিক একই ভুল করলেন দেখছি। লোকটি অলিত কণ্ঠে উত্তর দিল।—জানেন আমাকে জেল থেকে উদ্ধার করতে আমারই মত দেখতে আমার এক বন্ধু কত কষ্ট পেয়েছে। শেষে তাকে রাজদণ্ডে মরতেই হো'ল সত্যি বলছি মশায়, আসল বন্ধু সেই ছিল আমার। নইলে কেউ নিজের প্রাণটা বন্ধুর জন্যে দেয়!

নিজের ভুল বুঝে বিস্মিত হলেন ভদ্রলোক, কিন্তু তার সঙ্গে একটা গভীর সমভাব সমাধান হো'ল তাঁর। তাঁর "এ টেল্ অব্ টু সিটিজ্" বইখানির পাণ্ডুলিপির শেষাংশ নিয়ে বিব্রত হয়ে পড়েছিলেন তিনি। এবার সন্ধান পেলেন সত্যিকারের সিড্নী কার্টনের।

বলা বাহুল্য ভদ্রলোকটি বিশ্ববিখ্যাত ঔপন্যাসিক চার্লস্ ডিকেন্স।

বিশ্বের সেরা গল্প

বিচ্ছেদ

শেকভ

অনুবাদ : আর্যভট্ট

লেখক পরিচয় :—[আনতন্ প্যাভলোভিচ শেকভ—এর জন্ম ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে। অজস্র ছোট গল্প আর নাটকের রচয়িতা হিসাবে তিনি এতই বিশ্ব-বিখ্যাত যে তাঁর পরিচয় দেয়ার যে কোনো চেষ্টাই মনে হবে বাহুল্য। তাঁর প্রথম নাটকের নাম 'ইভানভ।' শেকভ-এর অন্যান্য ক'য়েকখানি নাটক : "দি সী-গাল," "আঙ্কল ভানিয়া," "থ্রি সিসটারস," আর "চেরী অরচার্ড।" শেষ নাটকটি তাঁর সেরা নাটক ব'লে বিবেচিত হ'য়ে আসছে। এই কৃশ লেখকের মৃত্যু হয় ১৯০৪ সালে, মাত্র চুয়াল্লিশ বছর বয়সে। কিন্তু এই স্বল্পায়ু জীবনেই তিনি যে সাহিত্য সৃষ্টি ক'রে গেলেন তার তুলনা নেই।]

দুপুরের আহারপর্ব শেষ হয়ে গেছে। স্বামী স্ত্রী দু'জনই একটা পরমপরিতৃপ্তি অনুভব করছিল তখন। থেকে থেকে হাই তুলছে দুজনেই। আবার মাঝে মাঝে দু'য়েরই দৃষ্টির আয়তন ছোট হয়ে আসছে ঘুমের আবেশে।

স্বামী একটা চুরুট ধরিয়ে সেই টাকে কাউচে হেলিয়ে দিল খুব আরামের সঙ্গে আর স্ত্রী পাশে বসে থেকে স্বামীকে মুগ্ধ করে রেখেছে রূপে।

ওরা দু'জনেই সুখী, একটি অমলিন পরিপূর্ণ দাম্পত্য জীবন ওদের।

"এমন চুপ্ করে ব'সে থাকা যায় না। কিছু একটা বল।" হঠাৎ বলে উঠল স্বামী এক গাল চুরুটের ধোঁয়া ছেড়ে হাই তুলতে তুলতে।

স্ত্রী বলল, "কি বলি বলত! ও! ভালো কথা, মনে পড়েছে। কেন, তুমি কিছু শোননি? ঐ যে সোফি ওকুরকোভা···বিয়ে করেছে।···ছেলেটার নামটা ঠিক মনে আসছেনা।···ও হ্যাঁ··· হ্যাঁ ভন্ টুস্··· ভনটুস্! ভন্ টুস্‌কে বিয়ে করেছে কি ঘেন্নার কথা।"

"এতে ঘেন্নার কি হোলো?" ভুরু দুটো ঈষৎ কুঞ্চিত ক'রে স্ত্রীর দিকে অপাঙ্গ দৃষ্টি হেনে জিজ্ঞাসা করল স্বামী।

"ঘেন্নার কি হোলো? আরে রাম রাম: তুমি জাননা কিছু? টুস্ একটা পাজি, একটা পুরো বদমাশ। ভীষণ খারাপ লোক এই টুস্। চরিত্র বলতে ওর কিছু নেই ভয়ানক অসৎ চরিত্রের লোক। আগে একজন জমিদারের গোমস্তা ছিল টুস্, এখন যেন্ কোম্পানীতে কি একটা চাকরী পেয়েছে। গোমস্তাগিরী করে বেশ কিছু পয়সা করেছে। এখন আবার রেলে গিয়ে নাকি চুরি করে শুনতে পাই। এই কয়েকদিন আগেও নিজের বোনকে ঠকিয়েছে। এক কথায় বলতে গেলে একটা পুরোদস্তুর চোর আর ওতো এই ভন্ টুস্। আর সোফি কিনা বিয়ে করল এই লোকটাকেই! আশ্চর্য! রুচি বটে সোফির! আমি হ'লে কখ্খনো বিয়ে করতামনা এই ধরনের লোককে···এমন কি

লক্ষপতি হ'লেও না। দেখতে যদি ঠিক একেবারে এ্যাপোলোর মতও হোত তা হলেও নাক ঘুরিয়ে সরে দাঁড়াতাম ওর কাছ থেকে। একটা বদমাশকে বিয়ে করার কল্পনা শুধু কল্পনা কেন স্বপ্নেও ভাবতে পারিনা আমি।" কথা গুলো একস্বরে শেষ করেই তড়িৎ গতিতে কাউচ্ থেকে উঠে দাঁড়িয়ে ঘরময় খুব দ্রুত পদক্ষেপে ঘুরে বেড়াতে আরম্ভ করল স্ত্রী। ঘৃণা আর অবজ্ঞায় ওর গোটা মুখটা অগ্নিশিখার মত লাল হয়ে উঠেছে। চোখের তারা দুটো যেন ক্রোধের অনন্ত আধার। এতে ওর আন্তরিক অকপটতারই প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে বটে!

স্বামী চুরুটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বেশ চতুর দৃষ্টি নিয়ে লক্ষ্য করতে লাগল স্ত্রীর গতিবিধির দিকে।

একটু পরেই স্বামীর মুখের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে স্ত্রী বলে উঠল, "এই ট্রম এমন একটা সাংঘাতিক লোক, যে মেয়ে এই ধরনের একজনকে বিয়ে করে সে নিছক একটা বোকা ছাড়া আর কিছুই নয়·· হাজার বার আমি তাঁকে বোকাই বলব।

"হুঁ···তা হ'লে তুমি এরকম লোককে বিয়ে করতেনা? খুব ভালো কথা!···যাই হোক এখন যদি বলি যে আমি তোমার ঐ ভন্ ট্রমের মতই একটা বদমাশ তা হ'লে তুমি কি করবে?" বলল স্বামী খুব চতুরতার সঙ্গে। বলেই স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল একটা কিছু উত্তরের আশায়।

স্ত্রী বলল "কি করব? সে কথা আবার জিজ্ঞেস করছ? আমি তোমার মুখ দর্শন করবনা এক মুহূর্তও তোমার কাছে থাকবনা। যে মুহূর্তে জানব তুমি ভন্ ট্রমের মতই একটা খারাপ লোক তক্ষুণি আমি তোমাকে ছেড়ে চলে যাব। আমি একশ'র মধ্যে নিরানব্বই জন লোককেই ভালোবেসে তাঁর ঘর করতে পারি। ভন্ ট্রম্ যে ধরনের লোক আমি যদি তোমার মধ্যে তার একশ ভাগের এক ভাগও খারাপ কিছু দেখতে পাই তা হলে জানবে আমি সেই মুহূর্তেই তোমার কাছ থেকে বিদায় নেব···আর সে বিদায় হবে চিরদিনের মত।"

"হুঁ···তা' হলে এই তুমি আমার অর্দ্ধাঙ্গিনী? আমার দুঃখের সুখী দুঃখের দুখী? বাঃ চমৎকার। তুমি যে এত সাংঘাতিক তা আমার জানা ছিলনা। উঃ এত খানি মিথ্যে কথা বলছ তবু তোমার মুখটা লজ্জায় একটুও লাল হ'য়ে উঠছেনা···আশ্চর্য্য!" বলল স্বামী বেশ একটু গম্ভীর স্বরে।

স্ত্রী বলল, "আমি মিথ্যে কথা বলিনা···কোন দিনও বলিনি আমার জীবনে। আমি জীবণ সাচ্চা মেয়ে। করইনা কোন রকম নষ্টামি···দেখ আমি কি করি।" বেশ একটু দৃঢ় কণ্ঠস্বরেই কথাগুলো বলল স্ত্রী।

স্বামী বলল "নষ্টামির আর বাকি কি আছে আমার? তোমার ত খুব ভালো জানেই জানা উচিত যে আমি তোমার ঐ ভন্ ট্রমের চেয়েও জীবণ খারাপ। আমার তুলনায় তোমার ট্রমত একটা ছোট খাটো পকেটমার মাত্র। ওকি চোখ দুটো বড় হ'য়ে গেল যে? আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই এতে মাই ডার্লিং। আচ্ছা ঠিক আছে·····আমার মাইনে কত? নিশ্চয়ই তোমার জানা উচিত!"

"বছরে তিন হাজার।" ঈষৎ কাঁপা গলায় উত্তর দিল স্ত্রী।

সঙ্গে সঙ্গে স্বামী বলে উঠল, অলরাইট। তা হ'লে এবার আসল ব্যাপারে আসা যাক্। আচ্ছা এই দিন সাতেক আগে যে নেকলেসটা আমি তোমায় কিনে এনে দিলাম সেটার দাম কত? দু'হাজার·····তাই নয় কি?"

"হ্যাঁ।" মুখ নিচু করে খুব নরমকণ্ঠে উত্তর করল স্ত্রী।

স্বামী আবার বলল, "আচ্ছা ঠিক আছে···এখন আমার ধরা যাক! কাল্ তুমি যে সাজ পোশাক কিনে নিয়ে এলে তার দাম পাঁচশ···নয় কি?"

"হ্যাঁ···।"

"গাঁয়ের বাড়িটা কিনতে লাগলো দু'হাজার। হাঃ···হাঃ···হাঃ···হাঃ···। আরো সব চেয়ে মজার ব্যাপার হোলো যে তোমার বাবা এসে কালই আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে গেল এক হাজার···এত টাকা কোথ্ থেকে এলো? আমার মাইনে ত মোটে তিন হাজার···তাও বছরে··· তোমার শেলামি এত টাকা? হাঃ···হাঃ···হাঃ··· হাঃ···।" দম কাটা হাসির শব্দে ঘরের চারদিকের দেয়ালগুলো যেন কাঁপতে আরম্ভ করল।

স্ত্রীর মনে হোলো প্রত্যেকটা হাসির শব্দ যেন ঠিক এক একটা তীরের মত এসে বিদ্ধ করছে ওকে। একটু স্বাভাবিক দুর্বলতা দেখা দিল ওর মধ্যে। কিন্তু তা সত্ত্বেও খুব সংযত ভাবে নিজের মনে শক্তি সঞ্চয় করে নিয়ে বলল, "সবই মানলাম · কিন্তু তেমনি তোমার অতিরিক্ত আয়ও ত আছে।"

"তা যেমন আছে তেমনি আমার নানারকম খরচ খরচাও ত আছে? এই যেমন ঘর রেন্ · ডাক্তার···তোমার টুপি সেন্ কিতের বিল মেটানো তা ছাড়া বেশী কথা কি? কালই ত তুমি সার্কাসে গিয়ে হাঁসের ছুরা খেলার বেয়ে এলে একশ কয়ন্। কোথ্ থেকে আসে এত টাকা?" বলেই স্বামী কাউচের উপর সোজা হয়ে ব'সে ডান হাতের মুঠোর উপর মাথাটাকে ন্যস্ত রেখে নানা রকম অভিযোগ আওড়াতে আরম্ভ করল স্ত্রীর কাছে নিজের সম্বন্ধে। তারপর রাইটিং টেবল্এর কাছে এগিয়ে গিয়ে কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ মাল-মসলাও দেখিয়ে দিল স্ত্রীকে।

স্ত্রী হতবাক হ'য়ে রইল মুখ নিচু করে। নিজের বুকের ভিতর আত্ম-অবমাননার একটা কদর্য্য গ্লানি গুম্‌রে গুম্‌রে উঠতে লাগলো। স্বামীর মুখের উপর নিজের আরক্ত দৃষ্টিকে তুলে ধরবার সাহসও হচ্ছেনা একবার।

স্বামী স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে নিজের ওষ্ঠাধরে একটা বঙ্কিম হাসির রেখা ফুটিয়ে বলল, "এবার বুঝতে পারছ আমার কাছে তোমার ঐ ফন্ ট্রিক্ একটা ছিঁচ্‌কে চোর বদমাশ ছাড়া আর কিছুই নয়। যাও···এবার যেতে পার ··হ্যাঁ তবে একটা কথা ভবিষ্যতে নিজের দিকে না তাকিয়ে আর অপরের দোষ দিয়ে বেড়িয়োনা···বুঝলে। মাই গুড্ উম্যান্ · ।"

গল্পের এখানেই সমাপ্তি। এখন আপনারা হয়ত জিজ্ঞাসা করবেন, তা হ'লে স্ত্রী কি স্বামীকে সত্যি সত্যিই ছেড়ে চলে গেল? তার উত্তরে আমি বলব, "হ্যাঁ গেল বটে, তবে বেশী দূরে নয়, এই পাশের ঘরে।"

* * *

সার অলিভার লজ্‌কে একব্যক্তি প্রশ্ন করেন। আপনি ত পরলোকতত্ত্ব ও প্রেতাত্মা বিষয়ে অনেক কিছু সন্ধান করেছেন। আচ্ছা আপনি কি বলতে পারেন, সত্যিই কি ভূত আছে?

সার অলিভার মৃদু হেসে বলেন: খুবই বিশ্বাস করি। তবে সে ভূতগুলো এখন মানুষ হয়ে আপনারই মতন ঘুরে বেড়াচ্ছে আর আমাকে প্রশ্ন করছে—এই যা তফাৎ।

অন্ধকার পেরিয়ে

রঞ্জত রায় চৌধুরী

আজ আর অন্যান্যদিনের মত উঠতে ইচ্ছে করল না সুমেধার। এমন কি সাড়ে পাঁচটার পর সেক্‌শন যখন খালি, তখনও সে বসে রইল।

কণিকাদি আর তৃপ্তি অনেক আগে চলে গেছে। ওদের সঙ্গেই রোজ ওঠে সুমেধা। তাতে কণিকাদি বা তৃপ্তির হয়তো বেশ সুবিধে হয়। ট্রামে বসে যেতে পারে। ওদের কত সুবিধে। একবার ট্রামে চাপলেই বাড়ি। সুমেধাকে ট্রামে চাপলে আবার বদল করতে হয়। বাস যায় বাড়ি অবধি। কিন্তু ওরা যত সহজে ট্রামে উঠতে পারে তত সহজে বাসে উঠতে পারে না সুমেধা। ওদের দিকে বাসে প্রায় সব সময়েই ভিড়।

বাড়ি ফিরতে খুব যে একটা ইচ্ছে আজকাল থাকে, তা নয়। তার আগে বাড়ি ফেরা নিয়ে বা দেরী করে বাড়ি ফেরা নিয়ে কেউ উৎসুকও নয়, উৎকণ্ঠিতও নয়। তবে এই ভিড় আর ঠেলাঠেলির হাত থেকে কিছুটা পরিত্রাণ পেতে, আর বাড়ি গিয়ে শুয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম পাবার প্রতি একটা আকর্ষণ আছে। শুধু হাত পা ছড়িয়ে বিছানায় দেহটা এলাতে পারার একটা সম্ভাবনা থাকে বলেই রোজ কণিকাদিদের সঙ্গে ওঠে সুমেধা। কিন্তু আজ আর সে ইচ্ছেটাও নেই। আর এখন ওঠার কোন মানেও হয় না। বাসে তো উঠতে পারা যাবেই না, যদিও পারা যায়, ধাক্কাধাক্কিতে আর নানাজনের নানা কটুক্তিতে সম্মানটা যে অনর্থক যাবে—সে বিষয়ে সে নিশ্চিত। একদিনের অভিজ্ঞতাও তার আছে।

বড়বাবু কাছে এসে দাঁড়ালেন, সুমেধার কি শরীরটা খারাপ?

একটু লজ্জা পেল সুমেধা। কাঁধের শাড়িটা গুছিয়ে নিয়ে ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে সে উঠে পড়ল। তার মধ্যেই বলল, ইচ্ছে করেই একটু দেরী করলাম, বাসে যা ভিড়!

সমস্ত সেকশনটা খালি। কেবল কোণের সীটে দাশগুপ্ত ফাইলের ওপর তখনও ঝুঁকে আছে। সুমেধা তার পাশ দিয়ে যাবার সময় বললে, আপনার এখনও হল না?

ফাইল থেকে চোখ তুলল দাশগুপ্ত। দুটো বিষণ্ণ শান্ত চোখ। বললে, আপনার আজ এত দেরী?

বড়বাবুকে দেওয়া উত্তরটার পুনরাবৃত্তি করল সুমেধা।

কিন্তু কোথায় যাবে সুমেধা? কোথায় গিয়ে সে এখন বিশ্রাম পেতে পারে? কোনো জায়গা কি আছে এমন? অথচ এমনি করেই আজ ন'বছর হয়ে গেল এই সরকারী আপিসের চাকরী।

সুমেধার মনে পড়ল চাকরির প্রথম দিনগুলোর কথা। বাড়ি ফেরার কি আগ্রহ থাকত! চারটে থেকে প্রস্তুত হত সুমেধা। বারবার ঘড়ি দেখত। মনে হত ঘড়িটা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে। পাঁচটা যেন আর বাজতেই চাইছে না।

মিস্ মজুমদার ? আজ এত দেরী ?

তেতলার লিফ্‌টের মুখে প্রফুল্ল বাগচীর সঙ্গে দেখা।

কাজ ছিল, ছোট্ট করে বলল সুমেধা।

চোখ কপালে তুলে প্রফুল্ল বললে। আই সী!—তারপর একটু হেসে, ডানহাতটা একটু তুলে একটু নাচিয়ে বললে, খাওয়াচ্ছেন কবে ?

নিরতিশয় বিস্ময়ে ফিরে তাকাল সুমেধা। একটু উচ্চ কণ্ঠে বললে, কিসের খাওয়া ?

কথাটা ঘুরিয়ে নিল প্রফুল্ল। বললে, থাক, ওটা নিখিলেশের কাজেই হবেখন। বলে চলে যাবার উপক্রম করল প্রফুল্ল।

সুমেধার মুখে একটা ম্লান হাসির রিক্ত রেখা দেখা দিল। বললে, আপনারও কি আজ বেশি কাজ ছিল নাকি ?

কাজ ? দুঃ—মুখভঙ্গি করল প্রফুল্ল। কাজ বরং এখন আছে, পাকা তিন ঘণ্টার তাশ পেটার কাজ, বলে হাসতে হাসতে চলে গেল প্রফুল্ল। আর প্রফুল্লের সেই হাসির ঢেউগুলো যেন নিভিয়ে দিল সুমেধাকে। দুপুর থেকেই একটা ভালো-না-লাগার অনুভূতি সমস্ত চৈতন্যকে আচ্ছন্ন করেছিল, এখন কেমন একরকম নিঃসঙ্গ বেদনাবোধে সমস্ত হাসির উৎসগুলোকে পাথর চাপা দিয়ে রুদ্ধ করে নির্জীব করে তুলল তাকে।

হাঁটতে ক্লান্তি লাগছে। তবু হাঁটতে হবে। তবু বাড়ি যেতে হবে। যেতে ইচ্ছে করছে না। আর ও কিছুক্ষণ একলা থাকতে চায় সুমেধা। মানুষের সঙ্গ আর ভালো লাগছেনা।

অথচ সুমেধার বাড়ি ফেরার আগ্রহ ছিল একদিন। বাবা পথ চেয়ে থাকতেন। মা চায়ের কেতলীতে জল ভরে রাখতেন, সুনেত্রা গুছিয়ে রাখত শাড়ি। তাই বোনেরা মাদুর পেতে বইখাতা নিয়ে বসে।

বাস থেকে নেমে প্রায় দশ মিনিটের পথ। সে পথটা সে সময় দীর্ঘ মনে হয়নি কোনদিন। ক্লান্তি আসেনি কোনদিন হাঁটতে। আজকাল লাগে। আজকাল মনে হয় বাস স্ট্যাণ্ড থেকে কলোনীর মধ্যে তাদের বাড়ির ব্যবধানটা বড় বেশি।

বাবা জিজ্ঞেস করতেন আপিসের কথা। তাই বোনেরা একটা না একটা আবদার করত। সুনেত্রা একদিন বললে, দিদি টেস্ট পেপার বেরিয়ে গেছে।

সব বুঝত সুমেধা। সন্ধের পর সে তখন ঘুর এভিনিউতে একটা টিউশানিও করত। তবু ভালো লাগত। পঙ্গু পিতা, ছোট ছোট ভাই বোন, সংসারের নিত্য নূতন চাহিদা—সুমেধা বিরক্ত হয়নি, বিষণ্ণ হয়নি, কাঁদে-নি কোন দিন।

কোথায় যাওয়া যায় ? আস্তে আস্তে রাস্তার দিকে পা বাড়াল সুমেধা। খুব আস্তে আস্তে। যেমন করে মানুষ নিঃশেষে নিঃশ্বাস ছাড়ে, তেমনি সন্তর্পণে পা ফেলতে লাগল সুমেধা।

আজ কত সহজে প্রফুল্ল বাগচী হাসতে হাসতে চলে গেল। আপিস ফাঁকা। কাছে পিঠে কেউ ছিল না। অথচ প্রফুল্ল আজ কত সাবলীল, কত সহজ হয়ে হাসি ছুঁড়ে মারল তাকে।

সুমেধার সঙ্গে কতদিন বাস স্ট্যাণ্ড অবধি এসেছে প্রফুল্ল। গল্প করতে করতে দু'তিনখানা

বাস মিস্ করিয়েছে। সুমেধা বুঝত সব। কিন্তু কি করবে ভেবে পেত না। এমন পরিস্থিতিতে কি করতে হয়, তা সে জানত না।

প্রফুল্ল বামচী তখন কি দেখে মুগ্ধ হয়েছিল?—সুমেধার কোন্ আচরণে আকর্ষণ বোধ করেছিল? সুমেধার কোন কথা তাকে তৃপ্ত করেছিল?—সুমেধা ভাবে। আর কি তার কিছুই নেই? সে কি ফুরিয়ে গেছে সব দিক দিয়ে? সুমেধা জানত, সেদিন প্রফুল্লকে নিয়ে অনায়াসে একটা মধুর জগৎ গড়ে তোলা যেত। কিন্তু সুমেধা তা চায়নি।

তখনও সুমেত্রার চাকরী হয়নি। তখনও রামানন্দ কুল ফাইন্যান্স পাশ করেনি। সুমেধার কল্পনায় সেদিন কোন পৃথক জগতের অস্তিত্ব ছিল না।

একদিন কণিকাদি বলেছে, ছেলেটাকে ঘোরাচ্ছিস কেন? হয় বাড়ি যা, নয়তো সাফ্ জবাব দিয়ে দে।

তুমি একি বলছ কণিকাদি?—আমি ঘোরাচ্ছি?

ঘোরাচ্ছিস না তো কি?

ছিঃ ছিঃ কণিকাদি! আমি তো কোন রকম ইসারা পর্যন্ত দিইনি। কোন রকম—,

থাম্। ন্যাকামি করিস্নে। ও তোর পেছনে ঘুরঘুর করে কেন? তুই কি বলতে চাস্ তুই কিছুই বুঝিস্ নে?

চুপ করে রইল সুমেধা। হঠাৎ বুকের ভেতর একটা ঝড় নাড়া দিয়ে উঠল। শিরশির করে উঠল পিঠ দাঁড়াটা। দু' চোখের দৃষ্টিতে আতঙ্কের ও অসহায়তার সংমিশ্রণ হল। কণিকাদি বলেছে, পছন্দ হয় ভালো, নয় তো এসব টিটকিরি শুনতে ভালো লাগেনা। টিটকিরি? সুমেধার মনে হল তার সমস্ত রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে। মনে হল, এই আপিস ঘরের প্রত্যেকটি লোক তার দিকেই চেয়ে চেয়ে পরিহাস-তরল-হাসির-ঝিলিকে তাকে অসম্মানিত করছে।

তখনই সোজা হয়ে বসল সুমেধা। মেরুদণ্ড সুদৃঢ় করল। তাকাল স্থির দৃষ্টিতে। ধীরে অথচ স্পষ্ট করে বললে, কণিকাদি, আমি চাকরী করতে আসি, প্রেম করতে আসি না, এটা ওদের বলে দেবেন।

কণিকাদিও চুপ করে গেলেন হঠাৎ। এই কালো, বিরাট মেয়েটার মনে যে আগুন রয়েছে, তার পরিচয় তার জানা ছিল না।

সুমেধাকে নিয়ে তবু কানাঘুষো চলল আপিসে। অথচ কি করতে পারে সুমেধা! তার দেহের বৃত্তাকার রেখাগুলোকে বাধ্য করে তোলার কোন সচেতন প্রয়াস তার নেই, মুখের মধ্যেও কৃত্রিম পালিশে কোন চাকচিক্য আনতে চেষ্টা করেনি সে কোন দিন—কিন্তু এমনই তার গড়ন, অনায়াসেই সে দুর্লভকে পেয়েছে দেহে, যা সচেতন প্রচেষ্টাতেও অনেকের কাছে সুদুর্লভ।

দুটপাথ থেকে কেনা সস্তার ছিটের ব্লাউজ আর হকার্স-কর্ণার থেকে কেনা সাধারণ তাঁতের শাড়ি—এই তো তার বেশভূষা। সমস্ত শরীরে কোথাও কোন অলংকারের চিহ্ন নেই—অথচ সে-ই নাকি প্রফুল্ল বামচীর মাথাটা চিবিয়ে চিবিয়ে খাচ্ছে।

একদিন আপিসেই টিফিন রুমের সামনের খোলা ছাদে সুমেধাকে একলা পেয়ে প্রফুল্ল বললে, শুনুন, একটা কথা ছিল আপনার সঙ্গে!

ফিরে তাকিয়ে প্রফুল্লকে দেখে সুমেধার মনে আগুন জ্বলে উঠল। কঠিন স্বরে বললে, আপনার

সঙ্গে আমার কোনো কথা থাকতে পারে না, এটা মনে রাখবেন, বলে দম্ দম্ করে নীচে নেমে এল।

সেদিন বাড়ি ফিরতে দেরী হল। আপিসের ছুটির পর কার্জন পার্কের বেঞ্চে সে বসে থাকল অনেকক্ষণ। বাড়ি ফিরে দেখল বাবা উৎকণ্ঠিত হয়ে পথের দিকে চেয়ে বসে আছেন, মা ঘর-বার করছেন; ছোট ভাইটার আবার প্রবল জ্বর এসেছে। প্রায় বেহুঁশ।

আজও কার্জন পার্কে এসে বসল সুমেধা। অন্ধকার এখানে ওখানে ঘন হয়ে রয়েছে। লোকজন আসছে যাচ্ছে। যে যার কাজে ব্যস্ত। আরামদায়ক বাতাস বইছে। গাছের পাতার মর্মর, চিনেবাদামের খোলা ভাঙার আওয়াজ, ট্রামের ঘন্টা, বাসের সতিবেগের শব্দ, গাড়ির হর্ন—চারিদিকের অবিচ্ছিন্ন কোলাহলের ভেতরও কেমন একটা যাদকতা।

সুমেধা বসল বটে, কিন্তু বসবার পর মনে হল আপিসে থাকতেও সে পারত আরও কিছুক্ষণ। দাশগুপ্ত ছিলেন। ওই মলছাড়া নিরিবোধী নিরালম্ব মানুষটা। সুমেধার মনে হল, সে নিশ্চিন্তে বসে থাকতে পারত—অন্ততঃ কোণের সীটে দাশগুপ্ত যতক্ষণ থাকত, ততক্ষণ।

সুমেধা বসে রইল চুপ করে। আজ প্রফুল্ল হাসতে হাসতে তার কাছে যেতে পর্যন্ত চাইল। আশ্চর্য! মানুষ সব পারে!

সুনেত্রা আই, এ, পাশ করবার পর সুমেধাই অনেক চেষ্টা করে এখানে এল, ডি, সিতে ঢুকিয়ে দিল তাকে। দুজনে একসঙ্গে আসে, একসঙ্গে যায়। সংসারের চেহারা কিছুটা ফিরল। এখন আপিস থেকে ফিরলে বাবা গল্প করেন সুনেত্রার সঙ্গে। মা অনুযোগ করে বলেন, সুনেত্রার দুটো ভালো শাড়ি কেনা দরকার।

সুমেধা অনেক নিশ্চিন্ত। দায়িত্ব ভাগাভাগি। দুশ্চিন্তাও অনেক দূর।

সুমেধা ভাবল, সুনেত্রা এখন ছুটিতে। মাস তিনেক এখনও ছুটিতে থাকবে। কেননা আজই নিখিলেশ দুপুরে খবর দিয়েছে সুনেত্রার ছেলে হয়েছে। নিখিলেশের সেকসনেই কাজ করে প্রফুল্ল বাগচী। নিখিলেশের বন্ধু।

অথচ নিখিলেশ-সুনেত্রাকে নিয়ে আপিসে কোনোরকম আলোচনা হয়নি। কেউ টিটকিরী দেয়নি। সবাই বিয়ের খবর পেয়ে হৈ হৈ করেছে—শুভেচ্ছা জানিয়েছে। আর প্রফুল্ল-হাঁ, প্রফুল্লই দীর্ঘ সাত বছর পর তার সঙ্গে কথা বলে তার কাছ থেকে সুনেত্রার ছেলে হবার খবর পেতে চেয়েছে।

সুমেধার মাথাটা ঝিম্ ঝিম্ করে উঠল। রগদুটো টন্‌টন্ করছে। বুকের ভেতর একটা নিঃসীম শূন্যতা। সুমেধা মনে মনে একটা হিসেব করল। হাঁ, তিরিশ পেরিয়ে এসেছে সে। আর তাতেই যেন তার জীবনের সমস্ত স্বাদ নোনা হয়ে গেছে। একদিন তার দেহের অনায়াস লভ্য কারুকৃতিতে পুরুষরা আকর্ষণ অনুভব করত, আজ কি তিরিশ বছরের পরপারে সেখানে শুধু তার ভগ্নাবশেষ! কথা সে কোনকালেই বেশি বলে না, তাতেই যদি একদিন পুরুষেরা মুগ্ধ হয়ে থাকে; আজ কি তার সব কথা বলা শেষ! সুমেধা ভাবল, কোনো অনাবশ্যক কাঠিন্যে কি সে নিজেকে সঙ্কুচিত করে রেখেছে দীর্ঘদিন? কণিকাদি তো আর কোনোদিন বলেনি কোনো কথা। বরং তৃপ্তি বলেছে, সুমেধাদি, তুমি বিয়ে করবে না?

বিয়ের কথা শুনে উদাস হয়ে গেছে সুমেধা। তার চেয়ে পাঁচবছরের ছোট রামানন্দ। সে-ও কবার আগে রেজিস্ট্রী করে বিয়ে করেছে। তার বিয়ের কথা তো কেউ বলে না। তবে এ মেয়েটা বলে কেন?

মুখে হাসি এনে সুমেধা বলল, তোর জানাশোনা কেউ আছে নাকি?

আহা! আমি এমনি বলছিলাম, বয়স তো হচ্ছে—

তৃপ্তিও শোনাল তার বয়স হচ্ছে। মেয়েমানুষের মুখে মেয়েমানুষের বয়স হওয়ার কথাটা বড় অর্থবহ। সুমেধা ভাবল, না, ভাবতে পারল না, তার আগেই মাথাটা হঠাৎ ঝিমঝিম্ করে উঠল আবার।

কবাদে মুখ চোখ মুছল সুমেধা। রাত হয়েছে। লোকচলাচল কমে গেছে। অন্ধকার আরও বেড়েছে। সুমেধা হাত ঘড়িতে দেখল, আটটা বেজে গেছে। এবার উঠতে হয়। বাড়ি পৌঁছলে রামানন্দের বউ বিনতি বলবে, দিদি কি সিনেমা দেখলেন?

যা বলবেন, তাই খাবি এখন?

সুমেধা আজ বলবে, ক্ষিধে নেই, বলে সে আজ শুয়ে পড়বে।

কী ব্যাপার? আপনি এখানে?

উঠবে বলে প্রস্তুত হচ্ছিল সুমেধা, চমকে উঠল। একটু দূরের একটা লাইট পোস্টের আলো এসে পড়ছে মুখে। সামনের সুরকির রাস্তায় দাশগুপ্ত দাঁড়িয়ে।

সুমেধা উঠে দাঁড়াল। উল্টে প্রশ্ন করল, আপনি কি এখন আপিস থেকে ফিরছেন?

হাঁ, একটু হাসল দাশগুপ্ত। বললে, এটাই আমার ফেরার টাইম।

রোজ এত রাত অবধি থাকেন?

তা থাকি।

সুমেধা হঠাৎ কৌতূহলী হয়ে উঠল। বললে, আপনিও কি ওখানে তাস খেলেন নাকি?

সাধারণতঃ কো-অপারেটিভে থাকি, কখনও ওরা তাস খেলে,—দেখি।

সুমেধার ঔৎসুক্য সহসা বেড়ে গেল। এ লোকটার ঘরে কি কেউ নেই। এ-ও কি তার মত নিঃসঙ্গ একা। আপিসে তাদের সেকশনে দাশগুপ্ত বদলী হয়ে এসেছে বছরখানেক। লোকটা কেমন যেন; দল ছাড়া। কাজ করে, ভাবে। চুপচাপ বসে থাকে। সকলের মাঝে থেকেও লোকটা যেন আশ্চর্যরকম অগোচরেই রয়ে গেছে। কাজকর্মের মধ্যে থেকেও লোকটা নিজেকে এত গুটিয়ে রাখে কেন? আজকের এই মুহূর্তে মনে হল লোকটার কথাও জানা দরকার।

সুমেধা বললে, আপনি কোথায় থাকেন রাকেশবাবু?

পাইকপাড়া।

রোজ রোজ এত দেরী করেন? বাড়িতে কোন বন্ধন নেই বুঝি?

দাশগুপ্ত ফিরে তাকাল। আপিসের স্বল্পভাষী মেয়েটাকে যেন চিনতে পারছে না।

তাছাড়া কার্জন পার্কের এই অংশে একা এত রাতে যারা ঘোরাফেরা করে, তাদের সম্বন্ধে খুব ভালো ধারণা রাখে না সে। দেখল, সুমেধা তার মুখের দিকেই তাকিয়ে আছে।

আশ্চর্য হল। অস্বস্তি বোধ করল দাশগুপ্ত। সুমেধার তৈলাক্ত মুখ, বিশৃঙ্খল চুল, ক্লান্ত চাউনি, তবু তার ভেতর দাশগুপ্ত দেখল একটা অপরিসীম ঔৎসুক্য। এমন করে তো সে কোনদিন তাকায়নি

সুমেধার দিকে। দেখল, যৌবনের স্নিগ্ধিত ছায়া চোখের কোলে, ঠোঁটের পাণ্ডুরতায়, সমস্ত দেহের গাঁথুনির ভেতর যাই যাই করেও রয়ে গেছে। সুমেধার মুখের থেকে দৃষ্টিটা সরিয়ে নিয়ে পাশের অন্ধকার ঘরে থাকা গাঢ়টার দিকে তাকাল ধাশগুপ্ত। বললে, ঘরে শান্তি নেই দেখেই বাইরে থাকি মিস্ মজুমদার। যতক্ষণ বাইরে থাকি ততক্ষণ বোধহয় বেঁচে থাকি।

সুমেধার ক্লান্ত চোখ সহানুভূতিতে কোমল ও করুণ হয়ে উঠল। একটুখানি মৌন থেকে সে বললে, আমি শুনেছিলাম, আপনি বিবাহিত।

ঠিকই শুনেছিলেন, স্ত্রী আমার, মুহূর্তকাল এই শান্ত নিরীহ মেয়েটার মুখের দিকে তাকাল ধাশগুপ্ত, বললে, এককালে ছিলেন। বছর খানেক হল আলাদা হয়ে গেছেন।

কার্জন পার্কের রাতের বাতাস এসে লাগল দুজনের গায়ে। ক্ষণকাল নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল দুজনে।

ধাশগুপ্ত বোধহয় সুমেধার কাছ থেকে আরও কোনো কথা শোনবার জন্য কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করল। বললে, আচ্ছা, আমি চলি।

আমিও যাব, আস্তে আস্তে বলল সুমেধা।

কার্জন পার্কের লাল সুরকীর পথ ধরে দুজনে ধীরে ধীরে পায়ে পায়ে আলো ঝলমল ট্রাম স্ট্যাণ্ডের দিকে এগিয়ে চলল। সুমুখের লাইট পোস্টের আলোয় দুটো ছায়া ঘন হয়ে অন্তরঙ্গ হয়ে এসে পড়ল লাল সুরকীর পথে।

* * * *

বার্লিনের ফুয়রার ভবনে হিটলার ও তাঁর প্রণয়িনী ইভা গম্ভীর মুখে পাশাপাশি বসে আছেন। বার্লিনের পতন হয়েছে, রাৎসীতন্ত্রের ধ্বংস ঘটেছে। আর কোন আশাই নেই। মরতে হবে, তবে শত্রুর হাতে নয়।

হিটলারের হাতে বিষবটিকা। অতি তীব্র বিষ। পোষা কুকুরটাকেও হয়ত এ বিষ খাওয়াতে হবে।

হিটলার ও ইভার মধ্যে অল্পিষ্ট তর্ক উঠল, কে এ বিষ আগে খাবে, অথবা দুজনে এক সঙ্গেই।

ইভা ছলছলে চোখে বললেন—"তোমার মরণ আমি চোখে দেখতে পারব না, ও বিষ আমিই আগে খাব।"

হিটলার বললেন—"তুমি শুধু প্রেম দাও নি ইভা, আমার জন্যে তোমার জীবনও দিতে এসেছ। মৃত্যুর গরিমা দিয়ে প্রেমকে অমর করেছ,—তোমার প্রেমের তুলনা নেই।"

—"সে প্রেম শিখেছি আমি তোমারি কাছে।" ইভা বিষের বড়ি তখনি নিজের মুখে ফেলে দিলেন।

না

সব্যসাচী

আমাদের দেশ হল কথা বলার দেশ, বক্তৃতার দেশ।—আর তা-ও আবার এমনতর বক্তৃতা যা পরিণত বুদ্ধি মানুষ এক হয় একেবারেই শুনতে যায় না। নয়তো শুনতে গিয়ে বিব্রত হয়ে পড়ে!

কিন্তু তাতেও বিশেষ ক্ষতি নেই। কাঁকা মাঠে বক্তৃতা দেওয়ার রেওয়াজ আমাদের দেশে যত প্রবল এমনতর আর পৃথিবীর কুত্রাপি নয়। সুতরাং বক্তৃতাওআলারা মনুষ্যেন না কিছুতেই, জন দশেকের "মহতী সভা"তেও যথারীতি গলাবাজি করে তাঁরা বাকসাহিত্য পরিবেশন করবেনই।

আমরা শুধু বলিয়ে নই। করিয়েও বটে। আমরা বক্তৃতা দিই এবং আন্দোলন করি। অর্থাৎ বক্তা এবং আন্দোলনী দুইই হলাম আমরা। বড় জিনিষেও আমাদের আন্দোলন, ছোট জিনিষেও আমাদের আন্দোলন,—ভালো জিনিষেও আমাদের আন্দোলন, আবার মন্দ জিনিষেও আমাদের আন্দোলন। স্বাধীনতা অর্জনের জন্যে আমরা আন্দোলন করি। আবার ট্রামে বাস পোড়াবার অবাধ অধিকারের জন্যেও আমরা আন্দোলন করি। কাজেই আমরা যে উৎসাহী জাতি তাতে সন্দেহ নেই। অজস্র কথা এবং কারণে-অকারণে চীৎকার হল আমাদের খাদ্যপানীয়।

কিন্তু যখন সমস্যাটা অসামান্য তখন উত্তেজনায় হয়তো প্রস্তুতই প্রয়োজন; যখন কোন বিশাল শয়তানীর মুখোমুখি দাঁড়াতে হয় আমাদের, তখন গণ-আন্দোলন নিশ্চয়ই অপরিহার্য। ভিড় জমে। মহলা জমে। সুতরাং তাকে তরঙ্গায়িত করতে পারলে মহলা কাটাতে পারা যায় একথা স্বীকার করে নিলেও আমাদের সতর্ক হয়ে থাকতে হবে সেইসব অর্বাচীন সম্পর্কে যারা মানব সমাজের সুপ্রতিষ্ঠিত সত্য অথবা বহু পরীক্ষিত সুসংবেদ্যতার বিরুদ্ধে চীৎকার করার চেষ্টা করে। বলে, আন্দোলন করছি, সংস্কারপন্থী আমরা!—এ হল সর্বনাশের নামান্তর, পরাবুদ্ধির পরাকাষ্ঠা।

আবার এ-ই হল উপযুক্ত সময় যখন আমাদের বলতে হবে "না"। আমরা এই দলে ভিড়ব না। এই পন্থার সঙ্গে আমাদের মনের মিল নেই একেবারেই। চিন্তায় বাক্যে ও আচরণে আমরা কিছুতেই এ-নীতি সমর্থন করব না।

এতে সাহসের দরকার।—সত্যি কথা বলতে কি অসামান্য সাহসের দরকার। বিরুদ্ধ জনমতের সম্মুখীন হওয়ার চেয়ে রণক্ষেত্রের গোলাগুলির সামনে বুক পেতে দেওয়া অনেক সহজ। কিন্তু এও দেখা গিয়েছে যে বিভ্রান্ত জনমতের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে উচ্চকণ্ঠে "না" এই তেজোগর্ভ একাক্ষর শব্দের প্রতিবাদ ঘোষণা করবার মত অসম সাহসীরও অভাব হয়নি কোনদিন পৃথিবীতে।

কিন্তু সম্প্রতি এ বিষয়ে ভৈরব দেখা দিয়েছে। বিশ্বগ্রাসী গণদেবতা মানুষের ব্যক্তিত্বকে গ্রাস করে বসে আছে। গ্রাস করে বসে আছে সকল ব্যক্তিসত্তাকে। সত্য, ন্যায় ও বিচার বুদ্ধিকে পরাজিত করার চেষ্টা চলেছে কেবলমাত্র সংখ্যার ভাণ্ডা উঁচিয়ে।—একটা মিথ্যাকে দশ হাজার লোক মিলে আড়ম্বরে সমর্থন করলেই যে সেটা অকস্মাৎ একদিন সত্য হয়ে ওঠে না, কোন অন্যায়কে লক্ষ

শোক মিলে প্রশ্রয় দিয়েই যে সেটা স্থায়ীর সুযোগ মণ্ডিত হয় না, তার শাস্ত্রের এই প্রাথমিক তথ্যই আমরা ভুলতে বসেছি।

সুতরাং এই হচ্ছে যথাযোগ্য কাল যখন আমাদের বলতে হবে "না"। আমাদের চিন্তাধারায় সৃষ্টি করতে হবে একটি সংগ্রামী "না" এর মনোবৃত্তি। এ "না" নেতিবাচক নয়। এ হল বিদ্যমানতা-সূচক। এর মধ্যে "নেই, নেই" নেই,—এর মধ্যে কেবল "আছে; আছে" আছে। মানুষের চরিত্রে আমার বিশ্বাস আছে, ন্যায় ও সত্যের 'পরে আমার শ্রদ্ধা আছে। পৃথিবীর স্বাভাবিক প্রগতিশীল চলৎশক্তির 'পরে আমার আস্থা আছে এবং সকল কর্ম-অন্তে আমার অবিচলিত নির্ভরশীলতা আছে অশেষ কল্যাণ ও শান্তির উৎস এক মহাস্রষ্টা বিশ্বনিয়ন্তার পরে।

অতএব আমরা দ্বিধাকণ্ঠে বলব "না"। আমরা মিথ্যাকে স্বীকার করব না। অন্যায়কে প্রশ্রয় দেব না। ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির প্রচেষ্টা যাতে কিছুতেই সমাজ কল্যাণের ঊর্ধ্বে স্থানলাভ না করতে পারে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা এবং কোন ক্ষেত্রেই ভয়কে স্বীকার করব না।—সমস্ত মন দিয়ে এতখা বলতে পারছি না বলেই আজ আমাদের এই দুরবস্থা।

—ছেলেমেয়েদের স্বেচ্ছাচারিতায় আমরা বাধা দিই না, তারা অসন্তুষ্ট হবে বলে। রাজনৈতিক নেতাদের অসাধুতায় আমরা হস্তক্ষেপ করি না, তাঁরা আমাদের আকাশের চাঁদ পেড়ে দেবেন বলেছেন বলে। অসঙ্গত আবেদন প্রমোদে আমরা প্রশ্রয় দিই, যেহেতু বর্তমান কালে সেটা বহুজনাকাঙ্ক্ষিত। —আমাদের পূর্বপুরুষেরা কিন্তু ঠিক এমনটি ছিলেন না। তাঁরা পাপপুণ্য স্বীকার করতেন এবং বিশ্বাস করতেন যে পৃথিবীকে শুভতর করে তোলার বিষয়ে তাঁদেরও কিছু দায়িত্ব এবং ক্ষমতা আছে। তাঁরা মনে করতেন ভগবৎ কৃপায় সে দায়িত্ব পালন করে পৃথিবীকে তাঁরা উন্নততর করে তুলতে পারবেন। আদর্শের জন্যে তাঁরা প্রাণ বিসর্জন দিতে পারতেন। সর্বপ্রকার ভয়ের সম্মুখে দাঁড়িয়ে তাঁরা বলতে পারতেন, "তোমাকে ভয় করি না।"

ক্ষতির সম্মুখে দাঁড়িয়ে তাঁরা বলতে পারতেন, "তোমাকে গ্রাহ্য করি না।"

অসঙ্গত বুভুক্ষার সম্মুখে দাঁড়িয়ে তাঁরা বলতে পারতেন, "আমরা কোমলে কঠিন হতে পারি।"

কিন্তু সে-যুগ অন্তর্হিত হয়েছে, সে-মানুষ বদলে গিয়েছে,—অন্তর্হিত হয়েছে অন্ধকারের কালোয়, বদলেছে নিচের দিকের টানে।

বর্তমানকালে আমরা "না" বলবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছি, খানিকটা গোলমাল এড়াবার অশোভন চেষ্টায় এবং খানিকটা ভয়ে। এই ক্ষমতার পুনরুদ্ধার প্রয়োজন। প্রধানত তিন স্থানে এর আশুপ্রয়োগ আবশ্যক।

প্রথম হল আমাদের ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্রে। আগেকার দিনে তাদের নানারকম পরিশ্রমের কাজ করেও লেখাপড়া করতে হত। ছেলেদের বাড়ীর বহু কাজে সাহায্য করে এবং মেয়েদের সংসারের খুঁটিনাটি বিষয়ে সহায়তা করে পড়াশুনা করতে হত। প্রচুর হাঁটাহাঁটির জন্যেও তাদের দৈহিক পরিশ্রম কম হত না। অল্পবয়সেই সংসার সম্পর্কে তাদের বহু দায়িত্ব বহন করতে হত। ফলে তাদের মধ্যে কর্তব্য ও দায়িত্ব বোধের উন্মেষ হত একান্ত সহজেই।

আজকাল কিন্তু আর ছেলেমেয়েদের খাটা-খাটুনীর বিশেষ বালাই নেই। স্বাস্থ্যচর্চার হাঙ্গামা নেই। সকল প্রকার দৈহিক পরিশ্রম থেকে সযত্নে আড়াল করে রাখা হয় তাদের। শ্রম স্বীকারের

ফলে কোন কিছু অর্জনের সুগভীর আত্মপ্রসাদ ও আনন্দ থেকে তারা বঞ্চিত। তাই আমরা বলি এই ধারা যদি চলে তাহলে পরবর্তী কালের ছেলেমেয়েরা জীবন সংগ্রামের জগতে একেবারেই অক্ষম বলে প্রমাণিত হবে।

আজ বিলাস ব্যসনের প্রাচুর্য ছেলেমেয়েদের সামনে। তাদের মানুষ করতে হলে সে-প্রাচুর্য কমাতে হবে। নিজেদের কর্তব্য সম্বন্ধে তাদের সচেতন করে তুলতে হবে অবিলম্বে। এর জন্যে সহায়তা নিতে হবে "না"র। বলতে হবে, "তুমি আজ সিনেমা দেখতে যাবে না। পড়তে হবে তোমাকে সন্ধ্যেবেলা। "—" সকালে তুমি অত বেলা অবধি ঘুমোবে না। ভোরে উঠে ব্যায়াম করতে হবে তোমাকে। "—"বকে" বসে আড্ডা দেবে না বিকেলবেলা। মাঠে গিয়ে ফুটবল খেলতে হবে তোমাকে।"

—মেয়েদেরও বলতে হবে অনুরূপভাবে তাদের করণীয় সম্পর্কে।

মনস্তত্ত্বের দিক থেকে বিচার করলে দেখা যাবে যে ছেলেমেয়েরা সেইসব মানুষকেই বেশী পছন্দ করে যারা তাদের প্রতি স্নেহাসক্ত অথচ দুর্বল নয়। অর্থাৎ দরকারমত যারা কঠিন হতে পারে তাদের প্রতি। সুতরাং ছেলেমেয়েদের "মানুষ" করে তোলার পক্ষে "না"র সুচিন্তিত ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

দ্বিতীয় ক্ষেত্র হল আমাদের সামাজিক পরিবেশ। এখানে দেখছি অসাধুতা, দুষ্কৃতিতা, মিথ্যাচারের জয় জয়কার। অথচ আমরা সবসময় সব কিছুতেই সায় দিয়ে যাচ্ছি "হেঁ, হেঁ" করে। সমর্থন করি না, মনে মনে বিরক্ত হই, কিন্তু তবুও ভাবি, কি দরকার বাবা আমার ওসব ঝামেলায় মধ্যে যাবার। যার যা খুশী করুকগে!—আশ্চর্য! আমরা জ্বলে উঠি না, সামাজিক দুর্নীতির বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াই না, অনাচার অবিচারের প্রতি কষ্ট আঘাত নিক্ষেপ করি না!—শান্তিপ্রিয় মানুষ আমরা, সকল কদর্য সামাজিক অবস্থার সঙ্গে, অক্ষমনীয় সমাজ-পাপীদের সঙ্গে নিরুপদ্রব সহাবস্থানের চুক্তি করে বসে আছি!—একবারও আমরা উত্তেজিত হয়ে বলছি না, "না, না, না। এ চলবে না। এ আমরা চলতে দেব না। সমাজ জীবনে অন্যায় আমরা সইব না, পাপ আমরা সইব না, অসঙ্গত লোভ আমরা সইব না, অসাধু উপার্জন আমরা সইব না।"

আজ আমাদের বারা বলতে হবে। বলতে হবে ওই কথা। সমস্ত অনুভূতি দিয়ে, চিত্তের প্রবলতম আবেগ দিয়ে। "না" এর উপর সর্বাধিক জোর দিয়ে।

তৃতীয় ক্ষেত্র হল আমাদের নিজেদের জীবন, নিজেদের চরিত্র।—জাতির চরিত্র হল আমাদের ব্যষ্টি চরিত্রের যোগফল। আমরা প্রত্যেকেই যদি নিজনিজ চরিত্র সংশোধনের ব্যবস্থা করি তাহলে বৃহত্তর মানব সমাজের আচরণের কথা মনে করে আমাদের খুব বেশী বিব্রত হতে হবে না। নিজেদের দোষত্রুটি সম্বন্ধে সাফাই গাওয়ার অভ্যাস আমাদের বন্ধ করতে হবে।

অন্ন আয়ে চলে না, তাই ঘুস নিই। সময় করে উঠতে পারি না, তাই সব কাজেই দেরী করি। কৌশল করি; রাজনীতি করি, নিজের সুবিধার জন্যে নয়, দেশের উন্নতির জন্যে!—নিজের কাছে নিজের এ-চালাকি চলবে না নিজেকে চোখ রাঙিয়ে বলতে হবে, "না, না, না। এ সমস্ত খোঁড়া কৈফিয়ৎ মানব না। অন্যায় যা, তা সব সময়ে সকলের ক্ষেত্রেই অন্যায়। ভুল যা, তা সব সময়েই ভুল। সুতরাং সামলাও আগে নিজেকে, ঘর ঠিক করে নাও নিজের, তারপর অন্য কথা।

সমাধি

বর্ষীয়ান মুখোপাধ্যায়

হাত দুয়েক মাত্র খড়ের চালটার চুড়াটা জেগে। তার ওপর ভানুমতী তার বৌদিকে নিয়ে বসে।

আশেপাশে কোথাও জনমানব নেই। আছে শুধু উন্মত্ত ফেনিল বারিজলের কলকল্ স্রোত। যেদিকে ওরা চায় জল—শুধু জল। সৈকিক রঙের জলস্রোত পাক খেয়ে আছড়ে পড়ছে ওদের চালাটার ওপর। সাপের ছোবলের মত ক্রুদ্ধ গর্জনে বন্যাস্রোত এক একবার কাঁপিয়ে দিচ্ছে চালাটাকে। শুধু দুটী নারী পাশাপাশি বসে মাটির পুতুলের মত। বাইরে থেকে বোঝার কোন উপায় নেই কি ভাবছে ওরা। একজনকে যদি বা দেখে মনে হয় সে উদ্বিগ্ন এই অবস্থায় অন্যজন কিন্তু নির্বিকার।

সত্যিই কি তাই। ভানুমতীর এই নির্বিকারত্বের পিছনের ইতিহাসের বুঝি খোঁজ জানেনা কেউ। যে জানতে পারতো সে তো ব্যস্ত একখানা নৌকার আশায়। কখন আসবে মানুষটা! জল তো বেড়েই চলেছে হু হু করে। কোন সময় ডুবিয়ে নেবে তাদের গুদ্ধ। কেউ জানতেও পারবেনা; কোথায় গেল দুটী জলজ্যান্ত মেয়ে মানুষ।

ভানুমতীর ভাবনাটা যায় এই মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও। ঐ ঘোলা জলস্রোতের মতই ভাবনা স্রোতগুলো যেন পাক খেয়ে খেয়ে মনের মধ্যে উত্তাল তরঙ্গ তুলে আবার মিলিয়ে যায় কোন সময়। শুধু মিলিয়ে যায়না যে মুখখানা সে মানুষটাকেই তো সে আশা করেছিল আজ সারাদিন ধরে। আসবে সে উদ্ধার করতে তার বলিষ্ঠ হাতে হাল ধরে নৌকা বেয়ে। কিন্তু কোথায় সে। সেও কি তার মতই এমন করেই চালে বা গাছের ওপর বসে বন্যার এই তাণ্ডবলীলা দেখছে। দেখছে কি এই তাবৎ জীব জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন দুটী নারী ভাসমান সমুদ্রে প্রহর গুণছে মৃত্যুর।

এই তো দুদিন আগেই এসেছে পত্রখানা। শশধর আসবে ভানুমতীকে নিতে। ওদিকে মায়ের বড় কষ্ট সংসারের কাজকর্ম নিয়ে। তাছাড়া ভানুমতী এখন যৌবনবতী। ষোল বছরের ভানুমতীর দেহে এসেছে যৌবনের জোয়ার। কানায় কানায় ভরে উঠেছে তার মনের কৈশোর কামনা বাসনা।

ভানুমতী শশধরকে দেখেছে তো মাত্র বার তিনেক। বিয়ের সময় ভানুমতী লজ্জাতে চাইতে পারেনি। সবাই বলেছে শুভদৃষ্টির সময় চাইতে হয় ভাল করে। ভানুমতী এক সময়ে আর দুটি লাজুক চোখের দিকে চোখ তুলে দেখেছে সুন্দর একখানা মুখ। বাস তারপর শ্বশুরবাড়ীতে ভিড়ে দেখতেই পায়নি তাকে। কটা মাত্র দিন তারা দেখেছে পরস্পরকে। তারপর আর দুবার তাদের বাড়ীতে।

শেষবার এসেছিল দিন পনেরো আগে। ভানুমতী তখন পুকুরঘাটে। দেখেই বুঝেছিল শশধর। সেও বুঝি চিনেছিল তাকে। তাই-কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকেছে নির্জন পুকুরঘাটে তাকে লজ্জা দেবার জন্য। লজ্জায় লিহরন জেগেছে ভানুমতী। কেউ যদি দেখে ফেলে কি ভাববে। কিন্তু শশধর দেখেনি। তখন ইসারা করতে হয়েছে ভানুমতীকে। হাত দিয়ে ইসারা করেছে বাড়ী যাও আসছি।

ও জানিয়েছে যাব না।

হাতজোড় করেছে ভানুমতী। লক্ষীটি বাড়ী যাও! আমি আসছি এখুনি। কেউ দেখে ফেললে লজ্জার আর সীমা থাকবে না।

শেষ পর্যন্ত শশধর এগিয়েছে পা পা করে। আগে ভানুমতী পিছনে শশধর।

নতুনরূপে ভানুমতীকে দেখে মোহিত হয়েছে শশধর। আর ফেলে রাখা চলেনা ভানুমতীকে বাপের বাড়ীতে! এখন ও নিজেই যেতে চায়। আর থাকতে চায়না এখানে।

রাত্রিতে বুঝি সেই কথাই স্পষ্ট করে জানিয়েছিল, তখন বাবুর পুকুরঘাটে হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকা হয়েছিল কেন? কৃত্রিম রাগে চোখ দুটো বড় বড় করে শাসন করে যেন ভানুমতী।

—তোকে দেখার জন্ত ভানুমতী। কথা বলে আর মৃদু মৃদু হাসে শশধর।

—আমাকে দেখার যদি এতই সাধ তো নিয়ে গেলেই হয়!

—তুই যাবি বৌ! সত্যি বলছিস, আমার গা ছুঁয়ে বল—,

—যাবনা কি চিরকাল বাপের বাড়ীতেই থাকব! বাপ কি বিয়ে দিয়েছিল এখানে থাকার জন্তে নাকি?

শশধর আনন্দে সরে এসেছে ওর কাছে। মুখটা তুলে ধরে বলেছে এতদিন বলিসনি কেন ভানুমতী! মিছিমিছি কষ্ট পেয়েছিস নিজে আর কষ্ট দিয়েছিস আমায়।

ভানুমতী লজ্জা পেয়েছে এবারে বুঝি। মুখ লুকিয়েছে শশধরের বুকে। এমনি করেই দুটি পিপাসার্ত হৃদয়ের মিলন ঘটেছে দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর। রাত্রি বেড়ে চলেছে ওরা জানতেও পারেনি চাঁদ উঠেছে আকাশে বাসীর। এক ফালি চাঁদ তবু কত মায়াময়। এক টুকরো আলো এসে পড়েছে ভানুমতীর বুকে লুটিয়ে।

—তোর মুখটা চাঁদের মত সুন্দর বৌ!

—যাঃ,

—সত্যি! একবার চাঁদের দিকে চেয়েছে শশধর আর একবার ভানুমতীর দিকে।

ঘুম ভাঙতে অনেক দেরী হয়েছে। বৌদি দরজায় মৃদু করাঘাত করে ডাকে—ঠাকুরঝি! রাত পুইয়েছে! এখন ওঠ!

দুজনেই গভীর ঘুমে অচেতন।

আবার ডাকে ও ঠাকুরঝি! ঠাকুরঝি! কত ঘুমোবে! ওঠ না!

এমন করে ঘুম ভাঙাতে চায়নি মনোরমা। ও ঘরে ভাঁড়ারের জিনিস পত্র রয়েছে তার। সকালে জামাইকে কি দিয়ে আপ্যায়িত করবে। এ ছাড়া প্রায় সমবয়সী মনোরমা। মনের কথা বুঝি মনে মনে বোঝে। তাই একটু হাসিতামাসা করতে চায় ও।

ঘুম ভাঙে অবশেষে মনোরমার তাড়নায়। চোখ কচলাতে কচলাতে দরজা খোলে ভানুমতী।

—কি গো মানিনি! সারারাত বুঝি একটুও ঘুমোওনি! ওমা তাইতো! চোখ লাল, মুখ ফুলোফুলো, চুল এলো! কি ব্যাপার ঠাকুরঝি তাই! ফুলশয্যার রাত বুঝি কালই গেল কি বল?

—যাও ! তোমার যেমন কথা বৌদি !

—কেন যেমনি ঘুমুতে তুমি না ঠাকুরজামাই ; আচ্ছা বল শুনে যদি হই, আমার কাছে লুকোলে চলবেনা ভাই ! সব ঘরে ফেলেছি ! ওমা দেখি দেখি কপালের সিঁদুর সারা মুখময় কেন গো ! কে এমন করে দিল বাড়িয়ে—

এমনই লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠছিল ভানুমতী আরও পরে যখন কথাটা রাষ্ট্র হ'য়ে গেল বাড়ী থেকে পাড়া ময়। ভানুমতী যাবে শ্বশুরবাড়ী এবারে।

সোনা মেয়ে যাবে বই কি না ! আর কি ভাল লাগে বাপের বাড়ী থাকলে ?

—সে তো বটেই। বয়সের ধর্ম্ম থাকতে পারবে কেন সোয়ামী ছেড়ে।

বাড়ীতে নেই গিন্নী। কে দেখবে দিনক'। পাড়ার মাসী পিসীরা এসেছে আগ বাড়িয়ে। পঞ্জিকা দেখিয়ে এসেছে পুরোহিত বাড়ী। ভাল দিন আছে পনের দিন বাদে।

সেই ভাল দিনই তো আজ। আজই আসার কথা শ্বশুরের। তাই তো দিন গুনছে ভানুমতী এক এক করে। কর সোনার সময় বুঝি পিছনে এসে দাড়িয়েছে বৌদি !

কি অত কসছ ঠাকুরঝি ! ঠাকুরজামাই অঙ্ক কষতে দিয়ে গিয়েছে বুঝি !

ধরা পড়ে রাঙা মুখটা আর তুলতে পারেনি বৌদির সামনে।

—আর বুঝি সবুর সইছেনা ঠাকুরঝি ! আহা দিন যেন আর যায় না ! দিন নয়তো যেন এক একটা বছর। আহা ! কি কষ্ট, আর দেখা যায় না। কৃত্রিম দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে বৌদি।

চালের ওপরে বসে ভানুমতী প্রতীক্ষা করে। আজ সে আসবে বলেছিল, সে আসবেই। সপ্তসাগর সাঁতার দিয়েও আসবে তার মনের মানুষ। তাইতো চেয়ে আছে ভানুমতী অথৈ সমুদ্রের দিকে। কল্ কল্ শব্দ করে এক একবার ভীষণ আক্রোশে পাক খেতে খেতে উত্তাল ফেনিল জলরাশি আছড়ে পড়ছে তাদের পায়ের নীচে। ঠিক অমন করেই বুঝি আছড়ে পড়ছে ভানুমতীর মনের চিন্তাগুলো। পাক খেয়ে খেয়ে। সে কি বেরিয়েছে বাড়ী থেকে। তাদের ওদিকে এই যান হয়নি। এমন করে বাড়ী ঘর মানুষ সব ছাড়ল সব নেয়নি ভাসিয়ে। ভাসিয়ে নেয়নি মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা কামনা বাসনাকে।

পাশে বসে বৌদি। যেন বোবা এক পাষাণ প্রতিমা। অমন হাসিখুশী মানুষটাকে কে চিনবে। কে বলবে এই বৌটি কথা আর হাসি ছাড়া থাকতে পারে না এক মিনিটও।

—তোমার দাদা তো এলো না ঠাকুরঝি ! কি হবে !

বোবা মানুষটা অনেকক্ষণ পরে কথা কইল একটা। বৌদি দাদার জন্ত বুঝি চিন্তিত। সাঁতরে গিয়ে জোর করে একখানা নৌকা ধরে গিয়েছে ডাঙায়। সেখান থেকে নৌকা নিয়ে আসবে তাদের জন্ত। সকাল থেকে অনেক চেষ্টাতেও পায়নি কোন নৌকা। পাবেই বা কি করে। সন্ধ্যা রাত্রেও তো জল বাড়েনি এতো। একটা রাত্রির কয়েক ঘণ্টা তো। তার মধ্যেই অথৈ সমুদ্র। বাঁধ-ভাঙা ঠাণ্ডা ঘোলা জল ভেঙে দিয়ে গেল ঘর আর সেই সঙ্গে অনেক মধুর স্বপ্ন, অনেক মিলনের আশা।

বৌদি চেয়ে আছে একটা মানুষ আর একটা নৌকার জন্ত। ভানুমতীও চেয়ে আছে একটা মানুষের জন্তই যে মানুষ নৌকা না পেলে আসবে সাঁতার কেটে এই পাথার-সমা। কিন্তু কারও দেখা নেই।

এদিক ওদিক চাইল আবার তাহমতী। অনেক দূরে কাদের চীৎকার শোনা যায় অস্পষ্ট। জলের ওপর প্রতিধ্বনিত হ'য়ে আসছে এখানে। তাদের মতই আশ্রয় নিয়েছে অনেকে কি পাখি আর দুটো পাখী পাশের বাবলা গাছটায়। একটা সাপও বুঝি নিয়েছে আশ্রয় ওখানে। কেউ কারও শত্রু নয়।

তবু তো ওরা পেয়েছে একটা আশ্রয়। গাছটা ডুবে না যাওয়া পর্যন্ত ওরা থাকবে পাশাপাশি। আর তাহমতী তার বৌদিকে নিয়ে বসে আছে মৃত্যুর পাশাপাশি। কখন আসে ঠিক নেই। হয় পশুর আসবে নয় আসবে জলের মধ্য থেকে মৃত্যুদূত।

হঠাৎ নড়ে চড়ে বসে মনোরমা। জল বাড়ছে। জল ছিল নীচে এই ক ঘণ্টার মধ্যে সে জল এসেছে পায়ের কাছে। পা তুলিয়ে বসেছিল তাহমতী। বুড়ো আঙুলের ডগাটা ছোবে ছোবে করছে ঠাণ্ডা ঘোলা জল।

—দেখ, দেখ, ঠাকুরঝি একটা বাছুর ভেসে যাচ্ছে দেখ! আহা কার ঘরের দুধের বাছুর।

কথা বলছে তাহমতীকে। এমন, কত বাছুর, গোরু, ঘর, বাড়ী, কত ভেসে যেতে দেখেছে ওরা। তবু যেন নতুন করে দেখে মনোরমা।

তবু কথা বলে না তাহমতী।

—কথা বলনা ঠাকুরঝি! ও ঠাকুরঝি। দোহাই তোমার কথা বল একটা! ডুবে মরার আগেই যে মরে যাব গো!

তাহমতী এবারে বুঝি মুখ খোলে।—আচ্ছা বৌদি এ বাণ কি সব জায়গায় হয়েছে!

হঠাৎ যেন মনোরমা মনে সেই স্বাভাবিক জীবনকে ফিরে পায় মুহূর্তের জন্য। অস্তগামান সূর্যের শেষ আলোর মত একটু ম্লান হাসি ফোটে অধরে।—ভয় নেই ঠাকুরঝি—ঠাকুরজামাই ভালই আছে! ওদের ওখানে বাণ হবে কেন?

যাক্ বেঁচেছে তাহমতী। পশুর ভালই আছে তাহলে। নিশ্চয়ই সে এসেছে। বাণ দেখে আশ্রয় নিয়েছে কোথাও। হয়ত আসবে এবার, নৌকা খুঁজছে নিশ্চয়ই! ভুলে যায়নি তাকে! যাবার আগে কি আদর করার ঘুম! তার গা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা: আসব—আসব—আসব।

একটা শব্দ মট্ মট্ করে শোনে দুজনে। যেন হঠাৎ নড়ে উঠেছে চালটা। উঃ কি ভীষণ স্রোত! সোটা একটা নদীর বিপুল স্রোত বয়ে চলেছে তাদের বাড়ীর ওপর দিয়ে। চালটা কাঁপছে থর থর করে। ভয় পায় দুজনেই! এতক্ষণ যেন তারা ভুলে গিয়েছিল তাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে। এখন মন দিয়েছে তাদের অবস্থিতির দিকে।

সত্যিই চালটা কাঁপছে ভীষণ। আর পারছে না উদ্দাম বন্যা স্রোতের সঙ্গে যুঝে। সারাদিন রাত কয়েকটা বাঁশের খুঁটির ওপর ভর করে এতবড় ঘরের চালাটা চালিয়েছে তার অস্তিত্বের সংগ্রাম। আর যেন পারেনা। রণক্লান্ত সৈনিকের মত চালটা যেন ভেসে যাবে এই স্রোতে। ভাসিয়ে নিয়ে যাবে তার আরোহিনীদের। আশ্রিতাদের বুকে করে লড়াইএর ক্ষমতা বুঝি আর তার নেই।

আবার ওরা চায় জলের দিকে। যতদূর দৃষ্টি যায় চারদিক কেবল জলস্রোত কল্-কল্ ছল্-ছল শব্দ। ফুটোর মত ভাসছে হলদে কেনার পাহাড় আর কচুরিপানার স্তবক। ভাসা কোথায়! কোনদিকে ভাসা! নৌকা আসবে তাদের বাঁচাতে কোনদিক থেকে।

—আসছে আসছে বৌদি! ঐ দেখ নৌকো! চীৎকার করে উঠে দাঁড়ায়।

দূরে একখানা নৌকা দেখা যায়। প্রবল প্রতিকূল স্রোতে উলেক্ষা করে উজিয়ে আসার চেষ্টা করছে আপ্রাণ। কিন্তু পারছেনা। দু ইঞ্চি যদিবা আসছে এগিয়ে ভীষণ স্রোতে পিছিয়ে যাচ্ছে দু ইঞ্চি। এতক্ষণে বুঝি নৌকাখানা এই উন্মত্ত স্রোতের সম্মুখীন হয়েছে।

—আসছে বৌদি! আসছে! ছোট শিশুর মত নেচে ওঠে তারুমতী। কোথায় আছে, কেমন অবস্থায় আছে সব ভুলে যায় ও:—কিন্তু এগিয়ে আসতে পারছেনা কেন? এত স্রোত:

কথা শেষ করার সঙ্গে সঙ্গেই বিকট গর্জন কোথায় যেন কি ভেঙে পড়ল জলে। কোন দূরের এই নদীর পাড় ভাঙা শত জলের তরঙ্গে তরঙ্গে নাচতে নাচতে আসে ছুটে। কি ভীষণ অথচ কি সুন্দর!

স্রোতের সঙ্গে নাচছে খড়ের চালাটা ভীষণভাবে। কোথাকার পাড়-ভাঙা ঢেউ বুঝি উত্তাল হয়ে আসছে ছুটে গ্রাস করতে তাদের এই আশ্রয়টুকুকে।

—কি হবে বৌদি! চালাটা যে ভীষণ কাঁপছে!

—ভয় নেই ঠাকুরঝি! ঐ তো নৌকো নিয়ে আসছে তোমার দাদা।

দুজনেই উঠে দাঁড়িয়েছে চালের ওপর। চালের কাঁপুনির সঙ্গে কাঁপছে তারাও।

—ভয় নেই! ভয় নেই গো! আসছি আমরা।

শোনা যাচ্ছে ওদের অভয় বাণী! আর ভয় নেই!

—বৌদি গো! গেলাম! ডুবে গেলাম! বাঁচাও, বাঁচাও।

চালাটা ভীষণ বেগে দুলতে দুলতে ডুবছে!

—ভয় নেই মাঝি! তিন চারজন একসঙ্গে দাঁড় বেয়ে আসছে ছপাছপ্ শব্দ করে। ভীষণ জোরে বাইছে তারা। বন্যা স্রোতকে অগ্রাহ্য করে প্রাণপণে বাইছে দাঁড়। সমস্ত শক্তি দিয়ে। হাতের পেশীগুলো উঠেছে ফুলে। গলার শিরাগুলো কম্পমান।

একটুখানি সবুর! এলাম বলে—আরো জোরে বাইছে নৌকা। প্রায় কাছাকাছি। সমস্ত শক্তি নিঃশেষ করে বাইছে নৌকা। আর একটু।

ভীষণ শব্দ করে ভেঙে পড়ল খড়ের চালাটা! ছিটকে গেল দশ হাত দূরে।

—বাঁচাও বাঁচাও! তারুমতী দুই নারীর কণ্ঠস্বর ছড়িয়ে পড়ল দিক্ বিদিকে মৃদু কম্পন তুলে।

নৌকা থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ল কে জলে।

সাঁতরাচ্ছে। তারুমতী একবার ডুবছে আর উঠছে। জল খেয়ে ভেসে ওঠে তখনও চেঁচাচ্ছে, ডুবে গেলাম বাঁ-চা-ও।

নৌকাটা তখনও ভাসছে আর ভাসছে। আর কেউ চেঁচাচ্ছে না জলের ওপর মাথা তুলে—বাঁচাও বলে।

শুধু বাবলা গাছটা কাঁপছে স্রোতের মধ্যে। আর কাঁপছে অজস্র পিঁপড়ের ঝাঁক, দুটো পাখী একটা সাপ।

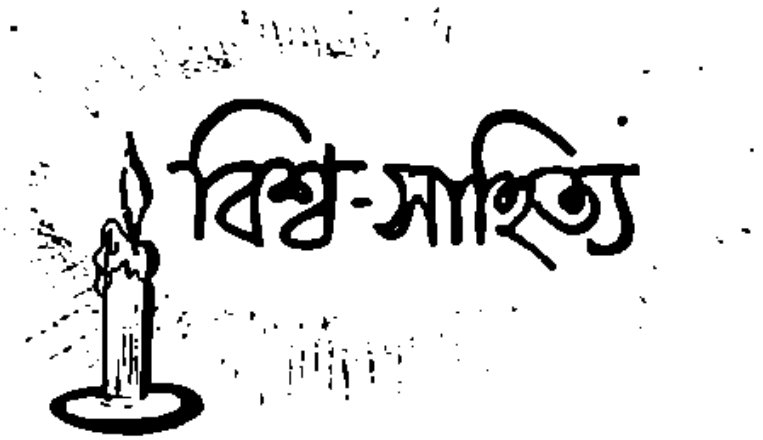

The literature of an age is but the mirror of its prevalent tendencies.

—*Nation*

সমারসেট্ ম্যম (১৮৭৪)

সৌরেন্দ্রনাথ বসু

॥ ১ ॥

"—আপনার প্রায় সব ক'খানা বই আমি পড়েছি—দেখেছেও ছাপা। কিন্তু আমার বাবা বলেন এ সব পড়ে আমি কেবল সময় নষ্টই করছি। এগুলো জল গরম করবার মতো বাজে কাগজ ছাড়া নাকি আর কিছু নয়। আপনি যেদিন থাকবেন না আপনার বই কেউ পড়বে না। আপনার লেখা কি সত্যিই এত বাজে?

একান্ত আপনার
রোজমেরি।"

একানব্বই বছরের দীর্ঘ জীবনে সমারসেট ম্যম কত পত্র লেখকের কত যে উৎসুক জিজ্ঞাসার উত্তর দিয়েছেন তার শেষ নেই। কিন্তু লেখা যখন একরকম বন্ধই ক'রেছেন তখন ডিভনসায়ারের ইস্কুল পড়ুয়া পঞ্চদশী রোজমেরির এই পত্র পেয়ে তিনি থমকে গেলেন। প্রায় সত্তর বছরের সাহিত্য সৃষ্টির ইতিহাসে চোখ বুলিয়ে তিনি উত্তর লিখলেন—

"—আমি পেশাদার লেখক এটা ঠিক—একথা আমি গোপন করিনি কোনদিন, অনেকেই তা' করে আসি। কিন্তু জল গরম করবার মত বাজে লেখাই লিখেছি কেবল এ আমি মানি না। লিখতে চাইনি, কিন্তু যাকে পড়ে লিখতে হ'য়েছে এমন লেখা আমার একটিও নেই।—কদাচিৎ একটি দুটি হয়ত খুঁজে পাওয়া যাবে অমন—"

সমারসেট ম্যমের সমৃদ্ধি সৃষ্টির অজস্র বৈচিত্র্যে, উৎকর্ষে নয়। বিদগ্ধ পাঠকের অভিযোগ তাঁর বিরুদ্ধে অপরিমিত। দুঃসাহসী, অদ্ভুতধর্মী কোনো উপন্যাসই তিনি লিখলেন না। রবেল ও প্রুস্তের, দুঃসাহসিক ভাবুকতা ও মননশীলতা তাঁর নেই। টলষ্টয় ও ডষ্টয়েভস্কির কল্পনার বৈভব ও মানবিকতায় তাঁর অনধিকার, বালজাক বা শেকভের ছোটগল্পের দৃঢ় জীবনবোধ তাঁর অনায়ত্ত, বার্ণার্ড শ', কি ইবসেনের নাট্যপ্রতিভায় অংশীদারও তিনি নন। নিজেও তিনি বলেন লেখক হিসাবে তাঁর স্থান দ্বিতীয় সারির প্রথম দিকে। তবুও ম্যম জনপ্রিয়, কারণ তিনি সহজ পাঠ্য। এই শতকের ইংরেজ লেখকদের মধ্যে পৃথিবীর সব দেশেই তাঁর জনপ্রিয়তা অনেকের কাছে ঈর্ষার বস্তু। কোন ভূমিকা ছাড়াই তাঁর গল্প

ও উপন্যাস পড়া যায় অনায়াসে, যা অধুনা দুর্লভ বলতে হয়। মাম গল্প বলতে বসে গল্পই বলেন—উপদেশ দেন না, সুচিন্তিত দার্শনিকতাও করেন না। জীবনকে তিনি যেমন দেখলেন, যেমন ভাবলেন সেই কথাই তিনি গল্পে বলেন। তাঁর বক্তব্য অন্তের সঙ্গে প্রণীত না হ'য়েও সহজবোধ্য, স্পষ্ট—গল্পগুলি একান্তভাবে গল্পই। প্রসঙ্গ ও প্রকরণ যেমনই হোক না কেন কাহিনী হিসাবে তা' চিত্তাকর্ষক। গল্পের এই প্রসাধনে মাম অনচিত্তজয়ী। তিনি সংশয়ী, অবিশ্বাসী। ধর্মে তাঁর নিগূঢ় অরুচি। আদর্শ নিষ্ঠার পরিবর্তে তাঁর মতে কপটাচরণ। আন্তরিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য ভোগে তাঁর স্পৃহা কারো চেয়ে কম নয়। তাঁর সুবিশাল সাহিত্যে তিনি কোথাও নারী-স্তুতি করেননি, বরং নারী বিদ্বেষী হিসেবে অখ্যাতিই পেয়েছেন। তবুও মাম জনপ্রিয়, কারণ শিল্প বস্তুর আবেদন, অন্ততঃ সাধারণ পাঠকের কাছে, সৃষ্টির প্রসাধনে। বাঙালীর একান্ত প্রিয় উপন্যাসিক শরৎচন্দ্র অন্য কোনো ঐতিহাসিক কারণে না হ'লেও, এই একটি গুণে আজও সাধারণ বাঙালী পাঠকের অন্তরঙ্গ। ভাবানুভূতা এবং বাঁধাধরা ছকের বন্দীদশা স্বত্বেও গল্প বলার সহজ ক্ষমতায় তিনি আমাদের জয় করেছেন। অগণিত পাঠককে মুগ্ধ ক'রেছেন মাম এই একমাত্র গুণে। তাঁর অনেক মতামত ও গল্প-উপন্যাসের উপকরণ পক্ষান্তরে, অনেক পাঠক ও পরিচিত মানুষকে বীতস্পৃহ করে। গল্পের প্রয়োজনে কত পরিচিত মানুষকেই না তিনি ব্যবহার করেছেন। পৃথিবীর সমস্ত দেশেই ঘুরেছেন তিনি। দূর প্রাচ্যের দেশ—জাপান, ফিলিপাইনস, মালয়, ভারতবর্ষ থেকে য়োরোপ আমেরিকার সর্বত্র ঘুরে বেড়িয়েছেন আর তাঁর দেখা মানুষদের বিচিত্রভাবে গল্পে হাজির ক'রেছেন। নিজের জীবনী তিনি লেখেন নি। কেউ লেখে তাও অপছন্দ করেন। তবে 'অব হিউম্যান বণ্ডেজ', 'কেক্‌স্ এণ্ড এল্' এবং 'দি মুন এণ্ড সিক্‌স্ পেন্স' নামে বহুপঠিত উপন্যাস তিনটিতে আছে তাঁর নিজের অনেক কথা। মনোরম এই উপন্যাস কটিতে মেলে তাঁর জীবনের বিচিত্র পরিবেশ, উপাদান ও উপকরণের কাহিনী। সে কাহিনীর সূচনা মামের কৈশোরে।

॥ ২ ॥

মামের পূর্বপুরুষেরা আয়ারল্যাণ্ড থেকে ইংল্যাণ্ডে এসে বসবাস শুরু করে, ইংল্যাণ্ড থেকে উঠে আসেন ফ্রান্সে। মামের অন্মস্থান ফ্রান্সে। ১৮৮৪ সালে তাঁর বাবার মৃত্যু পর্যন্ত কৈশোরের দশটি বছর কেটেছে এইখানে। এর আগেই তাঁর মা মারা গেছেন। মামের স্মৃতি এই পরিণত বয়সে আজও তাঁকে উন্মনা করে। প্রায়োকোন কোম্পানীতে 'অব হিউম্যান বণ্ডেজ' উপন্যাসের প্রথম খণ্ডটি পাঠ ক'রতে গিয়ে তিনি কান্নায় ভেঙে পড়েন। সেখানে আছে নায়ক ফিলিপের মাতৃবিয়োগের বর্ণনা। মায়ের অনেককাল আগের তোলা ফাপসা একটি ছবি টেবিলে রেখে দেন তিনি সব সময়।

কৈশোরের দিনগুলি মামের কেটেছে বড় আনন্দে। জন্ম থেকেই তাঁর জিহ্বার জড়তা ছিল। মনের কথা মুখে উচ্চারণ করবার অক্ষমতা ও লজ্জা তাঁকে বেদনা দিয়েছে সারাটা জীবন। নিজের এই ত্রুটি সম্বন্ধে তিনি সচেতন হলেন কেন্টে, হুইটস্টেবলে তাঁর কাকার কাছে পড়তে এসে। স্কুলে বাড়ীর লোকেরা কিংবা ছেলেবেলার খেলার সাথীরা কেউই তাঁকে এ নিয়ে ঠাট্টা তামাসা ক'রত না। কিন্তু হুইটস্টেবলের ইস্কুলের সঙ্গীরা তাঁর পিছনে লাগত। স্পর্শকাতর বালক মামের ছেড়ে দিল। কোন

রকম শারিরীক বিকৃতি মানুষকে কত নিঃসঙ্গ এবং সংশয়ী করে তোলে মাম তা' হৃদয় দিয়ে অনুভব করেন। 'অফ হিউম্যান বণ্ডেজের' নায়ক ফিলিপের পা ছিল বাঁকা। তার জীবনের নিঃসঙ্গতা ও ব্যথা মামের নিজের জীবনের কথা।

হুইটটেবলের জীবন আরো শোচনীয় হল তাঁর কাকার নির্বিচার শাসনে। এই হৃদয়হীন মানুষটিকে মাম 'অফ হিউম্যান বণ্ডেজ' এবং 'কেকস্ এণ্ড এল্' উপন্যাসে নির্মমভাবে ব্যঙ্গ করেছেন। ঘরে প্রবল শাসন, বাইরে সঙ্গী নেই—বালক মাম সমুদ্রের পাড়ে যাযাবরদের খোলামেলা জীবন দেখে বিভোর হ'য়ে যেত। কেন্টের জীবনের সাতটি বছরের যন্ত্রণার স্মৃতি তাঁর মন থেকে আজও মুছে যায় নি। বয়সের সঙ্গে পূর্ব-স্মৃতির দুঃখের ভার নেমে গেছে বটে তবে এ অধ্যায়ের চকিত ছায়াপাত ঘটেছে তাঁর কয়েকটি উপন্যাসে।

এর পরবর্তী অধ্যায়ের স্মৃতি আরো মর্মান্তিক। ক্যাণ্টারবেরী কিংস স্কুলে ভর্তি হ'য়ে মামের স্বভাব লাজুকতা ও উচ্চারণের জড়তা তাঁকে ক'রে তুলল আরো নিঃসঙ্গ। এর পরিণতি সুখের হয় নি। মাম বিশ্বাস করেন আমাদের চরিত্রের বিচিত্র উপাদানগুলি শারীরিক বৈশিষ্ট্যের উপর অনেকখানি নির্ভর করে। কিশোর জীবনের এই সংঘ-বিহীন বেদনা তাঁকে ক'রে তুলল দুর্বিনীত, সংশয়ী—সন্দিগ্ধ অনাস্থায় সব বিশ্বাসের ভিত হ'ল শিথিল।

অসুস্থতার অজুহাতে এক বছর ছুটি পেয়ে তিনি স্কুলে ফিরে এলেন। ইটালী, সুইজারল্যাণ্ডের পাহাড়ে পাহাড়ে আর রাইণ নদীর তীরে ঘুরে বেড়ালেন মুক্তির আনন্দে। ঘুরে বেড়াবার নেশা সেই থেকে তাঁকে ঘরছাড়া ক'রছে। তাঁর নায়ক ফিলিপ দেশ ভ্রমণের স্বপ্ন দেখত। নিজের জীবনেও তিনি কখনও স্থির হ'য়ে বসলেন না।

কিন্তু ইস্কুল জীবনের এই ক্ষণিক বিরতির পরম সঞ্চয় হিডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে কুনো ফিশারের বক্তৃতা শোনা। জীবনের একটি নতুন শিক্ষদর্শন হ'ল তরুণ মামের। খৃষ্টধর্ম ও চার্চ সম্বন্ধে বিশ্বাসের সব খড়িমাটি গেল ছিঁড়ে। ইংলণ্ডে ফেরবার আগেই তিনি স্থির ক'রলেন তাঁকে লেখক হ'তে হবে—পিতৃব্যের শাসন আর তিনি মানবেন না। দুর্বিনীত তরুণ ১৮৯২ সালে সেণ্টমাসের মেডিকাল স্কুলে ভর্তি হলেন। এখানে যে বাড়ীতে তিনি বাস ক'রতেন তাঁর কর্ত্রী ছিলেন খুব সহৃদয় ও সহানুভূতিশীল। তার অনেক শহুরে রসিকতা তিনি নোট বইয়ে টুকে রাখতেন। 'কেকস এণ্ড এল' উপন্যাসের এই মহিলাটিকে মাম কিছু মার্জিত চেহারা দিয়ে হাজির ক'রেছেন।

মামের শিল্পীজীবনের সূচনা এই অধ্যায়ে। পাঠ্য বই ফেলে তিনি শুরু ক'রলেন দেশী বিদেশী সাহিত্য পাঠ। গল্প রচনার শিক্ষানবিশী ছাড়াও বিচিত্র সব ঘটনা আর কথাবার্তা নোট বইয়েতে সযত্নে টুকে রাখতে লাগলেন। দ্বিতীয় বছরের শেষে আউটডোর বিভাগে ক্লার্কের কাজ পেয়ে জীবনকে দেখলেন আরো কাছ থেকে। এখানে দেখা একটি ঘটনা নিয়ে লিখলেন 'লিজা অব ল্যামবেথ্।' উপন্যাসটি তাঁকে অর্থ দেয় নি, দিল প্রত্যয়। চিকিৎসক না হ'য়ে লেখক হবার সংকল্প তাঁর আরো দৃঢ় হ'ল।

লণ্ডনের জীবন মামের শিল্প সৃষ্টিতে খুব কাজে লেগেছে। এখানে বাস ক'রে জীবনকে খোলা চোখে দেখতে পেলেন তিনি। চিকিৎসা বিদ্যার পাঠ কল্পনা-বিলাস ঘুচিয়ে তাঁকে শেখাল নিজের অভিজ্ঞতায় আস্থা রাখতে। তিনি ঠিক করলেন তাঁর লিখন ভঙ্গি হবে সহজ স্বচ্ছ এবং বাস্তবানুগ।

পরীক্ষা শেষ হ'লে মাম আবার দেশে দেশে ঘুরতে লাগলেন। স্পেন ও ইটালী ঘুরে ওদেশের চিত্রকলা দেখলেন। ফ্রান্সে ফিরে এসে সেখানকার ইম্প্রেশনিষ্ট চিত্রকলা দেখে মুগ্ধ হ'লেন। এখানকার লেখক ও চিত্রকার সমাজে মিশে তিনি পেলেন সৃষ্টির প্রেরণা। ঔপন্যাসিক হিসাবে ১৯১৪ সালে 'অফ হিউম্যান বণ্ডেজ' প্রকাশিত হবার আগে খুব খ্যাতি পেলেন না বটে তবে ১৯০৮ সালেই নাটক লিখে বেশ টাকা পয়সা পেলেন। আমেরিকায় ও ইংলণ্ডে তাঁর নাটকের চাহিদা হ'ল খুব। এই সময়ে তাঁর জীবনে এল প্রথম প্রেম—নান্। মেয়েটিকে তিনি রোজি নামে 'কেক্‌স্ এণ্ড এল' উপন্যাসে অমর ক'রে রেখে গেছেন। তবে যাকে ভালবাসলেন জীবনে তাকে পেলেন না। ১৯১৬ সালে তিনি বিয়ে ক'রলেন। সিরি নামে যে মহিলাটিকে তিনি বিয়ে করেন তার সঙ্গে ১৯২৭ সালে তাঁর ছাড়াছাড়ি হ'য়ে যায়। এই মহিলাটি মামের জীবনে অশান্তিই দিয়েছেন। তাঁর নারী-বিদ্বেষের অন্যতম কারণ দাম্পত্য জীবনের ব্যর্থতা। তবে, বিবাহ-বিচ্ছেদ লেখক জীবনে কাজেই লেগেছে। তিনি অবিরাম আমেরিকা, সাউথসি, হাওয়াই, সামোয়া, টাহিটি, বোর্ণিও, চীন, জাপান, শ্যাম—কত দেশেই না ঘুরলেন। কফাসী শিল্পী সমাজের অভিজ্ঞতা নিয়ে লিখলেন 'মিলুন এণ্ড সিকস্ পেন্‌স্।' ১৯১১ সাল থেকে ১৯৪১ সাল পর্যন্ত মাম খ্যাতি পেলেন বিস্তর। 'দি সার্কল' 'দি ট্রেডউইনাবের' মত নাটক লিখলেন,—মহাযুদ্ধের অভিজ্ঞতা নিয়ে লিখলেন 'আশেনডেন'; আর দূর প্রাচ্য—মালয়, বোর্ণিও ইত্যাদি দেশের ইংরেজ রাজকর্মচারী, আদিবাসী, চা বাগানের মালিকদের অসংখ্য চরিত্র তুলে দিলেন ছোট গল্পগুলিতে। মাম বলেন তাঁর কল্পনার ঐশ্বর্য বড় কম—তাই জীবনে অসংখ্য চরিত্রকে তিনি অবিকল যেমন দেখেছেন তেমনি গল্পে হাজির ক'রেছেন। কখন কখনও মাম লুকোবারও চেষ্টা করেন নি। এর জন্য তাঁকে ভুগতে কম হয় নি। ১৯৩৮ সালে তিনি ভারতবর্ষে আসেন। এদেশের ফকীর যোগী এবং পুরোহিতদের দেখে ভারতীয় আধ্যাত্মিকতায় তিনি কৌতূহলী হন। এদেশের পাঠকের কাছে 'দি রেজর্স এজ' উপন্যাসটির বিশেষ সমাদর এই কারণে। শেষ উপন্যাস 'ক্যাটালিনা' স্পেনের প্রতি তাঁর প্রীতির নজরানা।

এখন মাম আর গল্প উপন্যাস লেখেন না। ফ্রান্সে নিজের বাড়ী ভিলা মারেয়েতে বসে তিনি স্মৃতিকথা লিখছেন। তাঁর মৃত্যুর আগে তা' প্রকাশিত হবে না। কারণ সহজেই অনুমেয়। মামের স্পষ্ট ভাষণ তাঁর পরিচিত অনেককে বিব্রত ক'রবে এ তিনি জানেন। জীবনের উপান্তে আজও তিনি বিশ্বাস করেন জীবনের কোন অর্থ নেই—তার রহস্য খোঁজা নিষ্ফল। বেঁচে থাকাটাই বড় কথা। সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের যত উপকরণ জীবনে আসে তাকে সহজে ভোগ করবার সাধনাই জীবনে একমাত্র কাম্য। জীবন সায়াহ্নে এসে তিনি স্মৃতিরোমন্থনে পীড়িত কিন্তু অনুশোচনা নয়। বার্ধক্য তাঁকে দিয়েছে সম্মান, মানসিক স্থৈর্য। জীবনে যা যা কামনা ক'রেছেন তিনি সবই পেয়েছেন—তবুও বার্ধক্যের বলি রেখা কুঞ্চিত কপালে কি যেন একটা অশান্তি লেখা—, দৃষ্টির গভীরে আজও আছে কী এক সংশয়ের ছায়া। ব্যক্তিত্বের এই দুরূহ জটিল দিকটি অবগত পাঠককে বিব্রত করে। তাঁর নায়ক ফিলিপ জীবনের তথা মানবচরিত্রের কোন ব্যাখ্যা খুঁজে পায়নি; মাম নিজেও তা' পেলেন না। দুঃসহ নীচতা এবং শ্রদ্ধেয় মহনীয়তার অদ্ভুত মেলামেশা মানুষের চরিত্রে। একই মানুষ এক সময়ে আদর্শ, অন্য সময়ে অপাংক্তেয়। একই নারীতে থাকতে পারে ক্রূর হিংসা, গ্রাম্য অভব্যতা ও আদর্শ প্রেমিকার সদ্‌গুণ। মানুষ নিজেই অনেক সময় তার সব কাজের অর্থ খুঁজে পায় না। জীবনের শোচনীয় দুঃখ ও বিকৃতি দেখে দেখে ঈশ্বরে

বিশ্বাস খুইয়েছেন মাম। তাঁর নায়ক ফিলিপ ঈশ্বরের কাছে পায়ের বিকৃতি নিরাময় করার প্রার্থনা জানিয়ে বিফল হ'য়ে ঈশ্বরে বিশ্বাস হারিয়েছিল। কিশোর মামও নিজের জিহ্বার জড়তা সারাবার প্রার্থনা জানিয়েছেন ঈশ্বরের কাছে অনেক করে। শেষে হতাশায় ভগবানের উপর সব আস্থা হারিয়েছেন। আদর্শে তাঁর নিষ্ঠা নেই। আদর্শ নিষ্ঠা পরিণামে কপটাচরণের আশ্রয় নেয়। স্বার্থ বুদ্ধিই আদর্শের প্রেরণা। এ যে শুধু মিথ্যাচরণ তাই নয়, ক্ষতিকরও। জীবন তাঁর কাছে সহনীয় কারণ বয়সের স্বাভাবিক পরিণতি স্বভাব, প্রকৃতি এবং সামর্থ্যের কল্পন সত্ত্বেও মানিয়ে চলবার বুদ্ধি জোগায়। আজও তিনি মনে করেন কৈশোরের লাঞ্ছনা ও বাক্যস্ফুটের ত্রুটি না থাকলে তিনি অন্য রকম মানুষ হ'তেন। হয়ত এই ত্রুটিই তাঁকে কোনদিন রমণী মনোহর হ'তে দেয় নি। জীবনে একটি মাত্র প্রেমের স্মৃতি—সেখানেও তিনি আঘাত পেয়েছেন। নারী পুরুষের হৃদয়ের সম্পর্ক তাঁর কাছে বাঁধা ধরা অঙ্কের মত। তাঁর সৃষ্ট নারী চরিত্রগুলি জায়া ও জননী হিসাবে একবারে ব্যর্থ।

॥ ৩ ॥

মাম লিখেছেন বিস্তর এবং তা সব সময়েই সুখপাঠ্য হয় নি। 'দি মেরী গো রাউণ্ড' মত অপাঠ্য উপন্যাসও তিনি রচনা করেছেন। নাটকার হিসাবে তিনি মধ্যপন্থী,—লোকরঞ্জন নাটকের নাট্যকার। ইংলণ্ডের চেয়ে ফ্রান্স, আমেরিকা ও জাপানে তাঁর নাটকের আদর বেশি। তরুণ বয়সে নাটক লিখতে শুরু করেন তিনি কেবল অর্থের আশায়। তাঁর স্পষ্ট স্বীকারোক্তি আছে—'নাটক লিখেছি টাকার লোভে, সুনামের আশায়।' সাহিত্যসৃষ্টি সম্বন্ধে এই সত্য ভাষণ তাঁকে অনেকেরই বিরাগ ভাজন ক'রেছে। তবে সহজবোধ্য নাটক লিখে, লোকরঞ্জন ক'রে অর্থ উপায় করেছেন তিনি প্রচুর। তাই যখন অর্থের অভাব মিটে গেছে নাটক লেখাও বন্ধ ক'রেছেন।

ছোট গল্পের শিল্পী হিসাবে মামের শ্রেষ্ঠত্ব তর্কাতীত। চরিত্র ও ঘটনার কোনো কূট তত্ত্ব তাঁর গল্পে নেই। তাঁর গল্প পড়তে ভাল লাগে, কারণ গল্প বলতে বসে তিনি গল্পই বলেন। ঘটনাও যেমন বিচিত্র, চরিত্রও তেমনি নানা রকমের। আদিবাসী এক তরুণী ভাল বেসেছে এক শ্বেতকায় নাবিককে। প্রেমে তাদের অভিশাপ ছিল। তাই তরুণ যেদিন হঠাৎই হারিয়ে গেল তরুণী বাধ্য হ'য়ে অন্য এক শ্বেতকায় নাবিককে বিয়ে ক'রল। অনেক দিন পরে তরুণীটি যখন যুবতী এবং আকর্ষণহীন হ'য়ে পড়েছে তখন নায়কের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ। নায়ক তখন নোংরা, অপালীন বুদ্ধকায়। নায়িকার স্বামী তাকে চিনতে পারল। অবাক হ'য়ে সে ভাবতে লাগল—এই অসভ্য মানুষটিই তাকে অসুখী ক'রছে, এই অপদার্থ জীবটিকে তার স্ত্রী কি আজও ভালবাসে? মানুষের প্রেমের এ এক নিষ্ঠুর কৌতুক। (রেড) 'রেইন' গল্পটির নায়িকার আর্তনাদ—'অপদার্থ নোংরা মানুষ, যা ঘিন ঘিন করে তোমাদের দেখলে'—শূকরের মত নোংরা তোমরা! তোমরা সব, সব একরকম। মানুষ নও, শূকর, শূকর তোমরা'—নির্মম সত্যভাষণে ভয়াবহ। সমস্ত গল্পটিতে বৃষ্টির দিনের পরিবেশ—অথচ আবহাওয়ার কথা নেই কোথাও। 'ম্যাকিনটস' কিংবা 'দি আউট স্টেশন' গল্প দুটি ভিন্নধর্মী চরিত্রের বিচিত্র সংঘাতের কাহিনী। দুটি গল্পেই প্রতিদ্বন্দ্বীরা নিহত। অনুতাপে ম্যাকিনটস করেছে আত্মহত্যা, কিন্তু ওয়ারবর্টন নির্দ্বিধ বোধ ক'রেছে।

অগণিত ছোট গল্প লিখেছেন ব্যাস—বিচিত্র সব পরিবেশ, অদ্ভুত সব চরিত্র। কিন্তু সবগুলই ঘটেছে লেখকের জীবন বোধের পরশকায়—প্রেমে অশ্রদ্ধা, ঈশ্বরে অভক্তি, আদর্শনিষ্ঠায় ব্যঙ্গ কৌতুক। অপ্রাসঙ্গিক বিষয়কে গল্প থেকে নির্বাসন দিয়েছেন তিনি। স্পষ্ট সহজ এই গল্পগুলি সাধারণ পাঠকের একান্ত প্রিয়। জনপ্রিয়তা সাহিত্যের উৎকর্ষের মান নয়। ব্যাস নিজেও জানেন সবাইকে সন্তুষ্ট করা তাঁর পক্ষে কঠিন। বিদগ্ধ রসিকজনকে তিনি সন্তুষ্ট ক'রতে পারেননি সব সময়—তবুও পাঠকের অভাব হয়নি কোনদিনই।

এখনও প্রতিদিন সকালেই তিনি লিখে যান। কুড়িখানার উপর উপন্যাস, ত্রিশটির বেশী নাটক, প্রচুর কাহিনী, কয়েকখণ্ড বিবিধ আলোচনা, পনেরটি জার্নাল—এমনি অগণিত রচনা শেষে আজও তিনি লিখে চলেছেন: প্রিয় দশজন ঔপন্যাসিক ও তাঁদের দশটি উপন্যাস নিয়ে তিনি অপূর্ব একটি আলোচনা লিখেছেন। ঔপন্যাসিকদের অনেক ছোটখাট কাহিনীর সঙ্গে তাঁদের রচনার অন্তরঙ্গ সম্পর্ক দেখিয়ে তিনি ব'লেছেন যে লেখকের জীবনের অনেক গোপন কাহিনী জানা থাকলে তাঁর শিল্প-কর্ম বোঝা আরো সহজ হয়। কিন্তু তাঁর জীবনী কেউ লেখে এ তিনি চান না। তবুও তাঁর জীবন সম্বন্ধে পাঠকের কৌতূহল অপরিসীম। বার্ধক্যের পরিণত দৃষ্টিতে নিজের জীবনের কথা তিনি লিখেছেন। তাঁর মৃত্যুর পর ওয়ারিশেরা যদি বিবেচনা করেন তবে তা প্রকাশিত হবে। খুব কাছাকাছি লেখেও যে দূরত্ব তিনি রেখেছেন একদিন তা' হয়ত আর থাকবে না। অন্যের জবানীতে নয়। নিজেই ব্যাস একদিন নিজের রহস্য খুলে ধরবেন। নতুন ক'রে তাঁর কথা ভাবতে তখন—হয়ত তাঁর সমসাময়িক অনেকেরই কথা নতুন ক'রে ভাবতে হবে—কেননা সত্যভাষণে তাঁর নিষ্ঠা অবিচল।

আমরা সাগ্রহে তাঁর আত্মজীবনী প্রকাশের অপেক্ষায় রয়েছি।

* * * *

গাছ যতদিন চারা থাকে বেড়া দিতে হয়। না হলে ছাগল গরু খেয়ে ফেলবে। গাছের গুঁড়ি মোটা হ'লে বেড়ার দরকার নেই। তখন হাতী বেঁধে দিলেও গাছ ভাঙবে না। গুঁড়ি যদি করে নিতে পারো, আর ভাবনা কি, ভয় কি? বিবেক লাভ করবার চেষ্টা কর আগে। তেল মেখে কাঁঠাল ভাঙ, হাতে আঠা জড়াবে না।

—রামকৃষ্ণ পরমহংস

সাহিত্য ও সাহিত্যিক

মেকলে যেমন বই ভালোবাসতেন এমন খুব কমই দেখা যায়। একটা চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন: "কেউ যদি বলে পৃথিবীর সব চেয়ে বড়ো রাজা ক'রে দেবো তোমাকে, সারে অনেক প্রাসাদ, সুন্দর সুন্দর বাগান, চমৎকার সব খাবার, মদ, বিদ্বান, জমকালো পোশাক কিন্তু একটা শর্তে—বই পড়তে পারবেনা—তাহ'লে আমি রাজা হতে মোটেই রাজী হবো না। তার চেয়ে বরং নিতান্ত গরীব অবস্থায় চিলে কোঠায় থাকবো যদি সেখানে থাকে বই, অজস্র বই।"

চিঠিতে একটুও বাড়িয়ে লেখেননি মেকলে। তিন বছর বয়সে যেই যে প্রথম পড়তে শিখলেন সেই সময় থেকে বই-ই হল তাঁর সব সময়ের সঙ্গী। গ্রীক, লাতিন, ফরাসী, আরেমায়, ওলন্দাজ, স্পেনীয় আর ইতালীয় ভাষা আয়ত্ত করার ফলে সাহিত্যের বিশাল প্রাসাদের অনেকগুলি দরজা খুলে যায় তাঁর চোখের সামনে। গণিত ছাড়া আর সব বিষয়েই তাঁর বুৎপত্তি জন্মেছিল। সকাল, সন্ধ্যা, নিশুতি রাত—সব সময়েই তাঁর হাতে থাকত একখানা বই। দিন রাত চব্বিশ ঘণ্টাই যেন ছিল তাঁর পড়ার সময়। বিছানায় যখন শুয়ে থাকতেন কিংবা বাইরে বেরুতেন তখনো থাকতেন না বই ছাড়া। ঐতিহাসিক ট্রিভেলিয়ন মন্তব্য ক'রেছেন যে ব্যাপারে তিনি সবচেয়ে সিদ্ধি লাভ ক'রেছিলেন তাহল জনাকীর্ণ পথে যেতে যেতেও চোখ দুটো বইয়ের ওপর রেখে চলার অভ্যাস। মেকলের বন্ধু সিডনী তো ব'লেই ফেলেছেন যে তাঁকেই মনে হত 'পাজামা পরা একখানা বই।'

নানা বিষয়ে ব্যাপক জ্ঞান আর তীক্ষ্ণ স্মৃতি শক্তি থাকার ফলে মেকলে বক্তা হিসাবে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রেছিলেন। বলবার মতো বিষয়ের অভাব তাঁর কখনোই হত না। আর যে বিষয়ে বলতেন তাঁর জ্ঞান ছিল পাকা-পোক্ত, একেবারে নিখুঁত।

• • • •

আলেকজাণ্ডার ডুমা এত জনপ্রিয় ছিলেন আর তাঁর বইয়ের এমন চাহিদাই ছিল যে তিনি বেশ ক'য়েকজন সহকারী লেখক নিযুক্ত করতে বাধ্য হয়েছিলেন। তখনকার দিনের লেখকেরা হামেশাই এ কাণ্ড করতেন। ডুমার সহকারী লেখকেরা চালাতেন গবেষণার কাজ, বের ক'রে আনতেন গল্পের প্লট, এমন কি এরা পরিচ্ছেদগুলো পর্যন্ত লিখে দিতেন। লেখা হ'য়ে যাওয়ার পর ডুমা সেই বই আগাগোড়া প'ড়ে দরকার মতো এখানে ওখানে একটু বদলে, গল্প আর চরিত্র গুলির অমল বদল করে বইখানিকে ক'রে তুলতেন আকর্ষণীয়, গল্পের মধ্যে নিয়ে আসতেন গতি যার জন্য তাঁর লেখা ও-রকম জনপ্রিয় হ'য়ে উঠেছিল। তাঁর সহকারী লেখকদের নাম কিন্তু বইয়ের কোথাও থাকতনা। তখনকার দিনের রেওয়াজই ছিল এই। বই লিখে প্রচুর পয়সা ক'রেছিলেন ডুমা। কিন্তু যা আয় করতেন তার চেয়ে ব্যয় করতেন অনেক বেশি। যখন মারা যান তখন তো তাঁর কপর্দকহীন অবস্থা।

• • •

১৮৪১ সালের সকাল বেলা। নিউইয়র্ক বন্দরের জেটি সিক্ত সিক্ত করছে। এই জাহাজটির জন্যই এদের এই অধীর অপেক্ষা। তখনকার জাহাজই নিয়ে আসত বাইরের জগৎ থেকে শেষ খবর খবর। ইংল্যাণ্ড থেকে জাহাজটা আসতেই জেটি থেকে সেই লোকগুলো চিৎকার ক'রে জিজ্ঞেস করল।

"ছোট্ট নেল কি মারা গেছে?" ছোট নেল আসলে কিন্তু এক গল্পের শিশু নায়িকা। গল্পটা তখন বেরুচ্ছিল ধারাবাহিক ভাবে আর তার শেষ কিস্তি ছিল সেই জাহাজে। গল্পটা কী দাঁড়িয়েছে জানার জন্য পাঠকেরা এত ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল যে জাহাজ বন্দরে নোঙর করবার তর সইছিল না।

যে লেখক পাঠকদের মন এভাবে কেড়ে নিয়েছিলেন তিনি বিখ্যাত সাহিত্যিক চার্লস ডিকেন্স। তাঁর বয়েস তখন মাত্র উনত্রিশ। আর যে গল্প ধারাবাহিকভাবে বেরুচ্ছিল তার নাম 'ওল্ড কিউরিসিটি শপ'।

সাহিত্য-সংবাদ

মার্কিন মুলুকের কবি পল এঙ্গল। আমাদের দেশে, বলতে গেলে, প্রায় অপরিচিত। হাইস্কুলে যখন পড়তেন তখন থেকেই কবিতা লিখতে শুরু করেন। এ পর্যন্ত তাঁর আটখানা কবিতার বই, একখানা উপন্যাস, আর একটি স্মৃতি-কথা প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৬৩ সালে এই মার্কিন কবি আমাদের দেশেও এসেছিলেন। এশিয়ার অন্যান্য দেশেও পর্যটন করেছিলেন তখন। বিগত প্রায় ছাব্বিশ বছর ধরে তিনি একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে জড়িত আছেন। বর্তমানে তিনি ওই বিশ্ব-বিদ্যালয়েরই 'লেখক-কারখানা'র পরিচালক। কী ক'রে সৃষ্টিশীল লেখার কৌশল আয়ত্ত করতে হয় তা শেখানোই এই 'কারখানা'র উদ্দেশ্য। এই অভিনব সংস্থাটি এমনিই কৌতূহলের সঞ্চার করেছে যে পৃথিবীর দূর প্রান্তের সব দেশ থেকেও তরুণ লেখকেরা আসেন এখানে। 'কবি পল এঙ্গল—এর এশিয়া ভ্রমণের অন্যতম উদ্দেশ্যও ছিল প্রাচ্যের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রতিভাবান তরুণ লেখকদের খুঁজে বের করা। তিনি চাচ্ছিলেন তাঁরা লেখক-কারখানা'র সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করুন।

য়ুরোপ থেকে আগত অনেকের মতো পল এঙ্গলও ভারতবর্ষে এসে আগ্রায় গিয়েছিলেন তাজ দেখতে। দেখে ফিরে পদ্যও লিখে ফেলেছেন তাজমহলের ওপর। সাধারণত এই সব পদ্যকে আমরা একটু কৃপার চোখেই দেখি। কিন্তু পল এঙ্গলের কবিতাটির বৈশিষ্ট্য এর উচ্ছ্বাসহীনতা। লম্বা ভাবালুতাকে প্রশ্রয় না দিয়ে, নতুন চোখে দেখে তিনি কলম নিয়ে বসেছেন। সংযতবাক এই কবির শান্ত চিন্তা স্বাভাবিক ভাবেই আমাদের আকর্ষণ করে। কবিতাটির একটি অংশে আছে :

"সপ্তদশ শতাব্দীতে যখন মেয়েরা
সকলের বস্ত্র ছিল ধার, মণি-মুক্তোর মতোই
সে কালেও নিঃসন্দেহে ছিলেন অনন্যা নারী তিনি
তাই তো মৃত্যুর পরে পেয়েছেন সঞ্চিত প্রেমের উপহার।"

প্রেমেন্দ্র মিত্র

স্মৃতি দোলায়

চম্পার নিমন্ত্রণটা আন্তরিক ছিল কি না জানি না; কিন্তু পূজা দেখতে আসব বলে কথা দিয়েছিলাম। নিজের নির্বুদ্ধিতায় সময়মত এসে না পৌঁছোতে পারার জন্যে একটু দুশ্চিন্তাবোধ করলাম।

তবে চম্পা হয়ত নিজের পূজার তন্ময়তায় আমার অনুপস্থিতি লক্ষই করেনি কিংবা তাইতেই খুশি হয়েছে হয়ত।

মন্দিরের দরজায় গিয়ে এবার দাঁড়ালাম।

এই ছোট মন্দিরের পক্ষে খুব ঘটা করে পূজোই বটে। বহু ঘৃতের প্রদীপ ভেতরে জ্বলছে, তবু ধোঁয়াটে ও ধূপের ধোঁয়ায় সমস্ত মন্দির প্রায় আচ্ছন্ন। তারই মধ্য থেকে বলিষ্ঠ উচ্চকণ্ঠে যাঁদের মন্ত্রোচ্চারণের ধ্বনি প্রতিধ্বনি শোনা যাচ্ছে তাঁদেরই ভালো করে দেখা যাচ্ছে না।

নির্জন মন্দিরের বিশেষ পূজানুষ্ঠান। সংশ্লিষ্ট পুরোহিত তন্ত্রধারক ইত্যাদি ছাড়া বাইরের কেউ আসে নি। হয়ত আসা নিষিদ্ধ হয়েছে। কিন্তু চম্পা নিজে এ পূজা স্থানে নেই কেন? ভালো করে লক্ষ করেও তাকে মন্দিরের মধ্যে কোথাও দেখতে পেলাম না।

মন্দিরের দরজা থেকে একটু বিস্মিত কৌতূহল নিয়েই তারপর বাইরে একটু দূরে গিয়ে দাঁড়ালাম।

রাত বাড়ার সঙ্গে বেশ একটু ঠাণ্ডা পড়তে সুরু করেছে। যা পরে বেরিয়েছিলাম এখনও পর্যন্ত শীত নিবারণের পক্ষে তা যথেষ্ট। কিন্তু এই পোষাকে বেশী রাত পর্যন্ত বাইরে থাকা বেশ কষ্টকর হবে। সে অসুবিধা এড়িয়ে তখনই অবশ্য বাসায় ফিরে যেতে পারতাম। কিন্তু চম্পার সঙ্গে দেখা হবার আগে চলে যেতে কিছুতেই মন চাইল না। আমায় নিমন্ত্রণ জানিয়ে নিজের মানত করা পূজোয় সে নিজে আসে নি এমন কি কখনো হতে পারে!

কিন্তু এই মন্দিরের কাছাকাছি ছাড়া সে যাবেই বা কোথায়?

উত্তরটা প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পেলাম। যে পথে সকাল বেলা মন্দিরের পূজারীকে নদী থেকে আসতে দেখেছিলাম সেই পথে কে যেন আসছে!

কাছে আসতে চম্পা বলে বুঝতে পারলাম।

অন্ধকারে চম্পা আমায় লক্ষ্য করে নি। মন্দিরের দিকেই এগিয়ে যাচ্ছিল।

মৃদু স্বরে ডাকলাম, শুনছেন!

চম্পা অতখানি চমকে সভয়ে ফিরে দাঁড়াবে ভাবতে পারিনি।

কে? চম্পার অস্ফুট স্বর একটু আতঙ্ক বিহ্বল মনে হওয়া হয়ত আমার শোনার ভুল।

এক পা এগিয়ে দাঁড়াবার পর চিনতে পেরে একটু অপ্রস্তুতভাবে হেসে চম্পা বললে,—ও আপনি! এতক্ষণে এলেন?

চম্পার অস্বস্তির ভাবটা তখনও কাটে নি। আপনিও ত' এখন আসছেন!—বলতে গিয়ে তাই কথাটা অন্যভাবে ঘুরিয়ে সাজালাম। বললাম,—না এসেছি অনেক আগেই। নদীর চড়া দিয়ে

খানিকটা দূর বেড়িয়ে আসতে গিয়ে বিপদে পড়েছিলাম। অন্ধকারে ফিরে আসতে বেশ অসুবিধে হয়েছে। দেরী হয়ে গেল তাই। এসে আবার আপনাকে দেখতে না পেয়ে ভাবছিলাম। আপনারও ত বেশ দেরী হল আসতে!

ঘুরিয়ে বলার ফলে আসল প্রশ্নটা সহজ করতে পারলাম কি না জানি না। কিন্তু চম্পা সে দিকটা এড়িয়ে সম্পূর্ণ অন্য কথায় চলে গেল।

আপনি নদীর চড়া দিয়ে এলেন!

কথাটা প্রশ্ন হিসাবে বলা না নিছক বিস্ময় প্রকাশ বলার ধরণে ঠিক বোঝা গেল না। শুধু মনে হ'ল কথাটা যেন অসম্পূর্ণ।

মনে মনে একটু বিস্মিত হলেও বাইরে তা প্রকাশ না করে বললাম,—হ্যাঁ, তাই জন্যেই ত দেরী হয়ে গেল! আজ যে অমাবস্যা সে কথা মনে থাকলে অমন ভুল করতাম না। কিন্তু আপনিও ত উল্টো পথে এলেন! এত দেরীই বা কেন?

আমার প্রশ্ন এবার একটু অতর্কিতেই সরল ও স্পষ্ট। চম্পাকে কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকতে দেখে বোধও সে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করবে বলে সন্দেহ হল। কিন্তু তা সে গেল না।

একটু যেন অতিরিক্ত শান্ত স্থির স্বরে বললে,—দেরী আমার হয়নি। পূজার কাজ সুরু করিয়ে দিয়ে আমি একটু নদীর ধারে গেছলাম।

যে প্রশ্ন এর পর স্বাভাবিক তা করতে গিয়েও নিজেকে সংবরণ করলাম।

কিন্তু আমার নীরবতা যেন নিজে থেকেই ঠিকমত ব্যাখ্যা করে নিয়ে চম্পা এবার একটু হেসে উঠে বললে,—ভাবছেন কি বেয়াড়া দুঃসাহস! কিন্তু এখানে ভয়ের কিছু আছে বলে ত আমি না। তাছাড়া—

একটু থেমে সম্পূর্ণ ভিন্ন স্বরে চম্পা বলল,—তা ছাড়া ভূত প্রেত মানুষ সব কিছুর ভয় বোধহয় আমি কাটিয়ে উঠেছি।

এক হিসেবে অর্থহীন অবান্তর কথা। প্রায় কিশোরী একটি মেয়ের মুখে বেশ বেমানানও শোনায়।

কিন্তু মন্দির প্রাঙ্গণের সেই অনতিদূরের মন্ত্রধ্বনি মুখর অন্ধকারে কথাগুলো কোন গূঢ় দুর্বোধ ইঙ্গিতে শঙ্কিত বলে মনে হল।

বলবার কিছু না পেয়ে একটু অস্বস্তির সঙ্গে চুপ করে রইলাম।

চম্পাই নিজে থেকে আবার বললে,—চলুন। পুজো দেখবেন না! শেষ পর্যন্ত থাকবেন ত?

শেষ পর্যন্ত মানে ত' সারা রাত.—এবার একটু হেসে সহজ সুরেই বলবার চেষ্টা করলাম,—না সারারাত ত নয়ই, এখনো আর থাকবার ইচ্ছে নেই। এ সব ব্যাপারে আমি ঠিক উৎসাহ পাই না। শুধু আপনার সঙ্গে দেখার জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম।

ও:!—একটু যেন ক্ষুণ্ণ স্বরেই বলে চম্পা খানিক চুপ করে রইল। তারপর হঠাৎ বলে উঠল,—চলুন তাহলে আপনাকে এগিয়ে দিই।

আমাকে এগিয়ে দেবেন আপনি!—সবিস্ময়ে না হেসে পারলাম না।

না, না, আপনাকে সাহস দিতে নয়।—চম্পাও হাসল,—শুধু সঙ্গে যেতে যেতে দুটো কথা বলতে। আপনার সঙ্গে ভালো করে একটু আলাপও করা হয়নি।

সুযোগ ছিল না বোধহয়।—যেতে যেতে একটু খোঁচা দিয়েই বললাম।

বিদ্রূপ করবেন না।—চম্পা একটু গম্ভীর হ'ল,—শুধু সময় থাকাটাই সুযোগ নয়!

ঠিক বুঝতে পারলাম না। কিন্তু সে কথা থাক!—একটু চিন্তিত ভাবেই জিজ্ঞাসা করলাম,—আপনি কি সারারাত এখানে থাকবেন নাকি?

থাকবার দরকার কিছু নেই। কিন্তু থাকলে দোষ কি!

না, দোষের কথা বলছি না।—নিজের উদ্বেগটা এবার প্রকাশ করলাম। কিন্তু নিখিলকে একলা ফেলে সারারাত এখানে থাকাটা কি আপনার ঠিক হবে!

একলা কেন? চম্পা হাসল,—আপনি ত আছেন! দরকার হলে দেখতে পারবেন না বন্ধুকে!

আমি!—আমার অসহায় বিমূঢ়তাটা গলার স্বরে গোপন রইল না।

হ্যাঁ, আপনি! চম্পার গলা হঠাৎ যেন কঠিন—যে বন্ধু আপনাকেই একমাত্র বিশ্বাসের পাত্র মনে করে ডাকিয়ে আনিয়েছে। তার জীবনের রহস্যটুকু শুধু জেনে নিতে ছুটে এসেছেন! আলসোচে শুধু সেইটুকু আদায় করে পালিয়ে যেতে চান, তার সামান্য একটু দায় নিতেও আপত্তি!

স্তম্ভিত নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম।

তার পরের মুহূর্তে চম্পা যা করে বসল তা কল্পনাতীত।

হঠাৎ আমার একটা হাত সজোরে চেপে ধরে তীব্র ব্যাকুল স্বরে বললে,—বন্ধুকে সত্যি আপনি ভালবাসেন? সত্যি তাকে বাঁচাতে চান! বলুন! বলুন!

বিমূঢ়ভাবে শুধু বলতে পারলাম,—কি তুমি বলছ চম্পা!

যা বলছি ভালো করে শুনুন,—আবেগে উত্তেজনায় গলার স্বরের সঙ্গে চম্পার সমস্ত শরীর কাঁপছে অনুভব করলাম,—বন্ধুকে যদি বাঁচাতে চান তাহলে আজই এখনই বাসায় ফিরে গিয়ে তাকে নিয়ে কোথাও চলে যান। যতদূরে সম্ভব,—এমন জায়গায় যার খোঁজ কেউ পাবে না। সমস্ত রাত আপনার হাতে আছে, তবু একমুহূর্ত বিলম্ব করবেন না। দুখনরাম বাড়িতেই আছে। তাকে দিয়ে টাকা ভাঙিয়ে শুধু যেটুকু যা না নিলে নয় তাই নিয়ে ষ্টেশনে চলে যান। কিংবা হাজিপুরে। তার পর সেখান থেকে…

তুমি কি পাগল হয়ে গেছ চম্পা! ধীরে ধীরে তাকে একটু সরিয়ে দিয়ে বললাম,—যা তুমি বলছ তার কোন মানে হয়?

হয়। হয়। সে মানে এখন বুঝতে পারবেন না। জানতেও চাইবেন না। শুধু দোহাই আপনার যা বলছি তাই করুন। না করলে হয়ত সর্বনাশ আর ঠেকানো যাবে না।

এ উন্মত্ত উচ্ছ্বাসকে শান্ত করার জন্যে স্নিগ্ধ স্বরেই যুক্তি দিয়ে বোঝাবার চেষ্টায় বললাম,—কিন্তু নিখিল আমার কথায় এমন পালানিতে রাজি হবে কেন? আর তুমি, তুমি কোথায় যাবে!

আপনার বন্ধু রাজি হবেন। আমি জানি আপনি জোর করে বললেই হবেন! আর আমার জন্যে ভাববার দরকার নেই। সে ভাবনা আমার ওপরই ছেড়ে দিয়ে যান।

না কিছুই ছেড়ে দেব না। এবার কঠিন স্বরেই বললাম, খানিক আগে যার জন্যে আমায় বিদ্রূপ করেছ সেই রহস্যই আমি আগে সম্পূর্ণ ভাবে জানতে চাই।

সব কিছু জানাতে আমি এখন প্রস্তুত। চম্পার স্বর এবার যেন ক্লান্ত। কিন্তু বিশ্বাস করুন এখন তার আর সময় নেই।

—তোমার যদি সময় না থাকে তাহলে অন্ধ হয়ে তোমাদের পালানির খেয়াল মেটাতে আমিও প্রস্তুত নই। আরো কিছু বলতে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ দূরে একটা দোলানো লণ্ঠনের আলোয় বিন্দু দেখে থেমে গেলাম। [ক্রমশঃ

বাতাসের কান্না

রেখা বসুয়া

মাঝের সিঁড়ি কটা এক নিমেষে দাওয়ায় উঠে নেমে আসে তনিমা, তারপর রান্নাঘরের সামনে গিয়ে ডাকে, মা—

আলুপটল দিয়ে রাত্রের ডালনা কুটে দিচ্ছিলেন সর্বাণী, মেয়ের ডাকে চোখ তুলে চাইলেন। চোখে পড়ল প্রকাণ্ড একটা খোঁপা।

—কেমন দেখাচ্ছে মা, মস্তবড় হয়েছে না? হাসি মুখে ঘুরে দাঁড়ায় তনিমা।

—ছাই, মায়ের আগেই উত্তর আসে পিসিমার কাছ থেকে, নিজের মাথায় চুল নেই তাই অন্যের চুলের ওপর মা তার চুল এনে খোঁপার বাহার করা—কি প্রবৃত্তি বাপু তোদের বলিহারী যাই।

—অমন করে বলছ কেন ঠাকুরঝি, মা বলেন, আজ কাল কে আর না করছে, আর তাছাড়া আমাদের সময়েই কি ছিল না? তোমার উঠে যাওয়া চুলে তুমি বিনুনী করে রাখতে তাই দিয়ে চাটুজ্জেদের বিমলা আর কমলার সে কাড়াকাড়ি ভুলে গেছ?

অতীতের উল্লেখে মনটা একটু প্রসন্ন হয়ে ওঠে পিসিমার তাই নরম সুরে বলেন, সে কথা আলাদা বৌ, সে ছিল জানাশোনার মধ্যে। এ কি জাত না কি জাতের মেয়ে কে জানে মোছলমান খৃষ্টান হতেই বা বাধা কি?

—সে সব জানবার উপায় থাকলে না হয় ঠিকুজী কুষ্টি সব মিলিয়েই কিনে আনতাম পিসিমা, রাগত সুরে বলে তনিমা, কিন্তু তার ত' উপায় নেই। বলত গোবর আর গঙ্গাজলে না হয় ধুয়ে নিই চুলটা।

—আঃ কি হচ্ছে তনু, মা বলেন, এসে থেকেই ত' চুলপর্ব চলছে—চা-টা খাবি না কি? যা হাত মুখ ধুয়ে আয়।

তনিমার অবশ্য দোষ দেওয়া যায় না রাগ করলে। ছোটবেলা থেকেই বেচারীর সখ বড় খোঁপা বাঁধবার। যখন ক্লাস সেভেন তখন সবাই ঘুমোলে মাথার গামছা দিয়ে মস্তবড় খোঁপা করত তার পর সারা দুপুর আয়নার সামনে ঘুরে ফিরে দেখত কেমন দেখাচ্ছে ওকে। গামছার খুপে ওর মনে সামান্যও জ্ঞান জন্মায়নি তাই কেবলমাত্র আয়তনটাই ওকে খুশী করত। কিন্তু যখন সত্যিই খোঁপা বাঁধার সময় এলো তখন ঝাঁকিটাকে সত্যের রূপ দিতে চাইল ও। বন্ধুদের দেখাদেখি নাইলনের চুল কিনল তনিমা। কিন্তু তাও বেশিদিন চলল না। জিনিসগুলো একদম টেকে না। সৃষ্টি হল নতুন সমস্যার। রোজ কলেজে যাবার আগে চুল বাঁধতে গিয়ে যেন কান্না পেত ওর।—আচ্ছা মা, চুলটা ছেঁটে ফেললে কি খারাপ দেখাবে? এই রেড় আঙুল বিনুনী কি যে লজ্জা করে আমার।

—তোর যত সব পাগলামী, আজকাল কারই বা লম্বা চুল। আমার ত' বাপু বেশ লাগে দু বিনুনী করলে, মা সান্ত্বনা দেন।

—হাই—ঠোঁট ওল্টায় তনিমা।

কিন্তু সমাধানটা হয়ে গেল হঠাৎই। ক্লাসের মেয়েদের মধ্যে উমা সেনগুপ্তার সঙ্গে বেশ ভাব হয়েছিল তনিমার। অবাঙালী বলে বড় একা পড়েছিল উমা। তনিমা সেচে ভাব করায় ও যেন কৃতার্থ হয়ে গেল। বিরাট বড়লোকের মেয়ে ও কিন্তু অহঙ্কার একেবারে নেই। ক'দিনেই তনিমার সঙ্গে খুব ভাব হয়ে গেল ওর। সেই উমাই একদিন কলেজে নিয়ে এলো এক গোছা চুল—মানুষের চুল, যেগুলো গুছি করে বম্বের ওদিকে খুব বিক্রি হয়। তনিমা জানত এগুলোর দাম অনেক কিন্তু উমা কিছুতেই দাম নিল না। তনিমার চুলের দুঃখের কথা ও জানত তাই ওর এক কাজিনকে দিয়ে আনিয়েছে বম্বে থেকে। চুল পেয়ে আনন্দে আটখানা হল তনিমা। বাড়ী এসেই বসল চুল বাঁধতে তারপর এক দৌড়ে বাথরুমের দরজায়।

শোবার আগে আয়নার সামনে আবার গিয়ে দাঁড়ায় তনিমা। পিসিমার ওপর রাগও ভুলে যায় সঙ্গে সঙ্গে। কি সুন্দর দেখাচ্ছে মস্ত বড় খোঁপা বেঁধে। চুলের রংটাও বেশ কালো, ওর চুলের সঙ্গে মিশে গেছে। সত্যি যদি এমন সুন্দর চুল থাকত ওর। একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে, যার সত্যিকারের চুল ছিল তাকে না জানি কি সুন্দর দেখাত। অনেক চুল না থাকলে কি আর চুল কাটে কোন মেয়ে। পিসিমা নাকি বিয়ের পর শ্বশুরবাড়ী গিয়ে নিজে নিজে চুলের জট ছাড়াতে না পেরে লুকিয়ে জট ধরা চুলের গোছা কেটে ফেলেছিলেন। হায়রে সে চুলের কিছুও যদি তনিমা পেত।

বড় আলোটা নিভিয়ে মৃদু নীল আলোটা জ্বেলে দেয় তনিমা। বইখাতাগুলো পায়ের কাছে গুটিয়ে রেখে শুয়ে পড়ে ও। সারাদিন অসহ্য গরমের পর একটু হাওয়া বইতে আরম্ভ করেছে। বোধহয় ঝড় উঠবে। মস্তবড় খোঁপাটার জন্যে শুয়ে অস্বস্তি লাগে ওর। ঘাড়টা একটু উঁচু করে কাঁটা কটা খুলে বিনুনীটাকে এলিয়ে দেয় তনিমা। সামনের দেয়ালে একটা ক্যালেণ্ডার। একমাথা চুল এলিয়ে মোহময় ভঙ্গীতে চেয়ে আছে একটি মেয়ে। চুলের ভারে মুখের অর্ধেকটা ঢেকে গেছে। হাওয়ায় ক্যালেণ্ডারটা দুলতে থাকে তারপর এক সময় দমকা হাওয়া এসে উল্টে দেয় ওটাকে। ইস্ ঘুরে গেল বুঝি ছবিটা—তনিমা উঠে সোজা করে দেয় ছবিটাকে। ভারী সুন্দর চেহারা কিন্তু মেয়েটার। সত্যি কোন্ দেশের মেয়ে কে জানে।

চোখটা জড়িয়ে এসেছিল কিন্তু খানে তন্দ্রা ছুটে যায় তনিমার। ছবিটা আবার উল্টে গেছে, জোরে ঝড় এসেছে বাইরে। উঠে জানলা বন্ধ করে ছবিটা সোজা করে দিয়ে আবার এসে শোয় তনিমা। ঘুমে চোখ মেলতে পারছে না ও।

লাল সবুজে বড় বড় চেক কাটা স্কার্ট আর হলুদ রং-এর ব্লাউজে ভারী সুন্দর মানিয়েছে মেয়েটিকে। ওর সরু কোমর জড়িয়ে ধরে বলছে যে তার বয়সটা যেন ওর অনুপাতে একটু বেশীই। ছিপছিপে তন্বী, গায়ের রং উজ্জ্বল গৌর। পেছন থেকে মোটা ঠাস বুননী লম্বা বেণীটাই সবার আগে চোখে পড়ে? বেণীটা দেখলে মনে হয় স্কার্টের চেয়ে সাড়ীতেই যেন ওকে বেশী মানাবে। পুরুষটির রং-ও কর্সা চুল কটা আর চিবুকে সামান্য একটু দাড়ি। চোখের দৃষ্টি তীব্র আর কিছুটা সম্মোহনী। হাসলে একপাশের দাঁতটা চোখে পড়ে—অস্বাভাবিক তীক্ষ্ণ আর কিছুটা লম্বা। মেয়েটির হাতটা টেনে নিয়ে সীটের ওপর মস্তবড় একটা সবুজ পাথর বসানো আংটি পরিয়ে দেয় পুরুষটি তার পর হাতখানা আলতো করে তুলে ধরে ঠোঁটের কাছে।

—লিলিয়ান, ওর ঘনঘনে গলার স্বর শোনা যায়।

—এরিক—ওর হাতের ওপর গাল রেখে চোখ বোজে মেয়েটি। চোখের কালো দীর্ঘ পাতার ছায়া পড়ে গালে। সুগঠিত সুন্দর নাকের পাশ আর ঠোঁটের কোণ কাঁপতে থাকে আবেগে।

—তুমি যেখানে নিয়ে যাবে সেখানেই আমি সুখে থাকব এরিক

—তবে কালই চলে এসো, কেন আর দূরে থাকবে। তোমার সহনা আর কিছু টাকা যদি আনো—তাহলে যাবার অগাধ টাকা তুমি বুদ্ধিমতী, কোন সুযোগ করে—আমরা ঘর বাঁধব লিলি—কথা শেষ করে না এরিক হোসুয়া। ঘন ঈক সান্নিধ্য, রোমাঞ্চকর কটি মুহূর্ত। ওরা বিদায় নেয় পরস্পরের কাছ থেকে। আবার দেখা হবে।

ভারী সুন্দর স্বপ্ন তনিমার।

রঙের বাইস্কোপ অকল। ইন্দ্রজালের।

আবার দেখা যায় লিলিয়ানকে। লালপাথর বসানো লম্বা ইয়ারিং কানে, পরনে জোলাপী জর্জেট সাড়ী। সাড়ীর রং-এর ছোপ বুঝি গালেও লেগেছে। ঠোঁটের ভাঁজে সুখের ছাপ। ঘর বেঁধেছে ওরা। এরিক বাড়ী ফিরছে সন্ধ্যাবেলা। জানলায় দাঁড়িয়ে ওরই প্রতীক্ষা করছিল লিলিয়ান। কিন্তু মুখে খুসীর আলোটা কি একটু ম্লান হয়ে গেল হঠাৎ? সঙ্গে আবার কাকে নিয়ে আসছে এরিক এই সন্ধ্যেবেলা। দরজা খুলে দিয়ে সরে দাঁড়ায় লিলিয়ান। কিন্তু সরে থাকা হয় না। ওর ডাক পড়ে বসবার ছোট ঘরটায়। চ্যাপটা একটা ষোতল টেবিলে রেখে দুটো গ্লাস চায় এরিক। একটু অবাক হয় লিলিয়ান। বাড়ীতে আবার এসব কেন। বাবার কাছ থেকে আনা টাকা ত' আগেই ফুরিয়েছে, দুএকখানা করে সহনা বেচে দিন চলছে এখন কি এসব করার সময়। ও আশা করছিল শীগগীরই কোন একটা কাজ জুটিয়ে নেবে এরিক। খুব বুদ্ধিমান ও।

কিন্তু একি, লিলিয়ানের মুখ অমন সাদা দেখাচ্ছে কেন? ওর স্বামী গেল কোথায় ওকে ফেলে? ও লোকটা এ ঘরে কেন? পা টলছে তবু এগিয়ে আসছে লোকটা। দরজাটাই বা বাইরে থেকে বন্ধ করল কে?

এ কি অদ্ভুত স্বপ্ন তনিমার!

লিলিয়ানের জোলাপী গাল কেমন ফ্যাকাশে হয়ে গেছে চোখের কোলে কালির ছোপ পড়েছে। মনে হয় যেন রাত জেগে জেগেই এমন হয়েছে ও। একটু আগেই ত' টলতে টলতে বেরিয়ে গেল খুসি পরা একটা লোক, এরই মধ্যে আবার কাকে নিয়ে এল এরিক। উঃ এরিকেরই বা হল কি? অমন নিষ্ঠুর ভাবে হিঁচড়ে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে ও লিলিয়ানকে। দোলনায় শোওয়া বাচ্চাটা যে কঁকিয়ে কাঁদছে, তাকে দেখবে কে।

হা, ঈশ্বর, একি স্বপ্ন তনিমার। লিলিয়ানের এ দশা হল কবে? নাকটা আর গালের হাড়দুটো ঠেলে উঠেছে। কালি পড়া চোখ আর ফ্যাকাশে ঠোঁট দেখে কি বলা হচ্ছে না ওর স্বামীর। দীর্ঘ হাড় বার করা শরীরটা ঢাকা পড়ে গেছে একরাশ এলো চুলে। কত বয়স হল লিলিয়ানের? একতাল মাখনের মত নরম বাচ্চাটাকে নিয়ে একি কাড়াকাড়ি ওদের। নিল, বাচ্চাটাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল এরিক।

তাই বুঝি? এই জন্যে? এত টাকা দিল অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটা। বাচ্চা ছেলেও বুঝি বিক্রি হয়। কিন্তু লিলিয়ানের কি হবে, ওর বোধহয় জ্ঞান নেই। আলমারীর কোন লেগে কপালটা কেটে গেছে, নাকি নিকেলের গ্লাসটা ভুলে নিয়ে নিজের কাটা কপালটা আরও কাটিয়ে দিয়েছে ও। এত রক্তও ছিল ওর ফ্যাকাশে দীর্ঘ শরীরে।

হে ভগবান, শেষ এ স্বপ্নের।

এই বুঝি লিলিয়ান? এমন প্রেতিনীর মত চেহারা ওর হল কবে। এরিক এখনও আছে। কেন, কিসের লোভে? আর কি আছে লিলিয়ানের। আছে আছে, কি আছে এরিক জানে। উন্মাদ প্রেতিনীর সব গেছে শুধু আছে এক চাল চুল। মানুষের চুল। লম্বা নরম চুল—অনেক দামে বিক্রি হয় বড়ের বাজারে। কোথায়, সব এরিক জানে। লম্বা ধারালো বড় কাঁচিখানা দেখে ভয় পেয়োনা লিলিয়ান, তোমাকে মারবে না এরিক, শুধু চুলগুলো ওর চাই। উঃ কি জোর ওই দীর্ঘ শরীরে। এরিকের হাতে দাঁত বসিয়ে দিয়েছে লিলিয়ান। চুল ও দেবে না। না—কিছুতেই না। পর পর একটা এরিক—উপুড় করে ফেলেছে লিলিয়ানকে, হাত দুটো দুমড়ে ধরেছে হাঁটুর তলায়, লম্বা চুল হাতে পেঁচিয়ে কাঁচি চালিয়ে দিল ও।

ভগবান, তনিমাকে রক্ষা কর।

লম্বা কাঁচির তীক্ষ্ণ ফলাটা নিজের গলায় আমূল বিঁধিয়ে দিয়েছে পাগলী।

—আমার চুল—চুল দাও, দীর্ঘ শিস্ টেনে চিৎকার করে ও। কাঁচির ফলাটা বেঁকা, দীর্ঘ সাদা হাত দুটো বাড়িয়ে এগিয়ে আসছে ও তনিমার দিকে।

বুকের ভেতরটা শুকিয়ে গেছে তনিমার। জল, একটু চাই। নিদ্রা আর জাগরণের মাঝে কখন বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে ও। মেঝের ওপর ওটা কি? কিছু না ক্যালেণ্ডারটা, বোধহয় হাওয়ায় কখন দেয়াল থেকে খসে পড়েছে মাটিতে। বাইরে ঝোড়ো হাওয়ার শোঁ শোঁ আওয়াজ—ঠিক যেন কার চাপা কান্নার মত।

—পিসিমা ও পিসিমা—দরজায় পাগলের মত ধাক্কা মারে তনিমা, আমি তোমার ঘরে শোব—আমার ভয় করছে—হাঁপায় ও। কেউ ত' নেই তবু যেন অদৃশ্য কারে ঠেকাবার জন্য ঘরে ঢুকে দ্রুত দরজা বন্ধ করে দেয় তনিমা। কিন্তু তারও আগে বিনুনী থেকে টেনে ছিঁড়ে খুলে চুলের গুচ্ছটা বারান্দায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে ও।

———

চিত্র বিচিত্র

মৃত্যুঞ্জয় ভরদ্বাজ

বার্নার্ড শ'র চিঠি

বার্নার্ড শ'র 'আর্মস্ অ্যাণ্ড দি ম্যান' নাটকের উদ্বোধন রজনী। হাউস ফুল। বহু বিদগ্ধ সমালোচক ও দর্শক সামনের সারিতে। তাঁদের পুরোভাগে স্বয়ং নাট্যকার।

প্রথম-অভিনয় সুষ্ঠুভাবে শেষ হল।

যবনিকা পতনের পর মুহুর্মুহু হাততালির সঙ্গে প্রেক্ষাগার মুখরিত হল।

নাট্যকারকে দেখতে চাই! রব উঠল চারিদিকে।

বার্নার্ড শ মঞ্চের উপর গিয়ে দাঁড়ালেন। হাত তালিতে কেটে পড়ল চারিদিক। নতশিরে নাট্যকার দর্শকদের অভিনন্দন গ্রহণ করলেন।

তারপরেই এক অভাবনীয় কাণ্ড। করতালি ধ্বনি মিলিয়ে যাবার পরক্ষণেই সেই আনন্দ-ধ্বনিকে ছাপিয়ে পিছন থেকে কে যেন বিদ্রূপ করে উঠ্‌ল, শিস দিল,—উচ্চকণ্ঠে ভেঙিয়ে উঠ্‌ল—বু···বু···বু।

স্তব্ধ হ'ল সবাই এ কী অভাবনীয় অভদ্রতা! নাট্যকারের মুখের উপর বিদ্রূপ!

ভুরু কুঁচকে মুখ-তুলে তাকালেন বার্নার্ড শ। হাসলেন। তারপর বিদ্রূপকারীকে উদ্দেশ্য করে বললেন—প্রিয় বন্ধু! আমি তোমার সঙ্গে একমত। কিন্তু এতগুলি লোকের বিরুদ্ধে আমরা মাত্র দু'জন কি করতে পারি বল।"

উল্লাসে নাচঘর উচ্ছকিত হল। কেমন মুখের মতো জবাব। এমনটি আর কেউ পারতো না। কলরব করতে করতে যে যার ঘরে ফিরল।

কিন্তু ঘটনাটি সেখানেই শেষ হল না। তার জের চলল চৌত্রিশ বছর!!

উক্ত ঘটনার সপ্তাহখানেক পরে শ' একটি চিঠি পেলেন।

"সেদিন অভিনয়ের শেষে যে আপনাকে বিদ্রূপ করেছিল, সে-ই এক পত্র লিখছে আপনাকে···"

আশ্চর্য সাহস তো লোকটার! দুর্বিনীত স্পর্দ্ধার শেষ নেই। কে এই ব্যক্তি?

নাম—রেজিনালড গোলডিং ব্রাইট। বয়স কুড়ি। লেখাপড়া শিখেছে। বাপের পয়সা আছে। তার ইচ্ছা, সে নাট্য সমালোচক হবে। এবং সেই বিষয়ে সে বার্নার্ড শ'র পরামর্শ চায়।

দীর্ঘ পত্র। কাটা কাটা বুলি। চাছা ছোলা ভাষা। পত্রখানা ছিঁড়ে ফেলে দেবারই কথা। কিন্তু বেঁাকের মাথায় শ তার জবাব দিলেন। লিখলেন—"নাট্য সমালোচক হবার কোন বাঁধা ধরা রাস্তা নেই, মূর্খ! ওটা দৈবে ঘটে।"

পত্র এলো—"দৈব কি? আমার জীবনে কি সে দৈব ঘটতে পারে না?"

জবাব গেল। কড়া জবাব—"তোমার জীবনে দৈবে কি ঘটবে, তুমি নরকে যাবে, না স্বর্গে যাবে, তার জন্যে আমার মাথা ব্যথা নেই।"

এমনি করে চলল পত্রালাপ। এক-আধ বছর বা এক-আধ মাস নয়। সুদীর্ঘ চৌত্রিশ বছর ধরে!

সোলজিং রাইট নাটা সমালোচকরূপে নাম করতে পারলেন না বটে, কিন্তু বার্নার্ড শ'র মতো লোকের সঙ্গে চিঠিপত্রি করে তিনি অমরীয় হলেন। তাঁর কাছে শ' যে সব পত্র লিখেছিলেন তাদেরই সংকলন করে বই বেরিয়েছে কিছুদিন আগে—"একজন তরুণ নাট্য সমালোচকের প্রতি উপদেশ ও অন্যান্য পত্র।"

পত্রগুলি ভাষার প্যাঁচে যেমন সরস ও সজীব, বক্তব্যের তীক্ষ্ণতায় ও বৈচিত্রে তেমনি কৌতূহলোদ্দীপক।

কয়েকটি বিশিষ্ট শ' মার্কা নমুনা দেওয়া যেতে পারে :

(১) লেখ, লেখ, লেখ। আগামী পাঁচ বছরে প্রত্যহ গড়ে এক হাজার শব্দ রচনা কর। টেনিং শিখতে হলে প্রথম প্রথম বোকার মত টলে পড়তে হবেই, হোঁচট খেতে হবেই…

(২) প্রথমে, রচনার মূলকথা সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ হও। লেখার মধ্যে যত কারিগরি দেখাও না কেন, রচনাশৈলীর যত রকম ফেরই কর না কেন, আসল হল বিষয়বস্তুর সারবত্তা। এই সারবত্তা যদি না থাকে তো তোমার প্রকাশ ভংগী কোনদিনই পাঠকদের চিত্ত জয় করতে পারবে না।

ওঁ। নেশা করবে না। জুয়া খেলবে না। ধার নেবে না। ধার দেবে না। প্রাণ থাকতে বিয়ে কোরো না। কখনো কারুর উপদেশ নিও না।

বই—কিন্তু বই নয়

কিছুদিন আগে আমেরিকার এক সাপ্তাহিক পত্রের সাহিত্য-বিভাগের পৃষ্ঠায় হঠাৎ একটি প্রশ্ন ছাপা হল—অনেক বই বেরুচ্ছে। কিন্তু সব বই কি বই?

তার মানে? তাহলে সেগুলো কি?

যদি বলি সেগুলো বই নয়—NON BOOKS।—নন্ বুকস্? সে আবার কি বস্তু?

আছে। নন্ বুকস্ আছে। সাধারণ ভাবে "না—বই" হচ্ছে সেই শ্রেণীর বই, যা লেখা হয় না, কাঁচির সাহায্যে যাদের বানানো হয়।

এই প্রশ্ন নিয়ে সম্প্রতি বিলাতেও আলোচনা সুরু হয়েছে—সব বই, বই নয়।

একটি বইএর মধ্যে আমরা প্রত্যাশা করি প্রত্যক্ষভাবে লেখকের কিছু চিন্তা, কিছু ঘটনা, কোন ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বা জীবন দর্শন সম্বন্ধে লেখকের নিজস্ব ব্যাখ্যা, মতামত আলোচনা।

কিন্তু "না—বই" তা নয়। তারা ঝকঝকে তকতকে হতে পারে, তাদের ছাপা বাঁধাই সবাই সুন্দর হতে পারে কিন্তু তাদের মধ্যে প্রাণ নেই। তাই তারা বই আকারে "না—বই"।

কোন্ কোন্ ধরণের বই এই "না—বই"-এর পর্যায়ে পড়ে তারও আলোচনা চলছে।

মোটামুটি তাদের এইভাবে শ্রেণী বিভাগ করা হয়েছে :—

(ক) উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত সংস্করণের সংকলন। রীডার্স ডাইজেস্ট পত্রিকা যেগুলি বার করেন সেগুলি "না—বই"! বাঁকের চৌকো টুকরো যেমন গরু নয় এগুলিও তেমনি বই নয়।

(খ) কোন ব্যক্তির মৃত্যুর বহু বছর পরে তার যে আত্মজীবনী বেরোয় বা তাঁর উক্তি ব্যবহার করে যেসব বই লেখা হয় সেগুলির সত্যাসত্য নির্ণয় করবার উপায় নেই, অতএব তারাও "না—বই"।

(গ) চিত্র প্রযোজকদের কারখানে লেখা বই। কোন চিত্র প্রযোজক নিজেই একটি বিষয় স্থির করলেন। কয়েকটি ঘটনাও জুড়লেন তারপর কোন লেখককে দিয়ে সেই বিষয়বস্তু আর ঘটনা সম্বলিত বই লিখিয়ে নিলেন। সেসব বই একেবারেই "না বই"।

(ঘ) উপদেশমূলক বই। ওই ধরণের মুখরোচক উপদেশ হয়ত আজও নানাজনের মুখে বা কলমে প্রকাশ পেয়েছে। সেগুলিকে আত্মসাৎ ও একত্র করে নিজের নামে লেখক যে বই প্রকাশ করেন সেগুলি যথার্থ বই পদবাচ্য নয়।

(ঙ) বেশির ভাগ সংকলন-গ্রন্থ। রুচি ও চাহিদা মাফিক বিষয়বস্তুর একত্রীকরণ। এগুলিও বই পদবাচ্য নয়। খবরের কাগজের কাটিং কেটে বা মনীষীদের বক্তৃতার টুকরো উদ্ধৃত করে যেসব বই তৈরী হয় তারাও সত্যিকারের বই নয়—"না বই"।

আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, ওদেশে অনেক প্রকাশকই এই ধরণের বই বার করেন এবং বিক্রিও করেন প্রচুর। এ বিষয়ে সবচেয়ে বলাও ব্যবসা করেন মার্কিন দেশের হার্পর-ব্রুকস্-এর ভাইস-প্রেসিডেন্ট কেনেথ ফিলিপার। তিনি বলেন—"যেমন ছবি তৈরী হয়, আমিও তেমনি বই তৈরী করি। আমি বই-এর প্রযোজক।"

গ্রন্থকারদের সঙ্গে ফিলিপারের যোগাযোগ নেই বললেই হয়। তাঁর কোন বাঁধা লেখক নেই। তাঁর কাজ একেবারে অন্য ধরণের। তাঁর কয়েকজন বই বিশেষজ্ঞ আছে। তারা বই-এর বাজারে ঘোরে। কোন্ ধরণের বই-এর চাহিদা বাড়ছে তা অনুধাবন করে। তারপর সেই চাহিদা বুঝে তারা সময়োপযোগী বিষয় বস্তু স্থির করে। তারপর বইটি বা বইগুলি কি ধরণের হবে সে সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ সম্বলিত পুস্তিকা তৈরী হয়। এবং সেই পুস্তিকা হাজার হাজার সম্ভাব্য ক্রেতার কাছে পাঠিয়ে তাদের মতামত চাওয়া হয়। অর্থাৎ এই ধরণের বই সম্বন্ধে ক্রেতা কি বলেন। তিনি কি বইখানি কিনতে ইচ্ছুক হবেন, যদি তিনি এখনি অর্ডার দেন তাহলে ডাকমাশুল লাগবে না। বই পড়ে ফেরৎ দেবেন, না ভাল লাগলে ফেরৎ দেবেন, ইত্যাদি আকর্ষণীয় সর্তও তাঁকে জানানো হয়। তারপর প্রকাশক অর্ডারের জন্যে অপেক্ষা করেন। যদি আশানুরূপ অর্ডার এসে যায় তাহলে তিনি একজন লেখক ভাড়া করে এনে (দরকার হলে একাধিক) বইখানা দ্রুত লিখিয়ে নেন। যদি আশানুরূপ অর্ডার না আসে তাহলে মধুর ভাষায় জানিয়ে দেন যে নানা কারণে তাঁরা তাঁদের প্রস্তাবিত বই প্রকাশ করতে পারছেন না। অন্য বিষয়ের বই এবং উৎকৃষ্টতর বই বার করবার আয়োজন করছেন। সে বিষয়ে শীঘ্রই ক্রেতাদের জানানো হবে।

এবং কথার সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশক অন্য বিষয়বস্তুর সন্ধান করতে বলেন—বিশেষজ্ঞরা আবার বাজার ঘুঁড়তে থাকে।

এইভাবে যদি পরপর দু'তিনটি পরিকল্পনা বাতিল করেও চতুর্থ বা পঞ্চম পরিকল্পনাটি হিট্ করে, অর্থাৎ লেগে যায় অর্থাৎ ক্রেতারা "লেগে" তাহলে প্রকাশকের সব খরচ উঠে গিয়ে প্রচুর লাভ হয়।

আমাদের দেশের প্রকাশকরাও তো এই ধরণের বই মাঝে মাঝে বের করেন। আমাদের দেশেও "না বই" নেই তা নয়।

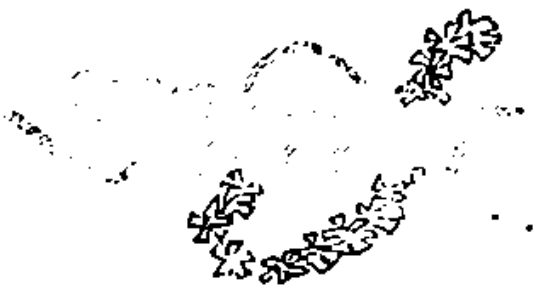

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

॥ ৩ ॥

লক্ষ্মী রোজই আসে রবিদের বাড়ীতে।

বরদাসুন্দরী মেয়েটিকে দেখেন আর ভাবেন—আহা এমনি একটি মেয়ে যদি তাঁর থাকতো।

কথাটা সেদিন হাসতে হাসতে বললেন হরেনবাবুকে।

'একটি মেয়ের আমার বড় সাধ ছিল।'

হরেনবাবু বললেন, 'মেয়ের ঝঞ্ঝাট অনেক। বিয়ে দেবার ঝামেলাটাই সব চেয়ে বেশি। ভাল বিয়ে যদি দিতে পারলে তো ভাল, আর নইলে কাঁহো লারাটা জীবন বসে বসে।'

বরদাসুন্দরী বললেন, 'ঝামেলা আবার কিসের? তোমার টাকা আছে লোকজন আছে—একটা মেয়ের বিয়ে দিতে পারতে না?'

হরেনবাবু হাসলেন, 'যাযো বাপু, যা নেই তাই নিয়ে আর চেঁচিয়ো না।'

বরদাসুন্দরী আরও বেশি চেঁচাতে লাগলেন।

'আমার চেঁচানিটাই তুমি শুনতে পাও। মনের দুঃখে দুটো কথা যে বলবো তারও উপায় নেই। একটা মেয়ে থাকলে তার সঙ্গে দুটো সুখ-দুঃখের কথা কয়ে বাঁচতুম।'

হরেনবাবু বললেন, 'আঃ, আবার চীৎকার করে!'

বরদাসুন্দরী বললেন, 'তোমাকে বলিনি। তুমি আমার দুঃখের কথা শোনো কোনোদিন যে তোমাকে বলবো?'

'কাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলছো তাহ'লে?'

বরদাসুন্দরী বললেন, 'ভগবানকে বলছি। বলছি—ভগবানের বিচারটি বেশ। যার পয়সা নেই তার বাড়ীতেই পাঠাচ্ছো মেয়ে। আর যার পয়সা আছে তার বাড়ীতে ছেলে।'

হরেনবাবু বললেন, 'তা বেশ তাহ'লে হরেনবাবুকে বলবো—আপনার মেয়ের বিয়ের যাবতীয় খরচ আমার মিত্রী দেবেন বলেছেন। ভদ্রলোককে কন্যাদায় থেকে উদ্ধার করে দাও—তোমার পুণ্যি হবে।'

'হ্যাঁ তাই দেবো।' বলে চুপ করলেন বরদাসুন্দরী।

চুপ হয়ত করতেন না কিন্তু চুপ করতে বাধ্য হলেন—লক্ষ্মী তাঁর কাছে এসে দাঁড়ালো হাসতে হাসতে।

'কি রে, তোর ঘর পেলি ?'

হরেনবাবু বলে উঠলেন, 'ঘর।'

কথাটা তিনি বুঝতে পারেননি তাই চমকে উঠলেন। বরদাসুন্দরী বুঝিয়ে দিলেন।

'সেই যে মাটির ঘরটা, বানায় জলে ডুবে গেলো তো! তাই ওর একটি ঘর চাই।'

হো হো করে হাসতে লাগলেন হরেনবাবু।

'তাই বল। আমি ভেবেছিলাম বুঝি সত্যিকারের ঘরের কথা বলছো। তা বেশ তো, দা'কে বল, বাজার থেকে ভাল একটি ঘর কিনে এনে দেবেন।'

লক্ষ্মী বললে, 'না। বাবা দেবে না।'

হরেনবাবু বললেন, 'বেশ তাহ'লে আমিই এনে দেবো।'

বলেই তিনি বরদাসুন্দরীকে বললেন, 'বিকেলবেলা যখন বেড়াতে বেরুবো তখন যেন আমাকে মনে করিয়ে দিও।'

বরদাসুন্দরী বললেন, 'দেবো।'

লক্ষ্মী বললে, 'আমাদের কবে দেখেছেন তো?'

হাতের আঙুল দেখিয়ে বললে, 'ছোট্ট—এইটুকু। ঘরও অমনি ছোট চাই। এই ঘরটা খুব বড় ছিল কিনা তাই আমাদের নৌকোটা ডুবে গেল।'

হরেনবাবু বললেন, 'কিন্তু আর যেন নৌকো নিয়ে জলে খেলা কোরো না। খেলা করতে হয় ঘরের ভেতর খেলা করবে। জলে ভিজলে অসুখ করে।'

লক্ষ্মী আকাশের দিকে তাকিয়ে বললে, 'বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেছে।'

হরেনবাবু বললেন, 'বন্ধ হয়েছে, আবার হবে।'

লক্ষ্মী বললে, 'ছুটে পালিয়ে আসবো তখন।'

পাশের ঘরে রবি পড়ছিল। এতক্ষণ গুন্ গুন্ করে তার গলার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছিল। হঠাৎ তার গলার আওয়াজ বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠলো।

'জি এ আর ডি ই এন্—গার্ডেন। গার্ডেন মানে বাগানে। গার্ডেন মানে বা-গা-নে।'

লক্ষ্মী ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

হরেনবাবু বললেন, 'শুনলে?'

বরদাসুন্দরী বললেন, 'কি শুনবো?'

'তোমার ছেলে ওয়ার্ড বুক পড়ছে।'

'হ্যাঁ পড়ছে তো।'

হরেনবাবু হাসতে হাসতে বললেন, 'গার্ডেন মানে কি বল দেখি?'

বরদাসুন্দরীও একটুখানি হাসলেন। বললেন, 'সবেতেই তোমার রসিকতা। ইংরেজি আমি জানি?'

হরেনবাবু বললেন, 'শেখো—শেখো। শেখবার বয়েস যখন ছিল তখন তো এ-সব কিছু শেখোনি। বুড়ো বয়েসে ছেলের কাছ থেকে শেখো।'

'কী শিখবো?'

হরেনবাবু বললেন, 'শিখবে—গার্ডেন মানে বাগান নয়। গার্ডেন মানে বাগানে।'

সত্যি-সত্যিই বাগানে।

লক্ষ্মীও বাগানে। ওয়ার্ডবুক হাতে নিয়ে রবিও বাগানে।

বাগানে একটা বেঞ্চি ছিল। লোহার বেঞ্চি। তারই পেছনে গিয়ে লক্ষ্মী দাঁড়িয়েছিল। পাশেই একটা আস্ত গাছ। রবি সেই আস্ত গাছের তলায় গিয়ে দাঁড়াতেই লক্ষ্মী ঘুরে গিয়ে বেঞ্চির এক কোণে বসে চুপটি করে বসলো। বসেই জিজ্ঞাসা করলে, 'তুমি কি খেতে ভালবাসো বল দেখি?'

বয়স তার দশ হলে কি হবে, সেই চিরন্তনী নারী!

রবি কি খেতে ভালবাসে তাই জিজ্ঞাসা করছে লক্ষ্মী।

রবি ভাবনায় পড়লো।

'আমি? আমি? আমি কি খেতে ভালবাসি?'

বলতে বলতে সে এগিয়ে এলো লক্ষ্মীর কাছে। বললে, 'বলবো?'

লক্ষ্মী বললে, 'বল।'

রবি হাসতে হাসতে বললে, 'মার খেতে ভালবাসি।'

'মার খেতে ভালবাসো?'

লক্ষ্মী খিল্ খিল্ করে হেসে হাতটা তুললে রবিকে মারবার জন্যে।—'মারবো?'

রবি বললে, 'মারো না? আমিও এমন মার মারবো—কাঁদতে কাঁদতে মাকে গিয়ে নালাবে।'

লক্ষ্মী বললে, 'যাঃ।'

রবি জিজ্ঞাসা করলে, 'আচ্ছা, তুমি কি খেতে ভালবাসো বল?'

লক্ষ্মী বললে, 'আমি বলবো? আমি খেতে ভালবাসি নারকেলের নাড়ু।'

রবি বললে, 'বেৎ! নারকেলের নাড়ু আবার খায় নাকি?'

লক্ষ্মী বললে, 'তোমরা বড়লোক। তোমরা কেন খাবে? আমরা খাই।'

রবি এসে বসলো তার পাশে। জিজ্ঞাসা করলে, 'নারকেলের নাড়ু কিসের? চিনির না গুড়ের?'

লক্ষ্মী বললে, 'গুড়ের।'

রবি তার মুখের চেহারাটা এমন করলে মনে হলো যেন খারাপ কিছু খেয়ে ফেলেছে।

লক্ষ্মী সেটা লক্ষ্য করলে। মুখে কিছু বললে না, কিন্তু বাঁহাত দিয়ে তার ফ্রকের তলা থেকে কি যেন নিয়ে টুক্ করে বেঞ্চির তলায় ফেলে দিলে।

রবির চোখ এড়ালো না। জিনিসটা কি—কুড়িয়ে নিয়ে দেখবার জন্যে হাত বাড়ালো সে। কিন্তু লক্ষ্মী কিছুতেই সেটা তাকে কুড়োতে দেবে না।

'না না, ও কিছু নয়।' বলে লক্ষ্মী তাকে বাধা দিলে। দু'জনে কাড়াকাড়ি লেগে গেল।

রবি কিন্তু তখন সেটা কুড়িয়ে নিয়ে একটু দূরে সরে গেছে। দেখলে, সাদা কাগজে মোড়া দুটি নারকেলের নাড়ু।

রবি তক্ষুনি নাড়ু দুটি মুখে পুরে দিয়ে বললে, 'এ খেতে আমি খুব ভালবাসি।'

ছুটো নাড়ু খেতে আর কতক্ষণ!

খাওয়া যেই শেষ হয়েছে আতাগাছের ওপার থেকে হরেনবাবু বলে উঠলেন, 'যা এবার একগ্লাস জল খেয়ে আয়।

হরেনবাবু যে এসে দাঁড়িয়েছেন দু'জনের মধ্যে তারা কেউই তা বুঝতে পারেনি।

রবি বলে উঠলো, 'খুব ভাল নারকেলের সন্দেশ বাবা, লক্ষ্মী কেমন দিচ্ছিল।'

'তা এখানে কেন? ঘরে যা। বৃষ্টি আসবে।'

দু'জনেই তখন পালাতে পারলে বাঁচে!

দু'জনেই চলে যাচ্ছিল। ওয়ার্ডবুকটা পড়ে ছিল বেঞ্চির ওপর। হরেনবাবু সেটা নিজেই তুলে নিলেন।

'বাবু! চিঠি!'

হরেনবাবু তাকিয়ে দেখেন, পোষ্টাপিসের পিওন এসে দাঁড়িয়েছে।

খামের একখানি চিঠি তাঁর হাতে দিয়ে পিওন চলে গেল। হরেনবাবু চিঠিখানি খুলে পড়লেন। তাঁর বড় ছেলে ছবি লিখেছে কলকাতা থেকে।

বরদাসুন্দরী জিজ্ঞাসা করলেন, 'হঠাৎ তুমি নীচে নেমে গেলে যে?'

রবির ওয়ার্ডবুকখানা তাঁর হাতে ছিল। বইখানা তাঁর দিকে বাড়িয়ে ধরে বললেন, 'এই যে ওয়ার্ডবুক—'

'সে আবার কি?'

ভুলটা সংশোধন করে নিলেন হরেনবাবু। বললেন, 'চিঠিখানা দিতে গিয়ে তোমাকে বইখানা দিচ্ছি। এই নাও, ছবি চিঠি লিখেছে। পড়।'

চিঠিখানা তাড়াতাড়ি খুলে পড়লেন বরদাসুন্দরী।

'আজ তো মঙ্গলবার। ছবি তাহ'লে কালই আসছে বিকেলের গাড়ীতে!'

হরেনবাবু বললেন, 'হ্যাঁ। গাড়ীটা এখানে ঠিক পাঁচটা পঁচিশে আসে। তার আগেই আমাদের ষ্টেশনে যেতে হবে।'

'কাল কে আসবে মা? দাদা?'

রবি বেরিয়ে এলো পাশের ঘর থেকে। লক্ষ্মী এলো তার পিছু পিছু।

বরদাসুন্দরী বললেন, 'হ্যাঁ, কাল ছবি আসবে পাঁচটার গাড়ীতে।'

রবি তার বাবার কাছে গিয়ে বললে, 'আমরা ষ্টেশনে যাব তো বাবা?'

'আমরা মানে কে কে? তুমি আর লক্ষ্মী?' হরেনবাবু জিজ্ঞাসা করলেন।

রবি লক্ষ্মীর দিকে ফিরে বললে, 'এই। যাবি আমার দাদাকে আনতে?'

লক্ষ্মী তার মাথাটি কাৎ করে বললে, 'হ্যাঁ, যাব।'

বরদাসুন্দরী বললেন, 'যাবে তো বলছো, কিন্তু তোমার মা যদি যেতে না দেয়?'

লক্ষ্মী বললে, 'মা আমাকে কিছু বলে'না।'

'যাও যদি তো ষ্টেশনের ষ্টল থেকে তোমার বর আমি কিনে দেবো।'

খুব খুশী হয়ে লক্ষ্মী বাড়ী চলে গেল।

ঘড়িতে চারটে বাজলো।

ষ্টেশনে যাবার জন্যে নরেনবাবু তৈরী হয়ে বললেন, 'কই গো, চল আর দেরি কোরো না। একটু আগেই যাওয়া ভাল।'

বরদাসুন্দরী বললেন, 'লক্ষ্মী যাব বলেছিল, কই, এখনও তো এলো না! একটু দাঁড়াও। আসুক মেয়েটা।'

নরেনবাবু বললেন, 'দাঁড়াতে হবে কেন? রবি, তুই একবার যা না ওদের বাড়ীতে। ডেকে আন লক্ষ্মীকে।'

রবি ছুটলো লক্ষ্মীকে ডাকতে।

লক্ষ্মী তৈরি হয়েই ছিল। রবিকে দেখবামাত্র বললে, 'চল।'

ছুটো ছুটো পায়ে দিচ্ছে লক্ষ্মী, রবি তার কাছেই দাঁড়িয়ে, এমন সময় লক্ষ্মীর দাদা গুণধর চেঁচিয়ে উঠলো, 'এই! কোথায় যাচ্ছিস?'

লক্ষ্মী বললে, 'যেখানেই যাই, তোমার কি?'

যেই বলা, গুণধর এগিয়ে গিয়ে কটু করে লক্ষ্মীর মাথায় এক চড় মেরে দিয়ে বললে, 'কি', —তোমার কি? খবরদার বলছি—যেবি না।'

কিন্তু পাছে সে তার কথা অমান্য করে বেরিয়ে যায়, তাই সে তার বাবাকে ডেকে দিলে।

'বাবা! যেতে দাও—লক্ষ্মী আবার চললো ওদের বাড়ী।'

নরেনবাবু তখন সবে মাত্র দিবানিদ্রা শেষ করে মুখে চোখে জল দিচ্ছেন। সেইখান থেকেই বললেন, 'অত ঘন ঘন যাস্‌নে যা। ওরা বড়লোক। কী ভাববে?'

গুণধর তার বাবার কাছে গিয়ে বললে, 'সেই ছেলেটা ডাকতে এসেছে লক্ষ্মীকে।'

'কোন্ ছেলেটা?'

গুণধর বললে, 'সেই যে ছেলেটার কথা লক্ষ্মী তখন বলছিল। ওই তো—ভাখো না ওইদিকে তাকিয়ে।'

নরেনবাবু দেখলেন তাকিয়ে। ন্যাটাছেলের সঙ্গে লক্ষ্মীর মেলামেশা তিনি পছন্দ করেন না। তাছাড়া ছোট বোন—দাদার অবাধ্য হয় তাও তিনি চান না। ডাকলেন, 'লক্ষ্মী!'

'আমাকে ডাকছো বাবা?'

'হ্যাঁ ডাকছি। শোনো।'

'ওদিকে যে আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে বাবা। ট্রেনের সময়—'

বলতে বলতে লক্ষ্মী এগিয়ে গেল তার বাবার কাছে।

'ট্রেনের সময় কি বলছো? কোথায় যাবে তুমি?'

লক্ষ্মী বললে, 'রবির মামা আসবে। ষ্টেশনে যাব।'

নরেনবাবু বললেন, 'না। তোমার মার অসুখ। যাও তুমি আমাকে এক পেয়ালা চা তৈরি করে দাও।'

লক্ষ্মী ভারি বিপদে পড়ে গেল। ওদিকে ষ্টেশনে গেলে রবির মা তাকে বড়-পুতুল কিনে দেবেন বলেছেন। এদিকে চা তাকে তৈরি করতে দেওয়া হয় না—সে পারবে না বলে। অথচ সে

পারে কিনা দেখিয়ে দেবার খুব ইচ্ছা। সেই চা তার বাবা আজ তাকে তৈরি করতে বলছেন। প্রয়োজন দু'দিকেই।

'কিন্তু আমি যে ওদের যাব বলেছি বাবা। শ্যাখো না—রবি আমাকে ডাকতে এসেছে।'

বরেনবাবু রবির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'না বাবা তুমি যাও। লক্ষ্মী এখন যেতে পারবে না। ওর মার অসুখ।'

রবি তক্ষুনি চলে গেল। ট্রেণের সময়। তারও এখানে দাঁড়িয়ে থাকা চলে না।

গুণধর লক্ষ্মীর চেয়ে বছর-চারেকের বড়। লক্ষ্মীর যাওয়াটা বন্ধ করতে পেরেছে—এই তার আনন্দ।

'কেমন! হলো তো?'

লক্ষ্মী তাকে জিব বের করে ভেংচি কেটে দিলে।

'বাবা, আমি তাহলে তোমার চা তৈরি করি।'

এই বলে লক্ষ্মী খাটের তলা থেকে ষ্টোভটা টেনে নিয়ে স্পিরিটের বোতলটা আনতে গেল।

হাঁ হাঁ করে গুণধর ছুটে এলো। স্পিরিটের বোতলটা তার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে বললে, 'মরবে যে! বাবা, তুমি ওকে ষ্টোভ জ্বালতে বলেছ?

বরেনবাবু বললেন, 'না না, ষ্টোভটা আমি ধরিয়ে দিচ্ছি। তোদের কাউকে ধরাতে হবে না। লক্ষ্মী, তুমি কেট্‌লিতে জল ভরে আনো।'

বরেনবাবু স্পিরিট দিয়ে ষ্টোভ জ্বালাতে বসলেন।

লক্ষ্মী কেট্‌লি নিয়ে গিয়েছিল জল আনতে। স্নানের ঘর থেকে বেরুলেন লক্ষ্মীর মা—সরলা।

'তুই চা করবি নাকি?'

লক্ষ্মী বললে 'হ্যাঁ মা, বাবা বললে।'

'তোর বাবার কি? ঘুম থেকে উঠে চা খাবার জন্যে ছট্‌ফট্ করছে। আমি তো এখনও মরিনি!'

বলতে বলতে ঘরে ঢুকলেন সরলা দেবী।

বরেনবাবু তার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বিকেলবেলা চান করলে তো? এমন যদি কর, অসুখ তোমার সারবে কেমন করে?'

সরলা দেবী বললেন, 'সারুক্ না সারুক্ সে তোমাকে দেখতে হবে না। বলি গোলমালটা কিসের হচ্ছিল শুনি?'

গুণধর বললে, 'শ্যাখো না মা, সেই ছেলেটা লক্ষ্মীকে ডাকতে এসেছিল। দিয়েছি তাড়িয়ে।'

মা খুব খুশী হলেন না কথাটা শুনে। বললেন, 'তোমার বাবা তোমার নাম রেখেছে গুণধর। তা তুমি গুণধরই হয়েছ দেখছি।—ডাকতে এসেছিল, তাড়াতে গেলি কেন?'

গুণধর বললে, 'তাড়াবো না? তুমি যে তখন বললে?'

'কী বললাম? বলেছি—ডাকতে এলে তাড়িয়ে দিবি? আমি বলেছি—ওরা বড়লোক। লক্ষ্মীকে খেতেটেতে দেয়। লক্ষ্মী যখন-তখন যায় তো ভাববে মেয়েটা বুঝি বাড়ীতে খেতে পায় না, তাই খাবার লোভে আসে।'

কেটলি হাতে নিয়ে লক্ষ্মী এসে দাঁড়ালো। বললে, 'আমিও দিয়েছি খাইয়ে।'

মা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী খাইয়েছিস ?'

ষ্টোভটা জ্বালিয়ে দিয়েছেন বরেনবাবু। কেটলিটা ষ্টোভের ওপর বসিয়ে দিয়ে লক্ষ্মী বললে, 'সেই যে তুমি আমাকে নারকেলের নাড়ু দিয়েছিলে। সেই নাড়ুগুলো তো আমি খাইনি। কাগজে মুড়ে নিয়ে গিয়ে রবিকে খাইয়ে দিয়েছি! ব্যস্, শোধবোধ হয়ে গেছে।'

বরেনবাবু বললেন, 'ভিজে কাপড়ে দাঁড়িয়ে রইলে কেন ? কাপড়টা ছেড়ে এসে নাও বোসো, চা'টা তাড়াতাড়ি করে দাও।'

লক্ষ্মী বললে, 'যা-রে, আমি করব না ?'

মা বললেন, 'না না তুই বসে বসে ছাখ্, আমি কেমন করে করি।'

লক্ষ্মী বললে, 'হাঁ, আমি যেন চা করতে জানি না। আমাকে ষ্টেশনে যেতে দিলে না, আবার চা করতেও দেবে না!'

'ষ্টেশনে কি আছে ?'

লক্ষ্মী বললে, 'কলকাতা থেকে আজ রবির দাদা আসবে, তাই রবির বাবা-মা আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবেন বলেছিলেন। রবির মা আমাকে কি বলেছিলেন জানো মা!'

'কী বলেছিলেন ?'

'আমাকে খুব ভালবাসেন তো! বলেছিলেন—আজ তোমাকে আমি খুব ভাল একটি পুতুল কিনে দেবো। কিরকম পুতুল জানো মা ? সেই যে আমার বর-পুতুল—নৌকোডুবি-হয়ে যেটা মরে গেল, তার চেয়ে ভাল বর হতো। আমার কনেটা একা-একা রয়েছে, ওর তাহ'লে জোড় মিলে যেতো। এই দাদাটা গিলে আমার সব মাটি করে। যেতেও দিলে না, আবার বলছো চা করতেও দেবে না।'

লক্ষ্মীর মা হাসতে হাসতে কাপড় ছাড়তে গেলেন।

(ক্রমশঃ)

• • •

জীবন না দিলে যেমন জীবন পাওয়া যায় না—ভালবাসা না দিলে যেমন প্রতিদানে ভালবাসা পাওয়া যায় না—তেমনি নিজে মানুষ না হলে মানুষ তৈয়ারও করা যায় না।

—সুভাষচন্দ্র

পুরাতন পাতা

খেয়াল খাতা

ললিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

আধুনিক প্রেমের কবিতা

আজকালকার প্রেমের কবিতাগুলিকে বাজারের খাবারের সঙ্গে তুলনা দিতে ইচ্ছে করে। খাবারের দোকান এখন অলিতে গলিতে, পঞ্চাশ বৎসর আগে এমনটা ছিলনা; কবিতাও এখন হাটে ঘাটে। আগে লোকে মুড়ি ও ঝুনা নারিকেল খাইত, খাদ্যটা কিছু নীরস ও শুকনা গোছের কিন্তু বড় পুষ্টিকর; এখন মুটে মজুরও গজাজেলাপী খায়। আগে লোকে যাত্রা, কবি, পাঁচালী, কথকতা, কীর্ত্তন শুনিত; তখনকার চণ্ডীর গান, ধর্ম মঙ্গল, মনসার ভাসান প্রভৃতিতে ধর্ম প্রসঙ্গই থাকিত; জিনিসটার তত রসকস ছিলনা, কিন্তু তাহাতে আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতি ও পরিপুষ্টি হইত; আর তাহার জায়গায় এখন প্রেমের কবিতার ছড়াছড়ি, অজাতশ্মশ্রু বালক হইতে অশীতিপর বৃদ্ধ পর্য্যন্ত থিয়েটারীছন্দে প্রেমের ছড়া কাটিতে যায়। খাবারের দোকানে ঘরে ঘরে হরেক রকম খাবার সাজান, দেখিতে বড় বাহার, কিন্তু খাইলেই অম্বল হয়, বুক জ্বলে, গলা জ্বলে, দুই এক ঢলক বমি হইয়া উঠিয়াও যায়। মাসিক পত্রিকার পৃষ্ঠায়ও নানা ভঙ্গীর নানা কবিতার পসরা সাজাইয়া বসিয়া আছেন; সেসব প্রেমের কাহিনী পড়িতে গেলেই কিন্তু হৃদয়ে জ্বালা ধরে, পাঠকেরও কবিত্বের ফোয়ারা এক আধটু ছুটিতে থাকে। টাট্‌কাভাজা কচুরি নিমকি জেলাপি বেশ মুচ্‌মুচে, মুখে দিলে মিলাইয়া যায়; কিন্তু একটুখানি জুড়াইয়া গেলেই বাসীর তেলের গন্ধ ছাড়ে, মুখে দিতে ইচ্ছা করে না। কবিতাগুলিও মাসিক পত্রিকার পাতা কাটিয়া পড়িবার-সময়, বেশ মোহকর—বেশ প্রাণের সঙ্গে মিশিয়া যায়, কিন্তু একটু জুড়াইয়া গেলে, স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইলে, বাসীটে গন্ধ ছাড়ে, পুস্তক পড়িতে প্রবৃত্তি হয় না। খাবারের দোকানগুলি না উঠাইলে সমাজের স্বাস্থ্য ভাল হইবে না, প্রেমের কবিতার হাট না ভাঙ্গিলেও সমাজের স্বাস্থ্য শোধরাইবে না।

Mobile equilibrium of intelligence

মাষ্টারী করিলে ক্রমশঃ বোকা হইয়া যায়, এইরূপ একটা অপবাদ আছে। দশবৎসর মাষ্টারী করিলে তাহাকে আর কোনও ঝুঁকির কাজের ভার দেওয়া হয় না, কোন সভ্যমুলুকে নাকি এইরূপ নিয়ম। কথাটা নিতান্ত অন্যায় নহে। মাষ্টারেরা সারাজীবন নিজেদের চেয়ে অল্প বুদ্ধি ও অল্পবিদ্য বালকদিগের সঙ্গে মেশেন, নিজেদের চেয়ে বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান্ লোকের সঙ্গে মিশিবার কোনও সুযোগ পান না। সুতরাং তাঁহাদের আত্মোন্নতির কোনও উপায় থাকেনা। তাঁহারা মূর্খকে পণ্ডিত করিতে গিয়া নিজেরা দিন দিন মূর্খ হইয়া পড়েন। ছাত্রদিগের Exercise সংশোধন করিয়া তাহাদের বানান

যোগদান করেন, কিন্তু সেই সঙ্গে নিজেরা বাজার ঘুরিতে থাকেন। যতই করিবে দান, তত যাবে বেড়ে,' কথাটা কবিকল্পনা বই আর কিছুই নহে। এই ব্যাপার দেখিলে পদার্থ বিজ্ঞানের mobile equilibrium of temperature নিয়মের কথা মনে পড়ে। ঘরে পাঁচটা জিনিষের মধ্যে একটা খুব গরম জিনিষ রাখিলে খানিক পরে দেখা যাইবে, গরম জিনিষটা কতকটা ঠাণ্ডা হইয়াছে। কিন্তু ঘরের অন্য জিনিষগুলো কতকটা গরম হইয়া উঠিয়াছে। তপ্ত জিনিষের তাপ অন্য জিনিষে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এইরূপ তাপবিকীরণ খানিকক্ষণ চলিতে থাকিলে দেখা যাইবে, ঘরের সব জিনিষগুলিতেই সমান পরিমাণ তাপ আছে, ঠাণ্ডা জিনিষটা গরম হইয়াছে, গরম জিনিষটা ঠাণ্ডা হইয়াছে, ইহাকেই বলে mobile equilibrium of temperature. এক্ষেত্রেও দেখা যাইবে, ছাত্রদিগের বিদ্যাবুদ্ধি যে পরিমাণে বাড়িয়াছে মাষ্টার মহাশয়ের বিদ্যাবুদ্ধি সেই পরিমাণে কমিয়াছে। শেষে বহুদর্শী মাষ্টারের ও সর্দ্দার পড়ুয়ার বিদ্যাবুদ্ধি সমান হইয়া দাঁড়ায়।

দেশী পণ্ডিত বনাম বিলাতী সংস্কৃত নবীশ (Sarvants)

আমাদের দেশের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের অগাধ পাণ্ডিত্য আছে, কেহ বা বিদ্যাসাগর কেহ বা বিদ্যাবুধি, বিদ্যার্ণব। কিন্তু তাঁহাদের বিদ্যাবারিধির এক ফোঁটাও সাধারণের জ্ঞানতৃষ্ণা নিবারণ করেনা। আপামর সাধারণের নিকট জ্ঞানপ্রচার করা তাঁহারা স্বীয় কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করেননা। যদি বা সে বিষয়ে প্রয়াসী হবেন, তাহা হইলে তাঁহাদের ভাষা এমন কঠোর ও দুর্বোধ হইয়া পড়ে যে, তাহাতে তোমার আমার রসগ্রহণ করিবার যো থাকে না। সম্মুখে অনন্ত সমুদ্র, কিন্তু সুপেয় জল একবিন্দুও নাই ; খাইতে গেলে তার জলে বমনোদ্রেক হয়, তৃষ্ণা নিবারণ হয় না। water, water, everywhere but not a drop to drink.' পক্ষান্তরে বিলাতী সংস্কৃত নবীশগণের সংস্কৃতজ্ঞান অল্প, হয় তো তাহাতে ভ্রমপ্রমাদও আছে ; কিন্তু সেই সামান্য জ্ঞানটুকু তাঁহারা সাধারণে বিতরণ করিতে সর্বদাই রহস্পর ; তাঁহাদের নিকট হইতে তবু আমরা প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধে দু'চারিটা কথা জানিতে পারি। কূপের পরিধি সঙ্কীর্ণ, জলও অল্প ; কিন্তু হইলে কি হয়, পশ্চিম অঞ্চলের কূয়ার জল বড় মিঠা।

সেকাল আর একাল

সেকালের লোকে স্নানান্তে শুদ্ধ বস্ত্রে কোশাকুশি, টাট, তাম্রকুণ্ড লইয়া বসিতেন, তাহাতে পূজার উপকরণ গন্ধাক্ষত, ফুল, বিল্বপত্র তুলসী চন্দন থাকিত। আর একালের যুবক যুবতীরা স্নানের পরেই আয়না চিরুণী ক্রস লইয়া বসেন, পাউডার, স্নো, পমেটম্ এসেন্সের সদ্ব্যবহার করেন। 'একেই বলে সভ্যতা'।

চোগা

চোগাটা ঠিক যেন সিরিষাগুজের মোমটা, মাথায় নামমাত্র দেওয়া অথচ মুখটা ঢাকা পড়িবেনা। ওটুকু বাদিলেও আবার কেমন ছাড়া ছাড়া দেখায়। চোগা ও ঠিক তাই, চাপকানের উপর না পরিলেও ভাল দেখায়না, অথচ পরিলেও আলগাভাবে পরিতে হয়, বোতাম আঁটিয়া বুকটা ঢাকিয়া ফেলা হইবে না।

অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী

অনেকে যেখানে সেখানে যখন তখন বিদ্যা ফলান, ইহাকে ইংরাজীতে বলে pedantry (বিদ্যার জাঁক)। একজন ইংরেজ লেখক (J. S. Blackie) ইঁহাদের সম্বন্ধে বলিয়াছেন, যেমন তামাক খোরের কাপড়-চোপড়ে, গায়ে মুখে সর্বদা তামাকের গন্ধ, তেমনি ইঁহাদের কথাবার্ত্তায় সর্বদা বিদ্যাফলানর চেষ্টা দেখা যায়। আমাদের মধ্যে তামাকের প্রচলন এত অধিক, যে ও উপমাটায় আমাদের

মন উঠে না, তামাকখোর না বলিয়া শিরাজ-রক্তখোর বলিলে কথাটা আমাদের কাছে আরও খোরালো হইত। আমার মনে হয়, বিদ্যালাভ অনেকটা তেলমাখা বা সাবান মাখার মত। তেল মাখিয়া বেশ করিয়া গা রগড়াইয়া স্নান করিলে ময়লাটা উঠিয়া যায়, কিন্তু তেল মাখার ফলে চামড়াটা বেশ মসৃণ ও স্নিগ্ধ হয়। সেইরূপ প্রকৃত পক্ষে বিদ্যালাভ করিলে স্বভাব, চরিত্র, আচার, ব্যবহার, কথাবার্ত্তা বেশ মোলায়েম হয়। কিন্তু চাষা লোকে খানিকটা তেল জবজবে করিয়া মাখে, হয়ত তার কোনও পুরুষে একটু তেল পায় নাই, তাই একদিন ভদ্রলোকের বাড়ীতে মজুরী করিতে আসিয়া সে আধপোয়া তেল গায় চালিল, মাথার চুল হইতে চুঁচিয়া তেল পড়িতে লাগিল। pedant এর অবস্থাও তাহাই। হয়ত বংশের মধ্যে বা গ্রামের মধ্যে বা সব শ্রেষ্ঠীর লোকের মধ্যে তিনিই কোনও সুযোগে কিঞ্চিৎ বিদ্যা উদরস্থ করিয়াছেন, তাই সর্ব্বদা চালচলনে কথাবার্ত্তায় সেটুকু জাহির করিতেছেন। দণ্ডে দণ্ডে খড়কে প্রমাণ ঘৃতের চেঁচুর তুলিতেছেন। সাবান মাখিলে গায়ের ময়লা কাটে, চর্ম্মরোগ দূর হয়। বিদ্যা শিখিলেও মনের ময়লা কাটে, চরিত্র নির্ম্মল হয়। কিন্তু আনাড়ীতে সাবান মাখিলে খানিকটা সাবানের ফেনা কাণে, কপালে লাগিয়া থাকে, সেটা ভাল করিয়া ধুইয়া মুছিয়া ফেলেনা। হয়ত লোককে দেখাইতে চায় 'আমি সাবান মাখিয়াছি।' pedantদেরও বিদ্যার ফেনা তাহাদের কথাবার্ত্তায় লাগিয়া থাকে। কাদালীরামের গোঁফে দুধের সর লাগাইয়া আঁচাইতে যাওয়ার গল্প মনে পড়ে।

বালির পিণ্ডি

কলিকাতায় ও মফঃস্বলের অনেক বেসরকারী স্কুল কলেজে প্রকৃতরূপে শিক্ষা দেওয়ার কোনও সরঞ্জাম নাই; ভাল পুস্তকাগার নাই, ভাল শিক্ষক নাই, কলেজ বা স্কুলগৃহটি পর্য্যন্ত নিতান্ত সঙ্কীর্ণ ও নোংরা। চাল নাই তরওয়াল নাই নিধিরাম সর্দ্দার। এইরূপ বিনা আয়োজনে ছাত্রদিগকে যোগে যোগে পাশ করানর বন্দোবস্ত ঠিক যেন দরিদ্র সন্তানের পিতৃশ্রেতকৃত্যে বালির পিণ্ডির ব্যবস্থা: পিণ্ড পুরুষের পেটভরে না, কোনও রকমে ঠাট বজায় রাখা যায়।

যাত্রার দল না কলেজ

কলিকাতার বেসরকারী কলেজগুলি এক একটী যাত্রার দল; প্রোফেসারেরা ঘুড়ী, এক এক বিষয় যোড়া যোড়া প্রোফেসার আছেন। তাঁহারা ঘুড়ীর গানের ধরণে কখনও দক্ষিণে কখনও বামে মুখ ফিরাইয়া বক্তৃতা (বা কথকতা) করেন বটুয়া সকল শ্রোতার মন রাখা হয় না। যাঁহার বক্তৃতা জমিয়া যায়, তাঁহারই জয় জয়কার; সে কলেজে ছেলের ভিড় জমে। আবার পাকা ঘুড়ীরা কখনও কখনও চটিয়া বাহির হইয়া নূতন দল খোলেন। কোনও কোনও কলেজ স্থাপনার ইতিহাসও ঠিক এইরূপ।

এই সব দেখিয়া শুনিয়া ভরসা হয়, যদি হাল আইনে ফলে এ সকল কলেজ উঠিয়া যায়, তবে কলেজওয়ালারা স্বচ্ছন্দে এক একটা থিয়েটার বা যাত্রার দল খুলিতে পারেন। তাঁহারাও বোধ হয় আখেরের কথা ভাবিয়া আগে হইতেই ছেলেদের তালিম করিতেছেন; সেই জন্যই প্রত্যেক কলেজেই এক একটা সখের থিয়েটারের আখড়া দেখা যায়।

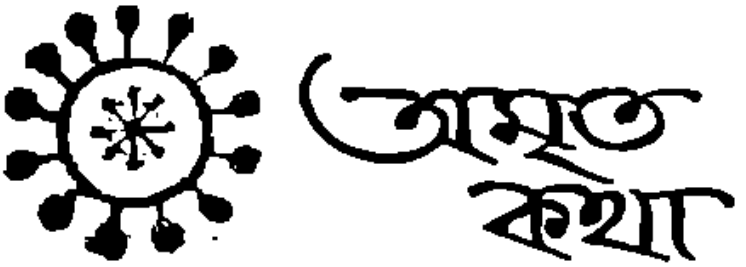

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের কথা—

জাহাজ যেদিকে থাক না কেন কম্পাসের কাঁটা উত্তর দিকেই থাকে, তাই জাহাজের দিক ভুল হয় না; মানুষের মন যদি ঈশ্বরের দিকে থাকে, তাহলে তার আর কোন ভয় থাকে না। ইট বা টালি যদি কোন ছাপ শুদ্ধ পোড়নো হয় তো পোড়াবার পর সে ছাঁচ আর কিছুতেই উঠেনা। সেই রূপ ভগবানে ভক্তি লাভ করে একটু পেকে যদি তোমরা সংসারে ঢোক, তাহলে সে ভক্তি চিরকাল থাকবে; কাম কাঞ্চন তোমাদের একেবারে সংসারে ডুবিয়ে ফেলতে পারবেনা। সংসার ধর্ম, তাতে দোষ নেই। কিন্তু ঈশ্বরের পাদপদ্মে মন রেখে কামনা শূন্য হয়ে কাজ কর্ম করবে। এই দেখনা, যদি কাক পিঠে একটা ঝোঁড়া হয়, সে যেমন সকলের সঙ্গে কথাবার্তা কয়, হয়তো কাজ কর্মও করে, কিন্তু যেমন ঝোঁড়ার দিকে তার মন পড়ে থাকে, সেই রকম।

একটা ভাব পাকা করে ধরে তাঁকে আপনার করে নিতে হবে, তবে তো তার উপর জোর চলবে। এই দেখনা, প্রথম প্রথম একটু আধটু ভাব যতক্ষণ ততক্ষণ 'আপনি মশাই' ইত্যাদি লোকে বলে থাকে, যেই বাড়ল, আর তখন 'তুমি—তুমি—তুমি'—আর তখন 'আপনি—টাপনি' গুলো বলা আসেনা; যেই আরও বাড়ল, আর তখন 'তুমি—তুমিতে' মানে না; তখন 'তুই-মুই'! তাঁকে আপনার করে নিতে হবে তবে তো হবে। যে ভগবানের জন্য সব ছেড়েছে, তাঁকে আপনার করে নিয়েছে সে তাঁর উপর জোর করে বলে, তোর জন্যে সব ছাড়লুম, এখন দেখা দিবি কি—না—বল্?

কার মুখ মনে পড়ে গো? সংসারে কাকে ভালবাস বল দেখি? ভাইপোকে? বেশ তো? তার জন্যে যা কিছু করবে তাকে খাওয়ান, পরান ইত্যাদি—সব গোপাল ভেবে কোরো। যেমন গোপাল রূপী ভগবান তার ভিতর রয়েছেন, তুমি তাকেই খাওয়াচ্ছ, পরাচ্ছ, সেবা করছ, এই রকম ভাব নিয়ে ক'রো। মানুষের করছি ভাববে কেন গো?

সব লোক বাবুর বাগান দেখে অবাক—কেমন গাছ, কেমন ফুল, কেমন ঝিল, কেমন বৈঠকখানা, কেমন তার ছবি এই সব দেখেই অবাক। কিন্তু কই বাগানের যে বাবু তাঁকে খোঁজে কজনা? বাবুকে খোঁজে দুই একজনা। ঈশ্বরকে ব্যাকুল হয়ে ডাকলে তাঁকে দর্শন হয়, তাঁর সঙ্গে আলাপ হয়, যেমন আমি তোমাদের সঙ্গে কথা কচ্ছি। সত্য বলছি দর্শন হয়। একথা কারেই বা বলছি, কে বা বিশ্বাস করে।

আচার্য প্রফুল্ল রায় যথার্থ মন্তব্যই করেছেন যে তিনি যদি স্বাধীনদেশে জন্ম গ্রহণ করতেন, জীবনের কর্মক্ষেত্র হিসাবে নির্বাচন করতেন রাজনীতি তবে তিনি নিশ্চয়ই বিসমার্ক—এর মতো বিখ্যাত রাজনীতিক হতে পারতেন। বিসমার্ক-এর মতো তাঁর ছেতরেও ছিল মেধা, সাহসিকতা আর বজ্র-কঠিন ইচ্ছাশক্তি। তাঁর জীবনের প্রধান কর্ম-ক্ষেত্র শিক্ষা-জগৎ। রাজনৈতিক জগতের তুলনায় অনেক বেশি অনুদ্ঘোষিত, অনালোকিত, প্রচ্ছন্ন, কিন্তু তা ব'লে কম জরুরী নয়। তাঁর কর্মক্ষেত্র রাজনৈতিক মঞ্চের মতো প্রখর আলোকে স্নাপিত ছিল না বলেই বোধহয় তিনি আমাদের কাছে যতখানি পরিচিত, আমাদের মধ্যে সেই পরিমাণে ততখানি উচ্চারিত নন। তিনি যেন ইচ্ছে ক'রেই বেছে নিয়েছিলেন স্থপতির কাজ—যিনি কারো বাহবার অপেক্ষা না রেখে, সকলের অগোচরে নিজের কাজ ক'রে যান নিঃশব্দে। হয়তো ভিত তৈরি করতেই কেটে যায় তাঁর সমস্ত জীবন, ওপরকার ভবনটির নির্মাণের কাজ প'ড়ে থাকে ভবিষ্যৎ আর পরবর্তীদের জন্য। পৃথিবীর অসংখ্য প্রাচীন স্থপতির নাম যেমন একদিন কালস্রোতে লুপ্ত হয়ে গেছে আশুতোষের নামও হয়তো তেমনি একদিন লুপ্ত হবে। কিন্তু সেদিনও তাঁর নামহীন দান নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে জীর্ণ স্বাধীনতা-কীর্তি।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায় দেশকে এত ভালোবাসতেন যে স্বদেশী ছাড়া জীবনে আর কিছুই যেন জানতেন না। স্বদেশী আহার—বিহার, স্বদেশী চালচলন, স্বদেশী পোশাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার—এই ছিল তাঁর জীবনের প্রধান বৈশিষ্ট্য। সর্বস্থানে, সর্বকালে তিনি নিজের এই স্বাতন্ত্র্যটুকু বজায় রেখে চলেছেন। যখন হোমরা-চোমরা রাজপুরুষেরা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসতেন তখনও তিনি নিজের বৈশিষ্ট্য এতটুকু ক্ষুণ্ণ না ক'রে তাদের সঙ্গে দেখা করতেন। তাঁর বাড়িতে এসে সাহেব-সুবারা বহুক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছে তাঁর সঙ্গে আলাপ করার জন্যে—এ দৃশ্য তখন মোটেই বিরল ছিল না। একবার ডিরেক্টর অব পাব্লিক ইন্স্ট্রাকশন মিঃ হার্টেল এসেছিলেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। খালি গায়ে ব'সে ছিলেন আশুতোষ। তিনি আসছেন খবর পেয়ে একবার ভাবলেন মেরজাই গায়ে চাপিয়ে নেন। কিন্তু পরের মুহূর্তেই মত বদলে আগের বেশেই তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন আশুতোষ। বাড়ির বাইরে যখন যেতেন তখনো ধার ধারতেন না বিজাতীয় বেশ-ভূষার।

স্যাডলার কমিশন আসছে কুচবিহার ভিক্টোরিয়া কলেজ পরিদর্শনে। ছোট শহরটি জেগে পড়েছে ষ্টেশনে। ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করছে অধীর জনতা। ট্রেন এসে থামল। একে একে ট্রেন থেকে নামলেন কমিশনের জীঘরেল সব লোক। কোট-প্যাণ্ট পরিহিত প্রত্যেকেই। তাঁদের মধ্যে কেবল একজনকে দেখা গেল বাঙালী পরিচ্ছদে। তিনি স্যার আশুতোষ। স্যাডলার কমিশনে অন্যতম সদস্য রূপে বঁরাবর কাজ ক'রে গেছেন ধুতি আর কোট প'রে।

আশুতোষ পরতেন বঙ্গললনার ধুতি। গায়ে থাকত একখানা চাদর। স্বেচ্ছায় গ্রহণ ক'রেছিলেন পূর্বপুরুষদের নিরাড়ম্বর জীবন-যাত্রা। যে যুগে বিদেশী পোশাক পরাই ছিল ভদ্রতা, ব্যক্তিগত জীবনে উন্নতির সহায়ক সেই যুগের মাঝখানে দাঁড়িয়ে তিনি পরিচয় দিয়েছেন দুঃসাহসিক স্বাতন্ত্র্যের। যারা স্যার আশুতোষকে বাড়িতে নিজের চোখে দেখেছেন তাদের তাঁকে মনে হয়েছে বিরল বসন তপস্বী। সন্ন্যাসীর বৈরাগ্যের বহিঃ প্রকাশ তাঁর সৈরিকে, আশুতোষের স্বাদেশিকতার বহিঃ প্রকাশ তার দেশীয় পোশাক-পরিচ্ছদে।

স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় আর স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়—এঁরা দু'জনেই ছিলেন খাঁটি

ভারতীয়, যাঁটি বাঙালী। দুজনেই ছিলেন উচ্চবংশের সন্তান, নিজের পারিবারিক জীবনে কর্তব্য-পরায়ণ, প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং পরম মাতৃভক্ত। ঐাদেরই শাসক লর্ড কার্জন আশুতোষকে জানালেন: "আপনার মা'কে বলুন স্বয়ং ভারতের ভাইসরয় এবং ভারতের গভর্ণর জেনারেল আপনাকে হুকুম করছেন। বিলেত যাবার জন্য।" নির্ভীক আশুতোষ সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন: "ভাইসরয় আর গভর্ণর জেনারেলকেও জানাচ্ছি নিজের মায়ের হুকুম ছাড়া আর কারো হুকুমই আশুতোষ মুখার্জি তামিল করেন না।" সত্যি, মায়ের আদেশই ছিল এঁদের দু'জনের কাছে সর্বশেষ আদেশ।

আশুতোষ ছিলেন নির্ভীক, অসমসাহসী। অন্যায়ের সঙ্গে, অসত্যের সঙ্গে রফা করতে তিনি জানতেন না। দেশের সম্মান আর আত্মমর্যাদা রক্ষার জন্য দরকার হলে অতি পরাক্রান্ত প্রতিপক্ষের অসন্তোষ উৎপাদনেও তিনি দ্বিধা করতেন না। তাঁর তেজদৃপ্ত জীবনের বহু ঘটনা তো আমাদের কাছে প্রবাদ-বাক্যের মতোই পরিচিত।

পাঞ্জাব—কলকাতা মেইল-এর প্রথম শ্রেণীর কামরায় চেপে কলকাতায় ফিরছিলেন আশুতোষ। তাঁর পরণে কোর্তা আর ধুতি। পায়ে জুতো। কামরায় ছিলেন সহযাত্রী একজন ইংরেজ মিলিটারী অফিসার। ইংরেজ অফিসার অবজ্ঞার চোখে তাকিয়ে দেখলেন আশুতোষের বেশভূষা। তাঁর ইংরেজ আভিজাত্য আর অহংকারকে যেন ঠাট্টা করছে ওই 'কালা আদমী'র পোষাক-পরিচ্ছদ। ভীষণ রাগ হল ইংরেজ অফিসারটির। রাত্রিবেলা আশুতোষ যখন ঘুমিয়ে পড়েছেন তাঁর পাদুকাজোড়া তিনি ছুঁড়ে ফেলে দিলেন চলন্ত ট্রেনের কামরা থেকে একেবারে-বাইরে। জুতোর ওপরই বোধ হয় তাঁর রাগ ছিল সবচেয়ে বেশি।

সকালবেলা জুতোজোড়া দেখতে না পেয়ে আশুতোষ বুঝতে পারলেন এই পাদুকা অন্তর্ধানের মূলে আছে ইংরেজ অফিসারটিরই কারসাজি। আশুতোষ মুখে তখন কিছু বললেন না।

এর পরে অফিসারটি যখন বাথরুমে ঢুকলেন আশুতোষ তাড়াতাড়ি উঠে সাহেবের পোশাক টুপিটি ফেলে দিলেন বাইরে।

ইংরেজ অফিসার ফিরে এসে দেখেন তাঁর টুপিটির পাত্তা নেই। আশুতোষকে চোখ রাঙিয়ে জিজ্ঞেস করলেন: "আমার টুপি কোথায়?"

আশুতোষ একটুও ভয় না পেয়ে জবাব দিলেন: "তোমার টুপি আমার জুতো তালাস করতে গেছে।"

এমনি ছিলেন আশুতোষ। সূর্যের মতোই তেজস্বী, বীর যোদ্ধার মতোই অকুতোভয়, স্বাধীন-চেতা মানুষ।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায় জানতেন জ্ঞানই প্রকৃত শক্তি। সেই শক্তি যদি এ দেশের মানুষকে অর্জন করতে হয় তবে চাই শিক্ষার প্রসার। তখনকার দিনের অনেক রাজনীতিক এ কথাটি মোটেই উপলব্ধি করেননি। ১৯০৬ সালে ভাইসচ্যান্সেলর হিসেবে আশুতোষের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দান শুধু বাংলার নয়, সমগ্র ভারতেরই উচ্চ-শিক্ষার ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা। স্যার আশুতোষ ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণপুরুষ। তিনি নেই, তাই আজ এই বিশ্ববিদ্যালয় ভিমিত। তখন বাংলায় যে নব জাগৃতি দেখা দিয়েছিল তার অন্যতম ধারা উৎসারিত হয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে দিয়ে। আর আশুতোষই তো প্রথম সেতু স্থাপন করেছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় আর বাংলার নতুন

সংস্কৃতির মাঝখানে। পারাপার সহজ হল। বিশ্ববিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ বন্ধ করার জন্য উঠে প'ড়ে লাগলেন তিনি। তা ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়কে কেবল পরীক্ষা গ্রহণের যন্ত্র না রেখে তিনি তার ভেতরে যেন পুরে দিলেন এক জীবন্ত ঋৎপিণ্ড। প্রকৃত শিক্ষা-কেন্দ্রে পরিণত হল বিশ্ববিদ্যালয়, চারদিকে উজ্জ্বল আলো বিকীরণ করতে থাকল বাতিঘরের মতো। একদিকে যেমন তিনি তরুণ বিদ্যার্থীদের বিদেশে পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন উচ্চতর শিক্ষা লাভ ক'রে এ দেশের উন্নয়নে আরো সহায়ক হবার জন্য, তেমনি তাঁর আমন্ত্রণে এ দেশেও এল পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে বহু বিদ্বান আর মনীষী। এই সজীব আদান-প্রদানে পুষ্ট হ'য়ে উঠল এ-দেশের নতুন সংস্কৃতি।

কিন্তু আশুতোষ শিক্ষা জগতে সবচেয়ে অমরীয় হ'য়ে আছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠিত বিষয়গুলির মধ্যে বাংলা ভাষা আর সাহিত্যের আসন মর্যাদার সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত ক'রে। মাতৃভাষার অনুশীলন ছাড়া জাতির শিক্ষা নিরর্থক তা অনেকে উপলব্ধি করলেও, মাতৃভাষাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বপ্রথম আশুতোষই আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দিলেন। বাংলা ভাষায় রচিত বিশিষ্ট গ্রন্থ যাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে প্রকাশ করা হয় সে ব্যবস্থাও করেন আশুতোষ।

চোখের সামনে যে বিশ্ববিদ্যালয় তখন গ'ড়ে উঠছিল তার দিকে তাকিয়ে তৎকালীন বাংলার গভর্নর মন্তব্য করলেন: "ভারতীয় সাম্রাজ্যের মধ্যে সব চেয়ে বড় আর সব চেয়ে জনবহুল মহানগরীতে যেন পাওয়া যাচ্ছে নালন্দার ছবি।"

প্রজ্ঞা, সাহসিকতা আর অফুরন্ত কর্মক্ষমতার মূর্ত বিগ্রহ, পরম আশ্বাসের প্রতীক ছিলেন আশুতোষ। স্যাডলার কমিশনের প্রধান মাইকেল স্যাডলার বলেছেন: তাঁর মৃত্যুতে শুধু ভারতই তাঁর একজন শ্রেষ্ঠ সন্তানকে হারায়নি, পৃথিবীও হারিয়েছে অসাধারণ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন একজন মানুষকে; আশুতোষকে বলা হয় বাংলার বাঘ, কেননা, বাঘের মতনই প্রবল পরাক্রমশালী ছিলেন তিনি। তিনি ছিলেন বস্তুবৎসল, ইচ্ছাশক্তি সম্পন্ন। পারিপার্শ্বিক সম্পর্কে অতি মাত্রায় সচেতন। আজকের দিনে জাতির জীবনে তিনি চিরস্থায়ী আলোক-বর্তিকা।

* * * *

নব প্রত্যুষের আশা নিয়ে আমরা কাজ করে গেছি, তবু দীর্ঘ রজনী আজও আমাদের ঘিরে রয়েছে, জানি না কতদিন থাকবে। আমরা যারা সংগ্রামের পুরোভাগে দাঁড়িয়ে, তারা হয়ত সেই উষার আলোক দেখতে পাবো না। কিন্তু সে উষা আসবেই। ততদিন পথকে আলোকিত করবার জন্য মশালকে জ্বালিয়ে রাখতে হবে।"

—জওহরলাল

মূল্য

সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

কলেজের ক্লাশ শেষ ক'রে প্রবীণ অধ্যাপক অতীন হালদার বাসের অপেক্ষায় দাঁড়িয়েছিল। টিপ্ টিপ্ ক'রে বৃষ্টি হচ্ছে। বেশ খানিকক্ষণ সময় কেটে গেল—বাসের আর দেখা নেই! দু'চারজন যাত্রী জমে উঠেছে স্টপেজে।···

বাস্ দেখা গেল। হাতের ইশারা করে অতীন থামতে অনুরোধ জানাল। বাস্ গতি একটু মন্থর ক'রেই আবার বাড়িয়ে দিলো—যা তাদের রীতি! চলন্ত বাসে উঠতে গিয়ে একজনের গায়ে ধাক্কা দিয়ে টাল্ সামলালো অতীন। বাস্ চাইবার আগেই লোকটি খেঁকিয়ে উঠলো, "কিরকম বুড়ো মশাই? চোখের মাথা খেয়েছেন?" অতীন কোনও উচ্চবাচ্য করলো না। ঘটনাটা এতই অপ্রত্যাশিত যে কথা বলার প্রবৃত্তি বা ইচ্ছা কিছুই হ'ল না। পরের স্টপেজে লোকটা নেমে গেল। চাপা উত্তেজনায় কান দুটো তার লাল হ'য়ে উঠলো। সারা পথ একটা অহেতুক অস্বস্তির মধ্যে অতিক্রম ক'রে বাড়ী ফিরলো অতীন।···

একী হ'ল? কেমন ক'রে সম্ভব হ'ল? জীবনে সম্মানের ডালি তার যে শুধু পেয়েছে শ্রদ্ধা-প্রীতি, আজ একি শুনতে হ'ল তাকে। স্কুল-মাষ্টারের ছেলে অতীন হালদার অর্থের প্রাচুর্য দেখেনি সত্য, কিন্তু সেটা পুষিয়ে দিয়েছে প্রভার প্রাচুর্যে। বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরব—স্বর্ণ-রৌপ্যপদকের বিপুল অধিকারী—সোনার ছেলে সে। সম্মান—শুধু সম্মানে পেয়েছে আকণ্ঠ আর কিছু ঈর্ষাকাতর সহপাঠি-আত্মীয়-পরিচিতজন। সম্মানের মূল্য সে জানে—সে দেখেছে শুধু নিজের জীবনে নয়, তার স্কুল মাস্টার বাবার জীবনেও। ষাট টাকার মাস্টার জ্যোতিঃপ্রকাশের জীবনেও। ছাত্রমহলে কী অসীম শ্রদ্ধা, কী বিপুল জনপ্রিয়তা নিয়ে জ্যোতিঃপ্রকাশ শান্তিপূর্ণ জীবন কাটিয়ে গেছেন—সে তা দেখেছে। অর্থ তাই তার কাছে তুচ্ছ—যেটুকু প্রয়োজন, তার অতিরিক্ত মূল্যহীন। এ শিক্ষা সে পেয়েছে তার বাবার কাছে। বাবা বলতেন, "দেখ বাবা অতীন! চাওয়ার শেষ নেই; তাই তৃপ্তিও নেই। কি কি চাই না ভেবে মানুষ যদি ভাবে কি কি না হ'লেও চলে যায়, তবে তার চাওয়া একজায়গায় থামবেই। সে তৃপ্তিও পাবে। আজকের মানুষ যে অতৃপ্তি আর তার জন্যে অশান্তি ভোগ করছে—এর একমাত্র কারণ এই চাওয়ার শেষ নেই বলেই।" সে কথা ভোলেনি অতীন। কোনও দিন বাবার শিক্ষা ভুলবেও না।

বাবা বলতেন, "সম্মান নিজের হাতে। আদায় করতে জানতে হয়। আপনা আপনি আসে না। সম্মানের যদি কোনও দেবী থাকেন, তিনি বড়ই কৃপণ। তবে জীবনে সব সামঞ্জস্য করে নিতে জানা চাই। একটা কথা সব সময়ে মনে রেখো বাবা, এই মানিয়ে নিতে পারাই জীবনে সবচেয়ে কঠিন। এবং তা না পারলেই শুধু দুঃখই পাবে। যে সব অবস্থায় মানিয়ে নিয়ে চলতে পেরেছে, যে দুঃখের সঙ্গে তাল রেখে এগিয়ে গেছে, সে-ই কেবল টিকে থেকেছে। তা নইলে কালের যাত্রার মুখ থুবড়ে কে কোথায় ছিটকে পড়েছে—কেউ মনেও রাখেনি। আমার সময়ে এই ছিল—আজ হবে না কেন? এ দাবি মনকে শুধু পীড়িত করে আসাই দেয়!"

সারা জীবন—যতদিন বেঁচেছিলেন জ্যোতিঃপ্রকাশ, একমাত্র পুত্রকে শুধু নির্দেশ দিয়ে গেছেন। ভবিষ্যৎ-জীবনের পাথেয় হিসেবে রেখে গেছেন তাঁর উপদেশ নির্দেশ। উত্তরাধিকার সূত্রে এইটুকুই পেয়েছে অতীন।

…আকাশের মেঘ এখনো কাটেনি। বাইরে হাওয়ার শীত শীত করছে। মনকে উদাস করে দেয় এই পরিবেশ। হয়তো স্মৃতি মন্থনের অবকাশ এনে দেয়।…

বাবার জীবনের নানা ঘটনা তার মনে পড়ছে। স্কুলের ছাত্র এসেছে উপহারের ডালি নিয়ে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ পরীক্ষায় জয়লাভ করেছে। এই কৃতিত্বের পেছনে শিক্ষকের অবদান-স্বীকৃতির বিনীত প্রতীক্ষা। সস্নেহে বাবা বলেছেন তার পিঠে হাত রেখে, "তুই এখনও বিষয়ী হতে পারলিনারে! কবে তোকে পড়িয়েছিলাম, সে কথা মনে রেখে শ্রদ্ধা জানাতে এসেছিস্!" গুরু-শিষ্যের অশ্রুভারাক্রান্ত সেই অসীম দৃশ্য সে একাধিকবার দেখেছে। দেখেছে এমনও দৃশ্য, যা আপাতদৃষ্টিতে বিসদৃশ। ছাত্র এসেছে উপহারের পশরা নিয়ে। বাবা অত্যন্ত সংযতকণ্ঠে বলেছেন, "তুমি এসেছ, খুবই আনন্দের কথা। বাবা, এসব জিনিস তো আমি নিতে পারবো না। এ তুমি ফিরিয়ে নিয়ে যাও!"

"কেন, স্যার, অনাদি তো আপনাকে নানা জিনিস দিয়ে গেছে। আমারটা কি তার চেয়ে খেলো?"

"দেখো বাবা, কোনও বস্তু দেওয়া তো বস্তুর মধ্যেই শেষ নয়। কেউ দিল ধুতি-চাদর, কেউ দিল মিষ্টি, কেউ দিল অন্য কিছু। এ সবই হচ্ছে প্রতীক্। কোনও ক্ষেত্রে শ্রদ্ধা জানানোর, কোনও ক্ষেত্রে বা হৃদ্য প্রকাশের। গরীব মাস্টার বটে আমি, তবুও অহংকারের দান আমি গ্রহণ করি না। আমার তো কিছুর অভাব নেই, বাবা।" নির্মমভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন জ্যোতিঃপ্রকাশ। নিজের সম্মানের কাছে অর্থ, প্রতিপত্তি, প্রাচুর্য সব কিছু তুচ্ছ করেছেন। তাতে যে মাঝে মাঝে বিপর্যস্ত হননি, এমন নয়। কিন্তু কী অসীম আত্মিক শক্তিতে সব কিছু প্রসন্ন মনে গ্রহণ করেছেন তিনি। কারুর বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ, কোনও অভিমান প্রকাশ করতে দেখেনি অতীন। সংস্কারমুক্ত, প্রগতিবাদী জ্যোতিঃপ্রকাশ। কতো ছাত্র জীবনে কতো উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সকলে যে শ্রদ্ধার সঙ্গে মনে রেখেছে, এমনও নয়। কিন্তু ছাত্র-গর্বে গর্বিত জ্যোতিঃপ্রকাশ।…

সেই পিতার পুত্র অতীন হালদার। সম্মানের মর্ম সে বোঝে, সে জানে। শুধু কি তার বাবার জীবনেই দেখেছে! তার নিজের জীবনে? তারও তো কর্মজীবন কম দিনের হল না!

নানা অসংলগ্ন চিন্তায় মনটাকে অকারণে ভারাক্রান্ত করে তোলে অতীন। বোধ হয়, এমনই হয়।

মনে পড়ে অতীনের, কর্পোরেশন অফিসে গেছে কোন্ কাজে। সিঁড়ি, দেওয়াল পর্যন্ত হাত পেতে থাকে কিছু প্রাপ্তির আশায়—এমনই জনশ্রুতি। কিন্তু অযাচিতভাবে এগিয়ে এসেছে প্রাক্তন কোনও ছাত্র। তার নামও মনে নেই, মুখটা শুধু চেনা।

"স্যার, আপনি!" সে চেনে নিয়ে গেছে অতীনকে। তাকে বসিয়ে রেখে নিজেই কাজটা করার ব্যবস্থা করে যেন কৃতার্থ হয়েছে। গেছে ব্যাঙ্কে। ওপাশ থেকে কোন্ এক ছাত্র দেখতে পেয়ে ছুটে এসেছে। দেখা স্টেশনে—প্রচণ্ড ভিড়। অতীন হালদারের কোনও অসুবিধে হয়নি—তার ছাত্র আছে। ট্রামে প্রচণ্ড ভিড়। সেই ভিড়ের মধ্যেও কোনও ছাত্র থাকলে ঠিক তার বসবার জায়গা করে

দিয়েছে। এতো বড় সম্মানের অধিকারী জগতে কে? শিক্ষকের চেয়ে ধনী জগতে কে? কিন্তু আজ একি কাণ্ড হ'ল! বাসে কি কেউ ছিল না?…

"স্যার!"

চিন্তায় বাধা পড়লো। শুয়েছিল অতীন চোখ বুঁজে। হাত দিয়ে মুখ ঢেকে। হাতমুখ পর্যন্ত ঘেমেনি কলেজ থেকে এসে। অবিবাহিত জীবন অতীনের। ঘরে তাই আসবাবপত্রের বাহুল্য নেই। সেল্‌ফে কিছু বই, কাগজপত্র, প্যাড ইত্যাদি। ছোট টেবিল, খান দুই চেয়ার ও একটা ছোট তক্তাপোষে বিছানা পাতা আছে। কিছুটা আগোছালো। কলেজের জামা পর্যন্ত ছাড়েনি অতীন। জুতো খুলে, এটাচিটা রেখেই শুয়ে পড়েছে। বড় বেশী চঞ্চল, বিব্রত ও উত্তেজিত হ'য়ে পড়েছে অতীন। একতলার এই ঘরটিই তার একমাত্র সম্বল—বলা সম্পূর্ণ পৃথক ব্যবস্থা বলে বেশ নিশ্চিন্ত আরামে তার দিন কাটে। দেখাশোনার ভার বনমালীর ওপর—বাবার আমলের চাকর। অতীনের ঘরটা বাদে রান্না-ভাঁড়ারের জায়গা ও চাকা একফালি বারান্দা। এইখানে থাকে বনমালী। এই অতীনের আবাস।

বনমালী বার দুই ঘুরে গেছে। গজগজ করে গেছে। তাতেও বিশেষ কাজ হয়নি।

"স্যার, শরীর খারাপ হয়েছে? এভাবে শুয়ে আছেন?" অনার্সের ছাত্র সোমপ্রকাশ পায়ের কাছে এসে বসলো। অতীনের পক্ষ থেকে কোনও সাড়া পাওয়া গেল না। আজ এইভাবে অপমানিত অতীন এখনও নিজেকে সামলে নিতে পারছে না। মানিয়ে নিতে বড় বেশী সময় নিচ্ছে। জ্যোতিঃপ্রকাশের সাধনা-শিক্ষা সবই কি তবে ব্যর্থ হতে চলেছে?

এখনও প্রশ্ন করে চলেছে অতীন। কেন এমন হ'ল? কেন তাকে অপমান করলো? তার তো ইচ্ছাকৃত ত্রুটি নয়! সে তো মাপ চেয়েই নিতো। তবুও কেন? বাসে কি কোনও ছাত্র ছিল না? তখন মনে হয়েছিল, বাসের লোকগুলো সকলেই যেন তার দিকে তাকিয়ে আছে, তার অপমানটাকে উপভোগ করছে। অনেকেই যেন তার মুখ চেনা; অন্ততঃ তাকে নিশ্চয় তারা চেনে। যে লোকটা কটুকথা বলেছে, সেও যেন পরিচিত মুখ। সে কি তবে কোনও প্রাক্তন ছাত্র? না—না—তা কখনও সম্ভব নয়। এভাবে আত্মবিশ্বাস হারালে অতীন সর্বহারা হয়ে যাবে।

কিন্তু বাসের মধ্যে কেউ তো এগিয়ে এলো না? নিশ্চয় দু'একজন ছিল! তাদের সম্মান দেখানো শুধু কলেজের মধ্যেই। কেউ—কেউ প্রতিবাদ করলো না—ঘটনাটা অস্বাভাবিক কিছু নয়! অতীন উত্তপ্ত হ'য়ে উঠলো। প্রচণ্ড অভিমান দেখা দিল ছাত্রদের ওপর অধ্যাপক অতীন হালদারের। প্রতিকারহীন বেদনা, যেখানে ক্রোধ প্রকাশ করতে পারে না, যেখানে অভিমান-ই দেখা দেয়।

তবে কি এইসব সম্মান সব মিথ্যা—সব ধাপ্পা—সব লোক দেখানো? এর কি তবে কোনও মূল্যই নেই? জীবনে যার ওপরে দাঁড়িয়ে কল্পনার সৌধ গড়ে তুলেছিল অতীন, আজ সেই সৌধের ভিত্তি প্রচণ্ড নাড়া খেয়ে যেন ভেঙে পড়ছে।

"স্যার!" আবার ডাকলো সোমপ্রকাশ অত্যন্ত সঙ্কুচিত কণ্ঠে।

"আজ তুমি যাও সোম—অন্যদিন এসো। আজ আমি ভালো নেই!"

কথাগুলো অত্যন্ত কর্কশ শোনালো নিজের কানেই অতীনের। পূর্ব-সূত্র জানা না থাকলে আশ্চর্য হবারই কথা! সোমপ্রকাশ বিস্মিতই হ'ল—অপ্রত্যাশিত-ও বটে! অভিমানী সোমপ্রকাশ!!

উঠে দাঁড়িয়ে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল দরজার দিকে।

"সোমপ্রকাশ!" উঠে বসেছে অতীন সব কিছু ঝেড়ে ফেলে স্বাভাবিক হতে চায় সে। ফিরে দাঁড়ালো সোম—ছল ছল চোখ তার। কাছে এগিয়ে এসে বললো অভিমান ক্ষুব্ধ কণ্ঠে, "আপনাকে বিরক্ত করলাম, স্যার! কি হয়েছে আপনার? চা এনে দেবো? গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে দেব?"

"আচ্ছা সোম, তোমাদের এই শ্রদ্ধা কি আন্তরিক না লোক দেখানো?"

"এমন কথা কেন বলছেন, স্যার!"

লজ্জিত হয়ে যায় অতীন, "না—এমনি!"·· ··

কোন্‌টা তবে সত্য? সেই অপমানটা না এই সম্মানটা? সম্মানে সে অভিভূত হয়, অপমানে চঞ্চল হয়—এতো চরিত্রের দৃঢ়তার পরিচয় নয়। জ্যোতিঃপ্রকাশের উপদেশ নিষ্প্রেষ এভাবে বিফল হ'য়ে যাবে? দাম তো সে কিছু মানুষ দিলেবেই। তার অপমানটাই বড়, সম্মানটা বড় নয়? দুঃখ-সুখ, আনন্দ-বেদনা, ভাল-মন্দ নিয়েই তো জীবন। দুটোকেই যে স্বাভাবিকভাবে মেনে নেবে, সে-ই তো যথার্থ মানুষ! সেখানেই তো তার সত্যিকারের পরিচয়! জ্যোতিঃপ্রকাশের শিক্ষাও তো তা-ই। সম্মানটা যেমন মানুষের কর্মের ফল, অপমানটাও তো তাই। দুটোই সত্য। শুধুই সম্মান পাওয়া স্বাভাবিক নয়। অপমান না থাকলে সম্মানের সত্যিকার মূল্য থাকে না। না—না—এতো সহজে চঞ্চল হওয়া শোভন নয়। সে জ্যোতিঃপ্রকাশের ছেলে—সে শিক্ষিত—সে সব অবস্থায় নিজেকে মানিয়ে নিতে জানে। সব ঝেড়ে ফেলে যেন হাল্‌কা হ'তে চায় অধ্যাপক অতীন হালদার। উৎসাহের আমেজ এনে বলে, "কিছু নয়, সোম। যাও, বনমালীকে দু'কাপ চা দিতে বলো—আর দেখি তো তোমার লেখা দু'টো। কেমন বুঝেছ, দেখি!" সোমপ্রকাশ খাতা এগিয়ে দেয়। বাইরের বৃষ্টিটা থেমেছে বটে, তবে আকাশের মেঘাচ্ছন্ন ভাবটা এখনও পুরো কাটেনি।·····

* * *

—নিরাশ হইও না। স্মরণ রাখিও, ভগবান গীতায় বলিতেছেন—'কর্মেই তোমার অধিকার, ফলে নয়।' কোমর বাঁধিয়া দাঁড়াও। প্রভু আমাকে এই কাজের জন্য ডাকিয়াছেন। সমস্ত জীবন আমি নানা কষ্ট যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছি। আমার প্রাণপ্রিয় আত্মীয়গণকে একরূপ অনাহারে মরিতে দেখিয়াছি। আমাকে লোকে উপহাস ও অবজ্ঞা করিয়াছে, জুয়াচোর বদমাস বলিয়াছে। আমি এ সমস্তই সহ্য করিয়াছি তাহাদেরই জন্য, যাহারা আমাকে উপহাস ও ঘৃণা করিয়াছে। বৎস! এই জগৎ দুঃখের আগার বটে, কিন্তু ইহা মহাপুরুষগণের শিক্ষালয় স্বরূপ। এই দুঃখ হইতেই সহানুভূতি, সহিষ্ণুতা এবং সর্বোপরি অদম্য দৃঢ়তাপূর্ণ ইচ্ছাশক্তির বিকাশ হয়—যে শক্তিবলে জগৎ চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গেলেও মানুষ একটুও কম্পিত হয় না।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

একদিন বিপর্যয় নেমে এসেছিল—সেটা ১৯৬১ সালে। প্রতিযোগিতার তালিকায় এদের একাদশ স্থানে নেমে যেতে হ'য়েছিল। কিন্তু এক বছরের মধ্যেই এরা বিপর্যয় কাটিয়ে ওঠে এবং তালিকার দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে।

ডায়নামো দলের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হোল এদের শৃঙ্খলা পরায়ণতা। খেলার মাঠে এ দলের খেলোয়াড়দের শৃঙ্খলা প্রতিপক্ষ দলের আশঙ্কার কারণ। দলের কর্তার নির্দেশ :—খেলোয়াড়ের ব্যক্তিগত নৈপুণ্য এবং দক্ষতাই দলের পক্ষে সব নয়। সর্বোপরি চাই দলগত সংহতি ও নিষ্ঠা। ডায়নামো দলের খেলায় এই নির্দেশের প্রতিফলন যথার্থই থাকে। এই দলের তিনজন শিক্ষক হ'লেন :—আলেকজাণ্ডার পোনোমারিয়ভ, সের্ভোলভ ব্লিনকভ এবং ভিক্টর প্যাভলভ। এরা এমন ভাবে দল গঠন করেন যা'তে খেলোয়াড়রা সম্পূর্ণ দলগত সংহতি বজায় রেখে বিদ্যুৎ গতিতে খেলতে পারেন। খেলোয়াড়দের মনোরঞ্জন তাঁদের দক্ষতা এবং নৈপুণ্যের ওপরই নির্ভর করে।

ডায়নামো দলের বর্তমান গোলরক্ষক লেভ ইয়াসিন (৩৪) গত দশ বছর ধরে দলের পক্ষে খেলছেন। দু' দু'বার বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতায়, অলিম্পিক খেলায় এ ছাড়া দক্ষিণ আমেরিকা কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা, এশিয়া সফরে ইয়াসিন সোভিয়েট রাশিয়ার প্রতিনিধিত্ব করেছেন। ১৯৬৩ সালে আন্তর্জাতিক খেলায় ইংলণ্ড এবং ইটালী দলের বিপক্ষে তিনি প্রশংসনীয় কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন।

সোভিয়েটের জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় ২৭টি খেলায় ইয়াসিন যোগদান করেন। তার বিপক্ষে গোল হয় মাত্র ছ'টি। সুতরাং এই সিদ্ধান্তে আসতে হয় যে—ইয়াসিনের বিরুদ্ধে একটি গোল করতে হ'লে ৪০৫ মিনিট খেলতে হবে।

ফরাসী ফুটবল পরিসংখ্যান বিদ্‌দের মতে ইয়াসিনের এই কৃতিত্ব যথার্থই বিশ্ব রেকর্ড। ইয়াসিনের খেলার ধারাও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। গোল রক্ষক যদি বল ছুঁড়ে দেয় তা'হলে তাড়াতাড়ি প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালানো যায়। ইয়াসিন এই রীতির পূর্ণ সমর্থক।

শুধু গোল রক্ষকই নন ডায়নামো দলে আরও অনেক খ্যাতনামা খেলোয়াড় আছেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন :—ব্যাক দু'জন এডওয়ার্ড মুজিক (২৪), ভিকটর জাবিয়ভ (৩২), হাফব্যাক—ভ্যালেরী কোরোলেনকভ (২৪), এবং পুরোভাগে ইগর চিসলেঙ্কো ও ভ্যালেরী ক্যাভেইয়েভ। বল আয়ত্তে রাখার নানা কৌশল জানেন ক্যাভেইয়েভ—মাথার ওপর বল রেখে তিনি অনায়াসে দৌড়তে পারেন? তাঁর এই সব কৌশল বিস্ময়ের সঞ্চার করে। দলের সেন্টার-ফরোয়ার্ড সেনাডি গুসারভ সম্প্রতি মস্কো টর্পেডো দল থেকে এসেছেন। তাঁর তীব্র গতি বিপক্ষদলের গোলরক্ষকের সর্বদাই ভীতির কারণ।

সোভিয়েট দলের সবচেয়ে বিস্ময়ের কথা যে ১৯৬৩ সালের জাতীয় প্রতিযোগিতায় ডায়নামো দলের নির্ধারণীয় দশজন খেলোয়াড়ই খেলেন নি। এঁরা এই সময় বিদেশ সফরে ছিলেন। কিন্তু খ্যাতনামা খেলোয়াড় ছাড়া খেলেই ডায়নামো দল সাফল্য অর্জন করেন। সোভিয়েট রাশিয়া, আধুনিক ফুটবলের ক্রমোন্নয় উন্নতি সাধনে ব্রতী ডায়নামো দলের বিরলস প্রচেষ্টা সর্বকালের জন্য স্বীকৃত।

টোকিওর পথে পুতাগ্নি, মশাল কোরিন্থে আগত

কোরিন্থ, গ্রীস, ২২শে আগষ্ট (এ, পি)—গতকাল ওলিম্পিয়ায় টোকিও ওলিম্পিকের জন্য যে মশালটি প্রজ্বলিত করা হয় আজ বেলা ৩-২৫ মিনিটে (ভারতীয় সময়) তাহা এখানে উপনীত হইয়াছে। সাদা স্যাট পরিহিত একটি পরিশ্রান্ত গ্রীক তরুণ উহা বহন করিয়া আনেন।

এথেন্সের পথে মশালটি এখন পর্যন্ত যাত্রাপথের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ অতিক্রম করিয়াছে। ৩৮১ জন বিদেশ যৌড়বীরের মধ্যে আড়াইশতজন ইতিমধ্যেই ওলিম্পিকের এই পূত প্রতীকটিকে গ্রীসের বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চলের মধ্য দিয়া দিবারাত্র বহন করিয়া লইয়া গিয়াছেন।

একটি সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানের পর এখানে মশালটি অন্য একজন যৌড়বীরকে দেওয়া হয়। তিনি সঙ্গে সঙ্গে করিন্থিয়ান ইসথমাসের পথে ধাবিত হন।

প্রত্যেক নগর ও গ্রামে মশালটির যাত্রাপথে জনসাধারণের হৃদয়ে একটি অতিপ্রাচীন ও মহান অনুষ্ঠানের স্মৃতি জাগিয়া উঠে।

* * * *

এই চলমান, জীবন যার নাম।

এই চলমান নদী, জীবন যার নাম, তার একমাত্র সত্য হলো, সে চলেছে, অবিচ্ছেদ অবিরাম তার গতি।

মানুষের কত পরিশ্রম, কত আকাঙ্ক্ষা, কত প্রাণপাত আবেগ আর আকুলতা, কোন মূল্য নেই তার কাছে। রাজাকে এক নিমেষে সিংহাসন থেকে নামিয়ে ধুলোয় করে ফেরে ধুলো, সারাজীবনের অক্লান্ত পরিশ্রম আর সাধনার শেষে মানুষ রেখে যেতে পারে না তার অস্তিত্ব সংকারের খরচ, সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভা আর সর্বরিক্ত ভিখিরি একই মাটির নীচে অচিহ্নিত অবস্থায় থাকে পড়ে, কোন অবাবদিহি খুঁজে পাওয়া যায় না সেই বিচারকের রায়ের, জীবন যার নাম।

আবার তার গতির রহস্যলোক থেকে কখন কি মন্ত্রে যে ধুলোকে সে পরিণত করে স্বর্ণমূর্তিতে, কাল যে পথের ধারে পড়েছিল, জগতের উপেক্ষার জঞ্জালে, রাত প্রভাতে তাকেই টেনে নিয়ে বসায় বিশ্ববাহিত সিংহাসনে, প্রাপ্তির ঐশ্বর্যে ভরে ওঠে ভিক্ষুকের জীর্ণ থলি, কেউ জানে না কি করে তার বাক্যে কুঁড়ি হয়ে ওঠে ফুল, ফুল হয়ে ওঠে ফল।

মানুষের সমস্ত বিচার বিতর্ক, অতি সূক্ষ্ম হিসেবের কড়াক্রান্তি বিভাগ, ভালমন্দের চুলচেরা বিচার, কিছুরই তোয়াক্কা রাখে না তার হৃদয়হীন গতির শুধু অবিরাম চলা।

তার কাছে একমাত্র সত্য, সে চলেছে, চিরদিন সে শুধু চলেছে, এই চলমান নদী, জীবন যার নাম।

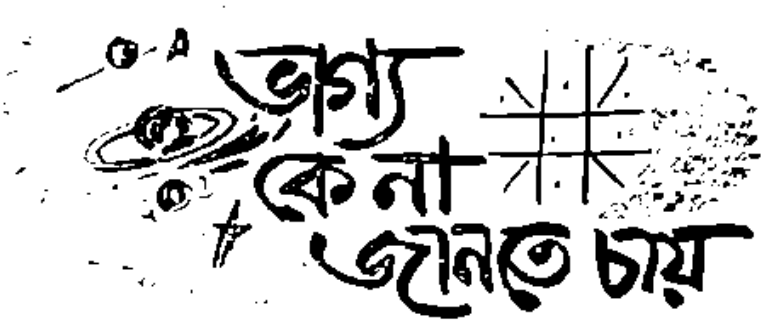

মহাভারত শর্মা

গ্রহ নক্ষত্রের অবস্থান মানুষের ওপর যে প্রভাব বিস্তার করে তার দ্বারাই মানুষ কর্ম করে যায়। তার ভাগ্য গ্রহদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত পথে এগিয়ে যায়। একথা সর্বতোভাবে যে যথার্থ তাতে অনেকে সন্দেহ করতে পারেন। সত্যই কি মানুষের ভাগ্যের ওপর গ্রহদের প্রভাব আছে? প্রশ্নের প্রথম ও প্রধান উত্তর সৌর জগতের সৃষ্টির কারণের মধ্যে নিহিত। প্রাণের সৃষ্টি ও মানুষের উদ্ভব সৌর প্রভাবে হয়েছে। সূর্য ও চন্দ্রের প্রভাব প্রত্যহ অনুভূত হয়। ঋতুর পরিবর্তনে এ দুটি জ্যোতিষ্কের প্রভাব কারো অজানা নয়। আবহাওয়ার সামান্য পরিবর্তনে মানুষের সুখ অথবা অসুখ বাড়ে। পর্যাপ্ত শস্য জন্মে। নিদারুণ শস্যহানি ও দুর্ভিক্ষের অবস্থা ঘটে। তাছাড়া নানা প্রকার রোগের প্রাদুর্ভাব ও হয়। এ সকল আবহাওয়ার দ্বারা প্রভাবিত এবং আবহাওয়ার কারণ সৌর নিয়ম। আমাদের মনের ওপর আবহাওয়ার প্রভাবে আমরা সুখী বা অসুখী হই। মানব শরীরের কতকগুলি গ্রন্থিরসের দ্বারা মানুষ ভালমন্দ কাজ করে। রাগ বা অনুরাগ, হাসি বা কান্না সবই বিভিন্ন গ্রন্থিরসের প্রভাবে প্রভাবিত। এণ্ডোক্রাইন (Endocrine) গ্রন্থিরসের নিঃসরণের ফল মানুষের মনে ভয়ের সঞ্চার।

থাইমাস্ (Thymus) গ্রন্থিরসের নিঃসরণে অস্বাভাবিক চিন্তা ঘটে। থাইরয়েড গ্রন্থি মানুষের প্রতিভা নিয়ন্ত্রণ করে। অন্যান্য যে সব গ্রন্থি আছে তাও আমাদের বিভিন্ন কার্যের কারণ স্বরূপ। সৌর নিয়ম এবং প্রভাবের ওপর এ সকল গ্রন্থির কাজ হওয়া না হওয়া নির্ভর করে। পূর্ণিমা অমাবস্যা অথবা একাদশীতে মানুষ চন্দ্র সূর্যের যথেষ্ট প্রভাব অনুভব করে। অন্যান্য তিথিতে এ প্রভাব অপেক্ষাকৃত অল্প হলেও তা অস্বীকার করা যায় না। চন্দ্র সূর্য ব্যতীত অন্য গ্রহ ও সেরূপ প্রভাব যে বিস্তার করে তাতে সন্দেহ নেই। কেন না, গণনা দ্বারা তা প্রত্যহ প্রমাণিত হয়। শুধু জন্ম সময়ে নহে, মাতৃ জঠরে ভ্রূণাবস্থায় প্রাণ সঞ্চার কালেও যে গ্রহদের প্রভাব থাকে বিখ্যাত রুশ বিজ্ঞানী অধ্যাপক জর্জেস সাবোভস্কীর তাই ধারণা। তিনি ওঁর লেখায় প্রাচীন কালের ঋষিদের অনুরূপ বিষয়ের মতবাদ সমর্থন করেছেন।

ইয়োরোপের মধ্য যুগে একদিকে কুসংস্কারের প্রাবল্য ছিল। কুসংস্কারের ইতিহাস সম্পর্কে বই পড়লে একথার সত্যতা বুঝা যায়। কিন্তু চিন্তাশীল লেখকেরা জ্যোতিষ শাস্ত্রও বিশ্বাসী ছিলেন। কিং লিয়ার নাটকে সেকসপীয়ার লিখেছেন—It is the stars, the stars above us govern on conditon" যাতে তাঁর Paradise গ্রন্থের দ্বাদশ সর্গে স্পষ্টভাবে জ্যোতিষ শাস্ত্রের উল্লেখ করেছেন। পরবর্তীকালে গোটে তাঁর আত্মজীবনীতে নিজের জন্মকাল ও কুষ্ঠীর কথা লিখেছেন।

এটা বিশেষরূপে লক্ষ্যনীয় যে বিভিন্ন গ্রহের দশা অন্তর্দশার বিশিষ্ট ফলে মানব জীবনের উত্থান পতন ঘটে। নেপোলিয়ন, হিটলার, মুসোলিনী, সম্রাট ষষ্ঠ জর্জ, সম্রাট হিরোহিতো, স্ট্যালিন —এঁদের প্রত্যেকের কুষ্ঠী আলোচনা করলে একবাক্যে সত্যতা বুঝা যায়। এখানে হিটলারের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। তাঁর কুষ্ঠীতে দেখা যায় দশমে শনি গ্রহ এবং সপ্তমে মঙ্গলের অবস্থান তাঁকে ভয়ঙ্কর মারমুখী মনোবৃত্তি দিয়েছিল। এর প্রতিবিধান করে মনে শান্তভাবে আনতে পারতো যে বৃহস্পতি গ্রহ তাঁর সমকালীন শক্তিহীনতা হিটলারকে তৎকালে দুর্ধর্ষ করে তুলেছিল। জ্যোতিষ শাস্ত্রে একথা বলা হয়েছে যে শনি মঙ্গলের পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় (অন্যান্য গ্রহের বলাবল ও অবশ্য বিচার্য) জাতককে আক্রমণাত্মক মনোভাব সম্পন্ন করে। মাদ্রাজ থেকে প্রকাশিত Astrological Magazine এ ১৯৩৭ সালে তাঁর আচরণ সম্বন্ধে "সতর্কবাণী লেখা হয়েছিল—হিটলার ও মুসোলিনীর কুষ্ঠীর সাদৃশ্যে মনে হয় তাঁরা দুজন ইউরোপকে ভয়ঙ্কর বিপদে নিমজ্জিত করবে। জাপানের সম্রাটের কুষ্ঠী এসঙ্গে আলোচনা করলে দেখা যায় এই তিন শক্তি কিরূপ নিরঙ্কুশ ভাবে আন্তর্জাতিক বিধি নিষেধ ভঙ্গ করতে বদ্ধপরিকর।" ঐ পত্রিকায় আরও কিছুকাল পরে লেখা হয়—১৯৪৪ এর অক্টোবরের পরে নবমাংশ কাল হিটলারের পক্ষে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর কাল। এ সময়েই তাঁর জীবন শেষ হবে। তাঁর অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ও নাটকীয় মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। বলবান মঙ্গল গ্রহের প্রভাবে এরূপ ঘটনাই নিশ্চিত ঘটবে।" মুসোলিনীর সম্বন্ধেও অনুরূপ উক্তি করা হয়েছিল।

রাশিচক্রের দশম গৃহ জাতকের পক্ষে অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ গৃহ। মানুষের জীবিকা ও কর্ম জীবন এই গৃহদ্বারা নিরূপিত। নবম ভাগ্যস্থান। শনিগ্রহ নবমে অথবা দশমে অবস্থান করলে (অথবা প্রথম দৃষ্টি দিলে) জাতকের সম্মানিত অবস্থা থেকে পতন ঘটায়। স্পেনের দ্বিতীয় ফিলিপ, নেপোলিয়ন বোনাপার্ট, অষ্টাদশ লুই, কাইজার, হিটলার এবং মুসোলিনীর রাশিচক্রে তা প্রমাণ করে।

ব্যক্তি জীবনের ন্যায় জাতির জীবনেও গ্রহনক্ষত্র এবং ধূমকেতুর প্রভাব দেখা যায়। আকাশে যখনই ধূমকেতু দেখা গেছে তখনই নিকটবর্তী দেশে কোন অমঙ্গল, দুর্ঘটনা ঘটেছে। মহাত্মাগান্ধীর মৃত্যুর পূর্বে ধূমকেতুর উদয় হয়েছিল। ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধে প্রাক্কালে প্রকাণ্ড এক ধূমকেতু দেখা যায়। জুলিয়াস সিজারের মৃত্যুকালে, রোমের বিখ্যাত পোপ গ্রেগরি দি গ্রেট-এর এবং বিখ্যাত সম্রাট শার্লমেনের মৃত্যুকালে ধূমকেতুর আবির্ভাব হয়েছিল। প্রাচীন গ্রীসে সালামিস এর যুদ্ধ এবং পিলোপনিসিয়ান যুদ্ধ, হুণ নেতা আত্তিলার রোম লুণ্ঠনের সময় ধূমকেতুর আবির্ভাব হয়েছিল। আরও বিখ্যাত ঘটনা এবং দুর্ঘটনার সঙ্গে ধূমকেতুর উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে।

• • •

…সত্য তো সূর্য অপেক্ষাও ভাস্বর, একদিন তাহার প্রকাশ হইবেই, সত্যকে খাটো করা যায় না, সত্যের অভিনয় চলে না। ছেলেরা ক্রীড়াচ্ছলে সূর্যকে আড়াল করে, কিন্তু সূর্য তাহাতে ঢাকা পড়ে না।"

—মহাত্মা গান্ধী

ছুটকি

অঃ কুঃ ঙঃ

সকাল থেকেই হুলুস্থুল ব্যাপার।

ইট, চুন, শুরকী এমন কী দুশ্প্রাপ্য সিমেন্টের বস্তা রাতারাতিই জোগাড় হয়ে গেছে। দু'জন মিস্ত্রি এসেও হাজির। বাঁশ আর দড়ি দিয়ে ভারা বাঁধা হচ্ছে।

পাশাপাশি দুই বাড়ি। শৈলপতি ঘোষাল আর রামপতি সান্যাল। অভিন্ন হৃদয় দুই বন্ধু। এক প্রাণ, একমন। দুটি পরিবারের পাশাপাশি দু'খানি বাড়ি! একই সঙ্গে সহরতলীর এই অঞ্চলে জমি কেনা, বাড়ি তৈরী করা। দুই পরিবারের দু'খানি স্বতন্ত্র বাড়ি বটে। মাঝে দুটি ছোট পাঁচিলও। তবে পাঁচিলে বাধা'র বা অবরোধের সৃষ্টি হয়নি। এ-বাড়ির ভালোতে ও-বাড়ির আনন্দ, ও-বাড়ির দুঃখ, শোক অশান্তিতে এ-বাড়ি বিমর্ষ। একপ্রাণ, একতা।

আর্থিক এবং সামাজিক সম্পর্কে দুই পরিবারই সম্ভ্রান্ত।

এ-বাড়ির গিন্নী ও-বাড়ির গিন্নীর দিদি—যেন আপন আত্মজা।

ও-বাড়ির মেয়ে এ-বাড়ির ছেলের প্রিয়তমা।

এমনই সম্পর্ক যেখানে, সেখানে আবার বিরোধ কিসের?

শৈলপতিবাবু সরোষে হুঙ্কার ছাড়লেন, 'সবুর মিঞা এমন শক্ত করে পাঁচিল গাঁথবে যেন ও-শালার চোদ্দ পুরুষের সাধ্য না থাকে যে এ পাঁচীল ভাঙে!'

রামপতি সান্যালও ছাড়বার পাত্র নন, 'রামদয়াল, বিলকুল সিমেন্ট লাগাও, আউর বহুত উঁচা করো. এতনা উঁচা যো শালা লোককা মু নেহি দেখা যায়েগা।'

তর্জন, গর্জন, আস্ফালন। সকাল থেকেই সারা পল্লী সচকিত হয়ে উঠেছে। কিন্তু ব্যাপারটা কী?

বেড় কিলো একটা ইলিশ মাছ—রূপোর মতন ঝকঝকে।

মুদির দোকানে কালো চাকনায় ঢাকা ছিলো। সকালবেলা প্রতিবেশি দুই বন্ধু শৈলপতি এবং রামপতি ভাল-মন্দ লওয়া করতে গিয়ে আবিষ্কার করলেন বেড় কিলোর ইলিশ। দরাদরি থেকে মন কষাকষি।

'আট টাকা।'

'দশ টাকা।'

'বারো।'

'পনের।'

'দূর শালা পাড়ের ওলার স্যাঙেল, বড়ো পয়সার গরম দেখছি যে।'

'দুই শালা বেলের ঘোড়ার ঘুষের আদ্দ হলাম, সবে তো ঘোড়ার ঘাসটিতে দু'পয়সার মুখ দেখেছিস।' তারপর অশ্রাব্য গালাগালি। কণ্ঠস্বর গ্রাম থেকে গলগ্রাম।

চেঁচামেচিতে পাড়ার লোকজন জড় হয়। পুলিশ আসার উপক্রম। এতক্ষণে দুঁদের কানে। চাকরা থেকে ইলিশ উধাও।

পরিণতি রাত্রি প্রভাত না হতেই দু'বাড়ির দু'পাশে টিনের পাঁচিল। এ-বাড়ির কর্তা ও-বাড়ির কর্তা, এ-বাড়ির গিন্নী ও-বাড়ীর গিন্নী আর তাই তাই বোন বোন নয়। শুধু এ-বাড়ির আইবুড়ো ছেলে আর ও-বাড়ির আইবুড়ো মেয়ে ক্ষুব্ধ অভিমানে প্রতিজ্ঞা করে,—জীবনে আর তারা ইলিশ মাছ ছোঁবে না।

• • • •

হলধর খুড়োর বাড়ির জমি সংলগ্ন এক টিলতে জমি; কিছু শাক-সব্জি ভরা। সেইখানে এক টিউবওয়েল।

আড়তি-বাড়তি ফলের জলে জমি থাকে সরস। দুর্মূল্যের বাজারে ফলন্ত শাকসব্জি সংসারের আয় পয়।

সেই জমি কালা কালা করে খুঁড়ে চলেছেন খুড়োমশাই,—সঙ্গে খুড়ি। শাবল আর কোদাল চালাতে চালাতে খুড়োর হাত ভারি হয়ে এলে গাছ কোমর শাড়ি এঁটে খুড়িও শাবল আর কোদাল ধরছেন।

খুড়ো-খুড়িকে এ বেশ অবস্থায় দেখে বিস্মিত হলাম।

'খুড়ো ব্যাপার কী?'

'হেঁ হেঁ',—খুড়ো একটু হাসলেন। চোখের ইশারায় খুড়ি যেন কী বললেন।

খুড়ো-খুড়ির ছোট মেয়ে পুঁটি কেবল আড়ালে বললে, 'তা বুঝি জানেন না! কেন কাগজ পড়েন নি?'

'কাগজে কী আছে?'

'টিউবওয়েলের জলের মধ্যে পেট্রোল!'

স্মরণ করলাম। হ্যাঁ, ঠিকই। সংবাদে প্রকাশ হাওড়া শহরের এক রাস্তায় টিউবওয়েলের জলের মধ্যে পেট্রোলের স্পর্শ পাওয়া গেছে বটে।

জিজ্ঞেস করলাম, 'হ্যাঁ পুঁটি, তা তোমাদের কলের জলে কী কিছু পাওয়া গেছে নাকি?'

পুঁটি বললে, 'হ্যাঁ, সর্ষের তেল। আজ দিদি আর জামাইবাবু আসবেন কিনা তাই।'

খুড়ি ডাকলেন, 'পুঁটি এদিকে আয়!'

পুঁটির চোখে ভীতির ছায়া, 'ও কথা বলিনি মা।'

• • • •

প্রাসাদসম অট্টালিকা। পাশাপাশি দু'খানি ঘর। বাসে এবং ঝকঝকে!

বামদিকের ঘরে একটি তক্তাপোষ, ছেঁড়া সেতরঞ্চি বিছানো। দেয়ালে বড় বড় পোষ্টার, পোষ্টার ভর্তি বামপন্থী রাজনৈতিক শ্লোগান। অর্ধভুক্ত, অনাহারক্লিষ্ট মনুষ্যের প্রতিকৃতিও দেয়ালজোড়া।

কবির চাঁদ কুণ্ডুর ব্যারিস্টার এ্যাট্‌ল—সেই ঘরেই বসেন। বামপন্থী ঘেঁষা মনোভাব। পরণে পায়জামা গায়ে খাটো পাঞ্জাবি কাঁধের কাছে একটু ছেঁড়া। ডাকে চা খান এবং অতিথি সজ্জনকে খাইয়েও

থাকেন। সোনে ক্লকের সমিষ্ট শব্দের সাথে পোড়া বিড়ির ধোঁওয়া মিশতে দেখা যায় তাঁর ঘরে। কেস করেন হাইকোর্টে। বিবাহ-বিচ্ছেদ,—দেবার ট্রাইবুন্যাল,—রাজনৈতী আন্দোলনের মামলাও। পাড়ার ছেলেরা এলো—সার্বজনীন দুর্গাপূজার চাঁদা চাইতে।

ফুসফুসে ফকিরচাঁদ বললেন, 'দেশে অভাব-অনাটন; আর দুর্গোৎসবের পূজো! ইট্ ইজ্ ক্রিমিন্যাল।'

পাড়ার ছেলেরাও নাছোড়-বান্দা, 'তা হলে সামনের ইলেকশনে দেখা যাবে।'

ফকির চাঁদের কণ্ঠস্বর কোমল হয়ে এলো। ছেলেদের নিয়ে ঢুকলেন পাশের ঘরে।

সে ঘরে প্রৌঢ় বনস্পতি কুবের। চালানি কারবারের ওপরনে লক্ষপতি, প্রসন্ন হাসিতে অভ্যর্থনা জানালেন প্রতিবেশি ছেলেদের।

এক ইঞ্চি নেমে যাওয়া ভানলো পিলোর আরাম কেদারার আশে পাশে দামী মুসন্দী চায়ের আসর বসলো।

বনস্পতি বললেন, 'ধর্ম? ধর্মচ্যুত হয়েই তো আমাদের এই দুরবস্থা। তোমরা যুবকবৃন্দ এ-কাজে যে ব্রতী হয়েছো এ পরম আশ্বাসের কথা। তবে বড় দুর্বৎসর। তবুও আনন্দময়ী মায়ের আশীর্বাদ জাতির এ-দুর্দিনে আমাদের চাই-ই।

চাঁদার খাতায় লিখলেন একশো টাকা। বনস্পতির ঘর ওয়ধ্বনিতে মুখর হয়ে উঠলো।

'কিন্তু শোন। আমি বৃদ্ধ হয়েছি। আমি আর এ বয়সে ও ইলেকশনের ঝামেলায় যেতে চাইনে। আর এখন জনগণের যুগ। জনগণের প্রতীক আমার ছেলে—দেশের দুঃখে ফকিরী নিয়েছে। ওকেই কিন্তু ভোটে দাঁড় করিও তোমরা!'

• • •

বিখ্যাত মহিলা উপন্যাসিক মেরি করেলি একবার ভুল করে রাত্রে এক গোরস্থানে ঢুকে পড়েন। গোরস্থানটি পাঁচিল দিয়ে ঘেরা আর নির্জন স্থানে অবস্থিত।

গোরস্থান রক্ষকেরা তিনি যে সেখানে আছেন সেটা না জানতে পেরেই গেটে চাবী দিয়ে বাড়ী চলে গেল।

একাকিনী সেই নির্জন গোরস্থানে থাকতে হোল মেরি করেলিকে। সারারাত কি এক মানসিক যন্ত্রণা নিয়ে রইলেন তিনি। অপূর্ব সে অনুভূতি, কি এক বিভীষিকাময় চেতনা। একটা গভীর নৈরাশ্যের কালোছায়া।

ভোরবেলায় রক্ষকেরা গেট খুলে তাঁকে দেখে অবাক্।

কিন্তু মেরি করেলির মুখে তখন উল্লাসের হাসি। তিনি পেয়ে গেছেন কিছু সাহিত্য সম্পদ্।

তার কিছুদিন পরেই প্রকাশিত হোল তাঁর Sorrows of Satan.

চিঠিশুদ্ধু চিঠি নয়

'পলাশীর যুদ্ধ'—প্রণেতা কবিবর নবীনচন্দ্র সেন 'সিরাজদ্দৌলা' নাটক প্রণেতা শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষকে নিম্নলিখিত পত্রখানি ১১নং ইডেন রোড, হেদুয়া হইতে ১৯০৯ খৃঃ, ২৪শে ফেব্রুয়ারী তারিখে লেখেন :—

'ভাই গিরিশ !

২০ বৎসর বয়সে 'পলাশীর যুদ্ধ' লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। ৬০ বৎসর বয়সে তুমি 'সিরাজদ্দৌলা' লিখিয়াছ শুনিয়া তাহার একখানি আমোঘ এই চার পড়া শেষ করিয়াছি। তুমি আমার অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী, আমার অপেক্ষা অধিক ভাগ্যবান। আমি যখন 'পলাশীর যুদ্ধ' লিখি, তখন সিরাজের শত্রু-চিহ্নিত আলেখ্যই আমাদের একমাত্র অবলম্বন ছিল। ভগবান তোমাকে আরও দীর্ঘজীবী করিয়া বঙ্গসাহিত্যের মুখ আরও উজ্জ্বল করুন !

আমি নবযুবক সিরাজের পত্নীর মুখে শোক-সঙ্গীত প্রথম সংস্করণ 'পলাশীর যুদ্ধে' দিয়াছিলাম। শোকের সময়ে সঙ্গীত মুখে আসে কি না বড় সন্দেহের কথা বলিয়া বঙ্কিমবাবু বলিয়াছিলেন। সেইজন্য আমি সঙ্গীত পরে উঠাইয়া দিয়াছিলাম। তুমি চিরদিন গোঁয়ার। দেখিলাম, তুমি সেই সন্দিগ্ধ পথ অবলম্বন করিয়াছ।

তোমার 'গীতাবলীর' সঙ্গে তোমার জীবনী প্রকাশিত হইয়াছে দেখিয়া উহার একখণ্ডও পাঠাইতে গুরুদাস বাবুকে লিখিলাম। এই সুদূর প্রবাস হইতে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, তোমার অদ্ভুত জীবন যেন সুখ-শান্তিতে শেষ হয় !

স্নেহাকাঙ্খী—শ্রীনবীনচন্দ্র সেন।

• • • •

অসহযোগে দেশ ভরে গেল,—স্নেহের বাঁধন শ্রদ্ধার বাঁধন চুর হয়ে এলো কিসের জন্য জানো ? তোমাদেরই দু'দশ জনের দোষে,—শিক্ষিতের বিরুদ্ধে শিক্ষিতের অভিযানে।

—শরৎচন্দ্র

বীরবলের কৌতুক

বররুচি

সম্রাট আকবর তাঁর অন্যতম সভাসদদের মধ্যমণি বীরবলকে সব চাইতে প্রিয় জ্ঞান করতেন। বীরবলের অসামান্য বুদ্ধিমত্তার উপর তাঁর অগাধ আস্থা ছিল। মাঝে মাঝে নিজে থেকে এসে তিনি বীরবলকে নানা উদ্ভট প্রশ্ন করে তার উত্তর দিতে বলতেন, তাঁকে নানা পরীক্ষায় ফেলতেন।

সম্রাট জানতেন, সেইসব পরীক্ষায় বীরবল নিশ্চয়ই সসম্মানে উত্তীর্ণ হবেন। এবং অন্য সভাসদরা (সম্রাট জানতেন অনেক সভাসদ বীরবলের প্রতি অত্যন্ত ঈর্ষাপরায়ণ ছিল) দেখবে যে বীরবলের শ্রেষ্ঠত্ব কি করে প্রমাণিত হয়েছে।

এক সভাসদ একদা তার মূঢ়তার জন্যে বীরবলের কাছে অপমানিত হয়ে প্রতিহিংসা নেবার জন্যে সম্রাট আকবরের খাসমহলের ক্ষৌরকারকে হাত করে এক ষড়যন্ত্র করেছিল।

নাপিতটি ছিল বাদশার বিশেষ প্রিয়। তাঁর চুল এবং দাড়ির পরিচর্যা করে নাপিতটি প্রত্যহ অপরাহ্নে তাঁকে বেশ কিছুক্ষণ আরাম দিত। এবং সেই সময় নাপিতদের যা ধর্ম অর্থাৎ নানা গুজব কথার এবং কেচ্ছার প্রসঙ্গ তুলে সে বকবক করত।

একদিন সম্রাটের মাথা মালিশ করতে করতে সে বললে—মহামান্য সম্রাটের বাবাকেও আমি এইভাবে সেবা করেছি। তাঁর মাথার চুল কি চকচকে ছিল!

সম্রাট বললেন—তাই বুঝি।

—আজ্ঞে হ্যাঁ। আর আপনার ঠাকুরদা মশাইয়ের চুল নাকি তেলচিটের মত নরম ছিল, আমার বাবা বলতেন।

সম্রাট বললেন—তা হবে।

কিছুক্ষণ পরে নাপিতটি বললে—জনাব যদি অনুমতি দেন তাহলে একটা কথা বলি।

সম্রাট বললেন—বল।

—মহামান্য সম্রাট তো এখানে বেশ আরামে আছেন। কিন্তু সম্রাটের বাবা এবং ঠাকুরদা স্বর্গে কি করছেন কেমন আছেন তা জানেন কি?

সম্রাট বললেন—তা এখান থেকে কেমন করে জানব?

নাপিত বললে—জানা শক্ত নয় সম্রাট। আমি একজন হিন্দু তান্ত্রিককে জানি, যে মানুষকে মন্ত্রবলে স্বর্গে পাঠিয়ে সেখানকার খবর নিয়ে তাকে আবার ফিরিয়ে আনতে পারে।

সম্রাট একটু ভেবে বললেন—সত্যি নাকি? বেশ তাহলে আমার পূর্বপুরুষদের খবর আনবার ব্যবস্থা কর।

কয়দিন পরে ক্ষৌরকার-পুত্রব সম্রাটের কাছে এসে বললে—খোদাবন্দ! তান্ত্রিক সব ঠিক করেছে। কিন্তু কাকে স্বর্গে পাঠানো হবে? এ কাজের জন্যে চাই খুব বুদ্ধিমান বিচক্ষণ কোনো লোক। বীরবল শেঠ ছাড়া এ কাজ আর কেউ পারবেনা।

বাদশা বললেন, বেশ তাহলে বীরবলই যাক্। তাকে স্বর্গে পাঠাবার জন্যে ক্রিয়াকর্ম কি রকম কি করতে হবে?

নাপিত বললে—তাঁকে স্নান করিয়ে এবং ধোপ করিয়ে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হবে। সেখানে চন্দন কাঠ দিয়ে তৈরী একটি বেদীর ওপর তাঁকে বসিয়ে দেওয়া হবে এবং আরও অনেক চন্দন কাঠ

দিয়ে তাঁকে সম্পূর্ণ ঢেকে দেওয়া হবে। তারপর তান্ত্রিক মহারাজ মন্ত্রপাঠ করে সেই বেদীতে আগুন দেবেন। বেদীটি সম্পূর্ণ পুড়ে যাবার পর বীরবল সূক্ষ্ম দেহ ধারণ করে স্বর্গে গিয়ে আপনার পিতা পিতামহের সঙ্গে দেখা করবেন, তাঁদের খবরাখবর নেবেন, তারপর সূক্ষ্ম দেহ নিয়েই পৃথিবীতে ফিরে আসবেন এবং তান্ত্রিক মহারাজের মন্ত্রের জোরে আবার স্বশরীরে আপনার কাছে এসে উপস্থিত হবেন।

নাপিতের কথা শুনে ঘাড় নেড়ে বাদশা বললেন—এ আর শক্ত কি। ডাক বীরবলকে।

বীরবল এলেন। নাপিতের প্রস্তাব শুনে অবাক বিস্ময়ে বললেন—সম্রাট! এও কি কখনও হয়?

—কেন হবে না? এই নাপিত যখন বলছে তখন অবশ্যই হয়।

বীরবল বললেন—নাপিতের কথার মূল্য কি?

সম্রাট বললেন—নাপিতের কথা কেন? একজন তান্ত্রিক আছে। সে এরকম কাজ পারে।

বীরবল বললেন—অবিশ্বাস্য।

সম্রাট বললেন—তুমি যেতে চাও না তাই বল।

বীরবল দেখলেন সম্রাটের সঙ্গে তর্ক করা বৃথা। তিনি রাজি হলেন। কেমন করে তাঁকে স্বর্গে পাঠানো হবে তাও শুনলেন। বুঝলেন তাঁকে নিঃশেষ করবার জন্যে এ এক মহাষড়যন্ত্র। বললেন, যেখানে সেখানে নয়। বেদী সাজান হবে তাঁর বাড়ীর পিছন দিকে খানিকটা ঘুরে যে ঝিল আছে তারই পাড়ে। আর এই অনুষ্ঠান হবে আজ থেকে একমাস পরে অমাবস্যার রাতে। এই একমাস বীরবল জপতপ করে নিজের শরীরকে শুদ্ধ করে নেবেন যাতে করে তান্ত্রিকের কাজের সুবিধা হবে। আর বীরবলের কিছু টাকা চাই। তাঁর অবর্তমানে তাঁর পরিবারবর্গ যাতে কোনো অসুবিধায় না পড়ে সে ব্যবস্থা তাঁকে করে যেতে হবে।

সম্রাট চাওয়াও হুকুম দিলেন যত টাকার দরকার হয় তত টাকা বীরবল নিয়ে যেতে পারেন খাজাঞ্চির কাছ থেকে।

বীরবল টাকা নিয়ে চলে গেলেন। চক্রান্তকারী সভাসদ আর তার দোসর নাপিত দুজনেই মহাখুশি। এবার আর বীরবলের রক্ষা নেই।

এদিকে বীরবল অনেক লোক লাগিয়ে গোপনে গোপনে ঝিলের পাড় থেকে তাঁর বাড়ী পর্যন্ত এক সুড়ঙ্গ পথ তৈরী করালেন। ঝিলের পাড়ে সুড়ঙ্গ পথের উপর কৌশল করে এমনভাবে চাকা দিয়ে রাখা হল যে বাইরে থেকে বোঝবার উপায় রইল না।

নির্ধারিত দিন এল।

ঝিলের পাড়ে বীরবলের নির্দিষ্ট স্থানে বেদী তৈরী হল। এক জটাজুট-ধারী তান্ত্রিক এসে তারস্বরে মন্ত্রপাঠ করতে লাগল। বীরবল বেদীর উপর গিয়ে বসলেন। তাঁর দেহের চারিদিকে ঘরে ঘরে চন্দন কাঠ সাজিয়ে দেওয়া হল। লম্বা লম্বা শক্ত দড়ি দিয়ে সেই কাঠের বেড়কে আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধে দেওয়া হল, যাতে করে তার ভেতর থেকে বীরবল বেরিয়ে আসতে না পারেন। তারপর সেই বেদীতে বড় বড় মশাল দিয়ে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হল।

বীরবলের সঙ্গে ছিল একটা ডুমুরের খানিকটা গুঁড়ো। তিনি প্রস্তুত হয়েই এসেছিলেন। সেই গুঁড়ো আগুনের ওপর ছড়িয়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ঘন কালো ধোঁয়ায় চতুর্দিক অন্ধকার হয়ে গেল। সেই সুযোগে বীরবল বেদীর তলাকার সুড়ঙ্গের প্রবেশ পথ খুলে তার ভিতর দিয়ে নিরাপদে নিজের বাড়ীতে চলে এলেন। সেখানে ছদ্মবেশের উপকরণ তৈরী ছিল। মাথায় জটা, লম্বা দাড়ি, গায়ে আলখাল্লা—রীতিমত সাধুর ছদ্মবেশে বীরবল অল্প সময়ের মধ্যেই ঝিলের পাড়ে গিয়ে উপস্থিত হলেন। তখন বেদীটা

দাউ দাউ করে জ্বলছে, কয়েকজন লোক রয়েছে, নাপিত রয়েছে আর রয়েছে এক অপরিচিত ব্যক্তি। বুঝলেন এই চক্রান্তে ঐ সভাসদেরই। নাপিতটার সঙ্গে খুব হেসে হেসে সে কথা বলছে।

বীরবল বাড়ী চলে এলেন। তারপর দেড়মাস বাড়ী থেকে বেরুলেন না। চুল রাখলেন, দাড়ি রাখলেন। মেটি পাতা ঘষে গায়ের রং অন্যরকম করলেন। নানান্ রকম কাপড়ের টুকরো দিয়ে একটা অদ্ভুত ধরণের পোষাক তৈরী করলেন। তারপর সেই পোষাক পরে বিচিত্র বেশে একদিন সকালে দরবারে গিয়ে হাজির হলেন। প্রথমে তো চেনাই যায় না। তারপর যখন চেনা গেল তখন সকলে অবাক।

বাদশা উচ্চকণ্ঠে বলে উঠলেন—বীরবল! তুমি ফিরে এসেছো?

—হাঁা খোদাবন্দ্। বীরবল বললেন—ফিরে এসেছি এবং বহাল তবিয়তে আছি।

বাদশা বললেন—আমার পিতা পিতামহের সঙ্গে দেখা হল?

—হল বৈকি সম্রাট।

—তাঁরা সব কেমন আছেন? আমার কথা জিজ্ঞেস করলেন?

ঘাড় নেড়ে বীরবল বললেন—করলেন বৈকি সম্রাট। তাঁরা আপনাকে অনেক আশীর্বাদ করলেন। তাঁরা সব ভালোই আছেন, কিন্তু···

—কিন্তু কি বীরবল?

—না তেমন কিছু নয়।

বাদশা বললেন, না না। তুমি চাপবার চেষ্টা করছ। 'কিন্তু' কি, খুলে বল।

বীরবল বললেন, তাঁরা অন্য সবদিকেই ভাল কিন্তু একটা মস্ত অসুবিধায় পড়েছেন।

—কি অসুবিধা?

বীরবল বললেন, সেখানে কোনো নাপিত নেই।

—তাই নাকি?

বীরবল বললেন, হাঁা, জনাব, সেখানে কোনো নাপিত নেই। ফলে তাঁদের চুল দাড়ির পরিচর্যা হচ্ছে না। সে জন্যে তাঁরা খুব কষ্টে পড়েছেন। তাঁদের দাড়ি লম্বা হয়ে মাটিতে ঠেকছে। ফলে তাঁরা ভালোমত চলাফেরা করতে পারছেন না। প্রায়ই হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাচ্ছেন। আর অন্য সবাই তাই দেখে তাঁদের ঠাট্টা বিদ্রূপ করছে। সে জন্যে তাঁরা খুব মনোকষ্টে আছেন। তাঁরা আমাকে বিশেষ ভাবে বলে দিয়েছেন আপনাকে জানাতে যে অবিলম্বে সেখানে একজন নাপিত যেন পাঠিয়ে দেওয়া হয়। আমাদের খাসমহলের নাপিতটিকে তাঁরা বিলক্ষণ পছন্দ করেন। তাকেই পাঠাতে বলেছেন।

সম্রাট আকবর ব্যাপারটা বুঝলেন। বললেন, অবশ্যই সেই নাপিত যাবে। ডাক তাকে।

নাপিতকে সভায় আনা হল। বীরবলকে দেখে সে তো মাথা ঘুরে মাটিতে বসে পড়লো। তারপর যখন শুনলো যে এইবার তাকে বীরবলের মতো স্বর্গে যেতে হবে তখন প্রাণের ভয়ে সে সম্রাটের পায়ে লুটিয়ে পড়ল। তারপর বীরবলের জেরার চোটে সে চক্রান্তের সব কথা কবুল করলে। সম্রাট সেই নাপিতকে আর সেই সভাসদকে প্রাণে মারলেন না বটে কিন্তু শাস্তি দিলেন খুব কঠিন।

সেদিন রাত্রে বীরবলের সম্বর্ধনায় সম্রাট এক বিরাট আনন্দানুষ্ঠানের আয়োজন করলেন। এবং সেই অনুষ্ঠানে তিনিই ছিলেন সবচেয়ে উৎফুল্ল ও সুখী ব্যক্তি।

ব্যঙ্গার্থ ব্যাকরণে

চক্রপাণি

(মতামতের জন্য লেখক দায়ী, সম্পাদকীয় সম্পাদক নন্)

ইংলণ্ডের রাণী এলিজাবেথের ছোট বোন রাজকুমারী মার্গারেটকে আপনারা নিশ্চয়ই ভুলে যাননি। কিছুদিন আগে এক প্রণয়কাণ্ডের নায়িকারূপে তিনি হলুস্থুল কাণ্ড বাধিয়েছিলেন। বড় বোন কোন রকমে সবুর বাঁচিয়ে এক বড়ঘরের ফটোগ্রাফারের সঙ্গে তাঁর বিয়ে দিয়ে দিলেন। বিয়ের পরেও মার্গারেটের চালচলন আর সাঁতারের পোষাক নিয়ে বিচিত্র আলোচনার সৃষ্টি করেছিল। সম্প্রতি তাঁকে নিয়ে আবার "সংবাদ" সৃষ্টি হয়েছে। এই নাটকীয় সংবাদে প্রকাশ যে আগা খাঁর সঙ্গে তাঁর এক প্রমোদ তরণীতে সমুদ্রবিহার করবার সময় মার্গারেট জাহাজ থেকে জলে পড়ে গিয়েছিলেন। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে জল থেকে তুলে নেওয়া হয়। ভূমধ্য সাগরে শ্যাডিনিয়া দ্বীপের কাছে এই ঘটনা ঘটে। ইতালীয় সংবাদপত্রে ঘটনাটির বিভিন্ন প্রকার বিবরণ বেরিয়েছে। একটি সংবাদে প্রকাশ মার্গারেট এবং তাঁর স্বামী আগা খাঁর আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন এবং আগা খাঁর বিলাসবহুল প্রমোদ-তরীতে সমুদ্র বিহারে বেরিয়েছিলেন। জাহাজের ধারে দাঁড়িয়ে মার্গারেট এবং আগা খাঁ গল্প করছিলেন, এমন সময় নাকি জাহাজটি একটি ডুবো-পাহাড়ে ধাক্কা খায় এবং টাল সামলাতে না পেরে মার্গারেট জলে পড়ে যান। সঙ্গে সঙ্গে আগা খাঁ তাঁকে উদ্ধার করবার জন্যে জলে ঝাঁপ দেন। বাকিংহাম রাজপ্রাসাদ থেকে এ সম্বন্ধে এখনও কোনো ইস্তাহার বা ঘোষণা বেরোয়নি।

• • •

উড়িষ্যার নেতা বিজু পট্টনায়ক সম্প্রতি একাধিক সংবাদ সৃষ্টি করেছেন। তিনি চিরকালই রোখা প্রকৃতির লোক, মেজাজ ঠিক রাখতে পারেন না। উড়িষ্যা প্রদেশ-কংগ্রেস সভায় তিনি অন্য এক কংগ্রেস প্রধান পবিত্রমোহন প্রধানকে তাঁর তীব্র সমালোচনার উত্তরে ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁর জামা ছিঁড়ে দিয়েছেন এবং তাঁকে মারপিট করেছেন। পবিত্র প্রধান কংগ্রেস-বড়-কর্তাদের কাছে নালিশ করেছেন। সংবাদে প্রকাশ এই ব্যাপারে কংগ্রেস হাই কমাণ্ড বিশেষ চিন্তায় পড়েছেন। নিজেদের মধ্যেই এরকম নারদ নারদ লাগলে তো ঘর সামলানো মুস্কিল। ওদিকে আবার ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেস "উড়িষ্যার দুর্নীতি" নামে এক প্রবন্ধে বিজু পট্টনায়ককে কড়া সমালোচনা করেছেন। বিজু পট্টনায়ক সঙ্গে সঙ্গে সম্পাদকের বিরুদ্ধে ২৫ লাখ টাকার মানহানির মোকদ্দমা রুজু করেছেন। উড়িষ্যায় মহা সরগোল পড়ে গেছে। একদিকে হরেকৃষ্ণ মহতাব, অন্যদিকে বীরেন মিত্র, তাঁর পাশে বিজু পট্টনায়ক। পট্টনায়কের খুঁটি নড়ে গেছে। তা নাহলে তিনি এক হাত দেখিয়ে দিতেন সবাইকে—উড়িষ্যার দুর্নীতির ব্যাপারে হাই কমাণ্ডের তরফকে নিখোঁজ নস্যাৎ করে দিতেন। যাই হোক এখন এই তিনজন উড়িষ্যা-নায়কের দাম কী দাঁড়ায় তা দেখবার জন্যে সবাই উৎসুক। একটা জিনিষ লক্ষ্য করবার আছে। উড়িষ্যায় এত কাণ্ড হচ্ছে অথচ উড়িষ্যার আর এক প্রধান কেন্দ্রীয় উপমন্ত্রী নিত্যানন্দ কানুনগো রা কাড়ছেন না। কূটনীতিতে কানুনগো ওই তিন প্রধানের চেয়ে অনেক বেশি পোক্ত।

• • •

পরপর দু'টি সংবাদে বেরুলো এই রকম :—

"নেফা অঞ্চলে চীন গেরিলা দলের অনুপ্রবেশ। ভারতের মধ্যে ব্যাপকভাবে কাজকর্ম চালাইয়া যাওয়ার জন্য চীন এই গেরিলা বাহিনীর সৃষ্টি করিয়াছে। প্রধান যোগাযোগ কেন্দ্র ভারত-ব্রহ্ম সীমান্তের কোন একটি অঞ্চলে অবস্থিত।"

পরবর্তী সংবাদ :—

"চৌ এন লাই কোথায়? তিনি গেলেন কোথায়? তিনি কি গোপন গহ্বরে গিয়াছেন অথবা অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন? এক পক্ষ কালের মধ্যে তাঁহাকে কোন অনুষ্ঠানে দেখা যায় নাই। দুটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকেও তাঁহাকে দেখা যায় নাই। প্রকাশ্য অনুষ্ঠানে চৌ এন লাইকে সর্বশেষ দেখা গিয়াছিল আগষ্ট মাসের প্রথম দিকে উত্তর ভিয়েৎনামের উপর মার্কিন বিমান হানার প্রতিবাদে অনুষ্ঠিত জন সমাবেশে।"

ব্যস! তারপর থেকে চৌ এন লাই নিরুদ্দেশ!

বোম্বাই-এর এনফোর্সমেন্ট বিভাগের ডেপুটি ডিরেক্টর এস. জি. সহস্রভোজনের কবলে পড়ে বোম্বাই চিত্রজগতের বড় বড় দুই কাৎলা ঝাড়ি ঝাড়ি টাকা ছাড়ছে। সহস্রভোজন এক সঙ্গে এক জালে কেলে অনেককে ভোজন করে ফেলেছেন। পাকা মোহেলা এই সহস্রভোজন। কোথায় লাগে পার্লক হোমস! বাথরুমের মেঝের তলা, দেওয়ালের অদৃশ্য গুপ্ত গহ্বর, সিলিংএর কাটল, লেপ তোষক, বিগ্রহের সিংহাসন। কিছুই তাঁর নজর এড়ায় নি। আর কি আশ্চর্য, যেখানেই হাত ঢুকিয়েছেন, সেখান থেকেই টেনে বার করেছেন, গোছা গোছা শ'য়ে শ'য়ে নোট, আর ভারী ভারী সোনা দানা হীরে জুহরৎ। সিনেমা-ভারকাদের জমানো "কালো" টাকা! সেই গুপ্ত টাকার অঙ্ক ৫০ লক্ষে পৌঁছেছে। আরও বাড়বে। চিত্রতারকারা এই টাকা মাটির নিচে রোজগার করেন নি, তা ঠিক। আয়কর ফাঁকী দেবার জন্যেই তাঁদের এই গুপ্ত প্রয়াস! যারা খাদ্যদ্রব্যে বিষ মেশাল মিশিয়ে "কালো টাকার" পাহাড়ে শুয়ে আছে তাদের সমগোত্রীয় নন এই চিত্রতারকারা। কিন্তু তাহলেও দেশবাসীর কাছে এঁরা যে কোন সহানুভূতি পাচ্ছেন না তার একাধিক কারণ আছে। এঁরা দেশবাসীকে ছবির পয়সায় আনন্দ দিয়েছেন, কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে দেশবাসীর সঙ্গে এঁদের মনের কোন যোগ নেই, দেশের সঙ্গে নেই কোন নাড়ীর সম্বন্ধ। এঁরা যেন এক অন্য জগতের জীব, সাধারণ মানুষকে এঁরা মানুষ বলেই গণ্য করেন না। দেশের দুর্দশায় এঁরা এতটুকুও বিচলিত হন না। দেশে যেখানে দু'একটা নাচগান বা সফর করেই এঁরা যত কাজ করেছেন বেবে উঁচু নাক আরও উঁচু করেন। দেশের হিতে এঁদের বিশেষ কোন দান নেই, কোন সৎ কর্মকে সাহায্য করবার জন্যে এঁরা স্বেচ্ছায় এগিয়ে আসেন না—যা আসেন তার মধ্যে ব্যক্তিগত স্বার্থ থাকে ষোলো আনা। এঁদের ব্যক্তিগত জীবনচর্চায় মনুষ্যত্বের মহৎ মূল্যবোধের কোন পরিচয়ই পাওয়া যায় না। এঁদের সবটাই কৃত্রিম, অন্তঃসারশূন্য মুখোশ, ছদ্মবেশ। আসলে এঁদের একমাত্র ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ হচ্ছে—টাকা! এঁরা জীবনে বোধকরি একবারও ভাবেন না যে, এত যে টাকা এঁরা লুকিয়ে রাখছেন, যাবার সময় সেই টাকা এঁরা সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবেন না। তখন পাঁচ ভূতে সেই টাকা লুটে খাবে। সহস্রভোজনের ঠেলায় যদি এঁদের এবং এঁদের সমগোত্রীয়দের চৈতন্যোদয় হয় তাহলে বোঝা যাবে সহস্রভোজন সত্যিই এক আশ্চর্য সহস্রকর্মা।

ইংরেজ আমলের গোড়ার পাঞ্জাব-কেশরী রণজিৎ সিং ভারতবর্ষ সম্পর্কে সখেদে বলেছিলেন—"সব লাল হো যায়েগা।" স্বাধীনতা পাবার সময় তিনি যদি থাকতেন তাহলে হয়ত সখেদে ভবিষ্যৎ-বাণী করতেন—সব "কালো" হো যায়গা! সত্যিই, ক বছরেই বা, দেখতে দেখতে সব কালো হয়ে গেল! কালো বাজার। কালো টাকা! এদেরই রাজত্ব এখন। এই মর্মীয় অবস্থার অবসান ঘটাবার জন্যে, এই প্রবল দুর্নীতি-দমনে সত্যিকারের চেষ্টা করছেন (লোক ভুলানো কপট চেষ্টা নয়) তিনি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গুলজারিলাল নন্দ। তাঁর এই চেষ্টা যদি ফলপ্রসূ হয় তাহলে দেশের লক্ষ লক্ষ নাগরিক মানুষ উপকৃত হবে, তাদের দুঃসহ জীবনযাত্রা সহনীয় হবে, তারা বাঁচবে। কিন্তু মানুষের উপকার করা কি সহজ কথা! দেশের সেবার আপনি একজনের উপকার করবেন আর আমি চোখ বুজে তাই সহ্য করবো? এ দেশে তাও কখনো হয়? বিশেষ যখন দেশের অঙ্গে রক্তে কায়েমী স্বার্থ প্রবল!

"সেল রাজা সেল যান
কালো বাজারের রাজারা হবে কি
অবশেষে হতমান।"

অতএব যত টাকা লাগে দাবাও সদাচার সমিতিকে। কোটি টাকা খরচ কর। সদাচারের গলা টিপে ধরেছো, সেই গলা এইবার তোমার মাথাতেই ভাংবো। চারিদিকে চাপা হুহুঙ্কার! সেই শুনে গুলজারিলাল নন্দ কী ভয় পেয়েছেন? কামনা করি সাহস তাঁর অটুট থাক, তাঁর সংকল্প হোক আরও দুর্বার। তাঁর মধ্যে দিয়েই কবির বাণী সত্য হোক—

"ভারতের ইতিহাসে উপস্থিত প্রায়
অচিন্ত্য অজ্ঞাত এক অপূর্ব অধ্যায়।"

আমাদের দেশে চালাও গণতন্ত্রের ভারি সুবিধা।

ভারত জননীর মঙ্গল কামনায় যার যা খুশী তাই বলতে পারে। দেশের ভালোর জন্যে বলছি, অতএব গলাবাজি করবার অধিকার আমার অবশ্যই আছে।

সেই সব উক্তি যতই জ্ঞানবিজ্ঞানশূন্য হোক বা অতিকর হোক, ডেমোক্রেসির দোহাই পেড়ে বক্তা নিরঙ্কুশ। বিশেষ করে ভারতীয়গণতন্ত্রের যেন মা বাপ নেই।

কেউ বলছেন আরও খানিকটা অংশ পাকিস্তান-কে দিয়ে দাও, কেউ বলছেন চীনকে কয়েকটা তালুক ছেড়ে দাও।

অন্য দেশ হলে এই সব দেশদ্রোহীদের ধরে ল্যাম্প পোষ্টে লটকে দেওয়া হত, কিন্তু, আচ্ছা, এদেশে তাঁদের লম্পঝম্প, নাচন কোঁদন আর বোলচাল অবাধে চলেছে।

মেক্‌দার লোক নজীর সৃষ্টি।

স্বাধীন ভারতের রাজপুরুষদের মধ্যে যে কাজ আর কেউ পারেনি তাই তিনি পেরেছেন।

যখন ইচ্ছে স্ত্রীর সমীপে গিয়ে বসেছেন।

আবার যখন ইচ্ছে তখনই সেই গদীকে লাথি মেরে (তাঁর নিজের কথা) চলে গেছেন।

কিন্তু গল্পের এইখানেই শেষ নয়।

তিনি ছাড়লেও কমলা ছাড়েনা। মন্ত্রীত্ব তাঁর পিছু পিছু ধাওয়া করে তাঁকে ধরে নিয়ে এসে আবার মন্ত্রীত্বের গদীতে বসিয়েছে। একবার নয়, বেশ কয়েকবার।

তাঁর নিজের কথাই শুনুন: "পনেরো বছর আগে আমি যখন প্রথম মাদ্রাজের মন্ত্রী হই, তখন আমি ছিলাম সর্বকনিষ্ঠ। তারপরে কখনও আমি একনাগাড়ে দু'তিন বছরের বেশী মন্ত্রীত্ব করিনি। যখনই লাথি মেরে চলে এসেছি তখনই দেখেছি মন্ত্রীত্ব আমাকে পিছন থেকে ডাকছে।"

বাপরে! লাথির কি জোর।

• • • •

আর চিন্তা নেই। মাছুখোর বাঙালীর নিরানন্দের দিন কাটল। বাংলা সরকারের মেজো মন্ত্রীর অনেক মুখপাত্র খবরের কাগজে সম্প্রতি এক লম্বা বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছেন, মাছ আসছে, মাছ এলো বলে, হাজার হাজার মণ মাছ, বাজার ছেয়ে যাবে, খেয়ে শেষ করতে পারবে না। মাছ এসে গেছে বললেই হয়।

মাত্র বছর চারেকের অপেক্ষা!!

রাজ্য সরকার এই বিষয়ে দুটি চমৎকার পরিকল্পনা করেছেন। মাছে বাধ হবে, বেশী নয়, লাখ পঞ্চাশেক টাকা, ব্যাস, তারপরেই হু হু করে মাছ আসতে শুরু হবে।

বোঝা গেল। বোঝা গেল, খরচটা ঠিকই হবে, অনেকে এই সুযোগে বেশ দু পাইস করে নেবে, কিন্তু মাছ? জলের মাছ জলেই থাকবে।

• • • •

ছাত্রাবস্থায় ইংরাজীতে অলংকার ছন্দশাস্ত্র পড়তাম—Rhetoric & Prosody যার নাম। তার মধ্যে ক্লাইম্যাকস (climax) ও অ্যান্টিক্লাইম্যাকসের উদাহরণ মুখস্থ করতে হোতো। অ্যান্টি-ক্লাইম্যাকসের একটি উদাহরণ এখনো মনে আছে। ভারতের রাজনীতিবিদ (অধুনা সর্বোদয়বিদ) জয় প্রকাশ নারায়ণের বর্তমান অবস্থা দেখে সেই উদাহরণটি মনে পড়ছে—

He within the one revolving of the moon
Was a statesman, a lawyer, a fiddler, a buffoon!

• • • •

মেহরুস্মৃতি ভাণ্ডারের সাহায্য করে নানা অনুষ্ঠান হচ্ছে। কলকাতা সহরে এই উদ্দেশ্যে একটা ফাঙ্কেতাই প্রদর্শনের আয়োজন হয়েছিল। ফুটবল খেলা। একদিকে বিগত দিনের মহানায়ক ও প্রিয় এবং বর্তমানে অথর্ব কয়েকজন নামী খেলোয়াড় অন্য-দিকে যতসব চিত্রাভিনেতা। বহু ডঙ্কা নিনাদ করা হয়েছিল—দর্শক আকর্ষণ করবার জন্যে। জানানো হয়েছিল বাংলার সব নামকরা লাস্যময়ী চিত্র-নটীরা মাঠের মধ্যে প্যারেড করে যাবেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও খেলার মাঠে একেবারেই লোক সমাগম হয় নি। সত্যি সত্যিই যে বাঙালী রুচীহীনতার শেষ সীমায় পৌঁছোয়নি তার প্রমাণ পাওয়া গেল, এই অধম তামাদাকে তাঁদের বর্জন করবার স্পৃহা দেখে। মেহরু স্মৃতি ভাণ্ডারে টাকা তোলবার জন্য কি অন্য কিছু উদ্ভাবনের অনুষ্ঠান করা যেতো না যা যায় না?

শুধু একটি উৎসব ঋতুর সামগ্রী নয়

শারদীয় গল্প-ভারতী

বাংলা সাহিত্যের অগ্রগতির একটি নিদর্শনও প্রত্যেক বছরে শারদীয় গল্প-ভারতী বাংলাদেশের প্রত্যেক শ্রেণীর সাহিত্য-রসিকদের অনবদ্য সাহিত্যসৃষ্টি সম্ভারে সমৃদ্ধ হয়ে যেমন আত্মপ্রকাশ করে এবারেও তার সেই ঐতিহ্য বর্তমান।

এই সংখ্যার আকর্ষণ ঃ

ঃ তিনটি উপন্যাস ঃ

নামকার সিঁড়ি : শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

পূর্ব ফাল্গুনী : নরেন্দ্রনাথ মিত্র

বায়ু বয় পূব দিকে : বাণী রায়

ঃ একটি পূর্ণাঙ্গ নাটক ঃ

হাউসফুল : বিজন ভট্টাচার্য

ঃ গল্প ঃ

আশাপূর্ণা দেবী, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, বিমল মিত্র, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সরোজ কুমার রায়চৌধুরী, পরিমল গোস্বামী, দক্ষিণারঞ্জন বসু, হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, ভবানী মুখোপাধ্যায়, অশীষ গুপ্ত, সুবোধ চক্রবর্তী, অনিলকুমার ভট্টাচার্য, প্রমথনাথ বিশী, সুবোধ বসু, চিত্তরঞ্জন মাইতি, রামপদ মুখোপাধ্যায়, অমরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র পাল, শক্তিপদ রাজগুরু, মহাশ্বেতা দেবী, সুলেখা দাশগুপ্ত, সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, গৌরীশঙ্কর দে, ডঃ হরেন্দ্রনাথ রায় এবং আরো কয়েকজন।

মেয়েদের কথা : শান্তা দেবী

এ ছাড়া গল্প-ভারতীর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য—সচিত্র সংযোজন

ঃ বিশ্ব-উৎসব ঃ

এই অনবদ্য সংযোজন চিত্র-শোভিত, তথ্যসমৃদ্ধ, পৃথিবীর নানাদেশের নানা উৎসব কাহিনী। লিখছেন :—ডক্টর কালিদাস নাগ, ডক্টর উমা রায়, ডক্টর হরপ্রসাদ মিত্র, গোপাল ভৌমিক, শুভ্রসত্ত্ব বসু, রমেন মল্লিক, চিরশ্রী বসু, মীনাক্ষী রায় এবং আরো অনেকে। আগমনী গান স্বরলিপি সমেত : রমেশ বন্দ্যোপাধ্যায়। এ-ছাড়া বিদগ্ধজনের প্রবন্ধ — শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ, ডক্টর কল্যাণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি।

দাম : প্রতি বছরের ন্যায় চার টাকাই।

অগ্রিম টাকা পাঠিয়ে আজই অর্ডার দিন। এজেন্টগণ প্রয়োজনমত পত্র লিখুন।

গল্প-ভারতী

শক্তি-সাধনা

শ্রীশ্রীজীব ন্যায়তীর্থ

ঋগ্বেদের ঋষিগণ পরমাত্মার ধ্যান-ধারণায় নিমগ্ন হইয়া যেমন এক অখণ্ড অদ্বিতীয় বিভু বিরাট্ স্বরূপ উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তেমনই তাঁহাকে বিশ্বধারিণী বিশ্বজননী মহাশক্তিরূপে চিন্তা করিয়াও কৃতার্থ হইয়াছিলেন।

ঊর্দ্ধে অনন্ত আকাশ—নিম্নে ধরণী—দিগন্তে দিগন্তে যেন উভয়ের এক অপূর্ব মিলন। ঋষিগণ চাহিয়া চাহিয়া বিভোর হইলেন! দ্যাবা-পৃথিবী যেন অর্দ্ধনারীশ্বর। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে—অনন্ত গ্রহ-নক্ষত্র মণ্ডলীকে নিজ অঙ্কমধ্যে স্থান দিয়া শান্ত ধীর স্থির নীরব হইয়া অবস্থিত এই দ্যাবা-পৃথিবী।

"দ্যৌর্মে পিতা জনিতা নাভিরত্র বন্ধুর্মে মাতা পৃথিবী মহীয়ম্"—'দ্যৌঃ' পিতা ও 'পৃথিবী' মাতা, আর তাহার নাভি—অন্তরিক্ষ আমার বন্ধু। ঋষিচিত্তে যে ভাব প্রবাহ উন্মেষিত হইয়াছিল—তাহাই শক্তি-সাধনার প্রাথমিক সোপান।

এই বিশ্বসৃষ্টি আকস্মিক না কেহ ইহার নির্মাতা আছেন—'কো অদ্ধাবেদ—ক্ব ইয়ং বিসৃষ্টিঃ' প্রকৃত তত্ত্ব কে জানে—কোথা হইতে এই সৃষ্টি সম্ভবপর হইল? এই তত্ত্ব অনুসন্ধান করিতে করিতে অম্ভৃণ ঋষি-কন্যা আম্ভৃণী দেবী আত্ম সংবিৎ প্রাপ্ত হইয়া দেখিলেন—'অহমেব বাত ইব প্রবাম্যারভমাণা ভুবনানি বিশ্বা'—আমিই বায়ুর ন্যায় প্রবাহিত হইয়া এই বিশ্বভুবন সৃষ্টি করিয়াছি। তিনি স্বয়ং পরমাত্মারূপে নিজরূপ উপলব্ধি করিয়া এই দৃশ্যমান বিশ্বের মূলে যে এক মহাশক্তি বিরাজমানা আছেন—ইহাই উপদেশ করিলেন। জীব যে অন্নগ্রহণ করে, সে আমারই ভোক্তৃ-শক্তি, জীব দর্শন করে, শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করে, শ্রবণ করে—এই সমস্তই আমার শক্তি, যাহারা আমাকে এভাবে না জানে—তাহারা হীনভাবাপন্ন হয় এজন্য হে শ্রুত! (শ্রোমন্) আমার উপদেশ শ্রবণ কর। আমিই রুদ্র, আদিত্য, মরুৎ ও বসুগণকে ধারণ করিয়া আছি—আমিই ক্ষত্রের শক্তি।

এই ঋগ্বেদের মন্ত্রার্থকে সপ্তশতী সরল ভাষায় ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন,—

যচ্চ কিঞ্চিৎ ক্বচিদ্বস্তু সদসদ্বাখিলাত্মিকে।
তস্য সর্বস্য যা শক্তিঃ সা ত্বং কিং স্তূয়সে তদা॥

জগতে যত কিছু সৎ বা অসৎ বস্তু আছে—সে সকলের যে শক্তি—তাহাই তোমার স্বরূপ।

এই মহাশক্তি চেতন ও অচেতন উভয়ে পরিব্যাপ্ত। জগতের যাহা কিছু বৈচিত্র্য দেখা যায়—তাহার মূলে আছে—এই শক্তির লীলা। এই জন্য তাঁহাকে প্রকৃতি বা মায়া নামেও অভিহিত করা হয়। আবার তিনি চিতিশক্তি—চৈতন্যময়ী মহতী সত্তা।

তাই ঋষিগণের অনুষ্ঠিত যজ্ঞের উদ্দেশ্যই ছিল—এই অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের পরিচালিকা মহা শক্তির উপাসনা। তাঁহার প্রদত্ত ফলমূল শস্য সলিল—তাঁহারই প্রদত্ত যব গোধূম তণ্ডুল—তাঁহারই প্রদত্ত—দধি দুগ্ধ ঘৃত, তাঁহারই প্রদত্ত—জীবনীশক্তি জ্ঞানশক্তি ক্রিয়াশক্তি ও ইচ্ছাশক্তি। এ সকলের বিনিয়োগ হইত—এক যজ্ঞকার্যে। ঋষিগণ তন্ময় হইয়া সর্বস্ব অর্পণ করিয়া বাঙ্‌মনঃকায় দ্বারা যজ্ঞ সম্পন্ন করিতেন। সেই যজ্ঞের দ্বারা পরমাত্মার প্রীতি সাধনই প্রকৃষ্ট উপাসনা—ইহাই ছিল তাঁহাদের চরম লক্ষ্য। যজ্ঞের দেবতা ছিলেন—কোনটি পুরুষাকৃতি, কোনটি বা স্ত্রীরূপিণী। তাঁহারা সকলকেই যজ্ঞে আহ্বান করিতেন—

'ইন্দ্রাণীমুপহ্বয়ে বরুণানীং স্বস্তয়ে।
অগ্নায়ীং সোমপীতয়ে॥

এই যজ্ঞে ইন্দ্রাণীকে ও বরুণানীকে আমাদের কল্যাণের জন্য আহ্বান করিতেছি; আর অগ্নায়ীকে সোমপানের জন্য আমন্ত্রণ জানাইতেছি।

ইন্দ্রশক্তি, বরুণশক্তি ও অগ্নিদেবের শক্তিকে কখনও খণ্ডিতভাবে কখনও বা অখণ্ডিত মহাশক্তি রূপে যজ্ঞে আমন্ত্রিত করা হইত। কখনও উষা, কখনও বা সরস্বতী, ইলা, ভারতী, ওষধি, অপ্, রাকা, সিনীবালী—এইরূপ নানা ভাবে, কখনও প্রকৃতিরূপে, কখনও বিদ্যারূপে, কখনও ওষধি, কখনও অন্নদেবীরূপে যজ্ঞে পূজিতা হইতেন। এই সব শক্তিগুলি সাধকের চিত্তে অধিকার অনুসারে, ভাব ও ধ্যান ধারণাভেদে প্রকাশিত হইতেন। যজ্ঞান্তে উপনিষৎ পাঠের সময়ে উপাসিত দেবতার স্বরূপ সাধকচিত্তে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিত। তিনি যে সর্বভাবে অবস্থিত—কি পুরুষ, কি নারী, কি বৃদ্ধ কি শিশু—সর্ববিধ জীব প্রকাশের মধ্যেই যে তাঁহার সত্তা—ইহা কীর্তিত হইত।

'ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি' ত্বং কুমার উত বা কুমারী।
ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চসি ত্বং জাতোভবসি বিশ্বতোমুখঃ॥'

এই বেদার্থকে অনুসরণ করিয়া বাঙ্গালী সাধক গাহিলেন—"কখনও পুরুষ, কখনও প্রকৃতি—কখনও নিরাকার হে।" পরমাত্মার যে সর্বরূপতা—সর্বব্যাপকতা শক্তিবাদে তাহাও সমাদরে স্বীকৃত। বেদে ও পুরাণে সেই একই সিদ্ধান্ত উদ্ঘোষিত হইয়াছে। তাই সপ্তশতীতে কথিত হইয়াছে —"একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা" এ জগতে আমি এক এবং অদ্বিতীয়া আমি ভিন্ন আর কেহই নাই। শক্তি সাধনার ইহাই বৈশিষ্ট্য যে—বিশ্বসংসারকে অলীক স্বপ্নবৎ ধ্যান করিবার প্রয়োজন নাই। মহাশক্তির একাংশ—এই বিশ্বসংসার, অপর অংশ হইল—চিন্ময়। জড়সত্তা ও চেতনসত্তা—পরস্পর

এক অবিচ্ছিন্ন অখণ্ড সম্বন্ধে সংযুক্ত হইয়া আছে। এ অখণ্ডরূপের প্রতীক হইল—ভাবা-পৃথিবী, উমামহেশ্বর বা অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তি—বা যুগলমূর্ত্তি। অখণ্ডরূপের পূর্ণ উপলব্ধি হইল শক্তি সাধনার চরম ফল। 'সর্ব্বংখল্বিদং ব্রহ্ম' এই শ্রুতিতে 'সর্ব' শব্দে জড় ও চেতন উভয়কে গ্রহণ না করিলে সর্বপদের অর্থকে সঙ্কুচিত করিতে হয়। বেদবাক্যের এরূপ অর্থসঙ্কোচ করা অনুচিত। সুতরাং বিশ্বের যাহা কিছু পদার্থ—জড় বা চেতন, সমস্তই সেই ব্রহ্ম। যাঁহারা মায়াবাদী—তাঁহাদের সহিত এইটুকু পার্থক্য—মায়া ব্রহ্ম শক্তি, মায়া কোনও বস্তু নহে, তাহা সৎও নহে অসৎও নহে, কিন্তু শক্তিবাদীর মায়া বাস্তব এবং শক্তি স্বয়ং মায়া বা মহামায়া। এই মহামায়াই জড়জগৎকে ধরিয়া আছেন। মায়া নিত্যা আর জড়জগৎ উৎপাদ বিনাশশীল। এই জড়জগৎই সঞ্জিত হইয়া সংসার নামে পরিচিত। মা আদ্যা মায়াস্বরূপিণী হইয়া এই সংসারকে রক্ষা করিতেছেন। বিষয়ের ভোগ যে অপরাধী—ইহা মানব বুঝিতে পারিলেও ভোগের প্রলোভন ত্যাগ করিতে পারে না। মানবের দুঃখ ক্লেশের মধ্যে বহুবিধ রোগভোগের মধ্যে—অভাব অনটনের সহিত যুদ্ধবিগ্রহের মধ্যে থাকিয়াও মানব যে বৈরাগ্যযুক্ত হয় না, জ্ঞানী ব্যক্তিও মদমত্ততার আবর্তে এবং মোহগর্ত্তে নিপতিত হয়, তাহার কারণ এই মহামায়ার প্রভাব, এই প্রভাবেই সংসারকে রক্ষা করিয়া চলিয়াছে।

কোনও সময়ে দেবর্ষি নারদ ভাবিয়াছিলেন, যে আমি মায়াপাশ হইতে মুক্ত হইয়াছি। সে কথা তিনি বৈকুণ্ঠধামে শ্রীহরির নিকট ব্যক্ত করিয়াছিলেন। শ্রীহরি বলিয়াছিলেন—দেখ নারদ! দেবদেহই হউক আর নরদেহই হউক, যে কোন দেহ ধারণ করিলেই মায়ার বশীভূত হইতে হইবে। বেদজ্ঞ বা যোগী, জিতেন্দ্রিয় বা সর্বজ্ঞ—কেহই সহসা মায়াকে অতিক্রম করিতে পারে না।

নারদ যেন অন্তরে একটু অভিমান পোষণ করিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন—হে নারায়ণ, আমি মায়াকে দেখিতে ইচ্ছা করি। মায়ার বল কিরূপ? কোন্ আধারে তাহার অবস্থান কৃপা করিয়া আমাকে বলুন এবং মায়ার স্বরূপ আমাকে দেখাইয়া দিন। নারায়ণ বলিলেন,—তিনি ত্রিগুণময়ী, তিনি অখিল আধারে বিরাজমানা। অথচ তিনি সর্বজ্ঞা, তিনি অজেয়া ও বহুরূপা। যদি তোমার মায়াকে দেখিতে ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে আমার সহিত গরুড়ে আরোহণ কর, তোমাকে সেই দুর্জ্ঞেয় মায়াকে দেখাইব।

নারায়ণের স্মরণমাত্রে গরুড় আসিয়া উপস্থিত হইলেন ও উভয়ে গরুড়ের উপর আরোহণ করিলেন; বায়ু বেগে গরুড় উড়িতে উড়িতে কান্যকুব্জদেশের সমীপে আসিতেই নারায়ণের ইচ্ছায় গরুড় থামিলেন।

দেখা গেল—এক অপূর্ব সরোবর। হংস কারণ্ডব চক্রবাক প্রভৃতি পক্ষিগণ ক্রীড়া করিতেছে। শ্বেত রক্ত কমল বিকশিত হইয়া আছে—মধুকরগণ গুঞ্জন করিতেছে। উভয়ে গরুড় হইতে অবতরণ করিলেন।

নারায়ণ বলিলেন—নারদ! কি সুন্দর রমণীয় সরোবর, এখানে তুমি স্নান কর। স্নান করিয়া আমরা কান্যকুব্জপুরীতে গমন করিব। তোমার বীণা ও মৃগচর্মের উত্তরীয় আমার হাতে দাও। নারদ তাহাই করিলেন এবং সরোবরে স্নান করিলেন। স্নান হইতে উঠিয়া দেখিলেন যে—সরোবর তীরে নারায়ণ নাই, গরুড়ও নাই। নিজেও পুরুষরূপ হারাইয়া এক অনিন্দ্য সুন্দরী বহুভূষণে ভূষিতা নারীর রূপ ধারণ করিয়াছেন। তাঁহার পূর্বস্মৃতি বিলুপ্ত হইল।

এমন সময়ে তাঁহার নয়নপথে পড়িল এক সুন্দর নরপতি। রথারূঢ় যুবা, অশ্বগজ পরিবৃত—দেখিতে পরম সুন্দর। রাজাও সেই রমণীয় নারীকে দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন—কে তুমি কন্যাটি! তুমি কাহার কন্যা? দেবতা, মানুষ, গন্ধর্ব বা নাগ কোন্ কুলে তোমার জন্ম? তুমি বিবাহিতা না অবিবাহিতা?

রাজার নাম তালজঙ্ঘ, কান্যকুব্জের রাজা। সেই নারী তখন বলিলেন—জানি না—আমি কাহার কন্যা বা কেনই বা এখানে আসিলাম। আপনি ধর্মজ্ঞ, আপনি যাহা ভাল বুঝেন তাহাই করুন। আমার আর কেহ নাই। রাজা সেই কথা শুনিয়া ভৃত্যবর্গকে এই নারীকে শিবিকা-যোগে রাজধানীতে লইয়া যাইতে আদেশ করিলেন। ভৃত্যবর্গ তাঁহাকে রাজধানীতে লইয়া গেলে শুভলগ্নে অগ্নি সাক্ষী করিয়া রাজা সেই নারীকে বিবাহ করিলেন। তালজঙ্ঘ তাহাকে পট্টমহিষী করিলেন এবং নাম হইল সৌভাগ্যসুন্দরী। ইহার গর্ভে একে একে আঠারটি সন্তান হইল। পুত্র-পৌত্র দ্বারা সংসার পূর্ণ হইল।

কিছুকাল পরে দূরদেশ হইতে এক বিপক্ষ রাজা আসিয়া কান্যকুব্জরাজ্য আক্রমণ করিল। পুত্র-পৌত্র সহ তালজঙ্ঘ তুমুল সংগ্রাম করিলেন। সেই যুদ্ধে পুত্র পৌত্রাদি সকলে নিহত হইল—রাজা গৃহে ফিরিলেন। তখন সৌভাগ্যসুন্দরী বিলাপ করিতে রণক্ষেত্রে আসিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সেই সময়ক্ষণে আগমন করিয়া তাঁহাকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন এবং বলিলেন এখন এস মা এই সরোবরে স্নান করিয়া শুদ্ধ হও। সৌভাগ্যসুন্দরী স্নান করিয়া উঠিতেই দেখিলেন যে তিনি আর নারী নহেন পুনরায় পূর্বের নারায়ণদেহ ফিরিয়া পাইয়াছেন।

নারায়ণ হাসিয়া বলিলেন—নারদ! তুমি না মায়াকে জয় করিয়াছিলে? এখন বুঝিলে কি—মায়ার কত বড় প্রতাপ? নারদ বিস্মিতবিমূঢ়ভাবে মহামায়াকে প্রণাম করিলেন।

এইজন্য সপ্তশতীতে বলা হইয়াছে যে,—

জ্ঞানিনামপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হি সা।
বলাদাকৃষ্য মোহায় মহামায়া প্রযচ্ছতি॥

এই মহামায়ার প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করিলে তাঁহার সাধনা দ্বারা এই মায়া হইতে মুক্ত হইতে পারেন।

আগমনী

রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

বর্ষাবিধৌত ধরিত্রী, স্বর্ণাতপমণ্ডিত দিগন্ত ব্যাপিত শস্যক্ষেত্র, কুলু কুলু ধ্বনি মুখরিত নদনদী, শ্যামল বনরাজি, শারদীয়া নীলাকাশ, মহামায়ার শুভাগমন প্রতীক্ষারত। সূর্য কিরণ প্রতিভাত শিউলি, মালতী সৌরভান্বিত, বিচিত্র কুসুম মুখরিত এক শারদ প্রাতে আগমনীর শুভ শঙ্খ বেজে ওঠে। মহামায়ার ধরণীতে আবির্ভাব আত্মজারূপে। বৎসরান্তে মাতা যেমন আকুল হৃদয়ে কন্যার আগমন প্রতীক্ষা করেন—বাঙালীও সেই আকুলতা নিয়েই মহামায়ার আগমন প্রতীক্ষা করে। অন্তরের এই আকুলতাই ভারতীয় সাধনার মূলমন্ত্র—তন্ত্র, মন্ত্র কৃচ্ছ্র সাধন নয়। এ দেশে, আরাধ্য দেবতা মানবধর্মীরূপে কল্পিত, পূজা ও পূজারীর মধ্যে ব্যবধান দূরীভূত। আমাদের দেশে ভক্ত, গীতিকারগণ, তাঁদের প্রেম ও ভক্তির উচ্ছ্বাস গানের মধ্যে নিবেদন করেছেন। তাঁরা দেবীকে সম্পূর্ণ আপনার জন রূপে বর্ণনা করেছেন। পূজারী যেমন প্রতিদিন নব প্রস্ফুটিত কুসুমে পূজা নৈবেদ্য রচনা করেন, সাধক-গীতিকার তেমনি নিত্য নতুন গীতিকুসুম নিবেদন দ্বারা পূজা সার্থক করে তোলেন।

একদিন বাংলার শান্তশ্রী পল্লীতে পল্লীতে কৃত্রিমতা রহিত প্রকৃতির ক্রোড়ে পালিত সরল সহজ মানুষ আগমনী গান গেয়ে দেবীকে বরণ করত। আবার পূজার শেষ দিনে বিজয়ার করুণ সুর সকলের অন্তর ব্যথাতুর করে তুলত। আগমনী গান বাংলার সংগীতের এক অমূল্য-সম্পদ। এক সময় এই গান বাঙলায় বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। কথা, ভাব ও সুরের অপরূপ সমাবেশে অন্যান্য গানে বিরল। সাধক কমলাকান্ত রচিত দুইটি আগমনী গান স্বরলিপিসহ প্রদত্ত হল।

আগমনী গান

ঝিঁঝিট—একতাল

গিরি! প্রাণগৌরী আন আমার
উমা বিধুমুখী না দেখি বারেক
এ-ঘর লাগে অন্ধকার।
আজি কাল করি দিবস যাবে
প্রাণের উমারে আনিবে কবে
প্রতিদিন কি হে আমারে ভুলাবে
এ কি তব অবিচার॥

কমলাকান্ত কহে নিতান্ত
কেঁদোনাকো রাণি হও গো শান্ত
কে পাইবে তোমার উমার অন্ত
তুমি কি ভাব অসার ॥

| | | |

আগমনী গান

মিশ্র-বিভাস - কাওয়ালি

কবে যাবে গিরিরাজ গৌরীরে আনিতে
ব্যাকুল হয়েছে প্রাণ উমারে দেখিতে।
গৌরী দিয়ে দিগম্বরে, আনন্দে রয়েছ ঘরে
কি আছে তব অন্তরে না পারি বুঝিতে॥
কমলাকান্তের বাণী শুন হে শিখর মণি
কেমনে সহিব এত মায়ের প্রাণেতে॥

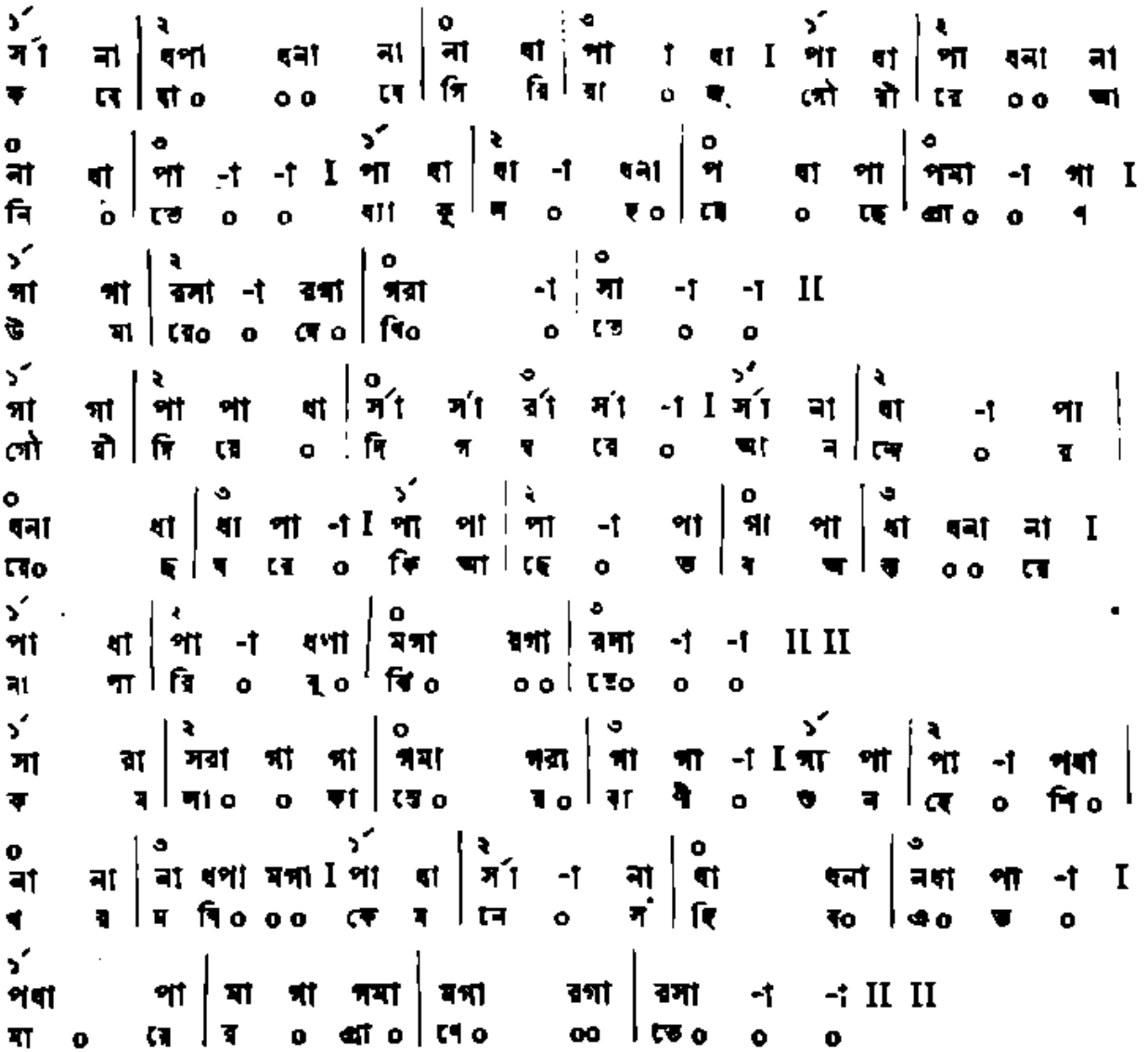

সঙ্গীত মুখর পূজার দিনগুলি আনন্দে ভরে উঠুক

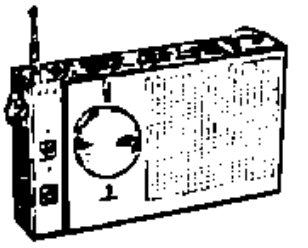

৫ ট্রানজিস্টার ৩ ওয়েভ ব্যাণ্ড-এর একটি আকর্ষণীয় পোর্টেবল বেতারযন্ত্র।
মডেল বিসি ৮১৪
মূল্য ৩৭৫৲

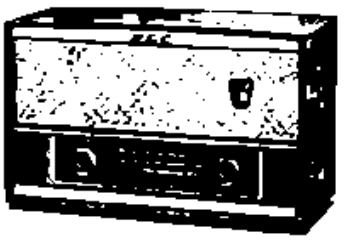

একটি ৬ ভালভ, ৩ ওয়েভ ব্যাণ্ড ও ঘাত্রিক আই-ফ্লু বেতারযন্ত্র। সুদৃশ্য কাষ্ঠের ক্যাবিনেট।
মডেল বিসি ৫৩৫৪ এসি মেইনসের জন্য।
মডেল বিসি ৬৩৫৩ ডিসি/এসি মেইনসের জন্য। মূল্য ৪১৫৲

৮ ভালভ, ৫ ওয়েভ ব্যাণ্ডযুক্ত সুক্ষ্মকরগ্রাহী একটি হাই-ফাইডেলিটি অনুপম বেতারযন্ত্র—ইলেকট্রনিক টিউনিং ইণ্ডিকেটার সহ সুদৃশ্য ফিনিশিং ক্যাবিনেটে বসানো। মডেল বিসি ৫৮৫১ এসি এবং বিসি ৬৮৫০ এসি/ডিসি মেইনসের জন্য।
মূল্য ৮৮৫৲

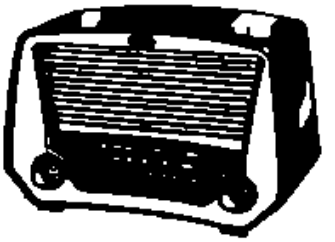

একটি ৫ ভালভ, ৩ ওয়েভ ব্যাণ্ডযুক্ত বেতারযন্ত্র—চমৎকার ডিলাক্স প্লাস্টিক ক্যাবিনেট।
মডেল বিসি ৫১৫১ এসি মেইনসের জন্য।
বিসি ৬১৫০ ডিসি/এসি মেইনসের জন্য।
মূল্য ৩২৫৲ মডেল বিসি ১১৫৫ ৫ ভালভ ট্রানজিস্টারাইজড চালানোর জন্য। মূল্য ৩৩৫৲

ঈপ্সিত মূল্য উৎসাহ শুরু করুন। স্থানীয় কর অতিরিক্ত লাগবে।

বেতারযন্ত্রগুলি নিকটতম বিক্রেতাকে বাজিয়ে দেখাতে বলুন।

G.E.C.

মেরা রেডিও

দি জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানী অব ইণ্ডিয়া প্রাঃ লিঃ

পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহার, উড়িষ্যা ও রাজস্থানের জন্য পরিবেশক **রেডিও ক্লাব প্রাইভেট লিমিটেড**

সুরমা হাউস, ৩, মাঙ্গো লেন, কলিকাতা-১
টেলিফোন : ২৩-২০১৪

GEC/G/7E4

দণ্ডিত

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

মেয়ে-যাত্রাদলের মেয়ে।

'কী নাম তোমার?' সেরেস্তাকে না দিয়ে প্রজেশ নিজেই সাক্ষীর কর্মটা পূরণ করছিল।

'ময়না দাসী।'

'স্বামীর নাম কী?' চোখ তুলে তাকাল প্রজেশ।

'বিয়ে হয়নি।'

'বাবার নাম!'

'জানিনা।'

যা খুশি বলে দিতে পারত। কিন্তু মেয়েটা সরল ও সৎ। সত্য কথা বলতে সঙ্কোচ করেনি।

এই যাত্রাদলকে বিবাদীপক্ষ মামলা করেছিল। প্লে-র পর বাকি টাকা দেয়নি তার জন্যে নালিশ। চুক্তির টাকা মার ক্ষতিপূরণ।

বিবাদী পক্ষ বলছে যে-প্লে করবার চুক্তি ছিল তা না করে অন্য প্লে করেছে। সে একটা নেহাৎ বাজে বই। দর্শকের দল ছি ছি করেছে। তা ছাড়া কথা ছিল ময়না হিরোয়িন হবে, তা না হয়ে ও ছোট পার্টে নেমেছে, দর্শকের দল খুশি হয়নি।

ময়না বলছে, যে বই করেছি তার সম্বন্ধেই চুক্তি ছিল আর আমি ছাড়া হিরোয়িন কে?

বিবাদীপক্ষের উকিল বললে, তার মানে উনি বলতে চান যে পার্টে উনি নামবেন সেইটেই হিরোয়িনের পার্ট। উনি ছাড়া দুনিয়ায় হিরোয়িন নেই। দেখতে তো কাকের মত, নাম রেখেছে ময়না!

সব দেখে-শুনে বিচার করে প্রজেশ ঠিক করল বাদীপক্ষের দাবি মাত্র-খরচা ডিক্রি দেবে। রায় লেখা হয়েছে, সই করে তারিখ বসানো শুধু বাকি।

ভাবলে ময়না দাসীকে বাড়িতে একবার ডাকলে কেমন হয়?

না-আসবার তো কোনো কারণ নেই।

বরং, আকর্ষণ আছে।

গলা খাটো করে আর্দালিকে বললে কথাটা। দেখো উকিল-ফুকিল যেন জানতে না পায়।

গায়ে চাদর জড়িয়ে রাতের অন্ধকারে খিড়কির দরজা দিয়ে ভিতরে চলে এল ময়না।

চেয়ারে বসল। হেসে বলল, 'উকিল আমাকে কাক বলেছিল—'

'উকিলে কী না বলে!' হাসি ফিরিয়ে দিল প্রজেশ।

না, টাকা-পয়সা নেয়নি কিছু ময়না। প্রজেশ দিতে চাইলেও, না। বুঝে নিল তার এত বড় জেদের মামলা। সে নির্ঘাৎ জিতবে। অনেক তদবিরের মত এও এক তদবির। চূড়ান্ত তদবির।

খুশি মনেই ফিরে গেল নয়না।

আর, বলাই বাহুল্য, ডিক্রি পেয়ে গেল।

রায়ে সই দেবার সময় একটু বুক দুরুদুরু করছিল বুঝি প্রভেশের। কিন্তু, না, ভয় কী, কে কী বলবে! বাদীপক্ষ তো কিছুই বলবে না, তার অনুকূলে রায়! বিবাদীপক্ষ বলতে পারে। জানলে পরে তো বলবে! বলুক—হারপক্ষ কী না বলে! আর, বেশ তো, অভিযোগ যদি সত্যি হয়, কী যায়-আসে! জাজমেন্টটা প্রভেশ ব্যাক-ডেট করে দিয়েছে। মামলা নিষ্পত্তি হয়ে যাবার পর নয়না যদি তার বাড়িতে আসে তাতে অপরাধ কী! নয়না তো না-আসবার মতো মেয়ে নয়। সেটা তো তখন 'অনেস্ট ডিল'।

প্রভেশ আরো একবার টলেছিল শামেলার বেলায়।

একটা এলো ইতিহাস মেয়ে। যেন একটা ফুটন্ত রজনীগন্ধার মতো।

বুড়ো বাপ মৃত্যুর একদিন আগে তার সমস্ত সম্পত্তি দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীকে দানপত্র করে দিয়েছে প্রথম পক্ষের ছেলে ও মেয়েকে বঞ্চিত করে। শামেলা সেই প্রথম পক্ষের মেয়ে। সে আর তার বড় ভাই দুয়ে মিলে নালিশ করেছে দানপত্র রদ করতে। তাদের বক্তব্য দলিল স্বেচ্ছাকৃত নয়, অবৈধ প্রতিপত্তি দ্বারা দূষিত। সমস্তই বিমাতার কারসাজি।

তিনদিন ধরে শামেলার জবানবন্দি ও জেরা হয়েছিল। প্রভেশ একটা চেয়ার দিতে চেয়েছিল, নেয়নি। দাঁড়িয়ে থেকেই লড়াই করলে।

শুধু একবারটি ভেঙে পড়তে চেয়েছিল যখন বিবাদী তার অতীতে চেয়েছিল ছুরি চালাতে।

প্রভেশের দিকে চেয়ে ঝামটে উঠল শামেলা; 'স্যার, ইজ দিস রেলিভেন্ট?'

প্রভেশ গম্ভীর হয়ে বলেছিল, 'হ্যাঁ, প্রাসঙ্গিক নিশ্চয়ই।'

বিবাদী বিমাতা বলতে চাইছে শামেলার অতীত একেবারে অনাঘ্রাত নয়। বিয়ের আগে কলকাতায় থাকতে যখন সে অফিসে কাজ করত তখন সে সন্ধের দিকে কোনো কোনো চিহ্নিত বাড়িতে 'নাইস টাইমের' বিজ্ঞাপন হয়ে টাকা কামাত। বিয়ে করে সে পুরো ওলটাতে চেয়েছিল, কিন্তু পুরোনো দিনের গন্ধ তখনো লেগে ছিল বলে তার স্বামী তাকে বরদাস্ত করতে পারেনি, তাড়িয়ে দিয়েছে।

সমস্ত মিথ্যে। গর্জে উঠল শামেলা।

প্রভেশ তাকে আশ্বস্ত করতে চাইল। সত্য হলেই বা ক্ষতি কী। সত্য সব সময়েই সুন্দর। পাপ যদি সত্য হয় তবে পাপও সুন্দর।

সব দেখে-শুনে প্রভেশ বিচার করে দেখল দলিলটাকে হটানো যায় না, মামলা ডিসমিস না করে উপায় নেই।

রায় লেখা হয়ে গিয়েছে, সই করতে বাকি, প্রভেশের মনে হল, শামেলাকে ডাকলে কি আসে?

যদি না আসে তো না এল, বয়ে গেল। মামলা তো এমনিতেই ডিসমিস।

কিন্তু যদি সত্যি আসে? যদি সত্যি অনুকূল হয়?

যদি আসে তো এই আষাঢ়েই আসবে যে মামলা ফলপ্রসূ হবে। দলিল নাকচ হবে। ওয়ারিশি মিলবে শামেলার। তারপর কি আর মামলা ডিসমিস করা ঠিক হবে? ফের নতুন করে উলটো সুরে লিখতে হবে না জাজমেন্ট? কী বলবে তার বিবেক? কী ভাববে শামেলা?

যা হবার হবে, একবার তো আসুক বাড়িতে।

এবার আর্দালি নয়, বাদী পক্ষের তদবিরকারকে ডাকল প্রবেশ।

গলা খাটো করে বললে, 'একটা স্পেশাল পয়েন্ট ক্লিয়ার করে নেবার জন্যে পামেলাকে একটু দরকার। খবর দিতে পারেন?

'যা, পারি না খুব পারি। কোথায় দেখা করতে বলব?'

'আমার কোয়ার্টারে।'

লোকটা যেন কী মুকুর করে তাকাল। পয়েন্ট ক্লিয়ার করবার জন্যে উকিলকে দরকার নয় পক্ষকে দরকার, তাও এজলাসে খাসকামরায় নয়, একেবারে বাড়িতে, ব্যাপারটা একটু গোলমেলে কি? না কি একেবারে—

'কখন আসতে বলব? সন্ধের দিকে?'

'যখন তার খুশি।'

তারই জন্যে তো রাতটা পালটানো চলবে না। ডিসমিস ডিসমিসই থাকবে। পামেলা দেখবে তার ধারও গেছে ঘুরড়িও গেছে। কিন্তু কিছুই সে করতে পারবে না।

কী করবে সে? নালিশ করবে? কী বলে? তখন স্পষ্ট বলা যাবে হারলক অমনি যা-তা বলেই থাকে। সে যদি কোয়ার্টারে গিয়েছে বলে, তার এভিডেন্স নেই, বলা যাবে সে ঘুষ দিতে বা ইনফ্লুয়েন্স করতে গিয়েছিল। আর তার সঙ্গে যদি তেমন বন্ধুতাই হবে তবে মামলায় তাকে জিতিয়ে না দিয়ে হারিয়ে দেব কেন?

সুতরাং পামেলা যা এখন বলছে সমস্ত অবিশ্বাস্য।

কিন্তু, আরো অবিশ্বাস্য, পামেলা এল না। মামলা যে-ডিসমিস সে-ডিসমিসই থেকে গেল।

রায়টা শুকর্ণে শুনে যেতে পামেলা এসেছিল কোর্টে। তার কালো হয়ে যাওয়া মুখটা দেখতে তার বিষাক্তার তো ভালো লাগছিলই, প্রবেশেরও লাগছিল।

কিন্তু এবার—এবার কী?

এবার তো ডাকবার মতন নয়, এবার বুঝি নিজেরই যেতে হয় চুপি চুপি, হয়তো ফাঁকায়, অন্ধকারে র‍্যাপার মুড়ি দিয়ে।

যা, রাত্রে কেন? দিনে, মধ্যদিনে যেতেই বা দোষ কী! অনায়াসে বলা যাবে যে লোকাল ইনস্পেকশান করতে এসেছি।

বলাবলিরই বা কী দরকার! সরল রেখার মত পরিষ্কার চলে গেলেই বা আটকায় কে!

অহীন্দ্র গুহ আসামী। বয়েস ত্রিশ-বত্রিশ। উঁচু ঘরের ছেলে। একটা মার্কেটাইল ফার্মে কেরানিগিরি করে। বিয়ে করেছে। স্ত্রী জীবিত, মেয়ে আছে একটি।

ধাক্কাধাক্কি আধের ছোট সংসারের নিরীহ নায়ক। ছাপোষা। দেখতে নিতান্ত ভালোমানুষ।

ডিফেন্স কী?

নির্দোষ।

'আর কিছু বলবেন?' প্রবেশ জিজ্ঞেস করল।

'বলব।'

আসামীর উকিল পর্যন্ত চমকে উঠল। সে কী! এমন তো কোনো কাহিনী নেই। নিম্ন আদালতে তদন্তের সময়ও তো কোনো বক্তব্য ছিল না। 'নির্দোষ' শুধু এই বলেই চুপ ছিল। দায়রায় কেস ওপনিং-এর সময়ও কোনো গল্পের আভাস দেওয়া হয়নি। এখন হঠাৎ এই দুর্মতি কেন?

'বলুন।'

'ঘুনের সময়,' অহীন স্পষ্ট কণ্ঠে বললে, 'আমি অন্যত্র ছিলাম।'

'ব্যস, এই? আর কিছু নয়?'

'অন্যত্র কোথায় ছিলাম তা বলছি।' সত্য ভাষণের মত মুখ করল অহীন: 'ছিলাম একশো সতেরোর বি মল্লিকবাড়ি স্ট্রীটে, সরস্বতীর ঘরে।'

সর্বনাশ করেছে! আসামীর উকিল মাথায় হাত দিয়ে বসল। সর্বস্বান্তের মত মুখ করে তাকাল অহীনের দিকে। এ সব গল্প ফাঁদবার কী দরকার ছিল? প্রমাণের ভার সরকারের উপর সে তোমার দোষ প্রমাণ করুক। তুমি কেন মিছিমিছি তোমার নির্দোষিতা প্রমাণের ভার নাও? ছি ছি, বলা নেই কওয়া নেই, কারু সঙ্গে পরামর্শ করা নেই, এমন কেলেঙ্কারি কেউ করে বসে? নিজের পায়ে কুড়ুল মারে?

'সাক্ষী দেবেন?' প্রদ্যোৎ জিজ্ঞেস করল।

'দেব।

'কে সাক্ষী?'

'সরস্বতী দাসী।'

'আর কেউ?'

'না।'

তখুনি সরস্বতী দাসীর নামে সমন বেরুল। মামলা মুলতুবি রইল। দেখা যাক সরস্বতী কী বলে। কতদূর সমর্থন করে আসামীকে।

প্রসিকিউশান কেসটা কী?

দুপুরবেলা প্রায় একটার সময় ব্যাঙ্কের সামনে ট্যাক্সি নিয়ে অপেক্ষা করছিল অহীন্দ্র গুহ। সে জানত তার বন্ধু শিবশঙ্কর ষাট্‌হাজার মোটা চেক ভাঙাতে ভিতরে গিয়েছে। এ টাকা থেকে তার কারখানার কর্মচারীদের সে মাইনে দেবে।

ট্যাক্সি রেখে শিবশঙ্কর এগিয়ে যায়, ড্রাইভার বলে, ড্যাশ ডাউন, লোক আছে। লোক কোথায়, পিছন তাকাতেই—কোথায় যা চাকা দিয়েছিল কে জানে—অহীন্দ্র বেরিয়ে এল। বললে, ওঠো, এ আমারই ট্যাক্সি, আমি তোমারই দিকে যাচ্ছি, তোমাকে তোমার কারখানায় অনায়াসে নামিয়ে দিতে পারব।

হাসতে-হাসতে, সরল বিশ্বাসে, শিবশঙ্কর উঠে বসে ট্যাক্সিতে। কতদূর আসতেই, দুপুর বলে রাস্তায় তখন লোক চলাচল কম, হঠাৎ রিভলভার বার করে শিবশঙ্করকে গুলি করে অহীন্দ্র। টাকার প্যাকেটটা ছিনিয়ে নেয়। তারপর ট্যাক্সি ড্রাইভারের দিকে রিভলভার লক্ষ্য করে। তাকে ট্যাক্সি থামাতে বলে। ট্যাক্সি ড্রাইভার ট্যাক্সি থামায়। ট্যাক্সি থামতেই অহীন্দ্র নেমে পড়ে। ট্যাক্সি ড্রাইভার পাছে রব তোলে বা ট্যাক্সি ছুটিয়ে পিছু নেয়, সেই পথ বন্ধ করবার জন্যে অহীন্দ্র

ড্রাইভারকে লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়ে। পর-পর দুবার। তারপর পাশের গলি দিয়ে ছুটে পালায়। যে দুজন ছিল রাস্তার লোক, কিন্তু সেটা ঠিক ঘর-ঘর ছিল না, এখান দিয়ে গেল ওখান দিয়ে পালাল—এমনি একটা অনুতাপের স্বর। তার মানেই সিন্ধু সিতে দেরি হয়ে গিয়েছে। বেরিয়ে বেরিয়ে গিয়েছে আততায়ী।

খুব কাছাকাছি থেকে মেরেছে বলে শিবশঙ্কর শেষ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু ট্যাক্সি ড্রাইভার, অভয়পদ বিশ্বাস, মরেনি। তার আঘাত গুরুতর। কিন্তু হাসপাতালে মাস খানেকের উপর থেকে সে সেরে উঠেছে।

ঘটনার সাত দিন পরে পুলিশ অহীন্দ্রকে তার বাড়িতে গ্রেপ্তার করে। পুলিশ তাদের সন্ধানের গোপন সূত্র প্রকাশ করতে বাধ্য নয়, কী পরিমাণ সাক্ষ্যপ্রমাণ সংগ্রহ করতে পেরেছে তাই দেখ। দেখ তা অহীন্দ্রের অপরাধ নিঃসংশয়ে সাব্যস্ত করতে যথেষ্ট কিনা।

মোটেই যথেষ্ট নয়—অহীন্দ্রের উকিল সরসীলাল ব্যানার্জি বেশ নিশ্চিন্ত ছিলেন, কিন্তু হঠাৎ, আজ এ কী অদ্ভুত কথা বলে বসল অহীন্দ্র!

একমাত্র চাক্ষুষ প্রমাণ ট্যাক্সি-ড্রাইভার অভয়পদ। সে বলছে সে চিনেছে অহীনকে। এই সেই লোক যে রাস্তা থেকে তার ট্যাক্সি ধরেছিল। ব্যাঙ্কের সামনে এসে দাঁড় করিয়েছিল। নেমে গিয়েছিল, পরে হঠাৎ আবির্ভূত হয়ে বন্দুকে তুলে নিয়েছিল গাড়িতে। এই সেই লোক যে গুলি করেছে!

টেস্ট আইডেন্টিফিকেশন প্যারেডেও অভয়পদ অহীনকে সনাক্ত করেছে।

এই একটা দুর্ধর্ষ সাক্ষী, তাকেও সরসীলাল জেরায় কোণঠাসা করেছিল। কে ট্যাক্সি ধরে, তার মুখ আপনি মনে করে রাখেন না। পিছনের সিটে প্যাসেঞ্জার যদি পুরুষ ও তার সঙ্গে যদি একাকিনী স্ত্রীলোক না থাকে তবে ড্রাইভারের আয়নাতে তার প্যাসেঞ্জারকে লক্ষ্য করার কথা নয়। তাহলে কী করে সনাক্ত করছেন? যখন রিভলভার উঁচিয়ে ভয় দেখিয়ে গাড়ি থামায় তখন? সেটা তো এক পলকের ব্যাপার। আপনি তখন গাড়ি থামাবেন, না, রিভলভারধারীকে দেখবেন? তারপর আর দেখলেন কখন? যখন গুলি ছুঁড়ল? তখন তো বেশ খানিকটা দূরে সরে গিয়েছে। তখন কি আপনি নিজে পালাবার কথা ভাববেন না লোকটার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকবেন একদৃষ্টে? তাকিয়ে থাকলেও কি সে মুখ মুখস্ত থাকবে? শুনুন, মিথ্যে কথা বলবেন না। সন্দেহাতীত নিশ্চিত না হলে বলবেন না। ভগবানের অনন্ত দয়া যে বেঁচে গিয়েছেন, গুলিটা কেটাল হয়নি।

সুদীর্ঘ জেরা করেছে ড্রাইভারকে। শেষ পর্যন্ত নড়িয়ে দিয়েছে। শেষ পর্যন্ত ক্লান্ত হয়ে অভয়পদ বলে ফেলেছে, নাক মুখ চোখ অত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সে মনে করে রাখেনি, তবে সেই খুনেটা ডকের আসামীর মত দেখতে তাতে সন্দেহ নেই। জীবনমরণ উত্তেজনার মুহূর্তে মানুষের ভুল করা ভুল দেখা অস্বাভাবিক নয়—ভুল তার না হতে পারে! কিন্তু অভয়পদর অত সহজে ভুল হয় না।

ব্যস, ওতেই হবে। অভয়পদের সাক্ষ্যের মধ্যে একটা সন্দেহ ঢুকিয়ে দিতে পেরেছে। অভয়পদ একেবারে ষোল আনা নিঃসন্দেহ নয়। বিয়ণ্ড রিজনেবল ডাউট তাহলে হচ্ছে না।

আর সাক্ষী কে?

রাস্তার কতগুলো চলতি লোক। সেদব অনুমানের সাক্ষী। তাদের কথার কানাকড়িও দাম নেই।

আর ?

রিভলভারটা পাওয়া গিয়েছে অহীন্দ্রের বাড়ির কাছের ডাস্টবিনের মধ্যে।

এ একটা প্রমাণ ? বাড়িতে বাক্সের মধ্যে পাওয়া গেলে তা হলেও বরং কথা ছিল। ডাস্টবিনে কে কী ফেলবে তার দায়িত্ব হবে অহীন্দ্রের ? কাছাকাছি আরো তো কত বাড়ি আছে তাদেরও তো না।

আরেক প্রমাণ টাকা। মোট টাকা খোয়া গিয়েছে দশ হাজারের কিছু বেশি। তার মধ্যে তিন হাজার সাতশো ছাব্বিশ টাকা অহীনের বাড়িতে পাওয়া গিয়েছে। অত টাকা অহীনের কাছে আসে কোত্থেকে ?

ঘোড়দৌড়ের মাঠ থেকে। অহীন রেস খেলে। না হয় ও টাকাটা ও দীর্ঘ দিন ধরে তিল-তিল করে জমিয়েছে। নোটে কি কোনো চিহ্ন আছে যে ও টাকাটা শিবশঙ্করের বলে সাব্যস্ত করতে হবে ? রেস তো টাকার কৈফিয়ৎটা গ্রাহ্য করার মত নয়। তাহলে কী হয় ? তাহলেই কি ধরে নিতে হবে অহীন্দ্র খুন করেছে ? একটা সন্দেহ হতে পারে—এই পর্যন্ত। কিন্তু সন্দেহই তো প্রমাণ নয়।

হ্যাঁ, আরেকটা বিষয় অহীন্দ্রের বিরুদ্ধে আছে। সেটা আর কিছুই নয়, দেখা যাচ্ছে খুনের দিন ও তার পরের দিন দুদিন তার অফিস থেকে ছুটি নেওয়া। ছুটি নেওয়া কেন ? কর এন আর্জেন্ট পিস অফ বিজনেস। বিজনেসটার কোনো ব্যাখ্যা দিতে পারেনি অহীন। তাই বলে বিজনেসটা খুন হবে তার কোনো মানে হয় না।

সাঙ্ঘাপ্রমাণ তো এই। এর উপর কখনো কনভিকশান হয় ?

হ্যাঁ, জুরির খামখেয়ালের উপর বিচার নির্ভর করছে। এক ট্যাক্সি ড্রাইভারকে বিশ্বাস করেই হয়তো দোষী বলবে। তার উপর ছুটিটার ব্যাখ্যা নেই সেটাও হয়তো জুরির মনে কাজ করবে। তাছাড়া অতগুলি টাকা !

তাই বলে সরস্বতীর ঘরে দিন কাটাবার ওজুহাত নেবার মানে কী ? ছুটি নিয়েছিল, দাঁতের ব্যথা থেকে শ্বশুরবাড়ি কত কিছু কারণ দেখানো যায়—একেবারে মন্দিরবাড়ি স্ট্রীটের সরস্বতী দাসীর কথা মনে পড়ে কেন ? এখন যদি সরস্বতীকে না পাওয়া যায় ? সে যদি পুলিশের ভয়ে সাক্ষী দিতে না আসে ?

এ একেবারে সব করে হাড়িকাঠে গলা বাড়ানো। একটা লোকের জীবন নিয়ে নেওয়া হয়েছে, আরেকটা লোককে জখম করা হয়েছে, এতগুলি টাকা লুট করা হয়েছে, জুরিদের মেজাজ এমনিতেই মারমুখো হয়ে আছে, যে-কোনো একজনকে ফাঁসিতে ঝোলাতে পারলেই তাদের শান্তি—সেখানে এতসব জটিল অবস্থার মধ্যে আবার এই একটা নতুন উৎপাত কে সৃষ্টি করে !

'কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করা নেই !' তীব্রণ বিরক্ত হল সরলীলাল : 'আমি তোর উকিল আমাকে কনফিডেন্সে নিবিনে ? সরস্বতীর বাড়িতে দিন কাটানো যদি সত্যিও হয় তাহলে এখন, এই স্টেজে তা বলতে হবে নাকি ? সব সত্যই কি সব সময়ে বলতে হয় খুলে বেলে ? ছি ছি ছি, এখন ঘুঘাতসলিলে ডুবলে আমি করব কী !'

বাড়িতে অহীনের স্ত্রী নিতাননী একথা শুনে কাঁদতে বসল। ঘটনার সময়ে অহীন একটা পতিতার বাড়িতে ছিল এই ওজুহাতে সে যদি খালাস হয় তাহলেও সে লজ্জায় কাউকে মুখ দেখাতে

পারবে না। সে একজন গণিকাসক্তের স্ত্রী এ অপমান খুনের স্ত্রী হওয়ার চেয়ে অনেক বেশি। মোটর ডাকাতি করতে গিয়ে গুলি করে কাউকে খুন করেছে এর মধ্যে তবু খানিকটা পৌরুষ ছিল। ও-খালাসের থেকে এ-জেল অনেক সম্ভ্রান্ত! ছি ছি, গণিকালয়ের কথা মুখ ফুটে কোর্টে বলতে তার বাধল না একটুও! অফিস থেকে ছুটি নিয়ে ওর এই জরুরি দরকার। সেখানে মাথা কুটতে লাগল নিভাননী। ভগবান তার আগে আমার কেন ফাঁসি হল না?

ঠিক যা ভয় করেছিল সরসীলাল। সরস্বতীকে পাওয়া গেল না। সমন গরজারি হল। বাসিন্দেরা কেউ বললে, ও নামে কোনো মেয়ে নেই। আবার কেউ বলল, ছিল, উঠে গেছে।

'তা আমরা জানিনা।' সরকারী উকিল বললে, 'য়্যালিবাই—অর্থাৎ ঘটনার সময় আসামী অন্যত্র ছিল এই ওজুহাত যখন আসামী তুলেছে তখন আসামীকেই তা প্রমাণ করতে হবে। বেশ তো, আসামী প্রমাণ করুক, নির্দিষ্ট সময়ে সে সরস্বতীর ঘরে ছিল, নয় থাচ্ছিল না অন্য কিছু করছিল, সে খালাস পেয়ে যাবে। কিন্তু যদি সে তা প্রমাণ করতে না পারে, তাহলে—'

'তাহলেও সে খুন করেছে প্রমাণ হবে না।' লাফিয়ে উঠল সরসীলাল।

'সেটা জুরি মহোদয়রা বিচার করে দেখবেন। দেখবেন য়্যালিবাই চলে গেলে প্রসিকিউশানের কেসটা আরো বেশি বিশ্বাসযোগ্য হয় কিনা। প্রমাণ আর কী! সত্য বলে বিশ্বাস করতে পারাটাই প্রমাণিত হওয়া। কেন, কেন আপনারা ট্যাক্সি-ড্রাইভার অভয়পদ বিশ্বাসকে অবিশ্বাস করবেন? প্রত্যক্ষ দিনের আলোয় তার ভুল হবার কারণ কী? ও কেন মিথ্যে কথা বলতে যাবে? ওর নিজের মনে সন্দেহ থাকলে ও কেন আসামীকে ছাড়বে? ওর কী স্বার্থ? সেই সঙ্গে পারিপার্শ্বিক সব অবস্থা দেখুন—

সরকারী উকিল চুটিয়ে আর্গুমেন্ট করল।

'য়্যালিবাইটা প্রমাণ করা যায়নি বলে সরকার পক্ষ খুব তড়পাচ্ছে, কিন্তু প্রমাণ করা কি সহজ কথা? ও ধরণের স্ত্রীলোককে কি সমন দিয়ে ধরা যায়? এমনিতেই টাকা নিচ্ছে আর এ অবস্থায় যাববরদারি কত চাইবে তার লেখাজোখা নেই—'

'কোনো প্রমাণ নেই যে সরস্বতী টাকা পায়নি বলে আসছে না।' সরকারী উকিল বললে, 'আমাদের বক্তব্য হচ্ছে সরস্বতীর অস্তিত্বই নেই। সমস্ত য়্যালিবাইটাই বানানো।'

'সেইটেই আপনারা বিচার করে দেখবেন।' সরসীলাল বললে তপ্তকণ্ঠে, 'বিচার করে দেখবেন একজন ছাপোষা কেরাণী, সম্ভ্রান্ত ও সম্মানিত, এমন একটা অযথা কথা বানিয়ে বলবে কিনা। না কি কাহিনীটার মধ্যে সত্যিই সত্য আছে? নিজের সুনামকে মানুষ বিপন্ন করতে পারে একমাত্র সত্যের খাতিরে। অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণ করা যাচ্ছে না বটে, কেননা এবেলার সরস্বতী ওবেলার চঞ্চলা লক্ষ্মী হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু আপনারা দেখবেন, খুন বা ডাকাতি করার মতলব থাকলে কেউ আপিস থেকে ছুটি নেয় কিনা—'

সরসীলালও গলা ফাটিয়ে আর্গুমেন্ট করল।

প্রসিকিউশান ও ডিফেন্স দুই পক্ষেরই সওয়াল—জবাব সারা, সেসন জজ এবার চার্জ দেবে, জুরিরা টানটোন হয়ে বসেছে, এমন সময় একটা স্ত্রীলোক হাতে একটা দরখাস্ত নিয়ে উপস্থিত।

সরসীলাল বললে, 'এতক্ষণে সরস্বতী দাসী এসেছে।'

'এই সরস্বতী।' প্রজেশ অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল।

কর্সা রঙ, সুন্দর গড়ন-পিটন, মদ খেয়েছে বলে যেন রূপ আরো খুলেছে। টুলটুল করছে মুখখানি। টানা চোখ নেশায় ভরপুর হয়ে আছে। মাথার চুল খোলা গায়ের আঁচলও শিথিল। যেন দাঁড়াতে পারছে না, টলছে।

'হাতে কী?'

'পিটিশন। বলছে আমার সাক্ষ্য নেওয়া হোক। আমি আসামীর পক্ষ সমর্থন করব।'

'ইমপসিবল।' পাবলিক প্রসিকিউটর লাফিয়ে উঠল: 'এ স্টেজে সাক্ষ্য নেওয়ার কথা কোনো কোডে লেখা নেই। এ সমস্ত ম্যালাফাইডি, নিতান্ত অসরল—'

'তা জুরি মহোদয়রা বুঝবেন।' সরসীলাল দরখাস্তটা বাড়িয়ে ধরল।

প্রজেশ দরখাস্ত নামঞ্জুর করে দিল। লিখল, এই স্তরে এ দরখাস্ত গ্রাহ্য নয়। সময়মত আসনি কেন?

সময় চার্জ দিল প্রজেশ। সরস্বতীর দরখাস্তের ভালো-মন্দ কী তাৎপর্য হতে পারে সমস্ত বিশ্লেষণ করে জোরাল জুরিদের। সরস্বতীর গল্প আসামী কোনোখানে এতদিন বলেওনি ঘুণাক্ষরে, কাহিনী সরল, না বানানো, না কি লজ্জাবশেই বলতে দেরী করেছে তা আপনারা বিবেচনা করবেন। সবচেয়ে বড় কথা, সরস্বতীর ঘরে যে ও ছিল তা আইনানুযায়ী এভিডেন্স হয়ে আসেনি আপনাদের কাছে, সুতরাং আসামী যে 'ব্যালিবাই' বা অন্যত্র থাকবার ওজর তুলেছে তা আপনারা আপনাদের মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দেবেন, যার কোনো বৈধ প্রমাণ নেই তা নিয়ে মাথা ঘামাবেন না। বরং যেচে নেবে নিজের উপর প্রমাণের ভার নিয়ে আসামী যদি অকৃতকার্য হয় তাহলে বিবেচনা করে দেখবেন সে আসলে দোষী কিনা।

এখন মূল কেসটা দেখুন—

খুব কড়া করে চার্জ দিল প্রজেশ। মনে-প্রাণে চাইল অহীন্দ্র দোষী সাব্যস্ত হোক। এত বড় একটা খুন! রাহাজানি! তারপরে কদর্য চরিত্রহীনতা!

জুরিরা কী ভাবল কে জানে, বেনিফিট অব ডাউটে নট-গিলটি বলে দিল।

প্রজেশের মনে হল সরস্বতীই এই কারসাজিটা করেছে। ঠিক করল সন্ধ্যায় সে যাবে সরস্বতীর সন্ধানে।

মামলা শেষ হয়ে গিয়েছে, আসামী খালাস, এখন যেতে আর বাধা কী! মেয়েটা তারি সুন্দর। অকারণ সুন্দর।

মহিমার যে এমন রূপ খোলে তা জানা ছিল না প্রজেশের। হয়তো তাকে দেখে চিনতে পারবে, কুণ্ঠিত হয়ে যাবে, সে কুণ্ঠার মধ্যে দেখবে আবার আরেক রকম ভাবভঙ্গি, আরেক রকম রসরাগ।

বিবেককে বোঝাল, আর কোনো কারণে নয়, সত্যিই ঘটনার সময় অহীন্দ্র তার ঘরে ছিল কিনা, না কি সমস্তই একটা ছল, এ জানবার জন্যেই তার যাওয়া। যদি কারু চেনা চোখে ধরা পড়ে, বলা যাবে, শুধু একটা বিচার জিজ্ঞাসা।

ময়নাকে, পায়েলাকে নিজের বাড়িতেই অভিসার করেছিল এবারের অভিসার বুঝি অভিসার হয়ে উঠেছে।

পিটিশনে সরস্বতীর ঠিকানা দেওয়া আছে। আবেদনপত্র ভালো করে দেখে নিল প্রবেশ। তারপর, স্টেতের রাত, পুরু করে র‍্যাপার মুড়ি দিলে।

এ বাড়িতে সরস্বতী বলে কেউ আছে?

সরস্বতী আবার কে? হ্যাঁ রে, আছে? ঐ নতুন মেয়েটার নাম কী? ওটার নাম তো শৈলবালা!

বাড়ির নম্বরে সম্ভাব্য কী ভুল হতে পারে মনে মনে বিচার করে আরো কটা বাড়ি খুঁজল প্রবেশ। আমরা কী দোষ করেছি। আমরা কি একেবারে হতশ্রদ্ধা করবার মত?

না, আমি সরস্বতীকে চাই।

সরস্বতীকে কোথাও পাওয়া গেল না। প্রবেশ ব্যর্থ মনে ফিরে এল।

ডাকল আসামীর উকিল সরসীলালকে। অন্তরঙ্গ হবার মত নিভৃতি রচনা করল। বললে, 'সরস্বতী কে?'

সরসীলাল মৃদু মৃদু হাসতে লাগল।

'এখন বলতে বাধা কী। কোথায় থাকে মেয়েটা?'

'শুনলে অবাক হবেন না তো?'

'দেখেই অবাক হয়েছি। শুনে আবার কী অবাক হব?'

'ও হচ্ছে অহীন্দ্রের বউ। নিভাননী।'

'আসামীর স্ত্রী?' মাথার রগ দুটো টিপে ধরল প্রবেশ: 'বলেন কী? ভদ্রমহিলা? ভদ্রমহিলা মদ খেয়েছে? মদ খেয়ে এলোমেলো হয়ে চলে এসেছে কোর্টে?'

'মদ নয়, জ্বর। একশো তিন ডিগ্রি জ্বর।' সরসীলালের মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল: 'জ্বর গায়ে বিছানা ছেড়ে উঠে এসেছে। দাঁড়াতে পারছে না, টলছে তবু চলে এসেছে। তার স্বামীকে বাঁচাবার শেষ চেষ্টা দেখেছে—' মুখ নামাল সরসীলাল।

প্রবেশের মনে হল, জুরি দোষী ঘোষণা করেছে আর সে, বিচারক, আসামীকে যাবজ্জীবন জেল দিতে গিয়ে অর্ডারে অহীন্দ্রের নামের বদলে নিজের নাম লিখে ফেলেছে।

———

॥ উৎসবে অপরিহার্য ॥
পশ্চিম বাংলার তাঁতের কাপড়
* টেঁকসই　* সস্তা　* চিত্তাকর্ষক
॥ রঙে, নক্‌শায় আর বুননে অতুলনীয় ॥
॥ সরকারী বিপণন-কেন্দ্রগুলিতে এবার রকমারি তাঁতের কাপড়ের বিপুল সমাবেশ ॥
পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রচারিত।

গল্পের সন্ধানে

প্র. না. বি.

এই মাত্র সম্পাদক মশায় কয়েকখানা নোট পকেটে গুঁজে দিয়ে বের হ'য়ে গেলেন। আপত্তি করেছিলাম, তীব্র আপত্তি; এবারে মাথার পর আসছে না, মাপ করবেন। তিনি বলেছিলেন, বিলক্ষণ, আপনাদের মাথা ঝাড়া দিলে আস্ত উপন্যাস বেরিয়ে পড়ে, তার কিনা একটা ছোট গল্প! বিন, কাগজ কলম নিয়ে ব'সে যান, আচ্ছা আমি চল্লাম, কালকে এই সময়ে লোক পাঠিয়ে দেবো।

এই বলে তিনি বের হ'য়ে চলে গেলেন। কিন্তু আমি এখন কি করি? সম্পাদকের কথা মিথ্যা হ'তে পারে না ভেবে বার কয়েক মাথা ঝাড়া দিলাম, বেশ জোরেই, পাকড়ী থাকলে ধ'সে পড়তো। কিন্তু উপন্যাস দূরে থাক, একটা ছোট গল্পও বের হল না। তবে দেখা যাচ্ছে যে সম্পাদকের কথাও সব সময়ে সত্য হয় না।

এবারে সত্য সত্যই মাথায় অষম্য, কলম কিছুই নাই। অথচ ওদিকে সম্পাদকীয় টাকা নিয়েছি। অবশ্য ইচ্ছায় নয়, জোর ক'রে পকেটে গুঁজে দেওয়া হ'য়েছে। তা হোক—তবু একই কথা। টাকার নিজস্ব নীতি অনুসারে ও আমার ইচ্ছাতেই গৃহীত। আবার বারকতক মাথা ঝাড়া দিলাম, শেষ মুহূর্তে কিছু বের হলেও হতে পারে। গৃহিণী ঘরে ঢুকেছিলেন, বল্লেন, মাথা ধরেছে নাকি? মনে মনে বললাম, হাঁ, সম্পাদকে ধরেছে। তিনি বল্লেন, তাহলে যাও, একটু বাইরে ঘুরে এসো, হাওয়া লাগলে ছেড়ে যেতে পারে।

গৃহিণীর কথা শুনে মনে হ'ল, এ যোধ করি খাসে ধর হ'ল, বাইরে একবার ঘুরে এলে মন্দ হয় না। তখনি মনে পড়লো একটি বেদবাক্য। কলকাতার পথে টাকা ও গল্প ছড়ানো, কুড়িয়ে নেবার অবসর মাত্র। তাহলার পরীক্ষা ক'রে দেখা যাক্ কলিযুগে বেদবাক্য ফলে কিনা কিম্বা কতটা ফলে কিম্বা কি ভাবে ফলে। সম্পাদকীয় পত্রপুট ভরাবার মতো এক অঙ্গুলি ছোট গল্পের মাল মশলা মিল্লেও মিলতে পারে।

তখনি উঠে পড়লাম, সম্পাদকীয় নোট ক'খানা পকেট থেকে বের ক'রে মানিব্যাগে রাখলাম। দেখলাম মানিব্যাগের মধ্যে 'মানি' নাই আছে তাঁর পূর্ব্ব লিখিত পত্রখানা, গল্পের পারিশ্রমিক নিয়ে যাচ্ছি, আপনার গল্প না পেলে এবারে পূজায় 'ধন-সাবরি' প্রকাশিত হবে না মনে রাখবেন।

গৃহিণী চাবি নিয়ে চলে গিয়েছিলেন, ডাকতে সাহস হল না, পাছে তিনি শুধু খোলা হাওয়ার উপরে ভরসা না করে আর কিছুর ব্যবস্থা করেন। বেরাজ খুলতে না পারায় মানিব্যাগ পকেটে ফেলে চাদর টেনে নিয়ে পথে বের হয়ে পড়লাম। কলকাতার পথে বাকি টাকা ও ছোট গল্প ছড়ানো থাকে। হায়, তখন কে জানতো যে এ বেদবাক্য এমন ভাবে সত্য হয়ে উঠবে আমার জীবনে।

ঘণ্টা দুই রাস্তায় ও পার্কে ঘুরে যখন বাড়ী ফিরলাম পকেটে হাত দিয়ে দেখি মানিব্যাগটি অন্তর্হিত। বেদবাক্য কখনো মিথ্যা হওয়ার নয়, এমন কি এই দারুণ কলিকালেও নয়। কলকাতার

পথেই আমার টাকা খোয়া গিয়েছে।—কিন্তু গল্প! তখনি বিদ্যুৎবেগে মাথায় খেলে গেল—এই ব্যাপারটাই গল্পাকারে লিখে ফেলা যাক না কেন? গল্পটা অবশ্য নিতান্ত মামুলী হবে, তার আর উপায় কি? যে টাকা পেয়েও পেলাম না তাকে ভুলে এমন আর কি অভিনব গল্প হবে। পরের দিনে কাগজ কলম নিয়ে লিখতে ব'সে এই পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছি তখন হঠাৎ ঘণ্টা বেজে উঠ্‌লো। দরজা খুলে চমকে উঠ্‌লাম—একি অরিন্দম যে।

ভালুট ও নমস্কারের মাঝামাঝি একটা মুদ্রা করে মুহূর্তান্তে অরিন্দম বল্‌লে, হাঁ, স্যার।

অরিন্দম এক সময়ে আমার কাছে কলেজে পড়তো, তারপরে পুলিশে ঢুকেছে বলে শুনেছিলাম। গায়ে তার পুলিশ অফিসারের পোষাক বটে।

তা এখন কোথায় আছ?

আজ্ঞে এই থানাতেই অফিসার ইন চার্জ।

এসো, এসো, ব'সো। তারপরে কি মনে ক'রে?

স্যার, আপনার মানিব্যাগ হারিয়েছে কি? এই বলে সে একটা মানিব্যাগ, আমারটাই, টেবিলের উপরে রাখলো। (মামুলী গল্প ক্রমে জমে উঠ্‌ছে দেখছি, দেখা যাক আর কতদূর গড়ায়)

এই তো আমার মানিব্যাগ। কাল বিকালে খোয়া গিয়েছিল। পেলে কি ক'রে?

কাল রাতের বেলায় ব'সে আছি, উঠ্‌বো, উঠ্‌বো করছি, এমন সময় হঠাৎ জানলা দিয়ে কি একটা জিনিষ এসে পড়লো। তুলে দেখি মানিব্যাগ, খুলে দেখি চিঠিতে আপনার নাম। ভাবলাম কাল দিয়ে আসবো, আজ সকালেই উঠে চলে এসেছি। দেখুন সব ঠিক আছে কিনা? (গল্প ক্রমেই আরও জমে উঠ্‌ছে)

খুলে দেখি নোট ক'খানা আছে, চিঠিটাও।

বল্‌লাম, চোরের এমন অদ্ভুত বুদ্ধি হ'ল কেন?

অনেক সময়ে চুরি করবার পরেই অনুতাপ হয়, বিশেষ পাকা চোর যদি না হয়। এমন কেস আরও দেখেছি।

অনেক ধন্যবাদ অরিন্দম। কিন্তু আবার কোর্টে যেতে হবে না তো।

না স্যার, ডায়েরী করি নি। আচ্ছা, এখন আসি।

অরিন্দম চলে যেতেই মানিব্যাগ উপুড় করে ঢেলে ফেল্‌লাম। বের হ'য়ে পড়লো সম্পাদক প্রদত্ত পাঁচখানা দশটাকার নোট, সম্পাদকের চিঠি। কিন্তু এখানা কি? আর কিছু তো ছিল না। এ যে আর একখানা চিঠি। দেখা যাক কি আছে। (গল্পও ক্রমেই জটিল ও জমাট হয়ে উঠছে) চিঠিতে আছে—স্যার, আমিও একজন গল্প-লেখক, সম্পাদকের তাগিদের তাড়নায় গল্পের উপাদান সন্ধানে বের হয়েছিলাম। আপনি একাকী রবীন্দ্রসরোবরের একখানি বেঞ্চিতে বসেছিলেন আপনার পাশে গিয়ে একজন লোক বসলো, মনে পড়ে কি? আমি সেই গল্পার্থী ব্যক্তি। তখন কি জানতাম আপনিও আমার মতো একজন হতভাগা ব্যক্তি। আপনার তন্ময় ভাবের (নিশ্চয় তখন গল্প ভাব ছিলেন) সুযোগ নিয়ে আপনার মানিব্যাগটা তুলে নিলাম। কেন; চুরির উদ্দেশ্যে নয়, গল্পের উপাদান সংগ্রহের উদ্দেশ্যে, চুরি করবার সময়ে চোরের মনস্তত্ত্ব কি রকম হয় জানবার উদ্দেশ্যে। তারপরে বাড়ী গিয়ে, মানিব্যাগ খুলে সম্পাদকের চিঠিখানা পড়ে বুঝলাম, আপনি আমার সম ব্যবসায়ী, না, তারও

বেশি, সমান তাগিদ তাড়িত। তখন বুঝলাম কি ভুলই না করেছি। কাকে কাকের মাংস খায়না আর আমরা লেখকেরা কি কাকেরও অধম। তাছাড়া বাংলা সাহিত্যের ক্ষতিটাও ভেবে দেখবার মতো। টাকা খোয়া গেলে গল্প না লিখবার নৈতিক অধিকার আছে—খুব সম্ভব 'বঙ্গ-সারথির' জন্য গল্প আর লিখবেন না। তাই স্থির করলাম, কোন এক সুযোগে থানায় গিয়ে ডায়েরীটা ফেলে দিয়ে আসবো। আর এটা ফেরৎ পেলে (থানার অফিসাররা আজকাল ভদ্রলোক, ফেরৎ দেয়ও) সত্য একটা গল্পের উপাদান হাতে পাবেন—বঙ্গ-সারথি নিয়মিত সময়ে গল্প পাবে। কি লেখেন দেখবার জন্যে পূজা সংখ্যা বঙ্গ-সারথি কিনবো। আমার বর্তমান অভিজ্ঞতা ধূম্রমার কাগজের পূজা সংখ্যায় বের হবে, আপনার ঠিকানায় পাঠাবো, পড়ে দেখবেন, তবে চিনতে পারবেন না, কেন না ছদ্মনাম ব্যবহার করবো'! নমস্কার, স্যার। ইতি বৃহন্নলা (গল্পে এই নামটিই থাকবে, নইলে বুঝবেন কি ক'রে ?)

চিঠিখানা পড়া শেষ হ'তেই গল্পের বাকি অংশটুকু লিখে ফেললাম, বস্তুতঃ চিঠিখানাই গল্পের শেষাংশ। ন্যায়তঃ ধর্মতঃ আমার গল্পের পারিশ্রমিকের কিয়দংশ তাকে দেওয়া উচিত। কিন্তু না, প্রশ্রয় দেওয়া কিছু নয়, কাজটা ভালো করে নাই, হাতে নাতে ধরা পড়লে অজ্ঞাতবাসের পরিবর্তে বৃহন্নলাকে হাজতবাস করতে হতো'।

সেবারে পূজা সংখ্যায় পাঠকেরা বললো 'বঙ্গ-সারথি' ও 'ধূম্রমার' পত্রের দুটি গল্প যেন একই অভিজ্ঞতার এদিঠ-ওদিঠ। লেখকেরা কি পরামর্শ করে লিখেছে নাকি।'

মিষ্টার ডি'কষ্টা

বিমল মিত্র

পৃথিবীতে মানুষের মত দুর্জ্ঞেয় আর কিছু আছে বলে মনে হয় না। আকাশ, বাতাস, গ্রহ, নক্ষত্র, অন্তরীক্ষ, মহাকাশ—সব কিছুর রহস্যভেদ করবার জন্যে আমাদের চেষ্টার অন্ত নেই। কিন্তু হাতের কাছের সব চেয়ে নিকটতম মানুষটিকেও আমরা চিনতে পেরেছি বলে গর্ব করতে পারি কি?

এই যেমন মিষ্টার ডি'কষ্টা!

এতদিন পরে ডি'কষ্টা সাহেবের কথা মনে পড়ার একটা কারণ আছে।

ফ্রি-স্কুল ষ্ট্রীটটা যেখানে কর্পোরেশন ষ্ট্রীটে এসে মিশেছে, ঠিক সেই মোড়ের মাথায় ডি'কষ্টা সাহেবকে আবার দেখতে পেলাম!

সে-চেহারা আর নেই ডি'কষ্টা সাহেবের, অন্ততঃ ডি'কষ্টা সাহেবকে দেখে আমারই একটু সন্দেহ হয়েছিল। আর কাউকে দেখছি না তো! ছেঁড়া কোট ঝুলঝুলে প্যাণ্ট ছুঁচো মোজা সবই নোংরা ময়লা। মোড়ের মাথায় এক কোনে গোটাকতক নেড়িকুত্তা নিয়ে বসে আছে। হাতে বোধহয় পাউরুটি। সেই পাউরুটি নিজেও এক একবার কামড়াচ্ছে, আর মাঝে মাঝে কুকুরদেরও খাওয়াচ্ছে। রাস্তার লোকজন, গাড়ি, ট্যাক্সি, ট্রাফিক, কোনও দিকেই খেয়াল নেই। একমনে কুকুর-ভোজন করাতেই ব্যস্ত।

আমি অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ্য করলাম।

তারপর কাছে গিয়ে ডাকলাম—মিষ্টার ডি'কষ্টা—

ডি'কষ্টা সাহেব বোধহয় শুনতে পেলে। একবার আমার দিকে তাকিয়ে বললে—গিভ্ মি এ্যান অ্যানা প্লিজ—আমাকে এক আনা পয়সা দাও তো বাবু—

বলে আবার কুকুরগুলোকে পাউরুটি খাওয়াতে লাগলো।

অথচ ডি'কষ্টা সাহেব এককালে কী সৌখীন মানুষ ছিল সে তো আমি জানি। এক সঙ্গে এক ঘরের মধ্যে তিন দিন তিন রাত কাটিয়েছি এককালে। সে কি আজকের কথা! প্রায় চব্বিশ বছর কেটে গেছে ইতিমধ্যে। অবশ্য চব্বিশ বছর আগে আমিই কি এ-রকম ছিলাম। না, ডি'কষ্টা সাহেবই এ রকম ছিল!

ডি'কষ্টা সাহেবকে আমি প্রথম এবং শেষ দেখা দেখি আম্রা ষ্টেশনের ওয়েটিং-রুমে। ওয়েটিং রুম ঠিক নয়, রিটায়ারিং-রুম। প্লাটফর্মটা যেখানে শেষ হয়েছে ওয়েটিংরুমটা সেইখানেই। তার পাশে কয়েক জোড়া রেল-লাইন এঁকে-বেঁকে সোজা ফাঁকা মাঠের দিকে চলে গিয়েছে।

আমি আর ডি'কষ্টা সাহেব দু'জনেই সেই ওয়েটিং-রুমে গিয়ে উঠেছি একই দিনে।

আমি গিয়েছি চাকরি খুঁজতে।

আসলে কোল্-ম্যানেজারের অফিস। কোল্-ম্যানেজারের এক বন্ধুর চিঠি ছিল আমার সঙ্গে। চিঠিটা দেখালেই একটা ছোট-খাটো চাকরি হয়ে যাবার কথা।

কিন্তু গিয়ে শুনলাম কোল-ম্যানেজার সাহেব টুরে বেরিয়েছেন। তিন দিন পরে ফিরবেন।

অফিস থেকে ফিরে এসে দেখি ওয়েটিং-রুমে আর একজন এসে উঠেছে সেখানে। বেশ সুট, টাই, পরা এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান।

পরিচয় হলো। জিজ্ঞেস করলাম—আপনি?

মিষ্টার ডি'কষ্টা সিগ্রেট ধরিয়ে বললে—মিষ্টার গ্যাব্রিয়েল ডি'কষ্টা। পিয়ানো টিউনার—

পিয়ানো-টিউনার কথাটা আমার জানা ছিল। পিয়ানো কিনলে মাঝে মাঝে সেটাকে পিয়ানো-টিউনারকে দিয়ে সারিয়ে নিতে হয়। হারমোনিয়াম বা কাস্তোলিন দোকানে নিয়ে গিয়ে সারানো চলে। কিন্তু পিয়ানো ভারি জিনিস। নাড়া-চাড়া করলে খারাপ হয়ে যাবার ভয় থাকে। তাই পিয়ানো-টিউনারকে ডেকে এনে মাঝে-মাঝে সুরটা ঠিক করে নিতে হয়। একাজ সবাই পারে না। সুর-জ্ঞান থাকা চাই, কান খুব তীক্ষ্ণ হওয়া চাই। একটা পিয়ানো টিউন করতে দু'তিন দিন কি চারদিন সময় লাগে। খাওয়া-দাওয়ার খরচার সঙ্গে মজুরিও দিতে হয় মোটা রকম। সেই জন্যেই লোকে বলে পিয়ানো কেনা মানে হাতি কেনা।

সেই দিন সন্ধ্যে বেলাই ভালো করে পরিচয় হলো মিষ্টার ডি'কষ্টার সঙ্গে।

আমি কলকাতা থেকে আসছি শুনে মিষ্টার ডি'কষ্টার খুব আনন্দ।

—আপনি মিষ্টার হালদারকে চেনেন? 'ম্যাকানিক'-এর মালিক?

বললাম—খুব চিনি—

তখন যুদ্ধের আগে সেণ্ট্রাল এ্যাভিনিউতে 'ম্যাকানিক' নামে একটা বিলিতি-মালের দোকান খুলেছিল আমার বন্ধু হরিপদ হালদার।

—মিষ্টার হালদার আমার গ্রেট ফ্রেণ্ড! তার কাছে আমার নাম করবেন!

চেয়ে চেয়ে দেখছিলাম মিষ্টার ডি'কষ্টার দিকে। দামী সিগারেট, দামী সুট, দামী জুতো মোজা আর দামী নেক-টাই। সবই দামী। আর তার পাশে আমার মধ্যবিত্ত পোষাক। মধ্যবিত্ত চেহারা, মধ্যবিত্ত আয়।

সাহেব বললে—এ-চাকরিতে কত টাকা মাইনে দেবে?

আমি বললাম—যদি চাকরিটা হয় তো খাটি ক্রশীজ স্টার্টিং-পে—বেড়ে বেড়ে শেষ বয়েসে নাইনটিতে পৌঁছোবে!

সাহেব খুব সহানুভূতি দেখালে। ভেরি গুওর পে। দিনকাল বড় খারাপ। দেখো না, আমি মাসুলি হাজার টাকা আর্ন করি। কোনও মাসে টু-থাউজ্যাণ্ডও হয়। কিন্তু তবু চালাতে পারি না। দিন-কাল বড় খারাপ পড়েছে।

তারপর হঠাৎ বললে—উড ইউ মাইণ্ড, ড্রিঙ্ক্স্—?

আমি বললাম—আপনি খেতে পারেন, আমার ওটা অভ্যেস নেই—

সাহেব বললে—কিন্তু আমি একলা-একলা কী করে খাই; আমি ড্রিঙ্ক করবো আর তুমি চুপ করে বসে থাকবে?

বললাম—তাতে কী হয়েছে? আমার কোনও আপত্তি নেই—আমি সামনে বসে থাকছি। তুমি খাও না—

সাহেব মাথা নাড়তে লাগলো। বললে—না, তা হয় না—তুমি মিষ্টার চ্যাটার্জির গেস্ট আমারও গেস্ট্। তুমি না খেলে আমি কী করে খাই?

বললাম—তাতে কী হয়েছে, আপনি কিছু মনে করবেন না—

কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুতেই ছাড়লে না ডি'কষ্টা সাহেব। ডি'কষ্টা একলা মদ খেতে পারে না। সঙ্গে একজন কেউ খাওয়া চাই-ই।

বললাম—এ তো ভারি বদ্ অভ্যেস আপনার!

সাহেব বললে—ভেরি ব্যাড্, জানি কিন্তু কী করবো? আমি যে একলা খেতে পারি না—

শুধু ড্রিঙ্কই নয়, খাবারও এল। মাংস আর পরোটা। এক গ্লাস শেষ করার পর আমার গ্লাসে আবার ঢেলে দিলে সাহেব। সেটাও অনেক আপত্তির পর শেষ করলাম।

কিন্তু যখন আবার গ্লাসে নতুন করে ঢালতে এল, তখন উঠে দাঁড়ালাম।

বললাম—আর কিছুতেই খাবো না আমি মিষ্টার ডি'কষ্টা।

সাহেব চেয়ার থেকে উঠে এসে আমার দুটো হাত ধরে কাকুতি-মিনতি করতে লাগলো।

—খেতেই হবে নইলে আমি খেতে পারবো না।

বড় মুশকিলে পড়লাম। শেষে যখন দেখলাম সাহেব বেশ টলছে, ঢলে ঢলে পড়ছে, তখন নিঃশব্দে ঘর থেকে বাইরের প্লাটফর্মে চলে গেলাম। পালিয়ে বাঁচলাম। এ কী লোকের পাল্লায় পড়লাম আমি। অথচ এর হাত থেকে পালাতেও পারি না। এরই সাথে এক ঘরে কদিন ধরে রাত কাটাতে হবে। অন্ততঃ যতদিন না কোল্-ম্যানেজার হেড কোয়ার্টারে ফিরে আসে।

অনেকক্ষণ বাইরে ঘোরাঘুরির পর জানলার ফাঁক দিয়ে দেখি সাহেবটা কী করছে। উঁকি দিয়ে দেখলাম ডি'কষ্টা সাহেব তখনও একমনে খাচ্ছে আর মাঝে মাঝে মাংসের হাড় চুষছে। তখনও অনেকটা মাংস প্লেটের ওপর রয়েছে। বোতলও পুরো খালি হয়নি।

হঠাৎ দেখি সেই অবস্থাতেই সাহেব উঠলো।

আমি অবাক হয়ে গেলাম! সাহেব আবার উঠলো কেন? দেখি গায়ের ওপর কোটটা চড়িয়ে নিয়ে আস্তে আস্তে বাইরে বেরোল। হাতে সেই আধখাওয়া মাংসের প্লেট। মাংসর প্লেট নিয়ে কোথায় যাচ্ছে সাহেব?

আমি আড়াল থেকে সব লক্ষ্য করতে লাগলাম।

সাহেব ঘর থেকে বেরিয়ে একেবারে প্লাটফর্মের শেষ প্রান্তে গিয়ে হাজির হলো। তখন রাত হয়েছে বেশ। লাইনে কোনও ট্রেণ নেই। অনেক দূরে ইয়ার্ডের ভেতর মালগাড়ির শান্টিং হচ্ছে। কুলিরা গড়া গড়া ঘুমে পড়েছে লম্বা প্লাটফর্মের ওপর যেখানে সে যে'খে। বোধ হয় কিছু ট্রেণ তখনও আসতে বাকি। তারও ওদিকে বুক-ষ্টলটার ঝাঁপ বন্ধ হয়ে গেছে।

দেখি ডি'কষ্টা সাহেব যেখানটা প্লাটফর্ম চালু হয়ে গিয়েছে সেইখানে গিয়ে কাকে ডাকতে লাগলো। আর পাঁচ ছ'টা কুকুর রাত্রি নাড়াতে নাড়াতে সাহেবকে ঘিরে দাঁড়ালো।

সাহেব তাদের সামনে নিচু হয়ে মাংসের প্লেট থেকে এক-একটা করে মাংসের টুকরো নিয়ে সকলকে খাওয়াতে লাগলো। কুকুরগুলোরও যত উল্লাস, ডি'কষ্টা সাহেবেরও তত উৎসাহ।

সেই রাত দশটার সময় ডি'কষ্টা সাহেব সেদিন কুকুরগুলোকে মাংস খাইয়ে কী আনন্দ পেয়েছিল আমি তা বুঝতে পারিনি। আমি ভেবেছিলাম ও-ও মাতালের এক বিচিত্র খেয়াল।

তারপর অনেক রাত্রে যখন ওয়েটিং-রুমের ভেতরে ঢুকেছিলাম তখন ডি'কষ্টা সাহেব নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে।

কিন্তু পরদিন ঘুম থেকে উঠেই ডি'কষ্টা সাহেব আবার সেজে-গুজে ফিটফাট্ ভোর বেলা আমাকে গুড্-মর্নিং করেই কাজে বেরিয়ে গেল।

এমনি প্রত্যেক দিন।

প্রত্যেক দিন ভোর বেলা ফিট-ফাট্ হয়ে সাহেবী পোষাকে সেজে-গুজে পিয়ানো টিউন করতে বেরিয়ে যেত ডি'কষ্টা সাহেব, আর তারপর ফিরে এসেই বোতল নিয়ে বসতো। আর যখন নেশাটা চড়ে উঠতো তখন সেই রেল-লাইনের ধারে গিয়ে কুকুরগুলোকে মাংস খাওয়াতো।

শেষকালে তিন দিনের দিন ডি'কষ্টা সাহেবের কাজ শেষ হয়ে গেল।

যাবার দিন ডি'কষ্টা সাহেব বললে—ক্যালকাটায় গিয়ে তোমার সঙ্গে দেখা হলে খুব খুশী হবো—

বললাম—মিষ্টার হালদারকে বলবেন আমার কথা—

এর বেশি আর কিছু কথা হয়নি। এর বেশি আর কিছু জানতুমও না। কে ডি'কষ্টা সাহেব, কী তার ঠিকানা, কোথায় তার বাড়ি, কে কে আছে তার সংসারে, সে-নিয়েও কোন কথা হয়নি। আমিও জিজ্ঞেস করার সুযোগ পাইনি, আর সাহেবও বলেনি।

পরের দিন রাত্রে দেখলাম সেই কুকুরগুলো রোজকার মত রেল-লাইনের কাছে দাঁড়িয়ে আছে মাংস খাবার লোভে। কিন্তু তখন ডি'কষ্টা সাহেবই বা কোথায় আর সেই মাংসই বা কোথায়! হয়ত ট্রেণের কামরার মধ্যে তখন সাহেব নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে।

এর পরদিনই কোল ম্যানেজার সাহেব হেড্-কোয়ার্টারে ফিরে এল। আর সেই দিন থেকেই আমার চাকরি হয়ে গেল আদ্রার রেল-অফিসে।

এর ছ'মাস পরে ছুটি নিয়ে কলকাতায় এসে হরিহরের সঙ্গে দেখা। হরিহর হালদার। হরিহরের বাবার অগাধ পয়সা। সেই পয়সায় সেন্ট্রাল এ্যাভিনিউএ মদের দোকান করেছিল। হরিহরকে বললাম ডি'কষ্টা সাহেবের কথা।

ডি'কষ্টা সাহেবের কথা উঠতেই হরিহর বললে—ডি'কষ্টার খবর জানিস না তুই?

বললাম—কী খবর?

—আরে ডি'কষ্টার তো ফাঁসি হবার কথা। বোধ হয় ফাঁসিই হয়ে যাবে শেষ পর্যন্ত—মামলা চলছে—

—কেন?

—সাহেব নিজের বউকে খুন করেছে যে—

বললাম—সে কি? কেন?

হরিহর বললে—সাহেব বাইরে গিয়েছিল কাজে ফিরে এসে দেখে সাহেবের কুকুরগুলোকে বউ ভাল করে খেতে দেয় নি। সাহেবের ভীষণ কুকুর পোষার সখ। একটা কুকুর না খেতে পেয়ে মারাও গেছে, সাহেব আর রাগ সামলাতে না পেরে মেমসাহেবকে গুলি করে মেরে ফেলেছে—

আমি সব শুনে অবাক হয়ে গেলাম।

হরিহর বললে—কুকুরগুলো হচ্ছে সাহেবের প্রাণ ভাই। সাহেব যা টাকা উপায় করে সব ওই কুকুরের পেছনে খরচ করে ফেলে। বাকি টাকাটায় কেবল মদ খায়। মেমসাহেবের কী দোষ? ছেলেমেয়ে তো কিছু নেই।

এরপর খবর পেলাম শেষ পর্যন্ত সাহেবের ফাঁসি হয়নি। জজসাহেব ডি'কষ্টা সাহেবের কুকুর প্রীতির কথা ভেবে ফাঁসিকাঠ থেকে সাহেবকে বাঁচিয়ে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের শাস্তি দিয়েছে।

তারপর প্রায় এক যুগ কেটে গেছে। আমিও সেই রেল-অফিসের চাকরি ছেড়ে দিয়েছি। আসা ছেড়ে বিলাসপুরে গিয়েছি অন্য চাকরি নিয়ে। কত ঘাটের জল খেয়ে শেষকালে আবার এই কলকাতায় ফিরে এসেছি। সেই হরিহর হালদারের 'ম্যাকানিজ'ও উঠে গেছে। শেষ পর্যন্ত হরিহরও একদিন মটর-এ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছে। মোট কথা বলতে গেলে সারা পৃথিবীটারই ওলোট-পালোট হয়ে গেছে এই ক'বছরে। এতদিন পরে এই স্ট্রী-ফুল ষ্ট্রীটের মোড়ে ডি'কষ্টা সাহেবকে এ-অবস্থায় দেখবো ভাবতে পারিনি।

আমি আবার ডাকলাম—মিষ্টার ডি'কষ্টা—

ডি'কষ্টা সাহেব আবার আমার দিকে চেয়ে বললে—গিভ্ মি এ্যান্ এ্যানা প্লিজ—

আমি পাশের দোকান থেকে একটা এক পাউণ্ড পাউরুটি কিনে সাহেবকে দিলাম। মনে হলো পাউরুটিটা দেখে সাহেব যেন খুব খুশী।

বললে—থ্যাঙ্কিউ বাবু—

তারপর নিজে একবার পাউরুটিটাতে কামড় দিলে, আর তারপর বাকিটা কুকুরগুলোকে খাওয়াতে লাগলো। এর পর আর বেশিক্ষণ সেখানে দাঁড়ানো গেল না। আমি সেখান থেকে পালিয়ে গেলাম।

বিপরীত

প্রেমেন্দ্র মিত্র

সামান্য একটু তন্দ্রা এসেছিল।

হঠাৎ তীক্ষ্ণ একটা শব্দের তীর যেন আচ্ছন্ন চেতনার শুদ্ধ অন্ধকার বিদীর্ণ করে চলে গেল।

অসীমের ঘুমটা ভেঙে গেল তৎক্ষণাৎ।

ট্রেনটা মাঝে পথে কোথায় দাঁড়িয়ে পড়ে অবিরাম হুইসিল বাজাচ্ছে।

কামরাটা একেবারে অন্ধকার। রীণার অসুবিধে হয় বলে রাত্রের ঘুমোবার নীল আলোটাও নিভিয়ে দেওয়া হয়েছে।

অসীম ওপরের বাঙ্কে উঠে বসল। হাতড়ে হোল্ডঅলের মাথার দিক থেকে সোয়েটারটা বার করে পরতে ভুলল না। রাত্রি দশটা নাগাদ যখন ওপরে উঠে শুয়েছিল তখন কম্বলটা গায়ে টেনে দিতে ইচ্ছে হয়নি। ডিসেম্বরের গোড়ার দিকের পক্ষে বেশ গরম মনে হয়েছিল। তারপর গভীর ঘুম না এলেও ছাড়াছাড়া তন্দ্রার মধ্যে ঠাণ্ডাটা বাড়ছে টের পেয়েছে। কম্বলটা গায়ের কাছ থেকে গলা পর্যন্ত উঠে এসেছিল। তারপর মাথাটা পর্যন্ত ঢাকা দিতে ইচ্ছে হয়েছে।

মাথা ঢাকা দিয়ে শোয়া তার এক রকম স্বভাব। সেই ছেলেবেলা থেকে। সেটা গায়ত্তপক্ষে জব্দ করবার চেষ্টা করে। অন্ততঃ রীণার চোখে পড়ার সম্ভাবনা থাকলে।

রাত্রে কম্বলটা মাথার ওপর টেনে নিলে এমন কিছু ভয় ছিল না। রীণা নিচে তখন অঘোরে ঘুমোচ্ছে। তার ঘুম বরাবরই অত্যন্ত গভীর। সেই গভীর ঘুম ভেঙে তার হঠাৎ জেগে ওঠবার সম্ভাবনা নেই। আর জাগলেও এই অন্ধকারে অসীম তার বাঙ্কে কিভাবে ঘুমোচ্ছে তা লক্ষ করতে উঠে দাঁড়াবে না নিশ্চয়।

ওপরের বাঙ্কে কোথা থেকে একটা ঝনঝনে ঠাণ্ডা হাওয়া আসছিল। কামরার ছাদের ভেন্টিলেটর থেকেই সম্ভবতঃ। বেশ একটু শীত হলেও অসীম কম্বলটা মাথায় টেনে নিতে পারেনি। মুখটা দেয়ালের দিকে ফিরিয়ে শুয়েছিল।

কেন তার এই নিষেধ মানার দুর্বলতা, তখনই ভেবেছে। রীণাই বা কেন তার প্রতি এই সব ছোটখাট মনোযোগগুলো এখনো ছেড়ে দেয়নি। শুধু কি অভ্যাস না কর্তব্যবোধ?

তাদের সম্পর্কটা কি শুধু কর্তব্য পালনের নিষ্প্রাণ চড়ায় এসে এখন ঠেকেছে।

উত্তাল আবেগ অবশ্য কোনদিন তাদের সম্পর্ককে আলোড়িত করেনি। তবু একটু উত্তাপ বুঝি ছিল প্রথম দিকে।

অসীমের দিক দিয়ে যতটা না হোক রীণার দিক থেকে বেশ কিছুটা।

ছোটখাট নানা ব্যাপারে তার প্রমাণ পেয়েছে।

অসীমের চিরকাল একটুতেই ঠাণ্ডা লাগে। একটু ধুলোর মধ্যে থাকলেই অ্যালার্জি না কিসের লক্ষণ নাক দিয়ে জল পড়া সুরু হয়ে যায়।

তখন আরো বেশী হ'ত।

বিয়ের কিছুদিন বাদেই নিজের ঘরের বই কাগজগুলো ওছোতে গিয়ে ওই রকম সর্দি লেগেছিল। এ রকম ঠাণ্ডা লাগা তার সা সওয়া। দুএকদিন থেকেই সেরে যায়। ওষুধ পত্তরের দরকার হয় না।

অসীম তাই এ নিয়ে রীণাকে কিছু বলা প্রয়োজন মনে করেনি। রাত্রে নাকটা বন্ধ হয়ে যাবার দরুন ঘুম না আসায় শুধু বিছানা থেকে উঠে ঘরের কোণের চেয়ারটায় গিয়ে বসেছিল।

রীণা যে অত্যন্ত ঘুমকাতুরে তা ফুলশয্যার রাত থেকেই টের পেয়েছে। সে ঘুমোচ্ছে মনে তার নিশ্চিন্তই ছিল।

তখন নতুন পরিচয়ের আড়ষ্টতা সম্পূর্ণ কাটেনি। অবশ্য তা কাটলেও আর রীণা জেগে আছে জানলেও তার সঙ্গে সর্দি লাগা সম্বন্ধে সহজ আলাপ করতে পারত না। অসীম সেভাবে গড়া নয়।

চেয়ারে খানিক বসে থাকবার পর অসীমের মনে হয়েছিল, ঘুম যখন আসছেই না তখন একটা বই-টই পড়লে হয়। কিন্তু টেবিল ল্যাম্পটা সন্তর্পণে জ্বালতে গিয়ে অন্ধকারে হাত লেগে টেবিলের ওপরে রাখা একটা অ্যাশট্রেই পড়ে গিয়েছিল বুঝি।

টেবিল ল্যাম্পটা জেলে অ্যাশট্রেটা মেঝে থেকে কুড়োতে গিয়ে অবাক হয়ে গিয়েছিল। রীণাই মেঝে থেকে সেটা কুড়িয়ে তুলছে।

কুণ্ঠিত স্বরে অসীম বলেছিল—তোমার ঘুম ভাঙিয়ে দিলাম!

না, আমি জেগেই ছিলাম। মৃদুকণ্ঠে বলেছিল রীণা।

জেগেছিলে; সবিস্ময়ে প্রশ্ন করেছিল অসীম।

হ্যাঁ, তোমার ঘুম আসছে না দেখলাম। রীণা যেন জেগে থাকার অপরাধের কৈফিয়ৎ দিয়েছিল লজ্জিতভাবে।

অসীম আর কিছু বলেনি। কিন্তু সত্যি অবাক হয়েছিল। অবাক হয়েছিল তার নিজের প্রকৃতি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বলেই হয়ত। স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধে গভীরতার স্বরূপ যারাই এই যে উভয়ে উভয়ের জন্যে ব্যাকুল হবে। কিন্তু সে গভীরতাতে কি তারা পৌঁছেছে! সে নিজে অন্ততঃ তা টের পায়নি। রীণার এরকম কিছু হ'লে সে এমন জেগে কাটাতে পারত না কখনই। তাছাড়া এমন নিঃশব্দে ত নয়ই।

রীণার এই নীরব আকুলতায় অবাক যেমন হয়েছিল তেমনি একটু অভিভূতও।

পরে আরো ছোটখাট ব্যাপারে রীণার হৃদয়ের উত্তাপটুকু সে অনুভব করেছে। তাতে কিন্তু ক্রমশঃ অস্বস্তিই বোধ করেছে বেশী। অস্বস্তি তার নিজের দিক থেকে স্বতস্ফূর্ত কোন সাড়া তার নেই বলে। কর্তব্যবোধের সঙ্গে মমতা একটা আছে। কিন্তু তার বেশী কিছু নয়।

বিয়ের আগে প্রথম যৌবনের সেই স্বপ্নের ঘোর চোখে লাগাই কি এ ঔদাসীন্যের কারণ?

না, তা যে নয়, তা অসীম অন্ততঃ ভালো করেই জানে। সে ত সাময়িক একটা ছেলে খেলা ব্যাপার। মনে কোথাও একটু আঁচড়ও রেখে যায়নি।

তার মনই যেন একটু অন্যভাবে তৈরী। আবেগের ঢেউ ওঠবার মত তরলতাই তার নেই। কলেজে পড়বার সময় বছর দুই হৃদয়ের চাঞ্চল্য বলে যা মনে হয়েছিল তা বোধহয় ওই বয়সের অনুকরণ-প্রিয়তা ছাড়া কিছু নয়। বন্ধুবান্ধবের দেখে শুনে ও রোমান্টিক গল্প উপন্যাস পড়ে সখ করে নিজের মনে

একটা কৃত্রিম আমেজ এনেছিল। ভোরের পাৎলা কুয়াশার মত বেলা বাড়ার সঙ্গে নিশ্চিহ্ন হয়ে তা মিলিয়ে গেছে।

না, রীণা সম্বন্ধে সে রকম কোন উত্তাপ সে কখনো হৃদয়ে অনুভব করেনি, সে তার মনেরই বিশেষ গড়নের দরুন। একটা নিশিপ্ত প্রশান্তি যেন তার সহজাত।

তবু—

হাঁ তবু একটু আছে। এই নিশিপ্ত প্রশান্তিই একবার কেমন দুলে ওঠেনি কি?

কিন্তু ট্রেনটা যে এখানে শিউড় গজিয়ে ফেলল মনে হচ্ছে। ব্যাপারটা কি? কোন দুর্ঘটনা গোছের কিছু নাকি!

খুব সাবধানে যতদূর নিঃশব্দে সম্ভব অসীম নিচে নামল। অন্ধকারে যেটুকু বোঝা যাচ্ছে তাতে রীণা অঘোরেই ঘুমোচ্ছে মনে হয়। আন্দাজ করে দুইটা খুঁজে পেয়ে অসীম রাত্রের নীল আলোটা জ্বালল। হাঁ, রীণাকেও ইচ্ছে করলে এবার একটু খোঁচা দেওয়া যায়। অসীমের বেলা টিকটিক করলেও রীণা নিজে মাথা পর্যন্ত কম্বলে মুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছে।

সুবিধে থাকলেও খোঁচা দেবার ইচ্ছে কিন্তু হবে না। আগেকার দিনে যদি বা কখনো হ'তে পারত, এখন আর হয় না। তাদের সম্পর্ক এখন শুধু বাহ্যিক মসৃণতার।

তার জন্যে কোন ক্ষোভও অসীম মনের মধ্যে টের পায় না। এই ত বরং ভালো। নিস্তরঙ্গ একটা দৈনন্দিন প্রবাহ। শতকরা নব্বই জনের দাম্পত্য জীবনই ন' এই ভাবে বয়। দুরন্ত উদ্বেলতার যাদের সুরু তাদেরও শেষ পর্যন্ত। পরস্পরের সংসর্গ স'য়ার একটা অভ্যাস। চেউ নেই খুশি নেই, শুধু একটা গতানুগতিক সুখ। যে যার নিজের মধ্যে মগ্ন, প্রাত্যহিক প্রয়োজনের শুধু একটু আধটু সংযোগ। তার অতিরিক্ত মাঝে মাঝে রীণার ওই অভ্যাসগত মনোযোগের সামান্য ব্যতিক্রম।

অসীমের নিজের দিক থেকে তাও নয়। আজকালকার দিনে একটা 'কুপে' পাওয়া নাকি অনেক সৌভাগ্যের কথা। চলমান ট্রেনে নিশ্চিন্ত নির্জন ঘনিষ্ঠতায় একটা নতুন স্বাদের কথা কেউ কেউ হয়ত ভাবত। অসীমের মনে সে কথা ওঠে নি। অনেক আগেও উঠত কি না সন্দেহ। সন্ধ্যের পর একটা স্টেশন পার হবার পর জানলার ধারে বসে বাইরের অন্ধকারে অসংখ্য জোনাকির মেলা দেখে বড় ভালো লেগেছিল। রীণা তখন সীটের অন্য প্রান্তে বসে একটা বই পড়ছে। একবার তাকে ডেকে দেখাবার কথা মনে হয়েছিল সত্যিই। কিন্তু উৎসাহ হয় নি।

ট্রেনটার সত্যি হল কি! একটা জানলার কাচের শার্সিটা যতদূর সম্ভব নিঃশব্দে নামিয়ে দেবার পর কাঁচের পাল্লার ভেতর দিয়ে নিচে একটা আলোর ঝলাচড়া ও কিছু মানুষের ওঠা যেন দেখা গেল। দরজার লক্ দুটো খুলে একবার বাইরে বেরিয়ে দেখতে হয়।

অসীম হুক থেকে জামাটা নামিয়ে গায়ে দিল। কিন্তু তবু দ্বিধা হল দরজাটা খুলতে গিয়ে। নিচের লকটা খোলবার সামান্য একটু শব্দ হয়েছে। না, রীণা তাতে জাগে নি।

জেগে উঠলে অবশ্য কি বলত তা অসীম যেন জানে। নিরুত্তাপ বাহ্যিক কণ্ঠে শুধু বলত, —দরজা খুলছ কেন?

ট্রেনটা কেন এতক্ষণ থেমে আছে একটু দেখি।—বললে সেই এক সুরে বলত, তুমি দেখে'ও আর ট্রেন চালাতে পারবে না। এই ঠাণ্ডায় বাইরে বেরিও না।

হয়ত তাতেই অসীম নিরস্ত হ'ত। না হ'লেও রীণা আর কিছু বলত না। যেন কর্তব্য পালন হিসাবে সাবধান করার বেশী আর কোন দায় তার নেই।

এই রকমই চলছে সেই দিনের পর থেকেই বোধহয়। সেদিন অসীমও যেন ক্ষণিকের জন্যে একটা অপ্রত্যাশিত নাড়া অনুভব করেছিল মনের কোনো গভীর স্তরে। সেটা হয়ত বিস্ময়েরই একটা রকমফের বলে নিজেকে অবশ্য বুঝিয়েছিল।

তাদের বাইরের সম্পর্ক তখন আগের তুলনায় অনেক সহজ হয়ে এসেছে। রীণার তখন আর ব্রীড়াবনতা নববধূর প্রায় কুণ্ঠা আড়ষ্টতা নেই। তবে তখনও শান্ত অনুচ্ছল।

একদিন রাত্রে হঠাৎ ঘুম ভেঙে উঠে অসীম অবাক হয়ে গিয়েছিল। জ্যোৎস্না রাত। পশ্চিমের জানলা দিয়ে ঘরে চাঁদের আলো এসে পড়েছে। পাশের বিছানায় কিন্তু রীণা নেই। কলঘরের দরজাটা খোলা কি না দেখতে গিয়ে উত্তর দিকের জানলায় চোখ পড়েছিল। রীণা সেখানে জানলার পরাদে ধরে অচল পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে।

রীণার গাঢ় ঘুমের কথা ভালো করেই তখন সে জানে। রাত্রে বালিশে একবার মাথা দেওয়ার পর ভোরের আগে তার আর ঘুম ভাঙে না। রীণার পক্ষে এ রকম বিনিদ্র হয়ে জানলায় দাঁড়িয়ে থাকা বেশ একটু অস্বাভাবিক।

অসীম তার স্বভাব অনুযায়ী সে বিষয়ে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে নি। বেড সুইচটা টিপে আলো জেলে কাছের টিপয়ে রাখা জলের গ্লাসটার দিকে হাত বাড়িয়েছিল। গ্লাসটা হাতে নিয়ে খেতে গিয়ে কিন্তু একটু দ্বিধা করেছিল। জলে কি যেন একটা ভাসছে।

দাঁড়াও, বদলে দিচ্ছি। রীণা জানলা থেকে সরে এসে গ্লাসটা অসীমের হাত থেকে নিয়ে ঘরের কোনের কুঁজো থেকে নতুন করে জল গড়িয়ে এনে দিয়েছিল। তারপর অসীমের জল খাওয়া শেষ হ'লে গ্লাসটা টিপয়ের ওপর রেখে দিয়ে অসীমের বিছানারই পায়ের দিকে উঠে বসেছিল তাকে একটু বিমূঢ় করে!

রীণার মুখের দিকে তাকিয়েও বিস্মিত হয়েছিল অসীম। রীণার সাধারণতঃ শান্ত স্থির ধীর মুখে কী যেন ভাবছে একটা চাপা উত্তেজনার আভা।

তোমায় একটা কথা আমার বলা দরকার। রীণার কণ্ঠস্বরে তার মুখের উত্তেজনার কোন ছাপ না থাকলেও কেমন অদ্ভুত শুনিয়েছিল অসীমের কানে।

এখনই বলতে চাও।—অসীমের গলায় আগ্রহ যেমন ছিল না তেমনি ঔদাসীন্যও নয়।

হ্যাঁ এখনি। রীণার স্বর এবার অস্বাভাবিক রকম দৃঢ় কঠিন, তোমার কাছে এ কথা অবশ্য আগেই বলা উচিৎ ছিল। বিয়ে যখন আমাদের হয়েছে তখন পরস্পরের কাছে কিছু লুকিয়ে রাখা আমাদের অন্যায়।

ব্যাপারটা স্পষ্ট কিছু বুঝতে না পেরে অসীম চিন্তিত ভাবে রীণার দিকে চেয়ে চুপ করে ছিল।

রীণাই আবার কথা বলেছিল। আর সেই মুহূর্তেই কি অসীমের হঠাৎ মনে হয়েছিল তার মনের কঠিন নির্লিপ্ততার কোথায় যেন চিড় খেয়েছে?

রীণা যা বলেছিল তা কাহিনী হিসেবে বিস্ময়কর কিছু নয়, তবে একেবারে অপ্রত্যাশিত।

বিয়ের আগে একজনের সঙ্গে রীণার কি ভাবে ভালবাসা হয়েছিল আর দুজনের একান্ত আগ্রহ সত্ত্বেও কেন যে বিয়ে তাদের হয়নি, তারই মামুলী সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

রীণার কথা শেষ হবার আগেই অসীম নিজেকে সামলে নিয়েছে।

তাকে চুপ করে থাকতে দেখে রীণাই আবার জিজ্ঞাসা করেছে, কিছু বলছ না যে?

অসীম একটু হেসে এবার বলছে,—বলবার কি আছে? বিয়ে ত তার সঙ্গে হয় নি।

শুধু এইটুকুই তোমার বলবার? রীণার স্বর একটু যেন রুক্ষ।

হ্যাঁ। আর কিছু নয়। বলে অসীম সুইচ টিপে ঘরের আলোটা নিভিয়ে দিয়েছিল।

বিছানায় শুয়ে কিন্তু প্রায় সমস্ত রাত কেন যে ঘুমোতে পারেনি নিজেই তা ঠিক জানে না।

এই আলাপের দিন কয়েক পরেই বোধহয় রীণা সেদিন সন্ধ্যায় অসীম কাজ থেকে ফেরবার পর চা দিতে এসে হঠাৎ বলেছিল, আজ মার্কেটে গেছলাম। কার সঙ্গে দেখা হ'ল জানো।

অসীম জানবার কৌতূহল প্রকাশের বদলে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়েছিল।

রীণাই নিজে থেকে আবার বলেছিল,—তোমাদের সুতপা সেনের সঙ্গে।

অসীম ভেতরে যদি একটু চমকে উঠে থাকে বাইরে তা প্রকাশ করে নি।

নিরুৎসুক ভাবেই চোখ তুলে বলেছিল—ও।

আর কিছু সে বলে নি। আশ্চর্যের বিষয় রীণাও এ প্রসঙ্গ আর বাড়ায় নি।

অসীম মনে মনে চমকে উঠেছিল শুধু রীণার মুখে সুতপার নাম শুনে নয়, মার্কেটে তার সঙ্গে রীণার দেখা হওয়ার কথাতেও।

রীণার কানেও সুতপার কথাটা কোনো শুভাকাঙ্ক্ষী তাহলে পৌঁছে দিয়েছে? না দেওয়াই আশ্চর্য। কিন্তু মার্কেটে তার সঙ্গে রীণার দেখা হওয়ার কথাটা সম্পূর্ণ মিথ্যা। সুতপা সেন মাত্র দুদিন আগে বিদেশের স্কলারশিপ পেয়ে প্লেনে রওনা হয়ে গেছে। খবরের কাগজটা খুঁটিয়ে পড়লে রীণার এ ভুলটা হত না।

রীণার মিথ্যা বলা কিন্তু এই প্রথম নয়। এর আগেও ছোটখাট ব্যাপারে কারণে অকারণে তার মিথ্যা বলা অসীম ধরে ফেলেছে।

ধরে ফেললেও সকলের মতই তা নিয়ে কিছু অবশ্য বলে নি। রীণার মত মেয়ের পক্ষে মিথ্যে বলার এই ঝোঁকটা তার কাছে অবশ্য অদ্ভুতই লেগেছে আগে। যতই উদাসীন নির্বিকার হোক কোথায় যেন একটা বাধাও পেয়েছে তাতে।

রীণার মিথ্যাগুলো অবশ্য নির্দোষ।

কি রকম ঠাণ্ডা লেগে একটা চোখ তার ফুলে অত্যন্ত লাল হয়ে উঠেছিল সেবার।

অসীম যথাকর্তব্য ডাক্তার এনে দেখিয়েছিল। ডাক্তারকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে ফিরে এসে অমনি অবাক হয়ে বলেছিল,—ওটা কি করছ?

রীণা প্রেসক্রপশনটা ছিঁড়ে ফেলেছে তখন। মুখে তার রাগ কি বিরক্তির বদলে কিন্তু খুব একটু হাসি।

রীণা হাসিমুখেই বলেছিল। আমার চোখ মাঝে মাঝে এরকম হয়। তার জন্যে ঔষধ লাগে না।

তবু লাগলে লাভ বই ক্ষতি ত নেই।—একটু অধৈর্যের সঙ্গে বলেছিল অসীম।

না ক্ষতি আছে। ডাক্তারী ওষুধে বাড়ে।—বলে রীণা ঘর থেকে চলে গিয়েছিল।

অসীম খানিকটা বিরক্তির বশবর্তী হয়েই মশাইকে ফোন করেছিল তৎক্ষণাৎ। তার শ্বশুর নিজেই ডাক্তার। তিনি এ ডাক্তারের প্রেসক্রপশনে যা ছিল সেই ওষুধের নামই করেছিলেন। রীণার চোখের এ রোগ মাঝে মাঝে হয় একথাটা সত্য। ডাক্তারী ওষুধে ক্ষতি হওয়ার কথাটা সম্পূর্ণ মিথ্যা।

এ রকম দৃষ্টান্ত আরও আছে।

আগে যেখানে এ সব মিথ্যার প্রমাণ পেয়ে সামান্য একটু ব্যথা পেয়েছে সুতপা সম্বন্ধে মিথ্যা কথাটা জেনে তার বদলে যেন একটু তৃপ্তিই পেয়েছিল। অবশ্য করবার সুযোগ পাওয়ার তৃপ্তি। সে রাতে সেই স্বীকারোক্তির এটা প্রতিক্রিয়া কিনা অসীম তলিয়ে দেখবার চেষ্টাও করে নি।

জানলার বাইরে যা ব্যস্ততা দেখা যাচ্ছে তাতে বেশ কিছু একটা গোলমাল হয়েছে মনে হয়।

অসীম এবার আর দ্বিধা করলে না। ধীরে ধীরে দরজাটা খুলে আবার সন্তর্পণে বন্ধ করে নিচে নেমে দাঁড়াল।

গোলমালটা সামনে বাঁ পেছন দিকের একটা গাড়িতে হয়েছে। তারই কাছে লোকজনের ভীড়।

অসীমকে সেই দিকেই একটু এগিয়ে যেতে হ'ল।

মিনিট পাঁচেক বাদে ফিরে আসবার সময় একটু অসুবিধেই হ'ল নিজের কামরাটা চিনে বার করতে।

পর পর এক সঙ্গে অনেকগুলো কাট ক্লাস কামরা। তার মত উৎসাহ নিয়ে কেউ সেখান থেকে নামে নি মনে হয়। অন্ধকারে নিচে থেকে জানলা দরজা বন্ধ করা আলো নিভানো কামরা গুলো চেনা বেশ কঠিন। শুধু ওই একটা আলো জ্বালান কামরার দরজায় কে যেন মুখ বাড়িয়ে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে। সে কি, ঠিক যেন রীণাই মনে হচ্ছে!

আর দু'পা যাবার আগেই মুখটা ভেতরে সরে গেল। আলোটাও সেই সঙ্গে গেল নিভে।

কাছে এসে দাঁড়িয়েও অসীমের একটু দ্বিধা হল কামরায় উঠতে। সে ভুল দেখেনি ত!

সাহস করে ওপরে উঠবার পর নিশ্চিন্ত হ'ল। ঠিক কামরাতে উঠেছে। রীণা কিন্তু তার বার্থে গলা পর্যন্ত কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে। ঘরের নীল আলোটা শুধু জ্বলছে। অসীমই জ্বেলে গেছল।

অসীম দরজা বন্ধ করে ওপর নিচে 'লক' করে ফেরবার পর রীণার গলা শোনা গেল—বাক্সটা নিয়ে যাও নি কেন?

'খুন হয়েছে।' বলে অসীম নিজের 'বাজে' উঠছিল, রীণার প্রশ্নে তাকে থামতে হ'ল।

কি হয়েছিল কি ?

থার্ড ক্লাস থেকে একটি মেয়ে পড়ে গিয়েছিল।—অসীম সংক্ষেপে সারল।

কি করে ?—রীণার কৌতূহল কি একটু বেশী !

কামরায় ভয়ানক ভীড়। অসীমকে বিশদ করতেই হ'ল, অনেকে ফুটবোর্ডে দাঁড়িয়ে যাচ্ছিল। তার মধ্যে ওই মেয়েটিও ছিল তার স্বামীর সঙ্গে। কি ভাবে অন্যমনস্কতায় পড়ে গেছে।

একটু থেমে অসীম আবার বললে, দু একজন বলছে এমনি পড়ে নি। মরণটাই নাকি ঠেলে দিয়েছে।

রীণা হঠাৎ এমন হেসে উঠবে অসীম ভাবতে পারে নি। বেশ একটু উচ্চ স্বরেই অসীম বললে,—হাসছ কি ? মেয়েটা হয়ত বাঁচবে না।

না বাঁচাই ত ভালো।—রীণার স্বর এখনো যেন তীব্র কৌতুকের,—কিন্তু থার্ড ক্লাসে যাওয়ার কি সুবিধে বলত !

অসীম এ মন্তব্য অগ্রাহ্য করে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলে,—তুমি দরজা খুলে বুক বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে ছিলে !

আমি !—রীণা যেন অবাক। আমার ত এই সবে ঘুম ভেঙেছে। বিছানা ছেড়েই উঠিনি।

মিথ্যে, মিথ্যে, আবার সেই অকারণ মিথ্যে কথা !

সেই মুহূর্তে অসীমের মনের ভেতর দিয়ে একটা বিদ্যুৎ যেন খেলে গেল।

মিথ্যে ঠিকই কিন্তু অকারণ কি ?

সব মিথ্যেই কি একই সূত্রে জড়ানো গভীর কোনো রুদ্ধ কান্নার উল্টো পিঠ ?

সে রাত্রের সেই স্বীকারোক্তিও কি এইরকম মিথ্যে ছাড়া আর কিছু নয়। সুতপার সঙ্গে অসীমের সম্বন্ধ নিয়ে সত্য মিথ্যা যা রীণা শুনেছে তাই কি এসব মিথ্যার মূল ?

বন্ধু

রামপদ মুখোপাধ্যায়

রেলের চাকরিতে ভ্রমণের নেশা জমেছিল। এই জন্য কম ঝঞ্ঝাট পোয়াতে হত না। এবার দেশভ্রমণের পূর্বে স্থির করেছিলাম—যথাসম্ভব হাল্কা হয়ে কাজটা সারব। অর্থাৎ যেটুকু না নিলে নয় সেই জিনিসগুলি একটা ঝোলার মধ্যে পুরে ভারতবর্ষের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত টহল দিয়ে আসব। গা-ঢাকা একখানা চাদর ছাড়া বিছানা পর্যন্ত নেব না—টুকিটাকি জিনিসভর্তি ওই ঝোলাটাই বালিশের কাজ করবে। ঝোলার মধ্যে থাকবে—একটি গেলাস—শুধু জল পানের জন্য নয়—সর্বকার্যে ব্যবহারার্থ। থাকবে আর এক প্রস্থ কাপড় জামা বিকল্পে দেখি পায়জামা, একখানা গামছা আরও দু' একটি জিনিস; নেহাৎ ভদ্র সমাজ হতে অপসৃত হয়ে না পড়ি এই আশঙ্কায় ওগুলি নিতেই হবে। ঝোলাটা কাঁধে ফেলে যে কোন জায়গায় নির্ভাবনায় চলে যাব। পায়ে থাকবে টায়ার সোলের সস্তা একজোড়া চটি যা ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে যে-কোন জায়গায় পড়ে থাকলেও স্থানচ্যুত হবার ভয় থাকবে না। ঠিক, সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর সজ্জা নয়—অথচ সর্বত্ব ত্যাগের ইঙ্গিতটুকু ওরই মধ্যে থাকবে।

সঙ্কল্প মত হাল্কা হয়ে বা'র হয়েছি দেশভ্রমণে। পথ দীর্ঘ—একেবারে ভারতবর্ষের শেষ স্থল-বিন্দুতে যাত্রা শেষ। রাজ্যের পর রাজ্য পার হয়ে চলেছে রেলগাড়ী—আনন্দের আবেগে কাঁপছে সর্বদেহ—মন বিস্ফারিত।

একটা দিন আর রাত্রি কেটেছে গাড়ীতে—আরও একটা দিন কাটিয়ে বড় মত একটা শহরে পৌঁছব। ইতিমধ্যে গাড়ীর মধ্যে সুরু হয়ে গেছে কানাকানি। আর সেটা আমাকে লক্ষ্য করেই।

আমার সামনে বসেছিলেন রোগামত এক ভদ্রলোক। সাজ-পোষাকে অতি সাধারণ। মুখখানা নিরীহ নিরীহ দেখালেও—চোখ দু'টি অতিশয় চঞ্চল। আমাকে বেশ কিছুক্ষণ অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করে এক সময়ে সবিনয়ে শুধোলেন। আপনি কি তীর্থভ্রমণে বেরিয়েছেন স্বামীজী? চমক-লাগার মত সম্বোধন—পুলকিত হবার মতও। তবু যথাসাধ্য সংযত বাক্যে উত্তর দিলাম, হাঁ—দেশ দর্শনে। ভদ্রলোক ঈষৎ হেসে বললেন, দেশদর্শন তো বটেই। তা আপনি কোন্ সম্প্রদায়ভুক্ত?

প্রশ্নের ধরণটা বিরক্তিকর মনে হ'ল। ইচ্ছা হ'ল ব্যঙ্গ করে বলি—মানুষ সম্প্রদায়। কিন্তু আরও সংযত হয়ে ব্যঙ্গোক্তিকে মনের মধ্যে রেখে নিজের পানে চাইলাম একবার। আমার বেশভূষা কি স্বামীজীদের মত? পরনে গৈরিক বসন? কণ্ঠে বাহুতে রুদ্রাক্ষ কি তুলসীর মালা? ললাটে আঁকা তিলক-কিংবা ত্রিপুণ্ড্ররেখা? মাথায় জটাভার—বিভূতি বিচিত্রিত সর্বদেহ?

মনে মনে হেসে নিলাম। বিজ্ঞজনেরা আমি আরাম বর্জন করেছি—প্রধান একটি কারণে—বেশি রকম মালপত্র নিয়ে বিব্রত হব না পথে। অতিরিক্ত মালপত্র অনেক সময় অশান্তি সৃষ্টি করে—অসহায় করে মানুষকে। মজুরেরা অন্যায্য দাবি তুলে মনোপীড়া ঘটায়। আবার এই মাল কোথাও রেখে সুস্থির হওয়া যায় না। দেবদর্শনে কিংবা নিসর্গ শোভা উপভোগের ক্ষেত্রে এরা সবাই হায়াই হায়াই ভাব নিয়ে কাঁটার মত বিঁধতে থাকে মনে।

মনে মনে হাসলাম কারণ আমার সহযাত্রী—সর্বত্যাগের এই সামান্যতম নমুনা দেখে ধরে নিয়েছেন আমি গৃহত্যাগী—কোন ধর্ম-সম্প্রদায়ের মানুষ। আরও একটা কারণে ওঁর ধারণা দৃঢ় হয়েছে হয়তো। অযত্ন বর্দ্ধিত শুষ্কশুষ্ক আর পারিপাটীহীন কেশরাশি। এটাও ক্ষৌর কর্মের ঝামেলা থেকে নিষ্কৃতি লাভের প্রধান মাত্র।

কোন উত্তর না দিয়ে মাথা নাড়লাম এমন ভাবে যার অর্থ খুসিমত ধরে নিতে বাধা নেই।

লোকটির মুখে অমায়িক হাসির তরঙ্গ উথলে উঠল। নড়েচড়ে বসে আমার দিকে আরও একটু ঝুঁকে পড়ে গলা নামিয়ে বললেন, আমি দেখেই বুঝেছি আপনি মহাত্মা। কিছু ধর্ম-প্রসঙ্গ···করুন।

সর্বনাশ! ভেক নিইনি—ভিক্ষাও চাইনি, তবু ধর্ম-প্রসঙ্গ!

সবিনয়ে বললাম, ধর্ম জিনিসটা খুব সোজা নয়।

উনি সোৎসাহে মাথা নাড়লেন, যথার্থ বলেছেন স্বামীজী। সাধারণ মানুষের ধারণা তীর্থে তীর্থে ঘুরে ঠাকুর দেবতা দেখে বেড়ালেই ধর্মকর্ম হল! তিলক কোঁটা কেটে আচার নিয়ম পালন করলেই ধার্মিক হয়!

বললাম, আমি ওসব কিছুই বুঝি না।

লোকটি তাড়াতাড়ি বললেন, ওসব বাইরের জিনিস, সাধারণ মানুষকে ভোলাবার কলাকৌশল। নয় কি স্বামীজী? আসলে ধর্ম হল ভিতরের জিনিস। মহাজনেরা বলেছেন—ধর্মের তত্ত্ব অত্যন্ত গোপন গুহায় লুকোনো থাকে।

বললাম গুহার মধ্যে কিন্তু অন্ধকার।

উনি বেঞ্চিতে একটা চাপড় মেরে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন, এক্জ্যাক্টলি! রাশি রাশি অন্ধকার। সেইজন্যেই তো সাধারণ মানুষ হাতড়ে মরে অন্ধকারে—আসল নকল খুঁজে পায় না। আপনি বলুন স্বামীজী সেই গোপন কথা—

ক্যাসাদ আর কি! তীব্র দৃষ্টিটা ওর মুখের উপর বুলিয়ে নিলাম একবার। বুঝতে চাইলাম—কিসের আগ্রহে ও উত্তেজনায় এমন একটি সঙ্গীণ মুহূর্ত সৃষ্টি করতে চাইছেন উনি? সত্যই কি জিজ্ঞাসু মনের কৌতূহলে উদ্দীপ্ত ওঁর দৃষ্টি, না পরীক্ষায় ছলনায় সুতীক্ষ্ণ? কিছুই বুঝলাম না। মনে হল—গুহার যত অন্ধকার ওঁর মুখমণ্ডলে ঘনীভূত হয়েছে। কৌতূহলের সঙ্গে কৌতুকরসও হয়তো আছে। যাই হোক—আপাতত প্রসঙ্গ বাড়াব না স্থির করে বললাম, শরীরটা ভাল লাগছে না—বিশ্রাম করব খানিক।

উনি বললেন, ট্রেনের ঝাঁকুনি আর কয়লার গুঁড়ো—শরীর ভাল থাকে না। তা ছাড়া··· আচ্ছা বিশ্রাম করুন। আপনি তো আজই নামছেন না—আমিও নামছি না। পরে আলাপ হবে।

চোখ বুজেও অস্বস্তি ঘুচল না। কেন জানি না—মনে হল—উনি একদৃষ্টিতে আমার পানে চেয়ে আছেন। যেমন মনে হল—চোখ চাইলাম। আশ্চর্য—কল্পনার সঙ্গে বাস্তব মিলে গেল। শিউরে উঠে চোখ বন্ধ করলাম। অস্বস্তি কিন্তু বেড়েই গেল। এমনিতে তো কত লোক মুখের পানে চেয়ে থাকে—অস্বস্তি হয় না। কিন্তু যেইমাত্র একটি মানুষ সম্বন্ধে আর একটি মানুষ কৌতূহলী হয়ে ওঠে—অমনি কি নানান সন্দেহ অস্বাচ্ছন্দ্য আসে মনে! সেই চাউনির তখন নানা অর্থ আবিষ্কার করার নেশা জাগে। কেন ও আমার পানে অমন করে চাইল? আমাকে কি ওর ভাল লাগছে? কোন

পরিচিত প্রিয়জনের কথা মনে পড়ছে? কিংবা কোন অভিশপ্ত কার্যের স্মৃতি উদ্বেল হয়ে উঠছে? লোকটি প্রতারক কি না—কে জানে? কোন দুর্ঘটনা মনের অগোচরে হতে পারে। এমনি নানান সন্দেহের ছায়া গাঢ়তর হতে লাগল মুদ্রিত দৃষ্টির তলায়। কিন্তু উনি যে যথার্থ ধর্ম-পিপাসু হতে পারেন—এই অনুমান একবারও মনে এলো না।

এমনভাবে কতক্ষণ আর চোখ বুজে থাকা যায়—আবার চোখ চাইলাম। আর আশ্চর্য, দেখলাম—উনি সেই একভাবে আমার পানে চেয়ে বসে আছেন।

এবার আর চোখ বন্ধ করলাম না। মনের বিরক্তি ভাব যথাসম্ভব গোপন করে একটু হেসে বললাম, আপনি দেখছি—ঠায় একভাবেই বসে আছেন। সত্যিই কি আশা করেছেন—আমি ধর্ম-কথা বলব?

উনি কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হ'য়ে বললেন, নিশ্চয় আশা করছি। এই আশা কি অন্যায়।

বললাম, ন্যায় অন্যায়ের কথা আসছে না,—কিন্তু আপনার আশা যে পূর্ণ হবে—এ আশ্বাস কোথায় পেলেন?

উনি বললেন, আপনার মুখের ভাবেই তা পেয়েছি। আমি বেশ বুঝেছি—আপনি একজন সর্বত্যাগী মহাত্মা। আপনার মধ্যে ভান নেই। তাহলে আপনি গেরুয়া পরতেন, কোঁটা তিলক কাটতেন, শাস্ত্রের শ্লোক আওড়াতেন। ধর্ম আপনার কাছে অত্যন্ত সহজ জিনিস—যেমন সহজে আমরা নিশ্বাস নিচ্ছি, আলো বাতাস ভোগ করছি।

বললাম, আসলে ধর্ম কোন কালেই কঠিন বস্তু নয়—হেঁয়ালি নয়। শাস্ত্রাচারের অনেক বিধি-বিধান চাপিয়ে জিনিসটাকে আমরা অতিশয় দুষ্পাচ্য করে ফেলেছি।

উনি বললেন, মনটা যেহেতু জটিল—আপনি ভাল ভাল কথা বললেও আমি ভাবব ওসব আপনার মনের কথা নয়। মান সম্মান আদায় করার জন্য এমন আড়ম্বর করছেন—কথার তুবড়ি কাটাচ্ছেন। কেমন ঠিক কিনা?

নির্বিবাদে সায় দিলাম না। কথায় আছে—অজ্ঞাত কুলশীলস্য। আবার সন্দেহ জাগল—আমায় দেখে ওর মনে সহসা ধর্ম-চেতনার উদ্ভব হল কেন? একি শুধুই কৌতূহল—না—

একটু ইতস্ততঃ করে বললাম, আপনার মত এমন করে ভাববার অবকাশ আমার হয়নি—কিন্তু ভাল ভাল কথা শুনতে ভালবাসেন—এমন মানুষও তো আছেন। যেমন আপনি। আবার এমন মানুষও তো আছেন—ভাল ভাল কথা বলে নিছক আনন্দ লাভ করেন—লোকচক্ষে নিজেকে তুলে ধরার ইচ্ছা যাঁর আদৌ থাকে না।

ভদ্রলোক হাসলেন। মাথা নাড়লেন দু'চার বার। বললেন, তেমন দৃষ্টান্ত আমার সামনেও পাচ্ছি। পাছে লোকের থেকে আপনাকে উঁচু মনে করি সেই ভয়েই মুখ খুলতেই চাইছেন না! বিশ্বাস করুন—আমি সেই ধর্মের কথাই শুনতে চাইছি—যা মানুষের জীবনকে সুস্থ রাখে—মনে শক্তি সঞ্চার করে—শান্তি এনে দেয়।

বললাম, পৃথিবীতে এই অবস্থাগুলি প্রতিটি মানুষের কাম্য। তবু বেশির ভাগ মানুষই এই পথের পথিক নয়। বলবেন—সুস্থ দেহ কে না কামনা করে? কে না চায় মানসিক শান্তি? কথাটা ঠিকই। কিন্তু সব জেনেশুনেও এ পথে পা বাড়াবার প্রবৃত্তি কেন আসে না—সেই তো আশ্চর্য।

প্রত্যেক মানুষের নিজের নিজের বুদ্ধি প্রবৃত্তি আর বিবেচনার দাগ কাটা পথ আছে—সেই ছক কাটা পথে চলতেই সে ভালবাসে। যে সব ভাল ভাল কথা তার কানে যায়—সেগুলির সঙ্গে প্রবৃত্তির যদি আপোষ রফা হয়—কথা মনের মধ্যে রয়ে যায়; যদি না মেলে বলবে—এমন উপদেশ বাস্তব ক্ষেত্রে অচল। বাস্তব কথাটা তার নিজেরই বিরোধী যুক্তিক সাজানো গোছানো ভো।

বা: চমৎকার বলেছেন তো! সুন্দর! তবে যে বলছিলেন—ধর্মের কথা আপনি জানেন না?

এ কি ধর্মের কথা হল? বললাম।

হল না! উনি হঠাৎ উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলেন। কামনা-বাসনার খোলস ছেড়ে বাইরে আসা কি সহজ কথা! বুঝে যতই বলুন—মন মানবে কেন! ধরুন রাজনীতিতে আপনার একটা মতবাদ আছে—, মানে সক্রিয় অংশ—

হঠাৎ মনে হল আলোচনা বাঁক ঘুরতে চাইছে! মানে উনি প্রসঙ্গান্তরে আসতে চাইছেন। আমার মনের প্রবণতা পরীক্ষা করতে চাইছেন। আর একথাও ঠিক—আজকালকার দিনে রাজনীতি নিরাসক্ত মন ক'টা মানুষেরই বা আছে! তর্ক জয়ের ইচ্ছাতেও অন্তত একটা দিক অবলম্বন করতে হয়—। এটা হয়তো বা মানসিক ধর্ম। তবু উঠন কামরার তর্ক জিগীষু মনকে আমি সংযত করলাম। ভাবলাম—দেশভ্রমণে এই প্রসঙ্গ নিরর্থক। আমি নির্লগ্ন শোভা উপভোগ করব—দেবমন্দিরের শিল্পকর্ম দেখব, দেবতাকে প্রণাম জানাব—আর নানা মানুষের সঙ্গে মিশব। আর সেই সঙ্গে—বুদ্ধি আর নাই বুদ্ধি—দেশের শিক্ষা সংস্কৃতির চেহারাটা চিনে নেবার চেষ্টা করব। ইতিহাসের পটভূমিকায় এত বিচিত্রবর্ণ মানুষের আনাগোনা হয়েছে দেশের মাটির উপর দিয়ে তাদেরও কীর্তি কাহিনী শুনব। রাজা, রাজবংশ, রাজনীতি, যুদ্ধবিগ্রহ—মন্দির ঘিরে যশ খ্যাতির প্রতিষ্ঠা কল্পনা সবকিছুর আস্বাদ নেব। কিন্তু রাজনীতি—দলীয় মতবাদ? ভ্রমণ-ক্ষেত্রে ওটা অপ্রাসঙ্গিক।

বললাম রাজনীতির ধার আমি ধারি না।

উনি অতিশয় আশ্চর্য দৃষ্টিতে এক মিনিট কাল চেয়ে রইলেন আমার পানে। পরে মৃদু হেসে বললেন—বলেন কি! কিন্তু তার কথাটা নিশ্চয় অস্বীকার করেও কাঁধ থেকে ঠেলে ফেলতে পারবেন না। এই যেমন ধরুন সেদিনের কথা। চীনাদের আক্রমণে ভারতবর্ষে যে দুর্যোগ ঘনিয়ে এসেছিল—ভারতবাসী হয়ে নিশ্চয় আপনি চুপ করে থাকতে পারেন নি? তখন কি চীনাদের বিরুদ্ধে আপনার মনোভাব—

বললাম, ওসব আলোচনা করতে এখন ইচ্ছা করছে না। আপনি বরঞ্চ এই দেশের মন্দির আর দেবদেবী সম্বন্ধে কিছু বলুন।

উনি হাসতে হাসতে বললেন, দেবদেবীর পরিচয় নতুন কি দেব—সারা ভারতবর্ষে ওদের একই গোত্র। বেঁচে থাকুক আমাদের বেদ বেদান্ত রামায়ণ মহাভারত পুরাণ কথাগুলি—

সবটা না শুনেই হাত দুটি বাঁকিয়ে আলস্য ত্যাগের ভঙ্গি করলাম—একটা হাই তুললাম—চোখ দুটি বাধ্যিক বন্ধ করলাম। এতগুলি ইঙ্গিত সত্ত্বেও উনি আমার পানে চেয়ে বসে রইলেন। অবশেষে ভাবলাম—থাকুন উনি যতক্ষণ আমার মুখের পানে চেয়ে। হোক অস্বস্তি—কোন মতেই আর চোখ চাইব না। এই অবাঞ্ছিত আলাপের সূত্রটা আর কিছুতেই টানব না।

টিকেট প্লীজ।

চেকারের কণ্ঠস্বরে চোখ চাইতেই হল। পাশখানা দেখিয়ে ওর পানে চেয়ে দেখি—উনি তখন পড়ে চোখ বুজেছেন। চেকার ওঁর পানে ফিরে চাইল না—অন্য যাত্রীদের টিকিট দেখতে দেখতে এগিয়ে গেল।

এতক্ষণে নিশ্চিন্ত হলাম। খানিক পরে ঘুমিয়ে পড়লাম।

ঘুম ভাঙল সম্পূর্ণ নতুন পরিবেশে। পুরাতন সহযাত্রীরা অনেকেই নেমে গেছেন—নতুন যাত্রী বিশেষ ওঠে নি। সব চেয়ে স্বস্তির কথা—সেই ভদ্রলোককেও দেখলাম না। বাইরে চেয়ে দেখি—আকাশে কি সুন্দর নীল। রুক্ষ বন্ধ্যা মাঠের উপর গভীর ভালবাসায় বিস্তৃত হয়ে রয়েছে সে আকাশ। বহুক্ষণ চেয়ে রইলাম মুগ্ধ চোখে।

বিরাট মন্দির অলিন্দ—প্রাঙ্গণ—গর্ভগৃহ আর স্তম্ভশ্রেণী। অনিন্দ্য শিল্পকর্মে মোড়া তার আগাগোড়া। অফুরন্ত বিস্ময়ে প্রদক্ষিণ করে চলেছি, কিন্তু শিল্পরীতির সঙ্গে পরিচিত নই বলে—স্মৃতির আলোতে বেশিক্ষণ ধরে রাখা গেল না সেই সৌন্দর্যকে। মন্দির দেখা শেষ করে সমুদ্রের ধারে এসে বসলাম। এখানে নূতন দৃশ্যপট—নূতন দৃষ্টিপাতে নূতন আনন্দের সঞ্চয়। ইতিমধ্যে অনুভব করলাম—আমার সর্বাঙ্গে আরও কয়েকটি চক্ষুর তীক্ষ্ণ বিস্মিত আলো এসে পড়েছে। এই বিস্ময়বোধ আমি বিদেশী বলে নয়—কারণ দেশ বিদেশের যাত্রীদল এখানে আসে বলেই বোধ হয় মাহাত্ম্য এত প্রবল। আমার অদ্ভুত বেশবাসই কি ওদের বিস্ময়ের হেতু? হয়তো তাই। একটি মাত্র কাঁধে ঝোলানো ঝুলির মধ্যে যাবতীয় প্রয়োজনীয় ভ্রমণ-বস্তুকে সঞ্চিত করে কোন পর্যটকই এমন ভাবে দেশ দেশান্তর ঘুরে বেড়ায় না। পরণে গেরুয়া থাকলেও অর্থটা পরিষ্কার বোঝা যেত—কিংবা দেবতার ভোগ পূজা প্রণাম প্রার্থনাতেও যদি কিছু সময় দিতে পারতাম তাহলে এটা হেঁয়ালি থাকত না। হট্টমন্দিরে শয়ন—এবং গব্য-তক্র ভোজন এই দৃশ্যও দেখছে না ওরা। সময় মত স্নান আহার, চা, কফি অনবরত চলছে দিবা—অতএব কে এই ছদ্মবেশী এই সংশয়-দোল ভঙ্গিতে ওরা আমার চালচলন লক্ষ্য করছে।

খুব কাছে দাঁড়ানো লোকটাকে হাত ইশারায় ডাকলাম। রাষ্ট্রভাষায় প্রশ্ন করলাম, কিছু বলবে?

ও কথা বলল না—শুধু মাথা নাড়ল। ভাবা পাল্টে প্রায় পরিত্যক্ত রাষ্ট্রভাষায় আলাপ করতে চাইলাম—ফল একই দাঁড়াল। ইসারা ইঙ্গিতেই প্রশ্নোত্তর চলতে লাগল।

ওর প্রশ্ন: কেন এসেছ এখানে?

আমার প্রতি প্রশ্ন: কেন লোক আসে এখানে?

ওর উত্তর: দেবদর্শনে।

আমার উত্তর: মনে কর আমিও তাই এসেছি।

ওর প্রশ্ন: মনে করব কি করে! তুমি দেবদর্শন করলে বটে—দেবতাকে প্রণাম করলে না—পূজো দিলে না—বিভূতি নিলে না।

উত্তর: দেবতাকে পূজো করেছি মনে মনে। কিন্তু তুমি কি করে বুঝলে আমি পূজো করিনি? তুমি কি সর্বক্ষণ আমাকে অনুসরণ করছ?

উত্তর : আমি কেন—অনেকেই তোমার চালচলন লক্ষ্য করছে।

বিস্মিত হয়ে বললাম, তাই নাকি! কিন্তু কেন?

ও বলল, তুমি কি জান না—আমাদের একজন মাননীয় মন্ত্রী আজ এখানে আসছেন?

বললাম, কৈ—নাতো!

ও বলল, দেখছ না—কত সরকারী লোক-লস্কর ঘুরে বেড়াচ্ছে? কত শান্তিরক্ষক—

বললাম, আমি মন্দির দেখতে এসেছি—সমুদ্র দেখতে এসেছি, রাজপুরুষকে দেখে কি লাভ!

কিন্তু রাজপুরুষরা তোমাকে দেখছেন। আমরাও দেখছি।

এতক্ষণে ব্যাপারটা বোধগম্য হল। ট্রেন থেকে এই সমুদ্রতীর পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন ঘটনা প্রবাহ নিমে একটি ছবি স্পষ্ট হয়ে উঠল। অমনি অযৌক্তিবোধ করতে লাগলাম।

ইচ্ছা ছিল স্নান সেরে আর একবার মন্দিরের মধ্যেটা ঘুরে দেখব। সেই ইচ্ছা আপাতত পূর্ণ হবে না বুঝছি। মন্দিরের দুয়ারে চত্বরে শস্ত্রপাণি শান্ত্রীরা টহল দিয়ে ফিরছে। মন্দির প্রবেশে অবশ্য বাধা নাই—কিন্তু যাওয়া আসার পথটি সুনিয়ন্ত্রিত। মূল্যবান রাজপুরুষটি দেবদর্শন করে যতক্ষণ না মন্দির ত্যাগ করছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত এই বেড়ার বাধা ভাঙছে না। দাঁড়িয়ে রইলাম—মন্দিরের প্রবেশপথে।

অবশেষে সেই উত্তম পুরুষ—যাঁর জন্য এত সতর্ক রক্ষণার আয়োজন—মন্দিরে প্রবেশ করলেন। বহু যাত্রীও সেই সঙ্গে মন্দিরে প্রবেশ করল। বেশ ঠেলাঠেলি পড়ে গেল। যাত্রীদের অবশ্য আলাদা একটি নিয়ন্ত্রিত পথে চালান করে দেওয়া হলো। উত্তম পুরুষটির আগে পিছে সিপাই শান্ত্রী সামান্যই ছিল,—সাধারণ পোষাকের—জনাকয়েক অসাধারণ পুরুষ ওঁকে ঘিরে পথ চলছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজনের উপর আমার দৃষ্টি পড়ল—তিনি আগে পাশে চাইবার কালে আমাকে দেখলেন। ঈষৎ হাসি ফুটল তাঁর মুখে। হাত ইসারায় আমাকে বললেন—কাছে যেতে। হাত ইসারায় জানালাম—বেশ আছি এদের মধ্যে।

ওঁরা এগিয়ে গেলেন—আমি হারিয়ে গেলাম জন-সমুদ্রে।

তবু একেবারে হারিয়ে যাইনি।

সেইদিন অপরাহ্নে ট্রেন-কামরায় ওঁর সঙ্গে দেখা হলো।

আমাকে সমাদর করে নিজের পাশটিতে বসিয়ে বললেন, নির্বিঘ্নে দেবদর্শন হলো?

বললাম, আপনিও তো দেবদর্শনে গিয়েছিলেন।

উনি হেসে বললেন, বলতে গেলে দেবতার সঙ্গে সঙ্গেই রয়েছি।

বললাম—তা বটে আগ্রহ দেবতা।

বললেন—কিন্তু মহাত্মা—দেবতাকে চেনা খুব শক্ত নয়—মাঝে মাঝে মুশকিল হয় আপনাদের মত মহাত্মাদের নিয়ে।

কেন—আমরা কি অপরাধ করলাম?

উনি হেসে বললেন, অপরাধের কথা বলছি না। আপনারা মহাত্মা—অপরাধী আপনাদের হয় না। কিন্তু পুরোপুরি একটা পথ যদি আপনারা ধরেন আমাদের হয়রানিটা কম হয়।

যথা?

বুঝলেন না—যেমন আপনার বেশবাস। এটা না সরকা—না ঘাটকা। বেশ খানিকটা এনিগ্‌মা সৃষ্টি করছে না কি? হয় আপনি গোঁফদাড়ি কামিয়ে ফেলুন—নতুবা পোষাক বদলে নেবেন—আমরা তাহলে নিশ্চিন্ত হই।

বললাম, আমার পুরো পরিচয়টি পেলে এসব উপদেশ দিতেন না।

উনি হাসলেন। পুরো পরিচয়টা না নিইয়ে কি ছেড়েছেন মহাশয়! না হলে সেদিন নিশ্চিন্ত হয়ে ট্রেন থেকে নেমে যেতে পারতাম!

বিস্মিত হয়ে বললাম, কখন পেলেন পরিচয়!

উনি মুখ টিপে হাসতে লাগলেন। বেশ করে ভেবে দেখুন তো!

এমন সময় চেকার উঠল গাড়ীতে। যাত্রীদের টিকিট পরীক্ষা করতে করতে চেকার এগিয়ে এল। ওঁকে কিন্তু পাশ কাটিয়ে গেল।

যাবার সময় ওঁর পানে চেয়ে হাসল—মনে হল আমার অলক্ষ্যে কি যেন ইঙ্গিত বিনিময় হয়ে গেছে ইতিমধ্যে।

এতক্ষণে অন্ধকার তরল হয়ে এলো। এবার আর বিদ্যুৎ চমকালো না মুহূর্ত কালের জন্য—চল্লিশ ওয়াটের বিদ্যুৎ-বাতিকে আশ্রয় করে স্থির হ'ল।

রাজ্যজোড়া বিস্তীর্ণ একটি জালের একাংশকে প্রত্যক্ষ করলাম।

আমার সংশয়যুক্ত মনোভাবটি বুঝে নিয়ে উনি হাসলেন। বললেন, একটা কথা আপনাকে জানিয়ে রাখছি বন্ধুভাবে। অবশ্য বন্ধুই আপনি—কথায় বলে এক সঙ্গে সাত পা বাড়ালেই বন্ধু। তা আপনার সঙ্গে একই ট্রেন কামরায় পুরো দেড়টা দিন তো কেটেছে। হাঁ—কথাটি বন্ধুভাবেই বলছি—আর কখনও এমনভাবে দেশভ্রমণে বা'র হবেননা—কিছু সঙ্গেপত্র সঙ্গে রাখবেন—ভ্রমণটি নিরাপদ হবে।

ট্রেন তখন একটি ছোটমে এসে থেমেছে। উনি ট্রেন থেকে নেমে দু'হাত কপালে ঠেকিয়ে বললেন, নমস্কার। কথাটা মনে রাখবেন।

আরও সুন্দর আরও উজ্জ্বল ক'রে তুলুন
আপনার চুল

একমাত্র লক্ষ্মীবিলাস
নিয়মিত ব্যবহারেই
তা সম্ভব।

সতর্কীকরণ :—

কিনিবার সময়
ট্রেডমার্ক রামচন্দ্র মূর্ত্তি
পিলফার প্রুফ ক্যাপের
উপর **R.C.M.** মনোগ্রাম
ও প্রস্তুতকারক
এম, এল, বসু এণ্ড কোং
দেখিয়া লইবেন।

লক্ষ্মীবিলাস তৈল

এম.এল.বসু এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
লক্ষ্মীবিলাস হাউস · কলিকাতা—৯

ভেজাল

আশাপূর্ণা দেবী

'ভেজাল! ভেজাল!'

নন্দী বক্সি রেগে বলেন, শুনে শুনে কান পচে গেল! যেন কী এক নতুন ঘটনা! যেন ওই 'ভেজাল' শব্দটা অভিধানে ছিলনা, তোরাই নতুন সৃষ্টি করলি! বলে কত ভেজালই দেখলাম জীবনে!

খড়দার নাতবৌ বলে, 'সে কী দাদু, আপনাদের আমলেও ভেজাল ছিল?'

'ছিল না?' নন্দী বক্সি বেগে উঠেন, 'কেন, থাকবেনা কেন? তোদের এ যুগেরই ব্রেন আছে? আমাদের যুগে ছিলনা? বলি কী বা ভেজাল দেখাচ্ছিস তোরা? বড় জোর চালে কাঁকর তেলে শেয়াল কাঁটা, ময়দায় সোপস্টোন্, কেরোসিনে জল, চায়ের পাতায় চামড়ার ছাঁট, কি না হয়—ওষুধে ডিষ্টিলড্ ওয়াটার! এই তো? এর বেশী তো নয়?···না হয় ওই রকমই। শুনেছিলাম বটে সাগুতে সাগু, বার্লিতে বার্লি, এসব আর থাকে না আজকাল।··তবু জিনিসে ভেজাল তো সোজা যে, আমাদের স্বাধ্ভা একজন মানুষে এমন ভেজাল দিয়েছিল, শুনলে বুঝবি! কিউটি পার্সেন্ট ভেজাল!

খড়দার নাতবৌ বলে, 'ফর্সা মেয়ে দেখিয়ে কালো মেয়ের বিয়ে দিয়েছিল বুঝি?'

'উঁহু! ও নয়। ও তো আকছারের ঘটনা। এ আর এক কায়দা। তা' হলে শোন গোড়া থেকেই বলি। গল্পের রস পাবি।··

আমাদের গ্রামের জমিদার হরসুন্দরবাবু অল্পবয়সে বিপত্নীক, ছেলেপুলেও ছিল না। কিন্তু আর বিয়ে করেন নি, গোটা তিনেক ভাইপো ছিল, তাদের সংসার নিয়েই সংসার।···তা ছিলেন খুবই ভাঁটের ওপর। চাকর বাকর, নায়েব গোমস্তা, আমলা শামলা থেকে সুরু করে, ওই ভাইপো ভাইপোবৌরা পর্য্যন্ত সব ভটস্থ, জোড়হস্ত। নচেৎ পান থেকে চুণ খসলে গর্জান নেবেন জ্যেঠামশাই।

তা' ভাল কি বাসেন না তিনি এদের?

বাসেন। বরং একটু বেশীই বাসেন। বুড়ো হাতী ভাইপোগুলো যে একটা কাজ করে না, অথচ মনের খুশিতে সংসার বাড়িয়ে চলছে, এ তিনি তাকিয়েও দেখেন না। একেবারে স্বোপার্জিত অর্থে হরসুন্দরের এই জমিদারী, কিন্তু ভাইপোদের অবান্তর ভাবেন না। তবে ওই বাইরের মূর্তিটি বেশ 'রুদ্র রুদ্র!'

ভাই বৌমারা শুধু সেবার মূর্তি হয়ে দূরে দূরে ঘুরে বেড়ান, কাছে আসেন না। অন্য কেউও না। কাছে আসে শুধু ছোট ভাইপোর মেজ মেয়েটা। মেয়েটাকে তিনি 'সুরোরাণী' বলেন।

সুরোরাণীর দাপটও তত, আবদারও তত। হরসুন্দর বলেন, 'এই একটা মেয়েই যা মানুষের মেয়ে। আর সব মাটির পুতুল! দূর দূর!'

অথচ সুরোরাণীর মা আড়ালে মেয়েকে শাসন করে, 'দাদুর কাছে অন্ততঃ একটু শান্তশিষ্ট হয়ে থাকতে পার না? এই তো বাড়ীতে এতগুলো ছেলে মেয়ে রয়েছে দেখে শিখতে পারনা?'

সুরোরাণী অবজ্ঞাভরে চলে যায়।

শিরে বলে, 'দাদু তুমি সবাইয়ের কাছে এত রাগী দেখাও কেন?'

হরসুন্দর হেসে বলেন, 'রাগী দেখাই কি রে? জবর রাগী তো আমি!'

সুরোরাণী মাথা নেড়ে বলে, 'কক্ষণো না। তুমি শুধু রাগী দেখাও।'

হরসুন্দর মেয়েটাকে কাছে টেনে বলেন, 'এ কথা তোকে কে বললে রে সুরোরাণী?'

'বলবে আবার কে?' বছর ছয়ের মেয়েটা রীতিমত দৃঢ়তার সঙ্গে বলে, 'আমি নিজেই সব বুঝতে পারি। তা' দেখাও কেন বাপু, মা বড়মা মেজমা কত নিন্দে করে!'

হরসুন্দর হেসে বলেন, 'নিন্দে করে? কি বলে রে?'

সুরোরাণী সোৎসাহে বলে, 'বলে, কী জ্বালাই হয়েছে বাবা! আর ভালো লাগেনা! খেটে খেটে হাড় কালি হয়ে গেল! মেজমা তো আবার বলে, সিধী নেই, তাই এত মেজাজ!'

'বটে! এই সব বলে তারা?'

হরসুন্দর একটু শুদ্ধ হয়ে যান। বোকেরি ঠিক এ ধরনের রিপোর্ট আশা করেননি। সুরোরাণী আরো উৎসাহে বলে, 'বলেই তো! আরো কত কী বলে! তুমি এক ঘণ্টা ধরে ভাত খাও, বসে বসে পাখা নাড়তে হয়—তা' রাগী হওয়াটা ছেড়ে দাওনা দাদু?'

'ছেড়ে?'

হরসুন্দর বলে ওঠেন 'ছেড়ে দিলে তোর ওই বাবা জ্যেঠা আর মেয়েরা এই বুড়োর টাকের ওপর নেত্য করবে বুঝেছিস?'

মেয়েটা দাদুর কথার তত্ত্বে ঢুকতে পারে না, বলে উঠে, 'তুমি বুড়ো? ইস!'

হরসুন্দরের মেঘাচ্ছন্ন মুখে ঈষৎ বিদ্যুৎ ঝলসায়। বলেন, 'বুড়ো নই?'

'মোটেই না। বড় জ্যেঠু তোমার থেকে অনেক—অনেক বুড়ো!'

মেঘ কেটে সূর্য উঠলো।

বললেন, 'দূর পাগলী!'

বললেন, 'তবু মনের মধ্যে পুরোপুরি একটা কাঁটা-গাছের ঝাড় পুঁতে রইলো! যে বৌমাদের ভক্তির প্রতিমূর্তি আর যে ভাইপোদের গরুড়ের অবতার বলে মনে হতো, তাদের মধ্যে অনেক তেজাল দেখতে পেলেন। কাঁটা মানেই ফোটা! কাঁটা ফোটে, চোখও ফোটে।

এখন দেখতে পান ভাতের কাছে পাখা নিয়ে বসেন বৌমারা পালা করে। এক একদিন এক একজন। এটা আগে চোখে পড়েনি। তারপর দেখেন, ওই এক ঘণ্টার মধ্যেই ঘোমটার মধ্যে একশোটা হাই উঠছে।

আর একদিন দেখলেন ভাতে বান।

একটা নয়, দুটো নয়, তিন তিনটে।

সংকল্প স্থির করে ফেললেন সেদিন।

খাওয়ার পর বৌমাদের ডেকে কাছে বসিয়ে, বেশ কিছুক্ষণ গড়গড়া খেয়ে বেশ একটু স্নেহের স্বরে বলেন, 'মা জননীদের বোধহয় এই বয়স্ক ব্যাটাকে নিয়ে কিঞ্চিৎ অসুবিধে হচ্ছে?'

মা জননীরা শিউরে উঠলেন।

তবে হরসুন্দর তাতে দৃষ্টিপাত করলেন না। বলতে লাগলেন, 'হতেই পারে। মা ষষ্ঠীর কৃপা তো বুঝিই পাচ্ছে, কাজেই সময় কমছে। তাই ভাবছি—।'

বৌমারা কথা শেষ করতে দিল না। হৈ হৈ করে উঠলো, কাঁদো কাঁদো হলো, ভাসুরীরা রাঁধুনীটার মাইনে কাটবে প্রতিশ্রুতি দিল।

অতএব হরসুন্দর সেদিন আর, কি যে ভাবছেন, সেটা আর ব্যক্ত করতে পারলেন না। তামাক খেতে লাগলেন। বৌমারা অনেকক্ষণ বসে থেকে থেকে আস্তে আস্তে সরে পড়লো।

কিন্তু মা জননীদের কপাল নিতান্তই ভেঙেছে। ক'দিন পরেই দেখা গেল হরসুন্দরের অন্নের গ্রাসে ধুলো ভাসছে।

হরসুন্দর সেদিন আর মাদের ডাকলেন না, ডাকলেন বাবাদের। বললেন, 'তোমাদের সংসার বৃদ্ধি হয়ে পড়েছে, মা জননীরা আর শ্বশুরের সেবা পেয়ে উঠছেন না বুঝতে পারছি, তাই ভাবছি—এতদিন পরে আবার কেঁচে গণ্ডুষই করতে হবে।'

কেঁচে গণ্ডুষ!

সেটা কি বস্তু!

ভাইপোদের তিন জুগুণে ছটা চোখ নীটোল গোল হয়ে উঠল। সেই চোখ দিয়েই তারা এই গোলমেলে কথাটা বুঝতে চেষ্টা করলো। তা' বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। হরসুন্দর কথা শেষ করলেন, 'অসুবিধা নিবারণার্থেই আর একবার দারপরিগ্রহ করবো ঠিক করছি!'

ঠিক করছি!

তার মানেই 'করে ফেলেছি!'

ভাইপোরা পায়ের তলায় মাটি খুঁজে পেল না। তবু 'যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ' নীতিতে এদোমেলো বলে উঠলো, 'কে বলেছে অসুবিধে? আপনার জন্যে অসুবিধে? বলে সেবা করে বর্তে যাচ্ছে। কারুর কোনো অসুবিধে হচ্ছে না!'

হরসুন্দর বললেন, 'ওদের না হোক, আমার অসুবিধে হচ্ছে। সরকারকে বলে দিও ঘটক মশাইকে একবার খবর দিতে।'

ঘটক এল।

পরামর্শ হল।

উঠে-পড়ে কনে খুঁজতে লাগল। সুন্দরী কনে চাই, বয়েস বেশী হ'লে চলবে না। বুড়ো বিদ্যে শোষ মানবে না।...

ভাইপো ভাইপোবৌরা মাথায় হাত দিয়েই রইল।

সুরোরাণী এসে বললো, 'দাদু, ভীমরতি মানে কি ?'

দাদু বলেন, 'ও একটা মজা ! কেন এ কথা কে বলেছে রে ? তোর মাসিরা বুঝি ?'

সুরোরাণী মহোৎসাহে বলল, 'হ্যাঁ !' মেজমা বলল, 'বুড়োর ভীমরতি হয়েছে।'

এখন আর হরসুন্দর ক্ষুণ্ণ হলেন না। হঠাৎ হা-হা করে হেসে উঠে বললেন, 'তোর মেজমা সব ঘরে ফেলে কি করে বল দিকি ?'

'কি জানি দাদু ! বললে, 'আমাদের জব্দ করতে বিয়ে করছে তোর দাদু।'

'ঠিক ঠিক ধরেছে।' হরসুন্দর আবার হাসেন, 'তা' বিয়ে করায় তোর কি মত বলতো সুরোরাণী ?'

সুরোরাণী বলে, 'আমার তো খুবই মত। অনেক ঘটা হবে দাদু ?'

'দূর পাগলী !'

সুরোরাণী মুখ ভার করে, 'ঘটা হবে না ? তবে কি ছাই বিয়ে ? ঘটা হবে লোক নেমন্তন্ন হবে, কতো আলো জলবে সানাই বাজবে, তবে তো বিয়ে !'

হরসুন্দর বলেন, 'তাইতো ! সাধে কি বলি সুরোরাণী ! সত্যি বটে, লোকে ভোজ না খেলে আবার বিয়ে ! লাগিয়ে দাও ঘটা !'

খড়দার নাত-বৌ বলে, 'বয়েস কত বুড়োর ?'

'তা' চৌষট্টি-ছেষট্টি। হলে হবে কি ? সোজা শালগাছ ! বিয়ের ঘটাতেও যেন বেমানান নয় !'

'তা' হলে সত্যি বিয়ে করলেন ?' নাত-বৌ চোখ কপালে তুলে রাখে, নামায় না, 'কনে জুটলো ?'

ননী বক্সি বললেন, 'নিশ্চয়ই ! জুটবে না কি রে ? বলি শুধু এই পোড়া বাংলা দেশ কেন, পৃথিবীর কোন দেশে পয়সাওলার কনে জোটে না রে ? আশী হলেও জোটে।...হরসুন্দরের তো আশীর অনেক দেরী !'...

বিয়ে হল।

হরসুন্দর আর বাসিত-পুরুত-ঘটক ! মেয়ে গরীবের, বেশী বরযাত্রী পারবে না। না পারুক, হরসুন্দর তো এ-পক্ষে প্রচুর ঘটা করছেন ! মনে স্ফূর্তি কত ! গরীবের মেয়ে হলে কি হবে, দিব্যি সুন্দরী ! ডুলডুলে চোখ, টুলটুলে মুখ, হাত-পা নরম কচুপাতার মত !

ভা' বক্সি হলো।

প্রকাণ্ড বক্সি। গ্রাম কে গ্রাম, পাশের গ্রামে পর্যন্ত নেমন্তন্ন। হরসুন্দর নিজে দাঁড়িয়ে—প্রজা পাঠকদের সব খাওয়ালেন। 'আরো নে আরো নে' করে দিয়ে, বলতে লাগলেন, 'অনেক বিয়ের ভোজ তো খেয়েছিস, বাবার বিয়ের ভোজ খেয়েছিস কখনো ? খাসনি। খা ভাল করে। পেট পুরে খা।'

সোকে খেলো, ছাই। বাঁধলে', আর বলতে লাগলো, 'বুড়ো লুচি-মণ্ডা ঠেসে নিজের মুখ বন্ধ করলো!'

মা জননীরা আর বাবাধনেরা ম্রিয়মান মুখে বজির খাওয়া ঠেলতে লাগলেন। ছাঁকারা তো কম হল না? এদিকে ওদিকের দূর আত্মীয়রা এসেছে, বেশ কিছুদিন রয়েও যাবে বোঝা যাচ্ছে। অতএব—! তারপর তোমার গিয়ে জিনিসও তো এসেছে এখান-ওখান থেকে? মাটোরের কাঁচাগোল্লা—গুপ্তি-পাড়ার মেঘো-মণ্ডা, কেটনগরের সরভাজা, মোল্লার চকের দই। অনুষ্ঠানের ত্রুটি নেই। যারা সে সব এনেছে তারা তিন দিন ধরে খাচ্ছে মাখছে, একেবারে রাজসূয় কাণ্ড!

এরা ঘরে ঘরে বলাবলি করছে, 'বিয়ের মাসেই এত বেহায়াপি! এরপর বুঝত তরুণী ভার্যা হলে আমাদেরই বাস ওঠাতে হবে।'

কিন্তু বাস ওঠানো কথাটা বলা যত সহজ, কাজে তো তত সহজ নয়। কাজে কাজেই ভাইপো-বৌরা জ্যেঠ-শ্বশুরের ফুলশয্যের পালঙ্কে ফুলের তোড়া রাখতে, আর বিছানায় 'খোসবু' ঢালতেও ত্রুটি করল না।

কিন্তু ধৈর্য রাখা দায় হলো কনে সাজানোর সময়। এদিকে কনে এসে অবধি ঘোমটার মুখ ঢেকে বসে আছে, কিন্তু ফুলশয্যার সাজসজ্জার সময় হঠাৎ বিয়ের কনে আগ্রহী মহিলাদের হাত থেকে শাড়ী গহনা প্রায় ছিনিয়ে নিয়ে, 'আমি নিজে সাজবো—' বলে ঘরে গিয়ে দরজায় খিল দিল!

এ কী!

এ কোন ধরণের অসভ্যতা!

বুঝতে বাকী রইল না, বাপের বাড়ীর শিক্ষার ফল। নির্ঘাৎ তারা বলে দিয়েছে 'তুই গিন্নী, তুই সর্বেসর্বা, তুই কারো কথা শুনবি না।'

বৌরা কপালে ঘা মেরে বললো, 'কপালে এতও ছিল!'

কিন্তু কপালে যে আরো কত ছিল, তা তখনও জানে না তারা। জানলো মাঝরাত্রে।

মাঝরাত্তিরে ফুলশয্যার ঘর থেকে মেয়েলি আর শিক্ষিত সুরেলা গলায় গান উঠলো!

কে।

কে!

কার গলা!

বাড়ীর এরা স্তম্ভিত হয়ে গেল। আর—গ্রামের গভীর-রাত্রির স্তব্ধতা ভেদ করে সে সুর যতদূর পর্যন্ত পৌঁছল, সবাই উৎকর্ণ হল! এ গলা এর আগে কে শুনেছে জমিদার-বাড়ী থেকে। মেয়ে গলায় গানই বা কে শুনেছে?

সন্দেহ থাকে না কে গাইছে।

নিজ নিজ শয়ন মন্দিরে কানে আঙুল দিয়ে বসে থাকলো ওরা, কারণ সুর ক্রমশঃ সপ্তগ্রামে উঠছে ; ঝনঝন করে বাজছে !

'বনদিনী বোলো নগরে নগরে !
ডুবেছে রাই রাজনন্দিনী—
কৃষ্ণ-কলঙ্ক সাগরে !'

বুঝতে আর বাকী রইল না কারো, বিয়ের ছল করে অ্যাটার্নীসাহেব এই বৃদ্ধ বয়সে একটা বাইজী ছুঁড়িকে ঘরে এনে তুলেছেন !

মায়েরা বললেন, 'আমরা এ কীর্তি সইতে পারবো না !'

বাবারা নিশ্বাস ফেলে বললেন, 'পারবে না তো যাবে কোথায় ? পায়ের ওপর পা দিয়ে বসে সবাই মিলে রাম রাজত্ব করে চলেছি, কত ধানে কত চাল, তা টের পাইনি। এখন কি মুটে-গিরি করতে বেরোবো ? ঠাকুর্দার সম্পত্তি নয় যে ভাগের দাবী করবো। দোষ তো তোমাদেরই ! তিন তিনটে মেয়ে মানুষে মিলে একটা মাত্র বুড়ো শ্বশুরের সেবা করছো এতটি পাওয়ার বিনিময়ে, তাতেও তাতে ঘান পড়ে, জলে ধুলো পড়ে। তা ছাড়া নিত্য অসন্তোষ করছো। ঠিক হয়েছে, যেমন কুকুর তেমনি মুগুর !'

পতিদেবতাদের এহেন সহানুভূতিহীনতায় তাদের বুকে মুগুর পড়ে, আর সেই মুগুর পড়া বুক ছুরি দিয়ে কাটতে থাকে। ধারালো ছুরি !

'আমার কুঞ্জে যাওয়া
হলনা রে সই !'

ছি ছি ছি !

ভদ্রঘরের মেয়ের মুখে এই গান ! তাও কি না লুকিয়ে মেয়ে মহলে নয়। ফুলশয্যার ঘরে বরের কাছে !···বরণী কেন বিধা হচ্ছেন না !

পরদিন থেকেই নতুনবৌ ঘরের সেবাযত্ন বুঝে নিতে থাকে। বলে, 'বৌমারা, বলে যাও বাছা তোমাদের শ্বশুর কখন কি খান।'···বলে, 'তাঁকে খাবার সময় তোমাদের আর কাছে বসতে হবে না মা ! আমিই বসবো।' বলে, 'ভাঁড়ারের চাবিতে আমার দরকার নেই বৌমা, শুধু পতি-সেবাটুকু করতে পেলেই ধন্য হবো।'

ছোট বৌ আর থাকতে পারে না।

বলে, 'তবু যদি না ঠাকুর্দার বয়সী পতি হতো !'

বৌ মাথা নীচু করে হাসে।

বলে, 'বয়সোচিতও বয়সের তফাৎ আকাশ পাতাল !'

এমনি পাকা পাকা কথা বৌয়ের।

অথচ সংসারের কাজের দিকে ঝোঁক নেই। সারাদিন চোখে সুর্মা, ঠোঁটে রং, আর আটাঘে অলঙ্কার পরে ঘরের মধ্যে বালিশ কোলে করে বসে থাকে, দুবেলা শুধু কর্তার খাওয়ার সময় মল বাজিয়ে ছুটে এসে কাছরমার পাখা নেড়ে বাতাস করে। এবং নিজে পাতে বসে চব্য চোষ্য খায়।

নতুন শাশুড়ীর যাওয়া দেখেও এরা গালে হাত দেয়। সন্দেহ নেই নেহাৎ আদেখলে ঘরের মেয়ে!

মানুষের সবই সয়।

মানুষ মানে মহাশয়।

তবু সবই কি আর সয়?

সন্ধ্যেরাত্তির থেকে মাঝ রাত্তির অবধি কর্তার শয়নমন্দিরে উপস্থিতি। আর কনে বৌয়ের হরেক রকম গান, পাগল করে তোলে এদের।

তাই কি মৃদু গান?

এপাড়া ওপাড়া তরঙ্গ তুলে গান ছোটে,

'আমি যমুনাতে জল আনিতে
যাবো কেমনে···এ!
সখীরে এ···এ···এ
পথে পা ফেলিতে
আমার, ঘরে শমনে।'

খড়দার নাতবৌ হেসে কুটিকুটি হয়ে বলে, 'তা' বাপু পাগল হওয়া তাদের অন্যায় নয়।'

'তা' নয়!' ননী বক্সি বলেন, 'ভাইপোরা পাগলই হয়ে ওঠে। নতুন জোঠির গলার সুরটা পর্যন্ত বাইজীদের মত চাঁছা ছোলা ধারালো, আর বাকী বাকী! ···এ কখনোই ভদ্রঘরের মেয়ে নয়!

ঘটক ব্যাটার খোঁজ করে, পাত্তা নেই।

হঠাৎ একদিন তিনভাইয়ের দুই ভাই যাচ্ছিল হাটের পথে, সামনে সেই ঘটক।

আর যায় কোথা। চেপে ধরলো দুই ভাই, বললো, 'গলায় গামছা মোড়া দিয়ে শেষ করবো তোকে, বল ব্যাটা কোন লক্ষীছাড়া ঘর থেকে মেয়ে এনে দিয়েছিস!'

ঘটক প্রথমে হাতজোড় করে বলে, 'আজ্ঞে বাবু মশায়রা উত্তম ঘর, নৈকষ্য কুলিনের ঘর, মেয়ে সুশ্রী সুলক্ষণা—' কিন্তু সত্যি যখন গলায় উড়ুনির পাক পড়তে লাগলো তখন প্রাণের দায়ে সত্যি কথাটা বেরিয়ে পড়ল, আজ্ঞে প্রাণে বধ করবেন না বাবু মশায়রা, বলছি···বলছি···! মেয়েই নয়, আসলে ছেলে!'

ছেলে!

ছেলে!

খড়দার নাতবৌ গালে হাত আটকে ফেলে বলে, 'ছেলে!'

ননী বক্সি বলেন, 'হ্যাঁ ছেলে! যাত্রার দলের ছেলে। দেখলে ঘরে কার সাধ্যি! বৌয়ের মন করতে ঘটকের সঙ্গে এই ষড়যন্ত্র বুঝেছো। যাত্রার দলের ওই ছোঁড়াটাও ধুরন্ধর, বলেছে, কেষ্টর রাধিকা সেজে যা পাই জমিদার বাবুর রাধিকা সাজতে তার তবল চাই কিন্তু!'

কর্তা তাতেই রাজী।

ঘটককে বলেছেন, 'ভাখ ব্যাটা, আমার মা জননীদের মাথার ওপর একটা ঝঞ্ঝাল খাণ্ডারী এনে বসিয়ে দিতে পারলেই উত্তম হতো, কিন্তু সাপ মারতে তো আর লাঠিগাছটা ভাঙতে পারিনা আমি?···লাঠি আস্ত রেখে সাপ মারার কৌশল আবিষ্কারের দরকার—।

সেই আবিষ্কারের ফল ওই যাত্রার রাধিকা। কর্তা দেখে শুনে পছন্দ করে বলেছেন, 'দেখ, তোকে সারা দিনরাত আমার গিন্নী সেজে থাকতে হবে, বৌমাদের একটু ফুটুস ফামড় দিতে হবে, আর সন্ধ্যে ভোর আমাকে উত্তম উত্তম গান শোনাতে হবে, এই তোর চাকরী! আমার মহলে মেলাই ঘর বারান্দা আছে, রাতের বেলা কোনোখানে পড়ে থাকবি, কেউ টের পাবে না।'···

যাই হোক বাবু মশায়রা, আমি একথা প্রকাশ করেছি, কর্তা মশাই যেন ঘুণাক্ষরে টের না পান। উনি আমাদের এমনি তো শিব, রাগলে ভৈরব!'

ভাইপোরা রেগে বলল, 'সব সময়ই ভৈরব!'

ঘটক বললো, 'সে কি কথা? কত আমুদে মানুষ। বললেন, 'দেখ ঘোষাল, এই উপলক্ষে বেশ একটা ভোজও লাগানো যাবে। অনেকদিন বাড়ীতে তেমন কাজ কর্ম হয়নি, গাঁয়ের লোক নির্ঘাৎ ভোজের আশায় এই বুড়োর মরণ টাঁকছে। তা' আমার ওই কচুর ভাইপোগুলো তো অ্যাঠার ছেরাদ্দর—ওঁ। · ওঁ।···ওঁ।···ছেড়ে দিন ছেড়ে দিন, আমি বলিনি কর্তা মশাই বলেছেন!'

ভাইপোরা বলে—'

খড়দার নাতবৌ অধীর হয়ে বলে, 'শেষটা কী হলো আগে বলুন মামা! ওরা বাড়ী ফিরে কী করলো?'

'ওরা?'

ননী বক্সি হেসে ওঠেন 'করবে আবার কি, অ্যাঠার সামনে টুঁ্যা ফোঁ করার সাধ্যি আছে? কীল খেয়ে কীল চুরি! বৌদের পর্যন্ত বলতে সাহস পেলনা। জানে মেয়েমানুষের পেটে কথা থাকেনা।

বৌরা বলে, 'যাই বলো, নতুন জ্যেঠির সবই কেমন বিটকেল! কিছুতে কারো সামনে চুল বাঁধেনা। ঈশ্বর জানেন পরচুল নাকি। হয়তো 'কেশবতী' ছিলেন কন্যে—।

ভাইপোরা বলে, 'হুঁ'!'

বৌরা বলে, 'ওই! ওই হলো মুস্কিল! উঃ এত পাপও ছিল আমাদের!'

বৌদের কথা শোনা যায়না, জ্যেঠশাশুড়ীর গলা বেজে ওঠে—

'আমি যমুনাতে জল আনিতে
যাবো কেমনে?
সখীরে এ···এ···এ—
পথে পা ফেলিতে
আমার ঘরে শমনে।'

ভাইপোরা বলে 'হুঁ।'

খড়দার নাতবৌ হেসে গড়ায়, 'তারপর ?'

'তারপর' ?'

ননী বক্সি হেসে ওঠেন, 'তারপর আর এক নতুন পালাগান।···একদিন কর্তার ক্ষীরের বাটিতে পিপড়ে। বাস কর্তা রেগে উঠে তরুণী ভার্যাকে এই মার তো সেই মার।···'সেবা যত্নর ঘাটতি ঘটেছে বলে তোমায় আমি ঘরে এনে, ভাত কাপড় দিয়ে পুষছি, আর এই সেবার ছিরি তোমার ? যাও ত্যাগ দিলাম !'

আসলে সবই সাজানো নাটক। ছোঁড়া আর বকলে থাকতে চাইছিল না। তবে এখন 'পালা'কে নির্খুৎ করতে পায়ে পড়ে বললো, 'আর এমন হবেনা নাথ ! দাসীরে চরণে ঠেলিবেন না !'

হরসুন্দর বলেন, 'উঁহু আমার যে কথা সেই কাজ ! ত্যাগ যখন দিয়েছি, তখন আর না ! যাও বাপের বাড়ী চলে যাও। মাস মাস মাসোহারা পাবে।··· তবে গানটা বেশ গাইতে, মাঝে মাঝে মাথার ঘোমটা দিয়ে পালকী চড়ে এসে দু পাঁচটা গান শুনিয়ে যাবে, ব্যস।·· আউটের দরকার নেই আমার। কাল থেকে সুরোরাণী আমার খাওয়া দাওয়া দেখবে।··· কী রে পারবি না ?'

সুরোরাণী একগাল হেসে বললো 'ধুর ! পাখা নাড়া আবার কাজ নাকি ?'

খড়দার নাতবৌ বলল, 'ওনা শেষ পর্যন্ত প্রকাশ তাহলে হলোনা ?'

'না না ! পুরোপুরি উদঘাটিত আর হলো কই ?' ননী বক্সি বলেন, 'জেজালের মা স্বধর্ম, 'ঢাকে ঢোলে কাঠি, উলু দিতে মানা।' ঘরে ঘরে হাসাহাসি, সামনা সামনি কাঁস নেই। কার মুখ থেকে প্রকাশ পেয়েছে ?' বলে সন্ধান যেতে কতক্ষণ ?··· অতএব কি মাসের পয়লা তারিখে গোমস্তা হিসেব লেখে, 'গিন্নীমার মাসোহারা বাবদ এতটাকা !' আর মাঝে মাঝেই জমিদারের পালকী যায় গিন্নীমাকে আনতে। পালকী দেখলেই গাঁয়ের লোক মুখটিপে হেসে বলে, 'ওই যে জমিদার গিন্নী আসছেন, কের্তন গাইতে।'

অষ্ট অঙ্গ অলঙ্কারে ঢেকে, ঘোমটার মুখ ঢেকে গিন্নী পালকী থেকে নেমেই ওপর মহলে উঠে যান, আর মাজা চাঁছা গলায় গান ধরেন;

'সখী বিরহ দারুণ জ্বালা
হানিল নিঠুর কালা,
ব্রজ ছেড়ে—
গেল মথুরায় !
বংশিল কালিয় সর্প,
ভাঙিল রাধার দর্প,
প্রাণ তার বুঝি যায় যায়।'

আর অবিশ্যি কারো বুক ছুরি দিয়ে কাটেনা, হেসে লুটোপুটি হয় বৌরা ! আর জ্যেঠ শ্বশুর হেঁকে হুকুম দেন, 'যা জননীরা খাওড়ীকে হুংকরে খাইয়ে দাইয়ে তবে ছেড়ো। গরীবের মেয়ে, দুটো ভাল মন্দ খেয়ে যাক তোমাদের ঘর থেকে।'···

শুনলি তো জেজালের গল্প ? একে বলি জেজাল।

ননী বক্সি হেসে ওঠেন।

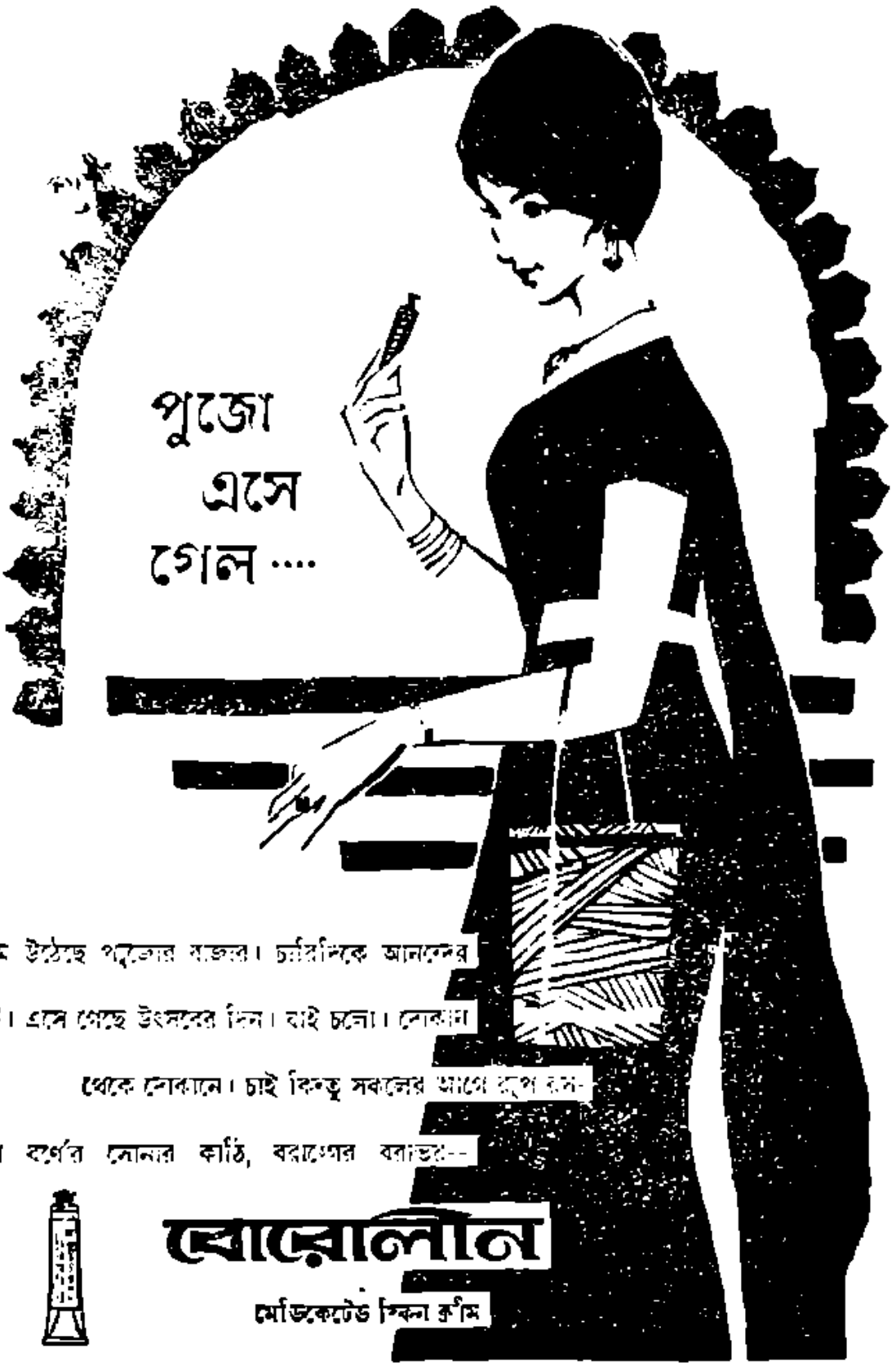

জমে উঠেছে পুজোর বাজার। চারদিকে আনন্দের হাট। এসে গেছে উৎসবের দিন। বাই চলো। দোকান থেকে দোকানে। চাই কিন্তু সকলের আগে রূপ রস-গন্ধ বর্ণের সোনার কাঠি, বরাতের বরাভয়—

বোরোলীন

মেডিকেটেড স্কিন ক্রীম

কবিকথা

সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

ভগবান তথাগত একদিন বলেছিলেন—সহকারক ভিক্ষুগৌতমি—যে পুরুষকারক আমি তোমাকে দেখেছি,—তাহার মধ্যে দেখেছি, দুঃখের মধ্যে দেখেছি, অনিত্যের মধ্যে দেখেছি—সেই পুরুষটের সকল পঙ্কজে ভেঙ্গে দিয়ে তোমায় দেখতে চাই সম্যকের বোধিতে। একদিক থেকে দেখতে গেলে এ শুধু মহাসাধকের কথা নয়, কবিমনীষিদেরও কথা। আমি দেখবো, আমি জানবো, আমি বুঝবো, আমি রস উপলব্ধি করবো, আমি এক আমি বহু হবো, সৃষ্টিকে করবো আত্মসাৎ, জগন্নাথস্বামী, তুমি দেখা দাও, নয়নপথগামী হও—

গগনের গালে রবিচন্দ্রদীপক জ্বলে, তারকামণ্ডল চমকে মোতিয়ে আসল রবীন্দ্রনাথ ত সেইখানে, তিনি দেখছেন, তিনি শুনছেন—জল পড়ে, পাতা নড়ে, বিস্ময়ে তাঁর প্রাণ জেগে ওঠে। তাই কবিকে দেখতে গেলে জানতে গেলে শুধু তাঁর কাব্যে গানে, সাহিত্যেই পাবনা, পাবো আরো গভীরে, তাঁর জীবনের সামান্যতম ছন্দেও, তাঁর পরিচর্যার প্রতিটি রেণুতে। তাই 'মানুষ' রবীন্দ্রনাথ কবি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে একাত্মীভাবে জড়িত। অবশ্য তাঁর দিকে চেয়ে আমাদের বিস্ময়ের সীমা নেই—সর্বসিদ্ধিদায়িনী ভাষা তিনি দিয়েছেন ছন্দোবদ্ধ অপূর্ব কাব্য তিনি দিয়েছেন, কিন্তু শরৎচন্দ্র যা বলেছিলেন, তাঁর সবচেয়ে বড়ো দান যে তিনি আমাদের মনকে বড়ো করে দিয়েছিলেন। জলধর সেন একদিন বলেছিলেন যে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে যা কিছু বলা হয় সবই যেন এর বাহ্য—আগে কহ আর।

আমাদের পরম সৌভাগ্য যে আমাদেরই জীবিতকালে তিনি কিছুকাল সমকালীন ছিলেন, তাঁকে আমরা দেখেছি, তাঁর কথা আমরা শুনেছি, তাঁর বিশ্বাস ও আশ্বাস, তাঁর স্নেহ ও ভালোবাসা পেয়েছি তবু সেটা হচ্ছে দূর থেকে একটা অনন্তলিঙ্গ তুঙ্গার কিরীটি দেবতাকে দেখা, যেন তুঙ্গী ত্রিমূর্তিনারায়ণ দাঁড়িয়ে রয়েছেন

ঠাঢ়ি রহো মেরা আঁখনকা আগে

থাকে প্রণাম করা চলে, যেখানে হাসিকান্না হীরাপান্নার মতন ঝুরে যায়। তবু আজও এমন জ্ঞানীগুণী রবীন্দ্রমনস্বীরা বেঁচে আছেন যাঁরা কবির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছেন, মেলামেশা করেছেন, তাঁকে দেখেছেন, সঙ্গ পেয়েছেন, সঙ্গ দিয়েছেন। সাহিত্যের আবরণ খসিয়ে, ধ্যানের নৈঃশব্দ ঘুচিয়ে, কল্পনা ও অলংকার বুহিয়ে, মননের জটিলতা দূর করে, দার্শনিক কুহেলির অন্তরালে এমন কি গানের ওপারে দাঁড়িয়ে আছেন যে রসিকরঞ্জন গায়ক পুরুষটি তাঁর কথা আরো আরো শুনতে ইচ্ছে করে—টুকরো টুকরো ছড়ার বা গল্পের মত যা ছড়িয়ে আছে আশী বছরের বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে, মুনিমুক্তোর মত জলমল করে।

তারই দুএকটি যা শুনেছি বা পড়েছি উদাহরণস্বরূপ নীচে দিলুম, অতিরঞ্জন বা অতিভাষণের দোষ থাকলেও, কারণ প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিতে পারবোনা। তবে আজও আছেন ডাঃ কালিদাস নাগ, ডাঃ সুনীতি চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত প্রশান্ত মহলানবীশ, প্রভাত মুখুয্যে, সৌরীন মুখুয্যে, কেদার চট্টোপাধ্যায়, দিলীপ রায়, অমল হোম (এখন অসুস্থ), সৌমেন্দ্র ঠাকুর, শ্রীমতী প্রতিমা দেবী, নির্মলকুমারী

মহলানবীশ, সীতা দেবী, শান্তাদেবী, মৈত্রেয়ীদেবী এবং আরো বহু শ্রদ্ধেয় এবং শ্রদ্ধেয়ারা, যাঁরা এ বিষয়ে বহু খণ্ড খণ্ড প্রসঙ্গ আমাদের দৃষ্টিগোচর করেছেন এবং আশা করছি ভবিষ্যতেও করবেন। 'গল্পভারতী' এই অবশ্য কর্তব্য ভারটির সূচনা করেছেন মনীষিদের জীবনীর টুকরো টুকরো কথা তুলে দিয়ে। তাঁদের সাধুবাদ দিই। সাধারণ মানুষের কাছে তাত্ত্বিক বা পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনার চেয়ে এই সব ছোট ছোট কাহিনীরই (ভরসা রাখতে হবে সেগুলি যেন আজগুবী বা অতিরঞ্জিত না হয়) মূল্য বেশী।

এ যেন কবির ভাষায়—

নতুন নামে ডাকবে মোরে
বাঁধবে নতুন বাহু ডোরে
আসব যাব চিরদিনের সেই আমি

স্বদেশীযুগের সময়—নাটোরের মহারাজার কন্যার বিবাহ—মহারাজ বললেন—কবি, আমার কন্যাদায় কোথায় আপনি সকাল সকাল আসবেন, তা না এতো দেরীতে এলেন। কবি উত্তর করলেন —রাজন্, আমার মাতৃদায়, দুজায়গায় সভা করে আসতে হ'ল।

নাট্যনিকেতনে গোরার অভিনয় হচ্ছে—কবি উপস্থিত, বললেন—অবিনাশ ও হলধর যে গানটি গাইলে, সে গানের সবটা কি আমার লেখা? খবর পাওয়া গেলো, গোড়ার ছ লাইন কবির, পরের ছ লাইন যোগ করে দেওয়া হয়েছে। কেমন হয়েছে তার—খাসা—কবি বললেন।

স্ত্রীকে চিঠি লিখছেন—রাত্রে বৈঠকখানায় শুয়েছিলাম, একটা কাঁকড়া বিছে কামড়াল। অদ্ভুত যন্ত্রণা! তখন মনে মনে ভাবলুম, যাকে কামড়েছে সে অন্য এক রবিঠাকুর, আমি নই। যন্ত্রণা চলে গেল, আমি ঘুমিয়ে পড়লুম। গীতালীতে চারিটি কবিতা আছে—পাখি তুমি পাখিমনের সখা হে, জীবন আমার যে অমৃত—সুখের মাঝে তোমায় দেখেছি, পথের সাথী নমি বারংবার—দেখা মাকি অসুর কন্যাকে নিয়ে স্টেশনে যেতে যেতে। অবশ্য মৃত্যুর সঙ্গে বেদনার সঙ্গে কবির পরিচয় সাধকের অনুভূতি দিয়ে। দুঃখের আঁধার রাত্রিই যে তোমার সৃষ্টির পথ। সাহিত্য তাইতো দৈববাণী। কাব্যের জগৎ সৎও নয়, অসৎও নয়। অপূর্ব বস্তু নির্মাণ করা প্রজাপতি যে তার নিদর্শন।

আবার দেখি—ব্রাইটন, কাল ১৮৭৯ কবির মেজবৌঠানের হাতে কত, ব্যাতেজ বাঁধা, চুল বাঁধা কেশপাশ অনাদরে বিস্রস্ত। তাঁর সপ্তদশবর্ষীয় দেবর ছিল কাছে, সে বৈজ্ঞানিক নয়, সে কবি। ছন্দোবন্ধনে তার অভিজ্ঞতা ছিল এই আশ্বাসে বউঠাকুরাণী তাঁর বেণীতে হস্তক্ষেপ করতে অনুমতি দিয়েছিলেন। যা ফল হয়েছিল সেটা গীতিকাব্যের মত সুঠাম নয়, কতকটা মডারন্ কবিতার মতো। চুল বাঁধা যেমনি হোক্, খোলা শক্ত হয়েছিল এই মনে আছে, মডারন্ কবিতা বোঝা যেমন শক্ত। কবি নিজেই একথাগুলি বলেছেন তাঁর এক চিঠিতে, সঙ্গে একটা ছড়াও লিখে দিয়েছিলেন—

মন উড়ু উড়ু চোখ ঢুলু ঢুলু ম্লানমুখখানি কাঁদুনিক্
আলুথালু ভাষা, ভাব এলোমেলো, ছন্দটা নির্বাধুনিক্।
পাঠকেরা বলে এতো নয় সোজা
একটি বর্ণ যায় না যে বোঝা
কবি হেসে কন, তাহার কারণ আমার কবিতা আধুনিক

আমরা কিন্তু একজন আধুনিক কবির ভাষাতেই বলবো—

করবী ঘেরিয়া সখি ফুটিয়া উঠিয়াছিল মল্লীমুকুল মধুগন্ধা বেণুলতার মতন।

আর একদিনের গল্প—রাত্রে পৌঁছলেন হাওড়া স্টেশনে (১৩২৮ সালের আশ্বিন) বোলপুর থেকে। "এসে শুনি হাওড়া ব্রিজ খুলে দিয়েছে, সবে স্টেশনে এসেছে, একটা নৌকা এসে আমাকে আড়কোলা করে তুলে নিয়ে চললো। নৌকোর কাছে এসে আমাকে শুদ্ধ কাদায় হুটোপুটি……গঙ্গামৃত্তিকায় লিপ্ত এবং গঙ্গাজলাভিষিক্ত হয়ে নিশীথ রাত্রে পৌঁছনো গেল। গঙ্গাতীরে বাস তবু ইচ্ছা করে বহুকাল গঙ্গাস্নান করিনি—ভীষ্ম জননী ভাগীরথী সেই রাত্রে তার শোধ তুললেন।"

সেকালে ওঁদের জোড়াসাঁকোর খামখেয়ালী সভায় গল্প বলেছেন স্বয়ং অবনীন্দ্রনাথ। সভার নমুনা দিচ্ছি—

স্থান—জোড়াসাঁকো। নিমন্ত্রণকর্তা—শ্রীসরেন্দ্রনাথ ঠাকুর। অনুষ্ঠান—শ্রীগগনেন্দ্র নাথ কর্তৃক 'অরসিকের স্বর্গপ্রাপ্তি' আবৃত্তি। শ্রীরবীন্দ্রনাথ কর্তৃক 'ক্ষুধিত পাষাণ' ও 'নামঞ্জুর' নামক গল্প পাঠ। গোসাইজীর গান ও তাঁহার দ্বারার সঙ্গত। গীতবাদ্য। আহার। ধূপ ধূনা রত্নচৌকি সহযোগে তাকিয়ে আশ্রয় করিয়া রেশমবস্ত্র মণ্ডিত জলচৌকিতে জলপান।

ডি, এল্, রায়ের পূর্ণিমা সম্মেলনের একটি নিমন্ত্রণে এক কবি আর এক কবিকে আমন্ত্রণ করছেন—

আমাদের এই সাদু মজলবে
রবিবাবু আপনার যোগ দিতে হবে

তাছাড়া সেকালের "বিদগ্ধজন সমাগমের" কতো গল্প, 'বিচিত্র সভার' কতো কাহিনী ইতস্তত: ছড়ানো আছে। কিশোর রবীন্দ্রনাথ গান গাইছেন পিতার সামনে ডালহৌসীতে বক্রোটার শৈল শিখরে এ ছবি আমরা দেখেছি, শুনেছি তিনি ঐ "বিদুষজন" সমাগমেও গান গাইতেন "ও আমার গোলাপবালা"। আবার এও শুনেছি যে তিনি 'আমায় বলো না গাহিতে গান' এ গানও শুনিয়েছেন।

আবার পড়ি, কবি বলছেন, রবীন্দ্রোত্তর কাব্য কী—না, রবীন্দ্রধুত্তোর কাব্য'। আরো পড়ি—আহা, শুনলেও রোমাঞ্চ হয়,…শান্তিনিকেতনে আমার নাকি একটা কাচের ঘর আছে, রাত্রিবেলায় শুয়ে থাকি সেখানে—রাতের তারা দেখা আমার খেয়াল। ভোর বেলা সুস্বরী মেয়েদের গান শুনে আমার ঘুম ভাঙে—আর স্নানের আয়োজন—সোনার গামলায় জল ভাঙে আতর থাকে ১০০৲ টাকা ভরি আর ডালিম বেদানা খাই বলে রং অতো ফরসা আর রোজ খাবার পর একটু স্প্যানিশ ওয়াইন…স্পার্কলিং বার্গণ্ডি—হা হতোস্মি—শেষকালে কিনা চানডুমড়া রস।

তিনসঙ্গীর ল্যাবোরেটরীতে আমরা পড়ি আগামী ভাবের কথা, অনেকেই জানেন না যে এর কিসটা পড়েছে কোথায়—চক্রবৈঠক সেকের ধারে আজও বসে, আমিও তার সুসভ্য সদস্য একজন, কবি ঠাট্টা করে এঁদেরই লক্ষ্য করে বলেছিলেন—হে স্বাতন্ত্র্যকালনরগণের সারথি, হে ছিন্ন সৃজন পরিকীর্ণ পথের অগ্রণীবৃন্দ—ইত্যাদি।

পরশুরাম সম্বন্ধে লিখলেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রকে—আপনার রাসায়নিক বন্ধুটিকে বলবেন মাসিক পত্র বলে যে সব জীবাত্মা হয়ত বা সাহিত্যসেবী হতে পারত তুলতীর বাঁটে তাদের অঘটিত সম্ভাবনার প্রেতগুলির সঙ্গে আপনার মোকাবিলায় পালাগুলি যেন তিনি রচনা করেন…আমি হস ঘাচাইএর

বিবেক

শক্তিপদ রাজগুরু

যাত্রার দল এসে পৌঁচেছে।

সারাগ্রামে সাড়া পড়ে গেছে। ছোট গ্রাম—বৎসরান্তে ক'দিনের জন্য জমে ওঠে শালবনের সীমার বাইরে গ্রামখানা। একটা লাল কাঁকুরে রাস্তা বনের দিক থেকে এসে এইখানেই মন্দিরের সামনেই শেষ হয়েছে।

একটু আগেই লালডাঙ্গার মধ্যে হাসপাতাল, হাসপাতাল নামেই। ছোট ছোট কয়েকটা টিনের শেড একদিকে ডাক্তারের কোয়ার্টার, ওপাশে ইস্কুল, বোর্ডিংও আছে।

রাস্তাটার দুদিকে এই ক'টা দিন লোকান পশার বসে, ডাক্তার বসে সার্কাস। যাত্রার গানও হয় দুরাত্রি। বাবা রক্তনেশ্বর শিবের গাজন এবার বেশ জেঁকেই উঠেছে।

মহীতোষ নোকুন এসেছে স্কুলের হেডমাষ্টার হয়ে। ইতিমধ্যে সেও এখানের গ্রামীণ সমাজের সঙ্গে মিশে গেছে। ক'দিনের জন্য খালি বোর্ডিংএই উঠেছে যাত্রার দলের অধিকারীরা।

কলকাতার দল, এদিক ওদিক টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে, আজ রাতে এখানে একপালা গেয়ে আবার ছুটতে হয় তাদের অন্যত্র, দাঁড়াবার সময় নেই।

মুখে গালে রংএর আবেমোছা দাগ, ক্লান্ত পরিশ্রান্ত চেহারা; সঙ্গে এক একটি ছোট পুটলির মত বিছানা, আর সাজের বাক্স।

···ছেলেরা ভিড় করে দেখছে।

মহীতোষও দাঁড়িয়েছিল, তদারক করছিল ওদের থাকার জন্য ঘরদোর সাফ আছে কিনা, কুয়োর দড়ি বালতি ঠিক রয়েছে কিনা।

ক্লান্ত লোকগুলো নামছে, ছেলে যুবক প্রৌঢ় অধোবয়সী সব রকমই আছে।

এদের মধ্যে কেউ কেউ আবার কুলীন, কেউ বা বংশজ আবার কেউ বা তাদের থেকে অনেক নীচে। লোকজন টহলী রসুইদার আসর সজ্জাকর সবাই আছে। একটা ছোটখাট পাঁচমিশেলী জনতা বলা যায়।

একজন ম্যানেজারই যেন বোধ হয় চারিদিক চরকীর মত ঘুরে সব ব্যবস্থা করছে। যাত্রাদলের রাজা উজীরদের জন্য ঘরের ব্যবস্থা হয়ে গেল, বাকী সবের ব্যবস্থা হ'ল হলঘরে। টানা ঘাসে পাতা হয়েছে সেইখানেই গড়ান দেবে তারা।

ম্যানেজারবাবু মহীতোষের সঙ্গে ইতিমধ্যে বেশ আলাপ জমিয়ে নিয়েছে।

—আপনিও মশায় কলকাতার লোক? নইলে আজ পাড়াগাঁয়ে মানুষের মান যাতির বোঝে? আমো বৌবাজারে থাকি—থাকা আর হয় কই বলুন, এই দেশদেশান্তরে খলরদারী করেই দিন কাটাচ্ছি, একেই বলে বরাত।

ওদিকে রান্নার ব্যবস্থা হয়ে গেছে।

সঙ্গে ঠাকুর চাকর বাসনপত্র সবই আছে।

ম্যানেজারবাবু! আমার খোরাকিটা—

চেঁচিয়ে ওঠে ম্যানেজারবাবু। মহীতোষ চমকে ওঠে। একটুকু সময়ের মধ্যে মানুষ যে বেমালুম এমনি সাংঘাতিক বদলে যেতে পারে তা কল্পনাই করেনি। গর্জন করে ওঠে—

—কাজের বেলায় নেই খোরাকি ওর রোজ চাই। বলেছি তো দল ছেড়ে দাও। তুমি বাঁচো আমি ও বাঁচি। যাও। এখন খোরাকি জলপানি হবে না।

মহীতোষ লোকটার দিকে চেয়ে থাকে। ধাক্কাটা খেয়ে বেচারার মুখ কালো হয়ে গেছে। কোটরাগত চোখদুটো ছলছল করে ওঠে। মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে আছে।

পরনে একটা আধময়লা পায়জামা আর পাঞ্জাবী। এককালে আদির পাঞ্জাবীই ছিল, হাতের উপর—বোতামের ঘরের দুই পাশে চিকণের অধুনাবিবর্ণ কাজ; কাঁধের কাছটা ঘামে ভেজে বিবর্ণ হয়ে কোঁসে গেছে। এককালে ওর মালিক যে বেশ সৌখীন এর চেয়ে অনেক ভালো অবস্থায় ছিল তা বেশ বোঝা যায়।

লোকটা মাথা তুলে একবার চাইবার চেষ্টা করে। মহীতোষ ওকে দেখছে, ফর্সাই ছিল—ভাগর দুটো ভাষাহীন চোখের চাহনিতে কি অসহায় বেদনা ফুটে ওঠে।

হঠাৎ মহীতোষের সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে যেতে সেও ওর দিকে চেয়ে থাকে! হঠাৎ সেই নীরব মুখে বেদনা আর নীরব ভাষার আভাস ফুটে ওঠে। ম্যানেজার ধমকে ওঠে,

—গেলে এখান থেকে?

লোকটা সরে গেল কোন কথা না বলে।

মহীতোষ ওর গতিপথের দিকে চেয়ে থাকে। ওই পাঁড়ুর মুখ অসহায় চাহনি ওই গতিভঙ্গী কেমন যেন মহীতোষের খুব চেনা চেনা বলে বোধ হয়। ম্যানেজার তখনও গজগজ করে চলেছে।

—মরণও হয় না আপদের। যত ঘাটের মড়া এসে জোটে এইখানে। ওদিক দলের মূল অভিনেতা, কর্তাব্যক্তিদের জন্য চা জলখাবারের আয়োজন করতে হবে। ম্যানেজার চলে গেল।

—পরে দেখা হবে মাষ্টারমশাই। নমস্কার। আসরে যাচ্ছেন তো? মাথা নাড়ে মহীতোষ। যাবে সে।

সহর থেকে অনেক দূরে প্রায়ান্ধকার এই গ্রামের স্কুলে আজ মহীতোষ মাষ্টারী নিয়ে এসেছে কিন্তু অতীতের তার স্বপ্ন ইতিহাস ছিল স্বতন্ত্র।

কলেজে পড়বার সময় থেকেই বন্ধুবান্ধবদের আড্ডার জমতো, মাঝে মাঝে কফি হাউস, ইউনিভারসিটি লাইব্রেরী না হয় গোলদীঘির ধারে আড্ডা জমতো।

সাংস্কৃতিক চেতনা আর সমাজ নিয়ে অনেক কথাই উঠতো। ওদের দেখে সেই বহুদিনের কলকাতার কথা মনে পড়ে, কেমন যেন একটা অতীত স্মৃতির মত। আজ সেই আলো ঝলমল জীবন। সেই আনন্দ স্বপ্ন থেকে সে নির্বাসিত হয়ে গেছে। বন্ধুবান্ধবরা আর কে কে সেখানে টিকে আছে তা ও জানে না।

বৈকালের বাড়ন্ত আলো শালবন সীমায় হলুদ সোনা রোদের আভাস এনেছে। এদিক ওদিকে ছড়ানো মেঘগুলো নানা রংএর তুফান তুলে আসমানে হারিয়ে যায়। ওরা যেন সেই স্মৃতির আকাশে আজ সাড়া জাগিয়েছে।

চেনা চেনা মুখ। পাঞ্জাবী পরা সেই লোকটাকে কোথায় যেন দেখেছে।

হাতে সিগারেটের টিন, পায়ে সাদা চটি, পরণে কর্ডাদার চিকণের কাজকরা দামী পাঞ্জাবী, আলো আর গান সুর কত মুগ্ধ জনতা সব মিলিয়ে একটা ছবি মনে ভেসে ভেসে আসে।

কিন্তু আজকের দেখা সেই মূর্তির সঙ্গে কল্পনা করতে পারে না, কোন পরিবেশেই এই মানুষটাকে মিশে গিয়ে ফেলতে পারে না।

সন্ধ্যার অন্ধকার নামে। ওই শালবনসীমা, লাল কাঁকুরে ডাঙ্গা, পাখীডাকা নিস্তব্ধ কোথায় হারিয়ে যায়। তবু মনে পড়ে আজ মহীতোষের অতীতের সেই হারানো দিনগুলো।

দুর্বাকেও ভোলেনি সে, জীবনের অনেক স্মৃতির সঙ্গে জড়িয়ে আছে একটি নাম, গানে বর্ণ তার রং—দুচোখে বিস্তৃত হলুদ ঘাসবনের ঝাউশিমা আর পাখীর ডাক মেশা কোন সুর।

ওদের বাড়ীও প্রায় যেতো মহীতোষ, কলেজের মধ্যে এ নিয়ে কথা হতো, বন্ধুরা মন্তব্য করতো—

—দুর্বা গায় ভালো,

কে যেন ফোড়ন কাটে চায়ের টেবিলে,

—দেখতেও মন্দ নয়। হাজার হোক মহীর চয়েস্ আছে বলতে হবে।

কয়েকটা বছর কি যেন একটা স্বপ্নের মধ্যে কাটিয়েছিল মহীতোষ। দুর্বা বি-এ পাশ করেই পড়া ছেড়ে দিয়েছিল। বলতো,

—গানই আমার সব।

মহীতোষ দেখেছিল দুর্বাকে। অনেক স্বপ্ন কল্পনাও করেছিল তাকে কেন্দ্র করে। তারা দুজনে ঘর বাঁধবে। সুখী হবে।

কিন্তু দুর্বার দিক থেকে সেই সাড়া ছিল না। সে মেতেছিল তার গান নিয়ে। সন্ধ্যার পর কোন কোন দিন যেতে। দুর্বাও এসেছে বাইরের ঘরে।

মহীতোষ নীরব দৃষ্টি মেলে ওর দিকে চেয়ে থাকে। অনেক কথা বলবে বলেই এসেছিল। কিন্তু সব যেন ওর সামনে এসে হারিয়ে যায়। বলে ওঠে দুর্বা,

—গানের মাষ্টার মশাই এসেছেন। আমি যাচ্ছি।

অর্থাৎ আজ সে এড়িয়ে গেল মহীতোষকে। চুপ করে একাই দাঁড়িয়ে আছে মহীতোষ। বন্ধ দরজার ওদিক থেকে একটা সুর উঠছে অচেনা কণ্ঠস্বর। তবু কেমন যেন মধুর—একটা স্বপ্নময় সেই সুর। মহীতোষ মন্ত্রমুগ্ধের মত দাঁড়িয়ে আছে।

ওই বলিষ্ঠ মাধুর্যমণ্ডিত সেই সুরটার পাশে পাশে দুর্বার সুরেলা গলার বিস্তার চলেছে। কেমন রোদ আর ছায়া দুটো মিলে একটা নিটোল আনন্দময় সেই স্পর্শ।

এই মধুজগতে তার ঠাঁই নেই।

সেই সন্ধ্যায় মনে হয়েছিল মহীতোষের দুর্বার তুলনায় সে অনেক নিঃস্ব ; তার কোন সম্পদ নেই যা দিয়ে দুর্বার শিল্পী মনকে সে পূর্ণ করে দিতে পারে।

মহীতোষ আজ অনেক ক'বছর আগেকার কথাগুলো অকারণেই ভাবে। কি যেন একটা হারানো সূত্র ধরে আবার সে অতীতের সেই স্বপ্নজগতে ফিরে গেছে জানেনা।

—মাষ্টার মশাই আসরে যাবেন না ?

সেকেণ্ড মাষ্টার হরষিত বাবুর ডাকে একটু চমকে ওঠে মহীতোষ।

রাত হয়ে গেছে। মেলায় জ্বলে উঠেছে ডেলাইট, পাকলাইটগুলো। নানা কলরব কোলাহল ওঠে হাজারো কণ্ঠের।

গরুর গাড়ীতে করে দলে দলে মেয়েছেলে লোকজন আসছে। সার্কাস দলের তাঁবুর সামনে ভিড় জমেছে। ওদের বাজনার শব্দ ওঠে।

মহীতোষ এসব পরিবেশ থেকে কোথায় কোন অতীতের মধ্যে হারিয়ে গিয়েছিল।

যাত্রার দলের আসামীরা যাচ্ছে মেলার আসরের দিকে। সাজের বাক্স চলে গেছে আগেই। ঘরপাতিও যাচ্ছে।

হঠাৎ আবছা আলোয় সেই ভদ্রলোককে থামতে দেখে চাইল মহীতোষ। একফালি হারিকেনের আবছা পড়েছে ওর শীর্ণ মুখে—নাকটাই সার। পরণে সেই পাঞ্জাবী পায়জামা, টিকটিকে গলায় বিবর্ণ একটি মাফলার জড়ানো। মাথায় উস্কোখুস্কো চুলগুলো একটু সামলাবার চেষ্টা করেছে মাত্র।

ওর চোখে চোখ পড়তেই লোকটা সরে গেল।

মহীতোষের মনে হয় ও তাকে চিনেছে। কেমন ইচ্ছে করেই তাই এড়িয়ে গেল। সরে গেল মহীতোষের কাছ থেকে।

তার পরিচয়টা জানতে দিতে চায় না। নিজেকে অপরিচয়ের অন্ধকারেই রাখতে চায়।

মহীতোষ যেন অকূল নদীর স্রোতের বিরুদ্ধে সাঁতরে তীরে ওঠবার বৃথা চেষ্টা করছে। ঠিক কিনারা পায় না। ধার ছুঁয়ে ছুঁয়ে কেমন স্রোতের টানে আবার ভেসে চলেছে।

ওই লোকটাকে কোথায় যেন দেখেছে! যাক্ গে।

তবু ওর জন্ত কেমন দুঃখ হয়। এই পরিবেশে যে অবস্থায় রয়েছে তা মোটেই যে সুবিধার নয়—এটা বেশ বুঝেছে মহীতোষ। সারাদিন হয়তো খাওয়া জোটেনি—কি হয়তো অপরাধ করেছে তাই আজ খোরাকিও জুটবে না। এদলে নেহাৎ অবাঞ্ছিতের মত পড়ে আছে। অন্তত্র গেলে আশ্রয়ও জুটবে না। তাই শত অপমান লাঞ্ছনা সয়ে এই অপেরাতেই রয়ে গেছে।

মুখে চোখে সেই নীরব বেদনার ছায়া।

ওই বেদনাকাতর দৃষ্টিটি ভোলেন নি মহীতোষ। ভোলা যায় না। ওর চোখে কোথাও অন্ত দৃষ্টি সে দেখছিল। দেখছিল ওর মুখ চোখে অন্ত কোন আশাময় জীবনের স্বপ্ন। আজ ওর ছন্নছাড়া-ভাবটাকে মেনে সহজ। তাই হয়তো চিনতে পারছে না।

শত হৈচৈ দারিদ্র্য অপমান সব মুছে গেছে। লাল শালু দিয়ে মোড়া আসরের খুঁটিগুলোর মুখের তোড়া টাঙ্গানো হয়েছে। চারিদিকে বসেছে যন্ত্রীর দল—অধিকারী মশায় স্বয়ং। দুজন হারমোনিয়াম, ঢোল কর্ণেট ফ্লুট এর সমবেত সুর ওঠে।

রাতের আঁধারে ফুটে ওঠে কোন অতীতের সুখ সমৃদ্ধ রাজ্যের ছবি। রাজার ভুলেই সব যেন ছত্রখান হয়ে যায়।

…রাজ্য গেল সম্পদ গেল।

একটা করুণ সুর ওঠে বেতালায়।

…তার সঙ্গে ধীরে ধীরে ভেসে আসে একটা কণ্ঠস্বর। সুরেলা গলাটা রাতের আঁধার স্তব্ধে তুলেছে—উঁচু পর্দায়। উঠছে ধীরে ধীরে। …দা' থেকে একটি ধাপ উঠছে। গলাও যেন ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলেছে পঞ্চমের দিকে।

আসর শুদ্ধ মন্ত্রমুগ্ধের মত হয়ে গেছে।

চমকে ওঠে মহীতোষ।

এ স্বর তার চেনা!…হাঁ!…এইবার তার অকটা মিলেছে।

ওই গায়ককে সে চেনে! কিন্তু এখানে তাকে দেখবে কল্পনাও করেনি।

ওকে দেখেছে কলকাতায়, অনেক আসরে ওর গান শুনেছে। সেদিন ও ছিল আরও অনেক সুন্দর ; যৌবনের ছোঁয়া ছিল ওর দেহে। কণ্ঠে ছিল অফুরান সুর। সুরের সেই মায়া আজ অনেক কমে গেছে। যা আছে তা অতি সামান্য, কণামাত্র।

দুর্বাদের বাড়ীতেই প্রথম দেখেছিল তাকে। দুর্বা ওর কাছেই গান শিখতো। মহীতোষের মনে পড়ে ওই সুরের মাধুর্যে সেই অতীতে মহীতোষও কোথায় হারিয়ে গিয়েছিল।

কাশছে লোকটা!

…গানের দীর্ঘ তানে আর সাপট মারবার ক্ষমতা তার নেই, মাঝে মাঝে দু একটা পর্দা বেসুর বাজে, বেহালা আর ফ্লুট ওয়ালা সেই ফাঁকটাকে ঢাকবার জন্য চেষ্টা করছে।

দলের ম্যানেজার মুখ কঠিন করে, ঘনঘন দৃষ্টি মেলে লোকটার দিকে চাইছে।

মহীতোষের মনে হয় হাঁপাচ্ছে লোকটা। দম রাখবার ক্ষমতাও তার নেই। তালে লয়েও বেসম্ ঠেকছে। কোনমতে গেয়ে বের হয়ে গেল।

মহীতোষ স্তব্ধ হয়ে বসে আছে। চোখের সামনে দেখেছে তিলেতিলে ওই মানুষটার অপমৃত্যু। জীবন ওকে একদিন অনেক দিয়েছিল, রূপ, কণ্ঠ, সুর সব কিছুই।

দুর্বাও ওকে ভালবেসেছিল, তাই বোধহয় মহীতোষও সরে এসেছিল সেদিন অনেক বেদনায়।

কিন্তু আজ!…জীবন ওর সবকিছু কেড়ে নিয়ে নিংড়ে ছোবড়া করে পথের ধারে ফেলে দিয়েছে। পরে শুনেছিল দুর্বার নাকি অন্য কোথায়, ভাল পাত্রে বিয়ে হয়ে গেছে।

কি ভেবে উঠে গেল মহীতোষ। আসরে তখন ঐক্যতান বাদন চলছে।

আঁধার আলো ঢাকা তেঁতুল গাছের নীচে একটা লম্বা চালায় সাজঘর হয়েছে। বাইরে কতকগুলো বাঁশ গাছের ঝটলা আয়গাটাকে অন্ধকার করে রেখেছে। ওরই মাঝে ছিটকে এসে পড়েছে হেজাকের এক ফালি আলো।

…চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে লোকটা। হাঁপাচ্ছে তখনও। গলাটা খুসখুস করছে। দীর্ঘ মুকটা হাপরের মত ওঠা নামা করছে। আজ সারা মনে তার হতাশার অন্ধকার। মাথায় সেই বিবেকের বাধনটাও নেই, কপালের টিপটা মুছে ফেলেছে।

দলের ম্যানেজার আজ শেষ কথা শুনিয়েছে তাকে, চরম অপমানই করেছে। সাফ জবাব দিয়েছে তাকে কাজ থেকে।

—এসব গান চলবে না। গাইতে পারবে না—তবু গাওয়া কেন?

বিবেকের পার্ট এই সিন থেকে করবে বাবাজি। তুমি সাজ-বেশ খুলে—এইবার আমা দাও দিকি।

মহীতোষ ঠিক শোনেনি কথাগুলো, জানেনা সে একদিন যার এত নাম ডাক ছিল কলকাতার আসরে কলকাত্তেলে পেয়েছে পাকা ওস্তাদের মত দুরুহ রাগ ঠুংরী সে আজ জীবনের শেষ অবলম্বনটুকুও হারালো।

…ঠায় দাঁড়িয়ে আছে পদচ্যুত বিবেকরূপী সেই বাতিল বাদ্যযন্ত্রটা, মুখে পড়েছে একফালি আলো, কেমন মধুর ছায়া নেমেছে তাতে।

আজ তার সব হারিয়ে গেছে। হারাতে সুরু করেছে সে অনেকদিন আগে থেকেই, কোন নারীকে অনেক আশা নিয়েই বিয়েতে চেয়েছিল,…সেদিনের খ্যাতিমান গায়ক ক্রমশঃ সব হারাতেই সুরু করেছে।

জীবনের সে সব আনন্দমুখর স্বপ্নময় কতদিন সব হারিয়ে গেছে। আজ কোথাও কোন পথ নেই দুর্বার লজ্জায় ঘৃণায় মহানগরের জীবনকে সে ছেড়ে আঁধারে সরে এসেছিল অপরিচিতের ভিড়ে বাঁচতে চেয়েছিল তার সব বেদনা ব্যর্থতা গোপন করে।

তাও বাঁচতে পারেনি সে।

—মাষ্টার মশাই!

হঠাৎ লোকটা চমকে ওঠে। এককালে ওই ডাক তার অতি পরিচিত ছিল, অনেকে ডেকেছে ওকে ওই নামে; কত সুর স্মৃতি মিশানো সেই ডাক।

একফালি আলোয় সে মহীতোষের মুখের দিকে চেয়ে থাকে একটুখন! মহীতোষকে যেন চিনেছে সে। মহীতোষ বলে ওঠে—

—কলকাতায় শ্যামপুকুরের দুর্বাকে গান শেখাতেন—ওদের বাড়ী যেতাম। সেদিন কি চমৎকার গানই না শুনেছি আপনার কাছ থেকে।

লোকটা কথা বললোনা। মহীতোষ ওর জরাজীর্ণ চেহারার দিকে চেয়ে থাকে। কাশছে লোকটা থক্ থক্ করে। বেশ জানে মহীতোষ—ওর আজ খোরাকিও বন্ধ হয়ে গেছে। ম্যানেজার ওকি সব আবার শুনিয়ে গেছে।

একটি লোক—সেদিন কত আশার আলো দেখেছিল তার মুখে ওর কথায়, আজ সে সব নিঃশেষে হারিয়ে গেছে।

মহীতোষ অবাক হয়। আসরে গান সুরু হয়েছে। বিবেকের গান। কিন্তু এ অন্ধ বিবেক। বেশ বুঝেছে মহীতোষ ওর অবাধ হয়ে গেছে।

সাজগোজ খুলে ওকে আজ বাতিল করে দিয়েছে ম্যানেজার। মাইনে খোরাকী সব বন্ধ হয়ে গেছে।

লোকটি আঁধারে বাসার দিকে ফিরছে, মহীতোষের মনটা খারাপ হয়ে যায়।

—শুনছেন ?

দাঁড়াল লোকটি মুখচোখে একটি কাঠিন্য ফুটে উঠেছে তার। মহীতোষ পকেট থেকে একটি দশটাকার নোটই বের করে ওর দিকে এগিয়ে দেয়।

—যদি কিছু না মনে করেন, এইটা রাখুন।

লোকটা একবার ওর দিকে চাইল বেদনার্ত কঠিন চাহনি মেলে। বিষণ্ণ হাসি একটু হাসি ফুটে ওঠে।

—দয়া করছেন ? ওটার আর দরকার নেই। থাক।

মাথা নাড়ে সে। দাঁড়াল না—আঁধারেই বাসের দিকে এগিয়ে যায়, আসরের দিকে আর ফিরেও চাইল না।

মহীতোষ অবাক হয়ে চেয়ে থাকে জরাজীর্ণ লোকটার দিকে। কাশছে—তখনও কাশির বেগ থামতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে।

কি ভেবে মহীতোষ এগিয়ে যায়।

লোকটা কুণ্ঠিত মনে প্রশ্ন করে।

—দুর্বার খবর জানেন ? দেখা হয় তার সঙ্গে ?

একটু অবাক হয় মহীতোষ। লোকটার বুকের ভেতর একটু আগুনের উত্তাপ এখনও আছে। সেই মনটা বোধ হয় আজও মরেনি।

মাথা নাড়ে মহীতোষ।

—না। ওর কোন খবরই জানি না।

লোকটা দাঁড়াল না। আঁধারে দয়া পা ফেলে হারিয়ে গেল। আর দেখা যায় না তাকে।

চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে মহীতোষ, লোকটা এমনি করে ওর সব কিছুকেই হারিয়ে—নিজেই কোথায় হারিয়ে গেছে।

পরদিন সকালে ওকে খুঁজেছিল মহীতোষ, লোকটাকে আর দেখা যায় নি। এতদিনের পুরোনো দল ছেড়ে সে কোথায় আজ হারিয়ে গেছে।

কেউ তার কোন খবরই রাখে না।

ওদের খবর কেউ রাখে না; ওরা বার বার হারে জীবনের ভিড়ে হারিয়ে যায় নিঃশেষ বেদনা বুকে নিয়ে।

গুরুশিষ্য কথামৃত

পরিমল গোস্বামী

শিষ্য জিজ্ঞাসা করল, গুরুদেব, স্বর্গে আর নরকে যে প্রভেদ ছিল, এখনও কি তাই আছে?

এ প্রশ্ন কেন বৎস?

আমার মনে সন্দেহ ঢুকেছে, গুরুদেব। শুনুন বলি। ও পাড়ার বিখ্যাত ব্যবসায়ী ধনঞ্জয় ভঞ্জ চালের চোরাকারবার করতে গিয়ে ধরা পড়েছিল। আরও নানা রকম দুষ্কার্যের নায়কত্বপে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল। সবই প্রমাণ হয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ তার মৃত্যু ঘটেছে সেদিন। কিন্তু দেখছি মৃত্যুর পর থেকে তার নামের আগে স্বর্গগত লেখা হচ্ছে। এই আমার সন্দেহের কারণ, গুরুদেব। স্বর্গগত কেন?

শিষ্যের এই কথায় গুরুদেব বললেন, বৎস, তা হ'লে সবটা কাহিনীই বিবৃত করি, তুমি শ্রবণ কর।

শিষ্য মনোযোগ ঘনীভূত করল।

গুরুদেব বলতে লাগলেন, শোন, বেশ কিছু দিন আগে থেকে নরকে আর ভারতীয় আত্মাদের —মানে দুরাত্মাদের, স্থান হচ্ছিল না। নরকের যত কর্মী ছিল তারা সবাই ধর্মঘট করবে এমন ভয় দেখা দিয়েছিল।

তুমি তো জান, নরকের একুশটি বিভাগ। কিন্তু তার কোনোটাতেই পাপের তারতম্য বিচার ক'রে ওদের স্থান করা যাচ্ছিল না। এজিনিয়ার মহদানবের সাহায্যেও অনেকগুলি নতুন এয়ারকনডিশন করা হল। সেও কম নয়। প্রতি বিভাগে প্রায় শ'খানেক ক'রে। সবই নতুন সাত আট তলা বাড়ি। টেনিমেন্ট প্যাটার্নের। কিন্তু তাতেও কোনো ফল হল না। এত পাপাত্মার স্থান কোথায়?

তা হলেই বুঝে দেখ, এত পাপাত্মাকে আগুনে পোড়ানো, পাকে ডোবানো, মাথায় ডাণ্ডা মারা, ও অন্যান্য যাবতীয় শাস্তি দেওয়ার কাজ নির্দিষ্ট সংখ্যক মজুরদের দিয়ে সম্ভব হ'তে পারে কি?—পারে না।

শাস্ত্রে তো জান, নরকের স্থান নির্দিষ্ট হয়েছে পৃথিবীর দক্ষিণ মেরুতে, নরকের উপরে অথবা নিচে। মৃত আত্মাদের বিচার করা হয় এইখানে। বিচারক, যমরাজ। কিন্তু তুমি শুনে থাকবে দক্ষিণ মেরুর নরকে অনেক দিন ধ'রে জীবিত মানুষদের আনাগোনা চলছে। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে আমুণ্ডসেন যেদিন প্রথম দক্ষিণ মেরুতে গিয়ে উপস্থিত হলেন, সেই দিন থেকে যমের দুর্ভাবনার আরম্ভ। তারপর যখন একের পর এক অভিযান চলল সেখানে, তখন তাঁর বিচারালয়কেই নরকের নিচের রাজ্যে শিফ্‌ট করতে হয়েছে। দেওয়ানি ফৌজদারি সব একসঙ্গে চলছে।"

তাও একরকম সয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ১৯৬৭ থেকে পাপাত্মাদের সংখ্যা প্রবল বেগে বাড়তে থাকায় হ'ল সমস্যা। এক একটা ডবল বেডের ঘরে পনেরো ষোল জন ক'রে রেখেও কুলানো যাচ্ছিল

না। আর শুধু কি তাই? আসল সমস্যা রয়েছে মজুরদের নিয়ে। তারা এত খাটতে রাজি নয়। মানে এত ওভারটাইম, এবং বিনা মজুরিতে। এর অর্থ অতি ভয়ঙ্কর। মানে, নরকের গৌরপ্রতিষ্ঠানে অচল হয়ে যাচ্ছিল। যারা এখানে মজুর, তারা চিরকাল মজুর। তাদের হ্রাস বৃদ্ধি নেই। কিন্তু পাপাত্মাদের বৃদ্ধি অতি দ্রুত। ও দুয়ের সামঞ্জস্য হবে কি ক'রে? মজুররা বলছিল, তাদের কাজ, প্রতিদিন সাত ঘণ্টা পাপাত্মাপীড়ন—মাঝখানের একঘণ্টা টিফিনের ছুটি সমেত। এর বেশি তারা খাটতে রাজি নয়।

যম উদ্‌ভ্রান্ত। কারণ মজুররা যদি সময়ের হিসাব ঠিক রেখে go slow পদ্ধতিতে কাজে শিথিলতা দেখাতে থাকে, তবে আইনত কিছু করবার উপায় নেই। ধর, যেখানে পঞ্চাশ ঘা ডাণ্ডা মারার কথা, সেখানে সংখ্যাটা ঠিকই রাখল, কিন্তু আঘাতের জোর একেবারে কমিয়ে দিল। তখন? তাতে অপরাধীরা তাদের স্বর্গে আছি। এমন অবস্থায় নরক চালানোর কোনো মানেই হয় না। এখন যেমন ভারতীয় জেলখানায় কয়েদীরা বেশি সুখে আছে, অনেকটা সেই রকম।

যম চিন্তায় বসলেন।

(২)

এদিকে স্বর্গের অবস্থা যে আরও খারাপ। বরং নরকে সব রকম নারকীয় ব্যাপার চলতে পারে, কিন্তু স্বর্গ তো পবিত্র স্থান। এখানে যা ঘটছে সেও খুব চিত্তাকর্ষক নয়। শোন মন দিয়ে। এখানে ব্রহ্মার দুশ্চিন্তার অবধি নেই। দূরে নারদ ব'সে আপন মনে বীণা বাজাচ্ছিলেন, ব্রহ্মা তাঁর কাছে গিয়ে তাঁকে যাচ্ছেতাই ক'রে বকলেন। বললেন, এখন ওসব রাখ।

নারদ প্রত্যুত্তর না ক'রে বীণা নিয়ে দূরে প্রস্থান করলেন।

ব্রহ্মা তখন চোখ বুজে ধ্যানে বসলেন। উদ্দেশ্য, কোনো সমাধান আবিষ্কার করা যায় কিনা, দেখা।

মন্দাকিনীর ধারা কুলকুল শব্দে বয়ে চলেছে পায়ের কাছ দিয়ে। পারিজাত অরণ্য থেকে ফুল ঝরে পড়ছে। দূরে কামধেনু মাঝে মাঝে খুব অনিচ্ছার সঙ্গে পারিজাত ফুল দু'একটা খাচ্ছে। তারও মন বিশেষ প্রফুল্ল নয়। স্বর্গের সব জায়গায় একটা থমথমে ভাব।

ব্রহ্মার মনোযোগ থাকছে না। ধ্যানের মধ্যে মধ্যে একটা অজানা ভয় এসে উৎপাত করছে। মনোযোগ ঘনীভূত করতে পারলে ভবিষ্যৎটা অনেকখানি স্পষ্টই দেখতে পেতেন।

অবশ্য ভয়টা একেবারেই যে অজানা ছিল, এমন নয়। যেটুকু জানা ছিল, তা হচ্ছে—স্বর্গের মজুরের সংখ্যা ছিল প্রায় পঞ্চাশ হাজার। তাদের প্রায় সবারই কাজ ছিল মহাকাশস্থিত ধূলো ঝাঁট দেওয়া। এও প্রায় সাত ঘণ্টার কাজ—মাঝখানে একঘণ্টার টিফিন।

কিন্তু কিছুকাল ধরে স্বর্গে পুণ্যাত্মার আগমন এমন অদ্ভুত রকমের হ্রাস পেয়েছে যে, শত শত মাইল ব্যাপী ধূলো ঝাড়ার কোনো দরকারই হচ্ছে না আর। তাই সম্প্রতি পঁচিশ হাজার মজুরকে ছাঁটাই করতে হবে। অথচ দেখ, এদের কাজ স্থায়ী কাজ, এবং সেই প্রতিশ্রুতি পেয়েই নানা গ্রহ থেকে এদের সংগ্রহ ক'রে এনে চাকরি দেওয়া হয়েছিল। বুঝতে পারছ, সমস্যাটা কত কঠিন?

এখন এই ছাটাই-ভীত কর্মীরা স্বর্গে তুমুল গণ্ডগোল বাধাবার চেষ্টায় আছে। বলছে, চলবে না, চলবেনা।

ব্রহ্মা এখন কি করবেন? ওদের দাবী অন্যায় নয়। স্বর্গে কাজ নেই, বা অকারণ কাজ, সে তো ওদের জন্য নয়। এখন ওরা যাবে কোথায়? এজিটেশন তারা নিতান্ত বাধ্য হয়েই করছে। বুঝতে পারছ কি ব্যাপার?

ব্রহ্মার আর বসে থাকা চলল না। তিনি প্রায় পঁচিশ জন দেবতাকে সঙ্গে নিয়ে স্বর্গ ইনস্পেকশনে বেরুলেন। দেখলেন ইতিমধ্যেই মহাজাগতিক ধুলোয় স্বর্গের চেহারা প্রায় মরুভূমির মতন হয়েছে। অর্থাৎ স্বর্গের সেই বিস্তীর্ণ এলাকা, যেখানে ভারতীয় পুণ্যাত্মারা এসে বাস করতে পারতেন। এই এলাকার বর্তমান বিরল বসতি দেখে ব্রহ্মা দুঃখে দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। তাঁর নিশ্বাসে সামনের জমি থেকে অনেকখানি ধুলো উড়ে গেল। যে সব পুণ্যাত্মা আগে এখানে এসেছিল, তাদের ভারতবর্ষেই পুনর্জন্ম ঘটানো হয়েছিল, কিন্তু তারা পরে সবাই প্রায় নরকে ফিরে এসেছে, এখানে আসার অনুমতি আর তারা পায়নি। সদাচার সমিতি গঠিত হলে দূর ভবিষ্যতে হয় তো দু'চার জন আসতেও পারে। কিন্তু সে তো অনেক দিনের ব্যাপার। ব্রহ্মা প্রায় ক্ষিপ্ত।

এমন সময় স্বর্গে বিপজ্জনক ঘন্টা বেজে উঠল। ব্রহ্মা ও তাঁর সহচর দেবতারা কর্মীদের বিদ্রোহ আশঙ্কা ক'রে ফিরে দাঁড়ালেন। কোথায় লুকোবেন ভাবছেন, এমন সময় একজন দূত ছুটে এসে খবর দিল, যমরাজ এসেছেন স্বর্গে।

যমরাজ! স্বর্গে কেন? কোটি কোটি বছর ধ'রে যাঁর স্বর্গে আসবার দরকার হয় নি, তিনি কেন স্বর্গে? যাই হোক, এখানেই নিয়ে এসো তাঁকে। কোনো রকম অসম্মান ক'রো না। মহা ঝামেলার ব্যাপার, দেখছি।

যমরাজ এসে ব্রহ্মাকে প্রণাম করলেন। তাঁর এক মুখ থেকে আশীর্বানী উচ্চারিত হ'ল, অন্য তিন মুখে সন্দেহের ছায়া।

যমরাজ বুঝতে পারলেন সেটা। মনে মনে ভাবলেন, সব শুনলে বোধ হয় আরও ভয় পাবেন। বললেন, দেব, আমি বড়ই বিপন্ন। আমাকে বাঁচান।

ও। তবে ভয়ের কিছু নয়। আক্রমণ করতে নয়, ভিক্ষা চাইতে এসেছে।

ব্রহ্মার চারটি মুখই খুশিতে ভরে উঠল। ভাবলেন, যমের বিপদ, তাতে আমার কি? বললেন, বল সব, দেখি কি করতে পারি।

যমরাজ তাঁর অবস্থা বিস্তারিত বর্ণনা করলেন। বললেন, সেখানে এখন যথার্থ নারকীয় অবস্থা। মজুর কম, কাজ বেশি। বাড়তি মজুর আনিয়ে খাটাবার জায়গা নেই, যারা আছে, তাদেরই এখন দাঁড়াবার জায়গা হচ্ছে না। আমার প্রাসাদের শোবার ঘরখানা ছাড়া সমস্ত ঘর পাপাত্মারা দখল করেছে। বারান্দায় বেরোবার উপায় নেই, শত শত প্রেতদেহ গিজ গিজ করছে।

ব্রহ্মা বললেন, ওদের পুনর্জন্মের জন্য ভারতে পাঠাচ্ছ না কেন? ওরা সেখানে গিয়ে কুকুর জন্ম গ্রহণ করুক।

তা কি করিনি চতুর্মুখ? কয়েক হাজারকে কলকাতা পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু সেখানকার কর্পোরেশন সবগুলোকে মেরে ফেলেছে। তাদের আত্মা আবার ঘুরে এসেছে আমার কাছে।

বেআইনি ক'রে মানুষ বানিয়েও পাঠিয়েছিলাম, কিন্তু মানুষ হয়ে এখানে তারা আরও বেশি পাপ ক'রে ফিরে এসেছে।

ব্রহ্মা একটা আরামের নিশ্বাস ফেললেন। বললেন, তোমার প্রস্তাব আছে কিছু?

আছে, চতুরানন।

কি, বল।

আমি স্বর্গের কিছু অংশ লীজ নিতে চাই। তা হ'লে আপনার তাঁবা স্বর্গে কিছু বৈচিত্র্য সৃষ্টি হবে, আমিও বেঁচে যাব।

ব্রহ্মা বুঝতে পারলেন, স্বর্গের সকল কর্মীদের এখানে কাজ জুটবে, কাউকে আর ছাঁটাই করতে হবে না। কিন্তু সে কথা প্রকাশ না ক'রে বললেন, বেশ তো, তোমার যদি তাতে সুবিধা হয়, তবে লীজ নাও। আর তাই বা কেন? স্বর্গ নরক ভেদ তুলে দিলে ক্ষতি কি? এখন তো সবই একাকার হয়ে যাচ্ছে, এখানেই বা সেটা বাদ থাকে কেন?

যমরাজ এ প্রস্তাবে আনন্দে একেবারে লাফিয়ে উঠলেন। বললেন, আপনি আমাকে বাঁচালেন। আমি আপনার চিরসেবক। আমি আর এক মুহূর্ত দেরি করব না, এখুনি ছুটে পালাই।

যমরাজ মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মাও নারদকে ডেকে পাঠালেন, এবং এসে বললেন, এবারে তোমার বীণা বাজাতে আরম্ভ কর। যত জোর পার বাজাও। যে সুর ইচ্ছা, বাজাও। গতর হ'লে আরও ভাল।

নারদ বীণার সুর বাঁধতে লাগলেন।

(৩)

স্বর্গের চেহারা একেবারে পালটে গেছে। আরও মজার কথা, প্রায় ত্রিশজন বাছাই করা দেবতা, মানে ওঁদের মধ্যে যাঁরা ডি-আই-পি, তাঁরা কিছুদিনের জন্য যমের আতিথ্য গ্রহণ করতে গিয়েছিলেন। নিজেরা কিছু পরিবার নারকীয় ভাবের সঙ্গে পরিচিত হয়ে এলেন ইচ্ছা করেই।

এসে দেখেন স্বর্গ আর স্বর্গ নেই। বহু জাতীয় অদ্ভুত চরিত্রের সব দুরাত্মা স্বর্গ দখল করেছে। যারা প্রকৃত স্বর্গবাসী তারা এখন কোনঠাসা। কোনো রকমে চোরের মতন ছোট্ট একটা অংশে দিন কাটাচ্ছে। কামধেনুটা একটা প্রভাবশালী দলের দখলে গিয়ে পড়েছে। তার দুধ, এবং তার কাছ থেকে অন্য যা কিছু পাওয়া যাচ্ছে, তাতে মনের আনন্দে ভেজাল মেশাচ্ছে। কল্পতরুর লেটেস্ট নিয়েছে একদল। মন্দাকিনীর জলে মাছ ধ'রে অন্য গ্রহে চালান দিচ্ছে একদল। কোটি কোটি দুরাত্মা স্বর্গে কালোবাজার খুলে বসেছে।

তারপর শোন, দেবতারা যে অমৃত পান করতেন তাতে ভেজাল, যে সোমরস পান ক'রে স্বর্গীয় আনন্দ পেতেন, তার জন্য কিউতে দাঁড়াতে হচ্ছে। কি মর্মান্তিক অবস্থা ভেবে দেখ।

কত যে হোটেল খোলা হয়েছে তার সংখ্যা নেই। মেনকা, রম্ভা, ঘৃতাচী, এই সব হোটেলে নাচের তাড়া খেটে বেড়াচ্ছে। খাঁটি অমৃতের জন্য বিশেষ লাইসেন্সের ব্যবস্থা হয়েছে। আরও কত রকম লীলা।

গুরুদেব বললেন, আমার গল্পের শেষ। এখন বুঝতে পারছ, এখন যে-কোনো পাপী মারা গেলে তার নামের আগে কেন স্বর্গগত লেখা হয়?

শিষ্য বলল, বুঝতে পেরেছি, গুরুদেব।

মাতাল হাওয়া

দক্ষিণারঞ্জন বসু

গ্রীষ্মে বিহঙ্গের জলকষ্ট।

মে-জুনে সারা দ্বীপ জুড়ে জলের জন্য হাহাকার। বোধহয় হুংকংয়ের জন্যেও। পাশের দেশ থেকে জাহাজে ভরতি জল এনে টেনে তবে তৃষ্ণা মেটে দু'জনে।

উঃ কী একফোঁটা সে তৃষ্ণা! কী অসীম আকুলতা এক ফোঁটা জলের জন্যে, একটু প্রেমের জন্যে!

অথচ চারদিকেই জলে ঘেরা বৃটিশ ক্রাউন কলোনী এই হংকং। বিরাট এশিয়ার মানচিত্রে সামান্য একটি বিন্দু মাত্র, তাহলেও এর গুরুত্ব অপরিসীম। রাজনীতির ঘাটদের হংকং বোধহয় আরো মনোরম। তা' নিয়ে কত গল্প কত কাহিনী পৃথিবীময় ছড়িয়ে গেছে মুখে মুখে। তার অনেক কথা তাঁরও জানা।

সেই মনোহারিণী হংকংকে দেখার বাসনা তাঁর বহুদিনের। সে ইচ্ছেকে পূরণ করতেই তাঁর এখানে আসা। এখন ফুরাই যায়। জলের জন্যে এখনো হা-হুতাশ! মাতাল হাওয়ায় একই সুরের ব্যঞ্জনা—জল চাই, প্রেম চাই, প্রাণ চাই!

জলের জন্যে হাহাকার দু'তিন মাসের ব্যাপার, কিন্তু প্রেমের জন্যে চাহিদার সেতো চিরন্তন—সর্বদেশের সর্বকালের। তবু হংকং নিয়ে এত কথা কেন? সকাল বেলা বেড়াতে বেরিয়ে একা একাই ভাবতে ভাবতে পথ চলছিলেন মিঃ ইয়ং।

সে বোধহয় হংকং-এর অভিনব পরিবেশের জন্যে। তার অদ্ভুত আবহাওয়ার জন্যে। এই পরিবেশ, এই আবহাওয়াই বোধহয় নারী পুরুষ সবার মনে একটা তীব্র পিপাসা জাগিয়ে দেবার পক্ষে অনুকূল। মাত্র একদিনের অভিজ্ঞতায় এ ধারণাই হয়েছে মিঃ ইয়ং-এর।

জোসান!

সাগর বেলায় বেড়াতে এসে একটা বেঞ্চিতে বসে একটু বিশ্রাম করছিলেন মিস হুড পো-শান। হঠাৎ নতুন পরিচিত মার্কিনী কণ্ঠে ক্যান্টোনিজ-ভাষার শুদ্ধ উচ্চারণ শুনে তিনি চমকে ওঠেন।

আরে আরে আপনি মিঃ ইয়ং এখনো রয়েছেন এখানে! ভারি খুশি হলাম আপনাকে দেখে। —দাঁড়িয়ে উঠে মিস হুড সেকহ্যাণ্ড এবং শুভেচ্ছা বিনিময় করেন মিঃ উইলিয়ম সি ইয়ং-এর সঙ্গে। তারপর পাশাপাশি বসে দু'জনে আলাপ আলোচনায় ডুবে যান। সামনে সমুদ্র-বুকের তরঙ্গের মতোই কত চিন্তা কত কথা ওঁদের দু'টি মনে দুলে দুলে ওঠে!

মিস হুড-এর সঙ্গে ইয়ং সাহেবের পরিচয় মাত্র দু'দিন আগের। তাও মাত্র ঘণ্টা দু'-একের আলাপ। টোকিও থেকে একই সঙ্গে ওরা ফিরেছেন হংকং-এ জাপান এয়ার লাইনস্-এর বিমানে। পাশাপাশি আসনে বসার সুযোগ পেয়ে সেই সময়টুকুর মধ্যে অনেক কথাই নিজেদের মধ্যে বলতে পেরেছেন ওরা।

হংকং নাইট ক্লাবের বিখ্যাত নর্তকী মিস হুড। একমাসের চুক্তিতে তিনি গিয়েছিলেন টোকিওতে নাচ দেখাতে। মস্ত টোকিওকে আরো মাতিয়ে দিয়ে এই তো সেদিন তিনি ফিরে এসেছেন।

বিমানে পাশের তরুণীটিকে চেনা চেনা মনেই হচ্ছিলো মিঃ ইয়ং-এর। কিন্তু সে নিয়ে আলাপ শুরু করতে খুব সংকোচও বোধ হচ্ছিলো তাঁর। তবে সংকোচের চেয়ে ঘনিষ্ট হবার লোভ যেখানে বেশী প্রবল, সেখানে আর কতক্ষণই বা চুপ করে থাকা সম্ভব?

আপনার সঙ্গে কোথায় দেখা হয়েছে বলুন তো?—খানিক ভাবনা চিন্তার পর শেষ পর্যন্ত মিঃ ইয়ং সোজাসুজি জিজ্ঞেসই করে বসলেন মিস হুডকে।

বিমানের শার্সির ভেতর দিয়ে আকাশে অনেক দূর অবধি দৃষ্টি উড়িয়ে একটু যেন অন্যমনস্ক ভাবেই মুচকি হেসে পার্শ্ববর্তিনী বল্লেন—আমার সঙ্গে দেখা হওয়াটা বিচিত্র কিছু নয়। হংকং-এও দেখে থাকতে পারেন কিংবা টোকিও থেকে যখন দু'জনেই আসছি সেখানেই দেখেছেন এমনও হতে পারে।

কিন্তু টোকিওয় কোথায় তাই ভাবছি।

কেন, নিচিসিকি নিউজিক হলে। একমাস ধরে সেখানেই নাচ দেখিয়ে ফিরছি আমি।

আপনিই তা'হলে মিস হুড সো-শাম!

তাই যদি হই তাতে কোনো আপত্তি নেই তো আপনার?

সে আবার কি কথা? আপনি মিস হুড, আপনার সঙ্গে আলাপ করার সুযোগ পাওয়া সে তো আনন্দের ব্যাপার, আপত্তি হবে কেন? আচ্ছা, কোথায় ছিলেন আপনি টোকিওয়?—এই প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে মিঃ ইয়ং-এর দৃষ্টির মধ্যে কী রকম একটা তীক্ষ্ণতা যেন স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

বেশির ভাগই আমি সময়মতো কাটিয়েছি গিন্জা টোকিও হলে। তবে শেষ দিকের কয়েকটা দিন আমি নিজে গিয়েছিলাম নিউ জাপান হোটেলে।

এই যাঃ, আমারও তো আস্তানা ছিল ঐ নিউ জাপানেই! পুরো একটা রাত আমি সে হোটেলে কাটিয়ে এলাম। আগে আপনার সঙ্গে আলাপ হলে কী মজাই না হতো!

কী আর মজা হতো! যে ব্যস্ততায় দিন কেটেছে, কথা বলার আর ফুরসৎ পেয়েছি কতটুকু!—হাসতে হাসতে উত্তর যেন মিস হুড।

তবু তারই মধ্যে……।

এবার আর কথায় কোনো জবাব না দিয়ে ইংগিতপূর্ণ মুচকি হাসি হেসে মিস হুড বাইরের দিকে ঘুরিয়ে নেন তাঁর চোখ দু'টোকে।

এর পর কিছুক্ষণ ধরে দু'জনেই ওরা নির্বাক ছিলেন।

হঠাৎ একবার আসন ছেড়ে উঠে যান মিস হুড। আর ঠিক সেই সময়েই এয়ার হোস্টেস মিস ফুকু সাদা কিমোনো এবং স্লীপার দিয়ে যায় এক এক করে সব যাত্রীদের। জাপান এয়ার লাইন্স-এর একটি করে সুন্দর পাখাও উপহার দেয় সঙ্গে সঙ্গে। একেবারে সব শেষে আসে ইয়ং সাহেবের কাছে। তাঁর সঙ্গে হেসে হেসে দু'চারটে কথাও বলে। মিঃ ইয়ং অনুরোধ জানান সামাকে মিস হুড-এর খালি আসনে বসার জন্যে। সামা এপাশে ওপাশে তাকিয়ে খুব আস্তে আস্তে জানায় যে, যাত্রীদের পাশে বসে গল্পকরার নিয়ম নেই তাদের, কোন যাত্রীর সঙ্গে ভাব করার চেষ্টা দেখাইনী।

শুনেই ইয়ং সাহেব থমকে যান এবং সামনের 'বুক'-পকেট থেকে একখানা বই টেনে নিয়ে তা পড়ার উদ্যোগ করেন।

মিস লামা তৎক্ষণে মুভ-এর আসনে তাঁর কিমোনো, স্লীপার এবং উপহারের পাখাটি রেখে কোথায় যেন উধাও হলেন, অনেকক্ষণ তাঁর আর পাত্তাই মেলেনি।

মিস মুভ পো-শানে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে ফিরে এসেছেন। এসেই কিমোনো দেখে খুব খুশি হয়েছেন। যে গরম!

জুলাই মাসেও দুপুরের মুখে সূর্যের বেশ কড়া মেজাজ। গরমে রীতিমত কষ্ট হচ্ছিল মিস মুভ-এর। পুলওভারটা খুলে রেখে কিমোনোটা গায়ে জড়িয়ে নিতেই খুব আরাম বোধ হলো তাঁর। তারপর জুতো জোড়া ছেড়ে স্লীপার পরে আরো হাল্কা হয়ে নিলেন তিনি। তারপর হেলান দিয়ে বসে আপার টাইমস-এর খবরের ওপর চোখ বুলোতে লাগলেন।

উপহারের সুন্দর পাখাটি খুলে নিয়ে নিজেকে তখন বাতাস করছিলেন মিঃ ইয়ং। মিস মুভও পাচ্ছিলেন সে বাতাসের কিছু কিছু ভাগ। তাঁর মনে হলো ইয়ংও গরমে কষ্ট পাচ্ছেন। তাই তাঁকে তিনি বললেন—পোষাক খুলে রেখে কিমোনোটা পরে নিতে। তাতেই খানিকটা যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন মিঃ ইয়ং। কৃতজ্ঞতা জানালেন সহযাত্রিনীকে। বল্লেন, উম কয়! অর্থাৎ ধন্যবাদ!

এরপরে দু'জনেই পাশাপাশি ঘুমিয়ে পড়েছেন। সাকের ডাক পড়লে দু'জনেরই ঘুম ভেঙেছে। মিস মুভ-এর যে খ্যাতির কথা তিনি শুনে এসেছেন জাপানে, নিচিগিকির নাচের আসরে একের পর এক নাচে যেভাবে তিনি অভিনন্দিত হতে দেখেছেন তাঁকে তাতে তাঁর পাশে এমনিভাবে ঘুমোনোর সুযোগ পাওয়া কি কম সৌভাগ্যের কথা! ঘুম থেকে জেগে উঠেই মনে মনে ভাবেন মিঃ ইয়ং। আর ঘুমের মধ্যেই মিস মুভ ভাবছিলেন, এদিকে তো যথেষ্টই হলো, এবার একবার মার্কিন মুলুকটা ঘুরে আসতে পারলেই কিস্তিমাৎ।

খেতে খেতে সে নিয়েই গল্প আরম্ভ হয়ে যায় দু'জনের মধ্যে এবং খাওয়ার শেষে মিস মুভই নিজে থেকে প্রকাশ করেন তাঁর মনের ইচ্ছেটা। আমেরিকায় একবার নাচ দেখাতে যাবার পরিকল্পনা রয়েছে তাঁর, সে কথা জেনে পুলকিত হয়ে ওঠেন মিঃ ইয়ং এবং তাঁকে তারিফ করেন তাঁর সেই ইচ্ছের জন্যে। আর সেই তারিফ করতে গিয়েই উচ্ছ্বাসের আধিক্যে নিজের ডান হাতে হাতলের ওপর রাখা মিস মুভের বাঁ হাতটাকে চেপে ধরেন সজোরে।

উত্তপ্ত সে হাত। আর সে উত্তাপ যথার্থভাবেই ধরা পড়ে মিস মুভ-এর উপলব্ধিতে। কিছুক্ষণ ধরে দু'জনেই নির্বাক। এবং সেই সময়েই কখন যে তাঁদের বিমানখানি পথ শেষ করে দক্ষিণ চীন সমুদ্রের ভেতরে কাইটাক এয়ারপোর্টে এসে পড়েছে, তা তাঁদের মোটে খেয়ালই ছিল না। হঠাৎ মাটিতে নামার ঠোক্কর খেয়ে মিস মুভ একেবারে পড়েই যাচ্ছিলেন মিঃ ইয়ং-এর পায়ের ওপর। চিলে করে হলেও কোমরবন্ধে বাঁধা থাকায় আর ইয়ং সাহেব নিজে দু'হাতে পার্শ্বসঙ্গিনীকে ধরে ফেলায় তেমন কোনো ঘটনা ঘটে নি, তা' না হলে অন্য কিছু না হোক হাস্যরসাত্মক একটা কোনো ব্যাপার যে ঘটতে পারতো তাতে সন্দেহ নেই।

এর পরে এক এক করে যাত্রীরা নেমে পড়েছেন। কাস্টমস-এর বেড়াজাল পেরিয়ে যে যার জায়গায় চলে গিয়েছেন। মিস মুভও তাঁর হলবল নিয়ে কখন কোথা দিয়ে যে দৃষ্টির অগোচর হয়ে

গেলেন তার কিছুই টের পেলেন না ইয়ং সাহেব। সে না হয় হলো, কিন্তু মিস ফুড-এর ঠিকানাটা জেনে নিতে তাঁর এমনি ভুল হয়ে গেল, সেটাই বড্ড আশ্চর্যের কথা। সিমোজিনে চেপে কৌতূহলের পেনিন্সুলা হোটেলে যেতে যেতে সেই আশ্চর্যের আঁচই তাঁর মনে বার বার ওঘরে ওঘরে উঠছিল।

তবে এও অবশ্য ইয়ং সাহেবের মনে হয়েছে যে, নর্তকী হিসেবে মিস ফুড-এর যে খ্যাতি তাঁকে খুঁজে বার করা মোটেই এমন কঠিন ব্যাপার নয়। কিন্তু না খুঁজেই যে তাঁকে পাওয়া যাবে এবং আপনা থেকেই যে তিনি এমনিভাবে ধরা দেবেন তাও কখনোই ভাবতে পারেন নি মিঃ ইয়ং।

তাই সমুদ্র তীরে এই আকস্মিক সাক্ষাতে দু'জনেই সমানভাবে অবাক।

আমি তো ভেবেছিলাম আপনি এখানে একরাত কাটিয়ে হংকং ফিরে গেছেন।—মিস্ ফুড বলেন উইলিয়ম ইয়ংকে।

না, অত তাড়াতাড়ি কি করে যাবো! হংকং নাকি স্বপ্নপুরী। সেই স্বপ্নপুরী ভালো করে দেখবার জন্যই তো আমি এখানে এসেছি। আমার দলের আর সবাই টোকিও থেকেই স্বদেশযাত্রী হয়েছেন শুধু আমি ছাড়া।—ইয়ং উত্তর দেন। যদিও প্লেন ঘাটের কাছাকাছি হলেও তাঁর প্রতিটি কথায় মধ্যেই নাম-মাহাত্ম্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মিস ফুড প্রতি উত্তর দিতে যাবেন, তাঁকে থামিয়ে দিয়ে মিঃ ইয়ং তাঁর নিজের কোটি না-বলা কথা বলবার জন্যই যেন একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়েন।

হাঁ, শুনুন আরেকটা কথা। সেদিন টোকিও থেকে আসবার পথে বিমানে আপনার সঙ্গে যে অন্তরঙ্গতা হলো তারপর আপনার কাছ থেকে বিদায় না নিয়ে আমি হংকং ছেড়ে চলে যাবো, তা কি হয়?

ইয়াও সুং (সাধু, সাধু)! সঙ্গে আপনার যদি প্রচুর ডলার থেকে থাকে তা'হলে তার বেশীর ভাগটা আপনি এখানে বেশ ভালো ভাবেই খরচ করে যেতে পারেন। খুবই ভালো কথা। —ইয়ং সাহেবকে সাধুবাদ দেন মিস ফুড এবং তাঁকে আমন্ত্রণ জানান সে রাত্রে হংকং নাইট ক্লাবে তাঁর সঙ্গে নাচবার জন্যে।

উঁহু কয়! আমন্ত্রণ পেয়ে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে ক্যান্টোনিজ ভাষায় মিস ফুডকে ধন্যবাদ জানান মিঃ ইয়ং। হংকং-এ আসবার আগে যে কয়টা ক্যান্টোনিজ শব্দ তিনি শিখে নিয়েছিলেন এক এক করে তার সবগুলিই এভাবে কাজে লেগে যাচ্ছে, ইয়ং সাহেবের তাতে ভারি আনন্দ।

চলুন না একবার আমার হোটেল হয়ে যাবেন।—পাল্টা ভদ্রতা করেন মিঃ ইয়ং।

চলুন, তাতে আর কিসের আপত্তি।—মিস ফুড পো-শান রাজী হয়ে যান সঙ্গে সঙ্গে। কয়েক পা এগুলেই হোটেল পেনিন্সুলা। ঘরে ফিরতে এই হোটেল পেরিয়েই তো নাথন রোড ধরতে হবে তাঁকে এবং ফেরবার সময়ও হয়ে এসেছে। তাই সম্পূর্ণ নির্দ্বিধায় মিস ফুড চলে আসেন ইয়ং সাহেবের হোটেলে।

হোটেল লাউঞ্জে বসেই বেশ কিছুক্ষণ ধরে আলাপ-সালাপ হয় দু'জনের মধ্যে। সিগ্রেটের পর সিগ্রেটের ছাই-এ এবং সিগ্রেটের টুকরোয় এ্যাশট্রেটা ভরে ওঠে, কিন্তু মন যেন কিছুতেই ভরে না —দু'জনেই অতৃপ্ত।

গল্পে গল্পে দু'বার করে চা-ও হয়ে গিয়েছে এরই মধ্যে। সময়ের খেয়াল ছিল না। হঠাৎ

রিষ্টওয়াচের দিকে তাকিয়েই দাঁড়িয়ে পড়েন মিস হুড। বলেন, ঘণ্টার মধ্যে একজন গেষ্ট আসবেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে, এখন যে ঘণ্টা বেজে গেল।

আর এক মুহূর্তও দেরী না করে মিস হুড বেরিয়ে পড়েন এবং ফুটপাতে নেমেই একটা ক্যাব ধরে উধাও হয়ে যান। কিন্তু যাবার সময় গাড়ীর ভেতর থেকে হাত নেড়ে নেড়ে তিনি যেভাবে বিদায় নেন সেই দৃশ্যটি মিঃ ইয়ং-এর বুকের ভেতরে যেন সারা দিন ধরে আছড়াতে থাকে।

সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায় ফ্লেমিঙ্গো সেট-কার নিয়ে হকেং নাইট ক্লাবে উপস্থিত হয়ে তবে ইয়ং সাহেবের শান্তি। তাঁকে অভ্যর্থনার জন্যেই ক্লাব-গেটে মিস হুড পাঁচ-সাত মিনিট ধরে দাঁড়িয়ে। সাক্ষাতের সঙ্গে সঙ্গেই দুটি মনের খড়কুটো শান্ত হয়ে আসে।

ইয়ংকে নিয়ে ঝিরিঝিরি একটা কোণায় গিয়ে বসেন মিস হুড। আগে থেকেই বোধহয় এ ব্যবস্থা করে নেওয়া। তা' নাহলে সব টেবিলেই মুখোমুখি দু'জোড়া করে মানুষ। এঁদের বেলায় তার ব্যতিক্রম হবে কেন? তার কারণ হকেং নাইট ক্লাবে মিস হুডের বিশেষ আধিপত্য। তাঁর ইচ্ছাকে সব সময়েই একটা বিশেষ মূল্য দিয়ে থাকেন ক্লাব কর্তৃপক্ষ। তাইতো যখন তখন বিশেষের আমন্ত্রণ গ্রহণে তাঁর কোনো অসুবিধে হয় না এবং তাঁর মন রাখার জন্যে অনেক কিছুই করতে হয় ক্লাবের পরিচালকদের।

নাচ শুরু হয়েছে। নৃত্য-মঞ্চের দিকে সব চোখ। টেবিলে টেবিলে ফিসফাস কিছু কিছু কথাবার্তা। মাঝে মাঝে মদের গ্লাসের টুং টাং শব্দ এদিকে ওদিকে, তা' ছাড়া মোটা দাগ জুড়েই মোটামুটি স্তব্ধতা।

তারই মধ্যে মিঃ ইয়ং একবার জিজ্ঞেস করলেন, আপনার নাচ কখন শুরু হবে?

কেন আপনি এত ব্যস্ত আমার নাচ দেখবার জন্যে। হুইস্কির গ্লাসে শেষ চুমুক দিয়ে খালি গ্লাসটা টেবিলের ওপর রাখতে রাখতে বিস্ময়ের সুরে পাল্টা প্রশ্ন তোলেন মিস হুড।

সত্যি তাই, নিশিমিকি হলে আপনি যে নাচটি প্রথম নেচেছিলেন তা' আমি ভালো লেগেছিল আমার। সেই ক্লাওয়ার ড্যান্সটি আরেকবার দেখতে খুবই ইচ্ছে হচ্ছে আমার। আজকে নাচবেন সে নাচটি?

সে দেখা যাবে'খন। কিন্তু এ নাচটিও তো ভালোই হচ্ছে, সবাই মুগ্ধ হয়ে দেখছেন। সামার ড্যান্স, এক সঙ্গে এত কটি মেয়ের নাচ—ভালো না লেগে পারে কখনো? কি বলেন?

যতই ভালো হোক এ পুরনো ধরনের ড্যান্স। আমার অনেকবার দেখা। আপনার ক্লাওয়ার ড্যান্সের সঙ্গে এর তুলনা? ছাঁ!

আপনি খুবই সমঝদার লোক দেখছি। লঙ অন মার্কা হুইস্কির গ্লাসে আরেক গ্লাস ঢেলে নিতে নিতে ইয়ং সাহেবকে একটু বাহবা দেন মিস হুড।

তা আপনার যা ইচ্ছে তাই আমাকে বলতে পারেন। আমি বলবো আপনার সে নাচটি সত্যি সত্যি অপূর্ব। একটি গোলাপফুলের কুঁড়ি। সেই কুঁড়ি ধীরে ধীরে পাপড়ি মেলছে। তারপর তার ভেতর থেকে আস্তে আস্তে বাহির হুলছে বিরাভরণা নিরাবরণা এক প্রকৃতির দুলালী। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঝরে পড়ে যায় ফুলের সব পাপড়ি। আর সেই পরিবেশে অতুলনীয় নৃত্যে সবার চোখ ধাঁধিয়ে দিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যে উধাও হয়ে যায় সেই ফুলকুমারী। বাস্তবিকই আমি অকপটেই স্বীকার

Advertising is the key to

WORLD PROSPERITY—

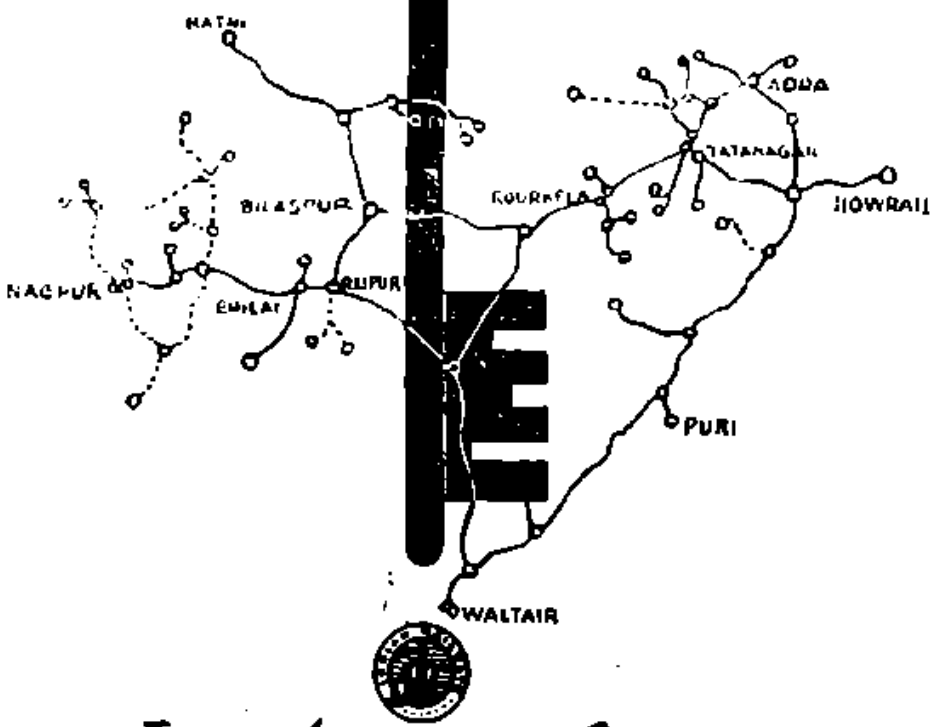

For your Advertisements Contact

THE COMMERCIAL PUBLICITY OFFICER

SOUTH EASTERN RAILWAY

11, GARDEN REACH ROAD, CALCUTTA-43

Phone: 45-2232/45-5349 Telegram: CPUOSER

CPUO-1-69.

করবো। সেদিন টোকিওর দেখবার আগে এমন চমৎকার নাচ আর কোথাও দেখিনি আমি।—এই বলতেই ইয়ং সাহেবকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে এক চুমুতে নেশা চতুর্গুণ বাড়িয়ে দেন মিস কুঙ।

সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় নাচটিও শেষ। বলনাচের ডাক পড়তেই জোড়ায় জোড়ায় সব নরনারী ছুটে আসেন নৃত্যমঞ্চে। মিস কুঙও ইয়ং সাহেবকে টেনে তুলে নিয়ে আসেন সেখানে।

নাচ শুরু হয়ে যায় বাজনার তালে তালে, ক্রমেই বেড়ে ওঠে উত্তেজনা। বাজনার গানটি অনেক দর্শকের কণ্ঠেই ধ্বনিত হয়ে ওঠে—নার্ভাস মাস্ট লার্ন ·····ইত্যাদি। সেই উন্মাদনার মধ্যেই নাচতে নাচতে একবার জিজ্ঞেস করে বসেন মিস কুঙ, আপনি আরো দু'চার দিন হংকং-এ থাকছেন তো মিঃ ইয়ং?

তা' আপনি যদি চান নিশ্চয়ই থাকবো, তবে যতটা সম্ভব তাড়াতাড়িই দেশে ফেরবার ইচ্ছে। এই ইচ্ছে প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই হঠাৎ মিস কুঙের দেহস্পর্শে চঞ্চল হয়ে ওঠেন ইয়ং সাহেব, তবে মুহূর্তের মধ্যেই আবার নিজেকে সামলে নেন।

মিস কুঙ একটু হেসে ফেলেন। দুষ্টুমিভরা সে হাসি। ঠোঁট ছুঁয়ে সে হাসি থাকতে থাকতেই তিনি বলেন, আসছে কাল ওঁর ছোট বোন আনা কুঙ-এর বিয়ে। সে বিয়েটা তিনি দেখাতে চান ইয়ংকে।

তাই বলুন। কিন্তু ও পথটা আপনি বুঝি এড়িয়েই চলেছেন?

তেমন মনের মতো পুরুষ আর পেলাম কোথায়?—মিস কুঙ-এ কথায় আহত হয়ে গর্জে ওঠে ইয়ং সাহেবের পৌরুষ। তিনি কি একটা উত্তর দিতে যাচ্ছিলেন ঠিক তখুনি নাচটা শেষ হয়ে যায় আর ওরা মঞ্চ থেকে নেমে এসে যে যার আসনে এসে বসে পড়েন।

এখানকার বীয়ারের খুব নাম। টেস্ট করেছেন?

হুইস্কিতে ডুবে থাকতে যে ভালোবাসে তার কাছে কি আর অন্য কিছু ভালো লাগে? তবে আপনি যখন বলছেন তখন নিশ্চয়ই একবার চেষ্টা করব।—বলেই দু' গ্লাস বীয়ারের অর্ডার দেন মিঃ ইয়ং এবং দু'জনের জুতেরও।

খেতে খেতে ওরা দুজন বেশ ভালো করে জেনে নেন পরস্পর পরস্পরকে। চীনা হলেও মিস কুঙ খৃষ্টান বাপ-মায়ের সন্তান। দু'পুরুষ ধরে ওরা খৃষ্টান। ছোট বেলা থেকেই নাচের দিকে খুব বেশী ঝোঁক ছিল মিস কুঙ-এর। বহু মালা, বহু হাততালি এবং মেডেল ইত্যাদি বহু পুরস্কার শেষ পর্যন্ত তাঁকে স্থানীয় নাইট ক্লাবগুলোর মধ্যে শ্রেষ্ঠ নর্তকীর সম্মান দিয়েছে। অর্থের অভাব কোনো সময়ই তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি, প্রাচুর্যই বরং পীড়াদায়ক হয়ে ওঠে তাঁর কাছে সময় সময়। এসব কথা মিস কুঙ কথায় কথায় বলে ফেলেছেন ইয়ং সাহেবকে। ছোট বোন আনা। তার চেয়ে অনেক বেশী সুখী, সে-কথা বলতে গিয়েই নিজের অসুখী জীবনের বহু কথাই প্রকাশ করে ফেলেছেন তিনি।

ছোট বোনের কথা বলতে গিয়ে মিস কুঙ বলেছেন, আনা ছোট বেলা থেকেই ছবি আঁকতে খুব ভালবাসতো। বড়ো হয়ে সে চাইনিজ আর্টের নেয়া শিল্পী মিসেস ক্যারী নেমাজির ছাত্রী হিসেবে হংকং-এর সর্বত্র বিশেষভাবে পরিচিত হয়েছে। ওর এক চিত্র প্রদর্শনী দেখেই তো মুগ্ধ হয়ে এক ধনী বৃটিশ ব্যবসায়ীর ছেলে আসছে কাল আনাকে বিয়ে করতে চলেছে।

এই বলার পর বীয়ারের গ্লাসটা নিঃশেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে মিস কুঙ-এর একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস

যেন মিলিয়ে যায় বাতাসের মধ্যে। এ যে আর কিছুই নয়, সংসারের স্বাদ আস্বাদনের আকুতি তা' বুঝতে কোনো অসুবিধে হয় না মিঃ ইয়ং-এর। তাই তিনি নাচের আলোচনাতেই চলে যাবার চেষ্টা করেন।

মিঃ ইয়ং গম্ভীরভাবে কথাটা তোলেন। বলেন, পর পর আরো দু'খানা নাচই তো হয়ে গেল। দু'টো নাচই ভালো হয়েছে সন্দেহ নেই। কিন্তু এর পর আপনার সেই ক্লাওয়ার ড্যান্সটা হলে আরি সুন্দর হতো।

আচ্ছা দেখা যাক কি করা যায়, বলে আসন ছেড়ে উঠে গেলেন মিস হুড। তারপর একটু বাদেই ঘুরে এসে বললেন, বিখ্যাত গায়ক মিস সান মুনের একখানি গানের পরেই তাঁর ক্লাওয়ার ড্যান্স দেখানো হবে।

সে কথা শুনে মিঃ ইয়ং-ই শুধু নয়, আশপাশের অনেকেই খুশি হলেন তা' জেনে। আসলে মিস হুড গো-শানের নাচই তো এ নাইট ক্লাবের মূল আকর্ষণ।

মিস সান মুনের কোকিল কণ্ঠের গানে একটা অদ্ভুত রকমের প্রশান্তি বিস্তৃত হয়েছে সারা হল ঘর জুড়ে। সেই নিস্তব্ধতার মধ্যে জোড়া জোড়া সমস্ত চোখের দৃষ্টি গিয়ে ছড়িয়ে পড়ে একটি সোনার কুঁড়ির দিকে মঞ্চের মাঝখানে। কুঁড়িটির আকস্মিক আবির্ভাব। তারপর মূল ফোটার সঙ্গে সঙ্গেই তার পাপড়ি ঝরা সুরু। তারপর মিস হুডের অতুলনীয় নিরাবরণ নৃত্য! যেমনি তার সৌষ্ঠব, তেমনি দেহ-ভঙ্গিমা! ক্লাওয়ার ড্যান্স দেখে আরেকবার মুগ্ধ হলেন মিঃ ইয়ং।

তারপরেও ওরা আরো অনেকক্ষণ ছিলেন ঐ নাইট ক্লাবে। আরো নাচ আরো গান উপভোগ করেছেন। আরেকটা রমনাচে মিস্ত হয়ে নিজ নিজ আস্তানায় ফিরেছেন।

পরদিন ছোট বোন আনার বিয়ের আসরে নতুন বন্ধুকে নিয়ে যাবার জন্যে মিস হুড নিজেই ইয়ং সাহেবের হোটেলে এসে উপস্থিত। তেমনি কথাই অবশ্য ছিল। তবে তিনি একটু আগেই এসেছেন।

মিঃ ইয়ং-ও এক রকম প্রস্তুতই ছিলেন। রিসেপশন রুমের টেলিফোন পেয়েই কোটটা গায়ে চড়িয়ে, চুলটা ব্রাস করে নীচে নেমে আসেন।

দেখা হতেই দু'জনের মধ্যেই কেমন যেন একটা লজ্জা ভাব। কাল রাতের বিদায় মুহূর্তটি দু'জনেরই মনের পর্দায় ভেসে ওঠে, তাই!

লজ্জা ভেঙে মিস হুড-ই জিজ্ঞেস করেন, হ্যাভ ইউ স্লিপ এনাফ নাইট?

ও ইয়েস! আপনার?—এবার পাল্টা প্রশ্ন আসে মিঃ ইয়ং-এর দিক থেকে।

আমার ঘুমও মোটামুটি ভালোই হয়েছে। তবে আজ আনার বিয়ে উপলক্ষে এক আধটুকু চিন্তা-ভাবনার ঝামেলা ছিল। চলুন, বেরিয়ে পড়া যাক।—এই বলে বাইরে এসে দাঁড়িয়ে ওঠেন মিস হুড মিঃ ইয়ংকে সঙ্গে নিয়ে।

গীর্জায় আমন্ত্রিতদের মধ্যেই ভীড় জমে গেছে এরই মধ্যে। আনন্দে উল্লাসে প্রার্থনার হলটি সরগরম। তাই মধ্যে মিস হুড খালি জায়গায় খুঁজে নেন দুজনের জন্যে। কিন্তু পাশাপাশি বসেও আজ আর তেমন খোলাখুলিভাবে তিনি কথা বলতে পারছেন না কেন মিঃ ইয়ং-এর সঙ্গে? মনের হাত দিয়ে নিজের মধ্যে একটু হাতড়ে দেখেন মিস হুড। এ কি তার ঈর্ষ্যা-জনিত কাতরতার ফল?

সে যাই হোক, বিয়ের সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানের আয়োজন সম্পূর্ণ।

হংকং-এ বিয়ে, কিন্তু সব কিছুতেই পশ্চিমী ছোঁয়া। কনের গায়ের শাদা গাউন আর ওড়না, হাতে শাদা ফুল বেদীর কাছে বরের জন্যে অপেক্ষা। তার সাথী মেয়েরাও ফুল হাতে দাঁড়িয়ে কনের এপাশে ওপাশে।

বর নির্দিষ্ট সময়ে কনের পাশে এসে দাঁড়াতেই পবিত্র বিবাহবন্ধনের সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠান শেষ করে যেন প্রধান ধর্মযাজক প্রার্থনা পাঠের মধ্য দিয়ে। সকলের শুভ কামনায় আমোদিত হয়ে ওঠে পরিবেশ। সেই পরিবেশ থেকেই ধীরে ধীরে সবাই বিদায় নেন সুশৃঙ্খলভাবে।

অবশ্য এই-ই সব নয়। বিয়ে উপলক্ষে চীনাদের কতগুলো চিরাচরিত রীতিও পালিত হয়ে আসছে যুগ যুগ ধরে। যে সব চীনা খৃষ্টান হয়ে গেছেন তারাও এসব রীতি বর্জন করেন নি। সে সবই মিঃ ইয়ং বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করছেন আনার বিয়ের বিরাট ভোজসভায় উপস্থিত হয়ে।

মিস হুড কেমন যেন একটু অন্যমনস্ক তবু মাঝে মাঝেই তিনি এটা ওটা বুঝিয়ে দেন মিঃ ইয়ং-কে আমন্ত্রিত আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব তো বটেই, বাড়ির সবাই রাখির ভোজসভায়। একেবারে বুড়ি ঠাকুরমা থেকে শুরু করে বৌদির কোলের ছেলেটি অবধি এ আনন্দের অংশীদার। বাড়ির এবং বরপক্ষের আসল আসল লোকদের সঙ্গে মিস হুড-ই তাঁকে তাঁকে মিঃ ইয়ং-কে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছিলেন।

ভোজ উৎসবে সারা হল ঘরটি জুড়ে লালরঙের ছড়াছড়ি—বাতির চাদনা দেওয়ালের কাগজ টেবিল ক্লথ এমন কি শিশু এবং মেয়েদের গায়েও লাল রঙ। লাল হলো চীনাদের আনন্দের রঙ কিনা তাই।

লবার চোখই অবশ্য নববধূর দিকে। এই বাকি যার চলে আসছে—বধূকে খুশি দেখাবে, কিন্তু উজ্জ্বল নয়। তার ঠোঁটে হাসির রেখার বিদ্যুৎ খেলবে, কিন্তু কখনো জোরে হাসা চলবে না। এতদিন ঘরে বাড়িতে বাপ-মা এবং আর সব গুরুজনদের কাছে যে সব আচার-আচরণ শিখে আসতে বিয়ের উৎসবেই যে তার পরীক্ষা!—এসব কথাই একটু একটু করে মিস ফুড বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন তাঁর অতিথি বন্ধুকে।

প্রধান খাবার টেবিলের ঠিক মাঝখানেই বসেছে আনা তার স্বামীর পাশে। আর ওকে ঘিরে শ্বশুরবাড়ির সব লোকজনেরা। ধীরে ধীরে খাওয়া চলেছে। শার্কিনস্-এর মেন ডিস না আসা পর্যন্ত এমনি ধীরে খাওয়াই নিয়ম। তারপর এক সময়ে নবদম্পতি বাবার বাপ-মায়ের সঙ্গে উঠে এসে এক একটি টেবিলের চারদিকে ঘুরে ঘুরে বড়বার জানাবে সব অতিথিদের এবং শুভ কামনা প্রার্থনা করবে। সব শেষে পোশাক বদলে 'শ্বশুরবাড়ি যাবার পোশাকে' সজ্জিতা হয়ে আরেকবার আসরে এসে উপস্থিত হয় নববধূ। সে পোশাক হয়তো বিখ্যাত 'মোহনে'র কিংবা কোন ফরাসী মডির বানানো। মুহূর্তের জন্যে সে দিকেই সবার দৃষ্টি নিবদ্ধ। কিন্তু আবার বিদায় প্রার্থনা সবার হৃদয়কে এমনভাবে স্পর্শ করবে যে পরক্ষণেই প্রত্যেকের মন থেকে মুছে যেল পোশাকের ঔজ্জ্বল্যের কথা।

কিন্তু এত বিষণ্ণতার ছায়া কেন মিস ফুড-এর মুখখানি জুড়ে? ভোজসভা থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে এই একটি প্রশ্নই মিঃ ইয়ং-এর মনকে কেবলি দোলা দিতে থাকে। চলতে চলতে হঠাৎ তাঁর মনে হলো, বেলা পড়ে আসছে, মিস ফুডকে নিয়ে তাঁর হোটেলে ফেরে খানিক আড্ডা জমালে মন্দ হয় না।

৺পূজার বাজারের শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ

* রেশমী বস্ত্র *

ও

অন্যান্য কুটীরশিল্পজাত দ্রব্যের বিচিত্র সমাবেশ

পশ্চিমবঙ্গ রেশমশিল্পী সমবায় মহাসংঘ লিঃ

(পশ্চিমবঙ্গ শিল্পাধীকারের প্রত্যক্ষ পরিচালনাধীন ও খাদি গ্রামোদ্যোগ কমিশন দ্বারা প্রমাণিত)

১২/১, হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১

বিক্রয়কেন্দ্রসমূহ :

(১) ১২/১, হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১
(২) কুটীরশিল্প বিপণি—
১১৩, এসপ্ল্যানেড ইষ্ট, কলিকাতা-১
(৩) ৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭
(৪) ১৪৯/১এ, বাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৯
(৫) ১৫৬, বিধান সরণি, কলিকাতা
(৬) ৪৫, টালিগঞ্জ সার্কুলার রোড, নিউ আলিপুর, কলিকাতা-৫৩
(৭) বাচন রোড—বেনাচিতি দুর্গাপুর-৩

রেশম বস্ত্রে রিবেট ২০%
খাদি বস্ত্রে রিবেট ৫%

গাড়িতে উঠে ইচ্ছেটা প্রকাশই করে ফেলেন মিঃ ইয়ং। তাতে কোনো আপত্তি নেই মিস ফুড-এর। আজ যে ছুটির দিন, ঘরে ফিরে তো একা একাই কাটাতে হতো! তার চেয়ে বরং একটু আড্ডা দেওয়াই ভালো। মনটাও হয়তো তাতে খানিক প্রফুল্ল হবে, আর এক বিদেশী ভদ্রলোককেও কিঞ্চিৎ খুশি করা যাবে।

এ সব ভেবেই সম্মতি দেন মিস ফুড এবং মিঃ ইয়ংকে নিয়ে নিজেই নিজের গাড়ি চালিয়ে হোটেল পেনিন্সুলায় চলে আসেন। এবার আর লাউঞ্জে গিয়ে বসা নয়, লিফটে চড়ে সটান একেবারে কিক্‌থ ফ্লোরে—রুম নাম্বার ৫৩৪-এ।

ড্রিঙ্ক। অর্ডার করুন মাই ড্রিঙ্ক ড্রিঙ্ক!—কুশনে বসেই হাত-পা ছড়িয়ে দিয়েই এই অনুরোধ জানান মিস ফুড। আর তাঁর ইচ্ছে জেনে নিয়ে ফোনে সেই মতোই অর্ডার দেন মিঃ ইয়ং।

বয় এসে মদের আসর জমিয়ে দিয়ে যায়।

আপনি কিন্তু আজ বড্ড বেশি ড্রিঙ্ক করছেন মিস!—এই বলে বোধহয় মিঃ ইয়ং একটু সাবধান করেই দিতে চাইছিলেন ফুড দম্পতিকে। কিন্তু সে বেচারা একেবারে নাছোড়বান্দা!

নেভার মাইণ্ড মাই ডিয়ার এভার গ্রেণ্ড, আই লাইক টু এনজয় এভ্রি মিনিট!—বলেই মিস ফুড আরেক পেগ হুইস্কি ঢেলে নিলেন গ্লাসে।

তার পরেও সে আড্ডা চলে অনেকক্ষণ ধরে। বেওয়ারিশ বোতলের টিপে রেল দিয়ে আরো দু'বার অন্তত মদ আনতে হয় বয়কে ডেকে। শেষবার যখন বয় আসে তখন আর কোনো নতুন অর্ডার দিতে হয় না তাকে। মিস ফুড তখন মিঃ ইয়ং-এর শয্যায় সটান।

কল-মে, মাই টার্ন নাই!—ক্যাটোনিজ ভাষায় বয়কে বিলটা নিয়ে আসতে বলেন মিঃ ইয়ং। আর সে কথা কানে যেতেই টলতে টলতে উঠে বসেন মিস ফুড।

ও নো নো, নট নাউ। এ কিউ মোর ড্রিঙ্কস প্লিজ!—ভীষণ একটা যন্ত্রণা, একটা অস্বস্তির সুর ফুটে উঠে মিস ফুড-এর কণ্ঠে। সেই যন্ত্রণা থেকে নিষ্কৃতি চান তিনি। সেই জন্যেই তাঁর আরো মদ চাই, আরো নেশা। অনেক বুঝিয়ে সুজিয়ে কোনো রকমে তাঁকে শান্ত করেন ইয়ং সাহেব এবং বিলের দাম দিয়ে বয়কে বিদায় করে দেন।

আজ থেকে আমি কত সুখী! নিজের স্বামী, নিজের সংসার নিয়ে কত সুন্দর সুন্দর কল্পনার জাল বুনে চলবে সে।—নেশার ঘোরে বলতে বলতে হঠাৎ চুপ করে যান মিস ফুড। মিনিট দুই পরেই আবার নিস্তেজ স্বরে বলতে আরম্ভ করেন—আমারও জীবনে কম পুরুষ আসেনি, কিন্তু একটাও পুরুষের মতো পুরুষ পাই নি; আই ওয়াণ্ট এ টাইগার, ইয়ং অর ওল্ড আই ডোণ্ট মাইণ্ড, বাট ম্যান মাস্ট বি এ টাইগার।

মিস্ ফুড-এর কথা শুনে চমকে ওঠেন মিঃ ইয়ং। তবে কি তাঁকে লক্ষ্য করেই বলছেন তিনি। জড়িয়ে জড়িয়ে আরো অনেক কিছুই বলে চলেছেন মিস ফুড। কখনো থামছেন, আবার হঠাৎ হঠাৎ বলে উঠছেন। তবে অনেক অসংবদ্ধতা সত্ত্বেও তাঁর মুর্ষমুখী মন সে সব কথায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

এ মাসটা সেপ্টেম্বর হলে ভারি ভালো হতো। সেপ্টেম্বরের নয় তারিখে আরো অনেক লোকের সঙ্গে কিংবা আমরা দু'জনেই অনেক অনেক দূরে সেই পাহাড়ের চূড়ায় একেবারে সেই ভিক্টোরিয়া পিকের ওপরে চলে যেতাম যেখানে কোনো বিপদই আমাদের কখনো স্পর্শ করতে পারতো না। জানেন না

বোধ হয়, দু'হাজার বছর আগে কোন দূরদর্শী চীনা পরিবার আসন্ন বিপদের আশঙ্কায় ঐ পাহাড় চূড়ার আগে থেকে পালিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষা করেছিলেন। সেই থেকেই তো প্রতি বছর সেপ্টেম্বরের নয় তারিখে আমাদের চেউং ইয়েউং উৎসব অর্থাৎ আত্মরক্ষার উৎসব চলে আসছে। চলুন, আত্মরক্ষার জন্যে আমরাও অনেক অনেক দূরে কোথাও পালিয়ে যাই।—শুয়ে শুয়েই একটানা এতগুলো কথা বলে হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে যান মিস কুক। চোখ দু'টো আর যেন মেলতে পারছেন না তিনি। অতিরিক্ত নেশার ফল। সেই ভোজ-সভার টেবিল থেকে শুরু আর এই হোটেলে অবিরাম লবাব-পাঁয়ন! তার জের যাবে কোথায়? মিস কুক তাই অসাড় হয়ে ঘুমুচ্ছেন এখন।

ইয়ং সাহেবের চোখে তাঁরি সুন্দর লাগছে ওকে এই অবস্থায়। একটা অবাক কামনার দৃষ্টি দিয়ে তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে চলেছেন মিস কুকের সর্বাঙ্গ। ডিভোর্সের আগে মিসেস ইয়ংকেও সময় সময় তিনি এমনিভাবে দেখতেন,এর চেয়েও নিবিড়ভাবে দেখতেন। সহসা সেই সব ছবি তাঁর চোখের সামনে ভেসে ওঠে আর তিনি ঘামতে যান।

রাত আটটা নাগাদ মিস কুক ফিরে আসেন তাঁর নিজের ঘরে। ছুটির রাতে আজ সম্পূর্ণ বিশ্রাম আর কেবলি আকাশ-পাতাল চিন্তা।

মদের নেশায় এমন কতগুলো কথা তিনি বলে ফেলেছেন ইয়ং সাহেবকে যার জন্যে এখন ভারি লজ্জা বোধ হচ্ছে মিস কুক-এর।

আরে কী মুস্কিল ওভাবে আপনি এত ভাবছেন কেন? আমারও তো তা' হলে লজ্জা পাবার অনেক কারণ রয়েছে. কিন্তু সে সব নিয়ে আমি তো মোটেই কিছু ভাবছি না। সত্যি কথা বলতে কি, আমাদের মধ্যে যে পর্যায়ের কথাবার্তা হয়েছে তারপর আর এ ধরণের কথাবার্তা অবান্তর। মাথার কাছে ফোনটা হঠাৎ ক্রিং করে উঠতেই মিস কুককে জুৎসই জবাবে চুপ করিয়ে দেন মিঃ ইয়ং। রাত তখন প্রায় বারোটা। ইয়ং-এর কথায় ক্লান্তির সুর ধরতে পেরে আর কথা বাড়াতে ভরসা পান না মিস কুক,—'গুড্ নাইট্, হ্যাভ গুড্ স্লিপ' বলেই ফোন ছেড়ে দেন।

এর পরে আর একদিন মাত্র তাঁর অপূর্ব নৃত্য পরিবেশন করেছেন মিস কুক হংকং নাইট ক্লাবে। তারপর?

তারপর যেন কিছুদিন বাদে ক্লাব-ম্যানেজারের নামে একখানা চিঠি এলো নিউইয়র্ক থেকে। পাঁচ-বছরের কণ্ট্রাক্ট করে ব্রডওয়ের কি-এক থিয়েটারে মিস কুক যোগ দিয়েছেন, এই সংবাদ। আরো সংবাদ আছে ঐ চিঠিতে। খুব শীঘ্রিই মিস কুক মিসেস কুক ইয়ং হতে যাচ্ছেন এবং মিঃ উইলিয়ম সি ইয়ং নিজেই কিনিয়ে থিয়েটারের প্রোপাইটার, এ খবরও লিখে জানিয়েছেন হংকং-এর সেরা নৃত্য-পটিয়সী স্বয়ং।

চিঠিখানি পড়া শেষ হতেই ম্যানেজার তাঁর টেলিফিতে যেন দেখতে পেলেন ভয়ঙ্কর রকমের একটা অহঙ্কারের মত্ততায় হাসে আমেরিকানের একখানি বিমান কাইটাক এয়ারপোর্ট থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল।

হংকং নাইট ক্লাবের বিজ্ঞাপনে অবশ্য কুক সো-শানের নামটা এরপরেও চালু রাখা হয়েছে। কিন্তু ক'দিন আর লোককে ফাঁকি দেওয়া চলবে?

উপন্যাস

বাড়ি থেকে পূর্বদিকে

বাণী রায়

নিম টুথ পেষ্ট সব বয়সের পক্ষেই সমান উপকারী মাজন।

নিম টুথ পেষ্ট-ই হল একমাত্র টুথ পেষ্ট যার মধ্যে নিমের বীজবারক, দুর্গন্ধনাশক ও কষায় গুণের সঙ্গে আধুনিক দন্তবিজ্ঞান-সম্মত ঔষধাদির সার্থক সমন্বয় ঘটেছে। এই টুথ পেষ্ট পাইওরিয়া, ক্যেরিজ এবং টার্টার নিরোধে সাহায্য করে, দাঁতের এনামেল অটুট রাখে এবং মুখের দুর্গন্ধ দূর ক'রে প্রশ্বাস সুরভিত করে।

নিম-এর তুলনা নেই।

চিঠি লিখলে নিমের উপকারিতা সম্বন্ধীয় পুস্তিকা পাঠান হয়।

নিম টুথ পেষ্ট

দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোম্পানী লিঃ কলিকাতা—২৯।

প্রস্তাবনা

দক্ষিণ সাগরে জাগে সহস্রদল বাসনার পদ্ম।

যে পথে জীবনে কখনও যাই না, বর্ণবহুল সেই পথের উপর বয়ে যায় দক্ষিণ বাতাস। ফুল ফুটে ওঠে, নানা বর্ণে। সমগ্র পৃথিবী ফুলে ফুলে ওঠে ফুলে। সোমুখী নিঃসৃত নীলধারা সঙ্গে দক্ষিণ সাগরের অবগাহনে চলে।

উপত্যকা সমৃদ্ধ হয়। নদীর তীরে তীরে ফুল ফোটে। জলে ফুল, মাটীতে ফুল, পাথরে ফুল, জলে ফুল।

গাছে নূতন হরিৎ পাতার কুঞ্জ, সেখানে নানা গলার পাখী। কত পাখী! ঘুরে ঘুরে আকাশ, মাটী একসূত্রে গেঁথে তোলে।

মেঘ ভাসে আকাশে। হাল্কা সাদা-সাদা মেঘ। নীলের বুকে ভাসায় গভীর সাদার ছায়া। রামধনুর রংএ সাজে আকাশ। কমলাফুলী রংএ ছেয়েছে আলো।

দক্ষিণা বাতাস বয়। তাই তো ফুলে সঞ্চিত হয় সৌরভ। পাখীর গানে জাগে তান। আলোতে রং জাগে।

জানিনা কোন সে নদী, বিপাশা, বেত্রবতী কিনা, সেখানে এই অনঙ্গ দক্ষিণ বাতাসের দাক্ষিণ্যে আমার জীবনে বিপুল সম্ভাবনা মূর্তি পরিগ্রহ করবে। আমার মনে আঁকা সেই পথ, সেখানে দক্ষিণ বাতাস চির বহমান। সেই পথ আমি কি খুঁজে পাবো?

এদিকে বয়ে যায় পূবালী হাওয়া।

আবার বয়ে যায় পুবে বাতাস। দক্ষিণ বাতাসের বুকের ওপরে হত্যা করে যৌবনকে।

সুমেরু পার হয়ে কঠিন হিমতীব্র বাতাস বয়ে আসে। জাহ্নবী ধারা সোমুখীর ধারে হিমবাহ হয়ে যায়। উপত্যকার বরফ পড়ে ঢেকে দেয় তৃণগুল্মলতা।

হু-হু করে পুব বাতাস বয়ে যায়। ঝরে পড়ে ফুল। একে একে পাখী উড়ে যায় আবার দক্ষিণা বাতাসের দেশের সন্ধানে। গাছের পাতা আগে হলদে হয়। ঝরে পরে ধুলোয়। নিষ্পাণ-রিক্ত গাছ নিঃস্ব দাঁড়িয়ে থাকে।

মাটি মসৃণতা বিহীন রুক্ষ-ধূসর হয়ে ওঠে। পাথরে পাথরে কাঁটাভরা ফণীমনসা জেগে মাথা তোলে।

সমস্ত হাল্কা নীল-সাদা আকাশ কালো জোড়ো মেঘ ঢেকে ফেলে। আলো হয় নিষ্প্রভ। সমগ্র পটভূমিকায় শুধু পূবালী বাতাস বয় অবিরাম।

দক্ষিণের দাক্ষিণ্য জমে যায় তুষারকাঠিন্যে। দক্ষিণা বাতাস গতি পরিবর্তন করে পুবে বয়। দক্ষিণা বাতাসের স্রোতের উপর স্রোত জাগিয়ে তীক্ষ্ণ ধারে ক্রতগতিতে পূব বাতাস রাজত্ব করে।

যৌবন স্থবির হয় সেখানে। অন্বেষা পথ কুয়াশাস্তরে ঢাকা পড়ে। দক্ষিণ সাগর উত্তাল বরফ জমানো মহাপারাবার হয়ে মৃত্যুর মত শিকারের অপেক্ষায় থাকে। সুমেরুর বাতাসে শীত, শীত

যৌবন মৃত্যুর প্রতীক্ষায় মাথা নামায়, জরা হয়ে যায়।

পূবালী হাওয়ায় দক্ষিণকে ডাকাই আমার সাধনা।

প্রথম কাণ্ড

গাছের গোড়াগুলো খুঁড়ে দিচ্ছিলাম।

এখনি জলের হোজ চালিয়ে মামা গাছগুলোর জল দিয়ে যাবেন। গাছ কাটা কাঁচি হাতে, পেছনে নৃত্যগোপাল এসে যাবে। মামা গাছের যত্নে ত্রুটী হতে দেন না। তবু ভাগ্য বলতেই হবে, গাছে ওঁর ফুল ফোটে না, গাছগুলো ভাল করে সবুজ পাখনা মেলার আগেই কুঁকড়ে যায়। দুএকটি কলি এক-আধটা ধরলে মামার কি হর্ষ! কিন্তু তারাও শুকিয়ে ঝরে পড়ে।

সহরতলীর অংশটাতে ছোট ছোট নূতন বাড়ী। অধিকাংশ বলে সকলেই অল্পবিস্তর জমি রেখেছেন বাড়ীর আগে পিছে। অবসরপ্রাপ্ত লোকগুলির বাগান রচনায় উৎসাহ প্রবল।

আমি ভেসে এসেছি এখানে। চাকুরি নেই, বেকার তরুণ আমি। মামাকে দেখবার লোক নেই, মামা তো চিরকুমার। তাই এখানে কিছুদিন থাকতে এলাম মামার আহ্বানে। এখানে যদি কিছু জুটে যায় দেখি।

কিন্তু এখানকার তরুণ-তরুণীরা গেল কোথায়! তরুণীকুল না হয় বিবাহ যোগ্যা পরবাসিনী, কিন্তু তরুণেরা কোথায়? চাকুরি নিয়ে সহরতলীর বাইরে সহরে তারা চলে গেছে। তারা কোন না কোন প্রকার ও প্রণালীতে এখান থেকে চলে গেছে।

অবসরপ্রাপ্ত চাকুরিয়া, বিধবা বা চিরকুমারী, বেকার বৃদ্ধ এদের দ্বারাই পূর্ণ এই স্থান। জ্যোৎস্না সন্ধ্যায় ছোট ছোট ফুলবাগানে ডেকচেয়ার পড়ে, রাংচিতের বেড়ার ওপার দিয়ে এ ওর দিকে গলা ছুঁড়ে-ছুঁড়ে ভাব বিনিময় করে থাকেন। কৃষ্ণপক্ষ হলে কোন ঘরের কয়াসে বসে তাসের আসর জমানো হয়। কখনও বা ছিটকে কোন তরুণ-তরুণী দেখা-সাক্ষাতে এলে তাদের কেন্দ্র করে উৎসব হয় এক-আধটু। বেতারে ভাল নাটক থাকলে তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হয়ে এক বাড়ী বসে সকলেই শোনেন, তারপর প্রবল উৎসাহে তাই নিয়ে আলোচনা চলে কিছুক্ষণ। খবরের কাগজটা যাবৎ উত্তেজনার বস্তু। বাইরের জগতের একমাত্র নিয়মিত যায় সেই এনে দেয়। কাগজ হাতে এলেই চাকরবাকর থেকে সুরু করে বন্ধু-পরিজনকে ডেকে ডেকে বলা হয়।

সকলেরি দেখা কোন ব্যাধি আছে। রক্তচাপ বৃদ্ধি বা হ্রাস, বাত, বহুমূত্র ইত্যাদি। তার জন্য প্রায়ই সকালে ডাক্তারের চেম্বারে যাওয়া হয়। সেখানে খবরের কাগজের সংবাদের তীব্র সমালোচনা হয়। তরুণের যেমন দেখা-সাক্ষাতের স্থান চায়ের দোকান, এঁদেরও সাক্ষাতের স্থান ডাক্তারবাবুর চেম্বার। দুই-তিনটি ডাক্তার আছেন বার্ধক্য কলোনীতে। তাঁরা স্নানাহারের সময় পান না।

দাঁত ও চোখ নিয়ে যা অন্য ব্যাধি বাড়লে কদাচিৎ শহরে ডাক্তারের কাছে যেতে হয়। রীতিমত ভ্রমণযাত্রা সেদিন। ছেলে-বৌ বা মেয়ে-জামাই অথবা অন্য পরিজন গাড়ী নিয়ে আসে, কিম্বা ট্রেনে করে নিয়ে বাকীটা ট্যাক্সি চালায়। ফিরে এসে দিন রাত গল্প চলে দু-একদিন।

ছেলে-বৌ বা নাতি-নাতনী থাকে না কাছে। আমতা আমতা করে বলা হয়, "আমি আবার শহরে খাঁচায় থাকতে পারি না—নিজের বাড়ী, গাছপালা ছেড়ে—ওরাও কাজ করে যাবে—ছেলেমেয়ের পড়াশোনা আছে—" ইত্যাদি ইত্যাদি।

অবশ্য কেউ কাউকে সন্ধানী প্রশ্ন করেন না। পুরুষেরা অধিকাংশই বিপত্নীক বা চিরকুমার। মহিলারা বিধবা বা চিরকুমারী। দুই চারজন ভাগ্যবানের মোটাসোটা বা রোগা খিটখিটে অধর্মী স্ত্রী আছে অবশ্য। তাঁরা গাইট বা মাইগ্রেনের রুগী। বিধবা বা চিরকুমারীদের কখনও বা আনার মত কাছের আত্মীয় থাকে একটা করে, কখনও বা তা-ও না। প্রতিবেশীরাই দেখাশোনা করেন। চিরকুমারীদের এক-আধটা বদ্যি কুকুর থাকে, পুরাণো দাসী থাকে। বিধবাদের থাকে জপের মালা, গুরুদেবের ছবি।

এমন একটা পরিবেশে এসে পড়লাম। এখানকার অলিখিত আইনে নেতা হচ্ছেন অবসরপ্রাপ্ত সাবজজ জয় হাজরা। ওঁর টেলিফোন আছে। সকলেরি কাজে লাগে। আগে রিসিভারটি তুলে টেলিফোন সেরে শব্দ না করে নামিয়ে রেখে আসেন সকলে। অপ্রতিভ ভাবে একটি সিকি টেলিফোনের বই-এর নীচে গুঁজে রেখে আসেন তাঁরা। জয় হাজরা অমায়িক জন্যতায় বলেন, "পেনসনী মানুষ, ভাই। তোমাদের মত ভবিষ্যতের ভরসা ছেলেমেয়েও নেই। তাই বাধ্য হয়ে খরচটা নিতে হচ্ছে। যখন খুশী এসো। তোমাদেরি টেলিফোন।"

কনট্রাক্টর পঞ্চানন প্রামাণিকের চিরকাল গাড়ী চালিয়ে অভ্যাস। পঁয়ষট্টি বছর বয়সেও গাড়ী চালিয়ে ফেরা চাই। পুরাণো মান্ধাতাকালের মায়ারী ফোর্ড। তবু সকলেরি বল ভরসা। দরকার হলে "পঞ্চাননের গাড়ী আছে" বলে ভরসা পাওয়া যায়। বাস্তবিক পক্ষে বছর রতিকান্তবাবুকে তৎক্ষণাৎ শহরে হাসপাতালে গাড়ী করে না পৌঁছে দিলে অ্যাপেণ্ডিসাইটিস ফেটে যাবারই উনি বেতেন। ভাগ্যি, পঞ্চাননের গাড়ী ছিল। তেমন তেমন ক্ষেত্রে পঞ্চানন পৌঁছে দেন, তবে "রিটায়ার করেছে, পেট্রলটা দিয়ে যেই—।" এ ব্যবস্থায় সবাই প্রীত; পঞ্চাননের খিটখিটে স্ত্রী ছাড়া। বেশ গাড়ী চালিয়ে স্বামী ওঁর মাছ খাওয়া ঘুচিয়ে দেবেন এই চিন্তায় মাথা ধরে ওঠে পঞ্চানন-পত্নীর।

কবিরাজও আছেন একজন। ঔষধ তৈরির খরচ ভিন্ন তিনি দর্শনী নেন না। তাঁর মেয়ে সংসার দেখে, কলোনীর প্রাথমিক স্কুলটাও চালাবার চেষ্টা করে। কিন্তু আধ বুড়া মহিলার স্কুলে ছাত্র-ছাত্রী পাওয়া দায়। আগেই বলেছি, ছোট ছেলেমেয়েরা ওখানে কোথায়?

সকালে আসে গোয়ালা গরু নিয়ে। দু'একজনের গরু আছে, যথা রিটায়ার্ড সহ-স্কুল-পরিদর্শিকা মিস বরাটের মূলতানী গরু। যাঁদের নেই গরু, তাঁরা দাঁড়িয়ে দুধ দুইয়ে নেন। কেবার পরিমাণ বেশী দিচ্ছে গোয়ালা বলে খেচা-খেচি করেন। নির্বিকার গোয়ালা জল মাপে। শুনে শুনে অভ্যাস হয়ে গেছে ওর। এসব বলে সময় না কাটালে এঁদের চলবে কেন?

ডিমওলা আসে। অনেকের হাঁস-মুরগী আছে, যেমন আমার মামার। বাকীরা দরকার মতন ডিম রাখেন। বাজার একটা থাকলেও মাছওলা একটা আসে দরজায়। আনাজ তরকারী প্রায়ই কিনতে হয় না কারুর। বাড়ীর পেছনে প্রায় সকলেরি কিচেনগার্ডেন আছে।

পিয়ন ঘুরে যায় অবহেলায় একবার। কারুরই তেমন চিঠি আসে না, এক ডাক্তারবাবুদের ছাড়া। তবু সাড়ম্বরে অনেকেই লেটার-বাক্স খুলিয়ে রাখেন, পিয়নের সাড়া পেলে উৎকর্ণ হন। মাঝে মাঝে অবশ্য আত্মীয়-স্বজনের পরলোক গমনের সংবাদ আসে। তখন সকলে সান্ত্বনা দিতে ছুটে আসেন। কখনও নাতি-নাতনীর কৃতিত্বের খবর আসে। সগর্বে সানন্দে সকলে শোনেন।

পাকিস্তানাগতা বিধবা অমিদার গৃহিণীর কাছে মা-বাপ-খেদানো-মরকুটে বোনপো থাকে। এ

অকলে প্রফেসার-গিন্নীর ছেলেমেয়ে ছাড়া ছোট মানুষ নেই। কবিরাজ কন্যার পাঠশালায় পড়ে সে। অধিকার গৃহিণীর তাকে আদর যত্নের সীমা নেই। তাঁর উপরে নির্ভরশীল একজন আছে এ যেন অনুভবে তিনি গর্বিতা। সর্বদাই যেখান যেন তাঁর আহার নিদ্রার সময় নেই এই মনোহর রক্ষণা-বেক্ষণের কর্মে। দশ বছরের ছেলে, তবু কোথাও গেলে বলে ওঠেন একটু পরেই, "যাই ভাই, পিন্টু একা আছে। আমাকে না দেখলে বেশীক্ষণ থাকতে পারে না।'

পিন্টুকে দেখেছি। বোকার মত ক্যাল্ ক্যাল্ করে চেয়ে পথ চলে। সকলেই নিজেদের মধ্যে ছোট ছেলেটাকে পেয়ে খুশী। যদ যেমুন কিনে যেন 'হে-আনা' ফেরিওলার কাছ থেকে। কিন্তু যত্ন-আদরেও পিন্টুর মনে সুখ আছে বলে মনে হয় না। চারপাশে বুড়ো দেখে দেখে হতভম্ব হয়ে গেছে সে।

মোড়ের দশমে বাড়ীর লাহিড়ী-গিন্নী জগমোহিনী প্রতি পূর্ণিমায় সত্যনারায়ণ করে থাকেন। ছেলে বিদেশ থেকে মোটা টাকার অঙ্ক পাঠায়। তাই পাড়ার লোককে প্রসাদ বিতরণ চলে। সেদিনটা উৎসব। সকাল থেকে এ ওকে বলেন, "আজ সন্ধ্যায় লাহিড়ী বাড়ী যেন হবে।"

কখনও সেখানে গান হয়। ভাঙা-বসা গলায় অবর মুখার্জি গান ধরেন :—

"মলয় আসিয়া করে গেছে কানে, প্রিয়তম তুমি আসিবে—"

কখন বা মিস বরাট বিস্তর অনুরোধের পরে কাঁপা গলায় গান ধরেন,—"আমারও বাগানে এত ফুল, তবু কেন চলে যায়?" আমার মামা গান শুনে নিঃশ্বাস ফেলেন। পরে আমাকে ডেকে বলেন,—"রবি, ওই ল্যাটালগে যে সারের কথা কাল পড়লাম, সেটা আনতে চিঠি লিখে দে। সত্যিই বাগানে আমার ফুল ফুটল না।"

উক্ত সার এলেও মামার বাগানে ফুল ফোটে না। মামা হা-হুতাশ করেন, "এতদিনের সখ আমার, নিজের ফুলের বাগান নিয়ে জীবনের শেষটা কাটাব। এখানে ফুটবে ক্রিসেন্থিমাম ওখানে ফুটবে চাঁপা। গোলাপের বেড়ের পাশে চেয়ারে বসে থাকব। ফুলের গন্ধে ঘুম পাবে। বৌমাছির আনাগোনা দেখব। তা, ভাগ্যে আমার হল কই? এত করে তোকে আনালাম চিঠি লিখে লিখে। যদি তোর হাতের গুণে গাছপালার উন্নতি হয়। তা হ'ল কোথায়?"

আমি যেহেতু হড়নি বা পি, সি, সরকার নই সেজন্য আমিও হা হুতাশ করি।

এরি মধ্যে গাছের ফুলে না হোক মনের ফুলে রং ধরল।

কিছুদিন থেকেই দেখছি মিস বরাটের প্রাতঃভ্রমণে বেড়োবার পথটা মামার বাগানের সামনে দিয়ে ঘুরে যাচ্ছে। মামাও সকালে উঠেই পড়ি-মরি করে বাগানের কাজে লাগেন। নোংরা হয়ে যাবে জেনেও রোজ দুরন্ত ট্রাউজার বা'র করেন। কাঁচাপাকা চুলে কাটেন বাঁকা সিঁথি। মিস বরাটের গতিটা বাগানের ধারে এলেই কেমন মন্থর হয়ে যায়, মামারও বেড়ার ধারে ধারার দরকার পড়ে।

একদিন গোটাকিসে যাচ্ছি গান কিনতে, মাকে চিঠি লিখব। আর এখানে ভাল লাগছে না। কেমন বিমনো আবহাওয়া, আরভিংএর ঘুমন্ত উপত্যকার মত। এখানে কোনদিন প্রাণস্পর্শ পাওয়া যাবে না। এখানে কোন পাখী গান গাওয়া ভুলে গেলে তবেই এই সব হলুদেটে পাতাগাছে বসতে আসে। কুকুরগুলো এখানে মোটা হয়ে কেবল রোদ পোহায়। ছাই রংএর বিড়ালটা বহুবল্লভের

পরে ঘাস খেয়ে অসুস্থতার জন্য এখানে আসে মাত্র। জমিদার গৃহিণীর কাকাতুয়াটা বুড়ো হয়ে চোখে দেখে না। এখানে থেকেই বা কি করবো?

মিস বরাটের বাড়ীর কাছে এলাম। তিনি এ জায়গার মাটিতে ফুল ফোটানো বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হয়ে বিশুদ্ধ শহর থেকে কয়েকটি গাছ এনে লাগিয়েছেন। অতএব ফুলের বনে তিনি ধনী।

কাল চুড়িদার শাড়ী-পরা মিস বরাট হাইহীল চটির ওপর ঘুরে বেড়াচ্ছেন বাগানে। শুকনো চামড়া, পাকা চুল, রোগা গড়ন। আমাকে দেখে পায়ে পায়ে বেড়ার কাছে এগিয়ে এলেন।

"কি রবি, বাজারে যাচ্ছ নাকি?"

আমি বিস্মিত হলাম, "বাজার তো নিত্যগোপাল করে রোজ। আমি ডাকঘরে যাচ্ছি।"

"ও! বেশ। আমার দু'খানা টিকেট এনে দেবে? দাঁড়াও পয়সা দিচ্ছি। ভেতরে এসো না।"

একটি গর্ত সামনে। এক কোণায় সেলাই-এর কল বেতের টেবিলে বসানো, বেতের সোফা পাশে। আমাকে সেখানে বসিয়ে মিস বরাট ঘরের মধ্য থেকে নিয়ে এলেন পয়সা। কিন্তু সোজাসুজি আমার হাতে না দিয়ে হাতে রেখে কিছু বিধার পরে প্রশ্ন করলেন, "আজ কি রান্না হচ্ছে? রান্না বলে দেয় কে?"

আমি আরো বিস্মিত হলাম। ছোট জায়গাটির মধ্যে সবাই সকলকে চেনে। অতএব এ ধরণের কথার কোনই থাকে না। উত্তর দিলাম, "নৃত্যগোপাল নিজেই সমস্ত ঠিক করে। মামার কিছু খাবার ইচ্ছে হলে তিনি অবশ্য ব্যবস্থা করতে বলেন। এতদিন থেকে থেকে নৃত্যগোপাল শিল্পী হয়ে গেছে।"

ইতস্তত করে মিস বরাট বললেন, "তোমার মামা কি খেতে ভালবাসেন?"

"মিষ্টি-টিষ্টি বেশ খান।"

চকিত হয়ে মিস বরাট বললেন, "এই নাও পয়সা। যাবার পথে দিয়ে যেও কিন্তু। খুব দরকার।"

ফেরবার পথে টিকেট দিতে এলাম। মিস বরাট আমাকে একটু দাঁড়াতে বলে ঘর থেকে একটা অ্যালুমিনিয়ামের কৌটো এনে হাতে দিলেন, "আমার গরুর দুধে কোকো জমিয়ে চকোলেট করেছি। তুমি খেও—মামাকে দিও।" কৌটো নিয়ে ফিরে এলাম। মামা আনন্দে অভিভূত হয়ে পড়লেন। চামচের ডুলে মুখে দেন আর বলেন, "চমৎকার করেছেন তো। হবে না? অত উচ্চ শিক্ষিতা যে।"

উচ্চ শিক্ষিতাদের গৃহস্থালী সম্পর্কে আমার ধারণা উচ্চ নয়। আমি চুপ করে রইলাম। মামা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, "এখন আমি কি দেব বলনি, আঁ? ইয়াং লেডিদের ফুল দেওয়া উচিত কোন পুরুষের। তা, আমার বাগানে ফুল কোথায়?

"ইয়াং লেডি কে, মামা?"

মামা বিরক্ত হলেন,—"আরে, আমার চেয়ে অনেক ছোট তো। বেচারীর হার্টের অসুখ আছে বলেই না এত তাড়াতাড়ি রিটায়ার করেছে।"

আমি হাসি গোপন করে বললাম, "ফুল যখন নেই-ই মা'র, তখন ডিম দাও তুমি। তোমার লেগহর্ণগুলো চমৎকার ডিম পেড়েছে। মীটসেফে তুলে রেখেছি। তাই দাও।"

মামা খুশী হয়ে উঠলেন, "যা বলেছিস। ইয়াং ম্যান না হলে কি ইয়াং লেডির কি—মানে কোন লেডির কি উপহার—এই কৌটোটাতেই দেই? না, শোন গত সপ্তাহে শহর থেকে কেকের বাক্সটা এসেছিল—বেশ ফুল আঁকা—ওটাতেই না হয়—"

ফুল মামার অবসেশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। অগত্যা কেকের বাক্স বার করে ঝেড়েমুড়ে গুছিয়ে দিলাম ডিমের সারি। মামা বললেন, "যা দিয়ে আয়।"

আমি বললাম, "তুমিই যাওনা, মামা। চকোলেটের জন্যে ধন্যবাদও দিয়ে আসবে অমনি।"

"যেতে পারি। তাহলে জামা-কাপড়টা একটু—"

মামা কাপড় ছাড়বার ঘরে অদৃশ্য হলেন। আধঘণ্টা পরে রীতিমত বিয়ে বাড়ির সাজে এলেন।

ধন্যবাদ ও ডিম দিয়ে ফিরে আসতে প্রায় ঘণ্টাখানেক গেল। খাবার টেবলে মামা সংবাদ দিলেন, "কাল তোকে আমাকে মিস বরাট নেমতন্ন করেছেন রে, রবি। বলেছেন আমারি ডিম আমাকে ভেজে খাওয়াবেন। হাঃ—হাঃ! চমৎকার কথা কিন্তু ওঁর।"

"কিন্তু আমাদেরও খাওয়াতে হবে, মামা।"

"নিশ্চয়, নিশ্চয়। তুই না থাকলে আবার অবিবাহিতা মহিলার সঙ্গে মেলামেশার কথা হ'ত। ভাগ্যি তুই ছিলি।"

আমি ভাবলাম মামা চিঠি লিখে আমাকে আনিয়েছেন সে কি শুধু গাছের ফুল কোটাতে?

নেমতন্নের দিন সকাল থেকে মামার দিকে আর চাওয়া যায় না। দুইবার শেভই করলেন। দুটি গাঙ্গাবী পরে যাবেন। সেগুলো দেখে বেছে দিতে হ'ল আমাকে। বারম্বেসে সাঠির বয়সে মহিস-শিঙের ছড়ি বার হল। চুলে অন্ততঃ দশবার ব্রাশ-চিরুণী পড়ল।

মিস বরাটও সেদিন প্রাতঃভ্রমণে বার হননি। সুতরাং ওপাশেও প্রস্তুতি চলেছে। চায়ের পার্টি হয়েছিল মিস বরাটের পর্চে। ফুলের টাবগুলি এসেছিল সেখানে। সামনে তারে জালালা খচিত। ঘুরে কলের চিমনির ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে।

মিস বরাটকে প্রাত্ত দেখালেও বয়সটা যেন কমে গিয়েছিল, মনে হচ্ছে। গালে লালিমার ছোপ। ঝোপঝোপ চওড়া খয়েরী পাড় শাড়ী ও সাদা রেশমের জামায়, ব্যস্ত চলাফেরায় বয়সে আর যাহোক রিটায়ার করা মহিলা মনেই হচ্ছিল না। হি-হি করে কেমন সরু গলায় তিনি হাসছিলেন তরুণীর মত কথায় কথায়।

তাঁর দাসী খবর দিল যে, দিদিমণির কাল বুকে কষ্ট হয়েছিল।

মামা অধীর হয়ে উঠলেন, "ডাক্তার দেখান নি? ওরে থাকা উচিত।"

মিস বরাট বললেন, "ডাক্তার আবার কি দেখাব? পুরাণো ব্যাধি। দুটো পিল খেয়ে রাত্রে ঘুমুলেই ঠিক হয়ে যাবে।"

মামা বললেন, "না, না অবহেলা করা উচিত নয়। কাল সকালেই দেখাবেন। আজ কেন এত খাবার-দাবার কষ্ট করে আমাদের জন্যে করলেন, বলুন তো?"

"কষ্ট আবার কি? আমার সকর দুধের মিষ্টি, পায়েস করেছি মাত্র। একা-একা থাকি। লোকজন এলে কত ভাল লাগে।"

মামার মুখেও লালের ছোপ। কাঁচা-পাকা চুল বাতাসে উড়ছে। মামা হা-হা করে হাসছেন। মামার বয়সও যেন অনেক কম মনে হোল।

চা-খাওয়ার পরে দাসী জিনিষপত্র সরিয়ে নিলে মামাকে মিস বরাট বললেন, "এবার আপনার পাইপ চলুক।"

"কিন্তু, মেডিয়া আপনার ধূমপান সহ্য করতে পারেন না, জানি। গন্ধ লাগে।"

আবদেরে খুকীর ভঙ্গিতে ঠোঁট উল্টে মিস বরাট বললেন, "না, না। আমার গন্ধ লাগে না।"

"তবে নিশ্চিন্ত হলাম। কিন্তু এবার একটা গান—অবশ্য যদি শরীরে কুলোয়,—"

মামা সন্দিহান কণ্ঠে বললেন।

"শরীরের কিছু হয়নি," জোর দিয়ে মিস বরাট জানালেন, "কিন্তু আমি আবার কি গান গাই একটা!"

আমিও অনুরোধে যোগ দিলাম। অবশেষে ঘরোয়া কাঁপা গলায় মিস বরাট ধরলেন—

"আমার মল্লিকা বনে যখনি ধরেছে কলি
আমি তোমারি লাগিয়া তখনি হে, বেঁধেছিনু অঞ্জলি।"

এর পরে হয়তো মামা আবার ফুলগাছের পেছনে লাগবেন।

যেখানে দক্ষিণা বাতাস বয় না সেখানে ফুল ফোটে কি করে? মামা হয়তো আবার নূতন সার এনে ঢালবেন।

রাত্রি গভীর হল। অবশেষে চায়ের আসর ভঙ্গ করে প্রত্যাময়ণ জানাবার পরে—আমরা পথে নামলাম।

শুনলাম নবীন প্রেমিকের গলায় মামা বলছেন "কাল যেন ডাক্তার দেখাতে ভুল না হয়।"

সকালে উঠেই প্রি-অ্যাম্বল্ সুরু হল। পরশুদিন নেমন্তন্ন করা হয়েছে মিস বরাটকে। যদিও মিস বরাট আগেও বহুবার এসেছেন, তবুও মামা গোটা বাড়ীকে ঢেলে সাজাতে মন দিলেন। আমাকে বললেন, "রবি, তুই না হয় চট্ করে শহরে চলে যা, খাওয়া-দাওয়া সেরে। একটা টি-সেট, ভাল টেবল-ক্লথ নিয়ে আয়। কিছু মিষ্টিও নিয়ে আসিস।"

আমি বললাম, "কাল না হয় বেয়ে চাটকা মিষ্টি আনব। আজ থাক।"

মামা ঘাড় নাড়লেন, "নারে। কাল তুই আশপাশে না থাকলে নার্ভাস হয়ে পড়ব।"

"অবাক করলে, মামা। মিস বরাট তোমাদের এতদিনের চেনা। তিনি এসে আবার নার্ভাস হবে কি?"

"নারে! বিয়ে-টিয়ে করিনি তো, মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা অভ্যাস নেই তেমন। ঘরদোর যা হয়ে রয়েছে। লক্ষ্মীছাড়ার বাড়ী তো। মেয়েদের হাত না পড়লে কি ঘরদোরের শ্রী হয়? রেণুকা, মানে মিস বরাটের বাড়ী যেখনি কেমন কাল? একেবারে টিপ্-টাপ্!"

"তা মামা, লক্ষ্মীছাড়া হয়ে আছই বা কেন? একটা বিয়ে করে ফেল না। খুব সোজা কাজ।"

মামা হেসে ফেলেন, "কি যে বলিস তুই? এত বয়েসে, হুঁ।"

"তাতে কি, মামা! বয়স্কা পাত্রীও তো পাওয়া যেতে পারে।"

মামা লজ্জায় লাল হয়ে উঠলেন, "যা, যা, বক্‌বক্ করিস না। খাওয়া-দাওয়া সেরে সাড়ে দশটার লোকালে চলে যা। আর শোন, সেই সঙ্গে তোর একজোড়া জুতো কিনে আনিস। জুতোটা তোর ছিঁড়ে গেছে বড্ড। আর,—একটা ভাল সেন্টও আনিস।"

মামার ফরমাসী জিনিষপত্র কিনে ফিরতে ফিরতে ভাবছিলাম: মাকে চিঠি লিখে দেই আপাততঃ আমার আর তাড়াতাড়ি ফেরা হবে না। মামার প্রয়োজনে আরও কিছুদিন থাকা দরকার। বার্দ্ধক্য-কলোনীর একটা ভাল। সকলে বিগতযৌবন, তাই কেউ নিজেকে বুড়ো বলে মনে করতে পারে না। ছোটখাটো জিনিষ এদের জীবনে দারুণ উত্তেজনা, বড় বস্তু এরা পায় না বলে। কিন্তু এই সব মধুর নিশ্চিন্ত আরাম-করা দিনগুলো ভুলিয়ে রাখে এদের যে যা'রে হঠাৎ পাকা ফল যদি বোঁটা থেকে খসে পড়ে, তাহলে এরা বিস্ময় বোধ করে, স্তম্ভিত হয়। তাদের কারুর যে মরবার বয়স হয়েছে এই বোধ তাদের নেই। তাই ব্যবহার অনেক সময় শিশুজনোচিত।

বাড়ীতে ফিরে এলাম। সারাদিন মামা বাগানখানার আগাছা নিংড়ে সাফ করেছেন।

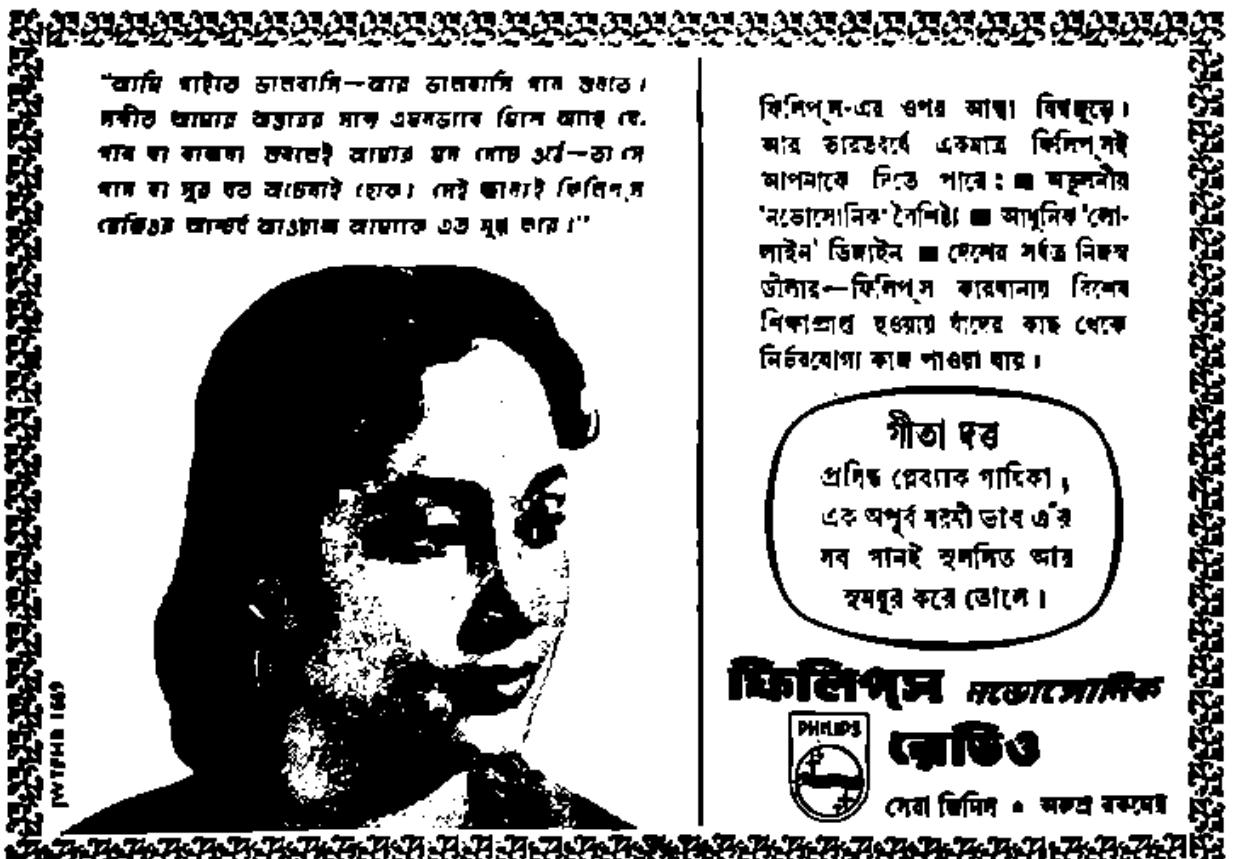

ধুলো-কাদা-মাখা মূর্তি। আমাকে দেখে বলে বলে উঠলেন, "দেখতো রবি, ঠিক হয়েছে কি? ওঃ; কটা ফুল যদি ফুটতো। কাল দেখলি না রেণুকা, আই মীন, মিস বরাটের কত ফুল ফুটেছে।"

"ও তো টবের ফুল, মামা। এখানকার মাটী খারাপ, ফুল ফোটে না। যাই হোক, আমি যাবার আগে নিশ্চয়ই তোমার গাছে ফুল ফুটিয়ে যাবো। তোমার দুঃখ থাকবে না।

নিত্যগোপাল চা দিয়ে গেল। হাত মুখ ধুয়ে মামা-ভাগ্নে বসলাম চা-খেতে। আগামী দিনের পার্টি নিয়ে মামা নানা আলোচনায় ব্যাপৃত হলেন।

হঠাৎ আমি চুপ করে গেলাম। বাইরে কেমন গোলমাল, ছোট রাস্তায় পায়ের শব্দ। নিত্যগোপাল দেখতে গেল। তক্ষুনি এসে খবর দিল ও!

"বরাট-দিদিমনি মারা গেলেন। আহা, বড় ভাল লোক ছিলেন।"

"মারা গেলেন?" আমি হতবাক হয়ে গেলাম।

"হাঁ, আজ সকাল থেকেই হার্টের ব্যারাম বেড়েছিল। ডাক্তারবাবু দুপুরবেলা মেয়ে চেষ্টা-চরিত্র করেছিলেন বহুৎ। এই মাত্তর মারা গেলেন।"

মামার দিকে তাকালাম। বিস্ময় ছাড়া সে মুখে কিছু নেই। অবাক হয়ে গেছেন তিনি। দেখতে দেখতে সারা মুখ ওঁর ছাই এর মত সাদা হয়ে গেল। মামা আস্তে আস্তে টেবল ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। শোবার ঘরের দিকে নিঃশব্দে চলে গেলেন। আশি বছরের বৃদ্ধের মত টেনে টেনে চলা মামার!

বাইরে মামার বাগানের গাছের মধ্যে পুবালী হাওয়া বয়ে যেতে লাগল।

দ্বিতীয় কাণ্ড

আমাকে পুবালী হাওয়ার দেশ ছাড়ানো গেল না।

মামা রেণুকা বরাটের মৃত্যুর পরে এতটাই ভেঙে পড়লেন যে আমাকে বাধ্য হয়ে সেই বার্দ্ধক্য কলোনীতে কিছুদিন থেকে যেতেই হল।

সেদিন মামার ফুলের গাছগুলোর কাছে ঘুরছি। একটা লার্কস্পার যেন ফুটি ফুটি করছে, আর একটায় ধরেছে কলি। মনে মনে ভাবলাম: এখন ফুলে মামার আর কি প্রয়োজন?

এত সার চালা হল, এত মালী ডাকা হল। এতদিনে ফুল ফোটেনি। পুবালী বাতাসে গাছগুলো নাড়া খেল কেবল।

এই স্থানটির সর্বত্র ব্যেপে পুবালী হাওয়া খেলা করে যায়। কখনও পাতা ঝরায়, কখনও ফুল ঝরায়।

সারা কলোনীময় এই পুবালী হাওয়ার উৎপাত। কিন্তু যখন প্রয়োজন ফুরোয়, ঈশ্বর কি তখনই ফুল ফোটান?

এই ফুল, ঝরঝুটে হোক, শুকনো হোক, সত্যি ফুল। হয়তো তুলে নেব, জলে রেখে দেব। কিন্তু মামা তুলে দেবেন কার হাতে?

বহুদিন আগে পড়া একটি কবিতার অংশ মনে ভেসে এল :—

বর্ষায় ফোটেনি ফুল, বসন্ত ব্যাকুল
পায়েনি ফুলের মুক্তি, বীজের মোচন ;
হিমানীর হিমচুমো দিল কি জীবন ?
দাগল না সে ফুলের বীজ কি মুকুল।

কবি উপমা দিয়েছেন মনগড়া ফুলের। আমি তো জানি মামার ফুলের জন্য কত বীজ, কত সার লেগেছিল। তবু অবসরপ্রাপ্তা সহ-কুলপরিদর্শিকা রেণুকা বরাটের প্রসারিত হাতে সে ফুল পৌঁছবার আগেই হাতখানা ঘৃণায় শীতল হয়ে গেল।

আমার মাকে মামা চিঠি লিখলেন আমাকে ওঁর কাছে রাখতে কিছুদিন। আমার চাকুরী করার দরকার নেই। মামার যা আছে ; মামা না থাকলে সবই আমার হবে।

বার্ডক্য কলোনীতে থেকে যেতে হবে ভেবে আমার আহার নিদ্রা ঘুচে গেল। মামা আমাকে সান্ত্বনা দিলেন, "বাংলায় এম. এ-টা পড়ে তৈরী হয়ে নে। ততদিনে আমিও সেরে উঠব। পরে পরীক্ষা দিয়ে একটা বাড়তি যোগ্যতা হবে তোর। দেখছিস তো চাকুরির বাজার কত শক্ত। তবু বি. এ পাশে হবে না। অসুবিধাও নেই। প্রফেসার মাইতি আছেন। আমি না হয় বলে দেব।"

আমি চুপ করে রইলাম। কিন্তু কয়েকদিন পরে একজোড়া বই এসে উপস্থিত হল—বাংলা এম. এর পাঠ্য। আমার উদ্দেশে মামা আনিয়েছেন।

দিন পুরণো চালে চলে। মামা বুড়ো হয়ে যান। জীবনে যে রস বসন্ত জেগেছিল অদৃশ্য হয়ে গেছে। মামা বই আনান, বই-এর সমুদ্রে ডুবে থাকেন। নৃত্যগোপাল ও আমি ফুলের বাগানে খাটি। ফুলের বাগানের সব আমারি স্কন্ধে চাপিয়ে মামা বইএর প্রাচীরের আড়ালে সমাধি গ্রহণ করেছেন।

শহরে যাই। মামের কাছে করুণ কণ্ঠে আবেদন জানাই। মা মাথা নাড়েন। আমারও মন সায় দেয় না মামাকে ফেলে রেখে চলে আসতে। ফুলের গলাবন্ধ কোটপরা মামার মূর্তি যেন অসহায়, বড় অসহায়। মনের পাতায় ফুটে ওঠে। মামা একা, কত একা। মামা যেন বলছেন, "রবি, এত করেও তোকে আপন করতে পারলাম না। আমি মামা না হয়ে বাবা হলে তুই কি এত অকরুণ হতে চাইতিস ?"

স্থির করি, না অকরুণ হব না। মামা সামলে উঠলে তবেই আমি ফিরে আসব শহরে। আমার বয়স কম, দু'চার বছর গেলেই বা ক্ষতি কি !

সুতরাং শহর থেকে দেখাশোনা সেরে, জিনিষপত্র কিনে আবার উপকণ্ঠে ফিরে আসি। বৃষ্টি নেমে ধুয়ে গেছে উপকণ্ঠের মাটি। ভিজে মাটি সোঁদা গন্ধ শহর কেরতের কাছে অন্য জগতের গন্ধের মত লাগে। খাটো-খাটো সাদা ডাঁটির ফুল ফুটেছে মুদিখানার পাশে। হালকা গন্ধ মিশেছে মাটির সৌরভে।

হলদে বাড়ী বাগানে আলো জেলে বসে আছে। লাহিড়ী গিন্নী জগমোহিনীর আজ পুণিমায় সত্যনারায়ণ। ছেলের চাকুরী বলে প্রোমোশন হয়েছে। আজ প্রসাদের ঘটা বেশী বেশী। কিন্তু বৃষ্টি পড়া দেখে জগমোহিনী চিন্তিতা। বৃদ্ধ ও প্রায় অথর্ব প্রৌঢ় কলোনীর বাসিন্দারা যদি ঠাণ্ডা লেগে যাওয়ার ভয়ে না আসেন ?

কিন্তু যথাকালে দেখা গেল সকলেই ছাতা, বর্ষাতির ভরসায় ঠুকঠুক চলছেন। ওখানে তাঁরা পরস্পরের সঙ্গে মিলবেন। ওটা ওঁদের মিলিং ক্লাব।

দেখা হল পিন্টু সহ জমিদার গিন্নী যাচ্ছেন। পিন্টুর গলা জড়িয়ে বিনা কারণে চক্‌রাবকরা দুজনে গলাবন্ধ। শ্রাবণের পূর্ণিমা তখন বৃষ্টি থামিয়ে দিয়ে রজনীগন্ধার কাড়ে হাসি বিলিয়ে দিয়েছে। তবু জমিদার গিন্নী সাবধান।

দেখলাম রতিকান্তবাবু আস্তে আস্তে লাঠি ভর করে চলছেন। অপারেশনের পর থেকেই কেমন দুর্বল হয়ে যাচ্ছেন।

আমাকে দেখে হাসলেন, "কি রবি, শহরে গেছিলে বুঝি, না? হালচাল কি, শুনি?"

এখন হালচাল শোনাতে বসলে মামা আমার দেরী দেখে চিন্তিত হবেন। ভাববেন হয়তো বা পাখী উড়ে গেল।

তাই হাসিমুখে বলি, "কাকা, পরে বলব। অনেক খবর।"

রতিকান্ত খুশিতে হয়ে ওঠেন, "তাই যাবি? যাও, ভাই, আগে কাপড় ছেড়ে লাহিড়ী বাড়ী তাড়াতাড়ি চলে এস।"

অধর মুখার্জি চলছিলেন গলা খাঁকর দিতে দিতে। যেন এখন থেকেই গানের আসরে বসছেন। আজ শ্রাবণী পূর্ণিমা ব্যর্থ যেতে দেবেন না উনি। আজ নিশ্চয় গান ধরবেন—

"আজ শ্রাবণের পূর্ণিমাতে—
কি এনেছিস, বল, বল, বল—"

অনেক লোককেই দেখলাম যেতে ধীরে ধীরে লাহিড়ী বাড়ী। সোনালী রংএ সোনালী আলো মেলে পথ চেয়ে বসে আছে।

রাস্তায় এখনও আলো বসেনি, যদিও বিদ্যুৎ ঘরে ঘরে। কলোনী প্রাণপণে চেষ্টা চালাচ্ছে। 'হবে হবে' আশ্বাস পায়, কিন্তু হয়ে ওঠে না। তাই রাস্তায় টর্চ বা লণ্ঠন নিয়ে সাবধানীরা পথ চলে রাত্রের গভীরে।

কিন্তু আজ হাল্কা চাঁদের আলো সাদা মেঘের আস্তরণ ভেদ করে ক্ষীণ দীপ্তিতে পথঘাট প্লাবিত করে দিয়েছে। গৌরবর্ণার দীপ্ত বর্ণ মসলিনের চাদরে ঢাকা। আচ্ছাদনের বাইরে অনন্ত বর্ণ ম্লানায়মান। তবু যে আজ পূর্ণিমা। তাই রং ফুটে বার হচ্ছে।

চওড়া পীচঢালা বড় রাস্তাটি দুইভাগে কলোনী চিরে চলে গেছে। ছোট ছোট অন্যান্য রাস্তাগুলি মোরাম মাটীর মোলায়েম লালে নয়নসুখকর। অসংখ্য ছোট বড় বাড়ী। প্রায়ই নূতন বাড়ী উঠছে। বেড়ে যাচ্ছে জমির দাম।

কিন্তু বাবু বয় পূবদিকে।

যারা জানে, এই শাখীর শাখায় যে পাখী বসে, সে হয় ছিন্নপক্ষ। বিস্ময়জনক এ লোকবৃদ্ধি বিগত যৌবন। মোড়ের মোরাটে বাড়ীখানা সদ্য নির্মাণ হয়েছে। তখন দেখেছিলাম কয়েকটি তরুণ মালপত্র বয়ে বাড়ীখানা সাজাচ্ছে, লরী থেকে মাল নামাচ্ছে, দরজার পাশের রোয়াকে বসে চা খাচ্ছে সবাই।

আশা জেগেছিল মনে। পুবের হাওয়া নিশ্চয় এখন দক্ষিণে বয়ে যাবে। আমার সখী

মিলবে। নিরন্ন দিনে আর শুধু মামার বাগানের জমি খুঁড়ে কি নিতাগোপালের সঙ্গে মুরগী পালন করে দিন কাটাতে হবে না।

মামা আসামে সিভিল সার্জন ছিলেন। অত দূরে থাকার জন্যই হোক, কিম্বা বিবাগেই হোক বিবাহ ঘটে ওঠেনি।

রিটায়ার করে মামা এলেন। দুই বোনের মধ্যে আমার মা ছোট। মামার বিশেষ প্রিয় বোন। কিছুদিন পূর্বে বাবা গেছেন। সৈত্রিক বাড়ীখানির খোপে খোপে ভাড়া বসিয়ে চালাচ্ছি আমরা। বাবা বিশেষ কিছু রেখে যেতে পারেননি। দাদার বিয়ে হয়ে গেছে, সংসারের ভারে দাদা ভারাক্রান্ত। মায়ের আলোচালের খরচটা কোনমতে চালিয়ে দেন। কিন্তু আমার খরচ বাড়তি।

তাই বি. এ. পরীক্ষা দেবার পরেই চাকুরি খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম। এমন সময়ে উপকণ্ঠ থেকে মামার চিঠি এল মায়ের কাছে, আমাকে কিছুদিন ওঁর কাছে পাঠিয়ে দেবার কথা লিখে।

বছর দুই আগে ওখানে মামা বাড়ী করেছেন। অবসর নিয়ে আত্মীয়-স্বজনের কাছাকাছি থাকবেন বলে চলে এসেছেন মামা।

প্রবাসী লোকের মত, ওঁর শহর অসহ্য অনাকর্ষ প্রতীয়মান হল। ফিরে এসে স্বদেশকে বিদেশ ভ্রম হল। এখানে বারমাস থাকা ওঁর চলবে না।

তাছাড়া প্রচুর জায়গা নিয়ে থাকা ওঁর অভ্যাস। অকৃতদার জীবনে গাছপালার সখ আছে। শহরে অত মূল্য দিয়ে জমি সামান্য কিনতে পারবেন।

তাই মামা, শহর বর্জন করে উপকণ্ঠে অনেক জমি নিয়ে ছোটবাড়ী করলেন। পেনসন আসে, হাতে টাকা আছে। চমৎকার দিন কাটতে লাগল। বছর সাতাশের মামা বাগানে ফুল ফোটাতে উদ্যোগী হলেন।

মাঝে মাঝে যাতায়াত ছিল। মামার ছবির মত বাড়ীখানি, লন, বাগান কলকাতাবাসীর চোখে অভিনব লাগে। পরীক্ষার পর কর্মহীন দিনে মামার আহ্বান যেন আমার দেবতার বর।

কিন্তু, কতদিন ভাল লাগে? ওই নিস্তরঙ্গ দিনযাত্রার অবসাদ, নিঃসঙ্গতার ব্যথা কত বহনকরি?

রেণুকা বরাটের মৃত্যুর পরে মামাও বদলে গেছেন। চুপচাপ বসে থাকেন। বাগানে ফুল ফুটেছে। ফিরেও দেখেন না। বেরিয়োজ ফুটে ওঠে, ক্ষীণ কাণ্ডে ভর করে শাদা গাউডারের তুলীর মত নাম না নার্সারী থেকে বীচি এনে লাগানো হয়েছে। তবু কেমন জীর্ণ শীর্ণ ভাব। এত সার কিনে আনলাম, শহর থেকে কেমিক্যাল সার, গোবর পচিয়ে কম্পোষ্ট সার করলাম। কিছুতেই ফুলগুলো পুষ্ট দেখা না। যেন সারি সারি বামনবীর। রোদে নির্জীব মাথা ঝুলে দাঁড়িয়ে আছে।

নার্কিস্সার এবারে ফুটেছে। রঙের আভায় এখানে ওখানে ছড়ানো ছোটখাটো ফুলের ডালা। অ্যানিমোনি ফুলের শাদা ঝাঁকার গায়ে সাজানো জেরানিয়াম। বেগুনী রং তার। একজন নিপুণ মালী যেন ফুলের দোকানে ডালায় ফুল সাজিয়ে রেখেছে। পদ্মির নীলও কিছু আছে। রডোডেনড্রনের বাহার নেই, অতিকষ্টে বিলিতি সারে কোটালাম।

আরো আলোছায়ায় বাড়ীর পথে পা দিলাম। প্রাচীরের ধারে হলদে ফুলে ভরা কল্কে গাছটি যেন সোনার গয়না পরে সেজে আছে। সাদা মল্লিকা ফুলের রেখা ফটকের ধারে। লাল গোরাদের

পথ গেছে লাল রংয়ের ধানের'য়। ঘোর সবুজ ধানে জল ছাওয়া। গাছের পাতাগুলোর সবুজে আকাশের মেঘেরা যেন ধৃত হয়েছে। দোতালার ছেলের বুকে মামা লম্ব করে দোহার হাতীর মাথা বসিয়েছেন। সেখান থেকে বর্ষণস্নিগ্ধ মেঘের ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ছে।

হঠাৎ যেন স্বপ্নদেখা বন্ধ হয়ে মনে হয়ে গেল।

এইমাত্র উত্তর কলিকাতার গলি দেখে এলাম। কাদা পচপচ করছে। নোংরা, ময়লা, দুর্গন্ধ। মনে হল এতক্ষণে নিজের বিবাদে ফিরলাম, শহরে আমি প্রবাসী। এই ঘর আমার পর।

বারান্দায় অন্ধকারে আলো নেভানো। মামা বসে আছেন।

"এ্যি, আলো জ্বালাওনি, মামা?"

হাহকণ্ঠ হেসে এল, "আয় রবি, ওরা সকলে কেমন আছে? চোখে বড় আলো লাগছিল। তাই অন্ধকার করে দিয়েছি।"

"চা খেয়েছ ঠিকমত?"

"হ্যাঁরে, হ্যাঁ। বোস এখানে। খবর কি?"

আমি হাতের সওদাপত্র নামিয়ে একটু বসলাম। আহা, সারা দিনটা মামা একা আছেন আজ।

পারিবারিক কুশলাদির সংবাদ অন্তে আমি প্রশ্ন করলাম, "শাহিড়ী বাড়ী চল না, মামা। একা বসে কি লাভ? তুমি না গেলে আমিও যাব না."

"নারে, আমি আজ যাব না। বড় ক্লান্ত লাগছে। ডিনারের আগে একটু শুয়ে নেব। তুই ঘুরে আয়।" আলো জ্বালালাম।

মামার একজোড়া মোজা আনবার কথা ছিল, এনেছি। আলো জ্বালিয়ে রেখেছি সামনে।

"একী, মামা, তোমার হাতে রং লাগলো কেমন করে? হাত ধোওনি?"

মামা অপ্রতিভ হলেন "না, হ্যাঁ—ওই পুরনো জিনিষপত্রগুলো গুছিয়ে-গাছিয়ে রাখতে রংয়ের বাক্সটা—। হাত ধুয়েছি তো। ওঠেনি দেখছি।"

মনে পড়ে গেল ডাক্তার হ'বার আগে মামা না কি আর্ট স্কুলে কয়েক মাসের জন্য ভর্ত্তি হয়ে যাতায়াত করছিলেন। কিন্তু দাদামহাশয় বড় ছেলেকে ভদ্র কোন কাজ না করিয়ে ছাড়লেন না। রং মাখা আর্টিষ্ট তাঁর মতে অপাংক্তেয়।

আমি কথাবার্ত্তা না বলে জিনিষপত্রগুলো তুলে আমার ঘরে চলে এলাম।

মাত্র ঘণ্টা দুই-তিন আগে যেখানে ছিলাম, সে স্মৃতির তুলনায় কত সুন্দর মামার দান আমাকে —এই ঘরখানি।

শাদা নেয়ারের খাটে নরম বিছানা, ধবধবে চাদর, বালিশের ওয়াড়। আয়নার সম্মুখে টেবলে চিরুণী-ব্রাশ, স্নোশন সাজানো। আলমারী ভরা জামা-কাপড়, আলনায় তাকে সাজানো জুতো। ঝকঝকে দেওয়াল, জানালার নতুন রং। সমস্ত কিছু কত পৃথক পূর্ব্ব পরিবেশ থেকে।

সেখানে মামার প্রাচুর্য্য নেই, নেই সৌন্দর্য্যবোধ। তেলচিটে বালিশের ওয়াড়-চাদরে সাবান দেবার এনার্জি থাকেনা বৌদির, এতগুলো লোকের রান্না করার পরে। ছোটমামা বিহারে থাকেন। ওঁর ছেলেও এখানে কাজ করে আমাদের বাড়ী থেকে। অফিসে দশটা পাঁচটা।

নতুন জীবনের নতুন প্রয়োজন।

নতুন জীবনের ধাত্রী যেটাতে নবজাতকের জনদীকে পুষ্টিকর টনিকের ওপর নির্ভর করতে হয়। সুনির্বাচিত উপাদানে সমৃদ্ধ ভাইনো-মল্ট ক্ষুধা বৃদ্ধি করে, হজমক্রিয়ায় সাহায্য করে এবং দ্রুত স্বাস্থ্য ও শক্তি ফিরিয়ে আনে। সন্তান প্রসবের পূর্বে ও পরে সমভাবে উপযোগী।

বেঙ্গল ইমিউনিটির তৈরী

OBL

ভাইনো-মল্ট

TCP/BI-3

মা নিজের রান্নাটা নিজে করে নেন। বৌদি আটমাসের বাচ্চা নিয়ে অত কাজ পেরে ওঠে না। হবিষ্যি রান্নার অন্ধকার ঘরে বসে ভাত ডাল চচ্চরি রান্না করে মা অনেক বেলায় খেতে বসেন।

বাচ্চা ছেলেমেয়ে সারা বাড়ী নোংরা করে রাখে। সারাদিন ভিজে কাঁথা শুকোয়। সকালের রোয়াকে আজ্ঞা বসায় পাড়ার বেকার তরুণ। তখন মনে হয় বেশ আছি।

কিন্তু মামা অন্য জগতের স্বাদ এনে দিলেন। এখন আমার সামনে টেবিলে বাটি পরে, কাঁচের প্লেটে খাদ্য আসে। নানা সুখাদ্য, যা কেবল বাড়ীতে উৎসবের দিনেই রান্না হত, সেগুলো হয় নিত্য এখানে। বেশ আছি। তবু আলস্যের জাওলা দেহমনে তামসিক রং ধরায়। নাগরিক পালিশ হয় অদৃশ্য। আরাম-আলস্যে ভরা দিনগুলো বিনা কাজে শ্রান্তির নিঃশ্বাস ফেলে। আত্মতিক্তের 'ঘুণন্ত উপত্যকা' থেকে পালিয়ে যেতে চাই।

যেতে চাই সেই গলির বোয়াকে সেখানে জীবন ধরস্রোতে বয়। রাস্তার মোড়ে ট্রাম-বাসের ঘরঘরানি ভেসে আসে। পাশের বাড়ী প্রেস চলে ঝক্কর-ঝক্কর। ঘন্‌ঘন্ করে ঘরে ঘরে ঠিকে ঝি বাসন মাজে আর বাক্য ছড়ায়। সুর করে ছেলেরা ঝুলে ঝুলে ক্লাশের পড়া করে। উল্টোদিকের মেয়ে হারমোনিয়ামে গান শেখে তারস্বরে। আলো জ্বলে রাস্তায়, দীপ্ত হয়ে ওঠে পথঘাট। সঙ্গে সঙ্গে তপসে মাছওলা, ফুলওলা ডেকে যায়। 'গরম মুড়ি'র হাঁকের ফাঁকে ফাঁকে আইসক্রীমের গাড়ী চলে।

নানা সুরে ভরা গলির বুকে দূর থেকে আসা গঙ্গার বাতাস ভাসে পাখা মেলে। পীচ জুড়িয়ে যায়। আকাশ কোমল হয়ে তারায় তারায় ভরে ওঠে। প্রত্যহ ইট কাঠের কঙ্কাল শহরে সেখমেলা রাতের মধুর নামার আশ্চর্য অনুভূতি।

নানা শব্দে ভরা সেই গলির বুকে নানা রাগে ভরা জীবন ছিল অমধুর, ক্রমে তার লয় বদ্ধিত হত দিনরাত্রির বীণার তারগুলো বেঁধে। অন্ত আকাশ আনত নূতন দিনের আশা।

এখানে সন্ধ্যা স্তিমিত। তারার আলোয় ভরা আকাশ আনে অসহায়তা। রাত্রি এখানে বিশ্রাম শুধু, দিনের ক্রমশঃ ধারা নয়।

সেখানে জীবন, এখানে সৌন্দর্য্য। কিন্তু, আমি কি করে নিজেকে বিলুপ্ত করে দেব জীবনের বিশ্রামাগারে? না হয়, আবার গলির জীবনে থাকবে সংগ্রাম, কিন্তু সেখানে আছে উত্তেজনা। ঝিমিয়ে পড়া দিনে মুখী ভরে কি পাব?

জানালার ধারে দাঁড়ালাম। নীলগন্ধা টানা। একটা গন্ধরাজের গাছের চারা রেণুকা দিয়েছিলেন। আজ সে ফুল ফোটাচ্ছে। ফুল কাকে দেবেন মামা?

অন্ধকার ভেদ করে চাঁদের আলো ওই সাদা গন্ধরাজের মত ধল বিস্তার করেছে। পূর্ণিমা, শ্রাবণের পূর্ণিমা। লাহিড়ী বাড়ীর নারায়ণশিলা আজ ফুলনের ঝোলা দান করেছেন।

বাইরের পোষাকে এলাম। মামা তখনও অন্ধকার ধারান্দায়।

"মামা, শুয়ে নাও একটু। আমি ন'টার মধ্যে আসবো।"

"দেরী হয় হোক। দশজনের মধ্যে যাচ্ছিস রবি, গয়নাগুলো করে ফিরিস। না হয় খাওয়াটা দেরী করেই হবে ডিনারের।"

মামা পাড়াগাঁয়ে পড়ে থাকলেও চিরদিনের অভ্যাসানুযায়ী মধ্যাহ্ন ভোজনকে 'লাঞ্চ' এবং নৈশভোজনকে 'ডিনার' ছাড়া বলতে পারেন না। নিতাগোপাল সর্ষেশাক ক্ষেত থেকে তুলে ভাজে, মৌরলা মাছের ঝোল রান্না করে দেয়। তবুও লাঞ্চ।

রাত্রে অধুনাকাল সাহেবীখানা মামা খান না। সহ্য হয় না। লঘুপাক শুক্ত-ঘণ্ট-দাউএর ঝোলের সঙ্গে আমার রুচিকর একটু লুচি সুখাদ্য। তবু ডিনার বলা হয়।

আমি মামাকে সন্তুষ্ট করবার আশায় বললাম, "মামা, এবার তোমার নার্সারি সুরু করে দাও। অনেক বইপত্র কেনা হল।"

মামা নার্সারি করার মানসে কয়েক বিঘা জমি দর করেছিলেন। বই এসেছিল অনেক ফুলের চাষ সম্পর্কে। নিত্য আমাকে পড়ানো হত আলোচনা করে করে। কিন্তু সে ঘটনা মিস বরাটের পরে শেষ হয়ে গেছে।

মামা বললেন, "নারে, এত বয়সে আর নূতন করে কিছু সুরু করব না। এবার আমার শেষবারের পালা! আমার আর নার্সারির ইচ্ছা নেই। কি ইচ্ছা করে, জানিস?"

"কী?" আমি উৎসুক হই।

"হরিদ্বার পেরিয়ে স্বর্গাশ্রমে ঋষিদের আশ্রম। সেই একটা কুটিরায় সাধু সেজে থাকি সব ছেড়ে। পাহাড়ের গুহায় বসে প্রকৃতির মধ্যে নিত্য নূতন রূপ দেখব। চা তৈরি করে খাবো শরীর গরম রাখার জন্য। আটা-আলু প্রধান খাদ্য। একটি দু'টি জামা কাপড়। কী সহজ জীবন, বলতো? পাথরের তাকে সাজানো ইষ্টদেবের পট বা মূর্তি। বুনো ফুল তুলে সেখানেই মন্দির। ঝরণায় জলের খোঁজ। কী সরল দিনগুলো!"

চিন্তিত হয়ে পড়লাম। এতদূর মামা এগিয়ে গেছেন মনে মনে?

মুখে বললাম, "এখন কি আর পারবে, মামা? সাধু হতে হলে অভ্যাস দরকার হয়। ঠাণ্ডা লেগে তোমার নিউমোনিয়া ধরবে। খাওয়া-দাওয়ার যদি অনিয়ম হয়, আমেসা হবে।"

জগমোহিনীর বাড়ি যখন পৌঁছলাম তখন প্রায় নিশীতক্ষণ শেষ। এবারে যথেষ্ট আয়োজন। নিতাই ময়রার লোক বাঁকে করে মিষ্টান্ন দিয়ে গেছে।

জগমোহিনীর রাতকাণা স্বামী বহু সাহিড়ী একপাশে সরে বসে আছেন। রাত হওয়া মাত্র সাময়িকভাবে চোখ দুটি যায় তাঁর। পূর্ণিমা লাগে দিবাভাগে। তখনি দিনের আলো থাকতে থাকতে তিনি অনুরোধ করেন সত্যনারায়ণ সেরে ফেলতে। রাজী হননা জগমোহিনী। নীল আকাশে ঢালের মত চাঁদ যদি না ওঠে তবে কি করে দেবতা সিন্নী খেতে মর্ত্তে নামবেন? অতএব প্রতি পূর্ণিমায় বহু সাহিড়ী চোখ কুইয়ে এককোণে বিরসমুখে বসে থাকতে বাধ্য।

"এসো, এসো, রবি। এত দেরী কেন? মামা এলেন না যে বড়?"

জগমোহিনী ডেকে বসালেন চওড়া জোতদার চাতালে ভাঙকরা সতরঞ্চে। তিনি পরিধান করেছেন মেড়হাতি চওড়া লালপাড় কোরা শাড়ী। ছেলে টাকা পাঠিয়েছে সত্যনারায়ণ পূজা বাবদ। নিজে বাঁচিয়ে এখানা কিনে এনেছেন।

এখানে কাপড়চোপড়ের দোকানী জীবেন পাল অর্ডার নিয়ে শহর থেকে যথাযথ বস্ত্র এনে কলোনীর ঘরে ঘরে যোগান। একটা হাতেই করমাস দিলে সর্ব্বস্ব মিলে যায়।

অনেকেরি প্রসাদভক্ষণ শেষ। কবিরাজ মহাশয়ের কন্যা পিতলের হাতা কেটে কেটে বিরাট গামলা থেকে মাটীর খুরিতরা প্রসাদ সিন্নী তুলে দিচ্ছে। পঞ্চাননশিল্পী হাতে হাতে বা পাতের কাছে সাজিয়ে বিলি করছেন। এবারে বিশেষ করে খুরি অর্ডার দেছে। অন্তবার চিনতে করা কলাপাতার দোনে সিন্নী বলেন।

অধরবাবু আগেই শেষ করে প্রস্তুত। একটু ঘুরে হারমোনিয়ামটিও তৈরি।

রতিকান্তবাবুই কথাটা পাড়লেন, "অধরভায়া, গুখানা গান হবে নাকি এখন?"

অধরবাবু গলা ঝেড়ে মুসাহিক হাসলেন।

হৃদয়বাবু সভানারায়ণের সাধারণ অধিবেশনে উপস্থিত থাকেন না, বয়স ও পদমর্যাদা,—হ'লই বা অতীত,—স্মরণ করে। কিন্তু অন্তকার বিশেষ অধিবেশনে তাঁর উপস্থিতি বহু লাহিড়ীর অধ্যবসায়ে সম্ভব হয়েছে। তিনি আসনপিঁড়ি হয়ে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে ঘট ও পটের সম্মুখে বসেছেন। একখানা পশমের আসন ওঁকে পৃথকভাবে দেওয়া হয়েছে।

তিনি বাধা দিয়ে বলেন, "আগে রবির কাছ থেকে শহরের খবরাখবর নেওয়া যাক। এখনও শহরের ধুলো ওর পা থেকে খসেনি।"

রতিকান্ত অপ্রতিভ হলেন। প্রথম দেখায় আমার কাছে তিনি যে হালচাল জানতে চেয়েছিলেন সে কথা ভুলে গেছেন। হয়তো অপারেশানের পরে মস্তিষ্ক ঠিক অপারেট করছে না।

তিনি বলে উঠলেন, "হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক কথা। তা, রবি চীনেদের ব্যাপার কি দেখে এলে?"

আমি সবিনয়ে জানালাম তারা ঠাণ্ডা আছে, যেন আমি লাডাক সীমান্ত থেকে দেখে এইমাত্র হেলিওকপ্টর করে ঘুরন্ত নগগ্রামে (নগর+গ্রাম) নামলাম।

রতিকান্তবাবু সোৎসাহে বললেন, "হবে না? আমাদের জবাহ্‌লাল আছা ধাওয়াই দিয়েছে, বিদেশী বন্ধুদের স্বপক্ষে এনে।"

রতিকান্তবাবুর ধারণা জহরলালের অভিজাত উচ্চারণ 'জবাহ্‌লাল'। সুতরাং তিনি সযত্নে উক্ত উচ্চারণে প্রয়াস পেয়ে থাকেন।

হৃদয়বাবু ভারী ও গম্ভীর কণ্ঠে বলেন, "শুধু জহরলালের চেষ্টায় কিছুই হতনা, যদিনা ক্রুশ্চেভের সঙ্গে চীনেদের মতের অমিল বেধে যেত।"

পঞ্চাননবাবু গলা তুললেন, "জবাহ্‌লালই তো ক্রুশ্চেভকে পথে আনল। জবাহ্‌লাল না থাকলে এতক্ষণ চীনে মাল্লুষে পথঘাট ভেসে যেত। ওহে রবি, জবাহ্‌লালের সঙ্গে আয়ুবের কি কথাবার্তা হ'ল?"

প্রশ্ন উচ্চারণে তন্ময়তা দেখে প্রতীয়মান যে আমি জবাহ্‌লালের ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং আয়ুবের খেলার সাথী। কয়েক ঘণ্টার জন্ত শহরে যেয়ে আমি রাজনীতির গূঢ় তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছি ধরে নিয়ে লোকগুলির চোখ মুখ জ্বলজ্বলে। কি করে জানাই যে সরকারী দপ্তরখানা আর আমার গলির ব্যবধান নগণ্য পকাশ মাইল?

অবশেষে রাজনৈতিক আলোচনার পট পড়ল। ইতিমধ্যে আহারীয়েরও পাট চুকলো। পিন্টু পাছে হাংলামি করে কেলে পঞ্চায় অমিয়ার-শিল্পী আগে খাওয়ার শিক্ষা দিয়েছেন। ফলে বেচারীর ঠিক একঘণ্টা লাগল আগে প্রসাদ খেতে।

জগমোহিনীর ছি চিত্রতারকার ভঙ্গিতে ঘরদোর পরিষ্কার করল। এতক্ষণে আজ অধরবাবু সুযোগ পেলেন।

প্রথমে তিনি ধরলেন আমার কল্পনার সঙ্গে মিলিয়ে রবীন্দ্রসঙ্গীত বটে, কিন্তু হায়, সে সুরে শ্রাবণী পূর্ণিমার কলর ছিল না। তিনি গাইলেন—

"আমারে মাথা নত করে দাওহে তোমার
চরণধূলার তলে,
সকল অহঙ্কার আমার
ডুবাও চোখের জলে।"

আমি ভাবলাম, ভাঙা গানেও ভাবগত অর্থ গায়কে আরোপ করার রীতি নেই। অধরবাবু বিপত্নীক, মেয়েজামাইএর অন্নে বেকার জীবন যাপন করে চলছেন। এককালে গানের মাষ্টার ছিলেন। বয়সকালে গলা ছিল, আদরও ছিল। কিন্তু নিষ্ঠুর নগরী নিজের বেগে চলে। যে এক পা পিছিয়ে যায়, তাকে ভুলে যায়। ভাঙা মাটীর পুতুলের মত সে হয় বিসর্জ্জিত। অধরবাবু সেই ভুলে-যাওয়া ভাঙা মাটীর পুতুল। এখানে ঘুষ-উপভাবার আশ্রয়ে মাথা গুঁজে জামাইয়ের কৃপাদত্ত অন্নে দিনাতিপাত করে যাচ্ছেন। জীবনে এখন একমাত্র বাঁচা জগমোহিনীর পূর্ণিমার আসর। সেখানে আবার তাঁর গানের আদর হয়। আবার কেন্দ্রস্থলে তিনি মনোযোগের পাত্র হয়ে ওঠেন।

পূর্ণচন্দ্রের আগমন—নির্গমন অধরবাবুকে লক্ষ্য করলে বিনা পঞ্জিকায় ধরা যায়। তিনি নগগ্রামের পঞ্জিকা। পূর্ণিমা এগিয়ে এলে মুখে হাসি, গলায় গুণগুণ, রাস্তায় উৎসাহে চলা মাথা তুলে। আগের দিন রিওয়াজ। মেয়ে বিছানা থেকে বিরক্ত মাথা তোলে, "কি করছো, বাবা এত ভোরে? তোমার বয়সে গলা সেধে আর কি হবে? এর চেয়ে ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করোনা কেন?"

অধর বলেন, "রিওয়াজ, মা, সদাসর্ব্বদা করে যেতে হয়। গান কণ্ঠে ধারণ করে না রাখলে ক্ষয়। সাধনা না করলে সিদ্ধি হয় কি?"

"তোমার সিদ্ধির কোন লক্ষণ দেখি না। যত বুড়ো হাবড়ার মধ্যে মেয়ে গলাবাজী।" মেয়ে মহা বিরক্ত হয়।

অধর গা করেন না। গা করলে চলে না তাঁর। ত্রিভুবনে এই আশ্রয়টুকু ছাড়া নেই।

কাল পূর্ণিমার আসরে কি কি গান হবে মনে মনে ভেঁজে নিয়ে বাজনায় তোলেন একখানে।

আবার এক পূর্ণিমা ছেড়ে অন্য পূর্ণিমার মধ্যের বন্ধ্যা দিনগুলি ওঁকে দেখলেই চেনা যায়। মাথা নীচু করে মেয়ের বাজারের থলি টানছেন।

এ হেন ব্যক্তির কি আর অহঙ্কার থাকতে পারে, এবং সেটি ঘোচাবার প্রয়োজন হতে পারে? মাথাই বা নূতন করে কতদূর নত হবে?

অধরবাবুর একখানের শেষে দ্বিতীয়খান ধরার মধ্যে ডাক্তার নারায়ণ মিত্র এসে হাজির হলেন। ওঁর পক্ষে আসা শক্ত, এখন ইনফ্লুয়েঞ্জার হিড়িক। কিন্তু আজ বিশেষ করে বলা হয়েছিল।

ডাক্তারকে দেখে সকলেই সম্ভ্রম দেখালেন। নিস্তেজ দিনযাত্রায় ওঁদের ডাক্তারবাবুর চটপটে চলাফেরা ও কর্ম্মব্যস্ততা যেন মহাসমুদ্রের এক ঝোড়ার, যাঁরা নাগার জলে।

ডাক্তারবাবু সিঁড়িতে জুতো খুলে খালি পায়ে উঠে এলেন। চেয়ারখানা টেনে দেওয়া হ'ল।

ডাক্তারবাবু আলগোছে বসে প্রসাদের লাজানো থালা থেকে সন্দেশটা তুলে নিলেন, "না, আর খেলেন না। এক্ষুনি ছুটতে হবে। কুণ্ডো বাংলোর মল্লিকমশাই অমে পড়েছেন।" সকলে সংপ্রশংস দৃষ্টিতে ডাক্তারবাবুর কর্মঠতাকে অভিনন্দিত করল।

সন্দেশ চিবিয়ে জলের গ্লাস ধরে ডাক্তারবাবু সন্দেশ বিতরণ করলেন, "শুনছেন, এদিকে কাণ্ড। কানাডার ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান কিনে নিল প্রায় অর্ধেকটা কলোনীর।"

সকলে খাড়া হয়ে বসলেন। অবরবাবু পর্যন্ত হারমোনিয়াম ছেড়ে তেড়ে এলেন,

"অ্যাঁ! বলেন কি?"

তন্দ্রা রক্ষা দেরে ভঙ্গিতে ডাক্তারবাবু উঠেছেন, "হাঁা, কথাবার্তা হয়ে গেছে। কয়েকদিন পরেই সইসাবুদ হয়ে যাবে। এখানে সোহার মত কারখানা বসবে। আর কি? জমির দাম হু-হু করে বেড়ে উঠবে। আপনারা সকলে লক্ষপতি হয়ে যাবেন।"

"আর রাস্তার আলো?" সকলে সমস্বরে প্রশ্ন করলেন, লক্ষপতি হওয়ার চেয়ে বিজলিবাতিতে পথচলা তাঁদের আরও আকর্ষণীয় বস্তু।

"রাস্তার আলো? জলের কল বসে যাবে। দোকানপাট, বাজারহাট, সিনেমা সমস্ত বসবে, মায় কফি-হাউস পর্যন্ত। আমি কিন্তু আর দাঁড়াতে পারছি না। পরে কথা হবে।" পকেটে হাত পুরে ডাক্তারবাবু যেমন ঝড়ের বেগে এসেছিলেন তেমনি বেড়িয়ে গেলেন। আমরা হতবাক হয়ে বসে রইলাম।

নিস্তেজ নিস্তরঙ্গ স্থানটির হৃৎপিণ্ড এতবড় একটি আঘাত সহ্য করতে পারবে কিনা সন্দেহ হল। সকলেরি মুখ বিচিত্র হয়ে উঠেছে। অতি বৃদ্ধ পেনসনী সার্জিনটীন খুড়ো হাত বুকে রেখে নীমিলিত নেত্র। বোধহয় মনোশ্চক্ষে ভবিষ্যৎ রূপের ধ্যান করছেন। দুই একজন ছিলেন অতিবৃদ্ধ, তাঁরা এ যেন উত্তেজনা সহ্য করতে পারবেন কিনা ভেবে ভয় হল।

রাতকানা বহু লাহিড়ী হাতিয়ে জলের গ্লাস ধরতে যেয়ে উল্টে ফেলে একাকার করলেন। গড়িয়ে এসে ঠেকল অবরবাবুর হারমোনিয়ামে ঠং করে। অবরবাবু আঁৎকে সরালেন যন্ত্রটা। এদিকে জলের ধারা গড়ালো যেখানে অন্য লোকেরা সঙ্গ-সখা ভাঁজকরা সতরঞ্চি পেতে বসে আছেন। কলরব করে ওঁরা উঠে সতরঞ্চি গুটিয়ে ফেললেন। হৈ-চৈ বেধে গেল।

চিত্রতারকানুলভ ভঙ্গিতে লাহিড়ী-গিন্নি গ্লাস তোলাতে। সকলেই উত্তেজনাব্যয়ের একটা পথ পেয়ে উল্লসিত হয়ে বেঁচে গেলেন। তড়িতাহত হয়ে তাঁরা এতক্ষণ বসেছিলেন। কি করবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না।

বহু লাহিড়ী সমস্বর গমগম করতে লাগলেন, "হাজারবার বলি যে দিনের বেলা গল্পটল্প দিয়ে হয়, তা না ঘুটঘুটে রাত না হলে পুজো হয় না। আরে, রাত্রে দেখা যায় না কি?"

রাত্রে যে অন্য সকলে পরিষ্কার রূপে দেখতে পান, এ তথ্য বহু লাহিড়ী কিছুতেই মেনে নেন না। যেহেতু তিনি দেখেন না, অন্যে দেখবে কেমন করে? তিনি যে চোখ মেলে দেখছেন দেখা যায় না।

লাহিড়ীগিন্নী অপ্রতিভ হলেন। স্বামী রাতকানা প্রচার হলে সম্ভ্রমবোধ ক্ষুণ্ণ হয়। অথচ অনভ্যস্ত স্বামী বস্তুটিকে অবাহিত গৃহসজ্জার মত পাচার করা চলে না। সুতরাং স্বামীকে সরিয়ে বসিয়ে উনি প্রসাদের পথ এগোতে চান।

সঙ্গীতের ছোয়ে অধরবাবু মনোক্ষুণ্ণ হয়ে গলার চাদরে বাদ্যযন্ত্র মার্জন করছিলেন। আদিযুগ থেকে ধুতির সঙ্গে চাদর ব্যবহার সভায় চলন, তিনি দেখে আসছেন। অতএব গুমোট গরম হলেও গলদেশ উত্তরীয় পরিশোভিত।

হরিবাবু বললেন, "অধরভায়া, গোটা দুই গান গাও। তারপরে উঠি। রাত হয়ে যাচ্ছে।"

অধরবাবু আবার পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় ষোলকলা প্রাপ্ত হলেন।

সমবেত অনুরোধ এল, "আজ যেন আনন্দের দিন। তায় একটা অধর ধর এল। জমাট গান ধরুন, দাদা। প্রাণটা ঠেঙিয়ে দিন।"

অধরবাবু প্রস্তুত। শুধু আরম্ভের আগে একপাত্র চা ভিক্ষা করলেন।

লাহিড়ী-গিন্নী ভটস্থ হয়ে উঠলেন, "বিনো, বিনো এসো। যে যে চা খাবেন বলুন।"

"বিনোদিনী নামক সমর্থা ঝি আবার হাজির হল। বন্ধ্যা কলোনীর তরুণী সে অতএব হাবেভাবে ঠিক কিন্নরীর। স্বাস্থ্যসম্পন্ন কালদেহে আঁট ব্লাউজ, ছাপা শাড়ী পরা। প্রকাণ্ড তেল-চকচকে খোঁপায় ভাগ্যি বেলফুলের মালা জড়ায় নি। চলাফেরা, হেলে দাঁড়াবার ভঙ্গি সমস্ত দেখেই মনে হয় যেন ও কোন সিনেমায় দাসীর ভূমিকায় অভিনয় করছে, আসলে দাসী নয়।

মনে মনে ভাবি: তোমায় এমত চং কে দেখবে এখানে? ঠাকুর চাকরও এখানে বুড়ো হয়ে তবেই আসে। যৌবন সোঙায় ওরা শহরে।

এখানে বয় পুরানো হাওয়া।

চা-পানান্তে অধরবাবু গলা ঝাকিয়ে গান ধরলেন। এবার 'ভানুসিংহের পদাবলী'র আওতায় চলে এলেন।

"আজু সখি মুহু মুহু
গাহে পিক কুহু কুহু
কুজবনে দুহু দুঁহু
মোহার পানে চায়। ****
আজু মধু চাঁদনী
প্রাণ উন্মাদনী,
শিথিল সব বাঁধনী
শিথিল ভই লাজ।"

আবেগে অধরবাবুর গলা থরথর করে কাঁপছে। মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে শিথিল পেশী দুলিয়ে বৃদ্ধের নবযৌবনের গান হাস্যকর।

আড়চোখে চেয়ে দেখলাম সকলে ভাবে ভোর। গায়ক এবং শ্রোতা কতখানি হাস্যকর ভেবে দেখার লোক নেই। কেউ চোখ বুজে, কেউ গায়কের প্রতি একদৃষ্টে চেয়ে শুনছেন। কেউ হাতে তাল দিচ্ছেন, কেউ গুণগুণ করে কর্কশ বেসুরো গলায় আনান দিচ্ছেন।

এই গান সফল হবে কেমন করে? নবগ্রামে নয় দু'চারটে থাকলেও থাকতে পারত, কিন্তু মানুষ আছে বহু। একমাত্র দাবার ক্ষেত্রে কলোনীর একমাত্র রোমান্সটি সফল হয়ে উঠতে পারত।

কিন্তু পুব হাওয়ায় ভুল করে গেছে। আলো ঝলমলো আনন্দমুখর গানের আসর। গন্ধর্ব

অনন্ত অভিশাপে জরাগ্রস্ত ধরাতি হয়ে গেছে। দমকা পুবের বাতাস যেন হঠাৎ ঝটিকা বেগে বয়ে গেল। চুরমার হয়ে গেল আসর। বাঁধন বাঁধা হ'ল না। ঝুলনের দোলা দুলল না।

এরা কত বৃদ্ধ, জানি নেই এদের। প্রতিদিনের তুচ্ছ আনন্দ জড়ো করে ভুলে আছে নিজেরা, অন্যকেও ভুলিয়ে রেখেছে। কিন্তু কাল ভোলে না।

একদিন আসে সে। নিঃশেষে মুছে আনে। আমি দেখব—এক এক করে। দেখতে আমি এসেছি। আমার জরা নেই, মৃত্যু নেই। অনন্ত পথ চলার পথিক আমি, এসে পড়েছি এখানে। অনন্ত দেখার তৃষ্ণা নিয়ে চেয়ে চেয়ে দেখব আমি, এক এক করে কেমন বোঁটা থেকে পাকা ফল খসে যায়, ধুলোয় মেশে। ঝুল ঝরে যায়, বাতাসে ওড়ে। আমি দেখব।

হু হু করে পুরানী বাতাস শ্রাবণপূর্ণিমার প্রতি রন্ধ্র আচ্ছন্ন করে বয়ে চলল।

ভানুসিংহের প্রেমাভিমানিনী অভিসারিকা রাধা নীলাম্বরে সোনার নূপুর পায়ে দেখা দিলেন না, কুঞ্চিত কেশে বেণী বেঁধে মুখমণ্ডল অলকা তিলকা পরিশোভিত করে।

আলোয় আলোময় আসরে রাতকানা চেয়ে থাকে অন্ধকারের চির ব্যাপ্তি চিহ্নিত জগতে। আলো নিভে যায় পুব বাতাসে।

"যাহু যহীঁ পুরবৈঞা,
নীদ নহীঁ বিন সৈঞা।"

তৃতীয় কাণ্ড

আমি কেবল জীবনটা দেখেই গেলাম, না? আমার সুখ হল না।

আমি তাই যেতে চাই হিমালয়ে। পাহাড়ের চড়াই বয়ে পৌঁছব অলকানন্দার তীরে। ফুল গেঁথিয়ে দেব মন্দিরে প্রণাম রেখে এগিয়ে যাব।

ছোট ছোট কুঠিরা পাহাড়ের বুকে ছায়াঢাকা উপত্যকায়। সেখানে বাস করব। শান্ত-সহজ জীবন। হরিতকী-আমলকী ছায়ায় আমার সংক্ষিপ্ত গেরুয়া বস্ত্র শুকোবে। গাছের ছায়ায় বসে শাস্ত্রপাঠ করব। নিজের হাতে খাদ্য প্রস্তুত করব। নিজে খাবো, তারপরে পালিত কুকুরটির মুখে কণী ধরে দেব। আমি দেখেছি কেদার বদরী যেতে এমনই শান্তসৌম্য আশ্রম। গায়ে গায়ে গাছ। গাছের তলায় তলায় সাধু।

কোন সাধু নীলধারার তীরে কৃচ্ছ্রসাধনে রত। অগ্নির কুণ্ড জেলে মোলনায় দুলছে আগুনের ওপর। দারুণ গ্রীষ্মে তপস্যা করছে।

মেয়েরা এমনি তপস্যা করে ঘরে ঘরে। আগুনের উত্তাপে দ্বিপ্রহরে খাদ্য প্রস্তুত করে। সেকালে ঘড়ির উদ্ভব ছিল। খোলা মুখে ঘড়ি ঠেলে সাধনা ছিল মেয়েদের। কে বুঝেছে?

কিন্তু মেয়েদের কথা থাক। সন্ন্যাসী জীবনে কেন গৃহস্থের স্বপ্ন?

তারপরে শোন। একদিন একঘেয়ে লাগবে। বিরস দিন বিষণ্ণ হয়ে উঠবে। চারদিকে হিমাদ্রির শিখরে শিখরে মেঘোদয় হবে। এক বোঝা কার্পাসে যেন ধূমাচ্ছ মেঘের সঘন আনার প্রতীক্ষায়।

আমি বেরিয়ে পড়ব।

ছেড়ে যাব আশ্রম, ছেড়ে যাব সামান্য তৈজস। পালিত কুকুরের মায়া বাঁধতে পারবে না। আমি আরও উর্দ্ধে চলে যাব, সমতল উপত্যকা ছেড়ে।

মাটীর স্পর্শ মিলিয়ে যাবে দূর তুষ শিখরে। আঁকাবাঁকা চড়াইএর পথে ঠেলে উঠব। হঠাৎ দেখব গেন্দিয়ার। সবের মত পাৎলা তুষারে নদী জমাট বেঁধে আছে। আস্তে পার হয়ে আরও উপরে উঠলাম! পাশ দিয়ে নেবে আসছে পাহাড় গলানো গর্জ্জনমান আভোলাঙ্গ। তুষার প্রপাত এড়িয়ে গেলাম। এবার নীলধারা গঙ্গা অদূর হস্তির গেগে হিমালয়ের কবর থেকে নেমেছে। আরও উর্দ্ধে চিরতুষার রাজ্যের অনির্দ্দেশ পথ।

আমি আরও উর্দ্ধে উঠলাম, জানিস? ফীণ পুষ্প সৌরভ আমার নিশানা। সেই সৌরভ ক্রমে উগ্র হয়ে উঠল। পদক্ষেপ করলাম শেষ তুষারশিখরের বাঁকে। চমকে উঠলাম।

উগ্র পুষ্প-সৌরভ আকুল করে রেখেছে একখণ্ড সমতল ভূমি। সবুজ ঘাসে ছাওয়া যেন বাংলার বৃন্দাবন। সাদা সাদা ফুল নয়া ডাঁটায় ফুটেছে - ব্রহ্মকমল তারা। অজস্র পদ্মফুলে পাশে অসংখ্য অজ ফুল—নাম জানা, নাম না-জানা। লাল রডোড্রেনড্রন, নীল পপি, হলদে ভেজি, সাদা অ্যানোমিনী। অসংখ্য পাখী ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছে। সেখানে প্রদীপ জ্বলছে একটি ছোট কুটীরে।

তাওলার মীনে করা আসনে কে আমার পথ চেয়ে বসে আছে? —সে।

আমাকে বললো, "এসো।"

আমাকে বললো, "তুমি আসবে জানতাম।"

পথশ্রমে ক্লান্ত শরীর হাল্কা হয়ে গেল সেই অদ্ভুত ফুলের গন্ধে, ফুলের বনে আর একটি ফুলের মত। বিস্ময় স্তব্ধ আমি দাঁড়ালাম আমার চিরকালের চাওয়ার দরজায়।

আমি বললাম, "এখানে তুমি! আশ্চর্য্য! কী করে চলে তোমার এত উঁচুতে, একা একা?"

সে বলে উঠল, "এখানে আর কোন প্রয়োজন থাকে না। তুমি কোথায় এসেছ বুঝতে পারছ না?"

আমি তার দিকে চেয়ে কথা হারিয়ে ফেললাম, রবি।

রবি, রবি, রবি!

উঠে বসলাম। রোদ এসে পড়েছে বিছানায়। এতক্ষণ স্বপ্ন দেখছিলাম। স্বপ্ন দেখছিলাম মামা আমাকে কথাগুলো বলছেন।

এই দীর্ঘ মনোলোপ মামা আমাকে অবশ্যই স্বপ্নের মধ্যে বলেন নি। আমি যুদ্ধে যা দেখেছি, স্বপ্নে যা শুনেছি, সাজিয়ে লিখলাম।

মামা কাল রাত্রে যা বলেছেন, বিশ্লেষণ করলে এটাই হয়।

বিছানার বালিশ ভিজে গেছে আমার চোখের জলে।

মামাকে নিয়ে করি কি।

বছর দুয়েক এখানে এসেছেন মামা। প্রথম থেকেই বোধ হয় প্রেম জন্মেছিল। স্নায়ুপরিবিহীন দিনগুলোর বুঝি পরস্পরের সঙ্গে বাড়ী-বাতায়াতে লেগে গেল আমাকে।

কিন্তু তার আগে এতকাল মামা করলেন কি? বিদেশে? চাকুরি-জীবনে কর্ম্মভারে যতই

ব্যস্ত থাকেন উনি, প্রেমের অবকাশ ঘটেনি কেন? পাত্র হিসাবে যে কোন নারীর প্রার্থিত বস্তু ছিলেন আমার মামা।

মরুভূমির উটের প্রথায় মামা জল সঞ্চয় করে মরুপথে চলেছিলেন বুঝি। ওয়েসিস পেলেন। সঞ্চিত জলের বোঝা একস্থানে ঢেলে দেবার পূর্বেই ওয়েসিস মিলিয়ে গেল।

এখন কি উপায়?

একজন অতি আনন্দে উদ্বেলনায় প্রাণই দিলেন। অন্যজনের অবস্থা দেখে চিন্তা হয়।

বৃদ্ধবয়সে মামা এত আকুল হবেন, ভাবতে পারিনি কখনও।

মাকে বলেছিলাম। মা পুরোপুরি আমার কথা বিশ্বাস করতে পারেন নি। বিরহ যেন একমাত্র তারুণ্যেরি সম্পত্তি।

তাহলে নিজে যা বৃদ্ধবয়সে স্বামীশোকে এত মুহ্যমান্ কেন?

ঝাঁকড়ে ধরার বস্তু কমে যায়, শেষ কামড় পড়ে। তাই বৃদ্ধকালে হারাণো প্রেম এতটাই হৃদয়স্পর্শী।

খাবার ঘরে যাবার মুখে দেখলাম বাইরের পর্চে মামার কাছে কে এসেছে।

সকালবেলায় মামার কাছে সাধারণতঃ ডাক্তারবাবুরা অথবা রোগীর আত্মীয়স্বজনেরা আসেন। মামা প্র্যাক্‌টিস ছেড়ে দিলেও একাও ডাক্তার ছিলেন। তাই পরামর্শ নিতে অনেকেই এসে থাকেন।

আমি নিতাগোপালের মুখে শুনলাম, আমার দেরী দেখে মামা আগেই চা খেয়ে নিয়েছেন। আমিও উদ্যোগী হয়ে চা-পানাদি সেরে নিলাম। এখন আমার মামার টাডিতে বসে পড়াশোনা করবার কথা। মামা প্রচুর বই কেনেন ও যত্ন করে রাখেন। এমন কোন বিষয় নেই যে বই নেই।

বই খুলে বসেছি। মামা প্রবেশ করলেন।

মামা বল্লেন, "রবি, কুচো বাংলোর মল্লিকমশাইএর অবস্থা খারাপ। ডাক্তার মিত্র যা সিম্‌টম্ বল্লেন, তাতে আমার মনে হয় ইনফ্লুয়েঞ্জা নয়, নিমোনিয়া হয়েছে। তুই একবার দেখে আয়।"

"তুমি চলো না, মামা। একবার চোখে দেখলেই তুমি বুঝতে পারবে।"

"নারে, না।" মামা অস্থির হয়ে উঠলেন, "আমি প্র্যাক্‌টিস ছেড়ে দিয়েছি একেবারে। দেখা মানেই মতামত দেওয়া। মতামত দেওয়া মানেই দায়িত্ব নেওয়া। আর—চোখে দেখলেই আমি বুঝতে পারি? তাহলে চোখে দেখেও কেন বুঝিনি?

"মানে? কাকে আবার চোখে দেখে তুমি বোঝনি?"

"যে লোক পরের দিন মারা যাবে, আগের দিন রাত্রে দেখে কেন বুঝিনি? ডাক্তার হয়ে এত বড় ভুল করেছিলাম? প্র্যাক্‌টিস ছেড়ে দিয়েছি বলে নির্লিপ্ত হয়ে না থেকে তখনই ঔষধের ব্যবস্থা দেওয়া উচিত ছিল।"

মামার প্রেমের সঙ্গে অনুশোচনা যুক্ত হয়েছে। ডাক্তার কেন ভুল করেছেন? তাই মামা এতটাই ভেঙে পড়েছেন?

মামা আমার কিছু বলার আগে চাপা বিষণ্ণ স্বরে আমায় বলে চললেন, তখনি ঔষধ দিলে

আনিয়ে জোর করে খাইয়ে দিলাম না কেন? প্র্যাকটিস ছেড়ে দিয়েছি বলে কি জ্ঞানবুদ্ধিও ছেড়ে দিয়েছিলাম? আমার ডাক্তার হয়ে এমন অপরাধ করা অন্যায়। ভারী অন্যায়! সে হয়তো আজও বেঁচে থাকত। ছিঃ, ছিঃ!"

মামা ধপ্ করে চামড়া ঢাকা আরাম কেদারায় বসে পড়লেন। এতদিনের মধ্যে কোনও দিনই উনি মিস বয়াটের সম্পর্কে খোলাখুলি এমন আলোচনা করেন নি। প্রচণ্ড অপরাধবোধ প্রিয়বিয়োগব্যথায় যোগ হয়ে মামাকে ভেঙে দিয়েছে।

যাহোক, মামা কথা বলে যাতে হাল্কা হতে পারেন তদনুযায়ী আমি কথাটা চালাবার প্রয়াস পেলাম। "তুমি কি করবে, মামা? দেখে কি বোঝা গিয়েছিল? আমিও তো ছিলাম। অত হাসিখুশী, সান"—

মামা শূন্যের দিকে চেয়ে রইলেন। আস্তে আস্তে মুখের কালচে বিষণ্ণতা কেটে গেয়ে উদ্দীপ্ত সরল ছায়া পড়লো। বুঝলাম অতীতে আনন্দের সেই শেষ মুহূর্তটিতে ফিরে গেছেন মামা। আবার নিজেকে তিনি গুটিয়ে নিলেন শামুকের মত। শুধু ফেলে রেখেছি আমি, মামার গোপন বেদনার স্বরূপ।

ঘরের বার হয়ে সুবিমাকে ডাক দিলাম। সুবিমা সাঁওতালী গ্রাম থেকে এসেছে। করলাখাদের শ্রমিক ছিল, ঐ কাজের ফুটি আঙুল খসিয়ে করলার কাজে বীতস্পৃহ হয়ে বাংলা মুলুকে চাকরের কাজে নেমেছে। বিভলাঙ্গ হলেও অপটু সে নয়। কাজেকর্মে দক্ষ।

গতকাল মামা আমি না থাকায় আমার সংক্ষেপে করেছিলেন শুনেছি। আমি সকালে চা খেয়েই চলে গেছিলাম। মায়ের হাতের রান্না কতকাল খাইনি। ফিরে এসে শুনলাম মামা মামি সেদ্ধ ভাত খেয়ে রয়েছেন। সারাদিন ঘরে দোর দিয়ে বসে ছিলেন।

আজ মুর্গী করতে বললাম। মামার মুর্গী কেবল সোমার জন্যে। ডিম খেতে পারেন, ওদের গায়ে হাত উঠবে না। তাই সুবিমাকে বাজার থেকে একটা মুর্গী কিনে কেটে কুটে নিত্যগোপালের হাতে দিতে আদেশ দিলাম।

আজ সকালে লেখাপড়া হবে না। কুচো বাংলোর খবর নিতে হবে।

মৃগেন মল্লিক পুরাতন রাজনৈতিক কর্মী। একযুগে চিরকৌমার্যে ব্রতপরিকর হয়ে প্রচণ্ড বিক্রমে জেল খেটে বেড়াতেন। রক্তচাপ মন্থীভূত হওয়ায় অবশেষে বিবাহ করে সংসারী হন। হাঁপানীর ধাত ছিল। শহরের আবহাওয়া সহ্য হচ্ছিল না। একটি মেয়েও আছে। ভবিষ্যৎ দেখা দরকার। তাই যথাসর্বস্ব ভেঙে বার্দ্ধক্যকলোনীর জমি কিনলেন। জমি কেনার পরে বাড়ী তুলতে অনটন দেখা দিল। একখানি প্রকাণ্ড ঘর করলেন টালীর ছাদ গাথা। সেখানার মধ্যে তিন ভাগ। মধ্যে বড় একখানা লিভিং রুম। দুপাশে ছোট-ছোট দুটো অংশ। পেছনে-সামনে টানা পাকা বারান্দা। পেছনের বারান্দায় রান্না ও খাওয়া একদিক ঘিরে। সামনের বারান্দায় কয়েকটি বেতের মোড়া ও ছোট টেবল একটি। বসার ঘরের কাজ করে। মৃগেন মল্লিকের একমাত্র কন্যা দেবকী এম. এ. পড়ে কলকাতায়। হষ্টেলে থাকে। টিউশন করে খেতে হয় তাকে। পিতা বেকার। সরকার থেকে কিছু টাকা পান। এটা-ওটা করে চলে। জমি খানিকটা বেশীই তিনি নিয়েছিলেন। কিন্তু ফলফুলুরি ফলানো আজো হয়নি। শরীর বাদ সেধেছে। অল্পবয়সে জেলে-জেলে নানা ঘাটের জল খেয়ে আজ তিনি ভগ্নপক্ষ বিহঙ্গম। ওড়ার সাধ্য নেই।

একখানি ঘর বোসে, মল্লিকগিন্নীর বাড়ীখানি সবাই 'কুচো বাংলা' নাম দিয়েছিল। মল্লিক-বাড়ীর কর্ত্রীগৃহিনী কিছু অসামাজিক। কলোনীর পক্ষে সেটা বিচিত্র। যেখানে ইলিশ মাছ বা মাটন কবে কোন ঘরে আসে জানা যায় সহজে, সেখানে নিজেরা নিজেদের নিয়ে থাকা দুষ্কিকর। অবশ্য কেউ হানা দিলে ওঁরা আতিথ্য করেন, কিন্তু নিজে থেকে এগিয়ে আসেন কই?

অবশ্য কলোনী আগমনের সময় ওঁদের বেশী নয়, কয়েকটা মাস মাত্র। আশা করা যায় ভবিষ্যতে হয়তো উন্নতির উন্মেষ হবে।

এখানে একটি আধো আলোছায়া ঘেরা স্বতন্ত্র জগৎ। ছেলেবেলায় যাদুঘরে কুমোরশালের মৃৎশিল্পীর গড়া মাটীর গ্রাম, শহর দেখে বিস্ময়ে চেয়ে থাকতাম। বিরাট পৃথিবীর একটি কোণে কাঁচের বাক্সে সুরক্ষিত একখণ্ড পৃথিবীর অংশ। কত ছোট, কিন্তু কত সম্পূর্ণ। সমস্ত আছে এইটুকুর মধ্যে। তেমনি ছোট একটি জগৎ এখানে। মিনিয়েচার। এখানে, মনে হয় বৃহৎ জগত ছুটে চলেছে ঊর্দ্ধে। নীচে সুরে সুর মিলিয়ে অনেক ছোট একটি এপিটোম ছুটছে। ম্লান আভায় এখানটা ঊর্দ্ধীপ্ত, সূর্য্যর প্রাখর্য্য নেই।

রাস্তায় বার হয়ে এলাম। লালটুকটুক দোহার সেটটি সবুজ লনখানির শেষে। এই যে ছুটেছে পার্কস্ট্রীট, ওই যে আলো করে আছে ঝলকে। এখানে বাঁধা হবে হাসোক। বেণুকা বলে আছেন,

হাতে উলের বোনা, কোলের কাছে মাসিক খোলা। আস্তে আস্তে দুলছেন একটু। বাতাস টপ্‌টপ্‌ করে ঝলকে ঝরছে আমার, কাপড়ে, চুলে। হাসছেন, গলায় গুণগুণ গান—

"আমার বাগানে এত ফুল
তবু কেন চলে যায়,
তারা চেয়ে আছে তারি পানে,
সে তো ফিরে নাহি চায়।"

দুলে দুলে নউমাছি, উন্মনা ভ্রমর গানের সুরে ঝিক ঝুল করে, রডোডেনড্রন গুচ্ছে মাথা ঠুকে ঘুরে ঘুরে চক্রাকারে ভ্রমণ করছে। সেখানেও অন্য এক গানের সৃষ্টি।

লোহার দরজাটা ঠেলে মাসী এলেন। হাসিখুশী, স্বাস্থ্যদীপ্ত প্রৌঢ় মূর্তি। হাসতে হাসতে মাথা উঁচু করে দোলনার দিকে চাইলেন। দুচোখ উজ্জ্বল, আলোজ্বালা চোখ দুটি একবছর আগের মত।

আমার ক্যানভাসে পুরানো হাওয়া গতি পরিবর্তন করে দক্ষিণদিকে বইতে লাগল। সমস্ত পট-ভূমিকায় এখন দক্ষিণা বাতাসের খেলা। দুলছে দোলনা বাতাসে।

ঈশ্বর কেন এমন একখানি ছবি চিরস্থায়ী রঙ এঁকে রাখলেন না? কেন শুধু তারা দুঃখ নিয়ে পুব বাতাস বয়ে গেল?

আমার মনে মাসীর বাড়ীতে ওই চিরন্তন দোলনার দোলা সাজিয়ে রাখলাম। পথে নেমে এলাম।

কুচো বাংলো বেশী দূরে নয়। পথটা বেঁকে ডানদিকে গেছে। সেখানেই বাংলোর অবস্থান: আমাদের রাস্তা থেকে দেখা যায় না, এই যা।

সেখানে পৌঁছে দেখলাম, একখানি সাইকেল-রিক্সা থেকে নামছে কেউ। কুচো বাংলোর মুড়ে চাকর ঘুরে ঘুরে বাক্স আর বুড়ি একটা বেতে বোনা, নামিয়ে নিচ্ছে।

এবারে নামল সওয়ারী। মাথায়-গলায় ছাপা সিল্কের রুমাল বাঁধা। তির্য্যক দৃষ্টি আমার উপর একবার ফেলে অবজ্ঞায় মুখ ঘুরিয়ে বাড়ীর মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল নির্ব্বিবাদে।

বুঝলাম মুগেন মল্লিকের মেয়ে এসেছে শহর থেকে বাবাকে দেখতে। ফ্যাসান করার সময় পায়নি আর? উগ্র আধুনিক পোষাক, অথচ শুনি মেয়ে পড়িয়ে খরচ চালাতে হয়।

আমাকে দেখে অবজ্ঞাই বা কেন? আমি কুলি না মজুর? তুই এম. এ. পড়িস, আমিও পড়ি। তবে?

বিরক্ত হয়ে ভাবলাম ফিরে যাই। অমন একটা ঠ্যাকারে মেয়ের বাড়ী যাব না। আমি শান্তি-নিকেতনী সাজগোছ ভালবাসি। উগ্র আধুনিক সিনেমা অভিনেত্রীর ঢংএ মাথায় রুমাল বেঁধে কম বাবাকে দেখতে নেমেছে, দেখ!

কিন্তু মনে এখন ব্যক্তিগত বিতৃষ্ণার প্রশ্ন ওঠে না। ওই মেয়েটির পিতা অসুস্থ, হয়তো যথেষ্ট অসুস্থ। মাসীকে খবর দিয়ে দিতে হবে।

একটুক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে রইলাম। কারণ, নবাগতাকে সময় দিতে চাই গুছিয়ে নিতে আগমনকে। তারপরে দরজায় ঘা দিলাম। দরজা খোলাই ছিল।

ত্রস্ত হয়ে এগিয়ে এলেন মল্লিকগিন্নী। এককালে বড় রূপসী ছিলেন, মুখে চোখে এখনও লেখা। কিন্তু সর্ব্বদা অসহিষ্ণু—সন্দিগ্ধ ভাব।

আমাকে দেখে কাঠহাসি হাসলেন, "ও, তুমি এসেছ "

একটু দ্বিধাগ্রস্তভাবে এদিক-ওদিক চাইতে লাগলেন তিনি। বারান্দার বেতের মোড়ায় কি বসবার অনুমতি দেবেন না?

আমি ওঁর ধরণধারণ দেখে বলেই ফেললাম, "মামার কাছে সকালে ডাক্তার মিত্র গিয়েছিলেন। মামা খবর নিতে আমাকে পাঠালেন।"

"ও:", নিমেষে মল্লিকমশায়ের মুখের কালিমা উবে গেল, সারল্য আত্মপ্রকাশ করল গলায়, "এসো, এসো। ভাল করে দেখে, মামাকে বলে যা হয় একটা ব্যবস্থা করো। আমাদের ভাগ্যি, এত বড় ডাক্তার এখানে আছেন।"

"মামা তো প্র্যাকটিস্ ছেড়ে দিয়েছেন।"

"তা হোক। উনি কানে একবার শুনে যা বিধান দেবেন, ছোট ডাক্তার সারাদিন ঘরে বসে থেকে তাও পারবে না। এসো, ওঁর কাছে এসো। আমার মেয়ে আমার এমনি এসে খবর পেয়ে।"

আমি দারুণ প্রয়োজনীয় ব্যক্তি হয়ে উঠলাম মামার মূল্যে। মল্লিকগিন্নী বড় ঘরখানির ভেতরে আমাকে নিয়ে গেলেন।

দু'দিকে দু'খানা খাট। ঘরখানা বড়। দুদিকে খাট দু'খানা যেন দুখানা আলাদা ঘর। এক খাটে অসুস্থ মুগেন মল্লিক শুয়ে রয়েছেন। মাথার শিয়রে টেবলফ্যান বসানো, একটা লম্বা টেবিলের এক পাশে। অন্যদিকে ওষুধপত্র সজ্জিত। কয়েকখানা বইও আছে। পায়ের দিকে একটা আলমারী।

গৃহিণীর দিকের টিপয়ে পানের ডিবে ও পত্রিকা। সোকেস্ প্যাটার্নের আলমারী ভরা কিছু কিছু বাসন, পুতুল ও সৌখীন দ্রব্য। শিল্পকের পাহাড় একটা চোখে পড়ে, আঁদের গোলাপ ফুলের তোড়া। ওপাশের ঘরটায় ড্রেসিং টেবল ও আলনা চোখে পড়ে। ওদিকের খোপ দেখা যায় না, ওখানেই বোধ হয় শ্রীমতী ঝিলি।

মুগেন মল্লিককে বহুদিন দেখিনি। আজ দেখে চমকে উঠলাম। স্ত্রী যতটা সুন্দর, তিনি ততটা কুশ্রী। আজ কাল রংএ, শীর্ণ দেহে বিছানায় মেশা তিনি রোগের গুরুত্ব সম্পর্কে আমাকে সজাগ করে দিলেন দেখা মাত্রে।

আমি একটা চেয়ার টেনে বসলাম। খানদুই চেয়ার ঘরে ছিল।

"কেমন আছেন?" মল্লিকবাবুকে 'কাকা' কি 'দাদা' বলব ভেবে পেলাম না। আমার স্বর্গগত পিতা অদ্যাপি জীবিত থাকলে ইনি তাঁর কে হ'তেন কে জানে?

"আছি কেমন দেখতেই পাচ্ছ।" হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে মল্লিকবাবু বলেন, "এখন যেতে পারলেই হয়।"

মল্লিকগিন্নীর সম্মুখে এ হেন বাক্যে আমি অপ্রতিভ হয়ে বললাম, "এ আর কি এমন? সর্দিকাশি ঘরে ঘরেই হচ্ছে। শীগ্‌গির ভাল হয়ে যাবেন।"

মল্লিকগিন্নী মুখখানা ঘুরিয়ে স্বামীর শিয়রে দাঁড়িয়ে ছিলেন। বলে উঠলেন, "তুমি বাবা, একটু বুঝিয়ে-বাঝিয়ে তোমার মামাকে একটি বার এনে দাও। উনি বড় অস্থির হয়ে পড়েছেন। বাড়ীতে দেখার কেউ নেই। আমি, আর ওই মেয়েটি, এখন এল। সে-ও ছেলেমানুষ।"

এমন সময়ে মেয়েটি ঢুকল ঘরে এবং বিরস মুখে ঠক্ করে এককাপ চা আমার সামনে একটা ছোট টিপয় টেনে বসিয়ে দিল। এখনও মুখে বিতৃষ্ণা ও বিরাগ, কিন্তু আটপৌরে একখানা লাল ডুরে শাড়ীর জন্যে গৃহস্থ মেয়ের মত লাগছে। মাথায় কমলে বাঁধা নেই বলেই হয়তো।

আমি বললাম, "এ কি? চা কেন? আমি এক্ষুণি বাড়ী থেকে চা খেয়ে এলাম। অসুখের বাড়ী, লৌকিকতা—"

বাধা দিয়ে তীব্রস্বর এল, "অসুখের বাড়ী চা তৈরি হয়, চা খেতে হয়। তখন কোন অভ্যাগত থাকলে এককাপ দেবার ভদ্রতা সকলেরি থাকে।"

কথার জাল যেন ছুরীর ফলা দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে কাটা।

আমি কথা বাড়ালাম না। যে-কোন কারণেই হোক মল্লিকতনয়া আমার প্রতি প্রসন্না নন।

মল্লিক গৃহিণী তাড়াতাড়ি মেয়ের কথার ধার চেকে দিতে বললেন, "রবি, তুমি বিশুর পাপড়িকে চেনো। পাপড়ি তুই রবিকে—"

"খুব চিনি। এখানেই তো দিনরাত থাকেন।"

অবজ্ঞাসহিত কথায় ও দেবকী ওরফে পাপড়ির মুখভাবে বোঝা গেল বহু তথ্য। আলোকপাতে আমার চোখের সম্মুখের ঘন অন্ধকার আলোকিত হয়ে উঠল।

আমি ওর মত শহরে পড়াশোনা করি না। বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার যোগ নেই। ও ধরে নিয়েছে, আমি মামার স্বাবকতায় নিষ্ক্রিয় বোদাহের জীবন যাপন করে থাকি। লেখাপড়ার সঙ্গে আমার কোন যোগ নেই। পরমুখাপেক্ষী পরগাছা, পুরুষ হ'লেও বেকার। তাই ও এতটা অবজ্ঞার পাত্র বলে মনে করে।

আমি কোন মতে চা-টা শেষ করে মল্লিকবাবুর স্বাস্থ্য সম্পর্কে প্রশ্নাদি জেনে নিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। পাপড়ি ভেতরে চলে গেছে। মায়ের সুন্দর মুখে বাবার কাল রং মিলে মিশে সে এক দ্যুতিময়ী শ্যাম অপরাজিতা। কিন্তু গন্ধহীনা।

মল্লিকগিন্নী আবার মামাকে এনে দেবার সবিশেষ অনুরোধ জানালেন।

আসবার আগে একটি সংবাদ দিলেন মল্লিকগৃহিণী। রেণুকা বরাটের খালি বাড়ীতে আসছেন ওঁরি বৌদি। বিধবা হয়ে একা-একা তিনি আছেন বহুদিন। ত্রিকুলে কেউ নেই। ছোট ননদ রেণুকা একমাত্র আত্মীয়া ছিলেন এতদিন। খুবই বৃদ্ধ হয়েছেন মহিলা। শহরে ভাল লাগছে না। ওখানে এসে থেকে যাবেন কয়েকটা দিন।

রেণুকা বরাটের একমাত্র দাদার ধনখ্যাতি ছিল। রেণুকার জমিটি কিনে বাড়ীটাও তিনি নাকি করে দিয়েছিলেন।

খবরটা শুনে ভাবলাম, মামাকে না জানি কতটা নাড়া দেবে? শূন্য বাড়ী আবার ভরে উঠবে। যাতায়াতের পথে রিক্ত শূন্যতা আর পীড়া দেবেনা। দরজা-জানালা খোলা হবে, আবার মালী ঘাস ছাঁটবে, মাছওলা উঁকি দেবে। কিন্তু যে চলে গেছে সে কখনও ফেরে না।

আকাশে ভাদ্রের ভরা সোনার কমলে মেঘ। নীল আকাশ হঠাৎ মেঘে ফুলে উঠল। সাদা ফুলো-ফুলো মেঘ, নীলের বিস্তৃতি মুছে গেল। গাঢ় কালচে নীল পরতের ছাতা নীলকে ঢেকে দিয়ে গেল। কৃষ্ণচূড়ার গাছের খলিয়দার পাতা আরও সবুজ, ঘোরালো সবুজ হয়ে উঠল।

ভাবলাম, স্বর্গের পৃথক অস্তিত্ব কোথায়? এই যে লক্ষ দিনে হাসি অশ্রু ভরা পুরাতন পৃথিবী, এখানেই অলকার স্বাদ পাই আমরা। এমন রংএ রূপে বিচিত্র পৃথিবী গড়ে ঈশ্বর আমাদের ভোলা স্বর্গকে মনে করিয়ে দেন।

বার্ডক্য কলোনীর আর একটি তরুণ মুখ পেছনে ফুচো বাদামের ঠোঙা ফেলে এলাম। কিন্তু এ মুখ আমার মত থাকার মুখ নয়। এ ক্ষণঅতিথি। এতদিনে যদি একজন তরুণী এল, যদি তার সঙ্গে আলাপ হল, তবু সে বীতরাগা।

আকাশ আরও কালো হতে লাগল। আমের মত কালো। রসভারে গোছা-গোছা কালো আম যেন উর্ধ্বে ঝুলছে। এখনি রসের বৃষ্টি নামবে।

তাড়াতাড়ি বাড়ী ফেরার চেষ্টা সত্বেও সেদিন ভিজে গেলাম।

মামাকে মৃগেন মল্লিকের বাড়ী যেতেই হ'ল।

ডাক্তার মিত্র, ডাক্তার ব্যানার্জি কূল পেলেন না। মামার অনুমান সত্য করে নিমোনিয়া ধরা পড়ল।

হাঁপানী রোগীর জরাজীর্ণ দেহে প্রকোপ যথেষ্ট রুদ্র।

ঔষধপত্র পাওয়া গেল মোটামুটি। বুড়ো বয়সে যা যা রোগ হতে পারে, ডাক্তারখানায় সেই ঔষধগুলো মজুদ করে রাখেন ডাক্তারেরা। তাছাড়া কম্পাউণ্ডার সপ্তাহে একদিন শহরে যায়। মেডিক্যাল রেপ্রেসেনটেটিভ আসে।

ক্রাইসিস চলছে ধারুণ। বাড়ীতে সেবার লোক না থাকায় আমি যাতায়াত করতে লাগলাম। কলোনীর অন্যান্য যাঁরা, তাঁরা সকলেই বৃদ্ধ। সেবার লোক খুঁজে মেলে না। কবিরাজ মশাইএর ঘরে নিজের অসার্থক পাঠশালা চালিয়েও দু'একরাত জেগে গেল। পাপড়ি ও মায়ের ওপর ভরসা করে অত বড় রোগী রাখা যায় না। অথচ ভাড়া নার্স আনারও রসদ নেই। কাজেই আমাকে জড়িয়ে পড়তেই হল।

মামাকে আবার অনেক বুঝিয়ে অকুস্থলে উপস্থিত করাতে হল। মামা প্রথমে প্র্যাকটিস্ ছেড়ে দিয়েছেন অজুহাতে দায়িত্ব গ্রহণে অসম্মত ছিলেন।

আমি বোঝালাম, "মামা, প্র্যাকটিস্ না করলেও তুমি অনেক ডাক্তারকে শিখিয়ে দিতে পারো। তুমি এখানে থাকাতে যদি ভুল চিকিৎসা হয়, তুমি কি শান্তি পাবে?"

মামা রাজী হতে চান না, "নারে রবি, একবার যখন কিছুই করিনি, নিশ্চিন্তে লোকটাকে মরে যেতে দিলাম, তখন আর যাব না এবার।"

আমি তর্ক চালালাম, "কিন্তু মামা, তাই তো তোমার বিশেষ করেই যাওয়া উচিত। তোমার দোষে না হলেও সেই ঘটনায় তুমি যদি মনে আপশোষ করে থাকো, আবার কিছু ঘটলে তো আরও আপশোষ হবে তোমার। তাছাড়া, ধরো একটা প্রায়শ্চিত্ত—"

মামা চুপ করে রইলেন। আমি হাত ধরলাম, "মামা, চলো। এ সময়ে কি করে ঘরে থাকতে পারো? পারো তুমি?"

মামা আস্তে হাত ছাড়িয়ে নিলেন। আমি ভাবলাম আর মৃগেন মল্লিকের বাঁচা হল না।

শহর থেকে প্রখ্যাত ডাক্তার আনার ক্ষমতা নেই ওঁর। অথচ এখানকার ডাক্তার দু'জন হালে পানি পাচ্ছেন না। মুখ শুকিয়ে গেছে ওঁদের।

মামা নিজের ঘরে ঢুকে গেলেন।

আমি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে কুটো বাংলোর বারান্দার উদ্দেশে প্রস্থান করলাম। ওঁরা কত আশা করে বসে আছেন মামার পথ চেয়ে। আমাকে একা দেখে ভাববেন কি?

মামা বেড়িয়ে এলেন। হাতে এতদিনের তুলে-রাখা, পুরণো কালো চামড়ার ডাক্তারী বাক্স।

দিন যেন থম্ থমে হয়েছে।

খুঁড়িয়ে চলা দেখতে দেখতে একটা দিনে দশটা দিনের দেখা দেখি।

মামার হাতে রোগী অনিবার্য পরিণতির পথে গড়িয়ে যেতে পারল না, কিন্তু অরাজীর্ণ হাসানীর রোগীর দেহ কুটো নৌকোর তলা। তাদিয়ে রাখা শক্ত, বড় শক্ত।

মামার সঙ্গে পাঁপড়ির ঘনিষ্ঠতা দেখলাম। মামাকে যত্ন করা, মামার সুখ-সুবিধার প্রতি দৃষ্টি রাখা দেখে খুশী হয়েছিলাম। বিনা পারিশ্রমিকে এত বড় ডাক্তার পেলে কৃতজ্ঞতা স্বাভাবিক।

মামাকে যাওয়া মাত্র চা করে দেওয়া, হাতপাখার বাতাস, যত্ন করে বসানোর মধ্যে আন্তরিক শ্রদ্ধা। মামারও কাজে জড়িয়ে পড়ে পরিবর্তন এসেছে। মামা আগের মত গম্ভীর উদাস নেই। উৎসাহ, জীবনকে নূতন করে দেখার ইঙ্গিত দেখা দিয়েছে চলনে-বলনে।

একটা ঘুমন্ত শূন্যতার কুয়াশা-আসন আস্তে মামার চোখের দৃষ্টি থেকে সরে যাচ্ছে। সরে যাচ্ছে মুখের ভাবহীন পাণ্ডুতা থেকে। একাগ্র মনোযোগে একজনের প্রসিদ্ধ চিকিৎসকটি ফিরে এসেছেন। দৃঢ় প্রত্যয়ে তিনি সান্ত্রাজা চালনার মত ডাক্তার দু'জনকে নির্দেশ দিচ্ছেন। ওঁরা সাগ্রহ বিনয়ে পালন করছেন।

ভাবলাম, ভালোই হল, বাইরের ছোট ঘরটায় একটা চ্যারিটি ডিসপেনসারি খুলে দেব। একঘণ্টা করে মামা পরোপকার করবেন। অতি উৎসাহী মামার ঘরবাসী জীবনে হঠাৎ যে একটা রিক্ততার বাধা জুমেছে, সেখানে জোয়ার না আসলেও অন্ত ধারায় প্রবাহিত করা চলবে জীবনতটিনী। কলোনীর লোকগুলিরও উপকার করা হবে।

শেষ প্রহরের চরম পিপাসার শেষ বারিবিন্দু মামার হাত থেকে কঠিন তাপ্পা ছিনিয়ে বালিচড়ায় শুকিয়ে দিয়েছে। পরপরপার বাতাসে নদী সঞ্জীবিত হয়ে উঠবে।

তাই মামার প্রাণচাঞ্চল্য দেখে সুখী হই। মামাকে পাঁপড়ি সমাদর করছে এবং মামার সেটা ভাল লাগছে দেখে আমার আনন্দ হয়। আহা, বঞ্চিত মামা সুধার গ্রাস কোথাও পান যেন।

এরি মধ্যে ভাদ্র আকাশে শেষ বর্ষণপালা সুরু হ'ল। রবীন্দ্র কাব্যে শেষ বর্ষণের যতটা আদর থাকুন না কেন, রোগীর জীবনে প্রমাদ ঘটিয়ে দিতে পারে। ভাদ্র, আশ্বিন, কার্ত্তিক মাসে, প্রবীণারা বলেন যমের নাকি চার ছুরার খোলা থাকে। সহজেই ব্যাধি প্রাণান্তকর হয়ে দাঁড়ায়।

এক্ষেত্রেও হল তাই।

ঘুসেন মল্লিকের অত্যধিক বাড়াবাড়ি দেখা গেল। পাঁপড়ির হাতে ছিল পথ্যের ভার। নিজের হাতে মামার নির্দ্দেশমত মেপে মেপে খাওয়ত সে বোগাত।

একদিন হয়তো পথ্যের পরিমাণ বাঁধাধরা মাপ থেকে একটু বেশী হয়ে গিয়েছিল। আপত্তিকে দোষ দেওয়া যায় না। সারাদিন রাত তাকে সমস্ত ঝুঁকি নিয়ে রোগীর সেবা করে যেতে হয়। কবিরাজ মশাইএর মেয়ে অবশ্য মধ্যে মধ্যে রাত জাগতে আসে, যদি বেশী বাড়াবাড়ি হয়। কিন্তু তার আবার পাঠশালার বাচ্চাদের দিয়ে একটা শারদোৎসব করাতে হবে। বাচ্চাদের সংখ্যা এত কম যে, শহর থেকে চেয়ে-চিন্তে এক রজনীর বাচ্চা যোগাড় করতে হবে। অতএব পুরোপুরি রিহার্সেলও সম্ভব নয়। সেখানকার বাচ্চারা নিজেদের মত অভ্যাস করে যাবে, এখানকার বাচ্চারা এদের মত করবে। অতঃপর যোড়া দিয়ে দাঁড় করানো হবে পূর্ণাঙ্গ অনুষ্ঠান। যা হয়, বলার নয়।

তবু গোটা কলোনীর লোক মেতে উঠেছে। মৃগেন মল্লিকের অসুখে একটু ম্রিয়মান হয়েছিল নগরগ্রাম, কিন্তু মাথা তুলে ধরার সাহস ফিরে পেয়েছে। বিকেল হতে না হতে ছোটে তারা কবিরাজবাড়ী।

সিমেন্টের ওপর টিনের চালা বড় ঘরটি পাঠশালা ঘর। মাঝখানে বাগচীর অর্থে কেনা সতরঞ্চি পাতা হয়। সেখানে অধরবাবু রাজা। বেহুরো হারমোনিয়াম অধরবাবুর হাতে মেচে মেচে ওঠে। অধরবাবু হাতে তালি দিয়ে গেয়ে ওঠেন—"এইবার, এইবার। ধরো একসঙ্গে,—

মেঘের কোলে রোদ এসেছে
বাদল গেছে টুটি,
আজ আমাদের ছুটি রে ভাই,
আজ আমাদের ছুটি।' হা-হা-হা-হা!

হ্যাঁ হ্যাঁ। মেচে মেচে, গাও।"

অধরবাবুর যেন কায়াকল্প চিকিৎসায় নবজন্ম ফিরে পেয়েছেন। লাফিয়ে লাফিয়ে চলেন, কথায় কথায় হাসেন। জামাই-এর বাড়ী বাজার করা ছেড়ে দিয়েছেন। মেয়ের খিটখিটে কানে তোলেন না। জামাই বিরস মুখে বাজার বয়ে আনে।

এবারে শারদোৎসবের পরে অধরবাবু ঠিক করে রেখেছেন যে, প্রস্তাব দেবেন, সপ্তাহে একদিন পাঠশালায় তিনি গান শেখাবেন। যদি হয় তো কিছু আসবে, না হয় বিনা পয়সায়ই শ্রম দেবেন। এতদিন কেন পরিকল্পনা মাথায় আসেনি, ভেবে পান না অধরবাবু।

বাচ্চাগুলো একপায়ে কাঙারুর মত লাফিয়ে নাচে। দর্শক জোটে বহু। তারা বাৎলে দেয়, "উহুঁ, হচ্ছে না। আর একটু হাত নাড়ো জোরে জোরে। কেটে-যাও পাশে। ধ্যুস, গলা ছাড়।"

মধ্যে মধ্যে বাচ্চারা বিদ্রোহ করে। কবিরাজকন্যা ছুটে একটা হরলিক্সের কৌটো বার করে সংগ্রহ দেয়। কম দুধে জোলো চা অধরবাবুকে যোগায়। বেচারী গানে বাজনায় দক্ষ নয়। কিন্তু অভিভাবকেরা চান, সিল্কের পোষাক পরে, জরির ঝোপ্পা ঝুলিয়ে অন্ততঃ একদিন তাঁদের বাচ্চারা মঞ্চে উঠুক।

কবিরাজকন্যার সমস্যাভার ঘটায় বাধ্য হয়েই আমাকে মৃগেনবাবুর শুশ্রূষার কিঞ্চিৎ ভার নিতে হয়েছিল। এখানে সকলেই প্রায় বৃদ্ধ। করে কে?

সেদিন রাত্রে মৃগেন মল্লিকের হঠাৎ পেটটা কেঁপে উঠল। একে নিঃশ্বাসের কষ্ট, তায় উরু অবধি। দৃশ্য অবর্ণনীয়।

আমি সন্ধ্যাবেলা মল্লিক মশায় ভালো আছেন দেখে বাড়ী ফিরে মামাকে রিপোর্ট দিয়েছিলাম। রাত্রে খাওয়াদাওয়ার পরে মামা শুতে গেছেন।

আমি মুরলীর খাঁচার তদারক সেরে বাড়ি আসার ঘরে, হঠাৎ দেখলাম কুচো বাংলোর উড়ে বুড়ো চাকর একটা ভাঁড়, কাপড়-আঁচার খাটকালো লণ্ঠন হাতে উর্ধ্বশ্বাসে আসছে।

"চল খোকে সাথ। ডাগদার সাবকে ডাঁকুছি।"

হাঁপাতে হাঁপাতে চাকরটি ছুটে এসেছে যখাসাধ্য।

"কি হল, কি?"

গুনশাম বাবু যেন কেমন-কেমন করছেন। এক্ষুণি আসবার যেতে বলেছেন ওঁরা। ডাক্তার নারায়ণ মিত্রকেও খবর গেছে।

আমি এত রাত্রে প্রথমেই মামাকে না তুলে, নিজে আগে দেখতে গেলাম।

সত্যিই অবর্ণনীয় দৃশ্য। মনে হচ্ছে নিঃশ্বাস নেবার চেষ্টায় মৃগেন মল্লিকের প্রাণ বোধ হয় এখনই চলে যাবে। সেই মৃদঙ্গের মত স্ফীত।

নারায়ণ মিত্র বিপন্ন ভাবে বসে আছেন মাথার শিয়রে। মল্লিকগৃহিণী বুকে হাত বোলাচ্ছেন।

পাগলের মত পাপড়ি এল ছুটে, "কই, আপনি একা কেন?"

আমি কী কোন কাজই পারব না? কেবলমাত্র মামার মূল্যে আমার মূল্য? এতদিন একাগ্র সেবার পরেও মৃগেন মল্লিকের মেয়ে আমাকে একেবারে 'এলেবেলের' দলে ফেলল না কি?

মল্লিকগিন্নীও সজল অনুযোগের চোখে তাকালেন।

আমি অপ্রতিভ হয়ে বললাম, "রাত হয়ে গেছে। মামা শুয়ে পড়েছেন। আগে আমি দেখে যাই। কি হয়েছে? তেমন তেমন দেখলে—"

বাধা দিয়ে পাপড়ি আমাকে সগর্জনে বলল, "তেমন তেমন—আপনি কি দেখছেন না? দেরী করার সময় আছে আর?"

দেবকীর মুখ লাল টক্‌টকে, চুলগুলো যেন উন্মাদিনী কালিকার ভঙ্গিতে ছড়ানো। বুড়ো বাবা, তার রুগ্ন, তাঁর যদি মৃত্যুই ঘটে, তাহলেই বা এমন করে কে?

মেয়েটি যেন কেমন? আদরের ডাকনাম 'পাপড়ি' যেন ওকে মানায় না মোটে। কসে-কারাসারের দেবকীর মত রহস্যময়ী সে, দ্বিতীয় কৃষ্ণের জন্মবাসনায় উন্মেলিতা। হয়তো আবার কোন অবতার তার মধ্যেই জন্মগ্রহণ করবে। তাই দেবকী সাধারণের অগোচরে নিজস্ব কোন মন-অভিলাষে রহস্যময়ী। আমাকে সে এখন তাচ্ছিল্য করে না ঠিক, কিন্তু কোন মর্যাদাও দেয়না। মামাকে এনে দেওয়ার মধ্যে আমার অবদানের গুরুত্ব সে দেয়না। আমার কাছ থেকে যে-কোন প্রমও অনায়াসে নেয় সে। ধন্যবাদটাও দেয় না কখনও। অবশ্য আমি কোন প্রাপ্তির প্রত্যাশায় প্রদান করিনা। তবু মামার স্টেথোস্কোপ বা ব্লাডপ্রেসারের যন্ত্রের মত আমার নির্বাক-নিষ্ক্রিয়ার উপস্থিতিকে স্বতঃসিদ্ধ তত্ত্ব বলে নিলে দুঃখ পাই।

আমার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে পাপড়ি ফেঁদে ফেলল, "কি হয়েছে? আমিই বুঝি বাবাকে মেরে ফেললাম। বাবার বেশী হয়ে গেছিল।"

আমি সান্ত্বনা-প্রদানের প্রয়াস পেলাম "যদি বেশী হয়েই থাকে, তাতে বলার কিছু নেই।

মানুষের হাত যেখিন নয়। দিনরাত আপনি খেটে যাচ্ছেন। একা আপনার ওপরে এতবড় রোগীর সমস্ত চিকিৎসা নির্ভরিত হচ্ছে। মাথা ঠিক থাকেনা।"

"কিন্তু আমার বাবা—আমার বাবা গেলে যে আমার কি হবে জানেন না আপনি। আপনার মামাকে শীগ্‌গির নিয়ে আসুন। পায়ে ধরছি।"

আমাকে স্তম্ভিত বিস্মিত করে সস্মিতা দীপ্তা পাপড়ি হঠাৎ দুহাতে আমার পা জড়িয়ে ধরল। মল্লিকগিন্নী চোখ মুছলেন। নারায়ণ ডাক্তার মাথা নামিয়ে বসলেন।

কঠিনার হাত এত কোমল!

আমি তাড়াতাড়ি পা ছাড়িয়ে নিতে ওর হাত ধরলাম। সমস্ত পৃথিবী আমার চোখের সম্মুখে কাঁপছে তখন।

মৃগেন মল্লিকের দিকে চেয়ে বুঝলাম, সত্যি দেরী করা চলবে না।

ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে গেয়ে মামার ধরকা ধাক্কা দিয়ে খুলে মামাকে টেনে বার করলাম। মামা ড্রিপিং স্যুটের ওপর একটা কোট ফেলে কোনমতে উপস্থিত হলেন।

নাড়ি ও বুক চক্ষের নিমেষে দেখে মামা ডাক্তার মিত্রকে আদেশ দিলেন,' ইমাকে পাম্প'।

তারপর সারা রাত্রি ধরে যুদ্ধ চলল।

পাম্প লাগিয়ে মৃগেন মল্লিকের পেট খালি করে তাঁকে স্বস্তি দেওয়া হল। এখন অচিরাৎ যে ঔষধটি লাগবে, তার জন্য শহরে যেতে হবে কাউকে ট্রেনে। রাত্রি প্রায় তিনটে তখন। কে যায়?

মামা আমার দিকে তাকাবার পূর্বেই আমি বললাম, "আমি এনে দিচ্ছি!"

পাশের খুপরি ঘরখানায় পাপড়ি ঢুকে গেল, টাকা আনতে বোধ হয়। আমিও এগিয়ে গেলাম।

কোণের জলচৌকীর উপর মল্লিকগিন্নীর মন্দির প্রতিষ্ঠিত। রাজ্যের পট ও পুতুলের গায়ে সিঁদুর চন্দন ও ফুল। তামার ফুলে-ফুলে টাট ও কোশাকুশী।

সেখানে মাথা কুটছে পাপড়ি,—"তোমরা কিছু নও। তোমরা শুধু পুতুল, পুতুল!"

কবিরাজকন্যা এসে হাজির হয়েছেন শুষ্ক মুখে। আরও দু'চারজন খবর পেয়ে জড়ো হচ্ছেন একে একে।

কবিরাজকন্যাকে পাপড়ির কাছে ডেকে দিয়ে আমি টর্চ নিয়ে অন্ধকারে রওনা হলাম সাড়ে তিনটের লোক্যালে। সময় নষ্ট করা চলবেনা।

ঔষধপত্র কিনে ফিরতে ফিরতে বেলা হয়ে গেল। সকাল শেষ হয়ে গেছে। সোনার রোদ সকলের ঘরে ঘরে সোনা বিছিয়ে দিয়েছে। ছোট ছোট কদাল-বাগানগুলো রাংচিতের বেড়া ঘেরা রোদে হাত পা মেলে হাসছে, বাচ্চাদের আনন্দে।

মাছওলা মোড়ে মাছের ঝাঁকা মাথায় অদ্ভুত হয়ে গেল আমার আগে-আগে। আজকাল এখানে একটু জীবন চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। দু'এক ঘর উদ্বাস্তু কলকাতায় স্থান না পেয়ে এখানে বাসা গোড়েছেন। এখান থেকেই অফিস করেন তাঁরা তাঁদের ছেলেমেয়েগুলো কবিরাজকন্যার পাঠশালায় যোগদান করায় শুধু পাঠশালাটি চলছে।

ডিমওলাও ঘুরছে দেখলাম। গোয়ালা আগেই চলে গেছে। অবেলায় শিয়ন ধীরে সুস্থে যখন সময় পায়, ঘুরে যায়। তবে আজকাল পূর্ব্ববঙ্গের বাঙাল বাসিন্দেরা গোলমাল করেন, চিঠিপত্রের দেরী দেখলে। ওঁদের চিঠিপত্র আসে ঘনঘন।

আজকাল আবহিংএর ঘুমন্ত উৎস্থকতা যেন নিজ রূপ ও রং বদলাতে চায়। ঝিমন্ত আলস গেছে চলে। পুরাণী বাতাস এখনও বয়ে যায়। তবে সোনালী গোধূলি যাই-যাই করছে। বিদেশী শক্তি কিনে নিয়েছে বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ড। কবে বা ক্রেন এসে মাটী খুঁড়ে তুলবে।

দূরে সরে বাসা নিলেও উহার পরিবার কদোনীর গানে উচ্চগ্রামের তান লাগিয়েছে। ফুল ছোটাতে চাষরা তারা, নিজের নিজের বাগানে তরকারীর চাষ করে থাকে। কুমড়োর ফুল, সজনের ফুল তাদের অতিশয় প্রিয়, রজনীগন্ধা বেল রেখে লাভ নেই।

ভয়ে ভয়ে পথ চলছিলাম। সাড়ে চারঘণ্টা কেটে গেল। জানিনা পাঁপড়ির বাঁধা আছেন কিনা। পথে লোকজনাচল তেমন নেই এখনও। আমি যেন সেই পুরাণখ্যাত হনুমান, লঙ্কণের শক্তিশেল নিবারণে সুদূর থেকে ঘোর রজনীর প্রহরে বিশল্যকরণী খুঁজে ফিরছি। বাড়ীর জানালায় চোখ রেখে দেখছে সকলে। আমার প্রতি পদক্ষেপের তালে তাল রেখে যেন বাড়ীগুলো প্রতিধ্বনি তুলছে, "রবি অষুধ নিয়ে এসেছে। রবি অষুধ নিয়ে এসেছে।"

মনটা সুস্থ ছিলনা। পিতার মৃত্যু সামনে নিয়ে পাঁপড়ির তথাপি মায়ার জন্য ব্যাকুলতা চোখে পড়ার মত। ঘরে দুধ নেই। তবু পিতার হরলিক্স্ দিয়ে এককাপ চা এনে মায়ার হাতে দিয়ে খাবার জন্য পেড়াপেড়ি করছে। আবার মামা থামছেন দেখে পাখা করছে।

আমি সন্তুষ্ট হয়েছিলাম। মায়ার কষ্ট হচ্ছে এত রাত্রে আচমকা ঘুম ছেড়ে রোগীর ঘরে এসে। মায়ার মত ডাক্তার গভীর রাত্রে বিনা পয়সায় উঠে এসেছে। অর্থের সামর্থ্য না থাকলে সমাদর দেখানো উচিত।

কিন্তু ইদানীং পাঁপড়ি যেন বাড়াবাড়ি করে ফেলছে। আশ্চর্য্য, মায়া কিন্তু বেশ প্রফুল্ল। মল্লিকগৃহিণী চির সন্দিগ্ধা। কিন্তু এখানে মহা সমস্যা। মেয়ে এমন একটি ব্যক্তিকে হাত করলে ওঁরই লাভ।

এসব কথা মনে করাও অনুচিত ভেবে তৎক্ষণাৎ চিন্তা ঝেড়ে ফেলেছি।

কিন্তু আমার দেবচরিত্র—চিরকুমার মায়ার মনে কাল্পন আগল নাকি? হাসিহাসি মুখে পাঁপড়ির সঙ্গে গল্পে দারুণ অভিরুচি দেখা যায়। রেণুকার কথা ভুলে গেলেন বুঝি?

আমার সুখী হওয়া উচিত। আমি রেণুকাকে ভুলিয়ে দিতেই চেয়েছি। মায়ার সুখ গড়ে তোলার জন্যেই আমি এখানে আছি।

কিন্তু এত বয়সে একটা ছোট মেয়েকে মায়ার আমল দেওয়া অসঙ্গত। তবে সেবার সকলে ভোলে দেখি।

যাই হোক, মনের অবস্তিকর চিন্তাকে চাপা দিয়ে পেছনে সরিয়ে মনটাকে সুখের সাজে সাজিয়ে রেখেছিলাম। কিন্তু ভোর রাত্রে একটা দৃশ্য দেখে মানুষের ওপর বিশ্বাস থাকতে চায় না।

খুপড়ি ঘরখানির মধ্যে মায়া হরলিক্সের চা খেতে ঢুকেছেন। ডাক্তার মিত্র বাড়ী গেছেন একটা ঘুম আনতে। কবিরাজকন্যা ও পাঁপড়ির মা রোগী দেখছেন।

আমি প্রথম থেকেই রাজি আছি। কিন্তু আমাকে একবার হরলিক্স্ চা দেবার কথা পাপড়ি মনে করেনি।

নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াবার সাধনায় সে ব্যস্ত। জীবনে কাঠিন্য এসে গেছে। আমাকে অবজ্ঞা তার পক্ষে স্বাভাবিক। আমি দোষ দেইনা। মামার ভয়ে চিত্র আমার অন্য বেয়ারা নেই। ভেবেছিলাম একবয়সী আমরা, বন্ধুত্ব হবে। এখানে কথা বলার লোক না পেয়ে মরে যাচ্ছি। বাংলোর নোটগুলো ওর কাছ থেকে নিয়ে নেব। ও যদি এক-আধটু সাহায্য করে, সামনের বছরে এম. এ টা দিতে পারব। কিন্তু পাপড়ি আমাকে মানুষ বলে মনে করে এমন পরিচয় পাইনি। মৃগেনবাবুর সেবা করে যাই কর্তব্যের খাতিরে মাত্র। নইলে অমন অহঙ্কারী মেয়ের ধারে কাছে ঘেঁষতাম না।

দেখলাম হরলিক্স্-চা টেবলে পড়ে আছে। পাপড়ি মামার গলা জড়িয়ে, বুকে মুখ। মামার মুখ দেখতে পাওয়া যায় না, দরজার দিকে ফেরানো।

চোরের মত পালিয়ে এলাম।

বিশদাক্তবর্ণী রাতে ফিরতে ফিরতে ভাবছি। সকলে পুরুষ জাতিকে দোষ দেয়, একদিক নয় বলে। আমি চটে যেতাম। মামার উদাহরণ দেখাতাম। মিসেস হরি মামার হেডক্লার্ক সঙ্গে. কেবল মাত্র ভাবমিলন হয়েছিল। তবু তাঁর সন্তার ভাবমিলনে বিশ্বস্ততা অপূর্ব।

এখন। এখন!

তবে আমি খুশী হচ্ছি না কেন?

মামার বাগানে ফুল তোলাতেই আমি তো এসেছি।

বিরস মনে যত শীঘ্র সম্ভব কুচো বাংলোয় পৌঁছলাম।

পৃথিবীর মানুষের জীবনে কেবলমাত্র একটা বস্তুই আছে। তাই নিয়ে সিনেমার উল্লাস, থিয়েটারে উৎসাহ। সাহিত্য-সঙ্গীত-চিত্র আদিরসের পূজারী। দোষ কারুর নেই। মানুষ নিজেই যদি নেমে যায়, তবে মানুষকে নিয়েই সর্বপ্রকার সৃষ্টি যারা করে থাকে, তাদের দোষ দেব কেমন করে?

তবু পিতা মনোমনো, ডাক্তারের রোগী যায় যায়, এহেন সময়ে পাশের ঘরে—! আমার দেবচরিত্র মামা! চোখকে বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না!

মৃগেনবাবুকে অপেক্ষাকৃত ভালই দেখলাম। ঔষধপত্র বুঝিয়ে দিয়ে চলে আসতে ছিলাম। ওখানে একদণ্ড থাকার প্রবৃত্তি হচ্ছিল না। এক রাত্রের মধ্যে আমার জগৎ ধ্বসে গেছে।

মল্লিকগৃহিণী বাধা দিলেন, "এককাপ চা খেয়ে তোমাকে যেতেই হবে, রবি। হরলিক্সের চা তখন তুমি খেতে পারবে না বলে পাপড়ি তোমাকে দেয়নি।"

মনে মনে ভাবলাম: সে তো বটেই। মেয়ে তোমাকে বোধ হয় তাই বলে বুঝিয়েছে। আসল কথা, ওর আমার কথা মনে ছিল না। সে হাসে মজেছে।

প্রবৃত্তির বলিহারী যাই। ওই বুড়োর গলা ধরলি? অবশ্য আমারও পা ধরেছিল। কিন্তু কী উল্টোপাল্টা বুদ্ধি! মামার পা ধরে, আমার গলা ধরাটাই স্বাভাবিক ছিল।

মামার এমন অধঃপতন!

যাকগে, আমি কয়েকদিন পরে চলেই যাবো। পাগলি যেন মামার দেশ-দর্শনের খবরদারী করে; নৃত্যগোপালকে রাজা বলে ডেকে; আর মামার বাগানে ফুল তোলায়।

আমার অসুখী মামার সুখ হয়েছে ভেবে শান্তিতে থাকব।

মল্লিকগৃহিণী আমাকে স্নেহনের বারান্দায় নিয়ে এলেন, ওঁদের রান্নার এলাকায়। সংগ্রাম অন্তে শান্তি নেমেছে। সুসেন মল্লিককে মৃত্যু কেড়ে নিয়ে চলে গেছে। বাড়তি লোকেরাও চলে গেছেন যে-যার ঘরে। সুসেনবাবু নিদ্রামগ্ন।

বারান্দায় এসে মা জলে গেল। সেখানেও সুসেন উপস্থিত। মোড়ায় বসে আছেন মামা। ওঁর পা-ধোয়ে পাগলি। মুখে হাত ঢাকা। বাবা ভাল হয়ে গেছেন, তবু ভাগ্নেবাবুর কান্না যায় না!

মামাই বা কেন এত সহজে রেণুকাকে ভুলে এই মেয়ের বয়সী মেয়েটাকে নিয়ে মত্ত। মামার কাছেও আদর্শ নেই, প্রেমের সম্মান নেই।

আমাকে দেখে মামা ছিলমাত্র অপ্রতিভ হলেন না। মানুষ যখন তলিয়ে যায় তখন,—'ঘৃণা-লজ্জা-ভয়, তিন থাকতে নয়।'

আমার হাতে চা দিয়ে মল্লিকগিন্নী বলেন, "আবার কাঁদছে?"

"দেখুন তো। পাগলি, শোন, আমি তোমাকে কথা দিয়েছিলাম। এবারে তোমার বাবাকে আমি সারিয়ে তুলব। কথা রেখেছি। তবে তুমি এখনও কাঁদছো কেন?"

"কাঁদছি"— ভাঙা সুরে হাতের আড়াল থেকে সে বলল, "কি হয়ে যাচ্ছিল। ভবিষ্যতে আমার কী হত? মুখ তুলে দাঁড়াতে কী পারতাম?"

মল্লিকগৃহিণী মাথা নামালেন। আমি বিস্মিত। কঠিন মেয়েটি ভাবপ্রবণতার প্রাবল্যে যা মনে হয় বলছে। আজ আগাগোড়া ওর ব্যবহারটা বিস্ময়জনক। প্রায়-বৃদ্ধ পিতার মৃত্যুর আশঙ্কা নিয়ে কোন মেয়ে এত আঘাতই পাক, এমন পাগলের মত করে না। অথচ মা-বাবার বিশেষ ভক্ত বলেও মনে হতনা ওকে। ঘুরে ঘুরেই থাকত। রাতারাতি যেন পিতৃপ্রেমে ক্ষেপে উঠেছে!

মনে মনে হাসলাম। মামাকে তোলাবার এক চেষ্টা মাত্র।

আমাদের চা খাওয়া হল। আমি উঠে দাঁড়ালাম। এখানে বেশীক্ষণ থেকে মামার সুখে ব্যাঘাত ঘটানো উচিত নয়।

মামা ডাকলেন, "দাঁড়া রবি, আমিও আসছি।"

আমি মুখ ফিরিয়ে আগে বারান্দা থেকে চলে আসতে প্রস্তুত হলাম। বিদায়ের সুকোমল ভাষা আমার কানে যেন না-ই আসে।

কিন্তু আমারি দু'কান ভরে সেই বাণী শুনতে পেলাম। মামার গলায় অতি মধুর অতি কোমল সুর শুনলাম। মামার গলায় যে এমন যদু আছে তাতো জানিনি।

শুনলাম মামা বলছেন আদরে-গলা গলায়, "পাগলী মা আমার! শান্ত হয়ে স্নান খাওয়া করো। ভয় কি, মা? তোমার এক বাবা না হয় অসুখে পড়েছেন। আর একটি বাবা তো পাশে দাঁড়িয়ে।"

সমস্ত আকাশ-বাতাস ভরে গেল সেই কথায়। মুহূর্তে সূর্যের আলো হীরার ধারে হেসে উঠে সারা পৃথিবী ছেকে দিল। অযুত নিযুত ফুল অলক্ষ্যে ফুটে উঠল।

আমার দেবতা ফিরে এলেন।

আরও এক উপলব্ধি তীক্ষ্ণ অসির ধারে আমাকে কেটে দিল।

কেন আমি সন্ধেকাতর রাত্রি বুকে বেঁধে বেড়িয়েছি? কেন বয়স্ক পুরুষের তরুণীর প্রতি স্নেহকে স্বাভাবিক সহজভাবে নিতে পারিনি?

আজই গভীর রাত্রে সুকোমল একটি স্পর্শ আমাকে রূপান্তরিত করে দিয়েছে। আমাকে সে বুঝিয়ে দিয়েছে।

রাত্রির শাখায় ফুল ফোটে কত শত। অনেকে তুলে নেয়, গলায় পরে।

জীবনের পথে অনেক ঝরণা। অনেকে জল পান করে।

আমার গায়ে সেই স্পর্শ অনুপরমাণু উদ্দীপ্ত করে প্রেমে আমাকে নবজন্ম দিয়েছে।

চতুর্থ কাণ্ড

"তুমি একটা দারুণ বোকা। হ্যাঁ, প্রথমে তোমাকে অপদার্থ মনে হয়েছিল, স্বীকার করি। কিন্তু পরে কী তাই ছিল না কি?"

শেষ প্রান্তে কলোনীর একটা পুকুর আছে। কেউ হয়তো সেখানে কখনও লাল শালুকের ফুল ভাসিয়ে থাকবে। শাখা-প্রশাখায় বিকৃত ফুল পুকুরের জল গ্রাস করে ভাসছে। পানার সবুজ মীনায় আরও শোভা খুলেছে।

বর্ষার শেষ হয়ে শরৎ জলে স্থলে। তাই চারদিকেই বর্ষাধোওয়া পাতায় পাতায় সোনালী রোদের আভা। গাছে গাছে ফুল। ফুলে ফুলে ভ্রমর।

পাপড়ি সেই জলার ধারে বসে অনর্গল কথা বলছে। আমরা বিকেল বেলায় বেড়াতে চলে এসেছি।

পাপড়ির বাবা এখন সম্পূর্ণ সুস্থ। তবে চিকিৎসকের মদ পান না। বাড়ীর সামনে চেয়ার পেতে বসেন। অবশ্য নিজের কাজকর্ম নিজেই করতে পারেন।

পাপড়ি এখনও ফিরে যায়নি। শীঘ্রই যাবে। কারণ এটা তার পরীক্ষার বছর। ছাত্রীদেরও কতদিন না পড়িয়ে রাখা যায়? শেষে যদি অঙ্ক শিক্ষিকা রেখে দেয়, বিপদ ঘটবে।

প্রথম দেখায় যে আধুনিকী বলে যাকে মনে হয়েছিল, সে এখন ঘরোয়া মেয়ের বেশে পাশে বসেছে। কালো চুলে খোঁপা, শাদা করে শাড়ী পরা।

পাপড়ি বলছে, "দেখ রবি, কতকগুলো কারণে আমি মানুষ সম্পর্কে একটু সাবধানে চলি, বুঝেছ? মানে নয়, বিশ্বাসযোগ্য লোককে অবিশ্বাস করে থাকি। কিন্তু দেখ, আমাকে উপার্জন করতে হয় দিনরাত পুরুষের মধ্যে। সর্বদা যথা উচিত ব্যবহার পাইনা। তাই বিরক্তি বোধ করি সময়ে সময়ে। প্রথমে তোমার মামার সঙ্গে যতটা মিশতে আমাকে হয়েছিল, ভেবেছিলাম অন্য পুরুষের জগতের মত উনিও সুবিধা নেবার চেষ্টা পাবেন। জানো রবি, একবার এক বয়স্ক বুড়ো পর্যন্ত আমাকে জড়িয়ে ধরেছিল। কিন্তু আমি দেখলাম এমন একটি লোককে—। জানোতো কথা আছে, 'নরাণাম্ মাতুলক্রমঃ'। ভাবলাম এঁর ভাগে অবশ্য এঁর মতই হবে।"

"হতাশ বলে তো!" আমি সাগ্রহ প্রশ্ন পাঠাই।

"মোটেই না। তুমি কিছু বুঝতে পারনা। তাই তো তোমাকে বোকা বলি।"

বোকা আমি নই। কিন্তু মায়ার অনুগ্রহে যে-নীল জীবন নিয়ে তোমাকে কি বলতে পারি, পাপড়ি? আজ আমার দিন তুমি ভরে দিয়েছ গানে।

জানি তুমি থাকবেনা পুব হাওয়ার দেশে। দক্ষিণ যাত্রী পাখী তুমি, উড়বে দেশে বিদেশে, দক্ষিণে হাওয়ার দেশে। তবু যেটুকু পেয়েছি তাই লাভ।

প্রকাশ্যে বললাম, "মায়াকে তুমি এত শ্রদ্ধা করো দেখে আনন্দ পাই।"

"ওর মধ্যে কোন গলদ বা ক্ষুদ্র কিছু নেই। আমরা চিরদিন মনে একটা আদর্শ চরিত্র এঁকে রাখতে ভালবাসি। কোথায় একটা এ রকম মানুষ থাক। মায়া সেই রকম একটি আদর্শ। এমন লোক আমাদের জীবনে দেখতে পাইনা। কোথাও আছে ভেবেও শান্তি। রবি, তুমিও মায়ারি ভাগ্যে। হাতটি পর্য্যন্ত ধরতে চেষ্টা করোনি।"

এই যে তোমার হাতখানা ঘাসে আলতে পাড়ে আছে আমারি হাতের পাশে পাপড়ি। সবুজ শাড়ীর পাড়ের সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে একগোছা সবুজ চুড়ি হাতে। আমি শুধে নিতে পারি কখনো চুড়ি। চোখ বন্ধ করে আমি বলে দিতে পারি শিরাটি কোথায় দপ্‌দপ্ করছে। মণিবন্ধের পাশে তিলটিও আমি চিনি। কিন্তু যে হাত প্রকাশ্য সভায় পাণিগ্রহণে গ্রহণ করার স্বপ্ন দেখি একদা, কেন অর্থহীন নম্রতায় অথবা আমি সেই হাত অকারণে স্পর্শ করব? যা দুর্লভ, তাকে সস্তা করে তুলি কেন?

পাপড়ি বলছে, "নিজের জীবন অন্যের কাজে মিলিয়ে দিতে তুমি পারো, রবি। তোমার সঙ্গে মিশে আমিও সহজ হয়ে গেছি। তোমাকে ধন্যবাদ।"

"চলো, পাপড়ি, বাড়ী যাই। সন্ধ্যা হয়েছে।"

পশ্চিম, আকাশে ঘোলা প্রান্তরের অনবদ্য বহুবর্ণিল সূর্যোদয়। কলিকাতার আকাশ শুধু এরই স্বপ্ন দেখে রংএর খেয়ায় পূরবীর সুরে। চোখে দেখার ভাগ্য সে হারিয়েছে, তেরতলা হাইরেসার তুলে আকাশের গায়ে।

তবু এখানে কমলালেবুর বাগান দেখি আকাশে। কাঁচা ডালিমের গন্ধ ওঠে; সবুজ হাজরার বাগানের ধার ঘেঁষে যখন চলি। অসমোহিনীর বাড়ী যেতে চাঁদের আলো জ্বলে ওঠে সোঁদাগন্ধভরা মাটির কানাচে, দুই চাঁপা দুলে ওঠে পঞ্চানন প্রামাণিকের বাড়ীর ফটকের পাশে। জলার জলে লাল সাপলা ফোটে, যেন মানসসরোবরে স্বর্ণাভ অরবিন্দ।

আমি পথ চলি। সন্ধ্যার আকাশে তারা ফোটে। বাতাস গতি পরিবর্তন করে দক্ষিণে বয়। কখন আমার পথ এসে পাপড়ির পথে মেশে।

আবছায়া অন্ধকারে শারদোৎসবের রিহার্সেল চলছে। অন্ধকার পূর্ণ করে অবনীবাবুর ঘরে কচি রিণ্‌রিণে মিষ্টি গলা মিলছে:—

"কোথাগাঙের নৌকা গেছে সাজিয়ে যেন ফুলে,
ভাসাদিবীতে ভাসিয়ে যেন, চলবে দুলে দুলে—"

পাপড়ি নিজের মনে গুণ্‌গুণ্‌ করতে লাগল :—

"আজ আমাদের ছুটী রে ভাই,
আজ আমাদের ছুটী—"

আমি বললাম, "একটা ভালো গান গাও না।"

পাপড়ি চাপা গলায় ধরল—

"আজি শরত তপনে প্রভাত স্বপনে
কি জানি পরাণ কি যে চায়—"

আস্তে আস্তে সুরে সুরে ভরে গেল অন্তরীক্ষ। ম্লান আলোয় শান্ত নিস্তব্ধতে স্থানটি যেন স্বপ্নের দেশ। এখানে গতি নেই, ব্যস্ততা নেই, বেগ নেই। সুর রঙে রঙে ভরপুর হয়ে আছে।

আমার গন্ধর্বলোক।

বাড়ীর কাছে প্রায় এসে গেলাম। তবুও পাপড়ি অহি মুহু, কেবল আমাকে শোনাবার গলায় গেয়ে চলেছে :—

—"কোন্ স্বপনের দেশে আছে এলোকেশে
কোন্ ছায়াময়ী অমরায়।
আজি কোন্ উপবনে বিরহবেদনে
আমারি কারণে কেঁদে যায়॥
• • • • আমি আবার এ প্রাণ যদি করি দান,
দিব প্রাণ তবে কার পায়।
সদা ভয় হয় মনে, পাছে অযতনে
মনে মনে কেহ ব্যথা পায়।"

আমার মনপ্রাণ ধীরে ধীরে এই গানে ভরে গেল। চাপা আলোয় পথ চলা চাপা গানের তালে তালে, বোধ হয় জীবনে এ পথটুকু শেষ হবে না। অক্ষয় অনন্ত করে ধরে রাখি মুহূর্তটি।

এখানে জরা নেই, মৃত্যু নেই, কাজ নেই, গতির অভিশাপ নেই। শুধু আছে পাপড়ির গলার গান।

প্রেম এখানে দেহ থেকে দেহাতীত রূপ পায়। যত বিক্ষেপ শেষ করে দেয় অবগাহনের শীতলতায়। দক্ষিণের উষ্ণতা পূবালী বাতাস হিমছুয়ারে সরিয়ে রাখে অনন্তের কাছে। প্রেম ঈষ ফসিল—ফুল বা পাতা কাচে জমে শক্ত হয়ে চিরস্থায়িত্ব পায় এখানে। ধ্বংস নেই, কিন্তু প্রাণই বা কোথায়?

এখানে প্রেম তার শেষ প্রহর বিহার। যদি এখানে প্রেম অমলাভ করে, তার শেষ থাকে না, অশেষ হয়ে ওঠে সে। কোন পরিবর্তন সে গ্রাহ্য করে না, সময়ের শাসন সে মানে না। সময়ের এখানে কোন মূল্য নেই। ঘুমন্ত উপত্যকার শিকড়ে শিকড়ে সহজ আলস্য। পদ্মবনের অধিত্যকার পায়ে পায়ে তন্দ্রা। শুক্তির বুক পূর্ণ করে মুক্তা। একটি-অনুভূতি সময়ের শুক্তিকে পূর্ণ করে মহামূল্য করে তোলে।

মিলন এখানে হয় ভাবমিলন।

রেণুকা বরাটের বাড়ীর সামনে গিয়ে পথ বেঁকে গেছে কুচো বাংলোয়।

রেণুকা বরাটের বৌদি অনেকগুলো ঝি-চাকরসহ বাড়ীতে এসে বসেছেন। ভিনকুলে কেউ নেই তাঁর। দীর্ঘজীবন কেবল বিড়ম্বনা।

মোটা বাড়ীখানি অন্তভাবে সাজানো হয়েছে বহু অর্থ ব্যয়ে। আধুনিক শিক্ষিতা মহিলার রুচিই এখন ধনবতী বিধবার প্রাসাদ।

টবের ফুলের গাছের পাশে তুলসীর চারা বসেছে। পর্চের অস্তিত্ব নেই, সেখানে গাড়ী-বারান্দা করা হয়েছে। পেছনের বাগানে জবাগাছ, বেলগাছ। দেবপূজার প্রস্তুতি।

মামা ব্রহ্মও এ রাস্তা দিয়ে হাঁটেন না। তাই এগিয়ে এসে শুনলাম—এখানেও গান। কিন্তু কীর্তন। কলকাতার দল এসে গান গাইছে। অনেক লোক জমা হয়েছে। জগমোহিনীর সিণার আসরে না তাঙন ধরে।

কীর্তন নগরগ্রামে অনিবার্য মাথুর? রাধাকৃষ্ণ এখানে ঝুলনে দোলেন না, ফাগে আবীর খেলেন না। এখানে চিরন্তনী রাধা কৃষ্ণের চির বিরহে বিরহিনী। সমস্ত পালাই এখানে মাথুরের পালা

"আজ ভারী জমাট দেখছি।"

পাপড়ির গান কীর্তনে হারিয়ে গিয়েছিল। সে উত্তর দিল, "আজ সখী-সম্মেলন হয়েছে। তাই চারুবালা দেবী কলকাতা থেকে পালাগানের দল আনিয়ে উৎসব করছেন।"

"সখীসম্মেলন মানে?"

"মানে, জলার ওধারের দুখানা ঘরে মালতী দেবীর সঙ্গে পুনর্মিলন ঘটেছে, দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর পরে। আমার মনে হয়, এই আশায় চারুবালা এখানে এসেছেন শহর ছেড়ে।"

পাপড়ি আমাকে গল্পটি শোনাল। সংক্ষেপে বলছি।

চারুবালা দেবীর বাল্যবন্ধু ছিলেন মালতী। উভয়ের প্রায় একসঙ্গে বিয়ে হয়েছিল। মালতী ও চারুবালার স্বামীরাও একত্রে মেলামেশা করতেন। নিসন্তান মালতী অকালে বিধবা হলেন। চারুবালারও ছেলেপিলে হল না। বন্ধুত্ব প্রবল হল আরও।

অকস্মাৎ দেখা গেল রেণুকা বরাটের দাদা, চারুবালার স্বামী মালতীর সঙ্গে প্রণয়বদ্ধ। মালতী চারুবালার বাড়ী থেকে বিতাড়িত হলেন। কিন্তু স্বামীকে বাল্যবন্ধুর সঙ্গে ভাগ করে নিতে হল চারুবালায়। মালতীকে বাড়ী করে দিলেন মিষ্টার বরাট, বোনের সঙ্গে সঙ্গে এখানে। গ্রাসাচ্ছাদনের পাকা ব্যবস্থাও হল। কিন্তু মিষ্টার বরাটকে আগেই বিদায় নিয়ে পাপপুণ্যের হিসাব দাখিল করতে যেতে হল পরলোকে।

এতদিন দুই দেবাধেষি বন্ধু ও বিদ্বেষ শত্রুতার পরে কেমন করে দুই বন্ধুর শেষ বেলায় মিলন হল পাপড়ি বিনয়ভাবে জানে!

কিন্তু সে অন্য কাহিনী।

পাপড়ি বলল, "দেখছো, কেমন করে গল্প এখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে? এখানে কত কাহিনী আছে, না?"

আমি বললাম, "এখানে সকলেরি সময় প্রচুর। তাই ঘরে ঘরে কাহিনী তৈরি করার সময় পাই আমরা। শহরের অলিগলি ভরা গল্প। তৈরি করার সময় নেই কারুর।"

বাড়ীর সামনে দিয়ে চলে এলাম আমরা। কীর্তনের সুর কানে আঘাত করে গেল :—

"কো কহ আওব মাধাই ?
বিরহতরঙ্গ পার কিএ হোওব,
মঝু মনে নহি পাতিয়াই। ● ●
মাস মাস করি বছর গোওয়নু
দিবস দিবস করি মাসা—"

উচ্চ খোলের বাস্তে বেণুকার ঘরবার পরিপূর্ণ।

পথে দেখলাম বীরেনবাবু যাচ্ছেন কীর্তনের আসরে। আমাদের দেখে হেসে ঘাড় নাড়লেন।

পাপড়ি বলল, "বীরেনবাবু আশপাশ বাড়িগুলো কেনবার চেষ্টা করছেন। কলকাতা হলে দাম বেড়ে যাবে অনেক। তাই এখনি লাভের চিন্তায় ব্যস্ত। কিন্তু রবি, ভালো হবে কি ? এ জায়গাটা অন্য রকম ছিল। এখানে ব্যবসার করতে চাইত না কেউ। সমস্ত লাভক্ষতির হিসাব মিটিয়ে কেবল যেন বাস করতেই আসত। এমন মনুষ্যত্বের আওতায় হারিয়ে নিজের বিশেষত্ব না যায়।"

আমি উত্তর দিলাম, "সে তো যাবেই। কিন্তু ভালোটাও দেখ. সভ্যতার সুযোগ সুবিধাটাও তো পাওয়া যাবে। পথঘাট ভালো হবে, দোকানপাট বসবে। তোমরা সিনেমা দেখতে কলকাতায় ছুটবেনা। তুমি এখানে স্কুল কলেজ হলে বাড়ী বসেই কাজ করতে পারবে। কত সুবিধা, দেখ।"

"কিন্তু আমার ভালো লাগবে না। আমি শহর থেকে পালিয়ে আসবার জন্যে এমনি একটি আয়গা রাখতে চাই। আমার আসবার জন্যে কোথাও এমন একটা আশ্রয় চাই।"

আমি হেসে বললাম, "অত পলায়নী মনোভাবকে আমি সমর্থন করি না। স্বপ্নকে অত দূরে সরিয়ে স্বপ্ন করে না রেখে বাস্তবে মেশাতে শেখো। আচ্ছা, আবার কাল দেখা হবে।"

পাপড়ি ঠোঁট টিপে বলল, "উহুঁ কাল নয়, তিন দিন বাদে।"

"তি—ন—দি—ন! কেন ?" কণ্ঠস্বরে ব্যাকুলতা প্রকাশ পাওয়াতে লজ্জিত হয়ে হাল্কা সুরে বললাম, "ব্যাপার কি, পাপড়ি ?"

"কিছু না। এখানে থাকবো না।"

"কোথায় যাবে ?"

একটু ইতস্তত করে বলল, "কাশীঘাটে যাবো।"

"পুজো দেবে বুঝি ? বাবার মানত ছিল ?"

"মানত আমি করি না, রবি। মা-বাবাকে নিয়ে যাবো।"

আমি অবাক হলাম, "বাবাকে নেবে কেমন করে ?"

"ট্যাক্সি ঠিক করেছি।"

"এতগুলো টাকা খরচ করবে !"

"রবি, যত টাকাই খরচ হোক, আমাকে করতেই হবে।"

গলার সুরের তীব্র গাঢ়ত্ব শুনে চমকিত হয়ে লক্ষ্য করলাম। প্রথমদিনের কয়াল মাথার জিপসী আজ শাদা শাড়ীর ঘেরে ঘরের মেয়ে হয়ে কাছে এসেছে। কবে কারাগারের রহস্যতরা

দেবকী কৃষ্ণময়ের অভিশাপে অসাধারণ রূপে ঘুরে মরে নেই। যে তীব্রতা প্রথম দিনে তার মধ্যে দেখে ভেবেছিলাম, এ তো স্বতন্ত্র, সেই তীব্রতা দিনে দিনে সান্নিধ্যে ক্ষয়ে গেছে। তবু এখন মনে হল, এর একটা কি যা রহস্য আছে।

বললাম, "তোমার কথা আমি বুঝতে পারলাম না।"

একবার অধর দংশন করল পাঁপড়ি, কি যেন বলতে গিয়ে থেমে গেল। তারপরে বলল, "তোমাকে বলব, রবি। তিনদিন পরে এসো।"

কুচো বাংলোর উল্টো দিকের সরু গলি ধরে বড় রাস্তা এড়িয়ে আমাদের শর্ট-কাট। আমি বিদায় জ্ঞাপন করে গলির মধ্যে পা দিলাম।

দুইদিকে দু'টো বাড়ীর বাউণ্ডারির পত্রবহুল বেড়ার মধ্য দিয়ে সরু রাস্তা গাছের ঘন ছাওয়ায় আবৃত। ঝরা পাতায় পা পড়ে মচ্‌মচ্‌ করে ওঠে। ডালে বসে 'খোকা হোক' পাখী কিচ্‌মিচ্‌ করছে। নানা আকারের শালিক সন্ধ্যায় ঘরে ফেরার ব্যস্ত। কোথায় যেন হাসু ও হানা ফুটেছে। সন্ধ গলিটাকে ভরে তুলেছে।

গলির শেষে কলোনীর পুরোহিত যোগেন গোঁসাইএর ছোট টীনের চাল-দেওয়া পাকা বাড়ী। গরীব পুরোহিত এখনও বিজলী নিতে পারেননি। ঘরে লণ্ঠনের আলো। চণ্ডীমণ্ডপে মাটীর সিলহুজে মাটীর প্রদীপ জ্বলছে।

চাপা একটা আলো আকাশ থেকে বিচ্ছুরিত হয়ে পৃথিবী আলো করে তুলেছে। যা দেখছি, তাই সুন্দর। এমন অন্তরাগে-মাখা জগৎ যেন চেতনা পরপারের বস্তু। প্রতিদিনে হাতে ধরার নয়।

পাঁপড়ি দাঁড়িয়ে রইল গলির মাথায়, আমার পথের দিকে চেয়ে।

আমি চলে এলাম।

মনের মত বুকে ভরে নিলাম ছবিখানি। যে রং কোনদিন উঠে যাবেনা, তেমনি রংএ ডুবিয়ে নিলাম।

বাড়ী ফিরে দেখি নৃত্যগোপাল মহা চিন্তিত।

চা-এর পরে মামা ঘরে দরজা বন্ধ করেছেন। আমিও বাড়ী থেকে বা'র হয়ে গেছি, মামাও ঘরে ঢুকেছেন। জানলাও ভেতরের কাচে পরদা টেনে বন্ধ। নৃত্যগোপাল সাহস পাচ্ছে না দরজা ঠেলতে, অথচ ভয় করছে বিনা কারণে মামা না অজ্ঞান হয়ে পরে থাকেন। সামনে ব্যর্থ ঘোরাঘুরি করে অবশেষে আমার পথ চেয়ে আছে।

"না, না। মামা অজ্ঞান হতে যাবেন কেন? আচ্ছা, দেখছি, দাঁড়াও।"

দরজা ঠেললাম।

একটু পরে মামা দরজা খুলে বেড়িয়ে এলেন। শ্রান্ত, এলোমেলো চেহারা।

"কি হয়েছে? আমি একটু দরজা বন্ধ করে কাজ করছিলাম।"

"মানে, রাত্রে কি খাবে?"

"রাত্রে? কেন, রোজ আজকাল যা খাই। দুপিস্ রুটী আর মাংসের স্যুপ্।"

"মামা, হাতে আবার রং লাগিয়েছে? কি করছিলে একা—একা? আমি করে দিচ্ছি।"

মামা অপ্রতিভ হয়ে হাত দুটো পেছনে টেনে বল্লেন, ও কিছু নয়। একটু ছবি—না, না, বলার মত নয়।"

আমার মনে পড়ে গেল, ডাক্তার হবার আগে মামা আর্ট স্কুলে গিয়েছিলেন। শেষ বয়সের শেষ প্রহরে শেষ প্রেম তাহ'লে শিল্প?

হায়, হায়! আমি যে চ্যারিটি ডিস্পেনসারী খোলার প্রস্তাব পাপড়িকে দিয়ে দেওয়ার ভেবে রেখেছি। পাপড়ির কথা মামার কাছে বেমানান্।

যাই হোক, মামা কোন কাজে নিযুক্ত থাকলেই মঙ্গল। ইরানীর সূক্ষ্ম দৃষ্টি মামার কেটে যাচ্ছে।

তবে, ভেবেছিলাম মামা বুঝি মালী হতেই চান।

ছুপ—দরোজা বোধ না পেয়ে শেষে কিনা শিল্প? ভালো, তাই হোক। তাই হোক। উৎসাহ দিয়ে বললাম, "চলো না দেখি, কি আঁকছ।"

মামা যেন ভয় পেয়ে দরজা আগলে দাঁড়ালেন, "ও কিছু না। কিছু না। সামান্য অভ্যাস রাখছিলাম। তুই বোধ হয় জানিস না আমি আসামে একজন লোক রেখে ছবি আঁকা শিখতাম। কতকগুলো ক্যানভাস আছে আমার। একদিন দেখাব।"

আমি চমৎকৃত হ'লাম।

"একদিন কেন? আজই দেখাওনা, মামা।"

"থাক, থাক। একদিন তোকে, পাপড়িকে দেখাব। কোথায় গিয়েছিলি? রোজই তো বিকেল বেলায় চলে যাস?"

মামা তীক্ষ্ণ সুনিপুণ চিকিৎসকের দৃষ্টি আমার মুখে ফেললেন।

আমি অনুভব করলাম কান গরম হয়ে উঠছে। বললাম, "পাপড়িদের বাড়ী যাই। ওর সঙ্গে বেড়াতে যাই।"

"ওর সঙ্গে বেড়াতে যাস রোজ? রবি, তোর মুখ লাল কেন? পাপড়িকে কি তুই,—মানে তোরা কি বিয়ে করবি?"

আমি মাথা নামিয়ে রইলাম।

আমার মুখ একমিনিটে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। তিনি আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন, তাঁর স্বভাবগত উচ্ছ্বাসবিমুখতা অতিক্রম করে।

"বা, বা। এই তো চাই। যেদিন ও বাড়ী পা দিয়েছি সেদিন থেকে মনে মনে মেয়েটিকে চেয়েছি। আমি কালই দিদিকে চিঠি লিখব। না কি; নিজেই চলে যাব!"

"মামা অত ব্যস্ত হোয়োনা। তোমার দিদি দারুণ রক্ষণশীল, তুমি ভালো করেই জানো।"

"আরে, ওরা ব্রাহ্মণ। তাছাড়া অমন মেয়ে দিদি পাবেন কোথায়? তার উপর, তোর পছন্দ হয়েছে।"

আনন্দে মামা অধীর হয়ে উঠলেন।

"মামা, তোমার ভাগ্নে বেকার, বিদ্যায় গৌরব নেই। তুমি জানো। ওর মা-বাবা কেন রাজী হবেন?"

"আরে তোকে বিদেশ পাঠিয়ে ছাপ মেরে আনাব। আমার সমস্ত তোদের। আর কি চাই ওঁয়া? তোকে আমি আর্কিটেকচার,—উঁ, এডুকেশন পড়িয়ে আনাব। নার্সারি না হোক, আমরা স্কুল খুলব—মডেল স্কুল। পাপড়িরা বড় লেখাপড়া ভালবাসে।"

পাগলের মত মামা হাঁকাহাঁকি করতে শুরু করলেন, "নৃত্যগোপাল আজ পোলাউ চড়াও। সুখিয়া ডিম বা'র করে আন। বাজারে যেয়ে মিষ্টি কিনে আন। কাকে বা নেমতন্ন করি?"

"মামা, এখনই নিমন্ত্রণের দরকার নেই। কয়েকটা দিন যেতে দাও।"

এখানে সুখময় পরিণতির উপর যদি বা যবনিকা টেনে দিতে পারতাম! যা আমরা চাই, তাই ঘটে কখনও কখনও বলে উপন্যাস লেখা হয়। কিন্তু বাস্তব অনেকক্ষেত্রে পৃথক হয় আদর্শ থেকে। তাদের মেলানো চলেনা। যাঁরা চান, সুখের দৃশ্যে শেষ করে নিন আমার গল্পটা।

পঞ্চম কাণ্ড

তিনদিন পরে।

সেই জলার ধারে এসেছি। একটু পরে পাপড়িও এল। আমার হাতে সে একটা প্যাকেট দিল।

"তোমার জন্যে এনেছি।"

খুলে দেখি বাঁশের সুদৃশ্য একটি টেবল ল্যাম্প।

"তাড়াতাড়ি লেখাপড়া শেষ করে তৈরি হতে পারো যাতে, তাই জ্ঞানের আলো জ্বালাবার ব্যবস্থা রাখছি।"

নামার উল্লাস পাপড়িকে জানালাম।

প্রথমে পাপড়ির মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে আবার কালো হয়ে গেল।

"একটা কথা তোমাকে বলব বলেছিলাম, না? আমি কালীঘাটে গেলাম কেন, জানো?"

রুদ্ধনিঃশ্বাসে প্রশ্ন করলাম, "কেন?"

"সেখানে একটা বিয়ে হল?"

আমি আমার সংকল্প বিস্মৃত হয়ে মুহূর্তেতে পাপড়ির কব্জী চেপে ধরলাম, "তুমি কালীঘাটে বিয়ে করে এলে?"

"উঃ, ছাড়, ছাড়। না, না। চুড়ি ভেঙে হাত কেটে গেল যে। 'আমি নয়, আমি নয়। বলছি।"

অপ্রতিভ হয়ে হাত ছেড়ে দিলাম। পাপড়ি ভাঙা কাঁচের চুড়ি ফেলে দিয়ে হাত ঝাড়তে লাগল, 'উঃ! রবি, তুমি যে এমন একটা হী-ম্যান হয়ে উঠতে পারো, জানতামনা। শোন বলছি।"

লাল পাপলার ফুল শুনে যেতে লাগল। আকাশে সন্ধ্যা তারা কান পেতে রইল। পাপড়ি বলে গেল।

"বাবা বহুদিন গুপ্তদলে রাজনীতি করেছিলেন, জানো তুমি। একবার মেদিনীপুরে মহা বিপদে পড়েছিলেন। একজন কায়স্থ জমিদারের এঁদের প্রতি সহানুভূতি ছিল। তিনিই আশ্রয় দেন।

পুলিশসাহেব গেছেন। তিনি রাত্রে হানা দিলেন। আমার বাবাকে বিয়ের ঘর সাজানো হল, জানে কায়স্থ জমিদারের কন্যা। বিয়ে যেন হয়ে গেছে, বাসরে বরকনে, এমনি করেই সেটি সাজানো হয়েছিল। পুলিশসাহেব বললেন, "বেশ। ঘরে বরকনে থাক দরজা বন্ধ করে। আমি পাহারায় আছি।" একঘরে সতী হিন্দু মেয়ে থাকতে পারে কিনা পর পুরুষের সঙ্গে, তাই পরীক্ষা করলেন।

মা পরমা সুন্দরী। বাবার পায়ে স্থান চাইলেন।

সকালে পুলিশ চলে গেল। বাবাও উধাও। কিন্তু—আমার জন্ম সূচিত হয়ে গেল। বিয়ের অবকাশ মিলল না।

অনেকদিন জেল খেটে বাবা ফিরে এলেন মায়ের কাছে। দাদামশায় মারা গেছেন। মা সকলের উপহাস কুড়িয়ে আমাকে মানুষ করছেন। চলে এলেন ওঁরা কলকাতায়। দেশ একদিন স্বাধীন হয়ে গেল।

বাবা লৌকিক বিবাহ করলেন না আর। তিনি বললেন, "ঈশ্বর যে বিবাহ দিয়েছেন, এতদিন পরে মানুষের মন্ত্রে তাকে ক্ষুণ্ণ করব কেন?"

ওখানে থাকতে না পেরে এখানে চলে এলেন ওঁরা নির্বাসনে। মা কেমন যেন হয়ে গেলেন। আমিও মানুষকে সন্দেহ করতে শিখলাম।

কিন্তু বড় হয়ে সমস্ত জানবার পরে যখন সাহস পেলাম, বাবাকে অনুনয় করতে লাগলাম, যাতে উনি আইন সঙ্গত বিয়েটা করে আমাকে লোকচক্ষে মর্যাদা দেন। বাবা রাজী হন না। যা মানেন না তার প্রয়োজন কী? তিনি ধর্মে তো ঠিক আছেন। অনেক করে রাজী করার পরে অসুখে পড়ে বাবা যাই যাই হলেন। আমি ভাবলাম বুঝি সমস্ত গেল।

অবশেষে এতদিনে সেই বিয়ে পর্ব হয়েছে কাশীঘাটে।"

পাপড়ি আমার হাতের উপর হাত রাখল, "রবি, আমাকে কে নেবে? আমি উপযুক্ত হই আগে, প্রতিভার স্বীকৃতি পাই, তবেই তোমার জীবনে যাবো। সাধারণত্ব অর্জন করতে পারলে তবেই আমার কলঙ্ক মুছতে পারব।"

উঠে দাঁড়ালাম আমরা। বাড়ীর দিকে রওনা হলাম।

গলির মুখে এসে পাপড়ি বলল, "রবি, কথা বলছ না কেন? যদি আমি জীবনে তোমার কাছে যেতে না পারি, কি হবে?"

অন্তরাগে উদ্ভাসিত আকাশের নীচে অঙ্গীকার গ্রহণ করলাম। পাপড়ির কাছে সরে গেলাম, কিন্তু দুলর্ভ সেই হাত দ্বিতীয় বার স্পর্শলাঞ্ছিত করলাম না।

বললাম, 'পাপড়ি, জীবন কি মাত্র একটাই?'

আমার বাবা পাপড়ির জীবন জানতেন, কিন্তু বাবা বলে মনে করেন নি।

তিনি আমার অনুরোধে মাকে সমস্ত খুলে চিঠি লিখলেন।

চিঠির উত্তর এল :—

"কল্যাণীয়েষু,

রবির সমস্ত ভার তোমার উপর ছাড়িয়া দিয়াছিলাম। বিবাহের দায়িত্বও তোমার ছিল। কিন্তু এমন একটি বিবাহ তুমি দিতে চাও স্বপ্নেও মনে করি নাই।

তুমি বাহিরে মানুষ হইয়াছ। ধর্ম বা সমাজে তোমার আস্থা নাই। কিন্তু আমার আছে। কন্যার বাবা ব্রাহ্মণ, মাতা কায়স্থ। অসবর্ণ বিবাহের দোষ ছিলই। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা যাহা, তাহা জানিবার পরে উক্ত পাত্রীকে বধূরূপে ঘরে তুলিয়া আমি আমার শ্বশুরকুলের অকল্যাণ বা অমর্যাদা করিতে পারিব না।

তুমি জাননা, তিন কন্যার জন্ম দিবার পরে আমার বড় বধূমাতার সন্তানধারণের শক্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। আমার স্বামীর বা পুত্রের দ্বিতীয় ভ্রাতা নাই। এক্ষেত্রে রবির দ্বারাই আমার শ্বশুরকুলের বংশরক্ষা হইবে। পিতৃপুরুষের জলগণ্ডূষ লুপ্ত করিবার পূর্বে আমি সমাপ্তির জীবন বিসর্জন করিব।

শ্রীমানকে পত্রপাঠ এখানে পাঠাইয়া দাও। উহার অভিভাবকত্ব লইবার ক্ষমতা তোমার নাই বুঝিতেছি। আমি সৎবংশজাতা সুন্দরী পাত্রীর সন্ধান করিতেছি। আমি স্বামীহীনা, আমাকে পুত্রহীনা করিওনা।

তোমার দিদি"

ছাই-এর মত ফ্যাকাশে মামার মুখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "আমি এখন কি করব মামা?"

"তোর যা ইচ্ছা, রবি। নিজের বিচারের ওপর আমার আর ভরসা নেই।"

"তুমি আমাকে মায়ের ইচ্ছামত অন্যত্র বিয়ে করতে বলো?"

মামা উত্তেজিত হয়ে উঠলেন, "আমি—আমি বলব? ঘরে আয় রবি, আজ তোকে দেখাব।"

অনেকদিন পরে মামার শয়নকক্ষে প্রবেশের অধিকার পেলাম।

কোণের ইজেলের ঢাকা ক্যানভাস খুলে দিলেন মামা।

অনিপুণ শিল্পীর হাতে আঁকা, কিন্তু বিষণ্ণ চিত্র। আমার চিরবিষণ্ণ মামার আকুল কি অবিষণ্ণ হতে পারে?

রেণুকা বরাট।

মামা বল্লেন, "দেখ। আমি কি অন্য মেয়েকে বিয়ে করতে বলতে পারি?"

স্বর্গলীতা! বহুদিন আগে এই দেশের এক পুরুষ, এক রাজা এমনি মানসী মূর্তি নির্মাণ করেছিলেন। কিন্তু অযোধ্যার সিংহাসনে সেদিনের ধনুর্ধারী নৃপতি বিনা দোষে প্রিয়াকে বিসর্জন দিয়ে চিরকাল প্রেমিক পুরুষের কলঙ্ক হয়ে আছেন।

আমার মামা কত বেশী উঁচু।

শুধু তাবদিনদের মাধুর্যে আমার মামার জীবন পরিব্যাপ্ত। আমি এই মামারি ভাগ্নে।

সযত্নে বললাম, "কালে মাকে বুঝিয়ে চিঠি লিখে ঠাণ্ডা করে দেব। তুমি ভেবোনা মামা। আমরা দুজনে এখনও লেখাপড়া শেষ করিনি। এত তাগিদ কিসের? বেশি কি হয়।"

মামা সেটীতে বসে পড়ে বুড়ো মানুষের মত টেনে টেনে বললেন, "আ—হা।"

বাহিরে চলে এলাম।

দূরে আকাশে চন্দ্র। শারদোৎসবের গান ভেসে আসছে। চারুবালাদেবীর কীর্তনের দল তিনদিন মাথুরের অন্তে মিলন ঘটেছে। রাধার শতবর্ষব্যাপী বিরহের অন্তে মিলন সঙ্গীতে আকাশ-বাতাস পূর্ণ হয়ে গেছে :—

"শতেক বরষ পরে বঁধুয়া মিলালো ঘরে,
রাধিকারো অন্তরে উল্লাস।"

বাড়ীর বাগানে চলে এলাম নরম ঘাসে পা রেখে, ফুলের রাজত্বে।

এখানে কি দক্ষিণা বাতাস কখনই বইবেনা? আমি ওই মামারি ভাগে। আকাশের দিকে চেয়ে মনে মনে বারবার বললাম।

"পালাড়ি, দেখি কি হয়।
দেখি কি হয়।"

পরিশিষ্ট

সে গন্ধর্বলোক হারিয়ে গেছে আমার।

অপরূপ বর্ণসম্ভারে উদ্যেল বাগানের ফুলগুলো কখন শুকিয়ে গেছে কাগজের ফুলের মত। বিশ্বব্যাপী রংয়ের চেউতে আমার ছোট বাগানখানির স্থান মেলেনি।

সেখানে দুলছে দোলনা গাছের আশ্রয়ে। শেষ প্রহরের শেষ প্রেম সেখানে। সজল হয়ে থাকে ফুলের রংএ পাখীর গানে, চাঁদের কিরণে। মন বারবার ফিরে যায় সেখানে। কনকচাম্পি স্বর্ণচাঁপা ফোটে। গন্ধে ভরে যায় অলক্ষ্যের সাজি।

আমার রিক্তশ্রী দিনগুলো ভরে যায় লক্ষ-প্রবাসীর পাখার সঞ্চারে। দুর্লভ অকিঞ্চ সহসা শুকনো গাছে ফিরে আসে? চেকে দেয় রসমঞ্জরীর দলে। যা পাইনি তাকেই তো ভালবাসি। ঘুমঘুমাত ঘরে এই মানবমনের অভীপ্সা। কোথায় মিলিয়ে গেল সে রূপসাগর? কেন গেল? বহু প্রশ্ন কণ্টকিত হয়ে উঠতে পারে, জানি। কাহিনীর শেষ নানাভাবেই হ'তে পারে, সুব্রধার। তোমার কাহিনী তুমি কত ভাবেই না শেষ করো।

আমাদের চাওয়ার সঙ্গে কোন মিল থাকেনা।

মামা হয়তো রোগগ্রস্থ হয়ে এক মিনিটে সমস্ত বিক্রয় করে চলে গেলেন বিদেশে চিকিৎসায়। আমি পুনর্মূষিক হয়ে ফিরে এলাম গলির বুকে। ততক্ষণে সেই গলি আমার কাছে অচেনা হয়ে গেছে।

সুব্রধার, এক কথায় কাহিনী তুমি শেষ করে দিতে পারো।

মামা হঠাৎ বিগত হলেন। রেখা গেল দেনা আছে। বিকিয়ে গেল সমস্ত।

অথবা, না হলে, ভাগীদার বুটে ভাগ হয়ে তরাংশে পরিণত হল। আমার দাদা মায়ের অনুমতি নিয়ে আমাদের ভাগের টাকা দিয়ে তেলকল খুললেন। পিছিল সিমেন্টে পা রেখে, বোরো আবহাওয়ায় আমি কখনও উন্মনা হয়ে যুবের দেশ ভাবতাম, যেখানে এখনও অযুত নিযুত ফুল ফুটে আছে।

সুব্রথার, এমন শেষই তোমার সুতোয় টানে অবিরাম এঁকে যাও তুমি।

তবু তোমাকে বলি জীবন দেবতা!

অথবা আরও বাস্তবে, আরও স্বাভাবিকে তুমি নেমে আসো। সুখময় পরিণতি এঁকে যাও তুমি।

তোমার মুখের হাসি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তৃপ্ত চোখে উর্দ্ধ থেকে নীচে তাকাও তুমি যেখানে সিনেমার ওই কিউ দিচ্ছে তোমার হালে-পড়া মানুষ। তারা এমনই পরিণতি চায়।

কলকারখানায় কলোনী সমৃদ্ধ হয়ে উঠল। সত্যই ডাক্তার মিত্রের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী সোনার ধানে মাটী বিকিয়ে গেল।

আমার শিল্পী মামা রেণুকা বরাটের ছবি ছিঁড়ে ফেললেন—না, না, সোনালী ফ্রেমে বাঁধাই করলেন। বিরক্ত হলেন নতুনগড়া শহরের কোলাহলে, অথচ তার অসমাপ্ত বিকাশে।

মামা সমস্ত বিক্রয় করে দিলেন। চৌরঙ্গির ধারে বাড়ী কিনে মামা আসর সাজালেন স্যাম্পেন, হুইস্কির। আমি ড্রেন-পাইপ ট্রাউজার পরে, ছবি আঁকা হাইই গায়ে এঁটে সিনেমার নায়ক হবার লোভে ছোটাছুটি করতে লাগলাম।

আর, কানে কানে বলে সেই শোন, আমি পাগড়িকে ভুলে গেলাম।

তোমার অধরে বাঁকা হাসি, সুব্রথার, আমি যে দেখতে পাচ্ছি।

অনন্ত তৃষ্ণার্ত্ত আমি। কিন্তু ব্যর্থ আমার অমৃত-যাত্রা। অনির্ব্বচনীয়, তোমার সন্ধান কি করে এ জীবনে পাবো!

এক জীবনে কি করে মধুরের, সুন্দরের কাছে যাবো?

জন্মজন্মান্তরের সেতু পেরিয়ে তবে সেখানে হাত বাড়াতে পারি; ধরতে পারি।

সেই শেষপ্রেমের দেশ।

কিন্তু তুমি মুছে যাও। অনেক সাধনার দক্ষিণ বাতাস হঠাৎ বয়ে যায় পুবদিকে। সমস্ত ঘরে পড়ে। তুমি বলো, কাহিনীকার, এখনও কত কাঁচা তুমি? এই তো দেখ। সমস্ত পৃথিবী ব্যাপি আজ হতাশ পুবের যাত্রী।

তুমি কেমন করে অস্ত যাওয়া শেখাবে?"

অন্ধকারের মুখ

রমনীরঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়

—আপনি যান।

অদূর তদন্তকারী অফিসার মিঃ মুখার্জি উত্তেজনায় কাঁপছিলেন।

—গুড্ বাই মিঃ মুখার্জি। কল্ দিস্ ইউ উইল রিগ্রেট। এ্যানি হাউ আই উইল গেট মাই প্রাইজ্ড্ ফ্রি। (নমস্কার মিঃ মুখার্জি। এ জন্য আপনাকে অনুতাপ করতে হবে। যে কোন প্রকারেই হউক আমার মস্তিষ্ককে আমি মুক্ত করে নেবই।)

চলতি পথে স্মিত হাস্যে বলে গেলেন মিঃ ব্যানার্জি। বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতি যুবকের কথায় উত্তেজিত মিঃ মুখার্জি তখনও টেবিলের এক কোনে ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। দুর্বলতায় তিনি কাঁপছিলেন।

যুদ্ধের সময়ের এক ঘটনায় একটি অসহায় মেয়ের আর্তনাদে একদিন তিনি চমকে উঠেছিলেন। তার সর্বাংগে পুরুষের নগ্ন লালসার দংশন দেখে বড় আঘাত পান।

মেয়েটি চিৎকার করে বলেছিল, আমি পারব না। আমাকে মেরে ফেলুন।—একটা অন্ধকার ঘর থেকে ছিটকে এসে পড়েছিল ষোল সতের বছরের মেয়ে অনিতা।

ওকে সামনে দেখে অনিতা স্তব্ধ হয়ে গেছল। বুঝতে পেরেছিল ঐ নির্বান্ধব পুরীতে একজন বাঙালী হয়ত ওর পরম আত্মীয়। স্বাভাবিক কারণেই মেয়েটি আর্তস্বরে বলেছিল, আমাকে বাঁচান। ঐ ছিল তার শেষ আবেদন। নির্মমভাবে ধর্ষিতা অনিতা মাটির উপর এলিয়ে পড়ে গেল। পরিধেয় কাপড়ের অংশ বিশেষ লাল হয়ে গেছে।

ঘর থেকে প্রসাদ এবং আরও দু'জন লোককে টেনে বের করা হল। একজন সেপাই কয়েকটি মদের বোতল এবং কাঁচের গ্লাস তুলে নিয়ে আসে।

মানুষ তার আদিম বৃত্তিগুলিকে ঢেকে রাখতে গিয়ে ভদ্রতার মুখোশ পরে। পাণ্ডিত্যের ভান করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বড় বড় কেতাবী বক্তৃতা ঝাড়ে। সমাজের উচ্চ শিখরে থেকেও আইনের আওতায় ব্যাভিচারিতার দায়ে নিজ পক্ষ সমর্থনে এতটুকুও লজ্জা পায় না।

আইনজ্ঞ আইন ক'রে সেই বৃত্তিকে একটা গণ্ডীর ভেতর ঠেলে রাখতে চায়। অত্যাচারীর হাত থেকে সর্বসাধারণকে রক্ষা করবে বলে দেশের শিক্ষিত যুবকগণ আইন পড়ে।

কিন্তু অনিতা? অনিতা কি তাদের চোখে অত্যাচারিতা নয়? সে কি জনসাধারণের বাইরে? ওর আঁৎকে উঠা মুখখানিতে আত্মাবমাননার স্বাক্ষর কি অস্বীকার করার মত? হিংস্র পশুর চাইতেও কুৎসিত এবং ভয়াবহ আক্রমণের হাত থেকে অনিতাকে রক্ষা করা কি সেই আইন ব্যবসায়ীর কর্তব্য নয়?

উত্তেজিত মিঃ মুখার্জির মনে বারবার একই প্রশ্ন ধ্বনিত হতে থাকে। দীর্ঘ অভিজ্ঞতার মধ্যে

তিনি তার কর্মজীবনে মানুষের ঐ একই রূপ দেখে আসছেন। আজও তিনি প্রখ্যাত ব্যারিষ্টার মিঃ ব্যানার্জির মধ্যে তার কোনই ব্যতিক্রম দেখতে পেলেন না।

পাশবিক হিংসা মানুষকে কতদূর টেনে নামাতে পারে, তারই এক নির্মম সাক্ষ্য নবদ্বীপের একটি রিফিউজি ক্যাম্প। দয়ার দরদহীন এক মানব গোষ্ঠীকে এক দেশ যখন তাদের মনপ্রাণ এবং বেঁচে থাকার দাবীকে স্বীকৃতি দিতে পারল না, তখন তারা একটু আশ্রয়ের খোঁজে এ দেশে আসে। সবার মুখের দিকে চায়। একটু আশ্রয়ের আশায় দেশের চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। রাষ্ট্র তাদের আশ্রয় দেয়—বলে, তোমরা অপেক্ষা কর। বিরাট ছিন্ন-মূলকে স-মূলে উৎপাটিত হতে আমরা দেবনা। তাই তারা নবদ্বীপের এক আশ্রয়কেন্দ্রে এসে বাসা বাঁধে। কিন্তু এখানেও তারা নিশ্চিন্ত হতে পারে না। মানুষের কান্নায় এখানে অনেকে কাঁদে। আবার কেউ কেউ সবার অজ্ঞাতে একটু একটু হাসেও।

রাষ্ট্র-বিপ্লবে মানুষ যখন সব হারিয়ে কাঁদে, তখন এরা মনের কামনাকে সযত্নে ঢেকে রেখে অতি সংগোপনে এই সর্বহারাদের দলের উপর হিংস্র আক্রমণ চালায়। সে আক্রমণে অপরপক্ষের বিরাট দুর্বলতার সন্ধান ওদের অজানা নয়। সে সন্ধান তারা অতি সহজেই খুঁজে পায়। সে দুর্বলতা যুগে যুগে স্ত্রীকে স্বামীর বুক থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে। সন্তানের মুখের গ্রাস মা জোর করে কেড়ে খায়। মানুষের মনের সুকুমার বৃত্তিগুলি চরম কাঠিন্যের আঘাতে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়।

এ অবস্থায় কেউ কারুর শাসন মানে না। সমাজের ভয় কিংবা ব্যভিচারিতার কঠিন আঘাতে স্বামী কিংবা স্ত্রী ভ্রূক্ষেপও করে না। কামনার বহ্নি-ঘাতে ক্ষত বিক্ষত হয়েও তাদের মুখে হাসি ফোটায়। এই নারকীয় যজ্ঞশালায় অপরপক্ষ সুনিপুণভাবে এগিয়ে আসে।

এই সুযোগে দেশের মধ্যে এক আন্তঃপ্রাদেশিক সমাজদ্রোহীর দল মাথা চাড়া দেয়। বিভ্রান্ত মানবগোষ্ঠী তাদের হাতছানিকে উপেক্ষা করতে পারে না।

এই সমাজজীবনে বিরাট ধ্বসের সামনা-সামনি দাঁড়াতে গিয়ে নবদ্বীপ আশ্রয়কেন্দ্রের পরিচালকের এক মর্মস্পর্শী আবেদনে একদিন মিঃ মুখার্জি চমকে উঠেছিলেন। আকুল আহ্বানের মাঝপথে জোর করে থামিয়ে দিয়ে মিঃ মুখার্জি বলেছিলেন, আপনি আমাকে সে সব খবর দিন। আমাকে একটু সাহায্য করুন। আমি একবার দেখতে চাই ওরা কতদূর শক্তিশালী।

পরিচালক মিঃ কুশারী ওর চোখে মুখে উত্তেজনার রেখা দেখে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেন। মিঃ মুখার্জির দৃঢ়তায় উৎসাহ বোধ করেন।

মিঃ কুশারী আস্তে আস্তে ওঁর অভিযোগ বলে চলেন। এই আশ্রয়কেন্দ্র থেকে পর পর কয়েকটি মেয়েই উধাও হয়ে গেছে। অথচ আজ পর্যন্ত একটি মেয়েকেও খুঁজে পাওয়া গেল না। স্বাভাবিক কারণেই মিঃ কুশারী বিশ্বাস করেন, এর মধ্যে এক অদৃশ্য হস্তের ইংগিত রয়েছে বলে। পুলিসে খবর ঠিকই যায়। কিন্তু মেয়ে চুরির সংখ্যা বেড়েই চলেছে।

নারী হরণ যুগে যুগে বিকৃত হয়েছে। সে মহাপরাধ থেকে মানব সমাজ তবুও নিষ্কৃতি পায় নি। এক সম্প্রদায় দ্বারা অন্য সম্প্রদায়ের নারী ধর্ষণে সারা পৃথিবী কলঙ্কিত। মধ্যযুগীয় বর্বরতাকেও পেছনে ফেলে,—এ যুগেও নারীদের প্রকাশ্য রাজপথে অপমানিত এবং লাঞ্ছিত করতেও ছাড়েনি। রাস্তাঘাটে তাদের বিক্রী পর্যন্ত করছে। এ নিয়ে মানুষের মন বিচলিত হয়েছে। তাদের মনে সেই রোষবহ্নি শতবাহু বিস্তার করে সক্রোধে গর্জন করে উঠে। তার বহিঃপ্রকাশও তো মিঃ মুখার্জির না জানার কথা নয়।

কেন জানি মিঃ মুখার্জি অস্বস্তি বোধ করেন। তিনি ভাবেন তবে কি মাতৃজাতির উপর সমাজ শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলেছে? তাঁদের উপর কোন মমত্ব বোধই কি তবে নেই? তবে মিঃ কুমারীর অভিযোগের কোন প্রতিকারই হবে না? এ দায়িত্ব শুধু কি পুলিসেরই?

না—না—না। উত্তেজিত মিঃ মুখার্জি ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেন। তীব্র প্রতিবাদের ঝড় বয়ে চলে। প্রতিবাদের সুরেই তিনি সে দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে মেনে নিতে চান না।

মিঃ মুখার্জি, ইউ উইল রিগ্রেট্। আই—শ্যাল—হ্যাভ্ মাই—স্ট্রাংগেস্ট্ ড্রি।

এ-কথা মিঃ মুখার্জি কিছুতেই ভুলতে পারেন না। উচ্চশিক্ষিত মিঃ ব্যানার্জি তো তিন সম্প্রদায়ের নন। সাধারণ মানুষের চাইতে তিনি তো অনেক উঁচুতে। বর্তমান সমাজে ওঁর প্রতিষ্ঠাও তো কেলে দেবার মত নয়। তবে কেন তাঁর মুখে এত বড় স্পর্ধার কথা?

ধর্মাধিকরণের সামনে বিশুদ্ধ ইংরেজিতে এরাই সসম্ভ্রমে উচ্চারণ করে,—মি লর্ড।—অথচ এরাই সমাজের স্নেহ, ব্যাভিচার কিংবা সমাজদ্রোহিতাকে সমূলে উৎপাটিত করতে, ভারতীয় আইনের নির্দেশে কোর্টকে সাহায্য করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। জাতির কাছে তাদের কাজ সব চাইতে দায়িত্ব-পূর্ণ। তবে কেন মিঃ ব্যানার্জির মুখে এত বড় কথা?

মিঃ ব্যানার্জির কাছে তিনি এক হৃদয়গ্রাহী আবেদনে মুংপেরের সেই কাহিনী ছাড়াও, প্রকাশ করেছিলেন কি ভাবে এ নারকীয় যজ্ঞে সমাজের কয়েক জন দায়িত্বহীন ব্যক্তি এক ঘৃণিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত।

মিঃ মুখার্জি আরও বলেছিলেন,—কি করে এরা বাংলার মেয়েদের অন্ধ প্রদেশে পাচার করে। বড় আশা নিয়ে তিনি মিঃ ব্যানার্জির কাছে তার আবেদন জানিয়েছিলেন। কিন্তু সব বৃথা।

মিঃ মুখার্জির প্রশ্নে মিঃ ব্যানার্জি হেসেই উত্তর করেন,—স—ব জানি মশাই। অন্তত যদি না-ই বা করবে, ওরা তবে আমাদের কাছে আসবে কেন? আর যদি না-ই বা আসবে, তবে এত টাকাই বা আমাদের কে দেবে?

মিঃ মুখার্জি চেয়ারের হাতল শক্ত করে ধরে বসেছিলেন। ম্যালেরিয়ায় পঙ্গু দেহটা তখনও কাঁপছিল।

ওর প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে মিঃ কুমারী অনেক কথাই বলেছিলেন।

বয়স কত—? মিঃ মুখার্জি প্রশ্ন করেন।

এই ধরুন ষোল কি সতের।

দেখতে কেমন?

নিঃসন্দেহে সুন্দরী।

পড়াশুনো?

আট্‌ম শ্রেণী অবধি পড়েছে।

ওর আছে কে?

মা—বাবা। ছোট ছোট কয়েকটি ভাই বোন।

ওর বাবা কি করেন?

তরি-তরকারি বিক্রী করে—।

অবস্থা কেমন?

ভাবছি প্রায়ই উপোষ দেয়—।

দীর্ঘ অভিজ্ঞতার ফলে যে কোন অভিযোগের কারণ বুঝে নিতে মিঃ মুখার্জির প্রায় ক্ষেত্রেই বিশেষ ভাবতে হয় না। মিঃ কুণ্ডারীর কথা শুনে অনিতার অন্তর্ধানে একটি বিশেষ কারণের কথাই ওঁর মনে পড়ে। সে কারণ হল মানব জীবনের পরম অভিশাপ—দারিদ্র্য।

খবর দেবার লোকের অভাব নেই। চারিদিক থেকেই আসতে থাকে। এখানেও প্রতিশোধ স্পৃহা। শত্রুতা সাধন কিংবা ঈর্ষা যাদের পুড়িয়ে মারে, তারাও চুপি চুপি এসে। ডালপালা ছড়িয়ে এ ওর নামে অনেক কথাই বলেছিলো, মিঃ মুখার্জি কাউকে বিমুখ করেন না। সহানুভূতি নিয়ে সবার কথা শুনেন। কিন্তু প্রতি পদক্ষেপে হোঁচট্ খেতে খেতে আবার নিজেকে সামলিয়ে নেন। কয়েকদিনের মধ্যেই তিনি বুঝতে পারলেন, এ আশ্রমকেন্দ্রকে উপলক্ষ্য করে, কতকগুলি লোক নিজেদের স্বার্থ নিয়ে মেতে উঠেছে। তারা একটা ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করেছে।

অনেকেই বলে বড় বড় গাড়ি আসে। তীব্র হেড্ লাইটের পেছনে কয়েক জোড়া হিংস্র চক্ষু—জ্বল জ্বল করে ওঠে। রাতের নিস্তব্ধতায় মানুষের অগোচরে তারা নাকি অনেক কিছুই করে। কোনও কাজ বন্ধ নেই। তাদের স্বচ্ছল অবস্থা দেখে অনেকেই অনেক কথা ভাবে। অথচ সাহস নেই যে কিছু বলে। বললে হয়তো একটু হাসে। বলে রিকিউজি ক্যাম্পে আছি বলে কি দেশের বাড়িতে কিছু থাকতে নেই। এখনও মাঝে মাঝে কিছু আসে। তাই কোনও রকমে চলে যায়।

ওদের কাজে প্রতিবাদ করতে গিয়ে চোরা গোপ্তা মার খেয়েছে,—এমন ঘটনা অনেক। সাক্ষী নেই বলে ওদের বিরুদ্ধে কিছুই করা যায় না। যদি ওরা দিন কয়েক হাজত বাস করে, ফিরে এসে রক্তচক্ষু হারবার হিংস্রতা নিয়েই আবার রুখে দাঁড়ায়। মান অপমানের বার তারা ধারে না। সমাজ চেতনা কিংবা সুরুচি বলে কোন কিছুর বালাই নেই। মেয়েদের দেখে ইতরামি করে। অভিভাবকদের সামনে চুরুট টানে। তাদের সংখ্যাই বড় দ্রুত বেড়ে চলেছে। হাল ছেড়ে দিয়ে অভাবগ্রস্ত মা-বাবা জীবনের অভিশাপ বলেই ওদের মেনে নেয়।

মিঃ মুখার্জির চোখে ধীরে ধীরে রিকিউজি ক্যাম্পের রূপ ধরা পড়ে।

উগ্র সৌন্দর্যের ডালি নিয়ে মেয়েরা এখানে সেখানে যাওয়া আসা করে। সাথে থাকে কয়েকটি কিশোর বালক। অদ্ভুত তাদের আচরণ। আরও অদ্ভুত পরিধানে কাপড় জামা। বার হাত কাঁকুড়ের তের হাত বীচির মতই তাদের চালচলন এবং কথাবার্তা। সব সময়ই মারমুখি। এ বয়সেই দু'চোখে কামনার বহ্নি উগ্র হয়ে দেখা দিয়েছে। কৈশোর এবং যৌবনের মাঝামাঝি জোর করে ফুটিয়ে তোলা একটি যেন মোলায়েম কুঁড়ি।

মেয়েদেরও তাই। আঁট সাট বেশবাসে সর্বাংগে যৌন ক্ষুধার ইন্ধন জ্বালিয়ে তারা চলে। নারীর সহজাত শালীনতার কোন বালাই নেই। সারাদার বুকে কয়েকটি মরুদ্যানের মতই শান্ত, ধীর-স্থির, কিছু কিছু বালক এবং বালিকার উপস্থিতি মিঃ মুখার্জিকে আনন্দ দেয়। তিনি মনে মনে তাদের দু'হাত তুলে আশীর্বাদ করেন। ভেঙে পড়া সমাজ জীবনে এখনও সাড়া জাগাবার মতো আশা আছে দেখে তিনি খুশী হন।

মিঃ মুখার্জি যত সহজ মনে করেছিলেন, অনিতাকে বের করা তত সহজ হল না। গোটা সংসার যেখানে স্বার্থপর, সেখানে মানুষের মহত্তার উপর নির্ভর করা বড় কঠিন।

ক্লান্ত দেহটা টেনে নিয়ে মিঃ মুখার্জি চলছিলেন। সূর্যতপ্ত গ্রামা পথের ধারে একটু বিশ্রামের আশায় বসেন। মাথার উপরে ঝটাসুটধারী বহু-র সাক্ষী হয়েই একটি বটগাছ দাঁড়িয়ে আছে। এক বুড়িমাও বসে ছিল। আঁচল দিয়ে সর্বাংগ মুছে ফেলছিল। একবার মিঃ মুখার্জির দিকে চেয়ে একটু হাসল। বললে—ভেজ থেমে গেছি বাবা।

মিঃ মুখার্জিও বসেন। আশে পাশে কয়েকটা কাক চোখ বুজে আবর কাটছিল। বুড়িমা লাঠি নিয়ে তাড়া করতেই কয়েকটা কাক উড়ে গেল।

ঝোলা থেকে বুড়িমা কি যেন বের করে মুখে পুরে দেয়। মনে হল সুপুরির সাথে পান। পান চিবুতে চিবুতে বুড়িমা মুরুব্বির মতই প্রশ্ন করে, কোথায় যাবে বাবা ?

মুখিলে পড়লেন মিঃ মুখার্জি। ভাবলেন কোনও উত্তর দিবেন না। একটু বিশ্রাম করেই তিনি চলে যাবেন। সামনেই তো ধূ ধূ করছিল বিস্তীর্ণ ক্যান্সা।

সাধ্য কি বুড়িমার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া। প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে বুড়িমা মিঃ মুখার্জিকে উত্যক্ত করে তোলে। কথার কথা বাড়ে। বুড়িমার কল্পনাকে মিঃ মুখার্জি এক ফাঁকে মস্ত পদে ঠেলে দেন। বুড়িমা গড় গড় করে বলতে শুরু করে। সে বলার পথে অনিতার কথাও এসে পড়ে। কোকড়া মুখে হাসি টেনে বুড়িমা অনিতার গল্প বলছিল। সে কথার মধ্যে এক বৈষ্ণবীও আত্মপ্রকাশ করে। কোকড়া মুখে পান চিবুতে চিবুতে বুড়িমার কুত কুতে চোখ দুটো হাসির ঘমকে প্রায় অদৃশ্য হয়ে যায়। মুখের ভাঁজ আরও স্পষ্ট হয়ে উঠে। রসাল ঠোঁট দুটি মাঝে মাঝে বিস্তারিত হতে থাকে।

বুঝলে বাবা ছুকরি গায় ভাল।

বয়স কত ? বুড়িমার অভিমত শোনার সাথে সাথে মিঃ মুখার্জি প্রশ্ন করে বসেন।

হবে বছর চাল্লিশ কি পঁচিশ।

বুড়িমা সামনের দিকে পা দু'টি ছড়িয়ে দিয়ে বৈষ্ণবীর মধুর কণ্ঠের বিস্তারে মেতে উঠতে থাকে।

বলছিল বুড়িমা, দেখতে শুনতে ভালই। মাথের উপর রসকলি। হাতে একতারা। গান গায় বেশ। সাদা ধবধবে কাপড় পরে। মাথার চুল উপরের দিকে টেনে খোপা বাধে। বিরাট খোপায় চারিদিকে সুন্দর বেলী ফুলের মালা জড়িয়ে রাখে।

থাকে কোথায় ?

চোখ মুখ ঘুরিয়ে বলে বুড়িমা, কি জানি বাবা কোথায় থাকে। তবে শুনেছি ট্রেণে করে আসে, আবার ট্রেণেই চলে যায়।

অঃ! তাই নাকি ?

তাই না কি মানে ? ওকে তো সবাই চেনে বাবা। হাঁ, অনিতার সাথে খুব ভাবছিল। গান গল্প করত। মুখ টিপে টিপে হাসত। ক'দিন ধরে দেখছি না।

বুড়িমার কথা বলার ঢং দেখে মিঃ মুখার্জিরও হাসি পেল। আবার উৎসাহ দেবার জন্য হাসেনও।

রসিয়ে রসিয়ে বুড়িমা কথা বলে, না শুনে উপায় নেই। —থেকে থেকে জিজ্ঞেস করে, বুঝলে তো বাবা ?

বয়সের মাপকাটিতে বুড়িমা এরই মধ্যে তুমিতে এসে গেছে।

কেন জানি মিঃ মুখার্জি বুড়িমার কথা বিশ্বাস করেন। একতারা হাতে শুভ্র বসনা এক যুবতী

ওর চোখের সামনে ভেসে বেড়াতে থাকে। বুড়িমার কথা ধরে এই বৈকল্পীর সাথে অনিতার যোগাযোগ কেন জানি মিঃ মুখার্জিকে রীতিমত ভাবিয়ে তোলে।

মিঃ মুখার্জি রসকলিকাটা মেয়েটির খোঁজে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। মিঃ কুণ্ডারীও বুড়িমার কথার সমর্থন জানান। অনেকেই বৈকল্পীর কথা স্বীকার করলেও, সে যে কোথায় থাকে, বলতে পারল না।

চলতি ট্রেণে বসে বসে মিঃ মুখার্জি ভাবছিলেন অনিতার কথা। এত পরিশ্রম ওঁর বৃথাই গেল। প্রায় বিশ পঁচিশ দিন হয়ে গেল। অনিতার খবর নেই। কতগুলো হারানোর মধ্যে একমাত্র অনিতাকে চিন্তা করে তিনি চমকে উঠেন। যারা নারীকে শুধু ভোগ্য বস্তু হিসেবে দেখে, তাদের হাতে অনিতার মত মেয়ের কোন মূল্যই নেই। সেখানে নারীর আপন সত্তা বলে কোন কিছু থাকে না। মিঃ কুণ্ডারীর কথা মনে পড়ে। এক এক করে অতগুলো মেয়ে চলে গেল, অথচ আজ পর্যন্ত তাদের হদিশ নেই! কথাটা মনে করে মিঃ মুখার্জির মনের কোণে কে যেন ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠে। রাষ্ট্র-বিপ্লবে মানুষের মনের শান্তি এমনি করেই ভেঙে পড়ে। যেখানে সমাজ বন্ধন দুর্বল, স্বাধীনতার কথা শুনে মানুষ ব্যংগ করে হাসে, সেখানে উশৃংখলতা সবার মনকে বিদ্রোহী করে তোলে। ব্যাভিচারিতা কিংবা যৌন বিলাস মানুষের প্রতিস্তরে, কোথাও উগ্র, আবার কোথাও বিকশিত শুভ্র মল্লিকার বুকে কামড়িয়ে পড়ে থাকা ক্ষুদ্র মক্ষিকার মতই দংশন করে। অন্তঃসলিলা স্রোতস্বিনীর মত ঢেউ সমাজের উচ্চ স্তর থেকে—সাধারণ স্তরে এসে পৌঁছেছে। এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার ক্ষমতা অনিতার মত মেয়েদের নেই। তাই পুলিসি জীবনে তিনি দেখেছেন সহরে কিংবা বন্দরে অনিতার মত মেয়ে এখানে সেখানে। দুদিনের অতিথি হয়ে কারা যেন সংগোপনে আসে। আবার তারা মিশে যায়। যারা আসে তারা সমাজে কলংকিত হয় না। আর যাদের কাছে আসে, তারা চির কলংকিত—সবার সম্পত্তি বলেই সবাই ভাবে।

হঠাৎ মিঃ মুখার্জি হকারের ডাক শুনে চমকে উঠেন।

এই শোন্।

ওরে বাবা! আপনি স্যার! এখানেই নেবে যাচ্ছি স্যার।

হকচকিয়ে উঠল হকারও।

রেল পুলিসে কাজ করার সময় দলে দলে ওদের ধরে নিয়ে মিঃ মুখার্জি বন্ধ করে দিতেন। তাই হকারের দল ওঁকে দেখে ভয় পেয়ে যায়। বিনে ভাড়ায় ট্রেনে চাপা আজকাল ট্রেনের লোক বড় বেশী বরদাস্ত করে না। ধরে নিয়ে গিয়ে সোজা ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে দাঁড় করিয়ে দেয়। ভয় পাবার তো কথাই বটে। তাতে আবার বহুদিন পর মিঃ মুখার্জির সামনে পড়ে ওরা রীতিমত ঘাবড়ে উঠে।

ওরে আমি থানার বরখাস্ত হয়ে গেছি।

আশ্বাস দেন মিঃ মুখার্জি।

তবুও হকারের দল ওঁকে বিশ্বাস করতে চায় না।

চল্। এই ষ্টেশনেই নেবে পড়ি।

পরের ষ্টেশনেই ওরা নেবে পড়ল। আধ মরলা বেঞ্চির উপর ওদের নিয়ে মিঃ মুখার্জি বসেন। এ-কথা ও-কথা থেকে, অনেক কথাই হয়। ওর পরেই আসে বৈকল্পীর কথা।

ওকথা শুনে হকার নবীন লাফিয়ে উঠে। গড় গড় করে বলতে থাকে। বৈকুণ্ঠীকে সে যে শুধু চেনে তা নয়, কোথায় থাকে সে কথাও ওর জানা। প্রায়ই তো ট্রেনে করে আসে, আবার যায়।

নবীনের হাতে একটি টাকা গুঁজে দিয়ে মনের আনন্দে মিঃ মুখার্জি পরের ট্রেনে দৌড় দিয়ে উঠে বসেন। বিস্মিত নবীন একবার হাতের উপর আর একবার চলতি গাড়িটার দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে থাকে।

নবদ্বীপ এসেন মিঃ মুখার্জি। পরিচিত পথঘাট। এ-থানায় চাকরিও করেছেন অনেকদিন। ভাল মন্দ অনেককেই তিনি জানেনও। এগিয়ে চলতে গিয়ে সহসা মনে মনে হেসে উঠলেন। মনে পড়ল একজনের কথা। সমাজপতি না হলেও অনেকের পতি তো বটেই। রাজনীতি থেকে কোন নীতিতেই ওকে আটকায় না। তাই সহরের দু' দশজন লোক মনে মনে না হলেও, অন্ততঃ মুখের উপর যামিনা বলতে পারে না। ভেতর থেকে ওর উপর ঘৃণা আসলেও, মুখে হাসি নিয়েই বলেন,—আজ্ঞে ভালতো?

এই যে নবকিশোরবাবু। সব ভালতো?

আরে আপনি! কি সৌভাগ্য! দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? বসুন স্যার? ব্যস্ত হয়েই নবকিশোরবাবু মিঃ মুখার্জিকে অভ্যর্থনা জানান।

মিঃ মুখার্জি বসেন।

নবদ্বীপ ধামের আশে পাশে অতকগুলো মনুষ্যাকৃতি নরপশুর মধ্যে, এই নবকিশোরবাবুও একজন। সুপুরুষ, তাতে অবস্থাপন্ন। বাপ দাদার আভিজাত্য মার্কা বিরাট বাড়ির একমাত্র মালিক। বাইরে থেকে মনে হয় নবদ্বীপ ধামের দশ অবতারের এক অবতার এই নবকিশোরবাবু। দেশী ও বিদেশীর বড় বড় ফটোতে ঘরখানি সাজান গুছান। প্রত্যেকের জন্মোৎসবের মাহাত্ম্য প্রচারে সদা জাগ্রত। প্রৌঢ়ত্বের ঘরে এসেও চোখের ক্ষুধায় এখনও ভাটা পড়েনি। বহুক্ষেত্রে তিনি সন্দেহ ভাজন ব্যক্তি। কিন্তু আইনের চোখে তিনি এখনও নিষ্কলঙ্ক। ওর চোখের সামনে মল্লযুদ্ধের মতই মেয়েরা ঘষকে দাঁড়ায়। হুঁস হবার সাথে সাথে ফিরে চেয়ে দেখে পেছনের সিঁড়ি জলে গেছে। বাধ্য হয়েই জীবন মরণের সন্ধিক্ষণে নবকিশোরবাবুর বাড়িয়ে দেওয়া হাত ধরেই উঠে আসতে হয়। অর্থবল, লোকবল ছাড়াও সব চাইতে রাজনৈতিক বলে বলীয়ান নবকিশোরবাবু কাউকে ভয় করে না। মুখে মিষ্টি হাসিটি লেগেই থাকে। কিন্তু এই মিঃ মুখার্জিই ওর জীবনে মস্ত বড় এক দুগ্রহ। একবার ওঁর হাতে পড়ে তিন মাস হাজতে থাকতে হয়েছিল। কিন্তু তবুও নবকিশোরবাবু ঘষামাজা ঘরের ছেলে ঘরেই ফিরে এসেন। চলে যাওয়া মিঃ মুখার্জিকে হঠাৎ নবদ্বীপ ধামে দেখে নবকিশোরবাবু হকচকিয়ে উঠলেন।

রসকলি কাটা মেয়েটির কথা উঠতেই অর্থ ইঙ্গিত মিহি হাসি বের করে নবকিশোরবাবু লজ্জায় মুখ ঢাকলেন। প্রকাশ করলেন সেই সব সংস্রব তিনি সেই থেকেই ছেড়ে দিয়েছেন।

সহসা মিঃ মুখার্জির মুখে কাঠিন্য দেখে নবকিশোরবাবু শংকিত হন। চোক গিলে বলেন, একটু চেষ্টা করে দেখি স্যার! উপরে পাখা থাকা সত্ত্বেও নবকিশোরবাবুর মুখে ঘাম দেখা দিল। নবকিশোরবাবু ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

খালি ঘর। মিঃ মুখার্জির আগমনের সাথে সাথে দু'একজন যারা ছিলেন, চলে গেছেন। রসকলি কাটা মেয়েটি যে আজও নবকিশোরবাবুর চোখে পড়েনি, এ-কথা তিনি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারেন না। মেয়েটির বাড়িতো দূর থেকে তিনি দেখেই এসেছেন। কাছেই তো মেয়েটি থাকে।

মিঃ মুখার্জি 'ফিমিন ফেয়ারের' পাতা উল্টিয়ে উল্টিয়ে দেখছিলেন। সময় কাটাতে হবে তো। পরের পাতা উল্টে ধরে তিনি হেসে ফেললেন। 'যোগন্'-এ বাদিন-এর ছবিই তিনি দেখছিলেন। ঐ ছবি রসকলি কাটা বৈষ্ণবীর কথাই বারে বারে মনে করিয়ে দেয়।

বাইরে শব্দ হতেই মিঃ মুখার্জি চেয়ে দেখেন নবকিশোরবাবু।

স্যার, নন্দা বাড়ি নেই।

বুঝতে পারলেন মিঃ মুখার্জি, বৈষ্ণবীর নাম নন্দা।

কোথায় গেছে?

বোলপুরে ওর দাদার বাড়ি।

ক'দিন হল?

ওরা বললে, হবে তিন চারদিন।

দাদার নাম?

ব্রজেশ্বরবাবু।

বোলপুর তো আর এতটুকু জায়গা নয় নবকিশোরবাবু?

ব্রজেশ্বরবাবু ওর কেউ নয়। তবে দাদা বলে ডাকে। তাই ওরা কেউ আর কোনও খবর দিতে পারলে না স্যার।

নন্দার স্বভাব চরিত্র কেমন নবকিশোরবাবু?

স্যার,.....।

বুঝতে পেরেছি। ধন্যবাদ।

স্যার,...একটু মিষ্টি মুখ।

হেসে বললেন মিঃ মুখার্জি, সময় নেই।

মিঃ মুখার্জি চলে গেলেন। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন নবকিশোরবাবু, বেলা প্রায় পড়ে এসেছে। বোলপুরের গ্রাম্য রাস্তা। পথ বেয়ে তিনি চলছিলেন। পথিক এক ভদ্রলোকের কাছে জানতে চাইলেন কোথাও হোটেল আছে কিনা। কথায় কথায় নিজের পরিচয় দেন। ভদ্রলোকের অনুরোধ এড়াতে না পেরে মিঃ মুখার্জিকে আতিথ্য মেনে নিতে হল। ভদ্রলোক খুবই আমোদী। ওঁকে বাড়ি নিয়ে এলেন। খাওয়া-দাওয়ার পর পুলিসি জীবনের অনেক কথায় এসে পড়া গেল। তাইতেই বোলপুরে আসার উদ্দেশ্যও বলতে হল। মাঝে মাঝে মিঃ মুখার্জি প্রশ্ন করে বসেন, ব্রজেশ্বরবাবুকে আপনি চেনেন?

ব্রজেশ্বর মিত্রের কথা বলছেন তো!

অমন করে চমকে উঠলেন কেন?

মিঃ মুখার্জির প্রশ্নে ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি বলে ফেলেন, না-অমনি। মিঃ মুখার্জির চোখে চোখ পড়তেই ভদ্রলোক আরও গম্ভীর হয়ে উঠেন।

না—বললেও ভদ্রলোকের চোখ ও মুখ স্পষ্টই বলে দেয় তিনি ব্রজেশ্বরকে শুধু যে চেনেন তাই নয়, ভাল করে জানেনও। তবে ও কথা বলতেও তিনি ভরসা পাচ্ছেন না।

নন্দা বলে একটি মেয়ে নবদ্বীপ থেকে মাঝে মাঝে আসে কিনা, এ প্রশ্ন করতেই ভদ্রলোক আবার মিঃ মুখার্জির মুখের দিকে চান। ধীরে ধীরে বলেন, মিঃ মুখার্জি, ব্রজেশ্বরের বিরুদ্ধে কোনও

কথা বলবার মত সৎসাহস আমার নেই। এ গাঁয়ে সেরকম সাহস কারুর আছে কিনা আমার জানা নেই। অথচ সবাই যজ্ঞেশ্বরের সর্বনাশ কামনা করে। কিন্তু সে আশা পূর্ণ হবার নয়। ওর মত এত বড় শয়তান আর কোথাও আছে কিনা জানা নেই। ওর বিরুদ্ধে গাঁয়ের লোক প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্যভাবে উপর তলায় বহু অভিযোগ জানিয়েছে, প্রতিকার তো দূরের কথা, দিন দিন ওর প্রতিপত্তিতে আমরা বিস্মিত। ওর বিরুদ্ধে টু-শব্দটি করার ক্ষমতা কারুর নেই। সবস্তরে যজ্ঞেশ্বর ক্রয়ক্ষমতাশীল।

ভদ্রলোক, অর্থাৎ নিখিলবাবু আবার চুপ করে থাকেন।

সামনে যতদূর দৃষ্টি যায় গভীর অন্ধকারে জোনাকী পোকার দল নিষ্ফল নিষ্প্রদীপের আলো নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। মিঃ মুখার্জির চোখে বিরাট নৈরাশ্য নিখিলবাবুর কথার ভেতর হতাশার ঢেউ এলোমেলো হতে থাকে।

পরদিন ভোরের দিকে মিঃ মুখার্জি বেরিয়ে পড়লেন। বিদায়কালীন নিখিলবাবুর অসহায় ভাব দেখে মিঃ মুখার্জি ঊৎসাহিত উঠেছিলেন।

বলছিলেন নিখিলবাবু, আমাকেও ছেলে পিলে নিয়ে ঘর-সংসার করতে হয়। বয়স্কা মেয়েরাও রয়েছে। আমার অনুরোধ যজ্ঞেশ্বরবাবু যেন আমার কথা জানতে না পারে।

মিঃ মুখার্জি পথে চলতে চলতে নিখিলবাবুর কথাই ভাবছিলেন, এই তো সমাজ! নিজের আদর্শ কি বাঁচিয়ে রাখবার ইচ্ছা মানুষ এমনি করেই হারিয়ে ফেলে। সমাজতন্ত্রীর কদর্য কটূক্তির সামনে ভীত সন্ত্রস্ত সবাই। অন্যায়ের অর্থ যেখানে মানুষকে প্রতিষ্ঠা দেয়, তাদের প্রতি সবস্তরে। কেউ প্রতিরোধ করলে সবাই তাকে উপহাস করে। বলতে না পারলেও মিঃ মুখার্জি নিখিলবাবুর কথা বুঝতে পেরেছিলেন—নিখিলবাবু চাইছিলেন মিঃ মুখার্জি যেন ওর আতিথেয়তার কথা কারুর কাছে প্রকাশ না করে। যজ্ঞেশ্বর নিশ্চিন্ত সে-কথা জানতে পারলে ওর আর রক্ষে রাখবে না।

মিঃ মুখার্জি নিজ মূর্তিতেই চলছিলেন। যজ্ঞেশ্বরের বাড়ি খুঁজে বের করতে ওঁকে বেগ পেতে হয়নি।

একেবারে সামনা সামনি। একজন পুলিস অফিসার ওকে প্রশ্ন করতেই যজ্ঞেশ্বরবাবু চমকে উঠলেন,—আমাকে!

আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনাকেই আমার দরকার।

এমন কি দরকার? বলুন।

প্রশ্ন আমার অনেক। একটু বসতে পারলে ভাল হত।

একবার মুখের দিকে চেয়েই যজ্ঞেশ্বর বললেন—আসুন।

যজ্ঞেশ্বরবাবুর মানসিক পরিবর্তন স্পষ্ট বোঝা গেল। শত চেষ্টা করেও বুদ্ধিমান লোক—মুখের উপর মনের কথা মুছে ফেলতে পারেন না। যজ্ঞেশ্বরবাবুও পারলেন না। প্রতিক্রিয়া মুখের উপর কম-বেশী প্রতিফলিত হবেই।

ধীরে ধীরে আসল কথায় এসে পড়া গেল। বার কয়েক মিঃ মুখার্জির মুখের দিকে চেয়ে যজ্ঞেশ্বরবাবু কি যেন ভাবতে থাকেন। পরক্ষণেই আকাশে বিদ্যুৎ চমকানর মত ওঁর মুখে আশা ও নিরাশার দ্বন্দ্ব দেখা দিল। স্বভাবসিদ্ধ আবেদনে মিঃ মুখার্জি সান্ত্বনা দেন—উপরওয়ালার হুকুম মানতে এসেছি। তা-না হলে এতদূরে আসে যশাই।

তবে তার, রিপোর্টটা একটু ভাল করে লিখে দেবেন।

সন্ত-আসা জাহাজের জলের মতই যজ্ঞেশ্বরবাবু পরম বান্ধব মিঃ মুখার্জির কাছে মনের কথা খুলে বলেন। নজার মত মেয়ে হয় না। পরিচয় করিয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি দেন বারে বারে। এতে অতের কাছে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠবার সুযোগ এসে গেছে।

সহসা যজ্ঞেশ্বরবাবুর মেজাজ রুক্ষ হয়। কর্কশ কণ্ঠেই প্রতিবাদ তুলে প্রশ্ন করেন, এতক্ষণ আমাকে আটকে রাখলেন কেন?

প্রশ্ন শুনে মিঃ মুখার্জি চুপ করে থাকেন। যজ্ঞেশ্বরবাবুর চোখমুখের পরিবর্তনে মিঃ মুখার্জি বুঝতে পারেন আপাতত যজ্ঞেশ্বরবাবু স্মৃতি হারিয়েছেন। যজ্ঞেশ্বরবাবু মারমুখি হয়ে উঠেন। ওর হাঁকডাকে এরই মধ্যে কয়েকজন লোক সেখানে এসে উপস্থিত হয়।

অবাস্তব হলেও যজ্ঞেশ্বরবাবুর কথা সমর্থনের লোকের অভাব ছিল না।

বলতো অমুকের কাছে যাই। কি বলবে যজ্ঞেশ্বর?

সমর্থকের দল মিঃ মুখার্জিকে উপলক্ষ্য করেই যে ওসব কথা বলছিল, তাতে সন্দেহ নেই। ও-কথা শুনে মিঃ মুখার্জি খুবই অস্বস্তি বোধ করছিলেন। যাদের নাম করে ওরা ওকে ও-সব কথা বলছিল, তাঁদের নামের আগে ও পেছনে রীতিমত বিশেষণের অলঙ্কার, স্বাভাবিক কারণেই মিঃ মুখার্জিকে বিচলিত করে তোলে। যজ্ঞেশ্বরবাবুর কথার দ্বিরুক্তিতায় ওর মুখের দ্বিরুক্তি বৃদ্ধি পেলেও, সব কিছুই ওকে হজম করতে হল।

কারণ, মিঃ মুখার্জির কাছে এমন কিছু ছিল না, যে প্রমাণের উপর নির্ভর করে যজ্ঞেশ্বরবাবুকে গ্রেপ্তার করা চলে।

আশ্চর্য! ষ্টেশনে পৌঁছেই মিঃ মুখার্জি দেখতে পেলেন নিখিলবাবু ওরই অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে।

কিছু সুবিধে হল? নিখিলবাবুর দৃষ্টি ছিল এদিক-ওদিক।

না।

ওর কাছ থেকে খবর যে কিছু পাবেন না, সে কথা আমি জানতাম। প্রসাদ বলে একজন বিহারীকে ওর কাছে প্রায়ই আসে। বয়স হবে চল্লিশের কোঠায়। দেখতে শুনতে বেশ। খদ্দরের পাঞ্জাবীর উপর কালো রংএর জহর-কোট গায়ে। মিষ্টি মিষ্টি আধ-হিন্দি আধ-বাংলা ভাষায় কথা বলে, শুনছি ঐ প্রসাদই নাকি যজ্ঞেশ্বরবাবুর কাছ থেকে মেয়েদের কিনে নেয়। কয়েকদিন আগের কথাই বলছি। একটি বাংলাদেশী মেয়েকে সাথে করে রসকলি কাটা একটি বৈষ্ণবী এসেছিল।

প্রসাদ থাকে কোথায়? মিঃ মুখার্জি উদগ্রীব হয়ে উঠেন।

ওর বাড়ি মুঙ্গের জেলায়। মুঙ্গের সহরে নাকি ওকে সবাই চেনে। তা ছাড়া মুঙ্গের সহরে ওর বড় বড় হোটেল আছে।

আপনি কখনও দেখেছেন প্রসাদকে?

না দেখলে অত কথা বলবার কি করে?

তাওতো কথা। আচ্ছা বলুন তো প্রসাদের মধ্যে এমন কোনও বিশেষত্ব আছে কিনা, যার উপর নির্ভর করে ওকে এক কথায় চিনে ফেলা যায়।

আজ্ঞে হ্যাঁ। খুশী হয়ে উঠেন নিখিলবাবু।

বলুন। থামলেন কেন?

ওর বাঁ চোখটা অসম্ভব টেরা। সব সময় কালো গ্লাসের চশমা পরে থাকে।

আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ মিথিলবাবু।

জোড় হাতে নমস্কার করে মিথিলবাবু বললেন—যাই।

মুহূর্তে মিথিলবাবু অন্তর্হিত হলেন। মিঃ মুখার্জি দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি চেয়ে দেখছিলেন সমান্তরাল রেল দুটি। পাশাপাশি হলেও প্রান্তসীমা ধূ-ধূ করছিল। মনে হয় ওখানেই দু'টি রেল লাইন একসাথে মিশে গেছে।

রীতিমত সন্ধ্যা হয়ে গেছিল। মিঃ মুখার্জি মুংগের সহরে এসে গেছেন। এতবড় সহরে প্রসাদকে খুঁজে পাওয়া কঠিন। তবুও তিনি হাল ছাড়েন নি। সোজা গিয়ে উঠলেন থানায়। থানাদার অল্প বয়স্ক এক যুবক। পরিচয় দিয়ে তিনি পরিচয়ে বললেন, ওর নাম বনওয়ারী তেওয়ারী। চোখে-মুখে দৃঢ়তার সাথে আত্মপ্রত্যয়ের রেশ মিশে ছিল।

মিঃ মুখার্জির কথা শুনে বনওয়ারীবাবু নিজের আসনেই নড়ে চড়ে বসলেন। পর পর কতগুলো প্রশ্নও করেন।

উৎসাহ পান মিঃ মুখার্জি। বনওয়ারীবাবুর দু'চোখে ঘৃণামিশ্রিত সান্ত্বনা ওকে আরও এগিয়ে নিয়ে চলে। বার বার তিনি অসহায় মেয়েদের কথা, তাদের আত্মাবমাননার কথা খুলে বলতে থাকেন।

তবুও বনওয়ারীবাবুর কাছ থেকে কোন প্রতিশ্রুতিই তিনি পেলেন না। যত কথাই তিনি বলেন, তার স্পর্শে বনওয়ারীবাবুর চোখে মুখে এক বিস্ময়কর পরিবর্তন থাকলেও, ওর কাছ থেকে কোন আশ্বাসই মিঃ মুখার্জি পাচ্ছেন না দেখে, তিনিও স্তম্ভিত।

সহসা বনওয়ারীবাবু মুখ ফিরিয়ে বলেন, মিঃ মুখার্জি, আপনার বক্তব্য আপনি আমায় একটু বিস্তারিত ভাবেই লিখে দিন।

লিখতে গিয়ে মিঃ মুখার্জি হঠাৎ প্রশ্ন করেন, বনওয়ারীবাবু, আপনি কি অসুস্থ?

কেন বলুন তো?

আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে, আপনি খুবই উত্তেজিত।

সত্যিই আমি উত্তেজিত। আমার যদি ক্ষমতা থাকত, তবে ঐ প্রসাদকে আমি কুকুরের মত রাস্তার উপর গুলি করে মারতাম। কিন্তু আমি অক্ষম। ভারতীয় আইন আমাকে সে অধিকার দেয়নি। প্রসাদকে মুংগের সহরে কে না চেনে? এতবড় একটা কুৎসিত সমাজদ্রোহীকে আইনের আওতায় আনা খুবই কঠিন। প্রতি পদে এই লোকটার হাতে আমি পরাজিত, জানি সব, কিন্তু আমার কথা কে বিশ্বাস করবে বলুন? মন গড়া কয়েকটি সাক্ষী কোর্টের সামনে তুলে ধরবার ক্ষমতা প্রসাদের আছে। প্রচুর অর্থের প্রলোভনে উঁচু স্তরের সাক্ষী বর্তমান সমাজ জীবনে এখানে সেখানে অনেক। একটু প্রলোভন, একটু ইংগিতে তারা কোর্টের সামনে হলপ করে মিথ্যা কথা হাসতে হাসতে বলতে পারে। এই সুযোগ নিয়ে প্রসাদের দল তাদের ব্যবসা চালায়। আজকের মত এমন সুযোগ হয়তো আমি আর পাব না। এবার প্রসাদকে আপনার হাতেই তুলে দেব। আমি সত্যিই উত্তেজিত মিঃ মুখার্জি। আপনি আজ আমার কাছে ভগবানের আশীর্বাদ স্বরূপ। অক্ষম আমি এমনি একটি সুযোগের আশাতেই ছিলাম।

বনওয়ারীবাবু সত্যিই কিন্তু মিঃ মুখার্জিকে ভগবানের আশীর্বাদ হিসেবেই গ্রহণ করেছিলেন। নিমন্ত্রণ করে খাওয়ালেন। খেতে বসে অনেক কথাই তিনি বললেন। মুগ্ধচিত্ত বনওয়ারীবাবুর কথা শুনে মিঃ মুখার্জির বড় ভাল লাগল। কথায় কথায় বনওয়ারীবাবু বলেছিলেন, প্রসাদ অনেক বড় বড় লোকের সাথে শুধু পরিচিতই নয়, মুংপের সহরে সর্বক্ষেত্রে ওর প্রতিপত্তি যথেষ্ট।

বনওয়ারীবাবুর ব্যর্থতার দীর্ঘশ্বাসে মিঃ ব্যানার্জির কথাই মিঃ মুখার্জির বারে বারে মনে পড়ে—আই ডাল গেট মাই প্রায়েট ক্রি।

রাত তখন বারত ন'টা। সিগারেট কিনে দোকানিকে পয়সা শুণে দিচ্ছিলেন। সহসা মিঃ মুখার্জি চমকে উঠেন। ব্রজেশ্বর যে!

তিনজন লোক। পথ বেয়ে চলছিল। একজনের গায়ে শুভ্র খদ্দরের পাঞ্জাবীর উপর জহর কোট। কেন জানি মিঃ মুখার্জির মনে হল সামের লোকটি প্রসাদ হবে। বুঝতে পারলেন না ওরা ওকে দেখেছে কিনা। ওকথা শুনে বনওয়ারীবাবু গম্ভীর হয়ে উঠলেন। ব্যস্তভাবে টেলিফোন তুলে নিলেন।

পরক্ষণেই তিনি বেরিয়ে গেলেন।

শীতের রাত। মিঃ মুখার্জি ঘুম থেকে উঠেই দেখেন বনওয়ারীবাবু ওঁকে ডাকছেন।

তাড়াতাড়ি করুন।

বনওয়ারীবাবুর সাথে মিঃ মুখার্জি ঘরের বাইরে এসে দেখেন সবাই প্রস্তুত। ঘড়ির দিকে চেয়ে বুঝতে পারলেন, রাত দু'টা।

অনিতাকে পেয়ে মিঃ মুখার্জি বুঝতে পেরেছিলেন ব্রজেশ্বরবাবু ওকে দেখতে পায়নি। কিন্তু ব্রজেশ্বরবাবুকে পাওয়া গেল না।

অনিতার সীমাহীন দুঃখে বনওয়ারীবাবুর সহানুভূতি দেখে মিঃ মুখার্জি অভিভূত হয়ে পড়েন। কিন্তু পরক্ষণেই প্রসাদের দলের উপর বনওয়ারীবাবুর কঠোরতায় তিনি শঙ্কিত হন।

এরই পরেই মিঃ মুখার্জি ক্ষিপ্র গতিতে ব্রজেশ্বর এবং নন্দাকে গ্রেপ্তার করেন। হিড়হিড় করে থানায় হাজতে ভরে দিয়ে নিশ্চিন্ত হন।

কুশারীবাবু মিঃ মুখার্জিকে অভিনন্দন জানালেন।

হতভাগ্য পিতা অনিতাকে পেয়ে অশ্রু ঢেলে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে গেল। মা মেয়ের রক্তমুক্ত মুখখানি বুকের উপর চেপে ধরে অঝোরে কাঁদে।

পরম তৃপ্তিতে মিঃ মুখার্জি হেসে উঠেন। মিঃ ব্যানার্জির স্পর্ধার উপযুক্ত উত্তর দিতে পারবেন বলে তিনি উৎসাহিতও কম নন। একটু গর্ব হয়েছিল বৈকি।

পরম উৎসাহে মিঃ মুখার্জি একদিন কোর্টের সামনে ওঁর আবেদন পেশ করলেন। ভারতীয় আইনের চোখে সবাইকে আপাতঃদৃষ্টে দোষী বলে তিনি অভিযুক্তদের বিচারপ্রার্থী।

বিচার চলতে থাকে। অপরপক্ষের খরচের বহর দেখে তাক্ লেগে যায়।

পুলিস প্রসিকিউটারের কথায় একদিন মিঃ মুখার্জির দু' চোখে বিস্ময় ফুটে বেরোয়। অস্ফুট শব্দ করে তিনি বসে পড়েন।

সাক্ষীরা সব উল্টোপাল্টা বলছে।

নিরুপায় পুলিস প্রসিকিউটারও প্রশ্ন করেন—এখন উপায় ?

মিঃ মুখার্জি ভেবে পাবেন না কি করবেন।

সাক্ষীদের কথার ভেতর কার যেন পরিচিত সুর ভেসে আসতে থাকে।

পুলিস প্রসিকিউটারের আবেদনে কোর্টের কাজ আপাততঃ স্থগিত রইল।

আবার বিচার আরম্ভ হয়। হঠাৎ মোড় ঘুরে গেছে। কোর্টের সামনে সাক্ষীদের সত্যি কথায় মিঃ মুখার্জি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন। পুলিস প্রসিকিউটার উৎসাহে গা ঝাড়া দিয়ে উঠেন। প্রসাদের মুখের দিকে মিঃ মুখার্জি বার বার চাইছিলেন। ভাবছিলেন, প্রসাদ নিজেকে বড় বুদ্ধিমান বলে মনে করে।

নিজের আত্মবিশ্বাসে পরম নির্ভরশীল মিঃ মুখার্জি পুলিস প্রসিকিউটারের কথায় আবার আঁৎকে উঠলেন। হতাশায় ভেঙে পড়লেন। ওঁর হাত পা অবশ হয়ে আসতে থাকে। সব কিছুই যেন ওর ইচ্ছা শক্তির বাইরে চলে যাচ্ছে।

ভেতর থেকে কে যেন গর্জে ওঠে। এত বড় পরাজয় মেনে নিতে মিঃ মুখার্জি পারেন না। তিনি একবার দেখতে চান প্রসাদের বল কত শক্তি রাখে।

অনিতাদের ঘর তেমনি করেই দাঁড়িয়ে ছিল। ভাংগা ঘর। ঘরের দরজা একটু ফাঁক করা। হাওয়ায় একটু একটু দুলছিল। ক্যাচ-ক্যাচ করে মাঝে মাঝে শব্দ ভেসে আসে। মুখার্জির দরজাটা ভেতরের দিকে একটু ঠেলে দিতেই, দু' চোখে তীব্র দৃষ্টি নিয়ে একটা বিড়াল ঘর থেকে বেরিয়ে এল। ডাকছিল। আওয়াজ বড় ক্ষীণ। না খেতে পেয়ে শুকিয়ে গেছে। খালি ঘর, অনিতারা সব পালিয়েছে। প্রসাদের দয়ায় অন্ত কোথাও হয়তো ভাল ঘরই বেঁধেছে।

মিঃ মুখার্জি বড় আশা করে কুপারীর কাছে অনিতাদের ঠিকানা চাইলেন। সব বৃথা। মিঃ কুপারী সব কথা খুলে বলে দীর্ঘশ্বাস ফেলেন।

যার উপর অত্যাচার সেই অত্যাচারিতা অনিতার অবর্তমানে অসহায় বিচারক সবাইকে খালাস দিলেন।

প্রসাদ, যজ্ঞেশ্বর, নন্দা সবাই যুক্তকরে বিচারককে নমস্কার জানাল। নীরবে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে হাসতে হাসতে উন্মুক্ত আকাশের নীচে এসে দাঁড়ায়।

মিঃ মুখার্জি স্তব্ধভাবে দাঁড়িয়েছিলেন। ধীরে ধীরে ওঁর মন মুংগেরের এক নোংরা পল্লীর মধ্যে গিয়ে উপস্থিত হয়। অনিতার উপর নৃশংস অত্যাচারের চিহ্ন যেন ওকে বার বার ধিক্কার দিতে থাকে। অনিতার অশ্রুরুদ্ধ আকুল আহ্বান তখনও ওঁকে অস্থির করে তোলে। চারিদিক থেকে অনিতার সে আর্তনাদ তাকে স্থির থাকতে দেয় না। মনে হয় প্রসাদের কাছ থেকে মুক্তি পেয়েও অনিতা আপন জনের কাছ থেকে কিছুতেই মুক্তি পাচ্ছে না।

দ্রুত সে স্থান ত্যাগ করতে গিয়ে মিঃ মুখার্জি সহসা থমকে পড়লেন।

গুড্ মর্ণিং মিঃ মুখার্জি। আই হ্যাড গট্ মাই প্রায়েন্ট ক্লিয়ার। থ্যাংক ইউ স্যার।

মিঃ মুখার্জির মনে হল মিঃ ব্যানার্জি যেন ওঁর মুখের উপর সপাং করে চাবুক বসিয়ে দিল। তীব্র আত্মাবমাননায় মিঃ মুখার্জির মুখটা কুঁচকে গেল।

শিল্পচিন্তার নূতন যুগ

কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

দীর্ঘকাল সুপ্তিমগ্ন থাকবার পর রেনেসাঁসের শিল্পসাধনাকে অবলম্বন করে রোমক সভ্যতা পুনরায় আত্মপ্রতিষ্ঠ হয়ে নূতন আলোকে ইউরোপকে উদ্ভাসিত করে তোলে--রেনেসাঁসের শিল্প-সাধনার মধ্য দিয়ে আপন সত্তার সঙ্গে ইউরোপের নূতন করে পরিচয় ঘটে, তার জীবনের আদর্শ ও মূল্যমান পুনরায় নির্ণীত হয়।

এই দিক থেকে দেখতে গেলে রূপশিল্পকে আত্মচিন্তার অন্যতম প্রধান অবলম্বন বলে অভিহিত করা যেতে পারে। মানুষের মধ্যে যে ক্রিয়াশীলতা দেখা যায়, যে সৃজন প্রতিভা মানুষকে সভ্যতা ও আত্মোন্নতির পথে ক্রমশ এগিয়ে নিয়ে চলেছে যুগে যুগে মানুষ তার পরিচয় রেখে চলেছে শিল্পে এবং সাহিত্যে সঙ্গীতে এবং নাটকে।

মানুষের আত্মোপলব্ধির পরিচয় নিহিত হয়েছে তার সৃষ্টিতে। আবার নিজেকে চিনবার জন্য, নিজের সত্য পরিচয় অবগত হওয়ার জন্য তাকে যুগবাহিত নিজের সৃষ্টিকেই বারংবার অনুধাবন করতে হয়েছে। অনেকদিন পর হারিয়ে যাওয়া নিজের সত্তাকে খুঁজে পাওয়ার জন্য দিশাহারা ইউরোপীয় মানস প্রাচীন যুগোত্তর গ্রীক ও রোমক শিল্প সাধনার অনুধ্যানে ব্রতী হয়েছিল এবং সেই শিল্প সাধনার গভীরে আপন সত্তাকে পুনরাবিষ্কার করে আত্মস্থ হয়েছিল।

সৃজনধর্মী ভারতীয় মানস সুপ্রাচীন যুগ থেকে যে শিল্প সৃষ্টি করে এসেছে নানা বিপর্যয় সত্ত্বেও তার সঙ্গে চলিত প্রাণ প্রবাহের যোগ কখনও আজ পর্যন্ত ছিন্ন হয় নাই। এখনও অসংখ্য মন্দিরের প্রাচীরে ও গর্ভগৃহের মণিকুট্টিমে যুগবাহী শিল্পের প্রত্যক্ষ রূপটি সন্ধানীর জন্য প্রতীক্ষমান। প্রলয়কাল উত্তীর্ণ হয়ে ভারত আবার আধিকারে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে—নানা বিপর্যয়ের ভিতর দিয়ে ভারতশিল্পও আজ কালোত্তীর্ণ হয়ে বর্তমানের কূলে উপস্থিত। এখানে তাই ইউরোপের রেনেসাঁস যুগের মত ইতস্তত: অতীতকে খুঁজে ফিরতে হবে না। বর্তমানের প্রবহমানতার মধ্যেই অতীত এখনও এখানে প্রাণবন্ত। শুধু উপযুক্তভাবে চিনে নেওয়ার জন্যই তার প্রতীক্ষা।

এই প্রবহমান শিল্পকে চিনে নেওয়ার কোন উৎসাহ জনসাধারণের ছিলনা কারণ তার প্রয়োজন ছিল না। স্বতঃসিদ্ধভাবেই চলমান সমাজের প্রাণধারার সঙ্গে এই শিল্পও ছিল অঙ্গাঙ্গীভূত। বিশেষ করে এই শিল্পের মধ্যে অর্থ ও তাৎপর্য খোঁজার কোন সার্থকতা কেউ বড় একটা অনুভব করে নাই। স্বভাবের আলো-বাতাসের মতই শিল্পেও ছিল ধর্মপ্রাণ মানুষের সহজাত উত্তরাধিকার—এই শিল্পের প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ নিয়ে তার কোন দ্বিধা বা প্রশ্ন ছিল না—ভক্তির মাধ্যমে তার উপভোগের ক্ষেত্রেও কোন দৈন্য ছিল না। সাধারণ মানুষ অবশ্য যেখানে ছিল দ্বিধাহীন, সহজাত প্রবৃত্তি নিয়েই তার উপভোগ প্রবণতা ছিল পরিতৃপ্ত—পণ্ডিত মহলে দেখা দিয়েছিল তার ব্যতিক্রম। নূতন শিক্ষায় শিক্ষিত পণ্ডিত মহলের সঙ্গে সহজাত প্রবৃত্তির বিচ্যুতি ঘটায় প্রবহমান শিল্প সম্পর্কে তাদের উপভোগ প্রবণতা ক্ষীয়মান হয়ে এসেছিল। তাদের মনে নানা দ্বন্দ্ব নানা উদ্বেগ নানা প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল

দীর্ঘকালের প্রবল পৌত্তলিকতা বিরোধী মুসলমান সংস্কৃতের মধ্যেও যাঁরা স্বাধিকারে আত্মস্থ থেকে শিল্প তথা প্রতিমার মূল সংবেদনটিতে স্থির ও অচঞ্চল থাকতে পেরেছিল নূতন পাশ্চাত্য শিক্ষার আলোড়নে তাঁদের মধ্যে দেখা দিল দ্বিধা। এই দ্বিধার মূলে ছিল প্রবহমান শিল্পধারার সঙ্গে যোগের বিচ্যুতি এবং তার অর্থবোধের অভাব। ফলে উপনিষদের বাণীর মধ্যে সত্যানুসন্ধান করতে গিয়ে প্রতিমার রূপোপলব্ধিকে পৌত্তলিকতা আখ্যায় অভিহিত করতে অনেকেই দ্বিধা করে নাই। ফলে সমাজের একটা বড় অংশই শিল্পধ্যান থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে। প্রথাগত পাণ্ডিত্যের পথানুসরণ-কারীরাও শিল্পধ্যানের তত্ত্বগত অনুশীলনের আর বড় একটা উৎসাহী ছিলেন না। ফলে শিল্প চিন্তার অনুশীলনে একটা ছেদ ঘটে এবং পাণ্ডিত্যের পথে শিল্পের অনুধ্যান বিলুপ্ত হয়ে যায়।

উনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্যের দৃষ্টিতে ভারতীয় শিল্পের মূল্যায়নের সূত্রপাত হয়। পাশ্চাত্য তখন কেবল স্বকীয় শিল্প নয় প্রথাগত পাশ্চাত্য শিল্পধারার মূল্যায়নের সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপের বাইরের বৃহত্তর জগতের শিল্প সৃষ্টির দিকেও দৃষ্টি পড়ে। নিসর্গীয় ও চৈনিক শিল্পের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় শিল্পের ঐশ্বর্যও তখন জগৎ সমক্ষে উপস্থাপিত হচ্ছিল। এই মূল্যায়নে ইউরোপীয় দৃষ্টি ভারত শিল্পে শ্রেয় বা প্রেয় বড় একটা কিছু দেখতে পায় নাই এবং এসম্বন্ধে তাদের কোন বিশেষ উৎসাহও ছিল না। পরে ভারতীয় শিল্পের প্রাচুর্য ও ঐশ্বর্য যে ইউরোপীয় শিল্পসন্ধানীদের কিছু ঈর্ষান্বিত না করেছে তা নয়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে তাই এক শ্রেণীর শিল্পসন্ধানী ভারত শিল্পে গ্রীকোরোমক শিল্পের প্রভাব প্রতিষ্ঠায় বিশেষভাবে তৎপর হয়ে ওঠে। এই নূতন মূল্যায়ন তখন অনেক ভারতীয়ও বিনাবিচারে স্বীকার করে নিয়ে গ্রীকোরোমক শিল্পের আভিজাত্য ও তুলনায় ভারতশিল্পের ন্যূনতা সম্বন্ধে অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন।

এই সময়েই প্রথম ইউরোপীয় দৃষ্টিতেই ভারতশিল্পের মহনীয়তা স্বীকৃত হতে থাকে। ভিনসেন্ট স্মিথ তার স্বাভাবিক ঔপন্যাসিক মনোবৃত্তি নিয়ে ভারতশিল্পের যে মূল্যায়ন করেন প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের সামগ্রিক মূল্যায়নের মতই শিল্পের এই সামগ্রিক মূল্যায়নে প্রভূত কৃতিত্বতা লক্ষ করা হয়। এরপর কারপেন্টার ভারতীয় স্থাপত্য শিল্পের কিছু মূল্যায়ন করেন যাতে ইউরোপীয় ঔপন্যাসিকতাকে অতিক্রম করে কিছু পরিমাণে শ্রদ্ধার ভাব দেখা যায়। কিন্তু এ বিষয়ে হ্যাভেলের মূল্যায়ন বহু পরিমাণে ভারতীয় মনকে স্পর্শ করে থাকলেও সেই মূল্যায়নে উচ্ছ্বাসের প্রাবল্য অস্বীকার করা যায় না। এই মূল্যায়নের ভারতীয় শিল্প সম্পর্কে যথেষ্ট মমত্ববোধ ও উচ্চগ্রামের শ্রদ্ধা থাকলেও যে মাপ কাঠিতে হ্যাভেল তার এই পরিমাপ করেছিলেন তা মূলত ইউরোপীয় এবং ভারতীয় দৃষ্টি ও অনুভূতির দিক থেকে কৃত্রিম। এরপর স্বামী বিবেকানন্দ ভাবস্বরে ভারতীয় শিল্পের মৌলিকতা ও স্বকীয়তা প্রতিষ্ঠা করেন এবং স্বামী শিস্টা নিবেদিতা তাঁর উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাহায্যে ভারত শিল্পকে সাধারণের চোখে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। এই উৎসাহ এবং ভারত শিল্পের দিকে সভ্য মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণের মধ্যে অনেকটা ইউরোপীয় রেনেসাঁ যুগের উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়। মনে হয় ভারতশিল্পের এই নূতন আবিষ্কর্তারা সেই অবলুপ্ত শিল্পধারা থেকে নূতন জীবন চেতনা সংগ্রহ করার উৎসাহ দিতে চেয়েছিলেন। এই নূতন আন্দোলনে অনেকটা ইউরোপীয় রেনেসাঁসের মত আহ্বান ছিল নূতন উদ্দীপনা ও নূতন চেতনা সৃষ্টির।

এর পরে আনন্দকুমার স্বামী নূতন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে ভারতশিল্পের মূল্যায়নে ব্রতী হন। কুমার-

স্বামীর শিক্ষা তথা দৃষ্টি গোড়াতে ইউরোপেরই আশ্রয় পুষ্ট হয়েছিল। কিন্তু অন্বেষণ ও অনুধ্যানের দ্বারা কুমারস্বামী শেষ পর্যন্ত ভারতীয় দৃষ্টি লাভে সমর্থ হয়েছিলেন। এই নূতন দৃষ্টিতে ভারতশিল্প এক উজ্জ্বলতর রূপ নিয়ে তাঁর কাছে ধরা দিয়েছিল। এই নূতন দৃষ্টিতেই দেখা গেল ভারতশিল্পে ছেদ পড়ে নাই; এই ধারা স্বয়ংই প্রবহমান। যারা এই ধারা থেকে বিচ্যুত তারাই নানাভাবে এর মূল্যায়নের চেষ্টা করেছেন। কিন্তু এই শিল্পের উদ্ভব ও বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই তার বিচারের ধারা প্রবর্তিত হয়েছে—নির্ধারিত হয়েছে তার মূল্যমান। এই মূল্যায়নের অন্বেষণ এখনও প্রকৃত উৎসাহের সঙ্গে আরব্ধ হয় নাই। কিন্তু তার অনুশীলনে আর বিলম্ব হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। আজ তথা-কথিত পণ্ডিতমণ্ডলীর জানা উচিত যে ইউরোপীয় মূল্যায়নের মত ভারতও তার শিল্পকর্মের জন্য নিজস্ব মূল্যায়নের সৃষ্টি করেছিল। ভারতের নিজস্ব চিন্তার জগতে এই শিল্পভাবনা, শিল্পপ্রশ্ন কিছু নূতন নয়। ঋগ্বেদের যুগ থেকেই এই শিল্প-ভাবনার পরিচয় পাওয়া যায়। ক্রমে এই শিল্পচিন্তা পরিপুষ্টি লাভ করে। সমাজে শিল্পের স্থান এবং শিল্পের মধ্যে রূপশিল্পের স্থান নির্ণীত এবং নির্দিষ্ট হয়। এই-মূল্যায়ন প্রসঙ্গেই বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণ বলেন—

যথা সুমেরু প্রবরো নগানাং যথাগুজনাং গরুড়ঃ প্রধানঃ।
যথা নরাণাং প্রবরঃ ক্ষিতীশস্তথা কলানামিহ চিত্রকল্পঃ॥

এখানে বলা হচ্ছে কলাসমূহের মধ্যে চিত্রকল্প বা রূপশিল্পই প্রধান।

কাশ্মীরের শৈব-সাধক পণ্ডিত অভিনব গুপ্ত শিল্পের জগতে রসের বৈশিষ্ট্য এবং সংবেদন নিয়ে ব্যাপক আলোচনা করে শিল্পসৃষ্টি এবং শিল্পচেতনার বৈজ্ঞানিক আলোচনাকে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন। এই শিল্পভাবনার ক্ষেত্রে অভিনব গুপ্তের আদর্শ ছিলেন নাট্যশাস্ত্রকার ভরত। পরে শিল্প-বিচারের আদর্শ বহু তাত্ত্বিককে অনুপ্রাণিত করেছে। এই শিল্প বিচারের মানদণ্ড শিল্পের রসে। রসই শেষ পর্যন্ত শিল্পের উপভোগের উপকরণ—শিল্পের তাত্ত্বিক মানদণ্ড। সেই প্রাচীন উক্তি "রসো বৈ সঃ" ব্যাপকভাবে আমাদের দেশে সাহিত্যের ক্ষেত্রে মানদণ্ডের মত ব্যবহৃত হয়ে আসছে। কিন্তু রূপশিল্পের ক্ষেত্রে এই মানদণ্ড এখনও ব্যবহার হয়নি। যামিনীকান্ত সেন কিছুকাল ভারতীয় রসের মানদণ্ড নিয়ে রূপশিল্পের বিচারে ব্যবহার করেছিলেন। পরে অবনীন্দ্রনাথ তাঁর বাগেশ্বরীশিল্প বক্তৃতাবলীতে রূপশিল্পের বিচারে ভারতীয় মানদণ্ডের প্রয়োগ ও ব্যবহারের নূতন রীতির প্রবর্তন করেন।

মডার্ণ ডেকরেটরস
৬৩এ, ডব্লু. সি. ব্যানার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৬ ফোন: ৫৫-২৫৪

কান্না

সুবোধকুমার চক্রবর্তী

মামীসাহেবার বাড়ি গিয়ে সমাজের একটা নূতন রূপ দেখলুম। বুঝতে পারলুম যে আমাদের দেশে সমাজ একটা নয়, দুটোও নয়, সমাজ অনেক; এবং তাদের প্রত্যেকটির ভিন্ন রূপ। এদের একজনের সুখ দুঃখ আর একজনের সঙ্গে মেলেনা, একজনের সমস্যা আর একজনের মতো নয়। গরিবের কান্না আমরা সবাই শুনেছি, কিন্তু মামীসাহেবার কান্নার কথা কি কেউ জানতে পেরেছে!

বিমল আমার মিত্র, আর মামীসাহেবা তার নিজের মামী। কিছুদিন আগেও বিমল কর্ণার রোডে তার মামার বাড়িতে থেকে চাকরি করত। সম্প্রতি একটা মেসে এসে উঠেছে। কেন উঠে এল। সে কথা সে কোনদিন ভেঙে বলেনি।

বিমলের সঙ্গে আমি কলেজে পড়তুম। লেখা-পড়া ওর ভাল লাগতনা বলে আই-এস-সি পাশ করে, ও একটা কারখানায় ঢুকল। আর আমি স্কলারশিপ নিয়ে মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়েছিলুম। বিমল এখন নিজেকে মিস্ত্রি বলে পরিচয় দেয়। বলে, নামের পিছনে ডেগ্রি না থাকলে কি আর ইঞ্জিনিয়ার! মোড়লে আর মন্ত্রীতে যেমন তফাৎ। সরকারি গদীতে বসে মোড়লি করলেই বলে মন্ত্রী।

এ সে বিমলের একটা জোরের বিষয় তাতে আমার সন্দেহ নেই। কিন্তু এই জোরের সঙ্গে মামীসাহেবাও জড়িয়ে আছেন কিনা, তা আমার জানা নেই। নিজের চোখে মামীসাহেবার সমাজটা আমি তখনও দেখিনি।

আমার দুরবস্থার কথা বিমল কার কাছে শুনেছিল জানিনা। একদিন তিনকড়িদার বৈঠকখানায় এসে হামলা শুরু করল, বলল: তুই নাকি ডাক্তারী ছেড়ে দিয়েছিস?

সত্যি কথা স্বীকার করলুম। সেই সঙ্গে মানুষ মারার গল্পটাও বললুম তাকে। প্রথমটায় বিমল কোন উত্তর দিতে পারেনি। তারপরে সামলে নিয়ে বলল: সংস্কৃতে একটা কথা আছে না?—"শতং মারি ভবেৎ বৈদ্য।

সে সংস্কৃত আমলের কথা। আমার হাতে আর একটা মরলে আমাকে পাগলা গারদে যেতে হবে। আর আমাকে ডাক্তারী করতে বলিসনে।

বিমল আমাকে অনেক বোঝাবার চেষ্টা করেছিল। এবং শেষ পর্যন্ত অকৃতকার্য হয়ে বলল: চল তাহলে মামীসাহেবার কাছে।

মামীসাহেবার অনেক গল্প আমি তার কাছে শুনেছিলুম। তাঁকে দেখবার ইচ্ছাও যে আমার হয়নি তা নয়। কিন্তু আজ তার এই প্রস্তাবে বিস্মিত হলুম। বললুম: মামীসাহেবার কাছে কেন?

ডাক্তারী যখন করবিই না, তখন একটা কিছু তো করতে হবে। মামীমা শুনছি একটা নতুন কার্য খুলছেন।

এই মামীমার গল্পও আমি বিমলের কাছে শুনেছি। বেলগাছিয়ার এক আত্মীয়ের বাড়িতে

থেকে মাসানি করতেন। দশ বছর আগেও ছেঁড়া চটি ফটর ফটর করে বেলগাছিয়া থেকে বালিগঞ্জ যেতেন পায়ে হেঁটে। সে কথা আজ আর কারও মনে নেই। রাতারাতি এখন মামীমাহেবার সঙ্গে পার্টনারশিপে ব্যবসা চালাচ্ছেন। দক্ষিণ কলকাতায় ধনী সমাজে এখন তিনি সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত।

বছর দশেক আগে ছ বছরের ছেলে দেবাশীষ আর বছর চারেকের মেয়ে তোরাকে নিয়ে মামী-মাহেবা বরিয়া ছেড়েছিলেন। ছেলেমেয়েরা বড় হচ্ছে, অথচ কলকাতায় ভালো ইস্কুলে ভর্তি করার ভাল শিক্ষার ব্যবস্থা নেই। মামীমাহেবা তাই স্বামীকে পাওড়ির ভিটা ভরে, বাপের বাড়ির দেশ কলকাতায় ফিরে এলেন। তাঁর অভিভাবক রাজাদা।

কলকাতায় আসার পর আরও দুটি সন্তান হয়েছে মামীমাহেবার। নিজের প্রাণের চেয়েও ছেলেমেয়েরা তাঁর প্রিয়। তাদের জন্যে করতে পারেন না এমন কাজ নাকি মামীমাহেবার অভিধানে নেই। তাই যখন নিন্দুকেরা তাঁর নামে নানা রকমের নিন্দা ছড়িয়েছে, তিনি একটুও বিচলিত হননি। সবার সব কথা শুনতে গেলে ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার হয়।

শৈশবে বাপ মা হারিয়ে বিমল দিদিমার কাছে মানুষ হয়েছিল। মামাকে সে দেবতার মতো ভক্তি করে। আমিও একবার তাঁকে বিমলের মেসে দেখেছিলুম। অমন ধনী অথচ অমন মাটির মানুষ আমি আর একজনও দেখিনি। বয়স হয়ে পঞ্চাশের কাছাকাছি, কিন্তু কর্মঠ চেহারা। গায়ে খদ্দরের ধুতি পাঞ্জাবী, পায়ে বিদ্যাসাগরের চটি। হাতে একগাছা লাঠি সম্প্রতি নিয়েছেন। চশমার পুরু কাচের ভিতর তাঁর গভীর দুটি বড় অন্তর্মনস্ক দেখায়। সারাক্ষণ যেন কিছু ভাবছেন। ঘরিয়ার আশে পাশে তাঁর অনেকগুলো কারবার ধনি। মোটা মাইনের ম্যানেজারদের কাজ কর্ম তিনি নিজেই দেখেন। নিতান্ত প্রয়োজন না হলে তিনি কলকাতায় আসেন না। এলে তাদের কাছেও আসেন একবার।

সেবারে তিনি যখন এসেছিলেন, আমি তখন বিমলের ঘরে বসেছিলুম। নিজের হাতে নানা রকমের জিনিষ ঘরে এনেছিলেন। বাবরাদের চিত্তরঞ্জন সন্দেশ খেতে বিমল ভালবাসত। ক্ষীর নয়, ছানাও মনে হয় না, কিন্তু অপূর্ব খায়। আমারও খেয়ে ভাল লেগেছিল। বিমল বলেছিল: তুমি এখনও এসব মনে রেখেছ?

মামা হেসে বলেছিলেন: আমি কি আর মনে রেখেছি! এ তোর দিদিমার কাজ। বোতলে নানা রকমের আচার আছে। কিন্তু বেশি খাসনি যেন।

তারপর আমার দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন: তোর বন্ধু বুঝি?

বিমল বলেছিল: বন্ধু, কিন্তু আমার মতো মিস্ত্রি নয়। ও ডাক্তারী পড়ছে।

সত্যি নাকি।

প্রচুর খুশী হয়ে বলেছিলেন: ডাক্তারী হল পেশার মধ্যে সেরা। মানুষের সেবা করে পয়সা নাও। প্রাণ-রক্ষার চেয়ে বড় সেবা তো আর নেই।

তারপর জিজ্ঞাসা করেছিলেন: কত দিন বাকি আছে?

বলেছিলুম: আর ছ বছর।

তবে আর বেশি দেরি নেই।

তারপর বিমলের দিকে চেয়ে বলেছিলেন: তুই তো জানিস, আমাদের কোলিয়ারীতে একজনও ভাল ডাক্তার নেই। তবে তোমাদের কি আর সেখানে ভাল লাগবে?

বলে আমার দিকে তাকিয়েছিলেন।

তখন আমার বড় ডাক্তার হবার উচ্চাশা ছিল। লম্বিত বাংলোর মতো বড় সাইন। বলেছিলুম: পাশ করার পর হাসপাতালে কিছুদিন কাজ করতে হবে।

এর পরে তিনি আমাকে করিয়া যাবার জন্য অনুরোধ করেননি। তবে কথাটা মনে ছিল। তাই বিমল যখন রাঙাদার নামের উল্লেখ করল, আমি আশ্চর্য হলুম। বললুম: এতলোক থাকতে রাঙাদা আমাকে চাকরি দেবেন কেন?

আলবৎ দেবেন। আমি বললে তাঁর না বলবার সাহস হবে না।

আমি তার এই বিশ্বাসের কারণ জানিনে, তাই খুব বেশি ভরসা পেলুম না।

বিমল জিজ্ঞাসা করল: কেন বিশ্বাস হচ্ছেনা বুঝি?

বললুম: রাঙাদা তো তোর মামা নয়, যে তাগনের বন্ধু বলে আমাকে খাতির করবেন।

বিমল বলল: মামার চেয়েও বেশি খাতির করবে।

কিন্তু কেন করবেন তা বলল না।

মামীসাহেবার রাঙাদাকে বিমল রাঙামামা কেন বলেনা, সেকথা আমি জানতে চেয়েছিলুম। বিমল তখন বলেছিল: মামা বলব কেন, চোখে দূরবীন লাগিয়েও তো কোন সম্বন্ধ খুঁজে পাইনে। আর আমার মামাকে তো দেখেছিস। তাঁর পাশে—

বলে বিমল একটা তোড়ি কেটেছিল।

ফাল্গুন রোডে মামীসাহেবার বাড়িতে আমি এসেছিলুম শুধু বিমলের জোরে। পূবের জিনস থেকে তখনও অন্ধকার মোছেনি। পশ্চিমের আকাশে কিছু আলো তখনও আছে। আমরা ফটক পেরিয়ে সরাসরি দোতলার বারান্দায় এসে বসলুম। বসবার ঘর তখনও খোলা হয়নি।

আমি বললুম: বোধহয় অসময়ে এসে পড়েছি।

বিমল বলল: একটু আগে আসাই ভাল। বলা যায়না তো, আজ আড্ডা হয়তো অন্য বাড়িতে বসছে।

তার বক্তব্য বুঝতে না পেরে আমি তার মুখের দিকে তাকিয়েছিলুম।

বিমল বুঝিয়ে বলল: এক একদিন এক এক বাড়িতে আড্ডা বসে। তবে এই বাড়িতেই বেশি। শুধু মামীসাহেবা নয়, রাঙাদাও আছেন কিনা।

এই পরিবেশে আমি খুব সহজ বোধ করতে পারছিলুম না। বললুম: আমাকে দেখে মামীসাহেবা কিছু বলবেন না তো!

কী আবার বলবেন! তাঁর কাছে তো কিছু চাইতে আসিনি!

সত্যি কথা, কিছু না চাইলে অসম্মানের ভয় নেই। বাড়িতে আমরা নতুন আগন্তুক দেখলে ভয় পাই, হয়তো কিছু চাইতে এসেছে। কিংবা কোন উদ্দেশ্য নিয়ে। তাইতেই আমরা মুখ ফিরিয়ে নিই। যে কারও কাছে কিছু প্রত্যাশা করেনা, সমাজে তার দাম আছে। মনে মনে সবাই তাকে শ্রদ্ধা করে।

আমি কোন উত্তর দিলুম না দেখে বিমল বলল: তুই এত ভাবছিস কেন?

বললুম: যখন বেড়াতে আসতে চেয়েছিলুম, তখন একদিন আনলিনা। এখন চাকরির উমেদারিতে এসেছি বলেই লজ্জা হচ্ছে।

সে ভাবনা তো তোর নয় জ্যোতির্ময়। তোর সামনে আমি কাউকে কিছু বলব না। তুই নিশ্চিন্ত থাক।

তারপরে আমাকে তোলাবার জন্যে মামীসাহেবার গল্প শুরু করল। বলল: কাল নিউমার্কেটে ডালমুট কিনতে গিয়ে মামীসাহেবার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। বেশ মুষড়ে আছেন দেখলুম।

কেন?

দেবাশীষের অসুখ করেছে। সন্দেহ করছেন অ্যাপেণ্ডিসাইটিস।

সর্বনাশ: তাতে খুশী হবার কী আছে!

বিমল হেসে বলল: বাড়িতে বহু ডাক্তার যাতায়াত করছেন, অনেক বড় বান্ধব আসছেন খোঁজ নিতে। বেশ সরগরম ব্যাপার। তার ওপর—

বিমল থামতেই আমি জিজ্ঞাসা করলুম: তার ওপর কী?

ডাক্তার রায় নাকি একজন নতুন সার্জনের খোঁজ পাওয়া গেছে। বিলেত থেকে এক গাদা ডিগ্রী নিয়ে সম্প্রতি দেশে ফিরেছেন।

আমার মুখের দিকে চেয়ে বিমলের বোধহয় মায়া হল। বলল: গল্পটা তাহলে গোড়া থেকেই বলি। কবীর রোডের বাড়ি আমি বাইরেই দেখেছিলুম। আর সমস্ত খবরই পেয়েছিলুম মোকারের কাছে। তাই ডালমুটের লাইনে যাবার আগে দয়ারামের দোকানে একবার উঁকি দিয়ে গেলুম। মামীসাহেবা খান কয়েক ঝকঝকে শাড়ি কিনছিলেন।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম: কথা বললিনা কেন?

বিমল আঁৎকে উঠল: পাগল হয়েছিস! তেলকালি মাখা কারখানার মিস্ত্রিকে তিনি চিনতে পারতেন!

তারপরেই হেসে বলল: ডালমুট চিবোতে চিবোতে পিছন দিয়ে ফিরছিলুম। হঠাৎ একটা সরু গলিতে আটকে গেলুম। একি, মামীসাহেবা যে! শাড়ির রঙ মিলিয়ে মিলিয়ে ত্যাম্বিটি ব্যাগ কিনছিলেন, বললেন, একি বিমল যে! আশ্চর্য ব্যাপার! আনন্দে আমি খপ্ করে তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে ফেললুম। মামীসাহেবা বললেন, মোকার খবর জানতো? ডক্টর রায় অপারেসন করছেন। অদ্ভুত সার্জন, বিলেত থেকে এক গাদা ডিগ্রী নিয়ে সম্প্রতি দেশে ফিরেছেন।

ভয়ে ভয়ে আমি জিজ্ঞাসা করলুম: খুব সিরীয়স কেস নাকি?

ক্ষেপেছিস তুই! এ সব অসুখের আলোচনা কি যেখানে সেখানে করতে পারি!

ব্যাগের দাম চুকিয়ে দিয়ে মামীসাহেবা চটির খোঁজে গেলেন, আমিও পালিয়ে বাঁচলুম।

বিমলের কথায় আমার আশ্চর্যের সীমা ছিল না। দেবাশীষের অসুখের সম্বন্ধে তার এতটুকু কৌতূহল নেই। আমি চারিদিকে একবার চেয়ে দেখলুম। কাউকে দেখতে পাচ্ছি না, কোন সাড়া শব্দও শুনতে পাচ্ছি না। জিজ্ঞাসা করলুম: বাড়িতে কি কেউ নেই?

কে থাকবে এখন?

দেবাশীষ আজ্ঞা দিতে গেছে, আর মেয়েরা গেছে বেড়াতে।

মামীসাহেবা?

বিমল আঙুল দিয়ে তিন তলাটা দেখিয়ে দিল। বলল: স্নান সেরে বেরবার সময় হয়েছে।

ঠিক এই সময়ে একটা সুসন্ধ এসে নাকে লাগল। আর একজন উদিপরা বেয়ারা যেন সেই সৌরভকে অনুসরণ করে তরতর করে নেমে এল।

আমি বিমলের দিকে তাকিয়েছিলুম। বিমল বলল: মাখীসাহেবা এবার ঘর থেকে বেরলেন।

এখনি নামবেন বুঝি?

প্রণাম হোক।

যে লোকটা নেমে এসেছিল, সে আমাদের দিকে ভ্রূক্ষেপ করল না। বসবার ঘরের দরজা খুলে জমাদারকে ডাকল। সোফা কোচের চাকনাগুলো সরিয়ে গুটিয়ে রাখল।

বিমল বলল: ঘর পরিষ্কার হবে, কুকুরে হয়তো নোংরা করে রেখেছে।

এ সবে আমার মন ছিল না। আমি দেবাশীষের কথা ভাবছিলুম। বললুম: অসুখ নিয়ে ছেলেটা আড্ডা দিতে গেছে?

বিমল বলল: পরীক্ষার আগে ওদের এই রকমের অসুখ করে। কিছুদিন আগে ডোরারও কী একটা হয়েছিল। তার জন্যে স্কুল থেকে ওকে তাড়িয়ে দেয়। সেও ঠিক এমনি ঘটনা। মাখীসাহেবাকে মুভে দেখেছিলুম নিউ মার্কেটে। শাড়ি কিনছিলেন, বললেন, ডোরার কথা শুনেছ তো! সহজে ওদের ছেড়ে দিচ্ছিনে। মিষ্টার বাসুকে চেন? গ্রেজ ইন থেকে ব্যারিস্টার হয়ে ফিরেছেন। তিনিই ব্রিফ নিচ্ছেন।

সর্বনাশ!

সর্বনাশ আর কী! লোয়ার কোর্টের অপদার্থ উকিলেরা মামলাই দাঁড় করাতে পারল না।

বলে বিমল হাসতে লাগল।

এই সময় দরওয়ানকে দেখা গেল সিঁড়ির উপর। একটা বিরাট আলসেসিয়ান কুকুর তাকে টেনে আনছে। ঘর্মাক্ত কলেবরে লোকটা যেন যুদ্ধ করছে। কুকুরটা এক পা-ও তাকে স্থির হতে দিচ্ছে না।

বিমল বলল: আর এগোসনে বাবা, ঐখেনেই থাক।

কিন্তু ভয়ে আমি চেয়ার ছেড়ে পিছিয়ে গেলুম।

বিমল উঠে দাঁড়াল, বলল: মাখীসাহেবা নামছেন।

সিঁড়ির উপরেই আমি তাঁকে দেখতে পেলুম। চকচকে কাঁচা হলুদ রঙের শাড়ি পরেছেন, গায়ে একই রঙের জামা। পায়ে হলদে চটি, সোনালি কাজ করা ভ্যানিটি ব্যাগ ঝিতে দিতে কাঁধ থেকে ঝুলছে। আমি এক নজরে তাঁর অলঙ্কারও দেখে নিলুম। কানে একটা করে মুক্তো, গলায় মুক্তোর মালা; হাতে এক গাছা করে চুড়ি, তাও মুক্তোর। বাঁ হাতের আঙুলেও একটা মুক্তোর আংটি। তাঁর বয়স অনুমান করতে আমি পারলুম না, কিন্তু এটুকু বুঝলুম যে মেদের আধিক্য যদি তাঁর দেহটাকে বিব্রত না করত, তাহলে তাঁর এই বয়সেও ছুড়ি মেলা ভার হত।

বিমল কিছু বলবার আগেই কুকুরটা তাঁর উপর লাফিয়ে পড়ল। মাখীসাহেবা ভয় পেলেন না, শুধু নিজের বাম হাতটা শূন্যে তুলে ধরলেন। দেখলুম, তাঁর সেই হাতে বেড়ালের বাচ্চার মতো আর একটা কুকুর নিশ্চিন্ত নিরাপদে মিটমিট করে চাইছে।

কুকুর বাঁচিয়ে বিমল তার পা ছুঁয়ে প্রণাম করে বলল: আজ আমার বন্ধু জ্যোতির্ময়কে সঙ্গে এনেছি।

ছুরন্ত কুকুর বাধা দিয়ে তাঁর আঁচলটা নামিয়ে ফেলেছিল। সেটি সামলে নিয়ে বললেন: তোমার কারবারটা বন্ধ বুঝি!

বিমল প্রতিবাদ করবার সুযোগ পেল না। মাসীমাদের হাত জোড় করে আমার নমস্কারের উত্তর দিয়ে বললেন: তোমরা একটু ব'সো বিমল, আমি ডক্টর রায়ের কাছ থেকে চট করে ঘুরে আসছি।

বলতে বলতেই তিনি নেমে গেলেন। আলসেসিয়ান কুকুরটাও গেল তাঁর সঙ্গে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আমি বিমলকে বললুম: চল এবারে।

কিন্তু বিমল আবার বসে পড়ল: আমাদের কাজ তো রাঙাদার সঙ্গে।

কেন জানি না, রাঙাদাকেও একবার দেখবার বাসনা আমার ছিল। আমিও বসে পড়লুম।

দিনের আলো নিবে গিয়েছিল অনেকক্ষণ আগে। সন্ধ্যার অন্ধকারে আকাশ আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। ঘরের ও বারান্দার সমস্ত বাতি জ্বালিয়ে দিয়ে বেয়ারা নেমে গেছে।

এক ভদ্রলোককে দেখলুম চোরের মত অতি সন্তর্পণে এসে পাশের ঘরে ঢুকলেন। কোনদিকে চাইলেন না, কারও খোঁজ করলেন না। বিমল তাঁর দিকে পিছন ফিরে বসেছিল বলে দেখতে পেল না।

খানিকক্ষণ পরে মেয়েরা কিরল কলরব করে। ডোরাকে দেখলুম সকলের আগে। ফর্সা তন্বী মেয়ে। বছর চোদ্দ বয়স। ফ্রকের উপর বেণী দুলছে, শাড়ি পরলেই যেন শোভন হত। ছোট বোন দুটির সঙ্গে তর্ক করতে করতে উপরে এল।

ওমা, বিমলদা যে!

বলে ডোরা এগিয়ে এল, বলল: ভালই হল, উত্তরটা তাহলে তোমার কাছেই পাব।

একটি ছোট মেয়ে জিজ্ঞাসা করল: বল তো, কার মা আকোলার এক বাইজী?

বিমল তৎপর ভাবে উত্তর দিল। কেন, সেই মেয়ের!

মেয়েরা উদ্দামভাবে হেসে উঠল। ডোরা বলল: এই না হলে বিমলদা।

আর একটি মেয়ে বলল: মাষ্টার মশাই আসেনি! তাকেই ধরা যাক।

বলে পাশের ঘরটায় সবাই ঢুকে গেল।

বিমল বলল: সিনেমা হাউস নিয়ে এখন গবেষণা হবে। ঠিক মতো উত্তর দিতে না পারলে ভদ্রলোকের অন্ন উঠে যাবে।

আমার আর ভাল লাগছিল না। বললুম: রাঙাদা কখন আসবেন?

তার কি ঠিক আছে! দু'একজন নতুন মানুষ সংগ্রহ হলেই চলে আসবেন।

তারপরেই জিজ্ঞাসা করল: মামীমার মামীসাহেবা নাম কেমন করে চালু হয়, সে গল্প কি তোকে বলেছি?

বললুম: না।

বিমল বলল: সে এক আলুওয়ালার কাণ্ড।

সেকি!

বিমল আমার ভুল বুঝতে পেরে বলল: আলুর কারবারী নয়, নাম আলুওয়ালা, বা ঐ রকমের একটা কিছু। গভর্ণমেণ্টের বড় চাকরে। কোন্ দেশের মানুষ তা জানিনে, তবে এক বাঙালী মহিলাকে বিয়ে করে বাঙালী বাড়িতে আড্ডা দিয়ে বেড়াতেন। কথাবার্তা কিছু বুঝতে পারতেন কিনা তিনিই

জানেন, তবে মাঝে মাঝে অকারণে হাসতেন। তিনিই এই নাম দিয়েছিলেন। ছেলেমেয়েরা সাহেবি কায়দায় 'মামি' বলত, আমি বলতুম মামীমা, ভদ্রলোক মামীসাহেবা বলতে লাগলেন, বোধহয় ভাবলো, এ একটা সম্মানের ডাক হল।

আমি হাসতে পারলুম না। নিচে মোটর আসার শব্দ পেলুম। তারপরেই সিঁড়ির উপর অনেকগুলো পায়ের শব্দ। মামীমা প্রথম দলের সঙ্গেই এলেন।

আমরা উঠে দাঁড়িয়েছিলুম। তিনি বললেন : তোমরা বাইরে কেন বিমল, ভেতরে এস।

বলে সবাই বসবার ঘরে ঢুকলেন :

একে একে অনেকের সঙ্গে পরিচয় হল। সস্ত্রীক মিষ্টার চৌধুরী ব্যারিস্টার, কুমার সাহেব রাজা প্রসাদ মিত্রের নাতি, মিসেস মৈত্র—সলিসিটার মিষ্টার মৈত্রের আজ একটা জরুরী কাজ আছে। ইত্যাদি।

নিজেদের সুবিধার জন্য আমরা দেওয়ালের ধারে একটা ডিভানের উপর বসেছিলুম। দুজন মহিলার সঙ্গে যে ভদ্রলোক এলেন, তাঁকে দেখতে পেয়েই বিমল আমাকে একটা চিমটি কাটল, বলল : রাঙামা।

ভদ্রলোক পুরোদস্তুর সাহেব, বয়স পঞ্চাশের নিচেই মনে হয়। মা হাতে ঠোঁটের পাইপটা নামিয়ে সকলকে অভিবাদন করলেন। আর ডিভানে বিমলকে দেখে একটা চোখ ছোট করে খুশী হবার ভাব দেখালেন।

আমি মামীসাহেবার দিকে তাকিয়ে তাঁর পরিবর্তনটা লক্ষ্য করলুম। তিনি গম্ভীর ভাবে প্রশ্ন করলেন : মিষ্টার সিকদার এলো না ?

উত্তরটা মিসেস সিকদার দিলেন না, দিল তাঁর মেয়ে : বাবার আজ একটা দরকারি ডিনার আছে।

বিমল এদের দেখে খুব খুশী হয়েছিল। চুপি চুপি আমাকে বলল : ঐ মেয়েটার নাম বাণী। ওকে নিয়ে একটু গোলমাল বেধেছে।

আমি পাশ ফিরে তার দিকে তাকাতেই সে বলল : পরে বলব।

বাণী তার মায়ের কাছে বসল না। বসল ঘরের এ ধারটায়, আমাদেরই কাছাকাছি। তারপর বিমলকে বলল : শুনলুম, তুমি আজকাল ভারি কাজের লোক হয়েছ, এদিকে আসবার সময়ই পাওনা।

বিমল উত্তর না দিয়ে শুধু হাসল।

বাণী জিজ্ঞাসা করল : আজকাল নাকি একটা মেসে আছ ? ঠিকানাটাও আমাদের দিলে না !

আমি দেখতে পেয়েছিলুম যে রাঙামা এই কথোপকথনের দিকে কান রেখেছিলেন। বিমল বলল : সে একটা বিশ্রী জায়গা বলেই ঠিকানা দিতে লজ্জা পাই।

তাহলে অমন জায়গায় গেলে কেন ?

বিমল হেসে বলল : স্বাধীনতা হতে।

ঠিক এই সময়ে দরজায় একটা কলরব উঠল : আরে নকুলদা যে, আসুন আসুন, অনেকদিন পরে এদিকে এলেন।

বন্ধুদের ধুতি পাঞ্জাবী পরা এই ভদ্রলোককে দেখলুম সকলেই চেনেন। বিমলের দিকে তাকাতেই সে বলল : বাগবাজারের নকুলদা। আড়ালে অনেকে নারদ বলে।

নকুলদা বললেন : কিছু খবরাখবর দেওয়া নেওয়া থাকলেই আমি আসি।

কুমার সাহেব বললেন : সে তো জানি, কিন্তু আজ খবর দেবার জন্যে, না নেবার জন্যে ?

দুই কাজেই।

বলে নকুলদা একটা ছোট চেয়ারে বসলো।

মালীসাহেবার দিকে তাকিয়ে আমার বড় অস্বস্তি হচ্ছিল। আলসেসিয়ান কুকুরটা ওঁকে এক মিনিট স্থির হয়ে বসতে দিচ্ছিল না। ওঁচলটা বারেবারেই টেনে নামাচ্ছিল। তার লোভী হাতের ছোট কুকুরটার উপর। মাঝে মাঝে যখন তার লম্বা জিভ দিয়ে মালীসাহেবার হাত চেটে দিচ্ছিল, তখন আমার গা ঘিন ঘিন করে উঠছিল। বিমলকে আমি আস্তে আস্তে বললুম : এবারে ওঠা যাক।

বিমল আমার পায়ে একটা চাপ দিয়ে বসে থাকতে বলল।

নকুলদা তাঁর খবরের জন্যে সবাই উদগ্রীব হয়েছেন দেখে বললেন : দেবাশীষের খবরটা আগে জেনে নিই।

কুকুরের জোয়াল্লো মালীসাহেবা সোফা থেকে কার্পেটের উপর গড়িয়ে পড়েছিলেন। কোন রকমে শাড়িটা সামলে উঠে বসে বললেন : ডক্টর রায় অপারেসন করবেন।

নকুলদা বললেন : কোন্ রায় ? আমাদের ডক্টরস্ রশ'য়ের নাতি ?

তর্কচঞ্চু মহাশয়কে কেউ চেনেন না। কিন্তু নকুলদা তাঁর পিতৃমাতৃকুলের সম্পূর্ণ হিসাব দিয়ে বললেন : কাল তো তাঁর প্রায়শ্চিত্তের খাওয়া খেয়ে এলাম।

দু একজনে আর্তনাদ করে উঠলেন : কিসের প্রায়শ্চিত্ত ?

নকুলদা বললেন : অনেকদিন বিলেতে ছিল। প্রায়শ্চিত্ত না করলে ঠাকুর্দা বিয়ে দেবেন কেন !

মামীসাহেবা বিহ্বল ভাবে বললেন : ডক্টর রায়ের বিয়ে নাকি ?

নকুলদা এক গাল হেসে বললেন : তাটপাড়ার মেয়ে।

একজন বেয়ারা কফি এনেছিল। আর খাবার এনেছিল আর একজন। নকুলদাই প্রথমে একখানা প্যাটি তুলে নিয়ে বললেন : মেয়েদের আগে দেখাও।

বিমল বোধহয় রাঙাদাকে ইশারায় কিছু বলেছিল। আমাকে বলতে বলে বাহিরে গেল। রাঙাদাও আর এক দরজা দিয়ে বাহিরে গেলেন। আমি তাদের লক্ষ্য করছিলুম। মিনিট কয়েক পরে তাঁরা ফিরে এসে নিজের নিজের জায়গায় বসলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলুম : এখানে উঠব তো ?

বিমল বলল : অত তাড়া কিসের ! কফিটা খেয়ে যাই।

মিসেস সিকদার তাঁর উল পুলে বসেছিলেন। বললেন : ডক্টর রায়ের উপর আমার কোনদিন ভক্তি হয়নি। ভদ্রলোকের ব্যক্তিত্বের অভাব আছে বলে আমার মনে হয়েছে।

মামীসাহেবাকে বড় গম্ভীর দেখাচ্ছিল।

আমরা বেশিক্ষণ বসিনি। কফির পেয়ালা নামিয়েই বিমল উঠে দাঁড়িয়েছিল। মামীসাহেবার অনুমতি নিয়ে আমরা বেরিয়ে এসেছিলুম।

পথে নেমেই বিমল বলল : অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার এলেই খাইয়ে দিবি।

মানে ?

মানে, রাঙাদার চরকাচক্রে তোমার চাকরি হচ্ছে, কেরানীর চাকরি নয়, অফিসার। একটা প্যাচ দিয়ে দিয়েছি। কয়েকমাস নিশ্চিন্ত।

আমি আশ্চর্য হয়ে তার মুখের দিকে তাকালুম।

বিমল বলল : রাঙাদার বিয়ে করবার শখ হয়েছে। ভয় পাচ্ছেন মামীসাহেবাকে, আর বাণী এখনও রাজী হয়নি, বয়সের অনেক তফাৎ। চরকাচক্রে রাঙাদার নিজের কার্ম, নিজের পায়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করছেন।

জিজ্ঞাসা করলুম : তাহলে প্যাচটা কোথায় দিলি ?

বিমল হেসে বলল : আমি জানি তুই বুঝতে পারিসনি। বাণী যখন আমার কাছে এসে কথা কইছিল, তখন তুই রাঙাদার মুখের চেহারা দেখিসনিতো ! বারান্দায় ডেকে সেই কথাই বললুম। তোকে একটা ভাল কাজ দিলে বাণীকে আমি রাজী করিয়ে দেব। মানে, আমি সরে দাঁড়ালেই যে সে রাজী হবে, রাঙাদা একথা বিশ্বাস করেন। তিনি তোর নাম ঠিকানা নোট বুকে লিখে নিয়েছেন। দু একদিনের মধ্যে চিঠি পাবি।

চিঠি ঠিকই পেয়েছিলুম কিন্তু তার পরে জেনেছিলুম আরও অনেক কথা।

সন্ধ্যাবেলায় বিমলের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে তার মেসে অপেক্ষা করছিলুম। এমন সময়

নকুলদা এসে উপস্থিত। বিমল বেড়াতে বেরিয়েছে শুনে তাঁর চটিখুলে বিমলের খাটের উপর উঠে বসলেন।

বেসের চাকরকে ডেকে আমি নারকেলের কুচি যেখানো মুড়ি আনিয়ে দিলুম, আর চা। তাই খেতে খেতে বললেন: দরকারটা ঠিক বিমলের কাছে নয়, দরকার তার মামার কাছে কল্যাণীর। বিমলের কাছে একখানা চিঠি পেলে এক পরিবের গু মুঠো অন্ন জুটবে।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম: তা মামীমাহেবার কাছে চিঠি নিলেন না কেন?

তার উপায় নেই।

কেন?

বড়লোকের ছবিকে পরোপকারের প্রসঙ্গ তুললে নিজের যাতায়াতের পথই বন্ধ হবে। আর মামীমাহেবার চিঠিতে কি কাজ হবে।

আমার বিস্ময় আরও বাড়ল।

নকুলদা একবার দরজার দিকে চেয়ে বললেন: ভেতরের খবরতো আপনি জানেন না। বড় গোলমাল চলছে। বিমলের মামার চেয়ে মামীমাহেবা অনেক ছোট, আর বিয়েটাও তাঁকে স্নেহার করেননি। রাঙাদার কিছু মাত্র সম্পত্তি থাকলে তিনি তাঁরই ঘরণী হতেন। স্বামীর সঙ্গে এখন শুধু তাঁর পরনার সবজ মনের সবজ রঙ বছর আগেই চুকে গেছে।

আমি স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলুম।

নকুলদা বললেন: দিন কয়েক আগে মামীমাহেবাকে হাসপাতালে আনা হয়েছিল।

কেন?

ঘুমের ওষুধ একটু বেশি খেয়ে ফেলেছিলেন। হাসপাতালে তাঁকে দেখতে গিয়ে আমি তাঁর চোখে জল দেখে এসেছি।

একটু নিঃশ্বাসে জিজ্ঞাসা করলেন: রাঙাদার বিয়ের বরযাত্রী যাবেন তো?

আমি তো নিমন্ত্রণ পাইনি।

পাবেন। রাঙাদার নতুন ফ্ল্যাট থেকে আমরা যাত্রা করব।

এ কথাও আমার কাছে নতুন। শুধু পুরনো মনে হয় একটি কথা। মামীমাহেবার চোখে নকুলদা জল দেখে এসেছেন। সে জল কি সহজে শুকোবে! হয়তো আবার একদিন ঘুমের ওষুধ বেশি করে খেয়ে ফেলবেন। এখন যে ঘুমেরই দরকার।

নকুলদার চোখের দিকে তাকিয়ে মনে হল, তাঁর চোখও একটু ভিজে ভিজে।

যৌবন

নীলিমা দাশগুপ্ত

"তোকে ডাকতে ক'টা ঘাসী-বাঁদী রাখতে হবে শুনি—?" দিদির এ কণ্ঠস্বরের সঙ্গে, হাসির পরিচয় নেই। এক ঝটকায় উঠে বসলো হাসি। কোলা কোলা ঘুম-চোখ মেলে তাকালো দিদির দিকে। দিদির গম্ভীর মুখ, শক্ত চিবুক যেন কেমন অচেনা ঠেকলো ওর। মান হয়ে গেছে দিদির, কী করে যে দিদিটা প্রাণ সারে মুখ ধোবার সঙ্গে কে জানে! চোখ বুজলে, ক্ষিপ্রহাতে, এদিক-সেদিক টানাটানি করে, ফ্রকের প্রান্ত হাঁটুর নিচে হাসি টেনে দিলো।—আজ তো রবিবার—, হাসি মুখ তুললো, কিন্তু কথাটা হাসির ঠোঁটের সামনে এসে ঝুলে রইলো, দিদির চোখে বিরক্তির গাঢ় প্রলেপ দেখে। তবু, দুষী মুখেই নামলো সে বিছানা থেকে। গত সন্ধ্যার আনন্দ এখনো জড়িয়ে আছে ওকে। দিদির দিকে তাকালো না আর।

ঘর থেকে বেরিয়ে, বারান্দায় দাঁড়িয়ে, পেছনে হাত দুটো টান করে আড়মোড়া ভেঙে নিয়ে, সোজা বাথরুমে গিয়ে ঢুকলো হাসি। বাথরুম মানে, ছেঁচা বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘেরা, আড়ে পাশে সাড়ে চার হাত আয়না।

দেড়খানি ঘর, এক চিলতে বারান্দা, একটি রান্নার খুপরি, এই বাথরুম আর সামনে উঠোন নিয়ে হাসিদের সংসার। হাসি, ওর দিদি খুশি, ছোটো ভাই আনন্দ আর ওদের রুগ্ন মা প্রভাবতী। বাড়ির চারদিকে পাঁচিল আছে, সেজন্ত ওরা খুব কৃতজ্ঞ বাড়িওয়ালার প্রতি।

জ্যোৎস্না রাত্রে, উঠোনে মাদুর বিছিয়ে ব'সে, ওরা চারজন 'তেওথা'র সোনামাখা-উদার আকাশটাকে খুঁজে পায়। পদ্মার পাশেই ছিলো ওদের বাড়ি। কালীঘাটারের বাড়ি, একডাকে সকলে চিনতো।

কালীপ্রসাদ, পাকিস্থান ছেড়ে, কলকাতায় এসে টিঁকেছিলেন মাত্র বছর দুই। নর্থ-ব্রাবর্ণে-ডাক্তার এই দেড়খানা ঘরে এসে উঠেছিলেন। স্থির, অচঞ্চল কম কথার মানুষ কালীপ্রসাদ, কেমন যেন চঞ্চল হয়ে পড়তেন পূর্ণিমার রাত্রিগুলিতে। অসুস্থ শরীরটাকে টেনে এনে, উঠোনে মাদুর বিছিয়ে, বসে থাকতেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা। নিজের দুর্বহ অস্তিত্বের বোঝা বিস্মৃত হতে চাইতেন আকাশের অঢেল আলোর দিকে তাকিয়ে। ছেলেমেয়েদের ডাকাডাকি করে কাছে এনে বলতেন,—দেখ, দেখ, ঠিক যেন আমাদের 'তেওথা'র আকাশখানা। হাসিদের তখন, 'তেওথা'র আকাশ বলে মনে হতোনা আকাশটাকে। কিন্তু, এখন হয়।…

দশ বছরে, মনের সঙ্গে সঙ্গে পিটে নিয়েছে আকাশটাকেও।

মুখ ধুয়ে রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকলো হাসি।

হোক সামান্ত, চারবেলার খাওয়া বজায় রেখেছে দিদি। পঁয়ত্রিশ টাকা বাড়িভাড়া দিয়ে, চারজনের খাওয়া পরা আর ছোটো ভাইবোনের স্কুলের মাইনা যোগাতে, দুবেলা দিদিকে ট্যুশানিও করতে হয়। চাকরীর টাকাতে হয়না।

খুশি রায়, ম্যাট্রিকে ঢাকা জেলায়, ছেলেমেয়েদের মধ্যে তৃতীয় স্থান অধিকার করেছিলো যে, বি. এ, তেও দশজনের একজন হয়েছিলো, তার এম. এ. পড়া হলো না। বাবার পুঁজি, মায়ের সঞ্চিত গোনাদানা, সব শেষ হয়ে, তখন মা'র একখেলা খাওয়া ঘরে টান দিয়েছে। চোখে পড়তেই, দ্রুত সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেলো খুশি রায়।—আর পড়া নয়, চাকরী করবো—। সেই সংকল্প থেকে একচুল নড়ানো গেলোনা দিদিকে, অটল রইলো। এমনকি, সমীরণদা, দিদির এত বড় হিতৈষী মা ছাড়া আর কেউ নেই, তার কথাও শুনলোনা শেষ পর্যন্ত।…

হাসি, কেটলি থেকে ছোটো একটা সসপ্যানে এক কাপ মতো চা ঢেলে উনুনে বসালো। চিনি দুধ মেশানোই থাকে। শুধু গরম করে নিলেই হয়। সকালের ব্যস্ততায়, বারে বারে চা করার সময় মেলেনা প্রভাবতীর। ভোরেই পুরো এক কেটলি চা বানিয়ে রাখেন। ঐ চা গরম করে করে বার পাঁচেক খান দুপুর পর্যন্ত। চায়ের তাপ দিয়ে দিয়ে স্নায়ুগুলোকে দখলে রাখেন। হাসি, চা গরম করে, পেয়ালায় ঢেলে, তাকের বাঁদিকের একটা টিন খুললো। বাদামটি বার করলো একটা। টিনের ঢাকনা এঁটে উবু হয়ে বসলো চায়ের পেয়ালা'র সামনে। চায়ে রুটি ভিজিয়ে, এক কামড় দিয়েই আবার উঠে পড়লো। তাকের টিনগুলোর ঢাকনা খুলে খুলে কী যেন খুঁজতে লাগলো।

"কী খুঁজছিস?" প্রভাবতী পেছনে এসে দাঁড়িয়েছেন।

"কাল সমীরণদা যে কেকটা দিয়েছিলেন, তার তো অর্ধেকটাই রয়ে গেছে।—" চায়ের টিন থেকে, প্রভাবতী কেকের বাক্সটা টেনে বার করবার আগেই, ঘর থেকে কাটা কাটা শব্দ ভেসে এলো, "মা, কেক খরচ করোনা। রবিবার আজ, কেউ না কেউ আসতে পারে—" প্রভাবতী সঙ্গে সঙ্গে হাত সরিয়ে আনলেন। হাসি ইসারায় এক স্লাইস কেটে দিতে বললো, কিন্তু অত সাহস প্রভাবতীর নেই। খুব আস্তে বললেন, "বিকেলে দেবো।"

হাসি বিনা আপত্তিতে চাটুকু খেয়ে বেরিয়ে এলো রান্নাঘর থেকে। নিজেকে একবার দেখবে বলে, ছোটো ঘরে, দেয়ালে ঝোলানো, পারাওঠা ঘোলাটে আয়নার সামনে এসে হাসি দাঁড়ালো। এপিয়ে, পিছিয়ে, ঘাড় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলো একটু। শাড়ির ব্যবধানে হাসিকে কাল চেনা যায়নি। নিজেকে নিজেই হাসি চিনতে পারেনি। কাল বিকেলে খুব সুন্দর দেখাচ্ছিলো হাসিকে। খুব সুন্দর। আজকেও হাসি শাড়ি পরবে বিকেলে। কী সুন্দর আকাশী রঙের শাড়িটা কিনে দিয়েছে দিদি। কাল, পাশের ভাড়াটে-বাড়ির বাদল আর সামনের লালকুঠির মন্টু, বারে বারে কানের কাছে মুখ নিয়ে বলেছে,—কী সুন্দর তোকে দেখাচ্ছে হাসি!…

হাসি বেরিয়ে, আবার রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকলো। কোথায় রাখা বড় বালতিটা শক্ত হাতে ধরে, পেছনের পুকুরে নিয়ে চললো। এখনো বালতির গা বেশ গরম। মা নিশ্চয়ই সকালেও আবার ফুটিয়েছেন কাপড়গুলো। ঠাস্-বোঝাই কাপড় বালতিটাতে। বালতি নামিয়ে রেখে, জোরে হাসি শ্বাস নিলো। একটু এগিয়ে, পুকুরের ঘাটলার সামনে এসে দাঁড়ালো। সবে ওঠা মিষ্টি রোদের আদেজ বুকে নিয়ে, আহ্লাদী-হাসি হাসছে পুকুরটা। পুকুরের আহ্লাদী চেহারাটার দিকে তাকিয়ে থাকলো হাসি। একটু একটু ঢেউ। লাল শালুকের মাথার ঢেউগুলো স্থির স্থির করে কাঁপছে। ফড়িং বসছে, উড়ছে আর বসছে। পাশের কটকটে খেজুর গাছের পাতাগুলো হাওয়ায় একটু একটু কাঁপছে। লালচে-নীল কচুপাতার তলা থেকে একটা ব্যাঙ্ বেরিয়েই, খেজুর গাছের গুঁড়ির ওপর একটু যেন লাফ

মেয়ে, ওপাশে জামরুল গাছের আড়ালে লুকালো, মজা লাগলো হাসির। একটু সুখ-সুখ শীত শীত ভাব পুকুরটার চারদিকে। হাসি লাফিয়ে ঝুঁকে ঘাটলার পাশের ছোটো বড় পাথরকুচি ক'টা হাতে তুলে নিলো। তারপরই, হাসির হাতের পাথরকুচি টুপটুপিয়ে পড়তে লাগলো পুকুরে। জামরুলের তীক্ষ্ণ ছায়া আরো কেঁপে কেঁপে উঠলো। সেই কাঁপা নরম ছায়ার পাশ দিয়েই এক ঝাঁক মৌরলা মাছকে ছুটতে দেখলো হাসি। আর সেই মুহূর্তে আকাশের কোল বেয়ে নেমে এলো একটা মাছরাঙা পাখি। আপন মনে, হাসি হেসে ফেলে চোখ ফিরিয়ে নিলো। পিছিয়ে এলো বালতির কাছে। দেখে দেখে দিদির জামা-কাপড়গুলো বার করতে লাগলো আগে। শেষের দিকে, তেমন পরিষ্কার হয়না কাপড়গুলো। মন মানে না হাসির।

"কিরে হাসি! তোর কী অত্তীর সঙ্গে কমিশনের বন্দোবস্ত নাকি?"

জামরুলে কাদড় বসিয়ে, পাশে এসে দাঁড়ালো বাদল, "নে, জামরুল খা—" তারা বসালো বড় বড় চারটে জামরুল আনকোরা ডোরাকাটা প্যান্টের পকেট থেকে বার করে বাদল বাড়িয়ে ধরলে।

"তোর কাছেই থাক এখন, আগে কাপড় ক'টা কেচেনি—"

"কাপড় ক'-টা—!" আকাশ থেকে পড়ার মতো চোখ করলো বাদল।

হাসি জবাব দিলোনা। কাপড় কাচা শুরু করলো। মুহূর্ত দুই চুপচাপ তাকিয়ে দেখলো বাদল। মাটে হাতা গুটোতে গুটোতে বললো, "রাখ্, খুপুস···খুপুস, ঢের কষ্টা বোঝা গেছে···,কাপড় কাচা কাকে বলে দেখিয়ে দিচ্ছি, এই কাপড় কাচতে আধঘেন্টা কাবার হবে তোর—"হাসির হাত থেকে কাপড় ছিনিয়ে নিয়ে, প্রায় যোদ্ধার ভঙ্গিতে বাদল পুকুরঘাটে কাপড় আছড়াতে লাগলো, ঘাপাস্···ঘপাস্···।

হাসি এক ঝলক হাসলো, "আহাগো, কী কথাই বললেন, যেন প্রতি রবিবার আমার সব কাপড় কেচে দেন উনি—"

খুশির শাড়ি, ব্লাউজ, পেটিকোট শেষ করে, একটা বিছানার চাদর আছড়াচ্ছে বাদল, "যাই বলো হাসি, খুশিদি ভারি স্বার্থপর। একফোঁটা ছোটো বোনকে দিয়ে রাজ্যের কাপড় কাচানো, নিজের শাড়ি জামাটাও তো নিজে কাচতে পারেন···"

"দিদি স্বার্থপর—" ঘুরিয়ে এলো হাসি, আমার দিদির মতো প্রাণ দিয়ে এমন দায়িত্ব পালন কজনার দিদি করে রে?—"চাইনে তোদের জামরুল,—দাও আমার চাদর দাও—"

হাসির হাতশুদ্ধ চাদরটা শক্ত মুঠি করে ধরে ফেললো বাদল, সোজা হয়ে দাঁড়ালো, হাসির প্রতিবাদকে তাচ্ছিল্য করে, হাতের মুঠিতে জোর দিলো আরো,

"তুই একফোঁটা মেয়ে, পারবি আমার সঙ্গে—"

হাতটা ছিনিয়ে নিতে পারছেনা হাসি. ছটফটিয়ে ফোঁস্ ফোঁস্ করে রাগি বেড়ালের মতো শ্বাস ফেলতে লাগলো। "আমি একফোঁটা মেয়ে, দুবছর পরে, যখন কলেজে পড়বো, দেখিস ভুল পাবিনা আপনি বলেও—"

হাত ছেড়ে দিয়ে, হো-হো করে বাদলের হাসি, "আর আমি যেন কলেজে পড়বোনা তখন—

প্যান্টের পেছনে হাতটা রুটু করে মুছে, বাদল জামদল চারটে বার করলো, "নে, রাস করে জামরুল খেতে থাক, দেখিস, ততক্ষণে আমার সব কাপড় ধোয়া ফিনিশ্…এই পকেট ভর্তি কী আছে বলতো, পেয়ারা, কাঁচা পেয়ারা—" প্যান্টের বাঁ-পকেটে জোরে একটা থাবড়া মেরে দেখিয়ে, আপোসের হাসি হাসলো বাদল।

হাসির রাগ ঠাণ্ডা। জামরুল খাওয়া শুরু করলো, "কার বাড়ির রে—? ভারি মিষ্টি তো—" তরল টলটলে স্বচ্ছচোখে তাকালো হাসি।

"হুঁ…হুঁ…, বোঝবোনা—"

একটু পরে দেখা গেলো, ধোয়া কাপড়ের আণ্ডিল সামনে রেখে, আকাশের ঘন ছায়া বেছে নিয়ে, মুখোমুখি বসে পেয়ারা খাচ্ছে দুজনে।

"বুঝলি হাসি, এ পেয়ারা পাড়তে গিয়ে, ডেঁয়ে পিঁপড়ের যা কামড় খেয়েছি, একেবারে চাকা চাকা—"

বাদলের হাতের গুলির দিকে তাকিয়ে, হাসির তখন নিজের শক্তি বিশ্লেষণ চলেছে,—কত অল্পসময়ে, অনায়াসে, কেমন এক বালতি কাপড় কেচে ফেললো বাদল! সত্যিই, ছেলেরা অনেক বেশী শক্তি রাখে—।

"কীরে হাসি! ভাবছিস কী—"পেয়ারায় বড় একটা কামড় বসিয়ে, বাদল গলাটা একটু খাদে নাবালো, আর ভুরু পরিমলে, বলি—, কাল শাড়ি পরে কী মার্ভালাস যে দেখাচ্ছিলো তোকে …বি—উটিফুল…"

আনন্দের আবেগে উদ্বেলিত হয়ে উঠলো হাসি। গলাভরা-স্ফূর্তি নিয়ে বলতে গেলো,—আজও শাড়ি পরবো দেখিস্—। কিন্তু, বলা হলোনা কথাটা। মুখ লাল করে, হাসি ভুরুটা নিচের দিকে টানলো। কেমন চোখে যেন ওর দিকে চেয়ে আছে বাদল। লাফিয়ে, গা-ঝাড়া দিয়ে উঠলো হাসি। পেয়ারাটা হাতে বয়ন করে, হ্যাঁচকা মেরে ধোয়া কাপড় শুদ্ধ বালতিটা ডানহাতে তুলে নিলো, "আর গল্প নয় বাবা, দিদির কাছে তাহলে বকুনি খেতে হবে—"

"তোর দিদি তো বরাবর ভালোই আছেন—" বাদলের চোখদুটো আবার অবাধ্য হলো, "দেখ্‌গে যা, তোর দিদি ইজিচেয়ারে আরেস করে বসে খবরের কাগজ পড়ছে—" বলেই ভুঁড়ি মেরে খাটুলাটুকু সেরিয়ে দেলো বাদল। বাদলকে নাগালে না পেয়ে, হাসি বাঁহাতের আস্ত পেয়ারাটাকে ছুঁড়ে দিলো বাদলের দিকে। বাদল লুকুতে যাচ্ছিলো। টুপ্ করে গিয়ে পুকুরে পড়লো পেয়ারাটা। হাসির দুঃখ হলোনা তাতে। যা ইচ্ছে বলবেই হলো দিদির নামে, দিদির সব ইচ্ছে, সব আনন্দ নিংড়ে নিয়েছে সংসারটা, কী সুন্দর কাঁচা সোনার মতো রং ছিলো দিদির, সেই রংএর কী ছিরি হয়েছে এখন, তামার মতো ম্যাড় ম্যাড় করছে…' সারা সপ্তাহে কী খাটুনীটাই না খাটে দিদি, রবিবারে জিরোবেনা একটু! আসলে, বাদলের রাগ রয়েছে দিদির ওপর। দিদির দোষ কী, সাধা কী আর অমনি বলেছে বাদলকে, একটা ইউনিটারি মেথডের অঙ্ক বোঝাতে দিদির কালঘাম ছুটেছিলো।…

বালতিটা উঠোনে নাবিয়ে, হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে, কপালের ঘাম মোছে হাসি। বালতি থেকে একটা একটা করে কাপড় তুলে, বেড়ে বেড়ে ঘরিতে মেলে দেয়। দিদির শাড়ি-ব্লাউজ-পেটি কোটে রঙ নেয় বেশী।

"হাসি-ই—"

—ওরে বাবা, দিদির আজ হয়েছে কী!—হাসি চমকচকিয়ে গেলো।—এমন মার-মুখো মেজাজ কেন দিদির সকাল থেকে—হাসি ছুটে এলো।

দেখলো, দিদি, শুধু ঘরে জানলার ধারে দাঁড়ানো, ইজিচেয়ারে বসে নেই।

"দুখানা কাপড় কাচতে, দুঘণ্টা লাগালি—" দিদির কণ্ঠস্বর যেমন স্বাভাবিক, চোখের চাউনি তেমনি ধারালো, "যা, আদর্শ বিপণি থেকে এই জিনিষ ক'টা নিয়ে আয়—"

মেঘলা-চোখে, দিদির হাত থেকে কর্দটা নিতে নিতে, হাসি কেমিয়ে আসা কান্নার ঢেউগুলো সামলালো।—দিদি তো এমন কাঠ গলায় কখনো কথা বলেনা ওর সঙ্গে। কালকে বিকেলেও তো হাসিকে কত আদর করলো···। হাসি যখন দিদির দেয়া জন্মদিনের শাড়িখানা পরে, প্রণাম করলো দিদিকে, দিদি বুকে জড়িয়ে ধরে হাসিকে কত আদর করলো, মা'র দিকে তাকিয়ে, কিরকম গর্ব-গলায় দিদি বললো,—মা, ভাখো হাসিকে, ঠিক যেন রাজকন্যে···আমার বোন বলে কেউ বিশ্বাস করবে? ···তারপর, হেসে হেসে বলেছিলো দিদি, হাসিকে আমি রাজপুত্রের হাতেই দেবো, দেখো—।

আর, এক রাত্তির কাপড় হয়ে গেলো কিনা দুখানা কাপড়···, গত রবিবারেও তো কত আক্ষেপ করেছে দিদি এ নিয়ে···,এত রাজ্যের কাপড় তুই কাচিস হাসি, রবিবারে ছুটির দিনটা খাটতে খাটতেই তোর শেষ হয়, সামনের মাসে, একটা ঠিকে-ঝি রাখবোই আমি—।

সবেগে মাথা নেড়ে, হেসে হেসে প্রতিবাদ করেছিলো হাসি,—নারে দিদি, আমার কিছু কষ্ট হয় না ···দিদি বললো, কী করে দিদি বললো, দুখানা কাপড় কাচতে দুঘণ্টা কাবার করলি ···।

মনটা মেঘে ভরা। থলিটা নেবার জন্য, হাসি বারান্দার কোনাকুনি এলো।—আরে। হঠাৎ হাসির চোখে পড়লো বেলী গাছটাকে। না, ভুল হলো হঠাৎ চোখে পড়লো মতিবেলের কুঁড়িটিকে। বাদলের বাড়ি থেকে, ছোট্ট একটুকখানি সিকলিকে একটা বেলীচারা এনে লাগিয়েছিলো হাসি। তারপর ওর খেয়ালও নেই। নয়ণা বিরহ...সেই শীর্ণ গাছটার বিনা যত্নেই চেহারা ফিরে গেছে। হাসি আয়ত চোখে অবাক বিস্ময় নিয়ে, চিকণ কাপ্‌সাসো পাতার ভেতর থেকে, উঁকি ঝুঁকি মারা আকর্ষণীয় কুঁড়িটির দিকে তাকিয়ে রইলো। মনের মেঘ মুহূর্তে উড়ে গেলো কোথায়! দিদির তাগিদ ও ভুললো। কর্দটা থলির ভেতর রেখে, পুলকের চঞ্চলতায়, কোথা থেকে একটা ভাঙা খুন্তি নিয়ে এসে, ভরপুর আনন্দে, গাছের গোড়া আলগা করতে লেগে গেলো হাসি।

•

আদর্শ বিপণির মালিক রতনলাল, কর্দটা হাতে নিয়ে, চশমার ওধার থেকে, কেমন যেন একটা যাচাইয়ের দৃষ্টি ফেললেন হাসির মুখের ওপর।

"কেউ আসছেন নাকি তোমাদের বাড়ি?"

"না তো—"

রতনলালের বিস্ময় স্বাভাবিক। যে বাড়িতে, গত ছ'বছরের মধ্যে, সাইকেলের সাবান আর টাটার নারকেল তেল ছাড়া, আর কোনো প্রসাধন দ্রব্য ঢোকেনি, সেখানে শুধু বিচিত্র নয়, কুলীন প্রসাধনী···পিয়ার্স সোপ, পণ্ডস কেস্‌পাউডার, ল্যাক্টো ক্যালামিন, নিভিয়া···। কর্দ মিলিয়ে

জিনিষগুলি লেদিং টেবিলের ওপর রাখছিলেন রতনলাল। এবার অবাক হয়ে হাসিও। মনটা তার ছিলো বলে, ফর্দর ওপর চোখই ফেলেনি হাসি।

—সত্যি তো, কেউ আসবেন নাকি ওদের বাড়িতে!

"এক মিনিট কাগজ দিন তো—" মন্টু সিঁড়ি টপকে দোকানের দরজায় এসে দাঁড়ালো, "ওমা হাসি, তুই এখানে? কি কিনলি?"

ফর্দমাফিক সব জিনিষ দেওয়া হয়ে গেছে রতনলালের। মাসকাবারে খুশি এসে বিল মিটিয়ে দেয়। জিনিষগুলি তখুনি থলিতে ভরতে ইচ্ছে করে না হাসির। এমন জিনিষগুলি হাসিদের বাড়ি যাচ্ছে, একটু দেখুক মন্টু। মন্টুটা দেমাকী না হলেও, ওদের বাড়ির সকলেই একটু উঁচু নাকের। সামনের মানুষদের যেন দেখেও দেখতে পায় না। আবার, মাঝে মাঝে এত বেশী মিষ্টিকথা বলে ফেলে হাসির সঙ্গে, হাসির বয়েস বেশী না হলেও বুঝতে পারে, কৃপা করছে ওকে। আর সঙ্গে সঙ্গে জ্বালা ধরে হাসির। মন্টুদের বাড়ি যেতে একদম ইচ্ছে করে না। তবু, যেতে হয় এক আধবার। তন্ত্র-পড়োশী বলতে মন্টুদের বাড়ি। আর হাসির সমবয়সী বলতে ওরাই···মন্টু, বাদল।

কাগজ নিয়ে টাকার চেকটা গুণে নিলো মন্টু। একটা সিকি রতনলালের দিকে ঠেলে দিলো, "টফি দিন তো···মটন—।" "চল্ যাবি না—" মন্টুর প্রশ্নে চকিত হয়ে, জিনিষগুলি ক্ষিপ্রহাতে হাসি থলিতে ভরলো। হাসি হাসি মুখে, লঘু চরণে নেমে এলো দোকান থেকে, "চল—"

"থলিটা দে আমার হাতে—" মন্টু হাত বাড়ালো।

"নানা—" মন্টুর চাউনি অনুসরণ করে সচকিত হলো হাসি। রাঙা হলো। পিঠ থেকে বেণীদুটো ঝাঁকের দুপাশ দিয়ে সামনে এনে, সামান্য ঝুঁকে হাঁটতে লাগলো।

"টফি খা—"

"না রে, ইচ্ছে নেই—" মন্টুর কাছ থেকে কিছু নিতে হাসির কোথায় যেন বাধে।

"কী হলো···" মন্টু নিজের একটা মুখে টফি পুরে, বাকী সব ক'টা জোর করে হাসির হাতের মুঠিতে দিয়ে দিলো। "কাল শাড়ি পরে তোকে যা লাগছিলো হাসি—" হাসির পাশ ঘেঁষে চলতে চলতে, হাসির কাঁধে হাত রাখতে সাহসী হলো মন্টু "···যেন সুইট সিক্সটিন—"

প্রাণপণ চেষ্টা করে, হাসি মুখের রং স্বাভাবিক রাখলো। বুঝলো, বাক্য যুগিয়ে মন্টুটা ইতিমধ্যে বেশ পাকা হয়ে উঠেছে। কার কাছ থেকে শুনেছে যেন কথাটা, যেখানে সেখানে লাগালেই হলো। হেসে হেসে খুব সহজ গলায় বলতে পারলো হাসি, "ষোলো বছর বয়েস পেতে ঢের দেরী আমার, দুটি বছর অপেক্ষা করতে হবে—"

"তোর বড় হতে ইচ্ছে যায় না হাসি—" দুই চোখ টান করে মন্টু তাকালো একটু, "আমি ঠিক করেছি, এবার থেকে ফুলপ্যান্টই পরবো সব সময়—"

বাড়িতে এলো হাসি। দরজার কাছে দাঁড়ানো দেখলো দিদিকে।···হাসির দিদির দিকে দৃষ্টি গেলে, খুশির অস্বাভাবিক ক্লান্তিময় মুখচ্ছবি দেখে, ওর কান্না পেলো···একটা প্রশ্ন খুশির অন্তর তোলপাড় করে ওকে শ্রান্ত করে তুলেছে। বিশেষ একটি মানুষের ওপর খুশির বিশ্বাস ছিলো, তাই সংসারের চূড়ান্ত কষ্টের মধ্যেও অনধীরতার বৈরাগ্যে ভেঙে পড়েনি খুশি। আজ, প্রশ্নটা খুশির সেই বিশ্বাসের মূলে যেন কুঠার

হানতে চাইছে।—মুহূর্তে কী ক্ষবরদায়ী হতে পারে না মানুষের…সে, হতো নীতিবাদী মানুষই হোক না?…এর উত্তর শোনার জন্য, খুশি যেন নিজেই নিজের হৃদয়ে কান পেতে আছে। উত্তরটা মিলছে না—হৃদয়ের গভীরে যতো অশান্তি আর আক্রোশের বুড়বুড়ি উঠেছে। আর, একটা তীব্র দুঃখবোধ —যেন গ্রাস করতে চাইছে খুশির সমস্ত সত্তাকে। ওই দুঃখবোধে গতরজনী তার বিনিদ্র কেটেছে। মনের এই দুঃসহ ভারটাকে, যেমন করে হোক তার নামানো দরকার।…

হাসির দিব্যদৃষ্টি থাকলে, টের পেতো, এক চিলতে কাগজ খুঁজতে, খুশি বাক্স হাঁটকে, সমস্তধর্ম হয়ে, হয়রাণের একশেষ হয়েছে। হাসির কষ্ট হতো। খুশির বি. এ. পাশের পর, সমীরণ কোনো এক ফাঁকে, ছোট্টো, ঐ কাগজটা খুশির হাতের মুঠিতে দিয়েছিলো। নীলাভ কাগজে সবুজ কালি দিয়ে দুছত্র লেখা ছিলো,—মনের সাগর হাতড়ে হাতড়ে সময় আমার কাটলো,

ব্যর্থ প্রয়াস আত্মদর্শনের সব উৎসাহী চেষ্টা—

মুক্তো কী নেই?……

সমীরণ প্রায় প্রতি সপ্তাহেই এসেছে, কিন্তু, এর উত্তর খুশির দেয়া হয়নি। কিন্তু, সত্যিই কী উত্তর পায়নি সমীরণ? অলিখিত কিছু?

—যাই হোক, আট বছর পরে, তার উত্তর আজ দিয়েছে খুশি—

তুমি নিজেই জানো, যাকে সে চায়, যেখানে তার লক্ষ লোভ।

কখন তাকে ডেকেছে, তাকে না পেয়ে তার দীপ্ত ক্ষোভ।

আগুন হয়, কান্না হয়, কখনো বোবা দুঃখ সয়।—

কবিতা কোনোদিন লেখেনি খুশি। ও ক্ষমতা আছে সমীরণের। তবু, প্রাণপণের চেষ্টায়, কবিতার মতো করেই লিখলো। আর স্থির করলো, আজকেই এটা দেবে। ওর এই উত্তর সমীরণের হাতে তুলে না দেয়া পর্যন্ত, খুশির অস্থির মনটা যেন হাঁফ ছেড়ে হাল্কা হতে পারবে না।……

বোনের পায়ের শব্দে সচকিত হলো খুশি। অপ্রস্তুত ব্যস্ত হাতে খামটা বোনের হাত থেকে নিলো।

অন্যদিন হলে, হাসি বাড়ি ঢুকেই জিজ্ঞেস করতো,—দিদি কেউ আসবে নাকি রে? কিন্তু, আজ সকালের শুরু থেকেই, দিদি যেন কেমন কেমন…, দিদির আচরণ দুর্বোধ্য হেঁয়ালির মত লাগছে ওর। হাসি নীরবে খামটা দিদির হাতে দিয়ে বেরিয়ে এলো বারান্দায়। দেখলো, আনন্দ আকাশের দিকে তাকিয়ে কেক খাচ্ছে।

—বাবে! এবার যে কেক খাচ্ছে আনন্দ… !—হিঃ, ছোটো ভাইয়ের সঙ্গেও হিংসে করবো—, টকি চিবুতে চিবুতে খুব সহজেই হাসি উদার হতে পারলো।

"এই ছোড়দি, কোন্ ঘুড়িটা তোকাটা হবে বলতো? পেটকাটা, না শতরঞ্জি?…শতরঞ্জি? ঠিক বলেছিস,…ওরা হলোনা,.. দুয়ো পেটকাটা, দুয়ো, দুয়ো. পেটকাটা তোকাটা—" কোমরের বেল্টটা এঁটে, ছুটে কাটা ঘুড়িকে অনুসরণ করতে যাচ্ছিলো আনন্দ, হাসি হাত টেনে ধরলো, "এই আর যাসনা, দিদি রাগ করবে, তোর ঘুড়িটা কাটা গেছে বুঝি? মুখটা মলিন করে ঘাড় নাড়ে আনন্দ, পরমুহূর্তেই আপন খুশিতে আনন্দ ঘুরপাক খেলো, "আর আনন্দের ঘুড়ি কাটা যাবেনা দেখিস, সমীরণদা আজ সুতোয় মাঞ্জা দেবার এ্যায়সা প্যাঁচ বাতলে দেবেন বলেছেন—"

"সমীরণদা আজ আসবেন নাকি ?" আর একটা টকি মুখে পুরলো হাসি।

"হ্যাঁরে, আজ আজ বিকেলের অনেক আগেই আসবেন, আমাকে মজার প্যাচ শিখিয়ে, তারপর দিদিকে নিয়ে পিকচারে যাবেন সমীরণদা।"

"দ্যাস্···, দিদি কোনোদি—ন সিনেমা দেখেনা—"

"হুঁ·· তোমাকে বলেছে—," পাছে সমীরণদার আসার সম্ভাবনা ফিকে হয়, সেই আশঙ্কায় আনন্দ ছোড়দিকে খুবই ভেংচে দিলো। "কাল সমীরণদার যাবার সময়, দিদি নিজে ডেকে বলে দিলো,—যাবে।"

রান্নাঘরের চৌকাঠ থেকে, হাসি উঁকি দিলো ভেতরে। রান্না হয়ে গেছে মা'র, বিকেলের জন্য আটা বার করছেন প্রভাবতী। প্রাণের আবেগে যেন উথলে পড়ছে হাসি। লাফিয়ে চৌকাঠ ডিঙোলো। "মা, দাও, আটা আমি মাখছি, তুমি বাক্স থেকে আমার শাড়িটা বার করে নিয়ে এসো না মা—"

"শোনো হাসি, কাছে এসো—" মা'র গলায় গাম্ভীর্যে হাসি ঘাবড়ে গেলো।

"কী হয়েছে মা ?"

সান্ত্বনা হেসে তরল হতে চাইলেন প্রভাবতী, "কিছু হয়নি—" আবার হাসলেন, "বলছি যে, শাড়ি পরতে চেওনা এখন, দিদি রাগ করবে। কোথাও যাওয়ার জন্য ওটা তোলা থাকনা—"

"না মা, দিদি একটুও রাগ করবেনা। তুমি দাওনা শাড়িটা এনে, কাল দিদি আমাকে বলেছে, তুই তোর ইচ্ছে মতন পরিস শাড়িটা, সামনের মাসেই আর একটা শাড়ি কিনে দেবে বলেছে দিদি—"

"না রে, শোন্, অত্ত হোস্‌নে, তুই তো আমার খুব বুদ্ধিমতী মেয়ে—" একটু থামলেন, গলা দিয়ে দ্বিধাগ্রস্ত স্বর বেরুলো প্রভাবতীর, "শাড়ি পরলে তোকে বড্ড যেন বড় দেখায় ··, আমার ভাল লাগেনা, বেখলিনে, কাল সমীরণ পর্যন্ত বললো এ কথা—" হঠাৎ কথার খেই যেন হারিয়ে ফেললেন প্রভাবতী।

উদ্‌গত অভিমানে হাসি মুখ ফেরালো।—মা যে কী বলে! এর কোনো মানে হয় ? ··কাল শাড়ি পরা হাসিকে দেখে, মা, দিদি দুজনেই তো কী খুশি! দিদি তো বুকে জড়িয়ে ধরে আদর করে অস্থির, তক্ষুনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছে হাসিকে, আর একখানা শাড়ি কিনে দেবে এ মাসে—।

তবে ?···তাহলে ?···

হঠাৎ, একেবারে হঠাৎ, একটি তীক্ষ্ণ নতুন বোধ হাসির সারা সত্তাকে জাগিয়ে দিলো। ওর মনের সামনে, কুয়াশার ওকটা পর্দা যেন ভাঁজে ভাঁজে খুলে গেলো। পর্দার ভাঁজে ভাঁজে উঁকি দিলো বাদল, উঁকি দিলো, মন্টু, উঁকি দিলো সমীরণদাও···। সমীরণদা কাল উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিলেন হাসিকে দেখে।—কেকের বাক্সটা হাসির হাতে দিয়ে, হাসির কাঁধে হাত রেখেছিলেন,

—ওমা খুশি !: স্যাখো কাণ্ডখানা···, হাসি এখন আর টুকু নেই, রাতারাতি রাণী হয়ে গেছে যে—, দিদির দিকে তাকিয়ে উচ্চ হাসির রোল তুলেছিলেন সমীরণদা। চোখের পাতায় সমীরণদার কৌতুক কাঁপছিলো। হাসতে হাসতেই আরো কয়েক পলক দেখেছিলেন হাসিকে।

সমীরণদার উচ্ছ্বাসে দিদির সঙ্গে সাড়া ছিলোনা,···সেটা তখন বোঝেনি হাসি···

রং-চটা, ধোঁয়ায় মলিন ঘুপচি জানলার ভেতর দিয়ে, হাসি চোখ বিশাল করে তাকালো। তাকিয়ে রইলো। অবচেতনে, আনন্দ আর স্বপ্ন এসে মিশলো হাসির হৃদয়ে।

আকাশটা যেন হাসির ছোঁয়ার সীমায় এসে গেছে—মনে হলো হাসির।

আকণ্ঠ এক আনন্দে, ব্রীড়াবনতা হয়ে, ক্রতহাতে হাসি আটা মাখতে লাগলো।

পিতৃদেবের ছবি

চিত্তরঞ্জন মাইতি

প্রথম দিনেই মনটা বিগড়ে গিয়েছিল ওর ওপর। সবে সেদিন কলেজের কাজে যোগ দিয়েছি। ফার্স্ট পিরিয়ডে ক্লাশ নেই। এসে ঢুকলাম প্রফেসারস্ রুমে। বসতে গিয়েই বাধা পেলাম। বেয়ারা গঙ্গারাম এসে বললে, বস না ওখানে বাবু, প্রিন্সিপাল সাব এলে মাঝে মাঝে ওখানে বসেন।

পাশের চেয়ারে গিয়ে বসলাম। তাকিয়ে দেখি দু'চারজন সহকর্মী এদিক ওদিক ছড়িয়ে বসে আছেন। তাঁদের একজন চশমার ফাঁকে চোখ মেলে আমার দিকে একবার তাকিয়ে নিলেন। হতে পারে চেয়ারটা প্রিন্সিপালের জন্যে নির্দিষ্ট, কিন্তু তাই বলে সবার সামনে এমন করে অপ্রস্তুত করে দেওয়া। মনটা সত্যি বিগড়ে গেল।

এর আগে আরও একটি ঘটনা ঘটেছিল। অবশ্য সে ঘটনায় ওকে সম্পূর্ণ দোষী করা যায়নি। কলেজে ইন্টারভিউয়ের শেষে নিয়োগ পত্রটি নিয়ে বেরিয়ে যাবার সময় ঢুকতে গেলাম বাথরুমে। কাছেই দাঁড়িয়েছিল ঐ লোকটা।

জিজ্ঞেস করলাম ওকে বাথরুমের খবর।

ও নির্বিকারভাবে দেখিয়ে দিলে যে ঘরখানা, সেখানে ছেলেরা দাঁড়িয়েছিল একদল। ঠিক তার পাশেই তাকিয়ে দেখি আর একখানা ঘর। লেখা আছে, "প্রফেসারস্ ওনলি"

বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসতেই লোকটা বললে আমাকে।

ওখানে গিয়েছিলে কেন?

মনে হল, একটি চড় বসিয়ে দি ওর গালে। বুড়ো মানুষ, তাই সামলে গেলাম।

ও আবার বললে, ওখানে বাবুসাহেবরা যান।

পরে বুঝেছিলাম গঙ্গারামের বাবুসাহেব মানে প্রফেসাররা।

বললাম, আমিও তাই গিয়েছিলাম। ও যেন কেমন এক অপ্রস্তুতের হাসি হেসে আমার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল।

গঙ্গারাম আমাকে সম্ভবতঃ ছাত্র বলেই ভেবেছিল।

তারপর দশটি বছর কেটে গেছে।

আমি কিন্তু গঙ্গারামের ওপর কেন কি জানি কোনদিনও সদয় হতে পারিনি।

ও শীতের দিনে আমার মুখের ওপর জানালা বন্ধ করে দিতে চেয়েছে। শেষে ধমক খেয়ে আবার খুলে দিয়েছে জানালা।

সিগারেট আনতে বলেছিলাম একদিন, ও কিনে নিয়ে এলো একছড়া কলা।

ধমক দিয়ে বললাম, সিগারেট মানেই কি কলা?

সহকর্মীরা সব হাসতে লাগলেন।

লোকটার দিকে ভ্রুক্ষেপই নেই। বলছে কিনা, এত সিগারেট খাচ্ছ বাবু, কলা খাও।

চেঁচিয়ে বললাম, মাতব্বরী করতে হবেনা আর, যাও নিজে খাও গিয়ে।

লোকটা কি রকম যেন হয়ে গেল। গজ গজ করে কি যেন বলতে বলতে চলে গেল।

ঠুস করে আবার সাফাই গাইবার ওস্তাদি আছে। মা জন্মে দিয়েছিল সেদিন।

এ রকম ঘাও ঘটাতে এই দশ বছরে কতবার দেখলুম ওকে।

আর সবাই ওকে কিছু দুষ্টু খাতির করে থেকেছি। ঐ বুড়োটাও আমার ওপর মনের মত কাজ করতে ওস্তাদ। কেবল আমার কপাল গুণে উনি হয়েছেন দুষ্টগ্রহ।

ক্লাশে যেতে পাঁচটা মিনিট দেরী হয়েছে কি এসেই হাজির।

ঘড়ির দিকে আঙুল দেখিয়ে বলবে, পাঁচ মিনিট কখন পার হয়ে গেছে, এখনও বসে রয়েছ বাবুসাব।

আর যারা বসে রয়েছেন বুড়োটা তাদের যেন দেখতেই পায়না।

মনে মনে ভাবি, ও কর্তৃপক্ষের একটা চর।

রবি ঠাকুরের ভাষায়, 'দেখে জ্বলে যায় পিত্ত।'

ক্লাশে চেঁচিয়ে পড়ালে অমনি ওর মাতব্বরী আছে।

গলাটা যে ভেঙে যাবে বাবুসাব। এত চেঁচিয়ে পড়ায় না।

আমি চেঁচাবো, তোর কি রে বাপু। গায়ে পড়ে এত উপদেশ কিসের। লোকটার একটুও যদি ভদ্রতা জ্ঞান থাকে।

পূজোর ছুটির আগে বেয়ারাদের বকশিস দেবার একটা রীতি আছে।

কয়েকজন ইতিমধ্যে কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল। দিয়ে দিয়েছি। গণ্ডারাম এবার আর এলোইনা। আমিও সেধে দিতে গেলামনা। শেষে যখন প্রায় সকলের দেওয়া শেষ হয়ে গেল, তখন নিজেরই কেমন যেন মনে হতে লাগল। একটা বেয়ারার কাছে ছোট হয়ে যাব।

সকলের সামনে ডেকেই বললাম গণ্ডারামকে।

এই যে নিয়ে যাও তোমার পার্বণী।

যা দিই তার চেয়ে কিছু বেশীই দিতে চাইলাম ওকে। ওর কাছে হার মানা চলবেনা আমার।

লোকটা কাছে এসে বলে কিনা, ভাল করে ভুখ বি কিনে খেও বাবুসাব, আমাকে আর দিয়ে কাজ নেই। দিনে দিনে যা চেহারা হচ্ছে।

সুস্পষ্ট অপমান। কিন্তু প্রতিশোধ নেবার পথ নেই এ অপমানের। নেওয়া না নেওয়া তার ইচ্ছের ওপরেই নির্ভর করছে।

আজ যখন গণ্ডারামের অবসর গ্রহণের জন্যে প্রফেসারস এসোসিয়েশান থেকে আয়োজন হচ্ছে, তখন আমি অনুপস্থিত থাকব বলেই মনে মনে ঠিক করলাম। একজন সাধারণ বেয়ারাকে নিয়ে একটু যেন বেশীমাত্রায় মাতামাতি হচ্ছে বলেই আমার মনে হচ্ছিল! চাঁদা অবশ্য আমিও দিয়েছিলাম। দু'শ টাকার নোট দেবার আয়োজন করেছিলেন কর্মকর্তারা।

অনুষ্ঠান চলছিল নীচের তলায়। আমি লাইব্রেরীতে অধ্যাপকদের জন্যে নির্দিষ্ট ঘরের ভেতর বসে পড়াশোনায় ব্যস্ত রইলাম।

একা একাই বসেছিলাম। কতক্ষণ কেটে গেছে মনে নেই। হঠাৎ দরজা ঠেলে কে যেন ভেতর ঢুকে পড়ল। ফিরে দেখি গঙ্গারাম।

বিস্মিত আর মনে মনে একটু সঙ্কুচিত যে না হলাম তা নয়।

আশপাশে কেউ নেই। গঙ্গারাম এগিয়ে এল আমার কাছে।

আজ যে তোমাকে দেখলাম না বাবুসাব?

মুখে একটুখানি হাসি টেনে বললাম, জরুরী একটা নোট করার কাজ ছিল গঙ্গা, তাই যাওয়া হয়ে ওঠেনি।

ম্লান একটা হাসির রেখা ফুটে উঠল লোকটার মুখে।

কিছু একটা বলতে হয়, তাই বললাম,—বুড়ো হয়েছ। চারতলায় ওঠা নামা খুবই কষ্টকর। এখন দেশে গিয়ে শেষ জীবনটা ছেলেপুলেদের কাছেই কাটিয়ে দাও।

বড় বিষণ্ণ মনে হল গঙ্গারামের মুখখানা। কিছুক্ষণ কি ভেবে নিয়ে বললে, বাবুসাব, বাপ মা, আর ছেলেপুলে যাই বল সবই ছিলে তোমরা। এই কলেজে পঞ্চাশটা বছর কাটিয়ে দিলাম। বাবুজী, ঘরবাড়ী এর চেয়ে আমার বড় কি আছে বলতে পার?

গঙ্গারাম কাঁদছে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল প্রায় সত্তর বছরের বুড়ো মানুষটি।

আমি অভিভূতের মত তার দিকে তাকিয়ে রইলাম।

এক সময় কান্না থামিয়ে গঙ্গারাম বললে, কতদিন কত কথা তোমাকে বলেছি বাবুসাব; মনে নিও না ওসব।

বাধা দিয়ে বললাম, তাতে কি হয়েছে গঙ্গা, ও আমি কিছুই মনে করিনি।

ও বললে, প্রথম দিন তোমাকে দেখে মনটা কেমন করে উঠেছিল। ছেলেটা বেঁচে থাকলে ঠিক তোমার মতই হত বাবুজী।

অবলম্বনহীন সেই বুড়ো বেয়ারা আমার চোখে আজ আমার স্বর্গত পিতৃদেবের মূর্তি নিয়ে এসে দাঁড়াল। আজ ওর অতীতের ব্যবহারগুলো পরম স্নেহের রূপ নিয়ে আমার চোখের সামনে একে একে ফুটে উঠতে লাগল।

আমাকে অন্যমনস্ক দেখে গঙ্গা বললে, লেখাপড়া কর বাবুসাব, আমি যাই।

দুটি হাত জোড় করে নত হয়ে গঙ্গারামকে প্রণাম জানালাম।

প্রথমে ওর মুখখানা কেমন সঙ্কুচিত হয়ে গেল। তারপর তৃপ্তিতে উদ্ভাসিত হল ওর চোখ দুটি। গঙ্গারাম চিরদিনের মত আমার চোখের সামনে থেকে বেরিয়ে গেল।

———

উৎসবে উষা সেলাই বলেই শ্রেষ্ঠ উপহার

উৎসব উপলক্ষে সর্বক্ষেত্রেই প্রিয়জনদের উপহার দেওয়ার রীতি আছে। উপহার হিসেবে উষা সেলাই কলের একটা বিশেষত্ব আছে। উষার প্রতিটি মডেলের প্রতিটি কারুকার্যে ও উৎকর্ষে অনন্য। আধুনিক উষাকলে সেলাই করে আপনার অবসর আনন্দে ভরপুর করে তুলুন।

শ্রেষ্ঠ মেশিনে
সেলাই করুন—

উষা

কলে সেলাই করুন

উষা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়ার্কস লিমিটেড, কলিকাতা-৩১

JCSM/G/459

পুতুল

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

রাখহরির হঠাৎ খেয়াল হ'ল গাড়ুটা বোধহয় উঠানেই পড়ে আছে।

আগেকার দিন হ'লে ভয়ের কিছু ছিল না। ভোরে উঠে যেখানকার জিনিস ঠিক সেখানে পাওয়া যেত। কিন্তু আজকাল তা হবার জো নেই। ছিঁচকে চোরের উপদ্রব ভীষণ বেড়েছে। বাইরে কিছু থাকলেই রাতারাতি হাওয়া। তা সে ছেঁড়া পামহাই হোক আর লুটো বাটিই হোক।

শুধু কি রাতে, দিন-দুপুরেই অমাবস্যা কাণ্ড হচ্ছে। ওপার থেকে হৈ হৈ করে লোক এসে এপারের ধানক্ষেতের ওপর পড়ছে। পলকে ধানের গোছা সাবাড়। একেবারে পঙ্গপালের সগোত্র। গরু বাছুর চরবার উপায় নেই। তাড়িয়ে ওদিকে নিয়ে যাচ্ছে।

এদিকের লোকেরাও কম যায় না।

ওটি শুটি গিয়ে ওপারের পাটের ক্ষেত সাবাড় করে। রোদে মেলে দেওয়া কাপড়-চোপড় বগলদাবা করে এপারে নিয়ে আসে।

এপার ওপার আগে ছিল না। এই বছর কয়েকের সৃষ্টি। কোন চিহ্ন নেই, নিশানা নেই, শুধু ছোট একটা ইঁটের ঢিবি। তারই এদিকটা আমাদের দেশ, ওদিকটা তোমাদের।

আচ্ছা বিপদ। চণ্ডীমণ্ডপ, হালামবাড়ী এপারে পড়ল, গোলাঘর আর হাঁড়ার চালা পড়ল ওদিকে। এ ভাগ বাঁটোয়ারার কোন মানে হয়। এ যেন আচমকা মানুষের কলজেটা আলাদা করে দেওয়া। মানুষ বাঁচুক আর না বাঁচুক তা কেউ দেখল না। দেখবার যেন দরকার নেই।

রাখহরি ঘরের ঝাঁপ ঠেলে বাইরে বের হল। গাড়ুটা ঘরের মধ্যে না আনা পর্যন্ত স্বস্তি নেই।

গাড়ুটা তুলতে গিয়েই চোখে পড়ল।

হাতে আধ-নিভন্ত হ্যারিকেন গা টিপে টিপে ব্রজখুড়ো দক্ষিণ দিকে যাচ্ছে। রাখহরি গাড়ুর কথা ভুলে গিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল।

এ রকম কানাঘুষো এর আগেও কানে এসেছে। পেট কাপড়ে গুপুরি বেঁধে ওদিক থেকে মেয়ে পুরুষ জঙ্গলের মধ্যে গা ঢাকা দিয়ে গায়ে গায়ে এদিকে এগিয়ে এসেছে। একবার এখানকার ব্যাপারীদের হাতে ছোঁয়াতে পারলেই চারগুণ লাভ। গুপুরি আর গুপুরি থাকে না, সোনার ডেলা হয়ে যায়।

তেমনই এদিকের লোকেরাও কাপড়ের টুকরো, লোহালক্কড় ওদিকে বে-আইনিভাবে চালান দিতে পারলেই রাতারাতি বড়লোক।

তেমনই কিছু একটা না হয়ে যায় না।

কিন্তু এই বয়সে ব্রজখুড়োর ব্যবসায় শখ হল। শখের কথা মানুষের কিছু বলা যায় না। মাথায় টাক পড়লে অনেকে বাহারে চিরুনি কেনে। বয়স বাড়লে আতরের শিশি।

রাখহরি ঠিকই সন্দেহ করেছিল। বাড়িটি টিম টিম করতে করতে বাঁশবাড়ের পিছনে মিলিয়ে গেল। তারপর আবার একটু দেখা গেল। অল্পক্ষণের জন্য। বসির মিয়ার ঘরের কাছ বরাবর এসে আর দেখা গেল না।

রাখহরি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। দুটো চোখ বিস্ফারিত করে, কিন্তু ব্রজখুড়ো ফিরল না।

দূরে কলাড় বনে শিয়াল ডেকে উঠতেই রাখহরি ঘরের মধ্যে চলে এসে দরজা বাইরে রেখে।

একরাত নয়, পর পর তিনরাত দেখল রাখহরি। প্রায়ই একই সময়ে আলো সরে সরে এপার থেকে ওপার গেল।

একদিন সকালবেলা মাঠে যাওয়ার পথে রাখহরি ব্রজখুড়োর দরজায় গিয়ে দাঁড়াল।

রোয়াকে বসে ব্রজখুড়ো গীতা পড়ছে। যারা প্রপঞ্চময় সংসার থেকে অব্যাহতি লাভের একমাত্র সান্ত্বনা।

কেমন আছ গো খুড়ো? রাখহরি একেবারে রোয়াকে এসে উঠল। ব্রজখুড়ো উত্তর দিল না। পড়তে পড়তে হাত তুলে শুধু রাখহরির সম্ভাষণের উত্তর দিল।

রাখহরি জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। ভিতর দিকে উঁকি দিল। মলিন শয্যা, নামমাত্র তৈজসপত্র। একটা ভাঙা হাতা। এই তো সংসারের আবরণ আর আভরণ। যে সব মাল নিয়ে ব্রজখুড়ো সওদা করতে যায়, সেগুলো রাখে কোথায়।

গীতা পাঠ শেষ হ'তে ব্রজখুড়ো সাষ্টাঙ্গে ইষ্টদেবতাদের প্রণাম করল তারপর রাখহরির দিকে ফিরে বলল, তুমি কেমন আছ রাখ?

এই কোনরকমে কেটে যাচ্ছে খুড়ো। দেশের দেশ একেবারে শ্মশান হয়ে গেল। একটা মন্বন্তর গেল আর একটা এবার আসবে।

সবই প্রভুর কৃপা, তিনি সৃষ্টি করেছেন, রাখবার হয় তিনি রাখবেন মারবার হয় মারবেন।

ব্রজখুড়ো দুটো হাত তুলে আকাশের দিকে ইঙ্গিত করল।

রাখহরি কিন্তু আকাশের দিকে দেখল না। বাঁশবাড়ের পিছনে বসির মিয়ার বাড়ীর দিকে চেয়ে রইল।

দেশ ভাগ হবার আগে বসিরের সঙ্গে খুব আলাপ ছিল। ঘন ঘন আসা যাওয়া। রাখহরির বাড়ীর শনি পুজোয় বসির এসে বসত। প্রসাদ নিয়ে ঘরে ফিরত। আবার বসিরের বাড়ীতেও যেত রাখহরিরা ঈদের দিন। কোলাকোলি করত। মিঠাই খেত। মধুসূদনদের বাড়ী দুর্গাপুজো শুরু হবার ক'দিন আগে থেকেই বসির আসত, ছেলেটাকে কোলে নিয়ে। তখনও প্রতিমা রংচং করা হয়নি। শুধু মাটি লেপা। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখত। ছেলেকে দেখাত।

বিসর্জনের দিনও ঢাকীদের পিছন পিছন নদীর ঘাট অবধি যেত, কোন কোন বার নৌকাতেও উঠেছে। মাঝনদী পর্যন্ত গেছে ভাল করে বিসর্জন দেখবার জন্য।

আগে খুব যাওয়া আসা ছিল, অন্তরঙ্গতা। তখন অবশ্য রাখহরিরাও জানত না, বসিররাও নয়, যে তারা আলাদা জাত, তাদের দেশ আলাদা, ধর্ম আলাদা, ঈশ্বর আলাদা।

একবার ফাগুনের কড়া রোদে বসিরের চালা দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছিল। বসিরের বৌ রান্না করতে গিয়ে কি করে আগুন লেগে যায়। খড়ের চাল জ্বলে উঠল, বাঁশের খুঁটি। বসির পাট কেতে ছিল।

এপার থেকে ছেলের দল ছুটে গিয়ে আগুন নিভিয়েছিল। তখন অবশ্য এপার ওপার কিছু হয়নি। দুটো দেশের মাঝখানে, দুটো মানুষের মাঝখানে এভাবে কেউ রেখা টেনে দাগেতন করে দেয়নি।

এখন এরাও যেমন যায় না, বসির মিয়াও তেমনি ফিরেও চায় না। বড় বড় বাঁশের বেড়া দিয়ে আড়াল করে দিয়েছে। যাতে নিজের উঠানে চলতে ফিরতে এদের মুখ না দেখতে হয়।

বসিরের সঙ্গে কথা বলবার, মেলামেশা করবার স্পৃহাও রাখহরিদের নেই। মাঝে মাঝে শহর থেকে জীপ গাড়ী করে বাবুরা আসে। জমিদারবাড়ীর কাছারিতে গিয়ে ওঠে। এখন অবশ্য জমিদারী আর নেই, তবু লোকে বলে জমিদারবাড়ী। গাঁয়ের মোড়লদের ডাকে, চাঁইদের ডাকে। ডেকে অনেক কথা বলে। কিভাবে বসিরের দল এ দেশের সর্বনাশ করার জন্য বদ্ধপরিকর তার বর্ণনা শুনতে শুনতে রাখহরিদের রক্ত গরম হয়ে ওঠে। কোনদিন বসিরদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় ছিল, অন্তরঙ্গতা ছিল, তবেই ঘৃণায় শিউরে ওঠে।

রাখহরি ঠোঁট কামড়ে মনে করবার চেষ্টা করল, বাবুদের সেই সব সভায় কোনদিন ব্রজখুড়োকে দেখেছে কিনা! দেখেছে বলে মনে করতে পারল না।

অথচ বসিরের সঙ্গে তলায় তলায় ভাব রাখে, গোপনে যাওয়া আসা করে এমন লোকেরও এদেশে অভাব নেই। অভাব যে নেই, তার প্রমাণ তো সামনেই রয়েছে। নিজের মনকে রাখহরি কি করে অবিশ্বাস করবে।

ইচ্ছা করেই রাখহরি কথাটা পাড়ল।

ওদের কাণ্ড কারখানার কথা শুনেছ ব্রজখুড়ো?

ব্রজখুড়ো আসনটা পাট করে বড়ির আসনায় রাখছিল, রাখহরির দিকে না ফিরেই বলল, কাদের কাণ্ডকারখানা?'

রাখহরি একটু অপেক্ষা করল, তারপর ব্রজখুড়ো ফিরে দাঁড়াতে তার দিকে চেয়ে আঙুল দেখিয়ে বলল, ওই যে ওদের।

আঙুল দেখাল বসিরদের চালাঘরের দিকে। আগে এ তল্লাটে বসির মিয়া একলাই ছিল, এখন আরও কয়েক ঘর উঠে এসেছে। আহমেদ, ফুরকান আর সোলেমান। বসির দল ভারি করার চেষ্টা করছে। অপকর্ম করার যাতে সুবিধা হয়।

ব্রজখুড়ো একবার বসিরদের পাড়ার দিকে আর একবার রাখহরির দিকে চেয়ে বলল, কি হল?

আমাদের শান্তিতে থাকতে দেবে না আর কি। শুনলাম, মেঘেশ্বরপুরে দুজন চাষীকে ধরে নিয়ে গেছে তার লাশও আর বলদ গুম। কোথায় নাকি গুলি চালিয়ে আমাদের দুজন লোককে জখম করেছে। আমাদের দেশের সর্বনাশ করবার সব রকম চেষ্টা করছে দল মিলে।

ব্রজখুড়ো উঠানে নেমে খড়মজোড়া পায়ে দিল। খুব মৃদু অথচ দৃঢ়কণ্ঠে বলল, দেশের সর্বনাশ দেশের লোকই সবচেয়ে বেশী করে রাখহরি। দেশের লোক যদি ঠিক থাকে তো বাইরের লোকের সাধ্য কি কোন ক্ষতি করে।

খড়মের শব্দ তুলে ব্রজখুড়ো বাগানের দিকে চলে গেল।

উত্তরটা কেমন গোলমেলে লাগল রাখহরির কাছে। লোকটা অবশ্য সবসময়েই এই রকম পেচিয়ে পেচিয়ে কথা বলে। মোকে তাপে তার পদার্থ নেই। কিন্তু একটা জিনিষ বোঝা গেল

ভিতরে ভিতরে ও তরফের প্রতি বেশ একটু দরদ রয়েছে। আঁতে ঘা লাগলে মানুষ একটু বেসামাল হয়েই পড়ে। বাইরের নিস্পৃহভাবটা একটা ভড়ং। লোক ভোলানো চটক।

রাখহরিও আস্তে আস্তে নেমে এল রোয়াক থেকে।

হাট কেরত রাখহরির সঙ্গে সাতকড়ি ঘোষের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল একদরের মামলাবাজ লোক। কি করে যে সংসার চালায় ভগবান জানেন। কেবল কর্মী আঁটছে।

তবে এ হাটের সবাই আসে মতলব নিতে। এমন পাকা মাথা আর নেই।

রাখহরি সাতকড়িকে হাটের ভীড় থেকে আলাদা করে নিল।

একটা কথা ছিল সাতকড়িদা।

সাতকড়ি বসে বসে বলের মধ্যে রাধা আলুগুলো গুনছিল। বোকানী ঠকাল কিনা। রাখহরির কথাগুলো কানে যেতেই লাফিয়ে উঠল।

কি ব্যাপার সত্যহরি মামলা রুজু করে দিয়েছে নাকি?

সত্যহরি রাখহরির দাদা। বছর দুয়েক আগে জমিজমা নিয়ে একটা গণ্ডগোল বেঁধেছিল। পাড়ার মাতব্বররা আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠবার আগেই নিভিয়ে দিয়েছিল। সাতকড়িও ছিল সেই দলে। ব্যাপারটা তাড়াতাড়ি মিটে যেতে যেন একটু মনক্ষুণ্ণ হয়েছিল।

রাখহরিকে বসেও ছিল।

রাখ, ও আপদ পুকুরটা ছেড়ে দিয়ে তুমি বড় বোকামি করলে।

ছাড়লাম আর কোথায় সাতকড়িদা, পাড়ার পাঁচজনেই তো ছাড়ালে। যাক, ভালোয় ভালোয় একটা মিটমাট হয়ে গেলেই ভাল।

সাতকড়ি দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিল, তোমাদের ব্যাপার, তোমরাই ভাল জান ভাই। কিন্তু আমি এই বলে রাখলাম সতেটা পুকুরের পাড়ের আমগাছ দুটোও মাথী করবে একদিন। তা যদি না হয় তো তুমি আমার নামে কুকুর পুষো।

সেইজন্যই রাখহরির কথায় সাতকড়ি প্রথমে একটু উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিল।

না, না, সে সব কিছু নয়, রাখহরি মাথা নাড়ল, অন্য ব্যাপার। আরো মারাত্মক।

উৎকণ্ঠিত সাতকড়িকে টানতে টানতে রাখহরি পথের পাশে আমরুলতলায় নিয়ে এল।

বেশ একটু ছায়ার আঁচড়। দুজনে আয়েস করে বসল।

গামছা ঘুরিয়ে হাওয়া খেতে খেতে রাখহরি বলল, ব্রজমুক্তোর ব্যাপারটা বড় ভাল ঠেকছে না সাতকড়িদা।

কি রকম?

ধারে কাছে কেউ নেই, তবুও রাখহরি সাতকড়ির কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ফিসফিস করে সব বলল। নিজের চোখে যা দেখেছে সব। বেশ একটু বাড়তি রংচং মিশিয়ে।

ভ্রূ কুঁচকে, শরীর টান করে সাতকড়ি সব শুনল, তারপর বলল, এ আর ভাবাভাবির কি আছে ভায়া। ব্যাপারটা তো দিনের আলোর মতন স্পষ্ট।

স্পষ্ট? বকের মত রাখহরি গলাটা বাড়িয়ে দিল।

চোরা কারবার আর কি। সীমানার দু পাশে সবাই যা করছে।

ব্রজগুড়োর ওপর সাতকড়ির যথেষ্ট রাগও ছিল। লোকটা তো সাতকড়িকে একেবারে পাত্তাই দেয় না। আড়ালে নাম দিয়েছে নর্দমার পোকা। যেদিকে পাঁক, সেদিকে মোষেরা সেদিকেই নজর। লোকের ভাল দেখতে পারে না। তার ওপর ব্রজগুড়োর এক বিঘে নাবাল জমির ওপর সাতকড়ির অনেকদিন ধরে নজর ছিল। ভেবেছিল লোকটার সংসারে আপনার বলতে কেউ নেই। এত জমিজমা নিয়ে করবেই বা কি। একটু ধরাধরি করলেই সস্তায় ছেড়ে দেবে।

কিন্তু হিতে বিপরীত। ব্রজগুড়ো ভাল করে কথা বলল না। অনেকবার অনুরোধ করার পর পরিষ্কার বলে দিল, জমি সে বিক্রি করবে না। যদিই বা কোনদিন করে, সাতকড়ির মতন লোককে তো নয়ই।

কেন আমাকে নয় কেন?

নরখাদক পশু আর মামলাবাজ মানুষকে প্রতিবেশী করতে নেই। আখেরে ঠকতে হয়।

সাতকড়ি একটি কথাও বলে নি। উঠে চলে এসেছে। আওতার বাইরে এসে প্রতিজ্ঞা করেছে, ব্রজবিলাসকে গাঁ থেকে যদি উচ্ছেদ করতে না পারে তো সে ঘোষের পোই নয়।

এতদিন অনেক চেষ্টা করেছে, কিন্তু সুযোগ পায় নি, নিরিপ্ত মানুষটাকে জড়াবার কোন জাল। এতদিনে ভগবান বোধ হয় মুখ তুলে চেয়েছেন।

তুমি আর দেরী কর না রাখহরি।

সাতকড়ি উপদেশ দিল।

কিন্তু কি করব?

তুমি আর কি করবে? এসব কাজে তোমার করবার কি আছে?

তবে?

সোজা গিয়ে থানায় খবর দাও। যা করবার তারাই করুক।

থানায়!

হাতের গামছাটা রাখহরি আরো জোরে জোরে ঘোরাতে লাগল। পৃথিবীর সব-বাতাস যেন বন্ধ হয়ে গেছে। হাঁপ লাগছে।

থানা এখান থেকে মাইল সাতেক। সেজন্য নয়, হাঁটতে রাখহরি খুব পারে। কিন্তু পুলিশ চৌকিদারদের দেখলেই কেমন শরীরটা ঝিমঝিম করে, অসুস্থ হয়ে পড়ে। এসব কথা তো আর সাতকড়িকে বলা চলে না।

তাই রাখহরি শুধু বলল, তুমিও সঙ্গে চল সাতকড়িদা। যাহোক তুমি গাঁয়ের একটা মাতব্বর লোক, তোমাকে সমীহ করবে।

সাতকড়ি খুশী হল, তবু একটু ইতস্তত করে বলল, আমি গেলে তো হবে না রাখ, আমি তো আর নিজের চোখে দেখি নি। শোনা কথায় এজাহার দিই কি করে! আইনের ঘোপে টিঁকবে না যে।

ঠিক আছে, রাখহরি সঙ্গে সঙ্গে একটা মতলব ঠিক করে ফেলল, তুমি নিজের চোখেই দেখ সাতকড়িদা। একটা রাত আমার ঘরে থাক, অসুবিধা আর কি।

কথাটা মন্দ নয়। নিজের চোখে দেখার ইচ্ছাটাও সাতকড়ির খুব। এতে তো আর ভয়ের

কিছু নেই। এমন নয় যে মাঝরাতে লাঠি হাতে ডাকাতের দলের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে হবে কিংবা আর মাইল দৌড়ে সিঁধেল চোরকে গ্রেপ্তার করতে হবে। এ শুধু একজনের উঠানে দাঁড়িয়ে আর একজনের গতিবিধি দেখা।

সাতকড়ি রাজী হয়ে গেল।

ব্যবস্থা সাতকড়ির। কিছুটা রাখহরিরও। দুজনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পায়ের পেশীতে টান ধরে গেল, কিন্তু ব্রজখুড়োকে বেরোতে দেখা গেল না।

ধৈর্য হারিয়ে অস্থির হয়ে সাতকড়ি বলল, কই রে, ব্রজখুড়ো তো দিব্যি ঘুমাচ্ছে। মাঝখান থেকে আমাদেরই অবস্থা কাহিল।

অপ্রস্তুত রাখহরি সান্ত্বনা দিল, কি জানি সাতকড়িদা, আজ তো ব্রজখুড়ো বের হল না। অবশ্য বোঝে যে বেরোবে, তারই বা কি কথা। সওদা করার মতন কিনিস কি আর রোজ হাতের মুঠোয় থাকে।

অনেক বলে কয়ে রাখহরি সাতকড়িকে আর একটা রাত আটকাল। ফিকে জ্যোৎস্না। অস্পষ্ট হলেও, সব কিছু অদৃশ্য নয়।

একটু রাত হতেই দেখা গেল ব্রজখুড়ো আস্তে আস্তে এসে উঠানে নামল। এদিক ওদিক দেখল তারপর ওপারের বাঁশঝাড়ের দিকে পা চালাল।

রাখহরি আর সাতকড়ি একেবারে দেয়ালের সঙ্গে মিশে গিয়ে রুদ্ধ নিশ্বাসে সব কিছু দেখল।

আশ্চর্য কাণ্ড। বসিরের বাড়ী পর্যন্ত ব্রজখুড়ো গেল না। ওপার থেকে চাদর মুড়ি দিয়ে কে একজন বেরিয়ে এল। বসিরই বোধ হয়। দুজনে বাঁশঝাড়ের আড়ালে দাঁড়াল।

মিনিট কুড়ি কিংবা তার একটু বেশীই হবে। রাখহরি আর সাতকড়ির ঘড়ির বা অবস্থা তাতে সময়ের হিসাব রাখা সম্ভব নয়।

আবার ব্রজখুড়ো নিজের বাড়ীর দিকে ফিরে এল।

হয়ে গেল। উত্তেজিত চাপা কণ্ঠে সাতকড়ি বলল।

সাতকড়িকে ঘরের মধ্যে টেনে নিয়ে যেতে যেতে রাখহরি জিজ্ঞাসা করল, কি হয়ে গেল?

সেনধেন আর কি। তক্তপোষের ওপর বসতে বসতে সাতকড়ি বলল, চাদর চাপা দিয়ে বসিরই কোন জিনিস নিয়ে এল বোধ হয়, সেটাই হাত বদল করল। আর দেরী নয় রাখ, কাল ভোরে উঠেই পলাশপুর থানায় খবর দিতে হবে। এইবেলা ঘরদোর খানাতল্লাসী করলে হয়তো হাতেনাতে ধরা পড়বে। এরপর জিনিস পাচার করে দেবে।

আনন্দে সাতকড়ি বাকি রাতটা ঘুমাতে পারল না। মাদুরের ওপর ছটফট করল। ব্রজখুড়োকে আইনের প্যাচে ফেলতে পারলে তার জমিজমা হাতের মুঠোয় আসতে মোটেই দেরী হবে না। বাবাল জমিটা কেন, বাস্তু ভিটেটাই কায়দা করে দখল করা যেতে পারে।

সাতকড়ি উঠে বসল। কানলা দিয়ে নজর রাখল ব্রজখুড়োর বাড়ীর দিকে। কোন শব্দ নেই। কতকগুলো জোনাকি ঘুরপাক খাচ্ছে আর প্রহরে প্রহরে শিয়ালের ডাক তো আছেই।

থানার অফিসার খুব মনোযোগ দিয়ে কথাগুলো শুনলেন। সীমান্তে অষ্টপ্রহর এইসব চলছে। এপারের জিনিস ওপারে যাচ্ছে, ওপারের জিনিস আসছে এপারে। বিরাট একটা দল হলে পুলিশের ধরার পক্ষে খুব সুবিধা। কিন্তু তাতো নয়, একেবারে ধারে ধারা বাস করে, আপাতদৃষ্টিতে নিরীহ

গোয়েন্দারা লোকজন তারাই এদের চোরাকারবারে অংশ নিচ্ছে। এই ব্রজখুড়োদের মতন লোক। সেইজন্যই পুলিশ নাকেদাল হয়ে যাচ্ছে ঠিক ধরতে পারছে না।

অফিসার ঘাড় নাড়লেন, ঠিক আছে, আজ সন্ধ্যাবেলা দুজন সেপাই পাঠিয়ে দেব। তোমরা কিছু গাঁয়ের লোকও জড় করে রেখ। এদের ধরতে গেলেই একটা হাঙ্গামা হয়। ওপার থেকে আবার গুলিগোলা না চালায়।

রাখহরি আর সাতকড়ি ফিরে এল। গাঁয়ের দু একজন মাতব্বরকে বলাই ছিল। দরকারের সময় তারা এসে দাঁড়াবে। আর পুলিশ যখন সঙ্গে থাকবে তখন আর ভয়টা কি!

দুজন সিপাই বিকেলের দিকেই এসে হাজির হল। দুজনের হাতে বন্দুক।

রাখহরি অবশ্য চায় নি এত আলো থাকতে পুলিশ দুটো এসে জোটে কারণ ব্রজখুড়ো একবার টের পেলেই সাবধান হয়ে যাবে। ওপারেও হয়তো ইশারা করে দেবে। ব্যস, এত পরিশ্রম সব বিফলে যাবে। চোরাই মাল সরিয়ে ফেলে নিজে সাধু সেজে বসে থাকবে।

শেষকালে মিথ্যা অভিযোগ দায়ের করার জন্য রাখহরিদের হেনস্তার একশেষ হবে। সিপাই দুটোকে রাখহরি নিজের বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়ে দিল। বারণ করে দিল, যেন উঁকি ঝুঁকি না দেয়। দরকারের সময় ঠিক তাদের ডাকবে।

অন্ধকার নামতেই দু'একজন করে রাখহরির উঠানে এসে জমল। কয়েকজন বসল দাওয়ার ওপর। দু একজন এগিয়ে গোপঝাড়ের আড়ালে দাঁড়াল। হাতে লাঠি, সড়কি, বল্লম কি জানি, কখন কি দরকার লাগে।

রাত এমন কিছু বেশী নয়। অন্ধকার ঘাটে গাঢ় অন্ধকার একটা ছায়া দেখা গেল। ব্রজখুড়ো সন্তর্পণে বের হচ্ছে।

পাশে দাঁড়ানো পুলিশ দুটোর গা টিপে রাখহরি দেখিয়ে দিল, ঐ দেখ যাচ্ছে।

একটু পরেই ওপার থেকে আর একটা ছায়ামূর্তিকে এগিয়ে আসতে দেখা গেল।

রাখহরি সেদিকেও দেখাল।

পুলিশ দুজন গুঁড়ি দিয়ে এগিয়ে গেল। একেবারে হাতে হাতে ধরতে হবে। কোনরকমে সীমানার ওপারে না চলে যায়। তাহলেই ধরার পক্ষে আইনগত নানা অসুবিধা দেখা দেবে।

ঠিক যে সময়ে এদিকের ব্রজখুড়ো ওদিকের ছায়ামূর্তির খুব কাছে গিয়ে দাঁড়াল, সেই মুহূর্তে গোটা দুয়েক টর্চের কড়া আলো এসে পড়ল। লোকগুলো হৈ হল্লা করে উঠল। দেখা গেল ওপারের ছায়ামূর্তিটা বসির মিয়ার, আগের মতনই সর্বাঙ্গে কাপড় জড়ানো।

ধাক্কাধাক্কি, গালাগালি। উত্তেজনার মুখে কে একজন ব্রজখুড়োকে সজোরে ঠেলা দিল। বকবামিক, তলায় তলায় এইসব হচ্ছিল?

ঠেলাটা বোধ হয় একটু জোরেই হয়েছিল। ব্রজখুড়ো ছিটকে মাটিতে পড়ে গেল।

বসির মিয়া চীৎকার করে উঠল, আহা কি করছেন আপনারা। খুড়োমশাইকে মেরে ফেলবেন না কি?

আগে বসির এক গাঁয়ের লোক ছিল, আজকাল একেবারে ভিন রাষ্ট্রের বাসিন্দা হয়েছে। সকলের সঙ্গেই খুব জানা শোনা।

ডিস্পেন্সারের বন্ধ হয়ে গেছে। কারবারটা বন্ধ হয়ে যাবে বুঝি? মালগুলো দেখি।

সঙ্গে সঙ্গে সাহেবটি কাপড়টা ঘরে টান দিল, তারপর হতভম্ব হয়ে একপা দুপা করে পিছিয়ে এসে দাঁড়াল।

বসির মিয়ার কোলে এক শিশু। ঘুমন্ত ছিল, এত লোকের চীৎকারে জেগে উঠে বিস্ফারিত নেত্রে চেয়ে চেয়ে দেখছে।

শিশুটিকেও প্রায় সকলেই চেনে। বসিরের কনিষ্ঠ পুত্র হোসেন।

বসিরই বরাবরের বলল, এই হোসেনকে দেখবার জন্যই প্রায় খুড়ো মশাই আসেন। দিনে তো আসবার উপায় নেই, তাই রাত্রে আসেন। পাছে আমাদের তরফের লোক দেখতে পায়, কিছু মনে করে তাই হোসেনকে কাপড় জড়িয়ে আমি কিছুটা এগিয়ে যাই। বাঁশঝাড়ের কাছ বরাবর। জানেন তো খুড়োমশাইয়ের এক নাতি ছিল, ঠিক হোসেনের বয়সী। তিনকুলে আপনার বলতে আর তাঁর কেউ ছিল না। সেটিকেও তো খোদা কেড়ে নিয়েছেন। সেই থেকে খুড়ো প্রায় আধ পাগল হয়ে আছেন। আপনারা খুড়োমশাইকে একটু দেখুন।

শেষদিকে বসিরের গলা আবেগে রুদ্ধ হয়ে গেল।

সকলে ব্রজখুড়োর দিকে চোখ ফেরাল। অচেতন দেহ। প্রসারিত একটা হাতের কাছে ইংরেজি মাটির পুতুল। কিন্তু অক্ষত নেই। ভেঙে গুঁড়িয়ে গেছে।

ফেস্টিভ্যাল অ্যাকাউন্ট

আগামী বছরের পূজার খরচের জন্য আমাদের রেকারিং ডিপোজিট স্কীমে
ফেস্টিভ্যাল অ্যাকাউন্ট খোলার এখনই উপযুক্ত সময়।

এছাড়া আমাদের দীর্ঘমেয়াদী রেকারিং ডিপোজিট অ্যাকাউন্টে আকর্ষণীয় সুযোগ সুবিধা আছে।

সেবায় প্রতীক

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ

রেজিঃ অফিস: ৪, ক্লাইভ ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আমরা সেবার সাথে দিই আরও কিছু

লঘুমেঘ

অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

সারা দিন গৃহিণী দুই অতিথি নিয়ে ব্যস্ত রইলেন। পঁচিশ বছর আগে যে ঘটনাকে কেন্দ্র করে তাদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় এবং যে ঘটনার প্রতিক্রিয়া কয়েকদিনের জন্যে আমাকেও বিষম ধাক্কা দিয়েছিল তা নতুন করে মনে পড়ল।

কাশী গিয়েছি, এবং দুচার দিনেই হাঁপিয়ে উঠেছি। স্ত্রীকে ডেকে বললাম—বেরিয়েছিলে তাজমহল দেখতে। কাশীর নামে তো নাক সিঁটকে উঠেছিলে। কিন্তু এখানে আসবার পর থেকে তো দেখছি তোমার ধর্মকর্মের আর শেষ নেই। হল কি? আমাকে পর্যন্ত ভুলে দেতে বসেছো বলে মনে হচ্ছে! স্ত্রীচরিত্রম কথাটা মানতে হল দেখছি।

গৃহিণী হেসে বললেন—বেঁচে থাকতে হলে অনেক কিছুই মানতে হয়। এই তো সবে শুরু।

—রক্ষে কর। আর মেনে কাজ নেই। এখন তাড়াতাড়ি ফিরতে পারলেই বাঁচি!

উত্তরে তিনি শুধু মৃদু হাসলেন! বুঝলাম, আমার কথায় কোন গুরুত্ব দিলেন না।

বললাম—হাসছো যে? তোমার কাণ্ডকারখানা দেখে সত্যিই আশ্চর্য হয়ে গেছি। নাস্তিকের অগ্রগণ্য ছিলে তুমি, হঠাৎ কাশীতে এসে পুজো-আর্চা দেবদর্শন আর রামুন-খাওয়ানোর অন্ত নেই। একেই বলে মেয়েমানুষের মন।

অচলা ক্ষণকাল আমার মুখের পানে চেয়ে রইল, বোধকরি আমি কতখানি বিরক্ত বোধ করছি তা অনুমান করে নিল। তারপর তেমনি হাসিমুখে বললে—কিন্তু কথা ছিল যে একমাস দেশ-বিদেশ ঘুরে আমরা হনিমুন করব। এখনো তো পনেরো দিনও হয়নি। এরই মধ্যেই ফিরতে চাও!

বললাম—হনিমুনে বেরিয়েছিলাম সত্যি। কিন্তু এই কি হনিমুনের নমুনো। এসে পর্যন্ত তো বাড়ীর মধ্যেই একলা কুনো হয়ে বসে আছি, তাছাড়া ক্যাস বাক্সে যে ঘুন ধরাবার জোগাড়। রিটার্ন টিকিট আছে তাই বাঁচোয়া তা নাহলে তো হনিমুন করতে এসে বাড়ীতে টাকা পাঠাবার জন্যে তার করতে হত, "সেণ্ড মনি সুন" আর তাতে আমার মুখ চুন হ'ত।

আমার কথা শুনে অচলা সশব্দে হেসে উঠে বললে—তুমি কী সুন্দর পান্ দিয়ে কথা বানাতে পারো।

বললাম—বিদ্রূপ করছ?

অচলা জিভ কেটে বললে—বিদ্রূপ! ছি ছি, কি বলছ! আমি কি তোমাকে শ্লেষ করে বা তোমাকে শ্লেষ দেবার জন্যে কোন কথা বলতে পারি!

গম্ভীরভাবে বললাম—বেশ! তাহলে তোমার প্লেস ঠিকই রইল!

দু'জনেই হেসে উঠলাম। সন্ধি হয়ে গেল।

অচলা বললে—সত্যিই কি আর এখানে তোমার ভাল লাগছে না?

—সত্যিই ভাল লাগছে না।

—কেন বল তো ?

বললাম—তা আবার বলতে হবে। আজ ক'দিন ধরে তোমার চুলের টিকি দেখা যাচ্ছে না, তার খেয়াল আছে ?

—মেয়েমানুষের টিকি হয় না।

—আরে ওই হল! বাহুর কেশাগ্রভাগই হল! কেবল দেখছি, কতকগুলো অলভা পাতা আর বিলবা মেয়েছেলে। এদের নিয়েই চব্বিশঘণ্টা চৌ চৌ করে বেড়াচ্ছো। এতে কি আর মন মেজাজ ঠিক থাকে!

এতক্ষণে বোধ হয় আমার কথার কিছু ফল ফললো। অচলা আমার কাছে এসে বললে—তুমি রাগ করো না, লক্ষ্মিটি! কি করব মা যে বলে দিয়েছেন, এখানকার সব তীর্থ ঘুরে প্রণাম দিয়ে যেতে।

বললাম—কতগুলো তীর্থ সারলে ? বাকীই বা কত আর ?

অচলা জবাব দিলে—তা তোমার আশীর্বাদে সব সেরেছি। একটা কেবল বাকি আছে। কাল ভোর চারটের সেখানে যাব। ব্যস, তাহলেই কাজ শেষ।

—ভোর চারটেয় যেতে হবে! ইনি কোন্ দেবতা ?

অচলা বললে—ইনি খুব জাগ্রত দেবতা। এঁর পুজো দেবার জন্যে মার বিশেষ আদেশ আছে। মা বলেছেন, এঁর কাছে পুজো দিলে, এক বছরের মধ্যে তাঁর একটি টুকটুকে নাতি হবে।

হাসি পেল। রাগও হল। বললাম—সেজন্যে তো আমিই রয়েছি। মার নাতি যদি হয় আমার দ্বারাই হবে। সেজন্যে ভোর চারটেয় উঠে…

আমার মুখে হাত চাপা দিয়ে আরক্ত মুখে অচলা বললে—কী যে বল। মুখে কিছু আটকায় না। দিনদিন তারী অশ্লীল হচ্ছ তুমি!

—তোমার অ্যাকশনে আমার রি-অ্যাকশন! কলাবিদ্যা পড়নি তো ? জানবে কোত্থেকে!

—আর জেনে দরকার নেই। আমি এখন চললাম।

—তা যাও। তাহলে কালই তোমার তীর্থধর্মের শেষ। কাল সকালেই যদি শেষ হয় তাহলে চল না কেন, কালই এখান থেকে এলাহাবাদ রওনা হই। সেখানে নিতাই মামার কাছে দিন দুই থেকে, আগ্রা হয়ে কলকাতা।

অচলা বললে—তোমার ইচ্ছেতেই আমার ইচ্ছে। তুমি যদি সেই ব্যবস্থা করতে চাও, তাহলে তাই হবে।

খুশী হয়ে বললাম—বাবা বিশ্বনাথ তোমার সুমতি বজায় রাখুন। কাল দুপুরেই তাহলে রওনা!

অচলা ঘাড় নেড়ে বললে—যো হুকুম!

* * * *

পরদিন।

ভোরবেলায় অচলা দু'তিন জন বয়স্কা সঙ্গিনীর সঙ্গে বেরিয়ে গেছে।

আমি মুখ হাত ধুয়ে ভৃত্য মুন্সীর সাহায্যে চা খাওয়া শেষ করে মোটঘাট বাঁধতে লাগলাম।

লাগেজ বেঁধে শহর ঘুরে ষ্টেশন হয়ে যখন বাড়ি ফিরলাম তখন এগারোটা বেজে গেছে।

তাড়াতাড়ি চান খাওয়া সেরে নেওয়া দরকার। সময় বেশি নেই। খুশীর মুখে শুনলাম, গৃহিণী কিছুক্ষণ আগে ফিরেছেন।

দোতলায় ওঠবার সময় কানে এলো, অচলা যেন কার সঙ্গে কথা বলছে। আমার পায়ের শব্দ শুনে কথাবার্তার সুর মিলিয়ে গেল। কিছুক্ষণের নীরবতা, তারপর চাবিচুড়ির শব্দ করতে করতে অচলা আমার সুমুখে এসে বললে—এলেছো!

স্পষ্ট দেখতে না পেলেও, আলোর পিছনে অদূরে যে একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে তা বুঝতে দেরী হয়নি।

বললাম—হ্যাঁ। টিকিট কিনে নিয়ে এলাম।

আমার কথায় কান না দিয়ে অচলা মেয়েটিকে কাছে এনে আমায় বলল—চিনতে পারছো?

চেয়ে দেখলাম, কিন্তু চিনতে পারলাম না।

বললাম—মনে হচ্ছে যেন কোথায় দেখেছি।

—চিনতে পারোনি?

ঘাড় নাড়লাম।

চিনতে না পারাটা যেন মস্ত একটা অপরাধ হয়েছে আমার এইভাবে অচলা বললে—সেই যে সেবার চাকা থেকে ফেরবার সময় ষ্টীমারে এর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। কতক্ষণ গল্প করলাম এর সঙ্গে। তুমি জিগেস করাতে বললাম, এর নাম নমিতা, বসবার আমাদের পাশের বাড়িতে অনেকদিন ছিল। এত সব কথা হল, আর এরই মধ্যে ভুলে গেলে আচ্ছা, ভুলো মন তো তোমার।

হেসে বললাম—তাতে আর সন্দেহ নেই! তা এঁরা বুঝি এখানে বেড়াতে এলেছেন?

অচলা কি বলতে যাচ্ছিল, থেমে গেল। তারপর বললে—অ্যাঁ, হ্যাঁ। হ্যাঁ শোন, খুশীকে দিয়ে তোমার সেই চেনা গাড়োয়ানটাকে ডেকে পাঠাও। তার গাড়িতেই যাব।

—কোথায় যাবে?

—নমিতাকে নিয়ে বেরুবো।

—বেশী দেরি হবে না তো?

অচলা নমিতা নাম্নী মেয়েটিকে নিয়ে পাশের ঘরে যেতে যেতে বললে—হ্যাঁ, এবেলা ফিরতে পারবো না। নেমন্তন্ন আছে। তুমি সকাল সকাল খেয়ে নিও। আমরা সন্ধ্যার আগেই অবিশ্যি ফিরবো।

সেকি! পকেটে হাত দিয়ে দেখলাম, টিকিট দু'খানা যথাস্থানেই আছে।

বললাম—একবার এদিকে শুনে যেয়ো তো।

ভিতর থেকে উত্তর এলো—আসছি।

বেশ কিছু সময় পরে অচলা বেরিয়ে এলো। বিলম্বের কারণ বুঝতে দেরী হল না। শুধু শাড়ী বদলানো নয়। প্রসাধন পর্যন্ত সারা হয়ে গেছে।

তাকে কাছে ডেকে বললাম—এখন আবার বেরুলে তো ট্রেন ধরা যাবে না।

—ট্রেন! কোথায়? কেন?

অন্ধ জল হয়ে গেল। বললাম—আজ যে আমাদের এলাহাবাদ···

—ওরে! তোমায় বলতে ভুলে গিয়েছিলাম। আজ যাওয়া হতে পারে না।

—কিন্তু টিকিট কেনা হয়ে গেছে যে!

—কিন্তু যাবার উপায় নেই।

—কেন নেই?

—সে বড় গুরুতর কারণ। সময়ান্তরে বলব। এখনি নমিতাকে নিয়ে আমায় বেরুতেই হবে। তাছাড়া···

—তাছাড়া কি?

—রাত্রে একজনকে নেমন্তন্ন করে এসেছি। লক্ষ্মীটি! রাগ করো না তিনচারদিন পরেই যাব।

এরপর আর বলবার মত কথা খুঁজে পেলাম না। জোর করতে পারতাম। প্রবৃত্তি হল না। কেমন যেন একটা গ্লানি অনুভব করলাম।

অচলা সেই মেয়েটিকে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

• • • •

সন্ধ্যার পর বাসায় ফিরে নীচে খুশীর মুখে শুনলাম, অচলা কিছুক্ষণ আগে ফিরেছে, সকালের সেই মেয়েটিও এসেছে।

উপরে উঠতে ইচ্ছে হল না। নীচের ঘরে তক্তপোষে বসে ভৃত্যকে মোড়ের দোকান থেকে চা আনতে বললাম। খুশী আমার কাছ থেকে পয়সা নিয়ে বেরিয়ে গেল।

মিনিট খানেক পরে দরজার প্রান্তে মানুষের ছায়া পড়ল। অল্প আলোয় চিনতে পারলাম না। বললাম কে?

উত্তর এলো—অচলা দেবী কি এই বাড়ীতে থাকেন?

—হ্যাঁ, থাকেন।

লোকটি এবার ভিতরে এসে দাঁড়াল। এক নবীন যুবা, সুশ্রী ও সুবেশ। বয়সে আমার চেয়ে কিছু ছোটই হবে!

বললাম—কাকে চান?

—অচলাদেবীর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। আমার আসবার কথা ছিল। তিনি জানেন।

—ও! কথা ছিল এবং তিনি তা জানেনও! একটু থেমে জিজ্ঞেস করলাম—মশায়ের নামটি জানতে পারি কি?

—আমার নাম প্রমোদ রায়। ওঁকে খবর দিলেই তিনি বুঝতে পারবেন।

খুশী চা নিয়ে এসে ঘরে ঢুকল। তাকে দিয়ে উপরে খবর পাঠালাম।

সঙ্গে সঙ্গে অচলা নীচে নেমে এলো। কলকণ্ঠে অভ্যর্থনা জানিয়ে বললে—এসেছেন তাহলে। আমরা তো ভেবেছিলাম, এলেন না। আসুন, ওপরে চলুন।

আমার দিকে চেয়ে বললে—তুমি কতক্ষণ ফিরলে? যাঃ। খবর দাওনি তো। একলা অন্ধকারে বসে আছ। আসুন, প্রমোদবাবু।

প্রদোষ নামক ব্যক্তিটি এগিয়ে গেল। তারপর যেন যেমন তার পালককে অনুসরণ করে তেমনি অনুগতভাবে অচলার পিছনে পিছনে উপরে উঠে গেল।

আমি হতবুদ্ধি হয়ে যেমন বসেছিলাম তেমনি বসে রইলাম।

• • • •

তারপর থেকে প্রদোষ প্রায় প্রত্যহই আসছে।

বহুক্ষণ ঘরে উপরে বসে হাসিমুখ চলে, তারপর সে এক সময় নীচে নেমে আমার ঘরের সামনে দিয়েই নতমস্তকে বেরিয়ে যায়।

বৈঠকখানায় বসে আমি প্রত্যহ তার এই আসা যাওয়া লক্ষ্য করছি।

সে আমার অস্তিত্ব আর উপস্থিতি নিশ্চয়ই জানতে পারে। কিন্তু কোনদিন ভদ্রতা রক্ষার খাতিরেও আমার সঙ্গে দুটো কথা বলে যায় না। বরং আমার সামনে দিয়ে যাবার সময় তার মধ্যে যেন কেমন একটা সন্ত্রস্ত ভাব দেখা যায়।

সন্ত্রস্ত ভাব দেখা যাবেই তো! রুদ্ধ আক্রোশে ভাবি এই পথ ধরে যারা জীবনযাত্রা সুরু করেছে তাদের বোধ করি এই ভীতি।

কিন্তু অচলা! তার মতিগতি হঠাৎ এমন হল কি করে? আমারই চোখের সামনে অন্য এক পুরুষকে নিয়ে মাতামাতি! কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। একেই কি বলে মেয়েমানুষ এদের লক্ষ্য করেই কি চাণক্য পণ্ডিত বলেছেন বিশ্বাসং নৈব কর্তব্যং স্ত্রীষু···?

অসহ্য লাগত, সর্বাঙ্গে আগুন ধরত যখন অচলা প্রদোষের সঙ্গে সদর দরজা পর্যন্ত অনুগমন করে তাকে পরদিন আসবার জন্যে অনুরোধ জানিয়ে বিদায় দিত!

অসহ্য জ্বালা। দিন দিন বেড়েই চলল।

• • • •

অচলার সঙ্গে আজকাল দেখাশোনা বেশি হয় না।

নমিতা মেয়েটি সেদিন থেকে আমাদের বাসাতেই আছে। অচলা তাকে নিয়ে পাশের ঘরে থাকে। এবং দিনরাতের প্রায় সর্বক্ষণই তার সঙ্গে কাটায়, অপরাহ্ণ বেলায় প্রদোষ আসে। রাত আটটা নটার পর যায়। কোন কোন দিন তিনজনে বেড়াতে বেরিয়ে যায়।

দুপুরে যখন খেতে বসি তখন মাঝে মধ্যে অচলা হয়ত এসে দাঁড়ায়।

সেই সময় দু'চারটে কথা বলবার সুযোগ পাই।

কবে আমরা কাশী ছেড়ে এলাহাবাদ বা কলকাতায় যাব, আমার এই প্রশ্নের সোজা উত্তর এড়িয়ে গিয়ে হাসিমুখে অচলা বলল—শিগগিরই যাব। আর দু'চারদিন পরেই তোমায় বলব।

—ওই মেয়েটা কি এখানেই থাকবে?

—কার কথা বলছ? নমিতার?

—হ্যাঁ। আর কোন মেয়ে এ বাসায় আছে বলে তো জানি না।

আমার কথা শুনে অচলা হেসে উঠল। মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত বোধ করলাম।

বললাম—নমিতা যে নির্বিবাদে দিনরাত তোমার কাছে রয়েছে এতে ওর আত্মীয়রা আপত্তি করে না?

অচলা জবাব দিলে—এতদিন তো করেনি। এইবার বোধ হয় করবে।

বললাম—করাই তো উচিৎ। যাক—ওকথা। এখন বল দিকি, আর কতদিন এ ব্যাপার চলবে?

কথাগুলোর মধ্যে রীতিমতো আহত বিরক্তি প্রকাশ পেল। কিন্তু অচলা তার ধার দিয়েও গেল না। তৎক্ষণাৎ সহজভাবে বললে—আর দিন পাঁচেক।

পরক্ষণেই কান খাড়া করে কি যেন শুনে বলে উঠল—ওই বুঝি প্রদ্যোতবাবু এলেন। তুমি যাও। আমি এলাম বলে।

এই বলে সেই যে চলে গেল, সারা দিন তার দেখা পেলাম না। সে চলে যাবার পর আমি যে আর কিছু মুখে দিই নি, এ খবরটাও সে জানল না।

• • • •

সেদিন সন্ধ্যার সময় হঠাৎ এক টেলিগ্রাম এসে হাজির। আমার নামে তার। তাতে লেখা: "আজ রাতে রওনা হচ্ছি। মধুসূদন।"

মধুসূদন, সে আবার কে? মধুসূদন নামে কাউকে তো চিনি না। আমার কোন জ্ঞাতি বা কুটুম!

সজোরে স্মৃতিমন্থন করলাম। কিন্তু কৈ, কাউকেই তো খুঁজে পাচ্ছি না। তবে এ মধুসূদন কে? এবং কেনই বা তিনি আসছেন?

অচলা নমিতাকে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছিল, বাসায় ফিরে দরজার সামনে আমাকে দেখে আমার হাতের দিকে চেয়ে বললে—তার এসেছে বুঝি! যাক্, বাঁচা গেল। কখন এলো?

নমিতা আমাদের পাশ কাটিয়ে উপরে উঠে গেল।

বৈঠকখানায় ঢুকে বললাম—এইমাত্র এলো।

কিন্তু বোধ হয় ভুল হয়েছে। মধুসূদন নামে কে একজন তার করেছে আমার নামে। কিন্তু ··

অচলা বললে—ভুল হয়নি। তাঁকে আমি একটা চিঠি লিখেছিলাম। এ তারই জবাব।

অবাক হয়ে বললাম—কিন্তু টেলি তো আমার নামে!

অচলা জবাব দিলে—আহা, চিঠিখানা লিখেছিলাম তোমারই জবানিতে। আমি মেয়েমানুষ, কি লিখব। এটা আর বুঝছো না?

বুঝছি হাড়ে-হাড়ে।

কিন্তু সেকথা বলবার সময় এখন নয়।

বললাম—বুঝলাম। কিন্তু এ লোকটি কে? এবং এর আগমনই বা কেন?

অচলা জবাব দিলে—মধুসূদনবাবু নমিতার কাকা। যাক, কাল আসছেন তাহলে। বাঁচা গেল।

—তা তো গেল। কিন্তু কেন আসছেন?

—নমিতার বিয়ে দিতে।

—তিনি থাকেন কলকাতায়। তাইঝির বিয়ে এখানে? কথাটা যেন কেমন কেমন ঠেকছে না?

অচলা এবার তক্তপোষের উপর বসল। বললে—বোসো।

বসলাম।

অচলা বলতে লাগল—এতদিন তোমায় কোন কথা বলিনি, পাছে আমার প্রাণ পণ্ড করে দাও এই ভয়ে। কিন্তু আর দেরী করা চলে না! শোন, তোমায় একটা গল্প বলি।

উৎসুককণ্ঠে বললাম—এবং তাড়াতাড়ি বল।

অচলার গল্প শুনতে লাগলাম—নমিতারা ঢাকায় থাকতো। সংসারে ওর ওই কাকা মধুসূদনবাবুই একমাত্র গার্জেন। তিনি কলকাতার সরকারী আপিসে চাকরি করেন।

—জানি কথা। তারপর?

—কয়েকদিন আগে সকালবেলা মন্দিরের কাছে হঠাৎ নমিতাকে দেখতে পাই। আমায় দেখে ও কেমন ভয়ে জড়সড় হয়ে যায়। আমি ওকে দেখে খুশী হয়ে কত কথা জিগেস করি, ও কিন্তু ভাল করে একটাও জবাব দিতে পারে না। ওর রকমসকম দেখে আমার যেন কেমন লাগে। ওকে একরকম জোর করেই আমাদের বাসায় নিয়ে আসি। তারপর আমার কাছে বেশিক্ষণ চেপে থাকতে পারেনি। কিছুক্ষণের মধ্যেই ওর সব কথা জেনে নি।

এই বলে অচলা আমার কানের কাছে মুখে এনে ফিস ফিস করে যা বলল তা শুনে দুই চোখ বিস্ফারিত করে বললাম—বল কি। কি দুর্নীতি। কিন্তু তুমি এই ইলোপমেন্টে সহায়তা করছ কি বলে।

অচলা বললে—তুমি বল কি! দেখে শুনেও নিশ্চিন্ত থাকবো! প্রদোষ তো প্রথমে বিয়ে করতে রাজীই হয় না। বলে, উনিই তো জোর করে চলে এলেন, আমি এ ভাবে আসতে রাজী ছিলাম না, যাই হোক, এখন কিছুদিন যাক, একটা চাকরি বাকরি জোগাড় করি, তারপর হবে। শোন তো কি সর্বনেশে কথা! সহজে কি রাজী হয়। এই ক'দিন প্রত্যহ ওকে বোঝাতে হয়েছে। শেষে ভয় দেখালাম, বললাম যে তুমি কলকাতায় পুলিশমন্ত্রীর দপ্তরে বড় কাজ কর, ইচ্ছে করলে প্রদোষকে এখনি ধরিয়ে দিতে পারো, এখানকার পুলিশ মহলেও তোমার খুব জানাশোনা, তখন কতকটা ভয়ে ভয়ে রাজী হল? দিন ঠিক হয়েছে। পরশু।

অচলার কথা শুনে প্রথমটা নির্বাক হয়ে রইলাম। তারপর ভাবের আতিশয্যে তার পিঠে চাপড় দিয়ে বলে উঠলাম—তুমি সত্যিই আশ্চর্য!

"এ কি মুক্তি। এ কি পরিত্রাণ…"

হঠাৎ আমার মুখের হাসি বন্ধ হয়ে গেল। অচলার মুখের পানে চেয়ে বললাম—তুমি তো একটা অবুঝ প্রাণ নিয়ে খেলা সুরু করেছিলে, এদিকে আমার যে কী অবস্থা হয়েছিল তা তো জানো। আর কিছুদিন হলে বোধ হয় পাগল হয়ে যেতাম।

আমার মুখের ভাব দেখে আর গলার স্বর শুনে অচলার মুখের হাসি অন্তর্হিত হল। আরও ঘন হয়ে ঘেঁষে বললে—কেন বল তো?

—কেন? গত কয়েকদিনের জীবনযাত্রার পাতাগুলো উল্টে দেখ, তাহলেই বুঝতে পারবে, অন্তত তোমার মতো বুদ্ধিমতীর বোঝা উচিৎ।

বহুক্ষণ অচলা কোন কথা বললে না, মুখ নীচু করে রইল, তারপর যখন মুখ তুলে চাইল তখন আমি সত্যিই বিস্মিত হ'য়ে গেলাম।

বললে—মনে মনে বুঝি খুবই কষ্ট পেয়েছিলে ?

তার কথায় শুধু একটু হাসলাম।

আপন মনে অচলা বলতে লাগল—ছি ছি। আপশোষে আমার মাথা খুঁড়তে ইচ্ছে করছে। যাক ক্ষমা চেয়ে আর লজ্জা বাড়াবো না। কিন্তু কালই আমরা কলকাতা রওনা হব।

বললাম—সে কি ! কাল মধুসূদনবাবু আসছেন। যখন এতটাই করলে···

বাধা দিয়ে অচলা বললে—না, আর নয়। তাঁর ভাইঝিকে তাঁর হাতে ফিরিয়ে দেব—ব্যস, তারপর তিনি যা ভাল বোঝেন করবেন। কালই আমরা এখান থেকে যাব। একমাসের ভাড়া দেওয়া আছে, মধুসূদনবাবু ইচ্ছে করলে এ বাসায় এখনো দশ পনেরো দিন থাকতে পারবেন।

—কিন্তু···

মাথা হাঁকিয়ে অচলা বললে - তোমার পায়ে পড়ি তুমি অমত কোরো না। এসব আমার আর একদণ্ডও ভাল লাগছে না !

• • • •

পরদিন যথা সময়ে মহীয় ভবনে মধুসূদনবাবুর শুভাগমন হল। বয়স হলেও বেশ শক্ত সমর্থ। মূর্তি কিছু উগ্র। পরিচয়াদির পর বললেন—মস্ত উপকার করেছেন মশায় ! কী উদ্বেগ। ভাগ্যে আপনি আর আপনার স্ত্রী ছিলেন, নইলে কি হত বলুন দিকি, এত বড় চাটুয্যে বংশের নামটা গঙ্গার জলে তলিয়ে যেতো। কী উদ্বেগ !

বললাম—যাক, এখন তো উদ্বেগের অবসান হয়েছে।

—তা হ্যাঁ, হয়েছে বটে, বজ্জাত মেয়েটা বুঝি আপনার স্ত্রীর কাছে ! উঃ শেষ কালে বিনা এই কাণ্ডটা করলে ! তা যা হোক, বিয়ে যখন হয়ে যাবে তখন আর কোন গোল নেই ! কি বলেন ?

—তা তো বটেই, আর কোন গোল নেই।

ঘনঘন মাথা নাড়তে নাড়তে বৃদ্ধ বললেন—যাক, তাহলেই বাঁচা গেল। উঃ ! কী উদ্বেগ ! বলা যায়, ছোঁড়াটা কাশীতে চাকরি করতে এসেছিল, তাই সেখানে গিয়েই ভাইঝির বিয়েটা দিয়ে দিলাম। কী বলেন ? তা সে ছোঁড়াটা কোথায় ? সে পাষ···

বাইরের দিকে উচ্চকণ্ঠে বললাম—এই যে আসুন প্রদোষবাবু !

প্রদোষ আমার আহ্বানে থতমত খেয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকল। মধুসূদনবাবুও আমার সঙ্গে সমান তালে বলে উঠলেন—এই যে এসো বাবাজী এসো ! শরীর গতিক ভাল আছে তো ? থাক, থাক, কল্যাণ হোক, কল্যাণ হোক।

বললাম—বসুন প্রদোষবাবু ! মধুসূদনবাবু আপনারা আলাপ করুন, আমি ওপরে খবর দিয়ে আসি।

• • • •

আমার কোন আপত্তি টেকে নি।

মধুসূদনবাবুর সনির্বন্ধ অনুরোধও না। সেইদিনই অচলার জেদে পড়ে আমাদের কাশী ছেড়ে কলকাতা রওনা হোতে হল।

দেশান্তর

সুবোধ বসু

দিল্লী থেকে আসবার আগে বন্ধু সেনগুপ্তই হোটেলটা সুপারিশ করেছিলেন। তিনি নিজে কখনও ওখানে থাকেন নি, তবে তাঁর এক বন্ধু একবার শিমলা এসে এই হোটেলে দু'হপ্তা কাটিয়ে যান এবং ফিরে গিয়ে সুখ্যাতি করেন। শিমলার সিসিল বা ক্লার্কের নাম সবাই জানে, কিন্তু মধ্যবিত্ত লোকের পকেটের সঙ্গে মানানসই সস্তাগণ্ডা হোটেলের নাম কলকাতার খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনে পড়া যায় না। তাই সেনগুপ্তর খবরটা নোট বইয়ে টুকে নিয়েছিলাম।

কালকা স্টেশন থেকে রওনা হবার পর পার্বত্য রেলগাড়ী এঁকে বেঁকে পাহাড়ে চড়তে চড়তে ক্লান্ত হয়ে শেষই ফোঁস ফোঁস করে নিশ্বাস ছাড়তে থাকে। একশো একটা টানেল পার হয়ে সেই গাড়ীর শিমলা পৌঁছতে যে বেলা দুটো বেজে যাবে, এতে আর আশ্চর্য কি। ফুলের যোগান দিয়ে সাজানো ছোট ছোট ইস্টিশান, কিন্তু বোর্গ ছাড়বার পর আর কোথাও খাবার মতো কিছু পাওয়া যায় না। সহযাত্রী এক মিলিটারী অফিসারের উপদেশ মান্য ক'রে বোর্গ স্টেশনে রেইনকোর্সমেণ্ট হিসেবে দ্বিতীয় দফা ব্রেকফাস্ট যথাস্থানে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। তাঁর সুপারিশ অনুযায়ী বোর্গ-এর জলও কিছু সঙ্গে নিয়েছিলাম—এমন জল নাকি সারা শিমলা পর্বতাঞ্চলে দুর্লভ। কিন্তু উৎকৃষ্ট জল যে কতটা বিপদে ফেলতে পারে শিমলা পৌঁছবার অনেক আগেই তা টের পাওয়া গেল। অবশেষে শিমলা স্টেশনে যখন গিয়ে হাজির হলাম, তখন মনে হলো দু'মাস কিছু খাইনি।

'গ্লু এঞ্জেল হোটেল। অ্যাটাচড্ বাথরুম। হট অ্যাণ্ড কোল্ড ওয়াটার। সিঙ্গেল সিক্সটিন রুপিস্।' 'স্নো ভ্যু হোটেল। নো ফ্লাইস্। ইণ্ডিয়ান অ্যাণ্ড কন্টিনেন্টাল ফুড। দিন বারো টাকা।' 'কস্-মোপলিটান হোটেল। অন্ দি ম্যাল। বার অ্যাণ্ড অরকেস্ট্র। দৈনিক সিঙ্গেল রোল, ডবল তিরিশ···' হোটেলের দালালেরা একের পর এক এক হাতে কার্ড গুঁজে দেবার চেষ্টা করছে এবং সশব্দ বিজ্ঞাপনে কান ঝালাপালা করবার উপক্রম করেছে।

'কাপুরের হোটেলের কোনও এজেণ্ট স্টেশনে হাজির আছেন কিনা বলতে পারেন?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'কাপুর্স হোটেল! শিমলায়? কই, নাম শুনিনি তো।' একজন হোটেল প্রতিনিধি বিস্ময় ভরে বললেন। 'ছিল কাপুর্স হোটেল। অনেক দিন উঠে গেছে।' অপর জন জানালে। শিমলের বেড়াতে এসেছেন, ভালো হোটেলে ওঠা চাই। আমাদের এ-ক্লাস্ হোটেল। দামও না হয় কিছু সুবিধে করে' দেব। কাপুর্স হোটেলে যাবেন কেন?···এ শর্মাজী, সুনিয়ে। ইনি আপনাদের হোটেলের খোঁজ করছেন। অথচ আমি আপনাকে ধরতেই পারছি না।'

শর্মাজী হাজির হবার আগেই সবাই ভিড়ের মধ্যে মিশিয়ে গেলেন।

এই শর্মাজীর দোলতে আমি অবিলম্বে কাপুর্স হোটেলে হাজির হলাম। বস্তুতঃ স্টেশনের এত কাছে শিমলার আর কোনও হোটেলই বোধহয় নেই, পরে তা আবিষ্কার করেছিলাম। হোটেলের

ঘর পছন্দ করার পর তাড়াতাড়ি সেরে ফেললাম। কাপুর নিজে এসে সব বন্দোবস্ত করে দিয়ে গেলেন। স্নান-কামরায় গরম জল দিয়ে যাবার হুকুম হলো। ভারতীয় না বিলিতী খাওয়া পছন্দ করব জেনে নিয়ে তিনি চলে গেলেন তার ব্যবস্থা করতে। স্নান সেরেই দেখি, গরম গরম খাওয়া হাজির।

হোটেলটি বড় নয়। একতলা আর দোতলা মিলিয়ে মোট গোটা পনেরো সিঙ্গেল ও ডবল রুম আছে। তারও প্রায় অর্ধেক খালি। অক্টোবর মাস শিমলার 'সীজন' নয়। তবু এ-কাজে ও কাজে বা বিনা কাজে কিছু লোক সব সময়ই শিমলায় আসে। এদের নিয়েই হোটেলগুলি কোনও রকমে বেঁচে থাকে। বছরে ব্যবসায় হয় না বলে কয়েকটা বড় হোটেল তো এসময় বন্ধই রাখা হয়।

কাপুর্স হোটেল মোটামুটি রকম ভালো করে' রাখা হোটেল। খুব দামি নয়, আবার খুব শস্তাও নয়। অবস্থানটি ভালো। হিমাচল প্রদেশ বিধানসভা থেকে কিছুটা পশ্চিমে এগিয়ে গেলে প্রথম যে রাস্তার মোড় পড়ে তার খুব কাছেই। মোল ম্যাল রোড থেকে কয়েক ধাপ মাত্র নিচে নামতে হয়। পশ্চিমে এক বা দেড় ফার্লং এগিয়ে গেলে সিসিল হোটেল, পুবে পাঁচ ছ ফার্লং এগুলে স্নোডেন পয়েন্ট আর রীজ।

কাপুর পরদিন নিজে নিয়ে গিয়ে আমাকে শিমলা কালীবাড়ি বেড়িয়ে নিয়ে এলেন। বললেন 'কালী বড় জাগ্রত দেবী। আমি প্রায়ই আসি। এলেই সামনের এই ঘন্টাটা নেড়ে দিই। এখানে তোমাদের বহু বাঙালী দেখতে পাবে। খুব ভালো না হলেও থাকারও এখানে ব্যবস্থা আছে। চল, একবার অফিসটা ঘুরে আসি। কমিটি মেম্বার কেউ যদি থাকেন আলাপ করিয়ে দেব।...'

বস্তুতঃ এর মারফতেই প্রথম কালীবাড়ি কমিটির সদস্যদের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। শিমলায় বাঙালির এত বড় জোরের জায়গা আর নেই।

অক্ষু হিলের মন্দিরেও কাপুরের সঙ্গেই গিয়েছিলাম। বাঁদর কাহিনীকে ভুট করে' মন্দিরের পথ নির্বিঘ্ন করবার কায়দাটা তিনিই শিখিয়ে দিয়েছিলেন। শহরের রাস্তায় এবং বাড়ীর ছাদেও এরা প্রায়ই হানা দেয়, কিন্তু অক্ষু হিলের মত জোর দেখাতে সাহস করে না।

কাপুর আমাকে একটু বিশেষ খাতিরই দেখিয়েছেন। হোটেলের মালিকের মর্জিকে রাস্তাঘাট চিনিয়ে দেওয়া কাজ নয়। হয় তো এ অঞ্চলে নিতান্ত আনাড়ী দেখেই শিমলার সঙ্গে প্রথম পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। প্রথম দু একদিনের পর আর তাঁকে যেতে হয়নি। আমি নিজেই শিমলার সাংঘাতিক চড়াই উতরাই ভেঙে নানা দুর্গম অঞ্চলের সঙ্গে পরিচয় করে' নিচ্ছি। সন্ধ্যার পর হোটেলে ফিরে এলে প্রায়ই কাপুর আমার ঘরে এসে বসেন। কোথায় কোথায় ঘুরেছি জিজ্ঞেস করেন। শিমলার রাস্তায় নাম লেখা থাকেনা বলে নানা রকম বর্ণনা করে তবে আমার ঘুরে আসা স্থানগুলি তার বোধগম্য ক'রে তোলা যায়।

একদিন তিনি নিজেই তাঁর বর্তমানের বিশেষ অতিথিদের সম্বন্ধে আমাকে ওয়াকিবহাল করলেন। এদের আসতে যেতে, সিঁড়ি দিয়ে উঠতে নামতে দেখেছি মাত্র। কারুর সঙ্গে আলাপ পরিচয় হয় নি। সবাই ঘুরছে। বসে গল্প করবার মত সময় কোথায়।

উপরতলায় একটা পুরো ফ্লাইট নিয়েছেন বম্বের কোন এক ফিল্ম প্রোডিউসার সঙ্গে প্রধান ও সহকারী ডিরেক্টর, প্রধান ক্যামেরাম্যান ও প্রোডিউসারের স্ত্রী। 'ভগবান জানেন, স্ত্রী কিনা।' কাপুর নির্লিপ্ত কণ্ঠে বললেন। 'হয়তো ফিল্ম-প্রোডিউসারের স্ত্রীরাও ফিল্মের নায়িকাদের মতোই

হাবভাব করেন। তবে বয়েসের তফাৎটা বড় বিশ্রী। যাক গে, ও সম্বন্ধে কৌতূহল আমার বিজনেসের মধ্যে পড়েনা।'

একজন মহারাষ্ট্রীয় যুবক ইন্টারভিউ দিতে এসেছে কেন্দ্রীয় সরকারের বিদ্যুৎ সরবরাহ বোর্ড-এর কাছে। সে সারাক্ষণ বই ওল্টাচ্ছে আর ভাইভাভোসির তত্ত্ব তৈরি হচ্ছে। লক্ষ্ণৌ থেকে এসেছে এক নববিবাহিত দম্পতি। সারাক্ষণ এরা ক্যামেরা কাঁধে করে ঘুরে বেড়ায়, পরস্পরকে ছাড়া আর কোনও কিছু তাদের নজরেই পড়ে না। চণ্ডীগড় থেকে এক শিখ কনট্রাক্টর প্রায় তিন হপ্তা ধরে' আছেন। এঁকে ওঁকে ভেট দিচ্ছেন, ডিনার খাওয়াচ্ছেন বড় বড় হোটেলে। লোক বাগাবার তালে সর্বদা ছুটোছুটি করে' বেড়াচ্ছেন। উপরতলার কোণের ঘরটিতে দুই বুড়ো-বুড়ী পূর্ব আফ্রিকার নৈরোবী থেকে এসে উঠেছেন। শিমলের বাড়ী কেনবার চেষ্টায়। কিনতে পারলে এখানেই অবসর নিয়ে থাকবেন, কিন্তু শিমলার প্রায় কোনও কিছুই পছন্দ হচ্ছে না তাঁদের—রাস্তা দুর্গম, দোকান পাট যথেষ্ট নয়, হাট বাজারের অসুবিধে, যান-বাহনের অসুবিধে, রাস্তায় লোকের ভিড় বেশি, জিনিষপত্রের দাম আকাশ এই সব হাজার রকম অভিযোগ। তবু বাড়ী কেনার চেষ্টার ত্রুটী নেই।

'ওদের সবারই কিছু না কিছু উদ্দেশ্য আছে। শুধু আপনিই বিনা কারণে শিমলা বেড়াতে এসেছেন।' কাপুর বললেন। 'এ জন্যই আপনাকে বিশেষ মনে করি, স্বতন্ত্র জ্ঞান করি। তা ছাড়া একটা সম্পর্কও রয়ে গেছে, কিছুতেই তা ভোলা যাচ্ছে না···'

'সম্পর্ক!' সবিস্ময়ে চোখ তুলে বললাম। 'কলকাতায় ছিলেন নাকি কখনও?'

'না, তা নয়।' কাপুর বললেন। 'কিন্তু আমিও একসময় উকিল ছিলাম। চোরে চোরে মাসতুত ভাই জানেন তো?'

প্রসন্ন কৌতুকোজ্জ্বল চওড়া হাসি কাপুরের রেখাঙ্কিত মুখে। বয়সকালে সুন্দর ছিলেন নিশ্চয়ই। কর্সা লম্বা দোহারা চেহারা, মুখটা চওড়া, কপালটা চওড়া, আজানুলম্বিত বলিষ্ঠ হাত। গা আমার উপর খদ্দরের কামিজ। তার উপর পশমী বাণ্ডি।

'তাই নাকি? তারি আশ্চর্য তো! তারপর কি হলো?' আত্মীয়তার সূত্র আবিষ্কার করে ক্ষুণ্ণ কণ্ঠে বললাম, 'পরের ঝামেলা বয়ে বেড়াতে আর ভাল লাগল না, কেমন?'

'ঠিক তা নয়। সে কাহিনী আরেক দিন বলব।' কাপুর উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আজ ডিনারের টাইম হয়ে গেছে। রান্নাঘরের কাছে এ সময়টা নিজে গিয়ে দাঁড়াই। পরের ঝামেলা ঘেড়ে ফেলবার উপায় কি? এখানেও অন্যের ঝামেলাই পোহাতে হয়—অন্যের পকেটের টাকা নিজের পকেটে টানবার অন্য কোনও ভদ্র উপায় নেই। নানা লোক, নানা রুচি, নানা ফরমাস, নানা রকম খাওয়ার। আপনি কোনও ফরমাস করেন না তাই আমার পছন্দমত খাওয়া পাঠাই। —অনেক পাঞ্জাবী ডিশ চালিয়েছি। আলু পরোঠা, ধাসের ডাল, সর্ষো শাগ, মটরপনীর, ছেঁ (মৃণাল)-র কোপ্তা। জানিনা পছন্দ করেছেন কিনা। কিন্তু যখন পাঞ্জাবে এসেছেন, তখন তার খাওয়াটা খেয়ে যাওয়া চাই। বিলিতি খাবার সবখানেই পাওয়া যায়। কালীবাড়ি থেকে বাঙালিখানাও আনিয়ে দিতে পারতাম। কিন্তু তা সাজেস্ট করিনি। খেতে খুব অসুবিধা হয় নি তো?···

'ভালই তো লাগছে।' আমি বললাম, 'দু একটা নতুন তরকারি খাচ্ছি বটে। মৃণালের কোপ্তা বা শুক্তির তরকারি বাঙলা দেশে হয় না। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে তফাৎ তো মাত্র কৌড়নের···'

'সারা হিন্দুস্থানে এই কৌড়নের তফাৎ ছাড়া আর তফাৎ কোথায়? একই সংস্কৃতি, একই চিন্তাধারা এমন কি ভাষাগুলির পঞ্চাশ ভাগ শব্দ এক। যা তফাৎ তা শুধু কৌড়নের!' বলে কাপুর সহাস্যমুখে অতিথি সৎকারের জন্য প্রস্থান করলেন।

লক্ষ্ণৌবাজার থেকে কাঠের কিছু প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় জিনিষপত্র কিনে ক্লান্ত হয়ে বীজের এক বেঞ্চিতে এসে বসেছি। পাহাড়ে এত প্রকাণ্ড চওড়া জায়গা আর কোথায় দেখিনি—দার্জিলিঙের চৌরাস্তার চারগুণ চওড়া। এখানে ছোটখাট একটা খেলার মাঠ হতে পারে। বস্তুতঃ খাদের ধারের রেলিং ঘেঁষে যে স্যালারিগুলি রয়েছে তা ভেতরের দিকে সরিয়ে এনে খেলার মাঠের স্যালারির মত চারদিকে সাজিয়ে দিয়ে ভেতরে খেলা পর্যন্ত হয় কখনো কখনো।

চমৎকার রৌদ্রে বীজের উজ্জ্বল পিচে-মোড়া প্রশস্ত অঙ্গন ভরে গিয়েছে। মহাত্মা গান্ধীর মর্মর মূর্তিটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আমার পেছনে দিগন্তব্যাপী বরফের পাহাড়। সামনে লাইব্রেরী গির্জার চূড়ো, ছোট শিমলে যাবার রাস্তা পেরিয়ে দূরে হারিয়ে যায় অন্তহীন পর্বতস্তরের মধ্যে। বৃহতের একটা ভাব আছে সারা শিমলা শহরে। এর পাহাড় উঁচু, মালার উঁচু, নিচে থেকে বহু ধাপ উঠে এসেছে এই শহর, বহুদূর ছড়িয়ে আছে।

'কিছু মনে করবেন না। বাঙালী কি?'

চমকে পাশে তাকালাম। আমার নিরপেক্ষ দর্শনের অবসরে বেঞ্চিতে পাশে এসে বসেছেন এক সহাস্যমুখ বছর চল্লিশের ভদ্রলোক। তার ভাষা শুনে সন্দেহ রইল না বাঙালি।

'আজ্ঞে হাঁ।' তাড়াতাড়ি জবাব দিলাম।

'কাপুরের হোটেলে উঠেছেন, তাই না? ক'দিন ধরেই আপনাকে লক্ষ্য করেছি। তখনই মনে হয়েছে বাঙালি। ক'দিন আছেন? পুজোটা থাকছেন তো। কালীবাড়িতে খুব ঘটা করে' দুর্গাপুজো হয়। আসুন না একদিন কালীবাড়িতে, সবার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব। আমার নিজের বাড়ীও কাপুরের হোটেল থেকে বেশি দূর নয়। একদিন এসে নিয়ে যাব। বিদেশে বাঙালী দেখলেই আপনজন বলে মনে হয়।' বলে অল্পক্ষণের মধ্যেই তিনি নিজ নাম, কোন অফিসে কাজ করেন, কত কাল শিমলা বাস করছেন একে একে জানিয়ে দিলেন এবং বিনিময়ে আমার নাম ধাম পরিচয় জেনে নিলেন।

'আশ্চর্য মানুষ এই কাপুর!' হোটেলে কেমন আছি, কোনও অসুবিধা হচ্ছে কিনা ইত্যাদি জেনে নিয়ে অবশেষে গাঙ্গুলী বললেন, 'এর ইতিহাস যদি বলি, ভাববেন গল্প বলছি। সত্যিই গল্পের মত চাঞ্চল্যকর! আপনি ভাবতে পারেন, হোটেলওয়ালা কাপুর ইচ্ছে করলেই পাঞ্জাবের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হ'তে পারতেন? ইচ্ছে করলেই।...'

গাঙ্গুলী প্রশ্ন না পেয়েই সেই চাঞ্চল্যকর ইতিহাস শোনালেন আমাকে। আমিও আগ্রহী করতেই এসেছি। বীজের রৌদ্রদীপ্ত আঙিনায় বসে পাঞ্জাব-বিভাগের সময়কার অন্ধকারাচ্ছন্ন ঘটনাবলী নীরবে শুনে গেলাম।

বিখ্যাত ব্যবহারজীবী ছিলেন কাপুর সাহেব হাইকোর্টে, যেমন নাম, তেমন আয়। এরপর যখন রাজনৈতিক মামলায় তিনি আসামীপক্ষ সমর্থন করতে লাগলেন বিনা পারিশ্রমিকে, তখন তার

খ্যাতি আরও ছড়িয়ে পড়ল। বলা বাহুল্য, এর পরের ধাপ কংগ্রেসে যোগদান। অল্পকালের মধ্যে কাপুর পাঞ্জাবের কংগ্রেস নেতাদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বলে স্বীকৃত হলেন। জেলে গেলেন কয়েকবার। সংগঠনের দিকে তাঁর দক্ষতা সর্বভারতীয় নেতাদেরও প্রশংসা অর্জন করল।

অবশেষে কংগ্রেস আন্দোলনের সাফল্য এলো দেশ বিভাগের মধ্যে। ইংরেজ বলল, 'স্বাধীনতা দিতে পারি, তবে মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র স্বাধীনতা স্বীকার করতে হবে। পাঞ্জাবকে আর বাংলাকে দু' দু' টুকরো করে পাকিস্তান আর স্বাধীন ভারতের মধ্যে বন্টন করে দেওয়া হবে।'

এই বিভাগকে স্বীকার না করে' আর কোনও উপায় ছিল না। দুঃখিত অন্তঃকরণে পাঞ্জাবও তাকে মেনে নিয়েছিল—যেমন বাংলাদেশ মেনে নিয়েছিল এই ভয়ঙ্কর অত্যাচার। সরকারী ভাবে লোক বিনিময়ের কোনও ব্যবস্থা হলো না বটে, দেশ বিভাগের সঙ্গে সঙ্গে ভীত সন্ত্রস্ত জনতা এদিক থেকে ওদিকে আর ওদিক থেকে এদিকে ছুটে পালাতে লাগল। পাঞ্জাবের এই স্বতঃস্ফূর্ত লোক-বিনিময় প্রচণ্ড বিস্ফোরণ সৃষ্টি করেছিল, তা এখন সুবিদিত।

প্রায় শেষ দিন পর্যন্ত কাপুর রয়ে গেলেন লাহোরে যারা ভারতবর্ষে পালিয়ে যাচ্ছে তাদের সাহায্য করবার জন্য। কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে তিনিই বোধ হয় শেষ পর্যন্ত লাহোরে ছিলেন। এবং একা নয়, সপরিবারে। চলে আসবার কত সুযোগ হয়েছে, বন্ধুরা অনুরোধ করেছেন, শত্রুরা ভয় দেখিয়েছে, কিন্তু তিনি তাঁর কর্তব্যে অবিচল হয়ে রইলেন। চারদিকে উন্মত্ত নরপশু রক্ত লালসায়, মাংস লালসায়, বিত্ত লালসায় পৈশাচিকতার তাণ্ডব করছে। কাপুরের মত মর্যাদা সম্পন্ন লোক না হলে কে আক্রান্তদের রক্ষার জন্য স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সহায়তা সংগ্রহ করতে সমর্থ হতো, ভীত সন্ত্রাসগ্রস্তদের মনোবল রক্ষা করতে পারত? যারা কাপুরকে, অন্ততঃ তাঁর পরিবারের মেয়েদের সরিয়ে দেবার পরামর্শ দিয়েছেন, তাদের কাপুর বলেছেন, 'এত মেয়ের ইজ্জৎ যখন বিপন্ন, তখন শুধু নিজের কথা ভাবলে চলবে কেন? কাপুর পরিবারকে দেখে অন্যেরা তবু সাহস পাবে ...'

এই মহত্ত্বের পুরস্কার পেয়েছিলেন তিনি ভালো রকমই। যখন শেষ 'রক্ষিত কনভয়' অমৃতসরে এসে পৌঁছল, তখন মনে হলো এক প্রেতবাহিনী যেন মধ্যরাত্রের শ্মশান থেকে দিনের আলোতে এসে উপস্থিত হয়েছে। কারুরই তর সাচ্ছে যেন এরা। রক্তের চিহ্ন ওদের কাপড়ে লেগে রয়েছে প্যাটরায়। যেন দুঃস্বপ্নের বিভীষিকা এদের মুখে চোখে। রক্তাক্ত দেহ করে নরপিশাচেরা খুন অপহরণ লুণ্ঠনের স্রোত বইয়ে গেছে।

অমৃতসর কংগ্রেসের লোকেরা এই প্রেতবাহিনীর মধ্য থেকে অতি কষ্টে কাপুরকে সনাক্ত করে নিয়ে গেল তাঁর জন্য আগে থেকে নির্দিষ্ট বাসস্থানে। সঙ্গে আর কেউ নেই। বাড়ীর আর একজনও এসে পৌঁছতে পারেনি। একমাত্র কাপুর নিজেই এসে পৌঁছতে পেরেছেন।

পুরো দু'মাস বিছানায় শুয়ে রইলেন কাপুর। বন্ধুরা চিন্তিত হয়ে বললেন, 'আর দেরী নয় এবার কাজে লাগাও। নইলে এঁকে বাঁচাবার আর উপায় নেই। ভেবে ভেবে পাগল হয়ে যাবে।'

এরই চেষ্টা চলল কিছু কাল। তারপর একদিন স্টিমের ধাক্কা-খাওয়া এঞ্জিনের মত কাপুর লাফিয়ে পড়লেন সংগঠনের কাজে। এ কাজে বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন তিনি অবিভক্ত পাঞ্জাবে। সেই কৃতিত্বের ঝলক খেলিয়ে দিলেন তিনি। শরণার্থীর সাহায্যে, স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠনে, কংগ্রেস

কমিটিগুলির সংহতি ও সুষমা বিধানে আশ্চর্য ক্ষমতা দেখালেন। অমায়ুষিক খাটবার শক্তি, অবিচল কর্তব্য নিষ্ঠা, অনস্বীকার্য নেতৃত্ব ক্ষমতা।

পাঞ্জাবের নতুন মন্ত্রীসভায় তাঁর আসন যে উঁচুতে হবে তাতে সন্দেহের অবকাশ রইল না। শোনা গেল, স্বরাষ্ট্রদপ্তর তাঁর জন্য নির্দিষ্ট হয়েছে। এ বিষয়ে কাগজের আলোচনা প্রায় নিশ্চয়তার দিকে পৌঁছল। পাঞ্জাব প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সবাই এ খবর জানে।

এমন সময় কাপুর আবার ভেঙে পড়লেন। যেন হিষ্টিরিয়া রোগীর মত অস্বাভাবিক জোর পেয়েছিলেন, কিন্তু সে জোর অস্বাভাবিক জোর, অস্থায়ী জোর। কাপুর ভেতরে ভেতরে ভেঙে দুমড়ে চৌচির হয়ে গেছেন। এক অস্বাভাবিক উত্তেজনা কিছুকালের জন্য ভাঙা টুকরোগুলি একীভূত ক'রে রেখেছিল। অকস্মাৎ ধসে পড়ল কাপুরের মনোবলের যা অবশিষ্ট ছিল। কাউকে কিছু না বলে, দলের নেতার জন্য শুধু এক দীর্ঘ অসংলগ্ন চিঠি লিখে রেখে, কাপুর একদিন চুপে চুপে পালিয়ে গেলেন। কোথায় গেলেন কেউ জানে না। অনুরোধ ছিল যেন অনর্থক তাঁকে নিয়ে মাথা ঘামান না হয়। তিনি বিশ্রাম চান, এ বিশ্রামে যেন ব্যাঘাত না করা হয়। তিনি শান্তি চান, এ শান্তি যেন ক্ষুণ্ণ না করা হয়।

এরও প্রায় বছর ছয় পরে—যখন প্রায় সবাই তাঁকে ভুলে গেছে—তখন হরবিলাস কাপুর শিমলায় এসে 'দি হুক' নামে বাড়ীটা কিনে সেখানে বাস করতে লাগলেন। কাপুর্স হোটেলের জন্ম হয় এরও বছর তিনেক পরে।

'এই তো কাপুরের আর তাঁর হোটেলের ইতিহাস, সান্যাল কাহিনী সমাপ্ত করে বললেন। 'কাপুর বহু অর্থ ও সম্পত্তি হারিয়েছেন দেশ বিভাগের ফলে, সোনা জহরত যা নিয়ে লাহোর ত্যাগ করেছিলেন তা রাস্তায়ই গেছে। তবু তিনি কপর্দকহীন নন। মস্ত বড় উকিল ছিলেন তিনি। দান ধ্যান করেও বহুটাকা বেঁচেছে। এর যে অংশ দিল্লীর ব্যাঙ্কে জমা ছিল তাও খুব কম নয়। এই টাকাতে অনায়াসে তিনি বাকি জীবনটা শান্তিতে কাটাতে পারতেন। হঠাৎ হোটেল খুলে বসলেন কেন, তাই একটা রহস্য। শত হোক্ এমন কৃতী ও নাম-করা লোক শেষে হোটেলওয়ালা বলে পরিচিত হবে,তা ভাবতে বড় খারাপ লাগে…'

সান্যালের মুখের দিকে তাকালাম। শুধু কণ্ঠস্বরই সহানুভূতিতে আর্দ্র নয়, সারা মুখে রীতিমত দুঃখের ছায়া। শিমলা কালীবাড়িতে কাপুর সর্বদা যান। বোধ হয় এ জন্যই এরা তাঁর জন্য ব্যথা অনুভব করে। কিন্তু কাপুরের মুখে কোনও অসন্তোষের ছায়া আমি কখনও লক্ষ্য করিনি। প্রসন্ন মুখ, কণ্ঠস্বরে দৃঢ়তা, ব্যবহারে মর্যাদাপূর্ণ অমায়িকতা। তাঁর ইতিহাস জানার আগে তবু তাঁকে মার্জিত রুচি বুদ্ধিদীপ্ত উদার ব্যক্তি বলে মনে হয়েছে। মনে হয়েছে, তাঁর বৃত্তির পক্ষে তিনি যেন একটু বেশি উন্নত।

'হোটেলেই ফিরছেন তো? চলুন, আমিও ওদিকে যাচ্ছি।' বলে সান্যাল বীজের সরকারী বেঞ্চি ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ালেন।

ভালই কাটল শিমলার দিনগুলি। ব্রিটিশ রাজত্বের ভাইসরয়দের আমলের সেই জলুস, সেই রোমান্টিক আবহাওয়া আর নেই। রাজা উজীর যাদাবরাদের ভিড় কমে গেছে। কিন্তু শিক্ষিত মার্জিত লোকদের অভাব নেই শিমলায়। বহু অফিস, বহু নতুন কলেজ, বহু হাসপাতাল ও ডাক্তার

অফিসের সময় কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের অফিসের কর্মচারি, স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীতে রাস্তা ভ'রে যায়। সন্ধ্যার স্যাণ্ডেল পায়েই বেড়াবার বা কেনাকাটা করার লোকের অভাব হয় না। কফি-হাউসে ভিড় সেদিনই আছে। আপার, মিডল ও লোয়ার এই তিনটে বাজার। মালপাড়ীতে বহু আলুর বীজ রপ্তানি হয় এখান থেকে। মে-জুনই ট্যুরিষ্টদের আসল সীজন, কিন্তু অক্টোবরেও কিছু কিছু লোক বেড়াতে আসে। পুজোর সময় অনেক বাঙালী চেঞ্জে আসেন; রাস্তাঘাটে সর্বদাই বাংলা ভাষা শোনা যায়। শিমলের আশে পাশে বহু বেড়াবার জায়গা। বাস্-এ চড়ে তার কিছু কিছু আমিও দেখে এসেছি। প্রকাণ্ড আকাশ, তরঙ্গিত দিগন্ত রেখা, তুষারাবৃত হিমালয়। বহু দূরে সাজানো অসংখ্য বাড়ী, ঘুরে ঘুরে চলে-যাওয়া অসংখ্য হারানো সুন্দর রাস্তাগুলি সব যেন মন হরণ করে নিয়েছিল। এমন সময় বিদায়ের দিন ঘনিয়ে এলো। বড় তাড়াতাড়ি ঘনিয়ে এলো।

রাত সাতটার মধ্যে ডিনার সমাপ্ত হয়েছিল। গায়ে লম্বা ওভারকোট, মাথায় সেখোয়ারী টুপি পরে কাপুর হাজির হলেন। বললেন, 'চলুন একটু হেঁটে আসি। ভারি সুন্দর চাঁদনি রাত। কালই তো চলে যাচ্ছেন। ঘুমন্ত পাহাড়ের রূপটা একবার দেখে যান। Are you sport?'

লোডটা ক'দিন ধরেই হচ্ছিল। কিন্তু একটু রাত হলেই পাহাড়ের রাস্তা নির্জন হয়ে ওঠে। নীতে ভয় পায় না এমন সঙ্গী না হলে বেড়ানো আর হয়ে ওঠে না। লোকে রেমাইণ্ডের ভলায় যেতেই পছন্দ করে।

'অবশ্যই।' জবাব দিলাম এবং তাড়াতাড়ি নিজের ওভারকোট গায়ে পরলাম।

মালের এদিকে বাড়ী নেই। নিচে সভীর খাদ। অন্ধকার রাতে মনে হতো খন্তোত অঙ্কিত কালো সমুদ্র। নিচের বসতি নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত। আজ জ্যোৎস্নায় যেন অজন্তরের মাথার মণি সেখানে ঘুমন্ত রহস্যপুরীর সন্ধান দিয়েছে। শহরের বিভিন্ন উচ্চতার বাড়ির দেয়ালি নিষ্প্রভ হয়ে উঠেছে আজ। পাইন গাছের পাতা আর সা বেয়ে রূপো গলে পড়ছে। রাস্তা নির্জন। পথের ধারের বেঞ্চিগুলি খালি। নিচের রাস্তা কোথাও চকচক করছে, কোথাও অন্ধকার। কনকনে হাওয়া বইছে। ভেতরটা পর্যন্ত যেন বুড়িয়ে যাচ্ছে এমন উপভোগ্য এই হাওয়া। এতদিন আছি শিমলাতে, রাত সাটার পরে আর বাইরে বের হইনি। সভীর রাতে এর একটা স্বতন্ত্র রূপ আছে, একটা স্বপ্নময় চেহারা আছে।

'আজ দিনের বেলায় আর সময় পাইনি। তাই ভাবলাম এখন আপনাকে নিয়ে একটু পায়চারি করে' আসি। কাল দুপুরে তো চলেই যাচ্ছেন।' চলতে চলতে কাপুর বলেন।

'হোটেলের দুঃখ তো এই।' আর মিনিট দশেক চলবার পর আবার বলেন তিনি, 'কেউ এখানে থাকতে আসেনা। সবাই চলে যায়। যাদের বন্ধু বলে মনে হয় তারাও বন্ধন মানে না। আপনি জানেন কি, কেন এ হোটেল খুলেছিলাম? লোক চাই। সঙ্গী চাই, পরিবারের মত অনেকে আমাকে বেষ্টন করে থাকুক, এটাই প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। সংসার থেকে দূরে পালিয়ে গিয়ে নির্জন বাসের চেষ্টা করেছিলাম। পারিনি। আবার পালিয়ে এসেছি লোকালয়ে। কিন্তু তাতেও মনেই হয় নি। আমার অনশূন্য বাড়ীতে লোক চাই। কিন্তু লোক-কোথায় পাই কি করে তাদের ডাকি? অবশেষে অনেক ভেবে এই হোটেল খুললাম। নইলে শুধু জীবিকার্জনের জন্য এর খুব দরকার ছিল না ভাই।'

'আমি সব জানি।' সুযোগ পেয়ে আমি তার সদ্ব্যবহার করলাম। 'আপনি একদিন সব বলবেন বলেছিলেন, কিন্তু আর বলেন নি। আমি অন্যের কাছ থেকেই সব শুনেছি···'

'কি শুনেছেন?' একটু যেন ভীতি ও বিস্ময়ের মিলিত কণ্ঠে বললেন কাপুর। কোথায় শুনেছেন? কালীবাড়ির ওদের কাছে শুনেছেন কি?

'হাঁ। তাই। সবই তাঁরা বলেছেন।' বলে দুচারটি নমুনা সংক্ষেপে শুনিয়ে দিলাম। রাস্তার ফ্লুরোসেন্ট আলোয় ওদিকে দেখলাম, কাপুরের রেখাঙ্কিত মুখটা যেন চৌচির হয়ে ফেটে পড়বার উপক্রম হয়েছে।

আর মিনিটটাক নিঃশব্দে চলবার পর তিনি সহসা বলেন, 'এর সবটা বিশ্বাস করবেন না। লোকের মুখে সবই পল্লবিত হয়ে ওঠে। তা ছাড়া ওসব সুদূর ইতিহাসের কথা। সেই দেশও আর নেই, সে কাপুরও আর নেই। যা অবশিষ্ট ছিল, তাও একটু একটু ক'রে কেটিয়ে দিয়েছি। কাপুর্স হোটেল! কাপুর নামটা দেওয়ার কোনও দরকার ছিল না। লোকে বলে হোটেলওয়ালা কাপুর। বলুক না, ক্ষতি কি? কোনও মানুষই তুচ্ছ নয়, কোনও বৃত্তিই তুচ্ছ নয়। অনেক লোকের সঙ্গ পাচ্ছি, এই আমার আনন্দ। বড় আর দামি হোটেল খুললে ম্যানেজার আর নানা রকম কর্মচারি তা চালাত। যেমন অফিস চলে। লোকের সঙ্গে কোনও অন্তরঙ্গ যোগাযোগই হ'তে পারত না সেখানে। সে রকম হোটেল হলে কি আমার চলে? আমি যে বড় নিঃসঙ্গ। আমি যে লোক চাই···'

এতদিন পরে তাঁর বেদনার কিছু আভাস তাঁর কণ্ঠস্বরে পেলাম। হয়তো তাঁর পূর্ব ইতিহাস জেনে ফেলেছি বলেই এতটুকু প্রকাশ হলো। নইলে কিছুটা বাৎসল্য রসপূর্ণ মার্জিতরুচি হোটেল-ওয়ালা ছাড়া অন্য কিছু মনে করবার মতো কিছুই আর তার মধ্যে নজরে পড়েনি।

হোটেলে এসে পৌঁচেছি। কাপুর আর কিছু বললেন না। নীরবে শুধু আমার হাতটা চেপে দিয়ে তিনি তাঁর নিজের ঘরগুলির দিকে এগিয়ে গেলেন। ভাবলাম বলি, 'শিমলায় সব চাইতে বিস্ময়জনক দ্রষ্টব্য যা দেখেছি তা আপনি।' কিন্তু কিছু বললাম না। চুপ করে' চলে এলাম।

বিসর্জন

মানবেন্দ্র পাল

ব্যাপারটা হঠাৎ কী হল কেউ বুঝতে পারল না।

নতুন বৌ। নিতান্ত ছেলেমানুষও না। বেশ হাসিখুশিই ছিল। হঠাৎ যে গতকাল সন্ধ্যার কী হল—সেই যে ঘরে খিল দিয়ে রইল আর খোলে না। শেষে অনেক সাধ্যসাধনায় যদি বা খিল খুলল, কিন্তু কিছুতেই দাঁতে কুটোটি পর্যন্ত কাটল না। বিছানাতেও শুল না, মাটিতে পড়ে পড়ে সারা রাত কাটালো। সে রাত্রি তো কাটল। কিন্তু পরের দিনও বউএর চোখের জল শুকোয় না। শ্বশুর শাশুড়ি নন্দ সকলেই অবাক।—এ আবার কী! অবশ্য বউ বড়লোকের মেয়ে। একটু বেশি আদুরে। রঙটা তুষে আলতায় গোলা। তা—হয়তো একটু জেদীও আছে। তা বলে এমন কী ঘটল যার জন্যে মুখ ভারী, চোখে জল, নাওয়া-খাওয়া বন্ধ? ডাক পড়ল ছেলের।

—হ্যাঁ রে মানিক, ব্যাপার কি? বৌমার কী হয়েছে?

মানিক ছেলেই অস্থির। বলে—কী করে জানব?

মা বলেন—তামাশা রাখ্। তোর বৌয়ের খবর তুই রাখিস না তো কে রাখবে শুনি?

মানিক তেমনি ভাবেই হাসতে হাসতে বলে—বিশ্বাস করো মা, আমি কিচ্ছু জানি না। কাল সারা রাত্রি ঘরে না ঢুকে আমাকে কেবল খিদচেচে।

মা সস্নেহ হাসিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে বৌয়ের উদ্দেশে বললেন—পাগল! একেবারে পাগল!

—শুধু বৌই পাগল নয়, তোমার ছেলেটিও পাগল। সারারাত ধরে বৌ খিমচলো আর তোমার ছেলেটি হাসিমুখে তা সয়ে গেল! একবারও জিজ্ঞেস করল না হাসির কারণ কী!—বোন যোগ দিল।

মানিক প্রবল প্রতিবাদ করে বললে—এই চিনু, চুপ কর। তারী তো জানিস। কতবার—ক-ত-বা-র সাধ্যসাধনা করেছি, কিন্তু উত্তর দেয়নি। এই দেখ্ মা সারা পিঠ কী রকম লাল করে দিয়েছে! বাবা বেছে বেছে বেশ একটি পাগল আমার জন্যে এনে দিয়েছেন!

মা বললেন—থাম্ বকিস নে। ও বয়েসে আমিও অমনি ছিলাম। আমার মনে হয় তোমার কর্তব্যে কোনো ত্রুটি হয়েছে।

মানিক কৃত্রিম বিস্ময়ে দু' চোখ কপালে তুলে যেন ভাববার চেষ্টা করল কী তার ত্রুটি। শেষে ভেবে চিন্তে বললে—হ্যাঁ হ্যাঁ, একটা মস্ত ত্রুটি হয়ে গিয়েছে তো! কাল বিকেলে এক প্যাকেট চানাচুর এনে খেয়েছিলাম। তা আমার কী দোষ বলো? ও তো একটু চেয়ে নিলেই পারত। তা না আমার চানাচুর খেতে খেতে ঘরে ঢুকতে দেখেই চুল বাঁধা ফেলেই এমনি ঝোড় মারলে যেন আমি তাকে গ্রেপ্তার করতে এসেছি। আর তা না হলে মনে হচ্ছে অন্য কারণও হতে পারে। আমার এই জওহর কোটটা দেখে প্রথম দিন থেকেই ও নাক সিঁটকে ছিল। সেইটে আবার পরেছি দেখেই হয় তো—

—মানিক। পাশের ঘর থেকে হেরম্ববাবু ডাকলেন।

মানিক চমকে উঠল—বাবা ডাকছেন! এই বলে চলে গেল।

হেরম্ববাবু বললেন—হ্যাঁরে, বৌমার কী হয়েছে?

মানিক মাথা চুলকে বললে—ঠিক বলতে পারছি না। তবে মনে হয়, বাপের বাড়ি যেতে চায়।

হেরম্ববাবু বললেন—ঠিক কথা, নিশ্চয় যাবে। মা-বাবাকে ছেড়ে থাকা যে কী কঠিন তা আমরা পুরুষরা ঠিক বুঝতে পারি না। মন তো খারাপ করবেই। আচ্ছা, বৌমাকে তুই পাঠিয়ে দে একবার।

এই বৌমাটির ওপরে হেরম্ববাবুর একটু বিশেষ স্নেহ ছিল। মেয়েটি যে মোটামুটি সুন্দরী, মোটামুটি শিক্ষিতা এবং বেশ অবস্থাপন্ন ঘরের এতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু মানিকের মতো পাত্রের জন্যে এর চেয়েও ভালো পাত্রী যথেষ্ট মিলতে পারত—মিলেও ছিল। কিন্তু রাধারাণীকে দেখার পর থেকেই কেমন যেন একটি বাৎসল্য রস তাঁর মনের মধ্যে নিবিড় হয়ে উঠল। সর্বাগ্রেই তাঁর ভালো লেগে গেল নামটি—'রাধারাণী'। বেশ নাম। একালের অর্থ তাৎপর্য-পুষ্ট নাম তাঁর মোটেই ভালো লাগে না। আর এ মেয়েটি একালের হয়েও একেবারে সেকালের সঙ্গে সম্পর্কচ্যুত নয়। শুধু নামটিই নয়—চলনে-বলনে লাজে-লজ্জায় সংসার-আচরণে মেয়েটি যেন দুই যুগের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে। খুব চালাকও নয়, খুব বোকাও নয়। খুব চঞ্চলও নয়, খুব শান্তও নয়। বড় সহজ হয়ে গেল মেয়েটিকে। সুতরাং অত পাত্রী আর মনে ধরল না। হেরম্ববাবু একদিন ভাবী বেয়াইবাড়ি সংসমক্ষে ঘোষণা করলেন—রাধী, আমি তোমাকে রাধীর মতো করেই নিয়ে যাব।

হেরম্ববাবু সে কথা রেখেছিলেন।

সেই রাধারাণীর চোখে জল! হেরম্ববাবু অপেক্ষা করছিলেন, এমন সময় ঝড়ের মতো বেগে চিনু এসে ঘরে ঢুকল।

—এই দেখো বাবা, বৌদির বিছানার নীচে কী পেয়েছি।

হেরম্ববাবু অবাক হয়ে দেখলেন—সত্য এতগুলি চুল।

—এ কার চুল? অমন করে কাটল কে? হেরম্ববাবু চমকে উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর দু চোখ কেমন অস্বাভাবিক ভাবে বিস্ফারিত হল।

চিনু হেসে বললে—তুমি অমন ঘাবড়ে উঠলে কেন? এ কারও মাথার চুল নয়, এটা নকল চুল। এই রকম চুলের গুছি বাজারে কিনতে পাওয়া যায়।

হেরম্ববাবু তৎক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়ে আশ্চর্য হয়ে বললেন—এ কিনে কী হয়? মাজা ঘষের লক্ষীরা পরে?

চিনু বৃদ্ধ বাপের অজ্ঞতায় হেসে উঠে বললে—যাদের মাথায় চুল কম তারাই এগুলি ব্যবহার করে। জান বাবা, বৌদিও এই চুলের গুছি দিয়ে চুল বাঁধে। তাই দেখি বৌদি চুল বাঁধছে তো দরজা জানলা বন্ধ কেন? এখন বুঝা পড়ে গেছে। আর বৌদির রাগের কারণও আমরা বুঝতে পেরেছি। কাল দাদা বিকেলে হঠাৎ বৌদির ঘরে ঢুকে পড়েছিল—বৌদি তখন চুল বাঁধছিল। বৌদি মনে করেছে ধরা পড়ে গেছে। সেই তার লজ্জা আর অভিমান।

হেরম্ববাবু প্রাণ খুলে হেসে উঠলেন। ও চরি, তাই বলো। কিন্তু মানিক যে বললে বাপের বাড়ি যাবার জন্যে কাঁদাকাটি করছে!

চিনু হেসে মুখভঙ্গি করে বললে—দাদার কথা বাদ দাও। কিছু বোঝে নাকি? বৌদি যে দাদাকে দেখেই চুলের গুছিটা বিছানার নীচে রেখে ছুটে পালাল এটা অন্ধ লোক হলেও বোধ হয় তা ধরে ফেলতে পারত। আর তোমার ছেলে—

হেরম্ববাবু বললেন—অমন চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কথা বলিস নে। আগে বৌমাকে একটু শান্ত করি। যা অভিমানী মেয়ে! তুই গিয়ে ওকে পাঠিয়ে দে তো!

চিনু তৎক্ষণাৎ মহা-উৎসাহে চলে গেল।

চিনু চলে গেল আর মুহূর্তের জন্যে ঘরটা খালি হয়ে গেল। হেরম্ববাবু ইজিচেয়ারে শুয়ে ছিলেন হাতার ওপর থেকে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছিল সেই নকল চুলের গুছি। হঠাৎ দেখলে কে বলবে এটা নকল চুল। ঠিক মনে হবে যেন কে কাঁচি দিয়ে এক গোছা চুল কেটে মাটিতে ফেলে দিয়েছে। এই কথা মনে হতেই হেরম্ববাবু শিউরে উঠলেন। অনেক দিন আগের একটা দৃশ্য তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠল। আজ তো তিনি বয়স্ক পুত্র-কন্যার পিতা। কিন্তু একদিন তিনিও ছেলেমানুষ ছিলেন। অভিজ্ঞতাটা সেই ছেলেবেলার।

মাকে মনে পড়ে। মাকে তো মনে পড়বেই। মা তো গেলেন এই সেদিন। কিন্তু আজও মনে পড়ে মায়ের সেই রূপ। কর্সা ধবধবে রঙ, কপালে আধুলির মতো বড় গোল টিপ, সিঁথি ভরে সিঁদুর, লাল পেড়ে শাড়ি আর এক পিঠ কুচকুচে কালো ঢেউ খেলানো চুল। সে চুলের বহরই বা কী! কত রকমের খোঁপা বাঁধা!—চালচিত্তির খোঁপা, পান খোঁপা, পাটি খোঁপা, চাটাই খোঁপা।

এমন কতদিনের ছবি মনে পড়ে—শীতের দুপুরে রোদে পিঠ দিয়ে বসে মা আঙুল দিয়ে চিরে চিরে চুল শুকোচ্ছেন। গ্রীষ্মের দুপুরে খাটে শুয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস পড়ছেন—খোলা চুল লুটোচ্ছে মেঝেতে, আর বেড়ালের বাচ্চাটা সেই চুল নিয়ে আপন মনে খেলা করছে। আবার যেদিন মা মাথা ঘষতেন, সেদিন সেই স্তূপীকৃত চুল চুড়ো করে বেঁধে যখন কপালে সিঁদুর পরে সোজা হয়ে দাঁড়াতেন—সেদিন মায়ের এক অপূর্ব ভৈরবী মূর্তি!

তারপর মা বিধবা হলেন। এক ফুৎকারে যেন আলো নিভে গেল। লাল পেড়ে শাড়ির বদলে এল সাদা থান। কপালে আর সিঁদুরের চিহ্ন রইল না। মাঠ কপালটা চিতির মতো কঠিন হয়ে উঠল। আর সিঁথিটি—সেদিকে যেন তাকানোই যেত না। পথিক-বর্জিত পথ যেমন শূন্য দেখায় সিঁথিটিও তেমনি খাঁ খাঁ করতে লাগল।

কিছুদিন পরেই দেখা গেল এ বাড়িতে কতকগুলি বিধবা নিয়মিত আসা-যাওয়া করছে। এরা এর আগে কোনোদিন মায়ের কাছে দুঃখের দিনে তো নয়ই, সুখের দিনেও এসেছে বলে মনে হল না। এরা সকলেই মায়ের চেয়ে বড়ো—অনেক বড়ো। মাও বিধবা তারাও বিধবা। কিন্তু মায়ের মতো তাদের মধ্যে কোনো বৈধব্যশ্রী ছিল না। মাথার চুলগুলো কাটা। গলায় কণ্ঠি। হাতে হরিনামের মালা। কারও কারও সামনের দাঁতগুলো পড়ে গিয়েছে। তারা নিয়মিত মায়ের কাছে আসতে লাগল। তা আসুক, কিন্তু তাদের যেন কেমন ভালো লাগল না। তারা পথ হাঁটে সন্তর্পণে। পদে পদে সতর্কতা, এই বুঝি ছোঁওয়া পড়ল। তাদের চোখের দৃষ্টিতে সর্বদাই সন্দেহ আর বিদ্বেষ। সুস্থ মানুষদের প্রতি অপরিসীম ঘৃণা। কথা বলে ফিস্ ফিস্ ক'রে—যেন কিসের ষড়যন্ত্র চলছে।

মা কিন্তু কিছুতেই এদের সঙ্গে খাপখাওয়াতে পারত না। তবু তাদের সঙ্গে মিশতে হত। তারা কেবল মাকে বলতে লাগল—এটা করো ওটা করো, অমুকটা করতে নেই। ওমা, বামুনের ঘরে বিধবা, এটা জান না?

একদিন স্কুলের ছুটি হয়ে গেছে অসময়ে। ছেলে বই শ্লেট নিয়ে বাড়ি এসেছে। মাকে অবাক করে দেবে বলে চুপি চুপি ঢুকেছে ঘরে। হঠাৎ কেমন চমকে উঠল। দেখল মা বড় আয়নাটার সামনে চুলগুলো মুঠো করে ধরে দাঁড়িয়ে আছে। আর নিঃশব্দে চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে।

প্রথমটা গেল বিস্ময়ের ধাক্কা। তারপরই ছেলে ছুটে গিয়ে পিছন থেকে মাকে জড়িয়ে ধরল। মা তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছে ছেলেকে কাছে টেনে নিলেন।

ছেলে বললে—মা, তুমি কাঁদছ কেন?

ম্লান হেসে মা বললেন—কই, না তো।

ছেলে অভিমান করে বললে—তুমি মিথ্যে কথা বলছ!

মা তাড়াতাড়ি বললেন—হ্যাঁ বাবা, সত্যিই কাঁদছিলাম।

—কেন?

—এই চুলগুলো কেটে ফেলতে হবে।

ছেলে সবিস্ময়ে বলে উঠল—কেন?

—এই নিয়ম বাবা। বিধবা হয়েছি কি না।

ছেলে প্রবল আপত্তি জানিয়ে মাথা নেড়ে বললে—না, কক্ষণো না। এ চুল তুমি কিছুতেই কাটতে পারবে না।

মায়ের চোখ দিয়ে আবার জল গড়িয়ে পড়ল। ছেলের মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন—কী করব বাবা, ওরা যে নিয়ে করে।

ছেলে উত্তেজিত হয়ে বলে উঠল—না, ওদের কথা শুনবে না। চুল তুমি কাটতে পারবে না—কিছুতেই না।

মা এ কথার ঠিক উত্তর না দিয়ে ছেলেকে আদর করে নিয়ে বললেন—আয়, খাবি আয়।

• • • •

তিন সপ্তাহ পর।

ইনস্পেক্টর আসার জন্যে তাড়াতাড়ি ছুটি হয়ে গেল। মনের আনন্দে বাড়ি ঢুকেই ছেলে ডাকতে লাগল—মা—মা—

কিন্তু সাড়া পাওয়া গেল না। এঘর ওঘর রান্নাঘর স্নানেরঘর, গোয়ালঘর, পুকুরপাড় সব খুঁজে এল। কিন্তু মাকে কোথাও দেখতে পাওয়া গেল না। তখন ছেলের যেন কেমন ভয় করল। চুকরে কেঁদে উঠল—মা—মাগো—

এমন সময় ঠাকুর ঘরের বন্ধ দরজা খুলে গেল। সামনে দাঁড়িয়ে মা।

মায়ের দিকে চোখ পড়তেই ছেলে চমকে উঠল—মা!

আর কোনো কথা সরল না। রাগে দুঃখে অভিমানে ছেলের চোখ বেয়ে জল ঝরতে লাগল। পাতলা ঠোঁট দুটো কাঁপতে লাগল থরথর করে।

মা ধীরে ধীরে এগিয়ে আসতে লাগলেন। মায়ের এ কী মূর্তি! চুলগুলো কি এমনই নির্মম ভাবে কেটে ফেলতে হয়!

মা এগিয়ে এলেন। তাঁর দু চোখেও জল টলমল করছে। বেদনাতুর ছেলেকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে স্থির গম্ভীর স্বরে মা বললেন,—বাবা, এ নইলে যে আমার পাপ হত। ঠাকুর রাগ করতেন। অনন্ত নরকে পচে মরতে হত।

নরক সম্বন্ধে ছেলের কিছু ধারণা ছিল। মাকে নরকে পচে মরতে হত শুনে ছেলের সর্বাঙ্গ শিউরে উঠল। কিন্তু মুখে কিছু বলতে পারল না। ভয়ে দুঃখে অভিমানে বেদনায় সে মাকে শুধু নিবিড়ভাবে জাঁকড়ে ধরে রইল।

মা বললেন—শোনো, এখনো তোমার একটু কাজ আছে। তুমি নইলে সে কাজ আর কেউ পারবে না। ঐ বারান্দায় কলাপাতা-চাপা একটা ঝুড়ি আছে। কলাপাতাটা তুলো না। অমনি ওটা নিয়ে গিয়ে গঙ্গায় ভাসিয়ে দিয়ে এসো।

ছেলের যেন কেমন ভয় করল। কলাপাতা-চাপা দেওয়া কী রহস্য লুকিয়ে আছে ঐ ঝুড়িটায়। কী করে তা মাথায় করে গঙ্গায় ভাসিয়ে দিতে যাবে!

মা এমনি সময় আবার বললেন—যাও বাবা, দেরি কোরো না। তুমি গঙ্গায় ওটা বিসর্জন না দিয়ে আসা পর্যন্ত আমি যে জলগ্রহণ করতে পারছি না।

এবার আর বিলম্ব হল না। চোখ বুজে ঝুড়িটা মাথায় নিয়ে ছেলে বেরিয়ে পড়ল।

নির্জন গঙ্গার তীর। বেলা তখন প্রায় তিনটে। হু হু করে বাতাস বইছে। অদূরে শ্মশান-ভূমিতে একটা নিভন্ত চিতা থেকে তখনো ধোঁওয়া উড়ছে! ছেলে ঝুড়িটা ধীরে ধীরে মাথা থেকে নামিয়ে দু হাতে ধরে গঙ্গার মধ্যে নেমে গেল অনেকখানি! ঐ ঝুড়িটার মধ্যে কলাপাতার নীচে কী ছিল ছেলে তা জানত না। মা দেখতে নিষেধ করেছিল, তাই সে দেখেনি। কী জানি, যদি তাতে আমার মায়ের কোনো অমঙ্গল হয়!

কিন্তু হঠাৎ এই সময় একটা ঝোড়ো বাতাস হা হা করে ছুটে এসে সেই কলাপাতার আবরণটা উড়িয়ে নিয়ে গেল। অমনি ঝুড়ির মধ্যে থেকে একরাশ কালো ঘন কাটা চুল বিস্ময়-বিমূঢ় ছেলের চোখের সামনে আত্মপ্রকাশ করল। কয়েক মুহূর্ত মাথাটা কেমন করে উঠল। মনে হল জলের নীচে পা দুটো কেমন অসাড় হয়ে যাচ্ছে। এখনি সে যেন জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে। আর সেই সঙ্গে সেও তলিয়ে যাবে গভীর জলের মধ্যে। তখন ছেলে প্রাণপণ শক্তিতে নিজেকে সামলে নিয়ে দু হাতে ক'রে নির্মমভাবে ঝুড়িটা ফেলে দিলে জলের মধ্যে।

মনে আছে, তারপর কতক্ষণ সে বসেছিল নির্জন গঙ্গাতীরে। বাড়ি ফিরল যখন তখন রাত হয়ে গেছে।

হেরম্ববাবু চমকে উঠলেন—কে?

দরজার বাইরে লুকিয়ে কে যেন অভিমানে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

হেরম্ববাবু বুঝলেন, বৌমা এসে দাঁড়িয়ে আছে। তাড়াতাড়ি সেই চুলের ঝুড়িটা সরিয়ে রেখে বৌমাকে ডেকে আনবার জন্যে এগিয়ে গেলেন।

বমপাশ টাউন থেকে

অনিলকুমার ভট্টাচার্য

মুখের আদল, দেহের গড়ন ঠিক মায়েরই মতন।

পঁচিশ বছর আগেকার সীমা। একটি চঞ্চলা কিশোরী। আনন্দমোহনের চোখে আজো তা অমলিন হয়ে আছে।

আনন্দমোহন তখন তরুণ যুবক। পাড়াপড়শী হিসাবে সীমাকে আপনজনই বলা যেতে পারে। পঁচিশ বছর আগে অন্ততঃ গ্রামের মানুষ পড়শীজনকে আত্মীয় বলেই মনে করতো।

হরিদাসের মেয়ে সীমা। প্রায় চঞ্চল কিশোরী। আনন্দমোহনদের বাড়ির অনতিদূরে থাকে:—ইস্কুলের পথে আসতে যেতে দেখা। কখনো কখনো পুকুর ঘাটে, আমবাগানের ছায়াশীতল বৃক্ষকুঞ্জে,—এ-বাড়িতে আর ও-বাড়িতে পরস্পরে আসা-যাওয়ার মধ্যেও।

কিন্তু দুজনেরই মনের অতি কাছাকাছি বসবাস। তখনকার দিন তাই; এখনকার দিনকাল হলে বিবাহে আটকাতো না।

হরিদাস কায়স্থ, আনন্দমোহনের পিতা রমণীমোহন দ্বিজ, ব্রাহ্মণ, বয়সে বড় বলে রমণীমোহন দাদা; তা ছাড়া কুলপুরোহিত-বংশ। মানে, সম্ভ্রমে, বংশ-গৌরবে—সবদিক থেকেই শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী। বিয়ের বাড়িতে, পূজার দরদালানে সামাজিক মেলামেশায় দ্বিজবংশের সম্মান অনেক ঊর্ধ্বে। রমণীমোহন আর হরিদাস তাই এক নয়।

কিন্তু আনন্দমোহন আর সীমার মধ্যে সে-ব্যবধান নেই। বাধা শুধু বর্ণগত, তা না হলে আনন্দমোহনের সঙ্গে সীমার বিয়ে হলে প্রতিবেশী দুই পরিবারই তুষ্ট হতো।

আনন্দমোহন সাধারণ ছেলে। গ্রামের স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে কলকাতায় কলেজে পড়তে এলো। তারপর একটা দুটো পাশ করে মামার দৌলতে সদাগরী অপিসে কেরাণীগিরি।

প্রতিবেশিনী সীমা ষোড়শের শিক্ষা আহরণ করে, রান্না-বান্না ঘর-সংসারের কাজকর্ম প্রভৃতিতে পোক্ত হয়ে পরের ঘরে চলে যাওয়ার জন্যে প্রতীক্ষারত।

দেখতে শুনতে বেশ মানান সই মেয়ে সীমা। মুখের ছন্দটি বড় সুন্দর, দেহের গঠনেও লাবণ্যশ্রী। চোখ দুটি প্রোজ্জ্বল, মাথার চুলগুলিতেও প্রলম্বমান ঘনত্ব, রংটি কেবল একটু মাজামাজা। তবুও সুশ্রী বলা যেতে পারে। সম্ভ্রান্ত কায়স্থ পরিবারে হরিদাসবাবু মোক্তারি করে দু'পয়সার মুখ দেখেছেন; সুতরাং আনন্দমোহনের বউ হওয়ার যোগ্যতায় সীমা হেরে যাবার মতন মেয়ে নয়।

শুধু জাতে আটকায়। সেইখানেই বাধা সীমার। আনন্দমোহন ব্রাহ্মণ, আর সীমা কায়স্থ।

সীমারই আগে বিয়ে হয়ে গেলো।

আনন্দমোহনের তুলনায় বরও ভালো পাত্রের সন্ধেই। পাত্র পশ্চিম প্রবাসী-আইনবিদ। অল্প বয়সেই সিভিলকোর্টে বেশ পশার জমিয়েছে।

সুতরাং পাত্র ভালোই।

তবুও বয় কনে বিদায়ের মুহূর্তে আনন্দমোহনের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই সীমা আর নিজেকে সামলাতে পারেনি।

সবাই বরকনে আশীর্বাদ করছে। আনন্দমোহনও ছিলো। সীমার অশ্রু প্লাবিত সেই মুখখানি গভীর রাগ টেনেছিলো আনন্দমোহনের অন্তরে। ইচ্ছা ছিলো একবারমাত্র স্পর্শ করে সেই বিষণ্ণকান্তি মুখ সান্ত্বনা।

কিন্তু তা হবার নয়।

সেই মুখখানিই আজ দেখলে আনন্দমোহন চৌত্রিশ বছর পরে। মুখে অশ্রুর প্লাবন নেই, কিন্তু কেমন যেন বিষণ্ণতার আমেজ। চোখ দুটি ছলছলে।

দেওঘরের ঘমপাশ টাউনের একখানি নিরালা ঘর।

কদিনের জন্যে একটু বেড়াতে এসেছিলেন প্রৌঢ় আনন্দমোহন। সংসারের ঘানি টানতে টানতে কলুর বলদের সামিল। একটু হাওয়া পরিবর্তন। তাও সুবিধে পাওয়া গেলো তাই। থাকা-খাওয়ার খরচ লাগবে না। শুধু আসা-যাওয়ার ট্রেন ভাড়া মাত্র।

অফিসেরই এক সহকর্মীর দৌলতে আসা। একাই এসেছেন আনন্দমোহন। সাবালক দুই ছেলে আর এক মেয়ে। গৃহিণীও বেশ পাকাপোক্ত। ক'দিন সংসার ছেড়ে এলেও তাই ক্ষতি নেই।

কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার!

উইলিয়মস টাউন থেকে ঘমপাশ টাউনের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিলাস্তূপ মাঝাপাহাড়। সেখানে বেড়াতে এসেই দেখা হয়ে গেলো সীমার সঙ্গে।

'ওমা আনন্দদা তুমি এখানে?'

আনন্দমোহনের চোখেও বিস্ময়! 'সীমা, তুমি!'

'হ্যাঁ, এখানে আমাদের নিজেদের বাড়ি। ছুটি-ছাটাতে প্রায়ই আসি আমরা। তা, তুমি?'

'এমনি, ক'দিন বেড়াতে একটু?'

'বৌদি, ছেলেপুলেরা কোথায়?'

'একাই এসেছি।'

'উঠেছো কোথায়?'

'অফিসের এক বন্ধুর বাড়ি। উইলিয়মস টাউন।'

সীমা প্রবলভাবে আপত্তি জানালে, 'তা হবে না। না, কিছুতেই নয়। আমি থাকতে তুমি পরের বাড়ি উঠবে।'

'কালই যে চলে যাবো?'

'সে দেখা যাবে পরে। এখন এসো তো আমার বাড়ি।'

কোন ওজর-আপত্তি শোনেনি সীমা। জোর করেই ধরে এনেছে আনন্দমোহনকে ঘমপাশ টাউনের তার ছোট্ট বাড়িটিতে। আর তার পরেই হৈ চৈ সুরু করে দিয়েছে, 'আনন্দদা, আমার বিভাস আপনজন।'

চলচলে মুখখানিতে তার পুরো সংসারীর ছাপ। তবুও প্রসন্নময়ী। ছিপছিপে দেহভঙ্গীতে মেয়ের আধিক্য ; তবুও সাবধানময়ী।

আনন্দমোহন বয়স খুঁড়িয়ে গেছেন। মাথায় এক মাথা টাক, কপালে ভাবনার রসীরেখা, নিষ্প্রভ চোখ। বয়েসের অবসন্নতা দেহ ঘিরে।

সীমাই সামনে নিয়ে এলো, 'আমার মেয়ে চন্দনা !'

আনন্দমোহন চেয়ে দেখেন, 'ঠিক তোমারই মতন।'

'আমার মতনই আর কই হোল ? রোগা ডিঙডিঙে।'

'তোমার বোধহয় বিয়ের আগের চেহারার কথা মনে নেই !'

'তোমার মনে আছে ?'

আনন্দমোহন তাকিয়ে দেখেন সীমার দিকে। তার পুরু চেহারায় কিসের ছোঁওনা যেন।

আনন্দমোহন বললেন, 'মেয়েকে তো দেখলাম। তোমার কর্তা কই ?'

'তাঁর কথা আর বলো না। এখানে এসেও মক্কেলের হাত থেকে রেহাই নেই। গেছেন রিখিয়ার এক মক্কেলের বাড়ি।'

'আর সব ছেলে পিলে ?'

'আর একটি কেবল ছেলে। পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরছে। আসবেখন ! তোমার ঘর-সংসার ছেলে পিলেদের কথা তো শুনবার না।'

'কি আর শুনবে। তারা সব বাপেরই মতন। গরিবের ঘরের গৃহস্থ।'

'বৌদিকে নিয়ে এলে না কেন ?'

শুকনো হাসি হেসে আনন্দমোহন বললেন, 'পতির পুণ্যে সতীর পুণ্য !'

সীমা বাধা দিয়ে বললে, 'না, না, ও সব কথা শুনছিনে। এখন এখানকার ক্লাইমেট খুব ভালো। আর তা ছাড়া আমার বাড়িতে কোন অসুবিধেই নেই। চাও তো দুখানা ঘরও ছেড়ে দিতে পারি। তুমি বৌদিকে টেলিগ্রাম করে দাও। ছেলে-মেয়েদের নিয়ে এখানে চলে আসুন।'

আনন্দমোহন এ-কথায় কোন উৎসাহ বোধ করেন না।

চন্দনা দাঁড়িয়েই আছে। রোগা একহারা চেহারা, আয়ত আননে অপরূপ লাবণ্য, চোখ দুটিতে বিস্ময়ের রেখা। শুনছিলো মায়ের বাপের বাড়ির আত্মীয়ের সঙ্গে আলাপন।

আনন্দমোহনবাবু সস্নেহে তাকে কাছে ডাকলেন।

সীমা বললে, 'প্রণাম করো। তোমার এক মামা হন।'

চন্দনা আনন্দমোহনবাবুর পদধূলি নিলে। আশ্চর্য কোমল স্পর্শ ;—কবেকার একটা সুপ্ত অনুভূতি যেন প্রৌঢ় আনন্দমোহনকে সচকিত করে তুললে। সীমার করস্পর্শ তাঁর মনে পড়ে যায়। সীমার করতলও এমনি কোমল—এমনি শিহরণময় ছিলো।

'থাক মা, থাক। বসো আমার পাশে। কি করো। পড়াশুনা ?'

'ওমা, তা বুঝি জানো না। ও এইবার পাটনা য়ুনিভারসিটি থেকে থ্রি ইয়ার্স ডিগ্রি কোর্স পরীক্ষা দিয়েছে।'—সীমার চোখে মুখে গর্বের ছায়া।

আশ্চর্য, বোধোদয় পর্যন্ত পড়া সীমাও এখন বেশ ইংরিজি উচ্চারণ করতে শিখেছে।

'তোমার মেয়ে ?'

সীমার প্রশ্নের উত্তরে আনন্দমোহন কী বলবেন ? তাঁর মেয়ে রুগ্না মায়ের পরিচর্যা করে। সংসারে সমস্ত স্বস্তি পোয়ায়। আর আইবুড়ো মেয়ের কেন যে বর জুটছে না তার জন্যে তিরস্কারে তিরস্কৃত হয়। উত্তর কলকাতার অঙ্গনলির অধিবাসী মধ্যবিত্ত কেরানী আনন্দমোহন বসাক টাইমের এই ঘরে এই পরিচ্ছন্ন পরিবেশের মাঝে কী মুখ ফুটে সে কথা বলতে পারেন ?

তবু বলতে হলো।

'এইবার প্রি-য়ুনিভার্সিটি পাশ করেছে।'

'বাঃ, তা বয়েস কতো ?'

'তোমার চন্দনার চেয়েও কিছু ছোট হবে।'

'আমার চন্দনার কতো বয়েস বল তো ?'

আনন্দমোহনবাবু মুস্কিলে পড়েন।

তবু বলতে হয়, 'বছর বাইশ।'

সীমা বালিকার হাসি হাসে।

'মা, সত্যিই তোমার দৃষ্টিশক্তি লোপ পেয়েছে। ওমা, বলো কী। ও দেখতেই চাপা। লম্বা কিনা। কিন্তু মুখ দেখে তো মানুষ অনুমান করতে পারে। চন্দনা সবে সতেরোয় পা দিয়েছে।'

আনন্দমোহন মেনে নিলেন।

কিন্তু কথার কথা বাড়ে। আনন্দমোহন না বাড়ালেও সীমা ছাড়বার পাত্রী নয়।

'তোমার ছেলে ?'

তিনবার ম্যাট্রিক ফেল করে চতুর্থবার থার্ড ডিভিশনে যে ছেলে পাশ করেছে, তাকে কারখানার কাজে শিক্ষানবিশী করতে দিয়েছেন সে-কথা আনন্দমোহন মুখ ফুটে বলতে পারেন না।

বললেন, 'ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে।'

সীমা জিজ্ঞেস করলে, 'কোথায় শিবপুরে ?'

'না।'

'খড়্গপুরে ? না যাদবপুরে।'

'যাদবপুরে।'

'ইলেকট্রিক্যাল না মিকিল ?'

'না, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং' কোনরকমে কণ্ঠকে পরিষ্কার করে নিয়ে আনন্দমোহন উত্তর দিলেন।

'ভালোই করেছো। এখন তো ইঞ্জিনিয়ারদেরই যুগ। আমার ওনার আবার যত অদ্ভুত রকমের। উনি বলেন, উল্টো কথা। পয়সা আছে বটে ও লাইনে। কিন্তু কালচার নেই। ছেলেকে উনি আইনে ডকটরেট করতে চান, আর তার সঙ্গে সাহিত্যে। তা ছেলেটির আমার মেধা বেশ। এই বয়সেই—বই লিখতে সুরু করেছে। পড়নি ওর লেখা। সমর বসু। মাত্র উনিশ বছরের ছেলে। এরই মধ্যে তিনখানা উপন্যাস বার করে ফেলেছে।'

সীমা থামতে চায় না।

চন্দনাই বাধা দিলে, 'তুমি কেবল গল্পই করছো মা। বাবাকে চা-জলখাবার দাও।'

'যা বলেছিস চন্দনা। দেখছিস, বাপের বাড়ির শোক পেয়ে এ-কথাটিও ভুলে গেছি। তুই মামাবাবুর কাছে বস। গল্প কর। আমি চা-জলখাবার নিয়ে আসি।'

সীমা চলে গেলো। তার ভারি শরীরে আত্মসুখ আর ঐশ্বর্যের মহিমা। চন্দনা কিন্তু তা নয়।

সে যেন পঁচিশ বছর আগেকার কুমারী সীমা। তার পরনে শিক্ষা-দীক্ষা রুচি এবং শালীনতার মধ্যেও বাংলার পল্লীশ্রী মাখানো।

আয়ত আয়ন, চোখ দুটি টানা টানা, কোমল করতল স্নিগ্ধরসে ভরা।

আর একবার স্পর্শ পেতে চান আনন্দমোহন চন্দনার।

কিন্তু আনন্দমোহনের সে-সাধ মিটলো কই?

গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবি, পরনে চিলা পরিচ্ছন্ন পায়জামা, তরুণ সুদর্শন যে ছেলেটি তাঁদের সামনে এসে দাঁড়ালো, তাকে দেখেই চন্দনার আয়ত আনন মুখর হয়ে উঠলো। টলটলে চোখের চাউনিতে খুশির বন্যা যেন উপচে পড়তে সুরু করেছে।

'এতো দেরি তোমার?'—চন্দনার কণ্ঠে অভিযোগ।

'আর বলো কেন! বাড়িতে কে এক মাসি এসে হাজির। মাসির আদরের ঠেলায় প্রাণ যায়।'

'তোমার মাসি?'

'হ্যাঁ। মার গ্রাম-সম্পর্কে বোন। আজ বৈদ্যনাথের মন্দিরে মার সঙ্গে দেখা। আর যায় কোথায়? একেবারেই এসে হাজির। মার হুকুম মাসিকে নিয়ে নক্সন পাহাড় যাও,—যাবোরা পার হ'য়ে চোল পাহাড় দেখিয়ে আনো; তপোবনটাও ভুলো না। কী মেয়ো বলো দিকিন!'

বাহ্যজ্ঞান দুজনেরই ছিলো না। তা নাহলে তারা দু'জনেই উপলব্ধি করতে পারতো যে তাদের মাঝখানে আনন্দমোহনও আছেন।

চন্দনা আগন্তুককে অভ্যর্থনা জানিয়ে বললে, 'চলো তরুণদা ভেতরে যাওয়া যাক্।'

তারপর তার চোখ পড়লো আনন্দমোহনের দিকে। হয়তো একটু কুণ্ঠা এবং লজ্জা। বললে, 'মামাবাবু বসুন, আমি মাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি!'

চন্দনার সঙ্গে তরুণ চলে গেলো।

আনন্দমোহনের শোনবার কথা নয়। তবুও চুপিসার কথাগুলি তাঁর কানে এলো।

পাশের ঘরে ঢুকতে ঢুকতে তরুণটি জিজ্ঞেস করলে, 'বুড়োটা আবার কে?'

চন্দনার কণ্ঠে সাবধানতার সুর, 'এই চুপ! শুনতে পাবে!'

'মামাবাবু বললে যে।'

'হ্যাঁ মামাবাবু, গেঁয়োভূতো। তোমার যেমন মাসি।'

তপ্ত শলাকার মতোই কথাগুলি গিয়ে বিঁধলো আনন্দমোহনের কানে। সীমা রান্নাঘরে। কিছু খাবার নিয়ে এক্ষুণি এসে হাজির হবে। তার চেয়ে বরঞ্চ এই সন্ধ্যার অন্ধকারে উঠে পড়াই ভালো।

সীমা কী মনে করবে?

আর চন্দনা?

না, কারুর কথাই মনে করবার আর দরকার নেই আনন্দমোহনের।

পা দুটোকে সে অস্বাভাবিক দ্রুতগতিতে চালিয়ে দিলে। বরাকর টাউন থেকে উইলিয়মস টাউন;—সেখান থেকে রাত্রের ট্রেনেই কলকাতায় যাওয়া দরকার। কাল নয়, আজই।

একই স্কুলের ছাত্র

সরোজকুমার রায়চৌধুরী

জনার্দন মহা মুস্কিলে পড়েছে। তিন বৎসর এখানে সে চিকিৎসা করছে, তার মধ্যে এমন বিপদে আর কখনও পড়েনি।

শম্ভু ঘোষ মরে মরে।

সেটা এমন কিছু হত না, যদি লোকটি শম্ভু ঘোষ না হত। পাশাপাশি পাঁচ-ছ' খানি গ্রামের মধ্যে জনার্দন একমাত্র চিকিৎসক। গত তিন বৎসর বহু রোগী সে দেখেছে। বহু রোগী বেঁচে গেছে, বহু মারাও গেছে। তাদের নিয়ে জনার্দন কখনও সমস্যায় পড়েনি। কিন্তু শম্ভু ঘোষ স্বতন্ত্র ব্যক্তি।

কথাটা আর একটু খুলে বলি :

প্রকাণ্ড একটা বিলের মধ্যে কয়েকটি উঁচু উঁচু ডাঙা জায়গার পাশাপাশি কয়েকখানি গ্রাম। প্রতি গ্রামে অল্প কয়েকঘানি ঘর। বর্ষাকালে এই গ্রামগুলি ছাড়া সমস্ত বিল জলময় থাকে। একটু উঁচু সরকারী রাস্তা গ্রামগুলির পাশ দিয়ে প্রায় চল্লিশ মাইল ঘুরে সদর পর্যন্ত গেছে। কিন্তু বর্ষায় সেটিও জলে ডুবে যায়। তখন গ্রামগুলির সঙ্গে বাইরের পৃথিবীর কোন সম্পর্কই থাকে না।

গ্রামগুলিতে গোয়ালার বাসই বেশী। কিন্তু অন্য জাতিও আছে।

এ অঞ্চলে পাঠশালা নেই, ডাকঘরও বহু দূরে। কখনও কারও কোন চিঠিও আসে না।

জনার্দন পাশ করা ডাক্তার নয়। এমনকি পাশ না-করা ডাক্তারও নয়। বস্তুতঃ, সে সেবা পড়াও বিশেষ শেখে নি। বিগ্রহ সেবা, ধনীর গৃহে রাধুনী বৃত্তি, জীবিকা অর্জনের জন্যে নানা রকমের কাজ সে করেছে। কিন্তু তাতে তার পোষায় নি। অবশেষে জনৈক বন্ধুর পরামর্শে সে স্থির করে ফেললে, চিকিৎসা-ব্যবসায় আরম্ভ করবে।

প্রথমটা সে সাহস করেনি। চিকিৎসার কিছুই সে জানে না। মানুষের জীবন মরণ নিয়ে ব্যাপার। কি করে কি করবে?

কিন্তু বন্ধু ভরসা দিলে : ব্যাপারটা কিছুমাত্র শক্ত নয়। মুলধনের মধ্যে একটি আমকাঠের ছোট আলমারী এবং কতকগুলো রঙ বেরঙের জলভরা শিশি।

জনার্দন সভয়ে লাফিয়ে উঠেছিল : এই নিয়ে চিকিচ্ছে!

বন্ধু বলেছিল, হ্যাঁ।

বন্ধুর যুক্তি এই ছিল যে, জীবন-মৃত্যু মানুষের হাতে নয়। ভগবানই বাঁচান, ভগবানই মারেন। ডাক্তার উপলক্ষ্য মাত্র।

দর্শন শাস্ত্রের একটা মতবড় তত্ত্ব। যুক্তিটা জনার্দনের মনে লেগেছিল। সত্যই তো। সে কে? সে বাঁচাতেও পারে না, মারতেও পারে না। সে শুধু ওষুধ দেবে, অথবা ওষুধের নামে যা হোক কিছু দেবে, আর তার বিনিময়ে কিছু পয়সা পাবে। তারপরে যা করেন হরি।

বন্ধু আরও বলেছিল : কিছু বুদ্ধি তোমাকে খরচ করতে হবে স্থান নির্বাচনে। অর্থাৎ এমন একটা জায়গা ঠিক করতে হবে, যেখানে লোকেরা লেখাপড়া জানে না। যেখানে কেউ

তোমার বিছে নিয়ে প্রশ্ন করবে না, বা তোমার সার্টিফিকেট দেখতেও চাইবে না। শুধু বলে তুমি যা দেবে, তাই তারা ভক্তিভরে খাবে।

—কিন্তু মরে যদি ?

—সে তোমার অপরাধ নয়। সে মরবে তোমার ওষুধের জন্যে নয়,—তুমিতো শুধু জল দিচ্ছ,—মরবে তার পরমায়ু নেই বলে।

এও একটি তত্ত্ব কথা।

জনার্দন একদিন বেরিয়ে পড়ল। তেমনি একটা জায়গায় খোঁজে। অনেক জায়গা সে খুঁজল। তেমন জায়গা কোথাও পাওয়া যায় না। সবাই প্রশ্ন করে, আপনি কোথা থেকে পাস করেছেন ?

ঘুরতে ঘুরতে এই নিশ্চিন্দিপুরের সন্ধান পেলে। শহর থেকে দূরে, রেল লাইন থেকে দূরে, এই পাওব-বর্জিত দেশে একটি মানুষেরও অক্ষর পরিচয় হয়নি। এখানে রোগ এবং রোগী প্রচুর। কিন্তু এই অঞ্চলের মধ্যে চিকিৎসক নেই। বেশীর ভাগ লোক দুধ ও ছানার চালানি কারবার করে। তার ওপর বিষের ফসল আছে। এখান থেকে আট ক্রোশ দূরে যে গঞ্জ, সেইখানে বাঁকে করে দিয়ে আসে দুধ ও ছানা আর গরুর পিঠে ছালা বোঝাই নিয়ে যায় রবি-শস্য। ফেরে বাঁক এবং ছালায় বোঝাই করে চাল-ডাল-নুন-তেল প্রভৃতি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ নিয়ে। গঞ্জের মারফতে বাইরের সভ্য জগতের সঙ্গে যেটুকু পরিচয় হওয়া সম্ভব, সেইটুকুই মাত্র পরিচয়।

এদের বিশ্বাস অপরিসীম। বিনা প্রশ্নে ডাক্তার সঙ্গে সমস্ত কিছু গ্রহণ করতে পারে। সুতরাং জনার্দনের স্থান-নির্বাচনে ভুল হয় নি।

একটা আম কাঠের আলমারী, ত্রিশ পঁয়ত্রিশটা ছোট-বড়-মাঝারি নানা আকারের শিশি বোতল আর একখানা ওষুধের পত্রিকা, এই নিয়ে জনার্দন দুর্গা' বলে প্র্যাকটিসে বসে গেল।

ওষুধের পত্রিকাটা হল মেটিরিয়া মেডিকা। প্রশ্ন করবার কেউ নেই। কারণ, অক্ষর পরিচয় সম্পন্ন লোক গ্রামে একটিও নেই।

যখন খুব কঠিন রোগী হাতে আসে, নানা ওষুধ দিয়েও রোগের উপশম হয় না, জনার্দন তখন মেটিরিয়া মেডিকা খোলে। ভুরু কুঁচকে পাতার পর পাতা ওল্টাতে থাকে। হঠাৎ একসময় তার মুখ আশার আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

রোগী বোঝে, ডাক্তারবাবু এবার ঠিক ওষুধ পেয়েছেন। সে খুশী হয়ে বাড়ি ফেরে। রোগী কখনও সারে, কখনও সারে না।

তাতে কি ?

হাত উল্টে জনার্দন বলে, ভাই, আমি তো ভগবান নই। রোগীর চিকিচ্ছে করতে পারি। কিন্তু তার পরমায়ু তো দিতে পারি না। পরমায়ু না থাকলে, আমার বাবারও ক্ষমতা নেই রোগীকে বাঁচাবার। কি করব বল ?

সত্যই বলার কিছু নেই। রোগীর অদৃষ্ট-লিখন সেকথা বোঝে। দোষ দেয় নিজের অদৃষ্টকে। জনার্দনকে নয়।

শম্ভু ঘোষের ছেলেরা যদি গ্রামের আর পাঁচজনের মত হত, চিন্তার কোন কারণ থাকত না। কয়েক সপ্তাহ কাটবার পরও যখন উন্নতির কোন লক্ষণ দেখা গেল না, শম্ভুর বাড়ির লোকজন খুব ব্যস্ত হয়ে উঠল। বিশেষ করে তার বড় ছেলে হারাধন।

জনার্দনের উপর শম্ভু ঘোষ ও তার পরিবারবর্গের বিশেষ জোর আছে। যে ঘরটিতে জনার্দনের ডাক্তারখানা, সেটি শম্ভুর সুবৃহৎ গোয়ালের একাংশ। ওদিকে তার অসংখ্য গরু মহিষ, এদিকে জনার্দনের ডাক্তারখানা। মাঝখানে দেওয়াল তোলা। সে দেওয়ালেও এত ফাটল যে, রাত্রে এঘর থেকে গরু বাছুরের রোমন্থনের শব্দ শোনা যায়। প্রথম প্রথম ঘুমের ঘোরেই জনার্দন চমকে উঠে বসে কানে হাত দিত। মনে হত, শব্দগুলি বুঝি তারই কাঁধ কামড়ে ধরেছে, শব্দ এত কাছে বোধ হত।

এখন অভ্যেস হয়ে গেছে। আর চমকায় না।

সে যাই হোক, এই বদান্যতার জন্যে জনার্দন কৃতজ্ঞ।

শম্ভু একাধারে ডাক্তারখানা এবং শয়নকক্ষই নয়, দুধ, দই ও ঘি পর্যাপ্ত পরিমানে উপহারও পেত। ক্ষেতের তরিতরকারী, তাও শম্ভু আর পাঁচজনের চেয়ে অনেক বেশী দিত।

শম্ভু এ গ্রামের সবচেয়ে ধনিক ব্যক্তি। তার জনবল এবং অর্থবলও অন্য সকলের চেয়ে বেশী। বস্তুতঃ, জনার্দন শম্ভু ঘোষের আশ্রয়েই নিশ্চিন্তে ব্যবসা চালাচ্ছিল। এইসব নানাকারণে জনার্দনের উপর শম্ভুর যেমন জোর বেশী ছিল, জনার্দনও শম্ভুর কাছে তেমনি অনুগত ছিল।

শম্ভুর অসুখ সারে না। হারাধন সকালে এসে দাঁড়ায়। জনার্দনের মুখ শুকিয়ে যায়।

—জ্বর তো কমে না, ডাক্তার। সবাই বলছে, বড় ডাক্তার আনতে। বাবার আপনার ওপর বিশ্বেস খুব বেশী। কিন্তু বাড়ির পাঁচজনের কথাও তো ঠেলা যায় না। আপনি কি বলেন?

ঠিক কাছাকাছি নয়, দূরে কোথাও একজন বড় ডাক্তার আছেন, এ খবর জনার্দন শুনেছে। কিন্তু কখনও তাঁকে চোখে দেখেনি। গ্রামের সাধারণ দরিদ্র লোক বেশী পয়সা খরচ করে তাঁকে আনতে পারে না।

কিন্তু শম্ভু ঘোষের কথা স্বতন্ত্র। তার পয়সা আছে। সুতরাং খরচ করে বড় ডাক্তারকে আনা, তার পক্ষে সম্ভব।

বড় ডাক্তার, কত বড় ডাক্তার, জনার্দন জানে না। কিন্তু এতগুলি লোক যখন অভ্রান্ত সম্ভ্রমের সঙ্গে তাঁর নাম উল্লেখ করেন, তখন নিশ্চয়ই বেশ বড় ডাক্তার। অন্ততঃ, তার চেয়ে বড়, তাতে আর সন্দেহের কারণ নেই।

এসেই নিশ্চয় তাকে জিগ্যেশ করবেন, রোগটাকে আপনার কি মনে হয়?

কি হয়ত: কি ওষুধ দিয়েছেন?

জনার্দন রোগ সম্বন্ধে নির্বিকার এবং নির্বিচার। তার কাছে সকল রোগই সমান। কোন রোগেরই নাম গোত্রের সে খবর রাখে না। এবং সকল রোগেই ঔষধ হচ্ছে, ওই রঙ করা জল। তারও নাম গোত্রের সে ধার ধারে না।

দুশ্চিন্তার আসল কারণ এইটাই।

পত্রিকা থেকে জনার্দন দুটো নতুন ওষুধ দিলে। আগে নীল ওষুধ দিচ্ছিল, এখন দিলে লাল এবং হলদে।

বললে, হারাধন, এবারে মোক্ষম ওষুধ দিলাম। দুদিনের মধ্যে জ্বর নিশ্চয় নেবে যাবে।

কিন্তু হারাধনের ভাগ্যটা মন্দ বলতে হবে। দুদিনে জ্বর তো ছাড়লই না, বরং আরও বেড়েই গেল।

হারাধন বললে, ডাক্তার, আপনি তো অনেক করলেন। কিন্তু, জ্বর তো ছাড়ছে না। আর সময় নষ্ট করে লাভ নেই। আজ বিকেলে বড় ডাক্তারের কাছে লোক পাঠাই। কি বলেন?

বলার কিছুই নেই। তার বাপের অসুখ, জ্বর কিছুতেই কমছেনা। পয়সা আছে। সুতরাং বড় ডাক্তার আনতে নিষেধ করে কি করে?

বললে, তাই দেখ।

এই দুটো শব্দ উচ্চারণ করতে সে চোখে অন্ধকার দেখলে। কোনমতে বক্তব্যটা শেষ করলে: কিন্তু তাও বলি, বড় ডাক্তারের কি ফী মনে না?

হারাধন গম্ভীর ভাবে উত্তর দিলে, সে তো বটেই কিন্তু কথা কি জানেন ডাক্তার, যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ। বড় ডাক্তার দেখাতে তো ক্ষতি নেই।

অর্থাৎ আর তাকে রোখা গেল না। বড় ডাক্তার আনতে সে যাবেই।

জনার্দন নিঃসুম হয়ে বসে রইল। তার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছে। বড় ডাক্তার অনেক দূরে থাকেন, আজ বিকেলে যদি তাঁর কাছে লোক যায়, কাল সকালের আগে তিনি আসতে পারবেন না নিশ্চয়। আজ রাত্রিই তার নিশ্চিন্দিপুরের শেষ রাত্রি। ভোরের আগে তাকে এখান থেকে সরে পড়তে হবে। বড় ডাক্তারের সামনে অসাবধ হওয়া চলবে না।

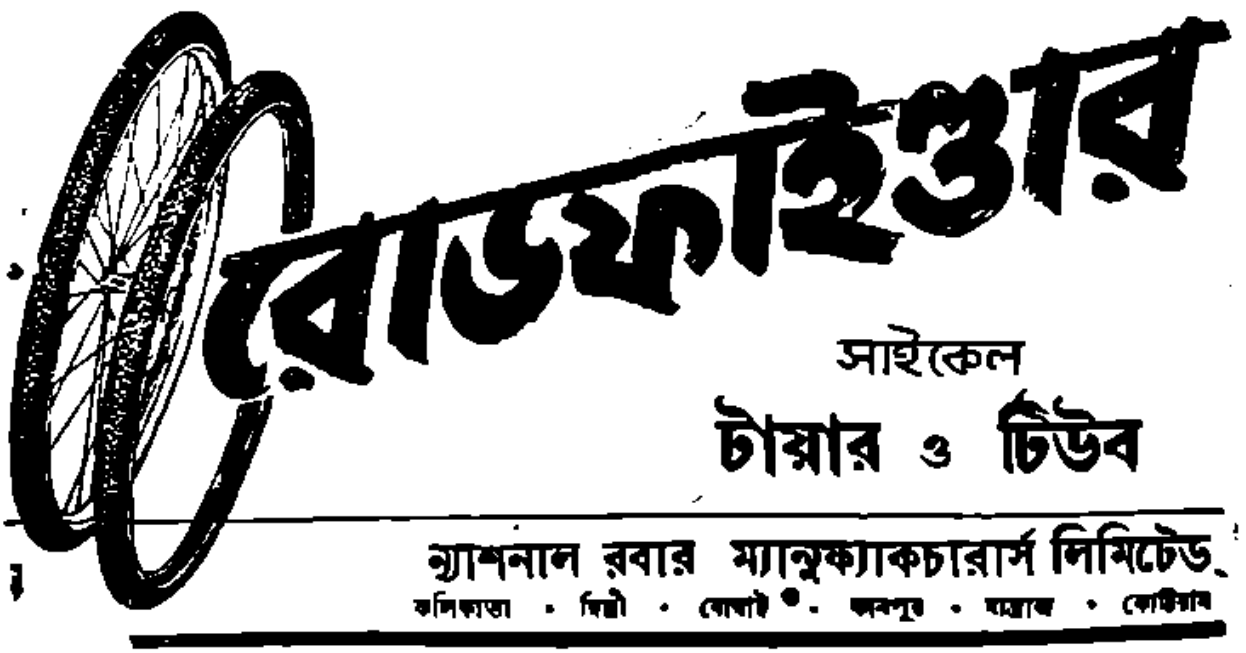

কিন্তু কোথায় যাবে? এই বিদ্যা নিয়ে সে আর কোথায় ডাক্তারী করতে পারে? কোথায় গিয়ে সে রুটি খেতে পারে?

এখানে যে পয়সা খুব বেশী পেত, তা নয়। কিন্তু চালটা-ডালটা, শাকটা-কলাটা-মুলোটা, তার উপর দুধ-দই-ঘি, নিজের শরীরটা ইতিমধ্যেই বেশ চিকন হয়ে উঠেছে। সিকিটা দু' আনিটা কিও পেত। ডাকঘরের অভাবে নিয়মিত মানি অর্ডার করতে পারত না বটে, কিন্তু দুতিন মাস অন্তর বাড়ি এসে জিনিষ পত্র ছাড়াও নগদ কিছু স্ত্রীর হাতে দিতে পারত। বলতে গেলে, সে সুখেই ছিল।

কিন্তু ভগবান একি করলেন।

শম্ভু ঘোষের ওপর রাগও হল। জনার্দনের জন্যে লোকটা অনেক কিছু করেছে সত্যি, কিন্তু শেষকালে যাবার সময় এ কি করে গেল? শম্ভু বাঁচবে না, কিন্তু মরবার সময় জনার্দনকেও মেরে গেল।

রাত্রে রান্না করতে তার মন সরল না। বর্ণাবর্ত দুধ ছিল আর মুড়ি। তাই খেয়ে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ল।

অন্ত শেষ রজনী।

এবং গ্রীষ্ম কালের রাত্রি কতটুকুই বা!

জনার্দনের চোখে ঘুম আসে না। শুধু আকাশ-পাতাল এলোমেলো চিন্তা। কোথায় যাবে, এমনি একটি সর্বাঙ্গ সুন্দর জায়গা, কোথায় খুঁজে পাবে, সে চিন্তা তো আছেই। কিন্তু সে তো পরের কথা। আপাততঃ কাক-কোকিল ডাকবার আগে সকলের অগোচরে এখান থেকে পলায়নের চিন্তাই বড়।

বোঝা বেশী হবে না। ওষুধগুলো তো শিশি মাত্র। সঙ্গে নিয়ে যাবার দরকার নেই। আলমারীটাও থাক। পরে যে ডাক্তার আসবে তার কাজে লাগতে পারে। একটা তক্তাপোষ আছে, কিন্তু সেটা কাঁধে করে নিয়ে যাওয়া যায় না। কাঁথা আর বালিশটা থাকলেই বা ক্ষতি কি? ষ্টেশন অনেক দূরের পথ। বাড়া হাত-পাই ভাল।

জনার্দন উঠে বসল।

শিশির জলগুলো ফেলে দিয়ে যাওয়া দরকার। বড় ডাক্তার এসে তার বিদ্যা ধরে ফেলতে পারে। কিন্তু আলমারী তালা বন্ধ থাকলে কেইবা তালা খুলে তা বড় ডাক্তারকে দেখাচ্ছে!

জনার্দনের খোঁজ একবার পড়বে। বড় ডাক্তার প্রেসক্রিপশন করলে ওষুধগুলো দেবার জন্যে।

এত দুঃখেও জনার্দন হেসে ফেলল।

কোথায় ঔষধ, কেই বা দিচ্ছে?

সময় অনেক দূরে। বড় ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন মত ওষুধ এনে খাওয়ার আগেই শম্ভু পটল তুলবে।

অন্ধকারে জনার্দন দাঁত বের করে হাসলে।

জনার্দন পালাচ্ছে।

জোরে জোরে পা চালিয়ে কয়েক মাইল আসতে অন্ধকার অনেক ফিকে হয়ে গেল। সেই ফিকে অন্ধকারে মনে হল, অনেক দূরে কে যেন ঘোড়ায় চড়ে আসছে। পিছনে আর একটা লোক। তার মাথায় একটা কি, ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। ঔষধের বাক্স হতে পারে। যদি তাই হয়, তাহলে অন্ধারোহীটিই নিশ্চয় বড় ডাক্তার। শম্ভু ঘোষকে দেখতে আসছে।

জনার্দন থমকে দাঁড়াল।

তারপর ধীরে ধীরে পাশে পাটক্ষেতের আড়ালে আত্মগোপন করলে।

পাট গাছগুলির ফাঁক দিয়ে তার দৃষ্টি ওই ঘোড়সওয়ারের দিকে নিবদ্ধ।

যখন তারা আরও কাছে এল, তখন দেখলে, লোক মোট দু'জন নয়, তিনজন। সব পিছনে হারাধন স্বয়ং।

কিন্তু ঘোড়ায় চড়ে ও লোকটি কে?

যেন চেনা চেনা মনে হচ্ছে।

ওরা আরও খানিকটা এগিয়ে আসতে, জনার্দন লাফিয়ে উঠল: আরে, এযে তাদের গাঁয়ের লক্ষ্মীরাম!

লক্ষ্মীরাম তার ছেলেবেলার বন্ধু। অনেক দিন গ্রাম ছাড়া। তার খবর কেউ বড় একটা রাখে না।

সে কি এই অকলে এসে বড় ডাক্তার হয়ে গেছে?

না, এ অন্য ব্যাপার? কিন্তু তাহলে হারাধন সঙ্গে কেন?

অনেক দিন পরে বাল্যবন্ধুকে দেখে জনার্দন আত্মহারা হয়ে উঠল। যা হবার হবে। স্থান-কাল-পাত্র ভুলে গিয়ে জনার্দন একলাফে লক্ষ্মীরামের ঘোড়ার সামনে এসে পড়ল।

লক্ষ্মীরামও অবাক। সেও তড়াক করে ঘোড়ার থেকে লাফিয়ে নেমে বন্ধুকে জড়িয়ে ধরল।

—আরে, জনার্দন! তুই এখানে?

হারাধনও অবাক: ডাক্তার, আপনি এদিকে কোথায় চলেছেন?

সেকথা বলবার নয়।

জনার্দন লক্ষ্মীরামের কাঁধে ঝাঁকিয়ে দিয়ে উত্তেজিত আনন্দে জিজ্ঞাসা করলে, আগে বল্, তুই-ই কি বড় ডাক্তার?

লক্ষ্মীরাম স্বীকার করলে, এখানে আমাকে সবাই ডাই বলেই ডাকে, ডাই।

আনন্দে জনার্দনের চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এল। ভগবান তাকে খুব রক্ষা করেছেন।

হারাধন বললে, উনি আমাদের গাঁয়ের ডাক্তার। বাবাকে উনিই দেখছেন।

লক্ষ্মীরাম রেগে গেল: উনিই যদি তোমার বাবাকে দেখছেন, তবে আবার আমাকে কল্ দিলে কেন? উনি কি সোজা ডাক্তার নাকি? আমরা একই ইস্কুলের ছাত্র।

জনার্দনের সাহস বেড়ে গেল।

বললে, তা হোক। এসে যখন পড়েছিস, তখন তুইও একবার দেখ্। তাছাড়া—হারাধনের দিকে চেয়ে বললে,—পুকুরে একটা বড় দেখে মাছ ধরাও। লক্ষ্মীরামকে আমার হাতের রান্না খাইয়ে দি।

উপন্যাস
নামবার সিঁড়ি
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

পুজোয় চাই নতুন জুতো

Bata

অনেকদিন আগেকার কথা বলছি! ইউরোপে তখন প্রথম মহাযুদ্ধ চলছে। ইণ্ডিয়ায় তখন ইংরাজের রাজত্ব।

যে গ্রামের কথা লিখছি সে গ্রামখানি শহরের কাছাকাছি—বেশ বড় একখানি গ্রাম।

রোজ সকালে বরদাতলায় একটি হাট বসে। অন্য গ্রাম থেকে চাষার মেয়েরা আসে মরশুমি ফলমূল বিক্রি করতে।

কয়েকদিন হলো মেয়েরা আর আসছে না। জিজ্ঞাসা করলে বলে, গাঁয়ের মানুষগুলো ভাল নয়।

মেয়েদের আসা বন্ধ হয়েছে। পুরুষেরা আসে।

তখন কার্তিক মাস। মাঠের নতুন বেগুন হাটে এসেছিল।

খবর পেয়ে গণেশ পাঁড়ে সেদিন নিজেই গেল বেগুন কিনতে।

বেগুনগুলাকে দেখাই যায় না। মেয়েরা তখন তাকে ঘিরে ধরেছে।

গণেশ জোর গলায় হাঁকলে, ধর কত সের—ধর কত তোমার বেগুনের?

লোকজনের গোলমালে বোধকরি কথাটা সে শুনতে পায়নি, তাই জবাব দিতে পারলে না।

গণেশ এবার এগিয়ে গেল।

—এই ব্যাটা চাষা!

মেয়েরা সরে দাঁড়ালো গণেশকে দেখে।

—কী বলছেন ঠাকুর?

—বলছি ধর কত?

—আজ্ঞে তিন আনা সের।

—তিন আনা কি বলছিস? সোনারপো তো নয়, চাষের বেগুন।

অন্য খদ্দেরের বেগুন ওজন করতে করতে চাষী বললে, কি করবো বাবু, যুদ্ধুর বাজার আজকাল।

—যুদ্ধুর বাজার হলো তো তোর কি? বেগুন তো বিলেতে চালান যাচ্ছে না!

চাষী সেকথার জবাব দিলে না। বললে, আপনার কাছে চার আনা পয়সা পাব কিন্তুর বলুন—

পাবি তো পাবি! আমি তো পালিয়ে যাচ্ছি না হারামজাদা।

গাল দিচ্ছেন কেন বাবু। আমি গরীব মানুষ—পয়সাটা ফেলে দিলেই তো পারেন!

গণেশ পাঁড়ে বলে উঠলো, যদি না দিই?

—দেবেন না কী বাবু? দিতে আপনাকে হবেই।

—তোর জোর তো কম নয় ব্যাটা চাষা।

হাতের বেগুন খদ্দেরের ঝাঁচলে ঢেলে দিয়ে চাষী বললে, গায়ের জোর তো দেখাতে পারি না বাবু, আপনারা ব্রাহ্মণ-সজ্জন মানুষ। তাই মুখের জোরেই কাজ সারতে হয়।

আমার জোরে এসে আমাকেই অপমান।

গণেশ পাঁড়ে ফট্ করে এক চড় মেরে বসলো চাষীকে।

বুক ফুলিয়ে উঠে দাঁড়ালো চাষী।

'তুমি আমাকে মারলে?'

গণেশ পাঁড়ের বুকখানাও কম চওড়া নয়। কনৌজ ব্রাহ্মণ। বাংলাদেশে বহুদিন বাস করে মাছ মাংসালীই হয়ে গেছে! আধি মেরে বেগুনের ঝুড়িটা সে উল্টে ফেলে দিয়ে বললে, ভাগ ব্যাটা ভাগ্ এখান থেকে।

চাষী বললে, কিছুতেই যাব না।

তোর বাপের জায়গা?

আমার বাপের না হতে পারে, তোমার বাপেরও নয়।

গণেশ ঝাঁপিয়ে পড়লো তার গায়ের ওপর। কিল, চড়, লাথি, ঘুষি—কিছু আর বাকি রাখলে না।

মুখে যাই বলুক চাষী কিছুতেই হাত তুলতে পারলে না গণেশ পাঁড়ের গায়ে। মাথায় হাত দিয়ে বসে বসে কাঁদতে লাগলো।

লাভের মধ্যে লাভ হলো এই যে ছড়ানো বেগুনগুলো যে যা পারলে তুলে নিয়ে সরে পড়লো।

গণেশ পাঁড়েও বেহাই দিলে না। তখন গোটাচারেক মাত্র পড়েছিল তার পায়ের কাছে। সেই বেগুন চারটি তুলে নিয়ে বিজয়ী বীরের মত সে তার বাড়ীর দিকে চলে গেল।

দেশে তখন জমিদার ছিল। চাষী বললে, যাই আমি জমিদার বাড়ীতে গিয়ে নালিশ করিগে।

গ্রামের কয়েকজন লোক এসে জুটেছিল মজা দেখবার জন্যে। বললে, গিয়েও কোনও লাভ হবে না বাবা। জমিদারের সঙ্গে গণেশ পাঁড়ের আদায়-কাঁচকলায়।

সেই দিন থেকে বয়রাতলার হাট গেল বন্ধ হয়ে। গ্রামে হাট আর বসে না।

গ্রামের দক্ষিণে রেল-ষ্টেশন।

এই ষ্টেশনটি দিনে দিনে বেশ জমকালো হয়ে উঠেছে। রেল-কোম্পানীর বিরাট একটা লোকো সেড্ তৈরি হয়েছে। 'ক্যারেজ ক্লে' দিয়ে ইঁট তৈরির একটা বিরাট কারখানা হয়েছে যেন। আর হয়েছে একটা চুনের ভাটি।

আগে 'ক্যারেজ ক্লে' কাকে বলে জানতো না গাঁয়ের লোক। সাদা সাদা মাটি—ঘর-দোর নিকোবার জন্যে নিয়ে আসতো খুঁড়ে খুঁড়ে। পুজোর আগে বাড়ী ঘর দোর এই মাটির পলস্তরা দিয়ে গ্রামের লোক সাদা ফট্‌ফটে করতো। তারপর হঠাৎ একদিন এই গ্রামের জমিদারের ছেলে নবীন তার এক বন্ধুকে ডেকে নিয়ে এলো এই গ্রামে। মাটিটা সে পরীক্ষা করে দেখলে। খানিকটা মাটি নিয়ে সেল সঙ্গে করে। তারপর থেকেই এই কাণ্ড। এখন আর কেউ সেখানে মাটি নিতে পারে না। গাড়ী আসে, ট্রাক আসে, মাটি নিয়ে কোথায় চলে যায় কে জানে। শুনছি নাকি রেলগাড়ীতে চালান যায়। সেই তারই একটা কারখানা হয়েছে ষ্টেশনে। সেই মাটি দিয়ে ইঁট তৈরি হয়।

নবীন বলে, আমার পয়সা থাকলে কারখানাটা আমিই করতাম।

যাক্ সেকথা পরে বলবো। এখন যে কথা বলছি সেই কথা বলি।

গ্রামের লোক সেসব কথা বোঝে না—বুঝতে চায়ও না। সেই সব কারখানায় ছেলে-ছোকরাদের এক-আধটা চাকরি জুটলেই হলো।

গ্রামের চারটে ছেলে ঢুকেছে সেইখানে।

তিনু ভট্‌চাজ বলে, হেঁ হেঁ বাবা, এমনি চাকরি করনি। চাল বিক্রি করে সাড়ে বত্রিশ টাকা ঘুষ দিলাম। তখন বললে, ছেলেটাকে দিও পাঠিয়ে।

দু'জন ঢুকেছে লোকো সেডে। আর দু'জন অন্য জায়গায়।

ঘরের খেয়ে তবু দু'পয়সা আনছে।

ভারতবর্ষ তখনও স্বাধীন হয়নি। ইংরাজের রাজত্ব। খাও দাও—সুখে সচ্ছন্দে থাকো। আর কি চাই? গাঁজা আফিংএর দোকান করে দিয়েছি। গ্রামে গ্রামে মদের ভাটি। ফুর্তি কর। ফুর্তি কর।

তা ফুর্তি করছেও।

গ্রামের পুব, পশ্চিম আর উত্তর—এই তিনটে দিক এখনও ফাঁকা। চাষ-আবাদের জায়গা ওদিকে প্রচুর। পশ্চিমে ছোট একটি নদীও আছে। নদী না বলে তাকে খাল বলা চলে।

চাষ হয়। শুধু ধানের চাষ। এই কিছুদিন আগে পর্যন্ত আখের চাষ হতো, খেসারী হতো, বিরি হতো, সরষে হতো। বাড়ীতে সারা বছরের গুড় আসতো, ডাল আসতো, সরষের তেল আসতো। প্রত্যেক বাড়ীতেই গাই ছিল, দুধ হতো। পুকুর ছিল, মাছ হতো।

বাজারে ছিল না তারা কিনতো টাকায় আট সের দুধ। আট আনা দু' আনা সের মাছ।

লোকজন কেমন যেন আয়েসী হয়ে পড়ছে দিন-দিন। পাকা ধান ঘরে ঢুকলে কেউ আর মাঠের দিকে ফিরে তাকায় না। সারা বছরের খোরাকী ধান চাল বাড়ীতে রেখে বাকি ধান বিক্রি করে আসে শহরে। জামা কেনে, জুতো কেনে, কাপড় কেনে। কেউ কেউ মদ খায় আর গাঁজা টানে।

গাঁজাখোরের দলটাই যেন ভারি হয়ে উঠছে দিন-দিন। সস্তায় নেশা। কিন্তু সেখানেও অতৃপ্তি আছে। মাধু সরকারের জোয়ান ছেলেটা গাঁজা টানতে শিখেছে। কিন্তু বাড়ীতে অভাব। বৌএর শাড়ী কিনতে হবে। ছেলেটার গায়ে শীতের জামা নেই। গিয়েছিল ষ্টেশনের কারখানায়। ঘুষ দিয়ে ঢুকেছিল ফিটার মিস্ত্রির তল্পিটিতে। তিন দিন পরেই ফিরে এলো।

কি হলো রে? চাকরি ছেড়ে দিলি?

হ্যাঁ ভাই, পোষালো না। সোহো-সরঞ্জামের যা বিচ্ছিরি আওয়াজ! দু' আনা রোজগার করতে গিয়ে আমার চার আনা লোকসান।

সে আবার কি রকম?

চার আনার গাঁজা টেনে সেলাম মদের ভাটিতে কাজ করতে। আওয়াজের চোটে চমকে চমকে উঠি। ঘণ্টা খানেক পরেই দেখি—নেশা একেবারে ঠাণ্ডা জল। তখন আবার ছোটো। আবার টানো?

কথাটা শোনে আর সবাই হো হো করে হাসে।

পচু পাসুলী সত বৎসর কোথায় যেন যাত্রা শুনতে গিয়ে একটি হারমোনিয়াম নিয়ে এসেছে। কেমন করে এসেছে সেই জানে। কিছুদিন চুপচাপ ছিল। বছরখানেক হয়ে গেল—তার আর কোনও

খোঁজ খবর না নেখে এখন সে হারমোনিয়ামটি বের করেছে। বাজে তাল, আর পচু পাঞ্জুলী বাজনাও তাল। কুহু চাটুজ্যের তুলি-তবলাটি সম্প্রতি মেরামত করানো হয়েছে। রাখহরি পাঠকের খঞ্জনী ঘষিয়া সবই রয়েছে। এত সব যন্ত্রপাতি থাকতে গ্রামে একটি যাত্রার দল কেন চলবে না—পচু পাঞ্জুলী এই নিয়ে আজকাল গভীর গবেষণা করছে। ছেলেছোকরাদের ডেকে সেদিন রাখহরি পাঠকের বাড়ীতে একটা মিটিংও করেছিল।

বেনোয়ারী-ওস্তাদ যাত্রার দলে ঠিকে চুক্তিতে বেহালা বাজিয়ে বেড়ায়। সেও বলছে, গ্রামে যদি একটা যাত্রার দল হয়, তাহ'লে আর তাকে পরের খোসামুদি করতে হয় না। ঘর-বার দুইই চলে এক সঙ্গে। তারই উৎসাহ যেন সব চেয়ে বেশি।

আমাদের গ্রামে এতগুলো গুণী লোক। আমাদের ভাবনা কি? দলের নামডাক হতে কতক্ষণ। তখন রাত-দিন দু'এক টাকা করে সবাই পাবে। নেশা ভাং তো ফ্রি।

ছেলেরা তাই চাঁদা আদায়ের একটা খাতা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

দু'চার আনা যার যা খুশী দাও। দল আরম্ভ করতে হলে প্রথম প্রথম কিছু খরচ আছে।

বরমতলার পাশে যত বড় যে সোনারী দোকানটি চলে, সেখানে আজকাল কারফ কলং প্লেট সেলিস তো থাকেই, তার ওপর কেমিকেলের গয়না, সেজি মোজা সাবান জরদা তরল আলতা স্নো পাউডার—সবই পাওয়া যাচ্ছে।

সোনো-পাউডারের কেউ কোনোদিন নামও শুনিনি বাবা, আজকাল দেখি আমার মেয়েটা বলে কিনা—বাবা পয়সা দাও, সোনো কিনবো।

সখিবর বলে, এই সবের চলন্ হয়েছে বলেই তো সজনী বয়রার অন্ধকার খুপ্‌রির ওপর দোতলা বাড়ান উঠলো।

কিন্তু কেনারাম মুখুজ্যে খাঁটি দার্শনিক।

সে বলে, উঠুক বাবা উঠতে দাও। দোতলার ওপর তেতলা উঠুক। সেই কথায় আছে না—অতি বাড় বেড়ো না ঝড়ে পড়ে যাবে। ওরও একদিন বেঘরে তোমরা:—এই আমি বলে রাখলাম, সব ঘুনিসাৎ হয়ে যাবে। বেলচুরির মাল-বেচা পয়সা বাবা—এমন তুমিও হতে পারো, আমিও হতে পারি।

কেনারাম মুখুজ্যেকে কিন্তু রোজই সকাল সন্ধ্যে দুবেলা সজনীর দোকানে আসতে হয়। আকিংখোর মানুষ। সকাল বিকেল একটুখানি চা না হলে চলে না। অথচ বাড়ীতে চা তৈয়ার খরচ আছে। চায়ের পাতা না হয় গরম জলে ফেলে দিলেই চা হলো, কিন্তু মুস্কিল হয় দুধ আর চিনি নিয়ে। বাড়ীতে যে গাইটি আছে তার দুধ অত সকালে দোয়ানো হয় না, চিনি চাইতে গেলেই তো গিন্নি তেড়ে মারতে আসে। বলে, কেন, গুড় রয়েছে বাড়ীতে, নাও না। আবার চিনি কেন?

কাজেই অনেক কষ্টে অনেক বুদ্ধি বিবেচনার পর মাত্র এই সেদিন—গত বৎসর পৌষ মাসের দুরন্ত শীতের এক সকালে প্রাতঃকালে সজনী নস্তকে এই আকিংএর অভ্যেসটি ধরানো হয়েছে। চা চিনি দুধ—কিছুরই অভাব নেই তার। দোকানের চালার খুঁটিতে ঠেস্ দিয়ে চির পুরাতন চটের আসন-

খানির ওপর চেপে একবার বলতে পারলেই হলো। চায়ের বরাদ্দ কারও কাঁক পড়বে না। এমন কী সারার বাটির এক বাটি চা সেখানে মিলবেই।

কপিল চক্কোত্তিও শুধু সেইজন্যেই এসে বসেছিল। সকেবেলা তখন সে তার কাপড়ের পুঁটের ওপর বসিয়ে গরম কাঁসার বাটিটি তার মুখের কাছে তুলে ধরেছে।

এমন সময় কেনারাম এসে বসলো। কপিলকে সে চিনতে পারেনি।

কেনারামের দোষ নেই। কি একটা ব্যারামের জন্য চোখের পাতাদুটি দিনরাত ওঠানামা করে। ভাল দেখতেও পায় না। কপিলের দিকে তাকিয়ে বললে, কি হে বক্তিনাথ, তুমিও এসেছ নাকি? আখো, তারুর জন্যে সেদিন বিস্কুট আনতে দিলাম তোমার ভাইপোকে। দু'আনায় আসলে তিনটি বিস্কুট। বলি ও হে সজনী, শোনো শোনো! তারুর দোকানে বিস্কুট আনতে পাঠিয়েছিলাম। দু'আনায় আসলে তিনটি বিস্কুট। তোমরা দোকানদার মানুষ—শুনেছ কখনও?

সজনী দোকানের ভেতর তার নিজিষ্ট আসনায় বসে খদ্দের বিদেয় করছিল, কথাটা হয়ত সে শুনতেই পেলে না।

সজনী না শুনুক, যে শোনবার সে শুনলে।

কপিল চক্কোত্তি বললে, আমি বক্তিনাথ নই, আমি কপিল।

কেনারাম তখন চায়ের জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল। দোরের একপাশে কাঁসার একটি বড় ঘটিতে তৈরী চা ঢাকা দেওয়া থাকে। যে আসে সে বাটিতে ঢেলে নিয়ে যায়। কেনারাম তার নিজিষ্ট বাটিতে চা টুকু ঢালতে ঢালতে বললে, চোখের নজরটা আজকাল ভাল চলে না হে, তাই এইরকম গোলমাল হয়ে যায়।

বলেই সে চায়ের বাটিতে চুমুক দিলে। চুমুক দিতেই মুখখানা তার অন্যরকম হয়ে গেল।

এ কী রকম চা হয়েছে সজনী? এ তো চা নয়। এ যে জল—

কথাটা সজনী এবার শুনতে পেয়েছিল। বললে, 'জল হতেই পারে না। তাকিয়ে আখো না কপিলের বাটির দিকে। ওই ঘটি থেকেই তো ঢেলে নিয়েছে। ওর বাটিতে এখনও ধোঁয়া উঠছে।

সত্যি সত্যিই ধোঁয়া উঠছিল কপিলের বাটিতে। খেতে পারছিল না—এত গরম। কেনারাম দেখতে পায়নি। এতক্ষণ পরে ভাল করে তাকিয়ে দেখলে। চায়ের বাটিতে ধোঁয়া উঠছে কিনা দেখতে পেলে না, কিন্তু দেখলে কপিল চক্কোত্তিকে।

ও, তুই কপুলে। আমি ভেবেছিলাম বক্তিনাথ। তবে আর বলতে হবে কেন সজনী। কপুলে ও-পাড়া থেকে এ-পাড়ায় এসেছে চা খেতে। জানে সজনী দত্তর দোকানে গেলে চা খেতে পাওয়া যায়। গরম চাটুকু নিজে ঢেলে নিয়েছে। তারপর দিয়েছে খানিকটা জল ঢেলে।

বলেই সে আবার আর এক চুমুক দিলে চায়ের বাটিতে। চুক করে চা টুকু খেয়েই বলে উঠলো, নিখুঁত জল। আর এ ওই কপুলের কাজ।

কপিল চক্কোত্তি মানুষটা একটু খ্যাপাটে গোছের। বয়স প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি। সজনী কেনারামের চেয়ে কিছু বড়ই হবে। বেঁটে খাটো মানুষ, মুখে একরাশ দাড়ি গোঁফ, চেহারাটা বিশ্রী।

বাড়ীতে বৌ আছে। কিন্তু বৌএর সঙ্গে একদণ্ড বনে না। ছেলেপুলে হয়নি। হবার আশাও নেই। বৌএর কাছে চা চেয়েছিল আজ সকালে। চা সে দেয়নি। বলেছে—কারও বাড়ীতে গিয়ে খেয়ে এসো! চা আমি দিতে পারবো না। চিনি নেই।

কপিল বলেছিল, নুন দিয়ে খাব।

এই বলে সে নিজেই গিয়েছিল একটু জল গরম করে নিতে। বৌ তাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়েছে। উনোন ছুঁতে দেয়নি। বলেছে, আকাচা কাপড়ে খবরদার বলছি আমার উনোনে হাত দিও না।

কপিল তখন বেরিয়ে পড়েছিল বাড়ী থেকে একটু চায়ের সন্ধানে। সজনীর দোকানে এসে দেখে—ঘটিতে গরম চা রয়েছে বাটি ঢাকা দেওয়া। একটা গামলা ছিল কাছেই নামানো। চুপিচুপি চা টুকু ঢেলে নিয়ে গামলার জল ঢেলে ঘটির চা যেমন ছিল ঠিক তেমনি রেখে দিয়েছে।

কেনারাম বললে, তুই ও-পাড়া থেকে এখানে কি জন্যে এসেছিস হারামজাদা? এখন কি করি বলতে পারিস? এই জলটা আমি খাব?

কপিল বললে, খাও না। উপকার হবে। পেটে গেলেই শুধ করবে।

বলেই খিক্ করে হেসে উঠলো।

একে আফিংখোর মানুষ, চা খেতে বসে এই বিভ্রাট, তার ওপর হাসি!

আপাদ মস্তক জ্বলে গেল কেনারামের। হাতের কাঁসার বাটিটা ছুঁড়ে দিলে কপিলের গায়ের ওপর।—'নে শালা খা তবে তুইই খা।'

বাটিটা ছিটকে ঘুরে গিয়ে পড়লো আর জল মেশানো চায়ে কপিলের কাপড়টা গেল ভিজে। তা যাক্। এর জন্যে গরম চা ছেড়ে ওঠা যায় না। কপিল উঠলো না। রাগও করলে না। বাটির অবশিষ্ট চাটুকু শেষ করে বাটিটি সেইখানে নামিয়ে রেখে বললে, নে কেনারাম, বাটিটা ধুয়ে রাখ্।

সর্বনাশ!

একে কেনারামের রাগ তখনও পড়েনি, তার ওপর এই কথা! উঠে দাঁড়ালো সে—কপিলকে মারবার জন্যে। কপিলও ছুটে গিয়ে রাস্তায় নামলো। বললে, গামলার জলটা তো খেলি।

রাগে কেনারামের চোখের পাতা দুটো ঘনঘন ওঠানামা করছে তখন। মুখ দিয়ে কথা বেরুচ্ছে না। ঠোঁট দুটো নড়ছে শুধু।

আঃ, এ কী হচ্ছে তোমাদের বুড়ো বয়সে ছেলেমানুষের মত।

বলতে বলতে সজনী বেরিয়ে এলো তার দোকান থেকে। তার পিছু পিছু এলো কয়েকজন খরিদ্দার। দুখন আকরা সুপুরি কিনেছিল, সেগুলি তখনও সে খুঁটে বাঁধবার অবসর পায় নি। সেইগুলি সে কাপড়ের খুঁটে বাঁধতে বাঁধতে বললে, কপিলের বাপ একজন মস্ত পণ্ডিত ছিলেন গো! সংস্কৃতে জানতেন।

পেছন থেকে কে একজন বলে উঠলো, আর ওই তার ছেলে।

কপিল তখনও খিক্ খিক্ করে হাসছে। কেনারামকে ক্ষেপাবার জন্যে বলতে লাগলো—কেম্, কেনৌ, কেনঃ। কেনাম্, কেনৌ, কেনাঃ। কেনেন, কেনাভ্যাম্, কেনেভ্যঃ। আমিও সংস্কৃত জানি।

বলতে বলতে সে তাড়াতাড়ি তার বাড়ীর দিকে চলে গেল।

কেনারাম ছুটে তাকে ধরবার জন্যে পা বাড়িয়েছিল, পেছন থেকে সজনী মস্ত তার হাতখানা চেপে ধরলে।

ছি! তুমি ছুটে গিয়ে মারবে ওকে? ও কি একটা মানুষ?

বলেই সজনী সেইখান থেকে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে মেয়েকে ডেকে বললে, মুখুজ্যের এখনও চা খাওয়া হয়নি মা। ওকে এক পেয়ালা বেশ ভাল করে চা তৈরি করে দে তো!

কেনারাম মুখুজ্যে ঠাণ্ডা হলো। আবার ঠিক নিজের জায়গাটিতে গিয়ে বসলো গজ্ গজ্ করতে করতে।

কপালে-ব্যাটা পাগল নয়—পাগল নয়, ব্যাটা শয়তান।

সুমুখের রাস্তা দিয়ে একটা লোক পেরিয়ে যাচ্ছিল ঝুড়ি মাথায় নিয়ে। কেনারামের নজর পড়লো সেইদিকে।

বলি ওহে ও লোকটি! শোনো, শোনো, নামাও না ঝুড়িটা। দেখি কি নিয়ে যাচ্ছ! গণেশ পাড়ে দিলে আমাদের হাটটিকে তুলে। এখন মর্ ব্যাটারা—তরি তরকারি কেমন করে জোগাড় করবি কর্!

লোকটি পথ চলতে চলতে বললে, এ তরকারি আপনারা খেতে পাবেন না বাবু।

কী এমন তোমার কপি-মুলো আছে যে খেতে দিতে পারবো না? নামাও নামাও, কেউ মারবোর করবে না—আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি তুমি নামাও।

হয়ত সে নামাতো না মাথার ঝুড়িটা। কিন্তু কেনারাম মুখুজ্যে উঠে গিয়ে তার ঝুড়িটা টেনে ধরলে পেছন দিক থেকে।

—তরকারির ব্যবস্থা কিছু নেই বাবা বাড়ীতে। শুধু আলু আর পোস্ত খেতে ভাল লাগে না। বাবা রোজ-রোজ। নামাও তুমি।

লোকটি নামালো তার ঝুড়ি। বললে, মুরগীর ডিম আছে বাবু।

কেনারাম লাফিয়ে উঠলো।—মুরগীর ডিম!

হাঁ বাবু, ইষ্টিশনে নিয়ে যাচ্ছি। সাহেবরা কেনে।

তা মুরগীর ডিম তো এ রাস্তায় কেন? এই বামুনের গাঁয়ের মাঝখান দিয়ে—ঠাকুর দেবতার থানের ওপর দিয়ে—

কেনারাম মুখুজ্যের চোখের পাতা দুটো খুব ঘন-ঘন ওঠা-নামা করতে লাগলো।

লোকটি তখন তার ঝুড়িটি আবার তার মাথায় তোলবার ব্যবস্থা করছে, কেনারাম বাধা দিলে।

না না সেটি হচ্ছে না বাপ্‌ধন, দাঁড়াও। মুরগীর ডিম ছুঁয়ে সকালবেলা চান যখন আমাকে করতেই হবে—

ঝুড়িটাকে চেপে ধরলে কেনারাম।

বলি তোমার আস্পর্দা তো কম নয়। ওরে কে আছিস? ডাক্ তো বাবা গণেশ পাড়েকে!

যাহার বলের জন্যে বাড়ী বাড়ী চাল আদায় করছিল হরেকেষ্ট দালাল। চালের ডালাটি মাথায় নিয়ে তখন সে সবেমাত্র এসে দাঁড়িয়েছে। ভাবলে বুঝি আনাজ-পত্র বিক্রি করতে এসে চড়া দর হেঁকেছে লোকটা। হরেকেষ্ট বললে, এ গাঁয়ে বেশি দাম চাইলে চলবে না বাবা। এ গাঁয়ে এক দর।

সজনী তখনও দাঁড়িয়েছিল। বললে, কি ভেবেছ তুমি হরেকেষ্ট? ও আনাজ বিক্রি করতে আসে নি। মুরগীর ডিম বেচতে এসেছে।

হরেকেষ্ট চেঁচিয়ে উঠলো।—মুরগীর ডিম! কে খাবে?

কেনারাম বললে, তাই তো বলছি ব্যাটাকে। আমাদের বুকের ওপর দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে মুরগীর ডিম। তার ওপর ধর্ম্মরাজতলার।

সজনী বড় বিবেচক মানুষ। বললে, কেন মিছেমিছি ঝিক্ করছো বেচারাকে? ছেড়ে দাও।

রাঘবরি পাঠক এসে দাঁড়ালো গোলমাল শুনে। বললে, না তা হয় না। এ অনাচার আর যেখানেই চলুক, আমাদের গাঁয়ে চলবে না। গণেশকে ডাকি, সেই এর বিচার করে দিক্।

ডিমওলা আর কাউকে না চিনুক্, গণেশ পাঁড়েকে চেনে। বললে, পাঁড়েকে ডাকবেন না বাবু, আমি চলে যাচ্ছি, আর এদিকে আসবো না। ইষ্টিশেনে যেতে হলে গাঁয়ের বাইরে বাইরে যাব।

কেনারাম বললে, তা যখন যাবে তখন যাবে, এখন কিছু অর্থদণ্ড দিয়ে যাও!

সজনী মনে মনে হাসলো। বললে, দাও ধর্ম্মরাজকে কিছু প্রণামী দিয়ে যাও। ব্রাহ্মণ যখন, তখন ছাড়বে না।

বলেই সে তার দোকানে গিয়ে ঢুকলো।

ডিমওলা দু'আনা পয়সা দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাকে দিতে হলো আট আনা।

কেনারাম মুখুজ্যে আধুলিটি তার ট্যাঁকে গুজতে যাচ্ছিল, হরেকেষ্ট, রাঘবরি—একসঙ্গে হাঁ হাঁ করে উঠলো।

সাধারণী পয়সা মুখুজ্যে, ধর্ম্মরাজের প্রণামী ওটা—তোমার প্রণামী নয়।

সজনী ভেতর বাড়ীর ভেতর থেকে মুখুজ্যের জন্যে চা এনে। গ্লাসটি হাতে নিয়ে কেনারাম মুখুজ্যে বললে। বললে, তা কি করতে হবে বল্। আমিই তো আদায় করলাম বাবা। তোরা হলে পারতিস?

হরেকেষ্ট বললে, বেচু ময়রা সরষ গরম বেগুনী ভাজছে দেখে এলাম। দাও, আট আনার বেগুনী নিয়ে আসি।

রাঘবরি পাঠক কিন্তু অন্য কথা বললে।

বেগুনীর চেয়ে পয়সাটা আমাকে দাও। গাঁজা কিনে আনি।

গাঁজা বিক্রির চোরাই কারবারটা তখন চলছে ভাল। গাঁজার নেশা করবার লোকের সংখ্যা প্রচুর। কাজেই দক্ষিণপাড়ার একজন আর পূব পাড়ার একজন, দু'জন একান্ত সঙ্গোপনে এই লাভের ব্যবসাটি চালাচ্ছে। টাকায় টাকা লাভ। পনর থেকে দশ টাকার গাঁজা কিনে এনে কুড়ি টাকা লাভ করে।

শেষ পর্য্যন্ত ঠিক হলো—বেগুনী এবং গাঁজা দুইই আসুক।

দুটি বস্তুই এলো।

আগে এ-সব কাজ গোপনে চলতো, আজকাল প্রকাশ্যেই চলে।

তবে হ্যাঁ, মাঝে মাঝে গোপন করতে হয় অবশ্য—কারণ যে দেরিয়ে যায় সেই রাস্তা দিয়ে, দেখতে পেলে ধরে পড়ে। হাত বাড়িয়ে কল্কেটা একবার চেয়ে বসে।

চাইলে বুঝি 'না' বলতে নেই। এই হচ্ছে নিয়ম।

সেদিন সজনী বড় বাদ দিয়ে উপস্থিত সকলেই প্রসাদ পেলে।

গল্পিকা প্রসাদের পর এলো বেগুনী।

ছেলে-ভাজা গরম বেগুনী। রাখহরি দেখে এসেছিল বেচু ময়রা তার দোকানের বাইরে গ্রম বসে উনোনে কড়াই চাপিয়ে বেগুনী ভাজছে। পাশেই বেচু ময়রার দোকান। আনতে বেশি দেরি হবে না।

কাঁচা শালের একটি করে পাতা হাতে নিয়ে নিজের নিজের ভাগের বেগুনী সবাই তুলে নিলে নিজের নিজের হাতে।

গণেশ পাঁড়ের ছোট ছেলেটা এসেছিল সজনীর দোকানে তেল কিনতে। রাখহরির বেগুনী সেবা চলছিল বাইরের একটা খুঁটিতে ঠেস্ দিয়ে। হঠাৎ কি ভেবে গণেশের ছেলেটাকে সে কাছে ডাকলে হাতের ইসারায়।

—এই ভ্যাটুয়া, শোন্।

ভ্যাটুয়া কাছে এসে দাঁড়ালো।

রাখহরি তার হাতের একটি বেগুনী তার দিকে বাড়িয়ে ধরলে।—'খাবি? গরম বেগুনী।'

ভ্যাটুয়া বেগুনীটি নেবার জন্যে যেই হাত বাড়িয়েছে, রাখহরি টুস্ করে বেগুনীটি নিজের মুখে পুরে দিয়ে বলে উঠলো, ছাই খা ব্যাটা সিটি খা!

বেগুনী খাওয়া তখন শেষ হয়ে গেছে। কেনারাম, ধরেকেষ্ট, রাখহরি সবাই যে যার বাড়ীর দিকে চলে গেছে, এমন সময় দেখা গেল গণেশ পাঁড়ে ভ্যাটুয়ার হাতে ধরে টানতে টানতে সজনী ময়রার দোকানের কাছে এসে দাঁড়ালো।

কোথায় সব—এরা গেল কোথায়? বেগুনী কোথায় ভাজছে?

সজনী তার দোকানের ভেতর থেকে বলে দিলে,

—আমার এখানে নয় গো পাঁড়ে, বেচুর দোকানে ভাখো।

বেচা! দেখি ব্যাটার বেগুনী বেচা আমি বের করছি। সকালবেলা ছেলে কাঁদানো—! চল্ ব্যাটা চল্!

ভ্যাটুয়াকে টানতে টানতে গণেশ বেচুর দোকানের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। প্রচণ্ড একটা হুঙ্কার ছাড়লে—বেচা!

দোকানের সুমুখে বসে কাশী হাজরা কল্কের ফুঁ দিচ্ছিল। গণেশের হুঙ্কারের চোটে হাত থেকে কল্কেটা তার পড়ে গেল।

বেচু বেগুনী ভাজছিল এক কোণে বসে। বললে, আসুন, পাঁড়ে ঠাকুর, আসুন। বসতে আজ্ঞা হোক্।

চটের আসনটি এগিয়ে দিলে বেচু। আসে ময়রা। দোকান করে খায়। মানুষের মন জোগাতে সে জানে। হাত জোড় করে একটি প্রণাম করে বেচু বললে, এসে বসুন এইখানে।

গণেশ পাঁড়ে বসলো।

ভাখ্ ব্যাচা, রোজ রোজ বেগুনী ভাজছিস্, ছেলেটা কেঁদেই সারা। এ তো ভাল কথা নয় বেচা। এক-আধদিন ভাজিস্ সেই ভাল, কিন্তু রোজ রোজ—

গণেশ পাঁড়ের মনের বাসনা বুঝতে পেরেছিল বেচুলাল। খাঁচি থেকে দুটি গরম বেগুনী তুলে ভ্যাটুয়ার হাতে দিয়ে বললে, নাও, সেবা যাও ছোট পাঁড়ে।

বেগুনী দুটি হাতে পেয়ে ভাঁটুয়ার মুখে হাসি ফুটলো।

বেচু এইবার ফিরে তাকালো গণেশ পাড়ের দিকে।

তা'হলে শুরুন পাড়ে ঠাকুর। আগে দিন পায়ের ধুলো দিন।

এই বলে হাত বাড়িয়ে পাড়ে ঠাকুরের ধূলি ধূসরিত পায়ে হাত দিয়ে সেই হাতটি ভক্তিভরে মাথায় ঠেকিয়ে বেচু বললে, তা'লে শুরুন, শুকনো খড় বলতে তো একগাছিও নেই কারও বাড়ীতে। তাই বলি গরু-বাছুরগুলো খায় কি? তাই বলি কিছু বেগুন ফুনুরি ভেজে রাখি। গাঁয়ের বাউরি-বাগ্‌দি মেয়েরা দু'এক আঁটি ঘাস দিয়ে যাবে আর মজের সঙ্গে খাবার জন্যে দু'চার পয়সার তেলে ভাজা নিয়ে যাবে—এই আর কি! নইলে কি আর আমি সাধ করে রোজ রোজ—

বলতে বলতে আলাদা একটি পাতায় প্রায় আট-দশটি বেগুনী নিয়ে গণেশ পাড়ের হাতে নামিয়ে দিলে বেচু।

নিন্ আপনিও সেবা দিন ঠাকুর। আজ আমার কত ভাগ্যি বলুন দেখি!

অম্লান বদনে বেগুনীগুলির সদ্ব্যবহার করে গণেশ পাড়ে উঠে দাঁড়ালো। বেচু বললে, দাঁড়ান ঠাকুর। মা-ঠাকরুণের জন্যে কিছু দিয়ে দিই আপনার হাতে।

একটি ঠোঙায় আরও কয়েকটি বেগুনী নিয়ে গণেশের হাতে তুলে দিয়ে আর একটি প্রণাম করলে বেচু।

গণেশ পাড়ে ভাঁটুয়াকে নিয়ে চলে যাচ্ছে, এমন সময় বলরাম তাকরা এসে দাঁড়ালো দোকানের সামনে।

পেন্নাম হই পাড়ে-ঠাকুর। আজ একটা বিচ্ছিরি কাণ্ড হয়ে গেছে।

কি হয়েছে?

বলরাম বললে, এক ভিরওলা এসেছিল আমাদের গাঁয়ে। তাকে মারধোর করে কেনারাম মুখুজ্যে, হরেকেষ্ট আর রাখহরি পাঁচটা টাকা কেড়ে নিয়েছে। লোকটা কান্নাকাটি করছিল। আমি বললাম এর নিষ্টিকার যদি করতে চাস্ তো যা ব্যাটা পাড়ে-ঠাকুরের কাছে চলে যা। এই বলে আমি তাকে পাঠিয়ে দিলাম আপনার বাড়ীতে।

তাহ'লে তো আমাকে যেতে হয় তাড়াতাড়ি। চললাম রে বেচু।

গণেশ পাড়ে চলে গেল।

কালী হাজরা ততক্ষণে কল্‌কেটা আবার নতুন করে সেজে হুঁকোয় বসিয়ে পড় পড় করে টানছিল।

বেচু বললে, দেখলে হাজরা? যে-ঠাকুরের যে মন্তর। পাড়ে-ঠাকুরকে কেমন ঠাণ্ডা জল করে দিলাম।

বলরাম তাকরা চেপে বসলো তামাক খাবার জন্যে।—দাও গো হাজরা, কল্‌কেটা একবার দাও নামিয়ে তোমার হুঁকো থেকে।

কালী হাজরা কলকেটা নামিয়ে দিতেই বলরাম দু'হাত দিয়ে সে এক অদ্ভুত ভঙ্গীতে টানতে টানতে ধোঁয়া বের করতে লাগলো। তারপর হঠাৎ তার কি একটা কথা মনে পড়তেই হাজরাকে জিজ্ঞাসা করে বললো, জানো হাজরা, এই যে যুদ্ধটা হচ্ছে—এটা কতদিন চলবে মনে হয়?

কাশী হাজরা পাঠশালার পণ্ডিত। কিছু লেখাপড়া জানে। বললে, বেশিদিন চলবে না। ঝগড়া মারামারি বেশিদিন চলে না। জানোয়ারগুলো হাঁপিয়ে যখন পড়বে, তখন থামবে।

বেচুর মনেও একটা প্রশ্ন আছে। বেগুনী ভাজতে ভাজতে সে জিজ্ঞাসা করলে হাজরা-মশাই যুদ্ধ যুদ্ধ তো শুনছি অনেকদিন থেকে। যুদ্ধটা হচ্ছে কোথায় বলতে পারেন?

ইওরোপে চলছে তখন প্রথম মহাযুদ্ধ।

কাশী হাজরা গম্ভীর মুখে বললে, বিলেত, বিলেত।

বিলেতটা আমাদের দেশের কোনখানে হাজরামশাই?

হাজরা বললে, পুবদিকে—ঠিক একবারে খাড়া পুব।

একটুখানি থেমে আবার বললে, সেদিন সেই মামলাটার জন্যে আদালতে যেতে হয়েছিল। ফিরতে রাত হলো। উড়োজাহাজ দেখে এলাম সেদিন।

উড়োজাহাজ মানে এরোপ্লেনের নাম তখন সবেমাত্র লোকজনের কানে এসে পৌঁছেছে।

বলরাম জিজ্ঞাসা করলে, সে আবার কি রকম হাজরামশাই? শুনছি নাকি আকাশে উড়ছে একরকম জাহাজ—

হ্যাঁ উড়ছে।

সুমুখের মাঠে বেচুর গরুর গাড়ীটা পড়ে ছিল, আঙুল বাড়িয়ে সেইটে দেখিয়ে হাজরা বললে, লাইনে ওর তখন হয়ে। জন তিরিশেক লোক চড়তে পারে। তারপর ডেগা থেকে পাঁই করে আকাশে উঠে চলে যায়। সে এক তাজ্জব ব্যাপার। ডাঙায় চলে, আকাশে ওড়ে আবার জলেও ভাসে।

কড়াইএর বেগুনীগুলো পুড়ে যাচ্ছিল। সেগুলো তাড়াতাড়ি তুলতে তুলতে বেচু বললে, বাঃ, সায়েবরা দেবতা আছে।

কাশী হাজরা বললে, আজ তোমাদের দেখাব। রোজ আকাশে ওঠে। এখান থেকেও দেখতে পাওয়া যায়।

সেদিন রাত্রে আকাশের সন্ধ্যা-তারাটিকে কেউ আর তারা বললে না।

কাশী হাজরা বুঝিয়ে দিলে, অনেক দূরে রয়েছে বলে আমরা ঠিক ঠাহর করতে পারছি না। কিন্তু ওটা চলছে। ঘণ্টায় তিন চার ক্রোশ তো নিশ্চয়ই।

বলরাম তার কপালে হাত দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে রইলো সন্ধ্যার সেই তারাটার আকাশের দিকে। তারপর বললে, হ্যাঁ, চলছে। তাখো তোমরা একটা চোখ বন্ধ করে—এইদিকে একটুখানি কাৎ হয়ে—

অনেকেই দেখলে।

বেচুর চোখ যেন খুলে গেল সেইদিন থেকে।

সন্ধ্যেবেলা প্রায়ই সে তার বৌকে টেনে আনতে লাগলো উঠোনের ওপর। আকাশের দিকে তাকিয়ে। বলতে লাগলো—ই-ই তাখো। তাখো ভাল করে তাকিয়ে।

বৌ বলে, দেখলাম।

উঁহু দেখলাম নয়। আর এইদিকে তাকাও। এই যে এই কদম গাছটার ওপরে। এই

দিকে সুধিয়া ওঠে—এই দিকটা খুব ঠিক। ও-ই যে দেখছো কতকগুলো তালের গাছ—ওর ওপারে তোমার মেয়ের শ্বশুরবাড়ী। তার ওপারে—তার ওপারে—তারও ওপারে অনেক অ—নে—ক দূরে। সেইখানে বিলেত।

আরও ভাল করে বুঝিয়ে বলবার চেষ্টা করে বেচু। বলে, আমাদের পাঁয়ে পাঁড়ে-পাড়ায় যেমন ঝগড়া মারামারি হয়, বিলেতেও তেমনি সাহেবরা ঝগড়া মারামারি করে। ওদের ঝগড়াটা বড় তো।—তাই বলে—দূর।

এখন সেখানে যুদ্ধ চলছে।

* * *

ডিমওলা সেদিন সত্যি সত্যিই গণেশ পাঁড়ের দোরে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল।

গণেশের বড় ছেলে চৈতন তখন তার মাঠ থেকে এক বোঝা আবপাতা ঘাসের গুছি কেটে এনেছিল গাইকে খাওয়াবার জন্যে।

গণেশ জিজ্ঞাসা করলে, কার মাঠে কাটলি?

চৈতন বললে, জমিদারের।

দলিলারি ব্যাটা চৈতন, ঠিক করেছিস। আগে কই কাৎলা, তারপর চুনোপুঁটি।

তারপর ডিমওয়ালাকে বাড়ীর উঠোনে ডেকে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, 'তোর কাছ থেকে কত টাকা কেড়ে নিয়েছে?'

ডিমওলা বললে, 'আট আনা।'

দূর ব্যাটা, আট আনা কি, বলবি আট টাকা। তার কমে মামলা চলে না। কই দেখি মারের দাগ।

আজ্ঞে না, মারেনি তো!

বাঁশের একটা কঞ্চি পড়েছিল হাতের কাছে। গণেশ পাঁড়ে সেই কঞ্চিটা তুলে নিয়ে সপাসপ্ বসিয়ে দিলে লোকটার পিঠের ওপর।

যন্ত্রণায় চীৎকার করে উঠলো ডিমওলা। ভাবলে বুঝি দুরন্তীর ডিম নিয়ে এই গ্রামের পথে যাবার জন্যে বুঝি ইনিও তাকে শাস্তি দিচ্ছেন।

আর আমি কখনও এ-পথ দিয়ে আসব না বাবু। আর মারবেন না। আমি বলে যাচ্ছি।

চলে যাবি কি রে ব্যাটা? তোকে মারছি তোর ভালর জন্যে। পিঠের এই দাগ দেখিয়ে বলবি—ওরা মেরেছে। মেরে আটটি টাকা কেড়ে নিয়েছে। বল্ এবারে কত খরচ করতে পারবি বল্।

লোকটি একেবারে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। বললে, গরীব মানুষ, ডিম বেচে খাই। খরচ কোত্থেকে করব বাবু?

গণেশ বললে, খরচ না করলে মামলা হয় না। আমাকে দিতে হবে দশটাকা। আর মামলার খরচ—

লোকটি বললে, আমাকে ছেড়ে দিন বাবু, আমি চলে যাই। মামলা-মোকর্দ্দমা আমি করতে পারব না।

গণেশ কি যেন ভাবলে। বললে, এসেছিস যখন, তখন এক কাজ কর্।

বলেই ডাকলে, চৈতন! চৈতন!

চৈতন বললে, কি বলছো বাবা?

একটা কাগজ আর পেন্সিল নিয়ে আয়।

কাগজ পেন্সিল এনে দিলে চৈতন।

গণেশ পাঁড়ে সেই কাগজের ওপর পেন্সিল দিয়ে লিখলে—

কেনারাম মুখার্জি

রাখহরি পাঠক

পানকিষ্ট পাল্লুলী

হরেকেষ্ট দাসাল

প্লেস অভ্ অকারেন্স—লক্ষ্মী ভস্তর দোকান।

লিখেই কাগজখানি লোকটির হাতে দিয়ে বললে, এইটি নিয়ে চলে যা থানায়। ঢুকে যে এক নম্বর ডাইরি। দারোগাবাবুকে বলবি, মায়ের হাল দেখাবি, বলবি আটটি টাকা কেড়ে নিয়েছে। সাক্ষীর কথা জিজ্ঞাসা করলে বলবি—গণেশীলাল পাণ্ডে। এই আমি লিখে দিচ্ছি আমার নাম—জি, এস, পাণ্ডে।

বলেই সে কাগজখানি আবার কেড়ে নিয়ে নিজের নামটি লিখে দিলে।

সোজা থানায় চলে যাবি। বুঝলি?

ভিমের কুড়িটি মাথায় নিয়ে লোকটি চলে গেল।

গণেশ মুখ থেকে খানিকটা থুতু ফেলে বললে, একদম বাজে। লোকটা কোনও কাজের নয়।

গণেশ পাঁড়ে বলে, বাংলাদেশে তাদের ঢোল পুরুষের বাস কিন্তু তারা শান্তিপ্রিয় নিরীহ বাঙালী নয়। কান্যকুব্জ থেকে এসেছে তারা—কনৌজ ব্রাহ্মণ। মারামারি কাটাকাটি তাদের রক্তের মধ্যে।

তাদের সে গৌরবান্বিত রক্তের পরিচয় তারা দিতে ছাড়ে না।

গণেশ পাঁড়ের বাপের আমলে তাদের খুড়োর জ্যেঠার আত্মীয় কুটুম্বে প্রায় আট দশ ঘর পাঁড়ের বাস ছিল এই গ্রামে। ঝগড়া-বিবাদের সময় লাঠিতে হাতিয়ারে প্রায় ত্রিশ-চল্লিশখানা একসঙ্গে বেরিয়ে পড়তো।

গ্রাম থেকে প্রায় মাইলখানেক দূরে সরকারি একটা রাস্তার ওপর ছোট একটি নদীর পুল আছে। আর সেই রেলিং দেওয়া পুলের এপারে ওপারে বড় বড় গাছের শ্রেণী শাখায় পাতায় পরস্পরকে জড়াজড়ি করে অনেক দূর পর্য্যন্ত রাস্তাটা এমনি ছায়াচ্ছন্ন করে রাখে যে দিনের বেলাও পথটা মনে হয় যেন অন্ধকার। একা একা সে পথ দিয়ে কেউ চলতে পারে না।

এই পুলের কাছাকাছি অংসন ষ্টেশনের রেলের একটি লাইন রাস্তার ওপর দিয়ে পার হয়ে গেছে। সেই লাইনের কটকওলা ছিল গণেশ পাঁড়ের পিতামহ। গ্রাম থেকে বুড়োকে রোজ সেখানে যাওয়া আসা করতে হতো। অন্ধকার রাত্রে পথযাত্রী অনেক পথিক নাকি সেখানে মারা পড়েছে—এই নাকি জনশ্রুতি। এই এ-সব কীর্ত্তি নাকি গণেশ পাঁড়ের পিতামহের।

গণেশের এক কাকা বাকি ছিল ছুঁড়ে পাই মারতে পারতো। সন্ধান ছিল তার অব্যর্থ।

হরলাল পাঁড়ের গায়ে বাকি ফোটে বসতো না।

এমনি সব বিশ্বাস্য অবিশ্বাস্য নানারকমের কাহিনী গ্রামের মানুষ এখনও ভোলেনি।

মারামারি খাওয়া খাওয়ি তারা চিরদিনই করে।

কিন্তু সেবছর মাত্রাটা বাকি একটু বেশি হয়ে পড়েছিল।

সেও আজ প্রায় দু' বছর আগের কথা।

পাঁড়েদের সকলের বাড়ীতেই তখন অনেকগুলো করে গায়রা থাকতো। গণেশ আর কিশোরী পাঁড়ের বাড়ীতে ধান-চালের অভাব চিরকাল। অথচ গায়রা জাতটা বাকি সুখের গায়রা। যেখানে খেতে পায় সেইখানেই চলে যায়। দেখতে দেখতে গণেশের বাড়ীর গায়রাগুলি কোথায় যেন চলে গেল। সে ভাবলে, প্রতিবেশী আত্মীয় কেউ হয়ত বা গায়রাগুলি ঘরে ঘরে খেয়েছে।

এই নিয়ে তাদের নিজের মধ্যে একটা ঝগড়া বাধে।

গণেশ আর কিশোরী পাঁড়ে একদিকে, আর বাকি পাঁচছ' ঘর আর একদিকে। প্রথমে মুখে মুখে, তারপর হাতে হাতে। মাস পাঁচ ছয় ধরে প্রায় প্রত্যহই তারা একটা না একটা ছুতো ধরে ঝগড়া-ঝাঁটি সুরু করে। দু'দলই লাঠি হাতে নিয়ে বেরিয়ে আসে, খুব খানিকটা গালাগালি চেঁচামেচি হয়, ঢিল ছোড়ে, তারপর আবার যে যার বাড়ী গিয়ে সদর দরজায় খিল এঁটে দেয়।

এমনিই চলছিল।

হঠাৎ সেবছর গ্রীষ্মকালের চরমোৎকার একটি প্রভাতবেলায় মানুষ যে তার হিংস্র প্রবৃত্তি চরিতার্থ করবার জন্য জন্তুজানোয়ারেরও অধম হয়ে যেতে পারে তার পরিচয় দিয়ে বসলো।

সূর্য্য যেমন রোজ ওঠে, সেদিন সকালেও তেমনি সূর্য্য উঠেছিল। প্রভাতের আলো ঝিকমিক করছিল পড়োবাড়ীর আগাছার জঙ্গলে আর তাল-তেঁতুলের মাথার ওপর। আকাশ ছিল তেমনি নীল, বাতাস ছিল তেমনি স্বচ্ছ। কিন্তু গ্রামের মাটি সেদিন মানুষের রক্তে রাঙা হয়ে উঠলো।

অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে উভয় পক্ষই বেরিয়ে পড়েছে।

গণেশ পাঁড়ে কোত্থেকে একটা অনেক কালের পুরনো মুঙ্গেরী গাদা বন্দুক সংগ্রহ করেছিল। না ছিল তার লাইসেন্স না ছিল কিছু। জঙ্গলের ভেতর ছুটে এসে মরি বাঁচি করে সেইটেই সে দিলে চালিয়ে।

সীসের ছররায় মানুষ মরলো না। জন পাঁচছয় মানুষ জখম হয়ে গেল শুধু। যারা হলো না তাদের ভেতর থেকে একজন ছুটে গিয়ে কিশোরী পাঁড়ের হাতে একটা টাঙির চোট বসিয়ে দিলে। কিশোরীর লাঠিতে একটা লোকের মাথা ফেটে গেল।

সেদিন আর এর মীমাংসা বাড়ীতে বসে হলো না। সরকারি আদালতে ফৌজদারী মামলা সুরু হলো। দিনের পর দিন মাসের পর মাস বিচার চলতে লাগল। আসামী সাক্ষীর এজাহার আর শেষ হয় না কিছুতেই। হাকিম ছিলেন এক ইংরেজ ভদ্রলোক। তাঁর মাথাটা গোলমাল হয়ে গেল। অবশেষে বছর খানেক ধরে এই এতগুলি লোকের হায়রাণীর পর বিচার শেষ হলো।

এক পক্ষের বৎসামান্য অর্থদণ্ড হলো। বন্দুকের লাইসেন্স ছিল না বলে মাসখানেক জেল খেটে ফিরে এলো গণেশ পাঁড়ে।

তারপর কিছুদিন চুপচাপ থাকবার পর নিজেদের ঝগড়া তারা নিজেরাই মিটিয়ে নিয়েছে। ভেজ প্রায় সকলেরই কমে গেছে।

শুধু গণেশ পাঁড়ে এখনও সতেজ।

ডিমওলা সেদিন যায়নি।

কিন্তু কথাটা কিরকম করে না জানি প্রচার হয়ে পড়েছিল সারা গ্রামে। প্রচার করেছিল বোধহয় গণেশ পাঁড়ে নিজেই। প্রচার করেছিল এই বলে যে নিরীহ একজন ডিমওলাকে মারবোর করে তার কাছ থেকে টাকা ছিনিয়ে নেওয়ার শাস্তি যে কিরকম করে পেতে হয় তা আমি দেখিয়ে দেবো। কেনারাম মুখুজ্যে, রংবেরি পাঠক, হরেকেষ্ট লালাদ—সবার বাড়েই নালিশ রুজু হয়ে যাবে হপ্তা খানেকের মধ্যেই।

হরেকেষ্ট লালাদ একটুখানি বেশবোঝা মানুষ। গাঁজা খেয়ে একদিন নেশায় বুঁদ হয়ে এক কৌচড় ঢিল নিয়ে রাত্রির অন্ধকারে গণেশ পাঁড়ের বাড়ীতে ঢিল ছুঁড়েছিল একটা ঝোপের আড়ালে বসে বসে।

কে ঢিল ছুঁড়লে? কে? কে? বলে গণেশ বেরিয়ে এসেছিল বাড়ী থেকে। কিন্তু কারও কোনও পাত্তা পায়নি।

ইয়াসিন মিঞা পার হয়ে যাচ্ছিল সেইদিক দিয়ে। দেখতে পেয়েছিল হরেকেষ্ট লালাদকে।

সেই কথাটি কানে গিয়ে উঠেছিল গণেশ পাঁড়ের।

সেদিন বেলা তখন প্রায় দুপুর গড়িয়ে গেছে

বৈশাখি ধান পাকবার সময়। গ্রামের পথের ওপর দিয়ে পাকা ধানের গাড়ীগুলো তখন হামেশাই যাওয়া আসা করছে।

গ্রামের দুপুর একরকম নিস্তব্ধই বলতে হয়। কিন্তু এই বৈশাখের দুপুর নিস্তব্ধ নয়। সারাদিন ধরে গরুর গাড়ীর চাকার আওয়াজ হয়। পথের ধুলো ওড়ে। লোকজনের কথা শোনা যায়।

—কোন্ মাঠের ধান গো?

—নয়ানজুলির।

—বেশ বড় হয়েছে তো। আমার ওখানে বিঘে দুই ছিল। বেচে দিয়েছি।

এই রকম সব কথা।

হঠাৎ সেদিন পাঁড়ে পাড়ার পথে অন্য রকমের আওয়াজ শোনা গেল। বেশ একটা গোলমাল উঠলো। গাড়ীর আওয়াজ নয়। মানুষে মানুষে গালি গালাজের বিশ্রী কোলাহল। মনে হলো শব্দটা যেন দেখতে দেখতে পাঁড়ে পাড়া থেকে ধরহতলা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়লো।

দূর থেকে ভাল বুঝাও যায় না। পাঁড়ে-পাড়ায় গোলমাল।

এগিয়ে গিয়ে কেউ যে দেখে আসবে সে সাহসও কারও নেই। যাদের আছে—কেউ-বা পড়ো বাড়ীর ভাঙা দেয়ালের ফাঁকে ফাঁকে, কেউ-বা গাছের আড়ালে, কেউ-বা পুকুরের পাড় দিয়ে খানিকটা এগিয়ে গেল, কিন্তু সঠিক কিছু ঠাহর করবার আগেই দেখা গেল গ্রামের একজন লোক হৈ হৈ করে এগিয়ে আসছে জমিদারের বাড়ীর দিকে।

জমিদার সীতাপতিবাবু তখন তাঁর ছোট্ট বাগানে বসে বসে কি একটা গাছ পুঁতছিলেন। এই সব গাছপালা আর চাষবাস নিয়েই থাকেন তিনি। বলেন, চাষ ডিমিনিশটেকে নিজে কষিস নে বাবা। চাষ আছে বলেই তোরা দুবেলা খেতে পাস্। শহরের দোকান থেকে একজোড়া কাপড় কিনে এনে পরতে পাস্।

লোকজনের গোলমাল শুনে সীতাপতিবাবু মুখ তুলে তাকালেন। তাকিয়ে যা দেখলেন তাতে তাঁর চমকে ওঠবারই কথা।

লোকগুলোর সামনে ছিল হরেকেষ্ট দালাল। তার মাথা দিয়ে কাঁচা রক্ত গড়াচ্ছে। সারা মুখখানা রক্তে রাঙা হয়ে গেছে। দুজন দুদিকে ধরে আছে তাকে। তার পেছনে রাঘবহরি পাঠক। তারও সর্ব্ব অঙ্গ ধুলি ধুসরিত। সারা গায়ে আঁচড়ের দাগ। সঙ্গে কেনারাম মুখুজ্যে। আর পেছনে যারা রয়েছে তারা মজা দেখবার জন্যে ছুটে ছুটে এসেছে এদের পিছু পিছু।

কি হয়েছে?

হরেকেষ্টর তখন ভাল করে গুছিয়ে কিছু বলবার ক্ষমতা নেই। মাথায় হাত দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে সেইখানে সে বসে পড়লো।

কেনারাম বুঝিয়ে বললে সব কথা।

বললে, গ্রামে একটি যাত্রার দল করবে বলে হরেকেষ্ট চাল আদায় করছিল বাড়ীতে বাড়ীতে। পাঁড়ে পাড়ার পাশ দিয়ে যাচ্ছিল সে ডালাটি মাথায় নিয়ে। ভেবেছিল দুতোর পাড়ায় যাবে একবার।

পথে গণেশ পাঁড়ের ছেলে চৈতনের সঙ্গে দেখা।

চৈতন তার ডালাটি কেড়ে নিয়ে ছুটে চলে গেল তাদের বাড়ীর দিকে।

হরেকেষ্ট ভেবেছিল সে রসিকতা করছে তার সঙ্গে।

তার পিছু পিছু ছুটেছিল ডালাটি ফিরিয়ে নেবার জন্যে। চৈতনদের বাড়ীর দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল গণেশ একটা লাঠি হাতে নিয়ে।

গ্যাখো পাঁড়ে গ্যাখো তোমার ছেলের কাণ্ড গ্যাখো। আমার চালের ডালাটা নিয়ে ছুটে এলো।

চৈতন তখন ডালাটা নামিয়েছে তার হাত থেকে।

গণেশ বললে, বদ্ ব্যাটাকে।

চৈতন ধরলে হরেকেষ্টকে চেপে। আর গণেশ তার হাতের লাঠি চালিয়ে দিলে হরেকেষ্টর মাথায়।

আর চাল ছুঁড়বি? আমার বাড়ীতে চাল ছুঁড়তে যাস্ কোন্ সাহসে?

আমায় মার।

আমায়।

এমনি করে মার খেয়ে হরেকেষ্ট যখন শুয়ে পড়েছে মাটিতে, তখন এলো রাঘবহরি পাঠক।

এ কী করছো পাঁড়ে? ওকে মারছো কেন?

এই যে—তোকেও খুঁজছিলাম। মার্ চৈতন, এ-ব্যাটাও ছিল সেদিন। ডিমওলার কাছ থেকে টাকা কেড়ে নিয়েছিল।

রাঘবহরির গায়ে জোর আছে। সে তার প্রতিবাদ করতে চেয়েছিল। বলেছিল, তুমিই তো সে ডিমওলাকে পাঠিয়েছ আদালতে।

. বেশ করেছি। গাঁয়ের বদনাম হলে দেখবে কে? দেখবার লোক আছে এ-গাঁয়ে? বয়স ব্যাটাছেলে তো কেউ নেই—সব তো মাগী।

রাখহরি সহ্য করতে পারলে না কথাটা। বললে, তুমিও তো সেদিন বেগুনওলার কাছে থেকে বেগুন কেড়ে নিয়ে গাঁয়ের নাটটি দিলে তুলে।

তোর বাপের হাট রে ব্যাটা! চৈতন, এখনও দাঁড়িয়ে রইলি?

হাতের লাঠিটা রাখহরির ওপর চালাতে যোষকরি ভরসা হয়নি শেষের। তাই দু'জনে বচসা হতে হতে চৈতন তাকে মারতে এসেছিল। রাখহরিও তাকে তেড়ে গিয়েছিল। তখন দু' বাপ-ব্যাটায় রাখহরিকে কাবু করতে না পেরে চেপে ধরেছিল বেয়াদবের গায়ে। এই দ্যাখো না—মাথা গায়ে আঁচড়ের দাগ।

সব কিছু শুনলেন সীতাপতিবাবু।

যারা মজা দেখবার জন্যে তখনও ভিড় করে দাঁড়িয়েছিল তাদের তাড়িয়ে দিলেন প্রথমে। তারপর বললেন, তা আমার কাছে এসে কি জন্যে? তোমরাও তো সোজা চলে যেতে পারতে থানায়।

হরেকেষ্ট কথা বললে এতক্ষণ পরে। বললে, যাব কেমন করে? থানায় যাবার রাস্তায় যদি মারধোর করে? ও-ব্যাটাকে তো বিশ্বাস নেই। ব্যাটা আইনকানুন জানে।

সীতাপতিবাবু রেগে উঠলেন।

তা আমাকে কি বলতে চাও তোমাদের সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে থানায় পৌঁছে দিয়ে আসবো?

কেনারাম বললে, না, তা বলছি না। তবে আপনি হচ্ছেন গিয়ে গাঁয়ের জমিদার। আপনি হচ্ছেন গিয়ে—

সীতাপতিবাবু বললেন, না। আমি নামে মাত্র জমিদার। আমাকে দিতে হয় বছরে বারো শ' টাকা। আমার হয় কখনও সাত শ', কখনও আট শ'। প্রতি বছর আমাকে বাড়ী থেকে টাকা জোগাতে হয়। তোমরা কেউ খাজনা দাও না। বিপদে পড়লে আমার কাছে আসো, নইলে আমার সঙ্গে কোনও সম্বন্ধ রাখো না। আমার কিছু জমিজমা আছে তাই কোনোরকমে খেতে পাই। আমি কিছু করতে পারব না। যাও। তোমরা মারামারি করে মর।

হরেকেষ্ট বললে, মারামারি তো আমরা করতে চাই না। আমরা একটা যাত্রার দল করতে চেয়েছি—

চীৎকার করে উঠলেন সীতাপতিবাবু।

না, যাত্রার দল নয়। করতে চেয়েছো গাঁজা টানবার একটা আড্ডা। কী লজ্জার কথা। আমার ছেলে নবীন ইস্কুলটিকে খাড়া করবার এত যে চেষ্টা করছে, তা সেদিক দিয়ে তোমাদের নজর আছে? ইস্কুলে তো তোমাদের ছেলে পুলেরাই পড়বে। লেখাপড়া একটু না শিখলে করবে কী? এই তো হরেকেষ্ট—তাঁতির ছেলে, তাঁতটা বিক্রি করে দিলি কেন?

হরেকেষ্ট বললে, তাঁতের কাপড় কেউ কিনতে চায় না। সবাই মিলের কাপড় পরছে। বিলেত থেকে আসছে মিলের কাপড়। আমরা তার দামের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে উঠতে পারছি না। তৈরি করছিলাম গামছা আর বিছানার চাদর। তাও তো বিছানার চাদর আসতে আরম্ভ করেছে।

কেনারাম এ-সব কথা অনেক শুনেছে। এখন কাজের কথা হোক্। বললে, আপনার দুটো চাপ্‌রাশী এদের সঙ্গে দিন। লাঠি হাতে নিয়ে এদের সঙ্গে যাক্।

সীতাপতিবাবু বললেন, ও-সব আমি জানি না। নবীনের কাছে যাও।

সীতাপতিবাবুর ছেলে নবীন।

সেদিন ছিল রবিবার। নবীন ইস্কুল বসে বসে কথা বলছিল হেড মাষ্টারের সঙ্গে। ছোট একটি মাইনর ইস্কুল। নবীন তার সেক্রেটারী।

এই ইস্কুলটি যিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তিনি ছিলেন মধ্যবিত্ত গৃহস্থ মানুষ। সামান্য কিছু লেখাপড়া শিখেছিলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল গ্রামে একটি ইস্কুল হোক্। ছেলেগুলো লেখাপড়া শিখুক্। সীতাপতিবাবু ঘিরেছিলেন ঘর। তিনি নিজে হয়েছিলেন হেড মাষ্টার। টিম্ টিম্ করে চলছিল কোনোরকমে। এমন সময় হেড মাষ্টার মারা গেলেন। স্কুল বন্ধ হয়ে যায়-যায়। নবীন প্রতিজ্ঞা করে বললো—বন্ধ হতে দেবে না। নিজের হাতে তুলে নিলে ইস্কুলের সব দায়িত্ব। হেডমাষ্টারের ছেলে বি-এ পাশ করে চাকরি করছিল কলিয়ারীতে। নবীন তাকে নিয়ে এসে অনেক করে বুঝিয়ে হেড মাষ্টার করে দিলে। কিন্তু সব চেয়ে মুস্কিল হলো স্কুলের গ্র্যাণ্ট্ নিয়ে। গ্র্যাণ্ট্ ছিল কুড়িটি টাকা মাসে। সে টাকাটিও বন্ধ হয়ে গেছে। তাইই পরামর্শ করছিল সে বর্তমান হেড-মাষ্টারের সঙ্গে।

এত বড় একটা গ্রাম—প্রতিটি ছেলে যদি মাসে মাসে নিয়মিত মাইনে দেয় তাহ'লেই স্কুলটি চলে যায়। কিন্তু অর্ধেক ছেলে মাইনে দেয় না।

হেড মাষ্টার বলছিলেন, মাইনে যারা দেবে না আমি তাদের কিছুতেই রাখবো না ইস্কুলে।

নবীন বলছিল, না। রাখতে হবে।

হেড মাষ্টার বললেন, তাহ'লে মাষ্টারদের মাইনে—যেটা কম পড়ছে সেইটে তুমি দাও।

দিচ্ছিই তো।

এমন করে কতদিন দেবে? মাসে মাসে টাকা দিচ্ছ, নিজে পড়াচ্ছ—এটা কি চিরকাল সম্ভব?

নবীন তখন ঠিক করেছিল—গ্রামের লোকের কাছ থেকে চাঁদা আদায় করবে প্রতি মাসে।

কিন্তু চাঁদা আদায়ের সব চেয়ে বড় প্রতিবন্ধক হয়েছিল বেনোয়ারী ওস্তাদ, রাঘবহরি পাঠক আর হরেকেষ্ট দালাল। তারা বলেছিল—তোমার ইস্কুল না ঘোড়ার ডিম। আমাদের যাত্রার দল আগে। তারপর তোমার স্কুল।

সেই রাঘবহরি আর হরেকেষ্টকে এইরকম অবস্থায় তারই কাছে আসতে দেখে নবীন জিজ্ঞাসা করলে, এ কী হয়েছে তোমাদের?

কেনারাম বললে, ভাখো, গণেশ পাড়ের কীর্তি ভাখো। তোমাকে একটু সাহায্য করতে হবে। তোমার বাবা আমাদের পাঠিয়ে দিলে তোমার কাছে।

আমি কি করব?

কেনারাম বললে, তোমার মহতাপ্ চাপ্‌রাশীকে দাও এঁদের সঙ্গে। এরা গণেশের ভয়ে যেতে পারছে না থানায়।

নবীন বললে, দিতে পারি যদি আমার কথা শোনো।

কি কথা বল।

নবীন বললে, যাত্রার দলের জন্যে কত টাকা আদায় করেছ ?

রাঘবহরি তাকালে হরেকেষ্টর দিকে, হরেকেষ্ট তাকালে রাঘবহরির দিকে।

শেষে হরেকেষ্ট বললে, তা চার খান আর নগদ পয়সা—সবসুদ্ধ ধরে টাকা চল্লিশেক্।

নবীন বললে, দিয়ে দাও ইস্কুলের জন্যে। আমি দিচ্ছি-মহাতাপকে।

ইতস্তঃ করছিল হরেকেষ্ট।—আমি তো একা ছেলের মালিক নই। বেনোয়ারী ওস্তাদ আছে, পটু গাঙ্গুলী আছে—

নবীনের সে এক কথা।—যে থাকে থাক্। ইস্কুল আগে। তারপর তোমাদের যাত্রার দল।

কেনারাম বললে, চল্লিশটি টাকায় তোমার ইস্কুল চলবে ?

নবীন বললে, যতটুকু চলে। একমাস চলবে। তারপর আবার তোমরা ইস্কুলের জন্যে চাঁদা আদায় করবে।

ইস্কুলের জন্যে চাঁদা কেউ দেবে না।

আলবাৎ দেবে। না দেয়, আমি সমস্ত গ্রামে আগুন ধরিয়ে দিয়ে পুড়িয়ে সব শেষ করে দেবো।

নবীনের এটা রাগের কথা। কিন্তু একরোখা এই ছেলেটিকে বিশ্বাস নেই। হয়ত-বা আগুন ধরিয়ে দিতেও পারে। এই আগুনকে কেনারামের খুব ভয়। তার গোয়ালের খড়ের চালে আগুন একবার ধরেছিল। সেদিনের কথা এখনও তার মনে আছে।

কেনারাম রাজী করে ফেললে হরেকেষ্টকে।

নবীন তার ঘরোয়ান মহাতাপকে ডেকে বলে দিলে, লাঠি হাতে নিয়ে চলে যাও এদের সঙ্গে।

যদি কেউ আটকায় ?

নবীন বললে, চালাবে লাঠি। এ অবিচার আমি চলতে দেবো না আমাদের গ্রামে।

তারা চলে যেতেই হেড মাষ্টার বললে, কাজটা কি ভাল হলো ?

কেন বল দেখি ?

মাষ্টার বললে, তুমিই তো বল—দুর্জনকে দূর থেকে পরিহার করাই ভাল। গণেশ পাড়ের সঙ্গে ঝগড়া করে কোনও লাভ নেই।

নবীন বললে, জানি। গণেশকে আমি ভাল কাজে লাগাতে চেয়েছিলাম একসময়।

লাগালে না কেন ?

লাগিয়েছিলাম। বলেছিলাম, ইচ্ছে করলে তুমি অনেক কিছু করতে পারো। কেন যে ওর মন বুঝতে পারি না।

গণেশ তখন বলেছিল, তোমরা আমাকে যে একঘরে করে রেখেছ।

মাষ্টার বলেছিল, কথাটা সত্যি। ওরা কলৌজ ব্রাহ্মণ বলে ওদের বাড়ীতে তোমরা খাও না।

নবীন বললে, ঠিক তার উল্টো। ওরাই আমাদের বাড়ীতে খায় না।

মাষ্টার বললে, এই জিনিসটাই আমাদের সর্বনাশ করেছে। আমরা এক জায়গায় এক গ্রামে এক সমাজে বাস করেও পৃথক পৃথক হয়ে গেছি। ওরা বারেন্দ্র, আমরা রাঢ়ী। আমরা হিন্দু, ওরা মুসলমান। আমরা ব্রাহ্মণ, ওরা শূদ্র।—আমরা যদি বলতে পারতাম আমরা মানুষ, তা'হলে অনেক দুর্ভোগ থেকে আমরা বেঁচে যেতাম।

নবীন বললে, তা আর হবার নয়। আমাদের এখন হিংসেটাই সব চেয়ে প্রবল হয়ে উঠেছে। গণেশ ভাবে সে শক্তিমান আর সকলেই দুর্বল। তাই দুর্বলের ওপর তার শক্তি পরীক্ষা করে সে আনন্দ পায়।

নবীন যা বলেছিল, শেষ পর্যন্ত তাই হলো।

রাত্রে নবীনই এসে খবর দিলে হেডমাষ্টারকে। বললে, শুনেছ মাষ্টার কি হয়েছে?

কি হয়েছে?

হয়েছেই আর রাখহরি ভয়ে খানায় যেতে পারছিল না, আমার কাছে এসে বললে—একটা লোক সঙ্গে দাও। দিলাম আমার মহতাপ্ দরোয়ানকে। ওদিকে গণেশ আর তার ছেলে চৈতন দু'জনে দুটো লাঠি নিয়ে বড় বাগানের ঘাটি আগলে বসে ছিল। যা ভেবেছিলাম ঠিক তাই। ওদের দেখেই হরেকেষ্টও ছুটেছে, রাখহরিও ছুটেছে। ছোটেনি শুধু মহতাপ্। মহতাপ্ মার খেয়েছে কিন্তু মারতেও ছাড়েনি। বলছে—গণেশ পাড়েকে মারতে পারেনি, কিন্তু চৈতনের একটা হাত সে ভেঙে দিয়েছে।—ভাখো কিরকম চরিত্র।

মাষ্টার বললে, থানায় তাহ'লে ওরা যেতে পারেনি?

নবীন বললে, না। পালিয়ে এসেছে দু'জনেই।

মাষ্টার জিজ্ঞাসা করলে, তুমি এখন কি করবে?

আমি কি করবো ভেবে কিছু ঠিক করতে পারছি না।

নবীনকে দেখে অত্যন্ত চিন্তান্বিত বলে মনে হলো। বললে, এত বড় একটা গ্রাম—গ্রামের এতগুলি লোক ধীরে-ধীরে কত নীচে নেমে যাচ্ছে ভাখো। এদের আমি ভাল করবো কেমন করে? যাদের হয়ে লড়াই করবো তারাও যে কাপুরুষ। একটা মানুষের মত মানুষ নেই। সব মিথ্যাবাদী, জোচ্চোর, বেশাখোর—কী নয়?

মাষ্টার বললে, এ হচ্ছে গিয়ে আমাদের পরাধীনতার অভিশাপ। দেশ স্বাধীন হয়ে গেলে সব ঠিক হয়ে যাবে দেখো।

নবীন বললে, না হবে না। আমার বিশ্বাস হয় না।

মাষ্টার একটু বিস্মিত হলো তার কথা শুনে।

তুমি কি চাও না—দেশ স্বাধীন হোক্।

নবীন বললে, চাই। খুব চাই। কিন্তু কাদের নিয়ে স্বাধীন হবে? এই সব মানুষগুলিকে নিয়ে তো? গাছের বীজ যদি খারাপ হয়ে যায়—মাটিতে সারও দাও, গাছ কখনই ভাল হবে না। মানুষের চরিত্র সেকেণ্ড নষ্ট হয়ে। ইংরেজ এইটিই চেয়েছিল।

নবীন তার পরের দিন একবার শেষ চেষ্টা করবার জন্যে একাই চলে গেল গণেশ পাড়ের কাছে। বললে, 'শোনো গণেশ, যে গ্রামে তুমি বাস করছো সে গ্রামের মঙ্গল হোক্ এটা কি তুমি চাও না?'

কেন চাইবো না?

তা যদি চাও তো কেন এরকম করছো ?

গণেশ পাঁড়ে বললে, আমি করছি না তুমি করছো ?

আমি আবার কি করলাম ?

তুমি তোমার লোক লস্কর দিয়ে ওদের শাসিশ করতে পাঠিয়েছিলে আমার বাড়ি।

তুমি হরেকেষ্টকে মেরেছ, রাধারমিকে মেরেছ— ওরা নালিশ করবে না ?

গণেশ বললে, কেন মেরেছি তা তো জানো না ?

জানি। ওরা আমাকে বলেছে।

ওরা মিছে কথা বলে।

নবীন বললে, তুমি মিথ্যা কথা বল না ?

গণেশ জোর গলায় বললে, না। আমি কাউকে মারলে বুক ফুলিয়ে বলি—হ্যাঁ মেরেছি। ওদের মত কোণের আড়াল থেকে ঢিল ছুঁড়ি না।

নবীন বললে, যা হবার হয়ে গেছে, এখন সবাই মিলে সুখে সচ্ছন্দে যাতে থাকতে পারি তার ব্যবস্থা কর।

গণেশ বললে, তুমি কর গিয়ে। আমার যা করবার আমি করেছি।

কী করেছ ?

গণেশ বললে, তুমি জানো না ?

না জানি না।

নিশ্চয়ই জানো। আর সব কিছু জেনেশুনেই তুমি এসেছ আমার কাছে।

নবীন অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকালে।

সত্যি বলছি—আমি কিছু জানি না।

গণেশ বললে, তোমার চাপরাশী মহতাপ, মেরেছে আমার ছেলেকে—সেকথা বোধহয় জানো।

নবীন বললে, শুনেছি। শুনেছি—তুমি আর তোমার ছেলে মহতাপকে মারতে গিয়েছিলে।

বেশ করেছিলাম। এখন তুমি যা করতে পার—কর।

নবীন চুপ করে বসে রইলো।

গণেশ বললে, চুপ করে কি ভাবছো ? আমি তাহরী করে এসেছি থানায়। ওরা যেতে পারেনি কিন্তু আমরা গিয়েছিলাম। আমার ছেলের হাতে চুন হলুদ লাগাতে হয়েছে। দেখবে ?

নবীন জিজ্ঞাসা করলে, নিজে করলে অপরাধ, তারপর সেই অপরাধ তুমি অন্যের ঘাড়ে চাপাচ্ছো ? কার নামে নালিশ করেছ ?

গণেশ বললে, তোমার নামে।

আমার নামে ?

হ্যাঁ, তোমার নামে। তোমাকে আমি আগে শেষ করতে চাই। তারপর ওদের শেষ করতে আমার বেশি লাগবে না।

নবীন বললে, এর ওপর আর আমার কিছু বলবার নেই। আমি চললাম।

গণেশ বললে, হ্যাঁ যাও। বেরোও তুমি আমার বাড়ী থেকে। দূর হয়ে যাও।

নবীন সত্যিই চলে আসছিল। চলে আসছিল অপমানিত হয়ে। মুখ দিয়ে কথা বেরুচ্ছিল না তার। কিন্তু বিনা কারণেই গণেশ এমন হৈ হৈ চেঁচামেচি আরম্ভ করলে যে চারিদিক থেকে লোক জড়ো হয়ে গেল।

কী হয়েছে পাঁড়ে? চীৎকার করছো কেন?

গণেশ বললে, চীৎকার করবো না? ভাখো তোমরা সবাই ভাখো—নবীন কাল আমার ছেলেকে মেরেছে, আজ এসেছে আমাকে মারতে। তোমাদের সাক্ষী রেখে আমি আবার নালিশ করবো।

কথাটা হয়ত মিথ্যা বলেনি গণেশ পাঁড়ে। নবীনকে কেউ কোনোদিন গণেশ পাঁড়ের বাড়ীতে আসতে দেখেনি। আজ তারা নবীনকে দেখে একটু অবাক হয়ে গেল বই-কি!

নবীনও কম অবাক হলো না।

চৈতন এতক্ষণ বাড়ীতে ছিল না। কোথায় যেন গিয়েছিল। সত্যি সত্যিই বাঁহাতে তার চুনহলুদ মাখানো। নবীনকে দেখেই সে চীৎকার করে উঠলো—মারো শালাকে। বাবা, তুমি এখনও চুপ করে দাঁড়িয়ে আছো? কাল ও বহুতাশকে পাঠিয়েছিল আমাকে মারতে। আজ নিজে এসেছে।

নবীন একরকম ছুটেই প্রাণে বাঁচালে।

গ্রামে একটা বিশ্রী ব্যাপার আরম্ভ হয়ে গেল।

'এনকোয়েরী' করবার জন্যে থানা থেকে দারোগাবাবু এলেন। কনেষ্টবল এলো।

সবাই শুনলে আমার পকেটে রিভলবার নিয়ে নবীন গিয়েছিল গণেশ পাঁড়েকে খুন করতে। গণেশ পাঁড়ের চীৎকারে লোক জড়ো হয়ে গিয়েছিল, তাই আর শেষ পর্যন্ত খুন করতে পারেনি। নবীন পালিয়ে এসেছে।

নবীনকে ডেকে তার বাবা সীতাপতিবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, কথাটা সত্যি?

নবীন বললে, সত্যি নয়। কিন্তু সত্যি হলেই খুশী হতাম আমি।

সীতাপতিবাবু বললেন, তুমি গণেশ পাঁড়েকে খুন করবে?

যা করলে এ গ্রামে আর বাস করা চলবে না।

মানুষ খুন করলে ফাঁসি হয়, তা জানো?

জানি। এরকম ভাবে বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়া অনেক ভাল। গণেশ পাঁড়ের অপমান আর সহ্য হয় না।

সীতাপতিবাবু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। বললেন, ভাল কাজ করছো না নবীন। গণেশকে তার যা খুশী তাই করতে দাও।

এ কী বলছো তুমি বাবা? গণেশ যা খুশী তাই করবে আর আমি চুপ করে থাকবো?

সীতাপতিবাবু বললেন, তুমি একা তো লড়তে পারবে না গণেশের সঙ্গে। যাদের তুমি সঙ্গে নেবে তারাও যে ভাল নয়। সমস্ত গ্রামটাই যে নষ্ট হয়ে গেছে। আমাদের আমলে কিন্তু এরকম ছিল না।

নবীন জিজ্ঞাসা করলে, কিরকম ছিল?

মানুষের অবস্থা এত খারাপ ছিল না। সবার বাড়ীতেই যথেষ্ট খাবার ছিল।

নবীন বললে, বাবার এখনও ঠিক তেমনিই আছে। শুধু লোক বেড়েছে। বসে বসে বংশবৃদ্ধি করেছে, কিন্তু এক বিঘে জমিও কেউ বাড়ায়নি, চাষও করেনি, রোজগারও করেনি।

সীতাপতিবাবু বললেন, রোজগার করবার ক্ষমতা আছে? নেশা করবে না রোজগার করবে?

অবস্থা যত খারাপ হয়েছে, দুঃখ কষ্ট ভুলে থাকবার জন্যে নেশার আশ্রয় নিয়েছে।

সীতাপতিবাবু বললেন, নেশার আড্ডাগুলো ভেঙে দিতে পারিস না?

চেষ্টা করব। নবীন বললে, বাজার বন্ধ করবার চেষ্টা করছিলুম। বাজার বন্ধ তো নয়, সন্ধ্যাবেলা নেশা করবার একটা জায়গা। সেইটে দিয়েছি ভেঙে। চাঁদা যা তুলেছিল—কেড়ে নিয়ে ইস্কুলের খাতে জমা করে দিয়েছি।

বাজার বন্ধ করতে দিলে না, এইবার মামলার খরচ তুমি দাও।

হরেকেষ্ট আর রাধহরি আদালতে গিয়ে মামলা করে এসেছে গণেশ পাঁড়ের নামে।

হরেকেষ্ট বললে, শালিশ-মোকর্দ্দমা যা কিছু করা—সবই তোমার ভরসায়। ঘরে বেঁধে সেদিন তুমিই আমাদের আদালতে পাঠালে। উকিলের কাছে চিঠি লিখে দিলে। নইলে ও-ব্যাটার নামে মামলা করা কি আমাদের সাধ্যে কুলোয়? এইবার সাক্ষী চাই চারজন।

নবীন বললে, সাক্ষীর ভাবনা কি?

ভাবনা কিছু নেই কিন্তু যাওয়া আসা খরচ খরচা বাদে প্রত্যেককে একটি করে টাকা দিতে হবে নেশা করবার জন্যে।

নবীন বললে, বেশ। গণেশকে জব্দ করতেই হবে।

নবীনের জেদ চড়ে গেল।

জমির চাষ-আবাদের জন্য মুনিষ-কৃষাণ গণেশ পাঁড়েকে প্রতি বছর নতুন করে রাখতে হয়। পুরনো লোক কেউ থাকে না।

বর্ষায় জমি 'নিড়ান্' থেকে আরম্ভ করে ধানের শুছিতে যতদিন পর্য্যন্ত না পাকের রঙ ধরে, ততদিন ক্ষেতের যাবতীয় কাজ যাকে দিয়ে সে করায়, ফসলের ভাগ দেবার আগে বৎসান্তে একটা ছল খুঁজে মারধোর করে তাকে তাড়িয়ে দেয়। তারপর পাকা ধান নিজেরাই কেটে নিজের খামারে তোলে।

পাঁচ বছর কাজ করবার পর গরীব মানুষ কাঁদতে কাঁদতে বাড়ী চলে যায়।

সে বছর নেপাল মুচির কপালে এই দুর্ভোগের যন্ত্রণাটি লেখা ছিল। বেচারা অত্যন্ত দুর্ব্বল। নিতান্ত ভাল মানুষ। ধান কাটবার সময় গণেশ পাঁড়ে তাকে তাড়িয়ে দিলে।

খবর পেয়ে নবীন তাকে ডেকে পাঠালে।

মার খেয়ে বাড়ীতে বসে বসে কাঁদছিস কেন? খাবা নেই? আদালত নেই?

কাঁকর-মাটির দেয়ালের ওপর নেপাল মুচির পিঠটা ঘষে দিয়ে পিঠের খানিকটা চামড়া তুলে দিয়েছে গণেশ পাঁড়ে। তাইই যন্ত্রণায় তখনও সে সোজা হয়ে বসতে পর্য্যন্ত পারছিল না। কোনো রকমে মেরুদণ্ডটা সোজা করে উঠে বললে। নেপাল। বললে, গরীব মানুষ হুজুর। মামলা-মোকর্দ্দমা করবার পয়সা কোথায় পাব? চাষের সময় খাটলায় চারটি খেতে পাবো—' বলতে বলতে সে ঝর ঝর করে কেঁদে ফেললে।

নবীন বললে, গণেশকে তো চিনিস্ তবু সেই ওরই বাড়ীতে চাষ করতে গেলি কেন ?'

নেপাল চুপ করে রইলো। নেপালের বৌ তার এই রুগ্ন স্বামীটিকে পরের মাঠে একা ছেড়ে দিতে পারেনি। বাচ্চা ছেলেটাকে কোলে নিয়ে সে তার সঙ্গে এসেছে। কোবরেজ মশাইএর ভাঙা ভিটের পাশে দাঁড়া খেজুর গাছটার তলায় সেও চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। সবকিছু জেনেও কেন যে সে গণেশ পাড়ের জমি চাষ করতে গিয়েছিল সেই কথাটার জবাব দিতে গিয়ে একবার মুখ তুলে তাকালে কিন্তু নেপালের দিকে তার নজর পড়তেই মুখের কথা মুখেই আটকে রইলো। ঠোঁট দুটো কান্নায় থর্‌থর্ করে কেঁপে উঠলো শুধু। কথা আর তার বলা হলো না।

নবীন জিজ্ঞাসা করলে, সাক্ষী প্রমাণ আছে ?

মুচি-বৌ এতক্ষণ পরে কথা বললে।

'খামারের ভেতর ঢুকিয়ে মেরেছেন বাবু। ও মরি কি কম মজাত—'

বলেই সে একটু থামলো। এদিক ওদিক তাকালো একবার। তারপর আবার বললে, বললাম হতভাগা দিনরেতে—ওই শরীর নিয়ে চাষ করতে যাস্‌নে এ বছর। তা সে মরতে মরতেও গেল। বললে, খাবি কি ?

নবীন শুনতে লাগলো চুপ করে।

বললাম, আমার এখনও সম্বল রয়েছে, যেমন করে হোক্ খেটে খুটে দুটো খাওয়াব তোকে। তা ও শুনলে না। মার খেয়ে বাড়ী এলো। তা যদি শুধু মার খেতো তা'হলেও বা হতো, কিন্তু বাবা গণেশের যে মাদুলিটি ওকে এনে দিয়েছিলাম সেটিও দিয়েছে টান মেরে ছিঁড়ে কোথায় ফেলে।

বাবা গণেশের মাদুলি কি জন্যে দিয়েছিলে ?

মুচি-বৌ বললে, ডাক্তারবাবু বললে ওর যে ব্যারাম—সে ব্যারামের নাকি চিকিচ্ছে নাই।

নবীন জিজ্ঞাসা করলে, কি ব্যারাম ?

নেপাল নিজেই বললে, বড় ব্যারাম গো। ধক্ ধক্ করে কাশির সঙ্গে মাঝে মাঝে রক্ত ওঠে।

লোহার একটি বড় মাদুলি ঝুলতো নেপালের গলায়। এখন বোঝা গেল—সে অক্ষর কয়টি তার স্ত্রীর লেখা।

হাবু রায় এসে দাঁড়িয়েছিল নবীনের কাছে। এই হাবু রায়কে আজ তার একান্ত প্রয়োজন। কারণ মিথ্যা সাক্ষী দিতে হাবু রায়ের জুড়ি আর কেউ নেই এ-গ্রামে।

নবীন বললে, 'গণেশ কি রকম মেরেছে নেপালকে দেখছো ?'

তাই তো দেখছি তারা।

নবীন বললে, সাক্ষীসাবুদ কিছু নেই।

হাবু জিজ্ঞাসা করলে, ক'জন চাই ?

তুমি একজন। আরও জন-তিনেক।

হাবু বললে, ঠিক আছে। আজ কিছু খাওনা দেবে নাকি ?

নবীন বললে, না।

তুমি যাবে নাকি ওদের সঙ্গে ?

যাব।

কোথায় ?

প্রথমে ডাক্তারখানায়, তারপর থানায়।

হাবু বললে, মামলাটা তার আগে সাজিয়ে নিলে হতো না ?

হাঁ ঘোস।

দু'জনে বসে বসে মামলাটা প্রথমে সাজিয়ে নিলে। গণেশ যে নেপাল বুচিকে মেরেছে সেটা মিথ্যা নয়। কিন্তু সত্য ঘটনাকেও মিথ্যা সাক্ষী দিয়ে প্রমাণ করতে হবে—এইটিই মামলার বিড়ম্বনা।

নবীন মহাজনকে সঙ্গে নিলে। তারপর নেপালকে বললে, আয় আমার সঙ্গে।

ছেলেটাকে কোলে নিয়ে নেপালের বৌ তাদের পিছু পিছু যাচ্ছিল। নবীন বললে, তুই কি জন্যে আসছিস ? তুই বাড়ী যা।

অশথতলা পার হয়ে গিয়ে নবীন একবার পিছন ফিরে তাকালে। দেখলে, নেপালের বৌ তখনও তাদের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে পথের ধারে চুপটি করে দাঁড়িয়ে আছে।

ছোট বড় পাঁচটা মামলা আদালতে দায়ের করে দেওয়া হয়েছে গণেশ পাঁড়ের নামে। পুলিশ-চালানী কেস্ দুটো, আর থানা থেকে আদালতে যাবার জন্যে তৈরি হয়ে আছে আরও একটা।

নিছক্ মিথ্যে কোনোটাই নয়। তবে সাক্ষীসাবুদ সাজাতে হয়েছে প্রত্যেকটাতেই।

টাকা চাই। নবীন টাকার জন্যে ছটফট করে বেড়াচ্ছে। সীতাপতিবাবু টাকা দেবেন না। সেদিন তিনি স্পষ্ট পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন নবীনকে—গণেশ পাঁড়েকে জব্দ তুমি করতে চাও জানি। কিন্তু মিথ্যে মামলা তৈরি করে তার খরচ চালাবার টাকা আমি দেবো না।

নবীন বলেছিল, আমার মায়ের তো গণেশ দুটো মিথ্যে মামলা করেছিল।

সীতাপতিবাবু বলেছিলেন, তার ফল কি হলো দেখলে তো ! মিথ্যে কখনও জয়ী হয় না।

তুমি কি তাহ'লে বলতে চাও আমিও হেরে যাব ?

সীতাপতিবাবু বলেছেন, সত্য যদি সেখানে না থাকে তো নিশ্চয় হারবে।

কিন্তু নবীন সেকথা শোনেনি।

গণেশ পাঁড়ের মত দুর্জনকে সায়েস্তা করবার আর কোনও পথ সে খুঁজে পায়নি। সে বলে কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে হবে।

সারা গ্রাম মেতে উঠেছে এই এক বিচিত্র আনন্দে। হিংসার একটা বিষ বাষ্প যেন সারা গ্রামের বাতাসকে কলুষিত করে তুলেছে। কিন্তু সেদিকে কারও ভ্রূক্ষেপ নেই। যেন আনন্দেই আছে সকলে।

মামলার দিন পড়ছে। সাক্ষীরা যাচ্ছে শহরের আদালতে। ফেরার পথে কেউ একটা কড়ি কিনে আনছে। কেউ আনছে ছেলের খেলনা। কেউ আনছে একটা নতুন গামছা। তার বেশি কিছু কেনবার পয়সাও নেই কারও।

চুপচাপ বসে-থাকা মানুষ যেন একটা করবার মত কাজ পেয়েছে।

নবীন সেদিন হাবুকে জিজ্ঞাসা করলে, কিছু টাকা কোত্থেকে পাওয়া যায় বলতে পারো ?

হাবু অনেক ভেবেচিন্তে বললে, বঙ্কিমানন্দকে যদি একটু নাড়া দিতে পারো তো কিছু পাওয়া যেতে পারে।

কিন্তু বঙ্কিমানন্দ তো চোরাই গাঁজার কারবার করে।

সেই জন্যেই তো বলছি।

নবীনের ইচ্ছে ছিল—গ্রামে এই সব চোরাই কারবার বন্ধ করে দেবার। পুলিশকে তাদের ঘাঁটির সন্ধান দিয়েছে। কেমন করে তাদের ধরতে হবে সে পরামর্শও দিয়ে গেছে। এই অবস্থায় বঙ্কিমানন্দের কাছে হাত পেতে টাকা নেওয়া মানে ঘুষ নেওয়া।

সেটা কি উচিত হবে?

হাবু বললে, তোমার টাকার দরকার তাই বলছি। আজ তুমি পুলিশের ভয় দেখিয়ে বের করে নাও তো কিছু টাকা! তারপর পুলিশ যদি এসে তাকে ধরে কোনোদিন, তুমি বলবে—আমি কিছু জানি না।

নবীন রাজী হয়ে গেল।

বঙ্কিম রায়।

নিজের তাপড় জামা সব গেরুয়ায় ছুপিয়ে নিয়েছে। আর কেউ বলুক আর নাই বলুক নিজেই নিজেকে প্রচার করেছে—স্বামী বঙ্কিমানন্দ বলে'।

স্ত্রী পুত্র কেউ নেই। নিজের সহোদর ভাইদের সঙ্গে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নিজে পৃথক হয়ে গেছে। জমি জায়গা বিষয় সম্পত্তি তার অংশে যা পড়েছে তাও খুব কম নয়। একটা মানুষের পক্ষে যথেষ্ট।

গ্রামের লোকে অনেকে অনেক কথাই বলে। বলে—বঙ্কিমের হাতে মেলা টাকা।

তবু লোকটা যে কেন টাকা টাকা করে কে জানে।

গ্রামের পূব-পাড়ায় বৈষ্ণবচরণের গোয়ালের পাশে ছোট একটি ঘর তৈরি করে নিয়েছে সে। পাশেই তার নিজেরই প্রকাণ্ড খামার বাড়ী। ধানের মরাই আছে তিনটে। সে সব আগ্‌লাবার লোকও আছে।

নিজে সেই ছোট ঘরটিতে বাস করে। নিজেই চারটি রাঁধে বাড়ে খায় আর গাঁজা টানে। বলে, সংসারের মায়া ত্যাগ না করলে কিছু হবার নয়। তোরা সব সংসারের কীট। আমার মত নিরাসক্ত হতে যদি পারিস তো বেঁচে থাকার মজাটি বুঝতে পারবি।

নিজের সেই ছোট ঘরটিকে বলে, এটি আমার আশ্রম।

সেই আশ্রমে বসে বঙ্কিমানন্দ গাঁজা বিক্রি করে আর গান গায়—

'জপ মন ভোলা।
ভোলার দয়া চাস্ যদি কেউ
সার কর যে গাঁজের জলা।'

কখনও-বা মনের আবেগে গেয়ে ওঠে—

'গাঁজা তোর মহিমা এ কি
আমি দিন-দুপুরে স্বপন দেখি।'

বঙ্কিমানন্দ তার গেরুয়া রঙের কাপড় জামার ওপর রুদ্রাক্ষের একটি মালা পরেছে। অপরিচিত কেউ তার নাম জিজ্ঞাসা করলে বলে—শ্রীবঙ্কিমানন্দ স্বামী। এই আনন্দটুকুই তো সব বাবা। দুনিয়ায় আনন্দ ছাড়া আর আছে কি?

তারপর তার একটি মুখর বুলি আছে। সেইটি সে যখন-তখন আওড়ায়।

চুরি করলেই চোর, ডাকাতি করলেই ডাকাত, হাওয়াগাড়ী চড়লেই বড়লোক, আর খেতে না পেলেই গরীব।

নবীন সেদিন হাবুকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল বঙ্কিমানন্দের কাছে। সন্ধ্যে হয়েছে সবে। লণ্ঠনটি জেলে বঙ্কিমানন্দ তখন তার মৃগচর্মের আসনটি বিছিয়ে তার ওপর বসে বসে গাঁজা তৈরি করছে।

নবীনকে আর হাবুকে দেখে বঙ্কিমানন্দ বললে, এসো বাবা এসো।

চটের আসনটি দেখিয়ে দিয়ে বললে, বোসো।

তাদের বসিয়ে গাঁজার কল্‌কেটি সেজে উনোন থেকে আগুন আনবার জন্যে উঠে গেল। কাছে একটি উনোনে তার খিচুড়ি রান্না হচ্ছে। কল্‌কের আগুন ফুলতে ফুলতে বললে, খপাক খাই বাবা। এর যে কি আনন্দ তা তোমরা সংসারী মানুষ, তোমরা বুঝবে না।

এই বলে কল্‌কেটি হাতে নিয়ে বঙ্কিমানন্দ ফিরে এসে বসলো তার নিজের জায়গায়। বললে, ব্যোম ভোলানাথ! আগে আনন্দ করে নিই বাবা, তারপর কথা বলবো তোমাদের সঙ্গে।

বঙ্কিমানন্দ তার দুটি হাত দিয়ে কল্‌কেটি ধরে চৌ চৌ করে টানতে টানতে আনন্দ করতে লাগলো।

তারপর বললে, বল বাবা এবার তোমার কথা বল।

বলেই সে একটু থেমে হাসতে হাসতে আবার বললে, তুমিও বাবা, এও বাবা, সেও বাবা, আর সব-চাইতে বড় বাবা হলো গিয়ে সেই পাগলা-বাবা ভোলা মহেশ্বর। দুর্জয় ব্যাটার সাহস কিন্তু। ঘর-দোর ছেড়েছুড়ে ছাইভস্ম মেখে সন্ন্যাসী হলো—ঠিক আমার মতন। বুঝলে নবীন, ওই ব্যাটাই খাঁটি, আর সব দেবতা-টেবতা সব ঝুটা। শুনলাম তুমি নাকি বাবা গাঁয়ে খুব তুলকাম্ তুলে দিয়েছ? গণেশ পাড়েকে জব্দ করবার মতলব করেছ?

নবীন বললে, আমি আর তাকে কি জব্দ করবো বঙ্কিমানন্দ, সেই আমাকে জব্দ করবার চেষ্টা করছে।

বঙ্কিমানন্দ বললে, পারবে না। পারবে না। শয়তান কখনও কাউকে জব্দ করতে পারে না। সে নিজেই জব্দ হয়ে যায়।

নবীন বললে, আমি বেশিক্ষণ বসব না বঙ্কিমানন্দ, আমার কাজের কথাটা শোনো।

হাবু বললে, আমি বলছি।

বলেই সে এগিয়ে এসে বসলো বঙ্কিমানন্দের কাছে। বললে, তুমি লুকিয়ে লুকিয়ে গাঁজা বিক্রি কর—এ কথাটা পুলিশে জানলে কেমন করে বলতে পার?

কথাটা শুনেই বঙ্কিমানন্দ যেন চম্‌কে উঠলো! চেঁচিয়ে বলে উঠলো, কে বললে আমি গাঁজা বিক্রি করি? গাঁজা আমি কিনি, আমি গাঁজা খাই। তাই বলে গাঁজা আমি বেচতে যাব কেন?

হাবু বললে, তা আমি জানি না বাবা, এই নবীনের কাছে এনকোয়েরী এসেছে, তাই ছুটে এলাম তোমার কাছে।

বঙ্কিমানন্দ বললে, ভাখো হাবু, ভাখো নবীন, পৃথিবীতে যত জানোয়ার আছে তার ভেতর মানুষই হচ্ছে সব চেয়ে খারাপ জানোয়ার। মানুষের বুদ্ধি আছে, সেই বুদ্ধি দিয়ে সে খারাপ কাজ করে। গাঁজা বিক্রি করি বলে আমাকে যদি কেউ ধরিয়ে দিতে চায় তো আমার সাধ্যি আছে আটকাবার? আমার বাবার বাবাও পারবে না। পারে যদি কেউ তো সে ওই—

বলেই মাথার ওপরটা দেখিয়ে দিয়ে বললে, বাবার বাবা ভক্ত বাবা সেই ভোলা মহেশ্বর। আর সেই জন্যেই বাবার শরণ নিয়ে বসে আছি।

হাবু বললে, ও-সব বুজরুকি ছাড়ো দেখি বঙ্কিমানন্দ, এখন যদি বাঁচতে চাও তো শ'খানেক টাকা ঝাড়ো, আমরা পুলিশটুলিশকে বলেকয়ে চেষ্টা করে দেখি। ধরো—তোমাকে যদি জেলে ঢুকিয়ে দেয়, তখন ওই বাবা-মহেশ্বর তোমাকে পঁচিশবার করে জেলখানায় গিয়ে গাঁজা খাইয়ে আসবে না। গাঁজা খেতে না পেয়ে পেট ফুলে মরে যাবে।

একশ' টাকা দিতে হবে শুনেই বঙ্কিমানন্দের চোখদুটো কেমন যেন স্তিমিত হয়ে এলো। ঝিম্ মেরে একটুখানি চুপ করে কি যেন ভাবলে। তারপর বললে, নে বাবা, একশ' টাকা এখন আমি কোথায় পাই? ভাখ্ হাবু, গাঁজা আমি খাই তাই আমার কাছে গাঁজা সব সময়েই থাকে। সে গাঁজা আমি বিক্রি করবার জন্যে রাখি সেকথা পুলিশকে কে বলেছে তা আমি বুঝতে পেরেছি। গাঁজা যারা খায় তারা বলবে না।

হাবু বললে, বলেছে, কে তা তুমি বুঝতে পারছো না? বলেছে গণেশ পাঁড়ে, নয়ত তার ছেলে চৈতন পাঁড়ে।

ঠিক বলেছিস। ওরা গাঁজা খায় না। ওদের যদি গাঁজা ধরাতে পারতাম তাহ'লে দেখতিস এ-গাঁয়ের চেহারা অন্যরকম হয়ে যেতো। গাঁজা খেয়ে বুঁদ হয়ে সব ঘুরে বেড়াতো। এইরকম মারামারি কাটাকাটি করতো না। তাই তো বলি—সুখেশান্তিতে যদি থাকতে চাস তো তোরাও গাঁজা ধর্।

হাবু বললে, ধরবো। এখন ও-সব আজেবাজে কথা ছেড়ে দিয়ে টাকাটা ঝাড়ো। আমরা চলে যাই। আমাদের কাজ আছে।

বঙ্কিমানন্দ বললে, টাকা তো নেই।

বেশ, তাহ'লে আমরা চললাম। পুলিশ যদি তোমাকে ধরে নিয়ে যায় তখন আমাদের কাছে যেয়ো না।

বঙ্কিমানন্দ ভয় পেয়ে গেল। বললে, দাঁড়া ভেবে দেখি।

হাবু আরও ভয় ধরিয়ে দিলে। বললে, তুমি বসে বসে ভাবো। আমরা চললাম। ওঠো নবীন।

এই বলে নবীনকে তুলে নিয়ে সত্যিই হাবু চলে যাচ্ছিল।

বঙ্কিমানন্দ বললে, শোন্।

ফিরে দাঁড়ালো দু'জনেই।

কি বলছো?

বঙ্কিমানন্দ বললে, পুলিশ আসবে না তো ?

টাকা দিলে আসবে না।

কত দিতে হবে ?

একশ' টাকা।

অত টাকা আমি পাব কোথায় ?

কত পাবে ?

পঞ্চাশ টাকা।

হাবু বললে, তাহ'লে হ'লো না। টাকা তো আমরা নিজের জন্যে চাই না। চাই ওই গণেশ পাঁড়েকে জব্দ করতে।

বঙ্কিমানন্দ বললে, কাল সকালে একবার আসিস্। কিন্তু হাঁ, তোর হাতে তো হবে না। নবীনকে আসতে হবে।

নবীন বললে, আসবো।

বঙ্কিমানন্দের আশ্রম থেকে বেরিয়ে এলো নবীন আর হাবু রায়। পল্লীগ্রামের অন্ধকার পথ। মাথার ওপর তারাভরা আকাশ।

পথ চলতে চলতে নবীন বললে, শুধু একটা মানুষের জন্যে গ্রামের অবস্থা কি হলো ভাখো। শুধু হিংসা আর হিংসা! খুলটাকে বাঁচাবার জন্যে আমি দশটা টাকার জন্যে ছটফট্ করে মরছি, আর এই এতগুলো টাকা সত্যিই যদি পাওয়া যায় বঙ্কিমের কাছ থেকে, সে-টাকাটা যাবে উকিল-মোক্তারের কাছে। ন যেয়ার ন ধর্মায়—

হাবু বললে, এখন আর সেসব কথা ভাববার সময় নেই। আগুন যখন জ্বলে উঠেছে তখন তাকে নেবাতেই হবে।

এ আগুন নিববে বলে মনে হয় না।—নবীন বললে, হিংসার আগুন যখন জ্বলে তখন সে আগুন সহজে নেবে না। নেবে যখন—তখন দেখা যায় দু'পক্ষই পুড়ে ছাই হয়েছে।

হাবু রায় বললে, অতসব বড় বড় কথা জানি না ভায়া। মিথ্যা সাক্ষী দিয়ে দিয়ে আর মিথ্যা কথা বলে বলে জীবনটা গেল।

নবীন বললে, আচ্ছা হাবু, এ সময় কেউ নেই ; একটা কথা জিজ্ঞাসা করি তোমাকে। সত্যি জবাব দেবে ?

বল। সত্যি কথা বলতে তো ভুলেই গেছি। তবু যদি বলবার মত হয় তো বলবো।

নবীন জিজ্ঞাসা করলে, এ-সব তোমার ভাল লাগে ?

হাবু বললে, লাগে বই-কি! বেশ লাগে। মনে হয় বুদ্ধির খেলা খেলছি। তবে একটা জায়গায় আমি খাঁটি আছি।

কোন্ জায়গায় ?

হাবু বললে, আমি যে-দিকটা ধরি, মনে মনে জানি সে অপরাধী নয়।

নবীন বললে, ঠিক বুঝতে পারলাম না। ভাল করে বুঝিয়ে বল।

হাবু তখন তাকে বুঝিয়ে বলতে লাগলো।

এই যেমন ধর—তুমি আমাকে নেপাল মুচির হয়ে মিথ্যে সাক্ষী দিতে বললে। আমি তক্ষুনি রাজী হয়ে গেলাম। কারণ আমি মনে মনে জানি নেপাল সত্যিই মার খেয়েছে। এই মামলায় গণেশ পাঁড়ে যদি আমাকে ডাকতো আমি কখনও যেতাম না। এই যেমন ধর—বক্সিরামজ। জানি আমি—লোকটা ভণ্ড। ও সাধুও নয় সন্ন্যাসীও নয়। গাঁজা খায়, চুরি করে গাঁজা বিক্রিও করে। ওর কাছ থেকে ঘুষ দিয়ে টাকা বের করতে আমার আপত্তি নেই।

কথায় কথায় তারা ইস্কুলের কাছে এসে পড়েছিল। স্কুল-ঘরের ভেতরে আলো জ্বলছে। দেখলে, টেবিলের ওপর লণ্ঠন রেখে হেডমাষ্টার কি যেন পড়ছে বসে বসে।

নবীন বললে, এবার তুমি বাড়ী যাও হাবু। কাল সকালে এসো। আমি যাব তোমার সঙ্গে বক্সিরামজের কাছে।

হাবু চলে গেল। নবীন গিয়ে ঢুকলো ইস্কুলে। মাষ্টার জিজ্ঞাসা করলে, এতক্ষণ কোথায় গিয়েছিলে?

নবীন বললে, গিয়েছিলাম টাকার সন্ধানে। ভাখো, ভাল কাজের জন্যে টাকা পাওয়া যায় না, কিন্তু মন্দ কাজের জন্য টাকা ঠিক এসে যায়। ইস্কুলের জন্যে টাকা জোগাড় করতে পারলাম না। কিন্তু আদালতের মামলার টাকা ঠিক জোগাড় করছি।—ভাল লাগছে না কিছু। মনে হচ্ছে—নেশা করে বুঁদ হয়ে পড়ে থাকি।

মাষ্টার বললে, আমি কিন্তু অত্যন্ত আশাবাদী মানুষ। আমার মনে হয় শেষ পর্য্যন্ত খারাপ কিছু হবে না। ভালই হবে। কিন্তু সে ভাল হয়ত আমরা দেখতে পাব না।

নবীন বললে, আমার বাবাও ঠিক এমনি কথা বলে। আমি কিন্তু ভাল হবে বলে আশা করতে পারছি না। ক্রমাগত মনে হচ্ছে—সারা দেশটাই যেন জাহান্নামের পথে নেমে যাচ্ছে। আমরা সেইখানে নামবার সিঁড়ি তৈরি করছি।

মাষ্টার বললে, দেশের রাজশক্তি যদি চায়—দেশটা উচ্ছন্নে যাক্, তাহ'লে তারা অনায়াসেই দেশকে সেই পথে ঠেলে দিতে পারে। ইংরেজ তো আমাদের মঙ্গল কামনা করে না। তারা চায় নিজের মঙ্গল। তাই তারা দেশকে এইখানে নিয়ে এসেছে। কিন্তু তুমি দেখো—মানুষ একদিন জাগবেই। চোখ তার একদিন খুলে যাবেই। এই আশা নিয়েই বেঁচে আছি নবীন, তাই তুমি যেদিন বলবে চাকরি ছেড়ে দিয়ে তোমার বাবার প্রতিষ্ঠিত ইস্কুলটিকে বাঁচাও, আমি সেইদিনই ছুটে এসে এইখানে।

ইস্কুলের বাইরের বারান্দায় পায়ের শব্দ হতেই নবীন বললে, কে?

একগাছা বাঁশের কঞ্চি নিয়ে ঘরে ঢুকলো কপিল।

কি খবর?

মাষ্টারের টেবিলের ওপর বাঁশের সিকলিকে ছড়িগুলি নামিয়ে দিয়ে কপিল হাসতে লাগলো।

এই একটি আধ-পাগলা মানুষ কপিল চক্রবর্ত্তী। গ্রামে এত যে মারামারি কাটাকাটি, এত যে মামলা-মোকর্দ্দমা, এত যে হিংসা-বিদ্বেষ, কপিল সেদিকে একবার ফিরেও তাকায় না। কেউ তার শত্রু নয়। কারও ওপর তার কোনও অভিযোগ নেই। তার কাছে গণেশ পাঁড়েও যা, নবীনও তাই।

নবীন বললে, রাত্তির বেলা তুমি বাঁশের ছড়ি তৈরি করছিলে?

কপিল বললে, মাষ্টারদের ছুটি চাই না? স্কুলের ছেলেগুলোকে ঠেঙাতে হবে না?

তাই বলে এই এত ছুটি?

কপিল হাসতে হাসতে বললে, এই এক-একটা ছুটি এক একটা ছেলের পিঠে ভাঙবে তবে তো! কি রে মাষ্টার, আর ছুটি চাই?

মাষ্টার বললে, না। আর চাই না। তুমি এখন বাড়ী যাও। অন্ধকারে একা-একা ঘুরে বেড়িয়ো না। গণেশ পাঁড়ে দেখতে পেলে তোমাকেই মেরে বসবে।

কপিল বললে, না না আমাকে মারবে কেন? আমি তো আজ বিকেলে তার বাড়ীতে গিয়েছিলাম।

নবীন একটুখানি অবাক্ হয়ে গিয়ে তার মুখের দিকে তাকালে।

মাষ্টার জিজ্ঞাসা করলে, গণেশ পাঁড়ের বাড়ী কি জন্যে গিয়েছিলে?

কপিল বললে, চা খেতে। আমি তো প্রায়ই ওর বাড়ীতে গিয়ে চা খেয়ে আসি।

নবীন বললে, আমাদের কথা তোমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করে না?

কপিল বললে, করে না আবার! খুব করে!

কি বলে?

গণেশের বৌ বলে, 'নবীন তোমাদের পেয়ারা খায়?' আমি বললাম—'খায় বই-কি, খুব খায়।' তখন বললে, 'দুটো পেয়ারা ওর জন্যে নিয়ে যাও।' গাছে মেলা পেয়ারা হয়েছে তো! পাকা পাকা পেয়ারা দুটো এনেছিলাম গাছ থেকে পেড়ে। কিন্তু খুব মিষ্টি পেয়ারা। রাস্তায় আসতে নিজেই খেয়ে ফেলেছি।

মাষ্টার নবীনের মুখের দিকে তাকালে। নবীনও মাষ্টারের মুখের দিকে তাকালে।

মাষ্টার বললে, শুনেছো নবীন? মন দিয়ে শোনো। আমাদের ঘরে ঘরে এই সব মেয়েরা এখনও বেঁচে আছে।

নবীন বললে, বিশ্বাস করতে পারছি না যে!

মাষ্টার বললে, বিশ্বাস কর।

বক্তিয়ারপুর কাছ থেকে একশ' টাকাই আদায় করেছে হাবু রায়। তার জন্যে কত মিথ্যা কথা বলতে হয়েছে তাকে—নবীন তা জানে। নবীন মুখ টিপে টিপে হেসেছে শুধু।

টাকা নিয়ে তারা ফিরে আসতেই দেখে—চণ্ডী ভট্চাজ বসে আছে নবীনের অপেক্ষায়। 'এসো, তোমারই জন্যে বসে আছি।'

চণ্ডী ভট্চাজ নবীনের চেয়ে বছর চারেকের বড়। সারা গ্রামের পুরোহিত। পুরোহিত হলেও নবীন তার সঙ্গে ইয়ারকি ফষ্টিনষ্টি করে।

চণ্ডী ভট্চাজ মানুষটিও এক অদ্ভুত প্রকৃতির।

চণ্ডী ভট্চাজের বাপের মত খুঁড়ি ছিল। চণ্ডী ভাবে তারও বুঝি খুঁড়ি হচ্ছে। তাই সে তার বাপের মত খাটো একটা গামছা পরে' বরদম ঘুরে বেড়ায়। শীত গ্রীষ্ম সব সময়েই তার ঠাণ্ডা লাগে। হাতে বেদনা হয়। তাই সে তার ছোট ভাইএর লালরঙের ছেঁড়া একজোড়া মোজা কয়েকদিন ধরে

পায়ে দিচ্ছিল। মোজা পরলেই জুতো পরতে হয়। অথচ জুতো সে কস্মিনকালেও কেনে না। ছোট ভাইএর জুতো জোড়াটা টেনেটুনে পরেছিল কোনোরকমে, কিন্তু একদিনেই পায়ে ফোস্কা পড়ে গেছে। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতে হচ্ছে। দাঁতে বেদনা হয়েছে বলে মাথায় 'মাঙ্কি ক্যাপ'।

সেই বিচিত্র বেশে চণ্ডী ভট্চাজ বসে ছিল ইস্কুলের দাওয়ায়।

নবীন কিছু বলেনি, কিন্তু হাবু বার বললে, এমন বাঁদরটি সেজে বসে আছ কেন? কী হয়েছে তোমার?

আমাকে বাঁদর বললি তুই?

বাঁদর সেজেছ, আর বাঁদর বলবো না? গামছা পরে পরেই জীবন কাটালে। ধুতি কিনতে পার না? না না, সত্যি বলছি ভট্চাজ, তোমাকে ঘিরে ঠাকুর দেবতার পুজো আচ্চা করানো উচিত নয়। চব্বিশ ঘণ্টা পান জরদা খাও, দাঁত মাজো না কোনোদিন।

হাবু হারের ওপর চটে উঠলো চণ্ডী ভট্চাজ। বললে, শাখ্ যা জানিস না তাই না নিয়ে কথা বলিসনে বলছি। আমাদের শাস্ত্রে চত্বারিংশৎ প্রকার দন্তধাবন প্রণালী আছে। তার মধ্যে সকালবেলা পুবমুখে দাঁড়িয়ে পনেরো বার কুলকুচ করা—একটা। আমি তাই করি। আর তুই বলছিস কিনা আমি দাঁত মাজি না?

হাবু হার বললে, সংস্কৃত পড়েছ কোনোদিন যে শাস্ত্র পড়বে? তুমি আর শাস্ত্রের কথা বোলো না।

চণ্ডী বললে, আমার বাপ্-ঠাকুর্দা চৌদ্দপুরুষ পুরুতের কাজ করে গেছে, আমিও সারা গাঁয়ের পুরোহিত, বাড়ীতে শ্যামচাঁদের নিত্য পুজো—আর আমি সংস্কৃত জানি না?

মন্ত্রগুলো সংস্কৃত ভাষায় লেখা। সেইগুলো মুখস্থ করে তুলতাল যেমন পারো আউড়ে যাও শুধু। ওকে সংস্কৃত জানা বলে না।

নবীন দেখলে এবার ওদের ঝগড়া বেধে যাবে। তাই সে থামিয়ে দিলে। বললে, হাবু এবার তুমি থামো। ভট্চাজ কি বলবে বলছিলে—বল।

চণ্ডী ভট্চাজ বললে, ভারি বিপদে পড়েছি শ্যামচাঁদকে নিয়ে।

শ্যামচাঁদ তাদের গৃহ-দেবতা। কালো কষ্টিপাথরের তৈরি চমৎকার মূর্তি শ্যামচাঁদের। রাধিকাও আছে। অষ্টধাতুর তৈরি রাধিকা। চণ্ডী ভট্চাজকেই ষোল পুজো করতে হয়।

তার আবার বিপদ কিসের?

চণ্ডী ভট্চাজ কিন্তু যে বিপদের অনুপুঙ্খিক বিবরণ দিলে তাকে বিপদ বলতে হবে বই-কি!

বীরেন ভট্চাজ ছিল চণ্ডীর জ্ঞাতি সম্পর্কে কাকা। কাজেই শ্যামচাঁদের দেবোত্তর সম্পত্তির অংশীদার ছিল সে। বীরেনের ভাগে পড়েছিল মাত্র পাঁচ বিঘে জমি। পাঁচ বিঘে জমির ধান যেমন সে পেতো, মাসে পাঁচদিন তেমনি শ্যামচাঁদের পুজো তাকে চালাতে হতো।

বাড়ী অবশ্য একটা তার ছিল, কিন্তু বাড়ীতে বৌ ছিল না। বৌ না থাকবার কারণ তারা ছিল শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণ। বিয়ে করতে টাকা খরচ করে বাড়ীতে বৌ আনতে হয়। কিন্তু টাকাও সে খরচ করতে পারেনি। বৌ আনবার সৌভাগ্যও কোনোদিন হয়নি।

আর বৌ ছিল না বলে বীরেন কোনোদিন স্থায়ীভাবে গ্রামে বাস করতো না। কোথায় যে থাকতো সেই জানে। গ্রামে আসতো দু' চারদিনের জন্যে। এর বাড়ী ওর বাড়ী চেয়েচিন্তে খেতো।

আর নিজের সেই ভাঙা বাড়ীতেই পড়ে থাকতো। তারপর হঠাৎ একদিন উধাও হয়ে যেতো। বলতো, একটা বৌ না থাকলে বাড়ীতে বাস করা যায় না।

চণ্ডী ভট্‌চাজকেই দিয়েছিল তার ভাগের পাঁচ বিঘে জমি। বলেছিল, তুমিই জমিটা ভোগ কর আর শ্যামচাঁদের পাঁচদিনের সেবাটা চালিয়ে যাও।

সেই ব্যবস্থাই চলে আসছিল বরাবর।

বছরখানেক আগে হঠাৎ একদিন ধীরেন ভট্‌চাজ গ্রামে এলো। এসেই বললে, এবার বিয়ে করব। মেয়ে একটি পাওয়া গেছে।

কিন্তু বিয়ে তো আর এমনি হবে না। কিছু টাকা চাই। আর সেই টাকা সংগ্রহ করতে, পড়লো গিয়ে গণেশ পাঁড়ের খপ্পরে। গণেশ বুঝি তাকে নগদ একশ'টি টাকা দিয়ে দিখিয়ে নিলে তার সেই পাঁচ বিঘে দেবোত্তর জমি আর মাসের মধ্যে পাঁচদিন শ্যামচাঁদের পুজোর পালা।

ধীরেন কিন্তু টাকা নিয়ে সেই যে উধাও হলো, সেই থেকে আর গ্রামেও এলো না, বৌও আনলে না।

ধীরেন ভট্‌চাজের পাঁচ বিঘে জমি চণ্ডীর কাছ থেকে কেড়ে নিলে গণেশ পাঁড়ে। কেড়ে নিয়ে নিজেই চাষ করলে।

তারপর মাসের প্রথম তারিখে চৈতন এসে হাজির হলো চণ্ডী ভট্‌চাজের বাড়ীতে!

কি ব্যাপার?

শ্যামচাঁদ আর রাধিকাকে নিয়ে যাবে।

পাঁচদিন বাড়ীতে রাখবে, পুজো করবে, ভোগ দেবে, তারপর আবার ছ' দিনের দিন পৌঁছে দিয়ে যাবে চণ্ডীর বাড়ীতে।

ঠাকুর ছেড়ে দিতে হলো চণ্ডী ভট্‌চাজকে।

চৈতন এক হাতে নিলে শ্যামচাঁদকে আর এক হাতে নিলে রাধিকাকে। নিয়ে চলে গেল নিজেদের বাড়ীতে।

চৈতনের কষ্‌ক্ষির জোর আছে বলতে হবে। নইলে ওই দুটো ভারি ঠাকুর—একটি পাথরের আর একটি অষ্টধাতুর—দু' হাতে দুটিকে নিয়ে যাওয়া বড় সহজ কথা নয়।

চণ্ডী ভট্‌চাজের বাড়ী থেকে গণেশ পাঁড়ের বাড়ী—এ পাড়া ও পাড়া অনেকখানি পথ।

ঠাকুর নিয়ে গিয়ে কেমন করে কি যে করে, কি মন্ত্র বলে পুজো করে কেমন করে ভোগ দেয় তারাই জানে। তারপর ছ' দিনের দিন চৈতন যেমন করে নিয়ে যায় ঠিক তেমনি করে আবার ঠাকুর দুটিকে ফিরিয়ে দিয়ে যায় চণ্ডী ভট্‌চাজের বাড়ীতে।

দু' মাস সেবা চালাবার পর তৃতীয় মাস থেকে নিয়মটা গেল বদলে।

চৈতন নাকি গণেশ পাঁড়েকে বলেছে—কেষ্ট-ঠাকুরটা তত ভারি নয় বাবা, কিন্তু রাধিকাটা বাপ বাবো সেরের কম নয়। ওকে আমি এক হাত দিয়ে আনতেও পারবো না—দিয়েও আসতে পারবো না।

গণেশ বলেছে, দু' বারে আনবি।

তার চেয়ে তুমিও চল না বাবা, দুজনে ভাগাভাগি করে নিয়ে আসবো।

চণ্ডী ভট্‌চাজের বাড়ী যেতে হলে নবীনদের বাড়ীর সুমুখ দিয়ে যেতে হয়। গণেশ পাঁড়ে রাজী হয় নি। বলেছে, আমি আনবো কি রে ব্যাটা? রাস্তার রাস্তার ঠাকুর বয়ে আনবো কি রে ব্যাটা? তার চেয়ে এক কাজ কর। রাধিকাটাকে বাদ দিয়ে শুধু কেষ্টকে নিয়ে আসবি। বলবি—মেয়ে ঠাকুরের পুজো আমরা করি না। আমরা জাত-কছুজ্যে।

সেইদিন থেকে রাধিকাকে ফেলে রেখে শুধু শ্যামচাঁদকেই নিয়ে যায় চৈতন।

তারপর কি হয়েছে শোনো—

চণ্ডী ভট্‌চাজ বললে, আজ মাসের ছ' তারিখ। এখনও শ্যামচাঁদকে দিয়ে গেল না। মাসকাবারে অন্তে তখনও চৈতন গেছে উকিলের বাড়ী। গণেশ নাকি তার ছোট ছেলে ভাঁটুরাকে বলেছে, তুই দিয়ে আয়। কিন্তু ভাঁটুরার মা তাকে বারণ করেছে। বলেছে, না বাবা, তুই ছেলেমানুষ, ঠাকুর নিয়ে আছাড় খেয়ে পড়িস যদি তো ঠাকুরও যাবে তুইও যাবি।

—এখন কি করবো তাই বল।

নবীন বললে, নিজে গিয়ে নিয়ে এসো।

চণ্ডী বললে, একা পেয়ে গণেশ যদি আমাকে আক্রমণ করে? কষ্ট করে যদি মেরে বসে?

কেন, শুধু-শুধু মারবে কেন?

চণ্ডী বললে, আমি যে তোমার তরফের লোক।

নবীন বললে, তাহ'লে থাক্ শ্যামচাঁদ ওরই বাড়ীতে। ঠাকুর-দেবতার ওপর তোমাদের ভক্তিও যত, পুজোও তত। শ্যামচাঁদের কপাল। কি আর করবে বল।

চণ্ডী ভট্‌চাজ বললে, না না—কি করবো তাই বলে দাও।

করবে আবার কি। বাড়ীতে যেমন পুতুল থাকে, তেমনি তোমার বাড়ীতে থাকবে রাধারাণী আর গণেশ পাঁড়ের বাড়ীতে থাকবে শ্যামচাঁদ। আসল ব্যাপারটা তো ঠাকুর নয়, জমির ফসল। সেটা যখন ঠিকই পাচ্ছ, তখন আর ভাববার কি আছে?

চণ্ডী বললে, নাঃ, তুমি দেখছি কিছুই বলবে না।

এই বলে সে উঠতে যাচ্ছিল, নবীন বললে, আমার কথা যদি রাখো তো বলি।

হ্যাঁ রাখবো। তুমি বল।

নবীন বললে, শ্যামচাঁদের বারো মাসের সেবা তো তুমিই চালাচ্ছিলে। এখনও তেমনি চালাও। চৈতন যদি ঠাকুর চাইতে আসে তো দিও না।

চণ্ডী বললে, পাঁচ বিঘে জমির ধান মেরে আর পুজো চালাবে না?

ও রকম পুজো নাই-বা চালালো!

গণেশের পাঁচবিঘের পুজো আমি চালাব?

চালালে ক্ষতি কি?

কিছুতেই না। ও খাবে জমির ফসল, আর আমি চালাবো ঠাকুর সেবার পালা? কখ্খনো না। কিছুতেই না।

নবীন বললে, তাহ'লে আর আমার কাছে এলে কেন?

চণ্ডী ভট্‌চাজ বললে, তুমি যে গণেশ পাঁড়ের ভয়ে অস্থির হয়ে আছো তা কেমন করে জানবো?

পাচ বিঘে জমির ফসল আমি ওকে অমনি খেতে দেবো ভেবেছ? কিছুতেই না। আমি ওকে পুরো কয়াব হয়ে ছাড়বো।

বলতে বলতে চণ্ডী ভট্টাজ চলে গেল সেখান থেকে।

নবীন তার চলে-যাওয়ার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে তাকিয়ে কি যেন ভাবতে লাগলো। হায় রে ভাগ্যচাদ, তোমার অদৃষ্টে এও ছিল!

নবীনের নামে অনেকগুলো পাল্টা মামলা রায়ের করেছিল গণেশ পাড়ে।

কিন্তু প্রমাণ অভাবে কোনোটাই শেষ পর্যন্ত টিকলো না।

গণেশ পাড়ে বলেই বেড়াতো—হুজুর, জমিদার ঘোর অত্যাচারী। তার ভয়ে কেউ সাক্ষী দিতে চায় না।

কিন্তু নেপাল মুচির মামলাটা গণেশ পাড়ে কিছুতেই সামলাতে পারলে না।

খুব ভাল একজন উকিল দিলে। টাকা পয়সা খরচ করলে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। একমাস জেল হয়ে গেল। আর চৈতনের হলো পঞ্চাশ টাকা জরিমানা। সেই জরিমানার টাকা নেপাল পাবে।

কিন্তু টাকা পাবার আগেই নেপাল মারা গেল।

ছোট ছেলেটাকে কোলে নিয়ে নেপালের বৌ এসে দাঁড়ালো নবীনের কাছে। মুখে কোনও

দেশের সমৃদ্ধি ও জাতীয় সংহতির মধ্য দিয়েই সার্থক হয়

* জাতীয় উৎসব *

এই দিনে আমাদের সঙ্কল্প ঃ

* জাতীয় সংহতি সুদৃঢ় করব

* সকল প্রকার অপচয় বন্ধ করব

* সর্বত্র উৎপাদন বৃদ্ধি করব

* জাতীয় প্রতিরক্ষা ও উন্নয়নের জন্য আত্মোৎসর্গ করব

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

কথা নেই। দু'চোখ বেয়ে শুধু জলের ধারা টপ্ টপ্ করে গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে তার গায়ের ওপর।

নবীন বললে, জানি সে মরবে। কিন্তু আর দুদিন পরে মরলেই ভাল হতো। গণেশ পাঁড়ের শাস্তিটা দেখে যেতে পারতো।

সারা গ্রামের আবহাওয়াটা হঠাৎ যেন বদলে গেল। সবাই বলতে লাগলো, নবীনের বাহাদুরী আছে।

সন্ধ্যে মহরার দোকানের মজলিসটা সেদিন অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত চলতে লাগলো।

বেচু তার উমোনের কাঁছটিতে বসে বেগুনী ভাজতে ভাজতে বললে, মাসখানেক নিশ্চিন্তি মনে কাজকম্ম করা যাবে।

চণ্ডী ভট্চাজ এলো নবীনের কাছে। বললে, শেষ পর্য্যন্ত তোমার কথাই সত্যি হলো নবীন। শ্যামচাঁদকে আর গণেশের বাড়ী পাঠাব না। কয়েদ-খাটা মানুষের হাতে শ্যামচাঁদের পূজো চলতেই পারে না।

সবাই আসতে লাগলো নবীনের কাছে। কেনারাম এলো। রাঘহরি এলো। হরেকেষ্ট এলো।

মেয়াদটা খুব কম হলো। বছরখানেক হলেই ভাল হতো।

কাশী হাজরা সেদিন আকাশের দিকে তাকিয়ে একসঙ্গে দুটো উড়ো জাহাজ আবিষ্কার করে ফেললে।

কেনারাম বললে, সবই তো হলো বাবা, কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে, গুলিখেকো বাঘ—জেল থেকে ফিরে এসে গণেশ কী কাণ্ড যে করে বসবে কে জানে।

হিজুল নদীর ধারে জমিদারের খানিকটা দো-ফসলের জমি ছিল। শশী মোড়ল সেই জমিতে একবার আলু-পেঁয়াজের চাষ করেছিল। কিন্তু আলু পেঁয়াজগুলি বড় হবার আগেই সারা মাঠের ফসল উপ্ড়ে তুলে ফেলে দিয়েছিল দুষ্টু লোকে।

তখন থেকে শশী মোড়লের আক্ষোশের আর অবধি ছিল না। চাষার ছেলে, চাষ করতে না পারার যে কি কষ্ট তা সে জানে। রাত্রে তার ভাল ঘুম হতো না।

শশী তার স্ত্রী-পুত্র নিয়ে বাঁকুড়া জেলার মহানন্দুলি গ্রামে গিয়েছিল তার শ্বশুর বাড়ীতে। সেখানে গিয়ে দেখলে—চাষীর ঘরে লক্ষ্মী যেন বাঁধা। তিনখানা লাঙলের চাষ। চার-পাঁচটা ধানের মরাই বাঁধা রয়েছে উঠোনে। চার জোড়া চাষের বলদ। তিন-তিনটে গাই দুধ দিচ্ছে দুবেলা। অভাব বলতে কোথাও কিছু নেই। দু'জন শালা। তাদের স্বাস্থ্যসুন্দর চেহারা দেখলে মুগ্ধ তাকিয়ে থাকতে হয়।

শশীর মাথাটা গেল খারাপ হয়ে। বৌকে বললে, ছেলেমেয়ে নিয়ে তুমি কিছুদিন থাকো ভাইএর বাড়ীতে। আমি আর একবার দেখি চেষ্টা করে।

বৌ বললে, তোমাদের গাঁ একেবারে জংগলে গেছে। ওখানে কিছু হবে না। খেটেই মরবে শুধু।

মরি মরবো। তবু আমি একবার চেষ্টা করতে ছাড়বো না।

এই বলে শশী তার মেয়েছেলেকে শালার বাড়ীতে রেখে গ্রামে ফিরে এসেছে।

আবার সে চাষ করবে। সীতাপতিবাবুর কাছে গিয়ে বললে, আবার একবার জমিটা দিন বড়বাবু। আমি আবার একবার লাগবো।

সীতাপতিবাবু হাসলেন। বললেন, দিতে তো আমি সব সময়েই রাজী। কিন্তু—

কিন্তু টিন্তু নয় বড়বাবু, এবার আর আলু-পেঁয়াজ দেবো না। এবার লাগাবো কচু।

সীতাপতিবাবু একটু ভেবে বললেন, তা মন্দ, নয়। কচু ছাগলে গরুতে খায় না। কিন্তু আমার ভয় শুধু মানুষকে।

শশী বললে, সে মানুষটা তো ছেলে চলে গেছে।

সে আর ক'দিন! পাঁচ দশ দিন পরেই তো ফিরে আসবে।

তা হোক্ বড়বাবু।

সীতাপতিবাবু বললেন, তাহ'লে আমিও খানিকটা কচুর চাষ করি। চল্ জমিটা দেখে আসি।

শশীর আনন্দ যেন আর ধরে না!

তাহ'লে আর কেউ কথাটি বলতে পারবে না হজুর। মেয়েছেলে তো রেখে এসেছি শ্বশুর বাড়ীতে। আমি একটা কুঁড়ে বেঁধে ওইখানেই বাস করবো। দেখি কেমন করে কে আমাদের ফসল নষ্ট করে!

গণেশ ঘোষের ঠিক কথাই বলেছিল।

গুলিখাওয়া বাঘের মতই গণেশ ফিরে এলো জেল থেকে। বলতে লাগলো, আরও কিছুদিন যদি থাকতে পেতাম জেলে তো দেখতিস শরীরটা কিরকম বাগিয়ে নিয়ে আসতাম।

যতটুকু বাগিয়েছে তাতেই রক্ষা নেই। চৈতনকে বললে, পুরনো সেই তলোয়ারটা বের কর্। ইট দিয়ে ঘষে বেশ ভাল করে পরিষ্কার করে রাখ্।

চৈতন জিজ্ঞাসা করলে, তলোয়ার কি করবে বাবা?

তলোয়ার দিয়ে কি করে আনিস না?

চৈতন বললে, কাকে কাটবে বাবা?

গণেশ বললে, নবীনকে। শত্রুকে একেবারে শেষ করে দেওয়াই ভাল।

মনের আনন্দে চৈতন তার মাকে বলতে গিয়েছিল কথাটা।—সকাল সকাল আজ আমাদের খাইয়ে দিবি মা। আজ আমরা একটা কাজে বেরুবো।

চৈতনের মা বললে, হ্যাঁ তা দেবো বই-কি। যে গুণ কাজে যাচ্ছ তোমরা—

চৈতন আর কোনও কথা বললে না।

মা বললে, এ ছাড়া তোদের আর কি কোনও কাজ নেই রে হতভাগা? সবাই মিলে আনন্দ করে থাকতে কি তোরা জানিস না?

চৈতন বললে, আমাকে কি বলছো—বাবাকে বল।

বলবার মত মানুষ হলে বলতাম। তুই আমার পেটের ছেলে তাই তোকেই বলছি—এই সব কাজ করবার আগে তোরা আমাকে কেটে ফ্যাল্।

তোমাকে কেটে ফেললে আমাদের রান্না করবে কে?

খুব রসিকতা করেছে ভেবে ক্যা ক্যা করে হাসতে লাগলো চৈতন।

মায়ের চোখ দিয়ে তখন জল গড়াচ্ছে।

হাবু রায়কে সঙ্গে নিয়ে নবীন গিয়েছিল শহরে। বিকেলের ট্রেণে ফেরবার কথা। বিকেলে এই একটিমাত্র ট্রেণ। শহর থেকে লোকজন সাধারণত ওই ট্রেণেই গ্রামে ফেরে।

হিজুল নদীর পাড় ঘেঁষে শিমুল গাছের তলা দিয়ে গাঁয়ে চলার যে পথটা গেছে গ্রামের দিকে; রেল ষ্টেশন থেকে গ্রামে ফেরার ওই একটি মাত্র পথ।

পথের ধারে বাসক ঝোপের ঝোপের তলায় লাঠি, কুড়ুল আর একটা তলোয়ার লুকিয়ে এনে রেখেছিল চৈতন। লুকিয়ে রেখে একটা টিপির আড়ালে অপেক্ষা করছিল।

গণেশ এলো। এসেই জিজ্ঞাসা করলে, ট্রেণটা চলে গেছে?

হ্যাঁ গেছে।

চল্ তাহ'লে ওই ঝোপটার কাছে গিয়েই বসি।

দুজনে ঝোপের কাছে এসে বসলো।

হেরোকে তুই তাড়া করবি তলোয়ার নিয়ে। আমি তখন ধরে নেবো নবুনেকে।

মহাতাপ দারোয়ানটা যদি সঙ্গে থাকে?

থাক্ না।

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করবার পর অতিষ্ঠ হয়ে উঠলো চৈতন। বললে, এ ট্রেণে বোধহয় এলো না। রাত্রের ট্রেণে ফিরবে।

গণেশ বললে, আরও ভাল।

চৈতন আকাশের দিকে তাকিয়ে বললে, বোধহয় চাঁদ উঠছে। ওই ভাখো!

গণেশ বললে, তুই ভাখ। অমন চাঁদ আমি কত দেখেছি: চাঁদ সুদ্ধি দু'জনেই থাক্ না বাবা। রাতে যেমন করে শিকার ধরে ঠিক তেমনি করে ধরব আমি নবুনেকে। ধরে নিয়ে গিয়ে ফেলবো হিজুলের বালিতে। কুপিয়ে কুপিয়ে কাটব। তুই ততক্ষণ একটা গর্ত খুঁড়বি। তারপর সেই গর্তে লাশটাকে ফেলে দিয়ে—

কথাটা শেষ হলো না গণেশের। চৈতন বললে, গর্ত খুঁড়তে হবে তা তো বললে না তখন! একটা কোদাল নিয়ে আসতে হতো যে বাড়ী থেকে।

গণেশ বললে, বালিতে গর্ত খুঁড়তে কোদাল লাগে না। হাত দিয়েই হয়।

না বাবা একটা মানুষ পুঁতবার মত গর্ত হাত দিয়ে হবে না।

গণেশ কি যেন দেখছিল তাকিয়ে তাকিয়ে। বললে, হবে না তো হবে না। ভাখ দেখি—ওখানে কে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছে।

চৈতন দেখলে। হিজুল নদীর উত্তর পাড়ে সো-জমির ওপর দাঁড়িয়ে কথা বলছেন সীতাপতিবাবু। পাশে দাঁড়িয়ে আছে শশী ঘোড়ল।

সীতাপতিবাবু বলছেন, বীজ যদি ভাল হয়, আর একটুখানি সার গোবর পড়ে মাটিতে, তাহ'লে আর দেখতে হবে না। গাছকে ঠিক মাথা তুলে উঠতেই হবে। ঝন্ ঝন্ করে ঠিক সাপের মত উঠবে। খুব তেজ হবে গাছের!

শশী বললে, তা যা বলেছেন বাবু।

সীতাপতিবাবু বললেন, আসল কথা কি জানিস? মাটিকে আদর যত্ন করতে হবে। ভালবাসতে হবে। ভাল না বাসলে কেউ কিছুই দেয় না শশী, ভাল না বাসলে কারও কাছ থেকে কিছু পাওয়া যায় না।

কথা বলতে বলতে হিজুলের পাড়ের ওপর দিয়ে সীতাপতিবাবু ঘোরকরি বাড়ী ফিরছিলেন।

নদী তখনও একেবারে শুকিয়ে যায়নি। নদীর দু'দিকে বড় ছোট নানারকমের গাছের সারি ডালপালা বাড়িয়ে নদীর জলের ওপর যেন ঝুঁকে পড়েছে। মস্ত বড় একটা শিরিষ গাছে ফুল ফুটেছে বিস্তর।

দূরের একটা গাছের আড়ালে চাঁদ উঠেছে।

সীতাপতিবাবু সেইখানে দাঁড়ালেন। বললেন, নদীর এই জায়গাটায় জল বাঁধতে হবে শশী। আর এ শিরিষগাছের তলায় ঢুকে খুঁড়ে একটা টেঁড়া বসিয়ে দিলেই জল উঠবে মাঠে।

Telegram : WOOLTOP Telephones : 23-6776 (3 Lines)

Puja Greetings to all

BHARAT WOOLLEN MILLS LTD.

WORSTED SPINNERS AND MANUFACTURERS.

11, ESPLANADE EAST, CALCUTTA-1

Proprietors of J. J. R. INDUSTRIES, Dulhipur-Moghalsarai.

শশী বললে, সে সব আমি ঠিক করে নেবো।

এমন সময় পাশের একটা ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো গণেশ আর চৈতন। সীতাপতিবাবু দাঁড়িয়েছিলেন পেছন ফিরে। গণেশ তাঁরই ওপর চালালে তার হাতের লাঠি।

উঃ। সীতাপতিবাবু হাতদুটো তুলে লাঠিটা আটকাবার চেষ্টা করলেন।

শশী ঝাঁপিয়ে পড়লো গণেশের ওপর।

চৈতন চালিয়ে দিলে সীতাপতিবাবুর হাতের ওপর আর এক লাঠি।

'ঈ—স্' বলে কাঁপতে কাঁপতে তিনি বসে পড়লেন।

শশী তখন প্রাণপণে চীৎকার সুরু করেছে—মেরে ফেললে আমাদের! কে আছিস—ছুটে আয়!

বাবা ও ছেলে দু' জনেই তখন শশীকে নিয়ে পড়লো।

মার্ ব্যাটা চাষাকেই আগে মার্!

গণেশ তার মুখখানা চেপে ধরলে। চৈতন তখন ঝোপের তলা থেকে তলোয়ারটা নিয়ে এগিয়ে আসছে।

আর-একটু হলেই শশীকে যোষহয় তারা শেষ করে দিত। কিন্তু তার চীৎকার শুনে দূর থেকে কারা যেন সাড়া দিলে।

ভয় নেই। যাচ্ছি—যাচ্ছি।

ষ্টেশন থেকে ভিন্ন গ্রামের কয়েকজন লোক সেই পথ দিয়েই আসছিল। গোলমাল শুনে তারা ছুটতে ছুটতে এগিয়ে এলো।

ঘটনাস্থলে তারা যখন এসে পৌঁছোলো, দেখলে সীতাপতিবাবুর হাত দিয়ে দর দর করে রক্ত পড়ছে। আর শশী শুয়ে পড়ে ছট্‌ফট্ করছে তার পায়ের যন্ত্রণায়। পায়ের ওপর দেখা গেল একটা চোটের দাগ। চৈতন তলোয়ার চালিয়ে দিয়ে পালিয়ে গেছে। গণেশকে তার ত্রিসীমানায় দেখা গেল না।

নবীন বাড়ী ফিরে এলো রাত্রে।

এমন যে হবে তা সে ভাবতেও পারেনি। বাপ শুয়ে আছে বিছানায়। শশীকেও তাদেরই বাড়ীতে আনা হয়েছে। ডাক্তার এসে ওষুধ দিয়ে ব্যাণ্ডেজ করে দিয়ে গেছে।

শশীর মুখে সবই শুনলো নবীন।

সীতাপতিবাবু বেশি কিছু বললেন না। শুধু নবীনের দিকে তাকিয়ে অনুরোধ করলেন, এইখানেই সব শেষ হোক্!

নবীন বললে, কেন? গণেশের ভয়ে?

না। হিংসার শেষ নেই। এ আগুন জ্বালিয়ো না। এইখানেই নিবিয়ে যাও।

নবীন কোনও জবাব দিলে না। ধীরে ধীরে উঠে চলে গেল সেখান থেকে। দোতলার ঘরে তার বন্দুকটা ছিল। পাখি-করা দোনলা বন্দুক।

কয়েকটা বুলেট ভরা কার্টিজ নিলে তার পকেটে আর বন্দুকটা নিলে হাতে। তারপর সে বেরিয়ে যাচ্ছিল বন্দুক হাতে নিয়ে।

সীতাপতিবাবু ডাকলেন, নবীন!

নবীন ফিরে দাঁড়ালো।

সীতাপতিবাবু বললেন, শোনো। এগিয়ে এসো।

নবীন তাঁর কাছে এসে দাঁড়ালো।

কোথায় যাচ্ছ?

আজ আমি গণেশ আর চৈতন—দু'জনকেই শেষ করে দেবো।

সীতাপতিবাবু বললেন, না।

মার খেয়ে চুপ করে থাকবো? তুমি কী দোষ করেছ? বিনা দোষে সে তোমার গায়ে হাত তুললো কেন?

সে দোষ তাদের নেই।

এর জন্য তাদের শাস্তি পাওয়া উচিত।

সে শাস্তির ভার নিজের হাতে তুলে নিও না। ভগবানের হাতে ছেড়ে দাও।

নবীন বললে, সে বিশ্বাস আমার নেই। অতখানি মহত্ত্বও আমার নেই।

সীতাপতিবাবুর বাঁ হাতটি ব্যাণ্ডেজ করে গলার সঙ্গে বেঁধে দেওয়া হয়েছিল। ডান হাত দিয়ে নবীনের হাতখানা তিনি চেপে ধরলেন।

আমি বলছি বন্দুক দিয়ে তাদের মারতে তুমি যেয়ো না। আমার কথা শোনো।

নবীন বললে, বেশ তাহ'লে আমি যাচ্ছি পুলিশ-সাহেবের কাছে। এর ব্যবস্থা আমাকে করতেই হবে।

আজ রাত্রেই যাবে?

হাঁ। আজ রাত্রেই যাব। প্রথমে যাব থানায়। তারপর যাব পুলিশ-সাহেবের কাছে।

আমি বলছি—না গেলেই ভাল হয়।

না বাবা আমাকে যেতেই হবে।

নবীন চলে গেল। সঙ্গে গেল মহতাপ্।

পরের দিন গ্রাম একেবারে সরগরম হয়ে উঠলো। মোটর বাইকে চড়ে পুলিশ-সাহেব নিজে এলেন। ওদিক থেকে দারোগা এলো। চারজন কনেষ্টবল এলো।

একজন ইংরেজ ভদ্রলোক নতুন এসেছেন পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট হয়ে। ভাঙা ভাঙা হিন্দীতে কথা বলতে পারেন। সীতাপতিবাবুর কাছে এসে বসলেন তিনি। সব কথা শুনলেন একটি একটি করে। পশ্চী ঘোড়লকে দেখলেন। ডাক্তারবাবু এসেছিলেন। তিনিও যা বলবার বললেন।

সীতাপতিবাবুর কাছারিতে বসেই তিনি ডেকে পাঠালেন গণেশ পাঁড়েকে আর তার ছেলে চৈতনকে। কনেষ্টবল সঙ্গে নিয়ে দারোগাবাবু নিজে গিয়েছিলেন তাদের ধরে আনতে।

কিছুক্ষণ পরে দারোগাবাবু ফিরে এলেন হতাশ হয়ে। গণেশকেও পাওয়া গেল না। চৈতনকেও না। দু'জনেই পালিয়েছে বাড়ী থেকে।

দারোগাবাবুর ওপর মামলা রায়ের করবার ভার দিয়ে পুলিশ-সাহেব চলে গেলেন।

গ্রামের সবাই বলাবলি করতে লাগলো—এবার আর বাছাধনের নিস্তার নেই।

পুলিশ-চালানী কেস সুরু হলো আদালতে। সমন বেরুলো গণেশ পাঁড়ে আর চৈতন পাঁড়ের নামে।

ছলিয়া বেরুবার আগেই তারা আদালতে গিয়ে 'সারেণ্ডার' করলে।

দিনের পর দিন পড়তে লাগলো।

সারা গ্রামের আবহাওয়া কেমন যেন অন্যরকম হয়ে গেছে। আগে ইউরোপের মহাযুদ্ধ নিয়ে আলোচনা হতো। আকাশের দিকে তাকিয়ে উড়ো জাহাজের সন্ধান করতো। আজকাল আলোচনা চলে গণেশ পাঁড়ে আর সীতাপতিবাবুর মামলা নিয়ে।

মামলা করেছে পুলিশ। আসামী গণেশ পাঁড়ে আর চৈতন পাঁড়ে। প্রধান সাক্ষী সীতাপতিবাবু আর শশী মোড়ল। আরও অনেক সাক্ষী আছে। মামলার দিন সাক্ষীরা খরচ পায়। বিস্তর টাকা আদায় করতে হয়।

কয়দিন জেল-হাজতে থাকবার পর জামিনে খালাস পেয়েছে গণেশ আর চৈতন। মামলার দিন আদালতে হাজির হতে হয়। উকিল দিতে হয়।

নবীন সেদিন সকালে তার বাড়ীর সুমুখে রকের ওপর বসেছিল চুপটি করে। হাতে একটা বেতের ছড়ি। আজকাল এই ছড়িটা সবসময়েই তার হাতে থাকে! কথা সে আজকাল খুব কম বলে।

চণ্ডী ভট্‌চাজ তার সেই বিচিত্র পোষাকে এসে দাঁড়ালো তার সুমুখে।

বলি কি ভাবছো নবীন?

নবীন মুখ তুলে তাকালে তার দিকে।

ভট্‌চাজ বললে, ভাববার কিছু নেই। ওদিকে বাহাদুর চেড়েক্ ডেঙেং!

সে আবার কি?

ভট্‌চাজ বললে, শ্যামচাঁদ আমাদের জাগ্রত দেবতা। ডাকলে সাড়া দেয়। গণেশ পাঁড়ের বাড়ীতে সে থাকবে কেন? আমার ঠাকুর আবার আমার কাছেই চলে এলো।

নবীন বললে, সে তো আমিই তোমাকে আনতে বলেছিলাম।

চণ্ডী ভট্‌চাজ বললে, তুমি তো বলেছিলে—শ্যামচাঁদের পুজো করবো আমি আর গণেশ পাঁড়ে পাঁচ বিঘে জমির ফসল নেবে অমনি ফোকোটিয়া। আমি বলেছিলাম সেটি হচ্ছে না বাবা। জমি ভোগ করতে হলে পুজো তোমাকে করতেই হবে। তারপর তো বাটোর জেল হয়ে গেল। তখন থেকে শ্যামচাঁদকে আর পাঠাইনি। আচ্ছা তুমিই বল—পাঠানো কি উচিত? জেলখানায় ছত্রিশ জাতের হাতে ভাত খেয়ে আর জাতজন্ম থাকে কিছু? আমাকেই পুজো করতে হচ্ছিল। পুজো করবার সময় রোজই বলতাম শ্যামচাঁদকে—তোমার জমি খাচ্ছে গণেশ পাঁড়ে আর পুজো করছি আমি—এটা কি ভাল হচ্ছে? বাস্, শ্যামচাঁদ ব্যবস্থা করে দিলে। গণেশ পাঁড়ে এলো আমার কাছে। এসে বললে, শ্যামচাঁদের জমি তুমি ফিরে নাও ভট্‌চাজ। ঠাকুরকে আমি যে টাকা দিয়েছিলাম সেই টাকাটা আমাকে ফিরে দাও। একশ' টাকা দিলাম। দিয়ে শ্যামচাঁদের জমি আবার লিখিয়ে নিলাম। আমার জমি আবার আমার কাছেই ফিরে এলো।

নবীন বললে, ওর এখন খুব টাকার দরকার। মামলার খরচ তো কম নয়।

চণ্ডী ভট্‌চাজ অত-সব জানে না। মামলা-মোকর্দমা কোনোদিন করেওনি। তার খরচ কত পড়ে তা সে জানেও না। সে তার নিজের শরীর নিয়েই ব্যস্ত। আজ দাঁতের ব্যথা, কাল গালে বেদনা।

কিন্তু তবে যে শুনলাম, তোমরা খরচ পাও!

নবীন বললে, সে-সব তুমি বুঝবে না।

আত্মসম্মানে আঘাত লাগলো চণ্ডী ভট্‌চাজের। বললে, আমি বুঝি না? আমি সব বুঝি। এই ছাখো না—গণেশকে একশ' টাকা দিলাম তো। টাকাটি মুঠে বেঁধে গণেশ বললে, আমাকে আবার মধনপুরের বাবুদের বাড়ীতে যেতে হবে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কেন? সে বললে—কিছু টাকা পাব সেখানে। জমি-জমা সব বেচে দিয়ে এ গাঁ ছেড়ে চলে যাব। সে কথা কেন বললে আমি কি আর বুঝতে পারিনি ভেবেছ? আমি সব বুঝতে পারি।

নবীন জিজ্ঞাসা করলে, কী বুঝতে পার?

গণেশ গাঁ ছেড়ে চলে যাব বলছে ওর বৌএর জন্যে।

নবীন একটু অবাক হয়ে গেল কথাটা শুনে।

বৌএর জন্যে? মানে—চৈতনের মায়ের জন্যে?

চণ্ডী ভট্‌চাজ বললে, হাঁ। আমি সেদিন নিজের চোখে দেখে এলাম যে! ওই জমি বেচেকিনির ব্যাপারে দুদিন যেতে হয়েছিল তো ওর বাড়ীতে। একদিন গিয়ে দেখলাম ওর বৌএর কপালটা ফুলে উঠেছে, দর দর করে রক্ত গড়াচ্ছে। ভাবলাম বুঝি গণেশ ওকে মেরেছে। তারপর শুনলাম—না মারেনি। গণেশের বৌ গণেশের সঙ্গে ঝগড়া করে বুড়ো শিবতলার সেই পাথরটায় মাথা ঠুকেছে। বলছে, যেদিকে দুচোখ যায় সেইদিকে চলে যাব আমি।

নবীন জিজ্ঞাসা করলে, এই কথা বলছে ওর বৌ? তুমি শুনে এলে?

শুনলাম না! টুপিতে কানদুটো ঢাকা ছিল, শোনবার জন্যে টুপিটা খুলে ফেললাম তো! তবে আমাকে দেখে আর কিছু বললে না। কিন্তু আমি বুঝতে পেরেছি সব। এই ধরো না। তুমি যেরকম ওর পেছনে লেগেছ, গণেশের আর চৈতনের জেল হয়ে যাবে নিঘ্‌ঘাৎ। তখন? ওর বৌ তো একা থাকবে ওই বাড়ীতে। তুমি যদি তখন ওর বাড়ীতে আগুন ধরিয়ে ওকে পুড়িয়ে মেরে দাও? সেইজন্যে বলছে—চলে যাবে এ গাঁ ছেড়ে।

নবীন আর কোনও কথা বললে না।

চণ্ডী ভট্‌চাজ বললে, শ্যামচাঁদ আমাদের খুব জাগ্রত দেবতা। তুমি দেখে নিও, শ্যামচাঁদ ওকে ঠিক জেলে পাঠিয়ে দেবে। তুমি যখন ওই অত বড় একটা সাপকে ডেকে আনতে পেরেছ, তখনই আমি বুঝতে পেরেছি—শ্যামচাঁদ রেগেছে গণেশ পাড়ের ওপর। ওর আর রক্ষা নেই।

এই বলে সে উঠলো।

যাই। আমাকে আবার চান করতে হবে। ঠাকুর-দেবতা বাদ কি কম জ্বালা ভেবেছ? সকালে এক কাপ চা ছাড়া আর কিছু খাবার জো নেই। তার ওপর চান না করলে পুজো করা চলবে না। তা সে তোমার দাঁতের ব্যথাই হোক আর গালই ফুলুক।

চণ্ডী ভট্‌চাজ এই সব কথা বলতে বলতে চলে গিয়েছিল খানিকটা। আবার কি কথা মনে পড়তেই ফিরে এলো।

আচ্ছা নবীন, একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করি। যেরকম গম্ভীর হয়ে থাকো আজকাল, কোন কিছু জিজ্ঞাসা করতে ভয় করে। সায়েবকে দেখবার জন্যে আমি এসেছিলাম সেদিন। সায়েব আমার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে হাসছিল কেন হে?

নবীন বললে, আমাকে জিজ্ঞাসা করছিল—কে এ লোকটি?

ভট্‌চাজ বললে, কি বললে তুমি?

বললাম, আমাদের গ্রামের এক ভদ্রলোক।

বললে না কেন—আমাদের সারা গ্রামের 'প্রিষ্ট'—মানে ধর্মগুরু।

ঠোঁটটা চেপে একটু হাসলো নবীন। বললে, বলতে ভুলে গেলাম। এবার যেদিন আসবে সেইদিন বলে দেবো।

হ্যাঁ বোলো। বলবে, হি ডজ্ পুজো অভ্ হিজ্ হাউস্-গড্ অ্যাণ্ড্ ওয়র্শিপ্ এণ্ড ইভ্‌নিং। পুজোর ইংরেজি কি?

নবীন বললে, ওয়ারশিপ্।

চণ্ডী ভট্‌চাজ গ্রামের মাইনর স্কুলের ফার্স্ট ক্লাস পর্যন্ত পড়েছিল। তার ধারণা ইংরেজি সে বেশ ভালই জানে। বললে, যাঃ, ওয়ার মানে তো যুদ্ধ, আর শিপ্ মানে জাহাজ। ওয়ারশিপ মানে তো যুদ্ধজাহাজ। আমাকে ভুল ইংরেজি শিখিয়ে দিচ্ছ? কাজ নেই বাবা, আমার সঙ্গে পরিচয় করে দিও। আমি নিজেই বলবো।

এই বলে সে চলে গেল।

চণ্ডী যেতে না যেতেই এসে দাঁড়ালো কেনারাম মুখুজ্যে। আজকাল অনেকেই একবার করে আসে নবীনের কাছে।

সাপ মারতে গিয়ে শিবের গায়ে লাঠি চালানো! তা ভাগ্যিস তুমি ছিলে বাবা, তাই ব্যাটা জব্দ হয়ে গেল। আজকাল আর ট্যাঁকো করছে না গবেশ পাঁড়ে। একদম ঠাণ্ডা।

নবীন কোনও কথা বললে না।

কেনারাম কি বলবে কিছু বুঝতে পারছিল না। চোখ দুটি মিট্ মিট্ করতে করতে বললে, গাঁয়ের এত উপকার যখন করছো, তখন আর একটি উপকার তোমাকে করতে হবে বাবাজি।

নবীন জিজ্ঞাসা করলে, কী করতে হবে?

কেনারাম বললে, এই যে বসন্তর টিকে দিতে আসছে রোজ রোজ, বলছে—ছেলেবুড়ো সবাইকে টিকে নিতে হবে। যত বলছি—ভাখো আমরা বাংলাটিকে নিয়েছি একবার ছেলেবেলায়, আর নিতে হবে না। কিছুতেই শোনে না। বলছে—প্রতিবছর নিতে হবে। ছেলেমেয়েগুলোর কিরকম শান্তি বল দেখি? ঘরের ভেতর লুকিয়ে বসে আছে, বেরুতে পারছে না। কিরকম জুলুম বল তো? এইটি তুমি বন্ধ করে দাও বাবাজি।

নবীন বললে, বন্ধ করবো কী বলছো? আমিই তো দেখাদেখি করে আনিয়েছি ওদের।

তুমি আনিয়েছ?

হ্যাঁ, ওরা দু'জন তো আমাদের বাড়ীতেই রয়েছে। সমস্ত গ্রামের লোককে টিকে দিয়ে তারপর যাবে।

সবাইকে নিতে হবে টিকে ?

নিশ্চয় নিতে হবে। গত বছর কি হয়েছিল মনে নেই ? আমাদের গ্রামে মরেছে পঁচিশ জন। পিয়ারহুটিতে মরেছে তেরো জন, বিনু গয়লানী তো অন্ধ হয়ে গেল। এগুলো মনে থাকে না কেন ?

কেনারাম বললে, টিকে নিলে আর হবে না ?

না।

কিন্তু টিকেগুলো কি দিয়ে তৈরি হয় জানো তো ? গরুর গায়ে বসন্ত থেকে তৈরি ওই টিকে, আমরা হিন্দু ব্রাহ্মণ—আমাদের রক্তে মেশাতে হবে ?

নবীন বললে, ও সব ভাবছো কেন ?

কেনারাম বললে, ইংরেজ রাজা হয়েছে বলে কি—তুমি বুঝছো না নবীন, এমনি চালাকি করে ওরা আমাদের জাত মেরে দেবে। সব খিরিস্তান করে নেবার মতলব।

নবীনের আর কথা বলতে ইচ্ছে করছিল না কেনারামের সঙ্গে। এমনি সব। অধিকাংশ গ্রামের মানুষ এমনি কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হয়ে আছে। কেনারামের এ থেকে মুক্তি নেই। কিন্তু ছেলেমেয়েগুলোকে মানুষ করতেই হবে। ইস্কুলটিকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য তাই তার এত আপ্রাণ চেষ্টা।

নবীন বললে, তুমি টিকে যদি না নিতে চাও নিও না। কিন্তু ছেলেমেয়েগুলোকে মেরো না। আমি নিজে বাড়ী বাড়ী ঘুরে প্রত্যেককে টিকে নেওয়াবো।

কেনারাম বললে, অমন কাজটি কোরো না বাবাজি, তোমার এই বিপদের সময় সব সাক্ষী বিগড়ে যাবে।

নবীন বললে, যাক্। সে আমার সহ্য হবে, কিন্তু বসন্ত কলেরা মহামারীতে গ্রামকে গ্রাম উজাড় হয়ে যাবে—সেটা আমি সহ্য করতে পারবো না।

কেনারাম বললে, তোমরা দেখছি—ঠাকুরদেবতাতেও বিশ্বাস করছো না আজকাল। শেতলার পুজোটি কর দেখি ভাল করে—টিকে দিকে কিছু নিতে হবে না—এই আমি বলে রাখছি দেখো।

নবীন বললে, শীতলার পুজো করতে হলে চাঁদা দিতে হবে, কিন্তু টিকে নিতে হলে কিছু দিতে হবে না।

কেনারাম বললে, দেবো চাঁদা।

বৈশাখ মাস।

বৈশাখ মাসকে গ্রামের লোকেরা বলে—ব্রাহ্মণ মাস।

গ্রামের ছেলে ছোকরার দল খোল করতাল বাজিয়ে হরিনাম সংকীর্তন করতে করতে প্রতিদিন সন্ধ্যায় গ্রামের পথে পথে ঘুরে বেড়ায়। নেচে গেয়ে গ্রামটাকে একেবারে মাতিয়ে তোলে।

অঘোর ঘোষালের বাড়ীর ভেতর ঢুকলেই দেখা যায়—তার ঘরের দেয়ালে দেয়ালের গায়ে টাঙানো একটি খোল ঝুলছে। রঙিন একটি কাপড় সেলাই করে তার একটি খাপা তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। সারা বছরের পর এই সময় ধুলো ঝেড়ে খোলটিকে বাবাবো হয়।

কিন্তু সে বছর আর নামানো হলো না।

মনু বৈষ্ণবী গিয়েছিল তাকে সংকীর্তনের কথা বলতে।

অঘোর বলে, আমি তাঁতির ছেলে, বিছানার চাদর আর গামছার মোট নিয়ে গাঁয়ে গাঁয়ে বিক্রি করে আসতাম। বৈষ্টম একদিন লাঠি দেখিয়ে তিনটে গামছা নিয়ে কেড়ে। সেইদিন থেকে রাত-বিরেতে কোথাও যাওয়া-আসা বন্ধ করেছি ভাই।

খঞ্জনীদার রাখু বোরেগী বলে, না দাদা, গণেশের জোর দিয়ে যাব না।

বেনোয়ারী ওস্তাদ মাসাধিক কাল তার মাসীর বাড়ী গিয়ে বসে আছে। গ্রামের লোক জানে সে যাত্রার দলে বেহালা বাজিয়ে বাজিয়ে খুব বেড়াচ্ছে।

পাড়ে-পাড়ায় পাশে—ধরতে গেলে গণেশ পাড়ের একেবারে জোরের কাছে—প্রকাণ্ড একটি পুরনো অশথ গাছের নীচে বুড়ো শিবের আস্তানা। সবাই বলে পাথরের এই শিবঠাকুরটিকে কেউ কোনোদিন প্রতিষ্ঠা করেনি। মন্দিরের কোনও চিহ্ন সেখানে নেই। প্রকাণ্ড এই শিবলিঙ্গটি পাতাল থেকে মাটি ভেদ করে আপনা থেকেই ওই জায়গায় উঠেছে—এইটিই নাকি জনশ্রুতি। আপাততঃ কলী-মনসার দুর্ভেদ্য বেষ্টনীর মাঝখানে তিনি নিরাপদে বিরাজ করছেন।

বৈশাখের শেষ দিনে অতি প্রত্যূষে সূর্যোদয়ের আগে স্নান করে গ্রামের ছেলে বুড়ো সবাইকেই এক ঘটি করে জল এই বুড়োশিবের মাথায় ঢালতে হয়। আবহমানকাল ধরে এই নিয়ম চলে আসছে। বুড়ো বাবার মাথায় জল ঢেলে তাকে ঠাণ্ডা না করলে সে বৎসর নাকি বর্ষা ভাল হয় না, মাঠের মাটি ফেটে চৌচির হয়ে যায় এবং দেশে দুর্ভিক্ষ অনিবার্য হয়ে ওঠে।—

বৈশাখের সংক্রান্তির আর মাত্র চার-পাঁচ দিন বাকি। এপাড়া ওপাড়া থেকে লোকজন আসতে লাগলো নবীনের কাছে।

এ বছর কি হবে বল তো? গণেশ পাড়ের জোরের সামনেই বুড়ো শিবের আস্তানা। ব্যাটা তো ক্ষ্যাপা কুকুর হয়ে আছে। হাতের কাছে আমাদের পেলে যদি হাঙ্গামা করে। তাই এলাম তোমার কাছে একটা পরামর্শ করতে।

নবীন বললে, আমি কি বলবো?

হাতে একটি জলের ঘটি নিয়ে যেতে যে ভয় করছে।

নবীন বললে, যেয়ো না।

যদি বৃষ্টি না নামে! যদি দুর্ভিক্ষ হয়!

নবীন বললে, হয়—হবে।

আর মুখুটি এসেছিল নবীনকে জিজ্ঞাসা করতে। তার এই জবাব শুনে বললে, তোমার কি বাবা, টাকা পয়সা আছে, ধান-চালের গরাই রয়েছে বাড়ীতে বাঁধা। একবছর কেন, দশ বছর যদি অনাবৃষ্টি হয় তোমার কোনও ক্ষতি নেই। মরতে মরবো আমরা। তার চেয়ে আমি বলি কি—গাঁয়ে একটি চোল সহরৎ করে দাও, তিরিশ চল্লিশ জন করে এক এক দলে যাই আমরা—বাবার মাথায় জল দিয়ে আসি। একসঙ্গে অনেকগুলো লোক দেখলে হাঙ্গামা করতে সাহস পাবে না।

কে একজন বললে, লাঠি নিয়ে বেরিয়ে এসে হাঙ্গামা তো করবে না। ওর ছেলেটা তারি বজ্জাত। সেই চড়ুনা হয়ত আড়াল থেকে ঢিল ছুঁড়ে মেরে মাথায়।

ঠিক এই সময় হাবু রায় এসে দাঁড়ালো সেইখানে। তার হাতে একটি মস্ত বড় কাগজ। বললে, আমি তার ব্যবস্থা করেছি।

কি ব্যবস্থা করেছ ?

হাবু বললে, এস্-ডি-ও'র নামে একটি দরখাস্ত লিখে এনেছি। এতে গ্রামের ষোলো আনার সই চাই।

কি দরখাস্ত লিখেছ শুনি।

হাবু পড়ে শোনালো—

মহামান্য এস-ডি-ও মহোদয়, সমীপেষু -

আগামী বৈশাখের সংক্রান্তির দিন আমাদের গ্রামে একটি চিরাচরিত প্রথা আছে। প্রথা না বলিয়া ইহাকে উৎসব বলিলেও চলে। এই উৎসবটি আমাদের ঊর্দ্ধতন চতুর্দ্দশ পুরুষের অনুষ্ঠিত। গণেশ পাঁড়ে ও তাহার পুত্র চৈতন—যাহাদের নামে আদালতে মামলা চলিতেছে—তাহারা আমাদের এই ধর্ম্মীয় অনুষ্ঠানটিকে পণ্ড করিয়া দিবার আয়োজন করিয়াছে। তাহাদেরই বাড়ীর সম্মুখে আমাদের এই উৎসবের স্থান। ঢেঁড়োশিবতলা। কাজেই এই অশান্তি উপদ্রবের আশঙ্কায় আমরা হুজুরের নিকট প্রার্থনা করিতেছি—হুজুর উক্ত দিবসে যদি কয়েকজন সশস্ত্র পুলিশ কর্ম্মচারী দিয়া গ্রামের দরিদ্র প্রজাবৃন্দকে সাহায্য না করেন, তাহা হইলে সমূহ বিপদের সম্ভাবনা। নিবেদন ইতি।—

নবীন প্রথমেই সহি করে দিলে।

সহি করতে কারও আর আপত্তি হইলো না। অনেকগুলি সহি করিয়ে নিয়ে দরখাস্তটি হাবু রায় নিজে গিয়ে এলো এস-ডি-ওর কাছে।

এবং তার ফল হলো এই যে, সে বৎসর বৈশাখ-সংক্রান্তির এই ধর্ম্মীয় অনুষ্ঠানটি পাঁচজন কনেষ্টবলের পাহারাধীনে নির্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হয়ে গেল।

খবর নিয়ে জানা গেল—গণেশ পাঁড়ে তিনদিন আগে টাকার সন্ধানে কোথায় যেন গেছে। এখনও বাড়ী ফেরেনি। তার ছেলে চৈতন তখন তাদের গোয়ালে বসে মনের আনন্দে গরুর জন্য ছানি কাটছিল।

বুড়ো শিবের মাথায় জল ঢালা হলো অনেক। কলী মনসার কাঁটা ঝোপের বাড়বাড়ন্ত হবে খুব।

বাবার মাথা ঠাণ্ডা হলো, কিন্তু ধরিত্রীর মৃত্তিকার ঠাণ্ডা হবার কোনও লক্ষণই দেখা গেল না।

যে সময়ে বর্ষা নামলে চাষ-আবাদ ভাল হয় সে সময় বর্ষা নামলো না। আকাশে মেঘ উঠলো, কিন্তু বৃষ্টি হলো না।

বর্ষা নামলো নিতান্ত অসময়ে। মনে হলো যেন অসহায় মানুষের সঙ্গে প্রকৃতি রসিকতা করছে। মাঠের সমুদ্র ধানের গাছ তখন শুকিয়ে হলুদ হয়ে গেছে। সারা গ্রামের অকর্ম্মণ্য মানুষগুলো তখন নেশায় বুঁদ হয়ে ঝিমোচ্ছে আর বলছে—এ-সব হলো শুধু গণেশ পাঁড়ের পাপে।

চাষ হলো না, ফসল হলো না, কিন্তু মামলাগুলো ঠিকই চলতে লাগলো।

গড়াতে গড়াতে বর্ষা গেরিয়ে শরৎ এলো।

সামনে পুজো।

গণেশ পাঁড়েকে সর্বস্বান্ত করে দিয়ে ছোটোখাটো মামলাগুলোর নিষ্পত্তি হলো এতদিন পরে।

গ্রামের তিনটি দুর্গা-প্রতিমার তখন মাটি পড়েছে।

সীতাপতিবাবুর হাতছাড়া মোকর্দ্দমাটার এজাহার জবানবন্দী প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, দু'পাঁচ-দিনের ভেতর যাহোক্ একটা কিছু হুকুম হয়ে যাবে, এমন সময় গণেশ পাঁড়ে একটা ভারি মজার ব্যাপার করে বসলো।

হাতে টাকা নেই অথচ বড় ঘরের একজন উকিল দিতে না পারলে বিশেষ সুবিধা হবে বলে মনে হয় না। বড় আদালতে গণেশ এই বলে এক আর্জি পেশ করলে যে থানার পুলিশ-কনেষ্টবল থেকে আরম্ভ করে সাবডিভিজনের বিচারক পর্য্যন্ত জমিদারের কাছে অপর্য্যাপ্ত ঘুষ খেয়েছে, তাতেই অন্যত্র বিচার না হলে তার পক্ষে সুবিচারের কোনও আশা-ভরসা নেই।

মোকর্দ্দমা দায়রা সোপরদ্দ হয়ে গেল।

দায়রায় তখন একটা ডাকাতি-মামলার বিচার চলছে। গণেশ পাঁড়ে কয়েকটা দিন সময় পেলে।

বিচারে কি হয় কিছু বলা যায় না। গণেশ আর চৈতনের জেল হয়ে যাওয়া বিচিত্র নয়। বাপ আর ছেলে দু'জনেই যদি জেলে চলে যায়—চৈতনের মার হাতে কিছু টাকা দিয়ে যাওয়া দরকার।

ধীরেন ভট্চাজের মরণ আমচারের দেবসেবার পাশা সমেত যে পাঁচ বিঘে জমি চণ্ডী ভট্চাজকে গণেশ সেদিন নগদ একশ' টাকায় বিক্রি করেছে, সেই জমিটাই মদনপুরের তারিণী মুখুজ্যের কাছে গণেশ বিক্রি করে এলো চারশো টাকায়।

এখন আর অত-সব ভাবতে গেলে চলে না।

দায়রায় ডুরির বিচার শেষ হয়ে গেল পুজোর ঠিক আগেই।

জমিদার সাধারণতঃ অত্যাচারী হয়ে থাকে। এ যেন স্বতঃসিদ্ধ সত্য। সুতরাং সীতাপতিবাবুই বা তার ব্যতিক্রম হবেন কেমন করে? মামলাটি আগাগোড়া জমিদারের সাজানো। গ্রামের নিরীহ প্রজা গণেশ পাঁড়ে এবং তার পুত্র চৈতন পাঁড়ে সম্পূর্ণ নির্দোষ।

সুতরাং ডুরির বিচারে গণেশ আর চৈতন দু'জনেই বেকসুর খালাস পেয়ে গেল।

সেদিন আর তারা পায়ে হেঁটে গ্রামে ঢুকলো না।

শহর থেকে একটা ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া নিয়ে বাজনা বাজাতে বাজাতে নবীনদের বাড়ীর সুমুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল।

নবীন হেডমাষ্টারকে জিজ্ঞাসা করলে, এটা কি হলো? পুলিশ-সাহেব নিজে দেখে গেলেন—

মাষ্টার বললে, সাহেব এসেই আমাকে বলেছিল—Anything political?

বলেছিলাম, না স্যার রাজনীতির গন্ধও বারে না এরা। বৃটিশ থাকলো কি গেল কিছুই আসে যায় না এদের।

Then there must be wine.

না, স্যার, তাও না। মদ এদের দু'পক্ষের ভেতর কেউ খায় না।

Then woman.

না স্যার, মেয়েমানুষের নামগন্ধও নেই এখানে।

আমার জবাব শুনে সাহেব খুশী হননি। বাঁকা একটু হেসে বলেছিলেন, মিস্টিরিয়াস্ ইণ্ডিয়া।

মাষ্টার বললে, আমি তখনই বুঝেছিলাম—ইতিহাস নতুন এসেছেন তিনি। এখনও ইতিহাসকে চিনতে পারেন নি।

পুজো এলো।

প্রতি বছর যেমন আসে সে বছরও ঠিক তেমনি এলো—চাকঢোল বাজিয়ে।

দেখা গেল হরি কোবরেজ বসে বসে কাঁদছে। লোকজন দেখলেই বলছে, পিতিমে-পুজো এ বছর আর হলো না দাদা। বউ-পুজোই হোক। পয়সাকড়ির খুব টানাটানি।

বঙ্কিমানন্দ বেশ আনন্দেই আছে। চোরাই গাঁজার কারবার তার ভালই চলছে। নেশায় বুঁদ হয়ে বলছে, ও-বেটির পুজো না করাই উচিত। শুধু ওই স্বামী বেটাই হচ্ছে—বাবার বাবা ভক্ত বাবা!

কপিল চক্কোত্তির আনন্দ আর ধরে না! কঞ্চি কেটে কেটে ঝাড়গুলোকে একেবারে নির্মূল করে ফেললে। হাতে একটি আর বগলে গোটাকতক বাঁশের ছড়ি নিয়ে দুর্গা প্রতিমার কাছে গিয়ে দাঁড়ায় আর বলে, এই কার্তিক, এই গণেশ, ইস্কুলের ছুটি হয়ে গেল। ভাল করে পড়া তৈরি করবি। না পড়লেই কেলাবাম হয়ে যাবি। নেশা ভাং খাবি আর ঘ্যোম্ ঘ্যোম্ করে ঘুরে বেড়াবি।

যেসে কোঁদে পুজো শেষ হয়ে গেল। এলো বিজয়া দশমি।

প্রতিমা বিসর্জন কখন হয়ে গেছে এ বছর নবীন তার খোঁজও রাখেনি।

বিসর্জনের পর গ্রামের লোক বাড়ী বাড়ী প্রণাম করতে বের হয়।

গ্রামের পূর্বপ্রান্তে তাল-তেঁতুলের ছোট একটি বাগানের ভেতর বহু প্রাচীন জরাজীর্ণ একটি মন্দিরে গ্রামের অধিষ্ঠাত্রী দেবী রক্তিণীকে আগাতে হয় প্রথম প্রণাম।

সেখানে যাবার জন্যই বোধকরি নবীন উঠলো। সিদ্ধির নেশায় মাথাটা তখন তার ঘুরছে।

আকাশে চাঁদ উঠেছিল। দশমীর চাঁদ।

গ্রামের পথে গোকুল চাটুজ্যের সঙ্গে দেখা। রোগা কঙ্কালসার মানুষটি দূরের গ্রামে ছোট একটি পাঠশালা করে চালায়।

গোকুল বললে, এসো ভায়া, কোলাকুলি করি।

নবীন তার হাত দুটি বাড়িয়ে তার সেই শীর্ণ দেহটিকে সাগ্রহে বুকে জড়িয়ে ধরলে।

বিজয়ার প্রণাম করে আর সুখ নেই ভায়া। মেঠাই-সন্দেশ খাওয়াতে হবে বলে জোরে সব খিল বন্ধ করে দিয়েছে। সতীশের কিছু নেই তবু দেখলাম সতীশের দোরটাই খোলা। হো হো করে হাসতে হাসতে বললে, অন্য বাড়ীতে খেয়ে দেয়ে এসে আমার বাড়ীতে শুধু জল খাবে। আমার কিছু নেই। বলেই সে আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলে। দেখলাম সতীশের চোখে জল। বুকটা কিন্তু জুড়িয়ে গেল ভাই। চলি এবার তোমাদের বাড়ীতে যাই।

গোকুল চলে গেল।

পথে আর কারও কোনও সাড়াশব্দ নেই।

কোথায় সে আনন্দকলরব মুখরিত গ্রাম? মনে হয় যেন প্রেতপুরী। ঘরে ঘরে খিল পড়েছে।

পথের দুপাশে আগাছার জঙ্গল। যেখানে-সেখানে কণী-মনসার ঝোপ। ভাঙা প্রাচীর-ঘেরা পোড়ো বাড়ীগুলো খাঁ খাঁ করছে।

ছায়া-ছায়া জ্যোৎস্নার আলোয় মনে হলো সর্পেশ পাঁড়ের বাড়ী থেকে কারা যেন বেরিয়ে আসছে। বলছে—ঘাটায় আছে কী যে খাওয়াবে!

দূর থেকে তাদের দু'জনকে চিনতে পেরে নবীন চমকে উঠলো।

রাখহরি আর হরেকেষ্ট।

নবীনকে বোধহয় তারা দেখতে পেয়েছিল। নইলে কামারদের গোয়াল-ঘরের আড়ালে আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে সরে পড়লো কেন?

নবীন ফিরলো। রক্ষিণীর মন্দিরে তার আর যাওয়া হলো না। মাথাটা কেমন যেন ঝিম্ ঝিম্ করছে।

ইস্কুলের হেড-পণ্ডিতের বাড়ী বাঁকড়ো জেলার কোন্ একটা গ্রামে। পূজোর ছুটিতে তিনি বাড়ী গেছেন। তাঁরই সেই ঘরখানি খুলে নবীন ভেতরে গিয়ে বসলো।

খোলা জানলার পথে চমৎকার জ্যোৎস্নার আলো এসেছে।

বাউরি পাড়ায় মাদল বাজছে। হরি কোদ্রেকের বাড়ী থেকে হারমোনিয়ামের কি যেন ছেঁচার আওয়াজ আসছে।

কার্তিক মাস পড়ে গেছে। আকাশ-প্রদীপ দেবার সময়। হিজি-বুড়ীর উঠোনে প্রকাণ্ড একটা বাঁশের মাথায় ছোট্ট একটি আকাশ-প্রদীপ ঝুলছে।

নবীন সেই প্রদীপটির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো। হিমেল্ হাওয়ায় চোখ দুটো তার বন্ধ হয়ে আসছে।

মনে হলো প্রদীপটা যেন ধপ্ করে জ্বলে উঠলো।

সিন্ধির নেশায় ঘোরে ভুল দেখছে কি না কে জানে।

আকাশ-প্রদীপের রঙিন কাগজের আবরণটা পুড়ে গেল। বাঁশের মাথাটাও জ্বলছে যেন!

সেদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিলে নবীন।

সুমুখে বইএর আলমারি। আলমারির মাথার ওপর একটা গ্লোব।

এই গ্লোবটি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ইস্কুলের ছেলেদের সে অনেকবার বুঝিয়েছে—ইওরোপ, আমেরিকা, এসিয়া—আর এই আমাদের ভারতবর্ষ!

তাদের এই ছোট্ট গ্রামখানি নবীন খুঁজতে লাগলো। গ্লোবটা যেন ঘুরছে। সমস্ত দেশ, মহাদেশ, গ্রাম, নগর—মিলেমিশে সব একাকার হয়ে গেল। সমস্ত সীমারেখা ঘুচে গেল। বিভেদ-বিভিন্নতা চলে গেল। সারা পৃথিবীর মানুষ এক হয়ে গেল। এক জাতি। এক প্রাণ। সমাজ-ধর্ম-সভ্যতা বাঁধা পড়লো প্রেমের বাঁধনে। স্বর্গের সুষমা নেমে এলো মাটির পৃথিবীতে।

নাঃ, সব ভুল। নবীনের নেশা হয়েছে প্রচুর।

ওই তো আগুন লেগে গেল বইএর আলমারিতে। বইগুলো পুড়ছে। সেই আগুন গিয়ে লাগলো গ্লোবে।

গ্লোবটা পুড়ছে।

পুড়ুক। আর-একটা নতুন গ্লোব এনে দেবো।

নবীন আর সোজা হয়ে বসে থাকতে পারছে না। চোখের দৃষ্টিতে মাথাটা কাৎ করতেই দেখলে—চোখের কাছে একটি মেয়ে এসে দাঁড়িয়েছে। বেদনার্ত মুখচ্ছবি। মহিমময়ী মাতৃমূর্তি!

কে?

নবীন উঠে দাঁড়ালো। ঘুম দেখছে না তো?

দেখলে—সতীশ পাঁড়ের স্ত্রী—মহামায়া!

তারই পায়ের কাছে মাথা নুইয়ে নবীন একটি প্রণাম করলে। বিজয়া-দশমীর প্রথম প্রণাম।

মাথাটি তার বুকের ওপর টেনে নিয়ে মহামায়া থর থর করে কাঁপতে লাগলো। ঠোঁট দুটি নড়লো, কিন্তু মুখে কোনও কথা বলতে পারলে না। চোখ দিয়ে দর দর করে নেমে এলো অশ্রুর ধারা।

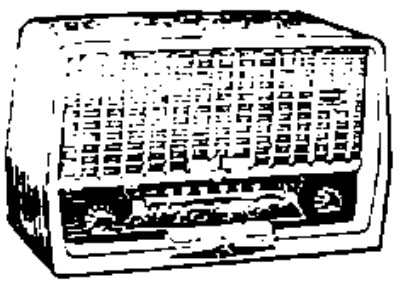

আর: এ—১০১
এ.সি. ও এ.সি./ডি.সি. ৬ ভাল্‌ব
৩ ওয়েভ ব্যাণ্ড।
মূল্য—২১০৲ ও স্থানীয় কর।

SIEMENS
INDIA
সিমেন্সের
রেডিও

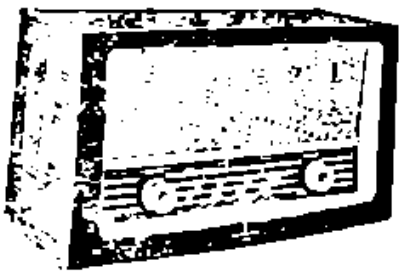

৬৯১ ডব্লিউ ও
এ.সি. ও এ.সি./ডি.সি. ৬ ভাল্‌ব
৪ ওয়েভ ব্যাণ্ড।
মূল্য—৪৭০৲ ও স্থানীয় কর।

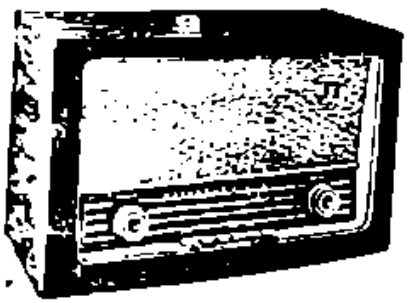

৬৯১ ডব্লিউ ও
এ.সি. ও এ.সি./ডি.সি. ৬ ভাল্‌ব
৪ ওয়েভ ব্যাণ্ড।
মূল্য—৪১৫৲ ও স্থানীয় কর।

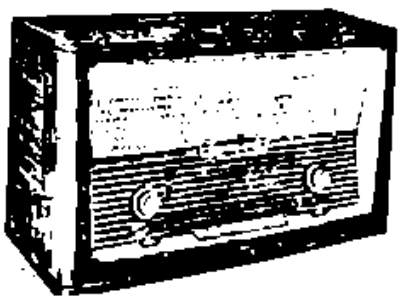

৭৯০ ডব্লিউ (এ.সি.)
৭ ভাল্‌ব, ৬ ওয়েভ ব্যাণ্ড,
৮+৫ পুশ বাটন, ৫ লাউড স্পীকার।
মূল্য—১৯০'৩০ ও স্থানীয় কর।

নিকটবর্তী অনুমোদিত ডিলারের নিকট অনুসন্ধান করুন।
পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম ও আন্দামানের পরিবেশক:
নান এণ্ড কোং ৯এ, ডালহৌসি স্কোয়ার,
৩২বি, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা

রং বদলায়

আশীন গুপ্ত

এমন করে হাঁটছিলেন যে মনে হল দু' পায়েই ফোস্কা পড়েছে, নয়তো হয়েছে কড়া। জুতো দুপাটি খুলে নিয়ে বগলদাবা করবেন বোধ হয় এখুনি, তারপর ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে করবেন রাস্তা অতিক্রম। কিন্তু একটু লক্ষ্য করেই মনে হল যেন চেনা-চেনা। ট্রেজারি বিল্ডিংসের কোণটাতে অপেক্ষা করলাম। হঠাৎ প্রৌঢ় ভদ্রলোক রাস্তার মাঝখানে থমকে গেলেন। মিলিটারী কায়দায় পায়ে-পা ঠুকে সোজা হয়ে বুক চিতিয়ে ডান হাত উল্টো করে তর্জনী ও মধ্যমা কপালে ঠেকিয়ে স্যালুট করলেন। তাঁর পিছনে দণ্ডায়মানা একটি তন্বী কিশোরী।

অবাক হলাম। একটু চিন্তিতও হলাম হয়তো। এ আবার কী ব্যাপার!—সামনে অগ্রসর হয়ে দেখি আমাদের গ্রামের কীর্তনসাগর নিরঞ্জনদা। পিছনে দাঁড়িয়ে তাঁর তন্বী মেয়ে কোকিলকণ্ঠী সাধনা, পিতার যোগ্য শিষ্যা।

দাদা তখনও অ্যাটেনশন ও স্যালুটের ভঙ্গীতে নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে, সৈন্যবাহিনীর উপযুক্ত ভাবলেশহীন মুখে। দেখেশুনে আমি তো স্তম্ভিত। তবুও কোনরকমে বললাম, "এ আবার কি খেল্ নিরঞ্জনদা?"

কপাল থেকে হাত নামিয়ে সহজ হয়ে বললেন, "ইমার্জেন্সির জন্যে আজ সকালেই এটা শিখেছি।"

"সেকি! এই বয়সে?"

"চৈনিক শত্রু দ্বারে আগত। এখন আর বয়স-টয়স নেই ব্রাদার। প্যারেড করছি রোজ। দেখবে নাকি আমার এই বেপমান কলেবরের লেফ্‌ট্-রাইট, লেফ্‌ট্-রাইট?"

"না দরকার নেই। কিন্তু যুদ্ধে যাবার আগে দাঁতগুলোও তো সব ঘুইয়েছ দেখছি। ওগুলোও কি কাঁপা-শরীরের মতনই কাঁপছিল?"

"না। ওরা সব কাঁপবার opportunityই পায়নি। আগেই গিয়েছে। সে হল আমার বিয়ের সময়কার ব্যাপার। ছিল দুরন্ত পাইওরিয়া, রোজই দাঁত কনকন, কান কনকন। রাগ করে সব ফেলে। বাঁধিয়ে নিলাম দুপাটি দাঁত। ঝকঝক করতে লাগল আইভরির মত। নিখুঁতভাবে সাজানো, ওপর-নিচের দুপাটিই একেবারে সমান-সমান মেপানো।

"বিয়ে করতে গেলাম সেই দাঁত লাগিয়ে। স্ত্রী-আচারের সময় উপস্থিত মহিলাকুলকে বললাম, 'কিছু যদি না মনে করেন, এক বাটি জল চাই।'

'কেন?'

'দরকার আছে।'

'জল এল। ফস করে দুপাটি দাঁতই খুলে ফেললাম। জলের বাটিতে রাখলাম সে-দাঁত।

বললাম, নতুন বাঁধিয়েছি। এখনও ঠিক set করেনি। মাড়ি একেবারে ব্যথায় টনটন করছিল,—ঘুমেও গিয়েছে বোধ হয়।'

হেসে উঠল মেয়ের বৌদি ও বোনেরা। সে-হাসি আর থামে না!

'খুব তোদ্ উমা। তোর দাঁতের পাটিও জলে ভিজিয়ে রাখ। অনেকক্ষণ এক-নাগাড়ে পরে আছিস!'

'মেয়ে তো লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে গেল! তোর বৌদিরও ছেলেবেলা থেকে সাংঘাতিক পাইওরিয়া—তারও সব দাঁত বাঁধানো।'

হাসলেন বিরঞ্জনদা। পকেট থেকে একটা অ্যালিউমিনিয়ামের কৌটা বার করলেন।

"তা বলে দন্তহীন হয়ে রাস্তায় বেরিয়েছি সেকথা যেন মনে কোরো না। মুখে দাঁত নেই। কিন্তু পকেটে আছে।"

কৌটো খুলে দাঁত দেখালেন। নিমেষে তা লাগিয়ে ফেললেন মুখে। চেহারা গেল বদ্‌লে, বয়স গেল কমে দশ বছর। বললেন, এবার লেফ্‌ট্-রাইট করলে শব্দ আর আগের মত কাঁপ্‌বে না। দেখবি?"

"এখন থাক, আর একদিন না হয় হবে demonstrationটা।—কিন্তু খুব সময়ে দেখা হয়ে গেল। তোমার কাছেই বার-বার ভাবছিলাম।'

"খুব ভালো, খুব ভালো! আমার কথাও মাঝে মাঝে মনে হয় তাহলে?"

"হাঁ, হাঁ, খুব মনে হয় বিরঞ্জনদা।—আমাদের ক্লাবের বার্ষিক অধিবেশন এসে গিয়েছে তাতে তোমাকে গান গাইতে হবে। তোমার আর সাধনার কীর্তন একসঙ্গে। তোমাদের বাপ আর মেয়ের যুগ্ম কীর্তন একেবারে অপূর্ব!"

"বাঃ, সব সোনা হয়ে গেল!"

"সে আবার কি?"

"মিষ্টি জল সোনা হয়ে গেল!—ভাবনাটা তাহলে আমার জন্যে নয়। আমার গানের জন্যে। ক্লাবের অধিবেশনই হল তাহলে চিন্তার মূল।—বাঃ, মিষ্টি জল সোনা হয়ে গেল।"

হেসে ফেললাম, "না বিরঞ্জনদা, তোমার জন্যে ভাবনা আমাদের চিরদিনের।"

সাধনার কান বাঁচিয়ে গলা নামিয়ে বললাম, "সেই যে তুমি একবার কোন এক প্রস্ফুটিত কমলকলিকার সঙ্গে প্রাণ দেওয়া-নেওয়ার জন্যে বিবাগী হয়ে যেতে চেয়েছিলে, ওঃ সেদিন তোমার জন্যে যে কী ভাবনাটাই হয়েছিল। তোমার ওই পাকা গোঁফের তরুণ অবস্থায় একটা কাঁচা রেখাও ওঠেনি সেদিন, আর আমরা তো তখন একেবারেই কুঁচো চিংড়ি! ওঃ, সেই বয়সেই তুমি হৃদয় বিনিময়ের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করে গৃহত্যাগ করতে চেয়েছিলে, আর আমরা পাড়াসুদ্ধু ছেলের দল একেবারে কালশিটে মেরে গিয়েছিলাম তোমার জন্যে ভেবে ভেবে! সেই তো রসের সাগর তুমি, কীর্তনীয়া হয়েছ, তা ঠিকই করেছ। কিন্তু রোগটা সারল কিসে?"

"সারল বাবার একদিনের ধমকেই ঠ্যাঙানিতে। ওই রোগের ও-ই হল একমাত্র ওষুধ। কিন্তু ওসব কথা থাক। আমি আবার এখন হেডমাস্টার।"

আজ আর আমার চমকে ওঠার শেষ নেই। হেডমাস্টার? সেকি। বিরঞ্জনদা ছিলেন জমি ও বাড়ীর দালাল, তা থেকে একেবারে হেডমাস্টার!

"হাঁ, আমি এখন আবার হেডমাস্টার। প্রাইমারী ইস্কুলের। বুড়োবয়সে আর কি কাজই বা করব? তাই মাস্টারীই করছি। একাজই হল পৃথিবীতে সব চাইতে সোজা।"

আমি বাকরুদ্ধ। নিরঞ্জনদা ব্যাখ্যা করলেন।—"বছর কয়েক আগে এক মাস্টার মশাইকে জমি কিনিয়ে দিয়েছিলাম সস্তা দামে। তা ভদ্রলোকের কৃতজ্ঞতাবোধ আছে।—তিনিই দিলেন হেডমাস্টারী প্রাইমারী ইস্কুলের।—তা বেশ আছি। চল্লিশ বছর আগে কলেজ ছাড়বার পর থেকে আর লেখাপড়ার সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক রাখিনি। অথচ এখন নাকি আগামী যুগের মানুষ তৈরী করছি আমি। বোঝ কাণ্ডটা। জমি বিক্রী করতাম, বাড়ীর খদ্দের যোগাড় করতাম, তা থেকে একেবারে মানুষ তৈরী! —এ ছাড়া কীর্তন তো আছেই।"

"আর ইমার্জেন্সির জন্যে লেফ্‌ট্-রাইট, লেফ্‌ট্-রাইট?" মৃদু হেসে টিপ্পনী কাটলাম আমি।

"হাঁ, ওটা শরীর fit রাখবার জন্যে। যদি যুদ্ধে যেতে হয়, তাই।"

কথা কইতে কইতে প্রায় হেদোর স্ট্রীটের কোণে পৌঁছে গিয়েছিলাম, বললাম, "চল নিরঞ্জনদা, একটু চা-টা খেয়ে আসি। ভালো দোকান আছে বাঙ্কশাল স্ট্রীটের কাছাকাছি।"

খুশী হলেন নিরঞ্জনদা, "সাধু প্রস্তাব। যা খেয়ে চিবিয়ে খেয়ে ফেলব। দুপাটি দাঁতই লাগিয়ে নিয়েছি।"

খেতে খেতে বললাম, "তোমার হেডমাস্টারীর কথায় আমারও একটা কথা মনে পড়ে গেল। আমাদের ক্লাবে অনেক পণ্ডিত, বিদ্বান ও ধনী সভ্য আছেন। তাঁরা ঠিক করেছেন কলকাতার কাছাকাছি কোন জায়গায় একটি আদর্শ আবাসিক স্কুল খুলবেন। আবাসিক কলেজেরও বন্দোবস্ত করা হবে সেখানে, কিন্তু সেটা হয়তো দু'এক বছর পরে হবে। বিপুল তোড়জোড় আরম্ভ হয়ে গিয়েছে এরই মধ্যে। শ্যামনগরে পনেরো বিঘে জমি দেখা হয়েছে। শীঘ্রিরই বাড়ীঘর ইত্যাদির কাজ শুরু হবে। বিশেষজ্ঞদের পরামর্শে, অভিনব পদ্ধতিতে পরিকল্পনা প্রস্তুত হচ্ছে। দেশবিদেশের কোন স্কুলের কাছেই এ-স্কুল হার মানবে না।—সবচেয়ে জোর দেওয়া হবে তরুণ সমাজের চরিত্র গঠনের ওপর। তোমাকেও হয়তো আমাদের দরকার হবে গান শেখাবার জন্যে।"

একটু পরিহাসের লোভ ছাড়তে পারলাম না।—কথার শেষে জুড়ে দিলাম "আর তুমি তো already মানুষ তৈরীর পুণ্য কাজে লেগেই গিয়েছ, কাজেই আমাদের এ-ব্যাপারটা তোমার খুব সম্ভব খারাপ লাগবে না।"

হঠাৎ খুশীতে ঝলমলে হয়ে উঠল নিরঞ্জনদার চোখ মুখ। বললেন, "মেয়েটাকে নিয়ে এসেছিলাম রেডিয়ো স্টেশনে অডিশন-টেস্টের জন্যে, তাই তো তোর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। গলা আছে মেয়েটা।—তা তোদের কাজ তো সৎ কাজ। আমি তোদের সাহায্য করবার জন্যে এখন একজন লোক দিতে পারি যে খুশী মনে লক্ষ লক্ষ টাকা দেবে।"

বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলাম, "কে এমন শৌরী সেন, নিরঞ্জনদা?"

"তুই খুব ভালো করেই নাম জানিস তার। ব্যারিস্টার হেমেন রায়।"

"বলুন একনধিক কমিশনের চেয়ারম্যান? সেই পাঁড় মাতালটা?"

"চিনিস তাকে?"

"না। দূর থেকেই তাঁর অপরূপ খ্যাতি শুনেছি।"

"পরিচয় থাকলে বুঝতিস যে—। কিন্তু থাক, আগে গল্পটা বলে নিই।"

মনে হল নিরঞ্জনদা একটু ক্ষুণ্ণ হয়েছেন। সুতরাং অপেক্ষা করলাম তাঁর কাহিনীর জন্যে।

বললেন নিরঞ্জনদা, "কদিন আগে গিয়েছিলাম হেমেনের ওখানে। ওর সঙ্গে আমার দীর্ঘ-কালের পরিচয়, শুধু ওর সঙ্গে নয়, ওদের পরিবারের অনেকের সঙ্গেই। বছর কুড়ি আগে ওদের বাড়ী গিয়েছিলাম জমি বিক্রী উপলক্ষে, কদিন যাতায়াতেই কেমন যেন একটা অন্তরঙ্গতা হয়ে গেল। হেমেন তখন ব্যারিস্টারীতে এত পসার করেনি,—সবে জুনিয়ার হিসেবে যে তখন নাম করছে। সেই থেকেই পরিচয়। অনেক জমি ও বাড়ী বেচেছি ওদের পরিবারে। হেমেন আমাকে "দাদা" বলে ডাকে এবং গরীব বলে কোনদিন মুরুব্বিআনা করে পিঠ চাপড়াবার চেষ্টা করে না।—হেমেনের কাছে গিয়েছিলাম একটি ছেলের জন্যে একটা সুপারিশের দরকার ছিল তাই।

"ওর ঘুতকুত ভাই রবীন বলল, 'একটু সাবধানে কথাবার্তা বোলো দাদা। অনেক টাকা Sacrifice করছে পীড়াপীড়িতে পড়ে। মাসে পঁয়ত্রিশ হাজার টাকার disclosed income এর ওপরেই income-tax দিত। আর undisclosed income যে কত তা জানেন একমাত্র ভগবান। তার তুলনায় একনমিক কমিশনের ঘুটো পয়সা হল ওর বাবুর্চি, খানসামা, দরোয়ান, ড্রাইভারের মাইনে। কাজেই মেজাজ ঠিক ভালো থাকবার কথা নয়। তাই বলি দাদা, একটু সামলে চোলো:—আর তাছাড়া সন্ধ্যার সময় ও রং-এ থাকে। কথা বলবার জো নেই, সেলাই পাল্টীয় offer করবে। ও-রসের রসিক না হলে সন্ধ্যাবেলায় গিয়ে মজা নেই। কাজেই, সকালে যাওয়াই প্রশস্ত।'

তা সেদিন সকালবেলাতেই গেলাম। দেখলাম ভারী ব্যস্ত, অনেক লোকজন বসে রয়েছে। ব্যারিস্টারীর কাজকর্ম গোটাচ্ছে।—সরকারী কাজের দায়িত্ব নিয়েছে, অতএব ব্যারিস্টারী ছাড়তে হবে। বলল, 'বিকেলে এসো, এখন কথা কইবার সময় নেই'।

বিকেলেই গেলাম। যা শুনেছিলাম তাই। প্রচুর টেনেছে, কিন্তু তবুও জান আছে টনটনে।

একটু অমৃতের স্বাদ নেবে নাকি দাদা?

হাতজোড় করলাম, 'বড় ভাইকে আর ডুবিয়ো না ভাদার'।

'আরে যাও, যাও,—জীবনটাই তোমার বাজে গেল।' বলেই টেবিলের ওপর থেকে একটা বোতল তুলে নিয়ে একেবারে গলার ভেতরে ঢেলে দিল। পাঁচ সেকেণ্ডেই বোতল খালি!

এমনতর মদ্যপান এর আগে আর দেখিনি। চোঁক গিললাম। কথা ঘোরবার জন্যে বললাম, 'অনেক টাকা sacrifice করলে হেমেন'।

'কি? একনমিক কমিশনের দায়িত্ব নিয়ে'?

'হাঁ। কী আয়টাই ছাড়লে! এখানে আর কটা টাকাই বা পাবে'?

ও কুঁচকে প্রশ্ন করল, 'কত আমার income ছিল ব্যারিস্টারীতে বল দেখিনি'।

'সে আমি কি করে বলব?

'Just guess.'

'Guessই বা করব কেমন করে'?

'Monthly পঁয়ত্রিশ হাজার টাকার basisএ income-tax দিয়েছি। এটা হল প্রকাশ্যে।

আর—' অর্থপূর্ণভাবে চোখ টিপল।—আমার একটা বোতল এক নিশ্বাসে শেষ হল। সোডা-টোডার কোন দরকার হয় না ওর।"

" 'একে চেন' ?—কথাগুলো অড়ানো কিন্তু বুঝতে কষ্ট হয় না। ঘরের কোণে আয়ামকেদারায় পুস্তক পাঠনিরত এক পাকা মাথা ভদ্রলোকের দিকে তার হাতের বুড়ো আঙুল উল্টো করে দেখাল। ভদ্রলোক বই বন্ধ করে তাকালেন আমার দিকে।—আমি বললাম, কি করে চিনব? পরিচয় করিয়ে দাওনি তো'।"

"আবার একটা বোতল চালান হল। পরিচয় করিয়ে দিল এতক্ষণে, 'My father-in-law and class-mate!

"আমার দিকে বুড়ো আঙুল ঘুরিয়ে বলল, 'My elder brother Niranjan Dutt.'

"Father-in-law and class-mate! বলে কি রে বাবা!—পঞ্চকেশ ভদ্রলোক তো একেবারে অপ্রস্তুত। বলল হেমেন, 'অবাক লাগছে? পরে বলব, দিনের বেলা বলব। বুঝবে তখন সত্যি কিনা।'

"তখন ভেবেছিলাম মাতাল বুঝি বা প্রলাপ বকছে,—পরে জেনেছিলাম কথাটা সত্য। একটু বেশী বয়সে বিয়ে করেছিল হেমেন, স্ত্রীর সঙ্গে বয়সের তফাৎটাও প্রায় তেইশ-চব্বিশ বছর। মহাদেব চাটুয্যে হেমেনের সঙ্গে পড়তেন সেণ্ট জেভিয়ার্সে। অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সে বিয়ে করেছিলেন। প্রথমা কন্যা সুরুচি। বিয়ে দিলেন পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সের সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যারিস্টার হেমেন রায়ের সঙ্গে এবং মুখোমুখি হয়ে দাঁড়ালেন father-in-law and class-mate!

"প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে বললাম, 'তোমার আইনের জ্ঞান কিন্তু গভর্নমেণ্টের খুব কাজে লাগবে। তোমার মত লোক যে-কোন administration-এর পক্ষে একটা asset.'

"হাসল হেমেন। 'আইনের জ্ঞান! তাই বটে! একটা কথা জেনে রেখো নিরঞ্জনদা, Hemen Roy knows everything under the sun except law! একনমিক্স্ সে নিশ্চয়ই জানে। একনমিক কমিশনের মারফত হয়তো সে গভর্নমেণ্টের গোটা economic policyটাকেই পালটে দিয়ে জনসাধারণের কিছু উপকার করতে পারে। কিন্তু with regard to law? Hemen Roy's knowledge is not really considerable.'

"মাত্রাতিরিক্ত নেশা সত্ত্বেও বুঝল যে আমি বিস্মিত হয়েছি। ব্যাখ্যা করল নিজেই, 'When I build up a case, I build it up on sand. The judge sits up and says, No monkeying please!—But he is hoodwinked all the same!'

"আমি চুপ করে রইলাম।

"জানো নিরঞ্জনদা I build up a story, right from the bottom, a nice plausible story. The presentation is superb and I do always win my case. But law? Pooh! Not the least bit of it. I know nothing of it. I raise a skyscraper on sand,—mind you the foundation is always sand.'

"রবীনকে বলেছিলাম কথাটা কিছুকাল পরে। বলল রবীন, 'দাদা মিথ্যে বলেনি। অর্থনীতি শাস্ত্রে ও সত্যিই বিশাল পাণ্ডিত্যের অধিকারী, কিন্তু আইনের তত্ত্বীয় দিকটায় ও বেশ কাঁচো।"

"রবীন নিজে অ্যাটর্নি, কাজেই আদালত এলাকার সংবাদ তার অজানা নয়। বলল সে, 'সেদিন ক্যালকাটা ক্লাবে আসুটিস্ সাহাব হাসতে হাসতে বলছিলেন, তোমার ভাইয়ের মত বাজারাজ

আর ছুটি নেই, যখনই কেস্ করতে ওঠে আমার এজলাসে তখনই জানি আসল আইনকানুনের ধার দিয়েও যাবে না। শুধু তলপাই দিয়ে মামলা জিতবার তালে থাকবে। সচেতন হয়ে থাকি, তাকি না দেয়। কিন্তু দেখার চোটে ও প্রতিপক্ষের পেটের কথা টেনে টেনে বার করে, তারপর সেটা present করে প্রকৃত artist-এর মত। জানি তাতে আইনজ্ঞানের বালাই নেই,—কিন্তু তবুও কিছুক্ষণ হেমেন রায়ের বক্তৃতা শোনবার পর মনে হতে থাকে যেন পায়ের তলার মাটি সরে যাচ্ছে, এ-অবস্থায় বাঁচবার একমাত্র উপায় হচ্ছে ওর পক্ষে রায় দেওয়া! সুতরাং কেস্-এর merit থাকুক বা না থাকুক হেমেন রায় কেস্ জিতবেই।'

"এ হল রবীনের দেওয়া খবর। এ যে সত্যি তাতে আমার সন্দেহ নেই। ইতিমধ্যে হেমেন কিন্তু বোতলের পর বোতল ওড়াচ্ছে। আমার দিকে তাকিয়ে সামান্য একটু জড়ানো সুরে বলল, "My dear Niranjanda, don't forget that Hemen Roy knows almost everything in this world except law. This is not modesty, but fact."

"ওর এক সেলামের বন্ধুরা সব আসতে আরম্ভ করলেন, আমি উঠে পড়লাম। আমার দিকে নিমেষমাত্র স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে হেমেন বলল, তুমি তো এখন মাস্টারী কর, না?'

"হাঁ! প্রাইমারী ইস্কুলে।'

"হক প্রাইমারী স্কুল, তবুও স্কুল তো বটে। —তা তুমি বড় স্কুলের বন্দোবস্ত কর। একেবারে প্রথম শ্রেণীর স্কুল। লোক জোটাও, পণ্ডিত জোটাও, বিদ্বান জোটাও চরিত্রবান মানুষের জোটাও।

যারা দুর্বল নয়, লোভী নয়, নেশাখোর নয়। সোনার মত খাঁটি, হীরের মত তীক্ষ্ণ যারা, তাদের নিয়ে এসো সংগ্রহ করে। দেশকে উপহার দিক তারা যত ছেলেমেয়ে যারা হবে বজ্রের মত কঠোর, ফুলের মত কোমল, ব্যবহারে মধু, চরিত্রে অমলিন। গড়ে তোল প্রতিষ্ঠান, পৃথিবীর সেরা প্রতিষ্ঠান। দু' লাখ, দশ লাখ যত লাগে আমি দেব।'

"আমি নির্বাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলাম,—হেমেনের যে কয়জন বন্ধু এসে পৌঁছেছিল তাদের অবস্থাও আমারই মতন। হেমেনের কথায় আতিশয্য ছিল, বলবার ভঙ্গীতে বেশ খানিকটা অসঙ্গতি ছিল, কিন্তু তবুও তা পানাশ্রিত বলে আমার মনে হল না। বলল হেমেন, 'লোক যোগাড় কর, সংগ্রহ কর জানীগুণীবিদ্যাব্রতীদের। কিন্তু কোন নেশাখোর চলবে না, এমন কি পান-সিগারেট-বিড়ি যারা খায়, নস্যি যারা নেয় তারাও বাদ। গড়ে তোল তোমরা সত্যিকার ব্রহ্মচর্য আশ্রম, চরিত্রে, মননে আচারে, আচরণে। আদর্শ জ্ঞান ও আদর্শ ব্যবহারের সমন্বয় ঘটুক সেখানে। Go ahead—টাকার জন্যে ভেবো না।'

"আমার বিহ্বল অবস্থা দেখে ওর বোধ হয় মনে হল যে আমি সব কথা পুরোপুরি বিশ্বাস করছি না। তাই বলল এবার 'নিরঞ্জনদা, হেমেন রায় মাতাল, পিঁপে-পিঁপে মদ খায় সে,—কিন্তু মনে রেখো সে কখনও মাতাল হয় না। The gentleman in him never forgets himself. অতএব তোমাকে যা কিছু বলেছি I mean every syllable of it.—তোমার চিন্তার কোন কারণ নেই, নির্ভয়ে এগিয়ে যাও। আর নেশার কথা?—আমি নিজে ফেঁসে গিয়েছি। আমার তো আর ফিরবার উপায় নেই!'

"একটু থামল হেমেন। ওর গলার সুর এখন আশ্চর্য রকম কোমল ও নিরুত্তাপ, অন্তর্দহনের ফলে তা চাকচিক্যরহিতভাবে মৃদু। মনে হল যেন ওর মনের ভিতরকার আর্তনাদকে ও সজোরে মুখ চাপা দিয়ে মন্থীভূত করছে। সে-হাহাকার কিন্তু সীমাহীন বেদনায় নিত্যনিয়ত আত্মপ্রকাশ করতে চাইছে, বলতে চাইছে মর্মাহত চীৎকারে, পথ নেই, পথ নেই—আমার আর ফিরবার পথ নেই!"

"একটু হয়তো অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। খেয়াল হতেই শুনলাম হেমেন বলছে, নিরঞ্জনদা, Everyone knows me for a blotto, কিন্তু বিশ্বাস কর I hate drinking from the core of my heart; as a matter of fact no one detests it more than I. কিন্তু ফিরবার আর পথ নেই ব্রাদার,—আমার বড় বেশী দেরী হয়ে গিয়েছে!'—শেষের কথাটা অবশ্য বলল হাসতে হাসতেই, কিন্তু মনে হল যে সকলের সামনে প্রকাশ্যে মুখ চাপড়ে কাঁদতে পারছে না বলেই যেন হেমেন এমনই করে হাসছে!'

"বললাম, 'চলি ভাই হেমেন।'

"এসো। যা বলেছি মনে রেখো। I'm very serious about it.—যদি পার তাড়াতাড়ি খবর দিয়ো।' —আবার একটা হোটলের তরল-অমৃত গলায় ঢেলে দিল হেমেন রায়।

"এই হল তোর গৌরী সেন। একেই ডিঙিয়ে দিতে চাইছি তোদের সবে। তাও যদি চলে।" —নিরঞ্জনদার মুখে একটু তিক্ত হাসি।

"সরাসরি উত্তর দিলাম না। বয়কে ডেকে বিলের পয়সা চুকিয়ে দিয়ে রেস্তোরাঁ থেকে বেরোবার মুখে বললাম নিরঞ্জনদাকে, 'হেমেন রায়ের ওখানে এর পরে যেদিন যাবে সেদিন ওঁকে বোলো যে আমি ওঁর কাছে ক্ষমা চেয়েছি।'

"নিরঞ্জনদা যে ঠিক কি ভাবছিলেন বুঝতে পারলাম না। অন্যমনস্কভাবে জবাব দিলেন, 'আচ্ছা'।

তমিস্রা

সুলেখা দাশগুপ্ত

মায়া আর শোভা দু'বোন। মায়ার বিয়ে হয়েছে অনেকদিন। সে এখন পাকা ঘরণী গৃহিণী।

শোভার বিয়ে হয়েছে বছরও ঘোরেনি। সে এখনও সংসারের ভিতে শক্ত পোক্ত পায় দাঁড়িয়ে উঠতে পারেনি। মাছ কাটতে বসে যখন দেখে কোন মাছ,কী ভাবে কাটে কিংবা বলতে পারে না—ছোটে দিদির কাছে। তরকারী কুটতে বসে যখন দেখে ইঁচড় আর মোচার কোনটা কেমতে হয়, কোনটা রাখতে হয় হদিস করে উঠতে পারছে না—ছোটে দিদির কাছে। নিজের বা সমীরের অসুখ বিসুখ হলে ভয়ে দিদিকে এনে বসিয়ে রাখে সামনে।

আর রান্না ঘরে গিয়ে কেবল হাত পা হিম হয়ে আসে আর কান্না পায় ওর। বলে, দিদিরে কড়াতে তেল গরম হতে হতে কালো আলকাতরার মত রং হয়ে আসে কেনরে? মরম না তো খেয়ে? রাতে হঠাৎ হঠাৎ সমীরকে ঠেলে জাগায়। ঘুম জড়ানো চোখ মেলে সমীর ধরমর করে উঠে বসে কী হয়েছে জিজ্ঞাসা করলে বলে, না এমনি। তুমি ঘুমোও। বলেই আর সমীরকে জিজ্ঞাসা করতে দেয়না কিছু। পাশ ফিরে শুয়ে টিপে চোখ বুজে থাকে। সমীর নালিশ জানায় দিদির কাছে।

দিদি জানতে চান এমন করে কেন সে। শোভা কেপে উঠে বলে, দেখতে হবে না বেঁচে রয়েছে না মরে রয়েছে। তুই বলিসনি এমন অবস্থা হয়েছে আজ কাল যে, সকাল বেলা মনে হয় আরো একটা দিন তবে বাঁচলাম কিছু বিষ হজম করে।

দুবোনের বাড়ির ব্যবধান নিতান্তই সামান্য একই পাড়ার এদিক ওদিক। সে দিন মায়া ছুটুকরো মাছ নিয়ে এসে হাজির হলো শোভার বাড়ী। কলকাতার বাজারে মাছ নেই। স্বামী কি কাজে যেন কল্যাণী গিয়েছিলেন সেখান থেকে ইলিশমাছ নিয়ে এসেছেন—কলকাতার বুকে বসে মাছ—তাতে ইলিশমাছ খাওয়া—এ যে স্বপ্ন। ছোট বোনকে দুখানা না দিয়ে খাওয়া যায়! এসে দেখে রান্না ঘরের বাসনপত্র ছড়িয়ে আছে। একদিকে দা খাড়া হয়ে রয়েছে। অন্য দিকে উনোনে চাপানো কড়াইতে তেল জ্বলে উঠবার মুখে। শোভা পেটিকোটের উপর কোনমতে শাড়ি জড়িয়ে একহাটু জলের মধ্যে বসে কুঁকে পড়ে মোসলা পিষছে। তাড়াতাড়ি হাতের বাটি নামিয়ে রেখে উনোনের কড়াই সাঁড়াশি দিয়ে টেনে নামাল মায়া। ধমকে উঠে বলল, এখুনি পুড়ে মরতিস যে।

শোভা উঠে দাঁড়ালো। বলল, বাঁচার চেষ্টা করে লাভ নেই। রামের হাতে মরলেও মরব, রাবণের হাতে মরলেও মরব—আমরা বৃথা হাঁকুপাঁকু করছি বাঁচবার জন্যে—হ্যাত্‌রি। বলে মোসলার হাত ঝাড়া দিল সে।

মায়া হতভম্বের মিটে গিয়ে পড়ল মায়ার মুখে। মায়া মুখ মুছতে মুছতে বলল, কেন হয়েছে কী? তোর কি কোথায়?

চলে গেছে।

কেন? বলে ঘরের ভেতর ঢুকে 'নে সর' বলে শোভাকে সরিয়ে দিয়ে নিজেই উনোনের কাছে বসে পড়ল। শোভা কি কি রান্নার আয়োজন রিয়েছে তা একনজর দেখে নিয়ে খড়াই চাপিয়ে দিলো উনোনে।

একটা আরামের নিঃশ্বাস ফেলে সরে দাঁড়াল শোভা। বললো, কেন আর। চুরি করছিল যাচ্ছেতাই রকম। এতদিন বুঝেও চুপকরে ছিলাম যে দিদি। তোকেও বলিনি। তুই যদি বকিস। যদি চলে যায়। কিন্তু সপ্তাহের রেশন যদি তিন দিনে হাওয়া হয়ে যায় তবে আমরাই খাবো কী বল?

আচ্ছা! তরকারী নাড়তে নাড়তে মন্তব্য করলো মায়া।

শোভা বললো, তাও দিদি, মুখে কিছু বলিনি। বেলের বিজ্ঞাপন দেখেন, 'ঘর যার মাল নিজে সামলাও?' তেমনি নিজের মাল নিজে সামলাচ্ছিলাম। উঁড়ার চাবি বন্ধ করে নিজের হাতে সব বের করে দিতে লাগলাম। দুটো দিনও তারপর যায়নি। আজ বললে, মাইনে চুকিয়ে দেও। কাজ করব না। অসুখ হয়েছে।

ঘুরে রাগতকণ্ঠে মায়া বললো, আর তুই বুঝি অমনি মাইনেপত্র চুকিয়ে দিলি?

তবে কী করব? বোকা বোকা কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলো শোভা।

মাইনে দিবিনে এমন হঠাৎ ছেড়ে চলে গেলে। তুই যদি তাড়িয়ে দিতিস, তবে মাইনে দিতে হতো। কিন্তু ও যখন তোকে আগে না বলে মাসের মধ্যখানে কাজ ছেড়ে চলে যাচ্ছে, তুই মাইনে দিতে যাবি কেন? সবটারই তো একটা নিয়ম আছে।

তাই বুঝি নিয়ম? জানি না তো। তা থাকুগে। মাইনে না দিলে চেঁচিয়ে মেচিয়ে আরো কাণ্ড করত। কিন্তু এখন একটি কাজের লোক পাই কোথায় সেই হলো ভাবনা রে দিদি!

নতুন মাকে রাখবি? ও এখন বলে আছে। কালকেই এসে আমার কাছে অনেকক্ষণ বসে থেকে গেছে একটা কাজের জন্য।

নাদুর মাকে পাওয়া যাবে—যেন হাতে স্বর্গ পেতে গিয়েও পেলোনা শোভা। মুখে নিরাশা ফুটে উঠল তার। বললো, নাদুর মা কাজে ভালো। লোকটাও ভালো। কিন্তু ওকে রাখা যাবে না। ও কিছুতেই এখানে থাকে না। ভাত নিয়ে যাবে বাড়িতে। আর সে কী ভাত

নেওয়া! ঠেসে ঠেসে এক গামলা। কিছু কওয়াও যায় না। নিজেকে ছোট মনে হয়। কিন্তু বড় হবোই বা কী করে বল। অত ভাত দিলে রেশনে হবে? ভাত নিয়ে যাবে বাড়ীতে অমন ঝি আজকাল রাখা যাবে না রে দিদি।

তা ঠিক। নাহুর মা যদি এখানে খেতে রাজী থাকে তবে পাঠাবো?

তবে তো কথাই নেই।

নাহুর মা প্রথমটায় এ প্রস্তাবে রাজী হলো না। তারপর অনেকক্ষণ চুপকরে বসে থেকে একটা মস্ত দীর্ঘশ্বাস টেনে বললো, আচ্ছা মা, তাই হবে।

একে কটুম্ট কাজের লোক মিলে গেল, তাতে পুরোনো লোক—কাজ বোঝানোর শেখানোর হাঙ্গামা পোহানোর দরকার হলো না—শোভা কী খুসী। নাহুর মার সঙ্গে বসে পা দুলিয়ে দুলিয়ে গল্প করল। মনে করে পরবার জন্ত একটা পুরোনো শাড়ি এনে দিল। নিজেদের সমান সমান মাছ তরকারী নাহুর মার জন্ত রাখল। নিজের হাতে পরিপাটি করে ভাত বেড়ে রান্নাঘরে দিয়ে এলো। কিছুক্ষণ বাদে কোন একটা কাজের কথা বলতে গিয়ে রান্না ঘরে ঢুকে শোভা দেখল নাহুর মা ভাতের থালায় হাত রেখে চুপকরে বসে রয়েছে। ওকে দেখেই ত্রস্ত হাতে ভাত তরকারী মাখামাখি করতে লাগল। যেন এই এক্ষুনি মুখে গ্রাস তুলবে। যা বলতে গিয়েছিল তা বলে চলে এলো শোভা কিন্তু কেমন যেন খটকা লাগল ওর মনে। কখন ভাত দিয়ে এসেছে। নাহুর মাকে খেতে বসতেই দেখে এসেছে সে—তবে এতক্ষণ নাহুর মা খাচ্ছিল না কেন? ভাতের থালায় হাত রেখে বসেছিল কেন? আস্তে আস্তে আবার উঠে গেল শোভা। গিয়ে দেখল ঠিক সেই ভাবে বসে আছে নাহুর মা ভাতের থালায় হাত রেখে হাঁটুতে চিবুক চেপে।

তুমি খাচ্ছ না কেন নাহুর মা? অসুখ করছে?

এবার কেঁদে ফেলল নাহুর মা: গাচ্ছিমে মা খেতে। গলা দিয়ে কিছুতেই নামছে না। বাচ্ছা দুটো না খেয়ে রয়েছে……। কান্নাভাঙ্গা মুখে ভাতের থালা তুলে নিয়ে কলতলায় চলে গেল সে। শোভা দেখলে যে নাহুর মা দুটো চাল পড়ে গেলে খুঁটে খুঁটে তোলে সেই নাহুর মা থালা ভরা ভাত কলতলায় কুকুরের মুখে ঢেলে দিল।

পায় পায় গিয়ে উপস্থিত হলো শোভা দিদির কাছে। ঘটনাটা দিদির কাছে বলে অসহায়ভাবে তাকিয়ে রইল শোভা মায়ার মুখের দিকে। বললো, এখন কী করব দিদি বল?

জানিনে শোভা—জানিনে। কালকে হঠাৎ রান্নাঘরে ঢুকতে গিয়ে দেখি আমার বিটি হাঁড়ি থেকে মুঠো মুঠো ভাত তুলছে আর কোন মতে কোঁক কোঁক করে গিলে চলেছে। আমাকে দেখে মুখভরা ভাত মুখে—হা করে কেঁদে ফেলল। বললো, দু মুঠো খেয়ে না নিলে হাত পা আর চলছিল না মা……

কান্না কান্না গলায় শোভা বললো? এ আমরা কোথায় এসে দাঁড়িয়েছিরে দিদি?

পূর্ব
ফাল্গুনী
নরেন্দ্রনাথ মিত্র

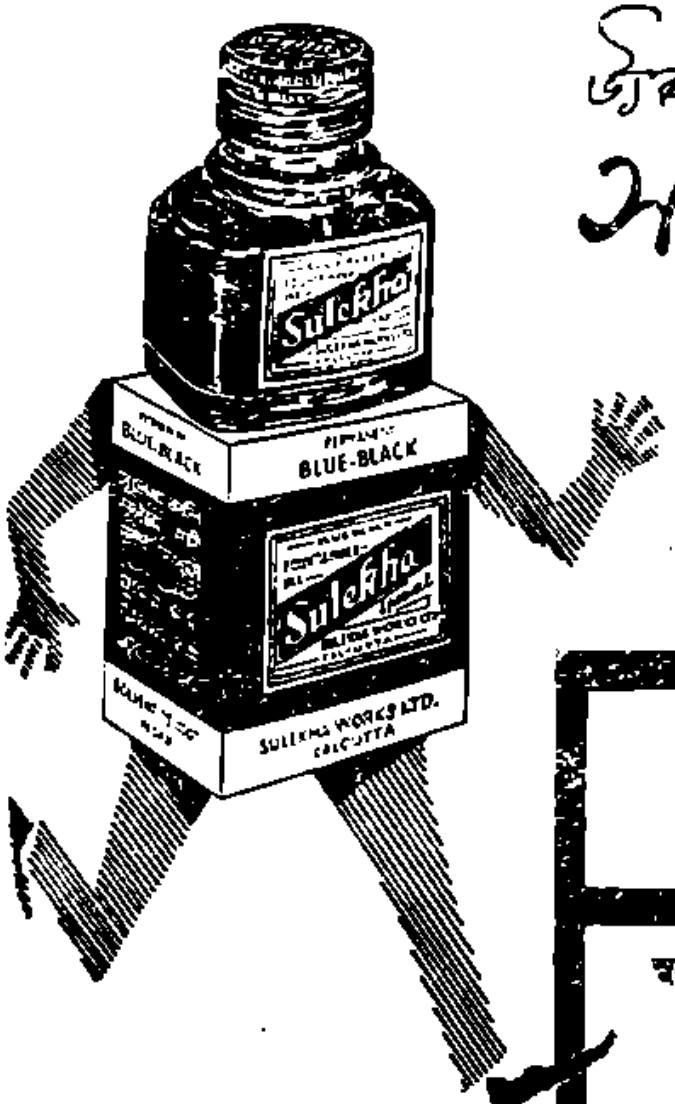

ডায়েরী ও ঐতিহ্যে

সবার আগে সুলেখা

ভারতে সর্বাধিক বিক্রয়ে তো বটেই, ক্রমবর্ধমান রপ্তানি বাণিজ্যের মাধ্যমে **সুলেখা** আজ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনেও উল্লেখযোগ্য দায়িত্ব পালন ক'রে চলেছে।

দেশ-বিদেশে সমাদৃত

সুলেখা-উৎপাদিত পণ্যের মধ্যে আছে : **'অ্যাডসল'** পেস্ট এবং গাম, **'সিকুরিটি'** সিলিং ওয়াক্স, **'পেনসল'**, স্ট্যাম্প প্যাড, বিভিন্ন লেখার কালি এবং স্টেনসিল, স্ট্যাম্পিং, মার্কিং ও ড্রইং-এর কালি।

সুলেখা

স্পেশাল

ফাউন্টেন পেনের

কালি

ব্লু ব্ল্যাক, রয়াল ব্লু, ব্ল্যাক, এবং ব্রাউন রং এবং ৩০, ৬০, ১২০, ৩৬০ ও ১২০ এম-এল-সাইজে পাওয়া যায়।

প্রস্তুতকারক : **সুলেখা ওয়ার্কস লিঃ**
সুলেখা পার্ক, কলিকাতা-৩২
ভারত।

PRO/SW-19

সুচরিতাসু

তোমাকে চিঠি লেখার অধিকার আমার নেই। তবু আজ লিখতে ইচ্ছে হল। অনেকদিন ধরে লিখি লিখি করছিলাম। কিন্তু বিধাও ছিল। আজ সেই বিধাটুকুকে জয় করেছি। আজ তোমাকে বিনা দুঠায় ডাকতে পারছি, এসো সঞ্জয় আর প্রব দুজনকে নিয়েই এসো। এই চিঠি ওদের দুজনকেও দেখতে দিয়ো। এ চিঠি তোমাদের তিনজনেরই। আমরাও এবাড়িতে এখন তিনজনই আছি। আমি অমলা আর অনু। আমাদের মেয়ে। ওর বয়স এই শ্রাবণে দশবছর পূর্ণ হল। আমি অমলাকে রাজি করিয়েছি। ও কিছু বলবে না, কিছু মনেও করবে না। ও জানে সবাই জানে আমার দুটো স্ট্রোক হয়ে গেছে। আমি যাওয়ার জন্যে পা বাড়িয়েই আছি। যাওয়ার আগে সবাইর সঙ্গে একবার করে দেখা করে যেতে চাই। সব বিবাদ মিটিয়ে যেতে চাই, সব দুষ্কৃতি মুছে দিয়ে যেতে চাই একথা বলব না। আমি জানি তা সম্ভব নয়। সারা জীবনের ঘরে শুধু একবার দেখার মেটে না। সে দেখা যদি শেষ দেখা হয় তাতেও না। ক্ষমা চাইলেই সব অপরাধের ক্ষমা পাওয়া যায় না। আমি তা জানি। আমি রোগশয্যায় সব পুরোন বন্ধুদের ডেকে ডেকে এনেছি, আত্মীয়-বন্ধুদের ডেকে এনেছি। সবাই আসেননি সবাই সাড়া দেননি। কেউ কেউ গিয়েছেন। কিছু পাওয়ার জন্যে কিছু চাওয়ার জন্যে তো আমি তাদের ডাকিনি এমন কি ক্ষমা চাওয়ার জন্যেও নয়। শুধু একবার যে তাদের সঙ্গে দেখা হল এইটুকুই যথেষ্ট। এইটুকুই পরম পাওয়া। তোমরা যদি আস আমিও তোমাদের কাছ থেকে তাই পাব। দেখা পাব।

এসো। আমি আজকাল সারাদিন বিছানায় প্রায় শুয়েই থাকি। শুয়ে শুয়ে অল্প স্বল্প পড়ি। একটু একটু চিঠি লিখি, ডায়েরি লিখি কখনো দুচার ছত্র। কখনো বা দুচার পাতা। দেখতে পেলে অমলা বকে, রাগ করে। তখন লেখালেখি বন্ধ করে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকি। জানালা দিয়ে এই বিশাল আকাশের কতটুকুই বা চোখে পড়ে। তবু চেয়ে চেয়ে দেখতে বেশ লাগে। প্রহরে প্রহরে আকাশের রঙ বদলায়। সেই রঙ বদলানো দেখতে বেশ লাগে। এসো। যদি পার এই রবিবারেই এসো। ষোলই শ্রাবণ। অনেকদিন বাদে এই তারিখটির কথা কেন মনে পড়ল। পড়া উচিত নয়। তবু মনে পড়ল। এসো, সবাইকে নিয়ে এসো। এলে খুশি হব। তোমাদের খুশি করতে পারব কিনা জানি না। কিন্তু যাওয়ার আগে একটু খুশি হয়ে যেতে পারব। প্রবকে স্নেহ, তোমাদের দুজনকে আমার শুভেচ্ছা জানাই। ইতি—

পরিতোষ গুপ্ত

সুনন্দা চিঠিখানা পড়ে স্বামীর দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'নাও।'

বাইরের ঘরে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বৈষয়িক আলোচনা হচ্ছিল। জমি নিয়ে আলোচনা। ঘুরে ঘুরে দুজনে জমি দেখে বেড়াচ্ছে। উত্তর শহরতলীতে দেখেছে, দক্ষিণে দেখেছে। কিন্তু পছন্দমত জমি এখনো পায়নি সুনন্দা।

নঞ্জয় বেশি কিছু বলে না। শুধু বলে 'তোমার পছন্দেই আমার পছন্দ।'

কিন্তু তাই কি আর হয়? নিজের পছন্দের সঙ্গে স্বামীর পছন্দ মিলিয়ে নিতে চায় সুনন্দা।

অনেক ব্যাপারেই ছেলে আবার অনেক ব্যাপারে মিলতে চায় না। যেমন জমি পছন্দ করার ব্যাপারে ছেলে না, ভাড়াটে বাড়ি পছন্দ করার ব্যাপারে মেয়ে কঠিন হয়। তবু সুনন্দা শেষ পর্যন্ত মিলিয়ে নেওয়ার জন্যে তার আগ্রহ বেশি ফুটে ওঠে। স্বামীর মতের বিরুদ্ধে প্রায় যেতেই চায় না সুনন্দা।

ছুটির দিন। সকাল বেলায় দু কাপ চা হয়। মনিং-এ আর সেই মনিং-এ। সেই দ্বিতীয় পর্বের চা আর জমির আলোচনা চলছিল। সেক্টাউনে বাকি এখনো কিছু জমি আছে। সুনন্দাকে সন্ধান দিয়েছে তার মাসতুতো ভাই ভন্টু। সেও বাকি সেখানে জমি রাখবে। সুনন্দার ইচ্ছা সঞ্জয়কে নিয়ে আজ বিকালে সেক্টাউন ঘুরে আসে। জমি পছন্দ হোক আর না হোক, জমি কেনা হোক আর না হোক এই উপলক্ষে স্বামীর সঙ্গে তার বেরোনও হয়, বেড়ানোও হয় একটু। সব দিন তো আর সময়ও পাওয়া যায় না। সঞ্জয়ের মত সুনন্দাকেও দশটা পাঁচটা অফিস করতে হয়। অফিসের পরে ঘর সংসারের কাজ দেখতে হয়। না দেখলে নিজের মনই খুঁৎ খুঁৎ করে। সঞ্জয়ের যেমন একটু পড়াশুনো না করতে পারলে খুঁৎ খুঁতির অন্ত থাকে না।

ছুটিছাটা ছাড়া বেরোন হয় না। সব ছুটির দিনগুলিতেই যে বেরোবার সুযোগ পাওয়া যায় তা নয়। সময় থাকে তো মেজাজ থাকে না, মেজাজ থাকে তো সময় থাকে না। সময়ের সঙ্গে মেজাজের মিল হওয়া চাই। দুজনের সময়ের সঙ্গে দুজনের মেজাজের। আজ বিকেলে সেই মিলটুকু হয় কিনা চেষ্টা করে দেখছিল সুনন্দা। পিওন চিঠি দিয়ে গেল। একখানা মাত্র চিঠিই আজ এসেছে। চিঠিটা সুনন্দার নামে। কিন্তু পিওন দিল সঞ্জয়ের হাতে। খামের চিঠি।

হাতের লেখাটা চেনাচেনা। কিন্তু ঠিক চিনে উঠতেও পারল না।

একটু হেসে বলল, 'তোমার চিঠি নাও।'

চিঠিটা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই খামের মুখ ছিঁড়ে ফেলল সুনন্দা। চোখ বুলিয়ে চিঠিটা পড়েও নিল।

একটুকাল চুপ করে বসে রইল। একটু বোধ হয় অন্যমনস্ক হল কিছুক্ষণের জন্যে।

সঞ্জয় বলল, 'কার চিঠি?'

সুনন্দার খেয়াল হল, তাড়াতাড়ি চিঠিখানা এগিয়ে দিয়ে বলল, 'নাও দেখো।'

সঞ্জয় একটু চোখ বুলিয়ে বলল, 'কিন্তু এ তো তোমার চিঠি।'

সুনন্দা বলল, 'তাতে কি। তুমিও দেখ। আমার এমন কোন চিঠি থাকতে পারে না, যা তোমার দেখতে নেই।'

সঞ্জয় বুঝতে পেরেছিল। তবু জিজ্ঞাসা করল, 'কার চিঠি?'

সুনন্দা এবার মুখ নামিয়ে মৃদুস্বরে বলল, 'প্রবীর বাবার।'

সঞ্জয় চুপ করে রইল। সুনন্দা কি বলতে পারত না 'পরিতোষবাবুর।' স্বামীর নাম ধরে তো সে মাঝে মাঝে ডাকে। অন্য লোকের কাছে উল্লেখও করে। ভূতপূর্ব স্বামীর নাম উচ্চারণ করতে দোষ ছিল কি। প্রবীর বাবা এ কথাটা না বললেই কি পারত না সুনন্দা?

একটু বাদে চিঠিখানা ফেলে রেখে সুনন্দা পাশের ঘরে চলে গেল।

কিছু সেন্টার টেবিলের ওপরে চিঠিটা তেমনি পড়ে রইল। সঞ্জয় সে চিঠি হাত দিয়ে ছুঁলনা। ছুঁতে যেন তার কেমন একটা ঘৃণা হচ্ছে। এ চিঠি সুনন্দা আজ এভাবে ফেলে রেখে যেতে পারে। এ চিঠি

আজ আর বাল্যস্মৃতি নয়। এ চিঠি পরিতোষ গুপ্ত নামে প্রায় বৃদ্ধ এক ভদ্রলোকের। ঘাটের কাছাকাছি তাঁর বয়স। এ চিঠিতে নিশ্চয়ই তিনি সুনন্দাকে প্রণয় নিবেদন করেন নি। তবু কুড়পূর্ণ স্বামীর চিঠিখানা সুনন্দা সঙ্গে নিয়ে গেলেই পারত।

সঞ্জয় একটু হাসল। সুনন্দা জানে ও চিঠি সে ছোঁবেনা। তাই নিশ্চিন্তে চিঠিখানা ফেলে রেখে গেছে।

তবু কী সাহস পরিতোষ বাবুর, কী স্পর্ধা! তিনি আজও সঞ্জয়ের স্ত্রীকে অনায়াসে চিঠি লিখতে পারেন। হলেনইবা তিনি রোগশয্যায় শায়িত। তবু সুনন্দাকে চিঠি লেখার কী অধিকার আছে তাঁর? লিখলে তিনি সঞ্জয়কে লিখতে পারতেন। সেইটাই শিষ্টতা হত।

কিন্তু তেমন শিষ্টাচার কবেই বা পরিতোষবাবুর মধ্যে লক্ষ্য করেছে সঞ্জয়? সত্যতা, নম্রতা এই মানুষটির মধ্যে কদাচিৎ দেখেছে সঞ্জয়। বরং যত ঘনিষ্ট ভাবে মিশেছে তত বিপরীত পরিচয়ই ও পেয়েছে ওর। অবশ্য লৌকিক শিষ্টাচারে ভদ্রতায় তিনি চিরদিনই নিপুণ। কিন্তু তাঁর আড়ালে যে মানুষটি বাস করেন তাঁর লোভের সীমা নেই, তাঁর নীচতা ক্ষুদ্রতা অপরিসীম।

প্রথম আলাপের কথা আজও মনে আছে সঞ্জয়ের। সবে বাংলায় এম, এ, পাশ করে বেরিয়েছে। রেজাল্ট ভালো হয়নি। দ্বিতীয় শ্রেণীর সীমায় কোন রকমে স্থান পেয়েছে একটু।

হাই স্কেলে ক্লাস পাওয়া বন্ধু সুব্রত তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, 'তাতে কী হয়েছে। আর একটা সাবজেকটে পরে এম, এ, দিয়ে নিলেই পারবে। তাছাড়া চাকরি বাকরির বাজার রেজাল্টের ওপর নির্ভর করে নাকি? মুরুব্বির জোর থাকলে তুমি এতেই ভালো চাকুরি পেয়ে যাবে।'

কিন্তু সঞ্জয়ের কই সেই মুরুব্বির জোর। বাবা মার্চেন্ট অফিসের কেরানী। চারটি ভাই বোন। কোন রকমে দিন চলে। এতদিন টুইশন করে নিজের পড়ার খরচ চালিয়েছে সঞ্জয়। ভাইবোনগুলিকেও কিছু কিছু সাহায্য করেছে। যে সব আত্মীয় বন্ধু সমাজের উঁচু সিঁড়িতে উঠে গেছেন তাদের সঙ্গে সঞ্জয়দের যোগাযোগ খুব কম। এক তরফা সম্পর্ক তো আর রাখা যায় না। সঞ্জয়দের দেখলেই তাঁদের আশঙ্কা হয় কী যেন চাইতে এসেছে। মুখের ভাব বদলে যায়। তাঁদের আশঙ্কা আর অস্বস্তি বাড়িয়ে কী লাভ! তাই সঞ্জয় কারো কাছেই যায় না। আত্মীয় স্বজন সবাইর সঙ্গেই তার সম্পর্ক ক্ষীণ। এই নিয়ে বাবা মাঝে মাঝে খুব বকেন। তাঁর ক্ষোভ দুঃখ আক্ষেপ অভিযোগ শোনা যায়। 'লোকের কাছে যাবিনে, লোকের সঙ্গে সম্পর্ক রাখবিনে, লোকে তোর জন্যে কেন করবে বলতো? মানুষের কাছে যাবি, মানুষের সঙ্গে মিশবি, তবে তো মানুষ হতে পারবি। যা স্বভাব চরিত্র দেখছি বনমানুষ হয়ে চিরকাল বনে বনে ঘুরবি।'

কারো কাছে অসম্মানিত অনাদৃত হওয়ার চেয়ে সঞ্জয় বরং তখন বনমানুষ হওয়াই শ্রেয়স্কর মনে করত। এখনো তাই করে। এখনো কোন রকম বৈষয়িক সাফল্যের জন্যে সে আত্মমর্যাদা ক্ষুণ্ণ করবে না।

কিন্তু সুব্রতের পীড়াপীড়িতে তার সঙ্গে সেদিন এক অপরিচিত ভদ্রলোকের বাড়িতে গিয়ে হাজির হয়েছিল।

হরতুকি বাগান লেনের সেই সেকেলে পুরোনো বাড়িটির কথা এখনো বেশ মনে আছে সঞ্জয়ের। বিশ বছর হয়ে গেল। তবু বাড়িটি যেন এখনো ছবির মত ভাসে। অবশ্য বাড়িটি মোটেই ছবির মত সুন্দর

ছিল না। একতলায় ওটি তিনেক ঘর। তাতে ছোট একটি প্রেস আছে। দোতলায় বাসযোগ্য দু'তিন খানা ঘর। একটির গায়ে লেখা মন্দাকিনী অফিস। সন্ধ্যার পরেও সেই অফিস ঘর খোলা ছিল।

সুব্রত বাইরে থেকে বলল, 'পরিতোষদা আছেন?'

'আরে এসো এসো, সুব্রত এসো।'

সাদর সৌজন্যে আহ্বান করলেন গৃহস্বামী!

গলার স্বরটুকু বেশ মিষ্টি।

সুব্রত বলল আজ আমার একজন বন্ধুকে নিয়ে এসেছি পরিতোষদা।'

'বেশ তো ভালোইতো, সবান্ধবেইতো এখানে আসবে। সেই তো নিয়ম।'

ভদ্রলোক হেসে দোরের সামনে এগিয়ে এলেন। দীর্ঘ চেহারা। মোটামুটি সুপুরুষ বলা চলে! বয়স কত চটকরে আন্দাজ করা যায় না। তিরিশের ওপরে নিশ্চয়ই। কিন্তু কত ওপরে তা সঞ্জয় বুঝতে পারেনি। স্মিতমুখ প্রসন্ন চিত্ত ভদ্রলোককে দেখে সেদিন আকৃষ্টই হয়েছিল সঞ্জয়।

সুব্রত পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল 'পরিতোষদা। মন্দাকিনী পত্রিকার সম্পাদক। আমার বন্ধু সঞ্জয় সরকার। আমাদের মতো এম, এ, পাশ করেছে। ওরও লেখার একটু আধটু হাত আছে পরিতোষদা। আর সাহিত্যে দারুণ উৎসাহ।

পরিতোষবাবু হেসে বলেছিলেন 'এই তো চাই। ভবিষ্যতের ভার তো তোমাদেরই হাতে ভাই।'

ঘরে আর কেউ ছিল না। পরিতোষবাবু টেবিলে বসে কী যেন লিখছিলেন।

সুব্রতের পিছনে পিছনে সঞ্জয় ঘরে ঢুকেছিল।

পরিতোষবাবু হেসে তাঁর সামনের চেয়ারটি দেখিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, 'বোসো তোমাকে তো তুমিই বলতে পারি। তুমি যখন সুব্রতর বন্ধু।' সঞ্জয় হেসে বলেছিল 'নিশ্চয়ই। তুমি না বলে আপনি বললেই বরং আমার আপত্তি থাকত।'

পরিতোষবাবু কী যেন লিখছিলেন। লেখাটা বন্ধ করে বললেন, 'তোমারও লেখালেখার সখ আছে কি।'

সঞ্জয় বলেছিল, 'আছে একটু একটু। কিন্তু সে নিতান্তই সখ। কিছুই হয়না।'

'কিছুই হয় না! কী করে বুঝলে তুমি কিছুই হয় না।'

সুব্রত বলেছিল, 'আর বলবেন না পরিতোষদা। সঞ্জয়ের মত এমন একজন পেসিমিষ্ট আমাদের দলে আর দ্বিতীয়টি নেই।'

পরিতোষবাবু হেসে বলেছিলেন, 'তার মানে তোমার এই বন্ধুটির স্বভাবের মধ্যে গভীরতা আছে। যারা একটু হালকা ধরণের মানুষ তারাই অপটিমিষ্ট। যারা ভাবতে জানেনা ভাবতে চায়না তারাই সহজে সুখী হয়। সঞ্জয় তাহলে আমারই দলে।

সুব্রত বলল, 'আপনিও কি পেসিমিষ্ট পরিতোষ দা। আপনাকে দেখে কিন্তু তা মনে হয়না।'

পরিতোষবাবুর হাসি আরও নিখুঁত রহস্যে পূর্ণ হয়ে উঠেছিল। তিনি বলেছিলেন 'আমাদের যা দেখার কি আমরা নিজেরা যা দেখি তাই কি সব সুব্রত? Dark continent এর মত আমাদের স্বভাবের বেশির ভাগ অংশই অন্ধকারে আচ্ছন্ন। অন্যে তো দূরের কথা আমরা নিজেরাও জানিনা

আমরা কী। আন্দাজে পা ফেলে ফেলে আমাদের এগুতে হয়। তাই নিয়েই আমাদের কাজ চলে। কাজ তো চালাতেই হবে।'

'কের বুঝি তোমার তত্ত্বকথা আরম্ভ হয়েছে? তোমার তাত্ত্বের ভয়ে ওরা ঘর ছেড়ে পালাবে আমি দেখতে পাচ্ছি।'

ছিপ ছিপে লম্বা চেহারার একজন ভদ্র মহিলা ঘরে ঢুকলেন। দেখতে সুশ্রী। গায়ের রং সৌরবর্ণই বলা যায়। তবে উজ্জ্বল সৌর নয় একটু যেন ফ্যাকাসে। বাঁক চোখ টানাটানা। কিন্তু সেই চোখের দৃষ্টিতে একটু যেন বিষাদের ভাব আছে।

স্ত্রীর সঙ্গে সঞ্জয়ের পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন পরিতোষবাবু।

'আমার গৃহিণী সচিব সখি প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলা বিদৌ। মক্কাকিনী পত্রিকা আর প্রেসের ম্যানেজার সুনন্দার আরো কয়েকটি পদও আছে। তা ক্রমশ প্রকাশ্য।'

সুনন্দা হেসে বলেছিলেন 'পদ না আরো কিছু। তোমার যা সম্পত্তি তার আবার ম্যানেজারি। তার আবার ক্যাশিয়ারি।

'কেন আমার সম্পত্তিটা একেবারে কম দেখলে কিসে!' পরিতোষবাবু হেসে স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

তারপর আস্তে আস্তে বলেছিলেন, 'পাড়ি বাড়ি বিষয় আশয় সম্পত্তি বলতে কি শুধু এই সবই বোঝায়? এই যে সুব্রত, এই যে সঞ্জয়, আগেই ওর সঙ্গে আলাপ হল কিন্তু মনে হয় যেন কতদিন ধরে আমাদের চেনাশুনা এরা বুঝি আমার সম্পদ নয়?

তুমি বুঝি আমার সম্পদ নও?'

সবাইর সামনে পরিতোষবাবুর এই প্রকাশ্য প্রণয় ভাষণে সঞ্জয় আর সুব্রত একটু লজ্জিত হয়ে উঠেছিল।

কিন্তু পরে একদিন যেতে না যেতে সঞ্জয় বুঝেছিল এইটাই ওদের রেওয়াজ। 'ওরা নিজেরা' একা থাকলে ঝগড়া করেন আর বাইরের লোকজনের সামনে প্রণয় নিবেদন করেন।

একটু পরেই সঞ্জয় বিদায় নেওয়ার জন্যে উঠে দাঁড়িয়েছিল।

কিন্তু পরিতোষবাবুও বাধা দিয়েছিলেন, সুনন্দাও সহজে ছেড়ে দেননি।

হেসে বলেছিলেন, 'তাই কি হয় নাকি? এই প্রথম এলেন? একটু মিষ্টি মুখ না করেই চলে যাবেন? তাই কি হয়?'

সঞ্জয় মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। একটি সুন্দরী তরুণী মেয়ের ওই মিষ্টি হাসি মিষ্টি কথা মধুর আচরণের চেয়ে আরো মধুর দ্রব্য কি থাকতে পারে তা যেন সেই মুহূর্তে সঞ্জয় ভেবে পায়নি।

কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বাইরে এসে চাকরকে খাবার আনতে পাঠিয়েছিলেন সুনন্দা। চা করে এনেছিলেন নিজের হাতে।

সেই থেকে আলাপ।

সুব্রত কিন্তু বেশি জড়ায়নি। দু'তিন মাসের মধ্যেই সে চাকরি নিয়ে বাংলা দেশের বাইরে চলে গিয়েছিল।

কিন্তু জড়িয়ে পড়েছিল সঞ্জয় নিজে।

সে আর কিছুতেই থেয়ে'তে পারেনি।

তাকে দুজনেই আকৃষ্ট করেছেন। পরিতোষবাবু আর তাঁর স্ত্রী দুজনে দুই অর্থে, দুই ভিন্ন কারণে।

সঞ্জয় সে কথা নিজেও বুঝতে পারত। তবু না গিয়ে পারত না। ওঁদের জীবনযাত্রা সঞ্জয়ের কাছে তেমন যে স্বাভাবিক মনে হত তা নয়। কোথায় যেন একটা গোপনতা প্রচ্ছন্নতা আছে ওঁদের—বিশেষ করে পরিতোষবাবুর জীবনে। কখনো বা মনে হত ওঁর জীবিকার পথ তেমন সহজ সরল নয়। তবু সেই প্রচ্ছন্নতা নিগূঢ় রহস্যের মত সঞ্জয়কে আকর্ষণ করত।

সঞ্জয় মনে মনে কত দিন ভেবেছে কত কঠিন প্রতিজ্ঞা করেছে আর যাবে না, তবু না গিয়ে পারেনি।

অবশ্য প্রথম প্রথম কিছুদিন বেশ ভালোই চলেছিল।

সেই প্রথম সাক্ষাতের পর দিন পনের যেতে না যেতেই পরিতোষবাবু বললেন, 'সঞ্জয়, আমার ইচ্ছা তুমি এই কাগজটার দেখাশোনা কর। তোমার সঙ্গে আলাপ করে আমার মনে হয়েছে যাদের কাছে যারা আছে তুমিই তাদের মধ্যে যোগ্য ব্যক্তি। তোমার সাহিত্যবোধ আছে, লেখার শক্তি আছে। এই কাগজ তুমিই চালাতে পারবে।'

সঞ্জয় লজ্জিত হয়েছিল। ভিতরে ভিতরে খুশিও কম হয়নি।

হেসে বলেছিল, 'কী যে বলেন পরিতোষদা।'

পরিতোষদা তাকে উৎসাহ দিয়ে বলেছিলেন 'তুমি পারবে? কে জানে ভবিষ্যতে তুমিই হয়তো একদিন এই মন্দাকিনী পত্রিকার সম্পাদক হবে। আমি তখন অন্যকাজে ব্যস্ত থাকব। কোন একটা কাজ নিয়ে বেশিদিন পড়ে থাকবার মত স্বভাব আমার নয়। আমার মেকিংএর মধ্যেই সেই স্থিরতা নেই। এই নিয়ে গৃহলক্ষ্মীর কাছে আমাকে বকুনি খেতে হয়। ভাগ্যলক্ষ্মীর কাছেও কম ঝাঁকুনি সহ্য করতে হয় না। কী করব বল 'অতীত্য হি গুণান সর্বান স্বভাবো মূর্ধি বর্ত্ততে।' নিজের ছোটখাট দোষ ত্রুটি তখনো অকপটে স্বীকার করতেন পরিতোষবাবু। কিন্তু বড় অপরাধের কথা কৌশলে গোপন করে যেতেন।

'মন্দাকিনী' কাগজে সহ-সম্পাদকের চাকরি হল সঞ্জয়ের। নামে চাকরি। কিন্তু কোন ম্যাইনে টাইনে নেই।

পরিতোষবাবু সঞ্জয়ের পিঠে হাত রেখে বললেন, মন্দাকিনীর এমন সাধ্য এখনো হয়নি তোমার মত গুণবান ছেলেকে মাইনে দিতে পারে। যখন ক্ষমতা হবে তখন আর বলতে হবে না। এখন শুধুই Love's labour. তবে it will be not the lost.'

সঞ্জয়ের তখন টাকা পয়সার দিকে খেয়াল ছিল না। নিজের খরচটা চালাতে পারলেই যথেষ্ট। সেই খরচ চালাবার জন্যে মাষ্টারী নিল সঞ্জয়, টুইশন নিল। আর কাগজের কাজটা হল তার শখের কাজ। সেই শখের জন্যেই সে মন্দাকিনী-অফিসে আসে। এই আসাটা নেশার মত হল। মাইনে না পেলেও সঞ্জয়ের তেমন ক্ষোভ ছিল না। প্রথম যৌবনে কাগজ চালাবার একটা নেশা আছে। সঞ্জয় সেই নেশায় মশগুল হয়েছিল। লেখা বাছাই বাছাই-এর কাজও তার হাতে। সে ইচ্ছা করলে

এ কাগজে যা খুশি তাই লিখতে পারে। একি কম ক্ষমতা? এর চেয়ে বেশি সুখ তখন সঞ্জয়ের সঙ্গে কল্পনার অতীত ছিল।

তা ছাড়া আরো একটি গোপন কারণ ছিল সুখের। সঞ্জয় সুনন্দাকে পেয়েছিল সহকারিণী হিসাবে। তিনি চা দিতেন, খাবার দিতেন প্রুফেও কপি ধরতেন। কোন লেখা যাবে না যাবে সে সম্বন্ধে মতামত দিতেন। সুনন্দার তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী ছিলনা। কিন্তু সাহিত্যবোধ ছিল। সঞ্জয় সেই বোধের উপর নির্ভর করত। নির্ভর করতে ভালো লাগত তার।

সাহিত্য সংসার সব দুজনের ওপর ছেড়ে দিয়ে পরিতোষবাবু বাইরে বাইরে ঘুরতেন।

সঞ্জয় মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করত, 'কোথায় থাকেন পরিতোষদা? আপনার দেখাই পাওয়া যায়না।'

পরিতোষবাবু জবাব দিতেন, 'পেটের ধান্ধায় থাকি ভাই। দেখা পাবে কী করে।'

তারপর ধীরে ধীরে পরিতোষবাবুর স্বরূপ উদ্ঘাটিত হতে লাগল। ধান্ধা যে কি তাও খানিকটা টের পেতে লাগল সঞ্জয়। পোয়েন্সা পুলিশের সঙ্গে পরিতোষবাবুর আনাগোনা। সহরের অনেক বড় বড় লোকের কুকীর্তির কথা সেই সূত্রে তার নখাগ্রে। পরিতোষবাবু ইচ্ছা করলে তা ছাপতে পারেন, ইচ্ছা করলে চেপে যেতে পারেন। কিন্তু টানাটানির সংসার পরিতোষবাবুর। তাই কিছু খরচ দরকার।

একথা জানবার পর থেকে সঞ্জয়ের মন বিতৃষ্ণায় ভরে উঠেছিল। এক মুহূর্তও আর ওদের সংস্পর্শে থাকে এমন ইচ্ছে তার হয়নি।

কিন্তু চাইলেই সঙ্গে সঙ্গে সব বাঁধন তো আর ছেঁড়া যায় না। পরিতোষবাবুর সঙ্গে সে একটি মহৎকাজে তখন ব্রতী। বাংলা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রবাদ প্রবচন সংগ্রহ আর তার সম্পাদনা সেই কাজে। সে কাজ দুএক বছরে শেষ হবে না। সে কাজ সময় সাপেক্ষ আর পরিশ্রম সাধ্য।

আরো একটি বন্ধন আছে। মধুর বন্ধুত্বের বন্ধন। সে বন্ধন সুনন্দার সঙ্গে। তখনো সম্পর্ক শুধু প্রীতির আর সৌহার্দ্যের। আর কিছু ছিল না তার মধ্যে।

সুনন্দা সঞ্জয়ের চেয়ে বয়সে দুতিন বছরের বড়। জীবনের অভিজ্ঞতা নিশ্চয়ই আরো বেশি। তাকে বউদি বলেই ডাকত সঞ্জয়। মাস কয়েকের মধ্যে আপনি থেকে দুজনেই তুমিতে নেমেছিল।

সঞ্জয়কে সুনন্দাও ছেড়ে দিতে চায়নি। বলেছেন, 'উনি তাহলে আরো পেয়ে বসবেন। একেবারেই যা ইচ্ছা তাই শুরু করবেন। তুমি থাকো সঞ্জয়। তুমি থাকলে আমি ভরসা পাই। আমরা দুজনে মিলে ওঁকে বাঁধব। ওঁকে ঠেকাব।'

কিন্তু পরিতোষবাবু যে তাদের দু'জনের তুলনায় অনেক বেশি শক্তিমান তা সঞ্জয় অনুভব করত।

মাঝে মাঝে সমালোচনাও করত সঞ্জয়। মুখের ওপরই বলত, 'পরিতোষদা, আপনার এ সব আমার পছন্দ হয় না।'

পরিতোষবাবু হেসে বলতেন, 'কোন সব?'

'আপনি অন্যের দুর্নাম রটনার ভয় দেখিয়ে টাকা নেন। এটা কোন ভদ্রলোকের জীবিকা নয়। এর নাম ব্লাক মেইলিং।'

পরিতোষবাবু কিন্তু চটেননি। শান্ত স্মিত মুখে বলেছিলেন চাল তাঁহার নাম যে বুড়ি তা আমিও জানি। কিন্তু তুমি যে এত বড় চার্জ আমার নামে আনছ কোন প্রমাণ পেয়েছ? পেয়ে থাকো তো বল, আমাকে হাতে হাতে ধরিয়ে দাও।'

সঞ্জয় চুপ করে গিয়েছিল।

সত্যি তার হাতে কোন প্রমাণ ছিলনা। মাঝে মাঝে দু'চারজন পুলিশ অফিসারকে সে এ বাড়িতে আনাগোনা করতে দেখেছে। আর পুলিশ যাদের ধরে নিয়ে যায় ঠিক সেই ধরনের যণ্ডা মার্কা দুচার জন লোকের সঙ্গেও পরিতোষবাবুকে পরামর্শ করতে দেখেছে সঞ্জয়। তাতেই প্রমাণ হয় না পরিতোষবাবু ওদের দলের একজন। কিন্তু হাতে হাতে প্রমাণই কি সব। মানুষের অনুভব-শক্তি কি কিছুই নয়?

পরিতোষবাবু হেসে সঞ্জয়ের কান মলে দিয়েছিলেন সঞ্জয়ের। কোন প্রমাণ নেই তোমার হাতে। তুমি শুধুই বড় কান দাও। এই তার শাস্তি। ওসব দিকে কান না দিয়ে তুমি নিজের মনে নিজের কাজ করে যাও। সেই হল সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ পথ। অনেক দুষ্ট লোক পরিতোষ গুপ্তের নামে অনেক বাজে

কথা বলবে। স্বার্থে ঘা লাগলেই মানুষ চেঁচামেচি করে। কিন্তু সব চীৎকারই আর্তের চীৎকার নয়; পরিতোষ গুপ্ত দুর্জনকে শায়েস্তা না করতে জানুক, রুখতে জানে, ভয় দেখাতে জানে। তা'র জন্যে তাকে মাঝে মাঝে ভয়ঙ্কর হতে হয়। এই মেক-আপটুকু না নিয়ে তার উপায় নেই। তা'র জনবল নেই, অর্থ-বল নেই, শাসন ত্রাসনের ভার যাদের হাতে সে তাদের মধ্যে পড়েনা। এসব সত্ত্বেও সে যে কিছু করতে চেষ্টা করছে কিনা, কিছু গড়ে তুলতে পারছে কিনা সেইদিকে লক্ষ্য রেখো।'

পরিতোষবাবু বেশ জোরের সঙ্গেই কথাগুলি বলেছিলেন। সেই লোকের কাছে মাথা না নুইয়ে পারেনি সঞ্জয়। অভিভূত করবার মত শক্তি পরিতোষবাবুর ছিল।

সুনন্দা তখন অন্তঃসত্ত্বা। এর আগে একটি বাচ্চা নষ্ট হয়েছে। সুনন্দার নিকট সম্পর্কের আত্মীয় স্বজন কেউ নেই। অন্তত তাঁদের কথা সঞ্জয় শোনেনি। সুনন্দার মুখেও না পরিতোষবাবুর মুখেও না। কাউকে আসতেও দেখেনি বাড়িতে। আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে তখন তেমন সংস্রব ছিলনা পরিতোষবাবুর। কিন্তু স্ত্রীর সেবা শুশ্রূষার জন্যে আর একটি মেয়েকে আনলেন পরিতোষবাবু। তার নাম মহু। আঠের উনিশ বছর বয়স। দেখতে আরো সুন্দরী। তারও নাকি তিন কূলে কেউ নেই। পরিতোষবাবু বললেন মহু সম্পর্কে তাঁর মাসতুতো বোন হয়। তাকে দেখে সুনন্দার মুখ ভার হল। এই ননদের পরিচয় তাঁর জানা ছিলনা তা স্পষ্টই বুঝতে পারে সঞ্জয়।

কিন্তু মহু শুধু সুন্দরীই নয়, সে খুব কাজের মেয়ে। সেবায় শুশ্রূষায় সে দুজনের অন্তত চার হাতের কাজ করে।

সঞ্জয়ের মতই বউদি বলে ডাকে সুনন্দাকে। কিন্তু সুনন্দা তাতে প্রীত হন না।

সঞ্জয় তখনই লক্ষ্য করত সুনন্দার চেয়ে মহু পরিতোষবাবুকে বেশি আনন্দ দেয়। পরিতোষবাবুর মধ্যে যে উদ্যমতা আছে মহু যেন তারই অংশভাগিনী। দুজনের প্রকৃতির মধ্যে মিল আছে সঞ্জয় তখনই লক্ষ্য করেছিল।

মহু পরিতোষবাবুকে কোন কাজে বাধা দিত না, কোন তর্ক করত না, সৎপথ অসৎপথ নিয়ে মাথা ঘামাত না। সব পথই যেন জীবনের চলবার পথ। যে ছুটে চলতে পারে তার কাছে কোন পথই যেন বিপদ নয়।

অবশ্য কখনো কোন বড় বড় কথা মহুর মুখে শোনেনি সঞ্জয়। তত্ত্বের ধার ধেঁষে সে চলত না। সেই বিদ্যা বুদ্ধিও তার ছিল না। চলার বলার জীবনী শক্তির প্রাচুর্য ছিল তার মধ্যে।

সেই শক্তি অল্পদিনের জন্যে সঞ্জয়কেও মুগ্ধ করেছিল।

পরিতোষবাবুর তা চোখ এড়ায়নি। তিনি এসব নিয়ে মাঝে মাঝে ঠাট্টা করেছেন, 'সঞ্জয়ের সঙ্গে মহুকে বেশ মানায়, কি বল সুনন্দা।'

সুনন্দা বলতেন, 'এ কি আর তোমার মনের কথা? কার সঙ্গে যে মানায় তা তুমি নিজেও জানো।

পরিতোষবাবু লজ্জার ভান করে বলতেন, 'ছি ছি ছি একি বলছ।'

মহু কি বুঝতে পারত না সে সুনন্দার মনে অশান্তির সৃষ্টি করেছে? পারিবারিক বিপর্যয়কে এগিয়ে আনছে? হয়তো পারত। কিন্তু বুঝতে যেন চাইত না। কি যখন যেটুকু সুবিবেচনা তার আসত পরিতোষবাবু তা ভাসিয়ে নিয়ে যেতেন।

তারপর ছেলে হতে সুনন্দা হাসপাতালে গেলেন। মা হতে চলেছেন কিন্তু মনে যেন সুখ নেই। ঘরের অশান্তি তাঁকে এমন ভাবে ঘিরে রয়েছে।

ছেলের নাম পরিতোষবাবু নিজেই রেখেছিলেন। অনুরোধও চেয়েছিলেন সঞ্জয়ের কাছে 'কী, নামটা তোমার পছন্দ তো? বেশ বনীর গন্ধ আছে না? তোমাদের উপযুক্ত নাম।

পরিহাস ছিল পরিতোষবাবুর কথায়। কিন্তু এ পরিহাসের মানে কি। ধ্রুব তো তাঁরই ছেলে। তার নাম সঞ্জয়ের পছন্দ হোক আর না হোক তাতে কী এসে যায়?

ধ্রুব দেখতে খুব সুন্দরই হয়েছে। পরিতোষবাবু নিজেও তো সুপুরুষ। বরং সঞ্জয়ই রূপের দিক থেকে হীন। রং কালো চোখাল চওড়া। মাথায় সেই বয়সেই টাকের আভাস পড়তে সুরু করেছে।

এই রূপের রাজ্যে আর একটু রূপ থাকলে যেন ভালো হত সঞ্জয়, ভাবত মাঝে মাঝে। কিন্তু প্রকৃতি এ ব্যাপারে তার প্রতি বড়ই কার্পণ্য করেছে।

কিন্তু হাসপাতালের কেবিনে পুত্রমুখ দেখে সুনন্দার শান্তি ছিলনা। স্বামীর কথাই বারবার তাঁর মনে পড়ত।

মাঝে মাঝে সঞ্জয়কে জিজ্ঞাসা করতেন সুনন্দা! 'মনু ওই বাড়িতেই আছে তো?'

সঞ্জয় হেসে বলত, 'আর কোথায় যাবে? ও থাকবে বলেই তো এসেছে।'

সুনন্দা যে এরকমের পরিহাসে আঘাত পান তা সঞ্জয় জানত তবু একটু খোঁচা দেবার লোভ যেন সামলাতে পারত না।

সুনন্দা বলতেন, 'না ও থাকতে পারবে না। আমি গিয়ে ওকে যদি ও বাড়ি থেকে না তাড়াই— আচ্ছা, সঞ্জয় তুমি আমার একটি উপকার করবে? বড়ুর কাজ করবে?'

'বলো কী করতে পারি।'

'তুমি ওকে বিয়ে করে নিয়ে চলে যাও।'

সঞ্জয় হেসে উঠেছিল, 'তাতে কি সমস্যা মিটবে? আমি ক'জনকে বিয়ে করব?'

'তা ঠিক। তুমি আর কজনকে।' হঠাৎ যেন নিভে যেতেন সুনন্দা। তাঁর কষ্ট দেখে সঞ্জয়ের আরো বেশি কষ্ট হত।'

তারপর সুনন্দা ছেলে নিয়ে বাড়িতে ফিরে এলেন। কিন্তু সেই অশান্তি আর মনোকষ্ট তাঁর সঙ্গ ছাড়ল না।

মনুকে নিয়ে প্রায়ই স্বামী স্ত্রীতে ঝগড়া হত। সুনন্দা বলতেন, 'তুমি এতদিন বাইরে বাইরে যা করেছ করেছ। কিন্তু ঘরের মধ্যে তুমি আর একজনকে এনে পুষবে তো আমি সহ্য করতে পারব না।'

পরিতোষবাবু অসংকোচে অবিচলিত ভাবে বলতেন, 'মনু তো তোমার সেবা করবে বলেই এসেছে। ওকে যদি তোমার পছন্দ না হয় বল ওকে সরিয়ে দিই।'

অথচ সত্যি মনুর ওপর পরিতোষবাবুর কোন অসাধু আচরণ সঞ্জয়ের চোখে পড়েনি। হাসি ঠাট্টা করতেন এই পর্যন্ত। সেখানে আমন্ত্রিত হলেন, কথা বললে উল্লাস বোধ করতেন।

তবু সুনন্দার ঈর্ষার ধরণ দেখে সঞ্জয়ের মনে সন্দেহ হত স্ত্রী স্বামীর মনের কথা যে ভাবে জানে তেমন আর কেউ জানতে পারে না।

মধুর উচ্ছলতা, প্রাচুর্য দেখে সন্দেহ হত সে পরিতোষবাবুর কাছে গভীর কিছু পেয়েছে। অন্তত কিছু আশ্বাস, কিছু প্রতিশ্রুতি তাকে দিতে পরিতোষবাবু কোন কার্পণ্য করেন নি।

মধু অসংকোচে পরিতোষবাবুর টেবিল গুছিয়ে দিত। ধূপদানিতে ধূপ কাঠি জেলে দিত, ফুলদানিতে ফুল সাজিয়ে রাখত।

আর তার প্রতিটি কাজ দেখে সুনন্দা ঝঙ্কার দিতেন, খবরদার তুমি এসব করবে না। তোমাকে এসব কে করতে বলেছেন।'

মধু বলত, 'পরিতোষদা বলেছেন বউদি।'

সঞ্জয়ের এক একদিন মনে হত সুনন্দা যেমন তার সঙ্গে গল্প করে তাকে সঙ্গ সান্ত্বনা দিয়ে স্বামীর মনে ঈর্ষার উদ্রেক করেন তেমনি তার প্রেমের প্রতিশোধ হিসাবে পরিতোষবাবু মধুর ওপর বেশি অনুরাগ দেখান। স্ত্রীকে ঈর্ষায় দগ্ধ করাই তার উদ্দেশ্য। তিনি হয়তো আসলে মধুকেও ভালোবাসেন না। তিনি শুধু নিজেকেই ভালোবাসেন।

পরিতোষবাবুর সেই আত্মপ্রেম যে কত নির্লজ্জ তা আরো বছরখানেক পরে প্রমাণিত হল।

প্রবচন সংগ্রহের প্রথম খণ্ড বেরোল। কথা ছিল সেই বইয়ের যুগ্ম-সম্পাদক হিসাবে সঞ্জয়ের নাম থাকবে। পরিশ্রম বেশির ভাগ সেই করেছে। পরিতোষবাবু শুধু মাঝে মাঝে উপদেশ নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু প্রথম পাতা খুলে সঞ্জয় দেখতে পেল পরিতোষবাবুই সেখানে একমেবাদ্বিতীয়ম হয়ে আছেন, সঞ্জয়ের সেখানে নামগন্ধও নেই। অবশ্য ভূমিকার শেষের দিকে কয়েকজন বন্ধুর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। সেখানে সহকারী হিসাবে সঞ্জয়েরও উল্লেখ আছে।

সঞ্জয়ের আর সহ্য হল না। সে তাঁকে সরাসরি জিজ্ঞাসা করল, 'এ কি হল পরিতোষদা?'

পরিতোষবাবু তেমনি হেসে বললেন, 'কী হয়েছে?'

সঞ্জয় বলল, 'সম্পাদক হিসাবে আমার নামও থাকবে আপনি কথা দিয়েছিলেন, কিন্তু নাম তো দেখলাম না।'

পরিতোষবাবু শান্তভাবে বললেন, 'নামের জন্যে অত ক্ষেপে উঠলে কেন? নামের সময় এখনো যায় নি। পাবলিশারের পরামর্শেই এ কাজ করেছি। তোমার নামটা গ্রন্থকারদের মধ্যে থাকলে বই বিক্রি হত না। নামের জন্যে ভেব না। দ্বিতীয় খণ্ডে তোমার নামটাই আগে থাকবে। কি তখন তুমিই একমাত্র হয়ে থেকো।'

কিন্তু সেই আশ্বাসে সঞ্জয় কোন সান্ত্বনা পায় নি।

সুনন্দা অবশ্য সঞ্জয়ের হয়েই স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করেছিলেন, 'এ তোমার কী অন্যায়। কেন তুমি সঞ্জয়ের নাম দিলে না? ও যে দিনরাত কত খেটেছে, গাঁটের পয়সা খরচ করে কত জায়গায় ছুটোছুটি করেছে তা তো আমি দেখেছি। তুমি কেন ওর নাম চুরি করবে?'

পরিতোষবাবু হেসে জবাব দিয়েছেন, 'ও তোমার মন চুরি করেছে। সেই অমূল্যধনের কাছে ওর নামটা এমন কিছু বেশি দামি নয়।'

সঞ্জয়ের সামনাসামনিই এ সব কথা বলেছেন পরিতোষবাবু। একটুও তাঁর লজ্জা হয়নি।

কিন্তু দ্বিতীয় খণ্ডের জন্যে সঞ্জয় আর অপেক্ষা করেনি। সে জোর করে নিজেকে গুপ্ত পরিবারের ওই গুপ্ত গহ্বর থেকে সরিয়ে নিয়ে এসেছে। এর আগেও মন্দাকিনীতে সঞ্জয়ের কোন কোন রচনা

পরিতোষবাবুর নামে চলে গেছে। সে সব লেখায় অবশ্য কারোরই নামগন্ধ থাকত না। তার খ্যাতিটুকু পরিতোষবাবু কৌশলে গ্রহণ করতেন, দুর্নাম হলে আঙুল বাঁকিয়ে দিতেন সঞ্জয়ের দিকে।

হেসে বলতেন, 'তুমি যুবক। বোকা বইবার শক্তি তোমার যতখানি আমার কি আর তত আছে। তাছাড়া একটু নিন্দাসন্দ হওয়া ভালো। তাতে ঘাড় শক্ত হয় মন শক্ত হয়।'

হাসি পরিহাস দিয়ে নিজের সব দুঃস্থতিকে পরিতোষবাবু ঢেকে দিতে পারতেন, অপকর্মকে কল্যাণকামনার বর্মে ঢাকতেও তাঁর জুড়ি ছিল না।

আঘাত খেয়ে প্রতিঘাত দিতে পারেনি সঞ্জয়। পুরোন পারিবারিক আশ্রয়ে ফিরে এসেছিল। অন্তত আসতে চেয়েছিল। অবশ্য ধরতাইস লেনের এ বাড়ির আশ্রয় তো সে ত্যাগ করেনি। কিন্তু নিজের বাড়িটি যেন শুধু খাবার আয়না আর ঘুমোবার জায়গা। বাপ-মা-ভাই-বোনের স্নেহবন্ধন যেন বন্ধনই নয়। তার নিজের গড়ে তোলা বন্ধুত্বের বন্ধনই যেন সবচেয়ে বড়। সেইভাবেই চলে এসেছিল সঞ্জয়। কেউ চলন বদলাতে গিয়ে দেখে তা আর চলে না। বাড়িতে শুধু থাকবার আর খাবার জায়গাটুকুই আছে সঞ্জয়ের আর কোন আশ্রয় নেই। যে আসনে তার জন্মগত অধিকার ছিল, সে আসনে মেজো ভাই এসে বসেছে। মা নেই, বাবা অসুস্থ। মেজোই এখন বড়কর্তা। যে সহজ শ্রদ্ধা-প্রীতির সম্পর্কটুকু ছিল ভাইবোনদের মনে তা কবে শিথিল হয়ে গেছে সঞ্জয় দেখতে পেল। ওদের দোষ দেওয়া যায় না। দোষ তারই। হৃতগৌরব উদ্ধারের চেষ্টা সে আর করেনি। তার চেয়ে নিজেই সরে গিয়ে মেসের ঘরে আশ্রয় নিয়েছে। তাতে বাবার কোন অসুবিধা হয়নি। সঞ্জয়ের চেয়ে বেশি কর্মক্ষম রঞ্জিৎ আর অঞ্জনই তখন বাবার ডান হাত বাঁ হাত হয়ে উঠেছে। সঞ্জয়কে বিয়ের জন্যে দু'একবার অনুরোধ করা হয়েছিল। সে রাজি হয়নি। কিন্তু গৃহিণী ছাড়া তো সংসার চলতে পারে না। তাই রঞ্জিতই বিয়ে করেছে আগে। তার ফলে যথাকালে অঞ্জনও বউ এনেছে।

পরিতোষবাবু আবার ডেকে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু সঞ্জয় আর ওমুখো হয়নি। গিয়ে কী করবে? পরিতোষবাবুর সেই পত্রিকা উঠে গেছে, প্রেস বিক্রি করে দিয়েছেন, গ্রন্থ সংকলনের নেশাও আর নেই। জীবিকার জন্যে আরো গুপ্ত সুড়ঙ্গপথ তিনি অবলম্বন করেছেন। সে পথ সম্বন্ধে সঞ্জয়ের কোন ধারণা নেই। কিন্তু ওসব গুপ্তের পথিকদের ছায়াও যে সে মাড়াবে না সে সম্বন্ধে তার মন নিঃসংশয় হয়েছে।

সঞ্জয় স্কুলে মাষ্টারি করে, সকাল-সন্ধ্যায় ছেলে পড়ায়। মেস খরচা বাদে, নিজের সামান্য হাত-খরচা বাদে যা বাঁচে বাবার হাতে দিয়ে আসে। কিন্তু বাবা তাতে খুশি হন না।

'কে চায় তোর টাকা? আমি কি টাকার কাঙাল?'

'কে বলে তুমি কাঙাল? আমি নিজেই দিচ্ছি। দেওয়া আমার কর্তব্য তাই দিচ্ছি।'

'থাক, তুই আর কর্তব্যের দোহাই পাড়িসনে। তুই যে কত কর্তব্যপরায়ণ, কত সৎপথে চলছিস তা আমার জানা আছে।'

সঞ্জয় প্রতিবাদ না করে সরে এসেছে।

এরপর আর বাবার হাতে টাকা দেয়নি। বোনের হাতে দিয়েছে।

রেবা ছলছল চোখে বলেছে, 'দাদা, তুমি কেন মেসে পড়ে থাকো। আমাদের সঙ্গে এসে

থাকো না। তুমি তো সবই দাও। টাকা-পয়সা দাও, বইটই কিনে দিয়ে যাও। শাড়ি-ব্লাউজ সাবান-স্নো সবই তোমার কাছ থেকে পাই, শুধু তোমাকেই পাই না।'

সঞ্জয় সস্নেহে ছোট বোনের গাল টিপে দিয়ে বলেছে, 'খুব বড় বড় কথা শিখেছিস। আমাকে আবার কী পাবি। যাকে পাওয়া দরকার তাকে খুঁজে এনে দেব। দুটো দিন সবুর কর।'

কিন্তু সবাইর কাছ থেকে সরে থাকতে পারলেও একজনের কাছ থেকে সরে থাকতে পারেনি সঞ্জয়। স্বামীর সঙ্গে কিছুতেই বনিবনাও হয়নি সুনন্দার। পরিতোষবাবু সুনন্দাকেও রাখতে চান, মধুকেও রাখতে চান। একজনের সঙ্গে সম্পর্ক প্রকাশ্য আর একজনের সঙ্গে প্রচ্ছন্ন। সুনন্দা এই ব্যবস্থা মেনে নিতে পারেন নি। তিনি ছেলেকে নিয়ে দূর সম্পর্কের এক খুড়তুতো ভাইয়ের কাছে চেংলাব আছেন। এখবর সঞ্জয় আগেই পেয়েছিল। সুনন্দার চিঠিতে তারই সমর্থন পেল।

সুনন্দা লিখেছেন, 'বড় অসুবিধের পড়েছি। একদিন এসে যদি দেখা কর খুব খুশি হব।'

সঞ্জয় না গিয়ে পারেনি। সেও তো নির্বান্ধব নিঃসহায়। সুনন্দার ডাকে সে সাড়া না দিয়ে পারেনি।

দাদার বাসায় একটি ঘর নিয়ে থাকেন সুনন্দা। তিনিও চিচাচি করেন। দেখতে রোগা হয়ে গেছেন। হঠাৎ যেন বয়সের ছাপ পড়েছে মুখে।

সঞ্জয় ভেবেছিল আর্থিক অসুবিধার কথা বলবেন সুনন্দা। কিন্তু তা তিনি বললেন না। নিজের অসুখ বিসুখ অস্বাস্থ্য নিয়েও কোন কথা তুললেন না। বরং সঞ্জয়ের স্বাস্থ্য খারাপ হয়েছে দেখে উদ্বেগ জানালেন। বিয়ে টিয়ে করছে না কেন মৃদু অনুযোগ দিলেন। পরিহাস করলেন একটু।

আসল সমস্যা তুলতে নিয়ে। ছেলেকে নিয়ে যেতে চান পরিতোষবাবু। কিন্তু সুনন্দা ছেলেকে ছাড়া থাকতে পারেন না। অতটুকু ছেলেই বা মাকে ছেড়ে থাকবে কী করে?

পরিতোষবাবু এই নিয়ে চিঠি লেখালেখি করছেন। শাসিয়েছেন উকিলের চিঠি দেবেন। লিখেছেন, 'শ্রব যদি তোমাকে ছাড়া থাকতে না পারে—ওকে নিয়ে তুমি আমার বাড়িতে থাকো। কিন্তু আমার ছেলেকে অন্যের আশ্রয়ে মানুষ করবে তা হতে দেব না।'

সঞ্জয় বলল, 'ঠিকই তো বলেছেন।'

সুনন্দা বললেন, 'আমি জবাব দিয়েছি মধুকে তুমি যতদিন ত্যাগ না করবে আমি তোমার বাড়িতে যাব না। তুমি যদি আইন আদালত কর। আমিও যাব সেখানে। আমারও বলবার কথা আছে।'

দেখ দুজনেরই সমান। পরিতোষবাবুও তাঁর পথ ছাড়বেন না, সুনন্দাও তাঁর মত ছাড়বেন না। তবে আইন আদালতের ভয় যতই দেখান পরিতোষবাবু সেদিকে শেষ পর্যন্ত যেতে চাইবেন না। হয়তো তাঁরও দুর্বলতা ছিল।

তবু তিনি সঞ্জয়কেও দেখাতে ছাড়েন নি। চিঠি দিয়ে জানিয়েছেন সুনন্দা স্বামীর কাছে ফিরে যাচ্ছেন না এর মূলে আছে সঞ্জয়। তারই পরামর্শে তিনি এমন ঘুরে সরে আছেন। সঞ্জয় যদি এখনো সুপরামর্শ না দেয় তিনি শোধ না নিয়ে ছাড়বেন না। ব্যাপারটাকে তিনি আদালত পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাবেন।

এসব চিঠির কোন জবাব দেয়নি সঞ্জয়। ভয় পায়নি। যা খুসি করবার তিনি করুন।

কিন্তু পরিতোষবাবু করেন নি শেষ পর্যন্ত কিছুই।

ছাড়াছাড়িটাই সকলে মেনে নিয়েছে। আর বেশি কলহ কলরোল চৈ চৈ হট্টগোল যে নিষ্ফল তা বুঝতে পেরেছে সবাই।

পরিতোষবাবু দ্বিতীয়বার বিয়ে করে সুখেই হয়েছেন। সুনন্দা অবশ্য অত তাড়াতাড়ি মন স্থির করতে পারেন নি। ছেলে বড় হয়ে উঠেছে। সে কী ভাববে। তাই বছরের পর বছর শুধু বয়স হিসাবেই রয়েছে সঞ্জয়। অধীর হয়ে ওঠেনি, অসহিষ্ণু হয়নি। দিনের পর দিন অপেক্ষা করেছে।

তারপর অবশ্য সুনন্দা রাজি হয়েছেন। নিজেই প্রস্তাব করেছেন, 'এভাবে থাকাটা আর ভালো দেখায় না। তুমি যখন বিয়ে করলেই না, সংসারী হলেই না, এসো এক বাড়িতেই থাকি। সম্পর্কটাকে বৈধ করে নেওয়াই ভালো। ছেলে বড় হয়েছে। সেও এখন তাই বলে।'

যেন ছেলের অনুমতির জন্যেই অপেক্ষা করছিলেন সুনন্দা।

সঞ্জয় ইচ্ছা করলে 'না' করতে পারত। বলতে পারত, 'এখন আর তার দরকার নেই সুনন্দা। এখন আমরা দুজনেই উত্তীর্ণ যৌবন। বাকি দিনগুলি, যেমন আছি আমাদের কেটে যেতে পারে।'

কিন্তু সঞ্জয় তা বলেনি। বলতে পারে নি। নারীর ঘর বাঁধার আগ্রহকে অপমান করতে সায় দেয়নি তার মন।

সঞ্জয় নিজেও কি কোন একটা আশ্রয় চাইছিল?

যৌবনের সেই উত্তালতা উদ্দামতা এখন অন্তর্হিত। দ্বিতীয় সন্তান হবার আশাও আর সুনন্দার নেই। সে কথা জানিয়ে দিয়েছেন। এ ভার্যা পুত্রার্থে ক্রিয়তে নয়। শুধু ভার্যার জন্যেই ভার্যা।

তবু সঞ্জয় রাজি না হয়ে পারে নি।

ধ্রুবও সব মেনে নিয়েছে। তার সঙ্গে এখন সঞ্জয়ের মোটামুটি প্রীতির সম্বন্ধ একটা কিছু স্বীকার করে। কিন্তু কোন রকম সম্বোধন করে না। ধ্রুব মিতভাষী। ধীর শান্ত। ও ঠিক যত কাছের, তত দূরের।

একটু বড় হওয়ার পর ওকে হস্টেলেই রেখেছে সুনন্দা। এখনো হস্টেলেই থাকে। তবু বাড়িতে ওর জন্যে আলাদা একটি ঘর আছে। ছুটি-ছাটায় সে ঘরে এসে থাকে ধ্রুব। নিজের ঘরে নিজের মনে নিজের পড়াশুনো নিয়ে থাকে। তখন ওর আর নাগাল পাওয়া যায় না। যেন কাছে থেকেও কাছে নেই।

কোথায় যেন একটু অস্বস্তি বোধ করে সঞ্জয়। নিজের যেন এক অপরাধ বোধ খোঁচা দেয়। ভাবে কী দরকার ছিল, এই বিয়ের কী দরকার ছিল।

সুনন্দার উৎসাহ উদ্যম আয়না-জমি বাড়িটাড়ি করবার ইচ্ছা দেখে সঞ্জয়ের মনে হয় না সে আর এখন কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যে আছে। সে সব ভুলে গিয়ে সুখী হতে চায়, স্বামী পুত্রকে সুখী করতে চায়। পূর্ব জীবনের কথা সে আর মনে করতে চায় না।

আশ্চর্য পরিতোষবাবু তবু সব কথা তাকে আজ মনে করিয়ে দিয়েছেন। দেখবার জন্যে ডেকে পাঠিয়েছেন। তিনি নাকি সব বিরোধ মিটিয়ে নিতে চান।

এই আনুষ্ঠানিক নিষ্পত্তিতে সঞ্জয়ের বিশ্বাস নেই। সুনন্দা যদি যেতে চায় যাক। ধ্রুব যদি যেতে

চায় থাক। সঞ্জয় যেতে পারবে না। এতদিন বাদে পরিতোষবাবুর খুব একটা যে রাগ আছে তা নয়। ধীরে ধীরে সব সয়ে গেছে। বিরাগ বিদ্বেষ আকাঙ্ক্ষা আগ্রহ সব স্তিমিত হয়ে এসেছে। কিন্তু আবার দেখা হলে সব কিরে আসতে পারে। কের দেখা সাক্ষাতে যে নাটকীয় মুহূর্তের সৃষ্টি হবে তা সহ্য করবার শক্তি সঞ্জয়ের নেই। কি শক্তি থাকলেও ইচ্ছা আর আগ্রহের অভাব। ওরা ঘুরে আসুক। সঞ্জয় ততক্ষণ বাড়িতে বসে থাকবে। কি একা একাই বেরিয়ে পড়বে। পার্কে গিয়ে বসে থাকবে। না হয় পথে পথে ঘুরবে। নিজের নিঃসঙ্গতাকে উপভোগ করবে সঞ্জয়। নিঃসঙ্গতা কি সে বাড়িতে থেকেও বোধ করে না? সুনন্দা আর ধ্রুব যখন নিজেরা বসে কথাবার্তা বলে, ছেলে তার সাধ-আহ্লাদের কথা মার কাছে বলে, আর মা বসে বসে শোনে আর মুখ টিপে টিপে হাসে তখন কি সঞ্জয়ের মনে হয় না সে এদের মধ্যে বহিরাগত। বিয়েই করুক আর যাই করুক সঞ্জয় সুনন্দাকে যেন পুরোপুরি পায়নি। ওর দেহের মধ্যে সন্তান হয়ে পুনর্জন্ম নিতে পারেনি সঞ্জয়। ধ্রুবকে সম্পূর্ণ করে পাওয়ার তো কথাই ওঠে না। ওরা দুজন তো একসঙ্গে অনেক জায়গাতেই যায়। যদি আরো এক জায়গায় যেতে চায় যাক। সঞ্জয় বাধা দেবে না। কিন্তু সে যাবেও না ওদের সঙ্গে।

'কী বসে আছ যে? চান করতে যাবে না? কত বেলা হল দেখ তো।'

সুনন্দা এসে স্বামীকে তাগিদ দিল।

'এই যাচ্ছি।'

'না না, এবার ওঠো। যাও আর দেরি কোরো না।'

ধ্রুব ওর বন্ধুদের সঙ্গে কোথায় বেরোল। চান-টান করেই গেছে। এসেই খেতে চাইবে। আমরা আজ এক সঙ্গে বসে যাব। যাও, আর দেরি কোরোনা।'

সুনন্দা স্বামীর পিঠে হাত রাখল। যেন ধ্রুবর মত এও আর একটি অবুঝ অশান্ত ছেলে।

স্নানের তাগিদে আজ বোধহয় একটু বিরক্তই হল সঞ্জয়। স্নিগ্ধা করস্পর্শে যেন তার অসহিষ্ণুতা বাড়ল।

সঞ্জয় তাড়াতাড়ি উঠে কাপড় আর তোয়ালে নিয়ে বাথরুমের দিকে এগিয়ে গেল।

সুনন্দা একটু আগেই স্নান করে এসেছে। পিঠে এলো চুলের রাশ ছড়ানো। হাতে দুগাছি করে চুড়ি আর শাঁখা। সিঁথিতে সিঁদুরের রেখা, কপালে ফোঁটা। লাল পেড়ে সাদা খোলের শাড়ি পরণে। কী ভেবে সুনন্দা আজ এসব পরেছে কে জানে। অন্তত পূর্ব স্বামী পরিতোষবাবুর কথা ভেবে পরেনি। তিনি এসব পছন্দ করতেন না। তিনি বয়সে প্রবীণ কিন্তু মতামতের দিক থেকে অনেক আধুনিক। তিনি ধর্ম মানতেন না ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানেও তাঁর কোন বিশ্বাস ছিল না। সুনন্দা যখন তাঁর স্ত্রী হয়ে ছিল তখন তার এমন গৃহিণীর সজ্জা ছিল না।

তিনি বলতেন, 'তোমার অমন লক্ষ্মীঠাকরুণ হয়ে থাকার দরকার নেই। আমি নিজে অলক্ষ্মীর চেলা, উড়ন চণ্ডী। আমার ঘরে ওসব মানায় না।'

সুনন্দা বরং সঞ্জয়ের কথা ভেবেই আজ এসব পরেছে?

সঞ্জয় পছন্দ করে গৃহশ্রী, লক্ষ্মীশ্রী। পুজো-পার্বণ সেও পছন্দ করে না কিন্তু আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে যেখানে তার চোখে সৌন্দর্য ধরা পড়ে সেটুকু সঞ্জয় রেখে দিতে চায়।

সঞ্জয় বলে, 'আমার মা ঠিক ওই রকম করে সাজতেন না। গয়না-গাঁটি তো ছিল না। সিঁদুর আর আলতাই ছিল তাঁর একমাত্র প্রসাধনের বস্তু।

গয়না-গাঁটি সুনন্দারও বেশি নেই। সঞ্জয় গড়িয়ে দিতে চেয়েছে, কিন্তু সুনন্দাই রাজি হয়নি। হেসে বলেছে, 'গয়না পরতে আমার ভালো লাগে না।'

সঞ্জয়ের হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে তুলে নিয়ে বলেছে, 'এই তো আমার গয়না।'

এই আদর এই কৃতজ্ঞতা সঞ্জয়ের প্রাপ্য। সঞ্জয় তার জন্যে অনেক করেছে, অনেক সয়েছে। সেই তুলনায় সুনন্দা ওকে কীই বা দিতে পারল। আর যাই হিক সন্তান দিতে পারেনি। পারবে না যে সে কথা সুনন্দা আগেই বলেছিল। ধ্রুব হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আর তারো আসার পথ বন্ধ করে দিতে হয়েছে। নইলে সুনন্দা নিজে বাঁচত না। প্রকৃতি যেন তাকে বলে দিয়েছে 'তোমার আর মা হয়ে দরকার নেই তুমি শুধু প্রিয়া হয়ে থাকো', কিন্তু তাই কি আর হয়? আরো মা হতে ইচ্ছা করে। অন্তত আর একবার মা হতে ইচ্ছা করেছে সুনন্দার। নিজের জন্যে নয় সঞ্জয়ের জন্যে। কিন্তু শুধু ইচ্ছা করলেই তো আর হয় না। চাইলেই মানুষের সব ইচ্ছা পূর্ণ হয় না।

সন্তান যে আর হবে না সে কথা প্রথম প্রথম অস্পষ্ট ভাবে আকারে ইঙ্গিতে তারপর স্পষ্ট ভাষাতেই সঞ্জয়কে জানিয়ে দিয়েছিল সুনন্দা। বিয়েতেও দ্বিধা যে তার এজন্যে সে কথা বলেছিল। 'আমি তো তোমাকে সব আনন্দ দিতে পারব না।'

একটু থমকে গিয়েছিল সঞ্জয়। মুখে কিসের যেন একটু ছায়া পড়েছিল। কিন্তু পরক্ষণেই সেটুকু কাটিয়ে উঠে হেসে বলেছিল, 'তাতে কি হয়েছে? তোমাকে পেলেই আমি সব পাব। তাছাড়া বংশধর রেখে যাওয়াই তো জীবনের একমাত্র গৌরব নয়। বলা যায় না বুড়ো বয়সে কীর্তিধরও তো হতে পারি।'

একটু থেমে সঞ্জয় বলেছিল, 'তাছাড়া আমাদের ধ্রুবই তো আছে। সে আমাদের দুজনেরই। তোমার কারুর আর আমার মনোজাত।'

ধ্রুব অবশ্য সঞ্জয়ের কাছে সে ভাবে ধরা দেয়নি। কিছু বলে ডাকে না। অবশ্য ডাকাটা কঠিন। প্রথম প্রথম মাঝে মাঝে কাকা বলত। এখন কী বলবে? কিছুই বলে না। বি-পিতার ওপর তার যে বিরূপতা আছে তা নয়। সঞ্জয়কে সে শ্রদ্ধা করে। তার ত্যাগ, তার একনিষ্ঠ প্রেমকে স্বীকৃতি দেয়। এখন তো বড় হয়েছে। এম. এ. পড়ে ছেলে। সবই জানে, সবই শুনেছে সবই বোঝে।

তবু ধ্রুব সঞ্জয়ের কাছ থেকে যেন দূরে সরে থাকতে চায়। সামনে এলে ওর লজ্জা জড়তা আড়ষ্টতা যেন কিছুতেই কাটতে চায় না।

ধ্রুব যে তাদের দুজনের ছাড়া আরো একজনের একথা যেন সে অনুভব করতে পারে না। ভুলতে কি সুনন্দাই সব সময় পারে? ওর চোখা ধারবার সে কথা মনে করিয়ে দেয়। নাক চোখ মুখের ভৌল জোড়া ভ্রু সব তাঁর মত। গায়ের গৌরবর্ণও বাপেরই পেয়েছে। মনে মনে প্রার্থনা করে সুনন্দা ধ্রুব যেন তাঁর আর কিছু না পায়। স্বভাবটা না পায়।

ধ্রুব যে তাঁরও একথা ধ্রুবর বাবাই কি ভুলতে পেরেছেন না পারেন? এই ছেলেকে নিজের কাছে নেওয়ার জন্যে তাঁর কী জেদ, তাঁর কী শাসন, কত রকম ভয় দেখানো। এমন কি আইন আদালতের ভয়ও দেখিয়েছেন। কিন্তু ছেলের অধিকার সুনন্দা ছাড়েনি। কিছুতেই ছাড়েনি। এমন কি সঞ্জয়ের বন্ধুত্ব

আর প্রথম হারোবার ভয়েও ছাড়েনি। সুনন্দা জানত ছাড়লে আর ছেলেকে সে ফিরে পাবে না। ছেলে তার বাপের মত হবে। বাপের শিক্ষা দীক্ষায় মানুষটাকে অমানুষ করবে। অবশ্য অনেক গুণ আছে প্রবীর বাবার। সাহস দৃঢ়তা, কর্মশক্তি অনেক গুণই আছে। কিন্তু নানা দোষের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। সবাই তো আর তা বেছে নিতে পারে না। বেশির ভাগ লোকই গুণ বাদ দিয়ে দোষগুলিকে তুলে নেয়। ছেলেও যে তাই নিত না তার কী মানে আছে। তাই ছেলেকে বাপের কাছ থেকে এমন করে সরিয়ে রেখেছে সুনন্দা। শুধু স্নেহের জন্যে নয় শুধু স্নেহের জন্যে নয়, ছেলের ভালোর জন্যেও। ওই তো সম্বল। আর তো হবে না। ছেলে যদি মানুষ হয় তাতে সবাইরই মঙ্গল।

একথা ছেলের বাপ প্রথমে বুঝতে চায়নি। যেরকম ভয় দেখিয়েছেন। আইন আদালতের ভয়ও তার মধ্যে ছিল।

অবশ্য সুনন্দা জানত আদালতে উনি যাবেন না। অনেক অসুবিধা আছে ওঁর অনেক রকম অনেক ব্যাপার আছে যা বেরিয়ে পড়লে ক্ষতি। সুনন্দা ইচ্ছা করলে তেমন ক্ষতি করতে পারত। কিন্তু তিনি আর এগোননি। সুনন্দার এগোবার কোন কথাই ওঠে না। সে শুধু আত্মরক্ষা করতে চায়, আর বাড়িয়ে কাউকে আঘাত দিতে চায় না।

আদালতে উনি যেতেন না। সুনন্দার সঙ্গে ওঁর যে বিয়ে হয়েছে তার তো কোন প্রমাণ নেই। আসলে বিয়ে হয়ই নি। উনি বলতেন, 'বিয়ে-টিয়ে আবার কি? আমি ওসব মানিনে।'

তিনি কিছুই মানতেন না। সুনন্দার বিধবা মার সঙ্গেও ওঁর যে সম্পর্ক ছিল তা বিবাহ বিধির বাইরে। বড় হয়ে সুনন্দা তা বুঝতে পেরেছে। অবশ্য প্রথম প্রথম তেমন ভালো করে বুঝত না। ওঁর সঙ্গে মার ঘনিষ্ঠতা দেখে হিংসা হত সুনন্দার। সেই হিংসাকে উনি কাজে লাগালেন। কিন্তু মার মনে যে এত হিংসা, আর সেই হিংসার চোটে তিনি আত্মহত্যা করবেন তা কি আর সুনন্দা ভাবতে পেরেছিল? দুঃখে কি বুক ফেটে যায়নি সুনন্দার? সে কি আর বিছানা ছেড়ে কদিনের মধ্যে উঠতে পেরেছিল? তিনিই হাত ধরে তাকে তুলেছিলেন। সে হাত আর ছাড়েন নি। সুনন্দা নিজেই ছাড়িয়ে নিয়ে এসেছে। ওরতেই জানত তাদের জীবনে মায়ের অভিশাপ লাগবে। তাই লেগে গেল। শেষ পর্যন্ত সুখ হল না।

শুধু সুখ চেয়েছে সুনন্দা। কে না চায়? অনেক অপমান লাঞ্ছনা আর দুঃখের পরে সেই সুখের রেখা মিলেছে। স্বামীর সুখ সন্তানের সুখ।

সুনন্দা মার হাত থেকে ওঁর বন্ধুকে কেড়ে নিয়েছিল। নিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেনি। সব সময় মনে হত ওঁকে আবার কে কেড়ে নিয়ে যাবে। নিয়েও ছিল। শুধু কি মনু? মনুর আগেও অনেকে এসেছে পরেও অনেক এসেছে। ওঁকে পুরোপুরি কোনদিন পায়নি। বিশ্বাস করেনি। সেই অবিশ্বাসের দুঃখে সবচেয়ে নিজেই বেশি যন্ত্রণা পেয়েছে।

কিন্তু সঞ্জয় তাকে কোন দুঃখ দেয়নি। সঞ্জয় পরম বিশ্বাসী বন্ধু বিশ্বস্ত প্রণয়ী, নিষ্ঠাবান স্বামী। সঞ্জয়কে কেউ কেড়ে নিতে পারবে না, সুনন্দার তুলনায় অন্য কোন তরুণী মেয়েকে দেখে সঞ্জয় প্রলুব্ধ হবে না একথা সুনন্দা জানে। একজন সম্পূর্ণ আমার এ জানাই কি কম সুখ। মনে হয় সব সুখ ওই সহজ বিশ্বাসটুকুর মধ্যে সহজ জানটুকুর মধ্যে আছে।

সুনন্দাও সঞ্জয়কে সুখী করার জন্যে সব দিকে চেষ্টা করেছে। প্রথমে বান্ধবী হিসাবে হিতৈষিণী

ভারতীয় ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত প্রথম শ্রেণীর দৈনিক

আনন্দবাজার পত্রিকা

আনন্দবাজার পত্রিকা শুধুই সর্বাধিক প্রচারিত নয়, সর্বাধিক জনপ্রিয়ও। তার কারণ অনেক। নির্ভীক ও বলিষ্ঠ সম্পাদকীয়, সুসম্পাদিত সংবাদ পরিবেশন আর বহুবিধ বিশেষ প্রবন্ধমালা।

যে-কোনো দিনের কাগজ
বৈচিত্র্যে, সুমুদ্রণে ও স্বকীয়তায়
আপনাকে মুগ্ধ করবে।

সংবাদপত্র জগতে নিঃসন্দেহে বৈচিত্র্য এনেছে আনন্দবাজার পত্রিকা

দেশের সেরা

দেশ

সচিত্র সাপ্তাহিক পত্রিকা

গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, রম্যরচনা, কার্টুন, রসরচনা, বিচিত্র বার্তা, রঙ্গজগৎ, সঙ্গীত, পুস্তক সমালোচনা, ক্রীড়াজগৎ প্রভৃতি বহুবিধ রচনায় ভরপুর।

খ্যাতনামা লেখকরাই দেশ
পত্রিকায় লেখেন।

যেখানে প্রতিদিন দৈনিক কাগজ পৌঁছায় না,
দূর গ্রামে যাঁরা বাস করেন,
তাঁদের জন্যে আছে

অর্ধ-সাপ্তাহিক

আনন্দবাজার পত্রিকা

প্রতি সোম ও শুক্রবার

প্রতি সংখ্যায় থাকে নিয়মিত সংবাদ, সম্পাদকীয় এবং রবিবাসরীয় বিভাগের বিশিষ্ট রচনা।

ইংরেজী খবরের কাগজ যাঁরা পড়েন তাঁদের জন্যে আছে

হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড

এমন ভাল কাগজ আর দ্বিতীয় একখানি নেই

আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাইভেট লিমিটেড

৬, সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা-১

হিসাবে সঞ্জয়ের কল্যাণের চিন্তাই সে করেছে। নিজের জীবনের কথা সব খুলে বলেছে সঞ্জয়কে। দোষের কথা পাপের কথা অন্যায়ের কথা কিছুই গোপন করেনি। শেষে অনুরোধ করেছে, 'তুমি আমার সঙ্গে তোমার পবিত্র জীবনকে জড়িয়ো না।

সঞ্জয় জিজ্ঞাসা করেছে, "তুমি অপবিত্র কিসে? তুমি আমাকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসো। সেই ভালোবাসা সব কলুষ নাশ করে আমি জানি। তোমার কখনোই কোন দোষ ছিল না, এখনো নেই।"

সুনন্দা হেসে বলেছে, 'মানুষ কি কখনো নির্দোষ হয়? একেবারে নিখুঁৎ? তা হয় না তবে তোমার জন্যে আমার কের সেই কিশোরী কুমারী হতে ইচ্ছা করে।'

সঞ্জয় তাকে আরো কাছে টেনে নিয়ে বলেছে, 'হতে ইচ্ছা করে কি, তুমি তাইতো রয়েছ। আমার কাছে তুমি তাই। অনাঘ্রাতা কুসুম, অনাস্বাদিত মধু।'

একটু চুপ করে থেকে বলেছে, 'কিন্তু আমার জন্যে তুমি তোমার বাবা ভাইবোনদের ছেড়ে আসবে তা আমি হতে দিতে পারব না। আমার এমন কি সাধ্য আমি একা তোমার সব অভাব পূর্ণ করব? সব সাধ আহ্লাদ মিটাব?"

সঞ্জয় জবাব দিয়েছে 'ছাড়ব কেন। তাদের সঙ্গে আবার আমি যোগাযোগ করব। তাদের ফিরে পাবার চেষ্টা করব। আমি জানি পাবও। তোমাকে পেয়ে আমি শুধু একটি সংসারই পাব না, অসৎ সংসারকেও পাব।'

সুনন্দা কিন্তুতেই ওকে নিবৃত্ত করতে পারেনি। দুজনে মিলে সংসারী হয়েছে।

সঞ্জয়ের স্ত্রী হবার পর পূর্ব জীবনের কথা সম্পূর্ণ ভুলে গেছে সুনন্দা। চেষ্টা করে ভুলতে হয়নি। সঞ্জয় আর পরিবেশ আপনিই সব ভুলিয়ে দিয়েছে। যদি বা কখনো মনে পড়েছে সুনন্দা নিজে থেকে সে প্রসঙ্গ কখনো তোলেনি। সঞ্জয়ের মনে সে কোন ঈর্ষার উদ্রেক করতে চায় না।

সুনন্দার জন্যে কি সত্যিই বাবা সত্যিই অপেক্ষা করেছিলেন? কে জানে? সুনন্দার সে কথা বিশ্বাস হয় না। শেষে তিনিও বিয়ে করলেন। মন্ত্রপড়া বিয়ে না, কি। মেয়েটি কবে বিয়ে সে খোঁজ নিতে যায়নি সুনন্দা। তবে এইটুকু শুনেছে মহুকে তিনি বিয়ে করেননি। তা কি তিনি ছেড়ে দিয়েছেন। না কি মহু নিজেই ছেড়ে গেছে কে জানে।

নিজের ঘর সংসার হবার পর মহুর জন্যেই বরং সুনন্দার একটু দুঃখ হয়েছে। আহা, মেয়েটা সত্যিই ওঁকে ভালোবাসত। ভালোবাসার কী যে লক্ষণ তা তো সে জানে। ভালোবাসার কী যে জ্বালা তা হারাবার দুঃখ যে কত তীব্র তাও তার অজানা নেই। সে ঘরে তাঁর কের সন্ধান হয়েছে সে খবরও পেয়েছে সুনন্দা। জীবনের ধারাও হয়তো আস্তে আস্তে বদলে গিয়ে থাকবে সুনন্দা ঠিক জানে না। হয়তো এতদিনে সত্যিই গৃহস্থ হয়েছেন। তবে বাড়ির কিছু করতে পারেননি। বিষয় সম্পত্তিও না: বরং যেটুকু যা করেছিলেন সব খুইয়েছেন।

সঞ্জয়ই মাঝে মাঝে খবর আনত, 'জানো সুনন্দা, পরিতোষবাবুর সেই বীরদর্প আর নেই। নতুন কিছু করবার দিকে তাঁর যে ঝোঁক ছিল তা চলে গেছে। এখন আরো পাঁচজনের মতই শান্ত গোছ মানা জীবনযাপন। স্ত্রীপুত্র নিয়ে সেই গতানুগতিক ধারায় আত্মসমর্পণ।'

সুনন্দা হেসে বলত, 'ভালোই তো, সবাই তো তাই চায়। তিনিও সমাজবিরোধী না হয়ে যদি সমাজের পক্ষে থাকেন তাহলে তোমার আপত্তি করবার কি আছে?'

সঞ্জয় জবাব দিত, 'আমার আপত্তি থাকা না থাকায় কিছু এসে যায় না। কিন্তু মানুষটির বিয়ে'র যে কত বুড়ো ছিল এতে তার প্রমাণ পাওয়া গেল। আসলে দুর্নীতি আর বিদ্রোহ এক নয় স্বার্থপরতা যৌন অসংযম আর মৌলিক বৈপ্লবিক চিন্তা ভিন্ন জিনিস।' পরিতোষবাবু কোনদিনই বিদ্রোহী ছিলেন না। কেবল বিদ্রোহের ভান করতেন। যে সব সমাজে বিরোধী কাজ তাঁর স্বার্থের শুধু সেই কাজগুলি করতে পারলেই তিনি পরিতৃপ্ত হতেন। তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল স্বার্থসিদ্ধি। সেই সিদ্ধি তাঁর হয়নি। তাই তিনি একেবারে নিবে গেছেন।'

সঞ্জয়ের প্রায় সব কথাই সত্য। কোন একটি কথারও প্রতিবাদ করতে পারে না সুনন্দা। কিন্তু মন অন্য কথা বলে। সুনন্দার মন চায় ওই পরাজিত পরাভূত প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রতি সঞ্জয় আর একটু কম নিষ্ঠুর হোক, আর একটু সহানুভূতিশীল হোক। কিন্তু সঞ্জয় তা হতে পারে না। পরিতোষবাবুর নাম শুনলেই সে অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে। অন্যায়ের প্রতি তার যে ঘৃণা সেই ঘৃণাই হয়তো তাকে এমন উত্তেজিত করে। সেই ঘৃণা সুনন্দার মনেও কম ছিল না। তাঁর অসততা অসাধুতার প্রতিবাদ সেও কম করে নি। কিন্তু আজ যখন পরিতোষবাবু দুর্বল হীনবল, অসুস্থ হয়ে পড়েছেন তখনও কি সঞ্জয় ঠিক আগের মতই তাঁর নির্মম সমালোচক হয়ে থাকবে? সঞ্জয় তো এত উদার, এত মহত্ত্বায় কোমলতায় ভরা ওর মন! এমন সংবেদনশীল মানুষ সুনন্দা খুব কমই দেখেছে। কিন্তু পরিতোষবাবুকে ক্ষমা করতে পারেনি সঞ্জয়। তাঁর প্রতি সামান্য সহানুভূতিও যদি সুনন্দা দেখায় সঞ্জয়ের মুখ ভার হয়ে ওঠে। ভার ভাষা ভুল হয়, আচরণ বিকৃত হয়। সঞ্জয় তখন সুনন্দাকে ক্ষমা করতে পারে না সে বেশ বুঝতে পারে। তখন সঞ্জয়ের ভাষা ভুল হয়ে যায়, আচরণে অশোভনতা আসে। শিক্ষা রুচি সংস্কৃতির সংস্কৃতি যে কী বস্তু তা তো সঞ্জয়কে দেখেই শিখেছে সুনন্দা। সঞ্জয়ের চেষ্টা আর আগ্রহেই সে এম. এ. পাশ করেছে, এখনো পড়াশুনোর চর্চা করতে পারছে। পড়াশুনোয়, আলাপ আলোচনায় তারা পরস্পরের সঙ্গী। তাই সঞ্জয়কে দিয়েই সঞ্জয়ের বিচার করতে পারে সুনন্দা। ওর উদারতা দিয়েই ওর অনুদারতা সংকীর্ণতার বিচার করে। পরিতোষবাবুর ওপর এই স্থায়ী বিদ্বেষের কারণ যে কিছু কিছু না আছে তা নয়। তিনি সঞ্জয়কে যে সব চিঠি লিখেছিলেন তার ভাষা খুবই আপত্তিকর। কোন কোন চিঠি প্রায় সব চিঠিই দেখেছে সুনন্দা! সেগুলি ইতরতার পর্যায়ে নামে। সঞ্জয় সেগুলি সব সঞ্চয় করে রেখেছে। নিজের কাছে লুকিয়ে রেখেছে। কোথায় রেখেছে সুনন্দাও ভালো করে জানেনা। কোন কোন দিন হেসে বলেছে, 'ওগুলি রাখবার মত নয়। ছিঁড়ে ফেলে দাও। ও সব রেখে আর কি হবে।' সঞ্জয় বলেছে, 'ছিঁড়ে ফেলব একদিন।' সুনন্দা জানে, তা সে ফেলেনি। চিঠিগুলি রেখেই দিয়েছে। যেমন সুনন্দাও পুরোন চিঠিগুলিও রেখেছে তেমনি তার পূর্ব স্বামীর চিঠিগুলিও দলিল হিসাবে নজীর হিসাবে সংগ্রহ করে রেখেছে। আশ্চর্য মানুষ সঞ্জয়। সুনন্দা এক এক দিন ভাবে। প্রত্যেকটি পুরুষের চরিত্রেই কিছু না কিছু দুর্বোধ্যতা থাকে। সঞ্জয়েরও আছে।

এই কিছুদিন আগেও সঞ্জয় একদিন এসে উত্তেজিত হয়ে বলেছিল, 'জানো সুনন্দা মন্দাকিনীতে আমার যে সব লেখা বেরিয়েছিল সেগুলি নিয়ে পরিতোষবাবু একখানি বই করেছেন। সে বই তাঁর নিজের নামে চলছে। সে বইয়ে পরিতোষবাবুর দু'একটা আর্টিকেল থাকলেও থাকতে পারে। কিন্তু বেশির ভাগ লেখাই আমার।'

সুনন্দা সঙ্গে সঙ্গে কোন জবাব দিতে পারেনি। একটু পরে হেসে বলেছে, 'যাকগে তোমার সে সব কাঁচা লেখা দিয়ে, তুমি আর কী করবে।'

সঞ্জয় জলে উঠে বলেছিল, 'কাঁচা লেখা হলেও লেখাগুলি তো আমারই। যতই বল, সন্নিতোষ-বাবু একটুও বদলাননি। এখন ক্ষমতায় ঝুলোয় না, তাই দৌরাত্ম্য কমেছে। দাঁত পড়ে গেছে তাই নিরামিষাশী!'

সুনন্দা শুধু হেসে ব্যাপারটাকে হালকা করে দিতে চেয়েছিল, 'কেউ একজনের বউ ছেলে চুরি করে আবার কেউ একজনের বই খাতা চুরি করে।'

কিন্তু রসিকতাটা সঞ্জয় বুঝতে পারেনি কি বুঝতে চায়নি। তেমনি চটে উঠে বলেছিল, 'তুমি ওঁর সঙ্গে আমার তুলনা দিতে চাও? আশ্চর্য! আমি তোমাকে চুরি করে এনেছি এই তোমার ধারণা? আমি যে তা করিনি ম্যারেজ রেজিষ্টারের খাতা তার সাক্ষী।'

সুনন্দা বলতে পারত, 'আজ না হয় সেই খাতা সাক্ষী, তার আগে তো আর আমরা কোন সাক্ষী রাখিনি। ওঁর বাড়িতে ওঁরই শোবার ঘরে আমরা দুজনে সিঁদ কেটেছি।'

কিন্তু সুনন্দা এসব কথা বলেনি। এত বড় ঝাপটার পর যে ছোট একটি নীড় সে বেঁধে তুলেছে তাকে সুনন্দা আর কোন বিপদের মুখে ফেলতে চায় না। সঞ্জয়ের মনে কোন সংশয় এনে দিতে চায় না সুনন্দা। তাকে আর কোন অশান্তি দিতে চায় না।

সঞ্জয় তার জন্যে অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছে, অনেক দুঃখ বরণ করেছে। অনেক দিয়েছে তাকে সঞ্জয়। তার যৌবন তার দুর্যোবনস্বপ্ন আর সেই যৌবনের একনিষ্ঠ প্রেম। সেই নিষ্ঠা সুনন্দার কাছেও সে যদি আজ দাবি করে খুব অন্যায় করবে বলা যায় না। যদিও আর একটু উদার সঞ্জয় হতে পারত। এসব সত্ত্বেও ধ্রুবর বাবার সঙ্গে দেখা করতে যেতে পারত। কিন্তু সঞ্জয় যদি না চায় সুনন্দার কি যাওয়া সঙ্গত হবে? তাছাড়া একা একা যেতে তার সাহসও নেই। সেই মানুষটিকে আজও বড় ভয় করে সুনন্দা। শুধু তাঁর অনিষ্ট করবার ক্ষমতাকেই ভয় করে না, তাঁর তীব্র বাসনাতরা ভালোবাসাকেও ভয় করে।

'মা কার চিঠি?' ধ্রুব এসে ঘরে ঢুকল?

সুনন্দা একটু চুপ করে থেকে বলল, 'তোর বাবার।'

এ কথা শুনে ধ্রুব চুপ করে রইল। বাবার কথা মার কাছে অনেকদিন সে শোনেনি। এ বাড়িতে বাবার নাম উচ্চারিত হওয়া নিষেধ। তাঁর নামের সঙ্গে কোথায় যেন একটা অকল্যাণ, অশুচিতা জড়িয়ে আছে।

ধ্রুব বলল, 'কার কাছে লিখেছেন!'

সুনন্দা বলল, 'আমার কাছে।'

ধ্রুব বলল, 'ও।'

সুনন্দা বলল, 'তুই দেখতে পারিস।'

ধ্রুব এবার একটু লজ্জিত হল। মার চোখের দিকে না তাকিয়ে বলল, 'আমি আবার কী দেখব। কী লিখেছেন।'

সুনন্দা বলল, 'লিখেছেন তিনি খুব অসুস্থ। এর আগে স্ট্রোক হয়ে গেছে দুবার। সবাইকে দেখতে চান। যেতে লিখেছেন।'

ধ্রুব বলল, 'তোমরা যাবে তো?'

সুনন্দা একটু চুপ করে রইল। তারপর বলল, 'কী জানি।'

ধ্রুব চুপ করে রইল। তারপর বলল, 'কত বেলা হল। তোমরা যাবে রান্না করবে কখন?'

'রান্না তো অনেকক্ষণ হয়ে গেছে। তুই এখন বসবি?'

ধ্রুব বলল, 'আমি কেন বসব কেন! তোমরা সবাই যখন বসবে তখন বসা যাবে।'

সুনন্দা বলল, 'তাহলে যাই ওঁকে একটু তাগিদ দিয়ে আসি। সেই যে বাথরুমে ঢুকেছেন তো ঢুকেই বসে আছেন। বেরোবার আর নাম নেই। কতক্ষণ লাগে চান করতে। যাই দেখে আসি উনি বেরোলেন কিনা।'

ভিতরের দিকে চলে গেল সুনন্দা।

আশ্চর্য, চিঠিটা ফেলেই গেল মা। এ সব চিঠি কি এভাবে ফেলে রাখতে হয়?

চিঠিটা তুলে নিয়ে বুক পকেটে রাখল ধ্রুব।

বাবার হাতের লেখাটা ভালো। ইংরাজী বাংলা দুই লেখাই ভালো। খারাপ মানুষের হাতের লেখা কি ভালো হয়? গ্রাফোলজি কি বলে? ঠিক জানেনা ধ্রুব। তবে এইটুকু বলতে পারে একজন লোক যে মুহূর্তে সুন্দর করে একটি অক্ষর লেখে সেই মুহূর্তে সে সুন্দর। একজন লেখক যে মুহূর্তে একটি সুন্দর বাক্য রচনা করেন সেই মুহূর্তে তিনি সুন্দর। তার পরের মুহূর্তগুলির কথা কি আগের মুহূর্তগুলির কথা অবশ্য বলা যায় না। জীবন একটি নিটোল স্বচ্ছ মুহূর্তের মত নয়, একটুকরো রত্নের মত নয়। এক গুচ্ছ গোলাপ ফুলের মত নয়। যদি হত তাহলে কিন্তু বেশ হত।

বাবা যত খারাপ মানুষই হন ফুল বড় ভালোবাসেন। তাঁর মধ্যে যে কতকগুলি ভালো ভালো মুহূর্ত আসা যাওয়া করে এ তার প্রমাণ। সুন্দর বস্তুকে দেখবার, তাকে উপভোগ করবার যে শক্তি তাকি মানুষের এক মুহূর্তের ব্যাপার? তার জন্যে অনেকদিনের অভ্যাস দরকার। হাতের সুন্দর একটি অক্ষরও তাই। তার পিছনে অনেকদিনের যত্ন আছে। একটি সুন্দর বাক্য রচনার জন্যে কতদিনের সাধনা করতে হয় কে জানে।

বাবা ফুল বড় ভালোবাসেন। ধ্রুব হস্টেলে গিয়ে লুকিয়ে তাকে বই দিয়ে আসতেন। ঠিক জন্মদিনের দিন যেতেন না। জানতেন সেদিন ভিড় হবে। তাছাড়া সেদিন তো বাড়িতেই চলে আসত। জন্মদিনের দু একদিন আগে যেতেন কি দু একদিন পরে।

'আপনি কেন আমাদের বাড়িতে আসেন না?'

ছেলেবেলায় যখন কিছু বুঝত না তখন জিজ্ঞাসা করত। বাবাকে আপনি বলত ধ্রুব, এখনো বলে। বাবা তো কাছের মানুষ নয়। তিনি দূরে থাকেন, দূরে থেকে ভালোবাসেন।

'আপনি কেন আমাদের বাড়িতে আসেন না?' জিজ্ঞাসা করত ধ্রুব।

'তোমাদের বাড়ি? সে বাড়ি তো আমাদের বাড়ি নয়।' বাবা হেসে বলতেন।

'আপনি কেন আপনাদের বাড়িতে আমাকে নিয়ে যান না?'

বাবা বলতেন, 'তাইতো ভাবি মাঝে মাঝে। ভাবি যে নিয়ে যাব। কিন্তু তাতে তোমার মার বড় কষ্ট হবে।'

'মাকেও নিয়ে যান না কেন?' ধ্রুব তখন কিছু বুঝত না তাই জিজ্ঞাসা করত।

বাবা ঠিক উত্তর দিতে পারতেন না। কোন কোন বার হয়তো বলতেন, 'তাতে সবাইরই কষ্ট হবে।'

কিসের কষ্ট তা ঠিক বুঝতে পারত না ধ্রুব। বুঝবার পরে আর জিজ্ঞাসা করেনি।

প্রথম প্রথম বাবার এই লুকিয়ে লুকিয়ে দেখা করতে আমাকে খুব রোমান্টিক মনে হত ধ্রুবর। তারপর সব যখন শুনল, সব বুঝতে পারল তার মন গ্লানিতে ভরে উঠত। ইচ্ছা করত এদের কারো সঙ্গে কোন সম্পর্ক না রেখে সে দূরে অনেক দূরে চলে যায়। পরে বুঝেছে দূরে যাওয়ার জন্যে দূর দেশে যাওয়ার দরকার হয় না। একটু আড়ালই যথেষ্ট। চোখের আড়ালই যথেষ্ট। তেমন আড়াল রচনা করবার সুযোগ মা তাকে দিয়েছেন, সঞ্জয় কাকাও দিয়েছেন ধ্রুব নিজেই সে সুযোগ করে নিয়েছে। বাবা ভালো মানুষ নন, ওঁর অনেক দুর্নাম অনেক বদনাম মার সঙ্গে ওঁর বনিবনাও হয়নি, মা আর একজনকে ভালোবেসেছেন, ভালোবেসে বিয়েও করেছেন—এর প্রত্যেকটি কথা এক সময় ধ্রুবকে সহস্রমুখের মত বিঁধত। এই সব চিন্তা কত যে তার পড়াশুনোর ব্যাঘাত করেছে, রাতের পর রাত জাগিয়ে রেখেছে তার ঠিক নেই।

রুমমেট সহপাঠী বন্ধু চিত্ত সহানুভূতির সঙ্গে বলত, 'কী কিরে ধ্রুব কী হল তোর?

'কিছু হয়নি।'

চিত্ত কিছু কিছু জানত। একদিন ওকে বলেছিল ধ্রুব, খুব কম ছেলের সঙ্গেই সে মিশেছে। কারো কাছেই সে মনের কথা সে বলে না। তবু দুএকজন বন্ধু ছাড়া জীবনে চলে? একেবারে কারো কাছেই কি সব না খুলে পারা যায়? ধ্রুব চিত্তের কাছে মন খুলেছিল। চিত্ত সেই বিশ্বাসের অমর্যাদা করেনি। কাউকে এসব কথা জানায়নি। এসব নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ করেনি। সেই ফার্স্ট ইয়ার থেকে এই সিকস্ ইয়ার পর্যন্ত চিত্তের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব অটুট আছে।

চিত্ত তখনই একদিন তার বিছানার পাশে এসে উঠে বসেছিল। চিত্ত তার পিঠে হাত বুলাতে বুলাতে বলেছিল, 'ধ্রুব তুই ভাবিসনে। আমরা আজকালকার ছেলে। আমরা কেন ওসব গ্রাহ্য করব? মহাভারতের সেই কর্ণের কথা মনে আছে তোর? আমরা আমাদের জন্মের জন্যে দায়ী নই আমরা আমাদের কর্মের জন্যে দায়ী।'

চিত্তের বাবা মার জীবন সুখের স্বাচ্ছন্দ্য জীবন। ওকে এসব দুঃখ ভোগ করতে হয়নি। তবু চিত্ত ধ্রুবর ভাগ্যের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে বলেছিল, 'আমরা'। বন্ধুকে আলাদা করে দিয়ে বলেনি 'তুই।'

এমন আশ্বাস এমন সান্ত্বনা আর কারো কাছে পায়নি ধ্রুব। মার কাছে না, সঞ্জয় কাকার কাছে না। বাবার তো কথাই ওঠে না।

বাবা তাকে সান্ত্বনা দিতেন না, বরং সান্ত্বনা পেতে আসতেন। আশ্বাস আর ভরসা পেতেন তার কাছে।

একদিন বাবা বললেন, 'তোমার একখানা ফোটো আমাকে দেবে?'

ধ্রুব অবাক হয়ে বলেছিল, 'কী করবেন আপনি সে ফোটো দিয়ে ?'

'টেবিলের ওপরে স্ট্যাণ্ডে বাঁধিয়ে রাখব।'

ধ্রুব মনে মনে হেসেছিল। কত তরুণী মেয়ের ছবিই না জানি বাবার দেরাজে আলমারিতে রয়েছে। কি টেবিলের স্ট্যাণ্ডেও থাকতে পারে। ধ্রুব তো কোনোদিন গিয়ে দেখেনি ? তবু ধ্রুবর একখানি ছবিও তাঁর চাই।

ধ্রুব তার একখানা ফোটো বাবাকে দিয়েছিল। না দিয়ে পারেনি।

বাবা দেখে খুসি হয়ে বলেছিলেন, 'বাঃ ভারি সুন্দর উঠেছে তো। এত ভালো ছবি দেখলে আমারও ভালো হতে ইচ্ছা করে।' বাবা একটু কৌতুকের সুরে বলেছিলেন।

ধ্রুব জানে তার সবটুকুই কৌতুক নয়। হয়তো কিছুই কৌতুক নয়। কৌতুক শুধু বাইরের আবরণ মাত্র।

তারপর আরো বড় হয়ে বাবার চরিত্র নিয়ে অনেকদিন ভেবেছে ধ্রুব। মাঝে মাঝে যেসব জনশ্রুতি কানে এসেছে তা প্রীতিসুখকর নয়। পিতৃনিন্দা ধ্রুবকে চকল করে তুলেছে। তা যেন আত্মনিন্দার মত জন্মের জন্যে ধ্রুব দায়ী নয়। কিন্তু জনকের দায়িত্ব যেন সবটুকু অস্বীকার করা যায় না। তাঁর অসম্মানে নিজের মাথা হেঁট হয়। তাঁর দুষ্কৃতির বোঝা নিজের ঘাড়ে এসে পড়ে।

কেন এমন হয় ? ভেবে মাঝে মাঝে অবাক হত ধ্রুব। বাবার সঙ্গে শুধু রক্তের সম্পর্কের মিলটুকু আছে। আর কোন সম্পর্ক তো নেই। তাঁর সঙ্গে রুচির মিল নেই, বৃত্তির মিল নেই, প্রবৃত্তির মিল নেই, কোন মিল নেই ধ্রুবর। তবু কিসের এই মমতা এই একান্ত আত্মীয়তাবোধ ?

মিশনারী কলেজের মিশনারী হষ্টেলের কয়েকজন কাফারের সঙ্গে বরং বেশি ঘনিষ্ঠতা ধ্রুবর। কেউ কেউ বলেন ধ্রুব তাঁদের ভাবশিষ্য। ধ্রুবকেও তাঁরা ছেলের মতই ভালোবাসেন, শুধু ছাত্রের মত ভালোবাসেন না।

শুধু বাবাকে দেখলে, বাবার কথা ভাবলে ধ্রুবর মনে যে আবেগের সঞ্চার হয়, ব্রহ্মের গঞ্জর কাকাকে দেখলে তা হয় না, ফাদারদের দেখলে তা হয় না।

এই রহস্যের মূল কোথায় ? এর নামই কি জন্ম-রহস্য ? মৃত্যুর মতই বা অন্ধকারে আচ্ছন্ন ?

বাবার ওপর মমতা আছে বলে ধ্রুব যে তাঁর সব কাজ সমর্থন করে তা নয়। বাইরে সে পিতৃনিন্দা করে না। করে লাভ কি। কিন্তু মনে মনে কঠিন সমালোচনা করে। তাঁর যৌন-জীবনের, তাঁর কর্ম-জীবনের তাঁর সমগ্র জীবনের সে নির্মম সমালোচক।

একদিন সে বাবার সামনেই তাঁর সমালোচনা করেছিল। বাবা সেদিন তাকে টাকা দিতে চেয়েছিলেন, শুধু পকেট খরচা নয়, মাসে মাসে পড়ার খরচা দিতে চেয়েছিলেন।

ধ্রুব বলেছিল, 'আমাকে ক্ষমা করবেন, আপনার ও টাকা আমি নিতে পারব না।'

তিনি অবাক হয়ে বলেছিলেন, 'কেন ? আমার টাকা কী দোষ করল ?'

ধ্রুব বলেছিল, 'আপনার টাকার দোষ আছে। আপনার টাকার জাত নেই।'

বাবা কষ্ট হয়েছিলেন। তাঁর চোখ দুটি গরম হয়ে উঠেছিল। সেই হষ্টেলের ঘরে সেদিন আর কেউ ছিল না। ধ্রুবর মনে হয়েছিল প্রবল শক্তিতে তিনি ধ্রুবর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বেন। নিজের

সৃষ্টিকে ধ্বংস করবেন, তিনি। যে দুর্দম হিংস্র পুরুষের গল্প শুনেছে ধ্রুব সেই মুহূর্তে তাঁকে সে প্রত্যক্ষ করেছিল।

কিন্তু একটু বাদেই সেই রুদ্র মূর্তি শান্ত হয়েছিলেন। একটু হেসে বলেছিলেন, 'কে বলেছে তোমাকে এসব? যেই বলে থাকুক সব কথা সত্যি বলেনি। আমি তোমার কাছে নিজের দোষ খালন করতে চাইনে। আমি নিষ্কলঙ্ক এমন মিথ্যা কথাও তোমাকে আমি বলব না। তবে আমার সব অপরাধই ইচ্ছাকৃত নয়। অনেক ক্ষেত্রেই আমরা creature of circumstance. আমাদের অনেক অপরাধেই unrepented যায় না। আর প্রকাশ্যে হোক গোপনে হোক সব পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়।'

ধ্রুবর মনে হয়েছিল অনেকেই তাঁর বাবার সমালোচনা করেছেন। কিন্তু ছেলের হাত থেকে যে আঘাত সেদিন পেয়েছিলেন তেমন আঘাত আর কারো কাছে পাননি বোধ হয় দয়াময় কাছেও না।

কিন্তু আশ্চর্য সেই আঘাত যেন আত্মীয়তা আরো বাড়িয়ে দিয়েছিল।

তারপরেও বাবা আসতেন। কিন্তু টাকার কথা আর বলতেন না। বই দিতেন, ফুল দিতেন আর কিছু দিতে চাইতেন না।

বাবার কাছ থেকে আর কিছু নিও না ধ্রুব কিন্তু তাঁর স্নেহটুকু নিও। পিতার দুষ্কৃতি থেকে কি পিতৃস্নেহকে আলাদা করা যায়?

ধ্রুবর কখনো মনে হয় যায় না, কখনো মনে হয় যায়। ধ্রুব ভাবে, 'আমরা কখনো মানুষের গুণগুলিকে তার দোষ দিয়ে ঢেকে রাখি। একেবারেই দেখতে পাইনে। কখনো বা দোষের সঙ্গে জড়িয়ে দেখি। কিন্তু কোন কোন মানুষের বেলায় কোন কোন সময় গুণ আর দোষকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখতে পারি। চাল আর ধানকে আলাদা করে রাখি, কাঁকরগুলিকে দূরে ফেলে দিই! কোন্ দেখা আমাদের সত্যিকারের দেখা কে জানে?'

ধ্রুব মাঝে মাঝে ভাবে।

সঞ্জয় কাকা ঠাট্টা করে বলে, 'তুমি তো Born philosopher ধ্রুব। তুমি কেন ফিলজফি নিয়ে পড়তে গেলে? এর পরে তো সাত ডাকেও তোমার আর সাড়া পাওয়া যাবে না। তুমি বড্ড বেশি ভাবো।'

তা ঠিক। ধ্রুব ভাবে। ভাবতে ভালোবাসে। 'আমরা ভাবতে পারি আর সেই ভাবনার একটা ভাবরূপ আছে। লিখি আর না লিখি, কাউকে বলি আর না বলি সেই ভাবনা স্বপ্রকাশ। এর চেয়ে বড় আনন্দ আর নেই। তার বিলাস ছাড়া আর কোন বিলাস আমার নেই, আর কোন বিলাস আমি চাইনে।' ধ্রুব ভাবে।

বাবাকে সে আঘাত দিয়েছিল। কে জানে সেই আঘাতই তাঁর জীবনের মোড় ফিরিয়েছে কিনা। কিন্তু বাইরের আঘাতে কি কিছু হয়? কি আদেশে উপদেশে?

বাপও ছেলেকে ফেরাতে পারেন না, ছেলেও বাপকে ফেরাতে পারেন না যদি তিনি নিজে না ফেরেন।

বাবা হয়তো নিজেই ফিরেছেন কিন্তু বড় দেরি করে ফিরেছেন। ফিরেছেন যে সে প্রমাণ কি আর তিনি রেখে যেতে পারবেন?

॥ আসন্ন শারদীয়ার নবীন সাহিত্যোপহার ॥

আশাপূর্ণা দেবীর
এ যুগের নবীন উপন্যাস
রাণী শহরের কানাগলি ৪॥

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তর
নবতম তথ্যসমৃদ্ধ উপন্যাস
ঢল ঢল কাঁচা ৬॥

শম্ভু মহারাজের
নূতন ভ্রমণ কাহিনী
পঞ্চ প্রয়াগ ৫৲

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাস
পরিণত লেখনীর নবীন অবদান
নিবেদনমিদং ৭৲

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের
নূতন উপন্যাস
শহরে-বন্দরে ৪॥

নীহাররঞ্জন গুপ্তর
নূতন উপন্যাস
বহুত মিনতি ১০৲

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের
নবতম উপন্যাস
দ্বৈত সঙ্গীত ৩॥

বিমল করের
নূতন উপন্যাস
জীবনায়ন ৫৲

মহাত্মা গান্ধীর
নূতন অনুবাদ
আমার ধর্ম ৫৲

আর্নেস্ট হেমিংওয়ের
বিশ্ববিখ্যাত উপন্যাস
ফর হুম্ দি বেল্ টোল্স্ ৮৲

শচীন্দ্রলাল রায় সংকলিত একখানি আশ্চর্য গ্রন্থ
বাবরের আত্মকথা
সাড়ে পাঁচ টাকা

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
উপন্যাস : শিশু উপন্যাস : গল্প : ভ্রমণ : কবিতা : ডায়েরী : শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের খণ্ডাংশ। বিচিত্র রচনার নিদর্শন হিসাবে বিপুল একটি সংকলন গ্রন্থ
বিভূতি-বিচিত্রা ১২॥
বেশম বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৫৲

স্বামী ওঙ্কারানন্দের
উপনিষদ কথা ৪॥
উপনিষদ সম্বন্ধে মোটামুটি যাঁহারা জানিতে চান — উপনিষদের বিখ্যাত কাহিনীগুলির সহিত যাঁহারা পরিচিত হইতে চান — তাঁহাদের জন্য সহজ সরল বাংলা ভাষায় বইটি লেখা হইয়াছে।

॥ ছোটদের নূতন বই ॥

দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের
কিশোরদের জন্য লেখা চারিটি বিখ্যাত বই
একত্র সংকলিত
কিশোর-গ্রন্থাবলী ৪৲
চিত্রে চিত্রে চিত্রময়—বড় সাইজ

সুখলতা রাওয়ের
বনে ভাই কত মজাই ২৲
নানান দেশের রূপকথা ৩৲
মৌমাছির রূপকথার ঝুলি ৩॥

মিত্র ও ঘোষ, ১০ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

তাঁর সেই মোড় ফেরার কথা আর কেউ হয়তো জানতেই পারবে না। বিশ্বাসই করবে না। ভাববে ক্লান্ত হয়েছেন বলেই তিনি ফিরলেন বুড়ো হয়েছেন বলেই তিনি খুঁড়তে চাইলেন।

কিন্তু তা তো নয়। অনেক দিন আগে থেকেই তিনি ফিরি ফিরি করছিলেন। তিনি ফিরতে চাইছিলেন। ধ্রুব তার সাক্ষী।

[মানুষ একই বিছানায় শুয়ে একবার এপাশ ফেরে আর একবার ওপাশ ফেরে। একবার নীতির দিকে যায় আর একবার দুর্নীতির দিকে যায়।]

ধ্রুব তার সাক্ষী।

'কি ফিলজফার ঘুমিয়ে পড়লে নাকি!'

সঞ্জয় কাকা মানে সেরে মাথা ঝাঁচড়ে এসেছেন। অবশ্য ঝাঁচড়াবার মত চুল আর তাঁর বিশেষ নেই। প্রায় মাথা জুড়ে টাক পড়েছে।

সঞ্জয় কাকার গলায় সেদিন মুখে প্রসন্ন একটু হাসি। স্নানের পর মানুষকে স্নিগ্ধ আর শান্ত দেখায়। সুন্দরও দেখায় বোধহয়।

'ঘুমিয়ে পড়লে নাকি?'

সঞ্জয় কের একটু কৌতুকের সুরে জিজ্ঞাসা করল।

ধ্রুব তাঁর দিকে তাকাল। তাঁর দিকে চেয়ে একটু হেসেই বলল, 'না ঘুমোইনি। যখন তখন ঘুমোব কেন? আমি কি বুড়ো হয়েছি?'

সঞ্জয় বলল, 'আহা তুমি অল্পবুড়ো। জ্ঞানবৃদ্ধ।'

সুনন্দা এসে তাদের সামনে দাঁড়ায়, হেসে বলল, 'হ্যাঁ ধ্রুব হল জ্ঞানবৃদ্ধ আর তুমি কর্মকিশোর। খুব বুদ্ধ সবাই এবার চল। খেতে দিয়েছি।'

ধ্রুব উঠে দাঁড়াল, বলল, 'যাচ্ছি। কিন্তু একটা কথা।'

সঞ্জয় বলল, 'কী কথা?'

ধ্রুব বলল, 'বাবার চিঠি এসেছে জানেন বোধ হয়।'

অনেকদিন বাদে মনে হল জীবনে বোধ হয় এই প্রথম সে ওদের দুজনের সামনে বাবার নাম করল। তাঁর প্রসঙ্গ তুলল।

সঞ্জয় গম্ভীর হয়ে বলল, 'জানি। শুনেছি।'

ধ্রুব বলল, 'তিনি অসুস্থ। তিনি আমাদের সবাইকে দেখতে চেয়েছেন।'

সঞ্জয় বলল, 'বেশ তো তুমি—তোমরা যাবে।'

ধ্রুব বলল, 'আপনি যাবেন না?'

সঞ্জয় বলল, 'না।'

'কেন?'

সঞ্জয় একটু চুপ করে থেকে বলল, 'তুমি এখন বড় হয়েছ, তোমাকে বলতে বাধা নেই। তোমরা যাও। আমি গেলে তিনি সহ্য করতে পারবেন না।'

ধ্রুব একটুকাল স্থির দৃষ্টিতে সঞ্জয়ের দিকে তাকাল। তারপর বলল, 'আপনি যদি পারেন তিনিও পারবেন।'

সুনন্দা সভয়ে বলল, 'ছিঃ কী হচ্ছে ধ্রুব? এসব কী হচ্ছে তোমাদের? চল, এবার তোমাদের খেতে দিই।'

ধ্রুব বলল, 'হাঁ। চল।' তারপর সন্তুর দিকে তাকিয়ে বাকি কথাটুকু শেষ করল, 'সবাই সইতে পারবেন। এখন আর না সইবার কিছু নেই। তাছাড়া আমি তো থাকব সঙ্গে। আমার অঙ্গে সবাই সইবেন। আমি তো সবাইকেই সইতে পেরেছি।'

ধ্রুব মুখ ফিরিয়ে আস্তে আস্তে বাবার ঘরের দিকে এগিয়ে চলল।

এ যেন তার আর একটি যৌবনযাত্রার সুরু।

আমাদের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রকাশন

• প্রবন্ধ ও সমালোচনা •

রাজশেখর বসুর
লঘু গুরু ৩·০০
বুদ্ধদেব বসুর
সঙ্গ : নিঃসঙ্গতা
রবীন্দ্রনাথ ৫·০০
বিশু মুখোপাধ্যায়-সঙ্কলিত
রবীন্দ্র-সাগর সঙ্গমে ১০·০০
অবনীনাথ মিত্রের
আচার্য জগদীশচন্দ্র ও
বসু-বিজ্ঞান-মন্দির ১·৫০
ডঃ নীহাররঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের
সংগীত ও সাহিত্য ৭·০০
ভূপেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর
ভারতে শক্তি-সাধনা ৭·০০
অন্নদাশঙ্কর রায়ের
দেখা ৩·০০ ঃ অপ্রমাদ ৩·০০
শুভ ওহঠাকুরতার
রবীন্দ্র-সঙ্গীতের ধারা ৬·০০
কণিকা ও বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের
রবীন্দ্র-সঙ্গীতের ভূমিকা ২·০০

• উপন্যাস •

প্রেমেন্দ্র মিত্রের
মনুষ্যাদশ ৩·৫০
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের
পথের দাবী ৬·৫০
বিপ্রদাস ৫·০০
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের
বসুন্ধরা ৩·০০
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের
মেঘের উপর প্রাসাদ ৭·০০
অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের
অনিমিত্ত ৪·৫০
প্রবোধকুমার সান্যালের
মনে রেখ ৬·৫০
প্রতিভা বসুর
অতল জলের আহ্বান ৩·৫০
বিমল মিত্রের
অন্তরূপ ৫·৫০
আশাপূর্ণা দেবীর
দিনান্তের রঙ ৬·৫০
দীপক চৌধুরীর
পাতালে এক ঋতু ৬·০০
সুনীল রায়ের
ত্রিনয়না ৫·০০
প্রাণতোষ ঘটকের
রাজায় রাজায় ৯·০০

• কবিতা-গ্রন্থ •

সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের
কাব্য-সঞ্চয়ন ৬·০০
পরশুরাম
পরশুরামের কবিতা ২·০০
বুদ্ধদেব বসুর
দময়ন্তী দ্রৌপদীর শাড়ি
ও অন্যান্য কবিতা ৪·০০
আধুনিক বাংলা কবিতা
(সঙ্কলন) ৬·০০
যে আঁধার আলোর অধিক ২·৫০
বিষ্ণু দে-র
আলেখ্য ২·৫০
হুমায়ুন কবীরের
অশ্বসাধ ২·০০ ঃ সাথী ১·৫০
অজিত দত্তের
জানালা ২·০০
মণীন্দ্র রায়ের
সংকলিত কবিতা ৪·০০
অমিল থেকে মিলে ১·৫০

এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স্ প্রাইভেট লিঃ ; ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

মোহ মুক্তি

হরেন্দ্রনাথ রায়

সমরেশের মতে বিবাহ জিনিষটা বাস্তবধর্মী, এ রিয়ালিটি। বিজয়ার মতে, এটা কমন্যালিটি।

সমরেশ বলে, সমাজ জীবনে—ইট্ ইজ্, এ নেসারিটি।

বিজয়া বলে, না, এ লাক্সারি।

নিজের মতকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য বিজয়া উঠে পড়ে লাগে। মেয়েদের একটা ক্লাব আছে। এখানে সপ্তাহে একদিন তারা মিলিত হয়। তাই নাম রেখেছে "মিলনী"। পুরুষেরা যাকে বলে, লেডিজ্ পার্লামেণ্ট। মিলনীর বাৎসরিক অনুষ্ঠান হয়। সে অনুষ্ঠানে বক্তৃতা আছে, জলসা আছে, ভোজ আছে। এই অনুষ্ঠানেই বক্তৃতা করে বিজয়া। জোরাল বক্তৃতা, ওজস্বিনী ভাষা। রিনরিনে গলা যখন সপ্তমে চড়িয়ে বলে, বিবাহ একটা সামাজিক কমন্যালিটি, একটা লাক্সারি—নিছক বিলাসিতা, তখন মিঠে হাততালিতে ঘরখানি যেমন ভরে উঠে তেমনি একটা চাপা হাসি, একটা ব্যঙ্গের প্রতিধ্বনিও শোনা যায়।

সমরেশের বন্ধু নিখিলেশ বলে, দড়ি টান কর ভায়া। সুরটা বড় ভাল ঠেকছে না। বিলাসিতার ভূত শেষ পর্যন্ত পথে না বসায়।

জনার্দন বলে, পথ হ'লেও ভাল ছিল। এ একেবারে বিপথ। এখন থেকে সামাল দাও সমরেশ, তা না হলে ঠকবে।

সমরেশ আর বিজয়া, স্বামী আর স্ত্রী। একদিন কোন এক অসতর্ক মুহূর্তে পথ এদের এক হ'য়েছে কিন্তু মত এক হয় নি। আজও হ'তে পারে নি। এক হওয়া যুগে যুগে, কালে কালে বিস্তৃত হ'য়ে চলেছে। স্বামী উদারপন্থী হ'লেও মতটা একটু সেকেলে। কিন্তু স্ত্রী পুরোপুরি একেলে। হয়ত এ কালেরও পরবর্তী যুগের।

দ্বন্দ্ব এইখানে। স্ত্রীর বিলাসিতার খেসারত যোগাতে যোগাতে সমরেশ আজ ক্লান্ত। তবুও ক্লান্ত মুখকে গোপন করে বলে এ মত তোমার ভ্রান্ত। এ মত তোমায় পাল্টাতে হবে বিজয়া।

বিজয়া সক্রোধে প্রশ্ন করে, কেন? এ শুধু আমার মত নয়। পরিণামদর্শী মাত্রেরই মত এই। এ ছাড়া দ্বিতীয় মত আর কিছু থাকতে পারে না।

—পারে। অভিমানে তুমি অন্ধ হয়ে আছ বলে, আসল নকলের পার্থক্য তোমার চোখে পড়ছে না। তা না হলে বুঝতে পার্থক্য কোনখানে।

বিজয়া মাথা নাড়ে। বলে, না, অভিমান আমি করিনি। আর কেন করব। তোমার আমার মতের মিল যদি না থাকে, তাকে আমি অভিমান বলে উড়িয়ে দিতে যাব কেন? একটু

বেঁধে আবার বলে, তোমার কাছে যেটা নেসেসিটি, একেবারে অপরিহার্য আমার কাছে তা নাও হ'তে পারে। তোমার যা নেসেসিটি আমার তা বিলাসিতা।

এত দিন এ অমিলের বোঝা কোন রকমে বয়ে আসছিল সমরেশ কিন্তু সেদিনের বন্ধুদের খোঁচা খাওয়ার পর আর পারল না। স্ত্রীকে ডেকে বলল, মত যদি তোমার না পাল্টায় বিজয়া, পথ আমাদের পাল্টাতে হবে।

বিজয়া হেসেই সংক্ষেপে উত্তর দেয়, বেশ, আমি রাজি, আমার আপত্তি নেই। সমরেশ ব্যাকুল হ'য়ে ওঠে। বলে, ভুল কর না বিজয়া। ভেবে দেখ একবার। ও মত কখনও সত্য হতে পারে না।

—পারে, পারে, পারে। আমি বেরিয়ে যেতে পারে। তোমাদের মামুলি বুলি আর আমাদের জোর করে লাগিয়ে রাখতে পারবে না।

সমরেশ ক্ষুব্ধ হয়ে বলে, তোমায় বাঁধিয়ে রাখবার কোন বাসনা আমার নেই। কিন্তু তোমায় ভালবাসি। তাই তোমার বিপথগামিতা আমায় পীড়া দেয়। বিবাহটা একটা লোক দেখান ব্যাপার এ ধারণা আর যে কোন দেশের মেয়েদের মনে ঠাঁই পাক না কেন, আমাদের দেশের মেয়েদের মনে যে পায় নি এ আমি জানি। এতখানি অধোগতি এদেশের মেয়েদের আজও হয় নি।

বিজয়া ফুঁসিয়ে ওঠে, অর্থাৎ অধোগতি হয়েছে শুধু আমারই। বেশ তাই হক। এই অধঃপতিত জীবন নিয়ে তোমায় আমি বিব্রত করতে চাই না। পথ যখন তুমি পাল্টাতে চেয়েছ, আমি বাধা দেব না। তবে যত শীঘ্র হয় ততই মঙ্গল। তারপর একটু ব্যঙ্গ করে মাথা দুইয়ে বলে, হে বন্ধু, নতুন পথে যাত্রা তোমার শুভ হ'ক এই কামনা করি।

সমরেশ বলে, কিন্তু এ কামনা আমার নয় ভদ্রে। নতুন পথের কোন পরিকল্পনা আমার নেই। নিজের ভাল মন্দের ভাবনাও আমি ভাবিনা। ভাবনা তোমার জন্য। যে পথে যেতে চাইছ সে পথ বড় বিপদ সঙ্কুল। নতুনত্বের আস্বাদন লালসায় এখন বুঝবে না। বুঝবে পরে, মোহ ভেঙে গেলে।

বিজয়া ঘাড় নাড়ে। দৃঢ়ভঙ্গীর ঘাড় নাড়া। বলে, এ মোহ ভাঙবার নয়।

—নয়?

—না। আমার মতের মধ্যে কোন গলদ নেই। দৈহিক বলে আমরা বন্দী নই বলেই আমরা অত্যাচারিত। বিবাহের ভড়ং দেখিয়ে, তার পবিত্রতার নাম নিয়ে আমাদের হাত পা, চোখ কান সব বেঁধে দাও। আজ সে বাঁধন আমি খুলে ফেলেছি। তাই বুঝেছি এ সব তোমাদের ধোঁকা। বিবাহ আর বিলাস বিভিন্ন জিনিষ নয়।

সমরেশ হতাশ ভঙ্গীতে শুধু ঘাড় নাড়ে। কোন কথা বলে না।

পার্বত্য নদী আর গার্হস্থ্য জীবন—এ দুয়ের মধ্যে হয় ত কিছুটা সাদৃশ্য আছে। নদী স্থির ধীর করে বয়ে চলে, কিন্তু মেঘোদয়ে স্ফীত দুর্বার হয়ে উঠে। নিঃশব্দ গার্হস্থ্য জীবনও তেমনি সময় সময় দুর্বার হয়ে উঠে।

সমরেশদের গার্হস্থ্য জীবনও দুর্বার হয়ে উঠল। নিঃশব্দ জীবনযাত্রায় একদিন বিদ্যুৎ চমকাল তারপর মেঘ গর্জনে আকাশ ভেঙে পড়ল।

এই গর্জনের তাড়নায় বেচারী সমরেশকে বেশ কিছুদিন উকীলবাড়ী ছুটাছুটি করতে হ'ল তারপর একদিন বিজয়াকে জানিয়ে দিল, তাবধার তোমার কিছু নেই বিজয়া। তোমার বাসনাই পূর্ণ হবে। যেমন তুমি চেয়েছ, তেমনি ব্যবস্থাই করে এসেছি আমি।

—অর্থাৎ। ঘর ছেড়ে যেতে যেতে বিজয়া ফিরে দাঁড়াল, দুচোখে বিদ্যুৎ বর্ষণ হ'ল। সঙ্গে সঙ্গে একটা কলহের ছায়া ঘনিবিড় হয়ে উঠল।

আজকাল এমনই হয়। কলহের কালো মেঘ দুজনার আশে পাশে ঘুরে বেড়ায়। সময় নেই, অসময় নেই মেঘ সামনে এসে দাঁড়ায় তারপর তার যা স্বভাব কখনও তর্জন কখনও গর্জন এবং সময় সময় বর্ষণও সুরু হয়ে যায়।

এ সব আজকাল সমরেশের গা সওয়া হয়ে গেছে। তাই সে নির্লিপ্তকণ্ঠে বলতে পারে, অর্থাৎ তুমি বলতে চাও সাপ মরুক কিন্তু লাঠি যেন না ভাঙে। আমাদের মতের অমিল নিয়ে পথের গরমিল হয় হ'ক কিন্তু লোক জানাজানি যেন না হয়। তোমার নতুন পথের নিত্য নতুনত্বের আস্বাদনে কোন বাধার সৃষ্টি যেন না হয়।

বিজয়া কঠিন কণ্ঠে বলে, ধন্যবাদ। আমার নতুন পথের নতুনত্ব নিয়ে গবেষণারও অন্ত নেই দেখছি। কিন্তু জিজ্ঞাস্য, মহাপ্রভুর পদযাত্রা নিয়ে কোন অভাগিনীর নিদ্রার কিছুমাত্র ব্যাঘাত ঘটেছে কি?

—না। কারণ আজকের অভাগিনী কালকের সুভাগিনী হবার আশায় মশগুল। তারই স্বপ্নে বিভোর। সেই জন্যেই ঘটেনি।

—ভাল কথা। সুভাগিনীর এ স্বপ্ন সার্থক হবার আর বিলম্ব কত?

—বিশেষ কিছু নয়। কিন্তু রাই, একটু ধৈর্য তোমায় ধারণ করে থাকতেই হবে। আমার যা করণীয় করেছি। ত্রুটি কোন দিকেই রাখিনি। ডিক্রী যাতে এক তরফা হয় সেই ব্যবস্থাই করেছি। সেরা উকীল দিয়েছি তোমার পক্ষে। আমার পক্ষে আছে মাত্র একজন কাঁচা মোক্তার। শুনতে বিশেষ কিছু পায় না। তবুও বলে দিয়েছি তোমার উকীলের সব কিছু আবদারই মেনে নিতে।

—আমার মানে?

—মানে তোমার কল্পিত অকল্পিত সব তাতই মেনে নিতে। যদি খোরপোষ দিতে হয় তাতেও যেন অরাজি না হয়।

বিজয়া একেবারে কেটে পড়ে। বলে, খোরপোষ? কেন? ভেবেছ এতে আমি রাজি হব? না, কিছুতেই না। যাঁদন কেটে যাচ্ছে তা একেবারেই যাক। তাতে এতটুকু যেন আঁচন না থাকে। খোরপোষ মানে ত ইতরোমির পরাকাষ্ঠা। খবরদার ও দিক দিয়ে গেলে ভাল হবে না বলে দিচ্ছি।

—না, ও চিন্তা করনা তুমি। যাতে ভাল হয় সেই ব্যবস্থাই করেছি! সেই জন্যে উকীলও ঠিক করেছি দু রকম। এক পক্ষে প্রবল, আর এক পক্ষে দুর্বল। এর জন্যে যত অর্থই লাগুক, সে বিষয়ে কোন কার্পণ্যই করি নি।

বিজয়া একটু সন্দিগ্ধ হয়। সন্দিগ্ধ কণ্ঠে প্রশ্ন করে, বটে! কিন্তু জানতে বাসনা হয়, মহারাজের অহেতুক এ অনুগ্রহ কেন?

বিনোদ বিহারী দত্ত

জুয়েলার্স এণ্ড ডায়মণ্ড মার্চেণ্টস্

৮৪, আশুতোষ মুখার্জ্জি রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা

ফোন : ৪৭-১২৫৮

দোকান প্রত্যহ সকাল ৮টা হইতে বেলা ১২টা ও বৈকাল ৩টা হইতে রাত্রি ৮টা ও শুক্রবার সকাল ৮টা হইতে বেলা ১২টা পর্য্যন্ত খোলা থাকে। রবিবার সম্পূর্ণ বন্ধ।

একমাত্র সত্বাধিকারী :—
ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত

সমরেশ বলে, অনুগ্রহ নয়, এ আত্মনিগ্রহ ছাড়া কী। প্রিয়ার অন্যায় প্রিয়র যদি ঠাঁই না হয়, তার চেয়ে মর্মান্তিক আর কি হতে পারে? তাই ভাবলাম, এ বিচ্ছেদে তুমি যদি সত্যই সুখী হও, তাই হ'ক। এর জন্য কোন কার্পণ্যই আমি করব না। তবে এইটুকু অনুরোধ করব তোমে, যদি অসুবিধে কিছু না হয়, তবে কোর্টের রায় না বেরুন পর্যন্ত এইখানে তুমি থেকে যাও। তাতে লোক জানাজানির আশঙ্কা থাকবে না।

বিজয়া বলে, বেশ তাই হ'বে। আমিও চাই না ঘরের কেলেঙ্কারী বাইরে প্রকাশ পায়।

শেষ পর্যন্ত কোর্টের রায় বেরয়।

সংবাদটা সমরেশই দেয় বিজয়াকে। বলে, আসামীর ফাঁসির আদেশ হ'য়ে গেল তবে।

বিজয়াকে কোর্টে হাজির হ'তে হয়নি। তাকে হাজির হ'তে দেয়নি সমরেশই। বলেছিল, বাড়ীবয় হ'য় আমি। তুমি শুধু শুনবে। তাই অপেক্ষা করে বসেছিল বিজয়া। তাকে একটু বিবর্ণ দেখাচ্ছিল। সে বিবর্ণ মুখে সমরেশের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

সমরেশ আবার বলল, যাক, সব শেষ। তোমার কৌসুলীর মুখের তোড় কি? সাধ্য কি আমার কালা মোক্তারের সে তোড়ের সামনে দাঁড়াতে। এক ধমক খেয়েই সে বেচারা থেমে মেরে এক কাণ্ড করে বসল। তারপর হ'ল এক তরফা সওয়াল। সে কি প্রলয়ঙ্কর বক্তৃতা কি বলব। শুনতে শুনতে আমারই মনে হচ্ছিল, সত্য বুঝি আমি এমনি অত্যাচারী, এমনি ভয়ঙ্কর প্রকৃতির লোক। বিচারক রায় দিলেন সওয়ালের ওপর। একেবারে মোক্ষম রায়—আসামীর ফাঁসি।

বিজয়া নিজেকে সামলে নেয়। বলে, হ'য় যদি পছন্দ না হয়, উঁচু আদালতে আবেদন করতে পার।

—উঁহু। কোন আদালতের সাধ্য নয় এ রায় রদ করে। ফাঁসি হবেই।

—বেশ, আদালতের ওপর আছেন রাষ্ট্রপতি, তাঁর সাধ্য নিশ্চয়ই হবে।

—হয় ত হবে। আর কোন পতি বা পত্নীর স্বামীর হাবয় হবার বাসনা আমার নেই আমি ফাঁসি মেনে নেব।

বিজয়া নিরুত্তরে শুধু সমরেশের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

সমরেশ বলে চলে, না মেনে উপায়ও নেই।

—কেন? প্রশ্নটা নিজের অজ্ঞাতেই বিজয়ার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল।

সমরেশ এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলে, রাজা যদি প্রজার ভালবাসা না পায় সে রাজার কোন সার্থকতা নেই। তেমনি স্বামী যদি স্ত্রীর অনুরাগ না পায়, সে স্বামীরও কোন সার্থকতা নেই। স্বামীর প্রয়োজন আমাকে, আমাকে নয়। শুধু শুধু কায়র ভার বহন করতে চায় কে?

বিজয়া নিনিমেষ ভাবে বলতে যায়, বেশ, কর না।

সমরেশ একটুখানি হাসে। ম্লান করুণ হাসি, কয়া না করার আর প্রশ্ন ওঠে না তবে। আজ সবেরই সমাধি হ'ল। আদালত মেনে নিয়েছে তোমার দাবী। তাই তোমার স্বপক্ষেই রায় দিয়েছে। এখন থেকে তুমি মুক্ত, স্বাধীন।

বিজয়া এ কথার কোন উত্তর দেয় না। নিরুত্তরে থাকে।

কলিঙ্গ টিউব্‌স

জল ও গ্যাসের জন্য

কলিঙ্গ টিউব্‌স লিমিটেড্‌

৩৩, টিরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-১২

কারখানা।

চৌদ্বার, কটক, উড়িষ্যা।

সমরেশ প্রশ্ন করে, খুশি হয়েছ নিশ্চয়ই ? স্বপ্ন সার্থক হয়েছে তোমার ?

—জানি না। এ খোলস ছাঁড়া থেকে না বেরুন পর্যন্ত বলতে পারি না। কিন্তু তোমার ?

—স্বপ্ন আমার ছিল না। তাই সার্থক বিশ্লেষণের কোন প্রশ্ন ওঠে না। তবে—।

—তবে ?

—তোমার কাছে লুকোব না। যে সত্যকে আমি বিশ্বাস করি মনে প্রাণে, তার মর্যাদা ক্ষুণ্ন হ'তে দেব না।

—অর্থাৎ ? বিজয়ার তির্যক চাহনী তীক্ষ্ণ হয়ে উঠে।

—অর্থাৎ যাকে অপরিহার্য বলে জানি, তাকে হয়ত আবার বরণ করে নিতে হবে।

—হুঁ। আর একবার টোপর পরবার সাধ হয়েছে।

—সাধ নয়, আদর্শবাদ। একজনের যাতে অরুচি, আর একজনের যে তাতে রুচি হবে না, এ ত কথা নয়। লাল চেলীতে আজকাল তোমার বীতরাগ, কিন্তু এ বীতরাগ সকলের নাও থাকতে পারে। সকলের দৃষ্টিকোণ যদি তোমার সঙ্গে একবিন্দুতে এসে না মেলে, তারা বিদ্রূপীয় হবে না নিশ্চয়ই।

বিজয়া অবাক হয়ে বলে, নিশ্চয় না। কিন্তু এ কথা কেন ? লাল চেলী আর আমার দৃষ্টি-কোণের সঙ্গে অপরের সম্বন্ধ কি ?

—আছে। তোমার দৃষ্টিকোণের কাছে লালচেলীর মূল্য আর কিছু নেই। কিন্তু সকলে ত নয়। তাদের কাছে লাল চেলীর মূল্য অনেক। তাদের কাছে এরা চিরন্তনী জিনিষ, জীবন যাত্রার পক্ষে অপরিহার্য।

এতক্ষণে বিজয়া রহস্যটা বোঝে। চোঁক গিলে বলে, বুঝেছি তোমার লালচেলীর রহস্য। কিন্তু জিজ্ঞাস্য, কে এই সৌভাগ্যবতী যিনি লালচেলীর মোহে টোপরের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধতে স্বতঃ প্রবৃত্ত হয়ে এগিয়ে আসছেন।

সমরেশ বলে, ঠাট্টা ক'র না। সে তোমার হিংসার যোগ্য নয়, বরং করুণার যে'গ্য। কারণ লাল চেলীর প্রতি তোমার বীতরাগ যতখানি, তার অ াস্থা ঠিক ততখানি। এইখানে তার সঙ্গে আমার মিল।

—সত্যি ?

—মিথ্যে বলে আমার লাভ কি ? সুষ্ঠ সামাজিক জীবনে নর নারীর বিবাহ যে অপরিহার্য,' এ মতের গোঁড়া সমর্থক সে। আর আমিও যে এ মতের সমর্থক এ কথা জেনেই সে এগিয়ে আসছে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে। অবশ্য জানা জানি আমাদের বেশী দিনের নয়। কিন্তু আশ্চর্য, দেখলাম সে আমাদের সব খবরই রাখে।

বিজয়া ভ্রু কুঞ্চিত করে। বলে, বটে ! কিন্তু জানতে পারি, এ বেন অনন্তাটি কে ? তাকে আমার অভিনন্দন জানিয়ে আসি।

—অনন্তাটি তোমার অচেনা নয়। একদা তোমারই সহপাঠিনী ছিলেন দেবী মধুভাষিনী। সেই সূত্রেই তার সঙ্গে পরিচয়—অবশ্য তুমিই করিয়ে দিয়েছিলে একদিন। অভিনন্দন জানাবার বাসনা যদি জেগে থাকে, তাকে জানাতে পার।

পরম বিস্ময়ে বিজয়া যেন ফেটে পড়তে চায়। চোখ দুটিকে কপালে তুলে বলে, কে? মহু! মহু সোদ্দারনী। স্কুলে যার নাম ছিল মহুসর্দ্দারনী তাকে বিয়ে করতে চাও তুমি!

—কেন, অপরাধ তার?

—অপরাধ! আর মেয়ে জুটল না তোমার? শেষ পর্যন্ত—। কী কাণ্ড! সেই ত ছিল আমাদের লীডার। বিয়ে কেউ তাকে করতে চায়নি বলে বিয়ে তার হয়নি। শেষ পর্যন্ত সে হ'ল স্কুল মাষ্টারনী।

—হয় ত তোমার কথাই ঠিক! তবে সর্দ্দারনী বা সোদ্দারনী সে নয়। নাম তার মহুভাষিণী সোদ্দার। উপস্থিত বৃত্তি স্কুল মাষ্টারনী।

বিজয়া উত্তেজিত ভাবেই বলে চলে, সেই মহুসর্দ্দারনীই ছিল আমাদের নেতা। নিজের বিয়ে হ'ল না বলে বিয়ের দিকে আমাদের মনটাকেও সে বিষিয়ে তুলছিল ধীরে ধীরে। বলতে কইতে পারত ভাল। যা বলত মনের মধ্যে একেবারে গেঁথে দিত। সেই আমাদের মাথার মধ্যে ঢুকিয়েছিল, বিবাহ একটা বিলাসিতা, একটা লোক দেখান সামাজিকতা। দু হাত মুঠো ক'রে বাতাসে ছুঁড়ে দিয়ে যখন বলত ইট্ ইজ্ এ লাকসারি, এ কমপ্যালিটি, তখন তার কথা বিশ্বাস না করে উপায় থাকত না। আমাদের মত সব মেয়েদের মাথাই সে ঘুরিয়ে দিয়েছিল। সকলেই মেনে নিয়েছিলাম তার কথাটা।

—আশ্চর্য! কি বোকা তোমরা। কিন্তু মহু ত এ সব কথা কিছুই বলে না এখন। বলে না ত বিয়েটা একটা বিলাসিতা।

—বলে না? কি বলে সে? প্রশ্ন করে সমরেশের মুখের দিকে বিজয়া তাকিয়ে থাকে।

—বলে, বিয়ে বড় পবিত্র জিনিষ। কি ছেলে কি মেয়ে সকলের পক্ষেই এ অপরিহার্য। অর্থাৎ এক কথায় বলা যেতে পারে, ইট্ ইজ্ এ নেসেসিটি। যা বলে থাকি আমি।

—অসম্ভব। এ কথা সে বলতে পারে না কখনও।

—বলে। আর বলে বলেই ত তার সঙ্গে আমার মতের আশ্চর্য মিল। সে মেনে নিয়েছে আমার মতকে, আমি মেনে নিয়েছি তার মতকে। সুতরাং প্রতিবন্ধক আমাদের মধ্যে কিছু নেই।

—আছে। বিজয়া দৃঢ় কণ্ঠে বলে।

সমরেশ বিস্মিত হয়। প্রশ্ন করে, কিসের প্রতিবন্ধক।

বিজয়া তেমনি ভাবেই বলে, আমার। প্রতিবন্ধক হ'ব আমি। মহু, অনৃতভাষিণী, প্রতারক। নিজে যা বিশ্বাস করে না, তাই সে অপরকে করিয়েছে। অপরের মনকে সে বিকৃত করেছে দূষিত করেছে। তার কাজে বাধা দেব আমি।

—তুমি?

—হ্যাঁ আমি।

—কিন্তু ভেবে, আবার ভুল করছ তুমি। এ বিলাসিতা নয়, এ অপরিহার্য। আমাদের মত, আমাদের পথ অ্যামিটির সমবাহু ত্রিভুজের মত পরস্পরের সঙ্গে এক হয়ে লীন হয়ে গেছে। অতএব এ রাজযোটক মিলে অমিল হবার সম্ভাবনা কিছু নেই।

—আছে। সমবায় ত্রিকুজের মধ্যে বিসমবাহুর আবির্ভাব হবে আর তাইতেই মিল হবে না।

—বল কি ?

—মিথ্যে আমি বলি না। তুমি মহুকে বিয়ে করতে পারবে না। বাংলা দেশে মেয়ের অভাব নেই। তাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছে বিয়ে কর, শুধু মহুকে না। সে আমাদের ঘরে ঘরে আগুন জ্বালিয়েছে। তার মাথায় মিথ্যাচারি বর্বর আমি সহ্য করব না।

—কি করবে তুমি ?

—বিশেষ কিছু না। শুধু তাকে জানিয়ে দেব, এ বিবাহ হবে না। আমার মত নেই।

—হবে না ? বল কি ? কিন্তু তোমার মতামতের সঙ্গে আমাদের এ বিবাহের সম্বন্ধ কি। আদালত ত আমাদের সম্বন্ধে রায় দিয়ে দিয়েছে। তুমি যা চেয়েছ তাই পেয়েছ।

—না, কিছু পাই নি। এ সবই তোমার কারসাজি। আমার পক্ষে ভাল কৌঁসুলী দিয়ে আর তোমার পক্ষে কৌঁসুলী না দিয়ে আদালতকে ভুল বুঝিয়েছ। মহুকে বিয়ে করবার জন্যেই তোমার এ বিবাহ বিচ্ছেদ। এইটাই তোমার উদ্দেশ্য।

সমরেশ অবাক হ'য়ে বলে, কি বলছ তুমি ? আদালতকে ভুল বুঝিয়েছি আমি ! তুমি চাওনি এ বিচ্ছেদ ?

—না। আগা গোড়া তুমি আমাকেও ভুল বুঝিয়ে এসেছ। এবার সেই কথাই আমি আদালতকে জানাব।

—আর উপায় নেই। আদালত তার চরম রায় দিয়ে দিয়েছে।

—দিক। সে রায়কে আমি নাকচ করাব। বড় আদালতে আপীল করে বলব, হিন্দু বিবাহ বড় পবিত্র বিবাহ। সাত পাকের যে বাঁধন তাকে চোদ্দ পাকেও খোলা যায় না। অতএব একটা কলমের খোঁচায় এ বিবাহ অসিদ্ধ হ'তে পারে না। আর তা ছাড়া সময়ও আছে এক বছর। আদালতকে জানাব, আমার মত পাল্টে গেছে। এর সবটাই কারসাজি। এ ভাবে বিবাহ বিচ্ছেদ হতে পারে না। অন্যায়কে প্রশ্রয় দেওয়া বা তাকে সমর্থন করা উচিত হবে না।

—কি কাণ্ড দেখ। এখন কেমন করে মহুকে আমি মুখ দেখাব।

—তার প্রয়োজন হবে না। যাতে আর কোনদিন তোমাদের মুখ দেখাদেখি না হয় সে ব্যবস্থা আমিই করব।

সমরেশ আঁৎকে উঠে। বলে, বল কি ! না, না এ অন্যায়। ভারী অন্যায়। আমাদের মত পথ সব এক হ'য়ে আছে। আমি যা বিশ্বাস করি সেও ঠিক তাই করে।

—না, করে না। করলে এমন বিষের বীজ সে আমাদের মনে গেঁথে দিত না। তাকে আমি বুঝিয়ে দেব, আজকাল আমিতি তার সেকেলে ধর্ম ছেড়ে একেলে হয়েছে। এতদিন সে নিজেকে সীমিত করে রেখেছিল শুধু তার দৈর্ঘ আর প্রস্থের গণ্ডীর মধ্যে, এখন উচ্চতারও অধিকারী হতে চলেছে সে। তাই সব কিছু এক হওয়া সত্ত্বেও তারা এক হ'য়ে আর লীন হ'তে চায় না। আরও বুঝিয়ে দেব, এতদিন সে তার বিকৃত মতকে আমাদের ঘাড়ে চাপিয়ে অনেক উপদ্রব করেছে।

ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ

বাংলা সংবাদপত্র

যুগান্তর

স্বাধীন * নিরপেক্ষ * নির্ভীক

সুষ্ঠ ও সবল জনমতের স্বচ্ছ দর্পণ

ও

আকর্ষণীয় বাংলা সাপ্তাহিক

অমৃত

সম্পাদক : শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ

গল্প, কবিতা উপন্যাস. প্রবন্ধ, খেলাধূলা, ছায়াছবি প্রভৃতি রচনায়

সমৃদ্ধ প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি পাঠকগোষ্টিকে প্রকৃত আনন্দ দান করে

আনন্দ চ্যাটার্জী লেন, কলিকাতা—৩

এবার তার মত তারই ঘাড়ে চাপবে। বিজয়া ঘাবে। একটু দম্ নেয়, তারপর আবার বলে, শোন, কালকে আমায় নিয়ে যেতে হবে আমার কৌশুলীর কাছে।

সমরেশ অবাক হয়ে বলে, কারণ ?

বিজয়া বলে, তাকে একটু ধন্যবাদ জানিয়ে আসব যে কাজ তিনি আমার জন্যে করেছেন।

সমরেশ একটু নিরস কণ্ঠে বলে, তার কি কোন প্রয়োজন আছে ?

—আছে। শুধু ধন্যবাদই দেব না, সেই সঙ্গে একটা অনুরোধও করে আসব। অনুরোধ করব, আর একবার তাকে সওয়াল সুরু করতে হবে। তবে এবার করতে হবে উল্টো দিক থেকে।

—ঠিক বুঝলাম না।

—বুঝবে। বুঝিয়ে দিলে বুঝবে। এবার তাকে সওয়াল করতে হ'বে, বিবাহ জিনিষটা কাঁচের বাসন নয় যে স্বামী বা স্ত্রীর একটু খুশি খেয়ালেই ভেঙে চুর হয়ে যাবে।

—তাই নাকি, সেখানে মতের মিল থাক আর না থাক ?

—তা কেন। মতের মিল অবশ্যই থাকবে। যে জিনিষটা শখ'ত, চিরদিনের তার মধ্যে বিকৃতি নেই। পরের প্রয়োচনায় হয় ত একটু আধটু ভুল ভ্রান্তি হতে পারে কিন্তু তার শোধনও ত আছে।

—হয় ত আছে। তবে সে প্রচেষ্টা যদি আন্তরিক হয়।

কথাটা বিজয়াকে বিঁধে। সে কিছুক্ষণ মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর পরাজয়কে মনে মনে মেনে নিয়ে কয়েক পা সমরেশের দিকে এগিয়ে আসে। চোখে চোখ রেখে বলে, তুমি সন্দেহ ক'র না। আমার মোহ কেটে গেছে। অহংকার টুটে গেছে। আদালতে জয়ই আমার পরাজয়ের কারণ হয়েছে। যুক্তির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমি আমার লোকসানের বিরাটত্বটা উপলব্ধি করতে পেরেছিলাম বলেই অন্তরের মধ্যে কোন উল্লাস বোধ করিনি। তারপর এল তোমার মহুতাষিণী। বল, এমন একটা চক্রী মেয়েকে সব জেনে শুনে কি হাল ছেড়ে দিতে পারা যায়, না তার কাছে পরাজয় মেনে নিতে পারা যায়। তার চেয়ে তোমার কাছে আমার পরাজয় শতগুণে শ্রেয়ঃ। বলতে বলতে বিজয়া একেবারে সমরেশের মুখোমুখি এসে দাঁড়ায়। স্বামীর হাতখানিকে ধরবার জন্য নিজের ডান হাতখানি প্রসারিত করে দেয়।

সমরেশ এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে ত্রুটি করে না। স্ত্রীকে বাহুবন্ধনে বেঁধে ফেলে বলে, মহু চক্রী, তুমি চক্র। তোমার চক্রাঘাতে সে আজ ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল জয়া। আজ আমি নতুন করে তোমাকে আমার জীবনে স্বাগত জানাই।

অসংখ্য মতামতের মধ্যে মাত্র কয়েকটি

I have tried a sample of 'Lakhmi Ghee' and found it very good. Pure ghee is so scarce in these days that any one who offers pure ghee for sale renders distinct public service.

C. C. Biswas
Ex-Judge, Calcutta High Court,
Ex-Law Member, Govt. of India

আমি 'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার ক'রে দেখেছি সত্যই ইহা বিশুদ্ধ ও স্বাস্থ্যপ্রদ।

ডঃ কালিদাস নাগ

'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার ক'রে দেখেছি এটা ভাল ঘিনিষ।

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ
সম্পাদক—অমৃতবাজার পত্রিকা

'লক্ষ্মী ঘৃত' ব্যবহার করিবার সুযোগ হইয়াছিল। ব্যবহারে পরিতৃপ্ত হইয়াছি। এই ভেজালের বাজারে এরূপ খাঁটি ও সুস্বাদু ঘৃত পাওয়া সৌভাগ্যের ব্যাপার।

শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

আমি 'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি। এই ঘি বাজারে চলতি উৎকৃষ্ট ঘৃতের অন্যতম, জনসাধারণ স্বচ্ছন্দে ইহা ব্যবহার করিতে পারেন।

শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়
সম্পাদক—যুগান্তর

'লক্ষ্মী ঘৃত' ব্যবহার করিয়া দেখিলাম। বাজার প্রচলিত সাধারণ ঘৃতের তুলনায় ইহা অনেক গুণে ভাল, সে বিষয় নিঃসন্দেহ। ব্যবহার করিয়া দেখিলে প্রত্যেকেই আমার সঙ্গে একমত হইবেন আশা করা যায়।

শ্রীআশাপূর্ণা দেবী

'লক্ষ্মী ঘৃত' ব্যবহার করিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি। ইহার স্বাদ ও গন্ধ ভাল।

শ্রীসীতা দেবী

'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি, ইহাতে প্রস্তুত খাদ্যাদির স্বাদ ভাল ও মুখরোচক।

শ্রীশান্তা দেবী

দুঃস্বপ্নের রাত

ভবানী মুখোপাধ্যায়

খট করে একটা শব্দ হল হঠাৎ।

সেই সঙ্গে ঘরের আলোটাও জ্বলে উঠল দপ্ করে। আমি কিন্তু তখনই ঘুরে দাঁড়াইনি। ঠিক সেইভাবেই ড্রেসিং টেবিলের দিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

ভয় পেয়েছিলাম ঠিকই। সেই সঙ্গে একটু রাগও হয়েছিল মনে মনে, ভয়ের কারণে, এই-ভাবে ধরা পড়ে গেলাম বলে, আর রাগ আমার অদৃষ্টের ওপর। সব-কিছুতেই কি এমন একটা দুগ্রহ জড়িয়ে থাকবে। যেখানে আমি সেখানেই কি বিপদ!

—ঘুরে দাঁড়াও, সাবধান! আমার হাতে আছে গুলিভরা পিস্তল। কণ্ঠস্বর স্ত্রীলোকের, বেশ দৃঢ়তাব্যঞ্জক। নিরুপায় হয়ে ঘুরে দাঁড়ালাম। এই অবস্থায় সবাই যা করে সেই অসহায় আত্ম-সমর্পণের ভঙ্গী!

ঘুরে দেখলাম, ত্রিশ-বত্রিশ বছরের এক মনোহারিণী নারী, সুন্দরী বটে। শুধু যে রঙের চটক তা নয়, ঠোঁট দুখানি পাতলা, নাকটা তীক্ষ্ণ, অপরূপ রূপলাবণ্যময়ী। পরণে কিংকে জরদা রঙের চটকদার ডুরে শাড়ি। ডান হাতে পিস্তল, লক্ষ্য আমার বুক, বাম হাতে শঙ্কানিবারণের বরাভয় নেই। বেশ কঠিন ও কঠোর তাঁর মুখভঙ্গী।

কি আর বলি। বললাম—বোকার মত চুকে পড়েছি। জানলাটা খোলা ছিল।

—জানলাটা আমার বেড়ালের যাতায়াতের জন্য সব্ সময় খোলা রাখি, তা বলে সেটা ত' সাধারণের সদর রাস্তা নয়।

জবাবটা বেশ সহজ ও শান্ত গলায় এল। কথা বলতে বলতে ঘরের ভেতর আরো একটু এগিয়ে এলেন, তারপর আমার রক্তহীন মুখের পানে নীরবে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন, দৃষ্টিটা অতি তীক্ষ্ণ।

আমার কীর্তিটা স্বচক্ষেই দেখেছেন, এখন দেখছেন আমাকে, আমিও দেখছি আমার প্রকৃত রূপ। ওঁর চোখের আয়নায় আমার মুখচ্ছবি প্রতিফলিত। আমি কিন্তু তা বলে করুণার ভিখারী নই, করুণায় আমার অসীম ঘৃণা।

করুণা এবং অনুকম্পার ভাবখানা ক্রমশঃ তাঁর মুখ থেকে মিলিয়ে গেল, যেমন করে অন্ধকার কেটে গিয়েছিল তেমনই হঠাৎ। এদিকে আমার হাত দুটি টন্ টন্ করছে, সিনেমায় ঠিক এমনই হয়ে থাকে।

এইবার মহিলাটি বললেন—আচ্ছা, এবার হাত নামাও—

কী গম্ভীর গলা, যেন মেয়েস্কুলের বড় দিদিমণি।

হাত নামালাম, অমান্য করার সাধ্য কই!

এতক্ষণে মুখে হাসি ফুটল, অতি ক্ষীণ হাসি। বললেন—এই ব্যবসা কতদিনের—?

এই বলে রিভলবারটা চেয়ারের ওপর রেখে প্রান্তভঙ্গীতে চেয়ারে হেলান মেরে দিলেন।

আমি শুখ্‌নো গলায় বলি—এই আমার হাতে খড়ি—

—হুঁ, ঘরে কি ক্ষুর ধরি, ন' ছেলে তিন দিন খায় নি, ও-সব ঢের শুনেছি, নতুন কিছু বলার থাকে ত' বলতে পারো!

কণ্ঠস্বর অনেক মোলায়েম।

আমি বললাম—এর আগে আর কখনও এতটা দুঃসাহস হয় নি। দোতে পড়ে দু-একটা মোটর পার্টস সরিয়েছি। এই প্রথম বাড়ি চড়াও হয়েছি।

—এটা কার বাড়ি জানো? এটা একজন পুলিশ অফিসারের বাংলো। ছাপী-বদমাশ থেকে ছিঁচকে চোর সকলের নাম ওদের খাতায় থাকে, চোর-ডাকাতের হিসেব ওদের মুখে মুখে—

একটু হাসবার চেষ্টা করি। মুখে বলি—এ পাড়ার সব বাড়িই ত' বড় সাহেবের বাড়ি, আজ পর্যন্ত আমি থানায় ঢুকিনি, এইবার সেই বিপদের মুখে পড়লাম—

মহিলাটি দৃঢ়স্বরে বলেন—না না, তা কেন? আমি অত সব হৈ-চৈ ভালোবাসি না, পুলিশের হাতে আমি দেব না—

বিস্মিত হলাম, আনন্দও হল মনে মনে, সেই সঙ্গে একটু বিরক্ত হলাম। গলার সুর চড়িয়ে বললাম—করুণা আমি চাই না, শাস্তি দিন, দোষ করেছি, ধরা পড়েছি।

—ওসব আমি জানি। যেন আমার মধ্যে একটা কিছু বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পেয়েছেন, আমাকে যেন আরো একটু জানতে চান। কথাগুলি হয়ত ভালোভাবেই বলেছেন, ব্যাপারটি লঘু করার চেষ্টা হয়ত।

তবু বলি—দেখুন, আমি যে কি তা জানি। বরাবরই জানি। আপনার কথার অর্থ কিন্তু ঠিক ধরতে পারছি না।

কণ্ঠস্বরে কৌতুহল মিশিয়ে মধ্যবয়সী বললেন—একটা কাজ-কর্ম করলেই ত' পারো, পুরুষ মানুষ, স্বাস্থ্যও মন্দ নয়, লেখা পড়া জানো বলে মনে হচ্ছে, চুরি করার চেয়ে ভিক্ষা করা অনেক ভালো।

আমি আবার সবিনয়ে বলি—চাকরি একটা করি, ছাপাখানার কম্পোজিটর, যা পাই তাতে পেট ভরে না। ইলেকট্রিকের কাজও কিছু কিছু জানি—আজ ক'দিন ধরে ছাপাখানায় লক্ আউট চলেছে।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভদ্রমহিলা এগিয়ে এলেন, মাঝখানে চেয়ারটুকুর ব্যবধান। আর সেই চেয়ারে পড়ে আছে পিস্তলটা। সন্ত্রস্ত দৃষ্টিতে সেদিকে তাকাই।

তিনি যেন আমার অস্বস্তি বুঝলেন, বললেন—ওটা বরং ড্রয়ারে তুলে রাখো, সামনে থাকলে কথা বলতে বাধবে তোমার—

প্রস্তাবটা মোটেই হুকুমের মত শোনালো না, তাছাড়া আর বন্দুক, পিস্তল আমার সয় না, সন্তর্পণে সেটি ড্রয়ারে উঠিয়ে রাখলাম। এরপর উনি একটা পাথর বসানো আঙটি আমার হাতে তুলে দিলেন। মূল্যবান বলে মনে হয়। দক্ষ সেলসম্যানের ভঙ্গীতে আঙটিটা আমার দিকে প্রসারিত করে বললেন, কেমন পছন্দ হয়? আমার তেমন ভালো লাগে না এসব, তুমি এটা নাও।

দান। রীতিমত করুণার দান। তবু দান ত'—

আমি রুদ্ধ গলায় বলি, মাফ করবেন ! চুরি করতে এসেছি, ভিক্ষা নিতে আসিনি।

মাথাটা নীচু করলাম। ঐ দৃষ্টির পানে তাকান কঠিন।

মহিলাটি বললেন—বিক্রী করে অন্তত পাঁচশো টাকা পেতে পারো।

আমার চোখ নিশ্চয়ই উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

আর ইতস্ততঃ না করেই তিনি সেই আংটিটা আমার মলিন সার্টের পকেটে ফেলে দিলেন। আমি প্রতিবাদ করিনি।

মহিলাটি ক্লান্ত গলায় বললেন—চেষ্টা করে এই টাকায় না হয় কিছু একটা করবে, কেমন ?

পালাবার প্রবল বাসনা, তবু পা যেন চলে না। করুণা আমাকে কাহিল করেছে। ওর মুখ থেকেই শুনতে চাই—আচ্ছা, এখন তাহলে যেতে পারো—

জানলার দিকে তাকিয়ে মহিলাটি যেন আপন মনেই বললেন— মনে হয় সুযোগ নিশ্চয়ই তোমার জীবনে এসেছে, কাজে লাগাতে পারো নি।

ওঁর কথায় সহানুভূতির আমেজ অনুভব করি। যেন কথা বলতে হয় তাই বলছেন, ভালো লাগছে না। এ ভাবে কথা বলতে।

আমি অতিকষ্টে বলি, সুযোগ জীবনে আসেনি, কারণ আমার ভিন-কূলে কেউ নেই, আমি অতি দরিদ্র—

বিরক্ত হচ্ছেন বুঝি, তবু যে কেন যেতে বলছেন না, বুঝতে পারি না। আমার ভাবভঙ্গী দেখে বুঝছেন যে যাওয়ার জন্য আমি পা বাড়িয়ে আছি। এবার সময় তিনি বললেন—কেউ নেই মানে ? কেউ না কেউ ত' থাকবেই।

—আপনাদের সমাজে হয়ত তাই, আমাদের কেউ নেই।

মহিলাটি হাসলেন, বললেন—তোমাদের সমাজটা তাহলে কি ?

—আমাদের আবার সমাজ। কেউ কোথাও নেই, চার দিক ফাঁকা।

হতাশাব্যঞ্জক গলায় মহিলাটি বললেন—তাহলে ত' কোনোদিনই কিছু মিলবে না। মানুষ জন্মায়, বড় হয়, কাজ করে, ঘর-সংসার করে, তারপর বুড়ো হয় ও মরে, এই ত' জীবন !

শান্ত হল তাঁর ক্লান্ত কণ্ঠ।

আমি বললাম—জীবনের এ সব ঘোর-পাঁচ, গলি-ঘুঁজি আমারও জানা আছে।

তিনি বললেন—আমি তাই বলি, মানুষ নিজেই নিজের জীবনটা গড়ে নেয়, জীবনটাকে গড়ে তুলতে হয়, অবশ্য সেই ইচ্ছাটা থাকা চাই।

শেষ পর্যন্ত মরিয়া হয়ে বলি, আমার যাওয়ার অনুমতিটা দিন !

উনি আবার হাসলেন। এই হাসিতে আর মাধুরী নেই। সরু পাতলা ঠোঁটে অতি কঠোর হাসি। বললেন—এই বয়সেই এত স্বার্থপর ! মনের মত কথা হচ্ছে না, তাই যেতে চাও।

কণ্ঠস্বরের ভঙ্গীটুকু তিরস্কারের।

আমি তোমাদের গলায় বলি, ঠিক তা নয়,

মহিলাটি বললেন—তোমার সঙ্গে কথা বলতে ভালোই লাগছে, একা একা তেমন ভালো

লাগছিল না এতক্ষণ। কেন কে জানে মানুষ নিজেই বুঝতে পারে না, কি ভালো লাগে, আর কি ভালো লাগে না।

এতক্ষণে বোঝা গেল, তাই এত সব কথা। একটা অশ্রদ্ধার ভঙ্গী ওঁর মুখে। ওঁর মুখের পানে একবার তাকিয়ে আবার মুখ নামিয়ে নিলাম। কেমন যেন লজ্জা ও হতাশার ভাব সেই মুখে।

আমি চুপ করে থাকি।

তিনি আবার কথা সুরু করেন, সেই একই কথার জের টেনে বলেন—যদি সুবিধা পাও ত' কি করবে?

—কি আর করব! কিছুই করার নেই। কোনো আশা নেই, ভরসাও নেই।

হয়ত—কি যেন বলতে চেয়েছিলেন, চোখে করুণার মায়াময় দৃষ্টি। কিন্তু হঠাৎ থেমে গেলেন।

বাইরে একটা মোটর এসে থামল, ইঞ্জিনটা বন্ধ হওয়ার আওয়াজ, তারপর সজোরে দরজা খোলা এবং বন্ধ করার শব্দ। মহিলাটি বললেন—ওঁরা এলেন। তুমি এবার পালাও, যে রাস্তায় এসেছ বরং সেই পথেই পালাও—

এক রকম তাড়িয়েই দিলেন। পালাবার সময় চাপা গলায় একটা ধন্যবাদ জানিয়েছিলাম। সেই ঘন অন্ধকারে আমার মনটা নিশ্চয়ই প্রফুল্ল হয়ে উঠেছিল। পকেটে পাঁচশো টাকা। ধরা পড়েও মুক্তি। পাঁচশো টাকা আমার নিজস্ব। পকেটের আঙটিটা অনুভব করি। পদক্ষেপ দ্রুত থেকে দ্রুততর হয়ে ওঠে।

অন্ধকারের ভেতর থেকেই কে একজন আমার জামাটা চেপে ধরল। ঠাট্টা করে বলে—বড় তাড়া দেখ্‌ছি, চলেছ কোথায়?

—বাড়ি যাচ্ছি।

—তাই নাকি! বাড়িটা কোন্ দিকে?

পাহারওলা আমার মুখের ওপর টর্চটা ফেলে ভালো করে দেখে।

আমার কণ্ঠে আর স্বর নেই, কে যেন সব হঠাৎ হরণ করে নিয়েছে। তাই ত' আমার বাড়ি কোথায়? নীরব হয়ে থাকি।

এইভাবেই আইনের বীর মহুর কবলে জড়িয়ে পড়লাম।

বেশী কথার প্রয়োজন ছিল না। এই গভীর রাতে এই অভিজাত পল্লীতে যে আমি নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে আসিনি সে কথা জানার জন্য 'থার্ড ডিগ্রি' এর প্রয়োজন নেই। সে প্রশ্ন করে—নামটা কি?

—রাধানাথ দাস।

—বাড়ি?

ঠিকানা একটা দিলাম।

পকেটে খানাতল্লাসী করে পরিচয় জ্ঞাপক কোনো নিশানা না পেলেও সেই আঙটিটা পাওয়া গেল।

—এটি কি! কুড়িয়ে পেয়েছ নিশ্চয়ই—এখন চলো আমার সঙ্গে—

আমি বললাম—জঞ্জালের ভেতর পেয়েছি, আমি নিজেই থানায় যাচ্ছিলাম।

ভদ্রমহিলাটিকে আর এর ভেতর জড়াতে চাইনি।

নির্জন জেলের কুঠুরিতে বসে একদিন শুনলাম সনাক্তিকরণ হবে। আমাকে সারে দাঁড়াতে হবে। ভদ্রমহিলাটিকে দেখে আমার মন আনন্দে ভরে উঠল। এইবার আমার মুক্তি। আততির মালিক স্বয়ং উপস্থিত। আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন, তারপর বললেন—হাঁ, এই সেই লোকটা।

তারপর চলে গেলেন।

এই কথা কটি বলে চলে গেলেন। ঘৃণায় যেন কণ্ঠস্বর কর্কশ হয়ে উঠেছে। তারপর তিনি কান্নায় ভেঙে পড়লেন। পুলিশ অফিসর তাঁকে ধরে নিয়ে গেলেন।

ডিটেকটিভ লোকটি কিন্তু ভালো মানুষ। তিনি বললেন—তোমার বাঁচবার কোনো চান্স নেই। কোনো জুরি তোমার আজগুবি জবানবন্দী বিশ্বাস করবেন না।

—আমি কিন্তু কাউকে খুন করিনি। এই কথাটা বোঝাতে পারছি না। এমন কি লোকটা কেমন দেখতে তাও জানি না।

অবিশ্বাসের ভঙ্গীতে মুন্ড দেহ নিয়ে পশমের ডিটেকটিভ ইনস্পেকটর মাথা নাড়লেন। বললেন—রিভলবারে তোমার আঙুলের ছাপ পাওয়া গেছে। পকেটে হীরের আঙটি। খুনের কিছুক্ষণের ভেতরই তোমাকে ওদের বাড়ির কাছে ধরা হয়েছে। এখন আর সত্যি কথা বলতে আপত্তি কি! সত্যি কথা বললে ফাঁসীটা রদ্দ হবে না, যাবজ্জীবন হবে।

তিনি হেসে উঠলেন। বললেন—দেখো এসব কেসে সত্যি কথা বললে তোমার ক্ষতিটা কি! যারা ত' যাবেই। বুকটা হালকা করে আরাম করে যাও।

আমার স্বপক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন একজন ছোকরা উকীল। নিছক দয়া করে। একবার আমার সঙ্গে দেখা করে তিন ঘণ্টা গায়ছা কাচা করে ছেড়েছেন।

—কোন হাত দিয়ে রিভালবারটা তুলে রেখেছ মনে নেই! তাঁর কণ্ঠস্বরে ঘৃণা, অথচ সংস্কার। ভদ্রলোকের মুখভঙ্গী আমাকে করাতের মত কাটে।

বিচার ভালোই হয়েছিল। সরকারি উকীল তাঁর বক্তব্য সংক্ষেপে ও সরলভাবে বলে গেলেন—আসামী নীচের জানলা দিয়ে ঘরের ভিতর ঢুকেছিল। জানালাটা বন্ধ ছিল, আটকানো ছিল না। মৃত শিবশঙ্করবাবু আর তাঁর স্ত্রী হঠাৎ এই ঘরে এসে পড়েন, ফলে আসামী বেতভম্ব হয়ে পড়ে। আসামী মিঃ চৌধুরীর বুকটা লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়েছিল। তবে আসামী আনাড়ি, ছিঁচকে চোর, এই কাজ বোধ হয় ওর প্রথম।

তারপর বললেন—কারো বিশ্বাস হয় মিসেস চৌধুরী এই আসামীকে জানলা খুলে ডাকলেন? তারপর গুলিভরা রিভালবার হাতে তুলে দিলেন! আমি আর কিছু বলব না।

আমার উকীলবাবু ছাড়বার পাত্র নন। তিনি ভদ্রমহিলাকে জেরার জেরবার করেছেন। মহিলাটির অনমনীয় দৃঢ়তা। এমনভাবে কথা বলছেন যেন যা বলছেন সবই সত্যি।

—কোন্ হাতে আসামী রিভালবার ধরেছিল?

—ডান হাতে।

—ঠিক বলছেন?

—হাঁ।

—কি করে ঠিক বলছেন। কি করে আপনি লক্ষ্য রাখলেন?

—ঘরের ভিতর ঢুকতেই দেখলাম। দরজার থেকে হীরের আঙটি বাঁ হাতে তুলে নিল, আর ডান হাতে রিভালবার—মিঃ চৌধুরী অবস্থাটা বুঝতে পেরে এগিয়ে যাচ্ছিলেন কিন্তু বেশীদূর যেতে হলনা, তারপর এই কাণ্ড—

কান্নায় ভেঙে পড়লেন মিসেস চৌধুরী!

আমার উকীল কিছুক্ষণ থেমে আবার জেরা করলেন।

—তাহলে আসামী আগেই মিঃ চৌধুরীর রিভালবারটা হাতিয়েছিল! আপনাদের রিভালবার কি ছেসিং টেবলেই থাকে বরাবর?

—হাঁ, সেদিন তাই ছিল!

—লোকটা ডান হাত দিয়ে রিভালবারটা ধরেছিল, আর কোনো উদ্দেশ্য ওর ছিল কিনা বলতে পারেন না? কিন্তু আপনার বাড়িতে সেদিন অশোক মজুমদারকে আপনি নিমন্ত্রণ করেছিলেন কি!

—নিমন্ত্রণ আমি কাউকেই করিনি!

—তিনি কি এসেছিলেন? কখন এসেছিলেন? এখন তিনি কোথায়?

—এ কথার জবাব আমি দেব না! তিনি কোথায় আমি জানিনা!

—বেশ! তাঁর কাছে লেখা আপনার একখানি চিঠি আমার হাতে আছে। সেই চিঠিতে কিছু জবাব হয়ত পাওয়া যাবে! আচ্ছা এইবার কিংগার প্রিন্ট ইন্সপেক্টরকে ডাকা হোক—

আবার সুরু করে ছোকরা উকীল, সবাই মুখ টিপে হাসছে। আদালতের ভয়ে কেউ কথা বলছে না। যেখানে সরকার পক্ষে নরোত্তম হাজরা সেখানে এই ছোকরা উকীল নলিনাক্ষ সরকার কি করবে।

ছোকরা উকীল প্রশ্ন করেন—আসামী ছাড়া আর কারো আঙুলের ছাপ আপনি রিভালবারে পেয়েছেন। হাঁ আরো দুটো ছাপ আছে, তার সঙ্গে আসামীর হাতের ছাপ মেলেনি!

—আসামীর ছাপ, ডান হাতের না বাঁ হাতের?

—বাঁ হাত! অন্য দুটি ছাপ ডান হাতের!

আদালতের কামরার সার্সীতে দুটি চড়ুই পাখীর কলরব শোনা যায়। আদালতের সকলের চোখ এখন মিসেস চৌধুরীর দিকে। তিনি আমার দিকেই তাকিয়ে আছেন। সে চোখে করুণার ছাপ নেই, সে চোখ এখন হাসছে।

আমার উকীল বললেন—এইবার তাহলে মিসেস চৌধুরীর এবং অশোক মজুমদারের আঙুলের ছাপটা পরীক্ষা করা হক। গুলিটা লেগেছে ডান হাত থেকে এমনই ধারণা এক্সপার্টের।

মিসেস চৌধুরী কি যেন মুখে পুরলেন। চিউইং গাম, সুপুরি না চকোলেট?

পর মুহূর্তেই তাঁর চেতনাহীন দেহ লুটিয়ে পড়ল চেয়ারে। সাদা পাউডারটাকেই কি পটাসিয়াম বলে?

একটি তরুণ আর কার্নেশন ফুল

মূলঃ আইজাক ডিনসেন

অনুলেখন : গৌরীশংকর দে

বেলজিয়ামের ছোট এলাকার একটা ছোট, হিমহাম হোটেল। কুইনস্ হোটেল। জাহাজের ক্যাপ্টেনদের অনেকে মাঝে মাঝে এখানে আসেন। সস্তা ব'লে থাকেন।

মার্চ মাস। সন্ধ্যার বিষণ্ণ ছায়া নেমে আসছে। ক্লান্ত পা ফেলে হোটেলের দিকে যাচ্ছে একটি ইংরেজ যুবক। বিষণ্ণতা তার চোখেও।

যুবকের নাম চার্লি ভেনপার্ড। গায়ের আর চুলের রং একই রকম। রঙীন চোখ দুটি মধ্য-গ্রীষ্মের আকাশের মতো নীল। পরনে নতুন পোশাক। হাতে তোরঙ্গ।

বয়েস তিরিশের বেশি নয়। দেখাচ্ছে আরো ছোট।

চার্লি সাহিত্যিক। তোরঙ্গের ভেতরে আছে ওর অসমাপ্ত পাণ্ডুলিপি। এর শেষ দু-তিনটি অধ্যায় লিখবে বলে সে যাচ্ছে ইটালীতে। স্ত্রী-ও আছে সঙ্গে। সে চলে এসেছে আগেই। চার্লির জন্যে অপেক্ষা করছে কুইনস্ হোটেলে।

ফেলে-আসা দিনগুলির কথা মনে পড়ে চার্লির। বড় গরীব ছিল ওর মা-বাবা। প্রতিদিন ওদের খাবারও জুটতনা। তারপর একেবারে রূপ-কথার নায়কের মতো রাতারাতি বদলে গেল অবস্থা। একখানা বই লিখেই নাম ক'রে ফেলল চার্লি। নামের সঙ্গে সঙ্গে এল অর্থ। শুধু কি রাজত্ব? রাজকন্যাও। এক বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকের সুন্দরী মেয়ে ওকে বিয়ে করল। ছিল চার্লি একেবারে ঘরের ছেলে, হ'য়ে গেল ওদের ঘরের একজন। ভাগ্য-লক্ষ্মী তার হাতের দীপের আলো সব টুকুই যেন ধরলেন ওর মুখে।

তবু এক বিপন্ন বিস্ময় তার রক্তের ভেতরে খেলা করে রাত্রি দিন। চার্লি বড় ক্লান্ত। ছকে বাঁধা প্রতিটি মুহূর্ত। মনে হয় সব ফুল ফুটে গেছে এক সঙ্গে, উপবনের পথে ঝ'রে আছে, শুধু মলিন পাপড়ি। ডানা হারিয়ে মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ে গেছে মুমূর্ষু কল্পনা। নিভে এসেছে বুকের ভেতরকার আগুন। মনের পর্দায় ভেসে ওঠেনা নতুন ছবি, রক্তের ভেতরে কোলাহল আনে না নতুন শব্দ। সব ক্ষমতা, সব দীপ্তি হারিয়ে মাটির তলায় লুকিয়ে-রাখা তরবারির মত বিবর্ণ আজ মন। প্রথম লেখাতেই নিঃশেষিত হ'য়ে গেছে তার শক্তি। আর কি সে পারবে দ্বিতীয় মহৎ সাহিত্য সৃষ্টি করতে? বলার যা ছিল সবইতো বলা হয়ে গেছে। তোরঙ্গের ওই পাণ্ডুলিপি তো ক'য়েক মিস্ত্রি কাগজ। আর লিখতে পারবেনা চার্লি। সাদা কাগজ এখন থেকে শুধু বিদ্রূপ করবে ওরদিকে তাকিয়ে। এখন যা সে লিখছে সে-তো খবরের কাগজ, পাঠক, আর সমালোচকের চাহিদামতো। নিজের সঙ্গীত হৃৎপিণ্ড সে-সব লেখার কোনোটিতেই তো সে পারছেনা ছুঁড়ে দিতে। নিজের ইচ্ছা বিসর্জন দিয়ে ও পরের আবদার রাখছে। একটা ষড়যন্ত্র চলেছে চার্লিকে ঘিরে। জেনেশুনেও তাতে সে জড়িয়ে

পড়েছে। এই ষড়যন্ত্রে যোগ দিয়েছে সবাই : পাঠক, সমালোচক, এমন কি ওর স্ত্রী লরাও। চালি রক্ত-মাংসের মানুষ ওরা তা ভুলে গেছে। সবাই ভাবছে ও লিখবার একটা যন্ত্র।

কেন এত বিখ্যাত হ'তে গেল চালি! তাই তো এখন ওর আত্মহত্যার অধিকারও নেই। এর আগে, ছেলেবেলায়, ক্ষুধার জ্বালায় যখন সে ছটফট করত তখনও অনেকবার মরতে চেয়েছে নদীর জলে ডুবে। কিন্তু সেদিনের সঙ্গে আজকের কত তফাৎ। তখনকার আত্মহত্যা হত নিছকই অখ্যাত, অজ্ঞাত কিশোরের আত্মহত্যা। তার খবর বিশেষ কেউ রাখত না। আর এখন? যশের উজ্জ্বল আলো এসে পড়েছে মুখে। তার দিকে অনবরত তাকিয়ে আছে ক'য়েক হাজার চোখ। ওর কোনো ব্যাপারই যেন এখন আর ব্যক্তিগত নয়। এতটুকু আড়াল নেই কোথাও। খ্যাতি ডেকে এনেছে সমতলের মরুখানে, সেখানে এতটুকু ঝোপ-ঝাড় গর্ত নেই। সব গোপনতা অদৃশ্য হয়েছে কুয়াশার মতো। কিছুই আর নেই যা তার একার, যা তার ব্যক্তিগত। আজ যদি সে নিজেকে ব্যর্থ মনে করে, সে ব্যর্থতা, সে আত্মহত্যা হবে একজন বিশ্ববিখ্যাত সাহিত্যিকের।

ওর প্রথম বই শেষ বিচারে কি টিকে থাকবে? শ্বশুর মশাই তো সেদিন পরিষ্কার ব'লেছেন "একেবারেই হাল্কা, চটুল, আর ভাঁপা আধুনিক সাহিত্য। ওজন নেই, মহত্ব নেই। একেবারে ভাসা-ভাসা। যা একবারও স্পর্শ করতে পারল না গভীরতা, কী হবে তা লিখে?" এ প্রশ্ন শুধু তার শ্বশুর মশাইয়ের নয়, এ প্রশ্ন চালির নিজেরও।

হঠাৎ চালি ভাবনার খেই হারিয়ে ফেলল। যে ঘরে লরা অপেক্ষা করছে ও এসে পড়েছে তার সামনে। নিচের রাস্তোরান বোধহয় এই ঘরটার কথাই ব'লে দিয়েছিল।

একটু ধাক্কা দিতেই দরজাটা খুলে গেল। ঘর প্রায় অন্ধকার। ড্রেসিং টেবিলের ধারে শুধু মৃদু একটা গ্যাস-বাতি জ্বলছে। ঘরের বাতাসে ভায়োলেটের গন্ধ। একদিকের দেয়াল দেখা যাচ্ছে। আশমানি রঙের কাগজে মোড়া। জানালায়, দরজায় লাল পর্দা।

ঘরে দুখানা খাট। একটিতে অঘোরে ঘুমোচ্ছে লরা। নিঃশ্বাসের তালে তালে ঢেউয়ের মতো ওঠা-নামা করছে ওর বুক। ওকে মনে হচ্ছে শাদা সোনালের কোয়কের মতো।

লরাকে আর জাগাতে চাইলনা চালি। শুয়ে পড়ল শূন্য বিছানায়। ঘুমের আমেজে বুজে আসছে চোখ। এমন সময় দরজায় একটা শব্দ হল। কে যেন হাতল ঘোরাচ্ছে। ওই তো টোকা দিচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে মিস। লরার ঘুম ভেঙে যাবে যে।

বিছানা থেকে উঠে, গায়ে সবুজ রাত্রিবাসটা চাপিয়ে আস্তে দরজাটা খুলল চালি। টানা বারান্দার দেয়ালে উজ্জ্বল আলো জ্বলছে। আর সেই আলোর ঠিক নিচে দাঁড়িয়ে এক অসাধারণ রূপবান যুবক। দীর্ঘ দেহ। স্বপ্নাতুর চোখ। পরনে বিকেলে বেড়াবার ঝলমলে পোষাক। বুকের ওপর, বোতামের ঘরে একটা সোনালি কার্নেশন ফুল। আশ্চর্য শান্তির আভাসে উদ্ভাসিত যুবকের মুখ। এমন শান্ত, স্নিগ্ধ মুখশ্রী এর আগে চালি কোনোদিন দেখেনি। মন্টেরাতের কুইনস্ হোটেলের বারান্দায় এল এ কোন দেবদূত!

আগন্তুকও কম অবাক হয়নি। একটু সময় চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে ব'লে উঠল "একটা ভুল হ'য়ে গেছে। আপনাকে বিরক্ত করার জন্য মাফ চাচ্ছি।" কথা তো নয়, যেন গান গেয়ে উঠল।

আবার ঘরে ফিরে বিছানায় শুয়ে পড়ল চার্লি। সঙ্গে সঙ্গে মন হ'য়ে উঠল অশান্ত সমুদ্র। মনে হল এতক্ষণ আলো এক মুহূর্তের জন্ত তার মুখে প'ড়ে সঙ্গে সঙ্গে সরে গেছে। এখন সামনে শুধু সীমাহীন তমসা।

মনে হল যে শান্তি, যে গৌরব, যে আলো, যে পরমার্থ এতদিন ধ'রে সে খুঁজে এসেছে পৃথিবীতে অন্তত একজন তা পেয়েছে। পেয়েছে ওই যুবক যার বুকের ওপর মহার্ঘ রত্নের মতো ঝলমল করছে কার্নেশন ফুল, যার মুখশ্রীতে অনন্ত শান্তির জ্যোতি। আর, একজন যখন সেই আনন্দ-লোকের সন্ধান পেয়েছে চার্লির পক্ষে এখনো সম্ভব হতে পারে সেই স্বপ্ন-রাজ্যের নিশানা বের করা। সেই মঙ্গললোকে কবেই তো সে যেতে পারত। পারেনি নিজেরই দোষে। গ্রহ-তারকা, সাগর, হ্রিয়ি পরিত্যাগ করে সে সন্তুষ্ট থেকেছে কেবল সেই সব শব্দে যা শুধু ঈশ্বরের ওই সব উপহার বর্ণনা করে। আর শব্দের দাসত্ব নয়। এবার চার্লি বেরিয়ে পড়বে বিপুলা পৃথিবীর মাঝখানে, আনন্দের সন্ধানে দিগন্ত থেকে দিগন্তে। পেছনে প'ড়ে থাকুক খ্যাতি, ঐশ্বর্য, প্রেয়সীর অনুযোগ। লয়া যাকে বিয়ে করেছে সে রক্তমাংসের মানুষ চার্লি নয়, সে হল লয়ারই মনের কল্পনা, একজন বিশ্ব-বিখ্যাত সাহিত্যিক। তাই তাকে ছেড়ে যেতেও কষ্ট হওয়া উচিত নয় চার্লির। প'ড়ে থাকুক সাহিত্য। চার্লি সাহিত্য সৃষ্টি করুক এ তো ঈশ্বরের অভিপ্রায় নয়। এবার পালে লাগুক হাওয়া। শেষ হ'য়ে এসেছে বন্দরের কাল।

ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে পড়ল চার্লি। বৃষ্টি পড়ছে টিপটিপ ক'রে। কী যেন বলতে চায় হাওয়া। একেবারে সমুদ্রের ধারে এসে পড়েছে ও। তাকাল জলের ভেতরে। মাথার ওপর ঝিকমিক করছে তারা। নিচে গভীর, অন্ধকার সমুদ্র। দীর্ঘ বাতিগুলির ছায়া পড়েছে জলে। এঁকেবেঁকে খেলা করছে নতুন সোনালি সাপের মতো। আকাশ থেকে নেমে আসছে অজস্র বাদলধারা, পায়ের কাছে এসে আছড়ে পড়ছে অবিরাম লবণাক্ত জল। কাছেই ভাসছে কয়েকখানা জাহাজ। বৃষ্টি-ভেজা অন্ধকারে মাস্তুলগুলো মনে হচ্ছে অতিকায়। জাহাজগুলির রহস্যময় গর্ভে বিচিত্র পণ্য, অনন্ত সম্ভাবনা, বহুজনের সৌভাগ্য। এরা অকূল পাথারের যাত্রী। যেখানে যেতে চায় সেখানেই এদের নিয়ে যায় লবণ-সমুদ্র! এরা সব দিক দিয়েই চার্লির চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

জাহাজগুলির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ ওর মনে হল ওই বিশাল হালগুলি থেকে সহানুভূতির প্রবাহ এসে তার ভেতরে অলৌকিক অনুভূতি সঞ্চার করছে। কী অমৃত-বাণী শোনাতে চাচ্ছে তার কানে-কানে। অনেকক্ষণ সেই বাণী রইল অস্পষ্ট। তারপর যেন একখানা কালো পর্দা চকিতে উঠে গেল মন থেকে: বিশাল জাহাজগুলিও তো ভেসে আছে জলের ওপর। ভেসে থাকাতেই ওদের ক্ষমতার পরিচয়। গভীরতা রইল অনেক নিচে, রইল অন্ধকার সমুদ্র-গর্ভ। তা স্পর্শ না করাতেই জাহাজের মঙ্গল। ভুমি স্পর্শ মানেই সর্বনাশ। ওরা ভাসা—এই তো ওদের অস্তিত্বের রহস্য। যতক্ষণ ওরা ভাসা ততক্ষণই সমুদ্র ওদের ক্রীতদাস। তাহলে নিজের সাহিত্য নিয়ে দুশ্চিন্তা কেন চার্লির!

ওর তাই দুঃখ হল কেন এতদিন আসেনি সমুদ্রের ধারে! জাহাজগুলির দিকে তাকিয়ে ও মনে মনে বলল: "সিন্ধু-বিজয়িনী, দেবদূতী! তোমাদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকবো চিরকাল। আমাকে আর তোমাদের যেন চিরকাল ভাসিয়ে রাখেন ঈশ্বর। দরকার নেই আমাদের গভীরতার।"

চার্লির সমস্ত শরীর বৃষ্টিতে ভিজে সপ্ সপ্ করছে। তবু সেদিকে ওর ভ্রূক্ষেপ নেই। নতুন শক্তি পেয়েছে ও এই রাত্রিশেষের সাগর-পাড়ে এসে। নতুন আনন্দ, নতুন উন্মাদনায় কানায় কানায়

ভরে উঠেছে চারি। বেঁচে উঠেছে বর্ষার জলের উদ্ভিদের মতো। এখন ঘুম ছুটতে শুরু করবে ওর ভেতরের সব অন্ধকার থেকে। আর দুঃখ নেই। যেখান থেকে চ'লে এসেছে স্বার্থপরের মতো, আবার ফিরে যেতে হবে সেখানে ঘুম ঘুমোচ্ছে ও লরাকে। তার কাছে ক্ষমা চাইবে অকপটে। কুইনস্ হোটেলের দিকে আবার পা বাড়িয়ে চারি।

ভোর হ'য়ে এসেছে। রাস্তার সারি-সারি বাড়িগুলি দাঁড়িয়ে আছে চুপ মুখে। আস্তে আস্তে ঘুম ভাঙছে শহরের। দু'চার জন লোক চলাচল শুরু হয়েছে রাস্তায়। এখনো আলো জ্বলছে কুইনস্ হোটেলের জানালায়।

হলঘর পেরিয়ে নিজের কেবিনে যাবে এমন সময় চারি দেখলে লরা বসে আছে হলঘরের পাশেই ছোট খাবার ঘরে। কাচের দরজা দিয়ে দেখা যাচ্ছে ফুটফুটে লিলি ফুলের মতো ওর মুখ। লরার সমুদ্র-নীল চোখে ভাবনার ছায়া।

চারিকে দেখতে পেয়েই লরা ব'লে উঠল : 'এত দেরি করে এলে তুমি!'

কোনো উত্তরই দিতে পারলনা চারি। ঘরের ভেতরে আলো জ্বলছে। আলোর রেখা এসে পড়েছে ছেঁড়া কার্পেট আর লাল মখমল-ঢাকা চেয়ারের গায়ে। সারাটা ঘরে কফি আর ভাজা রুটির গন্ধ। শাদা টেবিল ক্লথ আর ঝকঝকে কফির সাজ মিলে রচনা করেছে উৎসবের দিনের ভোর বেলার পরিবেশ। লরার গায়ে 'নীল পোশাক'। সোনালি চুল ঝিলমিল করছে আলো লেগে।

নতুন বই ! নতুন বই !!

প্রেমদাস তীর্থংকর (গুহাবাসী) প্রণীত

দেবভূমি বক্রেশ্বর

বাংলাদেশের স্বপ্রখ্যাত গ্রাম 'বক্রেশ্বর'—যার তীর্থ-মহিমা ভারতের অন্যান্য প্রসিদ্ধ তীর্থভূমির সমকক্ষ। সর্বত্যাগী মহাপুরুষ প্রেমদাস তীর্থংকর (গুহাবাসী) ভারতের সর্বতীর্থ পরিক্রমার শেষে এইরূপ দেবাদিষ্ট হন, "কাশীতে কাশী মাহাত্ম্য, জগন্নাথে জগন্নাথ মাহাত্ম্য, তদ্রূপ বক্রেশ্বরে, বক্রেশ্বর মাহাত্ম্য প্রকাশ করা আবশ্যক। তৎসঙ্গে এ তীর্থের লুপ্তপ্রায় সপ্ত মনিষীগণের জীবনী সাযোজিত রহিবে।" এই দৈবাদেশে লিখিত, তীর্থভূমির আলোক-চিত্র সম্বলিত প্রায় দেড়শ পৃষ্ঠার এই অনন্যসাধারণ গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে। বিভিন্ন সম্ভ্রান্ত পুস্তকালয়ে পাওয়া যাবে। দাম : ৫·০০

১৩৩এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৯

পরিবেশক :

জিজ্ঞাসা

৩৩এ, কলেজ রো, কলিকাতা

চার্লিকে তার দিকে তাকাতে দেখে লরা ব'লে উঠল : "কী ভাবছ অমন ক'রে ?"

চার্লি বলল : "তোমাকে মনে হচ্ছে রাত্রিবধূ। তোমার স্নিগ্ধ আলো আমাকে দেবে সুখের বিশ্রাম।"

লরার গোলাপি মুখ আরো গোলাপি হ'য়ে উঠল। ও শুধু বলল : "চলো, আমাদের কেবিনে যাই।"

ঘরে ঢুকে কিন্তু চার্লি অবাক হ'য়ে গেল। কাল রাতের ভায়োলেটের গন্ধ তো ঘরে নেই। বিছানার ওপর যে চাঁদোয়া ছিল সে-টা কোথায় গেল! দেয়ালে ওই যে ছবিটা টাঙানো রয়েছে কাল তো তা চার্লির নজরে পড়েনি। চার্লির মনে আর সন্দেহ নেই। কাল রাতে সে ভুল ক'রে অন্য কারুর ঘরে ঢুকে পড়েছিল। জোরে নিশ্বাস টেনেও মনে মনে ব'লে উঠল : "সর্বশক্তিমান ঈশ্বর! স্বর্গ যেমন মর্ত্যের থেকে সেরা, তেমনি আমাদের ছোটগল্পের চাইতে সেরা তোমার ছোটগল্প।"

এমন সময় ভূইনস্ হোটেলের সেই ছোট কেবিনে চার্লির চোখের সামনে ঈশ্বর আবির্ভূত হলেন। বললেন : "চার্লি, এখন থেকে তুমি প্রেমের গল্প লিখবে তো? এমন গল্প যা চিরকাল বেঁচে থাকবে তরুণ-তরুণীর মনে?"

চার্লি বলল : "তাই হবে প্রভু।"

ঈশ্বর আবার বললেন : "তোমাকে সাহিত্য সৃষ্টি করতে হবে। পাঠকদের জন্যও নয়, সমালোচকদের জন্যও নয়, আমার আনন্দের জন্য।"

চার্লি কি বলতে যাচ্ছিল। দেখল ঈশ্বর অন্তর্হিত হয়েছেন। লরা কখন খুলে দিয়েছে জানালা। বাইরে থেকে আসছে ভোরের হাওয়া, গাড়ি-ঘোড়ার শব্দ, চড়াই পাখির কিচিরমিচির, মানুষের কথাবার্তা, ধোঁয়ার গন্ধ। চার্লি তাকিয়ে দেখল আকাশে ঠিক ঠিক করছে রোদ। ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে পড়েছে মানুষ। একটি রূপসী তরুণী গায়ে সবুজ রঙের শাল জড়িয়ে চলে যাচ্ছে তাড়াতাড়ি।

এই জাগরণের প্রান্তে দাঁড়িয়ে চার্লি মনে মনে বলল : "ঈশ্বরের কাছে চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকবো। তিনি অন্তত একবার আমাকে করুণা করেছেন। যার বুকে গোলাপি কার্নেশন সেই যুবকের স্বপ্নের কুহকে আমার ভুল হাতের স্পর্শ পড়েনি। একেবারে আমার হাতের কাছে ছিল, তবু।" জানালা দিয়ে চার্লি চেয়ে দেখল হোটেলের বাস-যাত্রীদের নিয়ে চ'লে যাচ্ছে।

মেয়েদের কথা

শান্তা দেবী

আজ মেয়েদের বিষয় কয়েকটা কথা বলব।

মেয়েদের জীবনে কত রকম নূতন আদর্শ, নূতন সমস্যা, নূতন সমাধান আজকাল দেখা দিয়েছে। তার সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় থাকলে সে বিষয়ে বলবার অনেক কথা আছে নিশ্চয়। কিন্তু আমি খবরের কাগজ আর মাসিক পত্র ছাড়া কলকাতা সহরের নারী সমাজের পরিচয় বড় বেশী পাই না। কাগজে দেখি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় মেয়েরা ছেলেদের ডিঙিয়ে যাচ্ছে। টাকার অভাবে ঘরে ঘরে গৃহলক্ষ্মীরা চাকরী করতে ঢুকছেন। ফলে ওঁদের ছেলেমেয়েরা মায়ের যত্ন মায়ের সঙ্গলাভ পাওয়া থেকে বঞ্চিত হওয়ায় ভাল করে মানুষ হয়ে উঠতে পারছে না। আবার কখনও বা দেখি পয়সার অভাবে শিশু সন্তানকে খেতে দিতে না পারায় দরিদ্র মায়েরা অসহ্যপাতে টাকা রোজগার করতে চলেছেন। এসব জিনিষই ভাববার জিনিষ।

বিশ্ববিদ্যালয়ে মেয়েরা যে ছেলেদের ডিঙিয়ে যাচ্ছেন অনেক ক্ষেত্রেই সেটা ছেলেদের পক্ষে সত্যই লজ্জার কথা। ওঁরা পুরুষ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠতর জীব বলে যে ওঁদের উচ্চ মঞ্চে প্রতিষ্ঠিত থাকা দরকার তা আমি বলছি না। বলছি যে, যত মেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা দিয়ে থাকে তার চেয়ে বহু গুণ বেশী ছেলেরা পরীক্ষা দেয়। সেই সংখ্যার অনুপাতে অনেক মেয়ের প্রথম স্থান অধিকার করার কারণ এই দাঁড়ায় যে, বেশীর ভাগ ছেলেরা পরীক্ষা দিলেও পড়াশুনা কম করে এবং পরীক্ষার ক্ষেত্রে কৃতিত্ব লাভ করার উচ্চাকাঙ্ক্ষা তাদের কম, জ্ঞান লাভের ইচ্ছাও তাদের কম ধরতে হবে। নাহলে পরীক্ষার হলে গুণ্ডামি করে ছেলেরা পরীক্ষা পাশ করতে চেষ্টা করত না। বহু ছেলের মধ্যে এই যে অভদ্র ও অন্যায় মনোবৃত্তি আজকাল জেগে উঠেছে তার কারণ অনেকে বলবেন—বর্তমান যুগের হাওয়া। কিন্তু হাওয়াটায় অর্থাৎ অক্সিজেনে বা নাইট্রোজেনে আজকাল এমন কিছু পরিবর্তন হয়নি যার জন্য কলেজের ছেলেদের অধ্যক্ষকে ঘরে বন্ধ করবার বা আফিসের কর্মচারীদের ম্যানেজারকে তালা বন্ধ করবার প্রেরণা আসতে পারে। অশিক্ষা বা কুশিক্ষার যে হাওয়া তরুণ মানবদের এই রকম উচ্ছৃঙ্খল করে তোলে তার উৎপত্তি কতক ঘরে কতক বা বাইরে। ঘরের শিক্ষার জন্য প্রধানত মায়েরাই দায়ী। আগেকার মায়েরা ছেলেমেয়েদের যতটা কষ্টসহিষ্ণু করে মানুষ করতেন, এখনকার আদরের দিনে তা কোনো মা করতে চান না। আমরা বহু খ্যাতনামা মানুষের কথা শুনেছি যাঁরা রাস্তার আলোর তলায় দাঁড়িয়ে রাত্রে পড়াশুনা করেছেন, মুড়ি-মুড়কি খেয়ে ছয় মাইল হেঁটে স্কুলে দিয়েছেন। বই না থাকাতে পরের বই ধার করে এবং কপি করে অনেককে পড়তে হত। কাপড়-চোপড় যথেষ্ট না থাকাতে নিজের কাপড় নিজে সাবানে কেচে স্কুলের পোষাক পরিষ্কার রাখতে হত। কিন্তু আজকালকার মায়েরা কি করেন? পয়সা একটু থাকলেই ছেলেদের জন্য ইলেক্‌ট্রিক টেবিল ল্যাম্প, কেতা দুরস্ত ইউনিফর্ম, নানারকম ফাউন্টেন পেন, স্টিওয়াচের বদলে ঘড়ি বইয়ে দেন। হেঁটে স্কুলে যাওয়া ত স্বপ্নেও এরা

তাবে না। মোটরে, সাইকেলে, বাসে, ট্রামে, বিস্তর বড় বড় ছেলেরা স্কুল কলেজে চলেছে দেখা যায়। সময় অবশ্য তাতে সংক্ষেপ হয়। কিন্তু সেই উদ্বৃত্ত সময়টা কি সৎকাজে ব্যয় করা হয়? না সিনেমা, থিয়েটার, আড্ডা আর গুণ্ডামিতে নষ্ট হয়? মায়েরা সে কথা কি ভেবে দেখেন? ছেলেদের কি সর্বদা জিজ্ঞাসা করেন? ছেলেদের এই যে আদর ও বিলাস মেয়েদের বেলায় সেটা অনেক ক্ষেত্রেই কম থাকে। তাই বোধহয় তারা প্রাত্যহিক জীবনের পরিশ্রমের মত জ্ঞানার্জনের পরিশ্রমটাকেও করতে ভয় পায় না অত। পরীক্ষার জন্য পড়া মানে হয়তঃ গুলির মত কয়েকটি প্রশ্ন গলাধঃকরণ করা যদি আধুনিক কালের প্রথা না হত, তাহলে পাঠ্যপুস্তকগুলির ভিতর কি আছে ছেলেরা আর একটু ভাল করে জানতে পারত। তাতে শুধু যে পরীক্ষায় তারা বুদ্ধিমানের মত উত্তর দিতে পারত তা নয়, বিদ্যা থেকে মানুষের চরিত্র গঠনের যে সহায়তা হয় সেটাও তাদের হয়ত লাভ হত। তারা বুঝতে পারত প্রশ্নের উত্তর চুরি করে বা পয়সা দিয়ে কিনে লিখে বিদ্যা লাভ হয় না, জীবনে বিদ্যার ফলস্বরূপ যে সফলতা তাও লাভ হয় না।

মেয়েদের আমি পরিশ্রমী বলছি; কিন্তু বিজ্ঞান মানুষের জীবনযাত্রা আধুনিক কালে অনেক ক্ষেত্রে সহজ করে তুলেছে বলে আগের মত পরিশ্রম মেয়েদেরও করতে হয় না। আমেরিকার মত বোতাম টিপলেই খাবার ব্যবস্থা অবশ্য এ দেশে হয় না, কলে বাসন মাজা কাপড় কাচাও চলে না বটে। কিন্তু পুরাকালের মেয়েদের মত ক'জন আজকাল ঘড়া কাঁকালে করে জল আনে? তজন ধান ভানে, মুড়ি ভাজে, ঘর নিকোয়, ছেলের আলো সাজায় আর পুরুষদের খাবার সময় তাল পাখা দোলায়? গ্রামে এ সবই আছে, কিন্তু সহরে কুঁড়ে ঘরেও অনেক বিলাস আরামের পরিচয় পাওয়া যায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে। উদ্বাস্তুতে সহর ভরে না গেলে হয়ত গ্রামের জীবনের অনেক কিছুই কলকাতা সহরে দেখা যেত না। উদ্বাস্তুদের কল্যাণে কলকাতা সহরের অভিজাত পল্লীতেও গ্রামের দৃশ্য সর্বদা দেখা যায়। সেখানে মেয়েরা কাপড় কাচা, বাসন মাজা, রান্না করা, জল আনা, ঘর নিকোনো, ঘুঁটে দেওয়া গুল দেওয়া সবই করে ছেলে কোলে করেই। পুরুষরা কোনমতে উপার্জনের চেষ্টায় যতটা কাজ করতে হয় তাই করে। কাজের পর বাড়ী ফিরে এসে তারা আবার দেশোদ্ধারে বেরিয়ে পড়ে।

যে সমস্ত মেয়েরা স্কুল কলেজে পড়ে তাদের পারিবারিক পরিশ্রম গ্রামের মেয়েদের মত এত বেশী সচরাচর করতে হয় না। তবু কলেজে পড়া তাই যেখানে বসে বসে বাড়া ভাত খায়, সেখানে কলেজে পড়া বোন মার পাশে দুটো একটা রান্নাও করে, সংসারের অন্য কাজেও সাহায্য করে। তবু এই বোনেদের পড়ার মন বেশী দেখা যায়।

সন্তানবতী মায়েদের চাকরীর কথাও আজ কাল একটা ভাববার কথা। কারণ দুধার জন নয় বহুজনই সন্তান পালন আধাআধি করে চাকরীতে আজ কাল বেরোন। তার ফলে সন্তান হয় ঝি চাকরের হাতে পড়ে থাকে, নয়ত এমন কারুর হাতে মানুষ হয় যার পালন করা যা স্বং পছন্দ করেন না। সুতরাং নিতান্ত টাকার অভাবে সংসার অচল হলেই এমন মায়ের চাকরী করা উচিত। নতুবা যতদিন ছেলে মেয়েরা স্কুলে ভর্তি না হয় ততদিন মায়ে সর্বদা তাদের কাছে কাছে থাকতেই আমি বলব। শিশুরা যতক্ষণ স্কুলে থাকে সেই সময়টুকুর মধ্যের বাইরে কাজ করা উচিত, তার বেশী নয়।

অনেক উপার্জন-ক্ষম স্বামীদের স্ত্রীরাও আজকাল চাকরীতে ঢোকেন, টাকায় কুলোয় না বলেই শুধু নয়। তাঁদের যেসব ইচ্ছা বা সখ স্বামীর টাকায় মেটে না সেইগুলির জন্যও তাঁরা উপার্জন করেন,

অথবা উচ্চশিক্ষা তাঁদের যে সব কাজের যোগ্য করে গড়ে তুলেছে, শিশু সন্তান আছে বলেই তাঁরা নিজেদের সেইসব কাজ ছেড়ে দিতে রাজি নন। তাঁদের ঘরের বাইরেও একটা অন্যরকম উচ্চাকাঙ্ক্ষা সর্বদা থাকে। জীবনের কয়েকটা বছর সেই উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে ভুলে থাকবার জন্য যতটা মানসিক জোর থাকা দরকার সকলের তা থাকে না। তাঁরা ভাবেন দশ বারো বছর কাছে কাছে রেখে যে মা সন্তান পালন করেন তাঁর সন্তানও ত নিখুঁত হয় না, তবে কেন আমার বাহিরের কাজে জলাঞ্জলি দেব? তাদের থাকলে এমনি করেই ছেলেমানুষ হবে। কিন্তু আজকাল অল্পবয়সী ছেলেমেয়েদের উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য দেশের যে অবস্থা দাঁড়িয়েছে তাতে ভয় হয় সভ্য সমাজ আর বেশীদিন টিঁকবে কিনা সন্দেহ। যেখানে বয়স অভিজ্ঞ ও জ্ঞানবান লোকের উপদেশ ও পরামর্শ ১০।১২ বছরের ছেলেরাও শুনতে চায় না সেখানে মানুষের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার মূল্য দেবে কে? সুতরাং সবার আগে দরকার মায়েদের ছেলেমেয়েদের শান্ত সংযত ও কর্তব্যপরায়ণ করে গড়ে তোলবার চেষ্টা করা। চেষ্টা করেও দু'চারজন যদি বিফল হন, তবু নিষ্ঠা থাকলে আর দশজন সফল হবেনই। এবং তাতেই দেশের ভবিষ্যৎ বংশীয়রা সভ্য ও নিয়মানুবর্তী সুসংযত মানুষ হয়ে উঠবে আশা করা যায়।

অসহযোগে যারা স্কুলের অন্ন সংগ্রহ করে তাদের বিষয় এক কথায় একটা কিছু বলে দেওয়া যায় না। তাদের নীতিশিক্ষা দেবার উপদেশ দেওয়া সোজা কিন্তু তা কার্যকরী হবে বলে মনে হয় না। এক্ষেত্রে সহযোগে তাঁরা যেন অন্ন পায় আগে এর ব্যবস্থা দেশের কর্তা-কর্তাদের করতে হবে। দেশে আজকাল যেরকম সহস্র সমস্যার ভীড় তাতে কর্তারা কোন সমস্যাটা বড় আর কোনটা ছোট মনে করবেন তা সাধারণ লোকে বলতে পারবে না। অন্নবস্ত্র এবং উপার্জন ক্ষেত্র তিনটিই সুলভ হলে তবে কতকটা ফল হয়। কিন্তু তার আশা কি আমরা করতে পারি? সমাজসেবিকারা সরকারের চিন্তার বাইরেও যদি এইসব অভাগিনীদের জন্য কর্মক্ষেত্র গড়ে তুলতে চেষ্টা করেন কিছু কাজ নিশ্চাই হয়। নানাক্ষেত্রে হচ্ছেও অল্পবস্ত্র?

মেয়েদের পোষাক-আসাকের সমস্যাও আজকাল একটা সমস্যা। ফ্যাশানের নামে শালীনতাকে বর্জন করায় মেয়েরা অনেকক্ষেত্রে মানুষের শ্রদ্ধা হারান। মানুষ বস্ত্র ধারণ করে শীতাতপ নিবারণ, শালীনতা রক্ষণ এবং কিছুটা সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্যও। মানুষের দৃষ্টি বাণে বিদ্ধ হওয়ার জন্য পোষাক নয়। অন্নবস্ত্রে মানুষ মানুষকে নিয়ে ঠাট্টা তামাসা করুক এর জন্যও বস্ত্র নয়। সুতরাং সেই যুগে মেয়েদের পোষাক-আসাক ব্যবহার করাটাই শোভন।

মেয়েদের পোষাক-আসাকে শালীনতার অভাবটা ও অন্নবস্ত্রের সঙ্গে যুক্ত নয়। সুতরাং বুঝতে হবে যে মানুষ ভদ্রতা সভ্যতা এবং সম্ভ্রম রক্ষা করাকে আগে যত মূল্য দিত এখন তা দেয় না। মানুষের অর্থাৎ স্ত্রী ও পুরুষের মনোভাব আগের চেয়ে অনেক হাল্কা হয়ে গিয়েছে, উচ্চ চিন্তা, প্রাণধারণের গাম্ভীর্য এসব যেন সেকালের জিনিষ। সকলেই কচি খোকা ও কচি খুকী এইভাবে চলাফেরার একটা সংক্রামক ব্যাধি এসেছে। তার ফলে অসৎপথে যাওয়াটাও সহজ হয়েও উঠেছে। আজকাল বালক বালিকা ও প্রাপ্তবয়স্ক কার যে সমাজে কি স্থান বোঝা শক্ত।

বিবাহ সমস্যাও একটা বড় সমস্যা। চিরকালই এদেশে সমস্যাটা কোনো না কোনো আকারে ছিল। কিন্তু তৎসত্ত্বেও প্রায় সব মেয়েদের বিবাহ হয়ে যেত। যখন কুলীনদের যুগ ছিল তখন দুচারজন বাদ থাকলেও মৃত্যুর পূর্বে নাবালক মেয়েদের বিবাহ কোনোরকমে কারুর সঙ্গে দেয়ে দেবার আগ্রহে

ছেটা ছিল এবং হয়েও যেত প্রায়ই। আজকাল বিবাহটা মাত্রমাত্র হওয়ার দৃশ্য চলে গিয়েছে। সত্য বিবাহ না বলে নাম রক্ষার জন্য সবরা করার দিন নেই। বাল্যবিবাহও শিক্ষিত সমাজে প্রায় উঠে গিয়েছে। আইনের চৌদ্দ বছরে বিয়েও লোকে দেবার জন্য অত ব্যস্ত নয়। তাতে সময় বেশী পেলে অনেক দিকে সুবিধা হয় বলে কুড়ি বাইশ বছরটা স্বাভাবিকই ধরে নিয়েছে। ৩০ থেকে ৪০ বছরের কন্যার বিজ্ঞাপনও কাগজে দেখা যায়। বয়স বাড়ার জন্য মেয়েরা শিক্ষিতা হচ্ছে বেশীরভাগ করছে। কাজেই তাদের পছন্দ অপছন্দের কথাও বহুক্ষেত্রে ধরতে হচ্ছে। বিবাহ অধিকাংশে মেয়েই করতে চায়। কিন্তু এমন মেয়ে এবং মেয়ের মা বাবাও আছেন যাঁরা বরের বাড়ী বাড়ী গিয়ে সাধতে অপমান বোধ করেন। যাতে ভাল ছেলে আপনা থেকে আসে তবেই বিয়ে হবে এমন মনোভাবও আজকাল কিছু কিছু কন্যাপক্ষের দেখা যায়। যে দেশে কন্যাপক্ষ সেধেও অনেক কাঠখড় না পোড়ালে বিয়ে হওয়া শক্ত সেখানে আপনা থেকে ক'জন ভাল ছেলে মেয়ের বাড়ী বিবাহের প্রস্তাব করে পাঠাবে? তার উপর আজকাল এমন ছেলের সংখ্যা বেশ বেড়ে গিয়েছে যারা বিবাহ মোটেই করতে চায় না। আমাদের বাল্যকালে—পঞ্চাশ বছর আগে—একজন ভদ্রলোকের কাছে গল্প শুনতাম "বাংলা দেশে হিন্দু সমাজে দুজন মাত্র চিরকুমার আছেন।" কথাটা অবশ্য সম্পূর্ণ সত্য নয়, তবু আংশিক সত্য। আমাদের পরিচিতদের মধ্যে দুজনের নামই আমরা জানতাম। কিন্তু আজকাল ত প্রায় প্রতি গোষ্ঠীতেই দুই একজন শিক্ষিত চিরকুমার দেখা যায়। এইভাবে বরের সংখ্যা কমে গেলে কন্যাদের বিবাহ আরও শক্ত ত হবেই। অর্থনৈতিক কারণে অনেক ছেলে বিবাহ করে না, অনেকে রাজনীতি ক্ষেত্রে এত মেতে থাকেন যে বিবাহের সময় হয় না, অনেকে সুবিধাবাদী বলে বিবাহের বন্ধন ও দায়িত্বনিতে চান না। আবার বিবাহের বয়সও অনেকে বড় পিছিয়ে দেন—চল্লিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যে বিবাহ করেছেন এমন মানুষ অনেক আছেন। অথচ মানুষের আয়ুই বা কত?

অল্প বয়সে বিবাহের সম্ভাবনা কমে যাওয়াতে অনেক মেয়েই নিজেরা নিজেদের বিবাহের উদ্যোগী হন। তাতে সফল হবার মত ক্ষমতা সকলের থাকে না। এবং সব মেয়েই তার পছন্দমত পুরুষের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পায় না। যেমন পাত্রই হোক বিবাহ একটা করবই—এরকম প্রতিজ্ঞা থাকলে অবশ্য সফলতা অনেকটা সহজ হয়। কিন্তু নিজের মূল্য খুব বেশী করে ধরলে বিবাহ হওয়া শক্ত এবং হলেও সংসারে শান্তি পাওয়া যায় না। বিবাহে সুখী হওয়া না হওয়ার ক্ষেত্রে অনেক সময়ই ভাগ্য মানুষে ইচ্ছা করে। সবচাল যাকে মনে করা যায় সেও কোন না কোন দিকে বন্ধ হয়ে দাঁড়াতে পারে, আবার যার কিছুই গুণ নেই মনে হয় সেও জীবনটা পূর্ণ করে তুলতে পারে। এমনও হয় যে কন্যা স্বয়ংই নিজের দোষে জীবনটা মাটি করে বসেন।

তাই মনে হয় বিবাহটা ভাবী বংশধরদের কথা ভেবেই, নিজের সুখের কথা ভুলে, করা ভাল। অবশ্য উপদেশ দেওয়া যত সহজ কাজ তত সহজ নয়। চোখের সামনের বর্তমানকে ভুলে ক'জন ভাবী বংশধরদের কথা ভাবতে পারে? পিতামাতা মেয়ের বিবাহের সময় মেয়ে যেন সুখে থাকে এই কথাই আগে ভাবেন। মেয়ে স্বয়ং বর নির্বাচন করলেও মনের মত বর চায়। কে কবে ভবিষ্যতে জীবপ্রবাহ রক্ষা করবার জন্যে আসবে সে কথা তারা ভাবে না। যদি বা কেউ ভাবে তাকে তাহলে ভাবী বংশের আগে প্রত্যেককে ডাক্তার দেখিয়ে পরে অন্য কথা পাড়তে হবে।

শ্রীআয়ুর্বেদমের
মহাভৃঙ্গরাজ তৈল

* মস্তিষ্ক ঠাণ্ডা রাখে
* নিদ্রাহীনতা দূর করে
* কেশপতন রোধ করে
* অকালপক্কতা বন্ধ করে

দেশবরেণ্যগণ কর্তৃক
ব্যবহৃত ও উচ্চ প্রশংসিত

মানে ও গন্ধে অতুলনীয়
একবার ব্যবহার করুন।

বড় বড়
ষ্টেশনারী দোকানে
পাওয়া যায়।

শ্রীআয়ুর্বেদম.

২৭৯এ, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-৬ ফোন : ৫৫-৩২৯৪

হাউসফুল

বিজন ভট্টাচার্য

(পর্দা উঠতেই দেখা যায় কালিকা মেস বোর্ডিং-এর সুপ্রশস্ত একখানি ঘর। সামান্য কিছু কাঠের আসবাব—ছোট্ট একখানি টেবিল, চেয়ার, একটি আয়না কেলানো একটি ড্রেসিং টেবিল ও একখানি আলনা। বাঁ দিকে একখানি খাট—শুধু পর্দা পাতা। দেওয়াল ঘেঁষে একটি কাঠের ওয়ার্ডরোব। ঘরটি খালি অর্থাৎ কোন বোর্ডার নেই। নতুন বোর্ডার আসবে। আর সেই সুবাদেই মেসের চাকর দে'লগোবিন্দ ঘরের আসবাবপত্র ঝাড়পোঁছ করছে। দুদিকে দুটো জানালায় পর্দা। মাঝামাঝি চওড়া দরজায় ভারি পর্দা—গোটানো।

পেছনে ওপরে ওঠবার সিঁড়ি। সিঁড়ি ও ঘরের মাঝখান দিয়ে টানা করিডর। পর্দার আড়ে সরিয়ে দিলে লোক চলাচল দেখা যেতে পারে।

সিঁড়ির নীচে কালিকা মেস বোর্ডিং-এর স্বত্বাধিকারী—প্রোপ্রাইটর 'কাম' ম্যানেজার—মুকুন্দমুরারি বাবুর অফিসঘর। টেলিফোন, ফাইল পত্তর, পুরোনো দলিল দস্তাবেজ প্রভৃতি যথেষ্টার সরঞ্জামে এই অপ্রশস্ত অফিসঘরটি ঠাসা। তাতা একখানি টিনের চেয়ারে বসে ব্যাসবাক্য আর কোন আগলে মুকুন্দমুরারি সব কিছু তদারক করেন। আপাততঃ তিনি, খাতাপত্তরে ব্যস্ত। সামনেই অপেক্ষমান দু-তিনজন পাওনাদার—কেউ মাছ ব্যবসের, কেউ দুধের, কেউ বি-এর—বুরি অনুযায়ী প্রবৃত্তির দুলো বাড়িয়ে পাওনাগণ্ডার আশায় বসে আছে।

করিডর দিয়ে বি চাকর বোর্ডার—ইতস্ততঃ চলাফেরা করছে। সিঁড়ি ঘরে ওঠানামাও চলছে। সিঁড়ির গায়ে সটকান বোর্ডারদের নামধামের ফিরিস্তিটাও সযত্ন রক্ষিত। দরকার মত 'ইন' 'আউট,—টেনে দিয়ে বোর্ডাররা আসছেন, যাচ্ছেন।

মুকুন্দমুরারি কাজ করে যাচ্ছেন, পাওনাদারের দল হুমড়ি খেয়ে পড়ে সামনে বসে, দাঁড়িয়ে আছে। ঝাঁঝালো সন্ধ্যার শঙ্খের সঙ্গে নেপথ্যে ঠাকুর চাকরের হাঁক ডাক শোনা যাচ্ছে। বিকেল বেলা। অফিস অন্তে পঞ্চাননবাবু মেসে ফিরলেন। যথারীতি করিডর ধরে এগিয়ে গিয়ে মুকুন্দমুরারির দপ্তরের সমুখ দিয়ে সিঁড়ি ধরে ওপরে উঠে যাবেন, হঠাৎ বিড় বিড় করে হিসেব কষতে কষতে মুকুন্দমুরারির টনক নড়ে ওঠে।)

মুকুন্দমুরারি: (সামনের পাওনাদার নরেন দালালকে উপলক্ষ্য করে) ব্যবসা যা হবার হয়ে গেছে। ব্যবসা করে আর খেতে হবে না কাউকে।···

নরেন দালাল: যা বলেছেন।

মুকুন্দমুরারি: ···এখন, এখন শুধু টিঁকে থাকা। ···করে ফেলিছি পাস কাজ কেঁদে বসে! কি করবো! মুখের গ্রাসের কারবার। তিন চার শুক্ত কমসে কম চার পাঁচা কুড়ি, হুঁতা সে হুঁশ' মুখ তো বটেই, হাঁ করে তোমার মুখ চেয়ে বসে আছে, বন্ধ করে দেবো বল্লেই তো আর তুমি হাঁড়ি শিকেয় তুলতে পারছো না। মাছ নেই, দুধ নেই, চাল নেই, ডাল নেই আবার শুনছি ডুবও নাকি পাওয়া যাচ্ছে না···

হাঁক পাড়া: না না যাচ্ছে, ডুব পাওয়া যাচ্ছে।

মুকুন্দমুরারি: আহা-হা এই পাওয়া যাচ্ছে, এই

পাওয়া যাচ্ছে না—আমি এমনি কথার কথা বলছি। নিরাকার হতে আর কতক্ষণ?

নরেন দালাল: যথার্থ কথাই।

মুকুন্দমুরারি: তা সে মাছ নেই, দুধ নেই, তরি-তরকারি কিছু নেই অথচ বোর্ডারবাবুরা বলবেন, ঐ তো বসে আছে মুকুন্দমুরারি—পাঁজাকোলা করে ঘরে ডেচকিতে বসিয়ে দাও, ছেড়ে কথা কইবে? তা সে হোটেল বিজনেসের অনেক জ্বালা। এই চলছে চলছে একদিন এসে দেখবে শিশি বোতলগুলা ভেঙে সের ঘরে সব মালপত্তর বেচেবুচে···, কথায় মাঝখানে এক ঠোঙা ফল আর শশা হাতে বোর্ডার পঞ্চানন বাবু করিডর ঘরে ঢুকে 'ইন আউট' টেনে দিয়ে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যান। পঞ্চানন বাবুকে চশমার ফাঁক দিয়ে চকিতে লক্ষ্য করে হাঁক-ডাক পেড়ে ওঠেন মুকুন্দমুখার্জি)···কিনি গেলেন? পঞ্চানন বাবু না? (হাঁক পাড়েন) বলি ও পঞ্চাননবাবু স্যার, ও পঞ্চানন বাবু! আরে মশাই শুনে যান, দেখে যান।

পঞ্চাননবাবু: (স্যুট পরা প্রৌঢ় অফিসার ঘুরে এসে বলেন) কি ব্যাপার?

মুকুন্দমুরারি: 'না মানে কথা'—বলবার সময় তো বলবেন, টু হাণ্ড্রেড পারসেন্ট লাভ! টাটকা টাটকা খেয়ে অভ্যেস, বাসী করা ঝোলের মাছ তা-ও নাকে ওঁকে বলে দেন বাসিপচা, এই দেখুন ঘর ঘরেছে কত করে কাটা পোনার নরেন দালাল!

পঞ্চাননবাবু: কত করে?

মুকুন্দমুরারি: সাড়ে পাঁচ, ছয়। তা-ও পাইকিরি!

পঞ্চাননবাবু: Criminal. পুলিসে দিন।

নরেন দালাল: তবেই তো মাছের মায়েরা আর বিয়োবে না কাল থেকে স্যার।

পঞ্চাননবাবু: কেন, ফরেস্ট্রাল রেট সাড়ে তিন!

নরেন দালাল: কোন জেলের ঘাচ্চা দেবে দাদা! আপনি আমায় পুলিসেই দিন স্যার। তবু জেল-হাজতে দুটো খেতে পাবো।

পঞ্চানন বাবু: Fantastic!

নরেন দালাল: তাঁরা তাঁরা পাইকারদের কথা বাদ দিন, তাদের আমিও দেখিনি, আপনিও দেখেন নি, পুলিসও দেখেনি—বন্যা রিলিফের মতই তারা নিরাকার, কিন্তু আমরা যারা ছোট কারবারী মানুষ, বেচে কিনে খাই··

পঞ্চাননবাবু: তাই বলে ছ' টাকা দর।

নরেন দালাল: পড়তায় না পোষালে স্যার কি করবো বলুন?, আপনি খরচটা দেখুন!

পঞ্চাননবাবু: খাবো না মাছ।

নরেন দালাল: এ তো স্যার আপনি গিয়ে চরিত্তির শুদ্ধির কথা বলেন। সে হলে অনেক কিছুরই তো দিয়ে হতো আমাদের।

পঞ্চাননবাবু: হ্যাঁ তাই করতে হবে। নইলে চারদিকের এই সব জাল জোচ্চুরি·····

নরেন দালাল: আপনি স্যার দেখেন নি তাই এতবড় কথা বলছেন। বাজারে গিয়ে দেখুন গিয়ে রামদোবাবু আর শ্রীমতী শাঁকচুন্নী পান তো কাঁচা মাছ লাইনেই চিবিয়ে খান। (হাসে) বলে না বিশ্বাস যাবেন মুকুন্দমুরারিবাবু, আমার চোখে আঙুলটা সত্যি, সে দিনে বাপের বয়সী একজন ভোমরা চোমরা ভদ্দরলোক, পরনে সে রেশমের ধোপভাঙা ধুতি পাঞ্জাবী, লাইনে দাঁড়িয়ে মাছ পেলেন না বলে ঠিক তার পাশের মহিলা লাইনের—তেনার মেয়ের বয়সী একজনা বৌমেয়েকে কি বলে শাপান্ত করলেন জানেন···

পঞ্চাননবাবু: হ্যাঁ সে কেচ্ছা অনেক রকমই রটছে শুনছি।

নরেন দালাল: না না ভদ্দরলোক যে মেয়েটিকে কি বলে গালাগালটি দিলেন শুনুন না!

মুকুন্দমুরারি: শুনি শুনি।

নরেন দালাল: ভদ্দরলোক তার মেয়ের বয়সী বৌটাকে বল্লেন, তুই বিধবা হবি। ভাবতে পারেন?

পঞ্চাননবাবু: আর তুমি দাঁড়িয়ে শুনলে?

নরেন দালাল: ভদ্দর লোকের কথা শুনে

ছেলের ছেলের বটখানা অবধি বিজলী বাতির আলোয় ঝিলিক মেরে হেসে উঠলো। ভদ্রলোক দেখি তখনও শাপান্ত করছেন! (মুকুন্দমুরারিকে) তা সে হিসেব না হয় পরে করবেন'খন এখন শ'ত খানেক টাকা ছাড়ুন তো, এখনও বহু দরজায় ধরা দিতে হবে।

পঞ্চাননবাবু: Abominable. [প্রস্থান

মুকুন্দমুরারি: তা সে ধরা দিয়েই যখন হাতে টাকা তখন সে ধরা দিয়েও সুখ আছে।

নরেন দালাল: আর আপনি দাদা যে বসে বসে খিঁচছেন!

মুকুন্দমুরারি: কি! হুঁ! (পঞ্চাননবাবুদের লক্ষ্য করে) সব পুরোনো বোর্ডার। পাঁচ শ হাজারের নীচে কেউ মাইনে পায় না। অথচ প্রত্যেকের কাছে দু মাস চার মাস করে বাকি পড়ে আছে—টাকা চাইলেই চলমখোর।.....

[ক্যাস বাক্স থেকে টাকা দেন নরেন দালালকে। নরেন দালাল চলে যেতেই এগিয়ে যায় হারু গয়লা:]

(হাঁক দেন) গোলগোবিন্দ! গোলগোবিন্দ!

(হারু গয়লাকে) কি! ক্যাসে টাকা নেই। ...গোলগোবিন্দ!

হারু গয়লা: বাসি খাঁট টানলে কি দুধ বেরুবে?

মুকুন্দমুরারি: মানে।

হারু গয়লা: গরু খাবে কি?

মুকুন্দমুরারি: গরু খাবে কি সে ব্যবস্থাও আমাকে করতে হবে? —নাও ধর। ধর আর বাজেনা করো না।

হারু গয়লা: কত দিচ্ছেন।

মুকুন্দমুরারি: কত দিচ্ছেন গুণে নেও। ...গোল গোবিন্দ!

গোলগোবিন্দ: যাই বাবু!

(হন্ হন্ করে সামনের দিকে এগিয়ে আসেন মুকুন্দমুরারি)

মুকুন্দমুরারি: যাই বাবু, কি এখনও দুই চেয়ারের হাতল বসছিস? বলিছি না একবার ঝাঁটা মেরে বিদি।

গোলগোবিন্দ: হুঁ তা বোর্ডারবাবু আসিলে তো মারবো।

মুকুন্দমুরারি: বোর্ডারবাবুকে ঝাঁটা মারবি নাকি?

গোলগোবিন্দ: সে আপনি যেমন বলিবেন।

মুকুন্দমুরারি: হাসছেন, পাজি ছুঁড়িছিস?

গোলগোবিন্দ: হুঁ।

মুকুন্দমুরারি: আপনা ওখানে কেন? আপনা পেছনে যাবে। খাটের পাশে।.....

(গোলগোবিন্দ ফরমাসে মত কাজ করে) টেবিল থাকবে সেন্টারে। চেয়ারটা টেনে দে।...আরাম কেদারা ওদিকে। ডান দিকে বুক্ কাঁচিকা।..

[হোটেলের দালালের প্রবেশ]

...কি? আসেন নি।

দালাল: মালপত্তর সমেত ট্যাক্সিতে বসে আছেন।

মুকুন্দমুরারি: ট্যাক্সিতে বসে আছেন কি reception দিতে হবে নাকি! আসতে বলো, ভেতরে নিয়ে এসো মাল, খবরদার বদু-এরা সব গেল কোথায়? ট্যাক্সিতে বসে আছেন! রাস্তায় ঝাঁকা মুটে কি কুলীটুলি কেউ নেই! এমন সব কথা বলো যে শুনলে মাথায় রক্ত চড়ে যায়। (গোলগোবিন্দকে) যা তো, ট্যাক্সি থেকে হাতে হাতে মালপত্তর সব ঘরে তুলে দে। তুমি যাও সঙ্গে।

[গোলগোবিন্দ ও দালালের প্রস্থান

[মুকুন্দ মুরারি ঘরের আসবাব পত্র তদারক করেন। ওয়ার্ড রোবের পাল্লাটা বন্ধ করে চেয়ারটা টেনে দেন একটু। সুইচ-টা টিপে পরখ করে দেখেন। ইতিমধ্যে নতুন বোর্ডার সমেত গোলগোবিন্দ ও দালাল এসে উপস্থিত হয়।

নতুন অভ্যাগত বোর্ডার বয়সে নবীন। তরুণ

যুবক! সুশ্রী চেহারা। পদস্থ নতুন চাকরীতে বহাল হয়ে শহরের মেস বোর্ডিং-এ এসে উঠেছেন। নাম তরণকান্তি ব্যানার্জি। বর্তমানে সীট্-এর অপ্রতুলতা সত্ত্বেও স্পেশাল রেট দিয়ে একখানি ঘর নিয়ে নিয়েছেন, ভবিষ্যতে ঐঁকে পেলেই মুকুন্দমুরারি সীট এর বন্দোবস্ত করে দেবেন এই আশ্বাসে]

মুকুন্দমুরারি: নমস্কার! আসুন স্যার, আসুন। আপনার জন্যেই অপেক্ষা করে আছি। বসুন। ট্রেন কি লেট ছিল?·· পরশু একবাপ চা খাবেন তো? এই গোলগোবিন্দ! ঝট করে স্পেশাল এক কাপ চা নিয়ে আয় তো! ধাঁ করে যাবি আসবি।

(প্রস্থানোদ্যত গোলগোবিন্দকে ফেরিয়ে)

উটি স্যার আপনার জন্যেই। খুব বিশ্বাসী। কেটে ফেলে দিন—মুখ দিয়ে রা কাড়বে না। আপনি সব কিছু ওর ওপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্তি থাকতে পারেন। কোন কিন্তু করবেন না। আর এমন তেমন হলে আমি আছি। তবে কেন না একটু বোকা। তা যা দিনকাল পড়েছে একটু বোকা হাবা হওয়া ভাল। ঝাঁড় পোঁছ থেকে ডলাই মলাই সব কিছুই চলতে পারবে। টাকা কড়ির কথা আপনি কিছু বলতে যাবেন না। আমি সব ঠিক করে নেবো। একটা বিশ্বাসী লোক পাওয়া মানে আজকালকার বাজারে··

(চা নিয়ে গোলগোবিন্দর প্রবেশ)

এনিছিস! দে! (নিজে এগিয়ে দেয়) আসুন স্যার!

তরণকান্তি: (চা নেয়) আপনি বড্ড ব্যস্ত হচ্ছেন।

মুকুন্দমুরারি: কিছু না কিছু না। যা ব্যস্ততা আমার এই আপনাদের নিয়েই। পেশা বলুন নেশা বলুন। আর আমি ব্যস্ত না হলে চলবে কেন। পঞ্চাশ জনের পঞ্চাশ রকম সত্যি মিথ্যে হাজারো বায়না চোখ বুজে থাকলেও কানে শুনতে হয়, কান চেপে রাখলেও চোখে দেখতে হয়—এ তো আমাকে করতেই হবে।

তরণকান্তি: তা বটে। (ঘড়ি দেখে) আচ্ছা স্নান করা যাবে তো?

মুকুন্দমুরারি: বিলক্ষণ, সে কি কথা! খোলা মেলা কলতলা কি চাকা চাপা যাবতীয় সব কিছুরই বন্দোবস্ত আছে। গোলগোবিন্দ আপনাকে সব দেখিয়ে দেবেখন।

তরণকান্তি: গোলগোবিন্দ; মানে গোলে যে গোবিন্দ। নামটি খাসা কিন্তু বড্ড বড়। আগের টুকু ছেঁটে দিলে হয় না! মানে সুবিধে হয় ডাকতে টাকতে।

মুকুন্দমুরারি: স্বচ্ছন্দে। সামনে পেছনে যে দিকে খুশী ছাঁটতে পারেন।

তরণকান্তি: না মানে পেছনটা ছাঁটলে নামটার আবার কোন ইয়ে পাওয়া যায় না।

মুকুন্দমুরারি: তা হলে গোবিন্দ বলেই ডাকবেন।

তরণকান্তি: গোবিন্দ-ই ভাল। (গোলগোবিন্দকে) কি রে, আপত্তি নেই তো?

মুকুন্দমুরারি: ও আবার কি আপত্তি করবে, মাথা ভেঙে দেবো না!

তরণকান্তি: না না বাপমায়ের দেওয়া নাম, ওর মতামতটা চাই বৈ কি। কি রে, গোবিন্দ!

মুকুন্দমুরারি: হাঃ, খাসা শোনালো তো!

তরণকান্তি: গোবিন্দ নাম তো ভাল। (গোবিন্দ হাসে)

মুকুন্দমুরারি: লোকে কথায় বলে, গোবিন্দ গোবিন্দ। দোল গোবিন্দ আবার কেউ বলে নাকি? তোর নাম আজ থেকে গোবিন্দ।

তরণকান্তি: তা হলে যাও গোবিন্দ, এইবার এসো হাতে সঙ্গে যা যা আমারা গুছিয়ে ফেলি। 'হোল্ড অল' টি খুলে ফেল তো।

মুকুন্দমুরারি: হ্যাঁ যেমন যেমন বলেন তেমন তেমন দেখে শুনে করবি। আর না বলে এক পা-ও

নড়বি নে। নে হাত লাগা চটপট। (তরুণকান্তিকে) তো স্যার অ্যাডভান্স কিছু করবেন নাকি ?

তরুণকান্তি : Oh sure. কত দেব ? (ব্যাগ খোলে ফিল পকেট থেকে)

মুকুন্দমুরারি : দিন খান দুয়েক বড় পার্টি।

(টাকা দেয়। মুকুন্দমুরারির প্রস্থান। সার্ট খুলে রেখে ট্রাউজার আর গেঞ্জি পরে তরুণকান্তি গোবিন্দর সহযোগিতায় ঘর গুছোতে লেগে যায়।

জানালা থেকে হোটেলের অন্যান্য কি চাকর নতুন বোর্ডারকে লক্ষ্য করে। পুরোনো বোর্ডাররাও কৌতূহলী হয়ে উঁকি ঝুঁকি মারেন। দু চার জন এগিয়ে এসে পরিচয়ও করে যান।)

[অবিনাশবাবুর প্রবেশ কোট প্যান্ট পরা। মোটা—মোটা গোঁফ। টাক আছে। পেশা বেসরকারী অফিসের পদস্থ কেরানী।]

অবিনাশ : (গোবিন্দকে উদ্দেশ্য করে) দোল গোবিন্দ আমার জামা কাপড়গুলো এনেছিলি লণ্ড্রি থেকে ? না কি আজও ভুলে গেছিস ?

দোলগোবিন্দ : বৃহস্পতিবার কাপড় দিবে কে ?

অবিনাশ : দেয়েছে ! (তরুণকান্তিকে) আপনি ভাই বুঝি নতুন এলেন ?

তরুণকান্তি : (নমস্কারান্তে) আজ্ঞে হ্যাঁ।

অবিনাশ : বেশ বেশ। (ঘরটি দেখে) এটি ছিল অফিস কাম গোডাউন। মুকুন্দমুরারিবাবু এবার এটিও কাজে লাগালেন। ভদ্রলোকের মাথা আছে। এবার বোধ হয় ওপরের করিডর আর বাথরুমগুলোতেও বোর্ডার এনে ঢোকাবেন।··· থার্টি ইয়ার্স ব্যাক আমি যখন প্রথম আসি এই হোটেল মেসে, বোর্ডারের সংখ্যা ছিল ওনলি ফাইভ।—আমি, রাখালবাবু, হরেকৃষ্ণ, হুদয় ঘোষ আর চাটুয্যে। সেই জায়গায় আজ বেশুনার বোর্ডারের সংখ্যা ফাইভ টুয়েন্টি ফাইভ্—স্যাট ইজ টোয়েন্টি ফাইভ্। তা ছাড়া উটকো লোক—আসছে যাচ্ছে বেরিয়ে যাচ্ছে আর সেটার নাথায় যে কত তার তো কোন ইয়ত্তাই নেই। লাল হয়ে গেলেন মুকুন্দবাবু এই হোটেল বিজনেস করে।

তরুণকান্তি : ম্যানেজমেন্ট কি রকম ?

অবিনাশ : ম্যানেজমেন্ট মোটামুটি দেখতে ভালই, তবে ঐ, ট্রাডিসন যাবে কোথায়—ও বেলার ডাল এ বেলা মেশাল হচ্ছে, পচামাছ পেঁয়াজ লংকা বাঁটার তরিবদে এমন একটি মোগলাই রেসিপি দিলেবে চলে যাচ্ছে যে বাইশটি পারসেন্ট বোর্ডার ডাইরেক্টলি সাফারিং ফ্রম ক্রনিক ম্যামিবায়োসিস এণ্ড পারনিসাস টাইপ অব কোলাইটিস।

তরুণকান্তি : বলেন কি ?

অবিনাশ : বলবার আর অপেক্ষা কি আছে ব্রাদার ;—একটা জেনারেশন খতম করে দিলে মুকুন্দমুরারি। অথচ বলতে যাও তক্ষুনি বলা হবে—অন্য হোটেল মেস দেখতে পারেন না গোবাদে ! এখন হোটেল মেসে আজকাল যে কি রকম প্রেসার সে তো ব্রাদার বুঝতেই পারছো রাস্তার ভিড় দেখে···

তরুণকান্তি : সেই সুযোগটা নিচ্ছেন আর কি।

অবিনাশ : আবার কি ! তোমার আমার বিচার খারাপ হলে মুকুন্দবাবুর কিছু এসে যাবে না।···কলকাতার শহরে এই করে ভদ্রলোক তিন তিনখানা বাড়ী করে ফেলেন। তবে ঐ টাকাই করেছেন আর বাড়ীই তুলেছেন। ভোগ করতে পারলেন না কিছুই। নিজে তো ঐ সিঁড়ির তলায় দিন রাত্তির বসে আছেন, বৌটি গেছে মারা, নাবালক একটি ছেলে বড় জামাইএর কাছে থাকে, তিন মেয়ে তিনটে বাড়ী ভোগদখল করে বসে আছে। আচ্ছা ব্রাদার পরে দেখা হবে।

তরুণকান্তি : হ্যাঁ নিশ্চয়ই।

অবিনাশ : নামটিই জানলুম না।

তরুণকান্তি : আজ্ঞে তরুণকান্তি ব্যানার্জি।

অবিনাশ : ব্যানার্জি, আমরা সান্যাল। আমার নাম শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সান্যাল।

তরুণকান্তি : আলাপ করে খুশী হলাম।

অবিনাশ : না তার আর কি কারণ ঘটলো। পিকচার-টা যা প্রথম পরিচয়েই বিলুপ্ত তাতে করে আনন্দিত হবার আর কি হেতু থাকতে পারে। তবে সব-অবদান যখন লগাট লিখন তখন নাস্ত পথা অয়নায়। তবে মেট হিসেবে আমি খুব খারাপ নই। তাদের ছুটীতে তো বটেই, এমনিতেও নই।

তরুণকান্তি : নিশ্চয়ই নন, কি আশ্চর্য্য।

অবিনাশ : তবে হয় তো একটু বেশী বকি। বয়স হচ্ছে তো!

তরুণকান্তি : Oh you talk so candidly.

অবিনাশ : হয় তো একটু appreciated হতে চাই। ঠিক বুঝতে পারি না। যা হোক···তা কি অফিস না বিজনেস?

তরুণকান্তি : অফিস। Williams and Williams.

অবিনাশ : ইঞ্জিনিয়ারিং?

তরুণকান্তি : হাঁ, Technical.

অবিনাশ : বিলেত পাঠাবে?

তরুণকান্তি : দেখি।

অবিনাশ : Excuse me, married?

তরুণকান্তি : আজ্ঞে না।

অবিনাশ : Prospective candidate no doubt, আচ্ছা ভাই, পরে কথা হবে।···By the by, আমার কিন্তু কোন মেয়েটেয়ে নেই। আর কোন মেয়ের ব্যাপারেও interested নই। কথাটা তুলাম বলেই নিজের position-টা explain করে দেলুম।

তরুণকান্তি : ও হো, আচ্ছা আচ্ছা!

(অবিনাশবাবুর প্রস্থান।)

(স্বগতঃ) ···খুব interesting লোক তো! (গোবিন্দকে) আচ্ছা গোবিন্দ, আর কিন্তু আজ্ঞা নয়। এবার কাজ। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে সব কিছু গুছিয়ে ফেলতে হবে। তুই এক কাজ কর, পর্দা টেনে দরজাটা বন্ধ করে দে।

গোলগোবিন্দ : হাঁ, এ বাবু বড় আজ্ঞাদার বাবু।

তরুণকান্তি : খুব আজ্ঞাদার না?

গোলগোবিন্দ : আর খুব হাসি খুশী।

তরুণকান্তি : খুব হাসিখুশী?

গোলগোবিন্দ : আমোদে করবেন আর পুজো করবেন।

তরুণকান্তি : পুজোও করেন নাকি?

গোলগোবিন্দ : এই তো এখন সুরু হবে। পুজো করবেন, তারপর খোল নিয়ে নেচে নেচে গান করবেন, সব একা একা।

তরুণকান্তি : একা একা নাচবেন? ঘরে কাউকে ঢুকতে দেন না।

Cool, Comfortable Breeze
with AirOn FANS

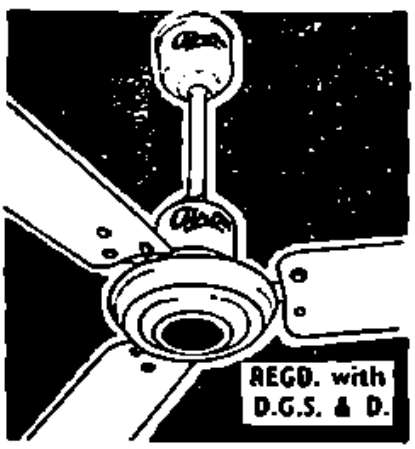

Low Power Consumption
Trouble Free Service
Double ball bearing

Manufactured by
PANDAY INDUSTRIES (P) LTD.
336, N. S. CHANDRA BOSE ROAD.
Calcutta-47
PHONES :
Factory and Office : 46-0067
Sales Office : 23-7821

গোপগোবিন্দ : কিমিতি ঢুকিবেন! দরজা বন্ধ!

তরুণকান্তি : আচ্ছা। আবার কেউ হয় তো ঢুকে পড়বেন, তুই আমাদের দরজাটাও বন্ধ করে দে।

[গোবিন্দ দরজা বন্ধ করে। তারপর প্রভু ভৃত্য মিলে ঘরগুছোনোর পাট সুরু হয় হাতে হাতে মহা আনন্দে—অভূতপূর্ব্ব উত্তেজনায়। কর্ম্মচাঞ্চল্যের মাঝখানে দৃশ্যটি শেষ হয়।

অবিনাশবাবুর নৃত্যসম্বলিত নাচগানের সুর খোলের বোলে তখন ঘরের ভেতর আছড়ে এসে পড়ছে]

—দ্বিতীয় দৃশ্য—

তরুণকান্তির ঘর। ইতিমধ্যেই ঘরটি বেশ সাজিয়ে গুছিয়ে ফেলা হয়েছে। রেডিও, রেকর্ড প্লেয়ার, দেওয়াল ঘড়ি। জানালায় দরজায় রং বাহারী পর্দ্দা —কোন কিছুরই অভাব নেই।

সকালবেলা। গোপগোবিন্দ জুতো পালিশ করছে। কিন্নি সত্তা গান তার মুখে। আর তরুণকান্তি গলায় তোয়ালে জড়িয়ে চা খাচ্ছে আর দাড়িতে সাবান লাগাচ্ছে।

তরুণকান্তি : গোবিন্দ বাপ একটু হাত চালাও। স্নানের জল দিতে হবে, লণ্ডি যেতে হবে, তোমার এখন অনেক কাজ।

[মুকুন্দমুরারির প্রবেশ। হাতে এক তাড়া চিঠি। গোপগোবিন্দর প্রস্থান]

মুকুন্দমুরারি : আপনার চিঠি।

তরুণকান্তি : চিঠি! (আগ্রহে চিঠি নেয়) দেখি…

মুকুন্দমুরারি : চিঠির তাড়া। সম্পর্কের মানুষ দেখি ছিটিয়ে রেখেছেন সংসারে।

তরুণকান্তি : (হেসে) হাঁ, এটি হলো অ্যাঠামশাই …এটি মণি পিসীমার ছেলের, এটি…

মুকুন্দমুরারি : তবু তো বলেন সংসার করেন নি।

তরুণকান্তি : কে আর দিচ্ছে বলুন!

মুকুন্দমুরারি : আমাকে তার বিশ্বাস করতে বলেন এ কথা! হুঁ: মুখ দিয়ে একবারটি হাঁ বলুন তো দেখি ক'মুঠো প্রজাপতি ধরে এনে আপনার ঘরে ছেড়ে দেই।

তরুণকান্তি : বলেন কি!

মুকুন্দমুরারি : আমি কি আর বলি, লোকে সব বলাবলি করে আমি সেই শোনা কথা বলি।

তরুণকান্তি : কি বলে?

মুকুন্দমুরারি : সে কথা শুনে আর আপনি করবেন কি!…রংদার খামে গন্ধ মাখানো সব দিনে দিনে চিঠি আসবে, তা না সব পোষ্টকার্ড আর বুকপোষ্ট।

তরুণকান্তি : আপনার এত interest কেন?

মুকুন্দমুরারি : interest…interest মিলিয়ে দিয়ে। মেলবার যখন বয়সকাল চলে যায় তখন মিলিয়ে দিলেও আনন্দ হয়। এটা বুঝতে পারেন না?

তরুণকান্তি : আপনি খুব রসিক লোক।

মুকুন্দমুরারি : রসিক কিনা জানিনে, তবে রসের সন্ধান করি, এইমাত্র। …যাই দেখি আবার ওদিকে কি হলো, নইলে সব রসটাই আবার কড়াই শুকিয়ে যাবে।

তরুণকান্তি : ম্যানেজার বাবু!

মুকুন্দমুরারি : বলুন স্যার।

তরুণকান্তি : আমার দু'একজন গেষ্ট আসতে পারে। If so please look to their comforts.

মুকুন্দমুরারি : বিলক্ষণ বিলক্ষণ। আপনাকে কিছু ভাবতে হবে না স্যার। তক্ক তাত আর পকবাঞ্জন আমার সব সময় ready থাকবে।

[দ্রুত প্রস্থান ও গোপগোবিন্দের প্রবেশ। সঙ্গে ধোপদোরস্ত জামা প্যাণ্ট ইত্যাদি।

গোপগোবিন্দ খাবার সাবার এনে তড়িঘড়ি টেবিল সাজায়। জামা প্যাণ্ট জুতো ঠিক করে। আর ইত্যবসরে তরুণকান্তি স্নান সেরে এসে অফিস যাবে বলে তৈরী হয়ে নেয়। তরুণকান্তি যখন সার্ট

পরে, ষোলগোবিন্দ তখন তরুণকান্তির পায়ে মোজা পরিয়ে দেয়। কর্মচঞ্চল কিছুক্ষণ অতিবাহিত হলে তরুণকান্তি ষোলগোবিন্দের জিম্মায় সব কিছু বিশ্বাস করে ছেড়ে দিয়ে অফিস রওনা হয়।]

তরুণকান্তি: চাবিটা।

[ষোলগোবিন্দ চাবি এগিয়ে দেয়। তরুণকান্তি চলে গেলে ষোলগোবিন্দ 'সিলোন' রেডিও ধরে। গান শোনে, গান গায় আর সংসারের কাজকর্ম করে।

একটু পরেই স্যুটকেশ, kit bag আর ঝোলানো ব্যাগ কাঁধে নিয়ে অতি কম আট দশ জন যুবক—এরা সবাই তরুণকান্তির বন্ধু হুড়মুড় করে ঘরে এসে ঢোকে এবং তুমুল হট্টগোল সুরু করে। মুহূর্তের মধ্যে ঘরটি চরমতম অগোছাল হয়ে যায়। ষোলগোবিন্দ হকচকিয়ে যায়।]

পরেশ: তোর নাম কি রে?

ষোলগোবিন্দ: ষোলগোবিন্দ···(জিব কাটে) গোবিন্দ।

পরেশ: ভেতানোর ব্যাপারটা কি হলো?

ষোলগোবিন্দ: আমার আগের নাম ষোলগোবিন্দ। বাবু ডাকেন গোবিন্দ।

পরেশ: অ, বুঝলাম। তা তোর বাবু কখন আসবে?

ষোলগোবিন্দ: সন্ধ্যের পর। কোন কোন দিন রাত্তির-ও হয়।

জগপতি: আমাদের কথা কিছু বলে গেছে?

[হন্তদন্ত মুকুন্দমুরারির প্রবেশ]

মুকুন্দমুরারি: এই যে দাদা, আমার সঙ্গে কথা বলুন।

পরেশ: আপনি···

মুকুন্দমুরারি: আমি···আমারই এই হোটেল। তরুণবাবু অফিস যাবার আগে আমাকে সব কথা বলে গেছেন। আপনারা আসবেন, থাকবেন, এখন কি করতে হবে তাই বলুন।

ইন্দ্রনাথ: বাস বাস তবে তো সব পাকাই আছে।

মুকুন্দমুরারি: একেবারে সব পাকা বন্দোবস্ত—কোন অসুবিধে হবে না আপনাদের। এইবার বলুন!

যোতন: আগে দাদা চা-টা সাপ্লাই করুন।

মুকুন্দমুরারি: শুধু চা!

যোতন: এই তো দেখুন বাজেলা করেন, ক'টা একটা রাউণ্ড হয়ে যেতে দিন না। তারপর চা-এর সঙ্গে না হয় টা-এর ব্যবস্থা করবেন।

মুকুন্দমুরারি: বেশ তাই দেবো। তবে অর্ডারটা আগে থেকে গেলে পরে, তৈরী হতে তো সময় লাগবে।

অদীম: বেশ তো বেশ তো, ব্রাই কি আছে।

মুকুন্দমুরারি: আজ্ঞে ব্রাই, চপ কাটলেট আমলেট মামলেট দোপেয়াজি ফ্রাই—যেমন আপনারা অর্ডার করবেন।

ঘনশ্যাম: চিকেন ফ্রাই, হবে?

মুকুন্দমুরারি: আজ্ঞে চিকেন ফ্রাই, রোষ্ট-এর কথা বলছেন?

ঘনশ্যাম: না না।

রহিম: আরে স্যার তোর চাইনীজ ডিসফিস ছাড় না, (মুকুন্দমুরারিকে) আপনি স্যার বেক মামলেট চা পাঠান।

মুকুন্দমুরারি: শুধু চা মামলেট!

কুমুদ: আচ্ছা একটা করে চপ আর রুটি দেবেন পিস করে সঙ্গে।

মুকুন্দমুরারি: এই তো কেমন পরিষ্কারটি বললেন। প্রথমে দেবো এক রাউণ্ড চা।

যোতন: পরলা রাউণ্ড।

মুকুন্দমুরারি: এখুনি পাঠাচ্ছি।

[জগপতি খাটে আধশোয়া হয়ে গান ধরে। কুমুদ টেবিল বাজিয়ে তার সঙ্গে সঙ্গত করে। রহিম করে আবৃত্তি। অন্য সবাই ভাগে ভাগে শুয়ে বসে গল্প গুজব করে। ইতিমধ্যে চা এসে পড়ে।

প্রথম ট্রে চা হাতে আসতেই লোফালুফি হয়ে যায়। আবার চা আনে তারপরই কটি নামকেট, চপ। বিছানার ওপর, টেবিলের ওপর, ওয়ার্ডরোবের ওপর সর্বত্র ছিটিয়ে পড়ে ট্রে ডিস কাপ প্লেট কাঁটা চামচ।]

পরেশ : দেখি সিগারেট দেখি।

কুমুদ : (শেষ সিগারেট ধরায়) Sorry.

জগপতি : গোবিন্দ তোর বাবু পান খায় না?

মোলগোবিন্দ : হুঁ।

জগপতি : তো সেই দোকান থেকে তোর বাবুর নাম করে দু সোনা পান নিয়ে আয় তো বাবাধন।

ঘনশ্যাম : দু সোনা নয়, চার সোনা।

পরেশ : আর এক প্যাকেট উইলস্।

ইন্দ্রনাথ : আটটা পান আর এক প্যাকেট উইলস্—কি বললে?

মোলগোবিন্দ : আটটা পান আর এক প্যাকেট উইলিস্।

ইন্দ্রনাথ : ঠিক আছে। ছুটে যাবি।

(মোলগোবিন্দ সহাস্যমুখে ইঙ্গিতের সঙ্গিবেশ নিয়ে পান আর সিগারেট আনতে চলে যায়!)

[মুকুন্দমুরারির প্রবেশ]

মুকুন্দমুরারি : রাত্রে স্যার খাবার অর্ডারটা! আপনারা দেবেন, না তরণবাবু এলে পরে।…

জগপতি : খাব আমরা, তরণ এসে কি অর্ডার দেবে!

মুকুন্দমুরারি : না তবু আমার একবার জিজ্ঞেস করবার কথা…

পরেশ : আমি বলছি। আপনার মেন্যু কি?

মুকুন্দমুরারি : মেন্যু যা থাকেন। তবে আজকের স্পেশাল চিকেন গ্রিল।

পরেশ : সেটি আবার কি বস্তু!

মুকুন্দমুরারি : খেলেই বুঝতে পারবেন।

পরেশ : বেশ, এমনিতে যা মেন্যু আছে আপনার রাত্রে খাবার অর্থাৎ কিনা ভাত ডাল মাছ তরকারি অল থুন…

মুকুন্দমুরারি : তার সঙ্গে চিকেন গ্রীল।

পরেশ : য়্যাঃ; ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছেন?

মুকুন্দমুরারি : পরিষ্কার হয়ে গেল ব্যাপারটা।

পরেশ : যান, কাটুন।

[মুকুন্দমুরারির প্রস্থান।

(মোল গোবিন্দ পান সিগারেট এনে দেয়)

কুমুদ : বাবা গোবিন্দ, তোর বাবুর লুঙ্গি আছে?

মোলগোবিন্দ : লঙ্গি।

কুমুদ : লঙ্গি না লুঙ্গি লুঙ্গি। রাত্রে পরে না! সেই যে কাপড়ের থোল মত।

থোতন : আবার বাবুর লুঙ্গি ধরে টানাটানি কেন বাবা! বাথরুম করবে তো!

কুমুদ : আছে তোর?

ইন্দ্রনাথ : দরকারটা কিসে হচ্ছে তোর। বাবি দরজাটি বন্ধ করবি, কাজটি সেরে চলে আসবি। এ কি আর তোর খোলা মাঠ? আনিয়ে দিলে মাইরী।

কুমুদ : গোবিন্দ বাপ একটু পথ দেখাও কানাকে।

ননী : দাঁড়া আমিও যাবো।

কুমুদ : একসঙ্গে দু'জনে চলবে কি করে!

ননী : না চললেও চালাতে হবে। গরজ বড় বালাই ভাই।

[মোলগোবিন্দের অনুসরণে দু'জনে দ্রুত বেরিয়ে যায়]

(ইতিমধ্যে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়। অবিনাশবাবুর কীর্তন গান খোলসমতে শোনা যায়।)

জগপতি : ওপরে কীর্তন হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে।

ইন্দ্রনাথ : আখড়া কাখড়া হয় তো আছে কোথাও।

জগপতি : আখড়া যে ক্রমেই এগিয়ে আসছে মনে হচ্ছে।

ইন্দ্রনাথ : তাও আসতে পারে। এর নাম বাবা শহর কলকাতা।

জগপতি : একটা সিনেমা টিনেমা গেলে হতো।

ইন্দ্রনাথ : তরুণটা এখনও এলো না।

[ইতিমধ্যে কীর্তন এসে ঢোকে। সিল্কের জোড় পরে অবিনাশবাবু অপূর্ব্ব ভাবমূর্চ্ছনা নিয়ে মাথা গলায় যাযাভাবে তরুণকান্তির ঘরে ঢোকেন। হাতে নৈবেদ্য। আগন্তুকদের প্রতি।]

অবিনাশ : কই ব্রাদারকে দেখছি না।

ননী : তরুণবাবুকে খুঁজছেন।

অবিনাশ : না। আমি শুধু তাই এক বাবুকেই খুঁজি। তরুণবাবু নয়, অরুণবাবু নয়, হরেন কিংবা কিরণবাবু—কোন বাবু নয়। কিন্তু তার সন্ধান আমি আজও পেলাম না।

(কথাটা শেষ করেই অপূর্ব্ব ভঙ্গী নৈবেদ্য বিতরণ করতে করতে অবিনাশবাবু নৃত্যছন্দে কীর্তনগান গান। দু কলি গান গাইবার পরই আবার ব্যক্ত করেন মনের কথা)

·· তরুণ না হয় নাই থাকলো, তবু তো তোমরা আছ ব্রাদার। এ সন্ধানের সন্ধানী হতে কারুরই তো মানা নেই।···

(আবার নেচে গান ধরেন। দু কলি গেয়েই আবার কথা বলেন অবিনাশ)

···এ-ও ব্রাদাররা বলতে পারো একরকম Twist. কিন্তু এখন কোন বীটনে Bitnick-কে দেখলাম না যে এই Bikini-র ব্যথা বুঝতে পারে। তরুণকুমারের মাঝখানে আমি আমার সেই পরম বীটনিকের আংশিক প্রতিভাস দেখতে পেয়েছি। ভক্তি-ই তো ভক্ত-কে খুঁজবে।

(অবিনাশবাবু আবার নৈবেদ্যের থালা উঁচু করে ধরে গান গাইতে গাইতে আর প্রসাদ বিতরণ করতে করতে এর ওর তার মাঝখান দিয়ে গলে নৃত্যপরা ছন্দে বেরিয়ে যান)

(গামছা ও তোয়ালে পরা অবস্থায় কুমুদ ও ননীর প্রবেশ)

ইন্দ্রনাথ : ভাবের পাগল।

জগপতি : শালা বুড়ো খচ্চর।

ইন্দ্রনাথ : আপ যা বুঝিস না তা নিয়ে কোন তর্ক করিস না। কত বড় একটা synthesis-এর কথা বল্লেন ভদ্রলোক idea করতে পারলি?

জগপতি : তোর idea নিয়ে তুই থাক। una-dulterated বেলেল্লাগিরি আর বলছে কাকে?··· তুই বলতে চাস এটা সদাচারে পড়ে না?

ইন্দ্রনাথ : কদাচারটা তুই দেখলি কোথায় যে সদাচারের আওতায় ফেলছিস?

ননী : ব্যাপারটা কি, ব্যাপারটা কি?

ঘোঁতন : Angry young men-রা কথা বলছে. তুমি তার এক বিন্দুও বুঝতে পারবে না।

ননী : রাখ রাখ, বড়রা যা তোদের তা তো দেখি দুটো চারটে জৈবিক প্রবৃত্তির চারপাশ দিয়ে ঘুরপাক খাচ্ছে। Angerটা কোথায় দেখলি?

ইন্দ্রনাথ : গামছা ছাড় গামছা ছাড়।

জগপতি : কেন গামছায় কোন synthesis আসছে না?

ইন্দ্রনাথ : আপ don't simplify Idiot.

ননী : But where is that Anger, সেই Anger! মানে সেই ক্রোধ! সেই ক্ষোভ! সেই বেদনা। বেদনার ঘানার মত এক বিন্দু অশ্রুনীরে মৌসুমী যে সমুদ্র ঘুমায়? কোথায় সে উচ্ছ্বাস? কোথায় সে উন্মাদনা? কোথায় সে···; নে সিগারেট ছাড়।···

[ইন্দ্রনাথের হাত থেকে সিগারেট ছিনিয়ে ধরায়। সকলে হেসে ওঠে।]

পরেশ : নাঃ, এরপর আর এক রাউণ্ড চা না হলে একেবারেই জমছে না।

ঘনশ্যাম : (হাঁকে) গোবিন্দ!

(গোলগোবিন্দ সামনেই ছিল)

আর এক রাউণ্ড চা, কুইক।

ঘোঁতন : কিন্তু যে জন্যে কলকাতায় আসা তারই কোন আলোচনা হচ্ছে না।

পরেশ : হ্যাঁ, এইবার সব গোল হয়ে বসো।

ঘনশ্যাম : কিন্তু তরুণটা না এলে···

পরেশ : তোর খালি তরুণ আর তরুণ! তরুণ এসে কি করবে? সে তো করবে finance. আর্টিষ্ট বুক করবো তো আমরা। Executive body কি করতে আছে?

ঘনশ্যাম : ঠিক আছে।

ধীতন : আগে ঠিক করো মেলা হবে, না কনফারেন্সের ওপর জোর দেবে?

পরেশ : মানে?

ধীতন : মানে সাংস্কৃতিক দিকটার কথা বলছি। অর্থাৎ এখান থেকে তোমরা চোমরা বক্তাদের নিয়ে যাওয়া, সেমিনার arrange করা···

ঘনশ্যাম : আমি একটা কথা বলবো?

ননী : আলবাৎ।

ঘনশ্যাম : আমি বলি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে করো, কিন্তু মেলাটার ওপর জোর দাও। মানে Exhibition-টার ওপর টাকা ওঠা চাই তো?

ননী : right, right.

ইন্দ্রনাথ : এটা কি তোমার পরিশুদ্ধ সেই Anger এর অভিব্যক্তি হলো বুঝি?

ননী : Practical side টার কথা ভাবছি তো? Don't mix up issues ইন্দ্রনাথ। এই জিনিষটাকে আমার খুব immature মনে হয়।

কুমুদ : A Daniel. A Daniel came to Judgement.

[মুকুন্দমুরারির প্রবেশ

মুকুন্দমুরারি : একটু disturb করতে এলাম স্যার।

ননী : বলুন।

মুকুন্দমুরারি : খাবার সব ready. আপনারা ভেতরে টেবিলে গিয়ে বসবেন না এখানেই দেবে?

ইন্দ্রনাথ : কোন option-ই তো রাখবেন না দেখছি। হয় ভেতরে নয় বাইরে—মানে খেতে এখন হবেই।

মুকুন্দমুরারি : না না পরেও খেতে পারেন। তবে বুঝতেই তো পারছেন, মেস হোটেলের ব্যাপার! ঘাঁটাঘাঁটি হয়ে গেলে জিনিষ তো আর তেমনটি পাচ্ছেন না! তাই বলছিলাম, আপনারা আবার তরুণবাবুর পেট, খাইয়ে না যদি তৃপ্তি দিতে পারি··

(নিম্নস্বরে আলোচনান্তে ঠিক হয় খাওয়া হবে)

ননী : ঠিক আছে বিয়ে দিন খানা।

জগপতি : গ্রীল স্টীল ready তো?

মুকুন্দমুরারি : কিছুটি ভাববেন না, একদম full course.

ঘনশ্যাম : চালাও পানসী।

ধীতন : তা হলে মোদ্দা কি দাঁড়াল হলো? কনফারেন্স না মেলা?

ননী : মেলা।—কি ভাই ঠিক হলো তো?

ধীতন : হাত, হাত।

(মেয়ীর ভাগ সভ্য হাত তোলে)

ননী : Passed বাকিটা কাল।

ইন্দ্রনাথ : কেন খাবার পর?

কুমুদ : খাবার পর কি আর Cultural আলোচনা চলে?

(ট্রে ভর্তি খাবার দাবার এসে পড়ে)

ঘনশ্যাম : এসে গেছে গ্রীল। No more culture.

ননী : uncultured-এর মত চেঁচাচ্ছিল ক্যান বলতো? অম্নে বোধ হয় গ্রীল খাস নি!

ঘনশ্যাম : মুরগীর আবার গ্রীল হয়, এই প্রথম শুনলুম।

ননী : তুমি শালা Proletariat, গ্রীলের কি জানবে! : Ox tongue খেইছিস?

ঘনশ্যাম : কি?

ননী : Ox tongue, ox tongue?

ঘনশ্যাম : না।

ননী : Hot Dog?

ঘনশ্যাম : দরকার নেই আমার খেয়ে।···কই আমার প্লেট কোথায়?

কুমুদ : আসছে আসছে। ব্যস্ত হচ্ছিস কেন! (গ্রীশ খায়) বিছানার ওপর খবরের কাগজ বিছিয়ে। টেবিলে, মেঝেতে, রেডিও-র ওপর, ওয়ার্ড রোবের ওপর চড়ে বসে—যে যার মত খেয়ে সুরু করে প্রোগ্রাম।

মুকুন্দমুরারি মাঝে মাঝে এসে তদারক করেন।

মুকুন্দমুরারি : একেবারে আলমারির ওপর চড়ে বসেছেন?

ঘনশ্যাম : এ খাওয়ায় কি আনন্দ জানেন?

মুকুন্দমুরারি : তা বটে। পাঁচজনে মিলে একসঙ্গে হৈ চৈ করে খাওয়া।...

জগপতি : মিষ্টি কিন্তু কিছু ব্যবস্থা করেছেন?

মুকুন্দমুরারি : ব্যবস্থা মানে—বলেন আনিয়ে দি।

কুমুদ : মাংসের পর মিষ্টি খেতে হয়, জানেন না?

মুকুন্দমুরারি : তা সে কথা বলবেন তো! কি কাণ্ড। তা কি সন্দেশ না...

জগপতি : না না, রসের কোন কিছু।

মুকুন্দমুরারি : তা হলে রসোগোল্লাই আনি।

জগপতি : ব্যস, স্রেফ রসোগোল্লা।

ননী : কাই হবে দাদা একটু!—গ্রীশের কাই? আর দুটি ভাত।

মুকুন্দমুরারি : দেখছি।

ননী : ভোজা বানিয়েছেন দাদা। যাবার সময় certificate দিয়ে যেবেন।

মুকুন্দমুরারি : তা যেবেন। বাঁধিয়ে রেখে যেবো।

(হাসতে হাসতে মুকুন্দমুরারির প্রস্থান)

[পরিবেশন চলে। খাওয়ার পাট শেষ হতে না হতেই মিষ্টি এসে পড়ে। তারপর পান—সিগারেট। রেডিও জোরে বাজে। তারপর রাত বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে ঝিমিয়ে পড়ে। হাসি ঠাট্টা কলরব ক্রমশঃ স্তব্ধ হয়ে আসে। ঘুম নামে সকলের চোখে। শুয়ে পড়ে সবাই সারাদিনের পরিশ্রমে। ঘুমিয়ে পড়ে বিশৃঙ্খল ভাবে।

[রাত হলে তরুণকান্তি পা টিপে ঘরে ঢোকে।]

(আলো জ্বালতেই খিঁচিয়ে ওঠে ঘনশ্যাম।)

ঘনশ্যাম : nonsense, কে রে?

[সঙ্গে সঙ্গে তরুণকান্তি আলো নিভিয়ে দেয়। আবার প্রশান্তি। কেউ ঘুমের ঘোরে কথা বলে, কেউ নিবিয়ে নাক ডাকায়। স্বল্প আলোয় নিরুপায় ভাবে জামা কাপড় ছাড়ে তরুণকান্তি।]

মুকুন্দমুরারি : আপনার খাবারটা Sir,

তরুণকান্তি : খাবারটা আপনি-ই খেয়ে ফেলুন! অনেক রাত হয়ে গেছে।

মুকুন্দমুরারি : আপনি—না খেয়ে থাকবেন তার?

ননী : আঃ!

ইন্দ্রনাথ : কথা বলে কে এত রাতে? Horror.

[তরুণকান্তি হাতের ইশারায় মুকুন্দমুরারিকে তাড়িয়ে দিয়ে খাটের এক কোণে কোনমতে বসে নিরুপায়ে একটা সিগারেট ধরায়।

রাত গভীর হয়। নিস্তব্ধ হয় চারদিক। একটার পর একটা সিগারেট টেনে রাত কাটে তরুণকান্তির। সৌহার্দ্যের হায়—মুখ ফুটে সে একটা কথাও বলতে পারে না।

ঘুমন্ত মানুষের চালচলন বলা যায় না। তরুণকান্তির গা বেয়ে ঠ্যাং উঠে আসে ইন্দ্রনাথের। আলগোছে সেই উদ্ধত পাটিকে সংযত করে চুপ করে বসে থাকতে হয় তরুণকান্তিকে কাষ্ঠবৎ।

নিষ্পলক রাত কাটে তরুণকান্তির। সকালবেলা। ঘুম ভেঙে ওঠে জগপতি। রাত তরুণকান্তিকে বসে থাকতে দেখে বলে :

জগপতি : তুই দেখছি আমার চাইতেও early-riser! কখন উঠলি?

তরুণকান্তি : এই সবে।

জগপতি : চায়ের অর্ডার দিইছিস?

তরুণকান্তি : না, দেব। (গোবিন্দকে) গোবিন্দ দু-কাপ চা পাঠিয়ে দে তো। (জগপতিকে) তারপর তোদের কোন অসুবিধে হয়নি?

জগপতি : অনুবিধে মানে মালিক-ই নেই ! তবে manage করে নেয়া গেছে। গোবিন্দটা wonderful ……আছে সিগারেট ?

(প্যাকেট এগিয়ে দেয় তরুণকান্তি)

তরুণকান্তি : ইন্দ্রনাথের ব্যাপারটা আর কিছু এগিয়েছে ?

জগপতি : এগিয়েছে মানে ইরাণী তো দেখি একুণি রাজী। অথচ ইন্দ্রনাথের complain হচ্ছে ইরাণী নাকি তার বৌদির ভাইকে ভালবাসে।

তরুণকান্তি : বৌদির ভাই মানে ?

জগপতি : ঝুমুর ঝুমুর, ঝুমুরকে চিনিস না ?

তরুণকান্তি : এ development-টা আবার কবে থেকে হলো ?

জগপতি : অবিশ্যি এসবই ইন্দ্রনাথের কথা।

তরুণকান্তি : তোদের কি মনে হয় ?

জগপতি : বুঝতে পারছো না ? ইন্দ্রনাথ এখন পরিষ্কার মেয়েটিকে gi't করছে !

তরুণকান্তি : This is really bad.

জগপতি : Bad মানে, awful. মুখেই সব বড় বড় কথা। কোন backbone আছে ?

ঝুমুর : (জগপতিকে) টেংরিটা সরা না ? জেগে আছিস অথচ পা-খানা চালিয়ে দিয়েছিস হিপ্‌বোনের ওপর দিয়ে। প্যাটেলা-টা কন্ কন্ করছে। (হঠাৎ তরুণকান্তিকে দেখে) তারপর গুরু, চা-এর অর্ডার-টা যাও !

তরুণকান্তি : (হাঁক দেয়) গোবিন্দ ! চা !

(চা-এর কথা শুনে লাফিয়ে ওঠে ননী ও ঘোঁতন)

ননী : কি, চা হয়ে গেল নাকি ?

ঘোঁতন : শালা মাটিতে শুয়ে পা হাত পা ভারি হয়ে গেছে। (হাঁচে) নির্ঘাত ডেঙ্গু হবে।

ননী : তফাৎ যাও তফাৎ যাও। infection ছড়াচ্ছে !

ঘোঁতন : এই তরুণ, আমায় রস দিতে বলিস তো একটা কাপে।

তরুণ : বলে দিচ্ছি।

ননী : বাড়ী গিয়ে খেলে মেড়ে বিশল্যকরণী খাওগে, আমার রস খেয়ে !

ঘোঁতন : ক্যাচ্ ক্যাচ্ করিস নি তো ! কথা বলেই humour হয় না।

ননী : Reader's Digest-এ কি আর no humour লেখা থাকে !

(ঘোঁতন হাঁচে)

ইন্দ্রনাথ : (লাফিয়ে ওঠে) Horrid. কি করছিস্ বল তো ?

ননী : (ইন্দ্রনাথকে) ও কি করবে ? ডেঙ্গু ওকে নিয়ে humour করছে। (ঘোঁতনকে। আর একটু অপেক্ষা কর, tickling-টা বুঝতে পারবি চাঁচে চাঁচে।

(আবার হাঁচে ঘোঁতন)

(ইতিমধ্যে চা এসে পড়ে)

তরুণকান্তি : (গোবিন্দকে) একটা আলু দিয়ে নিয়ে আয়।

ননী : বাসি পেটে চা, বিস্কুট টিস্কুট নেই ?

তরুণকান্তি : গোবিন্দ, এক প্লেট বিস্কুট।

ননী : (তরুণকে) তোর কি আজও অফিস ?

তরুণকান্তি : মানে ? মানার বাড়ীর আবদার নাকি ?

ননী : কালকের আলোচনাটা আমাদের শুনিছিস ?

তরুণকান্তি : কখন শুনলাম !

জগপতি : কনফারেন্সে মিটিং-কিটিং-এর ওপর জোর না দিয়ে মেলাটার ওপর concentrate করবার কথা হয়েছে।

ননী : কথা নয়, resolution passed.

তরুণকান্তি : তবে তো হয়েই গেছে। এইবার programme কি হবে সেটা তোমরা বসে ঠিক করো। আমার যে কর্তব্য সেটা আমি তো বলেইছি করবো।

ননী : হ্যাঁ সেই কর্তব্যের কথাতেই আসছি এক নম্বর—আর্টিষ্ট contact—তোমার।

তরুণকান্তি : এখন কাকে কাকে দরকার তোমাদের সেটা ঠিক না জানলে --

ননী : আসছি, আসছি। এক এক করে আসছি। সে জিই, তোমাকে আজই দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। Advance যা করবার আপাততঃ সে-টি তুমি করছো।

তরুণকান্তি : সে তো বিস্তর টাকা।

ননী : বিস্তর কিন্তর লাগবে না, তুমি তোমার influenceটা exert করবে। কিছু অবশ্য দিতেই হবে—booking-এর সময়। বাকি টাকা on the night of performance right on the Dias. এটুকু ভাই তোমাকে করতেই হবে।

তরুণকান্তি : কি করে হবে বুঝতে পারি না। হুণ্ডি তো আর কাটতে পারবো না।

ননী : দরকার হলে তাও কাটবে। একটা কনকারেন্সের ব্যাপার, Public involved. জনসাধারণ মেরে শালা ভক্তা করে ছেড়ে দেবে।

জগপতি : কেন না তাদের কাছে তুমি টিকিট বিক্রী করছো।

ননী : চালাকি কথা? তবে হ্যাঁ, যে টাকাটা তোমার involved হচ্ছে Executive নিশ্চয়ই সে টাকার দায়িত্ব নিচ্ছে;—এটা তুমি assured থাকতে পারো।

তরুণকান্তি : কিন্তু কি দিয়ে কি করবো ঠিক বুঝতে পাচ্ছি না।

ননী : সে এখন ভাই তোমার ব্যাপার, তুমি ভাখো।

তরুণকান্তি : Any way, ভাবি।

ইন্দ্রনাথ : না না এর মধ্যে আর ভাবাভাবি করো না। এমনিতেই time short. অনেক কিছু করতে বাকি আছে। We must take it as accepted.

তরুণকান্তি : ধরে রাখো।

ননী : Ambiguity করছিস কেন? Yes or no.

তরুণকান্তি : Yes.

ননী : That's like a good boy. তাহলে passed.

যৌতন : Passed, Passed.

ননী : Artist list-টা তাহলে জগপতি তুমি তরুণকে আজই দিয়ে দিচ্ছ। That's your affair.

জগপতি : দিয়ে দিচ্ছি।

তরুণকান্তি : তোমাদের কাজ কারবার আজই হয়ে যাচ্ছে না থাকছো তোমরা আজ?

ননী : কিছু বাকি, কিছু হয়তো থাকবে। কেননা chief guest-এর ব্যাপারটা ঠিক করতে হচ্ছে তো! তোর কোন suggestion আছে?

তরুণকান্তি : কাকে বলি!

যৌতন : আমি বলি ডক্টর হরিধন ভটচাজ-কেই নাও। লোকে সাংঘাতিক নেয় ভদ্দরলোককে।

ননী : নেয় বলেই তো হলো না, কিছু পায়

'রূপা'র বই

উপন্যাস

প্রাণপাখের—দেবব্রত রেজ ... ৭·৫০
চক্ষে আমার তৃষ্ণা—বাণী রায় ৬·০০
এক যে ছিল রাজা—দীপক চৌধুরী ৫·০০
বাতাসী বিবি—অজিত কৃষ্ণ বসু [অ.কৃ.ব.] ৪·০০
এখানে মৃত্যুর হাওয়া—প্রবোধচন্দ্র ঘোষ ৪·০০
শেষ বসন্ত—অজিত কৃষ্ণ বসু [অ.কৃ.ব.] ৪·০০
প্রাচীর ও প্রান্তর—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ৩·০০

গল্প সংগ্রহ

বরষর্ণিনী—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ৩·০০
অনেক বসন্ত তুচ্ছ মন—চিত্তরঞ্জন মাইতি ৩·৫০

রূপা

রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

আবার তা-ও দেখতে হবে। People-এর ওপর আমাদের একটা responsibility আছে—সেটা ভুললে চলবে না।

কুমুদ : তাহলে ডাঃ খাসনবীশকে ডাকো।

ইন্দ্রনাথ : Impossible. একটা ডাইহার্ড রিঅ্যাকসনারী!

ঘনশ্যাম : তবে তারক বন্দ্যোপাধ্যায়-ই ঠিক থাক।

ননী : Extreme right হয়ে পড়ে। People নেবে না।

তরুণকান্তি : অত right left করতে গেলে কিন্তু কাউকেই তোমরা ঠিক করতে পারবে না।

ননী : ব্যাপারটা সত্যিই খুব ঝামেলার।

তরুণকান্তি : কেন ডাঃ হরিধন ভটচাজকে তোমাদের পছন্দ হচ্ছে না কেন?

ননী : হচ্ছে না মানে···

তরুণকান্তি : বেশ হোল্ড করে রাখতে পারেন mass-কে।

ননী : মুস্কিলটা হচ্ছে বিষয়বস্তু কিছু না থাকায় ওরা mass যে একবিন্দুও hold করে না। বল্লাম না?

ধৌতন : হাত, হাত।

(প্রায় সকলেই হাত তোলে)

ননী : এক দুই তিন চার পাঁচ—So passed. হরিধন ভটচাজ-কেই আমরা chief guest হিসেবে ডাকছি।

তরুণকান্তি : কটা বাজে?

জগপতি : ন'টা বাজতে পনেরো।

[সঙ্গে সঙ্গে শিব টেনে দাঁড়িয়ে ওঠে তরুণকান্তি]

তরুণকান্তি : অফিসের দফা আর রফা। গোবিন্দ! স্নান খাওয়া কিছু হবে না।

বেণুধর কণ্ঠ : যাই বাবু।

[গোবিন্দর প্রবেশ]

তরুণকান্তি : আমার জুতো মোজা, জলদি।

(মুহূর্ত কালের মধ্যে তৈরী হয়ে নেয় তরুণকান্তি)

ননী : স্নান খাওয়া হলো না তো।

তরুণকান্তি : খাওয়াটা কিছু না, স্নানটাই করতে পারলাম না।···যাহোক, মোটামুটি আমার কাজ আমি করছি। তোমাদেরটা তোমরা কর। ফিরতে রাত হবে। হয়তো তোদের সঙ্গে এ যাত্রায় আর আমার দেখা হচ্ছে না।

ননী : দেখাটা immaterial, আসল কথা কাজটা। সেইটি খেয়াল রেখো।

তরুণকান্তি : আচ্ছা so long. (হাঁকে) গোবিন্দ! এই যে গোবিন্দ। এঁরা সব রইলেন। সব দেখাশুনো করবি। ঘরটা ঝাঁট দিস।

ইন্দ্রনাথ : সত্যি যা নোংরা হয়েছে। ঘরখানাকে astray হিসেবে ব্যবহার করবার কি কোন মানে হয়?

ননী : সিগারেট খাচ্ছিস আর ফেলছিস—তুই-ই তো নোংরা করছিস বেশী।

ইন্দ্রনাথ : (ছাইদান উঁচু করে দেখায়) কি, সেটি বলতে পারবে না। সে অভ্যেসদোষ আমার নেই।

তরুণকান্তি : (চিরুণী রেখে) আচ্ছা ভাই, দেখা হবে। দেখে শুনে একটু manage করে নিস।

ননী : বড্ড formality করছিস তুই তরুণ।

তরুণকান্তি : বাঃ, Guests !!

[তরুণকান্তির প্রস্থান ও মুহুরমুরারির প্রবেশ]

মুহুরমুরারি : তরুণবাবু চলে গেছেন?

ননী : কেন বলুন তো?

মুহুরমুরারি : না জিজ্ঞেস করছি, বলি আপনারা কি আজও থাকছেন?

ননী : কেন আপনার আপত্তি আছে?

মুহুরমুরারি : দেখুন বেখি, আপনারা ঘরের, ঘরের লক্ষ্মী···

ধৌতন : কান্তিক বলুন। আমরা সব বেটাছেলে।

মুহুরমুরারি : না সে তো দেখতেই পাচ্ছি।

ননী : শুনুন শুনুন, ম্যানেজারবাবু!

মুহুরমুরারি : বলুন স্যার।

ননী : এ বেলাটা আমরা সবাই আছি। আজি এবং বিশেষভাবে আছি।

মুকুন্দমুরারি : বেশ তো।

জগপতি : তবু ও বেলাটা আমাদের কিন্তু ঠিক নেই। যেতেও পারি আবার থাকতেও পারি।

মুকুন্দমুরারি : যেমন অভিরুচি।

[মুকুন্দমুরারির প্রস্থান]

ননী : তা হলে চল বেরিয়ে পড়া যাক।

ইন্দ্রনাথ : in batches. যে যার কাজ করো।

জগপতি : আমি কোন কাজে আসছি? আসছি না।

কুমুদ : তুমি শালা নিশ্চয়ই সিনেমা যাবার তাল করছো। ওটি হবে না। তুমি আমার সঙ্গে বড়বাজার যাচ্ছো।

জগপতি : My goodness. Why at all in Barabazar?

কুমুদ : হরিদাস আগরওয়ালার গদিতে যেতে হবে। এমনিতেই Patron করা হয়েছে নাকি?

ননী : And that is very vital. জগপতি তুমি কুমুদের সঙ্গে যাবে। নিজেকে shield করো না।

জগপতি : Shield আমি করছি না। কিন্তু আমার গিয়ে কি কোন লাভ হচ্ছে?

ননী : হচ্ছে।

জগপতি : কি লাভ হচ্ছে? কুমুদ সেখানে একলাই একশ'।

ননী : I detest this mentality. সেক্ষেত্রে তো আমিও বলতে পারি Dr. Haridhone Bhattacharya is best known to যৌতন, আমার সেখানে যাবারই কোন মানে হয় না। না না, এ তারি অন্যায় কথা।

জগপতি : বেশ যাচ্ছি, তবে ইন্দ্রনাথকেও আমাদের সঙ্গে যেতে হবে।

ইন্দ্রনাথ : Insist করো যাচ্ছি কিন্তু তাহলে আর আমার বাদুড়বাগান যাওয়া হয় না।

জগপতি : বাদুড়বাগান, ব্যাপারটা বুঝতে পারলুম না।

(দুজনেই হো হো করে হেসে ওঠে)

ননী : জগপতিটা সত্যি এত blunt! (ইন্দ্রকে) বাদুড়বাগানে ইন্দ্রনাথের interest-টা তুমি দেখবে না রাসকেল?

যৌতন : (স্নান করে) তুমি চলে গেলে, পাখাটার বুকে লিখে রেখে যাবো নাম।

ইন্দ্রনাথ : (যৌতনকে) খুব কাজলামি হচ্ছে, না?

যৌতন : প্রেমের গান গাইতে মানা করো বন্ধু?

জগপতি : I am really sorry. ইন্দ্রনাথ ভাই কিছু মনে করিস না। (পায়ে পড়ে) ব্যাগাড়া করি তুই বাদুড় বাগান যা।

ইন্দ্রনাথ : Limit. কি হচ্ছেটা কি বলবি?

কুমুদ : (টেনে টেনে) Speak him not, touch him not, leave him alone and he will fly.

(সকলেই যে যার মত তৈরী হয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ে)

কুমুদ : (চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে জগপতিকে) Just a moment জগপতি।

[ইন্দ্রনাথ বাদে জগপতি ও কুমুদের প্রস্থান]

(ইন্দ্রনাথ সিগারেট-টা টেনে শেষ করে। তারপর যোগদোরস্ত গিলে করা পাঞ্জাবী আর ধুতি পড়ে প্রসাধন শেষ করে। যাবার আগে গোবিন্দকে হাসতে হাসতে বলে)

ইন্দ্রনাথ : গোবিন্দ, যে কোন একটা আঙুল ধর। ধর।

[গোবিন্দ একটা আঙুল ধরে। ইন্দ্রনাথ সস্নেহে তার গালে একটা চড় মেরে ব্যাগ খুলে বকশিস করে চলে যায়—পাখা থেকে সুর তাঁজতে তাঁজতে]

(অরগোপাল ও মুকুন্দমুরারির প্রবেশ)

[অরগোপালবাবু সম্পর্কে ভরণকান্তির জামাইবাবু। মফঃস্বলে থাকেন। ব্যবসায়ী মানুষ। সওদা করতে

এসেছিলেন। মালপত্র কিনে গুছিয়ে রাখার স্থানাভাবে তরুণকান্তির অবস্থান হয়েছেন। কেনাকাটি শেষ হলেই বাড়ী চলে যাবেন। মাথায় টাক, ভাঁড়ি ঝুলতে পারে, সাটের ওপর সুতির ওপন স্লেট কোট, চাঁদে ভাঁজ করা চাদর। বয়স মোটা পঞ্চাশেক।

মুকুন্দমুরারি জয়গোপালবাবুকে আপ্যায়ন করতে করতে ভেতরে নিয়ে আসেন]

মুকুন্দমুরারি: আসুন আসুন, এই হচ্ছে তরুণ-কান্তিবাবুর ঘর।

জয়গোপাল: বাঃ, চমৎকার বন্দোবস্ত।

মুকুন্দমুরারি: এই তো, খানিকক্ষণ আগেও ছিলেন সবাই। কিছুক্ষণ হলো বেরিয়ে গেছেন। আপনার পরিচয়টি···

জয়গোপাল: বলার যে, জামাইবাবু। তরুণ আমার শালা এবং একমাত্র শালা।

মুকুন্দমুরারি: ও।

জয়গোপাল: দেখা না করে গেলে, বুঝতেই পারছেন, গিন্নী তো একেবারে অতিষ্ঠ করে তুলবেন প্রায়—যে এতদিন পর কলকাতা গেলে অথচ ভাইটির আমার কোন খবরই নিয়ে এলে না, দেখাটি অবধি করলে না তার সঙ্গে···

মুকুন্দমুরারি: তা তো বলতেই পারেন। রক্তের রক্ত। কথায় বলেছে···

জয়গোপাল: না শুধু সম্পর্কের টান-ই সব না। এদের ভেতরে, আকর্ষণটা—বুঝতে পারলেন কি না, কি বলবো আপনার সিয়ে এই চুম্বকের মত। বোন তো আমারও আছে; কিন্তু এ বোন সে কি বলে বোঝাবো আপনাকে ভাই বলতে অজ্ঞান। তাই ভাবছি দেখা না করে চলে যাবো!

মুকুন্দমুরারি: তা সে রকম মনে করেন রাত্রের ট্রেনেও যেতে পারেন। রাত্রে এলেই তরুণবাবুর সঙ্গে দেখা হতে পারবে।

জয়গোপাল: তা হলে থেকে যেতে বলছেন?

মুকুন্দমুরারি: না মানে ভাইবোনের টান যেখানে এই রকম সাংঘাতিক একটা কিছু বলছেন তখন—বাড়ী গিয়ে আবার অসুবিধে হতে পারে তো?

জয়গোপাল: সেই তো হয়েছে মুস্কিল। কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে আমার সঙ্গে কিছু মালপত্তর আছে, ওগুলোকে তো তা হলে সাময়িকভাবে খুলে দিতে হয়।

মুকুন্দমুরারি: তা খুলে দিন। পাশের ঘরে তরুণবাবুর জিনিষ, তাল রেখাজতেই থাকবে। তা ছাড়া চাকর আছে, সব দেখে শুনে রাখবে। আমি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। (ডাকে যেন) ওরে গোবিন্দ! গোবিন্দ!

(গোবিন্দর প্রবেশ)

ভাখ তো বাবা, গাড়ীতে কি মালপত্তর আছে সব এনে গুছিয়ে রেখে যে ঘরে। একা না পারিস বলু, জগন্নাথকে ডাক।

জয়গোপাল: কয়েক ঘণ্টার মামলা।

মুকুন্দমুরারি: তবু তো আর রাস্তায় থাকতে পারে না জিনিষ। আপনি তার একটু কষ্ট করে দেখে শুনে নিন।

জয়গোপাল: ঠিক আছে ঠিক আছে। মালটা রেখে আমি অবিশ্যি একটু বেরুবো। তারপর সন্ধ্যে-সন্ধি ঘুরে আসবো।

মুকুন্দমুরারি: বেশ খুশী। তো আচ্ছা!·· চা-টা কিছু খাবেন?

জয়গোপাল: না আমি বাইরেই খেয়ে নেবো। বেলা হয়েছে তো?

মুকুন্দমুরারি: তা সে যদি অনুমতি করেন খাওয়া এখানেও হতে পারে।

জয়গোপাল: তা হলে তো কোন কথাই নেই।

মুকুন্দমুরারি: জামাইবাবু, আপনি বাইরে খেতে যাবেন কেন? মালপত্তর গুছিয়ে আপনি একটু সুস্থির হয়ে বসুন। আমি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

জয়গোপাল : অশেষ ধন্যবাদ।

মুকুন্দমুরারি : জামাইবাবু মানুষ!

(ইতিমধ্যে মালপত্র এসে পড়ে যায়। সবই জুতো। বাক্স ভরতি জুতোর বাক্সের পাহাড়। ঘরের ঠিক মাঝখানে ডাঁই করে নামিয়ে দিয়ে যায় কুলীরা। ভাড়া চায় হাত বাড়িয়ে)

জয়গোপাল : ভাড়া তো! দেগা। লেকিন পিছু দেগা। শুনো, রাতকো আয়েগা। তখন ফিন্ সামান উঠায়েগা গাড়ীমে। তুম্ তিন আদমী। ঐ টাইম তুমকো ডবল ভাড়া মিল যায়েগা। সমঝা?

কুলী : রাতকো কয় বাজে বাবু।

জয়গোপাল : কয় বাজে, হিয়াই তো বড়া হ্যায়। দেখকে যায়েগা। হাম তো হি রাই রহেগা।

কুলী : তো ঠিক হ্যায়। চা খানেকে লিয়ে দুচার আনা মিল যায় বাবু।

জয়গোপাল : আবেলা করে চা! (পয়সা দেন) নে, তিন আনা নে।

[সেলাম করে কুলীদের প্রস্থান]

…এক পর্ব শেষ হলো। গোবিন্দ, তুমি বাবা এখন ডান হাতের জোগাড়টা চটপট করে ফেল দিকি। ম্যানেজার বাবু তো ব্যবস্থা করে দিচ্ছি বলেই যাওয়া কাটলেন। স্থাখ, চটপট করো।

(গোবিন্দর প্রস্থান)

… যাক্, মালপত্তর গুলো যে safely dump করা গেল একটা Secure place-এ এই হলো কাজের কাজ!

[শুয়ে পড়ে গড়ান জয়গোপাল বিছানায় হিপোপটেমাস-এর মত। হাত দিয়ে চাপড়ে নরম গদী অনুভব করেন। লাফিয়ে উঠে আবার বাক্স ভরতি করেন। ইতিমধ্যে ভাতের থালা এসে পড়ে]

জয়গোপাল : বাঃ, এ যে দেখছি একেবারে home comfort ;—ভাজা, ছ্যাচড়া…

(গোবিন্দ জল গড়িয়ে দেয়)

(গোবিন্দকে) তুই কি? হোটেলের চাকর না বাবুর চাকর।

গোবিন্দ : আমি বাবুর চাকর।

জয়গোপাল : বাবুর চাকর? তুই তো দেখছি তা হলে চাকরের চাকর। তোর বাবু আমার কি হয় জানিস? শালা।

গোবিন্দ : ছি।

জয়গোপাল : ছি কি রে বেটা, গালাগালি দিচ্ছি ভাবলি?

গোবিন্দ : আমার বাবুর নাম তরণকান্তি বাবু।

জয়গোপাল : তরণকান্তি হলে বুঝি কারো শালা হতে নেই?

গোবিন্দ : ছিঃ!

জয়গোপাল : আবার বলে ছিঃ। তুই বেটা কথাটাই বুঝলি নে। জল দে।

(গোবিন্দ জল দেয়)

জয়গোপাল : ও জল না। আঁচানোর জল।

গোবিন্দ : কলঘরে যাও।

জয়গোপাল : সে-টা আবার কোন দিকে?

[পথ দেখায় গোবিন্দ আঙুল দিয়ে। একটু পরেই পুনঃ প্রবেশ করেন জয়গোপাল এবং যথারীতি চুল আঁচড়ে, পান খেয়ে বেরিয়ে যান]

জয়গোপাল : সব থাকলো দেখিস বাবা। ও সব তোর বাবুরই জিনিষ।

[প্রস্থান

[জয়গোপালবাবুর নিষ্ক্রমণের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তরণকান্তির বহু বান্ধবের দল হুড় মুড় করে ঘরে ঢোকে এবং পরিশ্রান্তির কারণ দুম দাম শুয়ে-শুয়ে পড়ে।]

মনী : (পান চিবোতে চিবোতে) এখানে 'বিল'

গুলো সব নষ্ট হলো। খাব না বলে দেলেই হতো ভাল।

গৌতম : চাইনীজ ডিস চাইনীজ ডিস বলে তুই-ই তো ক্ষেপে উঠলি। অনর্থক গাঁটগচ্চা চলে গেল কতকগুলো টাকা।

অগপতি : এটা কিন্তু কনফারেন্সের খাতে যাওয়া উচিত।

ননী : হতে পারবে খরচ-খরচা বাদ দিয়ে হাতে যদি বাড়তি টাকা থাকে।

কুমুদ : আমার কিন্তু আবার ক্ষিদে ক্ষিদে পাচ্ছে।

ঘনশ্যাম : পাচ্ছে তো? আমারও। চাইনীজ ডিসের স্পেশালিটিই-ই এই।

ননী : জীবনে তো এই প্রথম খেলি, আবার অত খপচাচ্ছিস কেন?

ঘনশ্যাম : থাক এ ব্যাপারে আর কথা বলিস না। তবে খাবার অত্যন্ত deteriorate করেছে। সেই চিলি চিকেন আর চিকেন চাউ চাউ, সে জিনিষই নেই।

গোবিন্দ : আপনাদের সব খাবার দেওয়া হয়েছে।

কুমুদ : Already served. চল যাচ্ছি। অগপতি আয়।

ঘনশ্যাম : এমনিতেও নষ্ট ওমনিতেই নষ্ট, চাট্টি খেয়েই আসি।

ননী : ক্ষিদে গেলে খাবি যে কেন? চলে যা।

ঘনশ্যাম : তুই সত্যিই যাবি না?

ননী : চল, company দিচ্ছি।…(জুতোর বাক্সের ওপর লক্ষ্য করে) কিন্তু এ বস্তুটি যে কি তা তো এতক্ষণ লক্ষ্য করিনি!

ঘনশ্যাম : জুতোর বাক্স বলেই তো মনে হচ্ছে।

ননী : এত জুতো!

ঘনশ্যাম : হ্যাঁ জুতো। কারো। রয়েছে। তুই ঘামথা মাথা ঘামাচ্ছিস কেন?

ননী : না মানে এমনও তো হতে পারে যে জুতোর কারখানা আছে এমন কোন Patron আমাদের Club কে donate করেছে। হতে পারে ভক্তদের কোন contact…

(তিনজন কুলীর প্রবেশ)

…কেয়া মাংতা বাবা।

১নং কুলী : কুচ নেহি বাবা, বাবু হামকো বৈঠনে বোলা।

ননী : কোন বাবু?

১নং কুলী : জুতাওয়ালা বাবু।

ননী : জুতোওলা বাবু? সেটা আবার কে?

১নং কুলী : কেয়া জানে কোন বাবু। (বসে পড়ে)

২নং কুলী : দেখিয়ে বাবু, ভাড়া না মিলল তো সামান হাম না ছোড়ব—হুঁ।

ননী : গোলমেলে ব্যাপার বলে মনে হচ্ছে। (কুলীকে) তা না ছোড়ব তো বৈঠ যাও, জুতাওয়ালা বাবু বহু আবেগা তব পাবড়েগা।

৩নং কুলী : হুঁ, ও হি বাত বোলতা না!

ননী : বেশ বসে থাকো জুতো আগলে। অন্য কিছুতে হাতটাত দিও না কিন্তু বাবা!

১নং কুলী : দেখিয়ে বাবু, মুলুক সে আয়া পেটকে লিয়ে। হাম চোর ডাকু নেই হ্যায় বাবুজী। হামারা জমীন উমীন সব নাশ হো গিয়া বর্ষামে। আব তো খুঁখা মরতে রহে বালবাচ্চা।

(এত জোরে জোরে আবেদন করতে থাকে কুলীরা যে ননী বিব্রত বোধ করে)।

ননী : ঠিক আছে, বন্দোবস্ত তো কর। জুতোওলা বাবু এলে বুঝোপড়া। গোবিন্দ তুই এখানে বসে থাক। (কুলীকে) মানে এ বাচ্চা কুমদোঁগোকো দেখ চাল করেগা আর কি। (ঘনশ্যামকে) ঐ যে অন্য কোন জিনিষে হাত টাত দিও না বলিছি, সেইজন্যে ক্ষেপে উঠেছিল। Proletarian গোসাটা একবার দেখলি?

ঘনশ্যাম : মানে এরাই Revolution করবে বলছিস ?

ননী : এই বেড়ালই বনে গেলে বনবেড়াল হয়। Whiskerগুলো দেখেছো ? ইয়া মোটা মোটা। বাঘের মতন।

ঘনশ্যাম : আর আমাদের !

ননী : পেটি বুর্জোয়া গোক। দু দিকে দুখানা কালো রেখার আইডিয়া। কোন পুরুষদের ছাপ আছে বলতে চাস ?

ঘনশ্যাম : নে চল বাবি চল।

ননী : নাঃ, বুভুক্ষু বিপ্লবের এই দৃশ্য দেখবার পর দুটু বার করে খাওয়া আমি immoral মনে করি। আমার ঠিক ভাল লাগবে না খেতে।

ঘনশ্যাম : যা বলেছিস।

(দুজনে বসে সিগারেট ধরায়। সময় যায়। একটু পরেই ভয়েলেট খেয়ে চেকুর তুলতে তুলতে সবাই ঢুকে পড়ে। নতুন আগন্তুক তিনজনকে দেখে সবাই হকচকিয়ে যায়)

ধৌতন : এরা কারা ?

ননী : ওয়ারিশান। ওরা থাকবে।

ধৌতন : মানে ?

ননী : চেঁচামিচি করো না, আবার যদি চেঁচাতে সুরু করো তা হলে আর ভিঠোনো যাবে না ঘরে।

কুমুদ : কি ব্যাপার কি ?

ধৌতন : Situation.

কুমুদ : But why grave ?

ধৌতন : Because it is grave.

কুমুদ : Baffling.

জগপতি : কিন্তু আমরা আর দেরী না করে তো রওনা দিলেই পারি।

ননী : ইন্দ্রনাথের জন্যে অপেক্ষা করছি।

জগপতি : সে বাদুড়বাগান থেকে সোজা ষ্টেশনে যাবে।

ননী : তা হলে Pack up your troubles. রওনা হয়ে যাই আমরা। গোবিন্দ, তোর বাবুকে বলিস—আর (বকশিষ দেয়) এটা তুই রাখ। মিষ্টি কিনে খাবি।

[যে যার মত মালপত্র নিয়ে রওনা হয়ে যায়—এক ঝাঁক পায়রার মত, যেমন এসে ঢুকেছিল।

ত্রিমূর্তি সমুখ করে বসে ঘর আগলায় গোবিন্দ।]

(তরুণকান্তির প্রবেশ)

তরুণকান্তি : কি ব্যাপার গোবিন্দ !—এরা সব চলে গেছে ? (জুতোর স্তূপ দেখে) এটা কি ? (কুলীদের) তোমরা কারা ?

১নং কুলী : নেহি সাব, ব্যাসাই বৈঠা হ্যায়।

তরুণকান্তি : বৈঠা হ্যায় তো ইধার কিঁউ ?

১নং কুলী : সামান-কা ভাড়া না মিলি বাবুজী।

তরুণকান্তি : কি সামান ? কার সামান ?

১নং কুলী : জুতাওয়ালা বাবুকা।

তরুণকান্তি : জুতাওয়ালা বাবু !

২নং কুলী : জী হুঁজুর।

তরুণকান্তি : মুকুন্দবাবু কোথায় ? আরে ইয়ে, ম্যানেজারবাবু, ম্যানেজারবাবু ? [প্রস্থান]

১নং কুলী : কেয়া পরেশানি !

২নং কুলী : কা জানে !

৩নং কুলী : (গোবিন্দকে) মোকাম কা মালিক হো বা ?

গোবিন্দ : আমার বাবু।

৩নং কুলী : ও জুতাওয়ালাবাবু কোন হো বা ?

গোবিন্দ : আমি কিছু জানে না।

৩নং কুলী : তু কৌন হো।

১নং কুলী : নোকর হৈল বা।

(হঠাৎ তরুণকান্তির নেপথ্য কণ্ঠ ফেটে পড়ে)

[তরুণকান্তির কণ্ঠস্বর : আপনি আমাকে টেলিফোন করতে পারতেন। আপনি আমার Office-এর টেলিফোন নাম্বার জানেন।]

(মুকুন্দমুরারি সহ তরুণকান্তির পুনঃ প্রবেশ)

মুকুন্দমুরারি : টেলিফোন করলাম না মানে, বললেন আপনার জামাইবাবু।

তরুণকান্তি : না আমার কোন জামাইবাবু নেই।

মুকুন্দমুরারি : কি কাণ্ড দেখুন অথচ পঞ্চাশবার ঘরে তার স্ত্রী অর্থাৎ কিনা আপনার বোনের সঙ্গে আপনার যে কি পরিমাণ ভাব সেই কথাই বলতে লাগলেন সারাক্ষণ।

তরুণকান্তি : কি যেন মশাই আমি তো ভাবতেই পারছি না। আমার বোন···

মুকুন্দমুরারি : আর একবার না, অতিকষ্ট হলবার করে আপনার নাম ধরে বললেন যে তরুণ হচ্ছে আমার একমাত্র শালা। কি করে অবিশ্বাস করি বলুন ?

তরুণকান্তি : আমি কারো শালা কালা নই।

মুকুন্দমুরারি : আর সেই সুবাদে মালপত্তরগুলো পর্যন্ত রেখে দিয়ে গেলেন। বল্লেন, রাত ছাড়া যখন দেখাই হবে না তখন আমিই বা খামখা বসে থেকে কি করবো, একটু ঘুরে আসি। এখন এত কথার পরও কি লোককে অবিশ্বাস করতে মন যায়, আপনিই বলুন ? ভদ্রলোক খেলেন বিশ্রাম করলেন···

তরুণকান্তি : কি, এখানেই খেলেন ?

মুকুন্দমুরারি : বলছেন জামাইবাবু, এখন আমি কি করে বলি বলুন দেখি যে না, আপনি বাহিরেই খান গিয়ে !

তরুণকান্তি : যাই হোক, (কুলীদের লক্ষ্য করে) কিন্তু এরা, এরা কি জন্তে ঘরের ভেতর এসে উঠেছে !

মুকুন্দমুরারি : উঠেছে, (তাড়না করেন) এই, হিয়া কেয়া মাংতা। তুম লোগ বরমে কৈসে ঘুসা। আভা হাম তুম লোগকো পুলিশমে দেনে সক্তা।

কুলীদের সমস্বর : হামারা কেয়া কসুর হায় বাবুজী, ভাড়াকে লিয়ে হাম বৈঠা হায়—কহা কি আভি হাম তুমকো ভাড়া নহি দেগা—বাতকো সব সামান উঠায়েগা, উসকেবাদ তবল ভাড়া মে দেগা এসমাধ।

তরুণকান্তি : কেয়া নিলেগা তুমকো।

১নং কুলী : জী ফিসাবসে দেখিয়ে তিন্ তিন আদমী—এক্কা মাল···

তরুণকান্তি : ঠিক আছে কত, তোমাদের হিসেবে ভাড়া কত ?

১নং কুলী : জী তিন রুপেয়া।

মুকুন্দমুরারি : এখান থেকে এখানে তিন রুপেয়া ? মগের মুল্লুক !

২নং কুলী : দেখিয়ে বাবুজী···

তরুণকান্তি : ঠিক আছে তিন রুপেয়া ; এই নাও তিন রুপেয়া। (ভাড়া দেয়)

১নং কুলী : দেখিয়ে সাব কেয়া ধুপ মে···

তরুণকান্তি : ঠিক আছে যাবা আর বসতে হবে না, বাইরে যাও।

[কুলীদের প্রস্থান]

মুকুন্দমুরারি : এ যে দেখছি তোঘলকীকেও হার মানালো। কিন্তু ভদ্রলোক কে আমার কিছুতেই অবিশ্বাস হচ্ছে না।

তরুণকান্তি : থাকুন আপনি আপনার বিশ্বাস নিয়ে। এখন মোদ্দা বিলটা আমার কত হয়েছে জানাবেন কি ? সেই থেই ঘরে ?

মুকুন্দমুরারি : খুব বেশী হবে না।

তরুণকান্তি : তবু কত ? approximate ?

মুকুন্দমুরারি : তা সত্তর আশী হবে।

তরুণকান্তি : বলেন কি ?

মুকুন্দমুরারি : তা তো হবেই ! আমি আপনাকে বিল দেখিয়ে দেবো, item by item.

তরুণকান্তি : ঠিক আছে। এখন ভুতোওয়ালা জামাইবাবুটি যে কে সেইটিই আমার জানতে বাকি রইল।

মুকুন্দমুরারি : দেখুন। অবিশ্যি দেখেই যে চিনতে

পারবেন—আপনার কথা শুনে সে-ও তো আমি ভাবতে পারছি না।

তরুণকান্তি : আমিই পারছি না, তার আপনি কি করে পারবেন?

[জয়গোপালের প্রবেশ]

মুকুন্দমুরারি : এই তো বলতে বলতে এসে পড়েছেন। আসুন, জামাইবাবু আসুন।

জয়গোপাল : তরুণকান্তি ফিরেছে?

তরুণকান্তি : আমিই তরুণকান্তি।

জয়গোপাল : অ, আমাকে নিশ্চয়ই তোমার মনে পড়ে না। আমি তোমার জামাইবাবু হই। আশ্চর্য্য লাগছে তো?

তরুণকান্তি : না মানে, আপনি বসুন?

জয়গোপাল : হ্যাঁ, বসেই কথা বলি। এক কাপ চা পাওয়া যেতে পারে?

তরুণকান্তি : নিশ্চয়ই, (মুকুন্দমুরারির প্রতি) ম্যানেজারবাবু, আপনি এখন যান। গিয়ে বরং দু কাপ চা পাঠিয়ে দিন।

জয়গোপাল : সুরেন জ্যাঠামশাইকে তুমি নিশ্চয়ই চেনো।

তরুণকান্তি : কে সুরেন জ্যাঠামশাই?

জয়গোপাল : কেষ্টনগরের নরেন বাড়ুয্যের দাদা সুরেন বাড়ুয্যে!

তরুণকান্তি : বিলক্ষণ বিলক্ষণ।

জয়গোপাল : মণিপিসীমার ভাসুর!—আমি তাঁরই পিসতুতো বোনের ননদাই। অনেকদিন দেখা সাক্ষাৎ নেই। ছোটবেলায় তুমি আমাদের বাড়ী মণিপিসীমার সঙ্গে কতবার গেছ? রাণী, অর্থাৎ আমার স্ত্রী তোমাকে খুব চেনে।

তরুণকান্তি : মানে মাঝখানে অনেকদিন দেখা সাক্ষাৎ নেই তো?

জয়গোপাল : তোমার অবিশ্যি সে কথা মনে থাকবার নয়।

তরুণকান্তি : হ্যাঁ, কত ছোটবেলার কথা।

জয়গোপাল : তা এবারে মণিপিসীমার সঙ্গে দেখা হতে তাঁর মেঝে তোমার কথা জানতে পারলুম। রাণী তোমার কথা শুনে ভারি খুশী। আর যাবারই কথা। তার-ও তো এখন হয়েছে—থেকেও কেউ নেই! তাই এবার যখন কলকাতা আসি তখন সে বিশেষ করে আমাকে তোমার সঙ্গে একবারটি দেখা করে যেতে বলেছে। তাই···

তরুণকান্তি : খুব ভাল করেছেন।

জয়গোপাল : আর সম্পর্ক রাখো রাখলেই থাকে, না রাখলেই থাকে না। ভাবলুম যাই, রাণী যখন বলছে এত করে।

(গোবিন্দ চা দেয়)

তরুণকান্তি : নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। আমারই অন্যায় হয়ে গেছে আপনাকে চিনতে না পেরে।

জয়গোপাল : আমি রাখো সকলের সঙ্গে সম্পর্ক

With Season's Greetings
From Manufacturers of :
CROWN BRAND
ALUMINIUM WARES &
ANODISED ARTICLES
Brighten your home with our
choicest articles
IN EYE PLEASING COLOURS
Visit Our Showroom
For Your Festival Shopping
JEEWANLAL (1929) LIMITED
Crown Aluminium House
23, Brabourne Road, Calcutta-1.

রেখে চলি। প্রত্যেকের বাড়ী অন্ততঃ বছরে একবার করে যাই-ই যাই।

তরুণকান্তি: এ তো খুব ভাল কথা। দেখা সাক্ষাৎ না থাকলে…, by the by আপনার কুলী ভাড়া কিন্তু আমি মিটিয়ে দিয়েছি। বেটারা বড্ড জ্বালাতন করছিল এখানে এসে।

অমরগোপাল: তাই নাকি? কিন্তু আমার তো রাত্রে রওনা হওয়ার কথা। কুলী না পেলে, মানে ঐ ঘন্টেই আর কি আমি তখন ভাড়া মেটাই নি।

তরুণকান্তি: কিন্তু আপনার তো দেরী হয়ে গেছে। এখন রওনা হয়ে আপনি স্টেশনের ধারের গাড়ী ধরতে পারবেন কি?

অমরগোপাল: Risky হয়, না? তা হলে…

তরুণকান্তি: কাল Early morning চলে যান। আর রাত করে এত মালপত্তর নিয়ে……

অমরগোপাল: কিন্তু এখানে তোমার কোন অসুবিধা হবে না?

তরুণকান্তি: কিছু না। এত বড় ঘর। কি অসুবিধে?

অমরগোপাল: তা হলে সেই ভাল। আর সারাদিন ঘোরাঘুরির পর।

তরুণকান্তি: আপনি বিশ্রাম করুন। আসুন। Relax করুন।

অমরগোপাল: একবার শুলে আর উঠতে পারবো না।

তরুণকান্তি: বেশ তো, আপনি বরং খেয়ে নেয়েই শুয়ে পড়ুন। (ডাকে) গোবিন্দ! ঠাকুরকে জামাই-বাবুকে ভাত দিতে বল। দেরী না করে। হাত মুখ ধোবেন তো?

অমরগোপাল: হাঁ, একটু।

তরুণকান্তি: গোবিন্দ, বাবুকে বাথরুমটা দেখিয়ে দে।

(গোবিন্দর সঙ্গে অমরগোপালের প্রস্থান)

[বিরক্তায় তরুণকান্তি হাত পা ছেড়ে দিয়ে ধপ করে মাটিতে বসে পড়ে। পরক্ষণেই উঠে বিছানা তৈরী করতে লেগে যায় খাটে। নিজের জন্যে একটি সতরঞ্চি পেতে নেয় মেজেতে। গোবিন্দ তাকে সাহায্য করে।]

তরুণকান্তি: (কাজ করতে করতে) গোবিন্দ, তোর সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে।…রোজ সেই রোজ সেই—এমনি করলেই হয়েছে আর কি?…নতুন চাকরী,…নে চাদরটা ধর।……কাল থেকে যে-ই আসুক, স্রেফ বলে দিবি বাবু কলকাতার বাইরে টুরে চলে গেছে। আর ঘরে তালাচাবি দিয়ে রাখবি। কি বলছি?

গোবিন্দ: তালা নেই দিব।

তরুণকান্তি: তালা নেই চাবি ম্যানেজারবাবুকে জিম্মা করে দিবি।…কাউকে ঘরে ঢুকতে দিবি না। বুঝতে পারলি?

গোবিন্দ: কাউকে আমি ঘরে ঢুকতে দিব নাই।

তরুণকান্তি: খেয়াল থাকে যেন।…সবাই যেন ধর্মশালা পেয়েছে! বলা নেই কওয়া নেই, এসে উঠলেই হলো! একটা সাধারণ Sense বলে কারো কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই! এর চাইতে সংসার পেতে বসলেই পারতাম! এত ঝামেলা হতো না। এ যেন নিজের ঘরে নিজে চোর হয়ে থাকার অবস্থা। কোন মানে হয়?…

(গোবিন্দ শোনেই, কিন্তু কোন কিছুই সে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না)

স্বার্থপর দুনিয়া…খালি স্বার্থের সম্পর্ক…বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, তার জামাইবাবু…(অমরগোপালকে দেখেই) জামাইবাবু খাটে শোবেন (গোবিন্দকে) বুঝতে পারলি? (অমরগোপালকে) আপনি জামাই-বাবু খাটে শোবেন।

জয়গোপাল : তা এইবার তুমি যাওয়া যাওয়া কর। তাহলেই তো আবার light off করতে হবে।

তরুণকান্তি : তা করুন না। আমি সব off করে দিচ্ছি।

জয়গোপাল : শুধু fan-টা full force-এ চালিয়ে যাও।

তরুণকান্তি : নিশ্চয়ই। (Regulator ঘুরিয়ে দেয়)

জয়গোপাল : কালী করাল বদনী।

[শ্যামা সঙ্গীত করেন এক কলি। উত্তেজনায় তরুণকান্তি চেয়ারটা উল্টে ফেলে দেয়]

জয়গোপাল : (অন্ধকারে) কি হলো ?

তরুণকান্তি : চেয়ারটা ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেছে অন্ধকারে। আপনি ঘুমোন।

[নিশ্চিন্তে কলির বাকি অংশটা শেষ করে চুপ করে যান জয়গোপাল। ঘুমিয়ে পড়েছেন। অন্ধকারে হাতড়ে মাটিতেই শুয়ে পড়ে তরুণকান্তি।

কাছে পিঠে কোথাও বিয়ে হচ্ছে। শঙ্খধ্বনি ও জোকার পুকার সমেত শিশু বারোয়া-র শানাই বাজছে।]

দ্বিতীয় অঙ্ক

[তরুণকান্তির ঘর। সুদৃশ্য একটি ফুলহাতীতে রজনীগন্ধার ঝাড় রাতকে দিন করেছে। জানালায় দরজায় নতুন পর্দা। মুকুন্দমুরারি আর অবিনাশবাবু যোগভাঙা জামাকাপড় পরে খাটের ছত্রীতে ঝুল ঝড়াচ্ছেন। পঞ্চাননবাবু ও অন্য দুজায় বোর্ডার চেয়ার টেবিলে সোজা হয়ে বসে মজলিশ করছেন আর কোকা-কোলা খাচ্ছেন নলে টেনে।

সব চাইতে আনন্দ আজ গোবিন্দর। সে লাল সিল্কের জামা পরে ঘর বার করছে ছুটে ছুটে।]

পঞ্চানন : মুকুন্দমুরারি বাবু কিন্তু এই কাজটি করে খুব বড় একটা স্টার্ট দিলেন। মেস বোর্ডিং-এ পরিবার পত্তন—এ বড় সচরাচর একটা দেখা যায় না।

মুকুন্দমুরারি : (ঝুলের ডাঁটা হাতে) শুধু স্টার্টই দেখলেন, ছবরের কোন প্রমাণ পেলেন না ?

পঞ্চানন : না না ছবর তো বরাবরই আপনার সহচর। কি বলেন অবিনাশবাবু ?

অবিনাশ : মুকুন্দ তার মুরারি। এখন বাঁশীটি হাতে নিয়ে বঙ্কিম হলেই ষোল কলা পূর্ণ হয়।

মুকুন্দমুরারি : যদুনা উজান করালুম তো ! সেটি বলুন।

পঞ্চানন : একশোবার ছেড়ে হাজার বার। এই বার দেখুন অবিনাশবাবুর যদি একটা গতি করতে পারেন।

মুকুন্দমুরারি : ঐটিই পারবো না। উনি যে নিজের সিঁথেতেই নিজে সিঁদুর টেনে আগোষে রক্ষা করে নিয়েছেন।

পঞ্চানন : কঠিন তপস্যা।

মুকুন্দমুরারি : সেই জন্যে পাইলসও সারছে না। এত নাচ, এত গান অথচ বলীর কোন নিষ্পত্তি হচ্ছে না।

অবিনাশ : (মুকুন্দকে) হ্যাঁ, ওটি আপনারই আর একটি অবদান।

মুকুন্দমুরারি : তেজাল খাইয়ে বলছেন !

অবিনাশ : পাগল! আপনি মুকুন্দমুরারি আপনার ওপর এ অভিযোগ শত্রুরও করবে না।

[হঠাৎ নেপথ্যে শাঁখ বেজে ওঠে। গোবিন্দ শাঁখ হাতে পাখীর মত ছুটোছুটি করে। পঞ্চাননবাবু প্রমুখ সবাই ব্যস্ত সমস্ত হয়ে ওঠেন। চেয়ার জোড় পরে ছুটে যান অবিনাশ। মুকুন্দমুরারি পেছনে হাতে তালি বাজাতে বাজাতে অগ্রবর্তী হন।

পাশ কাটিয়ে ঘরে প্রবেশ করে তরুণকান্তি। হাতে একটি নতুন চামড়ার সুটকেশ। সঙ্গে রূপলাবণ্য-ময়ী যোড়শী স্ত্রী। সঙ্গে অনূঢ়া একটি শ্যালিকা। ফ্রক পরা।

তারপরই চোকে সারি সারি ঢাকা চাপা দেওয়া সন্দেশের থালা, দই-আর মিষ্টির ভাঁড়।]

পঞ্চানন : আমাদের কর্তব্যটি এইখানেই শেষ করি।

[কনের হাতে সিল্কের শাড়ী তুলে দেন কাগজের বাক্সে মোড়া। অন্য দুচারজন বোর্ডারও কনের হাতে সৌহার্দ্যের নজির রাখে। হাত তুলে তুলে নমস্কার করে বৌ। মুকুন্দমুরারি দেন একখানি গয়না -লাল বাক্সে—রঙীন ফিতে বাঁধা]

তরুণকান্তি : ম্যানেজারবাবু, আপনি kindly মিষ্টিগুলো সব ঘরে ঘরে distribute করে দিন। কি, চাকর, ঠাকুর– কেউ যেন বাদ না পড়ে। (স্ত্রীকে) পরে আলাপ করোখন। হোটেলের তো বটেই, তোমার আমারও একমাত্র ম্যানেজার। মানে উনি যদি ঘর না দিতেন আমি তোমাকে এখানে আনতেই পারতুম না বিয়ে করে। (শ্যালিকাকে) মোদনচাঁপার বাড়ীর জন্যে মন কেমন করছে না তো?… আমাদের গোবিন্দ, (স্ত্রীকে) তোমাকে বলেছি। (গোবিন্দ টিপ্ করে একটি প্রণাম করে বসুকে)

[হাতে হাতে কাজ এগিয়ে যায়। মুকুন্দমুরারির নির্দেশে মিষ্টির ভাঁড় আর সন্দেশের থালা বেরিয়ে যায় সব ঘর থেকে। কৌতূহলী বোর্ডারদের ভিড় সরে যায়। রাত হয়। এখন মধুযামিনী। ঘরে নীলচে আলো জ্বলে কিন্তু স্বামী স্ত্রীর মাঝখানে ব্যবধান রচনা করে ড্যাব ড্যাব করে তাকিয়ে থাকে মোদন-চাঁপা।]

তরুণকান্তি : মোদনচাঁপার ঘুম আসছে না বুঝি?

মোদনচাঁপা : জামাইবাবু কনকদিদি একলা থেও না, জানলা দিয়ে ঘট পালাবে দেখতে পাবে না (ছড়া কেটে দুষ্টুর মত খিল খিল করে হেসে ভেঙে পড়ে)

কনকচাঁপা : (ধমকে) আ, কি হচ্ছে কি মোদন এত রাতে! ঘুমিয়ে পড়।

মোদনচাঁপা : আমি গল্প শুনবো জামাইবাবুর কাছে।

তরুণকান্তি : কি গল্প শুনতে চাও বলো।

মোদনচাঁপা : ভূতের গল্প।

তরুণকান্তি : আচ্ছা বলছি।

মোদনচাঁপা : তুমি দিদির দিকে মুখ করে বলবে না।

তরুণকান্তি : আচ্ছা তোমার দিকে মুখ করে বলবো।…

(গল্প বলে) আমি তখন ইস্কুলে পড়ি। এই আর কি একটু নীচু ক্লাসের দিকে। ক্লাস ফোর কি ফাইভ হবে।…

কনকচাঁপা : কানের কাছে ঘ্যানর ঘ্যানর আমি মাটিতে গিয়ে শুচ্ছি।…

তরুণকান্তি : সে কি, মাটিতে! ঠাণ্ডা লেগে অসুখ করবে যে।…(মোদনচাঁপাকে) দেখলে তো ভূতের গল্প বলবার আগেই তোমার দিদি ভয় পেয়ে পালিয়ে গেল!

মোদনচাঁপা : দিদিটা ভীষণ ভীতু।

তরুণকান্তি : এখন কি হবে!

ষোলনচাঁপা : দিদি শুনছে, তুমি আমায় কাছে গল্প বলো।

তরুণকান্তি : তোমার দিদি ভয় পাবে, সেটা কি ঠিক হবে? (উচ্চৈঃস্বরে) ঠিক আছে আমরা ভূতের গল্প বলছি না,—কনক তুমি খাটে উঠে এসো।

কনকচাঁপা : আমি বেশ আছি মাটিতে।

তরুণকান্তি : বেশ আছি আবার সকালবেলা দেখবে গা গতোরে ব্যথা হয়ে ডেঙ্গুতে ধরেছে। কলকাতায় এখন ভীষণ ডেঙ্গু চলেছে।

কনকচাঁপা : হোক ডেঙ্গু।

তরুণকান্তি : (উঠে বসে) এই, কি হচ্ছে কি?

কনকচাঁপা : ঠিক আছি।

তরুণকান্তি : তবে আমিও এসে মাটিতে শুচ্ছি।

কনকচাঁপা : তোমার খুশী।

তরুণকান্তি : বেশ।

(নীচে শোয় বালিশ ফেলে)

[সঙ্গে সঙ্গে খাটের ওপর উঠে দাঁড়ায় ষোলনচাঁপা,

ষোলনচাঁপা : আমিও মাটিতে শোব।

কনকচাঁপা : না।

ষোলনচাঁপা : হুঁ।

কনকচাঁপা : না।

ষোলনচাঁপা : আমি কিছুতেই বিছানায় শোবনা।

কনকচাঁপা : তুমি এইবার আমার কাছে পিটুনি খাবে।

ষোলনচাঁপা : বারে, তোমরা মাটিতে শুয়েছো আর আমি বুঝি মাটিতে শুতে পারি না জামাইবাবুর কাছে।

কনকচাঁপা : জামাইবাবুকে ওপরে দিয়ে শুতে বল না?

তরুণকান্তি : ষোলন তুমি ভীষণ গণ্ডগোল করছো। নীচে শুলে তোমার অসুখ করবে।

ষোলনচাঁপা : আর তোমাদের বুঝি অসুখ করবে না।

তরুণকান্তি : আমরা বড়। বড়দের মাটিতে শুলে অসুখ করে না।

ষোলনচাঁপা : একটু আগে যে বলেন দিদির ডেঙ্গু হবে মাটিতে শুলে।

কনকচাঁপা : কার সঙ্গে কথা বলছো? কখায় তুমি ওর সঙ্গে পেরে উঠবে। ঐ জন্যেই আমি ওকে সঙ্গে আনতে চাইনি।

তরুণকান্তি : যাগগে থাক, একবার যখন এসে গেছেই তখন এসো মাটিতেই এসো।

(ষোলনচাঁপা লাফিয়ে মাঝখানে বালিশ নিয়ে শুয়ে পড়ে)

তরুণকান্তি : শান্তি তো!

ষোলনচাঁপা : এইবার গল্প বলো?

তরুণকান্তি : আবার গল্প কিসের?

ষোলনচাঁপা : ভূতের বলতে বলছি না তো! রাজারাণীর গল্প বলো।

তরুণকান্তি : This is too much ষোলনচাঁপা। রাজারাণীর গল্প শোনবার তোমার বয়েস নেই।

কনকচাঁপা : ও ভাবছো সরল মনে এই সব কথা বলছে? ইচ্ছে করে with some purpose আমাদের জ্বালাতন করছে। ওকে আমি জানি না!

(ষোলনচাঁপা এই অভিযোগের উত্তরে দিদিকে ভেঙিয়ে শব্দ করে ওঠে। তারপর ফুঁৎ ফুঁৎ করে কাঁদে)

তরুণকান্তি : ছি ষোলনচাঁপা; ও রকম করতে নেই। ঘুমিয়ে পড়।

ষোলনচাঁপা : আমার ঘুম আসছে না।

তরুণকান্তি : ঘুমিয়ে পড় কাল আবার আমাদের নেমন্তন্ন আছে, সিনেমা আছে।

(কনকচাঁপার ধৈর্যচ্যুতি ঘটে। সে উঠে বসে)

কনকচাঁপা : বাবাঃ, এখানেও সেই ঘ্যানর ঘ্যানর। নাঃ, শুতে দেবে না। (বসে থাকে)

[সঙ্গে সঙ্গে ষোলনচাঁপাও উঠে বসে। তরুণকান্তিও অগত্যা একটি সিগারেট ধরায়, উঠে বসে।

বসে বসেই রাত কাটে। সকালবেলা। তরুণকান্তি দোলনচাঁপাকে কোলপাঁজা করে খাটে শুইয়ে দেয়।

তরুণকান্তি : (কনককে) আমি তোমায় হুকুম করছি বসুন মাটিতে শুয়ে কাজ নেই। (কপালে হাত দেয় দোলনের) হুঁ, রীতিমত temperature run করছে।

কনকচাঁপা : সেই ডেঙ্গু তো ?

তরুণকান্তি : জ্বর হলেই যে ডেঙ্গু হবে এমন কোন কথা নেই। তবে কলকাতায় এখন epidemic চলেছে ডেঙ্গুর। বিশ্রী একটা type of flue···এই তো সেদিনই তো শুনছিলাম—সাত বছরের তাগড়া ছেলে, কথা নেই বার্তা নেই ইস্কুল থেকে জ্বর নিয়ে বাড়ী ফিরেছে। বাড়ীর লোকেও হয়তো অতটা লক্ষ্য করেন নি প্রথমটা কাজেকর্মে। রাত্রে হয় সেই temperature সাত।

কনকচাঁপা : সাত মানে ?

তরুণকান্তি : Hundred and seven. প্রকৃতিই তো ডেঙ্গুর এই।

কনকচাঁপা : কি কাণ্ড, তারপর ?

তরুণকান্তি : তারপর আর কি ? ডাকে ডাক্তার, আনো বস্তি, সার্জন, নার্ভ puncture করা হলো, বরফ ঘরে রাখা হলো কিন্তু কণী বাঁচানো গেল না। Just within forty eight hours collapse.

কনকচাঁপা : এখন কি হবে ?

তরুণকান্তি : এটা যে ডেঙ্গু সে কথা তোমায় কে বলে ? আমি বলাম তোমায় একটা ঘটনার কথা।

কনকচাঁপা : Temperature-টা দেখবে ?

তরুণকান্তি : রাখ। আর কিছু হলে ডাক্তার তো পাশেই আছে। ভয় পাবার কি আছে ?

(কনকচাঁপা থার্মোমিটার লাগায়)

···নেমন্তন্ন, সিনেমা—সব মাথায় উঠে গেল।

কনকচাঁপা : ওকে না নিয়ে এলেই ভাল হতো।

তরুণকান্তি : এখন বলছো। এইরকমটি যে ঘটবে সেটি কে জানতো ? রাখ !

কনকচাঁপা : (বিস্ফারিত দৃষ্টি) হাণ্ড্রেড এণ্ড··

তরুণকান্তি : (ছিনিয়ে নেয়) কত ?

কনকচাঁপা : পাঁচ ছয় বলে মনে হলো।

তরুণকান্তি : কোথায় ? পাগলের মত যা তা বকবে,—ছুই।

কনকচাঁপা : সেটাও কিছু কম নয়।

তরুণকান্তি : না Temperature দেখ। একবার উঠতে দেবে না।

কনকচাঁপা : ডাক্তারবাবুকে একবার ডাকলে হতো না ?

তরুণকান্তি : সব ব্যবস্থা হচ্ছে। ভেবো না।

কনকচাঁপা : ওগো, জ্বর যদি আরও বাড়ে।

তরুণকান্তি : Ordinary flue বলেই তো মনে হচ্ছে। ঠাণ্ডা লেগেছে।

কনকচাঁপা : আর যদি ডেঙ্গু হয় !

তরুণকান্তি : ডেঙ্গু হলে শরীরে অসহ্য যন্ত্রণা হয়। দোলনচাঁপা সে কথা কিছু বলছে ?

কনকচাঁপা : বলবে কি ! একেবারেই যে বেহুঁস, অচৈতন্য হয়ে পড়ে আছে।···দোলন !

তরুণকান্তি : ডেকো না।

কনকচাঁপা : আর একবার Temperature নেব ?

তরুণকান্তি : এই তো দেখলে।

(চা সহ গোবিন্দর প্রবেশ। দুজনে চা নেয়)

তরুণকান্তি : গোবিন্দ তোমাকে এক্ষুণি একবার ডাক্তারের কাছে যেতে হবে। বলবি—

কনকচাঁপা : তুমি নিজে গেলে হতো না ?

তরুণকান্তি : আচ্ছা আমি নিজেই যাচ্ছি। তোকে যেতে হবে না গোবিন্দ। তুই বৌদির কাছে কাছে থাক। দোলনের জ্বর হয়েছে।

(গোবিন্দ সমবেদনায় চুক চুক শব্দ করে)

কনকচাঁপা : গোবিন্দ তুমি বরং জলটা ধরে নাও কুঁজোয়, কেমন ?

তরুণকান্তি : জল ভর, শক্তি যা—এইসব করে বেখে বেখে। আমি আসছি। (প্রস্থান)

গোবিন্দ কাজ করে। কনকচাঁপা আবার থার্মোমিটার লাগায়। উত্তেজনাময় কয়েকটি মুহূর্ত। একটু পরেই থার্মোমিটার দেখতে থাকে। বিশ্বাস হয় না। বিছানা থেকে নেমে জানালার কাছে ছুটে যায়। অবাক হয়। সুইচ বোর্ড ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখে। নির্ভুল দেখা—একশ চার। রোগীর কাছে ছুটে যায়।]

কনকচাঁপা: দোলন? দোলনা? মনু?

(কোন সাড়া নেই? অধিরভাবে বোনের মাথার ওপর লুটিয়ে লুটিয়ে পড়ে)

(স্বগতঃ) বড়ুন, এসে কাজ নেই। এখন এই বিদেশ বিভূঁইএ আমি কি করবো! দোলন? দোলনা? মনু?…

…(গোবিন্দ জলের হুঁজো রাখে) গোবিন্দ, ম্যানেজারবাবু আছেন?

গোবিন্দ: পরে আসবেন।

কনকচাঁপা: কখন আসবেন?

গোবিন্দ: আমি দেখছি।

কনকচাঁপা: কি বিপদেই ফেললে ঠাকুর! (মাথার কাছে গিয়ে বসে)

…দোলন, দোলনচাঁপা?

(ডাক্তার সহ তরুণকান্তির প্রবেশ)

ডাক্তার: (তরুণকে) জন্ম মৃত্যু বিবাহ—এ কেউই বলতে পারে না। আর বিয়ে না করেই যে নিষ্কৃতি পাবেন এমন কথাও আপনি হলপ করে বলতে পারবেন না। ও আমরা ছাড়ার কেন বলি না, নিষ্কৃতির ওপর কোন কথা নেই। কর্মফল একটা অধিক্ষি আছে, তবে সেটা কিছু বড় কথা নয়—বুঝলেন কি না?…জ্বর মেপেছেন?

তরুণকান্তি: জ্বর দুই।

কনকচাঁপা: না বেড়েছে, চার।

তরুণকান্তি: কি করে? আবার দেখলে নাকি?

কনকচাঁপা: তুমি চলে যেতে।

ডাক্তার: বেশ তো লাগান না আর একবার। দেখি…(নিজের থার্মোমিটার লাগান) Temperature-টা অধিক্ষি বড় কথা নয় ওটা একটা Expression মাত্র—that gives a clue to the actual disease. অধিক্ষি সব সময় তাও আবার সত্যি না। That might be the resultant effect of some secondary infection. সত্যি কথা বলতে কি আমরা ডাক্তার বদ্যিরা—কি করি জানেন, chance নেই। লাগে তুক্ না লাগে তাক্। মুখে অধিক্ষি সবাই আমরা বড় বড় কথা বলি। আসলে আমরা স্থির করে কিছু বলতে পারি নে।

কনকচাঁপা: হয় নি?

ডাক্তার: আমি ঘড়ি দেখছি।…তা সে যে কথা বলছিলাম—ডাক্তারী করি আমরা অথচ দেখুন গোটা জিনিষটাই একটা wrong hypothesis-এর ওপর দাঁড়িয়ে আছে। চোখ বাঁধা কতকগুলো বলদের মত আমরা শুধু হাতড়ে বেড়াচ্ছি—Just groping in the fathomles darkness. অথচ এর superstructure দেখলে আপনার মাথা খারাপ হয়ে যাবে।…Science, কি করতে পেরেছে science? বলুন না?

কনকচাঁপা: এতক্ষণে নিশ্চয়ই হয়ে গেছে।

ডাক্তার: টাছুন। Hundred four point six. প্রায় পাঁচ-এর কাছাকাছি। বরফ দিচ্ছেন মাথায়?

তরুণকান্তি: বলেন নিশ্চয়ই দেব।

ডাক্তার: একটু বরফ দিন। আর ঠাণ্ডা জলে তোয়ালে নিংড়ে গাটা বেশ ভাল করে পুঁছিয়ে দিন।

কনকচাঁপা: ডেঙ্গু বলে মনে করেন কি?

ডাক্তার: (হেসে) দেখা যাক না? অধিক্ষি একটা virus infection হচ্ছে আজকাল, ডেঙ্গু বলেই চলছে বাজারে তবে আরও বিভিন্ন ধরণ আছে। ডেঙ্গু মাত্রেই সাংঘাতিক একটা কিছু নয়।

(চেম্বেসকোপ লাগান) না:, কোন congestion নেই। মাথাটা বেশ করে দুইয়ে দিন আগে। তার পর আইসব্যাগে করে…ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই temperature কমে যাবে।…বেশি কাশলে দিন।…

তরুণকান্তি নোটবই বের করে। ডাক্তার Prescription লেখেন]

…কিছু worry করবেন না।

তরুণকান্তি : আমি খবর দেবখন।

ডাক্তার : টাবলেটটা দুটো করে তিনবার। আর mixture-টা every three hours. বিকেল নাগাদ একটা খবর দেবেন—কেমন থাকে না থাকে। আচ্ছা!

(ডাক্তারের প্রস্থান)

[ডাক্তার চলে গেলে বালতি বালতি জল ঢালা হয় মাথায়। কনকচাঁপা কাঁপতে কাঁপতে বাতাস করে মোদনচাঁপার মাথায়]

তরুণকান্তি : গোবিন্দ, তুই পাড়ের দোকান থেকে দশ সের বরফ (টাকা দেয়) আর ডাক্তারবাবুর দোকান থেকে একটা আইসব্যাগ—চট করে নিয়ে আয়।

[গোবিন্দর প্রস্থান]

…গা-টা পুঁছিয়ে দিতে বললো ডাক্তার, কিন্তু এত জ্বরের ওপর ঠিক ভরসা পাচ্ছি না। তুমি কি বলো?

কনকচাঁপা : দরকার নেই স্পঞ্জ করে।

তরুণকান্তি : হ্যাঁ যদি আবার ঠাণ্ডা টাণ্ডা লাগে! ডাক্তাররা অমন অনেক কথা বলে।

কনকচাঁপা : আচ্ছা মা বাবাকে একটা টেলিগ্রাম করলে হয় না?

তরুণকান্তি : আমিও ভাবছিলাম কথাটা।

কনকচাঁপা : আমি বলি করে দাও। যদি এমন তেমন হয়!

তরুণকান্তি : না না, অতখানি ভাবছো কেন? এমন তেমন হলে তাঁরা এসেই কি ঠেকাতে পারবেন? …করে দিচ্ছি টেলিগ্রাম।

কনকচাঁপা : আর শোন, মোদনচাঁপার কথা টেলিগ্রামে কিছু বলবে না। ভাববে, অবুঝ খারাপ একটি ঝগড়া হয়ে এসো। এখন যা বুঝুন তাতে।

তরুণকান্তি : ঠিক আছে। তাই টেলি করে দেই। ঝুঁকি নেবার কোন মানে হয় না। After all তাঁদের মেয়ে!

কনকচাঁপা : ওগো, কি হবে বল তো?

তরুণকান্তি : ভাবছো কেন! সব ঠিক হয়ে যাবে। টেলিগ্রামটা করে দিয়ে আসি।…from frying pan to fire—ব্যাস্!

(তরুণকান্তির প্রস্থান।

[গোবিন্দ বরফ ও আইসব্যাগ আনে। বরফ ভেঙে মাথায় দেয়া হয় মোদনচাঁপার। বিকেল নাগাদ তাপ কমে যায় মোদনচাঁপার]

"শরতে আজ কোন অতিথি এল প্রাণের দ্বারে
আনন্দ গান গা'রে হৃদয় আনন্দ গান গা'রে।"

রবীন্দ্রনাথ

এই আনন্দ মুখর দিনে—
নানা রংয়ের, ঢঙের ও
বৈচিত্র্যের
শাড়ী
নানা রকমের ও বর্ণের
ব্লু-সিল্ক
অফুরন্ত ধরণের ছেলেমেয়েদের
তৈরী পোষাক পরিচ্ছদ
এখানেই পাবেন
বেঙ্গল ষ্টোর্স লিঃ
৮এ, চৌরঙ্গী প্লেস, কলিকাতা-১৩
ফোন : ২৩-২২৪৩

তরুণকান্তি : আমি বলছি, তুমি ওঠ।

কনকচাঁপা : গা হাত পা একেবারে টন্ টন্ করছে।

তরুণকান্তি : এক নাগাড়ি বসে আছো তো!

কনকচাঁপা : আমি ভাবছি তোমার কথা। এতটুকু যত্ন হচ্ছে না তোমার।

(তরুণকান্তির মুখে মাথায় হাত দেয়)

তরুণকান্তি : দিঁ দিঁ।

[চোখ বুজে পড়ে থাকে রুগী। সামনে গিয়ে পাটিপে উঠে যায় কনকচাঁপা। তরুণকান্তি বসে রুগীর কাছে। সন্ধ্যাসন্ধি ডাক্তার এসে পরীক্ষা করেন]

ডাক্তার : জ্বর তো দিব্যি কমে গেছে দেখছি। আর কোন ভয় নেই। (নল লাগান)…ঠিক আছে। ঐ ওষুধই চলবে।

কনকচাঁপা : একদম সাড়া নেই।

ডাক্তার : ঘুমুচ্ছে তো? তা এত বড় একটা অসুখের পর একটু অবসন্নতা আসবেই। আর তা ছাড়া mixture-এ Bromide পড়েছে। ঘুমুক, ঘুম তো ভাল। আপনারা নিশ্চিন্ত হতে পারেন।

তরুণকান্তি : আপনি খুব save করেছেন।

ডাক্তার : ও যিনি রক্ষে করবার তিনিই করছেন। আমরা নিমিত্ত মাত্র। আচ্ছা!

(Visit নিয়ে প্রস্থান)

কনকচাঁপা : (ঘনিষ্ঠ হয়ে) এখন দেখছি টেলিগ্রাম না করলেই-ভাল হতো।

তরুণকান্তি : কি করে বুঝবো বল? সেটায় তুমিই বলতে…

কনকচাঁপা : না গো না, আমি তোমার তেমন বউ নই!

(দুজন দু জনের দিকে চেয়ে থাকে)

তরুণকান্তি : (আবেগে) কনক!

কনকচাঁপা : (আশ্লেষে) ব-লো!

তরুণকান্তি : দিঁ দিঁ।

(ছিটকে সরে যায় দুজন দুদিকে)

[রাত হয়। ওষুধ ও পথ্য দেবার পর মশারী খাটিয়ে দেওয়া হয় রোগীর। নীচে গোবিন্দ বিছানা নেয়। বাসি সন্দেশ আর মিষ্টি এ ওর মুখে পুরে দেয় প্রাণের খুশীতে। আজ মধুরাত।

লাল সিল্কের চেলী মুড়ে কনকচাঁপা শুয়ে আছে ঘুমের ভান করে। সিগারেটটা শেষ করে পাশেই শুয়ে পড়ে তরুণকান্তি।]

তরুণকান্তি : ঘুমোলে?

[কনকচাঁপা পাশ ফিরে শোয়। তরুণকান্তি তার কপাল থেকে চুল সরিয়ে দেয়]

কনকচাঁপা : আমায় তোমার ভাল লেগেছে?

তরুণকান্তি : প্রমাণ চাও?

কনকচাঁপা : হুঁ—উ—উ।

[হঠাৎ দরজায় করাঘাত। দুম দাম শব্দ। ভারি ভারি কি সব জিনিষ যেন পড়ছে মাটিতে। সঙ্গে হাঁক ডাক।

লাফিয়ে ওঠে তরুণকান্তি। জানালার পর্দা সরিয়ে উঁকি দেয় কনকচাঁপা।

দরজা খুলে দিতেই মোট্‌মোটরা, বিছানা, বাক্স ইত্যাদি নিয়ে ঘরে ঢোকে শ্বশুরবাড়ী,—তরুণকান্তির শ্বশুর, শাশুড়ী, শালা, শালী—সংখ্যাক্রমিক পাঁচ ছটি।]

ক্ষেত্রমোহন : (শ্বশুর) এখন কেমন?

তরুণকান্তি : Crisis কেটে গেছে।

[শাশুড়ী কোলেরটিকে কনকচাঁপার কাছে ছুঁড়ে দিয়ে ছুটে যান ঘোলনচাঁপার শিয়রে। আর কাটা মশারী তুলে অন্য দিক থেকে খাটে গিয়ে ওঠে]

ক্ষেত্রমোহন : আমি ভাবলাম গতকালই রওনা হয়ে গেল আর এর মধ্যেই; বৈব বৈব।

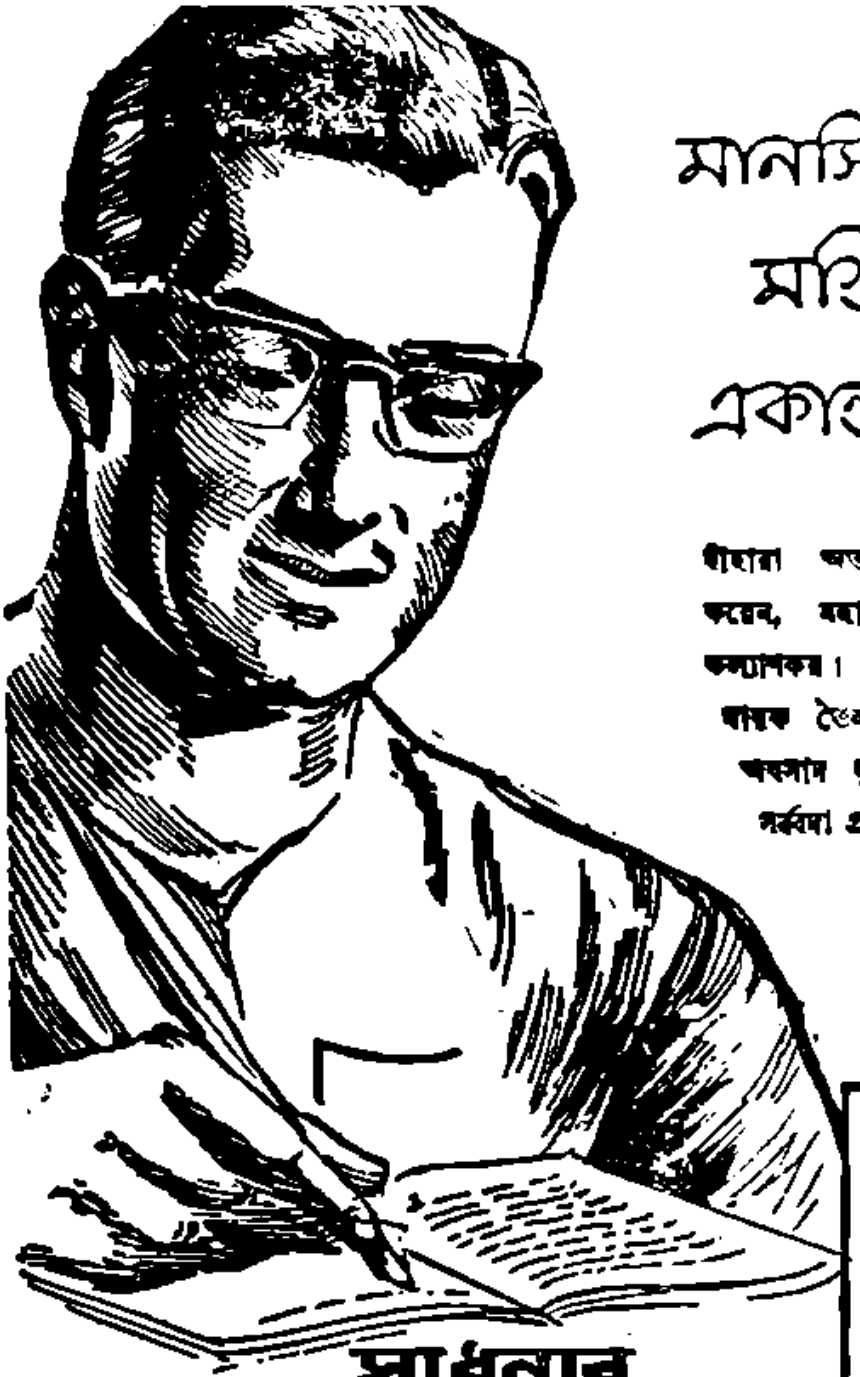

মানসিক পরিশ্রমে মস্তিষ্কের যত্ন একান্ত প্রয়োজন !

যাঁহারা অত্যধিক মানসিক পরিশ্রম করেন, মহাভৃঙ্গরাজ তাঁহাদের পরম কল্যাণকর। এই স্নিগ্ধকর ও আরাম-দায়ক তৈল সর্ব্বপ্রকার ক্লান্তি ও অবসাদ দূর করে, দেহ ও মনকে সর্ব্বদা প্রফুল্ল ও কর্ম্মক্ষম রাখে

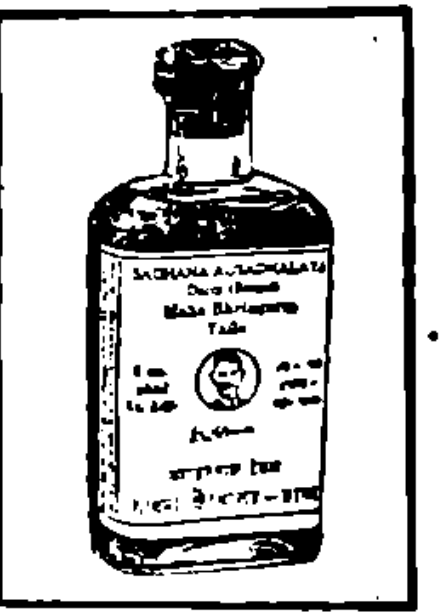

সাধনার
মহা ভৃঙ্গরাজ
তৈল

সাধনা ঔষধালয়-কলিকাতা

সাধনা ঔষধালয় হইতে কবিরাজ ডাঃ

কবিরাজ কেশব – ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ,
এল, এম, এস, (কলিঃ) আয়ুর্বেদাচার্য

অধ্যক্ষ শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ, এম, এ,
আয়ুর্বেদশাস্ত্রী, এফ, সি, এস, (লণ্ডন) এফ, সি, এস (আমেরিকা)
[illegible] এখানে থাকিয়া কৃতকার্য্য অধ্যাপক।

(বাসংশয্যা টান মেরে শুটিয়ে ওয়ার্ড রোবের ওপর ফেলে দেয় তরুণকান্তি)

কনকচাঁপা : আমার এমন ভয় করেছিল ! ডেঙ্গু হলে নাকি চল্লিশঘণ্টাও কাটে না। তাই ··

ক্ষেত্রমোহন : কি জানি ? আজকালই শুনছি। ছোটবেলায় আমাদের কত ডেঙ্গু হয়েছে। এখনও তো টিঁকে আছি। নাকি বাবাজী ?

তরুণকান্তি : হ্যাঁ নিশ্চয়ই। তবে সব ডেঙ্গুই ডেঙ্গু না। (স্ত্রীকে) ডাক্তারবাবু বল্লেন শুনলে না ?

[তরুণকান্তি ও কনকচাঁপা বাদে সবাই মশারীর ভেতর খাটে গিয়ে ওঠে।

তরুণকান্তি ভেঙে পড়ে চোখের মাথায় হাত দিয়ে।]

কনকচাঁপা : কি হলো ? শরীর খারাপ লাগছে ?

তরুণকান্তি : (নাড়ী টিপে) জ্বর জ্বর মনে হচ্ছে।

কনকচাঁপা : কি বলছো ?

তরুণকান্তি : নির্ঘাত ডেঙ্গু।

কনকচাঁপা : হ্যাঁ !!

তরুণকান্তি : হুঁ !

কনকচাঁপা : যাঃ !

তরুণকান্তি : কি ?

কনকচাঁপা : এ ডেঙ্গু সে ডেঙ্গু নয়।

তরুণকান্তি : মানে ?

কনকচাঁপা : দেখো তোমার কিছু হবে না। আমি বলছি তোমায়।

তরুণকান্তি : হবে আবার কি ? এর চাইতে আর কি হবে বলতে চাও ? জানি—মরবো না, তবে সারবেও না।—এই, এই হচ্ছে সেই সাংঘাতিক ডেঙ্গু ডাক্তাররা যেটাকে ঠিক আজও ধরতে পারছে না। অসুখ-বিসুখ কিছু নেই, অথচ···

কনকচাঁপা : ওগো ! তোমার কি খুব কষ্ট হচ্ছে ?

তরুণকান্তি : মাথাটা···

কনকচাঁপা : কি করি এখন !

তরুণকান্তি : আলোটা।

কনকচাঁপা : চোখে লাগছে ? অন্ধকার করে দেবো। (ছুটে গিয়ে সুইচটা টিপে দেয়)

—যবনিকা—

বিখুঁত সুন্দর ব্লকের জন্য

সি গ নে ট
ফটোটাইপ

ডিজাইন
হাফটোন
লাইন ব্লক
কালার ছাপার জন্য
ট্রিরিও
ম্যাট

১২৩বি, রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৪।
ফোন : ৫৫-৬৬৭৯

হারানো আয়না

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

আকাশ অন্ধকার করে বৃষ্টি এল।

এল তো এলই, যাওয়ার আর কোনো লক্ষণই কোথাও নেই। কখনো একটু হাল্কা হয়ে আসে, মনে হয় এইবার থামবে, তারপরেই চারদিক ভেঙে আবার ঝাঁঝের মত ধারায় পড়তে থাকে।

প্রায় ঘণ্টা খানেক একটা বারান্দার নীচে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করলুম। সেখানেও জলের ছাট আসছে, জুতোটা ভিজে একাকার হয়ে গেল। আমার আবার সর্দির ধাত, একটুতেই ঠাণ্ডা লাগে —প্যাচপেচে জুতোটার অনুভূতি এমন বিশ্রীভাবে সারা শরীরে ছড়াতে লাগল যে মনে হল এখুনি বোধ হয় আমার জ্বর আসবে।

যা থাকে কপালে—লাফিয়ে নেমে পড়লুম। খানিকটা ছুটে দেখতে পেলুম ট্রাম ডিপো। সার দিয়ে গাড়ীগুলো দাঁড়িয়ে, ইলেকট্রিকের আলো আর অঝোর বর্ষণে সাদা সাদা ট্রামগুলোকে যেন এক ঝাঁক তিমির মতো মনে হল।

উঠে পড়লুম প্রথম গাড়ীটাতেই। ট্রাম চলবে কিনা জানি না, টালীগঞ্জ ব্রীজের তলায় এর মধ্যেই যে কতটা জল দাঁড়িয়ে গেছে তা-ও অনুমান করা অসম্ভব। তবু বারান্দার চাইতে ট্রাম ভালো। অন্তত বসবার জন্যে নরম গদী আছে, বৃষ্টির ছাট আসবার কোনো সম্ভাবনা নেই, নিশ্চিন্ত ভাবে চলবে না না জানা পর্যন্ত নিশ্চিন্ত হয়ে বসেও থাকা যায়।

ভিজে গিয়েছিলুম—সেটা অপরিহার্য। রুমাল দিয়ে মাথা-টাথা মুছে এক জায়গায় বসে পড়া গেল। দুদিকে জানলা তুলে দেওয়া, কাচের সংকীর্ণ ফাঁকগুলোর ওপর দিয়ে বেশ বক্সা বইছিল।

ড্রাইভারের দেখা নেই, একজন বুড়ো মতন কণ্ডাক্টার বসে বসে ঝিমুচ্ছে। আমার দিকে চোখ তুলে চেয়ে দেখল একবার। বললুম, ট্রাম যাবে?

—যাবে। একটু দেরী হবে। বসুন।

বর্ষাতি গায়ে চড়িয়ে আর একজন অল্প বয়সী কণ্ডাক্টার লাফিয়ে উঠল। দাঁড়ানো বুড়োর পাশে গিয়ে।

—দাদা, কী ভাবছেন?

—দেশের কথা।

বর্ষাতি খুলে রেখে ছেলেটি বুড়োর মুখোমুখি বসে পড়ল।

—ষোলো বছর আগে তো দেশের মায়া কাটিয়েছেন। এখনো ভুলতে পারলেন না?

—সারা জীবনেও কেউ ভুলতে পারে?

—দাদা, ও-সব ভাবনা এখন ছাড়ুন। এখন পশ্চিম বাংলাই আপনার দেশ। এখানকার সবাইকে নিয়েই সুখী হতে চেষ্টা করুন।

—তোর হাওড়া জেলা যদি পাকিস্তানে পড়ত, তা হলে বুঝতে পারতিস—বুড়োর দীর্ঘশ্বাস পড়ল : সেই সুপুরীর বন, ধানের ক্ষেত, ইল্‌শা নদী, ইলিশ মাছ—

নদীর নাম শুনে আমি উৎকর্ণ হলুম। বুড়ো তা হলে আমারই জেলার লোক। মনে পড়ল কালাবেলেরে কালো জল আর ইল্‌শার গৈরিক রঙ মিশেছে একসঙ্গে—দুদিকে তীরের চিহ্ন দেখা যায় কি দেখা যায় না—অফুরন্ত আকাশ আর দিগ্‌দিগন্ত ছড়ানো নদীর কী আশ্চর্য তটভূমি। বাইরের বৃষ্টির শব্দে ইল্‌শা-কালাবেলের মিলিত কলতান আমার কানে এল।

—ইলিশ মাছের কথা আর বলবেন না দাদা—আমি উলুবেড়ের লোক হয়েও আজ তিনমাসের মধ্যে একটা মাছের ঝাঁশ চোখে দেখিনি।

—উলুবেড়ের আবার ইলিশ!—দাদা অনুকম্পায় হাসি হাসলেন।

খোঁচা খেয়ে ছেলেটি একটু উত্তেজিত হল। বললে, পাকিস্তানের জমিদারীর গল্প ছাড়ুন দাদা—শুনে শুনে কান কালাপালা হয়ে গেছে। আমরা তো মেনেই নিয়েছি যে দেশে আপনারা সবাই জমিদার ছিলেন, ক্ষেতভরা ধান ছিল, গোয়ালভরা গোরু ছিল, পুকুরভরা মাছ ছিল—রাজার হালে কাটাতেন। কিন্তু আমাদের এই গরিব দেশে যখন এসেই পড়েছেন, তখন কষ্টে সৃষ্টে এখানেই কাটিয়ে দিন—কী আর করবেন!

—তুই চটে যাচ্ছিস—দাদার হাসিটা মিলিয়ে গেল : না, সবাই আমরা জমিদার ছিলুম না। আমাদের খোড়ো ঘর দিয়ে বৃষ্টির জল পড়ত, চেয়ে-চিন্তে আমাদের দিন কাটত, আমার বাবা রাজমিস্ত্রীর কাজ করত—দু'বেলা পেটের ভাতও জোটাতে পারত না। কাঠা তিনেক জমি, দুখানা খোড়ো ঘর, একটা ডোবা আর তিনটে নারকেল গাছ ছাড়া আর কিছুই আমাদের খোয়া যায় নি।

—তা হলে এখানে অনেক ভালো আছো বলো।—ছেলেটির গলায় বিস্ময়ের সুর পাওয়া গেল।

—ভালো তো নিশ্চয়ই। সেই অল্প বয়েসে পেটের জ্বালায় পালিয়ে এসে যখন কলকাতার ট্রামে চাকরি নিলুম, নিজের থাকা খাওয়ার আর বাড়ীতে দু-দশটা টাকা পাঠানোর সংস্থান যখন হল, তখন ভাবতুম, দেশের পাড়াগাঁয়ে আবার মানুষে থাকে। কতদিন স্বপ্ন দেখেছি, কলকাতায় একটা বাসা করেছি, দেশ থেকে সবাইকে নিয়ে এসেছি—

—সে স্বপ্ন তো ফলেছে দাদা। অবর-সবল জমিতে টিনের চালা তুলেছ, বৃষ্টির জল আর পড়েনা। কষ্ট তো আমাদের আছেই—কিন্তু দু মুঠো পেটের ভাতের জোগাড় একভাবে হয়েই যায়। তা ছাড়া তুমি তো এবার ইন্‌স্পেক্টার হচ্ছ, মাইনে বাড়বে, পজিশন বাড়বে। তোমার কিসের দুঃখ?

—না, দুঃখ কিছুই নেই—দাদা একবার মাথা নাড়ল : হয়তো এই ভাবেই সুখে আছি। দেশে যখন ছিলুম, দেশকে তখন ভালো লাগত না। গ্রামের সব লোকের সঙ্গে তখন আমিও কলকাতার স্বপ্ন দেখতুম, কলকাতায় এসে চোখ জুড়িয়ে যেত। আজ—আজ কী?

দাদা কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল। বাইরে বৃষ্টির আওয়াজ অনেক থামি খেয়ে এসেছে, এবার সত্যি সত্যিই ধরে যাবে বলে মনে হয়। আমি পাশের একটা জানলা খুলে দিলুম। মেঘের একটা কোনায় আকাশ উঁকি দিয়েছে, জ্বলে উঠেছে কয়েকটা তারা।

দাদা বললে, আজ ভাবি, ইল্‌শা নদী আর দেখতে পাব না, আর কোনোদিন রয়ানী গান শুনতে পাবনা, ত্রিনাথের মেলা দেখবনা, সুপুরির বনে আর তেমন করে ঝড় আসবেনা। আসল

কথাটা কী, জানিস? গ্রামের আয়না দিয়ে কলকাতাকে দেখতে গেলুম, জীবনটাকে দেখলুম। সেই আয়নাই গেছে ভেঙে—এখন সব অন্ধকার, নিজেকে আর চিনতে পারছিনা।

আমি চমকে উঠলুম। এ তো কণ্ডাক্টারের মুখের কথা নয়!

দাদা আবার বললে, আমার গ্রাম ছিল, তার মধ্য দিয়ে কলকাতাও ছিল। আজ গ্রাম নেই—কলকাতাও না।

ছেলেটি চুপ করে রইল। বুড়োর কথা সে বুঝতে পারছিল কিনা জানি না, কিন্তু একটা বুঝতে চেষ্টা করছিল। আমি দেখলুম, তার তরুণ মুখের ওপর কিসের একটা ছায়া নেমে এসেছে।

এমন সময় ট্রাম থমটি থেকে হাঁক উঠল: তিনশো এগারো—তিনশো এগারো নম্বর—

ড্রাইভার এগিয়ে এসে নিজের জায়গায় উঠে পড়ল।

ছেলেটি বললে, নাও দাদা চলো এবার। ও নিয়ে মন খারাপ করে আর কী হবে!

—না, কিছুই হবে না। শুধু এই বৃষ্টিটাই কেমন আনমনা করে দিয়েছিল।

ঘণ্টি বাজল, ট্রাম চলল। ছেলেটি তার বর্ষাতি নিয়ে নেবে চলে গেল সেকেণ্ড ক্লাসে।

বাইরে বিদ্যুতের আলোয় চারদিকে ঝলমল করছে বৃষ্টির জল। যেন ইন্দ্রাণী নদী ছলকে উঠছে কিছুক্ষণের জন্যে। সেই জলে হারিয়ে যাওয়া আয়নাটা কয়েক মুহূর্তের জন্যে ফিরে এসেছে আবার, অন্তত একবারের জন্যে চিনিয়ে দিয়েছে নিজেকে।

কিন্তু এ জল আজ রাতেই নেমে যাবে। কাল সকালে এর চিহ্নও থাকবেনা।

আর আপাতত কলকাতার ট্রামের এক বুড়ো কণ্ডাক্টার আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। হাত বাড়িয়ে বলছে: টিকিট?

বিষ হেমলক্ খাওয়ার পরে সক্রেটিস্ ঘরের মধ্যে একটু হাঁটাহাঁটি করছিলেন। মৃত্যু অনিবার্য জেনেও তিনি হাসিমুখে শিষ্যদের বললেন: এইবার পা দুটো ভারি হয়ে আসছে। এর পরে কোমর—তারপরে পেট—তারপরে বুক—তার পরে সব শেষ।

হো—হো করে প্রাণখোলা হাসি হাসলেন তিনি।

অবধারিত মৃত্যুর দ্বারে দাঁড়িয়ে জগতের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক দেখিয়ে গেলেন মৃত্যুর আনন্দ।

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।"

দেবীর অর্ঘ রচনায় অপরিহার্য্য ভীম নাগের সন্দেশ

বিশ্ব-উৎসব

॥ সচিত্র সংযোজন ॥

"মানুষ প্রতিদিন যে ভাবে কাজ করে, এক-একদিন তাহার উল্টোভাবে আপনাকে সারিয়া লইতে চেষ্টা করে। প্রতিদিন উপার্জন করে, একদিন খরচ করে; প্রতিদিন দ্বার রুদ্ধ করিয়া রাখে, একদিন দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দেয়, প্রতিদিন গৃহের মধ্যে আমিই গৃহকর্তা, আর একদিন আমি সকলের সেবায় নিযুক্ত। সেইদিন শুভদিন, আনন্দের দিন, সেই দিনই উৎসব।"

রবীন্দ্রনাথ

বৃক্ষরোপণ উৎসব

বীণাক্ষী ঘোষ

"অয়ি ভূমিসুতা! তুমি জেনেছিলে সবার আহ্বান,
প্রাণের প্রথম জাগরণে, তুমি বৃক্ষ, আদিপ্রাণ,
উৎসবীরে উচ্চারিলে আলোকের প্রথম বন্দনা
ছন্দোহীন পাষাণের বক্ষ-পরে।"

আদিপ্রাণ বৃক্ষের প্রতি সপ্রদ্ধ বন্দনা গান করে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বনবাণী' গ্রন্থের সূচনা করেছেন। 'বনবাণী'র প্রতি পৃষ্ঠার অন্তরালে শোনা যায় যেমনই বীথির মর্মরধ্বনি, তেমনও তা শুনতে পাই উদার বিশাল শালতরুর অভ্রান্ত আন্দোলনের গান।

আমাদের চারপাশের দর্শন ও চিন্তাধারার সঙ্গে প্রকৃতির যোগ চিরকালীন। এই দেশের সৌন্দর্যপ্রাণ ধ্যান-নিমিত্ত ঋষিরা প্রকৃতির উদার উন্মুক্তায় ধ্যানের মর্ম খুঁজে পেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথও বলেছেন "গাছগুলি ঋষীর ধ্যানমন্ত্রের ধ্বনি।"···বৃক্ষের প্রতি আন্তরিক অনুরাগ, শ্রদ্ধা ও মমতাবশতঃই সম্ভবতঃ বৃক্ষরোপণ উৎসবের সূচনা হয়েছিল প্রাচীনতর কালে—যার পরিবর্তিতরূপ এসেছে আজকের বনমহোৎসব।

বর্তমান বনমহোৎসবের মধ্যে রবীন্দ্র পূর্ব ভাবধারার প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়—সমস্ত অনুষ্ঠানটিতে যেন শান্তিনিকেতনের সৌরভ লেগে আছে।

সুন্দর সুসজ্জিত প্রাঙ্গণের নিখুঁত শৌখিন বিন্যাস করছে পূজা অর্চনার মতই শুচিতা। বনবালার বেশে সজ্জিতা বালিকারা মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে নিত্য বৃক্ষটিকে অভিষিক্ত করে রোপণ করছে—অতিথি বালক তাদের ঘিরে চলেছে মধুর সঙ্গীতের গুঞ্জরণ: এই প্রসঙ্গে ইন্দিরা দেবীকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের একটি পত্রের উল্লেখ করা যেতে পারে—যেখানে শান্তিনিকেতনে অনুষ্ঠিত প্রথম বৃক্ষরোপণ উৎসবের কথা বর্ণিত—

"তোমার টবের বকুলগাছটাকে নিয়ে বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠানটা হ'ল। পৃথিবীতে কোন গাছের এমন সৌভাগ্য কল্পনা করতে পার না। সুকণী বালিকারা সুসজ্জিত হ'য়ে শাঁখ বাজাতে বাজাতে গান গাইতে গাইতে গাছের সঙ্গে যজ্ঞক্ষেত্রে এল—শাস্ত্রীমশায় সংস্কৃত শ্লোক আওড়ালেন—আমি একে একে দুটী কবিতা পড়লুম—ধানা-চন্দন দিয়ে ধূপধুনো জ্বালিয়ে তার অভ্যর্থনা হ'ল।···তারপরে বর্ষামঙ্গল গান হ'ল···।"

বৃক্ষরোপণ উৎসব কেবল আমাদের দেশেই প্রচলিত নয়, পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও বহু প্রাচীনকাল থেকে নানাভাবে বৃক্ষবন্দনা ও রোপণ উৎসব অনুষ্ঠিত হ'য়ে আসছে। তার মধ্যে প্রাচীন গ্রীসের Vegetation উৎসব উল্লেখযোগ্য। দ্রাক্ষালতার গুচ্ছ গুচ্ছ ফলন্ত লতাকে ঘিরে এই গান ও আনন্দোৎসব অনুষ্ঠিত হ'ত। ফলভারের প্রাচুর্যকে বন্দনা করে এই উৎসবের সার্থকতা।

ইংল্যাণ্ডের রোম্যান্টিক কাব্য আন্দোলনের পুরোধা ওয়ার্ডসওয়ার্থ তাঁর প্রকৃতি প্রেমিকতার জন্যেই বিশেষরূপে খ্যাত। সে সময়ে বৃক্ষরোপণ উৎসবের কোনো আনুষ্ঠানিক প্রকাশ না থাকলেও ছোট্ট একটি চারা গাছ ও তার প্রথম ফুল ফোটাকে কেন্দ্র করে ওয়ার্ডসওয়ার্থ-এর কাব্যবিকাশের প্রচুর নিদর্শন মেলে। ইয়োরোপের বৃক্ষপ্রীতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ উদাহরণরূপে আলেকজাণ্ডার ডুমার 'দি ব্ল্যাক টিউলিপ' গ্রন্থের কথা সর্বাগ্রে মনে পড়ে

টিউলিপ গাছে ফুল ফোটানোর উৎসবকে সেদিন জাতীয় উৎসবের মর্যাদা প্রদান করা হয়েছিল। এখনও য়ুরোপের কোনো কোনো দেশে বিশেষ একটি দিনে ফুল-দিবস পালিত হ'য়ে থাকে—প্রত্যেক পথচারী সামান্য মূল্যের বিনিময়ে একটি করে পুষ্প ক্রয় করে থাকেন।

ভারতবর্ষে আদিকাল থেকে বৃক্ষবন্দনা ও বৃক্ষরোপণ উৎসব অনুষ্ঠিত হ'য়ে আসছে—বিভিন্ন তার প্রকাশ ভঙ্গী। বাৎস্যায়নের কামসূত্রে নানা বিধ বৃক্ষবরণ, শস্য আহরণ উৎসবের কথা উল্লিখিত আছে। এই প্রসঙ্গে 'নবপত্রিকা' উৎসবের কথা স্মরণীয়।

নব শস্যোদ্গমে প্রথম বর্ষায় যে বনভোজন – তা-ই 'নবপত্রিকা' উৎসব এবং সেই উৎসবের প্রধান অংশ পিচ্‌কারী যোগে তরুশ্রেণীতে জল সিঞ্চন।

এই উৎসবকে বর্তমান বনমহোৎসবের আদিতম রূপ বলা যেতে পারে।

প্রাচীন ভারতে সম্রাট অশোক ও শেরশাহ পথের ধারে ধারে বৃক্ষ রোপণ করতেন—পথচারীদের স্নিগ্ধ শীতল ছায়া দান ও বৃক্ষ-শিশুর সযত্ন বর্ধন—দুই-ই হোতো একসঙ্গে। বর্তমানেও আমাদের দেশের প্রস্তরময় রাজপথের একাংশে মহাসমারোহে বৃক্ষ রোপণ হয়।

কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের ভাষায় 'কোনো অরসিক পথকর্তার চেলা' পাষাণের বুকে বকুলচারা রোপণ করেছে কাননরাণীর শিশুকন্যাকে হরণ ক'রে। কিন্তু এই হরণের অন্তরালে যে সেই শিশু চারাগাছের প্রতি মমতাও আংশিকভাবে জড়িত একথা অবশ্য স্বীকার্য। গাছের প্রতি স্বাভাবিক মমতা আছে বলেই নাগরিক জীবনের উষরতায় সেই শ্যামকান্তির অভিষেক। তা-ই প্রতি বছর সংঘবদ্ধ শ্রান্তীর্ষে বনমহোৎসবের অনুষ্ঠান।

এই বৃক্ষরোপণ উৎসবের মধ্যে আছে এক পবিত্র গাম্ভীর্য। যে গাম্ভীর্য তরুশ্রেণীর সঙ্গে অন্বিত। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"ওই গাছগুলো বিশ্ববীণের একতারা, ওদের মজ্জায় মজ্জায় সরল সুরের কাঁপন, ওদের ডালে ডালে পাতায় পাতায় একতালা ছন্দের নাচন। যদি নিস্তব্ধ হ'য়ে প্রাণ দিয়ে শুনি, তাহলে অন্তরের মধ্যে মুক্তির বাণী এসে লাগে।" প্রথম প্রাণের বেগ নিয়ে এসেছে যে বৃক্ষ তার বরণ উৎসব তাই আনন্দ-উৎসব শুধু নয়—সে প্রাণের মন্ত্রে জীবনের নব অভিষেক।

আজ যে শিশুবৃক্ষ রোপিত হচ্ছে পবিত্র উদার গাম্ভীর্যে, নগরীর কোলাহলময় রুক্ষতায় সে-ই আনাবে প্রাণের নিমন্ত্রণ, পাথরের বুকে আসবে শ্যামলশ্রী। অঙ্কুর থেকে মহীরুহে প্রকাশমান বৃক্ষের মধ্যে যে আদিতম প্রাণস্পন্দন আছে—বৃক্ষরোপণ উৎসব সেই প্রাণের মন্ত্রে সাড়া জাগাবার উৎসব আনন্দে তার জন্ম আনন্দে তার প্রতিষ্ঠা—

"মরুবিজয়ের কেতন উড়াও শূন্যে
হে প্রবল প্রাণ।
ঘুলিয়ে ধ্বস করো করুণার পুণ্যে
হে কোমল প্রাণ।
মৌনী মাটির মর্মের গান কবে
উঠিবে ধ্বনিয়া মর্মর তব রবে,
মাধুরী ভরিবে ফুলে ফলে পল্লবে
হে মোহন প্রাণ।"

বহ্ন্যুৎসব

নীলিমা দে

কালো পটে লাল রং দিয়ে কে যেন ক্ষিপ্র হাতে এঁকে চলেছে ছবি। অন্ধকার টিলা, উঁচু চিবি, পাহাড়ের চূড়া, আর মাঠের মাঝখানে জ্বলে উঠেছে আগুন, লেলিহান শিখা মেলে গ্রাস করতে চায় বুঝি আকাশের তারা। দাবানল নয়, আগ্নেয়ার আলোও নয়। য়ুরোপের গ্রাম অঞ্চলের লোকেরা বহ্ন্যুৎসব উদ্‌যাপন করছে। এই দৃশ্য সব চেয়ে বেশি চোখে পড়ে বসন্তকাল আর মধ্য গ্রীষ্মে। তবে শরতের শেষে আর শীতের মাঝামাঝি সময়েও দেখা যায়। বসন্তকালের বহ্ন্যুৎসব হয় সাধারণত লেন্ট-এর রবিবার, ইষ্টার ইভ এবং মে দিবসে। য়ুরোপের সাধারণ মানুষ, বিশেষ ক'রে কৃষকদের মধ্যে এই উৎসব চ'লে আসছে খ্রীস্টধর্মের জন্মেরও আগে থেকে।

প্রাচীন পৃথিবীর মানুষ আগুনকে দেবতা ব'লেই মনে করত। মিশরবাসীর কাছে আগুন ছিল সূর্য-দেবতার প্রতিভূ। মিশর, গ্রীস আর রোমের মন্দিরে প্রজ্বলিত থাকত অগ্নি। বৈদিক আর্যদের কাছে আগুন ছিল একাধারে দেবতা এবং গৃহের অতিথি। সুদূরকাল থেকে পৃথিবীর নানা দেশে এমন অনেক উৎসব চ'লে এসেছে যে সব অনুষ্ঠানের প্রধান ভূমিকা অগ্নির।

বহ্ন্যুৎসবের উদ্দেশ্য প্রায় সব অঞ্চলেই এক। প্রচুর পরিমাণে ফুল-ফল, শস্য উৎপন্ন হোক, নিরাপদ হোক মানুষ এবং গৃহপালিত পশু —অগ্নি উৎসবের মধ্যে লুকিয়ে আছে এই লৌকিক প্রার্থনা। আবার ঝড়, বৃষ্টি, শিলাপাত, বজ্র, কীট-পতঙ্গ, আধি-ব্যাধি, ডাইনী ইত্যাদি অশুভ শক্তির হাত থেকে মানুষ, পশু আর শস্য যাতে নিরাপদ হতে পারে তার জন্যও অগ্নি-উৎসবের আয়োজন।

য়ুরোপের বহ্ন্যুৎসব : আঞ্চলিক পার্থক্য সত্ত্বেও, য়ুরোপের বিভিন্ন দেশে অনুষ্ঠিত বহ্ন্যুৎসবগুলির কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। ছেলে-বুড়ো, মেয়ে-পুরুষ সবাই ঘুরে ঘুরে নাচে আগুনের চারধারে কিংবা লাফ দিয়ে পেরিয়ে যায় আগুন। আগুনের চারদিকে বা মাঝখানে দিয়ে চালনা করা হয় গবাদি পশু। কৃষকরা জ্বলন্ত মশাল হাতে প্রদক্ষিণ করে মাঠে ক্ষেত, খামার, গোশালা আর বাগান। তারা খুন্তে নিক্ষেপ করে কিংবা পাহাড় থেকে গড়িয়ে দেয় জ্বলন্ত চাকা। খড়ের মানুষ কিংবা "ডাইনী" পোড়ানোও হয় অনেক এলাকায়।

বেলজিয়মের কৃষক-শিশুরা বহ্ন্যুৎসবের প্রায় পঞ্চকাল আগে থেকেই খামার থেকে খামারে ঘুরে সংগ্রহ করে জ্বালানি কাঠ। কেউ যদি উৎসবের কাঠ দিতে অস্বীকার করে তবে উৎসবের পর দিন শিশুদের সামনে পড়লে তার দুর্দশার সীমা থাকে না। শিশুরা দল বেঁধে তাকে তাড়া করে, উৎসবের আগুনের ছাই দিয়ে কালো করে দেয় তার মুখ। উৎসবের দিনে শিশুরা সব ঝোপ-ঝাড়, বিশেষ করে জুনিপার আর ঝাঁটা-ঝোপ কেটে-ছুটে সাফ করে ফেলে। নদীর জল জমে বরফ হয়ে গেলে বরফের ওপরই জ্বালানো হয় উৎসবের আগুন।

ফ্রান্সের কয়েকটি জেলায় বহ্ন্যুৎসবের আগুন জ্বালাবার প্রথম সুযোগ পায় সেই ছেলে কিংবা মেয়ে যার বিয়ে হয়েছে গ্রামের মধ্যে সবার শেষে। কৃষকরা বিশ্বাস করে উৎসবের সময় নাচ যত ভালো হবে ততই ভালো হবে শস্য। গ্রামের ছেলেরা রাস্তা দিয়ে গাড়ি টেনে নিয়ে যায়, থামে কেবল সেই সব বাড়ির সামনে যে সব বাড়িতে মেয়ে আছে। ছেলেরা উৎসবের কাঠ ভিক্ষে ক'রে আনে সেই সব বাড়ি থেকে। কয়েকটি জায়গায় তরুণ-তরুণীদের মধ্যে প্রতিযোগিতা লেগে যায় কে কত নিপুণভাবে অগ্নি-শিখা লাফ দিয়ে পেরিয়ে যেতে পারে সেই চেষ্টায়। যার জামা-কাপড় একটুও পুড়ে যাবে না, অথচ লাফ দিয়ে অগ্নি-হ্রদ পেরিয়ে যেতে পারবে

তার নাকি এক বছরের মধ্যেই বিয়ে হয়ে যাবে। দক্ষিণ ফ্রান্সে একটা লম্বা গাছের কাণ্ড ফাঁপা করে তার মধ্যে জ্বালানী কাঠ, খড় ইত্যাদি পুরে দেওয়া হয়। গাছের ডগায় ঝুলিয়ে দেয়া হয় ফুলের মালা। গাছে আগুন দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের সদ্য বিবাহিত যুবক সই বেয়ে উঠে গাছ থেকে নামিয়ে আনে ফুলের মালা।

লোহাবিদ্যাতে ছেলে-মেয়েরা হাত ধরাধরি করে লাফ দিয়ে যায় আগুনের ওপর দিয়ে। সেখানে অবশ্য বহ্ন্যুৎসব হয় মধ্য গ্রীষ্মে। বোহেমিয়ার লোকেরা বিশ্বাস করে মধ্যগ্রীষ্মের সন্ধ্যাবেলা যে মেয়ে পর পর ন'টি বহ্ন্যুৎসব নিজের চোখে দেখবে সেই মেয়ের বিয়ে হবে বছর ঘুরতে না ঘুরতে। বহ্ন্যুৎসবের এমনি সব বিচিত্র আঞ্চলিক রীতি প্রচলিত রয়েছে ফ্রান্স, জার্মানী, স্পেন, ইতালী, সিসিলী, অষ্ট্রিয়া, বেলজিয়ম, স্কটল্যাণ্ড, ওয়েলস, সুইজারল্যাণ্ড, ডেনমার্ক, নরওয়ে, হাঙ্গারী, সুইডেন ইত্যাদি নানা দেশে। য়ুরোপের আকাশ বেশিরভাগ সময়েই ঢাকা থাকে মেঘে। সেই ধূসর পরিবেশে বর্ণ আর তাপ সঞ্চারের জন্যই বোধ হয় রাতের অন্ধকারে য়ুরোপের লোকেরা জ্বালে উৎসবের আগুন।

আফ্রিকার বহ্ন্যুৎসব : উত্তর আফ্রিকার মরক্কো এবং আলজেরিয়াতে মিডসামার ডে বা মিডসামার ইভ উপলক্ষ্যে মুসলমানরা বহ্ন্যুৎসব উদ্‌যাপন করে। বাড়ির উঠোনে, রাস্তার মোড়ে, ক্ষেতে কিংবা শস্য ঝাড়বার ঘরের মেঝেতে জ্বালানো হয় আগুন। যে সব গাছ পোড়ালে ঘন ধোঁয়া বেরোয় কিংবা বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে সুগন্ধ, উৎসব উপলক্ষ্যে সেই সব গাছ বেছে বেছে জড়ো করে তাতে আগুন দেয়। লক্ষ্য রাখা হয় যাতে সেই ধোঁয়া শস্যের ক্ষেত আর ফলের বাগানের দিকে যায়। এখানেও আছে লাফ দিয়ে আগুন পেরিয়ে যাবার রীতি। আরোগ্যলাভের আশায় বিশ্বাসী রোগীরা এসে বসে আগুনের ধারে। উৎসবের আগুন নিভে গেলে অনেক মরক্কোবাসী চুলে ছাই মাখে এই বিশ্বাসে যে তাহলে কখনো মাথায় টাক পড়বে না। এখানকার লোকেরও বিশ্বাস অগ্নি-উৎসব পালন করলে বৃদ্ধি পায় মানুষ, পশু, ফল আর শস্য। তবে এরা আগুনের চাইতে আগুনের ধোঁয়ার শক্তিতেই বেশি বিশ্বাসী।

ভারতের বহ্ন্যুৎসব : শুধু য়ুরোপ বা আফ্রিকাতে নয় এশিয়ার নানা দেশে, বিশেষ করে ভারতে বহ্ন্যুৎসবের প্রচলন রয়েছে। ভারতের অনেক অঞ্চলে হোলি উৎসবের ঠিক আগের সন্ধ্যায় উদ্‌যাপিত হয় বহ্ন্যুৎসব। এই উপলক্ষ্যে অনেক জায়গায় খড়কুটো দিয়ে তৈরি করা হয় 'বুড়ির ঘর।' বাড়ির মেয়েরা পিটুলি দিয়ে বুড়ির মূর্তি তৈরি করে তা রেখে দেয় ওই কুঁড়ে ঘরে। তারপর ওই ঘরে ধরিয়ে দেয়া হয় আগুন। এই ভাবেই পোড়ানো হয় 'হোলিকা'কে। পুড়ে ছাই হয়ে যায় সব অশুভ শক্তি।

পঞ্জাবে জানুয়ারী মাসে লোহ্রি উৎসব হয়। সেই উপলক্ষ্যে ছোট-ছোট ছেলে-মেয়েরা দুয়ারে-দুয়ারে ঘুরে চাঁদা আদায় করে। সেই পয়লার সন্ধ্যাবেলা উদ্‌যাপিত হয় বহ্ন্যুৎসব। পবিত্র আগুনের চারদিকে সমবেত শিখ নর-নারী আগুনে নিক্ষেপ করে মিষ্টান্ন ইত্যাদি খাবার। কয়েকজন পরিবেশন করে জনপ্রিয় লৌকিক গানগুলি। সমবেত সকলে শুভেচ্ছা বিনিময় করে পরস্পরের সঙ্গে।

জীবনীশক্তির প্রবলতার প্রকাশ আনন্দ। আনন্দ প্রকাশের অন্যতম পথ বিভিন্ন জাতির বিচিত্র উৎসব। বহ্ন্যুৎসব বহু উৎসবের মধ্যে আবার বিশিষ্ট। এর বর্ণাঢ্য রূপ, উত্তেজনা, কোলাহল মানুষের মনের উল্লাসেরই প্রতীক। কিন্তু দুঃখের বিষয় নাগরিক সভ্যতা বিস্তারের জন্যই হোক, কিংবা মানুষের মনের আনন্দ কমে যাওয়ার জন্যই হোক, বহ্ন্যুৎসব উদ্‌যাপনের রীতি ধীরে ধীরে উঠে যাচ্ছে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে, কিংবা সীমাবদ্ধ হয়ে থাকছে নিতান্তই পণ্ডগ্রামের মধ্যে।

বর্ণ উৎসব

নীলাদ্রি সোম

আকাশের ইন্দ্রধনু থেকে ধরণীর প্রজাপতিটির পাখা—সকলেই যেন কথা বলছে রঙের ভাষায়। বর্ণের মধ্য দিয়ে ধ্বনিত হয় সুন্দরের অমৃতনিস্যন্দী বাণী। প্রকৃতির রাজ্যে বর্ণের বৈচিত্র্য সব চেয়ে বেশি আলো আর ফুলে। সুন্দরের উপাসক মানুষ। তার সৌন্দর্যের উপাসনা বিশেষরূপে দেখা যায় নানা উৎসবের ভেতর দিয়ে। তাই তো উৎসব প্রাঙ্গণ সাজায় সে লতা-পাতা, ফুলে-ফলে, আলোক-মালায়। বছরের বিশেষ ক'য়েকটি দিনে রং বেরঙের পোশাক পরে পথে বেরোয় শিশু-বৃদ্ধ, মেয়ে-পুরুষ, সবাই। তাই তো কোনো-কোনো উৎসবে মানুষ প্রীতি বিনিময় করে একজন আরেকজনের দেহে রং মেখে, রং দিয়ে পরস্পরকে ভিজিয়ে দেয়। রং, ফুল, কি আলো নেই—এমন উৎসবের কথা যেন কল্পনাও করা যায় না। উৎসব কখনো নিরাভরণ হতে পারে না।

শহরের অধিবাসীদের চাইতে গ্রামের লোকেরা, বিশেষ করে আদিবাসীরা প্রকৃতির অনেক কাছাকাছি। তাই উৎসবে ফুলের ব্যবহার তাদের মধ্যেই সব চাইতে বেশি। প্রকৃতির দুলাল-দুলালী সাঁওতাল যুবক-যুবতীরা শুধু তাদের উৎসবের গানে নয়, চলতি গানেও ফুলের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। সাঁওতাল তরুণীরা খোঁপায় পরে ফুলের মালা, কানে গোঁজে ফুলের ঝুমকো। সাঁওতালরা ফাল্গুন মাসকে বলে 'বাহাবঙ্গা' বা ফুলের মাস। যারা আরণ্য বা পাহাড়ী পরিবেশে মানুষ তারা রং বেরঙের পোশাক পরতেও ভালবাসে সবচেয়ে বেশি। নেফা-অঞ্চলের অধিবাসীরা উৎসব উপলক্ষ্যে পরে বহু বর্ণের পরিচ্ছদ। তাম্রবর্ণ মোহানার ধারে যারা বাস ক'রে সেই চৌধরী আদিবাসীদের বিবাহ উৎসবে সন্ধ্যাসমাগমে বধূকে বিবাহবাসরে নিয়ে যাওয়া হয় পুষ্পস্তবকে সজ্জিত ক'রে। আমাদের দোল উৎসবের এক নামই হল ফুল-দোল। ফ্রান্সের কার্নিভাল উৎসবে ফুলের প্রাচুর্য দেখার মতো।

সিংহলীদের শ্রেষ্ঠ উৎসব 'পেরহারা'। এতে ফুল আর লতাপাতা দিয়ে সাজানো হয় বৃক্ষদণ্ড (আষাঢ় গাছ)। সৌন্দর্যের আর আনন্দের মূর্ত প্রতীক ফুল। ফুলের ভাষা সার্বজনীন। তাই পৃথিবীর প্রতি দেশের প্রায় উৎসবের প্রাঙ্গণই পুষ্প-প্রাচুর্যে উজ্জ্বল।

"জানেনা কেন——কে দিয়েছে তাদের আলোর ফুলের সমান করে ফুটিবে, অন্ধকার রাতে এমনিভাবে চেয়ে আছে আমার দিকে লক্ষ কোটী তারার প্রদীপ। ……ঘরের প্রদীপ সে জানে শুধু রহস্য——" লিখেছেন অবনীন্দ্রনাথ। পূজো-পার্বণে, কি অন্যান্য উৎসবে প্রদীপ ছাড়া আমাদের চলে না। দেবালয়ে স্ফটিক দীপ জ্বালিয়ে দেবতাকে আহ্বান করে ভারতবাসী। আর উৎসবের দিনে তো কথাই নেই।

ভারতের অন্যতম প্রাচীন উৎসব দীপান্বিতা বা দেওয়ালি। এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয় ভারতের প্রায় সর্বত্র। দীপালি উৎসবের সন্ধ্যায় আলোকসজ্জিত পর্ণকুটিরগুলিও মনে হয় একটি আলোর স্বপ্ন-দ্বীপ, অন্ধকারের সমুদ্রে ভাসছে। একান্ত নাস্তিকদেরও ভালো লাগে সে দিকে তাকিয়ে থাকতে। ভাগ্যলক্ষ্মীর বর পাবার আশায় ধনী-দরিদ্র সবাই নিজের নিজের সাধ্য মতো ঘরে ঘরে জ্বালে মাটির প্রদীপ, মোমবাতি, কিংবা নানা রঙের ইলেকট্রিক বাল্‌ব। বাংলার দীপান্বিতা-ই এখন বাংলার বাইরে দেওয়ালির রূপ নিয়ে পরিণত হয়েছে আলো আর বাজির উৎসবে। আমাদের দেশে সারাটা কার্তিকমাস ধ'রে জ্বালানো হয় আকাশ প্রদীপ।

সিংহলের কার্তি উৎসব হিন্দু দীপাবলীরই একটি সংস্করণ। পেরহেরা উৎসব উপলক্ষ্যে সিংহলীরা রাতে শোভাযাত্রা ক'রে পথে বেরোয় মশাল হাতে নিয়ে।

এশিয়ার অন্য কয়েকটি দেশেও দেওয়ালি ধরণের আলোক-উৎসবের প্রচলন আছে। জাপানীরা উদযাপন করে 'লণ্ঠন উৎসব'। জাপানীদের বিশ্বাস ওই উৎসবের রাতে তাদের মৃত পূর্বপুরুষদের আত্মা ফিরে আসেন যে যার বাড়িতে। উত্তর-পুরুষদের কাছ থেকে তারা আশা করেন শ্রদ্ধা আর এরা তাদের করেন আশীর্বাদ। সুন্দর-সুন্দর বাজি তৈরির ব্যাপারেও জাপানীদের বেশ নাম আছে। উৎসবের রাতে বিরাট আর উজ্জ্বল জাপানী হাতপাখা উঠে যায় নীল আকাশের আঁধার চিরে। সঙ্গে সঙ্গে চলে বাজি পোড়ানো। কানে তালা লাগার উপক্রম হয় পটকা ফাটার শব্দে।

নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে অনুষ্ঠিত হয় 'কান-হাবুন' উৎসব। উৎসবের রাতে চারদিকে ছোট-ছোট কাঠির মাথায় কাঁচা ডাবের খোলার মধ্যে নারকেল তেল কিংবা শুয়োরের চর্বির আলো মিটমিট করে জ্বলে। রাত খুব অন্ধকার হ'লে নাচের আঙিনা আলোকিত হ'য়ে ওঠে সারি-সারি নারকেল-খোলের লেলিহান শিখায়।

আন্তর্জাতিক নৌকা প্রদর্শনী উপলক্ষ্যে প্যারিসের সেইন নদীর ধারে ক'য়েক বৎসর ধ'রে চ'লে আসছে আন্তর্জাতিক বাজি পোড়ানোর উৎসব। এতে যোগদান করে 'মোমবাতির রাজ' বিশেষজ্ঞ জার্মানী, রং মশাল বিশেষজ্ঞ বেলজিয়াম, আলোকিত উই ওমিল তৈরিতে দক্ষ হল্যাণ্ড, জলপ্রপাত বিশেষজ্ঞ ফ্রান্স। তাছাড়া স্পেন, ইটালি, এমন কি দূর প্রাচ্যের জাপানও এই উৎসবে অংশ গ্রহণ করে।

পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপ-পুঞ্জের তরুণীরা নাচের উৎসবে যাবার আগে মণি-মুক্তার পরিবর্তে তাদের পোশাক আর চুলে জোনাকি ব্যবহার করে। বিশেষ বিশেষ উৎসবে অসংখ্য জোনাকি ধরে তা-ই দিয়ে ঘোড়াগুলিও সাজানো হয়। তারপর রাতে অন্ধকারে যখন শোভাযাত্রা বেরোয় মনে হয় অনেকগুলি আলো যেন এক সঙ্গে পথ দিয়ে চলেছে।

মুসলমানদের মধ্যেও আলোক-উৎসবের প্রচলন আছে। তাদের শবে-বরাত বা 'ভাগ্যের রাত্রি'-তে ছাদে আর দুয়ারের পাশে অতিরিক্ত আলো জ্বালানো হয়। মুসলমানদের বিশ্বাস এই 'ভাগ্য নিরূপণ'-এর রাত্রিতে আল্লাহ্-তালা মানুষের সারা বছরের ভাগ্য-লিপি ঠিক ক'রে দেন।

ভারতের সর্বপ্রধান বর্ণ উৎসব হোলি। বাণভট্টের 'হর্ষ-চরিত' থেকে জানা যায় যে সেকালের বসন্তোৎসবে রং খেলা হত। আবির আর পিচকিরি এই দুই-ই চলে হোলি উৎসবে। বাংলা দেশে দোল উৎসবে শ্রীকৃষ্ণকে দোলায় বসাবার বদলে নানা রকম রং ব্যবহার করা হয়। বোধ হয় ভারতের অন্যান্য প্রদেশের হোলির অনুকরণেই দেখা দিয়েছে রং ব্যবহারের এই বাহুল্য।

ফ্রান্সে প্রতি বৎসর শিল্পীদের যে উৎসব হয় তাতে নিজেদের হাতে তৈরি সুন্দর সব রথ নিয়ে রং মেখে সং সেজে পথে বেরোয় ছাত্র-ছাত্রীরা। জুলাই মাসে যে উৎসব হয় তাতে নিজের খুশিমতো রং মেখে পথে ঘুরে বেড়ায় তরুণ চিত্র শিল্পীর দল। আলেকজাণ্ডার, ক্লিওপেট্রা ইত্যাদি ঐতিহাসিক নানা চরিত্রের ভূমিকায়।

অন্যদিনে যেমনটি থাকুক, উৎসবের দিনে মানুষ স্বতন্ত্র। আর এই স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টিতে, মানুষের মনের আনন্দ বাইরে প্রকাশ করতে সাহায্য ক'রে আসছে আলো, রং আর ফুল। প্রকৃতির রাজ্যেও তো যে মুহূর্তে পাতায় পাতায় সঞ্চারিত হয় বোধনের বার্তা; বনের পলাশ রক্তপ্রদীপে সাজায় আরতিপাত্র, প্রচুর পরাগ আর রক্তিমরাগে প্রস্তুত হ'য়ে ওঠে দাড়িম্ববন।

ভারতের উৎসব

হিরণ্ময়ী বসু

ভারতবর্ষ উৎসবের দেশ। সেই প্রাচীন যুগ থেকে আরম্ভ করে আধুনিক যুগ পর্যন্ত উৎসবের অভিনবত্ব যেন জাতির প্রাণশক্তিকেই নবীন করে তুলছে। বৈশাখ থেকে সুরু করে চৈত্র পর্যন্ত বারো মাসে তের পার্বণ তো এদেশের চলতি কথা। কার্তিকী অমাবস্যার রাত্রে দীপদান উৎসব ভারতের কোন প্রাদেশিক উৎসব নয়। সূর্য তখন যান তুলারাশিতে; আর ঐ দিন শেষ রাত্রে জৈনগুরু মহাবীরের নির্বাণলাভও হয়েছিল। কাজেই এই উৎসবটি শুধু হিন্দুর উৎসব নয়—জৈনদেরও উৎসব।

"সাজাও আলো—সাজাও আলো—জ্বালাও আলো দীপালিতে"—ঘরে ঘরে এই ডাক এসে পৌঁছয় আর ধরণী সেজে ওঠে আলোর মালা প'রে। আগুন নিয়ে খেলা হয় মানুষের—আগুনের রূপের যেন প্রদর্শনী সুরু হয়। কালিপূজাকে কেন্দ্র করে এবং মহাবীরের নির্বাণোৎসবে সারা নগরীতে দীপদানকে উপলক্ষ্য করে সারা ভারত যেন আপন প্রাণের দুঃসাহসিকতাকেই আগুনের প্রতীকে ঘরে ঘরে অনুভব করে।

ভারতের আর একটি উৎসব নবান্ন। প্রসঙ্গত বলা যায় যে ভারতের সমস্ত উৎসবই ধর্মমূলক। শুধু ভারতের কেন—পৃথিবীর সর্বদেশের সর্ব উৎসবই মূলতঃ ধর্মকে কেন্দ্র করেই উৎসারিত। ধর্মেই তো মানুষ মুক্তি খুঁজেছে চিরকাল—পেয়েছে অভয় আশ্রয়। সভ্যতার বিবর্তনে এই ধর্ম যে কতদূর প্রভাবশালী তা আজ আর আমাদের চোখে পড়ে না সত্যি কিন্তু এর চেয়ে বড়ো সত্যিও আর কিছু নেই। পৃথিবীর অভ্যন্তরে আগুন আছে ব'লেই পৃথিবীর বহিরঙ্গে এত রঙময় প্রাণের উত্তাপ। নবান্ন উৎসবেও আমরা একটি মৌল সত্যকে আবিষ্কার করতে পারি। আমাদের কোনো উৎসবই জীবনের কোনো অঙ্গকে অস্বীকার করে না—এমনকি মৃত্যুকেও সে অস্বীকার করে না। তাই নবান্নে বছরের প্রথম ফসল ধরে দেওয়া হয় প্রথমে তাঁদেরই উদ্দেশ্যে যাঁরা ছিলেন আমাদেরই পরম প্রিয়। সুগন্ধি আতপচাল, নতুন গুড় আর নারকেলের সংমিশ্রণে উপাদেয় খাদ্য প্রস্তুত, ঘরে ঘরে চলে পার্বণ। বাংলাদেশে ঐ দিন ধানের মরাইয়ের চারপাশে আলপনা এঁকে সারারাত ধরে গৃহলক্ষ্মীরা জেগে থেকে গান করেন—উৎসবে উৎসবে তাঁদের জীবনে একটি নূতন স্বর্গ রচনা করেন।

মানুষ জীবনে চায় সিদ্ধি—চায় সফলতা। এই সফলতা আসে সাধারণের ধূলিময় পথে—গণেশ তাই গণজনের দেবতা। গণেশপূজা একটি সর্বভারতীয় উৎসব। রক্তবর্ণ, পঞ্চমুণ্ড এই দেবতা—ইঁদুর-বাহন। মায়ের গায়ের ঘাম কুমকুম থেকে জাত এই সন্তানটি শনির দৃষ্টিতে মুণ্ড হারিয়ে হাতীর মুণ্ড স্কন্ধে ধারণ করেছেন। কিন্তু ইনিই সর্বসিদ্ধিদাতা, সমস্ত সাফল্যের কারক ইনিই। তাই যে কোনো কার্য্যারম্ভের পূর্বেই গণেশের পূজা। প্রাণের স্তরে এঁর আবাহন—জীবিকা এঁর প্রসাদ।

কিন্তু জ্ঞানের পথে আসেন সরস্বতী। এই সরস্বতী পূজাও একটি সর্বভারতীয় উৎসব। এঁর বাহন হংস—হস্তে বীণা। সর্বশুক্লা সরস্বতী—মাল্য চন্দন বসন ভূষণ—সমস্তই শ্বেতবর্ণ। জ্ঞানও শুভ্র এবং অচঞ্চল। সরস্বতী যেন আমাদের আপনার লোক। ছোট্ট ছেলেও স্বচ্ছন্দে এঁর চরণোপান্তের হাঁসের গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে পারে এবং দেবী তাতে সহাস কটাক্ষে সমর্থন করেন। জ্ঞানের রাজ্যই যে নির্ভেদের রাজ্য। সরস্বতী পূজো আসমুদ্র হিমাচলের উৎসব।

কতগুলি পূজোর উৎসব আছে যাতে প্রাদেশিকতার অনুরঞ্জন অধিক। অবশ্য প্রাদেশিকতা শব্দটি এস্থলে

নিস্বার্থে প্রযুক্ত নয়। বাংলাদেশে দুর্গাপূজা এবং পশ্চিমে হনুমান পূজা এর নিদর্শন। বাংলা দেশে তো দুর্গাপূজার চেয়ে বড় উৎসব আর নেই-ই। এখন এই দুর্গাপূজা শুধু শক্তির পূজাই নয়—সারস্বত সাধনারও সবচেয়ে বড় প্রেরণা। বাংলার সারস্বত সমাজ এই পূজাকে উপলক্ষ্য করেই তাঁদের সাধনার ফল ঢেলে দেন মাতৃচরণে।

আমি আজ বর্তমান কালে প্রচলিত উৎসবের কথা ছাড়াও আর কয়েকটি উৎসবের বিষয়ে একটু বলবো। এগুলি জাতীয় উৎসব নয় বটে কিন্তু সমাজজীবনের অঙ্গীভূত হ'য়ে যে ভাবে ব্যাপকতা লাভ করেছিল তাতে তাদের গুরুত্ব কিছু কম ছিল না।

পূর্বে দীপান্বিতা উৎসবের কথা বলা হয়েছে। এই উৎসবের প্রাচীন নাম ছিল যক্ষরাত্রি বা সুখরাত্রি।

কৌমুদীজাগরও আর একটি উৎসব ছিল। কৌমুদীজাগর উৎসবটি বরং পূর্ণিমায় অনুষ্ঠিত হত। মদন ত্রয়োদশীতে হতো সুবাসক উৎসব।

বসন্তে যখন আমের মুকুলের সৌরভে চারিদিক আমোদিত হয়ে উঠত তখন হত সহকার ভক্তিকা উৎসব। আম্রবনে দল বেঁধে গিয়ে মুকুলভঙ্গ, কাড়াকাড়ি করে খাওয়া বা লোফালুফি করা ছিল এ উৎসবের প্রধান অঙ্গ। এই উৎসবগুলির একটি ব্যাপার লক্ষণীয়। ধর্মের সঙ্গে এগুলির সাক্ষাৎ সম্পর্ক প্রত্যক্ষ নয়। এগুলিকে বরঞ্চ আদিম উৎসবপ্রবৃত্তির ঋতু উৎসবের পরিণতিরূপে গণনা করা যেতে পারে।

শীতের মুখে যখন উঠত নতুন ছোলা তখন ক্ষেতে আগুন লাগিয়ে গাছশুদ্ধ ছোলা মটর পুড়িয়ে খাওয়া হত —এর নাম ছিল অভ্যাবধাদিকা। এমনি আর একটি উৎসব ছিল—বিদগ্ধাদিকা। দীঘিতে নেমে দল বেঁধে পদ্মের মৃণাল তুলে নানা কৌশলে সদলে বনভোজন। বর্ষায় ছিল নবপত্রিকা উৎসব— এটি ছিল বনভোজন বিশেষ।

বসন্তে হোলির উৎসবকে আমরা জানি। আলোর উৎসব যেমন দীপান্বিতা—জলের উৎসব তেমনি হোলি—তবে রঙিন জল আর শুকনো রঙিন আবীর। এটিকে বর্ষোৎসব বলা যেতে পারে। বসন্তের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে যখন মানুষের মনে জীবনসম্ভোগের বাসনা জেগে ওঠে—যখন ইচ্ছে হয় একটু রঙ লাগিয়ে দিতে মনে আর দেহে—তখনই হয় হোলির উৎসব। এটি এখন ধর্মের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে গেছে। কিন্তু আগে এর নাম ছিল উদকক্ষেড়িকা। অবশ্য হোলি নামটি অনেক সুন্দর আর মধুর। এই উৎসবের প্রাচীন নাম ছিল হোলাকা। দোলা উৎসবের নাম ছিল একপাদ্মলী। নাগরিকেরা ফুলে ফুলে দেহ সাজিয়ে একটি বড় শাল্মলীবৃক্ষকেও ফুলে ফুলে সাজিয়ে দিত তারপর হত দোলায় আমোদ। আলোক চতুর্থী নামে আর একটি উৎসব ছিল এই দোল খাওয়ার উৎসব। শ্রাবণ মাসের শুক্লা তৃতীয়াতেও ছিল এই দোল খাওয়ার আর একটি উৎসব। মাটিতে থেকেও আকাশের স্বাদ গ্রহণ করার সুখ যেন মানুষ এতে পেত।

বৈশাখ মাসে শুক্লা চতুর্থীর দিন হত যব চতুর্থীর উৎসব। তখন সুগন্ধি যবের গুড়ো ছড়িয়ে দিত নাগরিক—ছুঁড়ে দিত একে অন্যের গায়ে। আষাঢ়ের নবমেঘসঞ্চারে আকাশ আবৃত হলে যখন নীলবনে কদম্ব ফুটে উঠত তখন দলে দলে সহর ছেড়ে লোকে যেত উপান্তের বনে বনে—কদম ফুল নিয়ে ছোড়াছুড়ি হত। এর নাম ছিল কদম্বযুদ্ধ।

ফুলের উৎসবই কত ছিল। মৌদ্রালোকিত এই দেশে ঋতুতে ঋতুতে ফুলের সাজি ভরে ওঠে—মানুষের মনোভূমিতে ফুল ফুটে ওঠে নানা রঙের বাসনায়। পুষ্পাবচারিকা বলে যে উৎসবটি ছিল—তাতে প্রতিযোগিতার সঙ্গে লোকে ফুল কুড়োতো। এ যেন বিলেতের বনে গিয়ে স্ট্রবেরি কুড়োবার খেলা।

ভারত উৎসবের দেশ। দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক ও জাতীয় জীবনের উৎসবও যোগ দিয়ে এ দেশে যেন উৎসবের ফোয়ারা ছুটতো। মুঠো মুঠো আনন্দের অবাধ মুক্তি জীবনকে ভরিয়ে তুলতো—চরিতার্থ করত, নিয়ে যেত সকল বেদনার অতীত এক লোকে। হোক সে সাময়িক—তবু তাতে থাকত চিরন্তনতার অঙ্গীকার।

প্রথম সূর্যোদয়ের দেশ জাপান

হরপ্রসাদ মিত্র

আয়তনে জার্মানির চেয়ে বড়ো,—ইংলণ্ডের তিনগুণ প্রায়। প্রশান্ত মহাসাগরে ভাসছে জাপান।

হক্কাইডো, হনশু, শিকোকু আর কিউশু—এই চারিটি অংশে, আর ছোটো বড়ো অনেকগুলি দ্বীপের সমাবেশে, আশ্চর্য প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের দেশ জাপান। সাড়ে ছ'হাজার ফিট উঁচু গিরিশিখরের সংখ্যা সেখানে আড়াইশ'রও বেশি।

পিয়ের লোটি অনেকদিন আগে লিখে গেছেন, সমুদ্রে ভাসতে ভাসতে দূর থেকে প্রথমেই জাপানযাত্রীর চোখে পড়ে দিগন্তে ভাসমান কয়েকটি বিন্দু। ক্রমশঃ সেইসব পাহাড় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যাত্রীর চোখের সামনে অবগুণ্ঠন খুলে দেয় জাপান।

বরফে-ঢাকা ফুজি-ইয়ামার চূড়া বারো হাজার তিনশ উনষাটফুট ফিট উঁচু। প্রতিবছর ভূমিকম্প হয় পনেরো শ বারেরও বেশি। নদীগুলির দৈর্ঘ্য কম, কিন্তু স্রোতের গতি ক্ষুরধার।

সমস্ত প্রকৃতি তবু কেমন যেন কোমল। অসংখ্য উৎসবের দেশ জাপান। শস্য রোপণের উৎসব, নববর্ষ উৎসব, বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের 'বন' উৎসব, শিন্টো-ধর্মাবলম্বীদের শোভাযাত্রা,—চা-পানের উৎসব, চেরী-উৎসব। জাপানের 'গেইশা'-রমণীর খ্যাতি বিশ্ববিশ্রুত।

নববর্ষ-বন্দনার অনুষ্ঠান ঘরে ঘরে। ঘর সুসজ্জিত। মেঝে তকতকে, ঝকঝকে। রান্নাঘরে রান্নার আয়োজন। চারদিকে আহারে বসেছেন পরিবারের প্রত্যেকটি মানুষ,—এমন কি সুন্দর কুড়ির মধ্যে বাড়ির ছোট্ট শিশুটিও। আর, ফুল ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে দেওয়ালে দেওয়ালে।

মাঠে ধান বুনে দেবার পরেও অনুরূপ ব্যবস্থা। ফসল ফলুক ভালো করে—মনে মনে এই প্রার্থনা।

অগাষ্ট মাসে হয় 'বন'-উৎসব। যাঁরা স্বর্গত, সে উৎসব তাঁদেরই জন্যে।

আবার শিন্টো-মন্দির থেকে তাঁদের উৎসবের দিনে শিন্টো-যাজকদের শোভাযাত্রা বেরোয়। সেও দেখবার মতন দৃশ্য। আশ্চর্য সমারোহ তার। মিছিলের পরিক্রমা শেষ হলে ভোজ শুরু হয়। প্রসন্ন সংরক্ষণ ফুটে ওঠে এই উৎসবের মধ্য দিয়ে।

বসন্তকালে সারা দেশ ছেয়ে যায় চেরীফুলে। তখন ফুলের বনে বনে যুবক-যুবতী, প্রবীণ, প্রৌঢ় সকলেরই সানন্দ বিচরণ। 'সাকে' পান, আর ভ্রমণ, মনের ভার হালকা করে জীবনকে ফুলের মতন উপভোগ করবার নেশা লাগে যেন।

একজন লিখেছেন, পুরোনো শহর কিয়োটো-তে গেলে মনে হবে সেখানে যে-কোনো দিনই যেন উৎসবের দিন। চা-অনুষ্ঠান জাপানের জাতীয় উৎসব হয়ে উঠেছে। ইস্কুল থেকেই সে শিক্ষার তালিম দেওয়া শুরু হয়। প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিককে চায়ের আইন কানুন জানতে হয়।

সেই আনন্দের দেশ জাপান এতো উৎসবের মধ্যে 'গেইশা' বিদ্যাটি দীর্ঘদিন চর্চা করে এসেছে। শোনা যায়, আঠারোর শতকের শেষ পঞ্চাশ বছর সেকালের জাপানে দায়ম্যো অধিপতির অধীনে ছিল একদল অনুচর। তারা পুরুষ। দক্ষ তীরন্দাজ তারা,—অশ্বারোহণে সমর্থ,—তলোয়ার চালনায় পটু। সেই দক্ষ-সেবকদের নাম ছিল 'গেইশা'। অর্থাৎ 'গেইশা' ছিল 'দক্ষ' কথাটারই প্রতিশব্দ। তারপর ১৭৮০র কাছাকাছি কোনো

সময়ে পুরুষ-'গেইশা'র প্রথা উঠে যায়। দেখা যেন বিনোদিনী রমণী! তাঁরা নৃত্যে পটু, সংগীতে মনোরমা। তাঁরাই প্রসিদ্ধ 'গেইশা' ধারার আদিপর্ব রচনা করে গেছেন।

'গেইশা' রমণীর দুই সম্প্রদায়। একদলের নাম 'হাওরি গেইশা', আর একদলের নামে 'কোরোবি গেইশা' 'হাওরি' যারা, তাঁরা অঙ্গ অনাবৃত রাখেন না কখনোই। তিন-তারের 'সামিসেন' বাজনা বাজিয়ে গান করেন তাঁরা, তাঁদের আসরে আপ্যায়িত হন অতিথি, কিন্তু কোনোরকম ঘনতা নেই সে-সান্নিধ্যে। তাঁরা চিত্তরঞ্জনী। 'কোরোবি-গেইশা'দের মতন তাঁদের বিনোদনে শারীরিক আবেদন মোটেই মুখ্য নয়।

'গেইশা' হবার জন্যে সাধনা দরকার। পাঁচ ছ বছর বয়সেই নাচ, গান, আর তেতারা বাজাবার শিক্ষা শুরু হয়। 'ওকাসান' বা কর্ত্রী-মা নেন শিক্ষার ভার। প্রায় একশ পাউণ্ড খরচ লাগে শিক্ষানবীশ এক একটি মেয়ের কিমোনো আর টুকিটাকি অন্যান্য উপকরণ কিনতে। শিক্ষানবীশীর সময়ে তাকে বলা হয় 'মাইকো'। কৈশোর উত্তীর্ণ হবার সঙ্গে সঙ্গে 'মাইকো' পুরোপুরি 'গেইশা' হয়ে ওঠেন।

প্রাচীন গ্রীসের 'হে-টিরি'র hetaerae) সঙ্গে জাপানের এই 'গেইশার' মিল লক্ষ্য করেছেন কেউ কেউ। কিন্তু বোধ হয়, সে অনুমান অভ্রান্ত নয়। প্রশান্ত মহাসমুদ্রের যে আশ্চর্য রমণীয়তা রূপ নিয়েছে প্রথম সূর্যোদয়ের দেশ জাপানে, 'গেইশা' বিনোদিনীর জন্ম, বোধ হয় সেই জাপানেই। শোনা যায়, ইতিহাসের ধারায় জাপান বিদেশীর সংস্পর্শ থেকে আত্মরক্ষা করবার সংকল্প পালন করে এসেছে অনেকদিন। ষোড়শ শতকের আগে সেখানে ইউরোপের অভিযাত্রী বণিকদলও পা দিতে পারেনি। যেটুকু সম্পর্ক ছিল, সে কেবল চীনের সঙ্গে, কোরিয়ার সঙ্গে। এই সেদিন, উনিশ-শতকের শেষার্ধে মাত্র পাশ্চাত্য জগতের দিকে জাপানের দরজা খুলে দেওয়া হয়।

শোনা যায়, জাপান ছিল কঠোর সামুরাইয়ের দেশ! কঠিন তার সংকল্প, অটুট তার সংরক্ষণশীল মন। এসব কথা ভাবতে ভাবতে একথা মনে হওয়া খুবই স্বাভাবিক যে, এই কঠোর সংকল্প রক্ষা আর কূর্মবৃত্তিই বুঝি খুবই স্বাভাবিক যে, এই কঠোর সংকল্প রক্ষা আর কূর্মবৃত্তিই বুঝি জাপানের বিশেষ চরিত্র। কিন্তু এইসব অজস্র উৎসবই তার অন্য পরিচয়। জাপান যে আনন্দে কৃপণ নয়, সৌন্দর্যে বিমুখ নয়,—এবং জাতি হিসেবে তার যে এই পরম সমাদরযোগ্য নিজস্ব এক পরিচয় আছে, এসব উৎসব তারই নজীর।

উৎসবের দিনে মিশর

রমেন্দ্রনাথ মল্লিক

'জগতের যেখানে অব্যাহত শক্তির প্রচুর প্রকাশ, সেইখানেই যেন মূর্তিমান উৎসব।' ···মানুষের উৎসব কবে? মানুষ সেদিন আপনার মনুষ্যত্বের শক্তি বিশেষভাবে স্মরণ করে, —বিশেষভাবে উপলব্ধি করে, সেইদিন।···প্রতিদিন মানুষ ক্ষুদ্র, দীন, একাকী—কিন্তু উৎসবের দিনে মানুষ বৃহৎ—সেদিন সে সমস্ত মানুষের সঙ্গে একত্র হইয়া বৃহৎ—সেদিন সে সমস্ত মনুষ্যত্বের শক্তি অনুভব করিয়া মহৎ।'

রবীন্দ্রনাথের এই উৎসবের ব্যাখ্যায় আমরা প্রাত্যহিক জীবনের গতিবদ্ধতার ঊর্ধ্বে মহৎ-মুক্তির আলোকে উৎসবকে উপলব্ধি করি।

প্রতিটি জাতির প্রতিটি দেশের নিজস্ব জাতীয় উৎসব বর্তমান ;—ধর্ম ও দেশাচার অনুসারে কেবল তার মধ্যে রয়েছে আচার ও আচরণের পার্থক্য। কিন্তু উৎসবের যে অন্তর্নিহিত মর্মকথা তা হচ্ছে প্রতিদিনের এক ঘেঁয়েমীর জীবন থেকে বৈচিত্র্যের রসাস্বাদন। বর্তমান মিশর দেশের জাতীয় উৎসবকে এই আলোকে বিচার করলে তাদের জীবনধারায় ধর্মীয় উৎসবগুলিই বহু বিস্তৃত দেখা যাবে।

বিশ্বের প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির পীঠভূমি মিশর। নীল নদীর পলিতে পলিতে শ্যামল দেশটি দেশবাসীর জীবনধারায় বহুবিচিত্র উৎসব-আনন্দের লীলা নিকেতন। প্রাচীন কালে মনীর দেশ মিশরের লোকাচারে প্রচলিত ছিল পৌত্তলিক ধর্ম। সে অবশ্য অনেক দিনের কথা ; বর্তমানে ইসলাম ধর্মের প্রাধান্য। আধুনিক মিশরের বড় বড় উৎসবগুলি মূলত ধর্মীয়।

নীল নদীর তীরের দেশটি যেমন শ্যামল-সুন্দর, তেমনি ইসলাম-ধর্মে অনুরক্ত মিশরবাসী। মহরম, রাবেয়া, রেগেব, ইমাম এব সাহাব্বি, রামাডান, এল-রেট-এল-সাগির, এল-এচ এল-কেবীর প্রভৃতি ইসলামীয় উৎসব মিশরীয়দের মধ্যে বর্তমানে প্রচলিত। এখানের এই জাতীয় উৎসব-সকল চান্দ্র মাস অনুসারে অনুষ্ঠিত হয়।

উৎসবের দিনে মিশরীয় জীবনধারায় নতুন প্রাণের জোয়ার অনুভূত হয়। তারা নতুন পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান ক'রে, নিজেদের মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন সুদৃঢ়ভাবে উপলব্ধি ক'রে উৎসবে মাতোয়ারা হয়ে ওঠে। সুসজ্জিত উটের শোভাযাত্রা পথে পথে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দরবেশদের নানা রঙের ও ঢঙের পোশাক ও আনন্দ-চাঞ্চল্য তাদের এই প্রাণ-চাঞ্চল্য তাদের জাতীয় চরিত্রেরই পরিচায়ক। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তারা যেমন একনিষ্ঠতার দ্বারা সাফল্যের সুউচ্চ-শিখরে আরোহণ করতে চায় তেমনি তারা উৎসবের দিনগুলিকে আনন্দ মুখর ক'রে তোলে। এইখানেই মিশরীয় নরনারীর প্রাণের পরিপূর্ণ বিকাশ।

আধুনিক মিশরীয়দের মধ্যে কায়রোয় সময় সময় যে জাতীয় উৎসবগুলি অনুষ্ঠিত হয় তা প্রায়ই প্রথাগত-ভাবে। মিশরীয় সভ্যতা বিশ্বের প্রাচীনতম সভ্যতার অন্যতম। তাদের জাতীয় জীবনের বহু ক্রিয়াকর্মে সেই ঐতিহ্যাশ্রিত প্রথা-প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। এবং এইসব অনুষ্ঠান উৎসব হয়ে থাকে বছরের নির্দিষ্ট সময়ে। দরবেশদের আগমনও এই সময়ে—তাদের পোশাক পরিচ্ছদও বৈচিত্র্যপূর্ণ। কেউ মাথায় দেন সাধারণ পাগড়ী কেউ বা তুরস্কের ফা-উক্ টুপি, পরিধানে মিশরীয় পোশাক।

মহরমের সময় মিশরীয়দের তাজিয়া অত্যন্ত সুন্দরভাবে নির্মিত হয়। এই তাজিয়ার সোনালী-শিল্প সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যখন তাজিয়া বহন ক'রে মিছিল ক'রে চলে সেই সময় তাজিয়ার ধারে ধারে রূপোর ঘণ্টাগুলি মিষ্টি শব্দ তোলে—টুং ঠাং।

রামেয়া উৎসবও মিশরীয়দের জাতীয় উৎসবের মধ্যে একটি। এই উৎসব মহাপুরুষের জন্ম উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত হয়। রেগেব উৎসব মিশরে ইমাম আলীর কন্যার জন্মদিন উপলক্ষ্যে আয়োজিত হয়ে আসছে। এবং ইমাম এর দাদীর জন্মদিনেও এক জাতীয় উৎসবে মিশরবাসী মুখর হয়ে ওঠে। রামাডান উৎসব বছরের নবম মাসে অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসবের রাত্রিকে বলা হয় নব-চন্দ্র-দর্শনের রাত্রি। কোনো মক্ত অঞ্চলে গিয়ে ফাঁকা জায়গায় মুক্ত আকাশ তলে উপনীত হওয়ার রেওয়াজও আছে।

বছরের দশম মাসের প্রথম তিন দিন মুসলমানদের মধ্যে আর দুটি উৎসব মিশরে অনুষ্ঠিত হয় একটি হচ্ছে এল-এড এল-সুগায়ির অপরটি মিশরের প্রধান জাতীয় উৎসবগুলির ক্ষেত্রে অপ্রধান। বছরের শেষ মাসে অনুষ্ঠিত হয় জাতীয় উৎসবগুলির মধ্যে বৃহত্তম এল-এড এল্ কেবীর। এই মাসের শেষ তিন-চার দিন ব্যাপী এই উৎসব চলে। প্রত্যেকেই নিজের নিজের অবস্থানুযায়ী নতুন পরিধান ক'রে মসজিদে নামাজ করতে পথে যাত্রা করে। এই প্রার্থনা আলোচ্য উৎসবের প্রথম দিন সূর্যোদয়ের সময়েই অনুষ্ঠিত হয়। পরস্পরের মধ্যে মসজিদে ও পথে সৌহার্দ ও উপহার বিনিময় করে, চাকরবাকরকে বক্সিস্ করার রেওয়াজও মিশরে আছে।

মিশরের প্রধান প্রধান জাতীয় উৎসবগুলি ভিন্ন কতকগুলি অপ্রধান উৎসব বছরের বিভিন্ন সময়ে বিশেষ বিশেষ উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত হয়। এগুলিরও ঐতিহ্য বহু প্রাচীন এবং এগুলির আড়ম্বরও দেখবার মতোই। ইষ্টার রবিবারের কপ্‌টিভ্ উৎসবের কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। এই সব উৎসব মিশরের কায়রো সহরে যেমন হয় তেমনি গ্রামাঞ্চলেও অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

নীল নদীর জলধারায় প্রবাহিত স্রোত যেমন বহু প্রাচীন তেমনি মিশরীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রাণ প্রতিমা এই সব জাতীয় উৎসবগুলিও বহু প্রাচীন। কর্ম-কণ্টকিত জীবনের থেকে একটু নতুন রসাস্বাদন ঘটে মিশরীয়দের এই উৎসবগুলির দিনে। রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেই আমরা বলতে পারি—

> "ঈশ্বরের শক্তি বিকাশকে আমরা প্রভাতের জ্যোতিঃশ্লেষের মধ্যে দেখিয়াছি, ফাল্গুনের পুষ্পপর্যাপ্তির মধ্যে দেখিয়াছি, মহাসমুদ্রের নীলাম্বুনৃত্যের মধ্যে দেখিয়াছি, কিন্তু সমগ্র মানবের মধ্যে যেদিন তাহার বিরাট বিকাশ দেখিতে সমাগত হই, সেইদিন আমাদের মহামহোৎসব।"

গ্রীসের উৎসব

উমা দেবী

মানুষের মনে আনন্দ-কৃষ্ণা এক আদিম প্রবৃত্তি। সভ্য বা অসভ্য—প্রাচীন বা অর্বাচীন—এমন কোনো দেশ নেই যেখানে উৎসব-অনুষ্ঠান নেই। মানুষ চিরকালই প্রত্যক্ষের মধ্যে অপ্রত্যক্ষের সন্ধান পেয়েছে, রূপের মধ্যে রূপাতীতের। এই অপ্রত্যক্ষ ও রূপাতীত সংবেদনা সভ্যজাতির মধ্যে দর্শনে পরিণতি লাভ করেছে, আর তার একটি স্থূল অভিব্যক্তি সমাজের উৎসব ইত্যাদিতে পাওয়া গেছে। একথা আরও বিশেষ ভাবে এইজন্যেই বলছি যে সকল দেশের সমস্ত উৎসবের পিছনেই আছে দেবতাকে খুশি করবার প্রবৃত্তি—কারণ দেবতা আমাদের দেবেন—সুখ, সন্তান, ধন আর প্রতিষ্ঠা। প্রাচীন গ্রীসের উৎসবেও এই কামনার ব্যতিক্রম দেখি না।

ধরা যাক গ্রীসের ঋতু-উৎসবগুলি। আনুষ্ঠানিক ভাবেই এগুলি প্রতিপালিত হতো। হোমারের সময় উৎসব ছিল মূলত এই ঋতুগত। যখন ফসল পেকে উঠত কিংবা দ্রাক্ষাকুঞ্জে গুচ্ছ গুচ্ছ পরিপুষ্ট ফলে রস ঘনীভূত হয়ে উঠত তখন সুরু হতো উৎসব। বাঁশী বীণা বাজাতে বাজাতে দেবতার স্তুতিগান করতে করতে দেবতাকে নিয়ে শোভাযাত্রা বেরুতো। তারপর দেবপূজায় বলিকর্ম শেষ হলে সেই মাংস ভোজে লাগানো হতো। দেবতাদের নিয়ে অনেক অভিনয়ও হোতো—আর হোতো ক্রীড়ামোদ। পায়ে-দৌড়ের প্রতিযোগিতার সঙ্গে থাকত ঘোড়দৌড়ের প্রতিযোগিতা এবং রথচালনারও। লম্ফঝম্ফ, মুষ্টিযুদ্ধ, ঘুরে-দৌড়া, কুস্তি ইত্যাদিতেও প্রতিযোগিতা চলত আর এইসব উৎসবের খরচও জনসাধারণই বহন করত।

সুরা-উৎসবের দেবতা ছিলেন ডায়োনিসাস বা ব্যাকাস। এই দেবতা মূলত ছিল থ্রেসিয়ানদের উদ্ভিদ দেবতা। ইনি জিয়াসের পুত্র ছিলেন। এর জন্ম ইতিহাসটি কৌতূহলোদ্দীপক। এঁর মা ছিলেন সেমেলি—তিনি জিয়াসকে কান্তভাবে কামনা করেছিলেন—আর দেখতে চেয়েছিলেন তাঁর বজ্রমেঘবিদ্যুৎ সমন্বিত তাঁর শক্তিদীপ্ত রূপ। কিন্তু সহ্য করতে পারলেন না—মারা গেলেন। জিয়াস তখন তাঁর আসন্ন ভাবী পুত্রকে উরুতে স্থান দিলেন আর এই উরু থেকে জন্মগ্রহণ করলেন ব্যাকাস বা ডায়োনিসাস—সুরার দেবতা। গ্রীসে সুরার উৎসব ছিল চারটি ডায়োনিসাস-এর চারটি রূপকে কেন্দ্র করে।

এই উৎসব ছাড়াও আরো বহু উৎসব প্রাচীন গ্রীসে প্রতিপালিত হতো—এ্যাপোলো বা সূর্যদেব, আর্টিমিস বা চন্দ্রমা দেবী ইত্যাদি। এমন কি নেকুসিয়া বা নেমেসিয়া অর্থাৎ মৃতোৎসব—পূর্বপুরুষদের উদ্দেশে—সবই গ্রীসের সমাজ জীবনকে আনন্দময় করে তুলেছিল।

অবশ্য এগুলির বিবরণ এতো কম পাওয়া যায় যে কোনো স্পষ্ট চিত্র সম্মুখে ভেসে ওঠে না। এই সমস্ত উৎসব বছরে অন্ততঃ পঞ্চাশ ষাট দিন পালিত হোতো। তখন কাজকর্ম সব বন্ধ থাকতো রাষ্ট্রীয় আদেশে।

এখনো ফ্রান্সে বা জার্মানীতে সুরা উৎসব যা দেখা যায় তার অনুসরণে আমরা প্রাচীন গ্রীসের সুরা-উৎসবকে খানিক কল্পনা করে নিতে পারি। ভক্তেরা মশাল জেলে চীৎকার করতে করতে আর নানা ভঙ্গিমায় নাচতে নাচতে দ্রাক্ষাকুঞ্জে প্রবেশ করতো—রসের ফসল জাগানোর কাজে লেগে যেতো। নৃত্য-গীত ও চীৎকার যত উন্মাদনাময় হোতো দেবতা ততো খুশি হতেন। উৎকট আনন্দে মশাল জেলে বনভূমিতে প্রবেশ করে পশু শিকার করে তারা তা ছিঁড়ে ফেলতো। সুরা-দেবতার ভক্তেরা ছিলেন মাংসপ্রিয়—বিশেষ করে ষাঁড় আর

ছাগলের মাংস। শোভাযাত্রা—সাজগোজ—আর নানান রঙের নাট্যাভিনয়—এইগুলি ছিল উন্মাদনাময় যুবা-উৎসবের রূপ।

সব থেকে উল্লেখযোগ্য গ্রীসের জাতীয় উৎসবগুলি যেগুলি মূলতঃ ছিলো ক্রীড়ামোদ। অবশ্য ধর্মের সঙ্গে এগুলিরও যথেষ্ট সম্পর্ক ছিল। এই জাতীয় উৎসবের গুরুত্ব গ্রীসের নাগরিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক জীবনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিলো কারণ সর্বপ্রকার জাতীয় উন্নয়নে এই ক্রীড়া-উৎসবগুলির প্রভাব ছিলো অপরিসীম।

গ্রীসের এই ক্ল্যাসিক ক্রীড়ামোদগুলির সূচনা হয় কোনো মৃত্যুকে কেন্দ্র করে অথবা কোনো দেবপূজার অঙ্গরূপে বা স্মৃতিরূপে। বাস্তবিকই প্রথম ক্রীড়া-উৎসব অনুষ্ঠিত হয় পেট্রোক্লাসের মৃত্যুকে স্মরণ করে। এই সব উৎসবগুলির প্রত্যেকটি অনুষ্ঠিত হতো কোনো মন্দির-প্রাঙ্গণে কোনো দেবতা বা বীরপুরুষকে স্মরণ করে। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকের আগে কোনো জীবিত ব্যক্তি এ উৎসবগুলির কোনোটিরই কেন্দ্রস্থানীয় ছিলেন না।

ইলিয়ড ও ওডিসিতে এ্যালসিনোয়াসের রাজসভায় অনুষ্ঠিত ক্রীড়ামোদের যে বিবরণ পাওয়া যায় সেগুলিও মূলতঃ ছিলো মুষ্টিযুদ্ধ, কুস্তি, ভারোত্তলন, পা-দৌড় এবং রথচালনা।

যাই হোক একথা বলা চলে যে এই ক্রীড়ামোদ-প্রতিযোগিতাগুলিই গ্রীসের জাতীয় উৎসবের সেরা উৎসব। ওলিম্পিয়ান, পিথিয়ান, নিমিয়ান ও ইস্থ্‌মিয়ান ক্রীড়ামোদগুলি এ প্রসঙ্গে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য এবং এগুলির মধ্যেও ওলিম্পিয়ান সর্বশ্রেষ্ঠ।

পিথিয়ান ক্রীড়া ডেল্‌ফির স্থানীয় উৎসব ছিল। এ্যাপোলোর উদ্দেশ্যে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হোতো এবং এটি ছিল সঙ্গীতপ্রধান। প্রথমে প্রতি চার বছর অন্তর ও পরে আট বছর অন্তর এই উৎসবের অনুষ্ঠান হোতো।

সব উৎসব সকলের জন্য অবারিত ছিলো না। যেমন জিউসের সম্মানে অনুষ্ঠিত নিমিয়ান ক্রীড়া-উৎসব, সমস্ত গ্রীসের জন্য উন্মুক্ত ছিল কিন্তু ইস্থ্‌মিয়ান ক্রীড়া-উৎসবে ইলিয়ানরা স্থান পেতো না। নিমিয়ান উৎসবে রথচালনার প্রতিযোগিতা হতো না আর এতে পুরস্কার দেওয়া হতো বুনো সেলেরির মালা। ইস্থ্‌মিয়ান্ ক্রীড়া-উৎসবে বিজয়ীর পুরস্কার ছিলো বুনো সেলেরি কিংবা পাইনের মুকুট।

ওলিম্পিয়ান্ ক্রীড়া-উৎসবই প্রাচীনতম ক্রীড়ানুষ্ঠানের নিদর্শন এবং একমাত্র এইটিই এখনো পর্যন্ত চালু আছে।

এলিসের সমভূমিতে ওলিম্পিয়া বলে একটি স্থান আছে—এর চারপাশ ঘেরা। এখানে জিউসের মন্দির এবং অ্যাটলিসের বুকে বিজয়ী ক্রীড়ামোদীদের মর্মর মূর্তিও আছে। গল্প শোনা যায়—এইখানেই হেরাক্‌ল্‌স্ রাজা অজিয়াসকে নিহত করে এলিস জয় করেন এবং এইখানেই জয়োৎসব অনুষ্ঠিত হয়। পিণ্ডারের একটি কবিতায় এই কাহিনীটি গৃহীত হয়েছে। কিন্তু অন্য গল্পও প্রচলিত আছে। এই গল্পানুসারে কোনো এক সময়ে গ্রীস মহামারীতে যেতে বসেছিলো। সেই সময় ইফিটাস্ দৈববাণী পেয়েছিলেন যে ক্রীড়া-উৎসবগুলি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হলে গ্রীস বেঁচে যাবে। ওলিম্পিয়ায় হেরার মন্দিরে একটি পিতলচক্রে এখনও ইফিটাসের নাম পাওয়া যায়।

এই সব ক্রীড়া-উৎসবগুলি যখন অনুষ্ঠিত হতো তখন গ্রীসের বিরোধী রাজ্যগুলির মধ্যেও সাময়িক শান্তি-চুক্তি মেনে নেওয়া হোতো এবং এটিও শোনা যায়, ইফিটাসের চেষ্টাতেই সফল হয়েছিল।

পূর্বে ওলিম্পিয়া ক্রীড়া-উৎসব ছিল স্থানীয় গ্রাম্য উৎসব। মাঝে কিছুদিনের জন্য এক খৃষ্টান সম্রাট এই

উৎসব বন্ধ করে দেন। পরে আবার এই ওলিম্পিয়া ক্রীড়া-উৎসব সগৌরবে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ জাতীয় উৎসবের মর্যাদা পায়।

এবার প্রাচীন গ্রীসের ওলিম্পিয়া উৎসবের একটি চিত্র নেওয়া যাক।

সমস্ত গ্রীসে রাজদূতেরা ঈশ্বরের অনুমত শান্তি ঘোষণা করেছেন। বিবাদ তিরোহিত। শত্রুতা শান্ত। দশজন বিচারক এসেছেন গ্রীসের বিভিন্ন শাখা জাতি থেকে। শাদা রঙের শিবির বানানো হয়েছে। কর্তব্য কর্মের নির্দেশানুসারে তাঁরা এই শিবিরে দশমাস হোলো সাময়িক বাসা বেঁধেছেন। এলিস শহর থেকে একটি রাস্তা এসে এখানে মিশেছে—আসছে সেই পথ বেয়ে জনস্রোত। ভীড় বাড়ছে। ক্রীড়ামোদীরাও এসেছেন—তাঁরা ক্রীড়াভ্যাসে রত হয়েছেন। মন্দিরের ভেট বয়ে নিয়ে পুরোহিতেরা আসছেন। নির্বাচনী প্রক্রিয়ানুসারে মেয়েরাও যোগ দিতে কেউ কেউ এসেছেন—এঁরা ডিমিটারের স্ত্রী পুরোহিত।

ভোর হোলো। ক্রীড়ায় যোগদানকারীরা বিচারকদের সামনে এলেন তাঁদের খাঁটি গ্রীকত্ব প্রমাণিত করতে। প্রমাণ দিলেন তাঁদের আত্মিক ও নৈতিক নিষ্কলঙ্কতার। শপথ গ্রহণ করলেন—ক্রীড়া-প্রতিযোগিতায় কোনো অন্যায় পথ তাঁরা অবলম্বন করবেন না। স্টেডিয়ামে গেলেন। অঙ্গ থেকে বস্ত্রোন্মোচন করলেন। অঙ্গে অনুলেপন দিলেন—তারপর দাঁড়ালেন সার সার লাইন বেঁধে। এবার দর্শকদের সম্মুখীন হয়ে তাঁরা আহ্বান জানালেন—যদি কেউ প্রতিযোগীদের কারুর সম্বন্ধে চরিত্রগত বা বংশগত কোনো সংশয় পোষণ করেন তো—এখুনি বলুন। দর্শকেরা নীরব। এইবার ভেরীর আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে ক্রীড়ারম্ভ হোলো।

অন্তত চব্বিশ রকমের খেলা হোলো। প্রথম প্রথম একদিনেই উৎসব শেষ হোতো—পরে পাঁচদিন পর্যন্ত বেড়ে গেলো। পা-দৌড়ের খেলাতে শোনা যায় স্পার্টান যুবকদেরও কেউ কেউ লক্ষ্যে পৌঁছতে না পৌঁছতেই হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মৃত্যুলাভ করতেন। যাঁরা কুস্তিগীর ছিলেন তাঁরা সর্বাঙ্গে তেল মাখার পর বালি ছিটিয়ে দিতেন। রথ প্রতিযোগিতায় রথ টানত ঘোড়া—ঘুড়ী আর খচ্চর।

ওলিম্পিয়া ক্রীড়া-উৎসবে বিজয়ী বীর পরলেন বুনো অলিভের মালা। আরো বহু পুরস্কারও পেলেন। প্রথমে তাঁর নাম ঘোষিত হোলো—তারপর তাঁর পিতা-মাতা ও দেশের নাম। সোনার কাজ করা হাতীর দাঁতের টেবিলের ওপর থেকে এর পর অলিভের মুকুট তাঁকে পরিয়ে দেওয়া হোলো আর হাতে দেওয়া হোলো তাল-পল্লব। তারপর তাঁকে জিউসের মন্দিরে নিয়ে যাওয়া হোলো। পথের দু'ধারে দাঁড়ালেন আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব নানা দামী উপহার হাতে নিয়ে। পথে ফুল ছড়ানো হোলো গানের সঙ্গে। গ্রীক ক্যালেণ্ডারে তাঁর নাম থাকলো।

দেশে ফিরে তিনি পেলেন প্রচুর অর্থ ও উচ্চ পদ। তাঁর নামে কবিতা রচনা করলেন কবিরা। ভাস্করেরা তাঁর মূর্তি ঘোষিত করলেন রাষ্ট্রের নির্দেশে। বেদী তৈরী হোলো—তাঁর সামনে বলি উৎসর্গ করা হোলো। এক কথায় ওলিম্পিয়া তাঁকে দিল পৃথিবীর সর্বসুখ। তাই অলিম্পিয়ায় বিজয়ীবীর সম্বন্ধে বলা হোতো—"এর পর স্বর্গে গিয়ে দেবত্ব লাভ করা ছাড়া তাঁর আর কিছু চাইবার নেই।"

বিচিত্র উৎসবের দেশ ব্রিটেন

নির্মলেন্দু মাল্লা

এ যুগের পৃথিবীতে কোথাও রাজা থাকুক আর না থাকুক, শেষ পর্যন্ত পাঁচটি রাজা থাকবেই, এক প্যাকেট তাসের মধ্যে চারটি, আর গ্রেট ব্রিটেনে একটি। কথাটা বলেছিলেন কারুক—রাজ সিংহাসন ত্যাগের সময়। এ থেকেই ব্রিটিশ চরিত্রের একটা আশ্চর্য দিক ধরা পড়ে গেছে আর সেটা হোল ব্যক্তি স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের জন্যে শত শত বৎসর ধরে সংগ্রাম চালিয়েও ব্রিটেনের মানুষ বিস্মৃত হয়নি তার আপন ঐতিহ্য। নানা ঘটনার সংঘাতে বিটিশ চরিত্র বিবর্তিত হয়েই চলেছে কিন্তু সেটা ঘটছে ঐতিহ্য অনুসরণ করে, বর্জন করে নয়।

ফলে গণতন্ত্রী গ্রেট ব্রিটেনের মানুষ রাণীর শোভাযাত্রা দেখার জন্যে পথের ওপর ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকে, আধুনিকতম শিল্প ও বিজ্ঞানে সমৃদ্ধ দ্বীপবাসী প্রাচীন প্রথা ও উৎসব সাড়ম্বরে পালন করে। বস্তুতঃ বাণিজ্যনির্ভর ব্রিটেনের একদিকে কাজের লোকের পোষাক আর একদিকে লর্ড মেয়র অফ লণ্ডন, হেরাল্ড, নাইট অফ গার্টার কিংবা রাণীর দেহরক্ষীর পোষাকের বাহার দেখলে পাঁচশো বছর আগের ও পরের ব্রিটেনকে একসঙ্গে মনে না পড়ে উপায় নাই। স্কটল্যাণ্ডের হাইল্যাণ্ড ড্রেস তো সত্যিই দেখবার জিনিষ। কোন কোন স্কুলের ছাত্ররাও (যেমন ক্রাইস্ট হাসপাতালের ইস্কুল) যে পোষাক পরে ক্লাস করে তাতে মনে হতে পারে এদের বোধ হয় রোজই কনভোকেশনের উৎসব।

যে জাতি যত বেশি ঐতিহ্যপ্রিয়, তার উৎসবের তত বেশি ঘটা। অন্ততঃ এ বছরের গ্রেটব্রিটেনকে দেখলে এ কথা স্বতঃই মনে হয়।

প্রথমেই ধরা যাক মহাকবি শেক্সপীয়রের চতুঃসহস্রতম বার্ষিকী উৎসবের কথা। শুধু স্ট্র্যাটফোর্ড আপন-অ্যাভন, লণ্ডন বা চিচেস্টার নয়, সারা ব্রিটেন এমন কি সারা বিশ্ব মেতে উঠেছিল এই উৎসবে।

এরপর অগস্টের প্রথম দিকে মড এবং রকারদের উৎসবে গেল, দলে দলে নরনারী ছুটল সমুদ্র উপকূলের দিকে। জুলাই আর সেপ্টেম্বরের প্রথম দিকে যথাক্রমে উইণ্ডসর ক্যাসল এবং এডিনবরায় পুষ্প প্রদর্শনী হয়ে গেল।

সঙ্গীত, নাটক এবং ব্যালের নামে ব্রিটেন আত্মহারা। ওয়েলশ (Welsh)-এর কবিতা ও সঙ্গীতের উৎসব শুধু ব্রিটেনে নয়, সারা ইয়োরোপে বিখ্যাত। আর এই প্রসঙ্গে আসে এডিনবরার বিশ্ববিখ্যাত উৎসব ও মেলার কথা। এটিকে আমরা আন্তর্জাতিক উৎসব বা বিশ্ব-মেলা বলতে পারি। সঙ্গীত, নাটক ও শিল্প-কলার এক বিরাট সমাবেশে এবৎসরের অষ্টাদশ আন্তর্জাতিক উৎসব সারা বিশ্বের মধ্যে এক উল্লেখযোগ্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। উৎসবের অনুষ্ঠান সূচীতে যে সব অজস্র আকর্ষণীয় বিষয় ছিল তার মধ্যে শেক্সপীয়র প্রদর্শনী, ওল্ড ভিক কোম্পানীর অভিনয়, হাইল্যাণ্ডের নাচ ও বাজনা এবং প্রাগ জাতীয় থিয়েটারের অপেরা বিশেষভাবে উল্লেখের দাবী রাখে।

এই উৎসবের আর একটা বিশেষ দিক হচ্ছে তরুণদের অভিনয়। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা তাদের কৃতিত্ব প্রদর্শনের দুর্লভ সুযোগ পেয়েছিল এই মেলার মাধ্যমে।

এ ছাড়া এই উৎসবের অন্যতম দ্রষ্টব্য বিষয় ছিল উনিশ শতকের বিখ্যাত ফরাসী শিল্পী দেলাক্রোয়-এর পেন্টিং, ড্রইং এবং লিথোগ্রাফ-এর প্রদর্শনী এবং আধুনিক আন্তর্জাতিক ভাস্কর্য।

আর একটি প্রদর্শনী মারফত উপস্থাপিত করা হয়েছিল সকল দেশের খাদ্যের মেলা। উৎসব কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল একই সঙ্গে মেলা ও মিউজিয়ম।

এবারে বলি গ্রেট ব্রিটেনের কয়েকটি বিচিত্র মেলা ও উৎসবের কথা। খেলাধূলাকে ওদেশের লোক এক টা মেলা বলেই ধরে নিয়েছে। জুলাই মাসে হেনলি রয়্যাল রিগাটা বা হেনলি-অন-টেমসে তাই বাচ খেলা দেখতে ভিড়ের অন্ত ছিল না। আইল-অফ-ম্যান-এ মোটর সাইকেলের দৌড় প্রতিযোগিতা আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে এ যুগের ব্রিটেনের অনেক উৎসব যন্ত্রনির্ভর। আবার নটিংহামের তীরধনুকের দ্বারা লক্ষ্যভেদ প্রতিযোগিতা আমাদের নিয়ে যায় সুদূর অতীতে। এই সঙ্গে স্মরণ করুন লীডস, ম্যাঞ্চেস্টার কিংবা লণ্ডনের ওভাল ময়দানে ক্রিকেট খেলার কথা—সারা বিশ্বের দর্শক যেখানে জমায়েত হয়েছে—তাহলেই বুঝতে পারবেন ব্রিটেনের উৎসব কত বিচিত্র পথে প্রতিনিয়ত মানুষকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে আনন্দের অভিসারে।

অক্টোবরে আমরা যখন মহাপূজোর আনন্দে মেতে উঠি তখন ব্রিটেনের মানুষ ছোটে ব্ল্যাকপুলে যেখানে আলোর অক্ষরে বড় বড় করে লেখা হয় "ওয়াণ্ডার ল্যাণ্ড অফ দি ওয়ার্ল্ড"। এত বড় মেলা ব্রিটেনে খুব কমই আছে। সমুদ্রের তীরে সুদীর্ঘ সাত মাইল পথ জুড়ে আলোর মেলা বসে। শীত আসছে, ইয়োরোপের অস্তত্র নিভে আসছে উৎসবের আলো, অতএব চলো আলোর রাজ্য ব্ল্যাকপুলে। এইজন্যেই লোকে আদর করে এর নাম দিয়েছে "দি লাইটস।" এই মেলার জন্যে কেবলমাত্র ব্ল্যাকপুল কর্পোরেশনই খরচ করে প্রায় পাঁচ লক্ষ পাউণ্ডের মতো, এ দেশের টাকার হিসেবে পঁচাত্তর লক্ষ টাকা, এ যে বিরাট বারোয়ারী চাঁদা সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

শীতকালে এবং শীতের অবসানে দুটি ধর্ম কেন্দ্রিক উৎসবে গ্রেট ব্রিটেন বিপুলভাবে মেতে ওঠে। এর একটি হোল ডিসেম্বরের ক্রিসমাস উৎসব এবং অপরটি ইস্টারের উৎসব। এ দুটিই খ্রীস্টধর্মকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠিত হয়।

ক্রিসমাস হোল যীশু খ্রীস্টের জন্মদিনের উৎসব। এই দিনে সবাই তাঁর প্রেম ও করুণার কথা স্মরণ করে। এই উৎসব উপলক্ষ্যে প্রিয়পরিজনেরা একত্রিত হন, তারপর চলে ক্যারল গান। প্রতিটি বাড়িতে পথে এবং দোকানে দেখা যায় ক্রিসমাস ট্রি ও সান্টা ক্লস। নাচ, গান, উপহার দান-প্রতিদান এবং শুভেচ্ছা জ্ঞাপন এই উৎসবের অঙ্গ। সংসারের বাদ বিসংবাদ ভুলে মানুষ এই সময় সন্ধান করে প্রেম ও শান্তি।

এই প্রসঙ্গে ক্রিসমাস মুকাভিনয়ের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 'সিণ্ডারেলা'র সেই গরীব মেয়ের গল্প, 'রবিনসন ক্রুশো'র সেই নিঃসঙ্গ জীবনের কথা, কিংবা 'আলাদীন' কি 'জ্যাক অ্যাণ্ড দি বিন্‌স্টক' এর চমকপ্রদ কাহিনী যুগ যুগ ধরে ছোট বড় সবাইকে মাতিয়ে রেখেছে।

শীতের শেষে আসে বসন্ত, একদিকে জেগে ওঠে নিদ্রিত পৃথিবী, অপরদিকে ধর্মপ্রাণ নরনারী স্মরণ করে যীশু খ্রীস্টকে যিনি ইস্টারের রবিবার সকালে কবরের মধ্য থেকে পুনর্জন্ম গ্রহণ করেছিলেন।

বসন্ত কালের অ্যাংলো-স্যাক্সন দেবীর নাম থেকেই ইস্টার কথাটা এসেছে। মার্চ ও এপ্রিলের মধ্যে এই উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। এর চিরাচরিত প্রতীক হোল ইস্টার লিলি, সদ্যোজাত ভেড়ার ছানা, বাচ্চা খরগোশ এবং ডিম। প্রাচীন প্রথার দেশ ল্যাঙ্কাশায়ারে এ সময় দেখা যায় গাধা ঘোড়া সব চলেছে মাথায় রঙীন টুপি পরে আর তাদের গলায় ঝুলছে রঙীন ফিতে ও ফুলের তোড়া।

ইস্টারের সোমবারে ব্রিসটলের অ্যাডেনহ্যাম পার্কে এক আশ্চর্য উৎসব দেখা যায়। হাজার হাজার ছেলেমেয়ে অবাক চোখে দেখে ইস্টারের রঙীন ডিম আর কমলা লেবু চালু পথ বেয়ে গড়িয়ে চলেছে।

লণ্ডনের 'ভ্যান হর্স ইস্টার প্যারেড' এবং লোভাযাত্রা নাকি কখনো ভোলবার নয়। চকচকে ভ্যান বা গাড়ী, ঝকঝকে পোষাক পরা, রঙ করা সব ঘোড়া, ঘোড়ার ল্যাজে আবার বিনুনী, আর তাদের আনন্দই বা কতো, আর গাড়ীর চালকের পেছনে পরিবারের লোকজন, তারা আবার তাদের ঘোড়াকে টেক্কা দিয়ে সাজগোজ করেছে। সব মিলিয়ে এক রঙীন উল্লাসমুখর উৎসব।

এই হোল ব্রিটেনের উৎসব-জীবন বা দ্বীপবাসীদের জীবনযাত্রার এক বিশেষ দিক। এর মধ্যে আছে ক্রিসমাস ও ইস্টারের ধর্ম-উৎসব, পুষ্প প্রদর্শনী জাতীয় ঋতু উৎসব, শেক্সপীয়ার চতুঃশতবার্ষিকী ও এডিনবরা ফেস্টিভ্যালের মতো নৃত্য-গীত-অভিনয় সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক উৎসব, স্কটল্যাণ্ডের লোক-উৎসব, গলফ ও ক্রিকেটের ক্রীড়া-উৎসব, ধনুর্বিদ্যার প্রাচীন উৎসব ও মোটর রেসের আধুনিক যন্ত্র-কেন্দ্রিক উৎসব। শেক্সপীয়রের ভাষায় "This blessed plot, this earth. this realm, this England"—এই দেশ যে উৎসবের দেশ আনন্দের দেশ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

উৎসবের দিনে

উৎসবের দিনগুলি সার্থক হয়ে ওঠে যখন ছেলেমেয়ে আর প্রিয়জনদের হাতে তাদের পছন্দমত বস্ত্রসম্ভার পরিবেশিত হয়। স্বদেশী-যুগে বিলাতী সৌখীন বস্ত্র ত্যাগ করে মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়ের মহান্ ব্রত বাঙ্গালী গ্রহণ করেছিল আর সেই ব্রত সার্থক করে তুলতে বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলের জন্ম হয়েছিল। আজ দেশ স্বাধীন হয়েছে আর তার অগ্রগতির সঙ্গে তাল রেখে বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল নূতন রূপ পরিগ্রহ করেছে।

দেশের সেবায় ৫৬ বৎসর

বঙ্গলক্ষ্মী

কটন মিলস্ লিমিটেড

৭, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৩

উৎসবের দেশ—ফ্রান্স

সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

উৎসবের দেশ ফ্রান্স। সেই উৎসবের বৈচিত্র্য যেমন মনোমুগ্ধকর, তার বৈভবের বিলাসও তেমনি বিস্ময়কর। মুখ্য বা গৌণ—যে উৎসবই হোক না কেন, আনন্দমুখর হয়ে ওঠা ফরাসীদের স্বভাব। তার প্রকাশ বিভিন্ন অঞ্চলে বিচিত্র।

নববর্ষের উৎসব দিয়ে ফরাসীরা তাদের নতুন জানুয়ারীর যাত্রা আরম্ভ করে। নিকট-দূর, ছোট বড় সকল আত্মীয়কে নিয়ে গড়ে ওঠে ফরাসীদের সংসার, বাঙালীর একান্নবর্তী পরিবারের মতো। পারিবারিক ও সামাজিক মিলন, এবং উপহার-বিনিময় এ উৎসবের অপরিহার্য অঙ্গ। সকালবেলা বাড়ীর ছোট ছেলেমেয়েরা নিজেদের তৈরী উপহার মা-বাবাকে দিয়ে দিনের উৎসব শুরু করে। ব্যবসায়ীরা বাৎসরিক সৌজন্য প্রকাশ করে খরিদ্দারের বাড়ী উপহার পাঠিয়ে—মাছ-ব্যবসায়ী পাঠায় মাছ, ডিম-ব্যবসায়ী পাঠায় ডিম ইত্যাদি। আর এই তত্ত্ব নিয়ে যে আসবে, সে বক্‌শিস্ পাবে মদ ও টাকা। চাকর-কেরানীকুল পাবে দু'মাসের মাইনে, আর প্রিয়জনদের মধ্যে আদান-প্রদান হয় চকোলেট-মিষ্টি-ফুল-ফল। নববর্ষের খানাপিনায় দূরের নিকটের প্রিয়জনেরা জমায়েত হবে সংসারের মধ্যে প্রবীণতম ব্যক্তির বাড়ী। বিকেলে ছোটরা যাবে বড়দের বাড়ী বেড়াতে, পুরুষ যাবে তার নারী-বন্ধুর কাছে। আকাশে বাতাসে উৎসবের আনন্দ-মুখরতা ছড়িয়ে পড়ে।

৬ই জানুয়ারী "রাজার দিন", মুখ্যত ছোটদের উৎসব। বিভিন্ন অঞ্চলে এর বিভিন্ন রূপ। বাচ্চাদের মধ্যে থেকে তিনজনকে রাজা সাজানো হয়, জমকালো পোষাক আর কাগজের মুকুট পরিয়ে। দুঃস্থদের এরা সাহায্য করে গান গেয়ে, আর দোরে দোরে ঘুরে ভিম কেক চেয়ে বেড়ায়। গৃহকর্তারা "ছোট অভ্যাগতদের" দেন খাদ্য-পানীয়-জামা-টাকা ইত্যাদি উপহার। "রাজার-কেক"অনুষ্ঠানে যেমন উত্তেজনা, তেমনি জমজমাট ব্যাপার। গোল ও চ্যাপ্টা ধরণের বিরাট কেক নিয়ে আসা হয় কাপড়ে ঢেকে ছোট একটা টেবিলে করে। কেক কাটার সময়টাই সবচেয়ে উত্তেজনাপূর্ণ, কারণ কেক কেটে কেটে যখন বিলানো হয়, গভীর আগ্রহ নিয়ে সকলে অপেক্ষা করে কেকের মধ্যে, সিদ্ধ করা বস্তু বা পুতুল কার ভাগ্যে পড়বে। বিতরণের পর বাড়তি কেক দেওয়া হয় প্রথম যে ভিক্ষুক দ্বারে আসবে, তাকে। এই অংশটুকুকে তারা বলে, "ভগবানের প্রাপ্য অংশ।"

এর পরের উৎসব "ফুলের উৎসব"। আমাদের দেশের হোলির খেলায় যেমন আবিরের মেলা, ফরাসীরা তেমনি ফুলের খেলায় পরস্পরের প্রতি ফুল ছোঁড়াছুড়ি করে। গান গেয়ে বাজনা বাজিয়ে তারা হল্লোড় করে পথ চলে। আমাদের দেশে গাজনে যেমন সঙ সাজে, প্যারিস নগরী বা অন্যত্র তেমনি এই দিনে ষাঁড়কে সাজিয়ে নিয়ে শোভাযাত্রা করা হয়।

আমরা ওদের অনুকরণে বলি "এপ্রিল ফুল", ফরাসীরা বলে "এপ্রিল ফিশ"—উদ্দেশ্য একই—পয়লা এপ্রিল বোকা-বানানো। নানা-ধরণের মাছের ছাঁচের কেক দিয়ে দোকান সাজানো হয়। বন্ধুরা পরস্পরের কাছে মাছের ছবি পাঠায়।

Mid-Lent হচ্ছে খৃষ্টানদের ৪০ দিন-ব্যাপী উপবাস-পর্ব। ইষ্টারের পূর্বের কোনও এক বুধবারে এর শুরু, এবং শেষ ইষ্টারে। এই উৎসবে ধোপানীরা প্রধান অংশ গ্রহণ করে। প্রত্যেক মেলা থেকে ধোপানীরা

এক এক জনকে রাণী নির্বাচিত করে। এইসব রাণী ধোপানীরা আবার একজনকে "পাটরাণী" করে, আর সেই "পাটরাণী" স্বভাবতই একজনকে রাজা মনোনীত করে এবং তারপর শোভাযাত্রা বের হয়।

চার্চের ঘণ্টার ধ্বনি শোনা যায় না বিশুর ক্রুশ-বিদ্ধ হওয়ার বেদনাকে প্রকাশ করতে শুভ-স্যাইডে থেকে ইষ্টার পর্যন্ত। শিশুরা জানতে চায়—"ঘণ্টা কেন বাজে-না?" মা বলেন—"কি করে বাজবে! ঘণ্টা যে রোমে পালিয়ে গেছে।"

ইষ্টারের ভোরে শিশুরা ছুটে যায় বাগানে—আজ ভোরেই তো ঘণ্টার ধ্বনি শোনা যাবে; ঘণ্টার যে আজ ফেরার কথা আছে রোম থেকে! ছোটরা যখন এই রকম করে, বড়রা তাদের জন্য লুকিয়ে রাখে চকোলেট ডিম ইত্যাদি নানা ধরণের খাবার।

"কই, ঘণ্টাটা যে ফিরলো, দেখতে পেলাম না তো!" —অভিমানী শিশুরা বলে।

"ওঃ হো! আসতে দেরি করে ফেলেছো, তারা তো এইমাত্র এখান দিয়ে চলে গেল, আর যাবার সময় তোমাদের জন্যে ফেলে রেখে গেল মিষ্টি কেক, চকোলেট, আরও কত কি! শিশুরা গান গেয়ে ওঠে।

ইষ্টারের রবিবারে প্রত্যেকে একবার চার্চে যাবেই। প্রদীপ জ্বালানো হয় মঙ্গলের কামনায়, আর সেই প্রদীপ বাড়ীতে এনে তারা রেখে দেয়, ভবিষ্যতে মাঙ্গলিক কোনও অনুষ্ঠানে জ্বালাবে বলে।

ইষ্টারে বন্দীদের মুক্তি দেওয়া একটা প্রচলিত সংস্কার, কারণ ইষ্টার নবজীবনের সূচনার প্রতীক।

১লা মে বিলাসী ফরাসীরা "লিলি-উৎসব" করে। সূর্যোদয়ের মুহূর্তে তারা ঘুম থেকে জেগে উঠে বনে-বাদাড়ে ছুটে যায় প্রথম লিলি ফুলটি তোলবার আশায়। ফুলের আতর মাখিয়ে দূরের প্রিয়জনকে পাঠানো হয় শুভেচ্ছা। রাস্তার মোড়ে মোড়ে বিক্রী হয় লিলি। লিলি তাদের কাছে সৌভাগ্যের প্রতীক, মনের মানুষের কাছ থেকে লিলি উপহার পাওয়া পরম আকাঙ্ক্ষার বস্তু। লিলি ফুলের সমারোহ এদিন ফরাসীদের মাতিয়ে রাখে।

সেন্ট জেন্স-এর নামে বছরে দুবার উৎসব হয়—১৫ই মে'র পর যে রবিবার, এবং সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম শনিবার ও রবিবার। এই দুবারেই একই ধরণের অনুষ্ঠান হয় -আর্তের জন্য প্রার্থনা ও বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা। সেন্ট জেন্সকে কল্পনা করা হয়—তিনি যেন লাঙল হাতে জমি চষতে ব্যস্ত, আর তার সঙ্গে আছে একটি ষাঁড় ও একটি নেকড়ে। প্রবাদ আছে—এই মহাত্মা দূরের এক নির্জন স্থানে চাষ করতেন একদল ষাঁড়কে নিয়ে। একবার একটি নেকড়ে একটি ষাঁড়কে হত্যা করে। ফলে শাস্তিস্বরূপ, তাকেও এখানে কাজ করতে হয় এই ষাঁড়েদের সঙ্গে।

জিপ্‌সীদের উৎসব ২৩শে আর ২৪শে মে। হাজার হাজার জিপ্‌সী সারা পৃথিবী থেকে বছরে একবার জমায়েত হয়। বাজনা বাজিয়ে পায়ে হেঁটে বা ঘোড়ায় চেপে তারা মেতে উঠে নাচে-গানে-সাজে-সজ্জায়। ধর্ম-পেশা-নির্বিশেষে সকলেই তারা এই উৎসবে যোগ দেয়, কারণ এখানে তাদের এক পরিচয়—তারা তীর্থযাত্রী। এই অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে শতাব্দীর পর শতাব্দী বহু জন-প্রবাদ প্রচলিত আছে। তাদের বিশ্বাস—Sara হচ্ছে কুমারী মেরীর সম্পর্কে বোন। কারুর কারুর বিশ্বাস—Sara হচ্ছেন একজন রাণী বিশেষ, মহাত্মাদের সঙ্গে তিনি একযোগে কাজ করেন ও তাদের মৃত্যু হলে তিনি সমাধিস্থ করেন। ২৪শে মে বিসর্জনের দিন। দুজন মেরীর মূর্তি নিয়ে তারা চার্চ থেকে নদীতে যায় বিচিত্র ধরণের সাজগোজ করে। যেসব পোষাক পরে মেয়েরা শোভাযাত্রা করে যায়, তাদের অনেক পোষাকই পুরুষানুক্রমে মা থেকে মেয়ের হাতে এসে পৌঁছেছে।

ইষ্টারের ১৭ দিন বাদে সমগ্র নগরবাসী দুদিন গ্রামাঞ্চলে ভ্রমণে আর চড়ুই ভাতিতে কাটিয়ে আসে।

সারা ফ্রান্সে নানা ধরণের উৎসব হয় বিভিন্ন সেন্টের সম্মানার্থে। এরা জুন সেন্ট জোনকে কেন্দ্র করে যে উৎসব, তাতে নানা ধরণের নানা আচার দেখা যায়। আগুনের শিখাকে ঘিরে নাচ-গানের ধুম লেগে যায়। কয়েক জায়গায় ধারণা আছে—জোয়ান লোকেরা যতদূর পর্যন্ত লাফাতে পারবে, ততদূর পর্যন্ত শস্যের শীষ উঁচু হবে।

১লা ও ২রা নভেম্বরের উৎসব All Saints' day আর All Souls' day। বিভিন্ন মহাত্মার স্মরণে প্রথম দিনের উৎসব, আর দ্বিতীয় দিনের উৎসবের সপ্তাহ পূর্বে শোক-সন্তপ্ত পরিবারের নারীরা যায় পারিবারিক সমাধিক্ষেত্রটিকে ফুল দিয়ে সাজাতে। উৎসবের দিনে আত্মীয়-পরিজনে মিলিত হয়ে মৃত আপনজনের স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করে।

বছরের শেষ বড় উৎসব ২৪শে ডিসেম্বর Christmas Eve। ফরাসীরা ছোট ছোট মূর্তি তৈরী করে রূপ দেয় শিশু যিশুকে—যোশেফ আর মেরী, মেষপালক ইত্যাদিকে। কোথাও বা এটা রূপ পায় মাটির মূর্তিতে। এগুলির মধ্যে শুধু যে পরিবারের চিত্রই রূপ পায়, তা নয়, গ্রাম্য নানা পরিচিত পরিবেশ ও চরিত্রের পুতুলের মেলা বসে। মধ্যরাত্রে চার্চের ঘণ্টাধ্বনি জানিয়ে দেয় যিশুর জন্ম-মুহূর্ত আর শুরু হয় ক্রীষ্টমাস। প্যারীনগরীর উৎসব জাঁক-জমকে ভরা আর গ্রামীণ উৎসবে সাদাসিধে ভাব। ছুচাকার একটা ছোট গাড়ীতে মেষপালকেরা প্রদীপ জ্বালায়, আর সেটা টেনে নিয়ে যায় একটি মেষ। এটাকে সাজানো হয় ফুলে-মোমবাতিতে মনোহারী করে। এই প্রদীপবাহী শকটকে আনন্দ মুখরতার মধ্যে শোভাযাত্রা করে চার্চে নিয়ে যাওয়া হয়, আর মেষপালকেরা বাঁশী আর ড্রাম বাজিয়ে পুরানো নানা প্রচলিত গান গায়, বাতি জ্বালায়, ফুল-ফল দেয়। শোভাযাত্রার শেষে একজন মেষপালক বেদীতে পাদ্রীর হাতে সেই প্রদীপটা তুলে দেয়। এই অনুষ্ঠানের পর সমগ্র ফরাসী দেশের রীতি আছে পারিবারিক মিলন-অনুষ্ঠানে খানাপিনা করা।

ক্রীষ্টমাসের পূর্বদিন ছোট ছেলেমেয়েরা fire placeএর কাছে তাদের জুতো খুলে রেখে দেয়, তাদের ধারণা Father Christmas শেষ রাত্রে এখানে এসে থামবেন আর এগুলো বাদাম, খেলনা আর মিষ্টিতে ভরে উঠবে। নাচে গানে উৎসব মুখরিত হয়ে ওঠে।

২৫শে ডিসেম্বর ক্রীষ্টমাসের দিন। পারিবারিক খানাপিনা, সকলের একসঙ্গে সমবেত হওয়া অনুষ্ঠানের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ। ছুটির আমেজে সারা অনুষ্ঠান মুখরিত।

জার্মানীর উৎসব

শুদ্ধসত্ত্ব বসু

জার্মানদেশের উৎসব বলতে ঐ এক কথাই বলতে হয়। খৃষ্টধর্মের উৎসবগুলিকে এই দেশ বিশেষভাবে পালন করে এসেছে। অন্ততঃ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বপর্যন্ত।

খৃষ্টধর্ম যখন জার্মানীতে প্রবর্তিত—তখন থেকেই খৃষ্টীয় উৎসবগুলিও প্রবর্তিত হয়। ষোড়শ শতাব্দীর Reformation-এর ফলে উত্তর, মধ্য এবং উত্তরপূর্ব জার্মান প্রোটেষ্টাণ্ট হয়ে পড়লো (এই প্রোটেষ্টাণ্টদের Lutherian এবং Calivinist বলেও অভিহিত করা হয়ে থাকে , আর পশ্চিম, দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব জার্মান হলো রোমান ক্যাথলিক। এই দুইদলে ধর্ম সংক্রান্ত বিবাদ লেগেই ছিল, ফলে খৃষ্টধর্মের প্রসার বা তাকে কেন্দ্র করে সাংস্কৃতিক উৎসবানুষ্ঠান একটু ব্যাহত হতে লাগলো। তবু জার্মান জাতির মধ্যে নববর্ষের উৎসব এবং বড়দিনের উৎসব যথারীতি হতে লাগলো।

বিংশ শতাব্দীতে প্রথম মহাযুদ্ধের শেষে জার্মানীতে যখন বিপর্যয় ঘটলো—তখন খৃষ্টধর্মের সংগে অন্যান্য ধর্মমতের মিশ্রণ ঘটে। তাতেও কিন্তু বড়দিনের উৎসবানুষ্ঠানের ব্যাঘাত ঘটে নি। ধর্মের দিক থেকে দেশে নানা ভাঙাগড়া অবশ্য চলছিল। Roman Catholic দল শক্তিশালী হয়, বিশেষ করে এই শতাব্দীতে যখন ব্যাভারিয়া (১৯২৬), প্রুসিয়া (১৯২৯) এবং বাডেন (১৯৩২) প্রদেশরূপে গণ্য হয়—তখন রোমান ক্যাথলিকগণ বিশেষ প্রভাবশালী হয়ে পড়ে। এমন কি নাজীরা পরে চেষ্টা করেও Protestant church ঠিক করতে পারেন নি।

ধর্মের বিরোধ যাই থাক না কেন, উৎসব-সূচীর কোনো বদল ঘটে নি। জার্মানের উৎসবের একটি বৈশিষ্ট্য হলো যে বড়দিনের সময় খৃষ্টজন্মের প্রধান ঘটনাকে স্মরণ করার এক বিস্ময়কর ব্যবস্থা। যীশুখৃষ্টের জীবন অবলম্বনে নাটকাভিনয় করার ব্যবস্থা এই উৎসবের একটি প্রাণময় বৈশিষ্ট্য। এই উৎসবে যীশুখৃষ্টের শেষ জীবনকে বিশেষভাবে রূপায়িত করা হয়ে থাকে। দক্ষিণ জার্মানীর মিউনিক সহর থেকে প্রায় চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ মাইল দূরে "ওবেরআমারগাউ" (Oberammergau) নামে একটি গ্রামে এই উৎসব বিশেষ বিখ্যাত। যীশুখৃষ্টের শেষ জীবনকে বা জীবনের শেষাংশকে ইংরাজীতে Passion বলে। জার্মানীতে বিশেষ করে এই ওবেরআমারগাউ গ্রামে মধ্যযুগ থেকে এই 'প্যাসন প্লে'র অভিনয় করার উৎসব চলে আসছে। শোনা যায় একবার মহামারীতে এই গ্রাম প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হতে যাচ্ছিল, ঠিক সেই সময় যীশুখৃষ্টের নাম স্মরণ করেই এই ধ্বংসের হাত থেকে 'ওবেরআমারগাউ' গ্রাম রক্ষা পায়, সেই থেকে জার্মানীর এই গ্রামে Passion play-র উৎসব প্রবর্তন করা হয়। প্রতি দশবছর অন্তর এই অভিনয় হয়। খৃষ্টের ভূমিকায় যিনি অভিনয় করবেন—নিয়ম হলো তাঁকে সাত্ত্বিকভাবে জীবনধারণ করে খৃষ্টীয় চেতনায় নিজেকে গ্রামে উদ্বুদ্ধ করে নিতে হবে এবং যীশুখৃষ্টের সাধনায় যখন তিনি দীক্ষিত হয়ে উঠবেন—তখন তাঁকে ঐ Passion play-তে অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হবে।

শোনা যায় Passion play প্রথমে ল্যাটিন ভাষায় লিখিত হয়, পরে তা ভাষান্তরিত হয়ে জার্মানীতে অনূদিত হইয়াছে। ত্রয়োদশ শতকে যীশুখৃষ্টের জীবন নিয়ে নাটকাভিনয় হতো জার্মানীর সকল ধর্মোৎসবে। তবে ১৬০৪ খৃষ্টাব্দ থেকেই Bavarian Alps অঞ্চলের ওবেরআমারগাউ গ্রামে এই Passion play-র উৎসব

হয়। খৃষ্টের জীবন, তাঁর উপদেশ, দুঃখ বেদনাকে স্বীকার করার মানবতার জন্যে তাঁর অদ্ভুত সাধনা, এবং মৃত্যু ও পুনরুত্থান নিয়ে লেখা এই Passion play. এই উৎসব প্রতি দশবছর অন্তর হয় বলে—শুধু জার্মানের নয়, খৃষ্টধর্মাবলম্বী সব রাজ্য থেকেই সবলে আসেন—ভাবগম্ভীর এই উৎসবে যোগ দিতে। ১৬৩৩ থেকে প্রতি দশবছর পর পর এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে—আজ পর্যন্ত যুদ্ধের জন্যে শুধু তিনবার এই উৎসব বসতে পারেনি। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে যখন এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয় তখন মিউনিক সহরে রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত ছিলেন—তাঁকে আমন্ত্রণ জানানো হয় জার্মানীর জাতীয় উৎসবে যোগ দেবার জন্যে; তিনি মিউনিক থেকে ৬৪ মাইল দূরে ঐ গ্রামে গিয়ে জার্মান ভাষায় লেখা ঐ Passion play অভিনীত হতে দেখেন। তিনি তারপর এই উৎসবে যোগ দেওয়ার প্রেরণা থেকেই The Child নামে ইংরাজী বিশিষ্ট নাটকটি লেখেন।

জার্মান দেশের আর একটি লোক উৎসব আছে—সেটাকেও জাতীয় উৎসব বলা যেতে পারে। সেই উৎসবের নাম হলো Wartburg Festival. বিখ্যাত ধর্মসংস্কারক মার্টিন লুথারের জন্ম তারিখে এই উৎসব পালিত হয়—এবং তাঁর জন্ম জয়ন্তী পালনই এই উৎসবের মূল কথা। Wartburg হচ্ছে একটি দুর্গ—খাড়া উঁচু একটি পাহাড়ের ওপর মনোরম ভংগীতে সুন্দর কয়েকটি প্রাসাদ ও উদ্যান বিশিষ্ট দুর্গ। এই দুর্গে ১৫২১ সালের ৪ঠা মে মার্টিন লুথার Federick the Wise-এর দ্বারা আনীত হন—এবং এখানেই তিনি New Testament অংশের অনুবাদ শেষ করেন। হয়তো এই ঘটনাকে স্মরণ করেই নভেম্বর মাসে Wartburg Festival অনুষ্ঠিত হয়। আবালবৃদ্ধবনিতা এই উৎসবে জমায়েত হয়ে আনন্দে মত্ত হয়ে ওঠে; এই উৎসবটি ভারতবর্ষের গ্রাম্য মেলার মতো, স্নিগ্ধ এবং প্রাণময়। মার্টিন লুথার নভেম্বর মাসের দশ তারিখে (১৪৮৩ সালে) জন্মগ্রহণ করেন—তাই প্রচণ্ড শীতের সময় নভেম্বর মাসে এই Wartburg Festival অনুষ্ঠিত হয়।

গ্রন্থশ্রীর বই

॥ কয়েকখানি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস ॥

অংশুমান মিত্র

ইতিহাসের নায়িকা　২·৫০

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

চোখের বাহিরে　২·৫০

প্রভাত দেব সরকার

মধুর এমন　৩·০০

চিত্তরঞ্জন মাইতি

ডঃ জনসনের ডায়েরী　৩·০০

সুবোধ ঘোষ

মুক্তিপ্রিয়া (২য় মুদ্রণ)　২·৫০

বারীন্দ্রনাথ দাস

অনেক সন্ধ্যা, একটি সন্ধ্যাতারা　৪·০০

প্রভাত দেব সরকার

মধুর এমন　৩·০০

ডি. এম. লাইব্রেরী

৪২, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের

অবিস্মরণীয় উপন্যাস

যদি জানতেম　৪·০০

কন্যা মৃগয়া (২য় মুদ্রণ)　৩·০০

স্বনির্বাচিত গল্পগ্রন্থ

সাত দিন　২·৫০

গ্রন্থশ্রী প্রাইভেট লিমিটেড

১৭০/৩, প্রিন্স আনোয়ার সা রোড,

কলিকাতা-৩৩

অনিলকুমার ভট্টাচার্যের

দু'খানি মনোরম উপন্যাস

উপলব্ধি　২·০০

মেঘ পাহাড়ের গান　২·০০

আধুনিক কবিতার বই

সাগর আকাশ　২·০০

ডি. এম. লাইব্রেরী

৪২, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

আমেরিকার উৎসব

গোপাল ভৌমিক

প্রথমেই বলে রাখা ভাল যে এই প্রবন্ধে আমেরিকা বলতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে বোঝানো হয়েছে। তেমনই উৎসব কথাটাকেও প্রয়োগ করা হয়েছে খানিকটা সংকীর্ণ অর্থে। উৎসব বলতে এখানে ব্যক্তিগত বা পারিবারিক উৎসব বোঝানো হয় নি—বোঝানো হয়েছে সামাজিক উৎসব, যে উৎসবে সাধারণত সকল শ্রেণীর নরনারী যোগদান করে থাকে। এই সামাজিক উৎসবও আবার দুই প্রকারের হতে পারে—ধর্মীয় এবং ধর্ম সম্পর্কশূন্য। ধর্মীয় উৎসব সাধারণত একটি বিশেষ ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। উৎসবের উদ্ভবের ইতিহাস অনুসন্ধান করলে দেখা যায় যে সুদূর পুরাকালে এর উদ্ভব হয়েছিল এবং যুগ পরম্পরায় এগুলি চলে আসছে। অনেক ক্ষেত্রে আমরা যে উৎসব পালন করি, তার উদ্ভব ও বিবর্তনের ইতিহাসও আমরা স্পষ্ট জানি না। মানুষ যখন বনের পশু পাখী শিকার করে প্রাণ ধারণ করত, সভ্যতার সেই আদিম স্তরে তার উৎসব ছিল শিকারের সাফল্য সূচক। তারপর কৃষি সভ্যতার স্তরে মানুষের উৎসব হয়েছিল কৃষিকেন্দ্রিক। কোন কোন ক্ষেত্রে বড় যুদ্ধজয়ের স্মারক উৎসবও প্রচলিত আছে। সর্বাপেক্ষা অধিক প্রচলিত ও জনপ্রিয় উৎসব অবশ্য হল ধর্মকেন্দ্রিক উৎসব। বিগত দুই তিন শতকের মধ্যে সমগ্র বিশ্বে গণতান্ত্রিক ভাবধারা প্রসারের ফলে আবার কতকগুলি রাজনৈতিক উৎসবেরও সৃষ্টি হয়েছে। উৎসব কথাটির মধ্যে আনন্দের ভাব অন্তর্নিহিত থাকলেও বহুক্ষেত্রে শোকাবহ ঘটনার স্মারক হিসাবেও উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উদাহরণ স্বরূপ যীশুখৃষ্টের ক্রুশবিদ্ধ হয়ে দেহত্যাগের মর্মান্তিক ঘটনার স্মরণের খৃষ্টান সমাজে যে উৎসব প্রচলিত তার কথা বলা যেতে পারে।

আমার আলোচ্য প্রবন্ধে আমি আমেরিকার ধর্মীয় উৎসবের কোন আলোচনা করব না। তার কারণ আমেরিকায় প্রচলিত ধর্ম হল খৃষ্টান ধর্ম এবং খৃষ্টান ধর্ম পৃথিবীর যে যে দেশে প্রচলিত সে সব দেশের সর্বত্র একই ধরণের ধর্মীয় উৎসব প্রচলিত। এক্ষেত্রে বিভিন্নতা বড় একটা থাকে না। যেমন ধরা যাক—খৃষ্টান ধর্মের দুটি বড় উৎসব হল যীশুখৃষ্টের শুভ আবির্ভাব উপলক্ষে অনুষ্ঠিত ক্রিষ্টমাস এবং তাঁর ক্রুশবিদ্ধ হয়ে দেহত্যাগ ও পুনরুজ্জীবন উপলক্ষে পালিত ইষ্টার উৎসব। ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানী, আমেরিকা প্রভৃতি সকল দেশেই এ দুটি উৎসব একই সময়ে এবং একই ভাবে প্রতিপালিত হয়। সুতরাং এই জাতীয় উৎসবকে একটি বিশেষ দেশের বা জাতির উৎসব হিসাবে চিহ্নিত করা যায় না। অপর পক্ষে এমন কতকগুলি জাতীয় উৎসব থাকে যেগুলি সাধারণতঃ একটি বিশেষ জাতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আমেরিকার এই ধরণের নিজস্ব উৎসব নিয়েই এখানে আলোচনা করব। এ ক্ষেত্রেও আবার আমেরিকার একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্যের দিকে প্রথমেই আমাদের দৃষ্টি দেওয়া ভাল। আধুনিক আমেরিকা বলতে আমরা যাকে বুঝি তা হল মূলত শ্বেতাঙ্গ প্রধান। এই শ্বেতাঙ্গ আমেরিকার উদ্ভব হয়েছে মাত্র শ চারেক বৎসর—কলম্বসের আমেরিকা আবিষ্কারের পর। তারও পূর্বে আমেরিকায় যারা বসবাস করত তারা রেড ইণ্ডিয়ান নামে পরিচিত আদিবাসী। এই আদিবাসীরা শ্বেতাঙ্গ সভ্যতার চাপে ক্রমশ ক্ষীয়মান হলেও তারা একেবারে অবলুপ্ত হয়ে যায় নি—তাদের নিজস্ব সভ্যতা ও সংস্কৃতি নিয়ে আজও তারা বিদ্যমান। সুতরাং এই প্রবন্ধে রেড ইণ্ডিয়ানদের বিশেষ বিশেষ উৎসবের কথাও আলোচনা করতে হয়। তা ছাড়া আছে আমেরিকার কৃষ্ণাঙ্গ নিগ্রো সম্প্রদায়। আমেরিকার নিগ্রোরা সকলেই খৃষ্টান বলে তাদের

ধর্মীয় উৎসব যেভাবে খৃষ্টানদেরই অনুরূপ। জাতীয় উৎসবের ক্ষেত্রেও বর্ণগত বিভিন্নতার অবকাশ নেই। তবু আফ্রিকার ধারাবাহী নিগ্রো সমাজের মধ্যে নিজস্ব কিছু কিছু উৎসব বর্তমান আছে।

ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে আমেরিকার জাতীয় উৎসব বলতে নিম্নলিখিত উৎসবগুলিকে বোঝায়: স্বাধীন আমেরিকার প্রথম প্রেসিডেন্ট জর্জ ওয়াশিংটনের জন্মদিবস ২২শে ফেব্রুয়ারি, স্বাধীনতা দিবস ৪ঠা জুলাই, ধন্যবাদ দানের দিবস নবেম্বর মাসের শেষ বৃহস্পতিবার, ক্রিসমাস দিবস ২৫ই অক্টোবর, মাতৃদিবস ১০ই মে, পিলগ্রিম ফাদার্স ডে ১৬ই সেপ্টেম্বর, পতাকা দিবস ১৪ই জুন প্রভৃতি। এর বাইরেও কিছু কিছু আঞ্চলিক উৎসব প্রতিপালিত হয়—যেমন দক্ষিণাঞ্চলের নর্থ ক্যারোলিনা রাজ্যের পুষ্পোৎসব। এই পুষ্পোৎসব বর্ণাঢ্যতার ও বৈশিষ্ট্যে অতুলনীয় হলেও একটি বিশেষ রাজ্যের মধ্যে এটি সীমাবদ্ধ—মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য রাজ্যে এর অস্তিত্ব নেই। আলোচ্য উৎসবগুলির মধ্যে জর্জ ওয়াশিংটনের জন্মদিবস ও স্বাধীনতা দিবসের বিশেষ পরিচয় দেবার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। আমাদের জাতির জনক গান্ধিজীর জন্মতিথি ২রা অক্টোবর যেমন সারা ভারতে উদ্‌যাপিত হয়, তেমনই স্বাধীন আমেরিকার জনক ওয়াশিংটনের জন্মোৎসবও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সকল রাজ্যে শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রতিপালিত হয়ে আসছে প্রতিবৎসর ২২শে ফেব্রুয়ারি। পিলগ্রিম ফাদার্স ডে ও ধন্যবাদ দানের দিবস দুটি বিভিন্ন হলেও এ দিবস দুটির তাৎপর্য একই প্রকারের এবং বিষয়েও প্রায় এক। এ দুটি দিবসেরই মূলে আছে পিলগ্রিম ফাদার্স নামে পরিচিত আমেরিকায় পলায়নকারী প্রথম একদল ধার্মিক ইংরেজের স্মৃতি। ইংল্যাণ্ডে এঁরা নিজস্ব মতে ধর্মোপাসনা করতে গিয়ে বাধা পেয়েছিলেন বলে ১৬২০ খৃষ্টাব্দের ১৬ই সেপ্টেম্বর মে ফ্লাওয়ার নামক জাহাজে ইংল্যাণ্ডের প্লাইমাউথ বন্দর থেকে রওনা হয়েছিলেন আমেরিকার উদ্দেশ্যে। তাঁরই স্মারক হিসাবে উদ্‌যাপিত হয় পিলগ্রিম ফাদার্স ডে। প্রায় দুই মাসাধিক কাল সমুদ্র যাত্রার পর এঁরা এসে পৌঁছেছিলেন আমেরিকার উত্তর পূর্ব কোণের মাসাচুসেট্‌স রাজ্যে এবং সেখানে নতুন প্লাইমাউথ উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন। এঁরা নবেম্বরে আমেরিকায় পৌঁছেছিলেন এবং রোগে ও খাদ্যাভাবে তাঁদের প্রায় অর্ধেক নরনারীর জীবনাবসান হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত মাসাচুসেট্‌স্ রাজ্যের বন্ধুভাবাপন্ন রেড ইণ্ডিয়ান অধিবাসীদের সহযোগিতায় তাঁরা উপনিবেশ স্থাপন করে কি ভাবে উক্তরাজ্যে চাষ-আবাদ ও যন্ত্রশিল্পের প্রবর্তন করেছিলেন সে এক স্বতন্ত্র ইতিহাস। তাঁদের সেই প্রথম ফসল পাবার পর তাঁরা রেড ইণ্ডিয়ানদের সহযোগিতায় যে উৎসব করেছিলেন তারই স্মারক হয়ে আছে এই ধন্যবাদ দানের দিবস। তাঁদের নির্বাচিত গভর্নর উইলিয়াম ব্রাডফোর্ড এই উৎসবের দিনটিকে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দানের দিবস রূপে চিহ্নিত করেছিলেন। তদবধি পুরুষানুক্রমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টগণের আদেশক্রমে নবেম্বর মাসের শেষ বৃহস্পতিবার ধন্যবাদ দানের দিবসরূপে উদ্‌যাপিত হয়ে আসছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সকল রাজ্যে।

ক্রিসমাস দিবস উদ্‌যাপিত হয় আমেরিকা আবিষ্কারক দুঃসাহসী নাবিক ক্রিস্টফারের স্মরণে। প্রতিবৎসর ১৪ই জুন তারিখে উদ্‌যাপিত পতাকা দিবসের মধ্যে নিহিত আছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় পতাকার উদ্ভব ও বিবর্তনের ইতিহাস। ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দের ১৪ই জুন সর্বপ্রথম জাতীয় পতাকা গৃহীত হয়েছিল এবং এই প্রথম পতাকাটি জর্জ ওয়াশিংটনের অনুরোধে ফিলাডেলফিয়ার মিসেস্ বেট্‌সি রোজ নির্মাণ করেছিলেন। প্রথম এই পতাকায় ছিল পরপর লাল ও শাদা রঙের ১৩টি লম্বাদাগ এবং নীল রঙের পটভূমিকায় ১৩টি শাদা তারা। এই তেরটি তারা ছিল তৎসময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গীভূত তেরটি রাজ্যের প্রতীক।

১৮১৮ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার কংগ্রেসে স্থির হয় যে কোন নতুন রাজ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গীভূত হলে এক একটি করে তারার সংখ্যা পতাকায় বেড়ে যাবে। আজ এই ভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় পতাকায় তারার

সংখ্যা হয়েছে ৩১৮। আমেরিকার উৎসবগুলির মধ্যে মাতৃদিবস একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ দিবস। সমস্ত যুক্তরাষ্ট্রে মা-দের প্রতি সন্তান সন্ততিগণ কর্তৃক যথোচিত প্রীতি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনই এই দিবসের উদ্দেশ্য। এই দিবসটির প্রথম সূত্রপাত হয় ১৯০৭ সালে ফিলাডেলফিয়ার মিস্ অ্যানা এম্ জার্ভিসের উদ্যোগে। বর্তমানে প্রেসিডেন্টের আদেশক্রমে এই দিবসই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সর্বত্র প্রতিপালিত হয় এবং এই দিবসে মা-দের নানা ভাবে সম্মানিত করা হয়। মাতৃদিবসের উদ্দেশ্য শুধু মা-দের প্রতি সম্মান প্রদর্শন নয়, মাতৃকল্যাণও বটে। আমেরিকার এই আদর্শে বর্তমানে পৃথিবীর অনেক দেশেই মাতৃকল্যাণ দিবসের অনুষ্ঠান হয়। আঞ্চলিক উৎসব গুলির মধ্যে প্রধান হল নর্থ ক্যারোলিনার পুষ্পোৎসব। ৪৫,০০০ অধিবাসীর সহর নর্থ ক্যারোলিনার উইল্‌মিংটনে এই উৎসব কয়েকদিন ধরে চলে। অ্যাজালিয়া ও ক্যামেলিয়া ফুলের জন্য উইল্‌মিংটন সহর সারা আমেরিকায় প্রখ্যাত। অ্যাজালিয়া ফুলের সমারোহ দেখা দিলে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয় এবং প্রতিবৎসর এই উৎসব উপলক্ষে আড়াই লক্ষাধিক নরনারীর সমাগম হয়। সভা, শোভাযাত্রা নৃত্য গীত প্রভৃতিতে এই ছোট শহরটি কয়েকদিনের জন্য উৎসব মুখরিত হয়ে ওঠে।

আমেরিকার উল্লিখিত উৎসবগুলির বাইরে বিভিন্ন রাজ্যের রেড ইণ্ডিয়ান আদিবাসীদের মধ্যে বিশেষ বিশেষ উৎসবের সাক্ষাৎ আজও পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য, এসব উৎসবে শ্বেতাঙ্গ নরনারীরা যোগ গ্রহণ করে না—এগুলি মূলত সীমাবদ্ধ রেড ইণ্ডিয়ান শ্রেণীর বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে। এই সব উৎসব মোটামুটি শিকার ও কৃষি কেন্দ্রিক এবং এই সব উৎসব বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে রেড ইণ্ডিয়ানরা এখনও সভ্যতার আদিম স্তরে পড়ে আছে। আমেরিকার বিভিন্ন রাজ্যের রেড ইণ্ডিয়ানদের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে এই সব উৎসব বিভিন্ন রূপে দেখা যায় প্রবন্ধের স্বল্প আয়োজনের মধ্যে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা সম্ভব নয়। নববর্ষ, শস্যকর্তন প্রভৃতি উপলক্ষে রেড ইণ্ডিয়ানরা অন্যান্য দেশের আদিবাসীদের মত সঙ্গীত ও নৃত্যোৎসব করে এবং সুরাপানে মত্ত হয়। তাদের এই জাতীয় উৎসব বহু ক্ষেত্রে কয়েকদিন ধরে চলে এবং এই সব উৎসব উপলক্ষে মহিষ নৃত্য, সর্পনৃত্য প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। এই সব উৎসবের সুযোগে নরনারী অবাধ মিলনের সুবিধা পায় এবং অবিবাহিত তরুণ তরুণীর বিবাহাদির সুবিধাও হয়। সামাজিক ভোজ এই সব উৎসবের প্রায় অপরিহার্য অঙ্গ। রেড ইণ্ডিয়ানদের গ্রাম থেকে অনিষ্টকারী ভূত প্রেত অপসারণ কিংবা রোগাদির অবসান কল্পেও নৃত্যগীত প্রভৃতি উৎসবের আয়োজন করা হয়। এই সব রেড ইণ্ডিয়ান উৎসব এত বিচিত্র এবং এরূপ বিস্তারিত ধরণে সেগুলি অনুষ্ঠিত হয় যে একটি প্রবন্ধে সেগুলির সম্যক পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়। তাই রেড ইণ্ডিয়ান উৎসবের উল্লেখমাত্র করে আমি আমেরিকার উৎসব সম্পর্কিত এই আলোচনা শেষ করলাম।

আমেরিকার লোক উৎসব

লোক উৎসব আজ আমেরিকার কাছে খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। লক্ষ লক্ষ ছেলেমেয়ে বিভিন্ন লোক উৎসব উপলক্ষ্যে আনন্দে মেতে ওঠে—নাচ, গান, প্রমোদ ভ্রমণ, খাওয়া দাওয়া ও হৈ হুল্লোড়ে গা ভাসিয়ে দেয়।

কিন্তু আমেরিকার এই সব লোক উৎসবের অন্য একটা তাৎপর্য আছে, শুধু বাইরের আনন্দটাই এখানে শেষ কথা নয়। উৎসব উপলক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্রের সর্বত্র কিশোর কিশোরী, তরুণ তরুণীরা যে লোকনৃত্যে অংশগ্রহণ করে তা এসেছে বৃটেন, স্কান্ডিনেভিয়া, ইতালী, পোল্যাণ্ড, মেক্সিকো, রাশিয়া, ইজরায়েল, ফিলিপাইন ও অন্য আরও কত দেশ থেকে। লোকনৃত্যে এই সকল দেশের নিজস্ব যে বৈশিষ্ট্য রয়েছে, সেই বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য আমেরিকার মাটিতে একটা সংহতরূপ লাভ করল। আমেরিকান ইণ্ডিয়ানদের নিজস্ব সঙ্গীতে ও নিগ্রোদের স্পিরিচুয়াল প্রভৃতি আমেরিকার নিজস্ব ঐতিহ্যের সঙ্গীতের সঙ্গে এই সব বিদেশী সঙ্গীতের মিলন হল। সৃষ্টি হল এক নবসঙ্গীতের। কাজেই নতুন সৃষ্ট এই সঙ্গীতে বিভিন্ন দেশের ঐতিহ্যের প্রতিফলন কিছুই বিস্ময়ের নয়। এমনিভাবে বহু দেশের উৎসবের বৈশিষ্ট্য এসে মিলেছে আমেরিকার মিলন তীর্থে।

আমেরিকার ইতিহাসের গোড়ার যুগে এই সমস্ত নাচ গান আদিম অধিবাসীদের চিত্তবিনোদনের প্রধান উপকরণ ছিল। এই প্রাচীন রীতির আমোদ প্রমোদ তারা ত্যাগ করে নি। তবে বিভিন্ন অঞ্চলভেদে কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পুরানো ঐতিহ্যের নাচ গান উৎসবের মধ্যে কিছু পরিবর্তনের ছোঁয়া এসে লাগছে।

যুক্তরাষ্ট্রের ছোট বড় প্রত্যেকটি অঞ্চলভেদে হাজার হাজার লোক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। গার্ল স্কাউটরা দলে দলে এতে অংশগ্রহণ করে থাকে।

কেনটাকির অ্যাপলাচিয়ানে প্রতি বছর গানের মজলিস বসে। পাহাড়ী পরিবেশে আসর বসে। পাহাড়ী ছেলেমেয়েরা এসে যোগ দেয় এ আসরে। তাদের পরণে থাকে ইংল্যাণ্ডের রাণী প্রথম এলিজাবেথের সময়ের পোষাকের অনুকরণে প্রস্তুত পোষাক। দুই এলিজাবেথের সময়ের মধ্যে কি আকাশ জমিন পার্থক্য এখানকার এই উৎসবের গান নাচ পোষাক পরিচ্ছদের মধ্যে তা সুপরিস্ফুট। কেনটাকির এই গানের উৎসবকে অতীতের একটি সুন্দর পৃষ্ঠা বলা যেতে পারে। পুরানো ইংলণ্ডের সংস্কৃতির একটা বৈশিষ্ট্য এই উৎসবের মধ্যে পাওয়া যায়।

উত্তর ক্যারোলাইনার অ্যাশভিলের পাহাড়ী নাচ আর গানের উৎসবের মধ্যে অ্যাংলো স্যাক্সন যুগের প্রাচীন ঐতিহ্যের ছাপ রয়েছে।

আমেরিকার মধ্যপশ্চিমাঞ্চলে মিনেসোটার সেন্টপল উৎসব ঐ অঞ্চলের প্রাচীনতম ও অন্যতম শ্রেষ্ঠ উৎসব। ঐ অঞ্চলে বিদেশ থেকে যত লোক এসেছে তারা ঐ দিবসে নিজ নিজ জাতীয় পোষাক পরিচ্ছদ পরে, তারপর নানা লোকসঙ্গীত ও নৃত্যের মাধ্যমে সেই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তীকালে ইউরোপের বহু অঞ্চলের বহু অধিবাসী আমেরিকার ঐ এলাকায় বসতি স্থাপন করেছিলেন। তাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের পরিচয় ঐ সকল অনুষ্ঠানে পাওয়া যায়। সেই সকল দেশের সাংস্কৃতিক ধারাই ঐ সকল উৎসবে প্রতিফলিত হয়ে থাকে।

এমন এক সময় ছিল যখন বিদেশাগতদের মধ্যে অনেকেই মনে করতেন, যে দেশ থেকে তাঁরা এসেছেন সে দেশের রীতিনীতি, ধরনধারণ, জীবনযাত্রা প্রণালী তাদের ভুলতেই হবে। সাম্প্রতিককালে কিন্তু সেই ধারণা পরিবর্তিত হয়েছে। তাঁরা উপলব্ধি করেছেন যে, নূতন দেশে তাদের সঙ্গে তারা যে সাংস্কৃতিক সম্পদ নিয়ে এসেছেন এতো তারই অঙ্গ। এখন লোকসঙ্গীত ও ঘোরার নৃত্যের যে সকল সংস্থা আছে তারা ঐ সকল

বিদেশাগত ব্যক্তিবৃন্দের সন্তান সন্ততিদের, তাদের পিতৃপিতামহের দেশের লোকসঙ্গীত ও নৃত্যানুশীলনের জন্য উৎসাহ দিয়ে থাকে। বড়দিন, ধন্যবাদজ্ঞাপন দিবস, নববর্ষ এবং মার্দার্সডে প্রভৃতি উৎসবকে নূতন নৃত্যধারায় অভিষিক্ত করার জন্য ঐ সকল উৎসবে আনন্দ সঞ্চারের জন্য তারা তাদের আহ্বান করে থাকেন। তাই এখন সারাবছরই ফ্রীডল্যাণ্ড, বাকেলো, সেন্টলুই, লসএঞ্জেলস প্রভৃতি সহরের সকল উৎসব ও অনুষ্ঠানে পোলিশ, চেক, হাঙ্গেরীয় এবং ইউরোপের অন্যান্য অঞ্চলের স্কোয়ার নাচ ও গানে মুখরিত হয়ে উঠে: পোল্যাণ্ড, চেকোস্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরী, ফিনল্যাণ্ড প্রভৃতি স্থানের অধিবাসীরাই এই সকল স্থানে একরা বসতি স্থাপন করেছিলেন।

উৎসব মুখরিত রাজ্যসমূহের মধ্যে ক্যালিফোর্নিয়া বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ঐ রাজ্যে সারাবছর ধরেই বহু উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। ইউরোপ ছাড়া এশিয়ারও বিভিন্ন দেশের সঙ্গীত ও নৃত্যকেও এই সকল অনুষ্ঠানের কার্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

লোক উৎসবের দিক থেকে আর একটি উল্লেখযোগ্য স্থান হচ্ছে নিউ মেক্সিকো। এখানকার উৎসবে দেখা যায় রেড ইণ্ডিয়ান জাতির জমকালো নাচ আর শোনা যায় তাদের সঙ্গীত। আমেরিকার বেশীর ভাগ রাজ্যেই রেড ইণ্ডিয়ানদের উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

আমেরিকার দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চল রেড ইণ্ডিয়ান এবং প্রাচীন স্পেনীয় জাতির ঐতিহ্যে পরিপুষ্ট। এখানকার প্রথমযুগের দিনগুলি ছিল বর্ণাঢ্য ও রোমাঞ্চকর এবং সমাজজীবন ছিল আনন্দোৎফুল্ল।

আমেরিকার লোকসাহিত্য, লোকসঙ্গীত, লোকনৃত্য, নানাদেশের লোকসাহিত্য, সঙ্গীত ও নৃত্য ধারায়ই গড়ে উঠেছে। মানুষের চিত্তবিনোদনের দিক থেকে যেমন এদের একটা বিশেষ মূল্য আছে তেমনি জাতি ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে মানুষের মিলন সাধনেও লোকসঙ্গীত ও সাহিত্যের আছে একটা বিশেষ তাৎপর্য।

উৎসব-রাজ শান্তিনিকেতনে

কালিদাস নাগ

রবীন্দ্রনাথের পিতৃদেব মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ (১৮১৭-১৯০৬) প্রায় ৯০ বছর পর্য্যন্ত বেঁচে ১৯-২০ শতাব্দীর যোগসেতু হয়েছিলেন। তাঁর মনীষী-পুত্র কবি রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১-১৯৪১) ৮০ বছরের জীবনে পরাধীন ভারতকে স্বাধীন জগতের পথে এগিয়ে দিয়ে গেছেন এই দুই মহাপুরুষের জীবন ও সাধনা দীপ্ত হয়ে উঠেছে শান্তি-নিকেতনকে কেন্দ্র করে। অথচ বীরভূম জেলার এই বিরাট প্রান্তরের কোলে স্নিগ্ধ পল্লীটি "পল্লীসমাজে" কীভাবে পরিণত হয়েছিল তার আভাষ পাই শান্তিনিকেতনের বরণীয় নানা পূজা-পার্ব্বণ ও পল্লী-উৎসবে। সংক্ষেপে তার বর্ণনা করব।

গ্রীষ্মকালে ২৫শে বৈশাখ রবীন্দ্রনাথের জন্মোৎসব সেবার ১৯১১ সালে ৫০ বর্ষ পূর্ত্তি উপলক্ষ্যে। শুধু বোলপুর গ্রাম নয়; ষ্টেশন থেকে প্রায় দু মাইল পথ হেঁটে আমরা কলকাতা থেকে বহু নরনারী ছাত্র-ছাত্রীরা শান্তিনিকেতনে কবি জন্মোৎসবে গিয়েছিলাম। প্রায় ১০০ মাইল লুপ লাইন ধরে প্রথম বর্দ্ধমানে থামা ও সেখানে বিখ্যাত সীতাভোগ ও চা-খেয়ে বীরভূম জেলার গ্রাম "ভেদিয়া" পার হয়ে বোলপুর ষ্টেশনে নামা গেল। আশ্রমের ছেলেরা হাসিমুখে আমাদের জিনিষপত্র নামিয়ে মেয়েদের জন্য গোরুর গাড়ী ও আমাদের জন্য পদযাত্রা ব্যবস্থা করল ও হাটার সঙ্গে "গ্রাম ছাড়া ঐ রাঙ্গা মাটীর পথ" গানটি গেয়ে আমাদের পথ-দেখিয়ে চলল। সহরে মানুষদের গ্রামে সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য যেন জলস্ত রূপ পরিগ্রহ করল। রবীন্দ্রনাথের বড় দাদা দার্শনিক দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪০-১৯২৬) থাকতেন নীচুবাঙলায়। তাঁর সেবা করতেন তাঁর পুত্রবধূ শ্রীমতী হেমন্তা ঠাকুর তিনি ৯০ বছর পার করে আজও বেঁচে আছেন। এঁদের প্রণাম করে মণ্ডপে এলাম সঙ্গে ছিলেন সপরিবারে মনীষী সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় যিনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ও সাহচর্য্যে 'প্রবাসী' পত্রিকা ১৯০১ সালে প্রতিষ্ঠা করে যেন নবযুগের সূচনা করলেন; তখন রবীন্দ্রনাথও তাঁর সাহিত্যগুরু বঙ্কিমচন্দ্রকে (১৮৩৮-১৮৯৪) স্মরণ করে নব-পর্য্যায়ে "বঙ্গ দর্শনের" সম্পাদকত্ব নিলেন। সেই পত্রিকায় 'চোখের বালি' ও 'নৌকাডুবি' উপন্যাস শেষ করে বিরাট গল্প উপন্যাস "গোরা" প্রবাসীতে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ করে জাতিকে একটি বড় বৈপ্লবিক প্রেরণা দিলেন। আমরা সেই যুগের ছাত্র-ছাত্রী কবি আশ্রমে, সেদিন ছিলাম ভাবতে আজ গর্ব্ব অনুভব করি। উদাস প্রান্তরে সূর্য্যাস্ত ও আকাশে রঙের খেলা দেখে মুগ্ধ হয়েছি। বৈদিকযুগের ঋষিদের মতন রবীন্দ্রনাথ অধ্যাপক ও ছাত্রদের পরিবেষ্টিত হয়ে বসেছেন, পণ্ডিত-প্রবর বিধুশেখর শাস্ত্রী ও তাঁর সতীর্থ ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় বেদভাষা সংস্কৃতে মন্ত্রোচ্চারণ করছেন, উপনিষদ পাঠ হচ্ছে ও সেই সদাবেশে কবির দীর্ঘ জীবন ও সার্থকতা কামনা করা হল, সঙ্গে সঙ্গে আশ্রম বালকদের সম্মিলিত কণ্ঠে "ব্রহ্মসঙ্গীত" গান শুনে আমরা মুগ্ধ হলাম। এই সিলসিলাই সন্ধ্যায় আবার তাদের গোলপাতার ছাওয়া নাট্য-ঘরে রাতে সম্বরচিত নব নাটক 'রাজা'র অভিনয়ে সবাইকে মুগ্ধ করে। ছাত্ররা বেশীর ভাগ থালিপায়ে ছুটাছুটি করে, ধোপদুরস্ত কাপড় চোপড় নেই তবু পরিচ্ছন্নতার প্রতিমূর্ত্তি এই ছাত্ররা তাদের সেবায়

ওপে "সহরে" অতিথিদের মুগ্ধ করেছিল। তারা আবার গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে ও তাঁর নাতি দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষায় "রাজা" অভিনয়ে সবাইকে মাতিয়ে তুলেছিল। Stage সজ্জা শুধু গাছ পাতা ও ডালপালা দিয়ে; মূল নায়ক 'রাজা' অন্তরালে অপূর্ব্ব অভিনয় করছেন তাঁর কণ্ঠ যেন মন্ত্রশক্তিতে দীপ্ত—যে শুনছে সে মুগ্ধ হয়েছে। বিদ্রোহী রাজাদের নায়করূপে হেডমাষ্টার জগদানন্দ রায় ও রানী সুদর্শনারূপে শ্রীসুধীরঞ্জন দাশকে অভিনয়ে নামতে দেখে ছাত্র-ছাত্রীদের কী উৎসাহ ও আনন্দ অথচ সহরে থিয়েটার না হয়ে গ্রামের "যাত্রা" যেন রূপ পেল রবীন্দ্রনাথের প্রয়োগ বিজ্ঞানের বিস্তারে সেটি দেখলাম। জ্যোৎস্নার আকাশ ভরে গিয়েছে তার মধ্যে বাউগাছের তলায় সুকণ্ঠ ছাত্রদের ধরে রাজার গানগুলি আবার আমরা গাইয়েছিলাম—

বসন্তে কি শুধু কেবল ফোটা ফুলের খেলা রে
হেমন্তে কি শুকনো পাতা ঝরা ফুলের খেলা রে॥
আমার প্রভুর পায়ের তলে
শুধুই কিরে মানিক জ্বলে?
চরণে তাঁর লুটিয়ে কাঁদে লক্ষ মাটির ঢেলা রে।"

শান্তি নিকেতনের সেই ছোট ব্রহ্মবিদ্যালয় আজ বিশ্বভারতী নামে বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে উঠে বাঙালী তথা সারা ভারতবাসীর গৌরব স্থান হয়ে উঠেছে তার মূলে ছিল রবীন্দ্রনাথের "আনন্দ" মন্ত্র ও উৎসবই তার সার্থক আজিও যেটি বুঝতে নানা দেশের মানুষ ছুটে আসছে।

Russia গিয়ে দেখে এসেছি তারা রবীন্দ্রনাথকে পেয়ে আনন্দিত হয়ে তাদের নানা ভাষায় রবীন্দ্র নাট্যের রচনাগুলি লক্ষ লক্ষ কপি ছেপে বিতরণ করছে এবং রুশ-জাতির মূল-উৎস Ballet Dancing যেটি কেন্দ্র করে সমগ্র U.S.S.R.-এর নরনারী এক সম্পূর্ণ শৃঙ্খলা ও ছন্দ লাভে ধন্য হয়েছে সুদূর Siberia-র নির্জ্জন নির্ব্বাসনে কত মনীষী লেখক বন্দী করে পাঠান নিষ্ঠুর জার-তন্ত্রের যুগে, তাই শ্রেষ্ঠ রুশ নেতা Lenin (1870-1924) মাত্র অর্দ্ধশতাব্দীর জীবনেই বিশ্ববিপ্লবকে সার্থক করে শ্রেষ্ঠ সাধারণতন্ত্র Soviet গড়ে গেছেন। তাঁর জন্মশতবার্ষিকীতে আমরাও সানন্দে যোগ দেব। জানাচ্ছি তাই রুশ বন্ধুরা আমাদের গল্পভারতীর উৎসব সংখ্যায় সহযোগ জানিয়েছেন বলে তাঁদের অভিনন্দন জানাই। তখন রবীন্দ্রনাথের 'রাশিয়ার চিঠি' (১৯৩১—৩২) বিশ্বের সব ভাষায় বিতরিত হবে ১৯৬০—৬১ সালে দেখে অবাক হয়েছি যে রবীন্দ্রনাথের প্রত্যেক রচনা মূল বাঙলা থেকে পড়ে তারা অনুবাদ করে বলেছেন যা ইংরেজী ফরাসী বা অন্য কোন ভাষাতেই সম্ভব হয়নি। শুধু তাঁর মহাকাব্য 'বলাকা' (১৯১৬) আমি বাঙলা ভিত্তিক ফরাসী অনুবাদ করে এসেছি (১৯২০-২৭) সেটি U N. E. S. C. O. রবীন্দ্র শতবার্ষিকীতে তাঁরা প্রকাশ করেছেন ও আজিও ভারতবাসীর জন্য "দেবনাগরী" অক্ষরে বলাকা ও তার "ফরাসী"-অনুবাদ পুনঃপ্রকাশ করেছি। তাই ১৯১১ সালের জন্মতিথি উৎসবকে সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে স্মরণ করি। যার ভিতর দিয়ে বৈদিক আশ্রমজীবনের সঙ্গে যেন প্রাণগত যোগ আমাদের সার্থক হয়। সেটি আবার বসন্ত উৎসব নামে ও রাসরাঙ্গিনীতে মূর্ত্তি পেয়েছিল; তারপর এল আশ্রমের আর এক গৌরব "বর্ষামঙ্গলের" উৎসব।

বাঙলা তথা বাঙালীর গর্ব্বের জিনিষ বর্ষা-ঋতু এবং মেঘদূতের কবি কালিদাসের মতোরবীন্দ্রনাথও আসলে প্রধানত বর্ষার কবি এবং তাঁর এই সময়েই রচিত "অচলায়তন" নাটকটিও বর্ষাকেন্দ্রিক। তার অভিনয়ও আশ্রমে দেখে এসেছি ও পরে কলিকাতার বহুস্থানে বর্ষামঙ্গলের গীতোৎসব দেখে ধন্য হয়েছি।

আজি বারিঝরে ঝরঝর ভরা বাদরে
আকাশ-ভাঙা আকুল ধারা কোথাও না ধরে।
শালের বনে থেকে থেকে বড় দোলা দেয় হেঁকে হেঁকে
জল ছুটে যায় এঁকেবেঁকে মাঠের 'পরে।
আজি মেঘের জটা উড়িয়ে দিয়ে নৃত্য কে করে ?

এইসব প্রসিদ্ধ গান রাগরাগিনী সমেত যখন আয়ত্ত হবে তার সঙ্গে রুশশিল্পীরা চলত Uzbekistan-এর নৌকাডুবির (Daughter of Ganga) মত বর্ষামঙ্গলও জগতের সুরজগতের সম্পদ হয়ে উঠবে। নৃত্যও বাদ যাবে না। কারণ রবীন্দ্রনাথের দৌহিত্রী নন্দিতা কৃপালনী রবীন্দ্রনাথের নৃত্য-যোজনাও রুশদেশে দেখিয়ে এসেছেন। অচলায়তন অভিনয়ে শুধু ভারতীয় বলে নয় ইংরেজ অধ্যাপক Pearson সাহেবও অভিনয়ে নেমেছেন ও নেচেছেন শান্তিনিকেতনে দেখে এসেছি। তাঁর অকাল মৃত্যুর পর (১৯২৩) একটি আরোগ্যশালা Pearson Hospital গড়ে উঠেছে। বর্ষামঙ্গলের কত গান ও সুর অপূর্ব প্রেরণায় আমাদের মাতিয়েছিল ও বিখ্যাত কলাবিদ নাটোরের মহারাজা তাঁর পাকা হাতে পাখওয়াজ বাজে সুরে কাঁপিয়ে গেছেন—সব মনে পড়ে।

বর্ষার পরেই আসে শরৎকাল। ইংরেজী Autumnএর সঙ্গে মেলে না তার বিষাদভরা মূর্তি। শস্যশ্যামলা বাঙলা মায়ের রূপের যেন বন্যা বইয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর শারদোৎসব নাট্যে রেখে গেছেন—

"সোনার থালায় সাজাব আজ দুঃখের অশ্রুধার,
জননী গো গাঁথ্‌ব তোমার গলায় মুক্তাহার॥"

মীড়ে মূর্চ্ছায় সে সুর যে বুকের মধ্যে প্রবেশ করেছিল রবীন্দ্রনাথ তাঁরা জানেন। তাঁর সঙ্গে এশিয়া ইউরোপ ও আমেরিকা এই তিন মহাদেশ পরিভ্রমণ করে দেখেছি সুরের রাজা উৎসবরাজ রবীন্দ্রনাথকে আবার নূতন করে যেন আবিষ্কার করতে হবে তবে সুরশব্দজ্ঞানী অথবা তালবিৎ USSR সেই আবিষ্কার করবে। সেটি ভবিষ্যৎকালই জয়মাল্য দেবে। নৃত্যনাট্য পর্যায়েও রবীন্দ্রনাথ সার্থক, সুর-রসিকের মনীষা দেখিয়ে গেছেন। আজই "শেষ বর্ষণ" অভিনয় দেখতে যাবো। উৎসবের পর উৎসব দিয়ে ঋতুতে ঋতুতে রবীন্দ্রনাথ জাতিকে নূতন পথনির্দেশ ও প্রেরণা দিয়ে গেছেন। হয়ত "রবীন্দ্রভারতী" তাঁর শিক্ষাপ্রণালীর সার্থক রূপ দেবেন।

এ বিষয় গবেষণার কত বড় ক্ষেত্র আছে তার আভাষ দিয়েছি আমার "সুরের গুরু রবীন্দ্রনাথ" গ্রন্থে। এই ধারা অবলম্বনে কাজ সুরু হলে ভারতের নানা বিচিত্র সুর ও নৃত্যধারা-মণিপুরী থেকে ভরতনাট্যম ও কথাকলি পর্যন্ত সবদলের শিল্পীরাই বাঙ্গালীর সঙ্গে সহযোগ করবেন ও Western music এর ধুরন্ধর দল ও Piano Violin Cello বাজনা নিয়ে বসবেন এ আশা আমরা করতে পারি Manhein এর মত World Famous শিল্পী সে কথা বলে গেছেন। তখন রবীন্দ্রনাথের বাঙলা দেশই আবার 'সকল দেশের সেরা' হয়ে উঠবে। সুরের সঙ্গে ভাষা মিলিয়ে রবীন্দ্রনাথ আবার ৭০—৮০ বছরের মধ্যে ২০০০ ছবি নিজহাতে এঁকে রেখে গেছেন। তার মধ্যেও অনেক মূল্যবান রূপায়ণের নিদর্শন ও তথ্য আমরা পাব।

তাই শুধু 'রবীন্দ্র প্রবাবলী' পাঠ নয় তাঁর সঙ্গীত ও নাট্যযোজনা তথা শিল্প ইত্যাদির তুলনামূলক চর্চা করলেই তাঁর মত বিশ্বশিল্পীর যথার্থ মর্য্যাদা দেওয়া হবে—সেকথা এই প্রসঙ্গে জানালাম। বাঙলা মাসিক সাপ্তাহিক পত্রিকাদি একাজ সুরু করতে পারেন একথা মনে করাবার জন্য "উৎসব সন্ধ্যার" এই লেখা দিলাম ও "শিল্পের ছিটে ফোঁটা" সুরু করলাম। প্রত্যেক উৎসবেই বাঙলা ভাষা বেশভূষারও সমাবেশ দেখাবার মতন দক্ষ শিল্পী,

চিত্রী ও নাট্যসঙ্গীতের শাখা পত্তন করতে হবে। তাই পূর্বে মণিপুর (গৌড়ীয় বৈষ্ণব) থেকে দক্ষিণ পশ্চিমে মাদ্রাজ ও কেরলের কথাকলি পর্যন্ত স্থান পাবে তাই রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথের আশীর্বাদে বাংলা নাট্য ও চিত্রশিল্পের বিকাশও বড়রকমে আমাদের দেখাতে হবে. আবার জোড়াসাঁকোর প্রাঙ্গণে ও মহর্ষিভবনে শুধু এর নব চিত্র ও যন্ত্রসঙ্গীত (Harmony) কেন্দ্রও গড়ে তুলতে হবে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েরও দায়িত্ব এক্ষেত্রে আছে সেকথা যেন আমরা না ভুলি কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের নবপ্রাণদাতা আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের শতবার্ষিকী উৎসবে মনে করাই তিনিই রবীন্দ্রনাথকে Universityতে টেনে Convocation address ও কমলাবক্তৃতামালা দিয়ে মাতৃভাষা বাংলারই জয়গান করিয়েছিলেন—তাঁদের দ্বিতীয় শতাব্দীতে ৪০ কোটীর স্থানে লোকসংখ্যা যখন ৫০ কোটী হয়ে উঠবে, তখন সারা বিশ্বে সাড়া পড়বে, যেমন ৪০০ বছর পর Sirat ford গ্রামের এক ছেলে Shakespeare জন্ম উৎসবে আজ সারা বিশ্ব মেতে উঠেছে ও রবীন্দ্রনাথ সেক্সপীয়রকে কাব্যবন্দনা করে গেছেন (1916)। বলাকা অনুবাদের সময় ফ্রান্সে সেকথা জানিয়ে এসেছি। এখন বাঙালী জাতীর কবি রবীন্দ্রনাথের উপযুক্ত শিষ্য হয়ে উঠুক—জয় গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের জয়!

মৃত্যু নয় জীবন ! অন্ধকার নয় আলো !! সমস্যা নয় সমাধান !!!

মহাত্মা তৈলঙ্গস্বামীর জীবন চরিত

তমসাচ্ছন্ন পৃথিবীতে দিশেহারা মানুষ এই গ্রন্থ পাঠ করে আলোকবর্তিকার সন্ধান পাবে।
এই অপূর্ব জীবন কাহিনী রচনা করেছেন মহাত্মার নিজ মন্ত্রশিষ্য
ও দীর্ঘসাহচর্যধন্য উমাচরণ মুখোপাধ্যায়।
বহু অমূল্য তথ্যসমৃদ্ধ ও অলৌকিক ঘটনা সমুজ্জ্বল এই অপূর্ব গ্রন্থখানি
ধর্ম-পিপাসুদের অবশ্য পাঠ্য। গল্পাকারে লিখিত, সহজ ও সুখপাঠ্য।

মূল্য : ৪·৭৫ নয়া পয়সা

প্রকাশক : শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়

প্রাপ্তিস্থান : ৩এ লালাবাগান রোড, কলিকাতা-৬

ফোন : ৩৫—৬৮২৭

সমস্ত সম্ভ্রান্ত পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

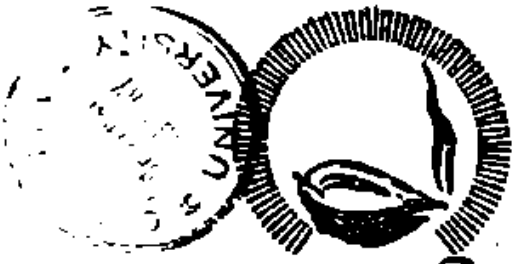

গল্প-ভারতী
কার্ত্তিক, ১৩৭১

বাঙালীর শক্তিপূজা

আজ রাত্রি অমাবস্যা। লক্ষ্মী পূর্ণিমার পর আজ শ্যামা অমাবস্যা। বাঙালী আজ রাত্রি নিশীথে আরাধনা করবে দিগম্বরনা শ্যামা জননীকে। অমাবস্যার গাঢ় তমিস্রার পটভূমিকায় রক্তলোলুপ শৃগাল কেরুপালের রক্তাম্বেষণ চীৎকার মুখরিত মহাশ্মশানে সন্তানের মুণ্ডমালায় বিভূষিতা হয়ে জননী আজ ধর্পর ধারিণী হয়ে এসেছেন মৃত্যু বিতরণ করতে। সঙ্গে নেই আজ শ্বেতবসনা সরস্বতী, পাশে নেই আজ হেমহারবিভূষিতা চেলাকল-শোভিনী লক্ষ্মী, উলঙ্গিনী নীলা জননীর সঙ্গিনী আজ অন্ধকার—দিগম্বরনা ক্ষুধির পিপাসার্ত্তা কাল ভৈরবীর মত। দেবতারা আজ ভয়ে অন্তর্হিত।

সেই দেবতা বিমুখ ভয়ার্ত্ত অন্ধকারে, বাঙালী সাধক আজ নিজের অন্তরকে সর্বরিক্ত করে, রচনা করেছে দেবীর অধিষ্ঠান আসন, শ্মশান ভালবাসিস বলে শ্মশান করেছি এ হৃদি। শুধু একদিনের আবাহন আর পরদিনের বিসর্জন নয়, এ নিত্যপূজা, নিত্য-আবাহন, সেই শ্মশানে তুই নাচবি নিরবধি!

বাঙালীর সেই সর্বভয় মুক্ত অন্তরের আসনে আজ হবে মৃত্যুরূপা জননীর উদ্বোধন—সর্বভয়, সর্বমোহ, সর্ব তুচ্ছতার উর্দ্ধে বাঙালী আজ মৃত্যুরূপা জননীর কাছে থেকেই চেয়ে নেবে মৃত্যুর আশীর্বাদ। জননী যার মৃত্যুময়ী মৃত্যুতে তার কিসের ভয়?

সর্বভয়ের বীজকে ধ্বংস করবার জন্যই তার এই মৃত্যুঞ্জয়ী সাধনা। মৃত্যুর স্তন থেকে বাঙালী সাধক পান করেছে অমৃতের সুধা। দেবতারা যার ভয়ঙ্করী মূর্তি দেখে আত্মগোপন করেছে, বাঙালী সাধক তাঁকেই মা বলে শিশুর মত বুকে ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

দীপান্বিতার রাত্রিতে বাঙালীর ঘরে ঘরে জ্বালানো প্রত্যেক মাটির প্রদীপের শিখায় লেখা আছে বাঙালীর সেই অপরূপ সাধনার কাহিনী। সারারাত্রি জ্বলুক সেই প্রদীপের শিখা। বাঙালীর অস্তিত্বকে ঘিরে জ্বলুক দীপান্বিতার রাত্রির এই প্রদীপের আলো।

সহস্র অন্ধকারের বুকে সেই প্রদীপের আলোয় আত্মবিস্মৃত বাঙালী পড়ুক আবার তার জীবন কাহিনী—মহা সম্ভবনার বিদ্যুৎ জ্বালা মন্ত্রে উঠুক প্রত্যেক তরুণ-তরুণীর বুকে—

পুড়ে ছাই হয়ে যাক আত্মতৃপ্ত সামান্যতার এই রক্তহীন মেদ বৃদ্ধি—

বাঙালীর বুকে জেগে উঠুক আবার দুঃসাহসের বন্যা বিরাট করে বিশাল করে সে আবার দেখুক স্বপ্ন…ভয়ঙ্করীর সন্তান সে, স্মরণ করিয়ে দিক সে-কথা দীপান্বিতার রাত্রির প্রদীপ।

সকলকে সে গ্রহণ করেছে তার নরম পলিমাটিতে, কোন বীজকে করেনি প্রত্যাখান। কিন্তু সকলকে স্বীকার করেও সে রয়েছে স্বতন্ত্র। তার এ তন্ত্র যদি আজ সে হারিয়ে ফেলে, সেই হবে তার চরম মৃত্যু। শক্তিপূজা তার সেই স্বাতন্ত্র্যেরই পরিচয়।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে শক্তি সাধনার প্রভাব

শ্রীহিমাদ্রি রায়

বাংলার স্বাধীনতাকামী শক্তি-সাধকদের মধ্যে অমর হ'য়ে আছেন যশোহরের প্রতাপাদিত্য আর বিক্রমপুরের চাঁদ রায় ও কেদার রায়। চিরকালই বিপ্লবের ধাত্রী-কেন্দ্র বাংলা। যখন ভারতের অন্যান্য দেশ একে একে মুঘল সম্রাট আকবরের বশ্যতা স্বীকার ক'রে নিচ্ছে তখনও স্বাধীনতা রক্ষার দুর্জয় পণ নিয়ে সংগ্রাম চালিয়েছেন বাংলার বিখ্যাত বারো ভূঁইয়া। প্রতাপাদিত্য এবং চাঁদ রায় ও কেদার রায় তাঁদের মধ্যে বিশেষ স্মরণীয়। স্বাধীনতাসংগ্রামে প্রতাপাদিত্য উদ্দীপনা ও শক্তি লাভ করেছিলেন তাঁরই প্রতিষ্ঠিত দেবী যশোরেশ্বরীর কাছ থেকে। চাঁদ রায় কেদার রায়ও ছিলেন মাতৃ-সাধক।

স্বাধীনতা-ব্রতের চিরস্মরণীয় ব্রতী শিবাজী ছিলেন শক্তির পূজারী। অত্যাচারী, পরধর্ম-বিদ্বেষী, পরাক্রান্ত মুঘল সম্রাট ঔরংজেবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ক'রে তিনি স্ব-রাজ্য প্রতিষ্ঠা ও স্বাধীনতা অর্জন করেছিলেন। আর এই সংগ্রামে তিনি প্রেরণা ও শক্তি লাভ করেছিলেন সিংহ-বাহিনী ভবানীর কাছ থেকে।

'বন্দে মাতরম' মন্ত্রের উদ্গাতা ঋষি বঙ্কিম চন্দ্রের রচনার মধ্য দিয়ে শক্তি-সাধনা এক নতুন তাৎপর্য নিয়ে ভারতবাসীর কাছে উপস্থিত হল। দেশ যে শুধু মাটির নয়, তা মা মায়েরই রূপ—এই সত্য উদ্ভাসিত হল বাঙ্গালীর অন্তরে। বঙ্কিম প্রচার করলেন সন্তান-ধর্ম। 'আনন্দ মঠ' এর সন্ন্যাসী সত্যানন্দের কাছে প্রতিভাত হল মায়ের ত্রিমূর্তি—"জগদ্ধাত্রী, কালী ও দশপ্রহরণধারিণী দুর্গার মূর্তি।" দুর্ভিক্ষ-পীড়িত বাংলার রূপটিই যেন প্রকাশ পেল মায়ের করাল মূর্তির মধ্য দিয়ে। বঙ্কিমের সাহিত্য নতুন মাতৃ-ধর্মে দীক্ষিত করল দেশবাসীকে।

ঋষি বঙ্কিমের অমর গ্রন্থ আনন্দ মঠে আছে :

"মহেন্দ্র ভক্তিভাবে জগদ্ধাত্রীরূপিণী মাতৃভূমিকে প্রণাম করিলে পর ব্রহ্মচারী তাঁহাকে এক অন্ধকার সুড়ঙ্গ দেখাইয়া বলিলেন 'এই পথে আইস।' ব্রহ্মচারী স্বয়ং আগে আগে চলিলেন। মহেন্দ্র সভয়ে পাছু পাছু চলিলেন। ভূগর্ভের এক অন্ধকার প্রকোষ্ঠে কোথা হইতে সামান্য আলোক আসিতেছিল। সেই ক্ষীণালোকে এই কালী মূর্তি দেখিতে পাইলেন।

ব্রহ্মচারী বলিলেন, 'দেখ, মা যা হইয়াছেন।' মহেন্দ্র সভয়ে বলিলেন 'কালী'।

ব্রহ্ম। কালী—অন্ধকার সমাচ্ছন্না কালিমাময়ী। হৃতসর্বস্ব, এই জন্য নগ্নিকা। আজ দেশে সর্বত্রই শ্মশান—তাই মা কঙ্কালমালিনী। আপনার শিব আপনার পদতলে বলিতেছেন—হায় মা!

ব্রহ্মচারীর চক্ষে ঘর ঘর ধারা পড়িতে লাগিল। মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হাতে খেটক খর্পর কেন'?

ব্রহ্ম। আমরা সন্তান, অস্ত্র মার হাতে এই দিয়াছি মাত্র—বল—বন্দে মাতরম্।"

প্রাক্ স্বদেশী যুগে শ্রীঅরবিন্দের অধিনায়কত্বে গঠিত 'যুগান্তর' বিপ্লবী দল প্রকাশ ও প্রচার করেছিল 'ভবানী মন্দির' নামক পুস্তিকা। সে অপূর্ব রচনা বিপ্লবী মহানায়ক শ্রীঅরবিন্দের।

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়কে যখন বিপ্লবী বারীন ঘোষ এক প্রচণ্ড ও মারাত্মক বোমা তৈরি ক'রে দেখিয়েছিলেন, তখন উপাধ্যায়জী 'সন্ধ্যা' পত্রিকায় 'কালী মাইকী বোমা' নাম দিয়ে একটি অগ্নি-গর্ভ সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখেছিলেন।

স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম পর্বে কলকাতায় অনুষ্ঠিত 'শিবাজী উৎসবে' পৌরোহিত্য করেছিলেন মহারাষ্ট্রের লোকমান্য বাল গঙ্গাধর তিলক। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, শ্রীঅরবিন্দ, বিপিনচন্দ্র পাল, পি. মিত্র, সুবোধচন্দ্র মল্লিক, বিজয় চ্যাটার্জী, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্ঞানসুন্দর চক্রবর্তী, হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ, মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা প্রমুখ নেতারা ছিলেন প্রধান উদ্যোক্তা। সেই উপলক্ষে উৎসব-ক্ষেত্রে সিংহবাহিনী ভবানীর পূজার্চনা সম্পন্ন হয়েছিল মহা সমারোহে। ব্রহ্মবান্ধব 'করালী' নামে একখানা সুন্দর সাপ্তাহিক পত্রিকা বের করেছিলেন 'সন্ধ্যা' কার্যালয় থেকে। বেশী দিন চলে নি, কিছু কাল পরেই বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু স্বল্পায়ু হয়েও ঐ বাংলা সাপ্তাহিক বাংলার সংবাদ-পত্র-জগতে ও বৈপ্লবিক সাধন-ক্ষেত্রে স্বকীয়তার স্বাক্ষর রেখে গেছে।

বিপ্লববাদী সন্ন্যাসী, তেজস্বী সাংবাদিক, লোকাতীত প্রতিভা ও মনীষার অধিকারী, স্বাধীনতা সংগ্রামের নির্ভীক যোদ্ধা ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় স্বদেশী আন্দোলনের প্রাক্কালে বের করেছিলেন 'সন্ধ্যা'। তৎকালে অনেকে মনে করতেন যে, 'সান্ধ্য' পত্রিকা বলেই ঐ পত্রিকার নাম 'সন্ধ্যা'। কিন্তু তা ঠিক নয়। বিদেশী রাজত্বকালের অবসানের দিন আর দূরে নয় বলেই 'সন্ধ্যা' নাম পত্রিকাটির দেওয়া হয়েছিল।

ওই বিপ্লবী সন্ন্যাসী তাঁর সম্পাদিত ও পরিচালিত 'সন্ধ্যা' পত্রিকার মাধ্যমে প্রকাশ্যে স্বার্থহীন ভাষায় প্রচার ক'রে গেছেন সেই অমোঘ বাণী—যা প'ড়ে-শুনে বাংলার বিপ্লবপন্থীরা স্বদেশের সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বিশেষ আশ্বস্ত হয়েছিলেন এবং বৈপ্লবিক গুপ্ত সমিতির (সিক্রেট সোসাইটির) গোপন পথের সন্ধান পেয়েছিলেন। সেই পথ সড়ার পথ নয়—ভাঙার পথ, সংগঠনের নয়—সংহারের পথ। তাই বিপ্লবীসাধকরা অনুপ্রাণিত হতেন কালীমাতার পূজায়। সেই পূজার্চনা হ'ত কার্তিকের অমাবস্যা রাত্রির নিশীথ কালে। বাংলার বিপ্লবীরা তখন সংহার মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে আত্মবলিদানের সংকল্প গ্রহণ করতেন।

স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম পর্বে কোন কোন স্থানে দীপান্বিতা কালী পূজা উপলক্ষ্যে বিদেশী শাসক শ্বেতাঙ্গদের প্রতীক সাদা পাঁঠা বলি দেওয়ার কথা আমরা শুনেছি। বাংলা শক্তি উপাসনার —শক্তি সাধনার উপযোগী ক্ষেত্র। বাংলা দেশেই অতীতে কালী-সাধক রামপ্রসাদ সেনের ও কমলাকান্ত ভট্টাচার্যের আবির্ভাব হয়েছিল। এক কালে হাটে-ঘাটে-মাঠে, বৈঠকে, মজলিসে, বারোয়ারী কালী পূজার আসরে শ্যামা সঙ্গীত গীত হত সারা দেশ জুড়ে। সাধক-কণ্ঠে আমরা শুনেছি :

"মন কেনরে ভাবিস এত
মাতৃহীন বালকের মত
কখন হয়ে ভেকের ভয় এদে বড় অদ্ভুত
ওরে তুই করিস কালের ভয় হ'য় ব্রহ্মময়ী-সুত"
"এ সংসারে ভরি কারে রাজা যার মা মহেশ্বরী,
আনন্দে আনন্দময়ীর খাস তালুকে বসত করি।"

বৈপ্লবিক সাধনার ব্রতী বাঙালী তরুণের দল, শক্তি-সাধকের কণ্ঠেও শুনেছি :

"শক্তি-পূজা কথার কথা না,
এটি কথার কথা হোতো চিরদিন ভারত
শক্তি পূজে শক্তিহীন হোতো না।"

বাংলার শক্তি-সাধকের কণ্ঠে একদা গীত হ'য়েছে :

"শ্মশানে ভালবাসিস্ ব'লে
শ্মশান করেছি হৃদি,
শ্মশান-বাসিনী শ্যামা
নাচবে ব'লে নিরবধি।"

বিপ্লবী বাংলার প্রথম দলের প্রবীচি মেদিনীপুরের ক্ষুদিরাম বসু, যিনি ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেলেন জীবনের জয়-গান, তিনিও শক্তি-মন্ত্রে দীক্ষিত 'সন্তান'। প্রথম জীবনে মেদিনীপুর সহরে কালী মন্দিরে ক্ষুদিরামের বিপ্লবের অগ্নি মন্ত্রে দীক্ষা নেবার বর্ণনা দিয়েছেন তাঁর দিদি স্বর্গতা অপরূপা দেবিবিত 'অতুল্য ক্ষুদিরাম' প্রবন্ধে। ক্ষুদিরাম ছিলেন বিপ্লবী নেতা বাংলার অন্যতম প্রবীচি সত্যেন্দ্র বসুর অনুগামী। দিদির লেখার কতকাংশ উদ্ধৃত করলাম :

"সোলকুমার চকে সত্যেন্দ্রের বাড়ীর লাগোয়া একটা ডাঙ্গায় ছিল ওদের গুপ্ত সমিতি—কালী মন্দিরের সামনে একটি চালায়। সেইখানে পরে উন্মাদিনী শাসীর ঘোড়ার গাড়ীর আড্ডা হয়। এইখানে কালী বিগ্রহের কাছে ওরা প্রতিজ্ঞা নিত—'সাদা পাঁঠা' বলি দিয়ে সেই রক্তে মাকে তৃপ্ত করতে হবে। এই সমিতিতে দু'খানি বই পড়ত ওরা (১) বর্ত্তমান রণনীতি, আর (২) মুক্তি কোন্ পথে। যুগান্তর পত্রিকা থেকেও প্রবন্ধ পড়া হত। অরবিন্দ ঘোষের লেখাগুলোর জন্যে ওরা হাঁ করে থাকত।

"এই সময় ওদের কাজ হোল বিভিন্ন জায়গায় ব্যায়াম চর্চার আখড়া, স্বদেশী কাপড় তৈরীর তাঁতখানা গঠন ও স্বদেশী দ্রব্য কেনার আন্দোলন।"

বিপ্লবী মহানায়ক অরবিন্দ এক স্বদেশী সভায় ভাষণ দান কালে বলেছিলেন যে—কলকাতার অনতিদূরে দক্ষিণেশ্বরের কালী-মন্দিরের পূজারী ব্রাহ্মণ রামকৃষ্ণদেবের যেদিন আবির্ভাব হয়েছিল সেদিনই সুনিশ্চিত হয়েছিল ভাবী কালে ভারতের স্বাধীনতা লাভ। যেদিন নানা দেশের আধুনিক কালের উচ্চশিক্ষা-প্রাপ্ত বিরুদ্ধ মনীষী ও পণ্ডিত জনেরা ঐ অশিক্ষিত ব্রাহ্মণের চরণ-প্রান্তে ব'সে অধ্যাত্ম জীবন গঠনের উপদেশ ও সাধন-পদ্ধতি শুনতেন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে, সে-দিন থেকে পরাধীন ভারতীয়গণের মুক্তি-অভিযানের গতি-বেগ দুনিবার হয়ে উঠল।

তৎকালে শ্রীঅরবিন্দ ছিলেন অখিল ভারতের অগ্নিসংযোগী বিপ্লবী নেতা—যিনি কালী সাধক যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আধ্যাত্মিক জীবন, বাণী ও ভাবধারায় প্রভাবিত হয়েছিলেন আশ্চর্য ভাবে। তাঁর লেখা থেকে এই সত্যও প্রকাশ পেয়েছে যে,—কারাবাস-কালে রামকৃষ্ণ-শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ সূক্ষ্ম-দেহে উপস্থিত হয়ে তাঁকে যোগ শিক্ষা দিয়েছিলেন। ভারতের সশস্ত্র বিপ্লববাদের ইতিহাসে কালী-সাধকের শক্তি-উপাসকের আসন সর্বোচ্চে প্রতিষ্ঠিত। কোন কোন ক্ষেত্রে বিপ্লবীর দীক্ষা নেবার ব্যবস্থা ছিল কালী মন্দিরে কালী বিগ্রহের সম্মুখে, কিংবা সিংহবাহিনী জগদ্ধাত্রীর মন্দিরে।

প্রখ্যাত বিপ্লবী নেতা স্বর্গত পুলিন বিহারী দাস নিজে ঘটার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিপ্লবের অগ্নি-মন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছিলেন ব্যারিস্টার পি, মিত্রের কাছ থেকে কলকাতায়। ঢাকায় পুলিন বাবু বিপ্লবীদের দীক্ষা দিতেন ঢাকেশ্বরী মন্দিরে দেবী বিগ্রহের সম্মুখে নিশীথ কালে অতি সংগোপনে লোক-লোচনের অন্তরালে। ঢাকেশ্বরী দেবীর বিগ্রহ কালী-মাতার বিগ্রহ। পুলিন বিহারীর নির্বাসন ও কারাদণ্ড ভোগ কালে তাঁর স্থলাভিষিক্ত অধিনায়কেরাও দীক্ষা দান কালে ওই পন্থা অনুসরণ ক'রে চলেছেন। সুতরাং বাংলার বৈপ্লবিক সাধনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন অবস্থায় পরিস্থার ভাবে প্রকাশ পেয়েছে শক্তি-আরাধনার অনন্যসাধারণ প্রভাব।

বাংলা দেশের বিপ্লববাদীরা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন বিবেকানন্দের জীবন, বাণী ও রচনাবলীর দ্বারা। দলে নেবার আগে প্রবেশার্থীকে বিবেকানন্দ-সাহিত্য পড়তে দেওয়া হ'ত। তাঁদের কাছে স্বামীজীর পরিব্রাজক, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, বর্তমান ভারত, কবিতাবলী, ইংরেজী বক্তৃতার অনুবাদ, শরৎচন্দ্র চক্রবর্তীর স্বামি-শিষ্য সংবাদ, ভগিনী নিবেদিতার রচনাবলী ছিল শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার মতো। বেদান্তবাদী সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীদুর্গা ও শ্রীকালীর পূজায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতেন।

বরিশালের মুকুন্দ দাস স্বদেশী আন্দোলনের যুগে (১৯০৪—১৯১১) বেশ নাম করেছিলেন স্বদেশী যাত্রার গাওয়া গান গেয়ে। তাঁর 'মাতৃপূজা' নে-সুরে সারা দেশে বিরাট আলোড়ন এনেছিল এবং দেশবাসীর মনে উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছিল।

মুকুন্দ দাস ছিলেন কালী-ভক্ত ও শক্তির উপাসক। বরিশালের স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতীর বিপ্লবী দলের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। স্বামীজীর পূর্বাশ্রমের জ্যেষ্ঠা ভগিনী সরোজিনী দেবীর কাছে মুকুন্দ দীক্ষা নিয়েছিলেন। বরিশাল সহরের উপকণ্ঠে তিনি কালী মন্দির নির্মাণ করিয়ে শ্রীকালীমাতার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মুকুন্দ দাসের কণ্ঠে আমরা শুনেছি :

"জাগ গো জাগ গো জননী !
তুই না জাগিলে শ্যামা কেউ ত জাগিবে না মা !
তুই না নাচালে কারো নাচিবে না রমণী।
ডেকে ডেকে হলাম সারা কেউ সাড়া দিল না মা !
খুঁজে দেখলাম কত প্রাণ কারো প্রাণ কাঁদে না মা ;
তুই না কাঁদালে প্রাণ কাঁদিবে না কারো প্রাণ
না কাঁদিলে সবার প্রাণ পোহাবে কি রজনী ?
দয়াময়ী নাম ধরিস দয়া কি মা আছে তোর,
দয়া থাকলে মরে কি আজ ত্রিশ কোটি ছেলে তোর ?
মরি তাতে ক্ষতি নাই, বাসনা মা দেখে যাই
ভারতের ভাগ্যাকাশে উঠিছে দিনমণি।"

শক্তি-সাধক স্বদেশ-সেবক ভারতের ভাগ্যাকাশে স্বাধীনতার দিনমণিকে উদিত দেখে যাননি সত্য, কিন্তু উদীয়মান দেখে গেছেন।

বিবেকানন্দ রচিত 'মাতুক তাহাতে শ্যামা' কবিতা বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। সেই রচনা থেকেও

নিঃসন্দেহে প্রমাণ পাওয়া যায় স্বামীজীর জীবনের উপর শক্তি-আরাধনা কতটা প্রভাব বিস্তার করেছিল। সেই উদ্দীপনা-পূর্ণ কবিতার একাংশ আছে :

"ক্ষুদ্র মুখে সবাই ডরায়, কেহ নাহি চায় মৃত্যুরূপা এলোকেশী।
উল্কায়, রুধির-উল্লাস, ভীম তরবার ঝলসাইয়ে দেয় বাঁশী॥
সত্য তুমি মৃত্যুরূপা কালী, সুখদনয়নী তোমার মায়ার ছায়া।
করালিনি, কর মর্মচ্ছেদ, হোক মায়াভেদ, সুখ স্বপ্ন দেহে দয়া॥
মুণ্ডমালা পরায়ে তোমায়, ভয়ে কিরে চায়, নাম দেয় দয়াময়ী
প্রাণ কাঁপে, ভীম অট্টহাস, নয় দিক্‌বাস, বলে মা দানবজয়ী॥
মুখে বলে দেখিবে তোমায়, আসিলে সময় কোথা যায় কেবা জানে।
মৃত্যু তুমি, রোগ মহামারী বিষকুম্ভ ভরি, বিতরিছ জনে জনে॥
রে উন্মাদ, আপনা ভুলাও, ফিরে নাহি চাও পাছে দেখ ভয়ঙ্করা।
সুখ চাও, সুখ হবে ব'লে, ভক্তিপূজাছলে স্বার্থ-সিদ্ধি মনে ভরা॥
ছাগকণ্ঠ রুধিরের ধার, ভয়ের সঞ্চার, দেখে তোর হিয়া কাঁপে।
কাপুরুষ! ধর্ম্মের আধার! ধর্ম্ম ব্যবহার মর্ম্মকথা বলি তাকে?
ভাঙ বীণা—প্রেমসুধাপান, মহা আকর্ষণ—দূর কর নারীমায়া।
আগুয়ান সিন্ধু রোলে গান, অশ্রুজল পান, প্রাণপণ, যাক্ কায়া॥
জাগো বীর, ঘুচায়ে স্বপন, শিয়রে শমন, ভয় কি তোমার সাজে?
দুঃখ ভার এ ভবইশ্বর্য, মন্দির তাহার প্রেতভূমি চিতা মাঝে॥
পূজা তার সংগ্রাম অপার, সখা পরাজয় তাহা না ডরাক তোমা।
চূর্ণ হোক স্বার্থ সাধ মান, হৃদয় শ্মশান, নাচুক তাহাতে শ্যামা॥"

মাতৃভক্ত বীর সাধক বিবেকানন্দ মাতৃরূপিনী কালীমাতাকে এই ভাবেও আহ্বান করেছিলেন :

"মাতৃরূপা মা আমার আয়!
করালি! করাল তোর নাম, মৃত্যু তোর নিশ্বাসে প্রশ্বাসে
তোর ভীম চরণ-নিক্ষেপ প্রতিপদে ব্রহ্মাণ্ড বিনাশে।
কালি। তুই প্রলয়রূপিনী, আয় মাগো, আয় মোর পাশে।
সাহসে যে দুঃখ দৈন্য চায়, মৃত্যুকে যে বাঁধে বাহু পাশে
কাল-নৃত্য করে উপভোগ, মৃত্যুরূপা তারি কাছে আসে।

(সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কর্তৃক অনূদিত)

বাংলা তথা ভারতের আর একজন প্রাতঃস্মরণীয় শক্তি-সাধক নেতাজী সুভাষচন্দ্র। স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এই তেজস্বী পুরুষের আবির্ভাব এক আশ্চর্য ঘটনা। শৌর্য-বীর্যের সন্ধান তিনি পেয়েছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের জীবনাদর্শ অনুসরণ ক'রে—শক্তি-আরাধনারই মধ্য দিয়ে।

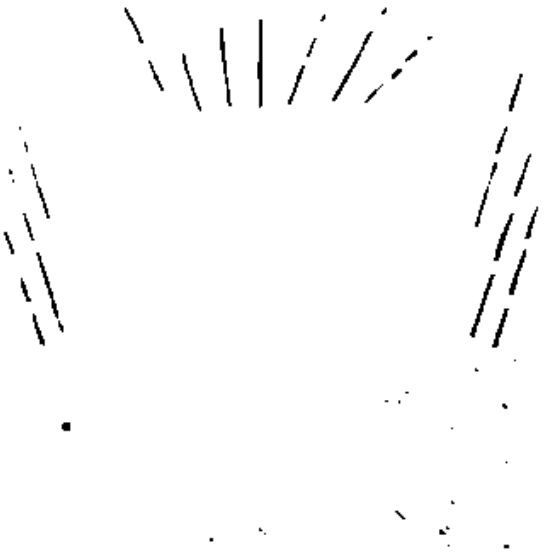

আজকের এই সংকট মুহূর্তে

টাকা নয়!

চাই মানুষ

চাই শক্তি

চাই সাধনা

চাই চরিত্র

দুধের সাদেতে না অসলে হত না,মা? এক্ষুনি খেতে চাইবে।
চাইবেই তো। ওর জন্যেও এনেছি। ডাক্তার ডাকার কথা উল্লিখিত করে গেলেন এই সময় ছোটদের রসগোল্লা খাওয়ানো মানে—ছানা আর রস— দুটোই খুব উপকারী।
তাহলে ব্যস্ত হলেন? ওঁর বাড়িতে নিশ্চয়ই বাচ্চাকাচ্চা আছে। কিন্তু বাজারের এইসব খোলা রসগোল্লা? ঝিক ঝিক করছে বাইরে ঘুলো-ময়লা আর ভনভন করছে মাছি— এ কখনও খেতে আছে? বিশেষ করে ছোটদের?
কিন্তু তা তাহলে, বলো তো এটা কী দিলে আজ? আমি কি এমনই মুখ্যু যে, রসগোল্লার যেমন তেমন ঘরোয়া বাড়িতে তৈরি করতে পারব? এ হলো আমার কে.সি.দাসের টিনের রসগোল্লা। কী? চেখেছ বুঝি চুপে চুপে আমি টুটিলে?
বাড়িতে রসগোল্লা তৈরি করতে তো বাচ্চা-কাচ্চা-সহ-মানুষ পারে। কিন্তু আসল রসগোল্লা? যে রসগোল্লা সব সময় সবখানেই খেতে পারে? সে তো একমাত্র কে.সি.দাসের টিনের রসগোল্লাতেই আছে।
কে. সি. দাসের রসগোল্লা বিশেষভাবে টাটকা দুধের ছানা কাটিয়ে স্টীম পাত্রে তৈরি হয়। এ রসগোল্লা সীলকরা টিনে থাকে, তাই এত বিশুদ্ধ আর টাটকা। কেবলমাত্র নির্ভেজাল খাঁটি জিনিসে তৈরি বলেই কে. সি. দাসের রসগোল্লা এত পুষ্টিকর।
কে.সি.দাস প্রাইভেট লিমিটেড
১১ এসপ্লানেড ইস্ট, কলিকাতা-১ টেলিফোন : ২৩-৫২১০
৮৪ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা-৯ টেলিফোন : ৩৩-২১৮৪
১৭৭ বি চিত্তরঞ্জন এ্যাভিনিউ, কলিকাতা-৭ টেলিফোন : ৩৪-৩৪৪৪
JWT&CO 1483

চিঠি-শুধু চিঠি নয়

["মা নরেন্দ্রকে তাঁহার কাজ করিবার জন্য সংসারে টানিয়া আনিয়াছেন। সে যেদিন জানিতে পারিবে সে কে, সেদিন আর ইহলোকে থাকিবে না, স্বসংকল্প সহায়ে যোগমার্গে তৎক্ষণাৎ শরীর পরিত্যাগ করিবে।" ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের এই ভবিষ্যদ্বাণী আক্ষরিকভাবে সত্য হইয়া উঠিয়াছে, ১৯০০ খৃষ্টাব্দের ১৮ই এপ্রিল আলামেডা, ক্যালিফোর্নিয়া হইতে জোসেফাইন ম্যাকলিওডকে লিখিত নিম্নোদ্ধৃত পত্রখানির ছত্রে ছত্রে।]

প্রিয় জো,

• • আমি ভালই আছি—মানসিক খুব ভালই। শরীরের চেয়ে মনের শান্তি-স্বচ্ছন্দতাই খুব বেশী বোধ করছি। লড়াইয়ে হার জিত দুই-ই হল—এখন পুঁটলি-পোটলা বেঁধে সেই মহান মুক্তিদাতার অপেক্ষায় যাত্রা করে বসে আছি। "অব শিব পার করো মেরা নৈইয়া"—হে শিব, হে শিব, আমার তরী পারে নিয়ে যাও, প্রভু। যতই যা হোক, জো, আমি এখন সেই আগেকার বালক বই আর কেউ নই, যে দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীর তলায় রামকৃষ্ণের অপূর্ব বাণী অবাক হয়ে শুনত আর বিভোর হয়ে যেত। ঐ বালকভাবটাই হচ্ছে আমার আসল প্রকৃতি—আর কাজকর্ম, পরোপকার ইত্যাদি যা কিছু করা গেছে তা ঐ প্রকৃতিরই উপরে কিছুকালের জন্য আরোপিত একটা উপাধি মাত্র। আহা, আবার তাঁর সেই মধুর বাণী শুনতে পাচ্ছি—সেই চিরপরিচিত কণ্ঠস্বর! যাতে আমার প্রাণের ভিতরটা পর্যন্ত কণ্টকিত করে তুলেছে!—বন্ধন সব খসে যাচ্ছে, মানুষের মায়া উড়ে যাচ্ছে, কাজকর্ম বিস্বাদ বোধ হচ্ছে। জীবনের প্রতি আকর্ষণও কোথায় সরে দাঁড়িয়েছে! রয়েছে কেবল তার স্থলে প্রভুর সেই মধুর গভীর আহ্বান! যাই, প্রভু, যাই। ঐ তিনি বলছেন: মৃতের সৎকার মৃতেরা করুক, (সংসারের ভালোমন্দ সংসারীরা দেখুক) তুই (ওসব ছুড়ে ফেলে দিয়ে) আমার পিছু পিছু চলে আয়।"

• • • হাঁ, এইবার আমি ঠিক যাচ্ছি। আমার সামনে অপার নির্বাণ-সমুদ্র দেখতে পাচ্ছি! সময়ে সময়ে স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করি সেই অসীম—অনন্ত-শান্তির পারাবার—মায়ার একটুকু বাতাস বা ঢেউ পর্যন্ত যার শান্তি ভঙ্গ করছে না। আমি যে জন্মেছিলুম, তাতে আমি খুশী আছি, এত যে কষ্ট পেয়েছি, তাতেও খুশি জীবনে যে বড় বড় ভুল করেছি, তাতেও খুশী; আবার এখন যে নির্বাণের শান্তিসমুদ্রে ডুব দিতে যাচ্ছি, তাতেও খুশী। আমার জন্য সংসারে ফিরতে হবে এমন বন্ধনে আমি কাউকে ফেলে যাচ্ছিনা; অথবা এমন বন্ধন আমি কারও কাছ থেকে নিয়ে যাচ্ছি না। দেহটা নিয়েই আমার মুক্তি হোক, অথবা দেহ থাকতেই মুক্ত হই, সেই পুরানো "বিবেকানন্দ" কিন্তু চলে গেছে, চিরদিনের জন্য চলে গেছে, আর ফিরছে না! শিক্ষাদাতা, গুরু, নেতা, আচার্য বিবেকানন্দ চলে গেছে—পড়ে আছে কেবল সেই বালক, প্রভুর চিরশিশু, চিরপদাশ্রিত দাস।

তুমি বুঝতে পারছ কেন আমি অভেদানন্দের কাজে হাত দিচ্ছি না? ... তাঁর ইচ্ছা—স্রোতে যখন আমি সম্পূর্ণ গা ঢেলে দিয়ে থাকতুম, সেই সময়টাই জীবনের মধ্যে আমার পরম মধুময় মুহূর্ত বলে মনে হয়। এখন আবার সেইরূপে গা-ভাসান দিয়েছি। উপরে সূর্য তাঁর নির্মল কিরণ বিস্তার করছেন, পৃথিবী চারিদিকে শস্য-সম্পদশালিনী হয়ে শোভা পাচ্ছেন, দিনের উত্তাপে সবপ্রাণী ও পদার্থই কত নিস্তব্ধ, কত স্থির, কত শান্ত! আর আমিও এখন সেই সঙ্গে ধীর স্থিরভাবে, নিজের ইচ্ছা আর বিন্দুমাত্র না রেখে, প্রভুর ইচ্ছারূপ প্রবাহিনীর সুশীতল বক্ষে ভেসে চলেছি। এতটুকু হাত পা নেড়ে এ প্রবাহের গতি ভাঙতে আমার প্রবৃত্তি ও সাহস হচ্ছেনা—পাছে প্রাণের এই অদ্ভুত নিস্তব্ধতা ও শান্তি আবার ভেঙে যায়। প্রাণের এই শান্তি ও নিস্তব্ধতাই জগৎটাকে আত্মা বলে স্পষ্ট বুঝিয়ে দেয়। এর আগে আমার কাজের ভিতর নাম-যশের ভাবও উঠত, আমার ভালোবাসার ভিতর ব্যক্তিবিচার আসত, আমার পবিত্রতার পিছনে ফলভোগের আকাঙ্খা থাকত, আমার নেতৃত্বের ভিতর প্রভুত্ব-স্পৃহা আসত। এখন সে সব উড়ে যাচ্ছে। আর আমি সকল বিষয়ে উদাসীন হয়ে তাঁর ইচ্ছায় ঠিক ঠিক গা ভাসান দিয়ে চলেছি। যাই, মা যাই! তোমার স্নেহময় বক্ষে ধারণ করে যেখানে তুমি নিয়ে যাচ্ছ, সেই অমল, অশান্ত, অজ্ঞাত, অদ্ভুত রাজ্যে—অভিনেতার ভাব সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়ে কেবলমাত্র দ্রষ্টা বা সাক্ষীর মতো ডুবে যেতে আমার দ্বিধা নাই।

আহা! কি স্থির প্রশান্তি। চিন্তাগুলি পর্যন্ত বোধ হচ্ছে যেন হৃদয়ের কোন এক দূর, অতি দূর অন্তস্থল থেকে মৃদু বাক্যালাপের মতো ধীর অস্পষ্টভাবে আমার কাছে এসে পৌঁছচ্ছে। আর শান্তি—মধুর, মধুর শান্তি—যা কিছু দেখছি, শুনছি, সব কিছু ছেয়ে রয়েছে! মানুষ ঘুমিয়ে পড়ার আগে কয়েক মুহূর্তের জন্য যেমন বোধ করে—যখন সব জিনিস দেখা যায়, কিন্তু ছায়ার মত অবাস্তব মনে হয়—তার থাকেনা, তাদের প্রতি ভালবাসা থাকেনা, হৃদয়ে তাদের সম্বন্ধে এতটুকু ভালমন্দ ভাব পর্যন্তও জাগে না—আমার মনের এখনকার অবস্থা ঠিক যেন সেইরূপ, কেবল শান্তি, শান্তি! চারপাশে কতকগুলি পুতুল আর ছবি সাজান রয়েছে দেখে লোকের মনে যেমন শান্তিভঙ্গের কারণ উপস্থিত হয়না, এ অবস্থায় জগৎটাকে ঠিক তেমনি দেখাচ্ছে; আমার প্রাণের শান্তিরও বিরাম নেই। ঐ আবার সেই আহ্বান?—যাই, প্রভু, যাই।

এ অবস্থায় জগৎটা রয়েছে, কিন্তু সেটা কি সুন্দরও মনে হচ্ছেনা, কুৎসিতও মনে হচ্ছেনা। —ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয়ানুভূতি হচ্ছে। কিন্তু মনে 'এটা ত্যাজ্য, ওটা গ্রাহ্য'—এমন ভাবের কিছুমাত্র উদয় হচ্ছেনা। আহা, জো, এ যে কি আনন্দের অবস্থা, তা তোমায় কি বলব! যা কিছু দেখছি, শুনছি, সবই সমানভাবে ভাল ও সুন্দর বোধ হচ্ছে; কেননা নিজের শরীর থেকে আরম্ভ করে তাদের সকলের ভিতর বড়-ছোট, ভাল-মন্দ, উপাদেয় হেয় বলে যে একটা সম্বন্ধ এতকাল ধরে অনুভব করেছি, সেই উচ্চ-নীচ সম্বন্ধটা এখন যেন কোথায় চলে গেছে! আর, সবচেয়ে উপাদেয় বলে শরীরটার প্রতি এর আগে যে বোধটা ছিল, সকলের আগে সেইটাই যেন কোথায় লোপ পেয়েছে!

ইতি—

তোমাদের চিরবিশ্বস্ত

বিবেকানন্দ

অমৃত কথা

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথা

—"পম্পা সরোবরে স্নানের সময় রাম লক্ষণ সরোবরের নিকট মাটিতে ধনুক গুঁজে রাখলেন। স্নানের পর উঠে লক্ষণ তুলে দেখেন যে ধনুক রক্তাক্ত হয়ে রয়েছে। রাম দেখে বল্লেন, 'ভাই দেখ দেখ, বোধ হয় কোন জীব হিংসা হলো।' লক্ষণ মাটি খুঁড়ে দেখেন একটা বড় কোলা ব্যাঙ! মুমূর্ষু অবস্থা। রাম করুণ স্বরে বলতে লাগলেন, 'কেন তুমি শব্দ কর নাই, আমরা তোমাকে বাঁচাবার চেষ্টা করতাম। যখন সাপে ধরে, তখন তো খুব চীৎকার করো।' ব্যাঙ বললে, 'রাম, যখন সাপে ধরে, তখন আমি এই বলে চীৎকার করি, 'রাম রক্ষা কর, রাম রক্ষা কর।' এখন দেখছি রামই আমায় মারছেন। তাই চুপ করে আছি।' দেহের সুখ দুঃখ আছেই। যার ঈশ্বর লাভ হয়েছে সে মন, প্রাণ, দেহ, আত্মা, সমস্ত তাঁকে সমর্পণ করে।"

শ্রীশ্রীবুদ্ধদেবের কথা

—দেবদত্তের পরামর্শে অজাতশত্রু পিতৃবধে অগ্রসর হলেন। একদিন তিনি কোমরে ছোরা লুকিয়ে অসময়ে ভীষবেগে উত্তেজিত হয়ে রাজদরবারে প্রবেশ করলেন। তাঁর ভয়ঙ্কর মূর্তি দেখে মন্ত্রীরা তাঁকে ধরে ফেললেন এবং তাঁর পোষাকের নীচে লোহার ছোরা দেখতে পেলেন। তাঁরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'রাজকুমার, আপনি কি করতে যাচ্ছিলেন?' অজাতশত্রু উত্তর দিলেন, 'আমি আমার পিতাকে বধ করতে চাই।' চমৎকৃত অমাত্যবর্গ জিজ্ঞাসা করলেন, 'কে আপনাকে এই কাজে উৎসাহিত করছে?' রাজকুমার উত্তর দিলেন, 'মুযোগ্য দেবদত্ত।' মন্ত্রীরা রাজকুমারকে মগধরাজ বিম্বিসারের কাছে নিয়ে গেলেন এবং তাঁর দুরভিসন্ধি জানালেন। রাজা পুত্রকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি আমাকে বধ করতে চাও কেন? যদি তুমি রাজ্য চাও, এই রাজ্য এখনই নাও।' এই বলে পিতা পুত্রকে রাজ্যভার দিলেন কিন্তু দেবদত্ত অজাতশত্রুকে বললেন, 'যদি বিম্বিসার বেঁচে থাকেন তাহলে তিনি আবার সিংহাসন ও রাজশক্তি পুনর্লাভে চেষ্টিত হবেন সুতরাং তাঁকে শেষ করে ফেলাই ভাল।' কিন্তু অজাতশত্রু পিতৃহন্তা হতে ইতস্ততঃ করলেন এই ভেবে যে, তাহলে তাঁকে কারারুদ্ধ হতে ও অনাহারে মরতে হবে। সেইজন্য বিভ্রান্ত অজাতশত্রু নিম্নোক্ত উপায় অবলম্বন করলেন।

কোশলের রাজকুমারী ক্ষেমা ব্যতীত অন্য কেউ রাজকীয় কারাগারে যেতে পারতেন না। রাণী গোপনে আহার নিয়ে যেতেন, তা খেয়ে বিম্বিসার বেঁচে থাকতেন। যখন তা নিষিদ্ধ হল তখন রাণী তাঁর কেশপাশের মধ্যে খাদ্য লুকিয়ে নিয়ে যেতেন। যখন তা ধরা পড়ল তাঁকে নুরুবেণীতে কারাগারে যেতে আদেশ দেওয়া হল; তখন তিনি নিজ জুতার মধ্যে খাদ্য নিয়ে যেতেন। যখন এই ঘটনা আবিষ্কৃত হল তখন তিনি খালি পায়ে যেতে আরম্ভ করলেন। রাণী নিজ গাত্রে মধু মেখে কারাগারে যেতেন এবং সেই মধু চেটে খেয়েই বিম্বিসার বেঁচে থাকতেন। যখন ইহাও জানা গেল, তখন রাণীকে রাজার নিকট আর যেতে দেওয়া হ'ল না। অগত্যা বিজেতা মগধরাজ বিম্বিসার এইভাবে অনাহারে কারাগারে মারা যান। যেদিন বিম্বিসার মারা যান সেদিন অজাতশত্রুর একটি পুত্র লাভ হয়। তা দেখে অজাতশত্রু অপার আনন্দে নিমগ্ন হন। বিদেহী রাজকুমারী তাঁকে বললেন, 'শৈশবে আমার আঙ্গুলে একটি ক্ষত হয়েছিল। ইহা খুব যন্ত্রণাদায়ক ছিল। কোন ঔষধে সেই ক্ষতের উপশম হ'ল না। আমার পিতা বিম্বিসার ক্ষতস্থান চুষে ও কেটে যন্ত্রণার উপশম করতেন। তারপর তিনি হেসে হেসে আমার সঙ্গে খেলা করতেন।' এই ঘটনা শুনে অজাতশত্রু অত্যন্ত মনস্তাপ পেলেন এবং পিতাকে কারামুক্ত করার ইচ্ছা করলেন। কিন্তু কারামুক্তি লাভের পূর্বেই রাজা বিম্বিসার দেহত্যাগ করেন।"

আপনি কি জানেন ?

ভিটামিন "সি" খেলে গাড়ি চালাবার ক্ষমতা বাড়ে

অনেকেই মনে করেন ভিটামিন বিশেষত "সি" ভিটামিনের গুপ্ত রহস্য বুঝি সবটাই জানা গেছে কিন্তু আসলে আমাদের শরীরের ওপর এইসব গুরুত্বপূর্ণ পদার্থের কি প্রভাব তা' এখনও সঠিক বলা যায় না। পশ্চিম জার্মানীর সুপরিচিত গবেষক ডাক্তার এ. গ্রাজোহান সম্প্রতি ভিটামিন গবেষণার ক্ষেত্রে এক প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন। ভিটামিন "সি" গ্রহণ করলে মোটরগাড়ীর চালকদের কর্মক্ষমতা বাড়ে কিনা সে সম্বন্ধে তিনি দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। তাঁর এই গবেষণার ফলাফল সাধারণভাবে সেইসব মোটরচালকদের কাজে লাগবে যারা সদা গাড়ি চেপে বেড়ায় তাদের নানারকম উত্তেজক পদার্থ গ্রহণ করায় সময় সময় অসুবিধা হয়ে পড়ে।

এ পর্যন্ত চালকদের ওপর "সি" ভিটামিনের প্রভাব সম্বন্ধে গবেষণার ভিত্তিতে যে পরীক্ষা হয়েছে তা অতি সামান্য এবং তাও যেটুকু হয়েছে, তা সীমিত অর্থাৎ দেহের আলাদা আলাদা যন্ত্রের ওপর তার প্রভাব লক্ষ্য করা হয়েছে, গোটা শরীরের ওপর নয়। নিরাপদ গাড়ি চালনার জন্য যেসব জিনিষ দরকার যেমন প্রত্যক্ষশক্তি, মনোনিবেশ ও নিমগ্নতা তথা বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া, নিষ্ক্রিয়তা এবং অভিযোজন সম্বন্ধে প্রধানত ডাক্তার গ্রাজোহান পরীক্ষা করেছেন। সাধারণত বলা চলে যে সেই লোক নিরাপদে গাড়ি চালায় যে তাড়াতাড়ি অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করে ধীরে সুস্থে সিদ্ধান্ত করে। হঠাৎ কিছু ক'রে বসা যেকোন চালকের পক্ষেই বিপজ্জনক।

পনের থেকে চল্লিশ বছরের বাইশজন চালকের ওপর ডাক্তার গ্রাজোহান তার পরীক্ষা চালান। বিস্ময়যোগ্য ফল প্রত্যক্ষ করার জন্যে এইসব লোকদের কাউকেই বলা হয়নি তাদের ওষুধ দেওয়া হচ্ছে না অন্য কিছু খাওয়ান হচ্ছে। পরীক্ষাও আবার দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছিল। ভিটামিন "সি" একবার খেলে কিম্বা বেশিদিন খেলে কি ফল হয় দেখার জন্যে দ্বিতীয় দফা পরীক্ষা চলেছিল একাদিক্রমে একুশদিন। পরীক্ষিত ব্যক্তিদের মেজাজের ঠেরকের বিচার করার উদ্দেশ্যে প্রত্যেককে আগে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে তারা কোন ওষুধ, খাদ্য বা উত্তেজক পদার্থ খেয়েছে কিনা, কতক্ষণ ঘুমিয়েছে এবং এরকম অন্যান্য আরও অনেক প্রশ্ন।

পরীক্ষার সময় দেহের বিভিন্ন ক্রিয়ার ওপর সতর্ক লক্ষ্য রাখা হয়েছিল। এই পরীক্ষায় ডাক্তার গ্রাজোহান যেসব ফলাফল প্রত্যক্ষ করেন সে সম্বন্ধে, তার মত এই যে ভিটামিন "সি" মানুষের চিন্তাশক্তির গভীরতা, মেজাজ ও বিশ্লেষণ ক্ষমতা বাড়ায় ডাক্তার গ্রাজোহান বলেছেন যে সারারাত যাদের গাড়ি চালাতে হয় তাদের রাত দুটোর সময় ভিটামিন "সি" খাওয়া দরকার কারণ ঐ সময় তাদের দেহের প্রতিক্রিয়ার ক্ষমতা তীব্রভাবে কমে যায়।

———

খেলার মাঠে হট্টগোল হয় কেন ?

এক জায়গায় অনেক মানুষ একসঙ্গে জড় হলে কেন তারা শাসনের বাইরে চলে যায়, এ নিয়ে বিস্তর বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ হয়েছে। দেখা গেছে সমস্বরে চীৎকার করা বা সকলের মনের ইচ্ছা প্রকাশ করা জনতার মনস্তত্ত্বের আসল রূপ নয়, আসল ব্যাপার হ'ল জনতার মধ্যে ব্যক্তি তার সত্তা ও ইচ্ছা সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলে।

কিন্তু কেন হারায়, এ সম্বন্ধে বিস্তর গবেষণা সত্ত্বেও, এর মূল কারণ এখনও আবিষ্কার হয়নি। এ সম্বন্ধে যে কথা প্রায় শোনা যায়, তা হ'ল জনতার মতামতের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে যে আদিম মানব আছে, তা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে এবং মানুষ তার বিবেক হারিয়ে নিম্নস্তরের জীবের মত ব্যবহার করে। কিন্তু এই ব্যাখ্যা সন্তোষজনক নয়।

জনতার মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে সম্প্রতি পশ্চিম জার্মানীর পুলিশের পত্রিকায় একটি লক্ষ্যণীয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। পুলিশের সঙ্গে কাজ করেছেন, এরকম বহু অভিজ্ঞ মনোবিজ্ঞানীরা ফুটবল খেলার মাঠে যেসব অসঙ্গত, অভদ্র আচরণ লক্ষ্য করেছেন সে সম্বন্ধে তাদের মতামত জানিয়েছেন। তারা সকলেই একমত যে ফুটবল খেলার মাঠে যে সব মারামারি হয়ে থাকে, তার মূলে সর্বদাই একটি ক্ষুদ্র সম্প্রদায় কাজ করে। এরাই বৃহৎ জনতার মনে আগুন জ্বালায়। এই সম্প্রদায় সাধারণত ছেলেছোকরাদের নিয়ে গঠিত যাদের মধ্যে খেলাধূলার তাৎপর্য বোঝার বিশেষ অভাব দেখা যায়। স্রেফ গালাগালি কিম্বা হাতাহাতি করার উদ্দেশ্যেই এরা খেলার মাঠে জড় হয় এবং খেলার মাঠকেই তারা তাদের অবদমিত শক্তি ও আবেগ উজাড় করার প্রকৃত স্থান মনে করে।

অপর একজন মনোবিজ্ঞানী লিখেছেন যে আজকাল ফুটবল খেলার মাঠে তিন শ্রেণীর দর্শক আসে। একশ্রেণীর দর্শকরা খেলা সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ অর্থাৎ একসময়ে যারা নিজেরাই ফুটবল খেলোয়াড় ছিল। এরা জনতার মনস্তত্ত্বে সাড়া দেয়না। দ্বিতীয় শ্রেণী হ'ল প্রথমের ঠিক উল্টো, এরা সব ছেলেছোকরার দল, এরা আসেই খেলার মাঠে তাদের বেপরোয়া মনের উদ্দাম পরিচয় দিতে। সারা দুনিয়ার খেলাধূলা নষ্ট করতে এরাই যত নষ্টের গোড়া।

তবে দর্শক হিসেবে সবচেয়ে বড় দল হল সব বয়সের, সমাজের সব শ্রেণীর, সব পেশার এবং শিক্ষাদীক্ষাসম্পন্ন অগণিত মানুষ যাদের ওর নির্ভর করে খেলার মাঠের প্রকৃত আবহাওয়া। এরা কেন খেলা দেখতে আসে তা তারা নিজেরাই জানে না। একজন মনোবিজ্ঞানী বলেছেন যে মনের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্যই এরা খেলা দেখে। জীবনটা দিনদিন যত একঘেয়ে হয়ে উঠছে, মানুষ তত ব্যক্তিগত উত্তেজনা খুঁজছে। আর খেলাধূলার প্রতিযোগিতা এমন একটা জিনিষ যা আমাদের সুপ্ত ও অবদমিত মনোভাবকে নাড়া দিয়ে জীবনটাকে পরিপূর্ণ উপভোগ করার একটা সুযোগ এনে দেয়। সেদিক দিয়ে খেলার মাঠে উচ্ছৃঙ্খল আচরণ আমাদের অবদমিত মনের আগল ভেঙে দেওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়।

আপনি কি দেখেছেন।

উদ্যানের মুক্তাঙ্গনে নৃত্য ও নাটক

হানোভারের উপকণ্ঠে যে শৌখীন উদ্যান আছে, তার নাম হেরেনহাউসেন পার্ক। এই পার্কের মুক্তাঙ্গনে প্রতি বছর নাচগান থিয়েটার হয় এবং তা দেখতে সারা পৃথিবী থেকে লোক আসে! প্রায় আড়াইশো বছর আগে ইংল্যাণ্ডের রাজা প্রথম জর্জের মা এবং প্রুশিয়ার ফ্রেডরিক দি গ্রেটের দিদিমা এই পার্কে মুক্তাঙ্গনের পরিকল্পনা করেছিলেন কিন্তু সেকালে খুব সম্ভবত এখানে কেবল নাটক হ'ত! এখনও হেরেনহাউসেন পার্কের কৃত্রিম ঝরণা ও ফোঁয়ারা ঘেরা প্রশস্ত মুক্তাঙ্গনে বার্ষিক অনুষ্ঠান যথারীতি চলেছে। এ মাসের শেষ পর্যন্ত অনুষ্ঠান চলবে। গোড়ার দিকে নাচের অনুষ্ঠান হয়েছিল, দ্বিতীয় ভাগের অনুষ্ঠানের মধ্যে আছে শেক্সপীয়ারের নাটক অপেরা ইত্যাদি। এ বছরের অনুষ্ঠানের শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ ছিল "বৎসরের ঋতু" নামে ব্যালে নৃত্য।

জেনে রাখুন:

বেশি গাড়ি চালানো স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর

জানেন কি সারাদিন গাড়ি চালানোর অর্থ সারা সপ্তাহ খাটুনির সমান? একথা জানিয়েছেন পশ্চিম জার্মানীর ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক ইন্‌স্টিটিউটের অধ্যাপক প্রয়সেন। ইলেক্ট্রোনিক যন্ত্রের সাহায্যে বহু পরীক্ষানিরীক্ষা করার পর অধ্যাপক প্রয়সেন এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে যানবাহন পূর্ণ পথে গাড়ী চালানে সাধারণ খাটুনির তুলনায় দেহ অনেক বেশি অথম হয়। বেশ পাকা চালকেরও গাড়ী স্টার্ট করার সঙ্গে সঙ্গে নাড়ীর গতি বেড়ে যায়। বেশব টানা রাস্তায় বেশী গাড়ী চলে, বয়স ও স্বাস্থ্য অনুসারে চালকের গাড়ীর গতি ১০ থেকে ১৫ ভাগ বেড়ে যায়। বিপজ্জনক অবস্থায় যেমন বেগের মাথায় অন্য গাড়ীকে পাশ কাটিয়ে যাবার সময় চালকের নাড়ীর গতি ৬৮ থেকে ঝুপ করে ১০০তে উঠে যায়। তাই শরীর সারাতে ছুটি নিয়ে যারা কেবল গাড়ী চালায়, তাদের শরীর সারা তো দূরে থাক বেশি খারাপ হয়।

এই বিষয়ে অন্যান্য চিকিৎসকরাও অধ্যাপক প্রয়সেনকে সমর্থন করেছেন। বহু প্রতিষ্ঠানের অনেক কর্মচারী ছুটির পরে কাজে যোগ দেবার সময় এত দুর্বল হয়ে পড়ে, যে আবার তাদের শরীর সারাবার জন্যে ছুটি শান্তিতে না কাটিয়ে কেবল গাড়ী ছুটিয়ে এখানে ওখানে ঘুরে কাটাতে হয়। এসব বন্ধ করার জন্যে কোনদিন হয়তো বিশেষ আইন প্রণয়ন করতে হবে। অবশ্য ফেডারেল জার্মান আইনে বলে যে ছুটি নিয়ে কোন কর্মচারী এমন কোন কাজ করতে পারবে না যা তার স্বাস্থ্যের ক্ষতি ক'রে কাজ করার ক্ষমতা নষ্ট করে। অবশ্য আজ পর্যন্ত পশ্চিম জার্মানীর শ্রমিক আদালতে এ রকম কোন মামলা ওঠেনি।

পাছে গাড়ী চালিয়েদের জন্যে জার্মানীর পুষ্টি-বিশেষজ্ঞরা খাওয়া দাওয়ার কিরিস্তি দিয়েছেন। তাদের মতে এদের চর্বিজাতীয় খাদ্য বাদ দিয়ে খেতে হবে কেবল প্রোটিনজাতীয় খাদ্য, ফলের রস, দই ও জাঁতায়-ভাঙা আটার রুটি। পাউরুটি।

অন্তরীক্ষে

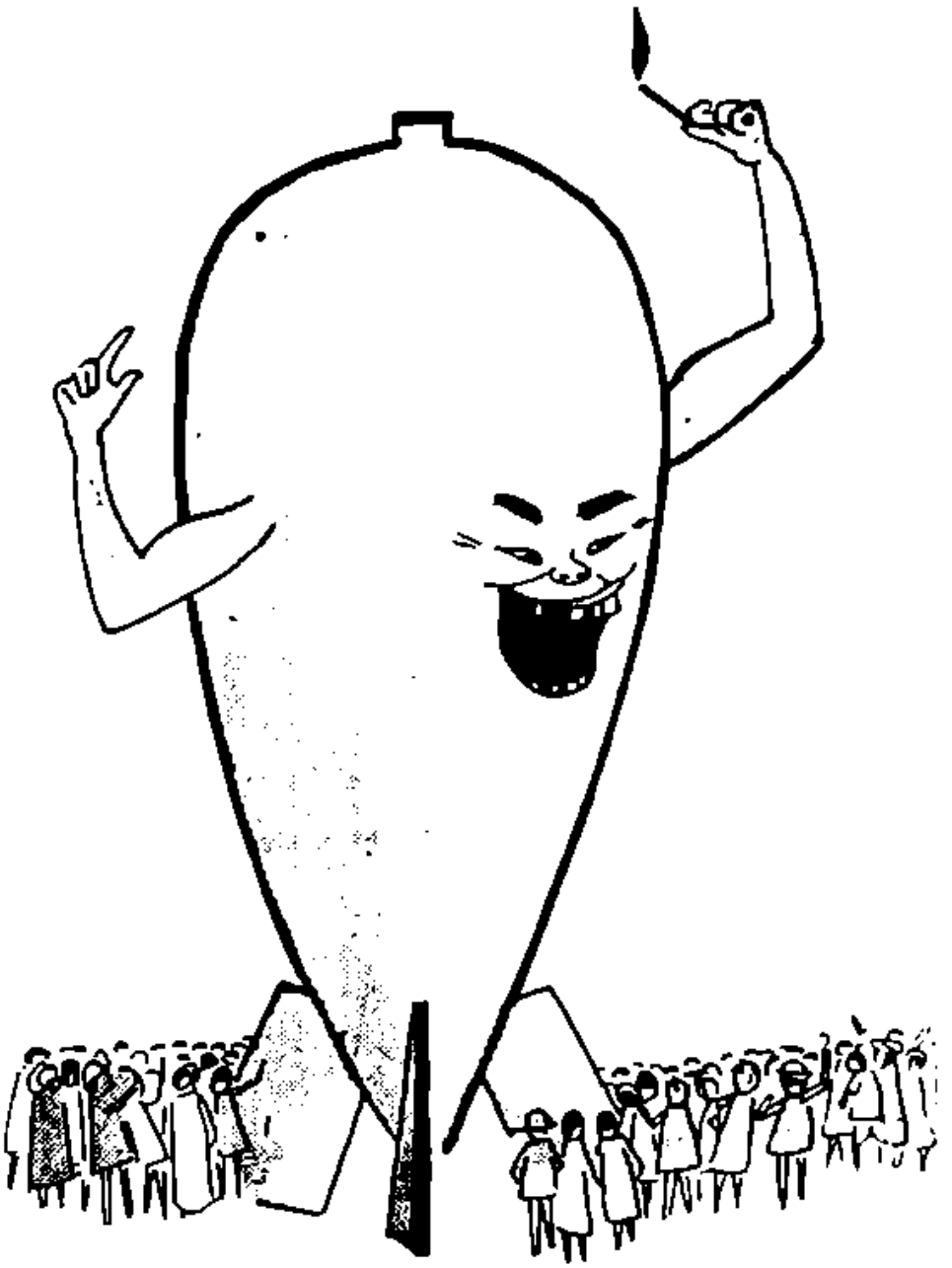

দীপালীর উপহার।

আগামী কাল !

পুতুল পুতুল

সন্দীপ মুখোপাধ্যায়

বৃষ্টি বিছানাটা ভিজিয়ে ফেলেছে। কোলের কাছটা ঠাণ্ডার ছ্যাঁক করে উঠতেই তৃপ্তির ঘুম ভেঙে গেল। দুবছর বয়েস হতে চলল এখনও মেয়েটার এই বিশ্রী নোংরা রোগ গেল না। বাইরে ঝিপ্ ঝিপ্ করে সমানে বিষ্টি পড়ছে। দালান পেরিয়ে কলতলা। উঠোনেই হয়ত এক গোড়ালি জল। তার ওপর ছ্যাতলা পড়ে কলতলার দুদশা যা হয়েছে! এই রাতে কাঁথাকানা নিয়ে কলতলায় যেতে হবে মনে করে তেঁতো হয়ে উঠল তৃপ্তির মেজাজ। শাড়ীটা বদলে এলেও ভাল হয়। নিতু, সনু, বাপ্পি, বুলু চারটেতে শুয়েছে দেখো না। একটা আর একটার ঘাড়ে মাথায় ঠ্যাং তুলেছে, হাতটা পড়িয়ে দিয়েছে। নিতুটা মাথা গুঁজে দিয়েছে তুলো বের করা বালিশটাতে। দশ বছরের ধেড়ে ছেলে! এখনও বাস পড়ে কব বেয়ে! আর উনি ত ঘোর! পিঠে চুঁচ বিঁধিয়ে দিলেও বশা মনে করে হাতটাকে একটু এধার ওধার করবেন।

যত বকুকি আর যন্ত্রণা হয়েছে তৃপ্তির। চৌকির ওপর থেকে ভারী শরীরটা ধপড়ে বিরক্তির একটা শব্দ করে মেঝেতে নামল। বিষ্টিটা চেপে এসেছে। হোঁচট খেল একটা কিসে দালানের অন্ধকারে। বাঁ হাত দিয়ে আলো জ্বালল। বেয়াড়া বাঁদর ছেলেমেয়েগুলো। রথের মেলা থেকে কাঠ আর টিনের খেলনাপাতি কিনে অবদি ভাঙছে ছড়াচ্ছে তছনছ করছে। সংসারদিনের উপদ্রব নরক হয়ে আছে দালানের এখানে ওখানে। আর একটু হলেই তৃপ্তি হুমড়ি খেয়ে পড়ত।

ভোরবেলাতেও আকাশের মেঘ সরে নি। বিছানা ছেড়ে উঠতেই খুব খারাপ লাগল তৃপ্তির। এঁটো বাসন কোসনগুলো জলে ডুবু ডুবু হয়ে আছে কলতলায়। চারুর মা আসেনি এখনও। দাঁতনটা কামড়াতে কামড়াতে জিতেন এসে দাঁড়ায় কলতলার মুখটায়। উঠোন আর পাঁচিলে মেঘময়লা ভোরবেলার ছায়াছায়া অন্ধকার। চোখেমুখে জলের ঝাপটা দিতে দিতে জিতেন মুখ নিচু করে বলল,

আজ কি খুব কষ্ট হচ্ছে তৃপ্তি? একবার শিব-মন্দলে গেলে হত না? ডাক্তার ত সেবার দিন পনের পরে দেখাতে বলেছিল?

না থাক্।' তৃপ্তির মুখে কিন্তু রাগের রেখা নেই। দেহের স্ফীত অংশটার দিকে জিতেন একটু বিব্রত চোখে না তাকিয়ে পারে না। তৃপ্তি উঠোনে তারের ওপর ভিজে কাপড়গুলো মেলে দিতে থাকে। মুখ ঘুরে একটু বেশিরকম শুকনো কাশির শব্দ করতে করতে জিতেন দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে যায়।

চারুর মা আসতেই মুখিয়ে ওঠে তৃপ্তি।

এত বেলা হলে কাল থেকে আর এসো না বাছা। এ কি হোটেল বাড়ী যে যখন খুশি আসবে আর ছাইগাদায় বাসন নিয়ে বসবে।

ও মা এই ত সবে সাতটা গো, মেঘ করে রয়েছে তাই ঠাওর পাচ্ছ না। চারুর মা নরম হয়ে আসে একটু।

কাল থেকে কোমরের ব্যাথাটা চাড়া দিয়েছে বৌদি। কি করি বল? তোমার এই ভরামাস। আমি নাকাল করতে যাব কেন গা?

বিরক্ত হয় তৃপ্তি। সবাই ওকে দেখছে। না দেখে পারে না। হঠাৎ ও যেন নির্লজ্জ রকমের প্রকট হয়ে উঠেছে। জিতেনের সামনে চারুর মার সামনে এমন কি নিরু, সনুও সময় সময় ওকে আই চাই করতে দেখে বলে, মা তোমার বুঝি খুব কষ্ট হচ্ছে?

খেতে বসে জিতেন বললে, ভাবছি হস্টেল থেকে রেখা এসে এখানে কিছুদিন থাকুক। এখান থেকেই না হয় কলেজ করবে। তোমার তাতে একটু……

আমার আবার অসুবিধেটা কোথায়? রেখার এগজামিন সামনে এখানে এসে ওই পদপাল-গুলোর জ্বালায় পড়াশোনা কিছু হবে নাকি!

তাহলে চারুর মাকে কি দুপুরটা থাকতে বলব?

যাই তোমার পান সেজে আনি। জিতেন বেশ বুঝতে পারে ওই একটা ছুতোয় তৃপ্তি উঠে গেল। কিন্তু কেন! হ্যাঁ খিটখিটে হবার কথাই এ সময়টা। কিন্তু তৃপ্তির ত আর এই নতুন নয়। ওদের আপিসের বিকাশ দত্তর বউ ত আটবছর সমানে এই জের টানছে। কি করবে! জিতেনও ত ওর সাতভাইয়ের কোলে। ওর বন্ধু ডাক্তার অজয় দাস বলেছিল, এইবার সামলাও হে। মেয়েটি নিয়ে তোমার হল পাঁচ। ফিস্ কার নো কারবার।

কিন্তু কি করবে জিতেন। সাবধান কি হয়নি? বাসের মধ্যে একবার ছেড়ে দুবারও বাপের বাড়ী গেছে তৃপ্তি। আর এই মাগ্‌গি গণ্ডার দিনে ছুট বলতে বাপের বাড়ী পাঠালে ওরাই বা ভাববে কি!

ঘর থেকে চীৎকার শোনা যায় তৃপ্তির। খুদুটাকে হয়ত মেরেছে। গলা কাটিয়ে কাঁদছে। সনু কি একটা হিন্দি গান জুড়ে দিয়ে বাথুম পিটছে। গলায় বোতাম লাগাতে লাগাতে জিতেন এসে ঘরে ঢুকল। বাপকে ছেলেগুলো যমের মত ভয় করে। সঙ্গে সঙ্গে চুপসে ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

কি হয়েছে কি? টেবিল থেকে পানের ডিবে তুলে নিতে নিতে ওর চোখ বড় হয়ে যায়। কটমট করে তাকায় সকলের দিকে।

বিছানার ওপর বসে বেশ জোরে জোরে হাঁপাচ্ছিল তৃপ্তি। এক দণ্ড শান্তি দেয় না আপদগুলো। মনে হাড় জুড়োয়। ওরোরের পাল কোথাকার!

তৃপ্তি কি যা তা বলছ?

ঠিক বলছি। তুমি যাও তোমার আপিসের বেলা হয়ে যাচ্ছে। আর ছেলে-পুলেদের আমি যখন বকব তখন তার ভেতর নাক গলাতে এসো না।

যা তা গালাগাল দিচ্ছ কেন? আজকাল তোমার যা মুখে আসে তাই বল। সামলাতে পারছ না, রেখাকে আনতে চাইছি তাতেও রাজী নও।

এ কি আমার একদিনের জ্বালা যে চং করে একবার তোমার বোন বেড়াতে এলেই জুড়িয়ে জল হয়ে যাব।

উত্তরের অপেক্ষা না করে উদরের ভারে নুয়ে পড়া দোল খাওয়া দেহটাকে যেন হিঁচড়ে টানতে টানতে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল তৃপ্তি।

নিতু সমুকে ইস্কুলে পাঠিয়ে চারটি নরম নরম করে মুখে দিলে। ঘরে এল। বাপী মৃদু বিছানায় শুয়ে শুয়ে ঘুনসুটি করছে। খুকিকে নিয়ে গেছে পাশের বাড়ীর মেয়েটা। খুকিও থাকে থাকে ওদের বাড়ী যাবার জন্যে হোক হোক করে।

শরীরটা গড়িয়ে দিল তৃপ্তি বিছানার ওপর। ঘর দোরের অবস্থা যা হয়েছে! গোছগাছ করতে পারলে হত। কিন্তু একেবারেই পারছে না। স্বিতেনের ময়লা মেঝিটাতে সাবান ঘষে দিলে ভাল হয়। পুরোনো খবরের কাগজগুলো তোলা হয় নি। টানাটানি করে তার কয়েকখানা ছিঁড়েছে ওরা। তেলচিটে বালিশগুলোতে বর্ষায় এমন একটা গন্ধ হয়। ওয়াড়গুলো কাচা দরকার। ঘর দোর যেমন নোংরা দেখতে পারে না তৃপ্তি তেমনি তার দশা হয়েছে।

একটা উদ্বেগ আর চিন্তা ভাবনা নিয়ে খানিক তন্দ্রা এসেছিল মনে হচ্ছিল স্বিতেন যেন কাকতেড়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ফুটপাথে ট্রাম পাচ্ছে না। ওমা! ছেলে নিয়ে নিতুই দৌড়চ্ছে দেখ।

ও কি ওর কানটা অমন লাল কেন? মার খেয়েছে নাকি ইস্কুলে? মাগো, ডাস্টবিনের ধারে ওটা কি! ইস্ গা সিন্‌সিন্ করে ওঠে! আবার বৃষ্টি এলো! ট্রাম আসছে না। নিতু কোথায় গেল?

এই তিপু অত ধারে শুয়েছিস কেন? পড়ে যাবি যে? ধড়মড়িয়ে চমকে উঠে বসে তৃপ্তি, রত্না! মনোহরপুকুরে থাকে, ওর ছেলেবেলার বন্ধু।

আয় বোস, বাদলাতে কেমন একটা আলিস্যি এসেছিল। ওদের আলিস ইস্কুল পাঠিয়ে খেয়ে উঠে মুখে পান দিতেই চোখ টেনে এসেছিল। তারপর তোর কর্তা কিরছেন কবে আন্দামান থেকে?

আর বলিস নি। কি যে ছাই ঘুরনির কাজ। কাল চিঠি এসেছে কাজ শেষ হলেই চলে আসবে। ওদিকে ঠাকুরপোর জ্বর পরশু থেকে। আজ একটু কম। তাই ভাবলুম তোর সঙ্গে একবার দেখা করে আসি।

বেশ করেছিস। রত্নার ব্লাউসটার দিকে চেয়ে তৃপ্তি বলে, বেশ ছিটটাত রে। কোত্থেকে কিনলি?

ফিরিওলাদের কাছ থেকে। প্রায়ই আসে। তোর বাড়ীর ঠিকানায় পাঠিয়ে দেবো'খন। তোর শরীর কেমন আছে তৃপ্তি? আমার মনে হয় হাসপাতালে থাকলে পারতিস এ সময়টা। বেশী এসে যেমুক না ক'দিন।

জানলা দিয়ে অন্যমনস্কের মত তাকিয়ে থাকে তৃপ্তি। এটা সেটা আলোচনা করে রত্না। আদর করে মৃদু বাপীকে। চুমু খায়, কোলে করে।

কি সুন্দর ছেলেমেয়ে তোর তিপু। আমার মেয়েটা এমন দুষ্টু হয়েছে কি বলব। রেডিওতে গান হলেই এমন হাত ঘুরিয়ে নাচবে।

উনি বলেন ওকে নাচ শেখাবেন। আমাদের সেদিন আরনেইয়ে। আমার বড় ছেলে প্রবীণ ফ্লাস ফোরে উঠল। কী বাড়বাড় বাবা। বলে, মা তোমার বাকলোয় গাদাখানেক পাঁজী কেন। রবিবাসরক্লাসে

কেনো না বাপীকে বলে। আমি ত ওদের নিয়েই থাকি যে। কণিকে নিয়ে এক একদিন বেড়াতে যাই। প্রদীপ পড়ে মাসটার মশায়ের কাছে। কণির আবার সিনিমনা কত! এই ত পাচে পড়ল। বলে, মা দাদা কাঁদবে না ওকে বেড়াতে নিয়ে না গেলে। খুশিতে উলচে উঠে হাসতে থাকে রত্না।

তৃপ্তির মনে হয় একটা ছোট জানলা দিয়ে ও যেন দূরের একটা সবুজ পৃথিবীর দিকে চেয়ে আছে। দেখতে ওর ভাল লাগে, শুনতে চায় প্রাণ ভরে। শুনে শুনে ক্লান্তি আসে। রত্নাকে ছাড়তে চায় না তবু। ইচ্ছে হয় একদিন ওদের সবাইকে নেমন্তন্ন করে খাওয়ায়। কিন্তু জিতেন হয় তো শুনে হাসিয়ে উঠে বলবে, এ মাসে আমার অনেক খরচ হয়ে গেছে।

তা খরচ ত বটেই। একটা গোটা জানোয়ারকে খাওয়াতে-হচ্ছে। একটা মেশিন চালু রাখতে তেল জুগিয়ে যাচ্ছে জিতেন বছরের পর বছর। কেনা বাঁদীর মত মুখ বুঁজে ওর ইচ্ছের ঘড়িতে বাঁধা পড়ে আছে তৃপ্তি। সারা শরীর যন্ত্রণায় দুমড়ে আসে ওর। রত্না চলে যায় এক সময়। ও চেয়ে থাকে জানলা দিয়ে। বেলা পড়ে এল। এইবার ওঠে ও। একঘর কাজ পড়ে আছে। পাশের বাড়ীর ছাত থেকে সরে যাচ্ছে বিকেলের রোদ। জিতেন আপিস থেকে আসবার আগেই রেখা এল। চুলের জট ছাড়াতে ছাড়াতে একবার শুধু রেখার মুখের দিকে আড়চোখে চাইল তৃপ্তি। রেখা বরাবর ওকে একটু এড়িয়ে চলে। প্রয়োজন হলে অনুকম্পা করে। দাদার পক্ষ নিয়ে বাঁকা কথা ছুঁড়ে মারতেও চেষ্টা করে রেখা। কাঁধের ব্যাগটা আলনায় ঝুলিয়ে রাখতে রাখতে বলল।

দাদা টেলিফোন করেছিল, এ সময়টা আমি থাকলে……

মিছি মিছি তোমায় টেনে আনবার কোনো দরকার ছিল না।

দাদার দরকার হয়ত ছিল।

ওঃ ভারী ভাই সোহাগী বোন! ছটফট চেঁচিয়ে উঠতে ইচ্ছে হল তৃপ্তির একটা বস্তা বোঝাই গাধাকে যেন সকলে মিলে গাঁড় করিয়ে রাখবার জন্যে খেটে মরছে। চোখ ফেটে জল আসতে চাইল তৃপ্তির। মনে হল কতকগুলো ঘিনঘিনে পোকামাকড় ওর গায়ে সড় সড় করে বেড়াচ্ছে।

রাত ন'টা বাজতে চলল, জিতেন এখনও ফিরল না কেন। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। আবার বৃষ্টি আসবে। বাপী চোখ রগড়াতে রগড়াতে ঘরে এল। আলো নিভিয়ে শুয়েছিল তৃপ্তি। ওর কোলের কাছে এসে গোঁপাতে লাগল। মাথার ওপর হাত বুলিয়ে তৃপ্তি জিজ্ঞেস করে।

কি হয়েছে রে? কাঁদছিস কেন?

পিসি মেরেচে। দেখো না আমি একটা বেশুন ভাজা চেয়েছি দেয়নি, আর গালে এক চড় মেরেচে।

এবার একটু জোরে কেঁদে ওঠে বাপী। বেত পড়ল যেন তৃপ্তির মুখের ওপর। একরকম হোঁচট খেতে খেতেই ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

ওসেই ছেলেটাকে মারতে গেলে কেন? ও আবদারে একটু, আমাকে ডাকলেই হত। না পারো বলবে, আমার ছেলেদের গায়ে হাত তুলবে না।

কি বলছ বৌদি! মুহ খাচ্ছে, সমানে ওর হাতে চিমটি কাটছে। দুটো বেশুন ভাজা দিয়েছি, আবার চাইছে। একটুখানি হাত ছুঁইয়েছি কি না ছুঁইয়েছি সাথি মেরে ভাতের থালাটা সরিয়ে তোমার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছে।

সাসারে আবার কি, ওর অত বুদ্ধি আছে নাকি? দেখলুম ত গালটা লাল হয়ে উঠেছে। কলেজে যাওয়া আর মা হওয়া এক নয় বুঝলে?

দেখো, কথায় কথায় তুমি অমন লেখাপড়ার খোঁটা দিও না বলছি।

জিতেন এসে পড়তেই ওরা থেমে গেল।

পান মুখে দিয়ে দালানের চেয়ারটায় বসে সিগারেট টানছিল জিতেন। ছেলেমেয়েরা শুয়েছে। রেখা ঘরের দরজাটা ভেজিয়ে পড়ছে। এগজামিন সামনে। খেয়ে উঠে ঘরের বিছানা বালিশগুলো ঠিক করছিল তৃপ্তি আজকাল ক্লান্তিটাকে নিয়ে তক্তপোষের ওপর শোয় তৃপ্তি। মাটিতে জিতেন আর চার ছেলে। কাচা বালিশের ওয়াড়গুলো পরাবার সময় পায় নি ও। ফুলকাটা নক্সা। ওরই হাতের। আগে সময় ছিল। সেলাই নিয়ে বসত। ঝাঁকার হাত ছিল। লাল নীল সুতোয় বিচিত্র বুননের কৌশল জানত। পাড়ার মেয়েরা শিখতে এলে তৃপ্তি বলত, মেয়েরা বড়দিন না মা হয় খেয়ালের খেলা খেলে। মেয়েরা যখন কোলে কাঁখে তখন এসব ছাই পাশ চুলোয় যেতে যাবে। আজ তাই হয়েছে তৃপ্তির। কোথায় ওর সেই কৈশোরের খেলার বিকেল দুপুর। কোথায় গেল নতুন ভালবাসায় রোমাঞ্চ মধুর ঘুম না-আসা রাত। সব কাকাসে হলদে হয়ে গিয়ে তৃপ্তিকে নিয়ে এসেছে একটা দস্যু গগনে মরুভূমির সামনে। ও ছুটছে, হাঁপাচ্ছে, ঘাম দিচ্ছে, আবার জল জল করে হন্তে হচ্ছে। জিতেনের মত দেওয়া বরা ইচ্ছের ঘর হয়ে রাতের পর রাত ও নিজেকে বিকিয়ে দিতে চায় নি। সরে যেতে চেয়েছে। তবু পারে নি। শিকল পরেছে পা বাড়িয়ে। উপায় না দেখে ঢুকেছে খাঁচায় বাধ্য হয়ে।

চুল ওঠা ওঠা রুক্ষ মাথার মাঝপথের বিবর্ণ সিঁথির দিকে চেয়ে চেয়ে ওর মনে হল যত বোঝাই হক জিতেনের লালসা তবু ও তা সারা গায়ে মেখে নিয়েছে। আত্মদানের দুর্বহতায় প্রবল আক্রোশে ভেঙে যেতে লাগল ওর বুক কান্নায়। বিছানা ঠিক করল তবু কান্না চেপে। জিতেনের বালিশ ফাঁপিয়ে সাজিয়ে দিল। ডাকতে হল না। জিতেন ঘরে এল।

প্রতিদিনের মত দরজা ভেজোতেই ঝাঁতকে উঠল যেন তৃপ্তি। বড় আলোটা নিভিয়ে দিল জিতেন। বিরস কণ্ঠে তৃপ্তি বলল,

এত রাতে আবার টেবিল ল্যাম্প জ্বালছ কেন? সারাদিন খেটে এসে আর নভেল পড়ে কি হবে?

আলমারির পাশে একটুখানি অন্ধকার কোন। তৃপ্তি পিছন ফিরে জামাটা খুলছিল। ওর পুষ্ট দেহের পিছন দিকটায় টেবিল আলোর আবছা আভা লেগেছে। ঘাড়ের অনাবৃত অংশ, ওর কর্সা বুকের একদিক সব দেখতে দেখতে ভাবল জিতেন সুন্দর ছিল একদিন ওর স্ত্রী। সেই প্রথম রাতগুলির একটি সঙ্গিনী। একটু অভিনয় করে ফেলল জিতেন। ছোট লাল বাক্স থেকে খুলে নিয়ে ওকে চমকে দিয়ে আঙুলে পরিয়ে দিল। চিক চিক করে উঠল। হাসল জিতেন।

কি সব পাগলামি শুরু করেছ। ছেলেমেয়েগুলোর প্যান্ট জামা নেই। ও মাসের ভাড়াটা জমে আছে। আজ বাদ দিয়ে কাল হয়ত আমায় হাসপাতালে যেতে হবে। হঠাৎ তোমার আংটি পরাবার সখ হল!

চিবুক ধরে মুখটা ভাল করে ফিরিয়ে নিল জিতেন।

আমার কি সুখ থাকতে নেই তিপু?

ওটা মিটিয়ে আমাকে শান্তি দিলেই বাঁচি।

তোমার কি খুব কষ্ট হচ্ছে?

আমার এই কদর্য চেহারাটা দেখে তোমার মনেই ছটফটানি বাড়ছে বেশি।'

লজ্জা অপমানে কালো হয়ে উঠল জিতেনের মুখখানা। বুঝল আজ তৃপ্তি ওকে চরম ঘৃণায় অজ্ঞানে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। তৃপ্তি বিছানায় শুয়ে পড়েছে ততক্ষণে। জিতেন দেখল কান্নায় ফুলে ফুলে উঠছে একটা নমনীয় ক্লান্ত দেহ।

ডাক্তার বললেন, না ভয়ের কিছু নেই, তবে খুব নার্ভাস। এই ত প্রথম নয়, তবু কেন যে—

জিতেন অফিস থেকে ফল নিয়ে গেল, ওষুধ দিয়ে এল। রেখা আবদার জানিয়ে এল, ভাইপো হলেই চলে যাব না, বেশ করে খেয়ে পরে নিয়ে তবে নড়ছি।

আর প্রহর গুণতে লাগল তৃপ্তি। বেবিজ হোম। ছোটটো বাগান ঘেরা প্রসূতিসদন একটা। সামনে কাঁকর ঢালা পরিচ্ছন্ন পথ গিয়ে মিশেছে বড় রাস্তায়। জিতেনের শালা ডাক্তার। সেই এখানে একটা কম খরচের ব্যবস্থা করে দিয়েছে।

বিকেল বেলা নার্স বললে, আশা করছি কাল সকালেই ছেলের মুখ দেখতে পাবেন। খুশির খবরটা তৃপ্তিকে দেবার সময় একটু মুষ্টিত হল জিতেন। হাজার হোক এই ত আর প্রথম ছেলে নয়। কিন্তু বলল শেষ পর্যন্ত। আর আজ ম্লান হাসল তৃপ্তি। জানলার বাইরে ঝকঝকে ডালিয়ার দিকে চেয়ে হাসিটা ভাল লাগল জিতেনের। নিশ্চয়ই, সাধার হোক মা হতে চলেছে তৃপ্তি। না এবার সতর্ক হবে বৈ কি সে। সত্যি তৃপ্তি-ওকে অনেক দিয়েছে। বোঝা আর চাপাবে না। সেদিনকার আংটিটা আজ তৃপ্তির আঙুলে অপূর্ব মানিয়েছে।

কাল সকালে আসব। আচ্ছা খোকনের জন্যে কি আনবো বলো ত?

বাঃ তুমি কি ভেবে নিয়েছ ছেলে হবেই, মেয়েও ত হতে পারে।

ঠাকুমা কি বলত জান? বর বউয়ে ঝগড়া হলে না কি ছেলে হয়?

আহা, যত রাজ্যের ছেলেমানুষি!

মুখটা নামিয়ে আনল জিতেন। অভিনন্দন জানাতে চাইল তৃপ্তির শান্ত হাসিকে। অল্প হেসে নার্স ঘরে ঢুকল।

অনেক রাতে খবর পেয়ে 'বেবিজ হোমে' চলে এল জিতেন। তৃপ্তির অবস্থা তেমন ভাল নয়। ডঃ রায় জানিয়ে গেলেন, হয়ত সিজারিয়ান করতে হতে পারে। জিতেন ভেঙে পড়ল, বলল, আমার ছেলে চাই না ডাক্তারবাবু ওকে বাঁচিয়ে তুলুন। ডাক্তার আশ্বাস দিয়ে ভেতরে গেলেন। রাত শেষ হতে চলেছে। ধীর ধীরে হাওয়ায় কেমন একটা তন্দ্রা এসেছিল জিতেনের। পোর্টিকোর সামনে বেঞ্চিটাতে আধশোয়া হয়ে আকাশ পাতাল ভাবছে। দ্রুত পায়ে নার্স যাচ্ছিল। ওকে ডেকে জিজ্ঞেস করল, কেমন আছে এখন?

ঘাবড়াবেন না সব ঠিক হয়ে যাবে।

ভোর হচ্ছিল তখন। ডাক্তারের ডাকাডাকিতে খুব তাড়াতাড়ি জিতেনের।

একি এখানেই শুয়ে পড়েছেন।

কেমন আছে ও ডাক্তারবাবু!

বেশ লোক ত মশাই, শুধু ওর কথাটাই জিজ্ঞেস করছেন। দুজনেই ভাল আছে। নিন, সিগারেট নিন একটা। আর শুনুন, এবার ইতি করে ফেলেন কিন্তু। আর না।

জিতেন মুখ নামাল। 'আচ্ছা এখন একবার·····

না বিকেলে দেখা করবেন।

ভোর হয়েছে। সকালের নিষ্টি আলো এসে ছুঁয়েছে বাগান, পথ আর তৃপ্তির বিছানার সামনে জানালাটা। সারা রাত কি যেন হয়ে গেছে। ওর অচৈতন্য অনুভবে ছায়া ছায়া সব কত ইতিকথার ঝিলমিল। যন্ত্রণার মেঘ যেন ওকে ঢেকে ফেলেছিল। নার্স নিয়ে এল ওর ছেলেকে। ও চোখ ফিরিয়ে দেখল। দেখল আর ভাবল। টুকটুকে ডালিমের মত গাল। ভেজা ভেজা ঠোঁট আর ঝাঁকা ঝাঁকা চোখ।

না এবার আর ওদের নিয়ে বিরক্ত হবে না তৃপ্তি। ভালবাসবে, সাজাবে, বড় হবে ওরা। তারপর·····

জানলা দিয়ে চেয়ে রইল বাঁকের চালা রাস্তার দিকে। বিকেলের প্রতীক্ষায়। সোনালী বিকেল।

* * * *

মাটীর প্রতিমা

মহাকালের অন্তরে জেগেছে তীব্র বাসনা···অনন্ত যুগের মধ্যে আমি বাঁচিয়ে রাখবো আমার ধারাবাহিকতাকে···অখণ্ডতাকে। মানুষ প্রতিদিন ঘণ্টে পলে তাকে করেছে খণ্ড বিখণ্ড···কি দিয়ে ওঁকে বেঁধে রাখা যায় এক করে?

চারদিকে ছুটলো বিশ্বকর্মার চরেরা। কেউ আনলো স্বর্গসায়ন; কেউ আনলো লৌহ শৃঙ্খল; কেউ নতুন করে আবিষ্কার করলো নব ধাতু। কিন্তু কিছুতেই গেল না বাঁধা। জগতের কঠিনতম ধাতু সর্বোত্তম পদার্থ, বিশ্বকর্মার মস্তিষ্কের সমস্ত উদ্ভাবনী শক্তি, সব ব্যর্থ হয়ে গেলো।

অবশেষে মানব এসে বল্লো, আমি পারি!

দেবতারা উঠলো হেসে।

মাটী আর খড় দিয়ে মানব গড়লো প্রতিমা। অন্তরের ভক্তি দিয়ে সেই মাটীকে করলো কালজয়ী।

ইলোরায়

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

অজন্তা থেকে ইলোরা। দীর্ঘ সাতষট্টি মাইল পাড়ি দিচ্ছি বাসে করে। পথটা বৈচিত্র্যহীন। দু'ধারে ধূ-ধূ করছে মাঠ—শস্য-হীন কর্কশ ভূমি। নভেম্বরের শেষ বলে সব জমিই নিরাভরণ। মাঝে মাঝে দু'একটি গ্রাম আসছে—সে-ও শ্রীহীন। বিশেষ করে এই রৌদ্রদীপ্ত মধ্যাহ্ন পথের সর্ব্বাঙ্গে মরুভূমির ছায়া ঘনিয়ে তুলেছে। চোখ মেলেই চলেছি আমরা—অথচ পথের কোথাও দৃষ্টির খাদ্য মিলছে না। এমনি করে ক্লান্তিকর দীর্ঘ পথ শেষ করে সন্ধ্যা নাগাদ আমাদের বাস থামল ঔরঙ্গাবাদ ষ্টেশনের গায়ে।

বাসে আসতেই শহরটা মোটামুটি দেখা হয়ে গেল। দেখবার মত বিশেষ কিছু নাইও শহরে। শাহী আমলের পুরনো ইমারতের জটলা ঠেলে যার কয়েক নতুন ফ্যাসানের প্রাসাদ মাথা তুলেছে। যেন জীর্ণ কাপড়ে কিছু কর্ম্মের স্বাক্ষর। চলতি বাসে বসে এর চেয়ে ভাল করে দেখা যায় না দেখিওনি আমরা।

বাস থেকে নেমে এবার আশ্রয়ের সন্ধান। এদিকটায় জনবসতি কম হলেও হোটেলের সংখ্যা বেশী। একটা ডরমেটরি ধর্ম্মশালা আছে। রেষ্টুরেন্ট তো দু'পা হাঁটা অন্তর। দেশ বিদেশের যাত্রী এসে ভিড় জমায় এই দিকটাতেই। তাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দের ভার নিয়ে সরকারী বাস—ষ্টেশন ট্যাক্সির আড্ডা—রেষ্টুরেন্ট—হোটেল সবই ভারে ভারে জমে উঠছে। রেলওয়ে ষ্টেশনকে ঘিরে নূতন একটা শহরের পত্তন হচ্ছে।

আয়গাটা মিলল ভালই। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ফুল-ফলের বাগান ঘেরা চমৎকার একটি ধর্ম্ম-শালায়। এটি অবশ্য নিছক নয়। কল জল আলোর সুবন্দোবস্ত আছে। আহার স্বপাক অথবা ধর্ম্মশালার সামনেই সারি সারি পাঞ্জাবী রেষ্টুরেন্টএ। আমিষাহারীর পক্ষে উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা। নিরামিষের আয়োজনও নিন্দার নয়—ঘাসের অভাবটা ঘুঁটে এবং লাক্ড়ুতে পুষিয়ে দেবার ব্যবস্থা রয়েছে। 'কেল কড়ি, মাখ তেল,' রেষ্টুরেন্টের বাঁধা বুলি।

যেমন তেমন যাত্রীর জন্য নয় বলে—ধর্ম্মশালার ব্যবস্থাতে বেশ কড়াকড়ি দেখা গেল। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার জন্য যেখানে সেখানে জল বা ময়লা ফেলা নিষেধ। যে উনুনে ধোঁয়া ওঠে তেমন উনুন জ্বালানো চলে না—আবার স্নানের ঘর ছাড়া অন্যত্র স্নানও অবিধি। নিয়মগুলি বিধিবদ্ধ হয়ে দেওয়ালে লটকানো আছে কিন্তু সেগুলি মানানোর জন্য কড়াকড়ি দেখে বাংলার একটা প্রবাদ বাক্য মনে পড়ল—বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়। ধর্ম্মশালার মালিক বা ম্যানেজার দিনান্তে একবার মাত্র এসে দর্শিতে বসেন। বড় জোর এক ঘণ্টাকাল তাঁর স্থিতি—আর সর্ব্বক্ষণ যিনি দোর্দণ্ড প্রতাপে এই রাজ্য শাসন করেন—সেই ভৃত্যরাজ সপরিবারে (শাশুড়ী এবং শালকসহ) এখানে সর্ব্বক্ষণ বিরাজমান। শাসনকার্যে এঁরা সকলেই অতিশয় দক্ষ। ভৃত্য-ঘরণী এবং শ্রালকপত্নী ঠাকুরাণী তো ঘর রসনার অধিকারিণী। একফোঁটা জল যদি বারান্দায় পড়ল তো ঘররসনা-অস্ত্রে ঝনঝনা তুলে দুই নারে বিয়ে মিলে রণভূমিতে নৃত্য সুরু করলেন। তখন মহারাষ্ট্রীয় ভাষার বেশ প্রবণতা দেখে

তাবি বিস্ময় হয়। কিন্তু বাক্যবাণগুলি তীক্ষ্ণ হলেও সব সময়ে ভিন্নদেশী অপরাধীদের মর্মভেদ করতে পারে না। বরং কৌতুকরঙ্গে তারা উচ্ছ্বল হয়ে ওঠে। অনর্গল প্রবাহিত ধ্বনিতরঙ্গ এবং ক্রোধ ভয়ঙ্কিত দেহ ভঙ্গিমা উপভোগেরই বস্তু কিন্তু ভাষাটা অর্থবহ নয়।

এখানকার সব ব্যবস্থাই ভাল—শৌচাগার ছাড়া। ধর্মশালার হাতার মধ্যে পোস্টাফ পাল্লায় প্রকাণ্ড একটা মাঠ পার হয়ে তার নাগাল ধরতে হয়। সংখ্যায় মাত্র চারটি। সেই অনুপাতে ধর্মশালাটি বেশ বড়ই। দোতলার একটি বড় হলঘরে ত্রিশ চল্লিশজন ছাত্র ও শিক্ষক সেইদিন আশ্রয় নিয়েছিলেন। এখন রাত্রী প্রায়ই আসছে। এছাড়া অন্য ঘরগুলিতেও ত্রিশ চল্লিশ জন তো থাকেনই। তবু ভিড় জমে না একটি কারণে—সব যাত্রীই চলমান। ধর্মশালাতে সকলেরই স্থিতিকাল সাময়িক। উষ্ণায়ত্তকাল পরিক্রমার জন্যই আশ্রয়টুকুর প্রয়োজন। প্রয়োজন শেষ হলে ধর্মশালার হাট ভাঙে।

এরই মধ্যে শৌচাগার নিয়ে একটি কৌতুক-নাট্য অভিনীত হয়ে গেল। এইদিন ধর্মশালায় ভিড় ছিল বেশ। চারিটি মাত্র শৌচাগারে লাইন দিয়েছিল জনা পঁচিশেক যাত্রী। ওরই মধ্যে একজনকার অবস্থা সঙ্গীন হওয়াতে পাশের মাঠে ভারমুক্ত হয়ে যেমন সে উঠে দাঁড়িয়েছে, অমনি তৃতীয় মহারাজ এসে তার পথরোধ করে তর্জন গর্জন সুরু করলেন। তার তর্জন গর্জনের সারমর্ম—নিয়ম ভাঙলে কেন? কেন লাইনে দাঁড়ালো না? আমরা বিনিমতে বোঝাতে লাগলাম—লাইন ভাঙা এক্ষেত্রে তেমন দোষাবহ হয়নি—যেহেতু আর আর ক্ষেত্রে লাইন লাগিয়ে ধৈর্যের পরীক্ষা নেওয়া সম্ভবপর হলেও এই একটিমাত্র ক্ষেত্রে তা অচল। এখানে প্রকৃতি যদি প্রবলভাবে চাপ দেন, অসহায় মানুষ তাহলে করবে কি!

ও তখন দাবি করল, নিয়ম ভাঙার জন্য আট আনা জরিমানা দাও তাহলে।

শাসনের আসল অর্থ এতক্ষণে বোধগম্য হল। ইচ্ছা হল জিজ্ঞাসা করি—জরিমানার টাকা জমা হবে কোথায়? ধর্মশালার খাতায়—না তোমার ট্যাঁকে?

সে যাই হোক, কিছু দক্ষিণার বিনিময়ে লোকটিকে ও অপকর্মের দায় থেকে রেহাই দিলো। কিন্তু প্রতিফলটা হাতে হাতে নগদ মিলল। সেই রাত্রিতে ফুল বাগানের মাঝখানে আর একটি বৃহৎ অপকর্মের চিহ্ন রেখে অপরাধী বে-সমাক্ত রইল, এবং পরের দিন সকালে ধর্মশালার ম্যানেজার বে-হুঁসিয়ারির অপরাধে ওকে কড়া ভাষায় ধমক দিলেন—শাসন করলেন। ধর্মশালার যাবতীয় যাত্রী পরম পুলকিত চিত্তে এই তৃতা-শাসন পর্বটি উপভোগ করল।

আজ সারাটা দিন ধর্মশালাতেই কাটল—কারণ শহরের দোকানপাট যানবাহন চলাচল বন্ধ। কাল রাত্রিতে মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকাম্বার দেহরক্ষা করেছেন। কয়েকবার ট্যাক্সিওয়ালা এসে জেনে গেলো—আগামীকাল সকালে আমরা ইলোরার গুহা মন্দির দেখতে যাব কিনা?

ধর্মশালারই অপর এক যাত্রী বললেন, আমরা একত্রকাশান বাসে করে পরিক্রমা করব। এতে ভাড়া কম—সুবিধা বেশী। সঙ্গে গাইড থাকবে—ছবির কথা সেই বুঝিয়ে দেবে। তাকে আলাদা করে কিছু দিতে হবে না। এ সরকারী ব্যবস্থার মধ্যে।

জিজ্ঞাসা করলাম, কখন ছাড়বে বাস?

সকাল সাড়ে সাতটায়—রেলওয়ে স্টেশনের সামনে থেকে ছাড়বে, এখানকার যা কিছু দ্রষ্টব্য সমস্ত দেখিয়ে ফিরে আসবে বিকেল সাড়ে পাঁচটায়।

বললাম সারাদিন—ঘুরবো বাসে করে! তাহলে উপবাসেই কাটবে দিন।

তা কেন—নিরীনেশ্বর মন্দিরে পৌঁছবেন ঠিক দুপুর বেলায়-একঘণ্টা বিশ্রাম। সেই সময়ে টিফিন অর্থাৎ সঙ্গে যা নিয়ে যাবেন তাই খেয়ে নেবেন। ওখানেই জলের ব্যবস্থা আছে—ভালমত বসবার জায়গা আছে। মিনিট পিক্‌নিক্ হবে।

আবার জিজ্ঞাসা করলাম এতো সারা দিনের ব্যাপার দেখছি—ইলোরা দেখতে এত সময় লাগে?

উনি হেসে বললেন, শুধু কি ইলোরা ঔরঙ্গাবাদের দ্রষ্টব্য বস্তু—গৌলতাবাদ দুর্গ, ঔরঙ্গজেবের সমাধি, বিবি-কা-মকবারা পানি-চাক্কি—সারা শহর ত্রিশ বত্রিশ মাইল চক্কর দিয়ে ফিরবেন। আজ বিকেলে টিকিট কিনে সীট রিজার্ভ করিয়ে নিন—না হলে হতাশ হবেন।

ওর কথা মত সেদিন অপরাহ্নে বাসের টিকিট কিনে ব্যবস্থাটা পাকাপাকি করে নিলাম।

পরের দিন সকাল সাড়ে সাতটায় যাত্রা সুরু হল। বাসে উঠে দেখি প্রায় সর্ব্বরাজ্য সম্মিলন। আমরা ছাড়াও বাঙালী যাত্রী ছিলেন চারজন, দ্রাবিড় কেরল মিলিয়ে ছিল ছোট মত একটি দল, নাগপুরের জনা চারেক—এ ছাড়া বোম্বাই, পাঞ্জাব, মধ্য ও উত্তর প্রদেশ এবং গুজরাট রাজ্যের নমুনাও কেউ কেউ ছিল। শুধু আসাম, উড়িষ্যা আর বিহার প্রতিনিধি পাঠায়নি—নব গঠিত হিমাচল রাজ্যও নয়। এতগুলি রাজ্য একসঙ্গে মিললেও আলাপ আলোচনা সুরু হল কিন্তু রাষ্ট্রভাষাতে। এমন কি ইলোরা পরিক্রমার প্রারম্ভে গাইড যখন আমাদের গুহার দুয়ারে দাঁড় করিয়ে জিজ্ঞাসা করল—কোন্ ভাষায় বলব বলুন—? তখন অতীত ও বর্ত্তমান দুই রাজ-ভাষার স্বপক্ষে দাবি উঠল। এবং সব চেয়ে আশ্চর্য্যের কথা ভোটের সংখ্যা প্রায় সমান সমানই দাঁড়াল। বর্ত্তমান রাজ ভাষার দাবিটাই মেনে নিলে গাইড—এবং একটু কৌশল করে বিগত রাজ ভাষাকেও সমানাধিকার দিলে। অর্থাৎ বক্তব্য সে আরম্ভ করল হিন্দীতেই-কিন্তু সেই সঙ্গে ইংরেজির মিশেল দিলে আশ্চর্য ভাবে। এটা হয়তো সে ইচ্ছা করেই করলেনা—কারণ কতকগুলি বহু প্রচলিত নিত্য ব্যবহার্য ইংরেজি শব্দের অর্থ পরিভাষার হিন্দী দিয়ে বোঝানোর সাধ্য তার ছিল না। কিম্বা সেই শব্দগুলি পরিভাষা সৃষ্টির গুণে এমনই দুর্ব্বোধ্য হয়েছে যা হিন্দীভাষা-ভাষীদের পক্ষেও বোধগম্য নয়। প্রসঙ্গত বলা যায় বাংলা ভাষাতেও এমন দুর্ব্বোধ্য পরিভাষার অভাব নাই! দৃষ্টান্ত স্বরূপ পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্টকে যদি আরক্ষাধ্যক্ষ বলা যায় তাহলে শাসন কার্যে হাজার দক্ষতা দেখালেও পরিভাষার রাজ্যে তিনি আমাদের নির্ভয় করতে পারবেন কি?

যাই হোক—এই কৌশলে অন্ত হিন্দী-ভাষার দল আপত্তি তুলল না—একেবারে ইংরেজি ভাষার দল খুশি হল।

হিন্দীর সঙ্গে ইংরেজি জুড়ে দেওয়ার ফলে গাইডের বক্তব্য সরল ও হৃদয়গ্রাহী হল। দুই একজন উগ্র হিন্দী সমর্থক বিরূপ হল, বরং আড়ী হিন্দী বাত।

গাইড ছেলেটির বয়স পঁচিশ ছাব্বিশ। ইতিহাস ও ধর্ম-শাস্ত্রে তার জ্ঞান প্রবেশিকার চেয়েও উৎকৃষ্টতর। গভীর তত্ত্বজ্ঞান কিম্বা শিল্প শাস্ত্র সম্মত ব্যাখ্যা তার কাছে আশা করবেনা কেউ, কিন্তু ইতিহাস, ধর্ম ও শিল্প সৃষ্টির পরিক্রমাটি সে সুষ্ঠু ভাবেই সারতে লাগল। মাঝে মাঝে হাস্য রসিকতার প্রলেপ লাগিয়ে বক্তব্য বিষয়টি সরস করে তুলল। দুই একটি ভুল যা করল মারাত্মক

না। সেটা উচ্ছ্বাস বলতই হয়তো বা ঘটে গেল। যেমন কৈলাস মন্দির তৈরী করতে যে সময় লেগেছিল সেটাকে দ্বিগুণিত করল কিংবা দৌলতাবাদ দুর্গের কামান সম্বন্ধে কিংবদন্তী মিশ্রিত ইতিহাসকে ভুলে ধরল—চাঁদ মিনারের উচ্চতা সম্বন্ধে একটু ভুল করল। কিন্তু ইতিহাসের চুলচেরা বিচার করে ক'জন দর্শক স্থান কাল আর ব্যক্তি মাহাত্ম্যকে মিলিয়ে নেন। সন তারিখে অভ্রান্ত হয়েও ইতিহাস কি কালের পরিবেশটিকে স্পষ্টতর করতে পারে? রাষ্ট্রশাসন রীতির সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে সমাজ-নীতির রূপটি সব সময়ে আত্মপ্রকাশ করে কি? এখানে আরও কিছু মালমশলা মিশিয়ে নিতে না পারলে মনের মধ্যে ছবির রং ফোটে না। ইতিহাসের সঙ্গে কিছু কল্পনার রং মেশে বই কি। কল্পনা তো মনেরই কর্মশালার বস্তু। সে কালের ইতিহাসে কল্পনার মিশেল বড় কম ছিল না। একই যুদ্ধের বর্ণনায় বিজিত ও বিজয়ীর কলম ভিন্ন মুখী। যে লাঞ্ছিত হয়েছে সেও মর্যাদা হানির ভয়ে লাঞ্ছনার কথা যথাযথ প্রকাশ করে নি পক্ষান্তরে বিজয়ী পক্ষের প্রশস্ত হওয়াই স্বাভাবিক। এদেরই উক্তি প্রত্যুক্তির ফাঁকে ফাঁকে মুলিয়ে তৈরী হয়েছে ইতিহাস—অনুমানের অবকাশ এর মধ্যে থাকবে বই কি।

এসব কথা উঠত না—যদি না একজন পাণ্ডিত্যাভিমানী দৌলতাবাদ দুর্গ প্রাসাদে ঢুকিয়ে ওই সামান্য ভুল দেখিয়ে গাইডকে অবথা তিরস্কার করতেন। কে না জানে বড় বড় পণ্ডিতরা ইতিহাসে ভুল তথ্য রেখে গেছেন পরবর্তী কালে সে সব সংশোধিত হয়েছে। আবার বর্তমানে যা আমরা অভ্রান্ত বলে মেনে নিয়েছি কে বলতে পারে নূতন তথ্য প্রমাণ হাতে এলে এ সবও বাতিল হয়ে যাবেনা।

ইলোরার প্রথম গুহা মুখে দাঁড়িয়ে গাইড একটি প্রারম্ভিক বক্তৃতা দিলে:

হাতে আমাদের সাড়ে তিন ঘণ্টা মাত্র সময়—সব গুহা খুঁটিয়ে দেখার সুযোগ আমরা পাব না। যে গুলি প্রধান প্রধান গুহা সেই গুলিই দেখবেন আপনারা—সেইগুলির পরিচয় দেব সংক্ষেপে। এখানে সব সুদ্ধ আছে চৌত্রিশটি গুহা। তার অর্দ্ধেক হল হিন্দু গুহা। যাঁরা অজন্তা দেখেছেন তাঁরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন সেখানকার উনত্রিশটি গুহার সবই বৌদ্ধ শিল্প কীর্তি। বৌদ্ধদের মধ্যে আবার দু'টি সম্প্রদায় ছিল হীনযান আর মহাযান। হীনযানীরা মূর্তি তৈরী করা পছন্দ করতেন না—মহাযানীদের সময় থেকে এই রীতি চালু হয়েছে। বৌদ্ধধর্মের অবনতি কালে এই মূর্তিগুলিই গুহার দেবদেবীতে পরিণত হয়েছে। দীর্ঘ কয়েকটি শতাব্দী ধরে এই রূপান্তর কাজটি চলছিল। হিন্দু ধর্মের পুনরুজ্জীবন কালে আচার্য শঙ্কর যে প্রতীক শিব মূর্তির পূজা চালু করে ছিলেন—আসলে সেটি নাকি ধ্যানাসীন বুদ্ধ মূর্তির উপবেশন ভাবকেই মনে পড়িয়ে দেয়। এ সব অবশ্য পণ্ডিত জনের অনুমান। যাক সে কথা।

অজন্তার গুহা চিত্রে ও ভাস্কর্যে বুদ্ধমূর্তি, জাতক কথা, বুদ্ধের জীবন কাহিনী প্রসঙ্গে যা যা ঘটেছিল, তারই নিদর্শন রয়েছে। ওখানে শুধু একটি ধর্মের ইতিহাস। কিন্তু ইলোরার শিল্পকীর্তিতে তিনটি ধর্মের ধারা এসে মিশেছে। প্রথম বারোটি গুহা জুড়ে বৌদ্ধ কাহিনীর প্রভাব, শেষ পাঁচটি গুহায় জৈন ধর্মের ইতিহাস—বাকি সতেরোটি গুহার শিবকে কেন্দ্র করে হিন্দু দেবদেবীরা এসেছেন রামায়ণ মহাভারত পুরাণ ইত্যাদি কাহিনীর প্রবক্তা হয়ে। এই শিল্পের চরমোৎকর্ষ দেখবেন কৈলাস মন্দিরে ষোল নম্বর গুহায়। একজন বিদেশী পণ্ডিত এই শিল্পকলা সম্বন্ধে চমৎকার মন্তব্য করেছেন। তিনি

বলেছেন, অজন্তা ও ইলোরায় যে সব ছবি ও মূর্তি দেখছি—তা অপরূপ একটি ভাস্কর্যে। ছবিতে এখন রং ফলানো ত অন্যত্র রয়েছে। ভাস্কর্যের এমন নিখুঁত রেখা-বিন্যাস এ-ও দুর্লভ নয়, কিন্তু রক্তে রেখায় এমন প্রাণ প্রতিষ্ঠা আর কোথাও নজরে পড়েনি। এমন জীবন্ত ছবি পৃথিবীর আর কোথাও নাই।

একটু থেমে গাইড বলল, এইবার আপনারা প্রথম চারটি গুহা ভাল করে দেখে নিন—পাঁচ নম্বর গুহার আমি থাকব। সেখানে আবার কিছু বলব।

প্রথম চারটি গুহায় দ্রষ্টব্য বিশেষ কিছু ছিল না। শৈল আবাস যেমন করে তৈরী হয় তারই নিদর্শন, বড় বড় হল ঘর ধার বারান্দা—সিঁড়ি প্রাঙ্গণ ইত্যাদিতে সীমাবদ্ধ। ধ্যানের কাজ কিছু আছে; —আর আছে সাধারণ বুদ্ধমূর্তি—কয়েকটি প্রতীকচিহ্ন—চক্র, গাছ, পদ্মফুল, সূর্য, জীবজন্তু, হাতী। পাঁচ নম্বর গুহা পর্যন্ত এই রকম চলেছে। ছ নম্বর গুহা থেকে আরম্ভ হয়েছে নারীমূর্তি—দেবী সরস্বতী।

পাঁচ নম্বর গুহার প্রাঙ্গণে আমাদের দাঁড় করিয়ে গাইড বলল, যেমন অজন্তায়—তেমনি ইলোরায় বৌদ্ধ গুহাগুলি দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত। এর কতকগুলি চৈত্য—আর কতকগুলি বিহার। চৈত্যের ভাগ কম। বিহার পঠন-পাঠন, বিশ্রাম, শাস্ত্রালোচনা, সভা সমিতির জন্য—চৈত্য মানে মন্দির যেখানে উপাসনা হতো। বিহারের ছাদগুলি সমতল - চৈত্যের খিলান করা—যেন একটা নৌকাকে উল্টে রাখা হয়েছে। লক্ষ্য করবেন দেওয়াল থাম আর ছাদের কারুকার্য; বাহারের বাহার। থিয়েটার কিংবা সিনেমা হলে ব্যালকনি দেখেছেন তো? একটি চৈত্যেও দেখবেন হাজার হাজার বছর আগে এই জিনিসটা এরা তৈরী করেছিল। আরও দেখবেন—কোল্ডিং চেয়ার, টেবিল, নিত্য ব্যবহার্য আরও অনেক জিনিস যা আজকাল আমরা ব্যবহার করি। ভ্যানিটি ব্যাগ দেখেছেন তো অজন্তায়?—আর সুন্দরী মেয়ের সর্ব অঙ্গে অলঙ্কারের নমুনা? কবরী রচনার ফ্যাসান? প্রসাধনের ভঙ্গি? এখানকার পাথরে গড়া মূর্তি কি ছবি দেখলে কিছুই নতুন মনে হ'বে না। এইসব ছবির বিষয়বস্তু পুরান ইতিহাস রামায়ণ মহাভারত আজব কাহিনী থেকে নেওয়া। এর মধ্যেই পাবেন সমাজ ব্যবস্থা, মানুষের রীতি রুচি চরিত্র। এই সব শিল্পকীর্তির মাঝখানে এসে আপনি নিশ্চয় সেই দু'হাজার বছর আগেকার ভারতবর্ষকে খুঁজে পাবেন। তা যদি না পান পুরোপুরি আনন্দলাভ করতে পারবেন না।

ওর কথা শুনে মনে হল—তাই কি সম্ভব? বর্তমানের প্রবল স্রোত থেকে পা তুলে পিছিয়ে আসা সহজ নাকি? শুধু ছবি দেখে ইতিহাসের পাতা উল্টে পুরাতত্ত্বের মালমশলাকে তন্ন তন্ন করে খুঁজে নিতে পারলেই তা সম্ভব নয়। দৃষ্টিকে যদি কল্পনার রঙে রঙীন করে না নিতে পারা যায়—তবে বৃথাই অন্বেষণ! আমার সেই সুদূর প্রসারী দৃষ্টির সঙ্গে মমতা-সরসা মনকেও সাথী করে নিতে হবে—না হলে পুরাতন কালের মর্মকথা শুধু অর্থহীন কলরব তুলবে!

মূর্তির পরিচয় প্রসঙ্গে গাইড আরও দুই একটি কথা বলল। বলল, এই সব দেখবার আগে মূর্তি ও তাদের বিশেষ বিশেষ ভঙ্গির পরিচয় জেনে রাখুন—তাহলে না বলে দিলেও সেগুলি চিনতে পারবেন। যেমন ধরুন এই বৌদ্ধগুহায় প্রায় সবগুলিতেই রয়েছে বুদ্ধ আর বোধিসত্ত্ব মূর্তি। বোধিসত্ত্ব মূর্তিগুলি মহাযান সম্প্রদায়ের অবদান। নির্বাণ লাভের প্রত্যাশা বৈরাগ্যে নিষ্ক্রিয়তায় এবং করুণায় বিগলিত এঁদের মুখভাব দেহভঙ্গি। এরা কখনো পদ্মপাণি—কখনো চক্রপাণি—মঞ্জুশ্রী আবার কখনো বা মৈত্রেয় মূর্তিতে বিরাজিত। মৈত্রেয় অবশ্য ভবিষ্যৎ কালের বুদ্ধ—যেমন হিন্দুর কল্কী-অবতার। কোথাও দেখবেন

সপ্তবুদ্ধ মন্দিরে বিভাজিত—বিপাশিন, বিশ্বভূ, ককুসন্ধ, গৌতম প্রভৃতি নানা নামে পরিচিত। আবার শিবগুহায় দেখবেন সর্ব্বেশ্বর মূর্ত্তিতে রয়েছেন ত্রিমুখপাণি একক—শিব। যদিও হিন্দুশাস্ত্রে আছে —সৃষ্টি স্থিতি ও লয় তিন বিভাগে যথাক্রমে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর হলেন অধিকর্ত্তা, অর্থাৎ ওঁরা এই তিন ডিপার্টমেণ্টের হেড—তবু ইলোরায় দেখবেন—তিন বিভাগের সর্ব্বেসর্ব্বা হচ্ছেন শিব। কৈলাস মন্দিরের গর্ভগৃহে লিঙ্গমূর্ত্তিতে তাঁর প্রকাশ—বিশ্বরচনায় ও চালনায় অনন্ত শক্তির আধার স্বরূপ এই শক্তি সর্ব্বদাই সক্রিয়। এই লিঙ্গমূর্ত্তি তিনটি অংশে বিভক্ত। ব্রহ্মভাগ, বিষ্ণুভাগ ও রুদ্রভাগ। একে বলা হয় ত্রৈধাশিক মূর্ত্তি। ইনি কখনো অন্ধকাসুর, কখনো বা গজাসুর বধ করছেন; কখনো ত্রিপুরান্তক কিংবা মার্কণ্ডেয়-ত্রাণকারী শমন শাসক।

জৈনমন্দিরে বর্দ্ধমান মহাবীর, পার্শ্বনাথ এবং গোতমেশ্বর মূর্ত্তিই প্রধান। মহাবীরও পার্শ্বনাথ হলেন তীর্থঙ্কর। গোতমেশ্বর তীর্থঙ্কর নন—প্রথম তীর্থঙ্করের পুত্র। কঠোরতম তপস্যার খ্যাতিতে তিনি সর্ব্বজন শ্রদ্ধেয়।

নোট্‌মুটি এইগুলি মনে রেখে বিহার, চৈত্য আর গুহামন্দির দেখুন—আনন্দ পাবেন। মূর্ত্তি চিনে নেওয়ার আর আর যে সব সঙ্কেতচিহ্ন রয়েছে—আপনারা হিন্দু—সে আপনাদের না বললেও চলবে। বাহন অস্ত্রশস্ত্রের প্রতি লক্ষ্য রাখলেই দেবদেবীদের অনায়াসে চিনে নিতে পারবেন। বিশেষ বিশেষ ভঙ্গিতেও ওঁদের পরিচয়। এখানে কার্ত্তিক গণেশ ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্রের পার্ব্বতী শ্রী সূর্য্য যক্ষ যম গঙ্গা কাম রতি সব দেবদেবীই বিদ্যমান। শিবের তো অসংখ্য মূর্ত্তি। তিনি কখনো যোগী, কখনো ভিক্ষুক—সঙ্গীত শাস্ত্রবিৎ, নর্ত্তক—কখনো বরদাতা, ত্রাতা কখনো বা সংহার কর্ত্তা। বিবাহ সভায়—দ্যূতক্রীড়ায় তাণ্ডব-নৃত্যলীলায় তাঁর বিভিন্ন রূপের প্রকাশ। কখনো বা উমা মহেশ্বর মিলে অর্দ্ধনারীশ্বর, কখনো বা বিষ্ণুর সঙ্গে মিলে হরিহর। অর্দ্ধনারীশ্বরে লক্ষ্য করবেন অর্দ্ধঅঙ্গে পুরুষ আর অর্দ্ধ অঙ্গে প্রকৃতির লক্ষণগুলো—কেশভার থেকে পদাঙ্গুলি শরীরের যাবতীয় লক্ষণ বেশভূষা আয়ুধ মুখকান্তি হাসি। হরিহর মূর্ত্তিতেও আয়ুধ অলঙ্কার আর শৈব বৈষ্ণব দুই সম্প্রদায়ের প্রতীক চিহ্ন লক্ষণীয়।

কৈলাস গুহা ভাল করে দেখবেন। অন্য গুহায় কয়েকটি বিখ্যাত ছবি দেখলে মনে হবে কৈলাসের অনুকরণ। অনুকরণ কি হাত মক্সো সে বিচার নিজেরাই করে নেবেন। আসল কথা, পণ্ডিতরা বলেন—কৈলাস ছাড়া অন্যগুহার ছবি অসম্পূর্ণ অ্যামিতিক রেখাবিন্যাসে ত্রুটিপূর্ণ, ভাবছন্দে ঈষৎ স্খলিত। কিন্তু কৈলাসে সেইগুলি সুসমঞ্জস সুন্দর প্রাণৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ। দৃষ্টান্ত স্বরূপ রাবণের কৈলাস উত্তোলন, হর-পার্ব্বতীর পাশাখেলা, অন্ধকাসুর বধ, হর-পার্ব্বতীর বিবাহ প্রভৃতি উল্লেখ করা যায়। এই কাহিনীগুলি ষোলনম্বর গুহা ছাড়া—১৪, ১৫, ২১, ২৯ নম্বর গুহাতেও রয়েছে। কিন্তু কৈলাসের মহান ঐশ্বর্য্য সেখানে নাই। একমাত্র কৈলাস দেখলে ইলোরার প্রাণসত্তাকে উপলব্ধি করতে পারবেন। কৈলাস পৃথিবীতে একটিই আছে।

কৈলাসের কথা পরে—এখন আমরা বৌদ্ধগুহাগুলি পরিক্রমা করছিলাম। একজন প্রশ্ন করলেন গাইডকে, আচ্ছা প্রথম যে গুহাগুলো দেখলাম—ওগুলোতে কোন মূর্ত্তি ছিল না—কিন্তু যত এগুচ্ছি—গুহাতে মূর্ত্তির সংখ্যা বাড়ছে। শুধু বুদ্ধমূর্ত্তি নয়—নারীমূর্ত্তি পর্য্যন্ত রয়েছে—

গাইড অল্প একটু হেসে বলল, এই ক্রম বিকাশ স্পষ্ট হয়ে উঠবে অবশ্যই গুহাগুলি দেখলে। আগেই তো বলেছি হীনযান সম্প্রদায় যানে প্রথম বৌদ্ধধর্মাবলম্বীরা মূর্ত্তি পূজা পছন্দ করতেন না।

বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের কয়েক শো বছর পরেও তাঁর মূর্তি তৈরী হয়নি। এই সব ক্রমে এসেছে। এঁরা প্রথমে পাহাড় কেটে গুহা তৈরী করেছিলেন অধ্যয়ন আরাধনা ও বসবাসের জন্য। উপাসনার জন্যও। তারপর বুদ্ধের পুনর্জন্ম আঁকবার বাসনায় বোধিবৃক্ষের প্রতীক হয়ে এলো বনস্পতি। ধর্মচক্র গুলির আকার হল সূর্য বা পদ্মফুলের মত। বৈদিক দেবতা ইন্দ্রের আদুর বজ্র হল অলঙ্কারে রূপান্তরিত। প্রবেশ দ্বারে শোভমান হল হংসমিথুন—আত্মা পরমাত্মার প্রতীক দ্বা-সুপর্ণ। আবার বৈদিক যূপ কাষ্ঠে বলির জন্য কাটা পশুগুলি সিংহ হস্তী প্রভৃতিতে রূপ বদল করে ক্ষোদিত বা চিত্রিত হতে লাগল স্তম্ভ গাত্রে। শেষে এলো বুদ্ধ মূর্তি; দেবা অদেবা মানব কল্পনার অনার্য শিল্প সাধনাকে মিলিয়ে তৈরী হতে লাগল সেই সব মূর্তি। কোন কোন পণ্ডিতের অনুমান গ্রীক ভাস্কর্যের অনুপম সৃষ্টি অ্যাপোলো মূর্তির সঙ্গে এর সাদৃশ্য রয়েছে। মহাযান সম্প্রদায় এই পথ্যাই এগিয়েছিলেন। প্রথম পাঁচটি গুহায় নারী মূর্তি বা বোধিসত্ত্ব প্রভৃতিকে দেখেন নি কারণ ওই গুহাগুলি হীনযানীরা তৈরী করেছিল। আর আর মূর্তির উদ্ভব হলো—মহাযান সম্প্রদায়ের উদ্ভবের পর। এই সম্প্রদায় আবার শেষ ভাগে তন্ত্র সাধনায় মেতে উঠল—তখন নানা দেবদেবী এসে আসর জমালেন গুহাভ্যন্তরে। সেই দেবদেবীরা আবার হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানের দিনে হিন্দু মন্দিরের পূজা বেদীতে প্রতিষ্ঠিত হলেন। কালী, তারা, প্রজ্ঞাপারমিতা, সরস্বতী···

নানা মূর্তির নিছিল দেখতে দেখতে আমরা এগিয়ে চলেছি। ছ নম্বর গুহায় রাজা রাণীর শোভা যাত্রা দেখলাম। দেখলাম প্রকাণ্ড এক বুদ্ধমূর্তি বাণী প্রচার করছেন। চতুর্ভুজ পদ্মপাণি বোধিসত্ত্বকে দণ্ডায়মান দেখলাম আট নম্বর গুহায়। সাত ও ন নম্বর গুহা তাড়াহুড়ি অতিক্রম করে আমরা দশ নম্বর গুহা ছুতার-কি-ঝোপড়িতে এলাম। এটি চৈত্য, এবং কারুকার্যে গঠন সৌকর্যে বৌদ্ধ-গুহাগুলির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। কাঠের কারুকার্য ভরা খিলানের অনুকরণে এর ছাদটি তৈরী যেন নৌকার খোলকে উপুড় করে রাখা হয়েছে মাথার উপরে। দেখলে আদৌ মনে হয় না, পাথর কেটে এমন ধারা খিলানের কাজ হতে পারে। উপরের বারান্দায় ছোট ছোট জানালা—স্কাইলাইটের মত—সামনের দিকে ব্যালকনি। সুদৃশ্য এক প্রেক্ষাগৃহের মাঝ খানে এসে দাঁড়িয়েছি মনে হল। হলের মাঝখানে স্তূপের গায়ে এগারো ফিট উঁচু প্রলম্বপাদ বুদ্ধদেব উপদেশ বিতরণের ভঙ্গিতে বসে রয়েছেন।

ছুতার-কি-ঝোপড়ি মানে শিল্পী রাজ বিশ্বকর্মার শিল্প শালা।

এগারো নম্বর গুহাটি দ্বিতল। দ্বিতলে মোট চারটি বুদ্ধ মূর্তি রয়েছে; তিনটি ভূমিস্পর্শ মুদ্রায়, আর একটি উপদেশ বিতরণের ভঙ্গিতে। এখানে কূপের এবং এক দেবীর মূর্তি ভাল লাগল।

বারো নম্বর গুহাটি তিন তলা। সুপ্রশস্ত বারান্দা, থামের সারি, প্রশস্ত সিঁড়ি, প্রকাণ্ড হল ঘর—তার দুপাশে ছোট ছোট কুঠুরি যার মধ্যে দুধারে দুটি করে পাথরের বেদি শয্যা রচনার জন্য। প্রথম শ্রেণীর রেল কামরার মধ্যে সামনা সামনি দুটো বার্থ যেন। একতলার চেয়ে দোতলা প্রশস্ততর সব চেয়ে বড় তিন তলা। বহুতর মূর্তি বিভিন্ন ভঙ্গিতে উৎকীর্ণ রয়েছে দেওয়ালে। উত্তরের দেওয়ালে গাছের তলায় ধ্যানাসীন বুদ্ধমূর্তি দক্ষিণের দেওয়ালে অনুরূপ মূর্তি ছাড়ার তলায়। একই সঙ্গে সাতটি করে বুদ্ধমূর্তি রয়েছে দুদিকের দেয়ালে। এঁরা হচ্ছেন মনুষ্য বুদ্ধ অর্থাৎ নর বুদ্ধ। প্রতি তলের শেষ প্রান্তের গর্ভমন্দিরে রয়েছে সব চেয়ে বড় মূর্তি ধ্যানী বুদ্ধ। আবার এই সবের মধ্যে তিন তলার মূর্তিটি বৃহত্তম।

এখানে গাইড আমাদের আর একটি তথ্য পরিবেশন করল ; তলাগুলি যত উপরে উঠেছে ওর বারান্দার পরিসরও বেড়ে চলেছে সেই পরিমাণে। আমাদের গৃহনির্মাণে কিন্তু এই বাস্তবিজ্ঞান খাটে না। অন্ততঃ দোতলার ফ্লোর আটকানো আট দশ তলা উঠাবনের আগে পর্যন্ত খাটত না। আমরা ইমারত তুলি নীচে থেকে দেখে তাই নীচেটা সব চেয়ে মজবুত ও প্রশস্ত হয়। যত উপরে ওঠে, তলা গুলি ছোট হতে থাকে ঘর বারান্দা কমে যায়। উপরের ভার কমানোর জন্যই এমন ব্যবস্থা। কিন্তু পাহাড় কেটে ঘর তৈরী বা উপর থেকে কাটতে কাটতে নীচের দৌহায় তাতে ব্যবস্থাটা উল্টে না নিলে ভারসাম্য বজায় থাকেনা। উপরের তলাটা বড় করার হেতুই হল অনেকখানি পাহাড়কে বাদ দিয়ে ভার কমানোর কৌশল। নীচের তলার ভার বহন ক্ষমতা এতে বজায় থাকে।

বৌদ্ধ গুহা দর্শন শেষ হল এবার হিন্দু গুহা দর্শন। তার আগে ক্লান্ত যাত্রীদের নিম গাছের ছায়া ভরা প্রশস্ত একটি প্রাঙ্গণে নিয়ে এসে গাইড বলল, দশ পনেরো মিনিট বিশ্রাম করে আমরা হিন্দু গুহা দেখব এবার। এখানে ইচ্ছে করলে চা খেয়ে নিতে পারেন চিঠি পত্রাদি লিখতে পারেন।

মরুদ্যানী ফুল গাছে ঘেরা জায়গাটি ভারি মনোরম। চায়ের একটি ছোট স্টল আছে কিন্তু যাত্রীর ভিড়ে সেদিকে যেঁষা দুঃসাধ্য। নিম গাছের তলাতেই একটা পোষ্ট আপিসএর ওয়াগন—এখানে শুধু স্ট্যাম্প আর কার্ড বিক্রী হয়—চিঠি ফেলার জন্য একটী ডাক বাক্সও আছে। এটুকু আয়োজন যাত্রীদের কম উপকারে আসে না। ছাত্রাত্তরা নিমের বেদি তলে বসে আপনা শিল্প কীর্তি দর্শনের দুরন্ত আনন্দকে কয়েকটি ছত্রে প্রিয় সান্নিধ্যে পৌঁছে দেওয়ার স্মরণীয় মুহূর্ত জীবনে কতক্ষণই বা আসে!

শুধু পত্র রচনার অবকাশ কটি মানুষের থাকে! চায়ের স্টলে ভিড় জমতে দেখলে মনে হয় দেহের ভার মনের চেয়ে অনেক বেশি। আবার মন যাদের দেহের সুখ সুবিধাকে তুচ্ছ করে আর লোকে খুঁজতে চায় তাঁরাও পত্র রচনার অবকাশ পাননা যে হেতু এই উঁচু জায়গা থেকে নীচের সমতল ভূমিটা মনে হয় স্বপ্নে দেখা দেশ, বর্ণাঢ্য চিত্র পট। বিসর্পিল পথঘাট গাছ-পালা মানুষ-জন ইমারত-মন্দিরের-চূড়া-মসজিদের গম্বুজ নদীর ধারা সব মিলে মিশে নীল সবুজ ও আরও নানা রঙের মিশেলে এক রূপময়ী প্রকৃতির প্রকাশ। এই সুন্দর প্রাকৃতিক পটভূমিকায় এমন একটি গিরি শ্রেণীকে রূপরচনার উপযোগী বলে বেছে নিয়েছিলেন যাঁরা তাঁরা নমস্য। আর ধন্য সেই শিল্পী দল যাঁরা আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে পাষাণে মেলে রেখেছেন প্রাণের প্রদীপ। দীপ জ্বলার পর প্রলয় ঝড় উঠেছে কতবার—রাষ্ট্র ও ধর্ম বিপ্লব ঘটেছে—দুর্ধর্ষ তরঙ্গ দল বারে বারে আছড়ে পড়েছে শিল্প সৌধের অঙ্গে—বর্ষাধৌত শাণিত অস্ত্র নিষ্ঠুরতম আঘাত হেনেছে শিল্পের সুকুমার দেহে—এ ছাড়া মহাকালের ভয়াল ভ্রূকুটি বিনষ্টির অন্ধকারকে ঘনিয়ে তুলেছে—তবু নিয়তি নিষ্কম্প দীপশিখা আজও উজ্জ্বল। পৃথিবীর নানা দিগ্‌দেশ থেকে সৌন্দর্য্য রসিকের দল ছুটে আসছে এই অপরূপ সৃষ্টিকে প্রত্যক্ষ করতে।

বেশ খানিকটা অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। সময়ের হিসাব হারিয়েছিলাম। হঠাৎ চেয়ে দেখি যাত্রীদল ওটি ওটি পা বাড়িয়েছেন কৈলাসের দিকে। ১৪ ও ১৫ নং গুহায়—(দশ অবতার ও রাবণ-কি-খাঁই) সংস্থান হচ্ছে। তাদের গর্ব অঙ্গে তারা যাঁরা। অন মনস্ক পাথর সিমেন্ট লোহা

সঙ্কটে পা বাড়াবার আয়না নাই। নতুন নতুন কলক্রীটের ধাম তুলে গুহা রক্ষার আয়োজন চলছে। পুরাতনের অঙ্গে নূতনের সংযোজন, যেমনান হলেও বিলুপ্তির সঙ্গে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার হাতিয়ার।

আমরা ষোল নম্বর গুহায় প্রবেশ করলাম। এর নাম কৈলাস।

শিবের আলয় কৈলাস, হিমালয়ের পারে সেই দেবভূমি। সেখানে বিশ্বতরু মূলে একটি বেদির উপর ব্যাঘ্রছাল বিছিয়ে বসে আছেন মহাযোগীশ্বর শঙ্কর পাশে সর্বমঙ্গলময়ী পার্বতী ত্রিভুবনের জনকজননী। চারিদিকে নন্দী ভৃঙ্গী জয়া বিজয়া প্রভৃতি সহচর দল; নৃত্যগীত বাদ্য স্তুতিরত অপ্সরী কিন্নরী দেব যক্ষ গন্ধর্ব বিদ্যাধরবৃন্দ প্রণত শিব দেবতা ও অসুর রুদ্র। কল্পনার অতি শৈশব থেকে হিন্দুর অন্তর আলয়ে এই কৈলাস ভূমি লালিত হতে থাকে। যৌবনে উপাখ্যানে ও কাব্যসাধনায় রস সঞ্চয় করে। তুষার মৌলি গিরি শৃঙ্গ—নীল জল ধারা ব্যাপ্ত মানস সরোবর শ্বেতপদ্ম বিকাশী কলহংস শ্রেণী স্বর্ণ কমলের সৌরভে ও অনাহত সঙ্গীতের সুধাস্রোতী সুরে পরিপূর্ণ দেবভূমি—হিন্দু মানসে এই কল্পনার ক্ষয় নাই লয় নাই। পশ্চিমঘাট পর্বত মালার বুকে সেই কৈলাসকে জাগিয়ে তুলেছেন শিল্পীদল;—রামায়ণ মহাভারত পুরাণ কাব্য কাহিনী কিংবদন্তী গাথা সব কিছু থেকে তিল তিল সৌন্দর্য ও মহিমাকে আহরণ করে শিবকে ধ্যানের জগতে এনে বসিয়েছেন ওঁরা। লীলায়িত উচ্ছল কাহিনীকে পাষাণ পটে উৎকীর্ণ করে শিব ক্ষেত্রের স্বরূপ উদ্ঘাটিত করতে চেয়েছেন। ভাবের অসংযম দিয়ে শিল্পের রীতি প্রকরণ নিয়মকে কোথাও লঙ্ঘন করতে চাননি চমৎকার সুষম ছন্দে ছবির পর ছবি এঁকে গেছেন। ভাব-কল্পনায় কৈলাসের প্রাণ পুরুষকে প্রত্যক্ষ না করলে এই অনবদ্য অর্ঘ্য রচনা সম্ভবপর ছিল না। সব চেয়ে আশ্চর্য, এই ভাব কল্পনা একটি মাত্র হৃদয়ের বস্তু ছিল না। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এক পুরুষ থেকে আর এক পুরুষে সঞ্চারিত হয়েছে এর রেশ প্রবাহ—এক মনের ধ্যান মহিমা অনায়াসে উত্তরণ করেছে বহু মনের আঙ্গিনায়। প্রাচীন ভারতবর্ষের শিল্পী সত্তার সেই শ্রেষ্ঠ প্রকাশ এখন আমাদের সামনে আমরা রোমাঞ্চিত দেহে কৈলাসপুরীতে প্রবেশ করলাম।

যা বাক্য দিয়ে প্রকাশ করা যায় না—মন দিয়ে ধরা যায় না উপমায় উপলব্ধি করা কঠিন—তাকে ভাষার বন্ধনে বাঁধবে কোন দুঃসাহসী! সে চেষ্টা নিরর্থক। আমরা বিস্ময় আনন্দ বিমূঢ়ের মত মন্দির পরিক্রমা করছিলাম। এতগুলি মানুষ কারও পায়ে চলার শব্দ উঠছিল না—কারও মুখে ধ্বনি মাত্র ছিল না—কারও নিঃশ্বাস দ্রুততর পড়ছিল না। স্তব্ধ প্রাচীরে—মন্দিরের উপরে নীচের সর্বত্র পাষাণ অলেখ্যে, ধরা পড়েছে যে হস্তীযূথ, কমলদল, দিব্যাঙ্গনারা যে দেবদেবী অসুর রাক্ষসেরা পুরাণের এক একটি কাহিনীকে ব্যক্ত করছে অকপট নৈঃশব্দে তাঁদের সঙ্গে আমরাও একাত্ম হয়ে গেলাম। মনে হল এখানে শব্দ করলে ওঁদের ধ্যান ভঙ্গ হবে এখানে কথা বললে ওঁদের মহিমা খর্ব হবে ছিন্ন হবে ভূবলোকের সঙ্গে ভুবলোকের মৈত্রী বন্ধন।

আমরা পরিক্রমা করছিলাম নিঃশব্দে। মন্দিরের প্রবেশ পথে গাইড কিছু বলেছিল। প্রথম তোরণ পার হয়ে মকর-বাহিনী গঙ্গার সামনে দাঁড় করিয়ে পাষাণে পদ্মফুল ও নদী জলের শিল্প চারুত্বের পরিচয় দিয়েছিল। তার পর ধাপে ধাপে নেমে আমরা এলাম ছবির রাজ্যে—। ছবিতে দেখা সেই বিখ্যাত স্তম্ভমূলে এসে দাঁড়ালাম। মন্দির দেওয়ালএর গায়ে ক্ষোদিত মহাভারত

কাহিনী অষ্টাদশ পর্বের মূল কাহিনীটি সংক্ষেপিত আকারে পরিবেশিত দেখলাম। তারপর মন্দির প্রবেশ শুধু মন্দির নয় যথারীতি অষ্টাঙ্গ অন্তরাল গর্ভগৃহ···যেমন দেখে তোলা মন্দিরের শাস্ত্রানুমোদিত বিন্যাস রীতি তেমনি পাহাড় কেটে সেউল রচনার প্রয়াস। সেই প্রয়াসে বিন্দু মাত্র ত্রুটি নাই—শাস্ত্রাচার লঙ্ঘিত হয়নি। আত্মহারা আমরা অন্ধকারের মধ্যে এসেও নির্বাক রইলাম।

দেবতা এখানে নিত্য পূজা পান না—শুধু বছ যাত্রী সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতে শ্রদ্ধা জানালে। শুধু দেবতার সামনে নয় প্রতিটি পাথরের সামনে চলল এই শ্রদ্ধা নিবেদন।

আমার পাশে পাশে চলেছিলেন মাদ্রাজ রাজ্যের এক বৃদ্ধ। তিনি তো মন্দির প্রবেশের পর মুহূর্ত থেকে ভাবাবেগে আকুল হয়ে উঠেছিলেন। ছবির বিষয় বস্তু জেনে নিয়ে পাথরে প্রণাম করছিলেন হাসছিলেন—কখনো বা আনন্দ গদ্‌গদ্ সাধুবাদ দিচ্ছিলেন। তাঁর দুচোখে অশ্রুধারা গড়াচ্ছিল। কম বেশী সব যাত্রীই বিহ্বল হয়ে ছিলেন। এরা সকলেই হিন্দু রামায়ণ মহাভারত পুরাণ কাহিনীর সঙ্গে পরিচিত। সবাই যে রামায়ণ মহাভারত পড়েছেন তা নয়—চিত্র শিল্পের বোদ্ধাও হয়ত দু একজনই ছিলেন; কেউ কানে শুনেছেন গল্পগুলি—কেউ কথকতার আসরে যাত্রা থিয়েটারে রস উপভোগ করেছেন, কেউ বা প্রচলিত আচার প্রথার মধ্য দিয়ে এর সামান্য অংশকে অনুভব করেছেন। মোট কথা সবারই অন্তরে সুপ্ত ছিল একটি ভাব রসময় জগৎ এখন এই অপরূপ চিত্র চর্য্যার সামগ্রীগুলি চোখের সামনে জীবন্ত হয়ে ওঠাতে সকলকারই ভাব গঙ্গ কমবেশি উদ্বেল হয়েছে—সেই বেগ সংবরণ করা দুঃসাধ্য।

গাইড মাঝে মাঝে চিত্র পরিচয় দিয়ে চলেছিল। মন্দিরের ডান ধারে উৎকীর্ণ দেখলাম রামায়ণ কাহিনী। মোটা দাগকাটের রামায়ণ সংক্ষেপিত আকারে। এরই তলায় রয়েছে সেই অপূর্ব্ব দর্শন ভাস্কর্য্য শিল্প-রাবণের কৈলাস পর্ব্বত উত্তোলন। প্যানেলের মধ্যে কৈলাস পর্ব্বত দেখা যায় যার উপরে শিব পার্ব্বতী নন্দী ভৃঙ্গী রয়েছেন। মহাশক্তিধর রাবণ তাঁর দশমুণ্ড ও বিশ বাহু দিয়ে এই পাহাড়টিকে উপড়ে ফেলার চেষ্টা করছেন। গুরুভার শৈল উত্তোলনের প্রয়াস রাবণের সর্ব্বদেহের পেশিতে, দাঁড়ানোর ভঙ্গিতে—তার ক্লিষ্ট মুখের ভাবে ফুটে উঠেছে। উৎপাটন কালে কৈলাস পর্ব্বত থর থর কাঁপছিল—তাও ধরা পড়েছে শিল্পকৌশলে। ফটো তুললেই সেই কম্পনবেগ ধরা পড়বে। পার্ব্বতী বিষম ত্রাসে জড়িয়ে ধরেছেন মহেশ্বরকে, একজন দাসী পিছন ফিরে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে পালাচ্ছে—আর নিজ প্রভুর শক্তিতে আস্থাবান নন্দী ভৃঙ্গী নিরুদ্বেগ চিত্তে বসে আছে। এই ছবিটি নাকি কৈলাস মন্দিরের সর্ব্বোত্তম সৃষ্টি। মাত্রা সমতায় শরীর তত্ত্ব সংস্থানে প্রতিটি মূর্তির ভাববাঞ্জনায় এ তুলনাহীন।

এর পর মন্দির ঘিরে চারদিকের দেওয়ালে অনেকগুলি প্যানেলে ছবি দেখতে দেখতে আমরা এগুতে লাগলাম। একসঙ্গে অনেক ছবি দেখার ক্লান্তি আছে নিশ্চয়। এক ছবির রস মনকে আবিষ্ট করতে না করতে অন্যছবির ঐশ্বর্য্য ধৃতি ভঙ্গ করে এও সত্য কথা—কিছুক্ষণের মধ্যে সব ছবি মিলে একটা অস্পষ্ট ছায়ালোক সৃষ্টি করে সেখানে কোনটাই স্পষ্ট নয়। কিন্তু এখানে কয়েকটি ছবি সেই ছায়ালোকে আত্মগোপন করল না। তাদের বিশেষ একটি ভঙ্গী এবং ভাব প্রকাশের চারুর্য্য মনকে সজাগ করে রাখল। হাঁ—প্রচুর ক্লান্তির মধ্যেও ভোলা যায় না বহুবেশিনী পার্ব্বতীর

ক্রীড়ানত মুখের সলজ্জ মধুর হাসিটি। ত্রিপুরান্তক শিবের ভ্রূকুটি ভয়াল সংহার মূর্তি, মার্কণ্ডের রাতার মৃত্যুপতিকে সবল পদাঘাত, অন্ধক অসুর বধকালে একহাতে উদ্যত ত্রিশূল উৎক্ষেপ—অন্যহাতে উৎকণ্ঠিতা পার্বতীর পত্রলেশ স্পর্শ করে অন্তর্ধান, তাণ্ডব নৃত্যরত শিবের প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের স্বভাবোৎক্ষিপ্ত ভঙ্গিমা, অর্দ্ধনারীশ্বর অঙ্গের বিস্ময়কর পরিকল্পনা।

এর পরও ইলোরায় আর কিছু দ্রষ্টব্য আছে বলে মনে ছিল না। আমরা মন কয়েক আত্মবিস্মৃতের মত ছবির পর ছবির সামনে এসে দাঁড়াচ্ছিলাম। কোন কোন ছবি একবার দেখে তৃপ্তি হচ্ছিল না—আবারও আসছিলাম তার কাছে। কিন্তু সময় ছিল বাঁধা—গাইড অনেকক্ষণ থেকে সঙ্কেত করছিলেন বাইরে আসার জন্য।

এরপর সব গুহা না দেখলেও জৈনগুহাগুলি আমাদের দেখতে হবে—ঘরা ছিল বই কি। কৈলাস যে এমন করে সময়কে ভুলিয়ে দেয়—এটা জানা থাকলে পুরো একটি দিন শুধু কৈলাসের মধ্যেই ঘুরে যেতাম। আজ মনে করি আবার যদি কখনো ইলোরায় যাই এই ব্যবস্থাই মেনে নেব। তখন সঙ্গে নেব মনের মত দু'একজন মানুষ যারা একটা ছবির কিছুটা দেখে—অন্য ছবির পানে ধাওয়া করবো না। সব ছবিতে চোখ বুলিয়ে নিয়ে ছুটে ছুটে চলার চেয়ে একটি ছবির সামনে দাঁড়িয়ে যদি ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যায় সেই কি পরিপূর্ণ দর্শন নয়? এমন পরিপূর্ণ দর্শন আমাদের কদাচিৎ ঘটে!

পাঁচটি জৈন গুহা বেশ খানিকটা দূরেই—এ ধারের উল্লেখযোগ্য গুহা হল—ইন্দ্রসভা, জগন্নাথ সভা। ইন্দ্রসভার ছাদের পদ্ম আর গুম্বের চমৎকারিত্ব চেয়ে দেখবার মত। দিগম্বর জৈন সাধকদের তপস্যাভূমির পরিবেশটি চমৎকার ফুটেছে পাথরের ছবিতে। জগন্নাথ সভা অপেক্ষাকৃত ম্লান। এমনটি মনে হওয়ার হেতু কৈলাসের বর্ণাঢ্য বিস্তার কিছুতেই দৃষ্টিপথের অন্তরালে চলে যাচ্ছিল না! আশ্চর্য্য কৈলাস।

অতঃপর বাস এলো গিরীশেশ্বর মন্দিরে। এখন ঘণ্টাখানেক বিশ্রাম—। জায়গাটা বিশ্রামের উপযুক্ত। ছায়াশীতল গাছের তলা—টানা বারান্দা—উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে একটি ইঁদারা—অনেকখানি খোলামেলা জায়গা। বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ জুড়ে যাত্রীর মেলা বসেছে পূজার উপকরণ নিয়ে কেউ ছুটছে দেবতার উদ্দেশে, কেউ ইঁদারা থেকে জল তুলছে—কোন দল বা ছেলেমেয়েদের সঙ্গে গোল হয়ে বসে হাসি-গল্পের সঙ্গে খাবার খাচ্ছে।

অনেককালের মন্দির। মাঝখানে রাণী অহল্যাবাঈ সংস্কার করিয়ে দিয়েছিলেন। ভারতবর্ষে যে বারোটি জ্যোতির্লিঙ্গ আছে, গিরীশেশ্বর তাদের অন্যতম। সুতরাং রাত্রিদিন পূজা পাঠ স্তুতি আরতি প্রণাম প্রার্থনার শব্দগুঞ্জনে এ-মন্দির জমজমাট।

আহার ও বিশ্রাম শেষে আবার যাত্রা সুরু হল। একে একে দেখলাম—খুলদাবাদে ঔরঙ্গজেবের সমাধিস্থল। প্রবল প্রতাপান্বিত মুঘল সম্রাট ঔরঙ্গজীব—কিন্তু কি হীন নিরাবরণ তাঁর সমাধি।

মাটি যার করা একটি কবর—মাটির উপর একটি চারা গাছ। কবরের চার ধার পাথরে বাঁধানোও নয়।

দেখলাম—দৌলতাবাদ দুর্গ—যার পুরনো নাম দেবগিরি। আলাউদ্দীন খিলজী এই দুর্ভেদ্য দুর্গ জয় করেছিলেন। হিন্দু গৌরবের পতন ঘটেছিল সম্মুখ সমরে বল কৌশলে নয়—; যে কলঙ্ক

কথা বহুবার লিখিত হয়েছে ভারত ইতিহাসের পাতায় পাতায় এ ক্ষেত্রেও তার পুনরাবৃত্তি ঘটেছিল। এই দুর্গের সঙ্গে জড়িয়ে আছে আর একটি খেয়ালী রাজার কীর্ত্তি। মুহম্মদ তোগলক দিল্লী থেকে রাজধানী উঠিয়ে নিয়ে যেশ কিছুকাল এখানে বসবাস করেছিলেন। দুর্গমধ্যে আর একটি দ্রষ্টব্য বস্তু হল—চাঁদ মিনার।

বিবি—কা—মকবারা ঔরঙ্গজীবের—মহিষী—রাবেয়া দুররাণীর সমাধি ভবন। দেখতে অনেকটা তাজমহলের মত—কিন্তু পত্রপুষ্প প্রশস্ত পাষাণে সেই অম্লান সৌন্দর্য্য ধরা পড়েনি। এই সমাধি মন্দির তৈরী করিয়েছিলেন বেগমের পুত্র শাহজাদা আজম।

শেষ দ্রষ্টব্য পানি-চাক্কি—নেহাৎই হেলে-ভোলানো ছড়ার মতো। শিল্পে অনন্ত-জীবন আর সমাধি মন্দিরে মহান মৃত্যুর সঙ্গে পরিচয় লাভের পর এই প্রমোদ-প্রহসনের ব্যবস্থা কেন যে রেখেছেন সরকার—ভেবে আশ্চর্য্য লাগে।

এটাকে একান্তই যদি ভ্রমণ তালিকাভুক্ত করার প্রয়োজন থাকে—থাকুক তা প্রথম প্রথম ভাগে—। সব শেষে থাকুক ইলোরার গুহামন্দির—সঙ্গীতের সমাপ্তি পর্ব্বে কীর্ত্তনের মত—শোভাযাত্রার শেষ প্রান্তে প্রতিমার মত—পূজা শেষে প্রণামের মত। রূপ—রস আনন্দ মিলিয়েই তো বস্তুর মহিমা, বাজী বাজনা রোশনাই এ সবই তো বাইরের ঘোষণা।

—

* * * *

শিক্ষাগুরু বাঁধায় পড়লেন তাঁর প্রিয় ছাত্রটিকে নিয়ে। তাকে পুতুল গড়তে বললে সে এমন পুতুল গড়ে, যে শিক্ষাগুরু অবাক হয়ে যান, মনে মনে ভাবেন, এ হাত ত মানুষের হাত নয়।

আবার, ছবি আঁকতে বললে ছাত্রটি এমন ছবি এঁকে বসে যে শিক্ষাগুরুর তাক্ লেগে যায়,—এ তুলির টান ত মানুষের দ্বারা সম্ভব নয়।

ছাত্র গুরুর পায়ের কাছে বসে মিনতি করে বলে, গুরুদেব বলে দিন আমাকে আমি কোন্ পথে যাব?

গুরু হেসে বলেন, তুমি অসাধ্য সাধন করতে শেখেছ। দু'পথে একসঙ্গে কেউ চলতে পারে না, কিন্তু তুমি সমানে তোমার অপূর্ব প্রতিভার লীলা মেলিয়ে চলেছ দুই বিভিন্ন পথে। জগতে তোমার মত প্রতিভা আর কার আছে?

শিষ্য সেদিন গুরুর চরণে প্রণাম করে দুই পথেই এগিয়ে চলেছিল।

আজও মাইকেল এঞ্জেলো শুধু অসামান্য ভাস্কর নন, অসামান্য চিত্রকরও বটেন।

দ্বৈপায়ন

সুশীল সিংহ

ট্রেণ আসার অপেক্ষায় ষ্টেশনে সেই পরিবারটিও দাঁড়িয়েছিল। স্বামী, স্ত্রী ও তাদের একমাত্র ছেলে। প্রতি রোববার দুপুরে এই সময় ওরা কলকাতাগামী এই ট্রেনটির জন্ত অপেক্ষা করে। ষ্টেশনের অনেকে তো বটেই ট্রেনটাও যেন জেনে ফেলেছে যে ওরা এই সময় থাকবে।

ওরা সকলেই কিন্তু এই গাড়ীতে যায় না। কেবল তীর্থপতি যায়। গাড়ীতে ওঠার আগে ছেলে বাবার গালে একটা চুমো খায়। স্ত্রীকে বলে, আসি। যা চলি। যা ওই ধরনের কিছু।

প্রভাতী বলে, এসো। সামনের শনিবার আসছো তো? নাকি আবার কোন কাজে আটকে যাবে?

এই সব কথা বলতে বলতে একসময় ট্রেণ ছেড়ে দেয়।

আজও ওরা অপেক্ষা করছিল।

প্রভাতী বলল, তুমি কিন্তু আবার অন্ততঃ আর একবার ভেবো।

—কি বিষয়ে বলোত!

—কল্যাণীতে যাওয়ার। আমি ভাবছি কি জান?

প্রভাতী অধ্যাপিকা সুলভ মর্য্যাদায় আস্তে আস্তে কথা বলছিল। সেই ভাবে ধীরে ধীরে বলল, কলকাতা থেকে বর্দ্ধমান যাওয়া কত সুবিধে। মাত্র দু ঘণ্টার পথ। গাড়ীও অজস্র। মন হলেই আসা যায়। কিন্তু কল্যাণী ইউনিভার্সিটিতে গেলে, সেখান থেকে বর্দ্ধমান—

তীর্থপতি মনোযোগ দিয়ে স্ত্রীর প্রতিটি কথা শুনছিল। শুনতে শুনতে কোন ফাঁকে যে সে আর কিছুই শুনছিল না তা সে বুঝতে পারেনি। আর ঠিক তখনই সেই অবিশ্বাস্ত ঘটনাটি ঘটল।

ঘটনা বললে ঠিক বলা হয় না। কেননা বাস্তবঃ সত্যিই কিছু ঘটেনি। যা কিছু হল বা হবে বলে মনে হল তা তীর্থপতি একা ছাড়া অন্ত কেউ প্রত্যক্ষও করেনি। সেই হওয়াটুকু এতই অবিশ্বাস্ত যে কাউকে বিশ্বাস করতে বলাও কষ্টকর। বর্দ্ধমান ষ্টেশনে যাত্রীদের জন্ত মাইকে ঘোষণা করার কোন ব্যবস্থা নেই। স্ত্রীর কথা শুনতে শুনতে তীর্থপতি হঠাৎ ষ্টেশনে মাইকে ঘোষণা শুনল, স্পষ্ট শুনল ঘোষণা: "এখুনি ট্রেণ আসবে।"

ঘোষকের কণ্ঠস্বর শুনে চমকে গেল তীর্থপতি। তার মনে হল, নিশ্চিত ভাবে শুনল যে ঘোষকের গলা আর তার নিজের কণ্ঠস্বর একেবারে হুবহু এক। এমনকি উচ্চারণের টান পর্যন্ত অভিন্ন। অর্থাৎ সে প্ল্যাটফর্মের ওপর দাঁড়িয়ে থাকলেও নেপথ্য থেকে সেই এই ঘোষণাটি করছে।

ট্রেণ আসার কথা একবার বলেই সেই ঘোষক তখন বিচারপতির রায় পড়ার মত গম্ভীর স্বরে ঘোষণা করছে একেবারে অন্ত কথা। ট্রেণ আসার সঙ্গে যা একেবারেই সম্বন্ধ হীন। বলছে: "এই অবশ্যম্ভাবী। এই ভবিতব্য। স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই যদি উচ্চশিক্ষিত হয়, এবং যদি তারা

বিয়ের আগে যখন ক্ষেত্রে আপন উপার্জ্জনের ধার নিয়ে থাকে তবে তাদের দাম্পত্যের নিয়ন্ত্রিত পালা গান হবে ক্ষণস্থায়ী। সুদূর। তারা নিজ নিজ বৃত্তের মধ্যে নিজ অস্ত্র চর্চায় সৈনিকের বৈরবৃত্তি পালন করবে। তারা এক আশ্চর্য গোপন হৃদের মধ্যে নিজেকে লুকিয়ে রেখে বাঁচবে। এই লুকিয়ে রাখার কথা অন্যে জানবে না, তারা মুখ ফুটে জানাতেও পারবে না। এই নিয়তি। এই যন্ত্রণা এবং এখুনি ট্রেণ আসবে।"

ঘোষকের কণ্ঠস্বরে ও বক্তব্যে বিমূঢ় তীর্থপতি সেই মুহূর্তে সব কিছু বিস্মৃত হয়েছিল। পাশে দাঁড়িয়ে প্রভাতী বলছিল, কল্যাণীতে গেলে সুবিনয়ের সঙ্গে এই সব অসুবিধের কথা গুলো কি আমি ঠিক বলিনি?

স্ত্রীর এই জিজ্ঞাসার একটি বর্ণও তীর্থপতি শুনতে পায়নি। সেই নৈপথ্য ঘোষক ও ঘোষণা তার সব কিছুকে আচ্ছন্ন করে যেন বুকের মধ্যে কিছু খুঁজছিল। অসহায় আত্মসমর্পণের ভঙ্গীতে বিড় বিড় করে বলল, 'যদি কোনদিন বাউল হতে পারি, তাহলে এই নিয়ে আমি গান বাঁধব।'

—কি বললে? এই—

দাঁড়িয়ে থাকা তীর্থপতিকে ঝাঁকু টান দিয়ে যেন জাগিয়ে দিল তার স্ত্রী।

সেই নৈপথ্য ঘোষক ও ঘোষণা তখন নিরুদ্দিষ্ট।

প্রভাতী আবার বলল, কি তুমি বললে, আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না। কি বললে?

কোন উত্তর না দিয়ে তীর্থপতি তার বিমুখী স্ত্রীর দিকে যেন নতুন করে চাইল। বয়স আর যৌবন পঁয়ত্রিশের চৌকাঠে এসে নিঃশ্বাস ফেলছে। একদিন—বছর পাঁচ আগে—বিয়ের আগে তীর্থপতির ঘরে বসে প্রভাতীর শাড়ীর আঁচল যেন শিখার মত জ্বলে, দোলে। এখন আবার নতুন করে তাকাতেই তীর্থপতি দেখল একটু আগে বাড়ী থেকে বার হওয়ার সময় প্রভাতী তার মুখে পাউডার এর গুঁড়ো গুলো ঠিক মত মিলিয়ে আসতে পারেনি। আশ্চর্য! প্রসাধনের ছোটখাটো ফাঁকি গুলো আজকাল এত সহজে চোখে পড়ে!

—কি দেখছো আমার দিকে?

প্ল্যাটফর্মের ওপরে মাত্র হাত দেড়েক তফাতে প্রভাতী দাঁড়িয়েছিল। ডান হাতে ধরেছিল রাজাকে। রাজা ওদের একমাত্র সন্তান। সামনের চৈত্রে চারে পা দেবে। সুন্দর ফুটফুটে আদুরে চেহারা। সব সময়ে তাকে সাজিয়ে রাখে তার মা। তাকে সাজিয়ে রাখা প্রভাতীর অভ্যাস। বাইরের বার হলে রাজার একটা হাত সব সময় থাকে তার মার হাতে। ছেলের হাত নিজের মুঠিতে রাখা প্রভাতীর আর একটা অভ্যাস। তাই বাইরে এলেই সামনের দিকে ঝুঁকে দোলার চেষ্টা করা রাজার একমাত্র স্পোর্ট। রাজা তাই করছিল। অদূরে বসা একটা ভিখারী এক দৃষ্টে দেখছিল ওকে।

—কি ভাবছিলে কিই বা বললে, বললে না তো।

ধৈর্য্যের সামান্য অভাব ও উদ্বেগের আভাস পাওয়া গেল প্রভাতীর গলায়।

ষ্টেশনে চা কেরির মিলিত কণ্ঠে ক্লান্তি নেমেছে। একজন চা ওয়ালা চেকারবাবুকে এক ভাঁড় চা দিয়ে পয়সা না নিয়েই চলে গেল। হাতের সিগারেট অর্দ্ধেক হবার আগেই আঙুলের কায়দায় অনেক দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন ওই ভদ্রলোক। একটা কুকুর ভিখারীটার গা শুঁকে চলে গেল। রাধার

গাড়ীটা অকারণে ঘুরে ও ঘসিয়ে ঘুলিটা তার চারপাশে পরিশ্রম ও অন্নের সুযোগ খুঁজতে লাগল।

—আমি,

কিছু বলতে গিয়ে তীর্থপতি বলল না, শুধু হাসল।

উৎসুক দৃষ্টিতে প্রভাতী বলল, বারে, কিছু না বলে হাসছো যে!

ছেলের হাত নিজের মুঠিতে আরো গুছিয়ে নিলে সে।

—আমি এখুনি অনেক কিছু শুনতে পেলাম। সত্যি মনে হল

—কে শোনাল?

—সেটাই আশ্চর্য।

—কি রকম?

—মাইক শোনাল :

—মাইক! কোথায় মাইক?

—নেই।

—তবে?

—আমি শুনলাম। স্পষ্ট শুনলাম। আর বোধহয় কাকে মনে হল জান?

—কে!

—সত্যি শুনবে? আমি—

—যাঃ। এ আবার কি ধরণের ঠাট্টা?

ঠাট্টা নয়, যেন স্বপ্ন শোনাল, স্বপ্ন দেখল তীর্থপতিকে। সেই ভাবে বলল, শুনলাম আপন কণ্ঠস্বরে, নিজের গলায়—যেন ঘোষণা করল তীর্থপতি।

—কোথায় শুনলে?

—এইমাত্র, এখানেই। অথচ একেবারে বুকের ভেতর।

যেন মস্ত কোন হেঁয়ালীর অবতারণা করছে তীর্থপতি। যেন এরপরই বলবে 'ছ'দিনের বিরহ যেন ছয় শতুর' বা ওই ধরণের কিছু। প্রভাতী তাই তার ভ্রূ যাকে নায়িকার ভঙ্গী কোটাতে চাইল নিজের অজান্তেই। সেইভাবে বলল, কি শুনলে? কি কথা?

শুনবে বলে যখন উৎসুক ও উৎকর্ণ প্রভাতী, ঠিক তখনই ষ্টেশনের ঘোড়ার দোহার পুতে ঢং ঢং ঢং ঢং করে একটা হাসির লহরা তুলল উদিসরা লোকটা।

চকিতে র‍্যাটফর্মে চাঞ্চল্য দেখা দিল। অনেক ব্যস্ততা। গাড়ী এল। কথা ফেলে তীর্থপতি ছুটে গেল রাজার কাছে। তারপর বলল, চলি।

দেখতে দেখতে ছেড়েও দিল গাড়ী। যে কথাটা তীর্থপতি তার নিজের গলায় নিজের বুকের মধ্যে ঘোষিত হতে শুনল সে কথাটা আর উঠল না। পুবের গাড়ী মিলিয়ে গেল লাইনের উপর।

রাজার হাত ধরে সিঁড়ি উঠছে তীর্থপতির স্ত্রী। বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের অধ্যাপিকা প্রভাতী বিশ্বাস। চোখের সোনালি ফ্রেমে আর চশমার কাচে রোদের ঝিলিক থেকে থেকে চমকে চমকে

উঠছে। তীর্থপতি কি বলতে চাইল তা শোনা হল না। অন্যমনস্ক প্রভাতীর অতি সাবধানী মুঠিতে রাজার কোমল কব্জী লাল হয়ে উঠছিল।

বাইরে এসে হিম্মা নিল প্রভাতী।

রিক্সায় বসে খিল খিল করে হাসে রাজা। হাসছিল। কথা বলছিল। প্রভাতীও। এর পরই কার্জন গেট। রিক্সাটা ডান দিকে বাঁক নেবে। তখনো প্রভাতী আন্দাজে বুঝতে চেষ্টা করছিল, তীর্থপতি কি বলতে চাইছিল, বলতে যাচ্ছিল, অথচ গাড়ী আসবে ও এল বলে বলা হল না। তখনই তার চোখ পড়ল ডান দিকে। ওইখানে বর্ত্তমান শহরের সেরা অফিস্।

সে রিক্সাওয়ালাকে হঠাৎ বলল, এই দাঁড়াও, দাঁড়াও।

ডাকঘর থেকে বড় রাস্তার দিকে আসছেন এক মহিলা। সঙ্গে একটি মেয়ে। ওই বছর তিন হবে। মাথায় ফিতের সুন্দর ফুল করা রয়েছে। খুকু যেন নাচের ভঙ্গীতে তার পা ফেলতে ভাবে ফেলছে। প্রভাতী যেমন, খুকুর মা-ও তেমনি তার মেয়ের হাত ধরে আছে।

উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল প্রভাতী। বেশ জোরে বলে উঠল, ও-মু-মা! হেনা না?

এই ভাবে হঠাৎ দেখায় ওরা চকিত, বিস্মিত ও আনন্দিত হয়ে পরস্পরের মুখ হয়ে দাঁড়াল। রিক্সাওয়ালা একবার ক্রিং ক্রিং ঘণ্টা বাজিয়ে উল্টো দিকে প্যাডেল ঘুরিয়ে চেনের শব্দ করে চুপ করে গেল।

—কারুরে? তোর?

খুকুকে কোলে তুলে নিল প্রভাতী।

হেনা তখন রাজাকে অনেক আদর করে ফেলেছে।

—বাবাঃ পাঁচ বছরে অনেক কিছু হয়ে গেছিস তো।

—তুইই বা কম কি বাবা?

দুজনেই হাসল।

তারপর হেনা বলল, নাম কি ছেলের?

—রাজা। ভাল নাম শ্রীরাজ। মেয়ের নাম?

—এষণা।

—উহু, হলো না। তুই কি হয়েছিস বল?

—তুই?

—আমার অধোগতি হয়েছে।

—মানে?

—চট্টোপাধ্যায় থেকে বিশ্বাস। তুই?

—আমার তাই ঊর্দ্ধগতি হয়েছে। বস্থ থেকে বসু।

দু'জনেই ছোট ছোট ঢেউ তুলে হাসতে লাগল। আর আশ্চর্য ওরই মধ্যে কেউ তাদের নিজের সন্তানের হাত আবার ধরতে ভোলেনি।

—কবে হলো রে বিয়ে?

—একুশে ফাল্গুন। ১৩৬৪ বলাব।

—ওমা, আমারো।

—সত্যি ?

—হ্যাঁরে।

—মন্ত্র পড়েছিলি ?

—না। তুই ?

—নৃনা !

দু'জনে আবার হেসে উঠল।

পোষ্টকার্ড কিনে ফেরার পথে দুজন লোক ওই হাসি শুনে থেমে গেছে।

প্রভাতী বলল, আমাদের এই এক জ্বালা ! রাস্তায় দাঁড়িয়ে একটু হাসবার জো নেই। চিনে ফেলবে।

হেনা নীচু গলায় বলল, নারে, তোকে দেখছে।

প্রভাতী সেই আগের মতন আছে কিনা কে জানে, তবে হেনার স্বাস্থ্য সত্যিই খারাপ হয়ে গিয়েছে। সে লাবণ্য নেই। দেখল, কিন্তু কিছু বলল না প্রভাতী। মনে হল একবার—হেনার কি আবার··· ধোৎ !

দুজনে হাঁটতে লাগল রাস্তার দিকে।

প্রভাতী বলল, কর্তা কোথায় ?

উত্তর দেওয়ার আগে কাপছাড়া ভাবে রুমালে একবার মুখ মুছল হেনা। তারপর বলল, বহরমপুর।

হেনা আগের চেয়ে কালো হয়ে গেছে।

—তোর ?

—কলকাতায়। আমারি মতন। কলেজের মাষ্টার। ইতিহাসের। তোর সঙ্গে মিলত ভালো। তোর ?

—সরকারী অফিসার।

—তবে তো রীতিমতো কর্তা রে। গোয়েন্দা বিভাগের নয়তো ?

এবার হেনা ঠোঁটের ফাঁকে আলতো হাসলেও আবার রুমালে মুখ মুছেই জানাতে চাইল, মুখটা আমার রোদে পুড়ে গেছে, না ?

—কই নাতো ! কর্তাকে চিঠি ফেলতে এসেছিলি বুঝি ?

—হ্যাঁ।

যেন কুমারীর লজ্জা নেমে এল হেনার 'হ্যাঁ' বলার ভঙ্গীতে।

—চিঠি কেন ? উইক এণ্ড-এ আসেননি বুঝি ?

—না।

—তাই চিঠি ?

—হ্যাঁ।

অধ্যাপিকা হলেও এই মুহূর্তে দুই সখীর মত আলাপ করছিল ওরা। তারই রেশ টেনে এবার হেনা জানতে চাইল, তোর ?

—এসেছিলেন ভাই। এই তো ট্রেণে তুলে দিয়ে এলাম।

হেনাকে শোনানোর মত করে কপট দীর্ঘশ্বাস ফেলল প্রভাতী।

একই রিক্সায় পাশাপাশি বসল ওরা। প্রভাতীকে নিজের বাড়ীতে টেনে নিয়ে চলল হেনা।

প্রায় একযুগ আগে একই সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়েছে ওরা। ওদের নাম ছিল জোটের পায়রা। প্রভাতীর বেণীতে ছিল রক্ত। হেনার আঁচলে ছিল চঞ্চলতা। একজন দর্শনের অন্যজন ইতিহাসের ছাত্রী। বড় ভাব ছিল দুটিতে। পাশ করার পর তিনবছর ওরা দু'জনেই ছিল বাড়গ্রামে। সেখান থেকে প্রভাতী প্রথম চলে এল হাবড়ায়, আরো ভালো কলেজে। তার কিছুদিন পর হেনা গেল আসানসোল, আরো ভালো গ্রেডে। প্রভাতী হাবড়া থেকে কলকাতা। হেনা আসানসোল থেকে বহরমপুর। তারপর—

গাড়ী থামল হেনার দরজায়।

হেনা পড় পড় মনোলার বাইরে। এধারে তিন চাকার সাইকেলে চড়ে রাজা অনেক দাগ টানল ঘরের মেঝেয়। দুই বন্ধুতে গল্প হল অনেক। কখনো আজকের কথায়, কখনো পিছনের পথের ওরা ফিরে ফিরে, ফিরে গেল।

উঠি উঠি করেও যখন কিছুতেই প্রভাতীর ওঠা হচ্ছিল না তখন একেবারে অন্য গলায় জানতে চাইল হেনা, কেমন আছিস বলতো ?

—ভালোই।

—যাক্, আমার ধারণা হচ্ছিল ভালো থাকা যায় না, থাকতে নেই।

—কেন ? তুই কি ভালো নেই নাকি ?

—আমি ?—বেশ—তা—দেখ—

দেওয়ালে কমলবাবুর ছবি ? শ্রীকমল বন্দ্যোপাধ্যায়। সুন্দর স্বাস্থ্য। পুরুষালি মুখ। মিহি গোঁফ। টাই সমেত ফটো ঝকঝক করছে। হেনার স্বামী। প্রভাতী বলল, কর্তা এলে নিয়ে যাবি আমার ওখানে। আলাপ করবো।

হেনা হঠাৎ তার বন্ধুর হাত চেপে বলল, একটা সত্যি কথা বলবি ? আমায় মেয়ো ভাববি না ?

—কি ?

তুই যে দুঃখে আছিস, তোর স্বামী বাস করেন না ?

দুই হাতে মুখ ঢাকল হেনা। সেই হাতের পাতাকে রুমাল করে মুখ মুছল সে। তারপর হাসল। বড় করুণ দেখাল সে হাসিতে।

—কি হয়েছে রে হেনা ?

কিছু না বলে প্রথমে মেয়েকে তারপর রাজার গালে চুমু খেল হেনা। টকির রস লেগে

আছে ওদের মুখে, পালে। বাসিমের গলা থেকে একটা খাম টেনে বাড়িয়ে দিল রেবা। বলল, পড়।

রেবার মুখে ঘরের আবহাওয়ার যে বিশ্লেষণ ও রহস্য সেটাকেই যেন মৃদু ঠেলা দেওয়ার চেষ্টায় প্রগাঢ়ী রসিকতা করে বলল, তার বিভাসের কাছে কথা চেয়ে পড়েই বেশি ভালো। বলে দেখল, রেবা তার কথা শোনেনি। সে আবার তার মেয়েকে আর বাজাকে আদর করছে।

"শ্রীকমল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখছি।

আমি, এই ভাবে চিঠি সুরু করতে তুমি চমকে যাবে। কিন্তু আজ এই রাত্রে চিঠি লিখতে বসে এইভাবে ছাড়া চিঠি সুরু করতে পারছি না।

আসলে আমার নিজের সঙ্গেই অনেক কথা আছে। চিঠিতে তা লিখলে তোমারও জানা হবে। আমারও নিজেকে শোনানো হবে।

পিছন ফিরে চাইতে মন চাইছে। যদি আমাদের সাক্ষাতের প্রথম দিন থেকে আরম্ভ করি তবে তা ছেলেমানুষী হবে। তবু দু'চারটি কথা আপনিই আসবে। তোমার কি মনে আছে, আমাদের বিয়ের আগে তুমি প্রতি সন্ধ্যায় আমার জন্য অপেক্ষা করতে! আর আমি কেমন ঘড়ির কাঁটার চেয়েও নির্ভুল হাজিরা দিতাম! সেই তুমি, সেই আমি—আজও আছি। আমাদের সন্তান আছে। অথচ আমি সম্প্রতি বিশ্বাস করতে আরম্ভ করেছি যে আমাদের এই থাকার মধ্যে স্বাভাবিক বাহিত উত্তাপ ও ঘনত্ব নেই। রাস্তার মোড়ে পুলিশের মত অবস্থানটাই কেবল পরস্পরের জানা।

তোমার ধারণা, তোমার কথাটা আমি বুঝি না। তা ঠিক নয়। বুঝি। তুমি বলতে চাও বিদ্যা তুমি অর্জন করেছো। সেই বিদ্যার চর্চার বহুদিন স্বাধীনভাবে উপার্জন করেছো। বিদ্যার বিনিময়ে উপার্জন করলে নিজেদেরই ভবিষ্যৎ ভালো হবে।

ঠিকই।

কিন্তু চাকরী মানেই নিজেকে বাইরে ছড়িয়ে দেওয়া। নানা কথার ছিকে ও কম্পিটিশনে নিজেকে জড়ানো। পুরুষের বেলায় যেমন, মেয়েদের বেলাতেও তাই। তাই চাকরীতে সুযোগ হলেই মানুষ আয়না বদল করে। যেমন তুমি ছিলে ঝাড়গ্রামে। সেখান থেকে আসানসোল। সেখান থেকে বহরমপুর।

বহরমপুরে আমাদের দেখা। ভাবতেও ভাল লাগছে সে সব কথা। স্মৃতি—বিশেষতঃ প্রণয় স্মৃতি, সত্যিই মধুর—, অভিজ্ঞরা এ কথা ঠিকই বলেছেন। তোমার অধ্যাপিকার আড়ালে যে নারী আছে, সে আমায় ডাকল। আমি মুগ্ধ হলাম। তুমিও। আমরা ভালবাসলাম। আমরা নিবিড় হলাম। আমি বললাম, অনেকদিন তো কলেজে বক্ বক্ করলে। এবার আমার বকুনি খাও। তুমি হাসলে। তাছাড়া কলেজে 'সিনিয়রিটি' নিয়ে যেন কি খিটিমিটি চলছিল তখন। তুমি চাকরীতে ইস্তফা দিলে। আমি খুসী হলাম। বললাম, 'যা পাই, তাতে চালাতে পারবে না অন্নপূর্ণার মত?' তুমি বললে, 'কেন পারবো না?' তারপর রোল করেছিলে চাষীর সুরে, 'বেশ গেরো কথা বলতে পারতো! অন্নপূর্ণা? হামি পারনা তবলে!'

আমি বলেছিলাম, 'আমি খুব গেরো। তফাৎ আরণ্যক।'

আমি মনে মনে ঠিক করলাম তোমার বিধবা মাকে তুমি যে দায়োদ্ধার দিতে ছেলের মত আমিও তা চালিয়ে যাবো। তুমি জানো, আমার কোনদিন তাতে ভুল হয়নি।

কেউ আসছে, খবর পাওয়া গেল। তুমি ফুলের মত ফুটে উঠলে। অথচ মনে মনে তখন তুমি ব্যস্ত হয়ে উঠেছো। তোমার ব্যস্ততা কেন তা আমি দেখতে পেতাম। যেদিন তুমি ফুল পার হয়ে কলেজে এসেছো, একের পর এক এগিয়ে গেছ, ততই তোমার আত্মীয় পরিজন তোমার সুখ্যাতি করেছেন। নির্ভর করেছেন। 'এ্যাট্রাক্টিভনেস' বলে যে সোনালোকে পদার্থ আছে—যা বহু দুঃখের ও সুদুর্লভ সুখের মূল—তা উচ্চশিক্ষিত পুরুষ নারী কাউকেই ছেড়ে দেয় না, সঙ্গে থাকে। আমার বাড়ী দেড় বছর সংসার করে এষণাকে নিয়ে দিনরাত তন্ময় থেকে তুমি বললে, 'একেবারে বসে আছি, একি ভালো লাগে?'

বসে তুমি ছিলে না। ভালো লাগে না, এই সত্যি কথা।

আসলে তোমার 'এ্যাট্রাক্টিভনেস' তোমায় তখন ভিতরে খোঁচা দিচ্ছে।

নিতান্ত কিশোর বেলায়—যখন সচেতনতায়—যে আকাঙ্ক্ষার, নিজেকে ঘিরে যে ইচ্ছার ও আত্মবিশ্বাসের সুরু, তিরিশ বছর পর্যন্ত যা একার মনে পালিত, মনের ওপর তার যে দাগ স্বামী সংসার পেয়েই কি তা মিটে যায়? যায়না। তোমারও যায়নি। এতে কোন দোষ নেই। এই স্বাভাবিক। এই স্বাভাবিকতার দাম্পত্য প্রতিক্রিয়া দেখে আমার কি মনে হয়েছে জানো? চমকে যেও না, কানে আঙুল দিও না,—থাক্ পরে বলছি।

অতএব তুমি আট মাসের মেয়ে নিয়ে কাটোয়া গেলে। সেখানে তোমার থাকার জন্য বাড়ী ঠি, ঠাকুর সব ব্যবস্থা করে দিয়ে এলাম। দু'দিন 'ক্যাজুয়াল লিভ' নেব। তারপর টানা দুটি বছর প্রতি শনিবার তোমাদের কাছে গেলাম। আর তোমরা কেমন আছো, এই ভেবে উৎকণ্ঠিত হলাম। কি চমৎকার শান্তি! মাঝে মাঝে পুজোর আর গরমের ছুটিতে কিছুদিন তুমি আমার এখানে এসে। ক্রমশঃ আমার মনে হতে লাগল যে তোমার কাটোয়া অথবা কামস্কাটকার থাকা আমার কাছে একই ব্যাপার।

আমি অপেক্ষা করে থাকলাম। তারপর তুমি আরো ভালো সুযোগ পেলে রাণীগঞ্জে। কাটোয়ার বাসা তুলতে হল। এবার সব ব্যবস্থা করে তোমার কলেজ যাওয়ার জন্য একজন বাঁধা রিক্সার বন্দোবস্তও করে দিয়ে এলাম। আবার সেই শনিবার। শনিবার। উৎকণ্ঠা। ক্লান্তি। শান্তি। শনিবার। শনিবার।

তোমার একটার পর একটা জায়গা বদল করাতে আমি আশ্চর্য হইনি। আরো ভালো সুযোগ, এবং আরো ভালো তথা 'স্কিম্', 'কম্পিটিসন', 'এ্যাট্রাক্টিভনেস', ইত্যাদি ছাড়া চাকরী হয় না।

এবার চলছে বর্ত্তমান। এবার আর সঙ্গে যেতাম না। আমি অসুবিধা হলেও তুমি সব ব্যবস্থাই করে নিয়েছো। এই একমাসে তোমার ন'খানা চিঠিই পেয়েছি। যাবার জন্য দুহাত বাড়িয়ে ডাকছো। আমিও অনেক কষ্টে যাওয়ার দিনটাকে কেবলই পিছিয়ে দিচ্ছি। বিশ্বাস করো, খুবই কষ্ট হচ্ছে।

আমি জানতে চাইবে—কেন?

বুঝিয়ে বলা কঠিন। নিজেই জানিনা কখন, অথচ আমাদের দাম্পত্য জীবন আমি আর পাঁচজনের সঙ্গে মেলাতে সুরু করেছি। মনে হচ্ছে, আমি পুরুষ বলেই আমার অসহায়তা অপার।

সারাদিনের শেষে তোমা'র বলার মত অনেক তুচ্ছ বাজে কথা আমার বলার থাকে। কে'থায় তুমি? কোথায় এষণা? কথা তুলে রেখে সাতদিনের কথা একদিনে বলা যায় না। মনেও থাকে না। আর চিঠি লেখার রোমাঞ্চ যে স্বল্পায়ু তা তুমিও নিশ্চয়ই টের পাচ্ছো।

তাই প্রতি শনিবার যখন তোমাদের কাছে যাই। যখন অফিসারের মার্কা দেওয়া আমার সামাজিক পোষাক গুলো এক এক করে খুলে ফেলি, আমার নগ্ন হাতে যখন অধ্যাপিকা বীনা তোমার নারী শরীর কথা বলে ওঠে, তখন আমার নিজের ওপর ঘেন্না হয়। ভাবি, আমরা কি এই জন্যই পরস্পরের নির্দিষ্ট?

তৃষ্ণাতো দেহসর্বস্ব নয় জেনো। তোমারও নয়। আমার তৃষ্ণা প্রতি মুহূর্তে দেওয়ার। হোক না সে দেওয়া নেওয়া নামঃ এলোমেলো, অর্থহীন তুচ্ছতায় ভরা। আমার দাম্পত্য বাসনা একেবারে আদিকালের চটে ওটা জিনিষ,—আমার চোখে যা পরম বাঞ্ছিত ঠেকে। আমি যে মেয়ে।

আমার নিশ্চিত ভাবে মনে হয়—তোমরা যারা কাজের সূত্রে এভাবে দূরে থাকো তাদের অনেকেরই অভাবের দোহাই সত্য নয়। আমার মাইনে তোমার জানা। হিসেব করলে দেখা যাবে সে টাকায় একসঙ্গে থাকলে যে স্বচ্ছলতা, আলাদা থাকায় তা নেই। আসলে সমস্ত যৌবন ধরে তোমরা একলা থাকার অভ্যাস আর সাধনা করেছো। ভাঁটার বেলায় এসেছে পুরুষ। আঁকড়ে ধরেছো তাকে। সেই ঈতের মতোই তার কাছে নিয়েছ সন্তান। তারপর—তারপর? 'এ্যামবিশন' দিয়েছে খোঁচা।

ভুল বুঝোনা। কারো নিন্দা করতে বসিনি। শুধু আমাদের দাম্পত্য জীবনে এই সবের প্রতিক্রিয়ার কথা বলছি। নিজের মনের দিকে ভালো করে তাকিয়ে বলোত বিয়ের পর প্রথম দেড় বছর কাছাকাছি থাকার যে আগ্রহ তোমার মধ্যে ছিল, তা আজও তেমনি আছে? নেই। থাকতে পারে না।

ভালবাসা অনেক দুঃখ সহ্য করতে পারে। উচ্চাকাঙ্ক্ষা নিজেকে ছাড়া আর কিছুই সহ্য করতে পারে না। তার নিজের মধ্যেই সে নির্বাসিত। সে 'নার্সিসাস'। স্বামী ও স্ত্রী, তুমি ও আমি পরস্পরের সম্পর্কে ক্রমশঃ নিরপেক্ষ হচ্ছি। তা কি টের পাচ্ছো?

শোন বেনা, ভিতরে যাই কেন না হোক, বাইরে আমার মুখে হাসি টেনে চলতে হয়। পুরুষ হওয়ার এই আর এক দায়। তবু তোমায় বলি, একদিন আমাদের মনে হয়েছিল আমরা দু'জন পরস্পরকে প্রতিটি মুহূর্ত দিয়ে ধন্য হব, তৃপ্ত, পূর্ণ হব। আমরা তাই হয়েছিলাম। সেদিন তাই সত্য ছিল। সেদিন সবাইকে জানিয়ে আমরা মিলেছিলাম। তেমনি আবার জানিয়ে দি আমাদের মিল ভেঙেছে আমরা আলাদা। তাতে সত্যকে স্বীকার করা হবে। এই নিদারুণ গোপনীয়তা, এই ক্লান্তি, এই শঠতা থেকে ছাড়া পাওয়া যাবে। নিজের কাছে মাথা উঁচু করা যাবে।

ভয় পেয়োনা লক্ষ্মীটি, আমি ডিভোর্সের প্রস্তাব করছি না।

এষণাকে আমার অজস্র আদর দিও। ইতি—

চিঠির শেষের দিকে আবার ঝুঁকে পড়ল প্রভাতী। তার মাথাটা ভার হয়ে গেছে। যেন ঘুলে গেছে চিঠিটা। শ্রী কমল বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা। অকারণে তীর্থপতি-বিশ্বাসের নামটা চোখের সামনে ভাসছে।

—তুই কি এর উত্তর দিয়েছিস?

—দিয়েছি।

—কি লিখেছিল?

হয়ত দুই বন্ধু এই দুপুরে আরও ঘন হত। চোখের জলে অথবা দুঃখাসে মনের কথা বলত। কিন্তু—

হেনা উত্তর দেবার আগেই ঘরে একটি তরুণী এল। আড়া বেণীতে তার রূপের নম্র অহঙ্কার কটি পাতার মত দুলছে। হাতে খাতা বই। ঠিক যেন ট্রেশনে ট্রেণ ছাড়ার ঘন্টা দিল। প্রভাতী বলল, ছাত্রী বুঝি?

—হাঁ। অন্যদিনে সকালে আসে। রোববার এই সময়টায় কি আর করি তাই—, হেনা আবার হাসল।

হাতের ঘড়িবন্ধে সময় রেখে চমকে উঠল প্রভাতী। বলল, সাড়ে চার? আমারও ছাত্রী আসবে যে। একদিন যাস্—

হেনার উত্তর শোনা হল না। তীর্থপতি কি বলতে চেয়েছিল তা-ও শোনা হল না আজ। রাস্তায় নেমে রাজার হাত নিজের মুঠিতে আরো দৃঢ় করে ধরল প্রভাতী।

• • •

অষ্ট্রিয়া অভিযানের পথে ফরাসী সৈন্যদল ধরে নিয়ে এল এক কিশোরকে মহাবীর নেপোলিয়ানের সামনে। সে না-কি পাহাড়ের আড়ালে থেকে তাঁর সৈন্যদল কোনপথে চলেছে সেটা বিশেষভাবে লক্ষ্য করছিল। পরণে তার ছেঁড়া পোষাক মুখে নির্ভীকতার ছাপ।

নেপোলিয়ান জিজ্ঞাসা করলেন: তুমি কি এই বয়সে গুপ্তচরের কাজ করছ বালক?

—আজ্ঞে হাঁ।

সেনাপতিরা আশ্চর্য হয়ে উঠলেন বালকের এই নির্ভীক উত্তরে। সম্রাট নেপোলিয়ান বললেন: তুমি জান, গুপ্তচরের শাস্তি কি?

—তা'তে আমি ভয় পাই না।

সম্রাটের দুটি চক্ষু উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি বললেন: তোমার নির্ভীক উত্তরে সন্তুষ্ট হয়েছি আমি। তুমি মুক্ত। তুমি আমার কাছে কি চাও বল?

—একটি বন্দুক ও বারুদ-গুলি।

কি করবে তুমি ও সব নিয়ে?

—এই পাহাড়ের আড়াল থেকে আমি আপনাদের অর্থাৎ ফরাসীদের ওপর গুলি চালাব। আপনারা আমাদের শত্রু।

নেপোলিয়ানের মুখে মৃদু হাসি ফুটে উঠল। তিনি তখনি বালকের মুক্তির আদেশ দিলেন। তাঁর সেনাপতিরা বিস্মিতভাবে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন।

সম্রাট শুধু বললেন: এ ছেলেটি সত্যিই বীর।

এক মুঠো টাকা

সুজিত সেনগুপ্ত

তাসের আড্ডাটা সেদিন খুবই জমে উঠেছিল। অবশ্য নির্দোষ তাসের আড্ডা নয়—সোজা ভাষে বলতে গেলে জুয়ার আড্ডা। কিন্তু যারা এর খেলোয়াড় তারা কেউই ঠিক নিম্ন শ্রেণীর জুয়ারী নয়, মধ্যবিত্ত বা উচ্চমধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে। অফিস ছুটির পর বিবেকানন্দ রোডের এই বাড়ীটিতে সমবেত হয় মাঝে মাঝে। আড্ডাধারীদের মধ্যে একজন ছাড়া সকলেই অবিবাহিত; বিবাহিত ছেলেটির নাম তরুণ গুপ্ত, সে তাসের টেবিলে কনুইচেপে বিষণ্ণ মুখে বসেছিল। এই লোকটি বিয়ে করেছে মাস আষ্টেক হোল। বিয়ের আগে সে এই আড্ডাতে মাঝে মাঝে আসতো, কিন্তু বিয়ে হবার পর সে আর এইখানে আসেনি। কারণ সে রাইটার্স বিল্ডিংয়ে আড়াইশো টাকা মাইনে পায়—ঐ টাকাতে বিধবা মা, এক ভাই ও স্ত্রী সমেত সংসারটি চালিয়ে তাসের নামে জুয়ায় বিলাসিতা করা সম্ভব হয় না। আজ এতদিন বাদে তার কি দুর্মতি হওয়াৎ সে এখানে উপস্থিত হয়েছিল, তার খেসারত তাকে ভাল ভাবেই দিতে হয়েছে। তার সহকর্মী রবীন তাকে বলতে গেলে একরকম জোর করেই নিয়ে এসেছিল। রবীন এই আড্ডার নিয়মিত মেম্বার। "বেশী খেলতে হবেনা, একটুক্ষণ খেলেই উঠে যেও, তুমুরের ফুল হয়েছ যে তুমি, একঘণ্টা বৌয়ের আঁচল ছাড়া থাকলে, এমন কিছু মহাভারত অশুদ্ধ হবেনা—" ইত্যাদি নানা স্তোকবাক্যে রবীন তরুণকে বশীভূত করে আড্ডায় উপস্থিত করেছিল। ফল তরুণের পক্ষে হয়েছে মর্মান্তিক। আজকেই সে মাইনে পেয়েছিল, সেই টাকা তাসের টেবিলে বেহাত হয়ে গেছে। আজ রবীনেরই ভাগ্য ভাল, অবশ্য প্রায় ওরই ভাগ্য সদয় থাকে। তাছাড়া সে ওস্তাদ খেলোয়াড়ও বটে। প্রসন্ন মুখে রবীন তাস বাঁটছিল, টেবিলে তার সামনে পড়েছিল বেশ পুরু কয়েক তাড়া নোট।

দ্বিরুক্তি, বিষণ্ণ মনে তরুণ চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল। তারপর সকলকে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে দরজার দিকে চলল। ঘর থেকে বেরোবার মুখে একবার ফিরে দেখল, সব খেলোয়াড়রা আবার একাগ্র মনে তাসের ওপর ঝুঁকে পড়েছে। চিন্তিত মনে সে রাস্তায় বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সিরীশ পার্কে ঢুকলো। তারপর নিরালা দেখে একটা বেঞ্চিতে বসল। তার মনে তখন চিন্তার ঝড় উঠেছে। স্ত্রীকে সে কি বলবে? জুয়া খেলে টাকা হারবার কথা? ছি ছি ছি এই মাসে সংসার চলবে কেমন করে? "হা ভগবান, কেন আমার এখানে আসবার মতি হয়েছিল! এই মাসটায় বুড়ো মা, ছোট ভাই, স্ত্রী-এরা কি অনাহারে মরবে? আর টাকাটা কোথায় গেল সে কৈফিয়ৎ-বা দেব কি করে? আচ্ছা, যদি বলি, পকেট থেকে কখন টাকাটা রাস্তায় পড়ে গেছে, টের পাইনি।" এই কথাটা মনে আসতেই এত দুঃখেও তার হাসি পেয়ে গেল। তরুণ জানে তার স্ত্রী অত্যন্ত বুদ্ধিমতী। তার চোখের দিকে তাকিয়ে এক মিনিটের মধ্যেই মিথ্যে কথাটা ধরতে পারবে। অত্যন্ত চিন্তিত মনে তরুণ বেঞ্চি থেকে উঠে দাঁড়াল, সন্ধ্যে সাতটা বাজে,

এইবার বাড়ীর দিকে যেতে হবে। ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তার পা যেন চলতেই চাইছিল না। ঠিক এমনি সময় রাস্তা ঘাট ও আশে পাশের বাড়ীর আলো ধপ্ করে নিভে গেল। প্রথমটা সে হক্‌চকিয়ে গিয়েছিল, তার পরেই যুবক আজকাল বিনা নোটিশে কলকাতার এক এক অঞ্চলে বেশ কিছুক্ষণ আলো নিভে থাকার একটি নিত্য নৈমিত্তিক উদাহরণ। ভগবান জানেন কতক্ষণের জন্ত আলো নিভলো। বিরক্ত হয়ে কয়েক পা অন্ধকারের মধ্যে চলার পরই একটা দারুণ মতলবের কথা তার মাথায় খেলে গেল। সে কন্সি আঁটল যে, বাড়ীতে গিয়ে বলতে হবে রাস্তার অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে একটা গুণ্ডা এসে টাকা কেড়ে নিয়েছে। এদিক ওদিক তাকিয়ে তরুণ আবার পার্কের নিরালা কোণে ফিরে গেল তারপর কিছু ধুলোকাদা দেহের কয়েক জায়গায় বেশ ঘষে দিল। সার্টের কলারটা টান দিয়ে একটু ছিঁড়ল, মাটিতে ঘষে আঙুলের ও কনুইএর কিছুটা ছাল তুলে ফেলল। তারপর সে বাড়ীর দিকে রওনা হল কিছুক্ষণ পার্কে অপেক্ষা করে। বাড়ীর গলিতে পা দিয়েছে সে, ঠিক এমনি সময় আবার ধপ্‌করে আশে পাশের আলো জ্বলে উঠল। এতক্ষণে অন্ধকারে মতলব বার করে তরুণ নিশ্চিন্ত ছিল, এখন আবার আলো জ্বলে উঠল দেখে কেন জানিনা তার বুকের মধ্যে গুর্‌গুর্ করতে লাগল। কম্পিত পদে সে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করল। তার স্ত্রী সরমা রাত আটটা বেজে গেছে দেখে উৎকণ্ঠিত হয়ে বার-বার করছিল, তরুণের সুপরিচিত পায়ের শব্দ শুনে দৌড়ে এল।—"কি গো এত রাত্তির হোল, আমি ভেবে ভেবে—" কথাটা তার শেষ হ'ল না, একটা অব্যক্ত শব্দ করে সরমা তরুণকে আঁকড়ে ধরল। "ওগো একি? কি হয়েছে, ওগো বলনা ··" তরুণ ভাঙা গলায় বলল—"সর্বনাশ হয়েছে, মাইনে নিয়ে ফিরছিলাম, রাস্তায় অন্ধকারের সুযোগে একটা গুণ্ডা আমাকে ধাক্কা মেরে ফেলে সমস্ত টাকা ছিনিয়ে নিয়ে পালিয়েছে।" মা পাখী যেমন তার ডানার নিরাপদ আশ্রয়ে তার শিশুদের ঘিরে রাখে, সরমাও তার কৃশ হাত দুখানি দিয়ে স্বামীকে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরল। বড় বড় চোখদুটি থেকে টপ্‌টপ্ করে জল পড়তে লাগল। সে কাতর কণ্ঠে বারবার জিজ্ঞেস করতে লাগল—"টাকা গেছে যাক্···কিন্তু ওগো তোমার লাগেনি ত?" তরুণ সেই অশ্রুমুখী নারীর দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বলল—"না আমার তেমন কিছু লাগেনি, দু'এক জায়গায় ছড়ে গেছে মাত্র। কিন্তু টাকা তো একটাও নেই, সারা মাস কেমন করে—" সরমা কাঁদতে কাঁদতে হেসে ফেলে তাকে বাধা দিয়ে বলল—"সে তোমার ভাবনা নেই গো, প্রতিমাসেই আমি কিছু কিছু জমাই, তা থেকেই কষ্টে সৃষ্টে চলে যাবে, কিন্তু সত্যি বল তোমাকে গুণ্ডাটা বেশী মারেনি তো?" অনেক কষ্টে তরুণ তাকে শান্ত করল। কিছু পরে নিজেকে সামলে নিয়ে সরমা একটা আইডিনের শিশি নিয়ে তার হাতে দিল, বলল—"তুমি যাও বাথরুমে গিয়ে হাত মুখ ধুয়ে এস। কাটাগুলো ভাল করে ধুয়ে আইডিন লাগিয়ে যাও। আমি খাবার আনছি তুমি খেয়ে নেয়ে একটু ঠাণ্ডা হয়ে ওপরের ভাড়াটেদের তো ফোন আছে, সেখান থেকে থানায় আজকের ঘটনাটা জানিয়ে যাও।" কথাটা শুনেই তরুণের বুকটা ধক্ করে উঠল,—"পুলিশ।" সরমা বলল—"হ্যাঁ, আমাদের সব কথাই তো তাদের জানাতে হবে।" তরুণ কম্পিত কণ্ঠে উত্তর দিল, "কি লাভ হবে? সে গুণ্ডাটা আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, তার মুখখানা আমি তো অন্ধকারে দেখতেই পাইনি। পুলিশের কাছে আমি তো তার কিছু মাত্রও বর্ণনা দিতে পারবনা।" সরমা দৃঢ়স্বরে বলল—"তাহলেও পুলিশকে সবকথা জানাতেই হবে। অন্তত পুলিশের কড়াকড়ি

বাড়বে, ওদের আর আস্কারা দেওয়া চলবেনা। তুমি যাও হাত মুখ ধুয়ে এস তারপর কিছু খেয়ে কোন করবে।" প্রচণ্ড বুক ধরফড়ানি নিয়ে তরুণ বাথরুমে ঢুকলো। তারপর দুহাতে মাথা চেপে ধরে বসে রইল। সে এখন কি করবে। পুলিশের কাছে ইতিপূর্বে সে কখনও যায়নি, তাদের প্রশ্নের ঠ্যালায় যদি সত্যি কথা ফাঁস হয়ে যায়? যদি পুলিশ বুঝতে পারে চুরীটুরি কিছু হয়নি, সমস্ত ব্যাপারটাই সাজানো। আবার যদি পুলিশের কাছে না যায় তবে স্ত্রী সরমার ঘোরতর সন্দেহ হতে পারে। সে অবশেষে পুলিশের কাছেই যাবে স্থির করল। কারণ সে স্থির বুঝলে যে পুলিশকে বরং তাদের ঘুঘু দিয়ে একটা কিছু বুঝিয়ে দেওয়া সম্ভব হলেও হতে পারে, কিন্তু সরমা যদি একবার আসল ব্যাপার টের পেয়ে যায় তবে সারা জীবন অশান্তিতে কাটবে। হাত মুখ ধুয়ে সামান্য কিছু খেয়ে তরুণ গুটিগুটি উপরের ভাড়াটের কাছে গেল। গৃহকর্তাটি অতি সজ্জন। সমস্ত ব্যাপারটা শুনে তৎক্ষনাৎ তাঁর ফোনটি ব্যবহার করার অনুমতি দিলেন। কম্পিত হাতে তরুণ ডিরেক্টরীটি ধরে জোড়াসাঁকো থানায় ফোন করল। তখন রাত প্রায় নটা। ফোনের অপর প্রান্ত থেকে জোড়াসাঁকো থানার ও সির গম্ভীর কণ্ঠ ভেসে আসতেই তার বুকটা ধরফড় করে উঠল। যথাসাধ্য চেষ্টায় সে কাঁপাকাঁপা গলায় গল্পটা বলে গেল। স্থানে স্থানে তাকে থামিয়ে ও সি প্রশ্ন করে ব্যাপারটা আরও প্রাঞ্জল করে নিতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পরে তরুণ সবিস্ময়ে লক্ষ্য করল সে প্রথমে পুলিশের সংগে কথা বলতে হবে বলে তার যে প্রচণ্ড ভয় হয়েছিল, কথা বলতে বলতে সে ভয় অনেকটা কেটে গেছে। অবলীলাক্রমে সে মিথ্যে গল্প রচনা করতে লাগলো। মিথ্যে বলতে সে যে এত পটু তা তার আগে জানা ছিলনা। অবশেষে তার সংগে কথা শেষ করে ও সি দুর্নীতি দমন বিভাগের এক অফিসার জীবনবাবুর সংগে তরুণের কানেকশন করে দিলেন। তাঁর কাছেও সমস্ত ঘটনার খুঁটিনাটি জানাতে হল। বারকতক বলে গল্পটা তরুণের এমন রপ্ত হয়ে গিয়েছিল, কোন জায়গায় তার আটকালো না, বেশ গড় গড় করে সব প্রশ্নেরই সে মনগড়া উত্তর দিল। সে যখন মনে মনে ভারী নিশ্চিন্ত বোধ করছে যে—যাক্ ব্যাপারটা ভালোয় ভালোয় চুকে গেল, ঠিক এমনি সময় সেই অফিসারটি গম্ভীর গলায় বললেন—"তরুণবাবু আপনি এক্ষুনি একবার থানায় আসতে পারবেন কি? আমার মনে হয় আমরা সেই চোরটাকে ধরেছি।"—"আপনারা কি ধরেছেন?"

"আমি বলছি, আমরা সেই চোরটাকে ধরেছি, যে আর কি আপনার টাকা ছিনিয়ে নিয়েছিল। সিরিশ পার্কের একটু দূরে চোরটা ধরা পড়েছে, আপনার এখন একটু থানায় আসা প্রয়োজন।" তরুণের হাত পা ভয়ে ঠাণ্ডা হয়ে গেল। তার আর বাকস্ফূর্তি হল না।—"তরুণবাবু!"

তরুণ কম্পিত কণ্ঠে জবাব দিলে—"আজ্ঞে আমি যাব—যাচ্ছি···ইয়ে, এক্ষুনি যাচ্ছি।" প্রায় কাঁপতে কাঁপতেই সে ফোনটি রেখে দিল।

এই উত্তরটি না দেওয়া ছাড়া তার আর কোন উপায় ছিল না।

নীচে নামতেই সরমা কাছে এসে দাঁড়াল। তরুণ নিরুপায় কণ্ঠে বললে, "আমায় একবার থানায় যেতে হবে, থানা থেকে বলল তারা চোরটাকে আধঘণ্টা আগেই ধরেছে।" সরমার মুখখানি হাসিতে ভরে উঠল, বললে—"দেখলে, তারা এরই মধ্যে চোরটাকে ধরে ফেলেছে। আমি বলেছিলুম কিনা। তবে?" তরুণ মিন্ মিন্ করে উত্তর দিলে, "আগেই অত ভাবিও না,

পুলিশ ঐ রকম অনেক কথাই বলে। একটু সন্দেহ হলেই নির্দ্দোষ লোককেও চোর বানিয়ে দেয়, কাকে ধরতে কাকে ধরেছে কে জানে?" সরমা দৃঢ় স্বরে উত্তর দিলে, "আমার মন বলছে পুলিশ ঠিক লোকটাকেই ধরেছে। তুমি তাড়াতাড়ি জামা কাপড় পরে নাও—বেশী রাত করনা।"

(২)

অপরাধীর মন, কম্পিত দেহ ও ভয়ার্ত্ত হৃদয় নিয়ে তরুণ ছোড়াদের খাবার মধ্যে ঢুকল। সেখানে তার নিজের পরিচয় দেওয়া মাত্রই এক লম্বা চওড়া অফিসার বেরিয়ে এলেন—ইনিই জীবন বাবু। এঁর মুখের ভাবটি সহৃদয়তায় পূর্ণ, এঁর চোখের দিকে তাকালে আর বলে দিতে হয় না যে ইনি অত্যন্ত ভাল মানুষ। তিনি তরুণকে তাঁর নিজস্ব ছোট ঘরটিতে নিয়ে গেলেন। সেখানে তরুণকে একটি চেয়ারে বসিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—"তরুণবাবু যে আপনার টাকা লুট করেছিল—দেখুনতো তাকে চিনতে পারেন কিনা।—এই ছোকরা উঠে এস।" তরুণ দেখল ঘরের একেবারে কোণে একটি ছোকরা বসে ছিল, অফিসারটির ডাকে সে তাদের সামনে এসে দাঁড়াল। ইয়াঙি ট্রেন পাইপ, টিশার্ট পরা উন্নতি চাঁড়োদের মত চেহারা। চুলগুলো এক বিশেষ অভিনেতার মত ছাঁটা। পায়ে ছুঁচল মুখ লম্বা জুতো। বয়স কিন্তু তার একেবারেই অল্প, সতের হয় কিনা হয়। কৈশোরের স্বাভাবিক লাবণ্যের ভাব এই বাঁদুরে পোষাকেও মিলিয়ে যায়নি। অফিসারটি হুঙ্কার দিয়ে বললেন—"সোজা হয়ে দাঁড়াও ছোকরা, এটা ইয়ার্কি মারার জায়গা নয়।" ছেলেটি সভয়ে প্রাণপণে সোজা হয়ে দাঁড়াল। অফিসার শুধোলেন, "কি তরুণবাবু, ছেলেটিকে চেনাচেনা ঠেকছে কি?" তরুণ ছেলেটির চোখে চোখ রাখতে পারছিলনা। মাথা হেঁট করে বুকের ধুকপুকুনি মন্থর করতে করতে আস্তাসো গলায় বলে—"ইয়ে দেখুন…অন্ধকার ইয়ে……ফোনে তো আপনাকে বলেছি তার অন্ধকারে লোকটাকে দেখতে পাইনি।" অফিসার হো হো করে হেসে বললেন—"আরে ঐ নিয়ে ভাববেন না, সে আমরা ঠিক করে নেবো। এই ছেলেটিই যে আপনার টাকা কেড়ে নিয়েছিল এ বিষয়ে আমার কোন সন্দেহই নেই। আচ্ছা আপনি বলেছেন না, আপনার আড়াইশো টাকা লুট হয়েছে?"—"আজ্ঞে হাঁ," অফিসারটি টেবিলের ড্রয়ার থেকে একটা খাম বার করলেন। বললেন—"ছোকরাটার পকেট থেকে এই টাকা গুলো সার্চ করে বার করা হয়েছে। ছোঁড়ার পকেটেও নিশ্চয়ই কয়েকটা টাকা ছিল, সব মিলিয়ে দুশো সাতায় টাকা পাওয়া গেছে। আমি জনদুই কনেষ্টবল নিয়ে টহল দিতে রাস্তায় বেরিয়েছিলাম। ইতিমধ্যে রাস্তার আলো সেল নিচে। এদিক ওদিক টর্চ ফেলতে ফেলতে আসছি। গিরিশ পার্কটা সামান্য ছাড়িয়ে একটা হেলেভাজাওয়ালা কার্বাইড ল্যাম্প জ্বেলে বিক্রি করছিল, তার সামনে দেখি এই ছেলেটি হাতদিয়ে নিজের একটা পকেট চেপে রেখে সন্দেহ জনক ভাবে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে আবার একটু একটু হাঁফাচ্ছেও। আমাদের দেখেই একেবারে চম্পট উঠল। সন্দেহ হতেই চ্যালেঞ্জ করলাম। আর সঙ্গে সঙ্গেই ছোকরা এমন দৌড় লাগাল, সে আর কি

বলব মশাই! দুটো কনেষ্টবল আপ্রাণ তাড়া করে চিৎপুর সেরিয়ে গণেশ টকির কাছে অনেক কষ্টে ছোঁড়াটাকে ধরতে পেরেছে।" তরুণের আর বাক্যস্ফূর্তি হোলনা। সে হাঁ করে রইল। সমস্তটাই তার কাছে স্বপ্নের মত ঠেকছিল। ইনস্‌পেক্টার জীবনবাবু অতঃপর তরুণকে বললেন, "তরুণবাবু একবার দয়া করে আমার সংগে বারান্দায় চলুন, আপনার সংগে আরো কিছু কথা আছে। আর শোন হে ছোকরা, তুমি ততক্ষণ কানধরে পকাশবার ওঠ বোস কর।" চোংগা প্যান্ট পরা ছেলেটি বিনা বাক্যব্যয়ে তৎক্ষণাৎ কান ধরে উঠ বোস করতে লাগল। তরুণ হতবুদ্ধি অবস্থায় ইনসপেক্টারের পিছু পিছু বারান্দায় এসে দাঁড়াল।

ইনসপেক্টার চাপা গলায় তাকে বললেন—"দেখুন আপনাকে একটা অনুরোধ করতে চাই, যদিও আমি নিজেই বুঝতে পারছি সেটা কতদূর অসংগত।" তরুণ হতভম্ব হয়ে বললে—"অনুরোধ?" ইনসপেক্টার বললেন—"আজ্ঞে হ্যাঁ। যে ছেলেটিকে ধরেছি, সে এই পাড়ারই ছেলে। আমি ওকে ওর শিশুকাল থেকেই দেখে আসছি। ভদ্র পরিবারের ছেলে। মশাই বলব কি, নীচু ক্লাশে প্রত্যেকবার ফেল করেও হোত কিন্তু বড় হবার সাথে সাথে বাড়ীর অত্যধিক আদর অনবরত সিনেমা দেখা, কুসংসর্গ ইত্যাদির জন্য ছেলেটি একেবারে বিগড়ে গেল। কিন্তু সত্যিকথা বলতে কি যত বাঁদরামিই শিখুক না কেন, টাকা লুট করাটা আজই প্রথম। আপনি বুঝতেই পারছেন আমি কি বলতে চাইছি।" তরুণ একটা মস্ত হাঁ করেছিল। সেই অবস্থাতেই সে কোন রকমে উত্তর দিল—"আজ্ঞে কিছুই তো বুঝতে পারলাম না।" ইনেসপেক্টারের মুখ ঈষৎ লাল হয়ে উঠল, তিনি বললেন—"কিছু মনে করবেন না, ইয়ে দেখুন—এ ছেলেটি মুক্তি পেলেই আমি খুশী হব।"

তরুণ বলে—"আপনি আমাকে কি করতে বলেন?" ইনেসপেক্টার বললেন, "দেখুন আজ রাতে যা হয়েছে, তা ভুলে যান। আপনার টাকাগুলো আমি আপনাকে ফেরত দিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু দয়া করে ছেলেটির বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ দায়ের করবেন না। আমি ছেলেটিকে খানিকটা শাসন করে দেব। তারপর কালকে তার বাবা-মার সংগে দেখা করে তাদের আজকে রাতের ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলব। ভবিষ্যতে ছেলেটি যাতে আর কুপথে না যায় সেদিকে আমি নিজেও সজাগ দৃষ্টি রাখব। আমি যদিও জানি যে ছেলেটিকে ছেড়ে দেওয়া ন্যায় কাজ হচ্ছে না, তবুও একবার ভেবে দেখুন এখন যদি ওকে জেলে পাঠান হয় তাহলে ওর ভবিষ্যৎ জীবনটা নষ্ট হয়ে যাবে। আমার তো মনে হয় এখনও ওর ভাল পথে ফেরার সময় আছে। কিন্তু একবার যদি এই অল্প বয়সেই জেলে যায় তবে জাতের মধ্যে ছেলেটির ভবিষ্যত জীবন তো নষ্ট হবেই, উপরন্তু চিরকালের জন্য একটা সমাজ-বিরোধী পাপ আত্মার সৃষ্টি হবে। তরুণবাবু আমার মত আমি জানালাম। এ ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার অধিকার কেবল আপনারই আছে।"

তরুণ এমন আনন্দ অনুভব করল যে সে আরেকটু হলেই চেঁচিয়ে হেসে উঠছিল। সে বলে উঠল, "আরে নিশ্চয়—সে কথা আবার বলতে! ছেলেটির এই রকম মারাত্মক ক্ষতি আমি করতে চাই না।"

"কখনই না। এমন কি আমি তো নিশ্চিত জানি যে, এই ছেলেটি আমার টাকা—ইয়ে থাকুক, ইনেসপেক্টার, আপনি যা বললেন আমি তাই করব, আনন্দের সংগেই করব।"

ভালো মানুষ ইন্সপেক্টারটির প্রশান্ত মুখে আনন্দের হাসি ফুটে উঠলো। তিনি তরুণের হাতে দু'শো পঞ্চাশটি টাকা দিয়ে নমস্কার করে বললেন—"তবে আর আপনাকে বিরক্ত করবনা। অনেক রাত হয়েছে।" তরুণ টাকাগুলো নিয়ে আচ্ছন্নের মত তার বাড়ীতে ফিরে এল। এ টাকা গুলো কোথা থেকে কেমন করে উপস্থিত হলো সে কথা সে কোন ক্রমেই বুঝে উঠতে পারছিল না। বলা বাহুল্য যে টাকাগুলো নিয়ে ফিরে আসতে তার বাড়ীতে সেদিন আনন্দের হাট বসে গেল।

পরের দিন কিন্তু ভোর থেকেই তরুণের মন অস্বস্তিতে ভরে উঠল। সকালে সে কোন কাজেই মন বসাতে পারল না। অফিস যাওয়ার আগে সামান্য দুটি ভাত খেয়েও তার কেমন বমি বমি লাগতে লাগল। এমন কি রাইটার্স বিল্ডিং যাওয়ার পথে সারাটি পথ সে গত রাতের হতভাগা ছেলেটির কথাই ভাবতে লাগল। আর কেউ জানে বা না জানে তরুণ তো ভাল মতই জানে যে, সে আড়াইশো টাকা ছেলেটির কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে পুলিশ তরুণকে দিয়েছে—সে টাকা ছেলেটারই, তার নয়। তার টাকা তো জুয়ার আড্ডায় হজম হয়ে গেছে। হয়ত বা ছেলেটার বাড়ীর লোক কোন কাজে এই টাকাটা দিয়েছিল। হয়ত বা এটা তাদের বাড়ী ভাড়ার টাকা। পারিবারিক চিকিৎসকের ওষুধের মাসিক দাম দিতে ছেলেটা ডাক্তারখানায় যাচ্ছিল ও নিতান্ত অদৃষ্ট মন্দ বলে, নিরপরাধ হওয়া সত্ত্বেও এই বাঁদরে পোষাক দেখে পুলিশ সন্দেহ ক্রমে ধরেছে। অথবা এও তো হতে পারে, ছেলেটির বাড়ীর অবস্থা খুবই খারাপ, মা তাকে তাঁর কয়েকটা গয়না দিয়ে ছিলেন বিক্রি করার জন্য। স্যাকরার দোকানে বিক্রি করে টাকাটা নিয়ে ফিরবার সময় আলো নিতে গেল দেখে, একহাতে পকেট সামলাতে এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে আসছিল, তখন পুলিশ সন্দেহ ক্রমে ধরে ফেলেছে।

এই সমস্ত ভাবতে ভাবতে তরুণ উদ্‌ভ্রান্ত অবস্থায় অফিসে পৌছল। নিজের পরিচিত আসনে বসেও কোন কাজে মন দিতে পারলনা। বার কতক বাথরুমে গিয়ে মাথায় জল থাবড়ে এল। কিন্তু তাতেও বিশেষ কিছু উপকার হোল না। মাথাটা ক্রমশঃ ভার ভার হয়ে উঠতে লাগল। বেলা বারোটা নাগাদ তরুণ একেবারে ক্ষেপে উঠল। মরীয়া হয়ে সে স্থির করলে অফিস থেকে থানায় ফোন করে অফিসার জীবনবাবুকে সমস্ত ব্যাপারটা জানিয়ে দেবে। তার অদৃষ্টে যা ঘটে ঘটুক—যার যার অন্যায়কে প্রশ্রয় দেবেনা। এই মনে ভেবে তরুণ দৃঢ় পদক্ষেপে ফোনের কাছে এসে দাঁড়াল। সবে ডায়ালটি করতে যাচ্ছে, এমন সময় তার সহকর্মী রবীন বিমর্ষ মুখে সেই ঘরে ঢুকল। তার কপালে ও গালে স্টিচিং প্লাষ্টার লাগানো। মুখের আরও দু এক জায়গায় কালশিটের দাগ। তরুণ তাকে দেখে ফোন করা বন্ধ রেখে সবিস্ময়ে জিজ্ঞেস করলে, "কি ব্যাপার রবীন? কি হয়েছে?"

রবীন তরুণের কাছে এসে তিক্তস্বরে ফিস্ ফিস্ করে বললে—"আর বোলনা, দারুণ খারাপ ব্যাপার। কাল রাত্তিরে তুমি যেবে গিয়ে আড্ডা থেকে বেরিয়ে এলে, খেলাটা বেশ জমে উঠেছিল কিন্তু তারপর কিছুক্ষণ খেলতেই থানায় আলো সেল নিতে। বেশ কিছুক্ষণ আমি কি করব অগত্যা ঐ পর্যন্তই খেলা রেখে যে যার বাড়ীর দিকে রওনা হলাম। আমি সেন্ট্রাল অ্যাভেন্যু ক্রস করে মেই গিরিশ পার্কের কাছে এসেছি, অমনি একটা লোক অন্ধকারের মধ্যে অতর্কিতে আমাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিল, তারপর আমার পকেট থেকে হ্যাচকা টান মেরে টাকা

শুনো নিয়েই দৌড় লাগালে—মুখখানা কি রকম আঁচড়ে দিয়েছে দ্যাখ। অন্ধকারে যেন মনে হল ওণ্ডাটা ছোকরা—বেশী বয়স নয়। কিন্তু তার মুখটা দেখতে পেলুম না, ঠিক মাছের মত পিছলে পালাল। কাল দুশো সাতান্ন টাকা ছিনতেছিলুম, সব গেল।" তরুণ একটা মস্ত হাঁ করেছিল, কোন রকমে নিজেকে সামলে জিজ্ঞেস করলে—"পুলিশে খবর···ইয়ে জোড়াসাঁকো থানায় খবর দিয়ে ছিলে?"

রবীন ক্ষিপ্তের মত খেঁকিয়ে উঠে জবাব দিলে—"লাভ কি? আমি তো চোরটার মুখটাই দেখতে পাইনি। ঐ রকম ওণ্ডা কলকাতায় কত লাখ আছে। পুলিশে রিপোর্ট করে লাভ তো কিছু নেই উপরন্তু অনর্থক বরবাদিগী প্রশ্নের পর প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে একেবারে জেরবার করে দেবে। পুলিশের কাজ কর্ম আমার জানা আছে। ভাত কাপড়ের কেউ নয়, কিল মারবার গোঁসাই।"

তরুণের মুখের হাঁ'টা আস্তে আস্তে বুজে আসছিল। সে আর কালবিলম্ব না করে উত্তর দিলে—"ঠিকই বলেছ। পুলিশে খবর দিয়ে কোন লাভই নেই—অনর্থক ঝামেলা। এটা লাখ কথার এক কথা বলেছ। নিজের সিটে ফিরে আসতে আসতে তরুণ অনুভব করলে যে তার খুব খিদে পেয়ে গেছে। টিফিনে ভরপেট খাওয়ার সংকল্প করে সে কাজে মন দিল। অনেক কাজ জমে আছে—সকাল থেকে কোন কাজই হয়নি। আর হ্যাঁ পরশু রবিবার, ঐ দিন বাড়ীশুদ্ধ সকলে সিনেমা গেলেও মন্দ হবে না। সমস্যা কিছুদিন থেকেই ভাসিয়ে দিচ্ছিল। তরুণের কলম তরতর করে এগিয়ে চলল।

কি রেখে এলুম

আজ গাঁয়ের দিকে যাত্রা করেছি পিছনের ঘাটে কি দেখে এলুম, কী রেখে এলুম, ইতিহাসের কি অকিঞ্চিৎকর উচ্ছিষ্ট সভ্যতাভিমানের পরিপূর্ণ স্তূপ। কিন্তু মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ, সে বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত রক্ষা করবো। আশা করব মহাপ্রলয়ের পর বৈরাগ্যের মেঘ মুক্ত আকাশে ইতিহাসের একটী নির্মল আত্মপ্রকাশ হয়তো আরম্ভ হবে এই পূর্বাচলের সূর্যোদয়ের দিগন্ত থেকে। আর একদিন অপরাজিত মানুষ নিজের জয়যাত্রার অভিযানে সকল বাধা অতিক্রম করে অগ্রসর হবে তার মহৎ মর্য্যাদা ফিরে পাবার পথে।

রবীন্দ্রনাথ

—মৃত্যুর তিনমাস আগে লিখিত

চিত্র বিচিত্র

মৃত্যুঞ্জয় ভরদ্বাজ

ইন্টারপোলের আর এক কাহিনী—

গত কার্তিক সংখ্যা গল্প-ভারতীতে আমেরিকার আন্তর্জাতিক গোয়েন্দা প্রতিষ্ঠান ইন্টারপোল-এর কার্যক্রমের একটি কাহিনী পরিবেশন করেছিলাম।

এ সংখ্যায় আর একটি কাহিনী লিখলাম।

এটি একেবারে হাল আমলের, অক্টোবর মাসের ঘটনা।

এবারকার নাটকের যবনিকা উঠল রাজধানী দিল্লীর সেরা হোটেল অশোকার রিসেপ্‌সন্ হলের সামনে। রাত তখন দ্বিতীয় প্রহর।

প্রবেশ করলেন এক সুশ্রী সুবেশ ইউরোপীয় যুবক। ক্ষিপ্র তার গতি, প্রাণোচ্ছল চালচলন, পরিপূর্ণ কেতাদুরস্ত।

নাম, এন. সি. ডি বার্মিংহাম। ইংরাজ। বয়স ত্রিশ।

আসছেন লোজা এরোড্রোম থেকে। বিশ্বভ্রমণের টিকিট পকেটে।

পেশা? তিনি কেউকেটা নন। একটি শীতাতপনিয়ন্ত্রণ-প্রতিষ্ঠানের তিনি ম্যানেজিং ডিরেক্টর। ইংলণ্ড এবং আমেরিকায় তাঁর প্রতিষ্ঠানের একাধিক শাখা আছে। বর্তমানে তিনি আমেরিকা থেকে আসছেন। উদ্দেশ্য, এদেশে একটি শীতাতপনিয়ন্ত্রণ-প্রতিষ্ঠান খুলবেন। দু'চার কোটি টাকা লগ্নী করতে তাঁর প্রতিষ্ঠান প্রস্তুত।

ভ্রমণের সময় বার্মিংহাম বেশি মালপত্র সঙ্গে নেওয়া পছন্দ করেন না। তাঁর সঙ্গে আছে একটি ড্রেসিং গাউন, গোটা দুইতিন পায়জামা, দাড়ি কামানর ক্ষুর আর একটি টুথ ব্রাস। ব্যস। আর কি চাই?

সবচেয়ে ভাল ঘর তাঁর চাই। দৈনিক ৫০৲ টাকার ঘর, তাঁর একদিনের বেশি পছন্দ হল না। পরদিন সকালে তার বদলে দৈনিক ৭০৲ টাকার একটি দু'ঘরযুক্ত সুইট নিলেন।

তারপর বেরুলেন বাজারে। চারহাজার টাকা মূল্যের পোষাক পরিচ্ছদ কিনলেন দিল্লীর এক বিখ্যাত দোকান থেকে। তাঁর পরিচয় পেয়ে দোকানের মালিক বিগলিত। নগদ টাকা তো নেই। চেক দিলেন বার্মিংহাম। সসম্মানে চেক গ্রহণ করলেন দোকানের মালিক।

তারপর বার্মিংহাম গেলেন দিল্লীর সরকারী দপ্তরে। সেখানে বড় বড় অফিসরদের সঙ্গে তাঁর পরিকল্পনা সম্বন্ধে আলোচনা করলেন।

হোটেলে ফিরে বার্মিংহাম মদের অর্ডার দিলেন। সন্ধ্যার সময় তাঁর এক বান্ধবী আসবেন। তাছাড়া আসবেন গণ্যমান্য সরকারী কর্মচারীরা।

হোটেলের মাসিক নিয়ম অনুযায়ী টাকা চাইলেন। হেসে বললেন বার্মিংহাম, কোন চিন্তা নেই। তাঁর টাকা আসছে। অনেক টাকা। টাকা এলেই সব শোধ করে দেবেন।

এদিকে এমন একটা খবর এলো যার জন্যে ভারতের প্যান-অ্যাম এয়ার লাইন্স-এর কর্তা বিচলিত হলেন। সিডনি থেকে বার্মিংহাম একটি বিশ্ব ভ্রমণের টিকিট কিনে ষোলো হাজার টাকার যে চেক দিয়েছিলেন তা ব্যাঙ্ক থেকে ফেরৎ এসেছে, ব্যাঙ্ক জানিয়েছে সে চেকখানা একেবারেই বাজে।

তারপরেই নাটকের দ্বিতীয় অঙ্ক সুরু হল।

দিল্লী পুলিসের কাছে ঘন ঘন যেতার বার্তা আসতে লাগল।

তার পাঠাচ্ছে, আমেরিকার আন্তর্জাতিক গোয়েন্দা প্রতিষ্ঠান—ইন্টারপোল।

চমকপ্রদ খবর।

বার্মিংহামের আসল নাম নরি ক্রক। সে অক্সফোর্ডের গ্রাজুয়েট। ইংলণ্ডে একটা বড় ফার্মে চাকরি করত। ছ'মাস আগে সে-চাকরি ছেড়ে সে নিরুদ্দেশ হয়।

তারপর সুরু হয় তার বিশ্ব পরিক্রমা।

প্রথমে পশ্চিম জার্মানি, তারপর পর্তুগাল, রোডেসিয়া এবং বেলজিয়া।

এই সব দেশে কিছুদিন তার "কাজকর্ম" চালাবার পর সে প্রত্যেকবারেই শেষ পর্যন্ত ধরা পড়ে এবং তার শাস্তি হয়।

তার ইতালী অভিযান কিছুদিন পর্যন্ত সাফল্য মণ্ডিত হয়। তারপর ইতালী সরকার তাকে দেশ থেকে বিতাড়িত করেন।

আসলে নরী ক্রক একজন আন্তর্জাতিক ঠগ। তার উদ্ভাবনের কায়দায় নানাদেশের সরকারকে পর্যন্ত সে ঠকিয়েছে।

ইন্টারপোল বরাবরই তার গতিবিধির ওপর লক্ষ্য রেখেছে এবং আঠারো মাস আগে তার নামে হুলিয়া বার করেছে। শেষ পর্যন্ত ইনটারপোল খবর পেয়েছে, নরী ক্রক দিল্লীতে পৌঁছেচে।

দিল্লী পুলিশ সক্রিয় হল।

সন্ধ্যায় নরী ক্রক তার নবলব্ধ বান্ধবীকে অভ্যর্থনা করবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে, এমন সময় বান্ধবীর পরিবর্তে এলো পুলিশের একজন বড়কর্তা।

নরী ক্রক চালান গেল দিল্লী হাজতে। ইন্টারপোলের বিশ্ববিস্তৃত জাল টেনে তুলল আর একটি আন্তর্জাতিক প্রতারককে।

এলিজির মর্মকথা

Thmas Gray-র Elegy কবিতাটি বিশ্ববিদিত।

কিন্তু গ্রাম্য সমাধিক্ষেত্রে বসে লেখা এই ভাবসমৃদ্ধ কবিতাটির পিছনে যে একটি করুণ কাহিনী আত্মগোপন করেছিল তা এতদিন জানা যায়নি। কেউ কল্পনাও করেনি যে সেই কবিতাটির পিছনে লুকিয়ে ছিল একটি মানুষের জীবনের এক করুণ ট্রাজেডি।

প্রকৃতপক্ষে সে ট্রাজেডি এক হত্যাপরাধের রহস্য।

এই হত্যার সংবাদ জনসাধারণ জানতে পারেনি কোনদিন।

আইনের কাছে সেই অপরাধের বিচার হয়নি।

প্রায় দু'শো বছর আগেকার কথা।

এক স্ত্রী তার স্বামীকে বিষ দিয়ে মারলে তারপর তার প্রণয়ীকে বিয়ে করলে।

তাদের একটি ছেলে ছিল। সে তার মায়ের এই নৃশংস দুষ্কর্ম সইতে পারলে না। হ্যামলেটের মত সে পাগল হল না বটে, কিন্তু তার মন ভেঙে গেল, শরীরও। মনে মনে গুমরে গুমরে ছেলেটি মারা গেল।

সেই হতভাগ্য যুবকের নাম রিচার্ড ওয়েস্ট।

তখনকার দিনে কবি হিসাবে ওয়েস্ট খ্যাতি অর্জন করেছিলেন সামান্য নয়। অনেকেই তাঁকে ভালবাসত। বহুলোকের প্রিয়পাত্র ছিলেন তিনি।

মৃত্যুর আগে ওয়েস্ট তাঁর জীবনের গোপনীয় মর্মান্তিক বেদনার কথা জানিয়েছিলেন তাঁর এক বন্ধুকে। তাঁকে শপথ করিয়ে নিয়েছিলেন, ওয়েস্ট-এর সেই গোপনীয় বেদনার কাহিনী বন্ধু যেন তাঁর কাছে কোনদিন প্রকাশ না করেন।

সেই বন্ধুটিও ছিলেন তখনকার দিনের এক উদীয়মান কবি।

বাস্তবজীবনে হ্যামলেট নাটকের পুনরাবৃত্তি দেখে ওয়েস্ট-এর সেই কবি-বন্ধু মর্মাহত হয়েছিলেন কম নয়।

বন্ধুর কাছে গোপনীয়তার যে শপথ করেছিলেন তার খেলাপ তিনি করেন নি বটে কিন্তু তাঁর এক বিখ্যাত কবিতার শেষে তিনি তাঁর অন্তরের বেদনাকে রহস্যময় ভাষায় প্রকাশ করে যেন বন্ধুকৃত্য সমাপন করেছেন বলে মনে হয়।

সেই প্রসিদ্ধ কবিতার শেষে সমাধি-কাব্যের যে অংশটুকু পাওয়া যায় তা পড়লে মনে হয় যেন, কোন এক রহস্যময় বেদনার আঘাতে এক যুবকের জীবনদীপ অকালে নির্বাপিত হয়েছে।

কবিতাটির মধ্যে ওয়েস্ট-এর নাম অবশ্য কোথাও নেই। নীরবতার অঙ্গীকার শেষ লাইন-গুলিতে যেন রহস্যাকৃত করেছে :

No farther seek his merits
to disclose
Or draw his frailties from
their dread abode··· ইত্যাদি।

সম্ভবত উক্ত কবিতার লেখক কবিতাটি প্রকাশ করবার কোন বাসনা পোষণ করেন নি।

হোরেস ওয়ালপোল নামে সাহিত্যিক সেই কবিতাটি আবিষ্কার করেন এবং তাঁর বন্ধুদের কাছে সমগ্র কবিতাটি প'ড়ে শোনান।

কিছুদিনের মধ্যে পাঠকমহল জানতে পারে যে, সমাধিক্ষেত্রে লেখা এলিজি নামক কবিতাটির বিলাপী লেখক হচ্ছে টমাস গ্রে।

তারা কেউই অবশ্য কবিতার শেষ লাইনগুলির নেপথ্যে মৃতবন্ধুর প্রতি কবির মর্মব্যথার যে প্রকাশ আছে সে-খবর জানতে পারে নি।

———

বার্ট্রাণ্ড রাসেলের ধর্মচিন্তা

চন্দন ভৌমিক

টিউলিপ, ড্যাফডিল, আর অকিডে ভরা ইংলণ্ডের ওয়াই উপত্যকায় সেদিন দুঃখের বন্যা ব'য়ে গেল। অ্যাম্বারলির জমিদার গিন্নী মারা গেলেন। মারা যাবার আগে ব'লে গেলেন—'আমাকে যেন গির্জার জমিতে কবর দেওয়া না হয়; আমি আমার উঠোনেই থাকতে চাই।' অদ্ভুত খেয়াল। মাত্র এক বছরের ব্যবধানে অ্যাম্বারলির জমিদারও মারা গেলেন। তিনিও একই ইচ্ছা প্রোথিত ক'রে গেলেন—আমার স্ত্রীর পাশেই যেন আমার কবর হয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইউরোপে এরূপ গির্জা-নিরপেক্ষ চিন্তাধারা ছিল বিরল। শুধু বিরল নয়, বিদ্রোহাত্মকও বটে। লর্ড অ্যাম্বারলি মাত্র কুড়ি বছর বয়সে নিশ্চিত হ'য়ে যে তিনি খৃষ্টান নন, এবং বড়দিনের দিনও গির্জায় যেতেন না।

লর্ড ও লেডী অ্যাম্বারলির পুত্র বার্ট্রাণ্ড রাসেল বাবা ও মার এই ধর্ম-নিরপেক্ষ চিন্তার উত্তরাধিকারী।

মাত্র তিন বছর বয়সে বাবা মার মারা যাওয়ায় প'রে ঠাকুর্দা ও ঠাকুমা তাঁকে দেখাশোনার ভার গ্রহণ ক'রেন। রাসেল সেখানে শিক্ষা পেতে লাগলেন—'যিশু ঈশ্বরের প্রিয় পুত্র; তাঁহাতে আস্থা রাখ; তিনি তোমাদিগকে তাঁহার কাছে পৌঁছাইয়া দিবেন।' রাসেল অনুমোদিকীতে ঠাকুমা একখানা বাইবেল উপহার দিলেন রাসেলকে। বইটার প্রথম পাতায় লিখে দিলেন বাইবেলের কয়েকটা প্রসিদ্ধ উক্তি—"Thou shalt not follow a multitude to do evil." "Be strong, and of a good courage, be not afraid. neither be thou dismayed; for the Lord, thy God is with thee whither soever thou goest."

মতানুসারিক অর্থে ধর্মে বিশ্বাসী না হ'লেও বাইবেলের উপদেশগুলো রাসেলকে অনেকখানি প্রভাবান্বিত ক'রেছিল। সেই সময় আরও একজন লোক রাসেলের বর্ণীয় জীবনে প্রভাব বিস্তার ক'রেছিলেন; তিনি হ'লেন রাসেলের গৃহশিক্ষক। দু'জনের ভাব বেশ জমে উঠেছিল। কিন্তু বেশীদিন এই গৃহশিক্ষকের সান্নিধ্য তিনি পাননি, কারণ মাত্র কয়েক মাস পরেই নাস্তিকতার অপরাধে রাসেলের ঠাকুর্দা তাঁকে বিতাড়িত ক'রেন।

আঠার বছর বয়স পর্যন্ত ধর্ম সম্বন্ধে স্বীয় মত গঠনের পরিপূর্ণ সুযোগ কোন সময়ই তিনি পাননি। তাই তিনি নিজেই ব'লেছেন—"Until the age of eighteen, I continued to believe in a Deist's God ..." অর্থাৎ ধর্ম-নিরপেক্ষ ভগবানে বিশ্বাসী ছিলেন তিনি। ধর্ম-নিরপেক্ষ ঈশ্বরের সৃষ্টি মানুষের বিস্ময় থেকে। ব্রহ্মাণ্ডের বিশালতা ও বৈচিত্র্য সম্বন্ধে আমাদের সম্যক পরিচয় ঘটে তখনই, যখন আমরা নিজেদের জীবনযাত্রার সঙ্গে সমস্ত বিশ্বের গতি ছন্দের তুলনা করি। যেমন, রাত্রির ঘোর আকাশের গায়ে যে অসংখ্য তারার মেলা ব'সে, তা' এক অচিন্তনীয় phenomenon ব'ললে নিশ্চয়ই বেশী ব'লা হবে না। বেশীর ভাগ তারাই নাকি পৃথিবীর থেকে লক্ষ, কোটি গুণ আয়তনে বড়। আরও অসংখ্য তারা নাকি আমরা সবচেয়ে শক্তিশালী দূরবীনের সাহায্যেও দেখতে পাই না। তাহলে আশ্চর্য্য লাগে

যে এই কোটি গ্রহ, উপগ্রহ, তারা, নক্ষত্র ঠিক সময়েই আকাশে উঠে, আবার ভোর হ'লে অস্ত যায়। বর্ষা আসন্ন হয়, ব্যাঙ ডাকে; বসন্তের প্রারম্ভে কোকিল গান গায়; বাতাস থেকে অক্সিজেন নিয়ে প্রাণী জীবনধারণ ক'রে; বীজ পুঁতলে গাছ হয়।—এই সব অমোঘ নিয়মের পরিচালক কে বা কোন শক্তি? নিয়ম কখনই হঠাৎ সৃষ্টি হ'তে পারে না, বিধায়ক নিশ্চয়ই থাকবে। কার্য হ'লে কারণ নিশ্চয়ই থাকবে।

এখানে রাসেল 'First-cause' বা 'প্রথম-কারণ' যুক্তির অবতারণা ক'রেছেন। প্রথম প্রাণ-সৃষ্টি প্রথম জীব-কোষের জন্ম, প্রথম পরমাণু কি রকমে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে মূর্ত হ'য়ে উঠল—রাসেল আঠার বছরে এ'সব প্রশ্নের সমাধান ক'রতে পারেননি। তাই তিনি বিশ্বাস ক'রতেন—ধর্ম-নিরপেক্ষ ভগবান নিশ্চয়ই আছে।

কিন্তু তাঁর সমস্ত ধারণা ব'দলিয়ে গেল ১৮২০ সালে, John Heart Mill-এর 'Autobiography' পড়বার পরে মিলের একটা কথা তাঁর মনে গভীরভাবে রেখাপাত ক'রল—"My father taught me that the question "who made me?" can not be answered since it immediately suggest the further question "who made God?" যখনই আমরা ভগবানের অস্তিত্বকে স্বীকার করি, তখন এ'কথাও আমরা অন্তভাবে স্বীকার করি যে এমন একদিন ছিল যখন ভগবানের অস্তিত্ব ছিল না। তা হ'লে প্রশ্ন এসে যায়—'ভগবানের সৃষ্টি কি ক'রে হ'ল?' রাসেলের মতে এখানেই First-cause যুক্তির অযৌক্তিকতা বা fallacy। তিনি ব'লেছেন—"If everything must have a cause, then God must have a cause."

দৃঢ়ভাবে তিনি নিজেকে অখৃষ্টান ব'লে ঘোষণা ক'রেছেন। যীশুখ্রীষ্টের বাণীকে অস্বীকার ক'রেছেন। শুধু তাই নয়, তাঁর অস্তিত্বেও সন্দেহ প্রকাশ ক'রেছেন—ইতিহাসে এমন কোন ব্যক্তি ছিল কিনা নিশ্চিত ক'রে জানা যায় না। সমস্ত সংস্কার ও অনুভূতির উর্দ্ধে থেকে যুক্তির ছুরি দিয়ে তিনি কাটা কাটা ক'রে বিচার ক'রেছেন খৃষ্টধর্মকে। মধ্যযুগীয় একনায়কতন্ত্র থেকেই ভগবান সম্বন্ধে প্রথম ধারণার জন্ম। স্বাধীন মানুষের পক্ষে এ ধারণা অসম্মানজনক—ব্যক্তি স্বাধীনতা বিরোধী। তাই তিনি দুঃখ প্রকাশ ক'রেছেন—"When you hear people in church debasing themselves and saying that they are miserable sinnners···it seems contemptible and not worthy of self-respecting human beings."

তা হ'লে কি রাসেলকে আমরা নাস্তিক ব'লে রায় দেব? তিনি ধর্মের এক বিশেষ সংজ্ঞা দিয়েছেন—"The essence of religion···lies in subordination of the finite part of our life to the infinite part." অর্থাৎ ধর্মের মূলকথা হ'ল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জীবনকে বস্তু-উর্দ্ধ জীবনের নীচে স্থান দিতে হ'বে। সুক্ষ্মতর অনুভূতি ও কমনীয়তাগুলোর লালনের মধ্যেই ধর্মের একমাত্র পথ। বর্ত্তমানকালের কোন বৃহৎ সমস্যারই মধ্যযুগীয় ধর্ম-বিশ্বাস দ্বারা সমাধান হ'তে পারে না। রাসেলের মতে এ'সব সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায় হ'চ্ছে—বিজ্ঞানসম্মত চিন্তাধারা, দৃঢ়তর আত্মবিশ্বাস, বস্তুনিরপেক্ষ ভাবনা এবং অনমনীয় আন্তরিকতা।

মেনকার বিশ্বরূপ দর্শন

সরিৎ শর্মা

প্রতিদিন বিস্ময়ের চোখ মেলে দেখেছি—প্রতি মুহূর্তে নবজন্ম হয়েছে দূর পাহাড়ের। তবুও একদিন চোখ ক্লান্ত হল, মনে হল, যেন পাহাড় নয়, সৌন্দর্যের কঠিন পাহারা, মনে মনে মনের বন্দিত্ব অনুভব করে হাঁফিয়ে উঠলাম। অফিসে নোটিশ দিলাম—বদলী করো, একমাত্র সন্তানের স্বাস্থ্য এখানে টিঁকছে না।

সত্যি, প্রবাল তখন এতটুকু, পাহাড়ী দেশের ঝরনার জল ওর মোটেই সহ্য হচ্ছিল না। তবু রক্তেও আমার কিসের নেশা জানি না,—কি এক বিচিত্র পিপাসা—বদলীর পর বদলী হয়ে চলেছি এখান থেকে ওখানে, ওখান থেকে সেখানে।

ভালো লাগে, মন বসে, আবার কবে মন ওঠে! ওই পাহাড়ী দেশটাকেও কম ভালোবাসিনি। কিন্তু একদিন মন উঠল।

স্থির হল—এবার সমুদ্র!

আসমুদ্রহিমাচল পরিক্রমা হোক তবে।

সমতলের মানুষ আমি, শহর কলকাতার মানুষ, শরৎ এলে অবশ্য ফিরি কলকাতায়···ধরো ধরো আশ্বিনের সমস্ত আকাশ জুড়ে বাজে ছুটির ইসারা। দিগন্তের নীল থালে সোনা-মোড়া রোদ্দুরের তীব্রতায় ভেসে ওঠে বিমনা হলুদ-হাত মায়ের করুণ দুটি চোখ!

বদলী হয়ে গেলাম কাঁথি সাব্-ডিভিসনে, সমুদ্রের কাছাকাছি! যদি বলি সিরেই সমুদ্র দেখার জন্যে অস্থির হয়েছি, তাহলে ভুল বলা হবে। সমুদ্র দেখেছি মাত্র একটি দিন। এইটাই আমার স্বভাব—যে-দ্রষ্টব্য নিকটে পেয়েছি, তার নৈকট্য পরিহার করাই আমার ঔদ্ধত্য। কারণ সমুদ্র দেখব শুধু এই চিন্তাটাই আমাকে অস্থির করেছে দিনরাত। মনে হয়েছে নিজের ভিতরে আমিই এক সমুদ্র ইত্যাদি—আনডিজিটেড্ থাকাই ভালো···

এইখানে একটা কথা, মাফ করবেন, অকারণে নিজের সম্বন্ধে এতগুলি কথা বলে ফেলেছি। আমার বলা উচিত ছিল মেনকার কথা। যাকে নিয়ে এই গল্প। মেনকার সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দেওয়া উচিত ছিল আমার। নিজের চোখেই অপরকে দেখতে ও দেখাতে চেষ্টা করেছি বরাবর। এটাও আমার স্বভাব। নিরর্থক এতগুলি কথা বললাম নিজের তরফে। কিন্তু মেনকা হলে কি বলত? দরকার হলে মেনকা যে কিছুই বলত না নিজের পক্ষে এমন কথা নয়। বলত তবে দু-একটি কথাই হয়ত বলত। এবং সম্ভবতঃ নিজেরই অজান্তে—অত্যন্ত সহজে, সহজাত প্রত্যয়ে। আর তার সেই সামান্য কথার সামনে আমার বৃদ্ধিবা সমস্ত পৃথিবী পরিক্রমার দম্ভও স্তম্ভিত হয়ে যেত এক মুহূর্তে। গোটা গল্পটিকে তেমনি একটি কথার ভূমিকা বলে ধরা যেতে পারে।

সুতরাং মেনকার সঙ্গে আগে পরিচয় করিয়ে দেওয়া দরকার। না, আমার স্ত্রীর নাম গৌরী। মেনকা ওখানকারই স্থানীয় অঞ্চলের একটি মেয়ে। দিঘা। চাষী ঘরের মেয়ে। সন্তান একটি। ছেলের নাম আশু। আশুর বয়েস গোটা বারো হবে। স্বামী বেঁচে থাকতে এক-আধ বিঘে জমি

হয়ত ছিল, তখন অবশিষ্ট বলতে কিছুই ছিল না। স্বামী নেই, সন্তান আছে, জমি নেই বসতি আছে। ভিটেটুকু যাই যাই করে কোনোমতে রয়ে গেছে—চোত-বোশেখের শুকিয়ে আসা ডোবার তলানির মত! জানি না আজও মেনকা সেই জমিটুকু পেয়েছে কিনা, আজ তার অপরিশোধ্য দেনা 'মুনিষ' খেটে শোধ করতে পেরেছে কিনা···

না না—শরৎচন্দ্র কিম্বা বিভূতি বাঁড়ুজ্জের কোনো চরিত্র বা কাহিনীকে বিগত অতীত থেকে টেনে আনছি না আমি। মেনকার গল্প আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় বর্তমানের একটি নিখাদ সত্য কাহিনী। তবে মেনকার ভাষাটুকু নির্ভুল তুলে দিতে পারব না—এ-আমার অক্ষমতা।

আজ কারারা নাকি এক সময়ে এক জোট হয়ে কল্পিত দেনার নামে বিধবার সম্পত্তির মালিকানা ভাগ করে নেন। আইন-কানুন আমি বুঝি না, তবে মেনকাকে জিগ্যেস করে যা জেনেছি তাতে মনে হয়েছে নাবালক আশুকে ভাগের ভরসা বলে কিছু ধান ধরে দেওয়া ছাড়া আর কিছু করেনি।

—উরা তো কিছু দিলনি আমায়। বলে, তোমার আশু আগে বড় হোক। সেই বাবা, তুমি একবার দেখত!

বলে মেনকা তার ব্লাউজের সিঁট খুলে জীর্ণ একখানি কাগজ বার করে আমার সামনে মেলে ধরেছে!

দুপাঠ্য লেখা যদি বা পড়তে পারি, বুঝতে পারি না কিছুই। কোনো মতে 'হাঁ হাঁ' করে সহানুভূতি জানানো ছাড়া আর কিছু করিনি।

—আমার আশু কি পাবে, সেই বাবা!

মেনকা ছেলেকে লেখা-পড়া শেখাতে চেয়েছে, যাতে আশু পড়ে-শুনে সব বুঝতে পারে। কিন্তু ছেলের পড়াশুনোয় মন নেই বারো বছর বয়সেও বর্ণ পরিচয় হল না—এই মেনকার দুঃখ।

—সেই বাবা, ছেলে কি বলেছে শুনছনি—'আমি পড়ব নি, খেল্‌না করব, মাছের।'···উ পুকুরে মাছ ছাড়বে···

—পুকুর আছে নাকি মেনকা!

—ছিল তো বটে, তা উয় বাপের ভেয়েরা দিনছে নাই।

দুই হাতের সমস্ত আঙুলগুলো আমার মুখের সামনে ছড়িয়ে বিস্ফারিত চোখে আমার খোরাল —অনেক টাকা লাগবে।

—বাঁধা আছে, আশু তাই মুনিষ খাটতে লেগেছে।

খেতে জন-'খাটা'কে ওরা মুনিষ খাটা বলে।

চোখ মুছতে মুছতে এঁটো বাসন ক'খানা মাজতে চলে গেছে কেষ্ট সাহরে।

গৌরী বলে তরকারী ফুটছে, কিম্বা রান্না চাপিয়েছে হয়ত। মেনকা একটু চোখের আড়াল হতেই বললে—

—ওর ছেলেটা তাড়াতাড়ি বড় হয়ে একটা কিছু করলে হয়। ছোটো ঘরের খাপার মুছছ না, ওর কারারাও সব দিক থেকে সুবিধের নয়। কাগজপত্তরগুলো একটা কিছু ব্যবস্থা করে যাও না গো।

কি বলব, চুপ করে রইলাম। আপনি যদি কখনো আদালতে গিয়ে থাকেন, তাহলে নিশ্চয়ই জানেন—কতখানি খোরাল জমে তবে মামলা-মোকদ্দমায় এঁটে ওঠা যায়। মেনকার কথা কে শুনবে।

—মেয়েটার কি রকম রোগা কাঠির মত চেহারা হয়েছে দেখেছ! কথা বলতে গেলে চোখ দুটো ঠেলে বেরিয়ে আসে। কেমন হাঁপায় দেখেছ!

সত্যিই, ওর শীর্ণ চেহারাটা দেখলে ভয় করে। তার ওপর লাল ছুতোয় বাঁধা কি একটা মাদুলি তাবিজ ঝুলছে গলায়। ভিতরে ভিতরে যেন কী একটা কঠিন অসুখ পুষে চলেছে ও। সাদা থান (তবে কোনোদিন ময়লা পরতে দেখিনি ওকে) আর গৌরীর দেওয়া ব্লাউজ একটা—উঁচু চোয়ালের হাড়ের থেকে চোখের কোটর কোন গভীরে ঢুকিয়ে গেছে—কেবল তার ভিতর থেকে অস্বাভাবিক বড় বড় পাঁসাটে দুটো চোখ উদ্‌ভ্রান্তের মত তাকিয়ে থাকে।

—শোকে তাপে ওর মাথাটাও ঠিক নেই।

গৌরী বলতে থাকে, 'ওকে দুটো দিন ঘুরিয়ে আনলে বেশ হয়!

—কোনদিন শুনবে, একেবারেই বিগড়ে গেছে মাথাটা। কেবল জমি আর জমি। আর এই এক কোঁটা ছেলেটাকে বুকে নিয়ে স্বপ্ন দেখে ও—ওর সব ফিরে আসবে। দিনরাত কাজ করে, ঘুমোয় না, ক'বাড়ি কাজ করে জানে···সত্যেনবাবু, সতীশ ডাক্তার···

আমার বাসায় কাজ করার জন্যে যেদিন এল সেদিন সত্যিই ভালো লাগেনি মেনকাকে। একেই তো আমার খোকন ভুগছিল, তার ওপরে এমনি রুগ্ন চেহারার লোকের কাছে তাকে রাখতে····· কিন্তু সামনের বাড়ির সত্যেনবাবুর পীড়াপীড়িতে ওকে রাখতে হল, মেয়েটি নাকি বিশ্বাসী, অনেকদিন ওঁদের ওখানে কাজ করছে, তাছাড়া রাখলে নাকি মেয়েটির বড় উপকার করা হয়—ছেলেটিকে দুবেলা ভাত দিতে পারে·····

মেনকা ততক্ষণে আমার খোকনকে কোলে নিয়ে বুকে চেপে ধরেছে। 'তুমি 'না' কোরো না' —ছলছল চোখে বলল গৌরী।

—আমি না হয় নন্দ ডাক্তারকে দিয়ে একবার দেখিয়ে নেব ওর।

তারপর খুব বেশী দিন যায় নি। মেনকা কেমন সহজ হয়ে মিশে গেছে আমাদের পরিবারে। ওর সুখ-দুঃখের কথা জানিয়েছে আমাদের—কখনো গৌরীকে, কখনো আমাকে।

একদিন অফিস থেকে ফিরে এসে দেখি, মেনকা দাওয়ায় বসে মুখে আঁচল-চাপা দিয়ে ফুলে ফুলে কাঁদছে।

—ওর কি হয়েছে গৌরী।

গৌরীর মুখখানা থমথম করছে। বুঝলাম, একটা কিছু অঘটন ঘটেছে।

—হেই মা, আমার আওর কি হবে গো।

—আজ এতদিন ওদের মুনিষ খেটে যে-পয়সা শোধ করেছে এখন ওরা তা স্বীকার যাচ্ছে না।

—হেই বাবা, সকুর ওরা মিলনি, দিবেক নাই···

—ছেলেটাও কোথায় চলে গেছে, কাল থেকে বাড়ি ফেরেনি।

চিন্তিত হয়ে পড়লাম। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। গ্রাম ঘেঁষে। গ্রাম পেরোলে কাজু বাদামের জঙ্গল, তারপর ধু-ধু করছে বালি আর বালি—দূর সমুদ্রের বালির ঢেউ নিয়ে তৈরী হয়েছে বালির সমুদ্র। ওখানে হারালে···

গৌরী ওকে ছুটি দিয়ে দিলে। চোখ মুছতে মুছতে মেনকা উঠে পড়ল। চোখ ফেরাতেই গৌরীর অন্বিষ্ণু চোখে চোখ পড়ল। যেন আমিই অপরাধী।

—ভগবান করুন, তাদের তাদের ওর ছেলেটা ফিরে আসুক, তোমার তো চার-পাঁচ দিনের ছুটি পড়ছে—মেয়েটাকে এবার পুজোয় দুদিন ঘুরিয়ে নিয়ে আসব—একটা সখ-সাধ-আহ্লাদ নেই গো। পাগল হয়ে যাবে!

যৌবতা দিয়ে সমর্থন করলাম।

তবে ব্যাপারটা আরও গড়াত যদি না ঘণ্টা দু'য়েক বাদে যেনকা লণ্ঠন হাতে এসে খবরটা দিয়ে যেত। আশুকে পাওয়া গেছে। বাস্ রাস্তার কোন্ দোকানের ওপর গিয়ে ছেলে বসেছিল। সে নাকি কলকাতা চলে যেত। অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে তবে আনা গেছে।

—যেই বাবা, সে কেমন জায়গা! সেখানে নাকি খালি সাহেবগুলান থাকে!

—হ্যাঁ তোর এই বাবুর মত সাহেব সব, গায়েছা কালিস্, গায়ছাঁয় ওর সাহের রঙ ওঠে দেখিস না।

বলেই বুকে আঁচল চাপা দিয়ে হেসে গড়িয়ে পড়ল গৌরী। খোকনও হাসল অর্থহীন হাসি!

—কিরে যাবি যেনকা? চল না—কলকাতায়, আমাদের বাড়িতে। সকলকে দেখিয়ে আনব।

—ভয় করে! উরা নাকি আটক করে কুথাকে পাঠিয়ে দেয়…

—কিসের ভয়' আমরা তো নিয়ে যাবো। কত কি দেখার আছে…

—হ, লোকে যায়, তা এ-গাঁয়ের দশটা মত ভবেন বেটে?

—তুই চল না, নিজের চোখেই দেখবি।

—আশুও কতবার শুধিয়েছে…

—আশুকেও নিয়ে চল্।

—অনেক টাকা লাগবেন কেনে…

—না, না, টাকার কথা তোকে ভাবতে হবে না।

—ভয় করে গো।

—কিসের ভয়।

—যদি আর ফিরতি না পারি গো, ওই বেত্তরদের ব্যাটা তো আর ফিরলি নি গো!

—আঃ, তুই তো আমাদের সঙ্গে যাবি।

—তা, আশুর জমিটো…

—আমরা তো ছুটি ফুরোলেই ফিরে আসব।

—আচ্ছা। আশুকে শুধোই!

সহজ হাওয়া বইল: যেনকা ফিরে গেল। ঘণ্টা গেল—আশু নাকি বলেছে, 'পড়ুয়া দিলনি, কিছক জমি আমি আধায় করবই।'—এবার আর ওদের কাছে মুনিষ খাটবেক নাই…।

দূর থেকে সায়েবের কালো পাঁড় ভুকে ফোনাকিগুলো লণ্ঠনের সঙ্গে দুলতে লাগল হাওয়ায় হাত ছানিয়ে।

আশু কথা দিয়েছে, সে কোথাও চলে যাবে না, তবে মুনিষের বা ঐ রকম কাজে লাগবে সে, এখন কলকাতা যাবে না। বাবুরা যদি যেনকাকে নিয়ে যেতে চায় খুব ভালো কথা—এই সুযোগে রেখে নেওয়াই ভালো, কেননা 'পুণ্যি করলে সগ্‌গে যাওয়া যায়', কিন্তু কলকাতা যেতে গেলে শুধু পুণ্যিতে চলে না, টাকা লাগে।' অতএব এ-দুদিন আশু রেঁধে নেবে চাট্টি।

পরের দিন সকালে এসে রাত্তিরের এঁটো বাসনগুলো গোছাতে গোছাতে মেনকা কথাগুলো জানালো গৌরীকে।

মেনকা যাবে।

বেরুবার দিন। ঠিক মুহূর্তটিতে মেনকা সহসা একহাত ঘোমটা টেনে, বগলে একটা পুঁটলি নিয়ে হাজির। হাতে একটা হ্যারিকেন।

—হ্যারিকেন কি হবে মেনকা?

—হেই বাবা, পথে আঁধার হবেক নাই!

গৌরী কোনোমতে হাসি সামলে বললে,—না তুমি ঠিকই করেছ মেনকা, আমাদের সেঁদিন ফিরতে তো রাত হবেই, তোমার বাড়ি যেতে ওটা লাগবে বৈকি।

—হই মা, লাগবে নি?

—এখন না লাগলে পথে কিনে নেওয়া যাবে'খন।

বাসে উঠে মেনকা নাকে কাপড় চাপা দিল। পেট্রলের গন্ধে বেচারার বমি আসছে। আমি করুণভাবে গৌরীর দিকে চাইলাম। সুখের চেয়ে স্বস্তি ভালো—এতে ওর শাস্তিই হচ্ছে বুঝি। আপাতঃ দৃষ্টিতে ওর ব্যাপারগুলো হাস্যকর হলেও ওর পক্ষে এর চেয়ে স্বাভাবিক আর কি হতে পারে।

খড়্গপুরে নেমেই মেনকা গৌরীর আঁচল দুঠো করে চেপে ধরল।

—আঃ কর কি মেনকা, কাপড় ছাড়ো।

এইবার গৌরী একটু বিরক্ত হয়ে উঠল।

পরক্ষণেই একটু শান্ত সহানুভূতির স্বরে বললে—তয় কি, আমরা আছি তো।

মনের অগোচর পাপ নেই। সত্যিই এইবার আমিও একটু একটু কৌতুকবোধ করতে সুরু করেছি। খোকনটাও দেখি সামনের দুটো কচি দাঁত বার করে অমন্ত পুলকে হাসছে।

প্ল্যাটফর্মে আরও ঘিঞ্জনা। পুঁটলিটি ও কারুর হাতে ছাড়বে না। অথচ গৌরীকেও সে ছাড়তে নারাজ।

—পড়ে যাবো যে মেনকা।

কিন্তু কে শুনছে কার কথা। গাড়ী প্ল্যাটফর্মে ঢুকে পড়েছে, মেনকা চোখ বুঁজে একহাতে গৌরীকে জড়িয়ে ধরে ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপছে। বকাঝকা করে কোনোমতে গাড়িতে তোলা হল। বেঞ্চে কোনোক্রমে জড়সড় হয়ে বসে রইল গৌরীকে আঁকড়ে ধরে।

—হেই মা, তুমি পড়বে কেবে, রেলের গাড়ী, আস্ত বলেচে—ভালো করে ধরে থাকিস কিন্তু হ।

আমাদের সশব্দ হাসিতে খোকা হাততালি দিয়ে উঠল।

ছাড়া'পর গাড়ী কিছুদূর যেতেই এক আশ্চর্য পরিবর্তন সহসা যেন মেনকাকে বদলে ফেলল। মেনকা যেন একা যাত্রী, নিঃসঙ্গ—নিতান্ত অপরিচিত।

বাহান্তর মাইল পথ মেনকা বুঝি নিঃশ্বাস ফেলেনি, শুধু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল জানলা দিয়ে—দূরে, বহুদূরে প্রথম শিশুর বিস্ময়ের চোখ মেলে কোন গহীন অন্তরে তলিয়ে গেল মেনকা। একটি কথা বলল না। খেল না। মাথা নাড়ল না।

ট্রেণ ছুটেছে। বাইরের সবুজ পৃথিবী থর থর নীল আশ্বিনের আকাশে ছড়িয়ে দিয়েছে মেঘের টুকরোগুলি মুঠো মুঠো হ'য়া কেনার মত। দুপুরের আকর্ষ রাদ্দুরে সোনার রাঙতায় মুড়ে দিয়েছে দিগন্তের গাছপালা। আদিগন্ত সবুজ সবুজ মাঠ নিঃশব্দে বেজে চলেছে আশ্বিনের কী এক দুরন্ত আশ্বাসে!

সাঁতরাগাছি পার হতেই মুখ ফিরিয়ে নিল মেনকা। আমাদেরও নামার প্রস্তুতি।

মেনকা নীরব দর্শক।

হাওড়ার প্ল্যাটফর্মে নামতেই কেবল বললে,

—হেই বাবা, আগুন লেগেছে নাকি গো!

আর বাইরে এসে অজস্র ট্যাক্সির ভিড় দেখে নিস্পৃহ কণ্ঠে বললে—তোমাদের এতগুলান গাড়ি।

এরপর চেষ্টা করেও পথে হাওড়ার ব্রিজ, জি-পি-ও, টেলিফোন ভবন, রাজভবন, মনুমেন্ট—কোনোটাতেই তার দৃষ্টি আকর্ষণ করা সম্ভব হয়নি। দুকানে হাত চেপে, চোখ বুঁজে বসেছিল সারাটা পথ। শুধু গৌরী দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে মাঝে মাঝে আমার দিকে তাকাচ্ছিল। আমি নীরব সহানুভূতিতে তার দৃষ্টিকে শান্ত করতে চাইছিলাম মাত্র।

যে কয়দিন কলকাতায় থাকার কথা, তা বাদ দিয়ে চতুর্থ দিনে আমাদের ফিরতে হল। কারণ মেনকা।

মেনকা উঠল না, খেল না, হেসল না। দাঁতে দাঁত চেপে তিনটি দিন পড়ে রইল। কোনো মতে দুবেলা এতটুকু চিনির জল ছাড়া কিছুই খাওয়ানো সম্ভব হয়নি। শুধু মাঝে মাঝে খোকনকে কাছে নিয়ে পড়ে থেকেছে।

ফেরার কথা ওঠা মাত্র মেনকা যেন শরীরে অসুরের বল পেল। বাঁধা পুঁটলি বগলে তুলে নিল। সুড় সুড় করে সকলকে প্রণাম করে ট্যাক্সিতে গিয়ে উঠল। এবার নিতান্ত অবহেলায়, নিতান্ত অবজ্ঞায় বলতে কি বুঝি বা পরম ঘৃণার সঙ্গে ষ্টেশন পর্যন্ত তাকিয়ে এল; গৌরীর আপ্রাণ শেষ চেষ্টা কলকাতার যাবা বিদেশী উচ্চারণে নিতান্ত ঔদাস্যে শুধু 'হ' 'হ' করে জবাব দিতে দিতে ষ্টেশনে পৌঁছুলো।

সাঁতরাগাছি পার হতেই কের সেই আমার দিনের মেনকাকে খুঁজে পেলাম। এই নিরক্ষর অসহায় প্রায় চাষী মেয়েটি যেন আমার সমস্ত স্মৃতিকে শুম্ভিত করে দিয়ে উজ্জ্বল দুপুরের এক অপরূপ অনুভূতিতে ভরে উঠল—যার নাগাল আমি কোনোদিনই পাব না পাইও নি। যেন পৃথিবী পরিক্রমার স্পর্ধা নিয়ে চলেছিলাম—আজ ওর কাছে আমার স্পর্ধিত জগতটা কত ছোটো কত বিরক্তির বোঝা বওয়ার সামিল হয়ে গেল। এ-বাহাত্তর মাইল কতবার তো পরিক্রমা করেছি।

না, আমি মেনকাকে কোনো ভিন্ন চোখে দেখিনি। কলকাতার মেয়ে প্রবালের-মা'কে আমি দেখেছি প্রকৃতির ও নগরের কত বিচিত্র পটভূমিতে। কিন্তু আমার সেরেস্তার প্রতিদিনের বাসন মাজা মেয়েটি, যন্ত্রভীরু, নগর-বিমুখ মেয়েটি যেন এক মহিমময় স্নিগ্ধ শান্তিতে পূর্ণ হয়ে আছে।

ফেরার কয়েকদিন পরে একটা ছুটির সকালে চায়ের বাটি হাতে গল্প চলেছে আমাদের। খোকা আছে মেনকার কোলে। জিগ্যেস করলাম,

—আচ্ছা মেনকা, কলকাতা যে দেখলে, কেমন লাগল।

আমার সুরে যে কৌতুক ছিল না, এমন নয়। কিন্তু মেনকাকে তা স্পর্শও করল না।

—হেই বাবা, খুব ভালো। খু-উব ভালো।

—সবচেয়ে ভালো লাগল কোনটা?—অধীর আগ্রহে গৌরী প্রশ্ন করল। মেনকার চোখ বড় বড় হয়ে জ্বলতে লাগল, তারপর এক অপরূপ স্নিগ্ধ শান্তিতে ভরে গিয়ে বললে,

—হেই গো মা, কেমন সোন্দর মাঠগুলান, আর কচি কচি ধানগুলান দুলছে, ঠিক খোকনের মত···

খোকনের গায়ে অজস্র আদরে হাত বুলোতে বুলোতে কের বললে,—আমার আগু একদিন জমিটো পাবে, অমনি ধান হবেক—আর এই খোকনের মত ধানগুলান খেলা করবে গো মা·····কচি কচি ধান।

টলটল করে জল পড়তে লাগল গৌরীর চোখ বেয়ে।

বিপর্যয়

শ্রীঅপূর্ব মণি গুপ্ত

দৈনিক সংবাদ পত্রের নিয়মিত পাঠকরা নিশ্চয় ভুলে যান নি সেবারকার মর্মন্তুদ ট্রেণ দুর্ঘটনার কথা। ঝড়ের বেগে আসছিল একসপ্রেস খানা, নিশুতি রাত্রি, যাত্রীরা কেউ বা ঘুমিয়ে কেউ বা ঢুলছে, হঠাৎ যেন লাইন থেকে ছুটে পড়লো ট্রেণখানা পাশের সাইডিংয়ে। পরমুহূর্তেই প্রলয় কাণ্ড। ত্রিশফুট নিচের খাদে ছিটকে পড়লো বিরাটকায় ক্যামেডিয়ান এঞ্জিন, সঙ্গে সঙ্গে লেপলাইয়ের বান্ডিল মত গুঁড়ো হয়ে গেল পার্শেল ভ্যান, কণ্ডাকটার গার্ডের গাড়ী এবং পরবর্তী কয়েকখানা থার্ড ক্লাস বগি। অতবড় ট্রেণখানার ঝলমলে আলো গেল নিভে ; সঙ্গে সঙ্গে হাজার কণ্ঠের আর্তনাদ।

ষ্টেশনমাষ্টার, পয়েন্টস্ ম্যান প্রভৃতি কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হোল। কেউ বললে ফিস প্লেট সরানো হয়েছে, কেউ বললে সাবোটেজ! একটা সংবাদ পত্র বিস্ময়ের সঙ্গে প্রশ্ন করলে মেন লাইন ছেড়ে ট্রেনখানা সাইডিংএ গেল কেন?

প্রায় দুবছর মামলা চলেছিল, যে সংবাদও অনেকেই জানেন। ষ্টেশনমাষ্টারের কোনও ত্রুটি খুঁজে পান নি আদালত, সুতরাং তিনি মুক্তি পেলেন। পয়েন্টস্‌ম্যান পল্টু চাটুয্যে জেল হাজতে রইলো বিচারের শেষ দিন পর্য্যন্ত শেষে সন্দেহের অবকাশে সেও মুক্তি পেয়ে গেল। আদালত রায় দিলেন দীর্ঘকাল তাকে হাজতবাস করতে হয়েছে, সেটাই তার পক্ষে যথেষ্ট শাস্তি বলে গণ্য করা যেতে পারে।

কিন্তু জেল হাজত থেকে পল্টু চাটুয্যে বাইরে বেরিয়ে দেখে পৃথিবীর চেহারা বদলে গিয়েছে। কোথায় যাবে সে? এক খুড়তুতো ভাই থাকতো উলুবেড়ের ওদিকের এক গ্রামে, সেখানে এসে, কিন্তু তাঁরা আশ্রয় দিলেন না। জেল ফেরত ছাপী লোককে বাড়ীতে রেখে সংসারের আবহাওয়া কলুষিত করতে প্রস্তুত নন তাঁরা। আদালত থেকে বেকসুর খালাস পেয়েছে? তা থাক। কিন্তু তার সর্বাঙ্গে যে কলঙ্ক ও দুর্নামের কালির দাগ লেগেছে সেটা আদালতের রায়ে মুছে যাওয়ার নয়।

মামার বাড়ী তারকেশ্বরের ওই দিকে, গেল সেখানে পল্টু। আশ্রয়দান সম্বন্ধে মামাকেও খুব উৎসাহী বলে মনে হোল না, তবে তিনি তাড়িয়ে দিলেন না। অবাঞ্ছিত অতিথি। খাও দাও থাকো এই পর্য্যন্ত। মামার চাষ বাস আছে, ঘরে ধানের অভাব নেই, সুতরাং দুবেলার আহার সম্বন্ধে কোনও অসুবিধা হোল না।

কিন্তু কয়েকদিন পরেই মাতুল লক্ষ্য করলেন পল্টুর যেন মাথার গোলমাল হয়েছে। আপন মনে বিড় বিড় করে বকে। একদিন দেখা গেল একটা বাঁশের অগ্রভাগ নিয়ে একটা হাঁচকা টান দিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো, হঠাৎ চোখ মুখের ভাবও যেন স্বাভাবিক নয়।

চিন্তিত হলেন মাতুল। কথাটা প্রকাশ করলেন স্থানীয় স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ডাক্তারবাবুর কাছে। তিনি প্রকাশ করলেন আর একজনের কাছে। এমনি করে ব্যাপারটা এতই রাষ্ট্র হয়ে গেল সারা গ্রামের মধ্যে যে পল্টুর উপস্থিতিটা সকলের কাছেই যেন আশঙ্কাজনক হয়ে উঠলো।

অবশেষে কি উপায়ে অনেক চেষ্টা ও তদ্বিরের ফলে তাকে উন্মাদ আশ্রমে ভর্ত্তি করে দেওয়া হোল, সে বিবরণ অবান্তর।

* * * *

ট্রেণ দুর্ঘটনার সংবাদ খবরের কাগজে আমিও পড়েছিলাম। কিন্তু সংবাদটুকু পড়া ছাড়া পল্টুর সম্বন্ধে কোনও কথাই আমি জানতাম না, জানবার সম্ভাবনাও ছিল না। যে কাহিনী লিপিবদ্ধ করছি সেটা উন্মাদ আশ্রমের সেক্রেটারী ললিতবাবুর কাছ থেকেই শোনা। মনোব্যাধি চিকিৎসায় তাঁর সুনাম ও খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত। মানুষের অন্তরকে তিনি চেনেন এবং সেখানকার স্বাভাবিক অস্বাভাবিকতা সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা প্রচুর। যারা উন্মাদ তারাও যে কোনও কোনও সময়ে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে সে তথ্য আমার জানা ছিল না, কিন্তু ললিতবাবু জানতেন। সুতরাং পল্টুর জীবন কাহিনী সংগ্রহ করতে তাঁর কোনও অসুবিধা হয় নি।

ললিতবাবু যে ভাবে আমার কাছে বর্ণনা করলেন, তাতে মনে হোল তিনি মনোব্যাধির চিকিৎসক না হয়ে উপন্যাস লেখক হতে পারতেন।

(২)

ষ্টেশন থেকে প্রায় আধমাইল দূরে সিগনাল কেবিন। ছোট ষ্টেশন। তারই সান্নিধ্যে কয়েকটি রেলওয়ে কোয়ার্টার্স। দুটি ঘর, বারান্দা, রান্নাঘর ইত্যাদি, ছোট একটু পাঁচিল ঘেরা উঠান তাতে কয়েকটা ফুলের গাছ। দেওয়ায় ঘেরে লাউ গাছ কুমড়ো গাছ উঠেছে ছাদের উপর।

গয়েটম্যান পল্টু ওরফে প্রফুল্ল চাটুয্যের অনেকদিন হয়ে গেল ওই একই ষ্টেশনে। জায়গাটা তার ভালই লেগেছিল, সেজন্য ষ্টেশন মাষ্টারকে অনুনয় করে বদলীর অর্ডারটা কয়েকবার বাতিল করেছিল। মাষ্টারবাবুই বলেছিলেন, বউ নিয়ে এসে ঘরসংসারে স্থির হয়ে বসো পল্টু।

বিয়ে হয়েছিল বছর তিনেক পূর্বে, তাদেরই দেশের কাছে একটা গ্রামে। কয়েকমাস পূর্বে সে স্ত্রীকে নিয়ে আসবে স্থির করেছিল। কিন্তু একটি মৃত সন্তান প্রসব করার পরে স্ত্রীর স্বাস্থ্য সেই যে ভেঙে গেল তাতে বিদেশে কোয়ার্টার্সে নিজের সংসার পাতিয়ে বসার পরিশ্রম সহ্য হবে কি না এ সম্বন্ধে শঙ্কা প্রকাশ করলেন বধূর মা এবং আত্মীয়েরা।

অবশেষে বধূ নবতারা এলো কয়েকমাস পূর্বে। শরীরের শীর্ণতা যায় নি তবে শয্যাগত নয়। কয়েকদিনের মধ্যেই গুছিয়ে নিলে নিজের সংসার।

গঞ্জের বাজার খুব বেশী দূরে নয়। ডাক্তার বিনয় ঘোষালের নামডাক আছে ওঅঞ্চলে। রোগিণীকে ভাল করে পরীক্ষা করে তিনি মত প্রকাশ করলেন রক্ত শূন্যতার চিকিৎসা বেশ কিছুদিন করা দরকার। শিশির ওষুধ পিল এবং সপ্তাহে তিনটে ইনজেকসান—তার উপর পুষ্টিকর আহারের ব্যবস্থা।

সহর অঞ্চলে হয়তো শেষোক্ত জিনিষটির ব্যবস্থা হওয়া কঠিন এবং ব্যয়সাপেক্ষ। কিন্তু পল্টু জানে এ ব্যাপারে তার কিছুমাত্র অসুবিধা নেই। অনেকগুলি দুধওয়ালা প্রতিদিন তাদের গরু নিয়ে যেতো গুখান থেকে ক্রোশ সহরে। ষ্টেশন ঘরের এক কোনে থাকতো একটা বড় বালতি, তাতে একটা ছোট গামলা দুধ ঢেলে দিয়ে যাওয়া ছিল প্রত্যেক দুধ বিক্রেতার নিত্যকর্ম। সকালের শেষ

ট্রেণ চলে গেলে দেখা যেতো সে বালতি কানায় কানায় দুধে ভর্তি হয়ে উঠেছে। সেই দুধ বিতরিত হোত ষ্টেশনে ষ্টেশনে হকের মধ্যে। সুতরাং অন্য যা কিছুর অভাব ঘটুক খাঁটি দুধের অভাব কোনও দিন অনুভব করে নি প্রতুল ওরফে পল্টু চাটুয্যে। টাটকা তরি-তরকারি এবং মাছ সম্বন্ধেও ছিল অনুরূপ ব্যবস্থা।

বাকী রইলো ওষুধ এবং ইনজেকশন। স্ত্রীকে সারিয়ে তোলবার জন্য পল্টুর চেষ্টার কোনও ত্রুটি রইলো না।

বিনয় ডাক্তারের কম্পাউণ্ডার কেদার ঘোষ পল্টুর পরিচিত বন্ধু! তাসখেলায় তার যেমন ঝোঁক তেমনি পটুতা। কেদার এসে ইনজেকশন দিয়ে যেতো নিয়মিত ভাবে, সুতরাং অসুবিধা ছিল না। আট আনা ফিঃ তেই সে সন্তুষ্ট।

ক্রমশঃ আবিষ্কার করা গেল পরিচয়ের সূত্র। কেদারের মামার বাড়ী এবং পল্টুর শ্বশুর বাড়ী একই গ্রামে পাশাপাশি। এখানে কেদার এবং পল্টু যেমন তাসখেলায় মত্ত হয়ে উঠতো, ওদিকে কেদারের মামা এবং পল্টুর শ্বশুর পাশাখেলায় দিগ্বিদিক জ্ঞান হারাতেন।

এমনি করেই দিন চলছিল। নবতারা ক্রমশঃ তার হারানো স্বাস্থ্য ফিরে পেলে। শরীরের পাণ্ডুতা চলে গিয়ে আবার দেখা গেল লাবণ্যের রেখা। নিয়মিত ইনজেকশন দেওয়ার ব্যাপারে কেদারের যত্ন ও পরিশ্রমের জন্য কেবল মৌখিক ধন্যবাদ নয়, একদিন তাকে নিমন্ত্রণ করে ঘটা করে খাওয়ানো হোল।

ডাক্তার ঘোষাল বললেন, ইনজেকশনটা এখনই একেবারে বন্ধ করা উচিত হবে না। সপ্তাহে একটা করে দেওয়া দরকার আরও কিছু দিন। বউমা তো এখন সুস্থ হয়েছেন, কাজেই তিনি যদি আমার ডিসপেনসারিতে আসতে পারেন, তাহলে তাঁর একটু বেড়ানোও হয়, ইনজেকশনটাও বিনা খরচে দেওয়া যেতে পারে।

এতে আপত্তির কিছুই ছিল না। ব্যবস্থাটা বরং ভালই বলে মনে হোল। নষ্ট স্বাস্থ্য ক্রমে ফিরে পেলো নবতারা।

এমনি করে আরও কিছুদিন গেল। ছোট কোয়ার্টার্সের উঠানে ফুটে উঠলো কৃষ্ণকলি ফুল। লাউ মাচায় ধরলো সাদা রংয়ের লাউ ফুল। সংসার জীবনের রথচক্র ধীরে ধীরে এগিয়ে যেতে লাগলো।

সেদিন রাত্রের ডিউটিতে গিয়েছে প্রতুল। আকাশজোড়া কালো মেঘে চারিদিক অন্ধকার। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎস্ফুরণ, পরমুহূর্তেই কড় কড় আওয়াজ। তার পর মুষলধারে বৃষ্টি। দুর্যোগের মধ্যে যেন প্রলয়ের সূচনা।

ডিউটি শেষ করে ভোরবেলা ফিরে এলো প্রতুল। সারা রাত্রির জাগরণে শরীর ক্লান্ত ও অবসন্ন হলেও সেটা অত্যন্ত ব্যাপার। সদর দরজাটা খোলা। কি আশ্চর্য! কিছুদিন আগেই এমনি খোলা দরজা দিয়ে একটা কুকুর রান্নাঘরে ঢুকে অনেক ক্ষতি করেছিল। তবে নবতারা একলা, দশ দিক সামলানো তার পক্ষে শক্ত।

ভিতরে গিয়েও বিস্মিত হতে হোল পল্টুকে। শোবার ঘরের দরজাটাও আধ ভেজান। জানালাগুলো বন্ধ। কোথায় গেল নবতারা—এই সকাল বেলায়?

কোথায় গো? —বউ, ও বউ—ডাকলো পল্টু।'

সাড়া পাওয়া গেল না।

জানালাগুলো খুলে দিলে। প্রভাতের সূর্যালোক এসে পড়লো বিছানার উপর। উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলো পল্টু। কোথায় গেল নবতারা?

ঘর থেকে বাইরে এলো, আবার বাইরে থেকে ঘরে।

ক্রমে বেলা হোল। পাশের কোয়ার্টারে থাকে তারই সহকারী রায় অবতার ভাগলপুর জেলার বাড়ী। তার মা জানালো কাল রাত্রের দুর্যোগে তারা সব বন্ধ করে শুয়ে পড়েছিল, কিছুই জানে না।

ব্যাপারটা ক্রমেই দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে উঠলো। ষ্টেশনে গেল পল্টু। ষ্টেশন মাষ্টার, তাঁর সহকারী, টিকিট বাবু, পার্শেলবাবু সবাই খবরটা শুনে খুবই উদ্বিগ্ন হলেন। কি ব্যাপার? কোথায় যেতে পারে নবতারা?

প্রশ্নের উত্তরটা পাওয়া গেল পুকুরের পারে। ডাক্তার ঘোষালও খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। সকালে রোগীর ভিড় অথচ কম্পাউণ্ডার কেদার ঘোষ অনুপস্থিত। কাজেই অসুবিধার একশেষ। কেদারকে বাড়ীতেও পাওয়া যায় নি। সুতরাং তাঁরও প্রশ্ন কোথায় গেল কেদার?

সর্বশরীরে একটা প্রচণ্ড শিহরণ বয়ে গেল পল্টুর। এ কি হোল? কি করে সম্ভব হোল এই অঘটন? কেদারটা শয়তান, কিন্তু নবতারা?

এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় না মনের কাছ থেকে। শেষে কি পাগল হয়ে যাবে পল্টু?

ষ্টেশন মাষ্টার বোঝালেন। পার্শেলবাবু পূজা আর্চ্চা করেন, তিনি সংস্কৃত শ্লোক আউড়ে সব কিছুর নশ্বরতা সম্বন্ধে উপদেশ দিলেন। মন দিয়ে নিজের কাজ করে যাও পল্টু। ফলাফল সেই একজনের হাতে। তিনিই ব্যবস্থা করবেন।

খুব জ্ঞানের কথা সন্দেহ নেই, কিন্তু তাতে কি মন সায় দেয়?

• • • •

প্রায় ছ'মাস পরে খবর পাওয়া গেল। দুটো ষ্টেশন পরেই যে মহকুমার সহর, সেখানেই আছে কেদার ঘোষ আর পল্টুর বৌ। খবরটা এনেছে রাহু মিস্ত্রী। তার মামার চায়ের দোকান আছে সেখানে। সেই দোকানের নিয়মিত খরিদ্দার কেদার ঘোষ। আজ সকালে সে দোকানের বাকী হিসাবের পাই পয়সা মিটিয়ে দিয়েছে। আজ রাত্রে তারা চলে যাবে। লোহার কারখানায় চাকরি পেয়েছে কেদার। সেইখানে স্থিতু হয়ে ঘর-সংসার পাতবে এবার।

স্থির হয়ে শুনলো সব কথা পল্টু। কিন্তু স্থির কি হওয়া যায়? বুকের ভিতর যেন হাতুড়ী পিটছে।

রাহু বলতে লাগলো, মুন্সী ঘরে বেশ ভাল চাকরি বাগিয়েছে শুনলাম। লোকটা তো কর্মিৎকর্মা। মামার কাছে বলতে লাগলো কেদার, গোছানো টোছানো সব হয়ে গিয়েছে, আজ রাত্তিরের এক্সপ্রেসে রওনা হবে তারা।

(৩)

হ্যালো— টেলিফোনের ঘণ্টা বেজে উঠলো সিগন্যাল কেবিনে। রাত্রি প্রায় দেড়টা।

হ্যালো—উত্তর দিলে পয়েন্টসম্যান পল্টু চাটুয্যে।

দূরের ফনট্রোল কেবিন থেকে এলো নির্দেশ। হ্যালো—থ্রি নাইনটি থ্রি আপ এক্সপ্রেস। থ্রু সিগন্যাল।

ইয়েস্—উত্তর দিলে পল্টু।

এক মিনিট পরেই আবার ক্রিং ক্রিং ক্রিং। হ্যালো। এবারে ষ্টেশন থেকে আহ্বান। স্বয়ং ষ্টেশন মাষ্টারবাবু। —কে পল্টু নাকি? হ্যালো—

হ্যালো—হাঁ।

থ্রি নাইনটি থ্রি আপ এক্সপ্রেস। থ্রু যাও।

সর্বশরীর কাঁপছে তখন পল্টুর। নবতারা—কেবার মোড়—লোহার কারখানার বিরাট অংশন ষ্টেশন—এক্সপ্রেস—মাথার মধ্যে সব একাকার। এ কি হোল? পৃথিবী কাঁপছে কেন? ভূমিকম্প হবে নাকি?

ঘটাং—পয়েন্টের হ্যাণ্ডেলে টান দিল পল্টু। সারি সারি সাজানো রয়েছে অনেকগুলি হ্যাণ্ডেল। সঙ্গে সঙ্গে দূরের একজায়গায় রেললাইনের সোনসূত্রে আওয়াজ হলো ঘটাং। দুটো লাইনের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা সংযুক্ত হয়ে গেল। দূরের সিগন্যালের লাল আলোর রং বদলে গিয়ে সবুজ হয়ে গেল।

দূরে এঞ্জিনের সার্চ লাইটের তীব্র আলো দেখা যাচ্ছে। ক্রমে নিকট থেকে নিকটতর। আলোয় চকচক করছে লাইনের ইস্পাত। গম গম আওয়াজ। এক্সপ্রেস আসছে এগিয়ে।

পরমুহূর্তেই কেবিনের সামনে দিয়ে গর্জন করে বেরিয়ে গেল দীর্ঘ ট্রেনখানা: রাত্রি একটা আটত্রিশ। যাত্রীরা নিশ্চিন্ত নির্ভরে ঘুমুচ্ছে। ওই গাড়ীটই কি কোনও একটা কামরায় বসে আছে নবতারা আর সেই রাসকেলটা?—স্বপ্ন দেখছে নূতন নীড় বাঁধবার?

সঙ্গে সঙ্গেই একটা বিকট শব্দ। পৃথিবী কি ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল? সহস্র কণ্ঠের আর্তনাদ, কি হোল কি হোল?

নিস্তব্ধ গভীর রাত্রি। অন্ধকার চারিদিকে। এক্সপ্রেস ডিরেলড হয়েছে। মেন লাইনের পরিবর্তে ট্রেন গিয়েছে তার পূর্ণ ক্রতবেগ নিয়ে পাশের সাইডিংয়ে। তার পরেই ঘটেছে বিপর্যয়। বিরাট ক্যানেডিয়ান ইঞ্জিনটা ছিটকে কাত হয়ে পড়েছে ত্রিশ ফুট নিচে খাদের মধ্যে, সঙ্গে সঙ্গেই আরও কয়েকখানা গাড়ী।

• • • •

সকাল হতেই রিলিফ ট্রেন এলো, পুলিশ এলো, বড় বড় অফিসাররা এলেন। সেই সঙ্গে সংবাদপত্রের রিপোর্টার, ফটোগ্রাফার—হৈ হৈ কাণ্ড।

ষ্টেশনমাষ্টার, পয়েন্টসম্যান পল্টু, তার সহকারী, সবাইকে গ্রেপ্তার করলে পুলিশ। কেউ বললে ফিসপ্লেট সরানো, কেউ বললে স্যাবোটেজ।

মামলা চললো দীর্ঘকাল। যে সব বিবরণ সংবাদপত্রে মারফতে সকলের জানা। মামলার উপসংহারে সন্দেহের অবকাশে মুক্তি পেল প্রতুল ওরফে পল্টু চাটুয্যে। তখন তার উন্মাদ অবস্থা। পাগল হয়ে গেছে পল্টু।

———

ব্যাপার সংচক্রাটে

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন)

চক্রপাণি

জাপানে এবার অলিম্পিক-এর আসর বসেছিল।

বিরাট আয়োজন। অভাবনীয় কাণ্ডকারখানা। যেন আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপের খেলা। হাতাহাতি সেখানে ইন্দ্রপুরী গজিয়ে উঠল।

বড় বড় বাড়ি, খেলার মাঠ, সাঁতার-কাটার পুকুর, দৌড় খেলার চক্রাকৃতি পথবন্ধনী হোটেল, সরাইখানা, টেলিভিশন, কত কি।

তারপর প্রতিযোগিতায় নিত্য নতুন রেকর্ড। কত পুরনো রেকর্ড ধুলোয় লুটাল, কত নতুন রেকর্ডের সৃষ্টি হল, তার পরিসংখ্যান নিত্য দেখা গেল পত্রিকায় পত্রিকায়।

এই সবের মধ্যে একটি ছোট্ট খবর আছে যা হয়ত অনেকেরই নজর এড়িয়ে গেছে।

বড় বড় অনেকগুলো হোটেল খোলা হয়েছে অলিম্পিক-গ্রামে। তারই একটাতে খাদ্য পরিবেশনকারীর (বয়) চাকরি নিয়েছে জাপান-সম্রাট হিরোহিটোর এক সম্পর্কের নাতি। দেশের রাজার নাতি হোটেলের বয়!!

তাতে কী? নাতি বলেছে, কলেজের এখন ছুটি, বসে বসে আড্ডা না মেরে বা অলিম্পিকের মাঠে মাঠে টহল না দিয়ে কিছু কাজ করা যাক না-কেন? হোক না সখের কাজ! অভিজ্ঞতা হবে তো, পৃথিবীর নানা দেশের লোকের সংস্পর্শে আসা যাবে তো?

উনিশ বছরের ছেলে বছুহাইক হিগাশিকোনি নিঃসন্দেহে এবারকার অলিম্পিকের একটি বিচিত্র "সংযোজ"।

হিগাশিকোনি টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। কাজ পেয়ে সে খুব উল্লসিত। শ্রমের মর্যাদায় বিশ্বাসী এই তরুণ ছাত্র একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ, যা থেকে আমাদের দেশের কর্মবিমুখ বড়লোকের ছেলেরা কিছু শিক্ষালাভ করতে পারে।

হিগাশিকোনি বলেছে, ইতিপূর্বে সে কোন কাজ করেনি, তার বাড়িতে চাকরদাসীর সংখ্যা অগণিত। তাহলেও তার আশা আছে, নতুন কাজ সে ভাল ভাবেই করতে পারবে, "মনিবদের" খুশী করতে পারবে এবং তার হাতে কাঁচের প্লেটগুলি মেঝের পড়ে গড়াগড় হবে না।

• • • •

মাথা গোঁজবার ঠাঁই নেই, এমন নরনারীর সংখ্যা আমাদের দেশে অগুনতি। পথেই তাদের বাস। পথে পথেই তাদের জীবনযাত্রা। তাদের মাথার ওপর দিয়ে গ্রীষ্ম গেল, বর্ষা গেল। এবার আসছে শীত।

তাদের সম্বন্ধে সরকার কি ভাবেন?

ভাবেন বৈকি! মাঝে মাঝে চায়ের টেবিলে বসে নানাবিধ সুখাদ্য আর পানীয়ের সদ্ব্যবহার করতে করতে সরকারের মুখপাত্ররা তাদের সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

দিল্লীর এক সংবাদে প্রকাশ, সেখানকার আশ্রয়হীনের সংখ্যা পঞ্চাশ হাজারের মত। শীত কালে তাদের গতি কি হবে তাই নিয়ে ডিন্‌রাজ্যের এক মন্ত্রী সেখানে এক চা-চক্রে তাদের সম্বন্ধে বিশেষ সহানুভূতিসূচক আলোচনা করেছেন। বলেছেন, এ সম্বন্ধে নানা বড় বড় পরিকল্পনা আছে, কিন্তু টাকার বড়ই অভাব।

সত্যিই তো, এতগুলো ভিখারীকে ঠাঁই দেবার মতো ব্যবস্থা করতে কত টাকার দরকার। সরকারের হাতে এত ফালতু টাকা কোথায়? কত দিকে কত খরচ। এই দেখুন না কেন,—হালফিল দিল্লী থেকে আগ্রা পর্যন্ত একটি বিলাসবহুল ট্রেন (তাজ এক্সপ্রেস) চালু করা হল, কী প্রাপ্তি ব্যাপার! খরচ হল চল্লিশ লক্ষ টাকা। তাহোক। এখন থেকে কী আরামে দিল্লী থেকে তাজমহল দেখে আসা যাবে!

আশা করছি উক্ত মন্ত্রীমশাই ইতিমধ্যে ওই ট্রেনে চেপে আর একবার তাজমহলের সৌন্দর্য উপভোগ করে এসেছেন।

• • • •

বাঙালী শ্রমকাতর, কলকারখানার কাজে অনুপযুক্ত—এ অখ্যাতি নতুন নয়। তাই এক ইংরাজী পত্রিকায় খবরটি পড়ে আনন্দ হল।

তিলাই-এর ইস্পাত কারখানায় দক্ষ শ্রমিক হিসাবে সন্তোষকুমার রায় কারখানার চীফ-এনজিনিয়ারের প্রশংসা অর্জন করেছেন।

চীফ তাঁর সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন: "আমার কারখানায় যত কঠিন কাজই আসুক না কেন, শ্রীরায় তা খুসীর সঙ্গে এবং দক্ষতার সঙ্গে সম্পাদন করেন; নতুন শ্রমিকদের শ্রীরায়ের কাছে পাঠানো হয় কাজ শেখবার জন্যে; এখানকার বেশির ভাগ শ্রমিককেই তিনি কাজ শিখিয়েছেন। শ্রীরায়ের জন্যে আমি গর্ব বোধ করি।"

আমরাও গর্ব অনুভব করছি। শ্রমিকশ্রেষ্ঠ সন্তোষকুমার বাঙালীর মুখ উজ্জ্বল করেছেন।

• • • •

আমাদের পল্লীর একটি ঘটনা।

পল্লীর মধ্যে একটি দোতলা বাড়িতে রবীন্দ্রসঙ্গীতের ইস্কুল খোলা হয়েছে। কেবল মেয়েরাই সেখানে শেখে। সকালে দুপুরে সন্ধ্যায় তিন শিফ্‌ট্-এ ইস্কুল চলে। সারাদিন ধরে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের ওপর স্টীম রোলারের প্রবল ঘর্ষন! পাড়ার লোক অতিষ্ঠ।

কয়েকদিন আগে। সকালবেলা স্থানীয় থানা থেকে দু-জনষ্টেবল দারোগা ইস্কুলে এসে হাজির। দরজা বন্ধ। ওপরে গানের ক্লাস চলেছে। দারোগা দরজায় ধাক্কা দিয়ে দিয়ে হায়রান।

অবশেষে দরজা খুলে দেবা দিলেন ইস্কুলের প্রধানা শিক্ষয়িত্রী।

কী ব্যাপার? পুলিশ কেন?

দারোগা বললেন, ব্যাপার গুরুতর। পাড়া থেকে থানায় খবর গেছে যে, এই বাড়ীতে এক

ঘাঁদুনি ঠাকুর আছে, তার নাম রবি। আপনারা সেই ঠাকুরকে গুম করে রেখেছেন, তার ওপর অকথ্য অত্যাচার করছেন, এবং তাকে খুন করবার ষড়যন্ত্র করেছেন। গান বন্ধ করুন, মেয়েদের বাড়ি চলে যেতে বলুন, আমরা বাড়ি তল্লাস করব।

পরের সংবাদ জানি না। তবে দেখছি, ইস্কুলটি বন্ধ হয়ে গেছে।

• • • •

নলচিকিৎসক ডাক্তার ভৈরব ভট্টাচার্য লণ্ডনে বসে এমন এক গবেষণায় এবং উদ্ভাবন কর্মে নিযুক্ত আছেন, আমাদের সমাজে যার ফল শুধু সুদূরপ্রসারী নয়, হয়ত বা নতুনতর জটিল সমস্যা এবং ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি করবে।

ব্যাপারটা বিশদ করে বলি। ডাক্তার ভট্টাচার্য গাভীদের কৃত্রিম গর্ভসঞ্চারের এমন এক প্রণালী আবিষ্কার করেছেন যার ফলে গাভীরা ষাঁড়ের বদলে গাই প্রসব করবে।

ডেলি মিরর বলছে, মানুষের ওপরেও এই পরীক্ষা চালানো যেতে পারে এবং তাতে সাফল্যের সম্ভাবনাও যথেষ্ট।

তা যদি হয়, তাহলে বিয়ের সময়েই বরকর্তারা স্থির করে ফেলবে, তারা ছেলে চায় না মেয়ে চায় এবং সংখ্যায় কটি চায়। বিপদ এইখানেই। আমাদের সমাজে যদি এই প্রণালী চালু হয় তাহলে মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্তদের মধ্যে কে আর মেয়ে চাইবে? তাহলে শুধু ছেলে হবে পাল পাল। তা তো হল। তারপর? অর্থাৎ বংশানুক্রমের ধারা বজায় থাকবে কি করে? ছেলের সংখ্যা যদি গড়ে দশ-বিশ গুণ বেড়ে যায় তাহলে মেয়েদের তো দ্রৌপদী হওয়া ভিন্ন উপায় থাকবে না!

• • • • •

ভারতের একটি বিরাট প্রচার দপ্তর আছে, যার হাঁকডাক, বাগাড়ম্বর আর বহরারম্ভের কমতি নেই। কিন্তু কাজের বেলায় অষ্টরম্ভা। সে কথা প্রকাশ করে দিয়েছেন অমরনাথ বিদ্যালঙ্কার তাঁর অধুনা প্রকাশিত রিপোর্টে।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় প্রচার বিভাগের গুরুদায়িত্বপূর্ণ কার্যকলাপ অনুধাবন করে একটি রিপোর্ট পেশ করবার জন্যে কয়েকজন বিশেষজ্ঞকে নিয়ে যে দল গঠিত হয় পার্লামেন্ট-সদস্য বিদ্যালঙ্কার তার নেতৃত্ব করেছিলেন। সম্প্রতি তাঁদের রিপোর্টটি প্রকাশিত হয়েছে। নিঃসন্দেহে এই রিপোর্টটিকে একটি প্রামাণ্য ও মূল্যবান দলিল বলে গণ্য করা যেতে পারে।

রিপোর্টের প্রথমেই বলা হয়েছে, এতাবৎ প্রচারবিভাগ যে কর্মসূচি অবলম্বন করেছেন তা অপর্যাপ্ত, অসংবদ্ধ এবং অস্পষ্ট।

হায়, কেন্দ্রীয় সরকারের প্রচার দপ্তর। বিদ্যালঙ্কার এবং তাঁর সহকর্মীদের মনে যে এই ছিল তা কে জানতো! এ যে একেবারে হাটে হাঁড়ি ভাঙা!

কী জাঁকজমক, কী অর্থব্যয়ের বহর! দেশে দেশে প্রতিনিধি—নবাব বাদশা, রাজা মহারাজার চেয়ে বিলাসবহুল তাঁদের জীবন-যাত্রা! কিন্তু কাজের বেলায় তাঁদের খুঁজে পাওয়া যায় না। বারবার এই সত্য প্রমাণিত হয়ে গেছে যে পররাষ্ট্র ব্যাপারে আমাদের প্রচারদপ্তর প্রতিবারেই পাকিস্থানের কূটনৈতিক তৎপরতা এবং প্রচারনৈপুণ্যের কাছে হার মেনেছে।

তারপর দেশের অভ্যন্তরে যে-প্রচার ব্যবস্থা তার মধ্যেও হাজারো গলদ। বিদ্যালঙ্কার রিপোর্টে

বলা হয়েছে, দেশের জরুরী অবস্থায় জনগণের মধ্যে যে চেতনা জাগিয়ে তোলা দরকার তা সঞ্চারিত করতে এই বিভাগের প্রচার-কার্য সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে, তার কারণ, সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাব, কার্যক্রমের দুর্বলতা, উদ্দেশ্যহীনতা এবং অবস্থা অনুযায়ী পদ্ধতি অবলম্বনে শিথিলতা।

রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে, বর্তমানে এই বিভাগ শহর অঞ্চলে অপেক্ষাকৃত শিক্ষিত দেশবাসীর উদ্দেশ্যেই তাঁদের প্রচার-কর্ম নিয়োজিত করেছেন, ফলে গ্রামাঞ্চল উপেক্ষিত হয়েছে, অথচ রিপোর্টের মতে, গ্রামের মধ্যেই ব্যাপক প্রচারের প্রয়োজন সর্বাগ্রগণ্য হওয়া আবশ্যক। তাছাড়াও দেশের জনগণকে উদ্বুদ্ধ করবার জন্যে যে ব্যাপক আয়োজনের প্রয়োজন তদনুরূপ অর্থ মঞ্জুর করবার ব্যবস্থা হয় নি, ফলে বিভিন্ন রাজ্যগুলিতে কাজ হয়েছে যেমনি খাপছাড়া এবং অকিঞ্চিৎকর।

রিপোর্টে আরও একটি গলদের কথা বলা হয়েছে। সেটি হচ্ছে এই যে যাদের দিয়ে এই বিরাট কর্মোদ্যম পরিচালনার কথা হয়েছে, গভর্নমেন্টের কাছে তাদের কদর থাকলেও দেশের লোক তাদের সুনজরে দেখে নি। গভর্নমেন্ট-প্রোপাগাণ্ডার দালাল রূপে তারা চিহ্নিত হয়েছে দেশের লোকের কাছে, ফলে তাদের কাজ একেবারেই ফলপ্রসূ হয়নি। হবে কোথা থেকে? সব কাজ কি সবাইকে দিয়ে হয়? ছাগলকে দিয়ে কি ঘর মাড়ানো যায়? দেশের মধ্যে সরকারের আওতার বাইরে যে সব প্রচার-বিশারদ আছেন, প্রচার-শিল্পের সাধনায় যাঁরা আজীবন নিযুক্ত রয়েছেন, এই কাজে যাঁরা বিস্তৃত অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন, তাঁদের বাদ দিয়ে কতকগুলো পেটোয়া অপদার্থ ব্যক্তিদের পোষণ করবার জন্যে যে ব্যবস্থা তার অবস্থা যে এমনই হবে তা তো সহজেই অনুমেয়।

এই সুচিন্তিত রিপোর্টে কয়েকটি ব্যবস্থা অবলম্বন করবার জন্য সুপারিশ করা হয়েছে।

রিপোর্টে যে ভাবে সরকারের প্রচার-দপ্তরের কার্যাবলী নিন্দিত হয়েছে, অন্য দেশ হলে হুলুস্থুল পড়ে যেতো এবং অনতিবিলম্বেই এই বিভাগের আমূল পরিবর্তন সাধিত হত। কিন্তু আমাদের দেশে এই ধরণের রিপোর্ট বেরোয়, কিছুদিন কাগজে কাগজে কিছু লেখালেখি হয়, তারপর যথা পূর্বং তথা পরম, দুঃশাসনের রথ প্রবল পরাক্রমে চলতেই থাকে! এক্ষেত্রেও, আশা করছি তার ব্যতিক্রম ঘটবে না।

• • • •

ছবির দাম

প্যারিসের একজিবিশনে ছবি পাঠিয়েছেন অবু ঠাকুর। কে জানে কত ফ্রাঙ্কে কত পয়সা হয়, দাম ধরে দিয়েছেন, ২৫ হাজার ফ্রাঙ্ক।

ছবি ভালো লাগে লুভ্রের মিউজিয়ামের কর্তাদের। দাম দেখে তাঁরা অবাক হয়ে যান। শিল্পীকে চিঠি লেখেন, দাম কমান···তাহলে আপনার ছবি স্থান পাবে জগৎ খ্যাত লুভ্রের মিউজিয়ামে···

অবু ঠাকুর উত্তরে লিখে জানান, ঝটিতি বাঁধা, আমার ছবি পাঠিয়ে দাও আমার কাছে।

অন্য কোনও মাথার তেলে এ আর কোনও দিন সম্ভব ছিল না এবং আজও সম্ভব নয়।

একমাত্র দ্বিবিধ ফলদায়ক কেয়ো-কার্পিন তেলই আপনার চুলকে নরম ও চক্‌চকে করে এবং মাথা ঠাণ্ডা রাখে!

কেয়ো-কার্পিন আপনার চুলের শোভা বাড়ায় ও চুলের স্বাভাবিক রং বজায় রাখে। এ এক বিস্ময়কর মাথার তেল —আজই কিনুন. রোজই ব্যবহার করুন।

কেয়ো-কার্পিন

দ্বিবিধ ফলদায়ক কেশ তৈল

দে'জ মেডিক্যাল ষ্টোরস্ প্রাইভেট লিমিটেড

কলিকাতা • বোম্বাই • দিল্লী • মাদ্রাজ
গৌহাটী • পাটনা • কটক • জব্বলপুর

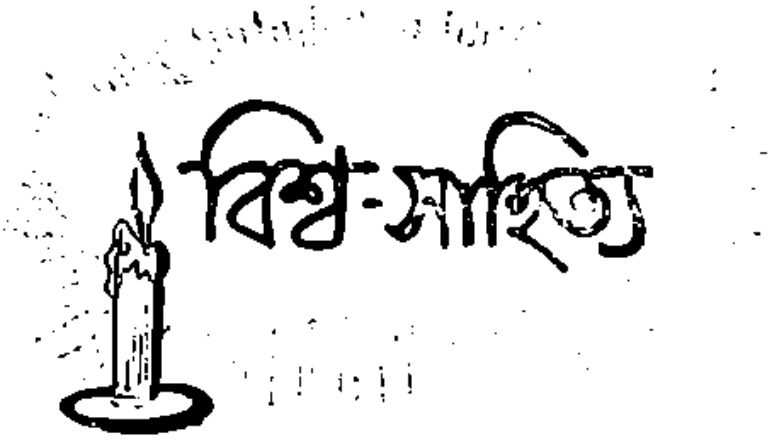

ডিলান টমাস (১৯১৪-১৯৫৩)

সৌরেন্দ্রনাথ বসু

১৯৫৩ সাল। প্রায় একই সময়ে ফ্লোরেন্সে বেড়াতে গেছেন ষ্টিফেন স্পেণ্ডার এবং অন্য এক খ্যাতনামা ইংরেজ কবি। ফ্লোরেন্সের শিল্পকলা দেখে ও বুদ্ধিজীবিদের সঙ্গে আলাপে স্পেণ্ডারের সময় কেটে যায়। কিন্তু অন্য কবির সে-রকম উৎসাহ ছিল না। তিনি খুঁজে নিলেন সবচেয়ে ভালো পানীয়ের দোকান আর এমন একটি বাসা যেখান থেকে 'বারে' যাতায়াত সহজ। বিষয় আলোচনায় তাঁর নিতান্তই অরুচি। বন্ধুজন তাঁকে আবিষ্কার করতেন—'বার' কিংবা 'পাবে' যোগলের সাহায্যের অন্তরালে বিয়ারের গ্লাস হাতে—দৃষ্টি উদাস, কখনো সুদূরে, অসংযত বেশবাস।

এই হলেন ডিলান টমাস—সত্তা ও অস্তিত্বনে আধুনিক ইংরেজী সাহিত্যের প্রসিদ্ধতম কিংবদন্তী, নিন্দায় ও প্রশংসায় সাম্প্রতিক ইংরেজী কাব্যের ঐতিহাসিক নায়ক। টমাসের কাব্যের প্রতীক বিয়ারের বোতল। একদিন বিয়ারের বোতল খুলতে গিয়ে তাঁর আঙুল বোতলের মুখে আটকে যায়। আঙুল মুক্ত করার চেষ্টা ক'রে যখন বিফল হলেন তখন টমাস সেই বোতল হাতে ক'রে কয়েকটি বন্ধুকে দর্শন দেন এবং পার্টিতে হাজির হ'ন। এরপর থেকেই বিয়ারের বোতল হয়ে ওঠে তাঁর কাব্যের প্রতীক। শোনা যায় মদের বোতল মুখে ধরিয়ে তাঁর ঘুম ভাঙানো হত। প্রাতরাশ করতেন কেবল 'মদ' পান ক'রে। কাব্য ছাড়া অন্য যে কোনো বিষয়ের আলোচনাতেই ছিল তাঁর উৎসাহ—কথায়, কাজে, চালচলনে নিয়মহীন, শৃঙ্খলাহীন, ব্যক্তির বিষয়েও একান্তই আত্মমগ্ন, জনমত সম্বন্ধে নিস্পৃহ। কতবার যে বক্তৃতার আগে শারীরিক ক্লান্তিতে ও মদ্যপানে জড়তা ও সৌজন্যের সীমা ছাড়িয়ে তিনি শয্যা নিয়ে প'ড়ে থেকেছেন তার ইয়ত্তা নেই। ক্লিষ্ট, ক্লান্ত, অসংযত টমাসের কাছে সমস্ত জগৎই দুঃখ ও বিভীষিকার নরক, আর জীবন পাপ ও পতনের যন্ত্রণাবদ্ধ যাত্রা—মৃত্যু তার অনিবার্য পরিণতি।

এহেন টমাসের জীবনে যে বইখানি সবচেয়ে বেশী পড়া,—যার প্রভাব সমস্ত জীবনভর তাঁর ওপর ছিল—তা হ'ল বাইবেল। টমাসের ঠাকুরদা ওয়েলসে ধর্ম প্রচারক ছিলেন। ওয়েলসে তখন প্রচারক মাত্রেই পিউরিটান। টমাস নিতান্ত শিশুকালে বাইবেলের গল্পগুলি যেনে ফেলেন। বাইবেলের গল্পের প্রতীকগুলি তিনি বারবার কবিতায় ব্যবহার করেছেন। তিনি ব'লতেন—ধর্মের জন্যই তাঁর কাব্য রচনা। টমাসের বাবা তাঁর জন্মভূমি 'সোয়ানসি' তে ইংরেজীর শিক্ষক ছিলেন। বিদ্যালয়ের শিক্ষকের

সন্তান হ'য়েও টমাস ছাত্র-জীবনে কোনো বিষয়েই কৃতিত্ব দেখাতে পারেন নি। একমাত্র ইংরেজী রচনায় তাঁর অসাধারণত্ব ধরা পড়ে। বিদ্যালয়ের পত্রিকা নানাজাতীয় রচনায় তিনি একাই ভরিয়ে রাখতেন। কিন্তু ইস্কুলে অন্য কোনো শিক্ষা না পেলেও কবি টমাসের কল্পনার উন্মেষ হয় এইখানেই।

ওদের ইস্কুলটি ছিল একটি পাহাড়ের উপরে। পাঠ্য বইয়ের অনেক দূরে জানালার বাইরে যেদিকে তাকান যায় সেখান 'স্তোয়ানসি' সাগর। শহরের কারখানার ধোঁয়া সেখানকার আকাশকে ঢেকে দেয় নি। ক্লাস চলছে, কিন্তু বালক টমাস তখন আকাশ আর সাগরের অসীমে স্বপ্নে মগ্ন। ওঁদের বাড়ীর কাছেই ছিল সাগর আর পাহাড়-ঘেরা একটি পার্ক তাতে—সবুজ ঘাস, ওইলোর ঝাড়, আর রডোডেনড্রন গাছ। পাহাড়ে পাহাড়ে মেঘের ছায়া দেখে, আর সমুদ্রের ঢেউগুণে দিন কাটাতে লাগলেন টমাস।

'স্তোয়ানসি' টমাসের কল্পনার প্রথম ইন্দ্রপুরী। এ জায়গাটি ওয়েলসের অন্য সব জায়গার মত কলকারখানার খিচি নয়। এখানকার জীবনের সঙ্গে ইংল্যাণ্ডের জীবনের মিল আছে—আনন্দ, বিলাসিতা আর প্রকৃতির লাবণ্যে। তা স্বতন্ত্র এক দেশ। এই স্বপ্নের কল্পভূমি বালক কবির নিজস্ব-জগৎ।

জন্মভূমির আকাশ, সাগর ও পাহাড়ালা তাঁর কাব্যে সর্বত্র সমভাবে। তাই, টমাসের 'কবিতায়' সাগরের কল্পরূপ ফিরে ফিরে এসেছে। তাঁর অনেক ছোট গল্পে, (যেমন, পোরট্রেট অব দি আর্টিষ্ট এজ এ ইয়ং ডগ) এসেছে এই স্বপ্নের ইন্দ্রপুরী, তার মানুষজন। বি. বি. সি. তে উত্তর জীবনে 'স্তোয়ানসি' পুনর্দর্শন ব'লে যে বক্তৃতাটি দেন তাতে এই জীবনের আর প্রথম জীবনের কথা বলেছেন তিনি গভীর মমতায়, প্রগাঢ় আবেগে। 'তাঁর কবিতা ও স্তোয়ানসির জল, মাটি, সাগরের ঢেউ, আর আকাশের তারারই কাব্যরূপ।

জীবনের উষা লগ্ন পেরিয়ে উত্তর জীবনের ইতিহাস ভিন্ন। পত্র-পত্রিকায় লিখে জীবিকা নির্বাহের তাগিদে যখন তিনি ওয়েলসের জীবনকে আরো স্পষ্ট দেখলেন—তখন ওয়েলস তাঁর কাছে অন্য এক রূপ নিয়েছে। পরবর্তীকালে 'দি বিট্রেড ওইল্ড সিস্টার্স' নামে খ্যাত যে ছবিটির সংলাপ রচনা করেন তাতে ওয়েলসের অনেক নয় দিক তুলে ধরেন তিনি। দুঃখ ক'রে একসময় তিনি বলেছিলেন ঠিক ইংল্যাণ্ড বা ওয়েলস কোনোটিকেই তিনি আপনার করে নিতে পারলেন না।

ইংল্যাণ্ডে এসে, টমাস খ্যাতি পেলেন, পেলেন অর্থ। 'এইটিন পোয়েমস' (১৯৩৪), পরে টোয়েন্টি কাইভ পোয়েমস' (১৯৩৬) তাঁকে কবি সমাজে প্রতিষ্ঠিত করল। কয়েকবার আমেরিকা ভ্রমণ ক'রে বি. বি. সি. তে নিয়মিত স্বরচিত এবং অন্যের কবিতা পাঠ ক'রে জনপ্রিয়তার শিখরাসীন হলেন। আর শুরু করলেন সেই শৃঙ্খলাহীন জীবনযাত্রা যা তাঁকে 'ছন্নছাড়াদের' রাজকুমারের যশ এনে দিল।

আধুনিক কাব্যের ইতিহাসে টমাসই একমাত্র কবি যিনি দুরূহ হয়েও জনপ্রিয়। কবিতা না বুঝে কবিকে তারা ভালবেসেছে। তাঁর সৃষ্টি, ব্যক্তিত্ব ও কণ্ঠস্বরের এমন এক অন্তরঙ্গ মোহ ছিল যাতে কবিতা তাঁর কণ্ঠে প্রাণ পেত। কবিতা লিখতেনও তিনি উঁচু গলায় প'ড়ে প'ড়ে। আর যখন একবার কবিতা পড়তেন—টিলেঢালা, উচ্ছৃঙ্খল এই মানুষটি একেবারে ভিন্ন জগতে চলে যেতেন। তাঁর শ্রোতারা তাঁর সঙ্গে একাত্ম হ'য়ে পড়ত।

টমাসের কাব্য পাঠের ও জনপ্রিয়তার মূলে আছে তাঁর গভীর আবেগ আর প্রচণ্ড শক্তি। তাঁর কণ্ঠে হিমবাহের প্রচণ্ডতার সঙ্গে মিশে যেত ঝরণার কলতান। তাঁর কাব্যের বৈশিষ্ট্যও এইখানে।

ফরাসী কবি স্বপ্ন-বিলাসী তরুণ দ্রষ্টা র‍্যাঁবোর সঙ্গে তাঁর মিল আছে। টমাস জানেন তাঁর মধ্যে পশু, উন্মাদ, আর দেবদূতের আশ্চর্য সমন্বয় ঘটেছে। তিনি নগ্ন, নির্মোহ, নিষ্ঠুর আত্ম-বিশ্লেষক। জীবনের অন্ধ ও পাশব শক্তির সঙ্গে যুদ্ধে তিনি ক্ষত-বিক্ষত—কিন্তু তাঁর লক্ষ্য অন্ধকারের গহ্বর হ'তে সত্যের আলোকাভিসার। কবিতা তাঁর একমাত্র লক্ষ্য। টমাস আধুনিক ইংরেজী গীতি-কাব্যের শ্রেষ্ঠ রোমান্টিক।

রাজনীতি তাঁর কাব্যে অনুপস্থিত। প্রথম জীবনে কম্যুনিজমের ওপর একটা ঝোঁক আসে বটে তা' নিতান্তই সাময়িক। সারাজীবন অর্থ-কৃচ্ছ্রতায় দিন কাটিয়েও তিনি অর্থনীতি ও সমাজনীতির সমস্যাগুলি সম্বন্ধে একেবারে উদাসীন। টমাসের জন্মভূমি ওয়েলস তাঁর কাব্যে সর্বত্রই সক্রিয়শীল। তবে সে ওয়েলস যুদ্ধোত্তর দেশবন্ধু অভাবগ্রস্ত ওয়েলস নয়। রাজনীতিতে তাঁর এই একান্ত অনীহা আধুনিক কবিতায় এক বিশিষ্ট ধারা থেকে তাঁকে স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে। টমাস জাতে—রোমান্টিক। তাঁর আগের বা সমসাময়িক কোনো কবির কাছে তাঁর স্বতন্ত্র কোনো ঋণ নেই। পাউণ্ড এলিয়টের প্রভাব-বলয়ে বাস করেও তিনি তাঁদের প্রভাবমুক্ত। শব্দ সৃষ্টিতে হপকিন্সের সঙ্গে তাঁর সাধর্ম্য আছে। হপকিন্সের কাছে খৃষ্টীয় নীতি ও বাইবেলের প্রতীক চিহ্নগুলি স্বতন্ত্র ধর্মীয় মর্যাদার অভিলিপ্সু। কিন্তু টমাসের কল্পনা বাইবেলের কাহিনী ও আদিমতম পাপবোধে প্রভাবিত হ'লেও তাঁর লক্ষ্য ভিন্ন। দেবদূতের পায়ে ঘোড়ার খুর না দেখলে তিনি তাদের চিনতে পারেন না। বাইবেলের কাহিনী ও প্রতীকগুলিকে তাঁর কাব্যে তিনি ব্যবহার করেছেন মানুষের গোপনতম ও গভীরতম সত্যানুসন্ধানের অবলম্বন হিসাবে। মানুষের হৃদয়ের গোপন সত্যের সন্ধান করেছিলেন ফ্রয়েড। ফ্রয়েডের মনো-বিজ্ঞানের সূত্রগুলিকে আশ্রয় ক'রে জীবনের আরো গভীরে প্রবেশ করেছেন তিনি। তাই তাঁর কাব্যের বিষয়বস্তু নিতান্তই অল্প—ধর্ম, প্রেম কয়েকটীর তত্ত্ব ও মৃত্যু। ধর্ম তাঁর কাছে পবিত্র অনুপ্রেরণার উৎস নয়, প্রেম সীমাহীন আশার নয়। তবুও তিনি ধার্মিক ও প্রেমিক—(I write for the love of man and to praise God). কারণ—ধর্ম, প্রেম ও যৌন জিজ্ঞাসার মধ্যেই আছে জীবনের অনন্ত রহস্য। সত্যনিষ্ঠ কবি জীবনকে প্রত্যক্ষ করতে চান। তিনি পলায়ক নন।

কবি টমাসের শক্তির সূত্র তাঁর ঐকান্তিকতা, নিষ্ঠা আবেগ। জীবন যাত্রার উচ্ছৃঙ্খলতা তাঁর কাব্যকে প্রভাবিত করেছে সত্য, কিন্তু কবিতা সৃষ্টির মহালগ্নে তিনি একেবারে আত্ম-মগ্ন—প্রতীক, কাব্যরূপ ও স্বতন্ত্র ভাষা সৃষ্টির শান্তিতে ও শৃঙ্খলায় সংযত। তাঁর কাব্যে আবেগের প্রচণ্ডতা সংযত।

আমেরিকায় তাঁর শোচনীয় মৃত্যুর পর প্রবীণ ও নবীন অনেক কবি ও সমালোচক তাঁকে শ্রদ্ধা জানালেন। তাঁর জন্মভূমি ওয়েলস-এর বইয়ের ব্যবসায়ী তাঁকে চিনতেন ছেলেবেলা থেকে। তার কাছে টমাস ছিলেন আজন্ম-শিশু। নিউইয়র্কে যাবার আগে টমাস তাকে বলে যান তিনি বড়োদিনের আগে আবার আসবেন। অনেক কাজ ক'রবেন তিনি সেখানে, যত কাজ করবেন তত টাকা পাবেন। টমাস আর ফেরেন নি। ভদ্রলোক দুঃখ ক'রে লিখলেন ওয়েলসের বড়ো বড়ো মানুষেরা বাইরে যান অর্থ উপায় ক'রতে, কিন্তু ঘরে ফেরা আর তাঁদের হ'য়ে ওঠে না। বিদেশেই তাঁদের জীবন শেষ হ'য়ে যায়। তাই তাঁর কাতর অনুরোধ ওয়েলসের বড়ো মানুষদের যেন কেবল অর্থ উপার্জন করতে বিদেশে বিভূঁয়ে এমন ক'রে জীবন শেষ ক'রতে না হয়।

টমাস তাকে যে কবিতা গ্রন্থ দুটি উপহার দিয়েছিলেন সে দুটি হাতে নিয়ে তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলবেন সারাজীবন।

জ্যাঁ পল সার্তর

অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

এ বছর সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছে ফরাসী সাহিত্যিক জ্যাঁ পল সার্তর-কে। প্রকাশ, ৬৯ বৎসর বয়স্ক দার্শনিক-লেখক সার্তর আকাদেমীর কাছে এক চিঠীতে ব্যক্তিগত কারণে পুরস্কার গ্রহণে অসম্মতি জানিয়েছেন। কি কারণে তিনি এই পত্র লিখেছেন তা এখনো জানা যায় নি। ইতিমধ্যে তিনি নাকি আত্মগোপন করেছেন এবং বর্তমানে স্কানডিনেভিয়ায় আছেন।

নোবেল পুরস্কার নিয়েও হলাহলি, কলহাকলি, রাজনীতির লড়াই। ইতিপূর্বেও রুশ লেখক বোরিস পাস্তারনাক উক্ত পুরস্কার নিতে অস্বীকার করেন, বা অস্বীকার করতে তাঁকে বাধ্য করা হয়। সার্তর-এর বেলাতেও সেই নেপথ্য-অবরদস্তি আছে কি না, তা এখনো প্রকাশ পায়নি।

তা সে যাই হোক, এই অবকাশে সার্তর-এর সম্বন্ধে কিছু আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

আজ যে পুরস্কার সার্তর পেলেন তার বীজ রোপিত হয়েছিল তাঁরই বারোয় পনেরো বিশ বছর আগে একটি বিশেষ ধরণের মতবাদ প্রচারের মাধ্যমে।

সেই সময় তাঁর জীবন-দর্শন ও সাহিত্য-সৃষ্টি সম্পর্কে যে আলোচনার সূত্রপাত হয়েছিল তাতে বলা হয়েছিল যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে মানুষের জীবনের উপর ঈশ্বরের উপর, ধ্যানধারণা আত্ম-চেতনা আর মননশীলতার উপর এত বড় আঘাত আর কখনো আসেনি এবং তারই পরিপ্রেক্ষিতে সার্তর-এর সাহিত্যকর্ম ও সাহিত্য মতবাদ সূচিত হয়েছিল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে মানুষ মরেছে লাখে লাখে মানুষের হাতে। তার চেয়ে বড় কথা, এই সংহারলীলার প্রতিক্রিয়া মানুষের আত্মার মধ্যেও প্রবেশ করেছে যেন। তার এতদিনের সংস্কার, রাজনীতি বিচার সম্বন্ধে তার বহু যুগের এত সাধনা, এই যুদ্ধ সব যেন দিয়েছে উল্টে। ন্যায়-নীতি সততার যে রীতি ছিল প্রচলিত, তার ব্যতিক্রম ঘটেছে বিস্ময়কর ব্যতিক্রম। মানুষের গতি যেন স্তব্ধ হয়ে গেছে সেই ওলোট-পালোটের মুখে। নতুন ক'রে মানুষকে চিন্তা করতে হচ্ছে, জীবনের অস্তিত্ব সম্বন্ধে মানুষ নতুনভাবে ভাবতে আরম্ভ করেছে। কী প্রাণান্তকর এই বেঁচে থাকা! প্রতি মুহূর্তে এই বেঁচে থাকার জন্য কী ব্যাকুল প্রয়াস!! এই টিঁকে থাকার সত্যিকার কোন মূল্য আছে কি?—এমনি করে সতত প্রাণভয়ে বেঁচে থাকা? বাঁচবার জন্যে তাই নতুন মন্ত্র চাই। তা না'হলে মানুষ, প্রাণ থাকলেও, বাঁচার মতো বেঁচে থাকবে না।

ফরাসী দেশের প্যারী নগরীতে সেদিন মানুষের এই নতুন ভাবনা একটা বিশিষ্ট রূপ নিয়েছিল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে এই নগরেই শোনা গিয়েছিল এক নতুন মতবাদের কথা, এক নতুন মন্ত্র। এই মতবাদের নাম Existentialism বা অস্তিত্ববাদ।

বাঁচতে যখন হবে তখন প্রতি পদক্ষেপে, প্রতি নিঃশ্বাস পতনে, প্রতিটি কর্ম-মুহূর্তে প্রমাণ করতে হবে সেই অস্তিত্ব। এবং তা প্রমাণিত হোক আপনা থেকেই।—ব্যক্তিক হোক সেই প্রমাণ। সেই নতুন মতবাদের এই হ'ল মূলমন্ত্র।

ডেকার্টে বলেছিলেন: "I think, therefore I am!" আমি চিন্তা করি, এই আমার অস্তিত্বের প্রমাণ।

সার্ত্তর বলেছেন, I act therefore I am! আমি কাজ করি, এই আমার অস্তিত্বের প্রমাণ।

সার্ত্তর-এর দর্শন, নিছক প্রাণশক্তির দর্শন। কাজ করবার স্বাধীনতা মানুষের আছে। সেই স্বাধীনতার জন্যেই তাকে কাজ করতে হবে। নিজের চরিত্রকে মানুষ যে-পথে খুশী নিয়ে যেতে পারে, যেমন ইচ্ছা গড়তে পারে। এই খুশী বা ইচ্ছার তার জন্মগত অধিকার। তার বিচার হবে জীবনের ফলাফল দেখে, তার আগে নয়, অর্থাৎ প্রায়শঃই তার মৃত্যুর পরে। বহু ক্ষেত্রেই তো দেখা গেছে, কোন বিরাট পুরুষের মহিমাকে পৃথিবী স্বীকার করেছে তাঁর মৃত্যুর বহু পরে। সুতরাং আজ এই মুহূর্ত্তে কোন মানুষের কাজের যে তীব্র সমালোচনা তুমি করলে তার যথার্থ মূল্য নিরূপণ করবে কে?

কঠিন প্রশ্ন। সার্ত্তর-এর সমালোচকগণ এখনো বোধ হয় এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পান নি।

অস্তিত্ববাদে। মানুষের জীবনযাত্রায় যে অহরহ ধোকাধোকি চলেছে তাতে জয় হবে কার? যার গায়ের জোর সবচেয়ে বেশী। জীবনযুদ্ধে জিতবে কে? সর্ব্বাধিক ক্ষমতাশালী যে। বেঁচে থাকাটা যখন নিছক যুদ্ধ তখন সর্ব্বদিক দিয়ে সেই যুদ্ধজয়ের জন্য তৈরী থাকতে হবে। অস্তিত্ব বজায় রাখবার জন্য অহরহ যখন তোমায় যুদ্ধ করতে হবে, তখন বুঝতে হবে, এই লড়াই ছাড়া তোমার জীবন কিছু না,—একটা শূন্য।

বলা হয়েছে সার্ত্তরের এই নীতি সহজেই আক্রমণাত্মক নীতিতে পর্য্যবসিত হতে পারে। উত্তরে জানানো হয়েছে, অন্য দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে দেখা হোক এই নীতিকে, আক্রমণ করার জন্য নয়, আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের জন্য যে প্রস্তুতির প্রয়োজন, তারই কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে এই নীতির মাধ্যমে।

সার্ত্তর যখন বক্তৃতা দেন, তখন ঘর ভ'রে যায়। তাঁর বই যখন বাজারে বেরোয় তখন তীব্র বেগে যায় দোকানে দোকানে। সমালোচকের বিরুদ্ধতার তীব্র কণ্ঠ উচ্চ থেকে উচ্চতর হ'য়ে ওঠে। সার্ত্তর নির্ব্বিকার চিত্তে তাঁর লড়াই চালিয়ে যান।

এক সমালোচক লিখলেন:

"নীচ মানুষের নীচতর অন্তরের জঘন্য প্রবৃত্তিগুলিকে উদ্‌ঘাটিত ক'রে সার্ত্তর যে ছবি আঁকেন তা যেমন ভয়াবহ তেমনি ঘৃণাই। কদর্য্যের পুরোহিত তিনি, অসুন্দরের উপাসক। দুর্বোধ্য দার্শনিক হেঁয়ালিতে তাঁর লেখা অস্পষ্ট। সৃষ্ট চরিত্রগুলি অস্বাভাবিক। বিকৃত রুচির বিবাক্ত হলাহলে তাঁর লেখা জর্জ্জরিত।"

এমনি যারা সমালোচনা সত্ত্বেও সার্ত্তর-এর নাম আজ সে দেশে সবার মুখে মুখে। তাঁর আসন আজ সুপ্রতিষ্ঠিত। দর্শনের গবেষণায় নয়, নাট্যকাররূপেই আজ তাঁর দেশজোড়া খ্যাতি। "দুশ্চক্র" নামে তাঁর একখানি নাটক প্যারী ও লণ্ডনের বহু রঙ্গালয়ে অভিনীত হয়েছে। বিদ্বেষ বিহ্বল দর্শকদের নিন্দা প্রশংসা ছাপিয়ে উঠেছে সেই নাটকের জয়গান। রেডিও মারফত প্রচারিত হয়েছে বহু-আলোচিত সেই নতুনতর জীবনালেখ্য।

এই নাটকের একটিমাত্র দৃশ্য—নরক। আগুন আর তৈলপূর্ণ তপ্ত কড়ার কলকল শব্দ নেই সেই নরকে। এ এক নতুনতর নরক—প্যারীর এক তৃতীয় শ্রেণীর রেস্তোরাঁর আলোবাতাসহীন নিরানন্দ এক

প্রকোষ্ঠ। অভিনেতা অভিনেত্রী মাত্র চারজন। প্রথম চরিত্র, এক সাংবাদিক, ভীরু এবং কাপুরুষ, যুদ্ধে যোগ না দিয়ে যে পালিয়ে এসেছে, পতিগত প্রাণা স্ত্রীর উপর জবরদস্তি করে যে তার জীবনকে দুর্বহ করে তুলেছে। দ্বিতীয় চরিত্র একটি স্ত্রীলোক, নিষ্ঠুরতায় যার তুলনা নেই। তৃতীয় চরিত্র এক সুন্দরী তরুণী, যে তার নিজেরই কামনার আগুনে পুড়ে মরেছে, তার প্রেমিককে আত্মহত্যা করতে বাধ্য করেছে। চতুর্থ চরিত্র একটি খানসামা, যার বিশেষ প্রয়োজন নেই এই নাটকে।

নিষ্ঠুর বাস্তবতার সাহায্যে এই নাটকে দেখানো হয়েছে, কেমন করে অহরহ এই তিনজন ভাগ্যতাড়িত কুচরিত্রের মানুষ পরস্পরকে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপবাণে জর্জরিত করছে এবং অবশেষে কেমন করে এই তিনজনেই অনুভব করলে যে, নরক আর কিছু নয়, নরক হচ্ছে আমাদেরই পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং আমাদেরই আশেপাশের মানুষগুলোই তার অধিবাসী, আর অনন্ত নরকবাস হচ্ছে নিয়ত এইসব মানুষের সংস্পর্শে আসার বিড়ম্বনা।

সার্তর-এর নাটকের চাহিদা আজ এত বেশী যে, তাঁর এক-একখানা নাটক যখন অভিনীত হয়, তখন দু'মাস পর্যন্ত সমস্ত টিকিট আগে থেকে বিক্রী হোয়ে যায়। তাঁর অন্য দু'খানা নাটক, "সমাধিহীন মৃতের দল" এবং "কর্তব্যপরায়ণা বারবনিতা" ফরাসী নাট্যজগতে যেন যুগান্তর এনেছে।

সার্তর-এর আয় আজ বড় কম নয়। কিন্তু তাঁর জীবনযাত্রা-প্রণালী আজো তেমনি আড়ম্বরহীন। একটি ছোট হোটেলে থাকেন। লেখাপড়া আর আলাপ-আলোচনার কেন্দ্রস্থল হোল কাফে দ্য ফ্লোর। সেইখানে জমায়েত হয় তাঁর অনুগামীর দল। বহু রাত্র পর্যন্ত চলে জীবনবেদের আলোচনা আর ব্যাখ্যা।

সার্তর-এর সাহিত্যিক শক্তির বিরুদ্ধে বড় অভিযোগ এই যে, তিনি তাঁর অনবদ্য ভাষা আর অসামান্য লিপি-নৈপুণ্যের জোরে ইচ্ছা ক'রে অত্যন্ত বেদনাদায়ক ঘটনাবলীকে নৃশংসভাবে উদ্‌ঘাটিত ক'রে মানুষকে বিহ্বল আতঙ্কগ্রস্ত ক'রে তোলেন।

তার জবাবে অস্তিত্ববাদীরা বলেন, সার্তর যে পৃথিবীকে তাঁর সামনে দেখছেন, যে নিষ্করুণ ভয়াবহ পৃথিবী অজগরের মত মানুষকে বেষ্টন ক'রে রয়েছে তারই দর্পণ তিনি মানুষের চোখের সামনে মেলে ধরেছেন।

সার্তর যে শক্তিমান লেখক, তাঁর আন্তরিকতা যে সন্দেহাতীত, তাঁর বুদ্ধি যে অসামান্য এবং তাঁর লিপিচাতুর্য যে অবিসংবাদিত, তা তাঁর সবচেয়ে বিদ্বেষবাদী সমালোচকও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন।

• • • •

জবাব

দিনের বেলা এক মুখ হাসি নিয়ে সূর্যমুখী বলে নিশিগন্ধাকে, তুমি কেন ভাই এমন শুকিয়ে মুখ ভার করে আছ?

রাত্রিবেলা নিশিগন্ধা এক-গা গন্ধ মেখে তাকে সূর্যমুখীকে, কই ভাই কোথায় গেলে? সকালের জবাবটা শুনে যাও।

ব্রহ্মা

রামপ্রসাদ সেন

গল্প করতে করতে হঠাৎ ক্ষেত্রমোহনবাবুর চোখ দুটো অস্বাভাবিক রকমের চকচক করে উঠল। টেবিলের ওপাশ থেকে ঘাড়টা এগিয়ে, প্রকাশের প্রায় মুখের কাছে মুখ এনে, দাঁতের ফাঁক দিয়ে হুবার হিস্ হিস্ শব্দ করে চাপা গলায় বললেন, দেবা আর সুধো দুটোকেই কাল রাত্রে শেষ করে দিয়েছি!

চেয়ার ছেড়ে হড়মুড় করে উঠে দাঁড়িয়ে, খানিকটা সরে এসে, বিস্ফারিত চোখে প্রকাশ বলল, বলেন কি কাকাবাবু! খুন! কাল যে ওদের দুজনকেই দেখেছি!

শান্ত, তারিতে গলায় ক্ষেত্রমোহনবাবু বললেন, স্থির হও প্রকাশ। তুমি লেখক মানুষ, ওইটুকুতেই এত বিচলিত হচ্ছ কেন? নির্লেপক্ষ ভাবে বিচার কর। শিল্পীর নির্লিপ্ত মন নিয়ে ব্যাপারটা বোঝবার চেষ্টা কর। খুন শুনেই আঁৎকে উঠো না! জান ওরা আমার সহপাঠী বন্ধু? একটা দেড়হাজারী সরকারী শকুনি। আর একটা মাড়োয়ারীদের লাড্ডু খেয়াই খাওয়ান বড়বাজারের ষাঁড়! জান, আমার মেজ মেয়ে শীলার বয়স এই আশ্বিনে ষোল পূর্ণ হয়েছে? অমনি ষাঁড় শকুনেরও টনক নড়েছে! তাই সরিয়ে দিলাম দুটোকেই জগৎ থেকে। বল, তুমি যদি মেয়ের বাপ হতে, আর তোমার স্বশ্রাদ্ধের, সহপাঠী বন্ধু, টাকা, গয়না, শাড়ি, সিনেমার লম্বা-চওড়া মাখিয়ে তোমার ষোড়শী কন্যার কচি মাথাটা কড়মড় শব্দে চিবিয়ে খেত—

আবার হিস্ হিস্ করে উঠলেন ক্ষেত্রমোহনবাবু। তারপর এল একটা কাশির দমক। কাশতে কাশতে বললেন, জল-এক-গ্লাস!

প্রকাশ তাড়াতাড়ি পাশের ঘর থেকে জল আনতে গেল। তার পাচক নিত্যানন্দ তখন বাজারে গিয়েছিল।

শহরের ছোঁয়াচ-লাগা গ্রাম। কলকাতা থেকে মাইল বার দূর। স্টেশন থেকে মাইল দুই আসতে হয় সাইকেল রিক্সায়। আটাত্তর নম্বর বাস নামিয়ে দিয়ে যায় একেবারে কদমতলার মোড়ে —নাও বোষ্টমের চায়ের দোকানের সামনে।

মাসখানেকের ছুটি নিয়ে গ্রামে এসেছিল প্রকাশ। উদ্দেশ্য, ঘাসঠাকুরদার ভিটেয় কিছুদিন বাস করা। পিতার অকাল মৃত্যুতে পাটনায় মামার বাড়িতেই প্রতিপালিত হয়েছিল সে। তাই তার শিক্ষা দীক্ষা সব কিছুই বিদেশে। পাটনা ইউনিভারসিটি থেকে বি. এ. পাস করার পর আজ বছর চার পাঁচ হল টাটায় কাজ করছে। গ্রামে আসার আর একটি কারণ—তার সুগভীর সাহিত্য-প্রীতি। টাটার "উড়ো খৈ" পত্রিকায় তার অনেকগুলি গল্প প্রকাশিত হয়েছে। তারই সঙ্গে চলমনে হয়ে উঠেছে তার নামের ক্ষুধা। কলকাতার আনুমান পত্রিকাগুলি প্রত্যাখ্যান করলেও একটি নবোদিত সাপ্তাহিকে তার লেখা বেরিয়েছে। সম্পাদক নারায়ণ বাবুর মন্তব্য-পত্রখানিও তার অন্তর মনে রেখাপাত

করেছে। তিনি বলেছেন, উড়ে-যেড়ো-সাঁওতাল নিয়ে গল্প রচনা না করে, সে যেন বাঙালী নরনারীর চরিত্র গঠনে সচেষ্ট হয়। নৈলে, বাঙালী পাঠক তাকে কোনও দিন গ্রহণ করবে না। তার উচিত বাংলাদেশে এসে কিছুকাল বাস করা। নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আশা, আকাঙ্ক্ষা, উল্লাস, বেদনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হওয়া। তাদের দোষ-গুণগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে পর্যবেক্ষণ করা। যেহেতু, বাংলা দেশের লেখক ও পাঠক প্রধানতঃ এই শ্রেণীরই অন্তর্গত। তবে এই চরিত্র বিশ্লেষণ অতি সাবধানতার সঙ্গে নিরাসক্ত ভাবে করা কর্তব্য।—এদের সুখদুঃখে জড়িয়ে পড়লেই সর্বনাশ।

গ্রামে আসার পর থেকে নারায়ণবাবুর উপদেশগুলি অক্ষরে অক্ষরে পালন করে চলছিল প্রকাশ। নিজের গাম্ভীর্য বজায় রেখে, অতি সন্তর্পণে সকলের সঙ্গে মেলামেশা করত। জ্ঞাতিবর্গ তার বেশির ভাগই থাকেন প্রবাসে বা কলকাতায়। তাই সামাজিকতা রক্ষার জন্যে কারও বাড়ি যাওয়া-আসার বালাই তার ছিল না। ওড়িয়া ভৃত্য নিত্যানন্দকে এনেছিল সঙ্গে। সে-ই তার রন্ধনাদি কার্য সম্পন্ন করত। আর প্রকাশ নিলিপ্ত দর্শকের চশমা এঁটে, পানিহাটী, সোদপুর, খড়দা, টিটাগড়ে জয়ন্তী, মৃত্যুবার্ষিক, নৃত্যানুষ্ঠান, নাট্যাভিনয় প্রভৃতি উৎসবে হাজিরি দিয়ে বাঙালী নরনারীর বৈশিষ্ট্য, বৈশিষ্ট্যগুলি আহরণ করে বেড়াত। নূতন আলাপীদের অবাঙালী রীতিতে স্পষ্টই বলে দিয়েছিল যে, তার লেখার অভ্যাস আছে, বাড়িতে সে কারও সঙ্গে দেখা করে না। ক্লাব, লাইব্রেরী, চায়ের দোকান তো রয়েছেই। অতি কৌতূহলী কেউ বাড়িতে আলাপ জমাতে এলেও প্রকাশ তাকে প্রশ্রয় দেয়নি। কিন্তু ব্যতিক্রম ঘটল।

সেদিন দুপুরে নিজের ঘরে বসে প্রকাশ লিখছে, এমন সময়, সৌম্য, নমস্কারান্তে একটি প্রৌঢ় এসে তার সামনে দাঁড়ালেন। চমকে উঠল সে। গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল তার। বাইরের দরজা বন্ধ, ভদ্রলোক ঢুকলেন কী করে? তা ছাড়া পায়ের শব্দও তো তার কানে আসেনি। লেখায় কি সে এতই তন্ময় হয়েছিল? তার মৈত্রক ভিটের ভৌতিক উপদ্রবের কথা তো কোনও দিন শোনে নি! তাও দিনদুপুরে!

ভদ্রলোক নিমেষে যেন তার মনের কথা বুঝে নিলেন। স্মিত হাস্যে বললেন, আশ্চর্য হচ্ছ এলাম কি করে? তোমার পাচক মহাপ্রভু যে এই মাত্র খিড়কি-দরজা হাট করে বাইরে গেলেন। আর পায়ের শব্দ পাওনি রবার-সোলের জুতো পরি বলে। শব্দ করে খাওয়া আর শব্দ করে হাঁটা দুটোই আমার কেমন সহ্য হয় না।

ভদ্রলোকটির অনধিকার প্রবেশে প্রকাশের অবাঙালী মন ক্রোধে তর্জন করে উঠলেও তাঁর বয়স এবং ব্যক্তিত্ব কিছুটা সম্ভ্রম জাগিয়ে তুলল তার মনে। টেবিলের অপর পার্শ্বের চেয়ারটি দেখিয়ে গম্ভীর মুখে তাঁকে বসতে বলল সে।

ভদ্রলোক বললেন, শরৎবাবুর ছেলে তুমি, আজ পাঁচ সাত দিন হল গ্রামে এসেছ, কৈ, আমাদের রায় পাড়ার দিকে তো যাওনি? তারাপদর মুখে শুনলাম তোমার লেখা-টেখার নাকি অভ্যাস আছে? তাই তো ছুটে এলাম আলাপ করতে। কুণ্ঠা-সঙ্কোচে ভরা আধ-ফোটা লেখকদের লেখা আমার বড় ভাল লাগে। যাঁরা ফোটা লেখক। অর্থাৎ যাঁদের কাছ থেকে পিঠ চাপড়ানি পাবার লোভে তোমরা আকুলি বিকুলি কর। তাঁদের লেখা, বারবনিতার রূপসজ্জারই সামিল। পাউডার, প্রলেপ আর রং।

যুক্তির ধারাল তলোয়ার ঘুরিয়ে তাঁর কথার প্রতিবাদ করতে গিয়ে প্রকাশ দেখল, হাতে কেবল তার হাতেলটিই আছে। তলোয়ারখানা কখন যে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে সে নিজেই টের পায়নি। তরুণ লেখকদের প্রতি তাঁর দরদী মনোভাবের সামান্য ইঙ্গিতেই কাবু হয়ে পড়েছে সে।

প্রথম আলাপেই তিনি প্রকাশের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করলেন। তাঁর সাহিত্য সম্বন্ধে জ্ঞান ও পড়াশুনার পরিধি দেখে অবাক হয়ে গেল সে। শুনল, তরুণ বয়সে তাঁরও নাকি লেখার ঝোঁক ছিল। সেকালের প্রখ্যাত পত্রিকাগুলিতে তাঁর কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল। তার পর?—"সংসার মোহ অতীব বিচিত্রং।"

সেদিন সাহিত্য সম্বন্ধে বহু আলোচনাই হল তাদের মধ্যে। ওঠবার সময় ভদ্রলোক বললেন, একদিন এস আমার বাড়িতে! রায়পাড়ায় গিয়ে ক্ষেত্রমোহনের নাম করলে সবাই চিনিয়ে দেবে।

—ও, তুমি তো গ্রামে এই প্রথম এলে? রায়পাড়া, জেলেপাড়া, ডোমপাড়া চিনবে কি করে। পথ বলে দিই শোন! সামনের পাকা রাস্তা ধরে খানিকটা গেলেই দেখবে, একটা মেটে পথ ঢালু হয়ে নেমে গেছে দক্ষিণমুখো। ওটা গেছে বিরিঞ্চি কর্মকারের বাগানের ঠিক মাঝখান দিয়ে। বাগান পার হলেই দেখবে, বিষ্টু দাসের কুঁড়ে। দাওয়ায় বসে সব সময় মাছ ধরার জাল বোনে সে। তার পর তোলা ডোমের বস্তি। এরই সামনা-সামনি রায়েদের ভিটে। অন্দর মহল, কাছারি বাড়ি, পূজার দালান সবই খসে গেছে। কেবল বৈঠকখানার অংশটুকু এখনও টিঁকে আছে। —হেসে বললেন, সামনেই একটা মাচানে দেখবে কচি কচি শশা ঝুলছে। বাড়িতে আমার সব সময়ই পাবে। বৈঠকখানায় বসে বই পড়ি আর বাগান পাহারা দিই। এস একদিন। বুঝলে?

প্রকাশ বলল, এই একটা লেখা নিয়ে একটু ব্যস্ত আছি কাকাবাবু। এটা শেষ হলেই আসব।

এই ভাবে ক্ষেত্রমোহনবাবুর সঙ্গে তার প্রথম দিনের পরিচয় ঘটে। এরপর আরও কয়েক দিন তিনি এসেছেন। জিজ্ঞাসাও করেছেন—কৈ হে, তুমি এলে না আমার বাড়ি?

প্রকাশ উত্তর দিয়েছে, এই লেখাটা শেষ হলেই আসব কাকাবাবু।

ইচ্ছে করেই সে লেখার ওজর দেখিয়েছিল। কারণ, কথায় কথায় একদিন তিনি বলেছিলেন —জান প্রকাশ, বাড়িতে 'ইয়াংম্যান'-দের আসাটা আমি পছন্দ করিনা। আমার মেয়েরা বড় হয়ে উঠছে। এই বয়ঃসন্ধিকালে হালকা ধরণের লোকের প্রভাব ওদের ওপর পড়াটা ঠিক নয়।— প্রকাশের চোখের দিকে চট্ করে একবার চেয়ে তখনই বললেন, দেখো, উল্টো মানে করো না যেন! তোমার কথা আলাদা। তুমি হলে লেখক। যাকে বলে—কথা-শিল্পী। তুমি এলে আমরা আনন্দ পাব। লেখাটা শেষ হলেই এস!

তা সত্ত্বেও প্রকাশ যায় নি।

দু-একদিন পরে তিনি আবার এলেন। বললেন, কৈ, তোমার লেখা শেষ হল? আমার মেয়েরা যে তোমার লেখবার জন্যে ব্যস্ত হয়েছে। রক্ত মাংসের লেখকী লেখক আমাদের কদমতলা গ্রামে একটিও নেই কিনা। ধরিত্রী পত্রিকার সব কটা সংখ্যা সংগ্রহ করে তোমার "মৃত্যুবাণ" উপন্যাসটি ওরা পড়েছে। আমিও পড়লাম। বেশ হয়েছে! বিশেষ করে যেখানটায় সুকর বুড়োকে মদ খাইয়ে তার মেয়েটাকে কুলী-কবাড়ি থেকে টেনে নিয়ে গেল অন্যরা 'কনট্রাকটার'। বড় সাহেবকে

ভেট দিয়ে কন্ট্রাক্ট রিনিউ করাতে। আদিবাসিনীর আর্তনাদে শিউরে উঠল দাবলাপাড়ার তমসাচ্ছন্ন মৌহাবন।—আর ও আয়গাটাও বেশ পেয়েছে আমার। বেখানটায়,—নেশা কাটলে সুরুক বুড়ো বহুকে ছিলে পরিয়ে, বিষ মাখান, পালক বাঁধা তীর হাতে, স্খলিত পদে বড় সাহেবের বাংলোর দিকে ছুটল প্রতিশোধ নিতে।—কম্পাউণ্ডে ঢুকতেই মেয়ে লাসি মুখে অভ্যর্থনা জানাল বাপকে। বলল, সাহেবকে বলে, কুলীর সর্দার করে দেবে তাকে।—বিকট হাসে সুরুক তীরের ফলাটা নিজের পেটেই বিঁধিয়ে দিল।—দেবু খুব প্রশংসা করছিল তোমার লেখার। ওর সম্ভাবনাও প্রচুর। তবে মুখবোজা। আজ চল না আমার বাড়িতে। রবিবার, ওরা সকাল সকাল আসবে। ওরা মানে দেবব্রত আর সুধাকান্ত। আমার দুটি বাল্য বন্ধু। প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় ওরাই কেবল আসে আমার বাড়িতে। সুধাকান্ত অবশ্য ইয়ারেঙদার। মাড়োয়াড়ীদের সঙ্গে ওর কারবার কিনা। তা ছাড়া ও একজন নামকরা গাইয়ে। যাকে বলে, কণ্ঠ সঙ্গীত-শিল্পী। স্বাস্থ্যটিও রেখেছে চমৎকার। মাথার একগাছি চুল পাকে নি। ঝকঝকে দাঁত, রসগোল্লা রং। কে বলবে আমার সমবয়সী। বউ মারা যাবার পর আর বিয়ে করেনি। গান-বাজনা নিয়েই আছে। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের দিকেই ঝোঁক বেশি। আমার মেয়ে শীলাকে অবশ্য আধুনিক এবং অন্যান্য আজের সঙ্গীতও শেখাচ্ছে। যুগধর্ম মানতে হবে তো! আর দেবব্রত?—সত্যিই ভীষ্মদেব! সরকারি অফিসার। হাজারের ওপর মাইনে পাচ্ছে। তবু এতটুকু দম্ভ নেই, আড়ম্বর নেই, ঔদ্ধত্য নেই। নিজে বিয়ে করেনি। ভাইপো ভাইঝিদের মানুষ করছে। জীবনের নানা ক্ষেত্রে বিড়ম্বিত হলেও, বন্ধুভাগ্যে আমি নিজেকে গরীয়ান্ বলে মনে করি প্রকাশ। তাই মেয়েগুলোকে বলি, ওরে, এমন সুযোগ আর পাবি না! দেবু আর সুধার কাছ থেকে যতটা পারিস নিয়ে নে, নিয়ে নে। শীলা বলে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর আমাদের আগলে রয়েছেন—আমাদের আবার ভাবনা কিসের!—হুঙ্কারে প্রকাশ, আমি হলাম ব্রহ্মা, দেবু বিষ্ণু আর সুধা হল গিয়ে মহেশ্বর।—ঠোঁট চেপে একটু হেসে বললেন, তারা বুদ্ধিমতী আমার এই সেজ মেয়ে। তা প্রায় ষোল পূর্ণ হল। বড় দুজনের বিয়ে হয়ে গেছে কিনা। ওর মা মারা যাবার পর থেকে সমস্ত সংসারটা ও-ই সামলাচ্ছে। তাই গত বছর থেকে বন্ধ করতে হল স্কুল। তারী বুদ্ধিমতী! আজ বিকেলে ফুলকপির সিঙ্গাড়া করবে বলেছে। আজ তোমায় আসতেই হবে! কোনও ওজর আপত্তি শুনব না!

সাহিত্য আলোচনা অসমাপ্ত রেখে পারিবারিক কথায় ওঁকে মেতে উঠতে দেখে বিরক্ত বোধ করছিল প্রকাশ। তবু শেষ পর্যন্ত সে রাজী হল ওঁর বাড়ি যেতে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর রক্ষিত এই ষোড়শীটিকে দেখবার জন্যে কিছুটা ঔৎসুক্য জাগল তার মনে। বিশেষ করে তার মতো অখ্যাত লেখকের লেখা যে মেয়ে তন্ন তন্ন করে পড়ে তাকে সে সাধারণ মেয়ের পর্যায়ে ফেলতে পারল না।

বিকেলে, ধরিত্রী পত্রিকার আপিসে দেখা সাহিত্যিকদের বেশভূষার যথাসম্ভব অনুকরণ করে, ডক্টার ঝিতাগোর বাংলা অনুবাদ ও নিজের কয়েকটি লেখা নিয়ে ক্ষেত্রমোহনবাবুর বাড়ির দিকে রওনা হল। ঢুকল বিরিঞ্চি কর্মকারের বিরাট বাগানের মধ্যে। দেখল, বিষ্টু মালের জাল বোনা। ভোলা ভোমের বস্তি। দেখল, কাছারি অন্দর মহল ভাঙা রায়বাড়ির বৈঠকখানা। মাচানে ঝুলছে কচি কচি পাখা। চুন-বালি খসা বাড়ি। চিনতে তার কষ্ট হল না। বর্ষায় গজিয়ে-ওঠা আগাছায় সামনের জমিটা ভরতি। বেলে পড়েছে সব দিকেরই বেড়া। এই জমিটুকুতেই বাগান আখ্যা দিয়েছিলেন

ক্ষেত্রমোহনবাবু। বৈঠকখানায় ঢুকে আরো ঘনে গেল সে। ছেঁড়া মাদুর পাতা একখানা তক্তপোশ, বেত ছেঁড়া তক্তামারা একখানা ইজিচেয়ার আর কোণে একটা পুরনো আমলের গোল টেবিল। তাকের বইগুলির দিকে চেয়ে বুঝল পাঁজি ছাড়া আর কিছু নয়। ঘনেদী বংশের নিদর্শন স্বরূপ একজোড়া হরিণের শিং দেয়ালের মাঝখানে টাঙান। ঘুসঘুসে চর্মাবরণ পোকায় কাটা, চোয়ালের হাড় বেরিয়ে পড়েছে। জানালার কাঠের গরাদ বেশির ভাগই লুপ্ত হয়েছে। জীর্ণ কপাটের কাটল বেরিয়ে পড়েছে জায়গায় জায়গায়। দেবব্রত ও সুধাকান্তের সঙ্গেও আলাপ হল তার। উৎসাহ পেল না সে। মনে হল, প্রাণহীন, ব্যক্তিত্বহীন বিষয় দুটি বৃদ্ধ রায়বাড়ির ধ্বংসস্তূপে এসে শেষ আশ্রয় গ্রহণ করেছে। তারপর নীলাকে দেখে সম্পূর্ণ হতাশ হয়ে পড়ল সে। শাড়ি জড়ানো একখানি কঙ্কাল। যোড়শীর কোনও সৌষ্ঠবই তার মধ্যে খুঁজে পেল না প্রকাশ। তার পরের বোনগুলির অবস্থাও দেখল তাই। একা ক্ষেত্রমোহনবাবুই জমিয়ে রাখলেন আসর। ধর্ম, সাহিত্য, বিজ্ঞান, রাজনীতি সকল বিষয়েই তাঁর বাকপটুত্ব প্রশংসনীয়। দেবব্রত ও সুধাকান্ত কেবল সায়ই দিয়ে যাচ্ছিলেন তাঁর কথায়। যুক্তি উক্তির বাণ বর্ষণে তাঁর যুক্তি খণ্ডন করে একাই যুদ্ধ করছিল প্রকাশ। আর অযুধ্যু হয়ে তক্তপোশের এককোণে বসেছিল নীলা। পিতা ও প্রকাশের বাক্য-সংযোজন, বাক্য-সন্ধান ও বাক্য-মোক্ষণের কৌশল ও ক্ষিপ্রতা অনভিজ্ঞ যোদ্ধার মতো অবাক হয়ে দেখছিল। ভিতর-বাড়ির দালানে জলখাবার খেতে গেল প্রকাশ। দেখল, বৈঠকখানার মতো ভিতর-বাড়িও শ্রীহীন, অপরিচ্ছন্ন। উঠানে তরকারির খোসা, ছুঁচো কাগজ, ভাঙা চায়ের পেয়ালা, নোংরা ন্যাকড়া, জটপড়া চুল ও উনুনের ছাই স্তূপাকার হয়ে রয়েছে। রান্নাঘর শোবার ঘরও সম্প্রতি বেছেছে বাড়ির আবহাওয়ার সঙ্গে। কেবল পরিবেষ্টনের বস্তু পরিপাটী রাখবার জন্যে একটা উৎকট প্রচেষ্টা ক্ষেত্রমোহনবাবুর মধ্যে লক্ষ্য করল সে।

বাড়ি ফিরে এসে এই ছিন্নভিন্না পরিবারটির কথা চিন্তা করতে লাগল প্রকাশ। উঠানের আবর্জনা ও বাইরের আগাছা ছাড়া নোট করবার মতো আর কিছুই সে খুঁজে পেল না। ক্ষেত্রমোহনবাবুর মতো বাকপটু লোক সে অনেক দেখেছে কলকাতার পত্রিকা-আপিসগুলোতে। মেড়হাজারী অফিসার তো টাটার কোয়াটারে কোয়াটারে। আর মাড়োয়াড়ীদের লেজুড় এই সুধাকান্তের দল তো ভারতের প্রদেশে প্রদেশে। বৈচিত্র্য এদের কারো চরিত্রে নেই। তা ছাড়া লালিত্য বা কমনীয়তার লেশমাত্র নেই এই নীলার চেহারায়। আকর্ষণ করে না পুরুষকে। তবু সে প্রায়ই যেত নীলুদের বাড়ি, ক্ষেত্রমোহনবাবুর সঙ্গে সাহিত্য আলোচনার উদ্দেশ্য নিয়ে। বেলা থাকতেই যেত। বেশিরভাগ দিনই উঠে পড়ত, দেবব্রত ও সুধাকান্ত আসবার আগে। এদের সঙ্গ ভাল লাগত না তার। নীলা এসে চা দিয়ে যেত। তন্ময়তার ভাণ্ডিরে প্রকাশ দু'একটা কথা বলত তার সঙ্গে। কুণ্ঠিত, দ্বিধাগ্রস্ত তার ভাবভঙ্গী দেখে বিরক্ত হত সে। সাহিত্য আলোচনার মাঝখানে সুযোগ পেলেই কন্যার প্রশস্তি গাইতেন ক্ষেত্রমোহনবাবু। বলতেন, বড় লাজুক ও। ইজি আর পিসি ছাড়া কারো সঙ্গে ও সহজভাবে কথা কইতে পারে না। বুঝতে না পেরে প্রকাশ জিজ্ঞাসা করে, ওর ছোট বোনেদের নাম বুঝি?—ক্ষেত্রমোহনবাবু বলেন, না না। দেবব্রতকে ও ধরাবর এই ইজিচেয়ারটাতে শুতে দেখছে কিনা। তাই ছেলেবেলা থেকে ওকে ইজি বলে। আর সুধাকান্ত একদিন কাঁধে করে ওকে পি বরাগোলের মেলায় নিয়ে গিয়েছিল। সেই থেকে ওকে বলে পিসি।

বৈঠকখানার দরজা দিয়ে ভিতর বাড়ির দালানের খানিকটা দেখা যায়। তর্ক-বিতর্কের মাঝখানে হঠাৎ প্রকাশের নজরে পড়ে, ভিজে কাপড়ে জড়সড় হয়ে ছুটে যাচ্ছে শৈলা। কোনও দিন বা জলভরা বালতি হাতে ক্রত পায় চলে যায় দালান পার হয়ে। মুঠোয় গুটিয়ে তোলা শাড়ি। চলার ছাঁদে গোলাপী সায়ার ঝালর দুলে দুলে ওঠে। কখনো মনে হয় তার গায়ের রং। কখনো মনে হয় তার গড়ন।

দুচারদিন আসা যাওয়া করতেই শৈলার আড়ষ্টতা অনেকটা দূর হল। কিছুটা সহজভাবে সে কথা কইতে আরম্ভ করল প্রকাশের সঙ্গে।

কোনও কোনও দিন সন্ধ্যা পর্যন্ত থাকলে, দেবব্রত এসে পড়ত। তখনই ইজিচেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে উচ্চরবে প্রকাশ বলে উঠত,—ও শৈলা, তোমার ইজি এসে গেছেন! ইজি চেয়ারের পায়মেনেন্ট খদ্দের! আমি এবার উঠি।—পরিহাসের সুরে বললেও, কথাগুলো নিজের কানেই তার বিশ্রী ঠেকত। সুধাকান্ত এলেও এই ধরণের মন্তব্য করত সে।

এদিকে ছুটি তার ফুরিয়ে আসছে। ভাবছে দিন পনরোর এক্সটেনশন নেবে কি না। সেদিন শৈলা বলছিল,—প্রকাশদা, কলকাতাতেই একটা চাকরি করুন না কেন?

ছেলেমানুষ জানে না, অত টাকা মাইনের চাকরি কলকাতাতে পাওয়া কত কঠিন। ক্ষেত্রমোহন বাবুর সাংসারিক অবস্থার কথা ভেবে, চিন্তিত হয়ে পড়ে সে। ভদ্রলোক চালান কি করে? উপার্জন তো নেই বললেই হয়। জমিতো সব ইটখোলার মহেন্দ্র মিশির দখল করে বসে আছে। মাঝে মাঝে নাকি কিছু দেয়। কিন্তু তাতে এত বড় সংসারটা কি চালান সম্ভব? তিন মেয়ের স্কুলের মাইনে, বই, জামা-কাপড়, জলখাবার!—ভেবে কূল-কিনারা পায় না প্রকাশ। একটা জিনিস তার ভারী চোখে ঠেকে দেবব্রত আর সুধাকান্তের সেবা যত্নের জন্যে এদের অহেতুক উদ্বেগ। অবশ্য তাকেও খাতির করে। কিন্তু ইজি পিসা এসেছে শুনলে শত কাজ ফেলেও বৈঠকখানায় দৌড়ে আসে শৈলা।

সেদিন একটু রাত্রি করেই গিয়েছিল। দেখল, বৈঠকখানার দরজা ভেজান, সঙ্কোচ কমান, শৈলা 'ওরিয়েন্টাল্ বাম্' মালিশ করছে দেবব্রতর মাথায়। আরো খারাপ লাগল, যখন ক্ষেত্রমোহনবাবু বললেন, চল প্রকাশ, আমরা ভেতরে গিয়ে বসি। দেবুর শরীরটা আজ ভাল নেই। আগে একদিন সুধাকান্তের বেলাতেও এই ব্যাপার লক্ষ্য করেছিল। —ঠাণ্ডা লাগায় তার বুকে পুরনো ঘি মালিশ করে দিচ্ছিল শৈলা। —কুশ্রী একটা সন্দেহ উঁকি দিল তার মনে। —তবে কি ওই লোক দুটো টাকা দিয়ে কিনে রেখেছে এদের? আর শৈলা বাধ্য হচ্ছে ওদের পরিচর্যা করতে? এত সাবধানী হওয়া সত্ত্বেও, দেবব্রত ও সুধাকান্তের বেলায় ক্ষেত্রমোহনবাবু একচক্ষু হরিণের মতো হয়ে পড়েন! এসে পর্যন্ত ওদের গুণগানই কেবল শুনে আসছে তাঁর মুখে। বৃদ্ধকে বাধা দিতেও তার কষ্ট হয়। কী অপরিসীম শ্রদ্ধা আর বিশ্বাস তাঁর এই দুটো 'স্কাউণ্ড্রেলের' ওপর! এর একটা বিহিত তাকে করতেই হবে। সাহিত্য আলোচনার মধ্য দিয়ে এ বিষয় তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করলে কেমন হয়? কিন্তু তার জন্যে সময় চাই। —আরও পনেরো দিনের ছুটির দরখাস্ত করবে স্থির করল সে।

কয়েক দিন পরে, ভোর বেলা, হঠাৎ ক্ষেত্রমোহনবাবু এসে হাজির। একটু যেন উদ্বিগ্ন বলে মনে হল তাঁকে।

নিত্যানন্দ চা দিয়ে বাজার চলে গেলে, প্রকাশ জিজ্ঞাসা করল, আপনি কি অসুখ বোধ করছেন কাকাবাবু? মুখ-চোখ রক্ত শুকনো দেখাচ্ছে?

প্রকাশের ডান হাতখানা চেপে ধরে অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন তিনি। তার পর ধীরে ধীরে বললেন, না প্রকাশ-অসুস্থ নয়। বড় অসহায় বোধ করছি নিজেকে। পৃথিবীতে কাউকে আর বিশ্বাস করতে পারছি না। যা শুনেছি, যা দেখেছি তা বলতেও আমার জিব জড়িয়ে যাচ্ছে! জান, আজ বছর পাঁচেক হল আমার কোনও স্থায়ী উপার্জন নেই। জমি তো সব ইট খোলার মহেন্দ্র মিশির দখল করে বসে আছে! আগে যেটা টাকাই দিত। দুই মেয়ের বিয়েতেও দিয়েছিল। এখন বলছে জমি তার। কেস লড়াও আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তিন মেয়ের স্কুলের মাইনে, সংসারের খরচ, রায় বংশের খাওয়া-পরার standard maintain করে কি করে যে চালিয়েছি সে কথা কল্পনাতেও কেউ কল্পনাও করতে পারে না। —দেবু শুধাও না। এবার পূজায় হাজার খানেক টাকা মহেন্দ্র মিশির দেবে বলেছিল। কিন্তু একদিন নালিশ করবো বলে চোখ রাঙিয়ে ছিলাম তাই 'প্রমিস্' করেও টাকাটা দিলে না। মেয়েগুলো অসুরের মতো আবদার করল, শাড়ি, সায়া, ব্লক, জুতোর জন্যে। সে একেবারে কান্নাকাটি, মাথাকোটাকুটি! বৈঠকখানায় বসে দেবব্রত আর সুধাকান্ত সব শুনল। সব জানল। বড়লোক ওরা। হাজার টাকা তো ওদের daily income বললেই হয়। একজনের ঘুষে, আর একজনের কটকায়। বাংলাদেশের দুর্ভাগ্য কি জান প্রকাশ, এদেশের মেয়েরা কেউ মায়ের জাত নয়। সবাই প্রিয়ার জাত। এম. এ. পর্যন্ত পড়েছি। ভাল ভাল কাজের সুযোগ পেয়েছি বিদেশে। গিন্নী বেঁচে থাকতে কোনও দিন বাড়ির বাইরে যেতে দেয়নি। লেপ্টে থেকেছে গায়ে গায়ে। তখন জমিও ছিল অনেক, জিনিস-পত্রও ছিল সস্তা। দিন একরকম চলে যেত। প্রকাশ, সোজা কথাটা মুখে আটকে যাচ্ছে, তাই এত কথা বলছি। পূজায় আমার কোনও অভাবই হয়নি। নীলার শাড়ি, সায়া, ব্লাউজ জুতো হয়েছে। বাকি তিনজনের আধুনিক ফ্যাসানের 'মুষলে আজাম' ব্লক্ হয়েছে। বিজয়ার মিষ্টান্ন বিতরণও বাদ পড়েনি। মেয়েদের মুখে হাসি ফুটেছে। কিন্তু আমি একেবারে মরে গেছি প্রকাশ!—প্রকাশের হাত ছেড়ে, ঠোঁট চেপে, কয়েক বার চোখ পিট পিট করে, ফিস ফিস করে বললেন, পুরনো বাড়ির কপাটের কাটা কুটো বড় সাংঘাতিক প্রকাশ! বৈঠকখানায় ঢুকতে গিয়ে সে দিন থমকে দাঁড়ালাম। দেখলাম, দেবব্রত দুঃশাসন হয়ে গেছে! শাড়িগুলো ওরই দেওয়া কিনা। কপাটগুলো মেরামত করান দরকার। সে দিন আবার দেবব্রত ছিল না, সুধাকান্ত গান শেখাচ্ছিল। নীরব সঙ্গীত ঠিক কোন অঙ্কের বুঝতে না পেরে, ভাবলাম ঘরে ঢুকি একবার। পারিনি ঢুকতে। গরল স্রোত ঘর উপচে দরজার ফাটল দিয়ে প্রবেশ করল আমার কানে—নিলা! অহল্যা! পাষাণী! আজ একি বেশে দেখা দিলে তুমি?—উষায় তোমার কেশ, সজল তোমার চোখ, লোভন তোমার দেহ-বল্লরী!—মল্লারে, বেহাগে, কামোদে মিশিয়ে আজ এ কি সুর শোনালে নীলা!—ও আমার কণ্ঠ-সঙ্গীত শিল্পী নিলা!

স্তম্ভিত হয়ে এতক্ষণ ক্ষেত্রমোহনবাবুর কথা শুনছিল প্রকাশ। উত্তেজনায় বাক্‌রোধ হবার উপক্রম হল তার। তোতলাতে তোতলাতে বলল, আপনি এই সব tolerate করেন কাকাবাবু! দুটো pervert বুড়োকে Lunatic Asylum-এ পাঠাতে পারেন না?—আমাকে অনুমতি দিন, আজ এসে ঘাড় ধরে দুটোকে বার করে দেব!

তেমনি ফিস ফিস করেই ক্ষেত্রমোহনবাবু বললেন, আমি বড় ভীরু প্রকাশ। তা ছাড়া ওরা যে আমার বাল্যবন্ধু। লোক জানাজানি হবে যে!

প্রকাশ বলল, আসব কাকাবাবু, আসব! রোজ আসব। দরকার হলে without pay ছুটি নেব। ওই বুড়ো ছুটোকে শায়েস্তা করে তবে ছাড়ব!

বরাভয়ের মতো ডান হাতখানি তুলে ক্ষেত্রমোহনবাবু বললেন, সে দায়িত্ব আমার প্রকাশ। আমিই ওদের ব্যবস্থা করব। তুমি শুধু একবার করে এস রোজ। তুমি এলে আমি খানিকটা জোর পাই। তোমার মনের গঠনের সঙ্গে আমার অনেকটা মিল আছে কিনা!

ক্ষেত্রমোহনবাবু চলে যাবার পর, ঘরময় পাইচারি করে বেড়াতে লাগল প্রকাশ।—যা ভেবেছিল ঠিক তাই ঘটেছে। শীলার জড়সড় ভাব দেখে, প্রথম দিনেই বুঝতে পেরেছিল, ভিতরে একটা গণ্ডগোল আছে। নৈলে এত কুণ্ঠা, এত ভয় তার কিসের?—ইজি-পিজা! আজ হিজিবিজি করে ছেড়ে দেবে তার ইজি-পিজাকে।

খাওয়া-দাওয়ার পরেও মনের খুশ্‌তা ফিরে গেল না প্রকাশ। ভাবল, শীলার সঙ্গে তার একবার দেখা করা কর্তব্য। আরশির সামনে চুল আঁচড়াতে গিয়ে দেখে, সকালে দাড়ি কামাতে ভুলে গেছে। তাড়াতাড়ি কামাতে গিয়ে কেটে গেল দুখানায়। ছুটতে গিয়ে ছোট বড় হয়ে গেল গোঁফ। হাওয়াই শার্ট আর প্যান্ট পরে যাবে, না ধুতি পাঞ্জাবি? পাট-ভাঙা কাপড় পরবে না আধময়লা?—অদ্ভুত সহপক্তি এই ক্ষেত্রমোহনবাবুর! বললেন, মিল আছে আমাদের চরিত্রের মধ্যে।

কামারপাড়া, জেলেপাড়া, ভোমপাড়া হয়ে ক্ষেত্রমোহনবাবুর শশা মাগনের কাছে গিয়ে পৌঁছল প্রকাশ। দেখল, বৈঠকখানায় তিনি ঘুমচ্ছেন। ভিতরের ঘরে একলা বসে উল বুনছে শীলা। ছোট বোনেরা গেছে স্কুলে।

তাকে দেখে, চমকে দাঁড়িয়ে উঠল শীলা। বলল, একি প্রকাশদা যে, হঠাৎ? ডেকে দেব বাবাকে?

শীলা একলা থাকবে প্রকাশ জানত। গ্রামে আসার পর থেকে সে যেন একটা দিব্যদৃষ্টি লাভ করেছে। কখন কি ঘটবে আগেই সে কথা বুঝতে পারে।—কণ্ঠে রুক্ষতা এনে বলল, না, ওঁকে বিরক্ত করো না। আমি এখনি যাব। শুধু লেখক হিসেবে একটা কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করতে চাই শীলা। শাড়ি, সায়া, জুতো ব্লাউজের প্রলোভনে মেয়েরা কি পিতৃসম্মান, শুচিতা, বংশমর্যাদা নিঃশেষে বিলিয়ে দিতে পারে? তুমি ছেলেমানুষ হলেও এটুকু বোঝবার বয়স তোমার নিশ্চয়ই হয়েছে!—নৈয়ায়িকের গাম্ভীর্য সহসা বিলুপ্ত হল মোহগ্রস্তের বিলাপে।

—প্রকাশ বলল, আমার জায়গায় তোমার ইজি-পিজা এসে এতক্ষণ তাঁদের সোহাগ করে বসিয়ে মাথায় ওরিয়েন্টাল বাম্ মালিশ করে দিতে—বুকে পুরনো ঘি।—দেড়হাজারী অফিসার আর কণ্ঠসঙ্গীত-শিল্পীর মোড় সংবরণ করা সাধারণ মেয়ের পক্ষে কঠিন, সে কথা আমি স্বীকার করি। কিন্তু কাকাবাবুর মুখের দিকে তাকালে আর আমার মাথার ঠিক থাকে না। তোমার ইজি-পিজার কীর্তি-কলাপ আজ সকালে তাঁর মুখে সমস্ত শুনেছি। তাই জানতে চাই—। কথা শেষ করবার আগেই থেমে গেল প্রকাশ। দেখল, থর থর করছে শীলার মুখ। দুচোখে টলটল করছে জল। বাঁধে গ্রীবা হেলিয়ে বঙ্কিম ভঙ্গীতে জানালার কাছে দাঁড়িয়ে আছে সে। যেন অন্তরার চিত্র। চুল গেছে তার খুলে। আলুথালু তার আটপৌরে হলুদরাঙা শাড়ি. প্রকাশের মনে হল বোড়শীর রূপসাধনা আলোর মতো ঠিকরে বেরুচ্ছে তার প্রতি লোমকূপ থেকে। ক্ষেত্রমোহনবাবুর মুখে শোনা, সুধাকান্তের

প্রলাপ উক্তিগুলি মনে পড়ল তার।—শিলা, অহল্যা, পাষাণী! আজ একি বেশে দেখা দিলে তুমি! উদাস তোমার কেশ, সজল তোমার চোখ, লোভন তোমার দেহ-বল্লরী! মন্দারে, বেহাগে, কাফোরে মিশিয়ে আজ একি সুর শোনালে শীলা!

কথা বলল শীলা। গড়িয়ে পড়তে দিল না চোখের জল। বলল, প্রকাশবাবু, লেখকদের চোখ, লেখকদের মন কি রকম হয় তা আমি জানি না। তবে মানুষের চোখ দিয়ে যদি আপনি আমাদের দেখতেন তা হলে প্রথম দিনেই বুঝতে পারতেন যে, আমার বাবা বদ্ধ উন্মাদ। এই সময়টায় একটু ভাল থাকেন প্রতি বছর। অন্য সময় বেঁধে রাখতে হয় ওঁকে। হাতে পায়ে দাঁতের দাগ লক্ষ্য করেননি? এরারে আপনি আসার পর থেকে ওঁর পাগলামি অসম্ভব রকম বেড়ে গেছে। কদিন থেকে খুন চেপেছে ওঁর মাথায়। হঠাৎ কঠোর হয়ে উঠল তার চাউনি। দৃপ্ত ভঙ্গীতে বলল, কী বলছিলেন সুধাকাকা আর লেবুকাকার সম্বন্ধে? ওঁরা দেবতা। ওঁরা দুজন না থাকলে কবে আমাদের খুন করে ফেলতেন বাবা! একটু কষ্ট করে রেলের হেড্-আপিসে গিয়ে খবর নেবেন। টাইম টেবিল ডিপার্টমেন্টে দেবব্রত ঘোষ একশ পঁয়তাল্লিশ টাকা মাইনের টাইপিষ্ট। কন্যা স্ত্রী, বিধবা পিসী আর সাতটি ছেলে মেয়েকে প্রতিপালন করতে হয় ওঁকে। পিঁজরাপোল তো কাছেই। একদিন ঘুরে এলেই জানতে পারবেন, সুধাকান্ত মিত্র পঞ্চাশ টাকা মাইনের চটের ওপর বসে খাতা লেখেন। কণ্ঠে ওঁর কষ্টি আছে তিনি বৈষ্ণব বলে। তবে সঙ্গীত আছে, সে কথা আপনার মুখ থেকে এই প্রথম শুনলাম। আর বড় মামার মাসহারায় আমাদের সংসার চলে, সে কথা গ্রামের সবাই জানে। আপনাদের মতো কল্প-কল্পনা-বিলাসী লেখকেরাই কেবল পারে মানুষ সম্বন্ধে এমন অদ্ভুত মনোভাব পোষণ করতে। আমার বিকৃত মস্তিষ্ক বাবার মধ্যে আপনি আপনার হীন মনোবৃত্তির প্রতিচ্ছবি দেখেছেন এতদিন ধরে।—এইবার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল তার। ধরা গলায় বলল—কিছু মনে করবেন না! অসম্মান আমি করতে চাইনি আপনাকে। বাবার পাগলামি বড় উৎকট ধরণের। আপনাকে উনি সম্মোহিত করে টেনে এনেছেন আমাদের বাড়িতে। কেবল আমার সঙ্গে ইঁদুর বেরালের মতো খেলা করবার জন্যে। মেলামেশা করবার সুযোগও দেবেন আবার সন্দেহও করবেন। এতে একটা পৈশাচিক উল্লাস বোধ করেন তিনি।—এগিয়ে এসে, প্রকাশের হাতদুটি ধরে আবেগভরা কণ্ঠে বলল,—প্রকাশবাবু, ক্ষমা করবেন আমাকে! অনেক অপ্রিয় কথা বললাম, যা আমার বয়সের মেয়ের মুখে অশোভন। কিন্তু আমিও তো পাগলের মেয়ে! বাবা যে পণ্ডিত পাগল! কথা ওঁর কাছ থেকেই শিখেছি। আর শিখেছি আপনাদের মতো লেখকদের লেখা পড়ে। আপনার ছুটি যদি শেষ হয়ে থাকে, ফিরে যান টাটায়। নৈলে এখন থেকেই বাবাকে বেঁধে রাখতে হবে। যান বলতে নেই। আসুন আপনি!

নির্বোধের মতো কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে বাড়ি ফিরে এল প্রকাশ।

জল খেয়ে সুস্থ হয়ে ক্ষেত্রমোহনবাবু বললেন, আমি তা হলে উঠি। তুমি বিকেলে এস চা খেতে! ও, ভয় হচ্ছে বুঝি, পুলিস আমার বাড়ি ঘেরাও করে রেখেছে? অত বোকা আমি নই। অপরাধতত্ত্ব, ক্রয়েড, হ্যাভলক্ এলিস সব আমার পড়া। ওরা নিজের বাড়ি গিয়েই মরেছে। আমার বাড়িতে কোনও 'ক্লু', কোনও চিহ্ন কেউ কোনও দিন খুঁজে পাবে না।

বিশ্বাসে, অবিশ্বাসে, আতঙ্কে, উৎকণ্ঠায় বিমূঢ় হয়ে কিছুক্ষণ বসে রইল প্রকাশ। তার পর জিজ্ঞাসা করল, কাকাবাবু, এ ব্যাপারে শৈলাতো কোনরকমে জড়িয়ে পড়েনি?

হেসে ক্ষেত্রমোহনবাবু বললেন, ঘরার বাড়া নাগ নেই। অত্রাণে আর কার সঙ্গে। এখন তুমি এসেই আবার নতুন করে সব শুরু করা যায়। রায় বংশে অমন গুমখুন অনেক হয়েছে। এটা একটা old story retold আর কি!

ক্ষেত্রমোহনবাবু চলে গেলে, নিত্যানন্দ দরজা বন্ধ করতেই চিৎকার করে উঠল প্রকাশ: নিত্যানন্দ, জিনিস-পত্র বাঁধ! এখনি আমরা টাটায় ফিরে যাব! এ পাগলের দেশে এসেছি আর কিছুদিন থাকলে আমরাও পাগল হয়ে যাব!

জিটের তালা বন্ধ করে সাইকেল রিকশায় উঠতেই দেখে, দেবব্রত আর সুধাকান্ত ধরাধরি হাতে বাজার করে ফিরছে। একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচল প্রকাশ! লোক দুটো তবে খুন হয়নি! পাগল তাকে মিথ্যা বিভীষিকা দেখিয়ে অভিভূত করে ফেলেছিল!

তাকে জিনিস-পত্র নিয়ে রিকশায় উঠতে দেখে, আশ্চর্য হয়ে দেবব্রত বলল, সে কি, তুমি চলে যাচ্ছ প্রকাশ? শুনেছিলাম Extension নেবে! তুমি থাকায় আমরা বড় খুশি হয়েছিলাম। শৈলারা একটু প্রাণ পেয়েছিল। ভরসা পেয়েছিল। খেতুর ব্যাপার তো সব জানই! পণ্ডিত পাগল আর কি! ওর পাগলামিতে সায় না দিলেই সর্বনাশ! তুমি শুধু বই-টইয়ের কথা বলে ওকে খানিক ভুলিয়ে রাখতে। নৈলে বড় অত্যাচার করে শৈলার ওপর। অবশ্য তাতেও তেমনি বাগে। বাড়াবাড়ি বাড়লে, কেবল শৈলাই পারে ওকে সামলাতে।

শৈলার কথায় বুকটা টন্‌টন্ করে উঠল প্রকাশের। শৈলা তাকে অনাদর করলেও তার বিষাদ-মলিন মাধুর্যের কথা সে কিছুতেই ভুলতে পারছে না। ভাবল, জিনিস-পত্র নাবিয়ে আবার বাড়ি ফেরে, টাটার কাজ ছেড়ে কয় মাইলেতে কাছাকাছি কোথাও কাজ যোগাড় করে নেয়। না হয় শিক্ষকতাতেই থাকা লিখবে। কিন্তু লজ্জা করতে লাগল তার। দুজনকে প্রণাম করে বিষণ্ণ মনে রিকশায় উঠল। যেন বিছানা, সুটকেসের মতো আর একটা কোন জিনিস, পায়ানীতে না রেখে কেউ সিটের ওপর বসিয়ে দিল।

দেবব্রত বললেন, এ যুগের ছেলে তোমরা, বলতে ভয় করে,—চলে যাচ্ছ। একবার নারায়ণকে প্রণাম করে যেও! কদমতলার আশ্রিত দেবতা! পথে যেতে ডান দিকে মন্দির।

নারায়ণ কথাটি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে কে যেন ধাক্কা মেরে তার ঘুম ছুটিয়ে দিল! রিকশার ওপরেই নড়ে চড়ে সোজা হয়ে বসল সে। নিমেষে দূর হল তার দেহ-মনের বৈকল্য। স্বচ্ছ হল তার দৃষ্টি। বুদ্ধির দীপ্তিতে উজ্জ্বল তার মুখ। হেসে বলল, আচ্ছা দেবুকাকা, তাই করব! তার চোখের সামনে তখন জ্বলজ্বল করে উঠেছে সম্পাদক নারায়ণবাবুর উপদেশ-পত্রখানি—"তবে এই চরিত্র বিশ্লেষণ অতি সাবধানতার সঙ্গে নিরাসক্ত ভাবে করা কর্তব্য। এদের সুখদুঃখে জড়িয়ে পড়লেই সর্বনাশ।"

প্রাচীন কেশবিন্যাস-১

কেশবিন্যাসে আমাদের ঐতিহ্য

উত্তরপ্রদেশে অহীচ্ছত্রের অনুপম ভাস্কর্যে প্রাচীন ভারতীয় নারীর অপূর্ব কেশ-বিন্যাসের দৃষ্টান্ত বর্তমান। এরূপ কেশবিন্যাসের জন্য প্রয়োজন কেশ প্রাচুর্যের। আজকের দিনের আধুনিকতম মহিলার কেশচর্চার বেলাতেও সেই একই কথা প্রযোজ্য। কিন্তু কেশবৃদ্ধির সহায়ক একটি মাথার তেল বাছাই ক'রে নেওয়া এক সমস্যা।

• **অলিভ অয়েল** দিয়ে তৈরী ক্যালকেমিকোর **ক্যান্থারল** চুলের গোড়া শক্ত করে এবং কেশ বৃদ্ধিতে সাহায্য ক'রে এই সমস্যার সমাধান করতে পারে।

ক্যান্থারল

সুরভিসম্পৃক্ত ক্যান্থারাইডিন কেশতৈল

দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ কলিকাতা-২৯

বিশ্ব-উৎসব

(সচিত্র সংযোজন)

ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ

বাংলা সংবাদপত্র

যুগান্তর

স্বাধীন ❋ নিরপেক্ষ ❋ নির্ভীক

সুষ্ঠু ও সবল জনমতের স্বচ্ছ দর্পণ

ও

আকর্ষণীয় বাংলা সাপ্তাহিক

অমৃত

সম্পাদক : শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ

গল্প, কবিতা, উপন্যাস, প্রবন্ধ, খেলাধূলা, ছায়াছবি প্রভৃতি রচনায়
সমৃদ্ধ প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি পাঠকগোষ্ঠিকে প্রকৃত আনন্দ দান করে

আনন্দ চ্যাটার্জী লেন, কলিকাতা—৩

যে দেশে প্রতিদিনই উৎসব ঃ ডেনমার্ক

শীলিমা দে

হান্স ক্রিশ্চিয়ান আণ্ডেরসেন-এর দেশ, রূপকথার রাজ্য ডেনমার্ক। একটি উপদ্বীপ আর শ পাঁচেক দ্বীপ—এই নিয়ে গ'ড়ে উঠেছে দেশটি। এর বিভিন্ন অংশের বাধাবন্ধের ব্যবধান দূর করে সমগ্র দেশটিকে একত্র রেখেছে অসংখ্য সেতু। আর, সমুদ্রের সঙ্গে ডেনমার্ক—এর অন্তরঙ্গ সম্পর্ক আবহমান কাল থেকেই। হাজার বছর আগে এ দেশের বিখ্যাত জলদস্যুরা ভাইকিং জাহাজে চড়ে পাড়ি দিত সাগর। এখনো এ দেশে প্রতি বছর তৈরি হয় অনেক সুন্দর-সুন্দর জাহাজ। সমুদ্রের সঙ্গে যোগাযোগ থাকার ফলে বহু আগে থেকেই মাছের ব্যবসায়ও চালিয়ে আসছে ডেনমার্ক।

ডেনমার্ক-এর রাজধানী কোপেনহেগেন-এর পত্তন হয় আটশ বছর আগে। শহরটির প্রতিষ্ঠাতা বিখ্যাত যোদ্ধা—বিশপ অ্যাবসালন। চমৎকার সব প্রাসাদ, দুর্গ আর গির্জে এখানে ওখানে তৈরি ক'রে সারা শহরটিকে সাজিয়ে গেছেন দিনেমারদের রাজা চতুর্থ ক্রিশ্চিয়ান সপ্তদশ শতকে। এখন অবশ্য দেশ ডেনমার্ক। সব সময়েই হাসি লেগে আছে দিনেমারদের মুখে। আনন্দের সন্ধানী ওরা। বিদেশীদের দিকে অভ্যর্থনার হাত বাড়িয়ে আছে সর্বদাই। শুধু অকারণ পুলকে দিন যাপনের তৃপ্তি ওদের মনে মনে। শীত, গ্রীষ্ম, বসন্ত—সব ঋতুতেই সমান আনন্দ। উৎসবের জন্য কোনো দিনকে আলাদা করে রাখেনি দিনেমাররা। প্রতিটি দিন, প্রতিটি রাতই ওদের উৎসবের। প্রায় প্রতিটি পথের ধারে বইয়ের আর ফুলের দোকান। দোকানীর বালাই নেই, দোকানে পরিচ্ছন্ন সাজে-সাজানো লোভনীয় সব খাবার আমন্ত্রণ জানাচ্ছে বর্ণ আর গন্ধের নিঃশব্দ ভাষায়। আছে রয়েল ব্যালে, যেখানে গিয়ে একবার নাচ দেখলে সম্মোহিত না হ'য়ে উপায় নেই। আর শহরের অনতিদূরেই স্নিগ্ধ শুভ্র বেলাভূমি। কিন্তু নগরের কোলাহল থেকে পালিয়ে সেখানে বেশিক্ষণ চুপ ক'রে বসার উপায় কি আছে! শহরে ফিরে যেতেই হবে একটু পরে। মোহিনীর মতো ডাকছে যে কোপেনহেগেনের প্রমোদ—উদ্যান টিভোলি।

উত্তর ইউরোপের শিল্প—কলার মতো এক প্রদর্শনী—বিপনী যেন ডেনমার্ক। ঝকঝকে আসবাব বাসন পত্র, পশম-শিল্প, জামা-কাপড়, রং বেরঙের কার্পেট, মণি-মুক্তা, নানা রকম পুতুল পথের দুধারের দোকানে—দেখে-শুনে মনে হয় যেন এক মেলা বসে গেছে, সজীব হ'য়ে উঠেছে আণ্ডেরসেনের রূপকথার ক'য়েকটি পাতা।

ফুল—ফোয়ারা—আলোর শহর কোপেনহেগেন এ ধারার সাজানো রয়েছে খোলামেলা জায়গায়। অসংখ্য সৌখিন রেস্তোরাঁয়। ভুবন-বিখ্যাত 'লেডেন বেশনস' আর একেবারে আক্রহীন 'হোটেল হাফনিয়া'য়।

গ্রীষ্ম—যামিনীতে কোপেনহেগেনের উদ্যপুরী প্রমোদ—উদ্যান টিভোলি। রাতে মুখর হ'য়ে ওঠে কলহাস্যে। খাউকে জিজ্ঞেস ক'রে খুঁজে নিতে হয়না উদ্যানটি। দিনের বেলায়ও এটি সরগরম থাকে গানে বাজনায়। আশ্চর্য শান্তি পাওয়া যায় এখানে এসে। এর মুখর ফোয়ারা, ছায়া

—তবু, বর্ষাটা সুগন্ধি ফুল ফেলে দিয়ে আসাই যায়। এ যেন এক স্বপ্নের লীলাপুরী। রাতে জোনাকির মতো মিটমিট করে হাজার হাজার সুখী আলো। নাগর দোলা, পুতুল—নাচ, আর বালে নাচের আসর বসে যায় এখানে—ওখানে। যেন এক মেলাগুরু হ'য়ে গেছে। খাবারের বন্দোবস্তও আছে বাগানের ভেতর। রাতের আকাশ মাঝে মাঝে আলোকিত হ'য়ে ওঠে রং বেরঙের সব হাওয়াই আর তুবড়িতে। টিভোলিতে একটি দিন শেষ হল ব'লে দুঃখ পাবার কারণ নেই। দিনেমারদের একজন রাজা তো ব'লেই গেছেন :

"সামনে আরেকটি দিন তো আছেই —আছে আগামী কাল!"

কোপেনহেগেনের রাত্রির সত্যি তুলনা নেই। সারাটা গ্রীষ্মকাল ধরেই যে শহরটির উৎসব-সজ্জা! টিভোলি-র বহুবর্ণ দৃশ্য ছাড়াও আছে নাচের বড়-বড় হলঘর। 'তেলেন্সিয়া' আর—'অ্যাটলান্টিক প্রাসাদ'-এ সন্ধ্যা হতে না হতেই শুরু হয়ে যায় সুন্দরী নর্তকীদের অপূর্ব নৃত্য। দিনের আলো মিলিয়ে যেতে না যেতেই সাজ-সজ্জার ধুম প'ড়ে যায় কয়েকটি হোটেলে। 'রয়েল থিয়েটার'-এ না গেলে কিন্তু কোপেনহেগেন দেখাই সম্পূর্ণ হল না। এখানে বারোমাস ধ'রেই চলে ব্যালে নাচ, অপেরা, আর নাটক। উৎসব কখনোই শেষ হয় না ডেনমার্কে।

বঙ্কিম রচনাবলী

প্রথম খণ্ডে বাবতীয় উপন্যাস (১৩টি) একত্রে। [১২'০০]

দ্বিতীয় খণ্ডে অন্যান্য বাবতীয় রচনা একত্রে। [১৫'০০]

রমেশ রচনাবলী

রমেশচন্দ্র দত্তের বাবতীয় উপন্যাস (৬টি) একত্রে [৯'০০]

উভয় রচনাবলীই শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল কর্তৃক সম্পাদিত।

ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত

ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য

বইটি রচনার জন্য সাহিত্য আকাদেমী পুরস্কারে ভূষিত। [১৫'০০]

শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের

উপনিষদের দর্শন [৭'০০]

রবীন্দ্র দর্শন [২'৫০]

বৈষ্ণব পদাবলী

সাহিত্যরত্ন শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত প্রায় চার হাজার পদাবলীর বৃহত্তম আকরগ্রন্থ। [২৫'০০]

দ্বিজেন্দ্র রচনাবলী

দুইটি খণ্ডে বাবতীয় রচনা সংগৃহীত এবং উভয় খণ্ডই ডঃ রথীন্দ্রনাথ রায় কর্তৃক সম্পাদিত।

[প্রথম খণ্ড ১২'৫০ ; দ্বিতীয় খণ্ড ১৫'০০]

রামায়ণ কৃত্তিবাস বিরচিত

সাহিত্যরত্ন শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ। ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকা সম্বলিত ও শ্রীসুধা রায় কর্তৃক চিত্রিত। [৯'০০]

— প্রকাশিত হইল —

SAMSAD

Little English-Bengali Dictionary

সহজ বহনীয় আকারে ৪½" × ৬½" × ১"

বাইবেল কাগজে সুদৃঢ় বাঁধাই ; সর্বসাধারণের বিশেষ করিয়া ছাত্র ও অফিস কর্মচারীদের সর্বদা ব্যবহারযোগ্য শব্দকোষ। [১৫০]

সাহিত্য সংসদ

৩২এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিঃ-৯

ইতালীর উৎসব

মলাত্রি সোম

শব্দ, গন্ধ, আর বর্ণের দেশ ইতালী। ম'রেও মরে যায়নি এখানে অতীত, বাসা বেঁধে বেঁচে আছে বর্তমানের বুকে। প্রাণ প্রাচুর্যে উজ্জ্বল আর উজ্জ্বল এ-দেশের নরনারী। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা মনের আনন্দে পথে খেলা ক'রে সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি। মাঝে মাঝে এ দেশের মানুষ আরো সুন্দর, আরো উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে উৎসব উদ্‌যাপনের মুহূর্তে।

ইতালীবাসীর মনের আনন্দ আর সজীবতা সবচেয়ে বেশি প্রকাশ পায় বিভিন্ন বসন্ত—উৎসবে। এই অনুষ্ঠানগুলি বিদেশীদের কাছে চকিতের জন্য উদ্ঘাটিত ক'রে ইতালীর প্রকৃত সত্তা। বাতায়নের মতো। সার্ডিনিয়ার দরিদ্র অধিবাসীরা তাদের আরাধ্য সেন্ট এফিসিয়ো-র মূর্তি নিয়ে মিছিল ক'রে বেরোয় পথে। গান—ভোজন আর হৈ-হল্লা ক'রে কাটিয়ে দেয় সারাদিন। প্রতি বছর অক্টোবর মাসে রোমের পুরোনো শহর ফেরিনোতে নতুন মদ নিবেদিত হয় 'কুমারী'র কাছে। সেই উপলক্ষ্যে পার্কের উদ্যানগুলিতে ফোয়ারা থেকে জলের পরিবর্তে উৎক্ষিপ্ত হয় রং বেরঙের সুরা। উত্তর ইতালীর সহরগুলিতে ঝলমলে পোষাক প'রে কুস্তির লড়াই চালায় স্থানীয় অধিবাসীরা। এই ভাবে মধ্য-যুগকে আবার যেন কিছুকালের জন্য ফিরিয়ে আনে ওরা। আরেজ্জুর অধিবাসীরা ঘোড়ার পিঠে, ভিনিস-বাসীরা নৌকায়, আর পিসাবাসীরা সাঁকো সেতুতে চ'ড়ে উৎসব যাপন করে! মারস্টিকার উৎসব আরো আকর্ষণীয়। সেখানে সহরের মাঝখানে প্রমোদ-উদ্যানে বাবার মতো এক ঘর আঁকা হয়। জমকাল পোষাক প'রে কয়েকজন মানুষই সেখানে হয় বাবার খুঁটি; তারপর সেই খুঁটি নিয়ে শুরু হয় দাবা খেলা।

ফ্লোরেন্সের কশাইরা ঝলমলে পোষাক প'রে আসে আর্নোর দু ধার থেকেই। এরা সাজ-পোশাক পরে মেডিসি রাজকুমারদের মতো। মাঝে মাঝে সময় সংকেত ক'রে গর্জে ওঠে কামান। তবে সবচেয়ে জমকাল উৎসব হল সিয়েনার ঘোড়দৌড়। পুরোনো শহরটির পার্কে দৌড় শুরু হওয়ার আগে সহিসেরা ঘোড়াগুলিকে নিয়ে যায় গির্জায়। সেখানে পাদ্রীরা আশীর্বাদ করেন ঘোড়াগুলিকে। তারপর হাজার হাজার দর্শকের সামনে শুরু হয় ঘোড়দৌড়।

নতুন পোপের অভিষেক উৎসব উপলক্ষ্যেও প্রচুর জন-সমাগম হয়। ইতালীর সেই বিশিষ্ট উৎসবের দিনে রঙিন রেশম, ফুল আর আলোতে ঝলমল করে সেন্ট পিটার গির্জা। পোপ যেদিন সিংহাসনে বসে নতুন কার্ডিনালদের লাল টুপি বিতরণ করেন সেদিনও প্রচুর জনসমাবেশ ঘটে ঐতিহাসিক গির্জাটির সামনে।

ইতালীর প্রবেশতোরণ নেপলস। নেপলসবাসীরা বলে লণ্ড্রীই তাদের পতাকা। রাস্তার দুধারের বাড়ির একটির অলিন্দ থেকে আরেকটির অলিন্দ পর্যন্ত টাঙানো আছে লোহার রড বা তার; পথে, মাথার ওপর সব সময়েই ঝোলে দো'য়া আছে জামা-কাপড়, হাওয়ায় সে-গুলি ওড়ে। মনে হয় যেন সর্বদাই উৎসবের আমেজ লেগে আছে নেপলসের লাভা-বিছানো পথে।

ইতালীর ঐতিহাসিক উৎসবগুলির একটি বিশিষ্ট উৎসব গ্যারিবল্ডী দিবস। এই দিনটিতে ইতালীবাসীরা শ্রদ্ধা নিবেদন করে তাদের জন্মভূমির এই বীর সন্তানের উদ্দেশে। জাতীয় ঐক্য দিবসও পালন করে ইতালীবাসীরা।

অতীত আর বর্তমান এই দুটি ধারা পাশাপাশি চলেছে ইতালীতে। এ দেশের উৎসব-গুলিতেও এই বৈশিষ্ট্যটুকু লক্ষ্য করা যায়। উৎসবের আলোতে স্নান করে নতুন জীবনের মুখোমুখী দাঁড়ায় ইতালীবাসী।

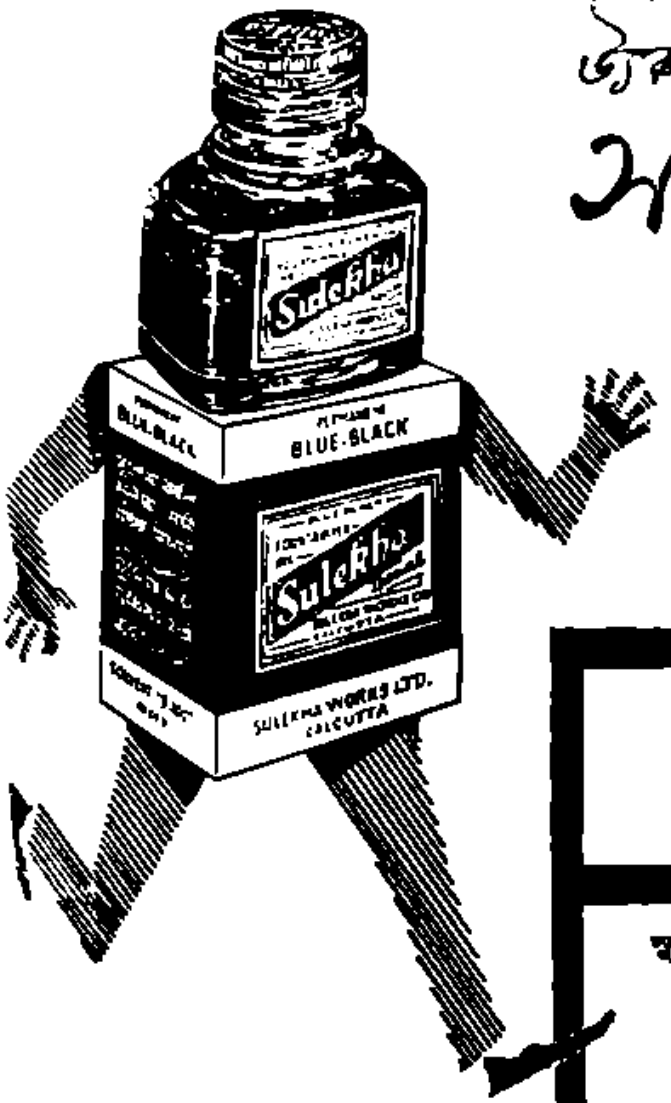

ঐতিহ্য ও উৎকর্ষের

সবার আগে সুলেখা

ভারতে সর্বাধিক বিক্রয়ে তো বটেই, ক্রমবর্ধমান রপ্তানি বাণিজ্যের মাধ্যমে সুলেখা আজ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনেও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন ক'রে চলেছে।

দেশ-বিদেশে সমাদৃত

সুলেখা-উৎপাদিত পণ্যের মধ্যে আছে : 'অ্যাডসল' পেস্ট এবং গাম, 'সিকিউরিটি' সিলিং ওয়াক্স, 'পেনসল', স্ট্যাম্প প্যাড, বিভিন্ন লেখার কালি এবং স্টেনসিল, স্ট্যাম্পিং, মার্কিং ও ড্রইং-এর কালি।

সুলেখা

স্পেশাল

ফাউন্টেন পেনের

কালি

ব্লু ব্ল্যাক, রয়াল ব্লু, ব্ল্যাক, এবং ব্রাউন রঙে এবং ৩০, ৬০, ১২০, ৩৪০ ও ৭১২০ এম.এল. সাইজে পাওয়া যায়।

প্রস্তুতকারক : **সুলেখা ওয়ার্কস লিঃ**
সুলেখা পার্ক, কলিকাতা-৩২
ভারত।

PPD/BW-13

টোকিও অলিম্পিক ১৯৬৪

॥ সচিত্র সংযোজন ॥

নতুন জীবনের নতুন প্রয়োজন।

নতুন জীবনের দাবী মেটাতে নবজাতকের জননীকে পুষ্টিকর টনিকের ওপর নির্ভর করতে হয়। সুনির্বাচিত উপাদানে সমৃদ্ধ ভাইনো-মল্ট ক্ষুধা বৃদ্ধি করে, হজমক্রিয়ায় সাহায্য করে এবং দ্রুত স্বাস্থ্য ও শক্তি ফিরিয়ে আনে। সন্তান প্রসবের পূর্বে ও পরে সমভাবে উপযোগী।

বেঙ্গল ইমিউনিটির তৈরী

BBL

ভাইনো-মল্ট

TCP/BM-8

বিশ্বউৎসবে টোকিও অলিম্পিক

অভিনব ও অবিস্মরণীয়

বিমল দেব

আধুনিক অলিম্পিকের অষ্টাদশ ক্রীড়ানুষ্ঠান সম্প্রতি টোকিওতে শেষ হয়েছে। সারা বিশ্বের ৯৪টি দেশের আট হাজার প্রতিযোগীর শক্তি পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে টোকিওর মেইজি পার্কে বিশ্বক্রীড়া-যজ্ঞের যে বিরাট অনুষ্ঠান হয়ে গেল তা বহুকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে। টোকিও অলিম্পিকের মূল কেন্দ্র মেইজি পার্ক আজ শান্ত, সমাহিত। দু'সপ্তাহ (১০ থেকে ২৩ অক্টোবর) ধরে বহু ঘটনা ঘটেছে, নতুন ক্রীড়া ইতিহাসের সৃষ্টি হয়েছে। কত কীর্তি, উত্থান-পতন, সাফল্য-ব্যর্থতা, আশা-নিরাশার নীরব সাক্ষী এই মেইজি পার্ক। বিভিন্ন দেশের প্রতিযোগিদের সাফল্যে, কীর্তিতে মুখরিত হয়েছে অলিম্পিক ক্রীড়াঙ্গন। নানাকারণে এবারের টোকিও অলিম্পিক অভিনব ও অবিস্মরণীয়। এর আগে এশিয়ার মাটিতে কখনও বিশ্ব অলিম্পিকের আসর বসেনি।

উদ্যোগী দেশ জাপান—

জাপান এশিয়া মহাদেশে সর্বপ্রথম বিশ্ব অলিম্পিক অনুষ্ঠান করে "প্রথমের" বিশেষ সম্মান লাভ করেছে। এই বৃহৎ অনুষ্ঠানকে সর্বাঙ্গীণ সুন্দর, সার্থক ও সাফল্যমণ্ডিত করতে সূর্যোদয়ের দেশ জাপান কোন ত্রুটিই করেনি। এর জন্য টোকিও শহরকে প্রায় ঢেলে সাজাতে হয়েছে। নতুন নতুন রাস্তাঘাট, মোনোরেল, রেলষ্টেশন, বিমান-বন্দর, হোটেল, বাসস্থান, ক্রীড়াকেন্দ্র নির্মাণ থেকে সুরু করে প্রতিযোগীদের অভ্যর্থনা আতিথেয়তা এবং বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের অত্যাশ্চর্য্য আয়োজন। জাপান সরকার এবং জাপানী জনসাধারণের নিরলস পরিশ্রম, অদম্য উৎসাহ, পরমনিষ্ঠা এবং বিপুল অর্থব্যয়ে সম্ভব হয়েছে এই বিশ্বক্রীড়াযজ্ঞের সার্থক অনুষ্ঠান।

অনুমান করা যাচ্ছে যে প্রায় ১৫০০ কোটি টাকা এই ক্রীড়াযজ্ঞের জন্য খরচ হয়েছে। যোগদানকারী সকল দেশই জাপানের আতিথেয়তায় মুগ্ধ। এত বিরাট, এত সুন্দর এবং এত নিখুঁত ও সমারোহপূর্ণ আয়োজন ইতিপূর্বে কোন অলিম্পিক অনুষ্ঠানে হয়নি। এত টাকাও কোন অলিম্পিকে ব্যয়িত হয়নি। এত দেশ এবং এত প্রতিযোগীর সংখ্যাও পূর্বের কোন অলিম্পিকে ছিল না। টোকিও অলিম্পিকে যত রেকর্ড সৃষ্টি হয়েছে ইতিপূর্বের কোন অলিম্পিকে তা হয়নি। সুতরাং সব দিক দিয়েই টোকিও অলিম্পিক বিরাট এবং অভিনব, সার্থক ও সুন্দর।

আমেরিকার সর্বাধিক স্বর্ণপদক লাভ—

এবারের অলিম্পিকে আমেরিকা ৩৬টি স্বর্ণপদক লাভ করে পদক তালিকায় শীর্ষস্থান অধিকার করেছে। রাশিয়া ৩০টি স্বর্ণপদক পেয়ে দ্বিতীয় স্থানের অধিকারী। ১৯১২ সালে হেলসিঙ্কি অলিম্পিকে আমেরিকা ৪০টি ও রাশিয়া ২২টি স্বর্ণপদক পেয়েছিল। কিন্তু ১৯৫৬ সালে মেলবোর্ণ অলিম্পিকে রাশিয়া ৩৭টি ও আমেরিকা ৩২টি এবং ১৯৬০ সালে রোম অলিম্পিকে রাশিয়া ৪৩টি ও আমেরিকা ৩৪টি

স্বর্ণপদক পায়। সুতরাং টোকিও অলিম্পিকে আমেরিকা আবার স্বর্ণপদক তালিকার শীর্ষস্থানে ফিরে এসেছে। পয়েন্ট তালিকায় শীর্ষস্থান লাভ করেছে রাশিয়া। তারা পেয়েছে মোট ৬০৭ পয়েন্ট। আমেরিকা ৫৮০ পয়েন্ট সংগ্রহ করে দ্বিতীয়।

ভারতের হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার—

এবারের অলিম্পিকের হকি ফাইন্যালে পাকিস্তানকে ১—০ গোলে হারিয়ে দিয়ে ভারত হকিতে বিশ্ববিজয়ীর হৃত গৌরব আবার ফিরে পেয়েছে। ১৯২৮ সাল থেকে শুরু করে উপর্যুপরি ছটি অলিম্পিকে ভারত বিশ্ববিজয়ী আখ্যা অক্ষুণ্ণ রাখে। ১৯৬০ সালে রোম অলিম্পিকে পাকিস্তানের কাছে ১—০ গোলে পরাজয় স্বীকার করে ভারত বিশ্বজয়ীর আখ্যা হারায়। হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারের জন্য ভারতীয় হকি দলের খেলোয়াড়গণ যে অনমনীয় দৃঢ়তা এবং অপূর্ব ক্রীড়াচাতুর্য প্রদর্শন করে অন্যতম শক্তিশালী দল পাকিস্তানকে পরাজিত করেন তা সত্যিই এক স্মরণীয় ঘটনা। ভারতের এই সাফল্যে ভারতবাসী মাত্রই গর্বিত।

এ্যাথলেটিকস—

এ্যাথলেটিকসে আমেরিকা পুনরায় তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে। রাশিয়া ও ফ্রান্স আশানুরূপ নৈপুণ্য প্রদর্শন করতে পারেনি। এই পর্যায়ে ব্রিটেনের ভূমিকা বিস্ময়কর। পূর্ববর্তী দুটি অলিম্পিকে ব্রিটেন এ্যাথলেটিকসে একটি করে স্বর্ণপদক লাভ করেছিল। এবারের এ্যাথলেটিকসে ব্রিটেন চারটি স্বর্ণপদক লাভ করেছে এছাড়া অনেকগুলি রৌপ্য পদকও তাদের দখলে এসেছে।

সাঁতার—

সাঁতারেও আমেরিকার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত। সাঁতার ও ডাইভিংয়ে ২২টির মধ্যে ১৩টি স্বর্ণপদক আমেরিকা দখল করেছে। এর মূলে আছে তরুণ সাঁতারু ডন শোলাণ্ডার এবং সাঁতার-পটিয়সী শ্রীমতী ষ্টোডারের অবিস্মরণীয় কৃতিত্ব। শোলাণ্ডার ৪টি এবং ষ্টোডার ৩টি স্বর্ণপদক লাভ করেন। অষ্ট্রেলিয়া ৪টি স্বর্ণপদক এবং রাশিয়া ও জার্মানী একটি করে স্বর্ণপদক পায়। এই প্রসঙ্গে অষ্ট্রেলিয়ার নবীনা ডন ফ্রেজারের কৃতিত্বপূর্ণ সাফল্যও বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ফুটবল—

ফুটবল ফাইন্যালে হাঙ্গেরী ২—১ গোলে চেকোশ্লোভাকিয়াকে হারিয়ে বিজয়ীর সম্মান অর্জন করে। কিন্তু খেলার মান খুব উন্নত ছিল না। বিজয়ী দলের সেন্টার ফরোয়ার্ড ফেরেন্স বার্নের কৃতিত্ব উল্লেখের দাবী রাখে। এবারের প্রতিযোগিতায় তিনি মোট ১২টি গোল দেন।

কুস্তি ও মুষ্টিযুদ্ধ—

রোম অলিম্পিকে কোন জাপানী প্রতিযোগী কুস্তিতে বিজয়ীর সম্মান অর্জন করেননি। কিন্তু এবার জাপান পাঁচটি স্বর্ণপদক লাভ করেছে। এর ফলে কুস্তি প্রতিযোগিতায় জাপানের অভ্যুত্থান এবং আমেরিকা ও তুরস্কের অবনতি সূচিত হয়েছে। রোম অলিম্পিকে আমেরিকা ৩টি স্বর্ণপদক পেয়েছিল এবারে তারা পেয়েছে একটিমাত্র ব্রোঞ্জ পদক। তুরস্ক রোম অলিম্পিকে ৭টি স্বর্ণপদকের অধিকারী হয়েছিল। এবার তারা দখল করেছে দুটি স্বর্ণপদক।

অলিম্পিকে এই প্রথমবার অনুষ্ঠিত যুযুৎসু প্রতিযোগিতারও জাপানের প্রাধান্য দেখা যায়। চারটির মধ্যে তিনটি স্বর্ণপদকই জাপানের দখলে আসে। কিন্তু ব্যক্তিগত পর্যায়ে হল্যাণ্ডের অ্যাণ্টন গিসিংকের কৃতিত্ব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি জাপানের খ্যাতনামা যুযুৎসু-চ্যাম্পিয়ান আকিও কামিনাগাকে পরাজিত করেন।

মুষ্টিযুদ্ধ—

মুষ্টিযুদ্ধে এযাবতকাল আমেরিকার শ্রেষ্ঠত্বই প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু টোকিও অলিম্পিকে পূর্ব ইউরোপের দেশগুলি আমেরিকার সর্ব খর্ব করেছে। পোল্যাণ্ড ও রাশিয়া ৩টি করে স্বর্ণপদক পেয়েছে কিন্তু আমেরিকা পেয়েছে মাত্র একটি স্বর্ণপদক। পোল্যাণ্ড ও রাশিয়ার প্রতিযোগিগণের মুষ্টিযুদ্ধে উন্নতমানের পরিচয় পাওয়া যায়।

জিমন্যাষ্টিক—

জিমন্যাষ্টিকে রাশিয়ার প্রাধান্য বিস্ময়জনকভাবে ক্ষুণ্ন হয়েছে। মহিলা বিভাগে চেক তরুণী ভেরা ক্যাসলাভস্কা একাই তিনটি বিষয়ে বিজয়িনী হয়ে তিনটি স্বর্ণপদক লাভ করেছেন। পুরুষ বিভাগে জাপান শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত করেছে।

ভারোত্তোলন—

এই প্রতিযোগিতায় রাশিয়া তাদের শ্রেষ্ঠত্বের গৌরব অক্ষুণ্ণ রেখেছে। তারা চারটি স্বর্ণ, তিনটি রৌপ্য এবং সাতটি ব্রোঞ্জপদক লাভ করেছে।

ভলিবল—

পুরুষ বিভাগে রাশিয়া জয়ী হলেও মহিলা বিভাগে জাপান সাফল্য লাভ করে। জাপানের বর্ণাকৃতি মেয়েদের অদ্ভুতপূর্ব ক্রীড়া নৈপুণ্যের বিরুদ্ধে রুশ মেয়েদের পরাজয় স্বীকার করতে হয়।

বাস্কেটবল—

ফাইন্যালে ৭৩—৬৩ পয়েন্টে রাশিয়াকে পরাজিত করে আমেরিকা এই প্রতিযোগিতায় তার অলিম্পিক আধা অক্ষুণ্ণ রেখেছে। বিশেষজ্ঞগণের ধারণা যে বাস্কেটবলে আমেরিকা আরও কিছুকাল শ্রেষ্ঠত্ব অক্ষুণ্ণ রাখতে পারবে।

শুটিং বা বন্দুক চালনা—

এই প্রতিযোগিতায় আমেরিকা একাধিপত্য বিস্তার করে। তারা দুইটি স্বর্ণ, দুইটি রৌপ্য এবং তিনটি ব্রোঞ্জ পদক পায়। একমাত্র র‍্যাপিড ফায়ার পিস্তল প্রতিযোগিতায় তারা সফলকাম হয় নি।

অসি চালনা—

পূর্বইউরোপের দেশগুলিই এই প্রতিযোগিতায় স্বর্ণপদক লাভ করেছে। ইউরোপের অন্যান্য দেশের ভাগ্যে জুটেছে রৌপ্য ও ব্রোঞ্জপদকগুলি। এই প্রতিযোগিতায় হাঙ্গেরী চারটি স্বর্ণপদক পেয়েছে।

সাইকেল চালনা—

সাইকেল চালনায় ইতালী তিনটি স্বর্ণ ও পাঁচটি রৌপ্যপদক অধিকার করেছে। ৪০০ মিটার টাম পারস্যুটে ও রোড রেসে ইতালীয়দলের কৃতিত্ব সবিশেষ উল্লেখ্য।

মডার্ণ পেন্টাথলন—

এই কঠিন প্রতিযোগিতায় রাশিয়ার দলগত এবং হাঙ্গেরীয় ডাঃ ক্রেরেন্সের ব্যক্তিগত স্বর্ণপদক লাভ স্মরণীয় ঘটনা।

কীর্ত্তিমান বিকিলা—

অনন্য কীর্ত্তিতে যাঁরা টোকিও অলিম্পিকে ভাস্বর হয়েছেন তাঁরা হলেন ইথিওপিয়ার ম্যারাথন দৌড়বীর আবেবি বিকিলা, অষ্ট্রেলিয়ার সাঁতার-পটিয়সী ডন ফ্রেজার, নিউজিল্যাণ্ডের দৌড়বীর পিটার স্নেল ও আমেরিকার তরুণ সাঁতারু ডন শোলাণ্ডার এবং এথলীট এ. ওটার। সকলকে ছাপিয়ে টোকিওর অলিম্পিক প্রাঙ্গণে যে নামে মুখরিত তাহোল আবেবি বিকিলা। ১৯৬২ সালে হেলসিঙ্কি অলিম্পিকে যুগোশ্লাভিয়ার চেক দৌড়বীর এমিল জেটোপেকের নাম এমনভাবে মুখরিত করেছিল অলিম্পিক ক্রীড়াঙ্গণ। রোম ও টোকিও অলিম্পিকে ম্যারাথন দৌড়ে বিকিলা পরপর দুবছর স্বর্ণ পদকের অধিকারী হয়েছেন। এর আগে এ সম্মান কেউই পাননি। ২ ঘণ্টা ১২ মিঃ ১১'২ সেকেণ্ডে নির্দ্দিষ্ট দূরত্ব অতিক্রম করে বিকিলা নূতন অলিম্পিক রেকর্ড ও সৃষ্টি করেছেন। রোমে ২ ঘণ্টা ১৫ মিঃ ১৬'২ সে তিনি পূর্বতন রেকর্ড করেছিলেন।

অষ্ট্রেলীয় তরুণী ডন ফ্রেজার এবারেও ১০০ মিটার ফ্রিষ্টাইল সাঁতারে শীর্ষস্থান অধিকার করেছেন। মেলবোর্ণ ও রোম অলিম্পিকে ও তিনি এই বিষয়ে প্রথম হয়েছিলেন। শুধু তাই নয় এবারে ৫৯'৫ সেকেণ্ডে তিনি নূতন অলিম্পিক রেকর্ডও করেছেন। এবার তিনি এক মিনিটের কম সময়ে নির্দ্দিষ্ট দূরত্ব অতিক্রম করে অবিস্মরণীয় কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। একই অলিম্পিকে ৮০০ ও ১৫০০ মিটার দৌড়ে শীর্ষস্থান অধিকার এর আগে কেউ করতে পারেন নি। কিন্তু নিউজিল্যাণ্ডের পিটার স্নেল তাও সম্ভব করেছেন, এবার ৮০০ মিটারে তিনি আবার নূতন অলিম্পিক রেকর্ডও করেছেন। আমেরিকার ১৭ বছরের স্কুলের ছাত্র ডন শোলাণ্ডার সাঁতার প্রতিযোগিতায় এক অত্যাশ্চর্য্য ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। ১০০ মিটার, ৪০০ মিটার ফ্রিষ্টাইলে জয়লাভ করা ছাড়া ও ৪×১০০ মিঃ ফ্রিষ্টাইল রীলে এবং ৪×২০০ মিটার রীলেতে ও তিনি আমেরিকার পক্ষে স্বর্ণ পদকের অধিকারী হয়েছেন। একই অলিম্পিকে চারটি বিষয় স্বর্ণপদক লাভ অলিম্পিক ইতিহাসে অভূতপূর্ব্ব ঘটনা। শোলাণ্ডার ১০০ মিটারে অলিম্পিক এবং ৪০০ মিটারে বিশ্ব রেকর্ডও করেছেন।

টোকিও অলিম্পিকে নূতন রেকর্ডের তালিকা

এ্যাথলেটিকস্—পুরুষ বিভাগ—

১০০ মিটার দৌড় :—রবার্ট হেজ (আমেরিকা)—সময় ১০'০ সেঃ (অলিম্পিক রেকর্ড ও বিশ্ব রেকর্ডের সমতুল) ; ২০০ মিটার দৌড় :—কার (আমেরিকা)—সময় ২০'৩ সেঃ (অলিম্পিক রেকর্ড ও বিশ্বরেকর্ডের সমতুল) ; ৮০০ মিটার দৌড় :—পিটার স্নেল (নিউজীল্যাণ্ড)—সময় ১ মিঃ ৪৫'১ সেঃ (অলিঃ রেকর্ড) ; ১০০০০ মিটার দৌড় :—মিলি মিল্‌স (আমেরিকা)—সময় ২৮ মিঃ ২৪'৪ সেঃ (অলিঃ রেকর্ড) ; ম্যারাথন দৌড় :—আবেবি বিকিলা (ইথিওপিয়া)—সময় ২ ঘণ্টা ১২ মিঃ ১১'২ সেঃ

(অলিঃ রেকর্ড) ; ২০ কিলোমিটার ভ্রমণ :—ব্যাপুক (ব্রিটেন) ১ ঘণ্টা ২৯ মিঃ ৩৭ সেঃ (অলিঃ রেকর্ড) ৫০ কিলোমিটার ভ্রমণ :—পাম্বিচ (ইতালী)—সময় ৪ ঘণ্টা ১১ মিঃ ১২'৪ সেঃ (অলিঃ ও বিশ্ব রেকর্ড) ; ৩০০০ মিটার ষ্টিপলচেজ :—রোশাটেন (বেলজিয়াম) ; সময় ৮ মিঃ ৩০'৮ সেঃ (অলিঃ রেকর্ড) ; উচ্চলম্ফন :—ভিঃ ব্রুমেল (রাশিয়া) উচ্চতা ২'১৮ মিটার (অলিঃ রেকর্ড) ; পোলভল্ট :—হ্যুবনের (আমেরিকা) ; উচ্চতা—৪'১০ মিটার (অলিঃ রেকর্ড) ; হপ, ষ্টেপ এণ্ড জাম্প :—জে. শ্মিড (পোলাণ্ড) ; দূরত্ব ১৬৮৫ মিটার (অলিঃ রেকর্ড) ; পুট্‌ অব্‌ ষ্টট্‌ :—ডি. সি. লং (আমেরিকা) দূরত্ব—৬৬ ফুট ৮½ ইঞ্চি (অলিঃ রেকর্ড) ; ডিস্‌কাস্‌ নিক্ষেপ :—আলফ্রেড ওটার (আমেরিকা)—দূরত্ব ৬১ মিটার (অলিঃ রেকর্ড) হাতুড়ি নিক্ষেপ :—ক্লিম (রাশিয়া)—দূরত্ব ৬৯'৭৪ মিটার (অলিঃ রেকর্ড) ৪ × ১০০ মিটার রীলে দৌড় :—আমেরিকা সময় ৩৯'০ সেঃ (অলিঃ ও বিশ্ব রেকর্ড) ; ৪ × ৪০০ মিটার রীলে :—আমেরিকা সময় ৩ মিঃ ০'৭ সেঃ (অলিঃ ও বিশ্ব রেকর্ড)।

এ্যাথলেটিকস—মহিলা বিভাগ—

৪০০ মিটার দৌড় :—বেটি কাথবার্ট (অষ্ট্রেলিয়া) ৫২'০ সেঃ (অলিঃ ও বিশ্ব রেকর্ড) ; পেণ্টাথলন :—ইরিনা প্রেস (রাশিয়া)—৫২৪৬ পয়েন্ট (অলিঃ ও বিশ্ব রেকর্ড) ; ২০০ মিটার দৌড় :—ব্যাকওইয় (আমেরিকা)—সময় ২৩'০ সেঃ (অলিঃ রেকর্ড) ; ৮০০ মিটার দৌড় :—অ্যান প্যাকার (ব্রিটেন) ; সময় ২ মিঃ ০১'১ সেঃ (অলিঃ ও বিশ্ব রেকর্ড) ; বর্শা নিক্ষেপ:—পিনেস (রুমানিয়া) ; দূরত্ব ৬০'৫৪ মিটার (অলিঃ ও বিশ্বরেকর্ড) ; ৮০ মিটার হার্ডলস:—বালজার (জার্মানী) সময় ১০'৫ (অলিঃ রেকর্ড ও বিশ্ব রেকর্ডের সমতুল) ; উচ্চলম্ফন:—ব্যালাস (রুমানিয়া) :—উচ্চতা ১'৯০ মিটার (অলিঃ রেকর্ড) ; দীর্ঘ লম্ফন :—মেরী র‍্যাণ্ড (ব্রিটেন) ; দূরত্ব—৬'১৬ মিটার (অলিঃ ও বিশ্ব রেকর্ড) সট্‌পাট্‌ :—তামারা প্রেস (রাশিয়া)—দূরত্ব—১৮'১৪ মিটার (অলিঃ রেকর্ড) ; ৪ × ১০০ মিটার রীলে: পোল্যাণ্ড—সময় ৪৩'৬ (অলিঃ ও বিশ্ব রেকর্ড)।

সাঁতার—পুরুষ বিভাগ—

১০০ মিটার ফ্রিষ্টাইল :—ডন শোলাণ্ডার (আমেরিকা) সময় ৫৩'৪ সেঃ (অলিঃ রেকর্ড) ; ৪০০ মিটার ফ্রিষ্টাইল :—ডন শোলাণ্ডার (আমেরিকা) ; সময় ৪ মিঃ ১২'২ সেঃ (বিশ্ব রেকর্ড) ; ১৫০০ মিটার ফ্রিষ্টাইল :—ষব উইণ্ডল (অষ্ট্রেলিয়া) সময় ১৭ মিঃ ০১'৭ সেঃ (অলিঃ রেকর্ড) ; ৪০০ মিটার মিডলেঃ রথ (আমেরিকা) সময় ৪ মিঃ ৪৫'৪ সেঃ (বিশ্ব রেকর্ড), ৪ × ১০০ মিটার ফ্রিষ্টাইল রীলে :—আমেরিকা সময় ৩ মিঃ ৩৩'২ সেঃ (বিশ্ব রেকর্ড) ; ২০০ মিঃ ব্যাকষ্ট্রোক :—গ্রাভেক (আমেরিকা) :—সময় ২ মিঃ ১০'৩ সেঃ (বিশ্ব রেকর্ড) ; ২০০ মিটার ব্রেষ্ট ষ্ট্রোক :—ও ব্রায়ান (অষ্ট্রেলিয়া) ; সময় ২ মিঃ ২৭'৮ সেঃ (বিশ্ব রেকর্ড) ; ২০০ মিটার বাটারফ্লাই ষ্ট্রোক :—বেরী (অষ্ট্রেলিয়া)—সময় ২ মিঃ ০৬'৬ সেঃ (বিশ্ব রেকর্ড) ; ৪ × ২০০ মিটার ফ্রিষ্টাইল রীলে :—আমেরিকা—সময় ৭ মিঃ ৪২'১ সেঃ (বিশ্ব রেকর্ড)।

সাঁতার—মহিলা বিভাগ—

১০০ মিটার ফ্রিষ্টাইল :—ডন ফ্রেজার (অষ্ট্রেলিয়া)-সময় ৫৯'৫ সেঃ (অলিঃ রেকর্ড) ; ৪০০ মিটার ফ্রিষ্টাইল : ডুরেন্ডেল (আমেরিকা) সময় ৪ মিঃ ৪৩'৩ সেঃ (অলিঃ রেকর্ড) ; ৪ × ১০০ মিটার

ফ্রিষ্টাইল রীলে—: আমেরিকা সময় ৪ মি: ৩'৮ সে: (বিশ্ব রেকর্ড); ৪০০ মিটার মিড্‌লে :—ডি. ভারোনা (আমেরিকা); সময় ৫ মি: ১৮'৭ সে: (অলিঃ রেকর্ড); ৪ × ১০০ মিটার মিডলে রীলে :—আমেরিকা—সময় ৪ মি: ৩৩'৯ সে: (বিশ্ব রেকর্ড) ১০০ মিটার বাটার ফ্লাই ষ্ট্রোক :—ষ্টোভার (আমেরিকা) সময় ৮৫'৭ সে: (বিশ্ব রেকর্ড); ১০০ মিটার ব্যাক ষ্ট্রোক :—কার্ষ্টসন (আমেরিকা) সময় ৯৭'৭ সে: (বিশ্ব রেকর্ড); ২০০ মিটার ব্রেষ্ট ষ্ট্রোক :—প্রজুমেনশিকাভো (রাশিয়া); সময় ২ মি: ৪৮'৪ সে: (অলিঃ রেকর্ড)

পদক তালিকা

	স্বর্ণ	রৌপ্য	ব্রোঞ্জ	মোট
আমেরিকা	৩৬	২৬	২৮	৯০
রাশিয়া	৩০	৩১	৩৫	৯৬
জাপান	১৬	৫	৮	২৯
জার্ম্মানী	১০	২২	১৮	৫০
ইটালী	১০	১০	৭	২৭
হাঙ্গেরী	১০	৭	৫	২২
পোল্যাণ্ড	৭	৬	১০	২৩
অষ্ট্রেলিয়া	৬	২	১০	১৮
চেকোশ্লোভাকিয়া	৫	৬	৩	১৪
ব্রিটেন	৪	১২	২	১৮
বুলগেরিয়া	৩	৫	২	১০
ফিনল্যাণ্ড	৩	০	২	৫
নিউজীল্যাণ্ড	৩	০	২	৫
রুমানিয়া	২	৪	৬	১২
হল্যাণ্ড	২	৪	৪	১০
তুরস্ক	২	৩	১	৬
সুইডেন	২	২	৪	৮
ডেনমার্ক	২	১	৩	৬
যুগোশ্লাভিয়া	২	১	২	৫
বেলজিয়াম	২	০	১	৩
ফ্রান্স	১	৮	৬	১৫
কানাডা	১	২	১	৪
সুইজারল্যাণ্ড	১	২	১	৪
ইথিওপিয়া	১	০	০	১

	স্বর্ণ	রৌপ্য	ব্রোঞ্জ	মোট
বাহামা	১	০	০	১
ভারত	১	০	০	১
দক্ষিণ কোরিয়া	০	০	১	১
ত্রিনিদাদ	০	১	২	৩
টিউনিসিয়া	০	১	১	২
কিউবা	০	১	০	১
আর্জেন্টিনা	০	১	০	১
পাকিস্তান	০	১	০	১
ফিলিপাইন	০	১	০	১
ইরাণ	০	০	২	২
ব্রেজিল	০	০	১	১
ঘানা	০	০	১	১
আফগানিস্তান	০	০	১	১
কেনিয়া	০	০	১	১
মেক্সিকো	০	০	১	১
নাইজিরিয়া	০	০	১	১
উত্তর	০	০	১	১

সময়ে চলে যায়...
কমে বেড়ে যায়... কিন্তু
বোরোলীন কে
কখনও তোলা যায় না

অগ্রহায়ণ, ১৩৭১

"কথা প্রসঙ্গে"

মানুষ অসুস্থ হলে তার শরীর রোগযন্ত্রণায় কাতর হয়। কোন কোন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী মানব দেহের সঙ্গে রাষ্ট্রকে তুলনা করেছেন। আমাদের এই সদ্যদশ বর্ষের স্বাধীন ভারতরাষ্ট্রের দেহও আজ কঠিন ব্যাধিতে অসুস্থ, বিষম রোগযন্ত্রণা উপশমের কোন লক্ষণ নেই। বরং তার বিপরীত ইঙ্গিত প্রতিদিন সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে।

এ রোগ মনুষ্যত্বহীনতা।

আহার্যের অভাব, চিকিৎসার মৈত্রতা, শিক্ষার সম্পূর্ণ অব্যবস্থা, বাসগৃহের স্বল্পতা, এ সকল ঐ রোগের লক্ষণ।

পরাধীন ভারতের পূজ্য নেতৃবৃন্দের নিষ্কাম আত্মোৎসর্গে একদিন যে মনুষ্যত্ববোধ দু'দিনের দিশারীরূপে ভবিষ্যতের পূর্ণতার প্রতি নির্দেশ করেছিল এখন তা বিলীনপ্রায়। প্রতিষ্ঠানরূপে কংগ্রেস সেদিন তার সকল শাখা প্রশাখা, সকল দল উপদল নিয়ে ভারতীয় মনুষ্যত্ববোধের উৎকর্ষ প্রমাণে সফল হয়েছিল। সে দিনে ব্যক্তি স্বার্থে ব্যষ্টির স্বার্থ বিসর্জন দেবার কথা কেউ ভাবেনি।

কংগ্রেস তখন সংগ্রামী প্রতিষ্ঠান।

সেদিনের সংগ্রামে তার জয়ের পশ্চাতে মনুষ্যত্ববোধের সুদৃঢ় ভিত্তি ছিল।

অকস্মাৎ কংগ্রেসের ভূমিকার পরিবর্তন ঘটল। সংগ্রামী প্রতিষ্ঠান শাসক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হল। ত্যাগের ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে যে প্রতিষ্ঠান আসমুদ্র হিমাচলের সকল অমৃতের সন্তানকে আহ্বান করে আপন পতাকাতলে সমবেত করেছিল তার আয়ত্তে এসে পড়ল ভোগের অফুরন্ত উপকরণ।

সুন্দরী অপ্সরীদের ইসারায় ইঙ্গিতে মুনিঋষিদেরও চিত্তবিভ্রম ঘটেছিল, বিপুল ঐশ্বর্যের ও ক্ষমতার অধিকারী হয়ে কংগ্রেসেরও বোধহয় তেমনি চিত্তবিভ্রম ঘটল।

শাসকের আসনে সংগ্রামী মানুষেরা বসলেন। কিন্তু তখন তাঁরা দেশ গড়ার উৎসাহে মানুষ গড়ার প্রয়োজন বোধহয় বিস্মৃত হয়ে গেলেন। মানুষের প্রয়োজনেই দেশ—এ ধ্রুব সত্য সেদিন তাঁরা স্মরণ করেন নি।

তাই আজ দেশের সর্বত্র নূতন যন্ত্রের উৎসব। মনুষ্যত্ববোধসম্পন্ন নূতন মানুষের অভাবে তাঁরা কাতর নন। শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত, বিত্তবান এবং বিত্তহীন সকলের মধ্যে মনুষ্যত্ববোধ সঞ্চারিত হলেই যে জাতি এবং তার সঙ্গে দেশ গড়ে ওঠে একথা কংগ্রেস সম্ভবতঃ স্মরণ করে না।

মনুষ্যত্ববোধ কি ?

সমাজ সেবার আগ্রহ ও অভ্যাস, নাগরিকের আদর্শ ও কর্তব্য সম্বন্ধে যথার্থ ধারণা, গণতন্ত্রের দায়িত্ব ও কর্তব্য বিষয়ে পরিমিত জ্ঞান।

সময়ের উপযুক্ত ব্যবহারের অভ্যাস, কর্তব্যকর্মে স্বাভাবিক অভীপ্সা, চিন্তার ক্ষমতা, সকল বিষয় ও বস্তুর যথোচিত মূল্যবোধ এবং উপচিকীর্ষা।

স্বাধীন ভারতের সকল নাগরিকের মনে সংযোগ রক্ষা করে তাদের এই মনুষ্যত্ববোধ উদ্বুদ্ধ করার কাজ জাতীয় সরকার এবং তাদের পেছনে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানও করেনি। দীর্ঘ সতর বৎসর তা না করার ফলে এবং এই বোধের অভাবে রাষ্ট্রদেহে প্রভূত নানাপ্রকার রোগ লক্ষণ প্রকট হয়ে উঠছে।

অন্ত কাজের পূর্বে একাজ অধিকতর প্রয়োজন। অনেক দেরী হলেও এখনও একাজ আরম্ভ করার সময় যায়নি। আজকের দিন ব্যর্থ হলেও আগামী কাল সার্থক হয়ে উঠবে।

কংগ্রেস বহুবৎসর বহু অধিবেশনে নানা সমস্যা সমাধানের ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। সরকারী পঞ্চবর্ষ পরিকল্পনা প্রকল্পে সে সকলের জন্ত প্রচেষ্টাও যথেষ্ট হয়েছে। কিন্তু মানুষ গড়ার চেষ্টা কোনদিনই কিছু হল না। অথচ এ প্রয়োজন যে সর্বাধিক তা অনস্বীকার্য এবং মানুষ না গড়ার ফলে দেশকে কেউ ভালবাসতে শিখল না। দুর্নীতি সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হয়েছে। প্রগতির পরিবর্তে সমাজ পশ্চাৎ দিকে অগ্রসরমান। এবং এর ফলে সরকারও কম বিপন্ন বা চিন্তাধিত নয়।

যথার্থ শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তনের দ্বারা দেশের প্রতিটি গ্রামে সহরে সকল লোকের মনে পূর্ণ নাগরিকের কর্তব্যবোধ জাগরিত করার চেষ্টার মাধ্যমে দেশ গড়া না হলে কংগ্রেসের এবং সরকারের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে যাবে। সকল সমস্যা সমস্যাই থেকে যাবে।

দুর্গাপুর কংগ্রেস এ বিষয়ে কিছু ভাববেন কি ?

———

ভারতে পোপের আগমন

এক সময় ছিল যখন কার্ডিনালদের হাত থেকেই রাজাদের মুকুট গ্রহণ করতে হত। ধর্মের সঙ্গে চার্চের ছিল তখন অন্তরঙ্গ যোগ। সময় পালটে গেছে। পোপ আজ আর রাজনীতির সঙ্গে জড়িত নন, রোমও আজ নয় রাজনীতির ঘটিকা কেন্দ্র। পোপ আজ দেখা দিয়েছেন শান্তি-প্রচারকের ভূমিকায়। রোম থেকে আজ উৎসারিত হচ্ছে শান্তির বাণী। এই ভূমিকা আগের চাইতে অনেক বেশি তাৎপর্যময়।

ভারতে ক্যাথলিক খ্রীস্টানদের সংখ্যা নেহাৎ কম নয়। এদের পাস্টর হলেন বোম্বের আর্চবিশপ ভেনেরিয়াল গ্রেসিয়াস। তাঁর আগে আর কোনো ভারতীয় কার্ডিনাল পদ লাভের সৌভাগ্য অর্জন করেন নি। তাঁরই নেতৃত্বে বোম্বেতে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল আন্তর্জাতিক ইউখেরিস্টিক কংগ্রেসের ৩৮তম অধিবেশন। এই অধিবেশনের প্রধান আকর্ষণ ছিল পোপ ষষ্ঠ পলের বোম্বেতে আগমন। তিনি এসে পৌঁছেছিলেন ২রা ডিসেম্বর। ভারতে পোপ এই প্রথম এলেন। যদিও ভারতে খ্রীস্টান ধর্ম প্রচারিত হয়েছিল খ্রীস্টীয় প্রথম শতকে।

আজো পৃথিবী হিংসায় উন্মত্ত, ক্রুদ্ধ, অশান্ত। আণবিক যুদ্ধের আতঙ্ক আজো সম্পূর্ণ দূর হয়নি পৃথিবী থেকে। এই অবস্থায় পোপের ভারতে আগমন অতি তাৎপর্যময় ঘটনা। ইতিহাসের উষাকাল থেকেই ভারতবাসী শান্তির উপাসক। এই দেশ থেকেই একদিন উচ্চারিত হয়েছিল ভগবান বুদ্ধের মৈত্রী ও করুণার বাণী। এদেশেরই রাজা অশোক চেয়েছিলেন যুদ্ধের অবসান ঘটিয়ে পৃথিবীতে চিরস্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে। তারপর শ্রীচৈতন্য—রামকৃষ্ণ—বিবেকানন্দের সাধনা সেই শান্তির আদর্শ ক'রে তুলেছে আরো জ্যোতির্ময়। ভারতের সেই প্রাচীন ঐতিহ্য আন্তরিকভাবে অনুধাবন করেছেন পোপ। ভারতবর্ষের মাটিতে পা দিয়ে যেমন অভিভূত হলেন, আনন্দ পেলেন, নতুন প্রত্যাশায় উদ্দীপ্ত হলেন আর কোনো দেশে গিয়ে এমনটি হতে পারেননি তিনি। যাবার বেলায় ব'লে গেলেন ভারতবর্ষকে তিনি কোনোদিনই ভুলতে পারবেন না। মনে হচ্ছে রক্ত-সন্ধ্যার আকাশে ভারত সেই প্রথম তারা যে আবার নতুন ক'রে বিকীরণ করতে শুরু করেছে শান্তির স্নিগ্ধ রশ্মি। ভারতের চিরন্তন শান্তির বাণী নতুন মহিমায় উদ্ভাসিত হল ধর্মগুরু পোপের আগমনে। বহু ধর্মের, বহু মতের দেশ ভারতও তাই সাগ্রহে বরণ ক'রেছে এই মাননীয় অতিথিকে।

জাপানে শুনিয়াছিলাম, সে-দেশের বালিকাদের বিশ্বাস এই যে যদি ক্রীড়াপুত্তলিকাকে হৃদয়ের সহিত ভালবাসা যায়, সে জীবিত হইবে। জাপানী বালিকা কখনও পুতুল ভাসেনা। আমারও বিশ্বাস যে, যদি কেউ এই হতশ্রী বিগতভাগ্য লুপ্তবুদ্ধি পরপদ-বিদলিত চির-বুভুক্ষিত কলহশীল ও পরশ্রীকাতর ভারতবাসীকে প্রাণের সহিত ভালবাসে, তবে ভারত আবার জাগিবে। যবে শত শত মহাপ্রাণ নরনারী সকল বিলাস ভোগ-সুখেচ্ছা বিসর্জন করিয়া কায়মনোবাক্যে দারিদ্র্য ও মূর্খতার ঘূর্ণাবর্তে ক্রমশঃ উত্তরোত্তর নিমজ্জনকারী কোটি কোটি স্বদেশীয় নরনারীর কল্যাণ কামনা করিবে, তখন ভারত জাগিবে··· সদ্বুদ্ধেশ্য, অকপটতা ও অনন্তপ্রেম বিশ্ববিজয় করিতে সক্ষম। উক্ত গুণশালী একজন কোটি কোটি কপট ও নিষ্ঠুরের দুর্বুদ্ধি নাশ করিতে সক্ষম"।

স্বামী বিবেকানন্দ

চিঠিশুদ্ধু চিঠি নয়

(আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুকে লিখিত)

বন্ধু,

তোমার ছবি আজ পাইয়া বড় খুশী হইলাম। ভারি সুন্দর ছবি হইয়াছে—এ ছবি আমার লিখিবার ঘর বিভূষিত করিয়া থাকিবে। কিছুদিন পূর্বে লাহিড়ী তোমার ছবি ছাপিবার জন্য সমাজপতি তোমার ফোটো চাহিয়া পাঠাইয়াছিল। আমাদের বিলাইতের গ্রুপ ছাড়া তোমার ছবি আমার কাছে ছিল না। সেটা তেমন ভাল না, কিন্তু অগত্যা সেইটেই সমাজপতিকে দিতে হইয়াছে। তোমার এ ছবিখানি চাহিলেও আমি দিতাম না—কারণ, চুরি করিতে অনেক ভদ্রলোক সঙ্কোচ করেন বটে, কিন্তু জিনিষ ধার লইয়া ফিরাইয়া না দেওয়াকে তাঁহারা অপহরণের নামান্তর বলিয়া জানেন না। তোমার প্রেরিত আশী ছবিখানিও ভাবে পূর্ণ। তারতবর্ষীয় আমার সপ্ততন্ত্রী বীণার মধ্যে কোন্ তারটা অবশিষ্ট আছে? ধর্ম, না কর্ম; ধ্যান, না জ্ঞান, বিদ্যা, না উদ্যম?

শান্তিনিকেতনে আমি একটি বিদ্যালয় খুলিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছি। সেখানে ঠিক প্রাচীন কালের গুরু-গৃহবাসের মত সমস্ত নিয়ম। বিলাসিতার নাম-গন্ধ থাকিবে না—ধনী-দরিদ্র সকলকেই কঠিন ব্রহ্মচর্যে দীক্ষিত হইতে হইবে। উপযুক্ত শিক্ষক কোনমতেই খুঁজিয়া পাইতেছি না। এখনকার কালের বিদ্যা ও তখনকার কালের প্রকৃতি একত্রে পাওয়া সম্ভব না। স্বার্থ-চেষ্টা আড়ম্বর হইতে কোন মহৎ কার্যকে বিচ্ছিন্ন করিতে পেলে কাহারো মুখরোচক হয় না। এতদিনকার ইংরেজী বিদ্যায় আমাদের কাহাকেও যথার্থ কর্মযোগী করিতে পারিল না কেন? মহারাষ্ট্র দেশে ত তিলক ও পরঞ্জপে আছে, আমাদের এখানে সে রকম ত্যাগী অথচ কর্মী নাই কেন? ছেলেবেলা হইতে ব্রহ্মচর্য না শিখিলে আমরা প্রকৃত শিষ্য হইতে পারিব না। অসংযত প্রকৃতি এবং বিলাসিতায় আমাদিগকে পুষ্ট করিতেছে—দারিদ্র্যকে সহজে গ্রহণ করিতে পারিতেছি না বলিয়াই সকল প্রকার হৈন্যে আমাদিগকে পরাভূত করিতেছে। তুমি যদি ইতিমধ্যে একবার এখানে এস তবে তোমাকে লইয়া আমার এই কাজটি পত্তন করিতে হইবে।

তোমার রবি

[আগষ্ট ১৯০১]

আজও ঘা শুকায়নি

"সহস্রদিনের মাঝে সেই দিনখানি"

সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথের "জীবন-স্মৃতির" নানা যে সকল ঘটনার উল্লেখ আছে তার মধ্যে কোনটি সব চেয়ে স্মরণীয় তা নির্ণয় করা কঠিন বলে মনে হয়। একটি ঘটনা পিছনে ফেলে পরবর্তী ঘটনাকে মনে হয় সব চেয়ে স্মরণীয়। প্রত্যেক মানুষের জীবনে তাঁর স্মৃতির পাহারা দায় কেটে চলে ঘটনাগুলি; পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার গুরুত্বে এক একটি ঘটনা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে মানসপটে। মনে হয় এ উজ্জ্বলতা চিরস্থায়ী, কোনদিনই স্তিমিত হ'বার নয়। কিন্তু দেখা যায় সেও মিলিয়ে গেল কোনো উজ্জ্বলতর ঘটনার আবির্ভাবে। তবে একথা ঠিক, স্মরণীয় কোনো ঘটনাই স্মৃতিপট থেকে একেবারে মুছে যায় না। স্মৃতিচারণের পর্যায়ে পর্যায়ে কোনটি উঁকিঝুঁকি দেয় আবার কোনটি বা সমগ্র স্মৃতিকে সম্পূর্ণ সজাগ ক'রে তোলে।

"গল্প-ভারতী"র সাদর আমন্ত্রণ পেয়ে যখন স্মৃতিচারণ সুরু হ'ল তখন মনে হ'ল জীবনে ছোট বড় অনেক স্মরণীয় ঘটনাকে পিছনে ফেলে ১৯২১ সালের জানুয়ারী মাসের একটি দিনের কথা। নিশ্চিত ভাবেই বলা যায় যে দিনের ঘটনাই আমার জীবনে সব চেয়ে স্মরণীয়।

তার পটভূমিতে ৪২ বছর আগের বাংলা দেশকে এখনো মনে পড়ে,—মনে পড়ে আত্মসমীক্ষার কথা। সেকথা আমি "বিপ্লবী জীবনের প্রথম অধ্যায়"এ সুভাষচন্দ্র ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র প্রসঙ্গে বলেছি। অপ্রাসঙ্গিক নয় বলেই তার কিছু কিছু পুনরুক্তি করছি।

১৯২০ সালের বাঙলা—সে বাঙলা "সোনার বাঙলা" নয়। সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা বাংলা দেশের বাণীমূর্তি কবি কল্পনায় বিধৃত কিন্তু তার বাস্তব রূপ প্রত্যক্ষ করলে মন বেদনায় ভরে ওঠে।

—সে যেন এক বিশাল "দেশ কারাগারে"—বন্দী জীবন যাপন করা। আশা নেই, উৎসাহ নেই। ধ্বংসোন্মুখ জাতির স্তিমিত জীবনে আলোর ইসারা মাঝে মাঝে আসে কিন্তু সে কদাচিৎ বিপ্লবী বাঙলার অগ্নিতপস্যায় বহ্নি জীবনকে আহুতি দিয়ে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে আত্ম-গোপনকারী মুক্তাভিলাষী সন্তানের দল। হঠাৎ দেখা যায় এখানে সেখানে অগ্নি বিস্ফোরণ, ভস্মাচ্ছাদিত স্ফুলিঙ্গের গোপন সঞ্চরণ,—; অসন্তোষ, বিক্ষোভ আত্মপ্রকাশ করে অস্ত্র রূপে তার ব্যাপ্তি ও বিস্তৃতি প্রতি মুহূর্তে প্রতিরুদ্ধ হয় ব্রিটিশ শাসনের নির্মম আঘাতে। 'দেশ-কারাগারে' বন্দী মানবাত্মার অন্তর্দাহ আকাশ বাতাস ভারাক্রান্ত করে তোলে নিরুপায় আর্তনাদে। কিন্তু সে

---

*"দেশকারাগার" কথাটি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের

অন্তর্গাহে মানুষ নিজে জলে উঠে অপরকে জ্বালিয়ে দেয় সে দাহের একান্ত অভাব ঘটেছে বলেও মনে হয় না। শুধু চারিদিকে একটা ধমধমে ভাব।

অন্ধ সংস্কারের মোহ, দাসসুলভ মনোভাব, স্বজন বিদ্বেষ ও আত্মপ্রবঞ্চনা সমগ্র জাতির চেতনাকে বিষন্ন ও বুদ্ধিকে বিভ্রান্ত করে রেখেছে। তার উপর পরমুখপ্রেক্ষিতার গ্লানি, পরবশতার কলঙ্ক, প্রতিদিনের অন্যায় বিধানের কাছে নির্বিচারে আত্মসমর্পণ, স্বজন সংগ্রামে শক্তিক্ষয়, পরমত-সহিষ্ণুতার অভাবে গৃহবিচ্ছেদ—বাঙালীর জীবনকে তখন দুর্বহ করে তুলেছে। প্রভাতের বিড়ম্বনার সঙ্গে সঙ্গে পদে পদে মনুষ্যত্বের অপমান অসহ্য হয়ে উঠেছে তখন পরাধীনতার মর্মান্তিক উপলব্ধিতে। রবীন্দ্রনাথ বললেন—

"শুধু দিনযাপনের, শুধু প্রাণ ধারণের গ্লানি
সরমের ডালি,
নিশি নিশি রুদ্ধ ঘরে, ক্ষুদ্রশিখা স্তিমিত দীপের
ধূমাঙ্কিত কালি—
লাভ ক্ষতি টানাটানি, অতি ক্ষুদ্র তার অংশ ভাগ
কলহ সংশয়—
সহেনা সহেনা আর, জীবনেরে খণ্ড খণ্ড করি
দণ্ডে দণ্ডে ক্ষয়।"

পরাধীন জাতির দুর্বলতার মধ্যে তার আত্মবিস্মৃতির গ্লানি সর্বাপেক্ষা শোচনীয় ও মর্মান্তিক। জাতিকে পঙ্গু করতে, দেশ ধর্ম ও সংস্কৃতিকে ভুলিয়ে দেবার পক্ষে এমন প্রতিক্রিয়াশীল মানসিক বিপর্যয় আর দ্বিতীয়টি নেই। তাই তখন দেখতে পেলাম উর্বর মস্তিষ্ক বাঙালী, যান্ত্রিকীর বুদ্ধি দেখে তাম্রিক করে, সর্বত্যাগী বাঙালী, মাড়োয়ারীর ত্যাগ দেখে মুগ্ধ হয়, অধিনয়ে দীক্ষিত নিভিক বাঙালী, মারহাট্টির বীরপনার কথা শুনে প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে ওঠে। রাজা দিবা, প্রত্যাপাদিত্য, ও ঈশাখাঁ, মোহনলাল মীরমদনের স্বজাতি বাঙালী, পাঞ্জাবীর সামরিক কৌশল দেখে স্তম্ভিত হয়, নিখিল ভারতের রাষ্ট্রগুরু বাঙালী, বোম্বাই এর রাজনৈতিক আস্ফালন দেখে বাহবা দেয়, আদর্শ প্রচারক বাঙালী, আদর্শের অন্বেষণে ছোটে বাংলার বাইরে; চিন্তা ও ভাবুকতায়, স্বদেশ প্রেম ও জাতি সংগঠনে অগ্রণী বাঙালী সেদিন নেতৃত্বের দায়িত্ব বাঙলার বাইরে পাঠিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত আরামে স্বজাতির বিদ্যায় পঞ্চমুখ হয়ে ওঠে।

বাঙালী চিত্তরঞ্জন একথা মর্মে মর্মে বুঝলেন, বুঝলেন বাঙালীকে এই মোহমুগ্ধ দুর্গ প্রাকার ভেঙে জাগিয়ে তুলতে হবে তার আত্মবিস্মৃতির অচৈতন্য অবস্থা থেকে। নিজের সত্যকার পরিচয়ে ঘটবে বাঙালী জীবনের নব অভ্যুদয়। তিনি বাঙালীকে আহ্বান করে সেদিন বললেন—

"সমবেত চেষ্টা চাই, সকলের উদ্যম চাই, বাঙালীর স্বার্থত্যাগ চাই। এই যে জীবন যজ্ঞ, ইহা শুদ্ধচিত্তে পবিত্র প্রাণে আরম্ভ করিতে হইবে। সকল বিদ্বেষ স্বার্থ ইহাতে আহুতি দিতে হইবে। ইহাতে ধর্ম ধর্ম নির্বিশেষে সকলকে আহ্বান করিতে হইবে। অনেক বাধা অনেক বিঘ্ন। অসহিষ্ণু হইলে চলিবেনা।"

সেই সঙ্গে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের বাণী সেদিন বাঙালীকে তার স্বরূপ চিনবার অনুপ্রাণিত করল :

বড় দুঃখ, বড় ব্যথা সম্মুখেতে কষ্টের সংসার
বড়ই দরিদ্র, শূন্য, বড় ক্ষুদ্র, বদ্ধ অন্ধকার।
অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ উজ্জ্বল পরমায়ু
সাহস বিস্তৃত বক্ষপট।"

রাজনৈতিক ঘটনার তখন দ্রুত পটপরিবর্তন চলছে ; স্বাতন্ত্র্যপ্রয়াসী জাতির সংগ্রামের ইতিহাসে নিরাশার পর আশা, অপমান ও লাঞ্ছনার পর আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা কংগ্রেসের দিক থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠ্‌তে লাগল। তাই ১৯২ সালে এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানের কলিকাতা ও নাগপুর অধিবেশন ভারতের রাজনৈতিক আকাশে নবদিগন্তের সন্ধান দিল। তখন থেকেই জাতির স্বাধীনতা সংগ্রাম একটি সম্পূর্ণ অপরিচিত পথে যাত্রা সুরু করল। এই সর্বপ্রথম জাতীয় সংগ্রামের মধ্যে গণ-আন্দোলনের মহিমান্বিত রূপ আত্মপ্রকাশ করল। এমন কি হিংসাপন্থী বিপ্লব বাদও সেই অভূতপূর্ব উদ্দীপনা থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন রাখতে পারল না।

তীর্থঙ্কর মহাত্মা গান্ধী সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। ঠিক এই সময় ১৯২০ সালের ডিসেম্বর মাসে নাগপুর কংগ্রেসে তাঁর "অহিংস অসহযোগ" এর প্রস্তাব গৃহীত হল। তিনি পক্ষ সমর্থনে বললেন—"If India had the sword to day, she would have drawn the sword."

গান্ধীজীর সঙ্গে বোম্বাপড়ার পর ব্যারিষ্টার চিত্তরঞ্জন অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করলেন। নাগপুর থেকে ফিরে এসে, বাঙ্‌লাদেশে বাঙালী জাতির পুনঃ প্রতিষ্ঠা কল্পে, তিনি সর্বস্বত্যাগ ক'রে এসে দাঁড়ালেন প্রসন্নময় পার্কে, সেই সভাতেই নায়ক—সম্পাদক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় চিত্তরঞ্জনকে অভিনন্দিত করে তাঁকে "দেশবন্ধু" বলে ঘোষণা করলেন। সারা বাঙলা দেশে অভূতপূর্ব সাড়া পড়ে গেল—আন্দোলনের উত্তাল তরঙ্গ সমগ্র দেশের অন্তরঙ্গ আলোড়িত করে তুলল।

সেটা ১৯২০ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষাশেষি। এখনো মনে পড়ে সেদিন সেই শীতের রাত্রে আকাশের ঘনঘটার কথা। সমর দীপের ঝড়ো হাওয়া প্রবল বেগে বয়ে গেল কলিকাতা শহরের উপর দিয়ে। আকাশে মেঘ গমগম করছে, বিদ্যুৎ স্ফুরণের বিরাম নেই।—সেই বিনিদ্র রজনীর নির্জন অন্ধকারে ফকির চাঁদ মিত্র ষ্ট্রীটের পোষ্ট গ্রাজুয়েট মেসে, দারুণ উৎকণ্ঠায় শুয়ে আছি—; ক্রমশঃ মানস-নেত্রে প্রকট হয়ে উঠ্‌ল বন্ধন বেদনায় বিবশ মাতৃমূর্তি। নির্বাক নিশ্চল সে মায়ের মূর্তি—এলায়িত ঘন কুন্তলে বিদ্যুৎগর্ভ মেঘের সম্ভার। সেই ঘনায়মান নিরাশার অন্ধকারে দেখতে পেলাম কাল ভৈরবের শ্মশান জাগরণ।—শুনতে পেলাম তালবেতালের নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে বাজছে অযুত শঙ্খ নয়—কপাল, শুনতে পেলাম সেই দুর্যোগে দূর দুর্গম পথ অতিক্রম করে যেন এগিয়ে আসছে অগণিত নর-নারী শিশুর মিছিল। আমার শয়ন শিয়রের সেই বিষণ্ণমূর্তি কোথায় যেন মিলিয়ে গেল—। তার স্থানে দেখতে পেলাম মৃত্যুবিজয়িনী শ্মশানচারিনী ভৈরবী যোগাসনে ধ্যানমগ্না। বহুদূর থেকে ভেসে আসতে লাগল অযুত কণ্ঠের "বন্দেমাতরম্" ধ্বনি।

এ স্বপ্ন মানুষ জীবনে কয়াচ কখনো দেখতে পায়। এর এ ক্লাশে পড়ছি—'ফাইনাল' পরীক্ষা আগত প্রায়। কিন্তু কিসের পরীক্ষা? পরের দিনই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নাম কাটিয়ে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিলাম। সেটা ১৯২১ সালের জানুয়ারী মাস।

ব্যক্তিগত জীবনে এমন অসহযোগ তখন অনেকেই করেছেন—। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছাত্রহিসেবে আমিই যে প্রথম বেরিয়ে এলাম এজন্য নিজে আত্মপ্রসাদ অনুভব করিনি বললে মিথ্যাচার হবে। কিন্তু জীবনে এ ঘটনা অবশ্য স্মরণীয় হলেও - একেবারে যে অবিস্মরণীয় এ কথা বলা যায় না।

অবিস্মরণীয় ঘটনা ঘটল—পরের দিন সন্ধ্যায় ইডেন বিয়েটারের ছাত্রসভায়। বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হয়েছিল,—সে সভায় বক্তৃতা করবেন: মহাত্মা গান্ধী, মৌলানা মহম্মদ আলি, সউকৎ আলি, চিত্তরঞ্জন দাশ, দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ আন্দোলনের নেতা গান্ধী শিষ্য মিঃ টমাস—এবং আরও অনেকে।*

বেলা ৩টার মধ্যে দলে দলে ছাত্রেরা এসে সভাগৃহ পূর্ণ করে দিলেন। সবান্ধবে যখন সেখানে ৪টার সময় পৌঁছলাম তখন সেখানে তিল ধারণের স্থান নেই। চিরদিন ছাত্রনেতা হ'বার সৌভাগ্য ঘটেছিল বলে স্থান সংগ্রহে সুযোগের অভাব হল না।

অধীর প্রতীক্ষায় যখন সন্ধ্যা ৬টা উত্তীর্ণ হয়ে গেল তখনও নেতৃবৃন্দের দেখা নেই। মঞ্চের উপর হঠাৎ চিত্তরঞ্জনকে দেখে ছাত্রেরা হর্ষ কোলাহলে তাঁকে অভিনন্দিত করল। তাঁর পিছনে অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। গান্ধীজী কাঁধ থেকে "তিলক স্বরাজ্য ভাণ্ডারের" জন্য সংগৃহীত অর্থের থৌচকাটি নামিয়ে বসে পড়লেন—পাশে বসলেন শ্রীমতী কস্তুর বাঈ গান্ধী।

চিত্তরঞ্জন সামনের দিকে এগিয়ে এসে বললেন,—"ছাত্রদের মধ্যে যিনি সর্বপ্রথম কলেজ ছেড়ে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন তাঁকেই আমি এই ছাত্রসমাবেশে সভাপতিত্ব করতে আহ্বান করছি—এ সম্মান তাঁরই প্রাপ্য। হেমন্ত (হেমন্ত কুমার সরকার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পরে তিনি বাংলাদেশের অন্যতম কংগ্রেস নেতা ও চিত্তরঞ্জনের প্রিয় শিষ্য বলে খ্যাতি লাভ করেন) আমাকে তাঁর নাম বলেছেন—কৈ সাবিত্রীপ্রসন্ন কৈ?" হেমন্তদা তখন সমবেত ছাত্রদের মধ্যে আমাকে খুঁজছিলেন। বন্ধুরা আমাকে হৈ হৈ করে ঠেলে এগিয়ে দিলে—হেমন্তদা হাত ধরে তুলে নিলেন সভা মঞ্চের উপর। আমার তখন বুকের মধ্যে ঢিপ, ঢিপ করছে। ঘামা দিয়ে উঠেছে ঘামে, ভয়ে লজ্জায় কুণ্ঠায় বিব্রত হয়ে পড়েছি। হেমন্তদার প্রস্তাবে এবং দেশবন্ধুর সমর্থনে সভাপতি হয়ে চেয়ারে বসতে গিয়ে যেন বুক ফেটে কান্না আসতে লাগল। কেন? আমি তো চাইনি এসব। কী এমন বাহাদুরীর কাজ করেছি? কতটুকুই বা আমার সামর্থ্য? বিপ্লবী জীবনে সাহিত্য লাভ করেছি অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত মরণজয়ী বিপ্লবীদের—সম্বল ছিল শুরুশিষ্যের। কোথাও গোপন চিঠি নিয়ে যাওয়া বোঁচকা করে কোথাও বা রিভলবার পৌঁছে দেওয়া। লাঠিখেলা ছোরা খেলা, নৌকা বেয়ে অজানা

---

* এই সভার প্রত্যক্ষ দ্রষ্টা ছিলেন, কংগ্রেসের ছাত্রকর্মী অসহযোগী আমার পরম প্রীতিভাজন সত্যেন্দ্র রায়—যিনি 'গল্প-ভারতী'র কর্ণধার এবং অত্যাধুনিক সাহিত্য-প্রগতির মধ্যে নিভিক ভাবে পরিচয় দিচ্ছেন 'গল্প-ভারতী'র পৃষ্ঠায় সৎ-সাহিত্য পরিবেশন করে।

স্থানে গিয়ে বলগড়া, প্রচার পত্র বিলি করা। সেতো সামান্য কাজ! কিন্তু আজ যে দিন এসেছে তাতে আমার স্থান সেখানে কতটুকু?

বেয়ারা ইংরেজিতে লেখা সভার কার্যসূচী রেখে গেলেন টেবিলের উপর। চিত্তরঞ্জন বললেন—"সভার কাজ আরম্ভ করে দাও।" ততক্ষণে নিজেকে অনেকটা সামলে নিয়েছি। কাগজ দেখে আমি একে একে বলে যেতে লাগলাম—I call upon Mr. C. R. Das to address the Students—। সেদিন চিত্তরঞ্জন বলেছিলেন—"তোমরা যে গোলামখানা ছেড়ে বেরিয়ে এসেছ আমার আহ্বানে তার জন্য আমার আনন্দের সীমা নেই। তোমরাই আমার আশা ভরসা, তোমরা আমার সঙ্গে থাকলে আমার বুকের বল বেড়ে যাবে চতুর্গুণ, আমি ব্রিটিশ সরকারের রক্ত চক্ষুকে ভ্রূক্ষেপও করব না। তোমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে সারা বাংলা দেশ তা আমি জানি কিন্তু এও জানি তোমাদের সর্বাগ্রে শিক্ষালাভ করতে হবে। তাই আজ আমি তোমাদের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, বাঙলা দেশের জাতীয় শিক্ষার গোড়া পত্তন হবে তোমাদের নিয়ে। আমি এমন একটি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তুলব যার গৌরবে সারা দেশ গৌরবান্বিত হবে। আজ তোমাদের যাত্রাপথের পাথেয় সারা দেশের আশীর্বাদ—দেশের শুভেচ্ছা তোমাদের যাত্রাপথকে নির্বিঘ্ন করবে।"

আমার বেশ মনে পড়ে চিত্তরঞ্জনের বক্তৃতার পর I call upon Mahatma Gandhi to deliver his address বলতে আমার প্রায় শ্বাসরুদ্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। নেতৃবৃন্দের বক্তৃতার পর কার্যসূচী অনুসারে ছিল সভাপতির বক্তৃতা। কি বলেছিলাম সব কথা মনে নেই, থাকবার কথাও নয় কারণ তখন আমার সম্মোহিত অবস্থা। শুধু একটা কথা মনে আছে। আমি বলেছিলাম "পথের ফকিরকে যদি জরির পোষাক পরিয়ে সিংহাসনে বসিয়ে দেওয়া যায় এবং বলা হয় তুমি "ফারমান" জারি করো—তাহলে তার যে অবস্থা হয় আমারও তাই।"

মনে আছে সভা ভঙ্গের পর গান্ধীজীকে প্রণাম করতেই তিনি মৃদুহাস্যে আমার মাথার উপর হাত রেখেছিলেন, আর সকলে আমার দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে চেয়েছিলেন। কেমন একটা অনুভূতি আমাকে যেন অভিভূত করে দিল। বন্ধুদের সঙ্গে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে মনে হল, যে শক্তি সামান্যকে অসামান্য করে তোলে, ক্ষুদ্রকে করে মহৎ সম্মানের যোগ্য, সে শক্তি যেন আমাকে সঙ্কটের বিহ্বলতা থেকে রক্ষা করে। বুকের দ্রুত স্পন্দন তখনো থামেনি। আনন্দে, গর্বে, পরিতৃপ্তিতে আমার সারা মন পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। এরকম দিনতো মানুষের জীবনে কদাচ কখনো আসে, সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত অযাচিত বলেই তা' জীবনের একটি পরম রমণীয় অবিস্মরণীয় দিন। আজও জীবনের অপরাহ্নে সেদিনের স্মৃতি আমাকে আনন্দ দেয়—বিহ্বল করে তোলে, কখনও কখনও অশ্রুসজল চক্ষে অনুভব করি—"সহস্র দিনের মাঝে সেই দিনখানি হয়েছে স্বতন্ত্র চিরন্তন"।

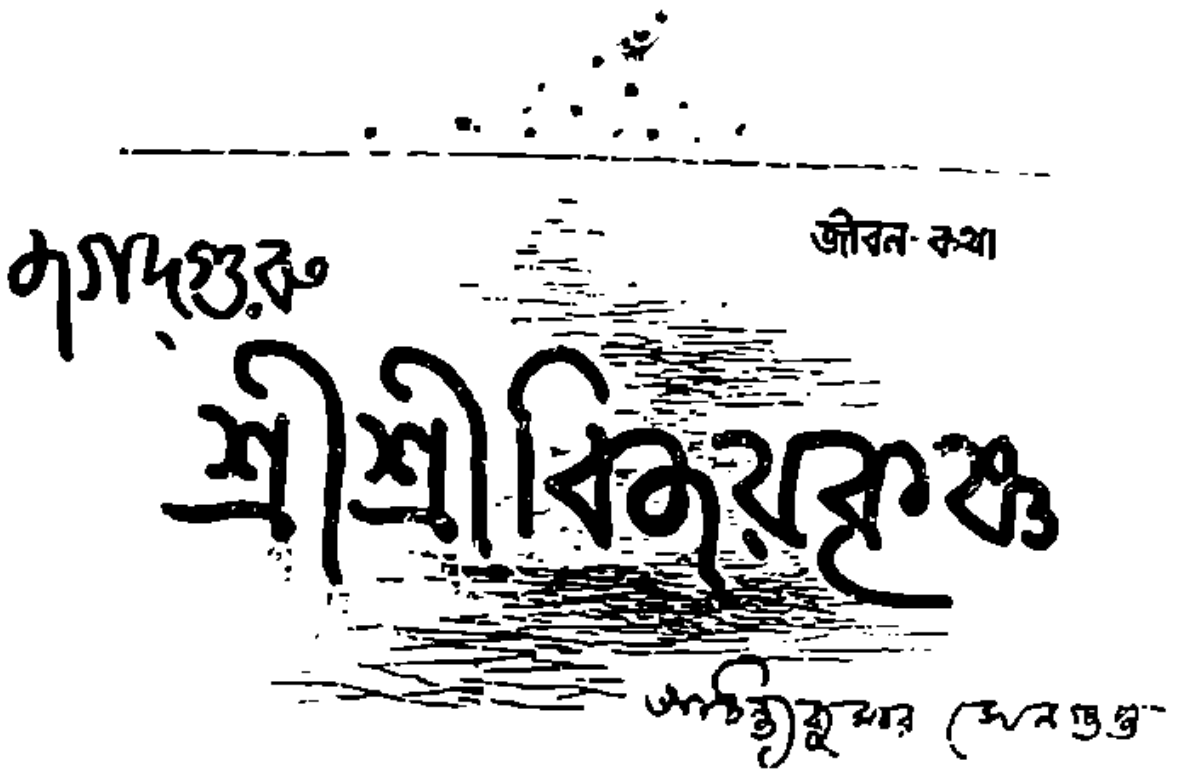

২৬

সেওারিয়াতে শঙ্খঘণ্টা কাঁসর বেজে উঠল।

কী ব্যাপার?

নাম-ব্রহ্মের মন্দির স্থাপিত হল। যোগমায়া দেবীর সমাধি-মন্দির।

যোগমায়া দেবীর দেহরক্ষার পর বৃন্দাবনেই গোঁসাইজীর কাছে নিত্যানন্দ প্রভু প্রকাশিত হয়ে আদেশ করেছিলেন সেওারিয়া আশ্রমে যোগমায়া দেবীর অস্থি সমাধিস্থ করে তার উপর মন্দির তুলে নাম-ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা করো। নাম-ব্রহ্মই কলির একমাত্র দেবতা।

কী—কে নাম-ব্রহ্ম?

গোঁসাইজির চোখের সামনে আকাশপটে স্বর্ণাক্ষরে প্রস্ফুটিত হল: 'ওঁ হরি। নাম-ব্রহ্ম। হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥'

যোগমায়া দেবীর পুণ্যাস্থির সমাধির উপর মন্দির উঠল। বেদীর উপর রাখা হল তাঁর ব্যবহৃত আসন ও শয্যা, শাঁখা ও সিঁদুরের কৌটো; আর তাঁর কণ্ঠী ও নাম-ব্রহ্মের পট।

মহাষ্টমীর দিনে মন্দির প্রতিষ্ঠা। সারাদিন যোগযাগ ভোগ চলল, সন্ধ্যা হতেই সুরু হল কীর্তন।

'নাচে আর হরি বলে গৌর নিতাই,
আমার গৌর নিতাই, নাচে অদ্বৈত গোঁসাই,
নাচে হরিবোল, হরিবোল বলে রে
তোরা দেখবি যদি আয় আয়, দরশনের সময় যায়—
যারা ভেদের বিচার নাহি করে, যারে তারে প্রেম বিতরে।

এমন দয়াল ঠাকুর আর দেখি নাই—'

কীর্তনান্তে গোসাইজি নিজে হরির লুট দিলেন।

'তোরা কে নিবি লুটে রে, নিতাই চাঁদের প্রেমের বাজারে।
হাটের রাজা নিত্যানন্দ, পাত্র হলেন শ্রীচৈতন্য
দুলিগিরি দিলেন অদ্বৈতেরে,
হরিদাস খাজাঞ্চি হয়ে লুট বিলায়ে নগরে।'

কলিহত দুর্বল জীবের জন্যে সহজসাধ্য পূজা এই নাম-ব্রহ্মের পূজা। ভক্তিই এ পূজার শ্রেষ্ঠ উপকরণ। আর কিছু নয়, নিদানে ভক্তিভরে একটি প্রণামই যথেষ্ট।

'হরি' এই কথাটিই শুধু হরিনাম নয়। যে নামে পাপহরণ করে তাই হরিনাম। কালী কৃষ্ণ রাম দুর্গা সবই হরিনাম। গায়ত্রীও হরিনাম।

ঈশ্বরের নাম অক্ষর নয়, স্বয়ং ঈশ্বরই নাম। তিনি শক্তি, নামও শক্তি। নামস্পর্শমাত্র প্রাণে যদি প্রেম ভক্তি পবিত্রতা না আসে বুঝবে তা ঈশ্বরের নাম নয়, কটি অক্ষরমাত্র।

হরিনামে প্রেম-লাভের ক্রম কী? প্রথম পাপবোধ, দ্বিতীয় পাপকর্মে অনুতাপ, তৃতীয় পাপে অপ্রবৃত্তি, চতুর্থ কুসঙ্গে ঘৃণা, পঞ্চম সৎসঙ্গে অনুরাগ, ষষ্ঠ নামে রুচি ও গ্রাম্য কথায় অরুচি, সপ্তম ভাবোদয় আর অষ্টম প্রেম।

কী ভাবে নাম করলে নামের ফল সহজে পাওয়া যায়? তৃণের মত নীচ হয়ে, বৃক্ষের মত সহিষ্ণু হয়ে, নিজের অভিমান ত্যাগ করে মান্য ব্যক্তিকে মান দিয়ে—আর এই অবস্থা লাভ করতে হলে দরকার সৎসঙ্গ, ধর্মগ্রন্থপাঠ, গুরু-আজ্ঞা-পালন আর ভক্তসেবা।

কাম আর প্রেমে পার্থক্য কী?

কাম নষ্ট হোক একথা ঠিক নয়। কাম থাকুক, কিন্তু ত্রিগুণের অতীত হয়ে। শারীরিক সুখের সঙ্গে মিশে থাকলেই কাম আর শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেই প্রেম। তখন প্রেম আত্মার অংশ, তার মানেই আত্মা!

মন্দির প্রতিষ্ঠার প্রায় একমাস পর গোসাইজি হঠাৎ একদিন খুব ব্যস্ত হয়ে বলে উঠলেন: 'মাকে দেখতে কাল ভোরেই আমি শান্তিপুর যাব।'

কেন, কী হল, মা কোনো খবর পাঠিয়েছেন না কী, কাউকে কিছু ভাঙলেন না। তবে বুঝি স্বর্ণময়ী মৃত্যুশয্যায় তাই গোসাই শেষ দেখা দেখতে ছুটেছে।

কজন ভক্ত-শিষ্যও গোসাইজির সঙ্গী হল।

বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে স্বর্ণময়ী যেন বিজয়েরই অপেক্ষা করছিলেন, ছেলেকে দেখে অভাবনীয় আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন: 'এ কী, তুই? তুই এলি?'

'মা, না এসে করি কী!' গোসাইজি মায়ের পায়ে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করলেন: 'তুমি যে বিষম, বিষম বলে আমাকে ডাকলে? কী ডাকো নি? ডাক শুনেই তো চলে এলাম। কী হয়েছে তোমার মা?'

স্বর্ণময়ীর গায়ে প্রহারের দাগ। বললেন, 'আমাকে ওরা মেরেছে।'

ব্যাপারটা বুঝে নিতে দেরি হল না গোসাইজির। স্বর্ণময়ীর উন্মাদ-রোগ সম্প্রতি বেড়ে

গিয়েছিল ও যে আত্মীয়টি তাঁর রক্ষণাবেক্ষণ করছিল সে পাগলামি সহ্য করতে না পেরে নিদারুণ প্রহার করে বসেছিল। প্রহারের ফলে মূর্ছিত হয়ে পড়েছিলেন স্বর্ণময়ী, কিন্তু মূর্ছা যাবার আগে প্রহারের প্রথম প্রতিক্রিয়ায় তিনি অনুপস্থিত ছেলেকে পরিত্রাতারূপে ডেকে উঠেছিলেন : বিজয়, বিজয়! আর শান্তিপুরের ডাক গেওারিয়ার বসে শুনেছিলেন বিজয়কৃষ্ণ।

মাকে নিয়ে ঘরের মধ্যে চলে এলেন গোঁসাই। বললেন, 'আর তোমাকে কাছছাড়া করব না।'

আজ রাসযাত্রা। গৃহদেবতা শ্যামসুন্দরকে আগে দর্শন করি, কেমন না জানি আজ সেজেছেন, তাঁর মাথার চূড়ো না জানি কেমন ঠিলিক দিচ্ছে!

মন্দির-প্রাঙ্গণে এসে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে গোঁসাই শ্যামসুন্দরের দিকে তাকালেন। নয়নের নিমেষ আর পড়ল না, কাঁদতে লাগলেন অঝোরে। আমি তোমাকে মানিনি কিন্তু তুমিও আমাকে ছাড়োনি। কেবল ঘোরালে, ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আবার নিয়ে এলে স্বস্থানে।

বড় রাস্তায় দাঁড়িয়ে গোঁসাইজি রাসযাত্রা দেখলেন। কত বিগ্রহ, কী বিচিত্র বেশভূষা, সাজসজ্জার কী সমারোহ! ভগবৎবুদ্ধিতে নিজের নিজের বিগ্রহকে যারা প্রাণের সমস্ত ঐশ্বর্য দিয়ে সাজিয়েছে ভগবানের সঙ্গে সঙ্গে সেসব ভক্তদেরও দেখ!

গোঁসাই বললেন, 'ঢাকার জন্মাষ্টমী, বৃন্দাবনের দোল, অযোধ্যার ঝুলন আর শান্তিপুরের রাস দেখবার জিনিস। কোথাও তার তুলনা নেই। এসব উৎসবে যারা যোগ দেয় তাদের মনে অশান্তি বলে কিছু থাকে না।'

অবিশ্বাসেই অশান্তি। অবিশ্বাস কেন? অবিশ্বাসের মূলে স্বার্থবুদ্ধি, পরনিন্দা, হিংসাদ্বেষ। এসব থেকেই নানা দুর্গতি উপস্থিত হয়। এজন্য ধার্মিকের একটি প্রধান লক্ষণ, প্রাণান্তেও পরনিন্দা করেন না। আত্মপ্রশংসা বিষতুল্য মনে করেন। হিংসা হৃদয়ে স্থান পায় না। ভগবানের কাজে অবিশ্বাস হলেই অসন্তোষ।

এক ভদ্রলোকের বাড়িতে নীলকণ্ঠের যাত্রা হচ্ছে, শিষ্য-ভক্তদের নিয়ে গোঁসাইজি সেখানে উপস্থিত হলেন। গণ্যমান্য গোস্বামীরাও এসেছেন। আসর খুব জমজমাট।

কিন্তু কী হল?

নীলকণ্ঠ না কোকিলকণ্ঠ! গান শুনে গোঁসাইজির ভাবসাগর উথলে উঠল, সমস্ত সাত্ত্বিকচিহ্ন প্রস্ফুটিত হল, তিনি আবেশে ঢলে ঢলে পড়তে লাগলেন। নীলকণ্ঠকে তখন দেখে কে, সে প্রবলতর উৎসাহে মেতে উঠল কীর্তনে। ভাবসংবরণ করতে না পেরে গোঁসাইজি লাফিয়ে উঠলেন ও উচ্চে হরিনাম তুলে উদ্দণ্ড নৃত্য করতে লাগলেন। যাত্রা ফেলে নীলকণ্ঠ তখন গোঁসাইজিকে আরতি সুরু করল। দেখতে দেখতে শিষ্যভক্তদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল ভাবস্রোত।

যাত্রার মধ্যে এসব কী অবান্তর প্রসঙ্গ। গোস্বামীরা বিরক্ত হয়ে বললে, 'এসব কী অবধা গোলমাল। এসব বন্ধ করে দাও।'

নীলকণ্ঠকেই উদ্দেশ করে বলছে। তোমার ওসব আরতির গান তো পালার বাইরে।

'আমার খুশি মত আমি গাইব।' নীলকণ্ঠ কঠিন হল : 'আমার মধ্যে যদি এখন আরতির ভাব এসে থাকে আমি ভক্ত মহাপুরুষের আরতিই করব।'

'কিন্তু তোমার ঐ ভক্ত মহাপুরুষের যাত্রার কোনো পার্ট আছে ?'

'নেই, তাই যাত্রা বন্ধ।' নীলকণ্ঠ ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললে, 'যেখানে মহাভাবের আদর নেই ভক্ত মহাপুরুষকে যেখানে মর্যাদা দেওয়া হয় না সেখানে আমি গান করি না।'

গান বন্ধ করে দিল নীলকণ্ঠ।

কীর্তন করতে করতে রাস্তা দিয়ে চলেছেন গোঁসাইজি। ভাবাবেশে নৃত্য করতে করতে পড়ে গিয়েছেন মাটিতে। উদ্ধত কতগুলো যুবক তাই দেখে বিদ্রূপ করে উঠল। বলল, সমস্ত চং, ভণ্ডামি।

দাঁড়াও, ভাব বার করছি। রাস্তার পাশেই একটা কামারশালা ছিল, সেখানে ঢুকে তারা একটা লোহার শলাকে আগুনে পুড়িয়ে আনল। চারপাশে শিষ্য-ভক্তদের ভিড়, মাঝখানে মূর্ছিত হয়ে পড়ে আছেন গোঁসাইজি, একটা ছোকরা সেই তপ্ত লোহার শলা তাঁর গায়ে চেপে ধরল। দেখি কেমন ভাব! দেখি ভাব এবার তিড়িং করে লাফিয়ে ওঠে কিনা।

না, প্রভু যেমন স্থির হয়ে পড়েছিলেন তেমনি স্থির হয়ে রইলেন। যেমন করছিল, ভক্তরা হরিধ্বনি করতে লাগল।

এ কী ভয়াবহ ব্যাপার!

গোঁসাইজি নড়লেন না, তাঁর গায়ে তপ্ত লোহার দাগ পর্যন্ত পড়ল না। এমন কী দেহ, আগুনের দাহিকাশক্তি লোপ পেয়ে গেল।

ছোকরারা একেবারে অভিভূত হয়ে পড়ল। ওরাও লাগল হরিনাম করতে। যুবক যিনি আগুনে দগ্ধ হন না, যাঁর স্পর্শে আগুন পর্যন্ত শীতল হয়, তিনি নরদেহে ভগবান ছাড়া আর কী!

সেদিন গোঁসাইজি বেড়াতে বেড়াতে অনেক দূরে চলে এসেছেন। জায়গাটা নির্জন, শুধু একটি জীর্ণকুটির দাঁড়িয়ে আছে।

গোঁসাইজি বললেন, 'সেই বাবাজীটি আর নেই।'

'কার কথা বলছেন ?'

'এখানে আগে একজন ভজনানন্দী বৈষ্ণব বাবাজী থাকতেন, আমি তাঁকে মাঝে মাঝে ভাণ্ডারের প্রসাদ এনে দিতাম। আনন্দ করে খেতেন আমার হাত থেকে।'

'সে কত দিনের কথা ?'

'অনেকদিন। আমার ছেলেবেলা।' গোঁসাইজি একটু হাসলেন, 'আমার বয়স তখন ন বছর।'

'আপনার সঙ্গে আলাপ হল কী করে ?'

'বলি সে কথা।' গোঁসাইজি বলতে লাগলেন : 'আমাদের বাড়িতে সেদিন কী এক সমারোহের ব্যাপার, বাবাজীও এসেছেন প্রসাদ নিতে। কিন্তু তিনি বাড়ির মধ্যে ব্রাহ্মণদের সঙ্গে না বসে বসেছেন বাইরে, রোয়াকে। তিনি খাবার চাইলেন—একবার নয়, দু'তিন বার। তাঁকে বলা হল, অপেক্ষা করুন, ব্রাহ্মণদের আগে হয়ে যাক, পরে আপনাকে দেয়া হবে।'

'পরে কেন ?'

'আর বোলোনা, বাবাজী ছিলেন অব্রাহ্মণ, হীনজাতি।'

'হীনজাতি! বৈষ্ণবে আবার জাতি কী!'

'সেই তো কথা।' বিজয়কৃষ্ণ উদ্দীপ্ত স্বরে বললে, 'সেদিনের সেই ন' বছরের বালকের কণ্ঠে সেই প্রতিবাদই তো মুখর হয়ে উঠল। আমি বললাম, একজন বৈষ্ণব ক্ষুধার্ত হয়ে খাবার চাচ্ছেন—প্রচুর খাবার তো রয়েছে দিয়ে দিলেই হয়—তার মধ্যে আবার ব্রাহ্মণ-শূদ্র কী! ক্ষুধার কাছে আবার জাত কিসের!'

'তারপর?'

'তারপর আর কী! আমি নিজেই উদ্যোগী হয়ে এগুলাম। বাবাজী বসুন, আমি দিচ্ছি আপনাকে। কিন্তু কোথায় বাবাজী! খাবার নিয়ে এসে দেখি বাবাজী নেই, ওই চলে যাচ্ছেন। খাবার রেখে ছুটলাম তার পিছনে, ধরে ফেললাম। কত সাধ্যসাধনা করলাম, কিছুতেই ফিরলেন না। বললেন, কুটিরে ফিরে যাচ্ছি, গোপালজী যদি আজ না খাইয়ে রাখেন, না খেয়েই থাকব।'

'চমৎকার!'

'আমি কায়দা করে বাবাজীর ঠিকানাটি যোগাড় করে নিয়েছিলাম, খাবার নিয়ে বাবাজীর সেই কুটিরে এসে হাজির হলাম। বললাম, বাবাজী আপনার প্রসাদ।'

বালকবয়সেই কী দয়া, কেমন পরসেবা বৈষ্ণবসেবায় তৎপর! সেই দয়ার শরীরের আশ্রয় পাওয়া ভক্ত-শিষ্যের দল মুহুকণ্ঠে বলে উঠল: 'অপূর্ব।'

'তারপর যখন বাড়িতে ছিলাম বিয়ে লেগেই আমার বাবাজীর কথা মনে হত। শ্যামসুন্দরের প্রসাদ চেয়ে এনে বাবাজীকে দিয়ে যেতাম।'

পথের দিকে তাকিয়ে ভক্ত-শিষ্যরা বললে, 'বলেন কী, এ তো প্রায় দেড় মাইল রাস্তা—'

'তা হোক।' দয়ার্দ্রতা উদার চোখে বিজয়কৃষ্ণ বললেন, 'কিন্তু বাবাজীকে না খাওয়ালে আহারে আমার রুচি হত না। কিন্তু আজ কোথায় সেই বাবাজী!'

একদিন একটি আকুল আন্তরিক আর্তি প্রকাশ করেছিল বাবাজী, তাইতেই সে নিত্য প্রসাদ ভোজনের অধিকারী হল। প্রসাদ ভোজন প্রকাণ্ড ভাগ্যের কথা। কিন্তু রান্না করে অন্ন ঠাকুরের কাছে ধরে দিলেই তা প্রসাদ হয় না। এমনও হতে পারে ঐ অন্নে ঠাকুরের প্রবৃত্তি হল না। গ্রহণ করলেন না তিনি। তাহলে আর প্রসাদ হল কী করে? ঠাকুরই যদি প্রসন্ন না হন তাহলে সে অন্ন প্রসাদ না হয়ে প্রমাদ হয়ে ওঠে।

ভাবাক্ষেপা গন্ধ শুঁকে ঠিক বলে দিতে পারত রান্নার কোথায় কোন গাঁদুনির কী অনাচার ঘটেছে। খোঁজ নিয়ে দেখা যেত অভিযোগ অক্ষরে অক্ষরে সত্য। কী, ঠিক বলেছি তো? তাই ঠাকুর আজ এ অন্ন সেবা করেন নি, অনাহারে রয়েছেন। তখন আবার নতুন করে শুদ্ধমত রান্না করো।

একদিন সকলে মিলে বাবলায় গেলেন, অদ্বৈত প্রভুর মন্দিরে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে বসলেন প্রাঙ্গণে।

'স্থির হয়ে বসে নাম করো।' বললেন বিজয়কৃষ্ণ, 'তাহলেই বুঝবে স্থানমাহাত্ম্য।'

স্থির হয়ে বসে সকলে নাম করতে লাগল। কতক্ষণ পরে শুনতে পেল দূর থেকে এক সংকীর্তনের দল এদিকে এগিয়ে আসছে; খোল করতালের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। গৌরাইজি এখানে এসেছেন জেনেই হয়তো এই আয়োজন।

এগিয়ে আসছে ক্রমশঃ। বাদ্যধ্বনি স্পষ্টতর হচ্ছে।

চলো আমরাও গিয়ে কীর্তনে যোগ দিই। আবাহন করে নিয়ে আসি।

গোঁসাইজিকে এরা রেখে আর সকলে এগিয়ে গেল। কিন্তু এ কী আশ্চর্য, যতই তারা গোঁসাইয়ের থেকে দূরে যাচ্ছে ততই কীর্তনের ধ্বনি দৃঢ় হয়ে আসছে। কোন দূর পথে পাড়ি জমাল কীর্তনের দল? আরো কিছু দূর এগুলো ভক্তশিষ্যরা—এ কী, আর শব্দও নেই। সমস্ত বাক্যধ্বনি হাওয়ায় মিলিয়ে গেল।

ফিরে এসে তারা চুপচাপ বসল গোঁসাইয়ের পাশে। বললে সব গোঁসাইকে।

গোঁসাইজি বললেন, 'যোগো স্থির হয়ে। নাম করো। স্থির হয়ে বসে নাম করলেই সংকীর্তনে ভালো করে যোগ দিতে পারতে। এ সাধারণ কীর্তন নয়, মহাপ্রভুর কীর্তন।'

সকলে অবাক হয়ে গেল।

'ছেলেবেলায় বাবলায় এসে আমিও অমনি কীর্তন শুনতাম।' বললেন গোঁসাই, 'আর কোথায় কীর্তন, কোনদিকে, এদিক ওদিক ছুটোছুটি করতাম। এ কীর্তন যে কিভাবে শোনা যায় তখনো আমার কাছে ব্যক্ত হয়নি। সব ধরে থাকো, স্থির হও আর নাম করো, তবেই এ অপ্রাকৃত কীর্তন শুনতে পাবে।'

কী কুবুদ্ধি হয়েছিল ঘুরে সরে গিয়েছিল তাদের গোঁইজীকে ফেলে। তাঁর কৃপাশক্তিতে একবার শোনা গিয়েছিল কীর্তন, তাঁর কৃপাশক্তিতে কতবার আবার শোনা যাবে।

শান্তিপুর থেকে কলকাতা ফিরলেন গোঁসাই। মসজিদবাড়ি ষ্ট্রিটে একটা বাড়িতে এসে উঠলেন। দর্শনার্থীর ভিড়ে ভরে গেল ঘরদোর।

স্যালভেশান আর্মি বা মুক্তিফৌজ নিয়ে একখানা বই লিখেছে শ্রীচরণ চক্রবর্তী, ব্রাহ্মসমাজের প্রাক্তন সহকারী সম্পাদক, বর্তমানে গোঁসাইজির শিষ্য। এই ফৌজের অধ্যক্ষ জেনারেল বুথ। ওদের কাজ কী? দুঃস্থ-দুর্গতের সেবা। এরা কাউকে রেখে ভিক্ষা দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে। রাস্তার নিরাশ্রয় অন্ধ খঞ্জ রুগ্ন আতুর পরিত্যক্তদের তুলে নিয়ে আসে, স্বাস্থ্যকর বাসস্থানে রেখে সযত্নে শুশ্রূষা করে। শুধু সেবা আর চিকিৎসাই দেয় না ভালোবাসাও দেয়।

স্বার্থহীন ভালোবাসার কথা শুনে গোঁসাইজি কেঁদে ফেললেন। বললেন, 'পরদুঃখে যাদের প্রাণ কাঁদে তাঁরা সাক্ষাৎ তীর্থ। তাঁদের দর্শনেও লোকে পবিত্র হয়। চলো তাঁদের দেখে আসি।'

কালবিলম্ব নয়, দুপুরবেলাতেই মুক্তি ফৌজের আস্তানায় গিয়ে হাজির হলেন। তীর্থ-দর্শনের সুযোগ কে উপেক্ষা করবে? ঐখানে যে ভগবান প্রকাশিত—দয়ারূপে, সেবারূপে, অহেতুক পরহিতরূপে। চলো যাই চিত্তের প্রণয় নিবেদন পরম প্রণামটি রেখে আসি।

(ক্রমশঃ)

দলিল

ভূমিকার

পাঁচটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে কলম ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় মনোধীর। বাসায় ফিরে পোষাক ছেড়ে, কোনমতে চা খাবারে খেয়ে, মাইল খানেক পথ ঠেঙিয়ে, নিশ্চিন্তপুরে রহমান সাহেবের বাংলোয় এসে যখন হাজির হয়, তখনও সবাই এসে জোটে নি।

রহমান সাহেব রেলওয়ে এঞ্জীনিয়ার। তাঁর কোয়ার্টারে অনেক ঘর। বিপত্নীক একা মানুষ, নিঃসন্তান। কয়েকটা ঘর এমি পড়ে থাকে। নীচের ড্রয়িংরুমটার পাশের ছোট কুঠুরীতে ওদের আসর বসে, তাসের বৈঠক।

সহরে একটা ক্লাব আছে বটে, কিন্তু সংস্কার অভাবে তার অবস্থা শোচনীয়। চাঁদা ঠিকমত আদায় হয় না, লোকজনের মাইনে অনেকদিন বাকী। সন্ধ্যার সময় খোলা হয় রোজই, কিন্তু আটটা বাজার আগেই বন্ধ হয়ে যায়।

ঠিক সাড়ে ছ'টায় ওদের খেলা বসে—কী শীত, কী গ্রীষ্ম। ভাঙতে ভাঙতে রাত্তির সাড়ে দশটা। কোনও কোনও দিন আরও বেশী রাত হয়। রহমান সাহেব একা লোক, খুব মজলিসী। চলুক না আড্ডা যতক্ষণ খুশী! আপত্তি করবার লোক ত নেই কেউ বাড়ীতে। খেলোয়াড়েরা সবাই তরুণ। ওদের কারুর গৃহিণী নেই, এক মনোধীর ছাড়া।

বছর কয়েক আগে সহরে নিউ এশিয়াটিক ব্যাঙ্কের যে অফিস খোলা হয়েছে, মনোধীর মজুমদার তারই ম্যানেজার হয়ে এসেছে এখানে। এম্. এস্. সি. পাশ করে চাকরীর উমেদারী করতে করতে হায়রাণ হয়ে, শেষটায় জোগাড় হয়েছে ষেড়শো টাকার এই চাকরী। ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের সঙ্গে ওর খুড়-শ্বশুরের ঘনিষ্ঠতা আছে। তাঁরই সুপারিশ ও চেষ্টায় চাকরী। ...খুড়-শ্বশুর রায় বাহাদুর উচ্চ পদস্থ সরকারী কর্মচারী ছিলেন, কয়েক বছর হল রিটায়ার করেছেন। সম্পর্কে আবার তিনি মনোধীরের আপন পিসে হন। ওঁর দাদার মেয়ে মালতীলতার সঙ্গে বিয়ে হয়েছে মনোধীরের। মালতী ওর চেয়ে দশ বছরের ছোট, আর বিয়ের মাত্র ক্লাশ নাইনের গণ্ডী পেরিয়েছে। সুন্দর স্বাস্থ্য মালতীর—রং ফর্সাই। কমনীয় মুখশ্রী, বিশেষ করে ঠোঁট ও চিবুকের টোলটা অপরূপ। শুভ্র সুবাসিত দশন সংস্কৃতি। নম্র স্বভাব, বাইরে থেকে মনে হয় লাজুক, ভীরু কিন্তু অন্তরে তার তেজ ও দৃঢ়তার অভাব নেই। অসম্ভব ধৈর্য ও সহনশীলতা মেয়েটির।

বিয়েতে মনোধীর ঘোরতর আপত্তি জানিয়েছিল। একে ছোট মেয়ে তা ছাড়া পিসিকে মাতৃহীনা আর পিসতুতো ভাইবোনদের খালা খালি বলে ভাবতেই তার মনটা বিরূপ হয়ে ওঠে। সব চেয়ে বড় আপত্তি যে ও বরাবরই এমন একজন স্ত্রীর কল্পনা করে এসেছে, যে ওর সাথে লণ্ড, টেনিস নিয়ে ঝাঁক করে, গ্রাফ এঁকে, ওর রিসার্চের কাজে সাহায্য করতে পারে,—প্রফেসর কুরির সহকারিণী মাদাম কুরির মত। বড় বৈজ্ঞানিক হবার সাধ ছিল মনোধীরের।

মনোধীর ভাল ছেলে, কিন্তু ভাগ্য তার বিরূপ। পরীক্ষার ঠিক আগে বিয়েই পড়ল অসুখে।

পরীক্ষা দিল বটে, কিন্তু ফল ভাল হল না। পাশ করার পর টিউশানি করে কয়েক মাস রিসার্চ করল, কিন্তু শেষটায় প্রফেসরের সঙ্গে কি একটা ব্যাপারে চটাচটি হয়ে গেল। দারুণ বিতৃষ্ণায় কলেজ ছেড়ে দিল মনোধীর।...পরীক্ষা দিলে হয়ত দু'একটা চাকরী লেগে যেতেও পারত, কিন্তু দৃষ্টির দুর্বলতা যার মাইনাস্ সিক্স পেরিয়ে গেছে তার কাছে সরকারী চাকুরীর দ্বার চিরতরে অবরুদ্ধ। প্রাইভেট কলেজের লেকচারারের জন্য চার পাঁচ বছর আগের পাশকরা বহু কাই ক্লাশেরা ভিড় করে আছেন—কারো কারো আবার লণ্ডন বা ক্যাম্ব্রিজের ডিগ্রীও আছে।

শেষ পর্যন্ত মনোধীরের তীব্র অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিয়ে হয়ে গেল। আর তারই ঠিক ছ মাসের মধ্যে চাকরীও জুটে গেল তার। কলকাতার অফিসে তিন বছর কাটিয়ে পূর্ববঙ্গ ও আসাম সীমান্তে এই সহরে বছর দুই হল শাখা ব্রাঞ্চের ম্যানেজার হয়ে এসেছে মনোধীর।

মালতীর বয়স এখন উনিশ পেরিয়ে কুড়ি চলছে, মনোধীরের উনত্রিশ। কয়েক মাস আগে ওদের একটা মেয়েও হয়েছে।

ঘরকন্নার কাজে মালতী সুপটু। চমৎকার রান্না করে, আর সেলাই ও বুনানীর কাজও শিখেছে চমৎকার এই কয় বছরে। সোয়েটারের প্যাটার্ন তুলতে পাড়ার মেয়েরা আসে ওর কাছে। লতিকাই জ্যেষ্ঠা মেয়ে।

• • • •

রহমান সাহেবের ওখানে ব্রীজের আসর জমেই না মনোধীর ছাড়া। ওর মত দক্ষ খেলোয়াড় সহরে ত নেইই, গোটা পূর্ববাংলা ও আসামেও বোধ হয় আঙুলের ডগায় গোনা যায়। ও ছিল বলেই না ওদের ক্লাব (সাতজন সভ্য নিয়ে গঠিত VIBGYOR CLUB) চিটাগাং এ. বি. রেলওয়ে ইনস্টিটিউট টুর্ণামেণ্ট খেলে, ইয়া বড় একটা কাপ জিতে এনেছে।

ফিরতে ইদানীং প্রায়ই দেরী হয় মনোধীরের। শীতের রাতে রোজ সাড়ে দশটা, এগারোটা পর্যন্ত খাবার আগলে বসে থাকার কষ্টটা কি কম! অধিষ্ঠীয় ব্রীজ চ্যাম্পিয়ান মনোধীর বক্সুদার এম্. এস্. সি, গৃহে ফিরে কখন আহারে বসবেন—সেই ক্ষণের প্রতীক্ষায় বসে থাকে মালতী, টিফিন ক্যারিয়ারে খাবার ভরে টীম বাথে চড়িয়ে।

সকালে বাইরের ঘরে অফিসের কাজে ব্যস্ত থাকে মনোধীর। এ্যাকাউণ্টেণ্ট পাঠা পাঠা হিসাবের কাগজ, লেজার খাতা সই করিয়ে নিয়ে যায়। ব্যাঙ্কের সাথে লাগা বাসা। দিনের দিন হিসেব মিলিয়ে কাগজ পত্র সই করতে গেলে, অফিসে পাঁচটার পর আরও ঘণ্টা দুয়েক থাকতে হয়। এমনি কাজের ভিড়। যুদ্ধের বাজারে লোকের হাতে কাঁচা পয়সা আসছে, ব্যাঙ্কগুলো রাতারাতি ফেঁপে উঠল। একজন এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট ম্যানেজারের জন্য লিখেছে মনোধীর। একা কাজ করে কুল পাচ্ছে না।

রিসার্চ করবার উৎসাহ বহুদিন শেষ হয়ে গেছে। টেনসর ক্যালকুলাস কোয়াণ্টাম মেকানিক্স, থেরেলস্ ফাংশানের থীসী, মোটা মোটা বইগুলো, আলমারীর কোনে ধূলিধূসর হয়ে উঠেছে। কোনদিন কারো একটা পাতা খুলেও দেখার ইচ্ছে হয় না। তা ছাড়া সময় কোথায়?...সারাদিন কাজের ঘানিতে ঘুরে, একটু খেলাধূলো না করলে চলবেই বা কেন? রিলাক্সেশন ত চাই একটু!

ব্যাঙ্কের ক্যাশিয়ার বিজয়বাবুর শ্বশুরের বাড়ীর তিনখানা নীচের তালার ঘর নিয়ে

আছে মালতীরা। গৃহস্বামিনী থাকেন দোতলায়, বিধবা কন্যা ঝিয়ারী আর তার খুদে পড়া ছেলেটিকে নিয়ে।

ঘরের সব কাজকর্ম মেরে নিয়ে একা শেষে ওঠে মা মালতী। মেয়ে রাখা ছোকরাটা তিন দিনের জন্য বাড়ী যাবার নাম করে সেই যে ডুব মেরেছে, আজ তিন হপ্তা পেরিয়ে যায়, এখনও ফেরার নাম নেই।

মেয়েটা বড্ড ফাঁকাকাটি করে আজকাল। ওকে নিয়ে কি কাজ করা চলে? ভাগ্যিস্, ঝিয়ারদি আছেন!

উপরতলার মাসীমা মধুর স্বরে মৃদু ভর্ৎসনা জানান, 'ছেলে মানুষ বৌ, এত রাত পর্যন্ত একা একা থাকে, সকাল করে ফিরলেই ত হয়!'

মনোধীর ওঁর কথা শুনেও শোনে না।

পুতুর ফ্রক ফুরিয়েছে, একটা নতুন ফিন আনতে হবে তার জন্য। আর চাই পছন্দসই কিছু উল, ওর জন্যে একটা টুপি, একজোড়া মোজা আর মনোধীরের জন্য একটা মাফলার তৈরী করতে হবে।

স্বামীর সাথে যে দুটো দরকারী কথা বলবে, তার সুযোগও পেয়ে ওঠে না মালতী। অফিস-ফেরতা মনোধীর মিনিট পনেরোও বাড়ী থাকে কিনা সন্দেহ! কাপড় ছাড়তে আর চা জলখাবার খেতে যতটুকু সময় লাগে। তারপর ছোটে প্রাত্যহিক তাসের আড্ডায়। ব্যাঙ্কে এমনিই ছুটি-ছাটা কম। তাও আছে, মুলতবী কাজ সারতেই দিন কেটে যায়। কাজের এমনি চাপ পড়েছে!

মালতী ভাবে, দিনের পর দিন এক ঘেঁয়ে খেলায় এমন কী আনন্দ পায় লোকে? বাড়ীর কাছেই নদী। দু'পা এগিয়ে গেলেই হয়। কী সুন্দর টলটলে স্বচ্ছ জল। নীচে চরে তিল, সরষে, রুই, মুগডাল কত কি লাগানো হয়েছে। সবুজ, হলদে, নীল, বেগুনে রঙের সমারোহ—দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। নদীর ধারে রাস্তা যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানে প্রকাণ্ড কৃষ্ণচূড়া গাছ। ফুলে ফুলে লাল হয়ে উঠেছে গাছটি। কবির ভাষায় 'রক্তিম প্রমত্ততা'। আর বিকালের হাওয়াটা এমনি ঝিরঝিরে, যে দু'দণ্ড এখানে এসে বসলে শরীর ও মন দুইই স্নিগ্ধ হয়ে ওঠে।

মনোধীর কালে ভদ্রে সিনেমা দেখে। মালতীকে সাথে নিয়ে প্রবাসে আসার পর বোধ হয় তিনবার মাত্র সিনেমায় গেছে। পাড়ায় নতুন মুদিলেকবাবুর বাসাতেও ত একদিন যেতে হয়। ভদ্রলোক আর তাঁর স্ত্রী নবাগত প্রতিবেশী হিসাবে মাস দেড়েক ধরে সেবা করে গেছেন।

পুরো পাঁচ বছর ওদের বিয়ে হয়েছে। এখনও মুখ ফুটে কিছু বলতে পারে না মালতী। হয়ত প্রতিবাদের আভাস তার মুখে ফুটে ওঠে, কিন্তু মনোধীর কি তার মুখের পানে নিবিষ্ট হয়ে চেয়ে দেখেছে কোনদিন?…বিয়ের পর খুব ভয়ে ভয়েই কেটেছে মালতীর। চশমা পরা এই ভারিক্কী গোছের লোকটা না জানি কত বড় পণ্ডিত, বুদ্ধিমান! ওদের দুজনার বিদ্যার আকাশ পাতাল ব্যবধানটা তার মনকে সঙ্কোচাপন্ন করে তুলেছে।

পরে যত দিন যাচ্ছে, দেখতে পাচ্ছে, এই লোকটার কী বিপুল অজ্ঞতা, জীবনের ছোটখাট বিষয়গুলিতে। খুব সাধারণ লোকের চোখেও যা ধরা পড়ে, ওর দৃষ্টিতে তা এড়িয়ে যায় কি করে—ভেবেই পায় না মালতী। ওর আত্মভোলা ভাবের পিছনে গা-ঢাকা দেওয়া অহমিকা। স্বার্থপরতাকেও

দেখে ফেলেছে মালতী। মনোরীর এ ভ্রূণীতীন এক পরবাচা কোন মহামানব নয়, আর দশজনের মতই রক্ত মাংসে গড়া মানুষ,—মালতীর কাছে এটা যত একটা আবিষ্কার। মনোরীরের ছেলেমানুষেরী ও দুর্বলচিত্ততা ওর মনে অনুকম্পার উদ্রেক করে।

স্বামীর মর্ম্যাদার পারদ যে হঠাৎ নীচে নেমে এসেছে, এতে অন্তরে দুঃখ পেয়েছে মালতী ঠিকই কিন্তু সদা সন্ত্রস্ত সন্দেহবোধের আড়ষ্টতার বন্ধন থেকে যে অবশেষে মুক্তি পেয়েছে, এটাও কম সোয়াস্তির কথা নয়।

• • • •

মালতীর শরীর কয়েকদিন ধরে ভাল চলছে না। ছোকরা চাকরটা এখনও ফেরে নি। ঠিকে ঝি সন্ধ্যে লাগার আগেই চলে যায়। অনেক কাজ মালতীকে একাই করতে হয় মেরে নিয়েই, অথচ মুখে তার নিবিকার প্রশান্তি।

সেদিন মনোরীর যখন বাড়ী ফিরল, রাত তখন প্রায় বারোটা। বিপক্ষ দলের খেলোয়াড়দের জিদ চেপেছিল ওকে হারাবেই। খেলা শেষে উঠতে গেলে, টেনে বসালো ওকে।...নভেম্বরের শেষাশেষি, বারটা কম রাত্তির নয়।

সহর তখন সুষুপ্ত। রাস্তার দোকান পাট বন্ধ হয়ে গেছে। কেবল দু'একটা গাড়ী যাত্র রাতের ট্রেন প্যাসেঞ্জার নিয়ে ষ্টেশন থেকে ফিরছে। তাদেরই চাকার ঘর্ঘর বা ঘোড়ার গলার ঘণ্টাগুলোর টুংটাং আওয়াজ রাত্রির স্তব্ধতা ভঙ্গ করছে।

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে ঘুমিয়ে পড়েছে মালতী। তার শরীর বেশ অসুস্থ। মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা।

মনোরীরের ধাক্কা ধাক্কার শব্দ তার কানে পৌঁছল না। এবার মনোরীর জোরে কড়া নাড়ল, বেশ শব্দ করেই। প্রায় মিনিট দশেক বাইরে দাঁড়িয়ে শীত ভোগ করছে সে। এটা কিন্তু তার মনে আসে না যে, এই প্রথম শীতের রাতে তারই প্রতীক্ষায় থাকায় আগুনে বসে থাকতে কম কষ্ট হয় না মালতীর।

হঠাৎ হাতের ঠেলায় দরজাটা খুলে যায়। ঘরে ঢুকে সুইচ টিপে আলো জ্বালালো মনোরীর। দেখে সামনের দেওয়ালে যেখানে সোজা আলোর রশ্মি এসে পড়েছে, সেখানে উল্টানো একখানা ক্যালেণ্ডারের সাদা পিঠে বড় বড় লাল হরফের লেখা ফুটছে :

এত রাতে যারা বাড়ী ফেরে
তারা হয় মাতাল, নয় গাড়োয়ান।

মনোরীরের মনে হল তার পায়ের নীচে মাটী সরে যাচ্ছে। এখনই টাল খেয়ে পড়ল বলে। যে মেয়ের সাত চড়েও কথা ফোটে না, প্রতিবাদের এই সহজ সত্যের ভঙ্গিটী কি করে গেল সে।

কতদূর নির্যাতনে মানুষের মন এমনি বেঁকে বসে ক্যালকুলাস্ কষা বুদ্ধিতে তা পরিমাপ করা সম্ভব না হলেও, মালতির এই অন্তর্ঘাতের ইঙ্গিত ওকে বিচলিত করে তোলে। একটা আসন্ন বিপর্যয়ের আশঙ্কায় সে ভীত হয়ে ওঠে।

শোবার ঘরে খাটের কাছে এগিয়ে এসে দেখল লেপ-ঢাকা কুঁকড়ে শুয়ে আছে মালতী দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে। মনোরীর এসে দাঁড়াতেই লেপ সরিয়ে ওর দিকে ফিরে তাকাল।

চোখ লাল, উদ্‌ভ্রান্ত চাউনী। গায়ে হাত দিয়ে দেখে, গা পুড়ে যাচ্ছে ··· হিরণদিকে খবর দেয় নি মালতী। এই আচ্ছন্ন অবস্থায় কখন উঠে গিয়ে পাশের ঘরের দরজা খুলে, চুপি চুপি আবার এসে বিছানায় শুয়েছে মালতী, টেরও পায় নি মনোধীর।

• • • •

একুশ দিন পর জ্বর ছাড়লো মালতীর। কীভাবে গেছে এই কটা দিন ভগবানই জানেন! দোতলার মাসীমা আর ওঁর মেয়ে হিরণদি ছিলেন তাই রক্ষে। এই যে এতবড় অসুখ—তার মধ্যেও হিরণদিকে বলে স্বামী সেবার কোন ত্রুটীই হতে দেয় নি মালতী। ঘুম ভেঙেই সকালে মনোধীর দেখে, বিছানার পাশে কোজী ঢাকা টীপটে গরম চা টীপয়ের উপর। বাসী গেঞ্জী, আণ্ডার অয়ার দাবান কাচা হয়ে ঝুলছে র‍্যাকেটে। ভাতের পাশে নানাবিধ সুস্বাদু ব্যঞ্জন।

তাদের আড্ডার বন্ধুরা এসেছিল মনোধীরের খোঁজ নিতে। ওর স্ত্রীর অসুখ দেখে ফিরে গেছে। এর মধ্যে কি করে বলে ওরা তাস খেলতে আসার কথা।··· ·····ওর অভাবে আসরটা ভেঙে যেতে বসেছে। খেলা জমেই না আজকাল।

ছ মাসের মেয়ে,—তার দুধ খাওয়ানো, কাঁথা পাল্টানো, কাজল পরানো আছে। এসব ব্যবস্থা হিরণদি নিয়েছেন। খুকুকে উপরে নিয়ে রেখেছেন তিনি।

স্ত্রীর অসুখের ঝঞ্ঝাট, আর একটানা এ কয়দিন সকাল বিকাল রোগীর ঘরে বন্দী থেকে, মনোধীরের প্রাণটা হাঁপিয়ে ওঠে। ওর অস্থিরতা লক্ষ্য করে হিরণদি টিপ্পনী কাটতে ছাড়ল না, "ধন্য বাপু তোমার স্বামী ভক্তি।····· এই এত বড় অসুখটা গেল, ঘণ্টাখানেকও যদি এক নাগাড়ে কাছে বসল একবার। একদিনও আপিস যাওয়া বন্ধ করলো না।···নেহাৎ চক্ষুলজ্জার দায়ে, তাই তাসের আড্ডায় যেতে পারছে না। দেখছিস্ না কেমন উসখুস্ করছে। ···এই যে জ্বর গায় দুর্বল শরীরে কখনও নিজে কখন আমাকে দিয়ে সেবা যত্ন চালিয়েছিস দুই, ওকী দেখছে না সেটা। ভগবান কী বস্তু দিয়েছেন ওকে. তা কি কোনদিন ও বুঝবে?···লেখাপড়া জানিস যে এই না ত তোর অপরাধ। কেন শিখিয়ে নিলেই পারে এখন।···আর বি. এ, এম. এ পাশ মেয়ে ত ঢের দেখেছি। পাশকরে কি তাদের নতুন হাত গজায়? বি. এ পাশ মেয়েদের স্বামীরা সব পরম সুখী, আর দুর্খু মেয়েদের স্বামীরা মহা কষ্টে আছেন না?

পাশের ঘরে বসে সব কথাই শোনে মনোধীর।···ওদের দৈনন্দিন জীবনের আসল রূপটা যেন সহসা তার কাছে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।···সত্যিই ত কত না অবহেলা সয়ে এসেছে মালতী! অতৃপ্ত অতন্দ্র কত রাত্রি তার প্রতীক্ষায় বসে থেকেছে। শীতের রাতে বাড়ী ফিরে এলে হাতের কাছে গরম জল, তোয়ালে এগিয়ে দিয়েছে, গ্রীষ্মকালে সুশীতল সরবৎ। ওর মুখে কোনো জিনিষ ভাল লাগলে নিজের ভাগটুকু না রেখে সবটুকু ওর পাতে তুলে দিয়েছে। গ্রীষ্মের রাতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পাখা নেড়ে, হাওয়া করে, ঘুম পাড়িয়েছে ওকে। ওর সুখের জন্য মালতীর মরণেও কুণ্ঠিতা নয়।···সহসা অনুকম্পায় আর্দ্র হয়ে ওঠে মনোধীর।

• • • •

মালতীকে কেমন নতুন লাগে মনোধীরের।

ওর মুখের সদ্যস্নাত পাণ্ডুরতা তার মনকে স্নেহসিক্ত করে তোলে। কাছে এসে বলে, 'আমাকে তুমি ক্ষমা করো মালতী! অনেক কষ্ট দিয়েছি তোমাকে।' এই বলে পকেট থেকে বার

করে একখানা কাগজ। ওটা ওর সামনে মেলে ধরে বলল, 'পড়ে রাখো'। তারপর নিজেই পড়তে সুরু করে তার প্রতিজ্ঞা পত্র। আজ থেকে যে সমস্ত অন্যায় ও অসঙ্গত কাজ থেকে সে বিরত থাকবে তারই লিখিতি।

শুনে মালতীর বড় মজা লাগে। কৌতুকজড়িত মুখে প্রশ্ন করে, 'কি হবে ও দিয়ে?'

'এর দু প্রস্থ নকল হবে। একখানা তোমার কাছে রাখবে, আর একখানা থাকবে আমার কাছে। তোমার সামনে আমি এ অঙ্গীকার পত্রে স্বাক্ষর করব। আমার বাঁচে থাকবে তোমার সই, আর পাশে সাক্ষী হিসাবে নেওয়া হবে, খুকুর হাতের টীপ। ওর টীপ সইয়ের একটা মস্যাদ আছে। দলিলটা ওতে জোরালো হবে।'

ওর ছেলেমানুষী দেখে মালতীর হাসি পায়।

'দলিল! দলিল আবার কিসের? আমি ত আর আদালতে—নালিশ করতে যাচ্ছিনে।'

ওর কথায় মনোরীর একটু অপ্রস্তুত বোধ করে।

মাথা দুলকিয়ে বলে, 'এটা আমি বাঁধিয়ে রাখতে চাই। দেওয়ালে টাঙিয়ে রাখব, চোখের সামনে থাকবে সব সময়। ভুল হতে দেবে না।'

মালতী লজ্জায় মত আড়ষ্টিত হয়ে ওঠে।

'ছেলেপুলে, ঝিচাকরি ঘরময় ঘুরে আসছেন, এ ছাড়া আরও কত লোক আসে বেড়াতে। দেখে সবাই হাসাহাসি করুক আর কি।' 'তাও বটে।' নিজের অপরিণামদর্শীতার জন্য লজ্জিত হয় মনোরীর। তবে মাথায় যখন ঝোঁক চেপেছে, দলিলটা ও তৈরী না করেই ছাড়বে না।

'আচ্ছা, আবার পড়ছি। শুনে যাও মন দিয়ে। আপত্তি থাকলে বোলো, সংশোধন করে নেবো'—

"আজ ৭ই পৌষ ১৩৪৭ সাল, ইংরাজী ২১ ডিসেম্বর ১৯৪১ খৃষ্টাব্দ। আমি অঙ্গীকারাবদ্ধ হইতেছি যে আমার কোন কার্যে বা ব্যবহারে আমার স্ত্রী শ্রীমতী মালতীলতার মনে জ্ঞাতসারে বেদনা বা কোনরূপ বিরক্তি উৎপাদন করিব না। আমার অবিবেচনায় যাহাতে তিনি শারিরীক বা মানসিক ক্লেশ না পান সে বিষয়ে সচেষ্ট থাকিব।"

'জ্ঞাতসারে কারো মনে কি কেউ ব্যথা দেয়, নেহাৎ শত্রু না হলে? বলল, মালতী।

'অজ্ঞাতসারে যে অপরাধ করে থাকি আমরা, তার জন্য আমাদের দায়ী করা চলে না। মনে অপরাধ বোধ না থাকলে আইনতঃ কোন অপরাধ হয় না। পেনাল কোড্ বা ফৌজদারী আইনে তাই পাগল ও মাতালদের অপরাধের কোন শাস্তির বিধান নেই' (মনোরীর বন্ধুর খানেক আইনও পড়েছিল)

'তুমি কিন্তু পাগলও নও, মাতালও নও। অবিশ্যি খেলার নেশা একরকম মদের নেশারই সামিল।'

আচ্ছা শোনো তারপর,

"আজ হইতে নিশ্চিন্তপুরের তাসের আড্ডায় আর খেলিতে যাইব না—"

'নিশ্চিন্তপুরের আড্ডায় না গিয়ে, থানাপাড়ার আড্ডায় গেলেই হল। অভাব কি তাসের আড্ডার? যুবনেক্ বাবুর স্ত্রীর মুখে শুনলাম, ওঁদের কর্ত্তা নিশিরবাবু উকিলের বাসায় খেলতে যান, মাঝে মাঝে। অনেকেই আসেন সেখানে তাস খেলতে।'

'আচ্ছা তা'হলে নিশ্চিন্তপুরের' কথাটা বাদ দিচ্ছি।'

'আমি ভাবছি একদম খেলা বন্ধ করলে শেষটা দম বন্ধ না হয়? অভ্যেসটা কি একবারে সহ্য হবে?' হঠাৎ মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায় মালতীর। নিজের প্রগল্‌ভতায় একটু লজ্জা পায় সে।

মনোধীর এ ধরণের মন্তব্য শুনতে অভ্যস্ত নয়। ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলল, 'সপ্তাহে একদিন খেল্‌লে আপত্তি হবে না নিশ্চয়?'

একটু হেসে উত্তর দেয় মালতী 'খেলতে বারণ কে করেছে? মাত্রা ঠিক রেখে চললেই হয়। বাড়ীঘর, বৌ ছেলে মেয়ে আছে, খেলতে বসে সেটা না ভুললেই হল।'

কথাবার্তায় মালতী এখন অনেকটা সহজ ও সপ্রতিভ হয়ে উঠেছে।

মনোধীর বলল 'আচ্ছা তা হলে লিখছি—

"যতদূর সম্ভব তাস খেলা বর্জ্জন করিয়া চলিব। যদিও কোন দিন খেলিতে বসি, রাত্রি নয়টার মধ্যে বাড়ি ফিরিব।'

একটু হাসল মালতী। 'দলিলটা এক তরফা হল না কি? আমার তরফ থেকেও একটা শর্ত ঢোকানোর দরকার আছে।'

'যেমন?'

'রাত্তির নটার পর বাড়ি ফিরলে খাবার মিলবে না।'

গম্ভীর মুখে মনোধীর উত্তর দেয় 'নিশ্চয়ই।'

শেষটা নীলাভ ষ্ট্যাম্প পেপারে দু প্রস্থ দলিল লেখা হল। মনোধীরের পীড়াপীড়িতে তার দস্তখতের নীচে মালতীও সই দিল, হাসি চেপে। লক্ষ্মীর আসনের তেল সিন্দুরে অনুরঞ্জিত শিশু কন্যার অঙ্গুষ্ঠের ছাপ দ্বারা চিহ্নিত হল, আনুষ্ঠানিকভাবে দলিল সম্পাদন করা হল। সাক্ষীর টীপ নেবার অভিনব আইডিয়াটা মনোধীরের মস্তিষ্ক প্রসূত।

• • • •

মালতীর শরীর এরই মধ্যে অনেকটা সুস্থ হয়েছে। পাণ্ডুর গণ্ডে লালিমা ফিরে দেখা দিয়েছে। আজকাল মনোধীর তাকে বিকালে আপিসের পর নদীর ধারে বেড়াতে নিয়ে যায়। দলিল তৈরীর তিনচারদিন পর একদিন রবিবারে হৈ হৈ করে বন্ধুর দল এসে হাজির। ওরা সবাই থাকে সহরের অপর প্রান্তে। কাজে তত্ত্বে আসে এদিকে। দেখাশুনা খোঁজখবর, আড্ডা সবই হয় হাফওয়ে হাউস অর্থাৎ নিশ্চিন্তপুর রহমান সাহেবের বাংলোয়।

এই ত দিব্যি সেরে উঠেছেন বৌদি, চলুন আজকে খেলতে বসুন। আজ দুমাস ধরে আমাদের অবস্থাটা 'নন্দপুর-চন্দ্র-বিনা বৃন্দাবনের মত', বলল প্রদোষ সান্যাল।

সমর ঘোষ টিপ্পনী কেটে বলে, 'কিহে ব্রাদার! হার ম্যাজেষ্টীর পারমিশান চাই নাকি?' সমর ও মনোধীর একসঙ্গে ল কলেজে পড়ত, একই মেসে থেকে।

দেবাশীষ বলে ওঠে, 'সেটা না হয় আমিই নিচ্ছি। (জোড় হস্তে মালতীর সামনে এসে, বিনম্র ভঙ্গীতে), "প্রসন্ন অন্তরে দিন অনুমতি দাদাকে বাইবারে রণাঙ্গনে।' কলকাতা থেকে আমার মামার এক বন্ধু এসেছেন জব্বর খেলোয়াড়। গোটা ভামবাজারে ওর মত আর দুটী নেই ব্রীজ প্লেয়ার। বলসেন, "তোমাদের এখানে খেলব কি হে। খেলা কেউ জানে এ দেশে?" চলুন না দাদা ভদ্রলোকের দেমাকটা একটু ভেঙ্গে দেবেন। দেখিয়ে দেবেন খেলা কাকে বলে?'

মনোধীর মুরুব্বিয়ানা সুরে বলল, 'তোমাদের আর কি। সংসারের, ঝামেলা ভাবনা ত আর নেই। বউ ছেলে মেয়ে নিয়ে আমাদের মত যারা ঘর করে, তাদের কি আড্ডায় দিন কাটালে চলে?'

ওর কথায় সবাই হেসে ওঠে।

সমর বলে, 'ডেডিকেশন ক্যোটিং ফুল চার্জ।'

প্রদোষ বলল, 'সংসার এতদিন ত দিব্যি চলছিল, আজ হঠাৎ '

'ঠিক আর চলছিল কোথায়? সংসার শকটের চাকায় বড্ড ক্যাচক্যাচ শব্দ হচ্ছিল।'

দীপক বলল, 'আমরা কিন্তু কেউই বিশ্বাস করবো না যে বৌদির মত শান্ত, লক্ষ্মী মেয়ে আপনার সাথে খ্যাচ্‌খ্যাচ্‌ করেন।'

'শুধু কি মুখেই লোক খ্যাচখ্যাচ করে?···প্রতিবাদ অনোনোর তর্জনীতে যৌলিকতা আছে তোমাদের বৌদির।'

মালতী প্রমাদ গনল। সেদিনকার ক্যালেণ্ডারের কথাটা আবার বলে না ফেলে মনোধীর। কথাটা এড়ানোর জন্য বললে,

'যাওনা কেন, ঘুরেই এসো এঁদের সঙ্গে।'

'জয় হোক বৌদির।' সমস্বরে চীৎকার করে ওঠে ওরা।

দেবু বলল, 'ভাববেন না, সন্ধ্যের মধ্যেই ফিরিয়ে দেব। আজ আমাদের ক্লাবে ভীষণ সংগ্রাম মহাবীর পার্থের তাই শরণাপন্ন হয়েছি। বিনা ধনুকে রণ জয়ে নাহি কোন আশা।'

মনোধীরকে নিয়ে ওরা চলে গেল। বেলা তখন একটা।

• • • •

আড্ডায় এসে ওদের সে কি হাসি!

কোথায় শ্যামবাজারের ট্রেনার? সব ফাঁকিবুঁকি!

মনোধীর একটু রেগেই ওঠে। কেন, এই প্রবঞ্চনা।

ওরা বলে, 'প্রেমে, রণে আর খেলায় মিথ্যা ভাবলে দোষ নেই।···

যাই হোক বহুদিন পর খেলতে বসে, মনোধীর ক্রমে ক্রমে খেলার রসে মত্ত হয়ে ওঠে। কোথা দিয়ে সময় চলে যাচ্ছে খেয়ালই নেই। হুঁস হল যখন সন্ধ্যে পেরিয়ে গেছে, প্রায় ছটা বাজে। বন্ধুদের পীড়াপীড়িতে আরও আধঘণ্টাটেক খেলতে হল। বাড়ী যখন ফিরল, সাতটা বেজে গেছে।

মালতীকে দেখে মনোধীর সাফাই গাইতে সুরু করে, 'কী করব ভদ্রলোক বিদেশী তাঁর অনুরোধ এড়াই কি করে। তা ছাড়া ভাল খেলোয়াড়ের সঙ্গে খেলার সৌভাগ্য ত সচরাচর মেলে না।'

মালতী গম্ভীর মুখে চা, জলখাবার এগিয়ে দিয়ে বলল, 'খেতে একটু দেরীই হবে, কল্পনা ছিল না, এইমাত্র ডিণো থেকে দিয়ে গেল!'··· ···

এরপরও কয়েকবার খেলতে গেছে মনোধীর, কিন্তু আট-টার পর আর কিছুতেই তাকে ধরে রাখা যায় নি। মাঝে মাঝে দু এক দিন, জিতের খেলায় বেশী রাতও হয়ে গেছে, কিন্তু মালতী কোন উচ্চবাচ্য করে নি।

• • • •

মালতীর অসুখের ঠিক আগ দিয়েই ট্রেনে ওর দামী ঘড়িটা চুরি যায়। রেল পুলিশে খবর দিয়েও কোন ফল হয়নি। যুদ্ধের বাজারে এ রকম ঘড়ি পাওয়াই যায় না। তা ছাড়া মালতীর অসুখে

অনেক টাকা বেরিয়ে গেছে। খুকুর বিয়ের জন্য সম্প্রতি আবার একটা ইন্‌স্যুরেন্স করেছে। নতুন ঘড়ি কিনতে হলে বেশ কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে।

• • • •

খেলতে খেলতে উঠে গিয়ে সে পাশের হল ঘরের ঘড়িটা দেখে আসে। যাতে ঠিক সময়ে ফিরতে পারে বাড়ী।

• • • •

সেদিন খেলাটা বেজায় জমে উঠেছে। মনোধীর ও রহমান একদিকে, অন্যদিকে প্রদোষ আর রমানাথন্ বলে মাদ্রাজী একজন ভদ্রলোক। ভদ্রলোক ট্যুরে এসেছেন। প্রদোষদের ডেপুটী ডিরেক্টর। ব্রিজে নাকি অসাধারণ হাত। প্রদোষও ভাল খেলে, কিন্তু কিছুতেই ওরা পেরে উঠছে না। পর পর কয়েকটা ডাউন খেলে ওরা। 'মনোধীর মজুমদার ইজ ইন হিস বেষ্ট ফর্ম টু ডে।'

দীপক দত্ত এর মাঝে কখন উঠে এসে টুলের উপর দাঁড়িয়ে পাশের হল ঘরের ঘড়িটার কাঁটা ঘুরিয়ে কমসে কম আড়াই ঘণ্টা 'ফ্রু' করে রেখে গেছে। কাজটা সবার সাথে যুক্তি করেই করেছে।

সেদিন আবার রহমান সাহেবের গ্যাঙ্ সর্দার গুরুল, বাদাম বাটা ও গোলাপী আতর মেখে সিন্ধির সরবত তৈরী করে দিয়ে গেছে, একটা এ্যালুমিনিয়ামের ডেকচী ভর্তি। সবাই কাড়াকাড়ি করে খেয়েছে তার সাথে গরম ডালপুরী। ফলে পাঁচে মনোধীরও দু গ্লাস সরবৎ খেয়ে ফেলেছে।

খেলা জিতে ও সিন্ধির প্রসাদে মনোধীরের মনটা বেজায় খুশী, বালকা বেলুনের মত ভয়-ভাবনা-শূন্য। অনুচ্চ কণ্ঠে একটা গানের কলি ভেঁজে চলেছে সে। রমানাথন বেরিয়ে গিয়ে বমেভম্ব দিলেন। তাঁকে নাকি ভোরের ট্রেনেই যেতে হবে ফিরে।

হঠাৎ মনোধীরের বাড়ীর কথা মনে পড়ে। তাইত! রাত্তির কত এখন?

কটা বাজে জিজ্ঞেস করতে রহমান সাহেব একটু মুচকী হেসে বলে, 'কত আর হবে, সাড়ে আটটা!'

সময় হাত বাড়িয়ে ঘড়িটা ওর মুখের সামনে ধরে বলল, 'এই দেখ না কেন···আটটা বেজে বার। সময়ই কেবল ঘড়ি পরে খেলতে আসে। সেও ছোকরাদের পরামর্শে ঘড়ির কাঁটা ঘণ্টা আড়াইয়েক পিছিয়ে দিয়েছিল।

ঠিক বিশ্বাস হয়না মনোধীরের। উঠে পাশের হলে এসে সুইচ টীপে দেখে, সত্যিই সাড়ে আটটা।

'কত?' জিজ্ঞাসা করলেন রহমান।

'সাড়ে আট,'

'তা হলে এমন কী আর বেশী রাত হয়েছে,'

'কিন্তু মনে হচ্ছে যেন বহুক্ষণ ধরে খেলছি,'

'সিন্ধি খেলে ওরকমই মনে হয়। হাত ও কানের ধারণা অস্পষ্ট হয়ে পড়ে। তা ছাড়া খেলাও ত আজ খুব সকাল সকাল বসেছে।'

'আর একবাজী হোক, কি বল? বলল প্রদোষ 'আমাদের রাবটা হয়ে যাক। না হয় আধঘণ্টা বেশী হবে।'

'না, না মনোধীর উৎকণ্ঠিত হয়ে বলল, 'আমি চল্লুম।

• • • •

রাস্তা ছেড়ে রেল লাইন পেরিয়ে মাঠের পথ ধরে মনোধীর। দারুণ খিদে পেয়ে গেছে তার। মাঠ ছাড়িয়ে ঘোষা পটির গলি বেয়ে কিছুদূর এসে বড় রাস্তায় উঠল মনোধীর। ঘোপাদের ঘরে তখনও দু'একটা বাতি জ্বলছিল, রাতে ইস্তিরি সারা করে রাখছে, যাতে সকালে কাপড় ডেলিভারী দিতে পারে সওদীতে। রাস্তায় লোকচলাচল নেই। মোড়ের পানের দোকানটাও বন্ধ হয়ে গেছে। মনোধীরের সেদিকে লক্ষ্য নেই। আপন মনে সুর ভেঁজে চলেছে চোখ বুঁজে :

"তোমার লাগি রয়েছি আমি জাগি,
তখন তোমার আসার সময় হবে ?···

হঠাৎ একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করে উঠল।

চমকে উঠে মনোধীর দেখে সে প্রায় বাড়ীর গেটের কাছে এসে পড়েছে। গেট পার হয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠে, কড়া নাড়তে গিয়ে হাতের ধাক্কায় দরজাটা আপনিই খুলে গেল। ভিতরে এসে খিল দিতে দিতে ভাবল মনোধীর, 'তাইত। মালতী দরজা বন্ধ করতে ভুলে গেছে। যদি চোর বদমাইস কেউ ঢুকতো !'

বারান্দায় রাখা ড্রাম থেকে জল নিয়ে, হাত পা ধুল। শোবার ঘরে এসে আলো জ্বালিয়ে দেখে মালতী আঁচলে মুখ ঢেকে ঘুমুচ্ছে।

ভাবল ঘুমুচ্ছে, ঘুমোক না, এখন জাগিয়ে লাভ কি ? আগে খেয়ে নেওয়া যাক। যা ভীষণ খিদে পেয়েছে !

আজ রাতে ডাক রোষ্ট হয়েছে। ওদের ব্যাঙ্কের এ্যাকাউন্টের তাই ডোরে বিলে শিকার করতে গিয়ে তিনটে মস্ত মস্ত বেলে হাঁস মেরে এনেছিল,—তারই একটা ওকে দিয়ে গেছে আফিসে বেরুবে ঠিক এমনি সময়ে।

অরেঞ্জ জুস্ দিয়ে কোল্ড ডাক রোষ্ট খাবে বলে রেখেছে। অরেঞ্জ জুস্ সহযোগে ডাক রোষ্টের যা স্বাদ হয়, যে খেয়েছে সেই জানে ! অনন্যা মরহুম মালতী বড় বড় দুই বোতল অরেঞ্জ জুস্ তৈরী করে রেখেছে।

খাবার ঘরের শেলফে সাজানো একগাদা বৈরম কৌটো বোতল। হরেক রকম জিনিষ তাতে—আচার, মোরব্বা, বড়ি, আমসী। অরেঞ্জ জুসের বোতলটা সহজেই খুঁজে পেল। ওটা হাতে করে এসে বসে খাবার টেবিলে।

মস্ত একটা জালের চাকনা দিয়ে ওর রাতের খাবার ঢাকা আছে টেবিলে। বুৎ করে চেয়ারে বসে খাবারের চাকনাটা তুলল মনোধীর।

কিন্তু একী ! কোথায় খাবার ?···

মনোধীরের ঝিম্‌ঝিম্ নেশা এক ঝটকায় কেটে যায়।

একখান প্লেটের উপর রেডিয়াম ডায়াল টাইমপীসটা ওর দিকে তাকিয়ে যেন ব্যঙ্গের হাসি হাসছে।

ছোটবড় দুটো কাঁটা জড়াজড়ি করে এসে দাঁড়িয়েছে বারটার দাগে। ঘড়িটার নীচে ঢাকা খুকুর আঙুলের তেল সিঁদুর ছাপ মেওয়া নীল ব্যাণ্ড পেপারে লেখা ওর সেই-চিঠিটা, মাঝখানে লম্বালম্বি ছেঁড়া।

চিত্র বিচিত্র

মৃত্যুঞ্জয় ভরদ্বাজ

বিশ্বের সাম্প্রতিকতম সংবাদ-কাহিনীর মধ্যে অন্যতম প্রধান কাহিনী হল : সৌদি আরবের রাজা সৌদ সিংহাসনচ্যুত হয়েছেন এবং তাঁর জায়গায় বসেছেন যুবরাজ ফৈজল।

রহস্যময় বিচিত্র দেশ এই সৌদি আরব। অধিকতর রহস্যময় আর বিচিত্র ছিলেন সিংহাসন-চ্যুত রাজার পিতা ইবন সাউদ; যাকে বলা হয় বর্তমান সৌদি আরবের জনক, যাঁকে ঘিরে পাশ্চাত্য দেশে একদা সৃষ্টি হয়েছিল অলৌকিক কিংবদন্তী, যাঁকে বলা হত আরবী রজনীর আধুনিক অধীশ্বর। সৌদি আরবের কথা বলতে গেলেই এই মানুষটির কথা মনে আসে।

সত্যিই অসাধারণ মানুষ ছিলেন রাজা ইবন সাউদ।

অতি-আধুনিক বিংশ শতাব্দীতে আরবী রজনীর সম্রাটের মতো তিনি এমন এক মধ্যযুগীয় রহস্য রোমাঞ্চময় পরিবেশের মধ্যে বিচরণ করতেন, তাঁর জীবনে ও কর্মে বারংবার এমন সব বিস্ময়কর ও কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনার সমাবেশ হয়েছিল, যার জন্য পাশ্চাত্য দেশের কাছে তিনি এক বিশেষ ও অতি-বিচিত্র মানুষ বলে পরিগণিত হয়েছিলেন।

বহু যুদ্ধের ক্ষতচিহ্ন তাঁর দেহে অঙ্কিত ছিল। শৌর্য, বীর্য আর সাহসিকতায় তিনি ছিলেন অদম্য। দীর্ঘদিন তিনি রাজত্ব করেছিলেন। তাঁর রাজ্যের চারধারে অদূরে দূরে বহু শক্তিশালী রাষ্ট্রের কর্মপ্রচেষ্টা চলেছিল প্রতিনিয়ত। কিন্তু তিনি কখনও তাঁর রাষ্ট্রের কোন ব্যাপারে বাইরের কোন শক্তিপুঞ্জের হস্তক্ষেপ সহ্য করেন নি। প্রয়োজনবোধে প্রজার মাথা কেটেছেন প্রকাশ্য রাস্তায় বিনা বিচারে, ক্রুটস্ত তেলের কড়ায় চুবিয়ে মেরেছেন দুষ্কৃতকারীকে, ক্রীতদাস ব্যবসায়ের অবাধ প্রশ্রয় দিয়েছেন নিজের দেশে, কিন্তু তা নিয়ে পাশ্চাত্য শক্তিপুঞ্জ কোনদিন সমালোচনার টুঁ শব্দটি করেনি। বরঞ্চ বরাবর তোয়াজ করেছে তারা রাজা ইবন সাউদের। খাতির মেলিয়েছে প্রচুর। সমীহ আর সম্ভ্রমও মেলিয়েছে অল্প নয়।

পাশ্চাত্য দেশের কাছে নিছক স্বার্থের খাতিরেই সাউদি আরবের রাজা আবদুল আজিজ ইবন আবদুর রহমন অল ফৈজাল অল সাউদ এতখানি প্রিয় ছিলেন। তাঁর বিস্তীর্ণ মরু-রাজ্যের দিগন্ত প্রসারিত বালুচরের তলদেশে আছে অফুরন্ত তৈল প্রবাহ। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ যদি বাধে তাহলে সেই তৈল মিত্র-শক্তিপুঞ্জের চাই। তার ওপরে অনেকাংশে নির্ভর করবে তাদের যুদ্ধযাত্রার সাফল্য। তাই তাদের কাছে তাঁর এতখানি সমাদর।

বিরাট পুরুষ ছিলেন ইবন সাউদ। লম্বায় ছ'ফুট চার ইঞ্চি, রাবণের মত বিশাল বক্ষদেশ,

দীর্ঘ অবিন্যস্ত কালো চুল, ঘন দাড়ি, গোঁফ, খড়্গ নাসা, তীক্ষ্ণ কালো দুই আয়ত চোখ, দেহের ওজন প্রায় চার মণ। প্রাচীন যুগের যুক্তির-অগতের রহস্যময় কাহিনীর নায়কের মতো ছিল রাজা ইবন সাউদের ব্যক্তিত্ব আর ব্যবহার, জীবন আর কর্মপদ্ধতি। তাঁর রাজপ্রাসাদ যেন আরব্য রজনীর যক্ষপুরী। সেখানে জোরে কথা বলবার অধিকার বা সাহস ছিল না কারুর। চারদিকে অনুক্ষণ গভীর অপার্থিব স্তব্ধতা। বিচিত্র বর্ণসমুজ্জ্বল পোষাকে সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদিত করে, আগে পিছে অগণিত ক্রীতদাস আর সশস্ত্র দেহরক্ষী সঙ্গে নিয়ে রাজা ইবন সাউদ যখন রাজকার্য এবং রাজমহলগুলি পরিদর্শন ক'রে বেড়াতেন তখন মনে হত যেন কোন অজানা মায়ালোক থেকে কোন অতিমানুষ পৃথিবীতে নেমে এসেছেন।

বিরাটত্বে আর আড়ম্বরে তাঁর রাজসভার জৌলুষ্যখানগুলি চমক লাগিয়ে দিত বিদেশাগত রাজ-অতিথিদের মনে। পাশ্চাত্য দেশের রাজপুরুষদের সঙ্গে পাশ্চাত্য দেশের রীতি অনুযায়ী খানা-টেবিলে বসতেন তিনি। কিন্তু কাঁটা চামচ ছুরি প্রভৃতি কীর্ণাঙ্গ অস্ত্র-গুলি কখনো ব্যবহার করতেন না। হাতে করে খেতেন। দীর্ঘ বলিষ্ঠ আঙুল দিয়ে, তাঁর সামনে বড় পরাতের ওপর রাখা একটা গোটা দুম্বার শিছনের পাখানা ছিঁড়ে নিয়ে যখন তিনি পরম পরিতৃপ্তি সহকারে ভোজন করতেন তখন তাঁর আশেপাশে উপবিষ্ট পাশ্চাত্য দেশের অতিথিদের মনের অবস্থা যে কী হত তা সহজেই অনুমেয়।

একুনে ১২০ বার দার পরিগ্রহ করেছিলেন তিনি। কোরাণের অনুজ্ঞা অনুসারে সংখ্যায় চারজনের বেশী স্ত্রী থাকা অপরাধ। তাই কিছুদিন ধরে উপভোগ ক'রে পরপর প্রত্যেক পত্নীকে তালাক দিতে হয়েছে তাঁকে। প্রত্যেক স্ত্রীর গর্ভেই একাধিক সন্তান উৎপাদন করেছেন তিনি। অনুসন্ধান করলে তাঁর রাজ্যের প্রায় প্রত্যেক নগরে ও গ্রামে তাঁর ঔরসজাত সন্তান-সন্ততির দেখা মিলবে। একদা এই প্রসঙ্গে সর্ব্বসমক্ষে বলেছিলেন—"যৌবনে একটা গোটা জাতির জন্ম দেবার ক্ষমতা ছিল আমার। সে ক্ষমতার কিছু পরিচয়ও দিয়েছি। তারা এখন আমার রাজ্যের জনবল বিস্তারে সহায়তা করছে।"

রাজকর্মচারীদের কাছে তিনি সাক্ষাৎ শমনের মতো ভীতিপ্রদ ছিলেন। তাদের কোন অমার্জনীয় ত্রুটি তিনি বরদাস্ত করতেন না। সহজে তাঁর সামনে আসবার সাহস হত না কারুর। আবার অপর দিকে, সামান্য বৃদ্ধ চাষী প্রজার কাছেও তিনি ছিলেন সহজগম্য। তারা তাঁকে সহজভাবে সম্বোধন করত, তাদের অভিযোগ অভাব জানাতো।

একদিন তিনি রাজপ্রাসাদের অলিন্দ থেকে দেখলেন, এক অবসন্নচিত্ত বেদে কাতরভাবে এক রাজকর্মচারীর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করছে আর কর্মচারীটি তাকে তাড়া করছে। রাস্তার ওপর এই দৃশ্য অভিনীত হচ্ছিল। দেখে ধীরপদে নেমে এলেন তিনি। প্রচুর আহার্য্য পাঠিয়ে দিলেন সেই বেদের কাছে। তারপর জল্লাদকে ডেকে একশ 'ঘা' চাবুক মারবার আদেশ দিলেন সেই রাজকর্মচারীকে যে ওই বেদেটিকে আহার্য্য না দিয়ে খেদিয়ে দেবার চেষ্টা করছিল।

অতিরিক্ত ধর্মনিষ্ঠ ওয়াহাবি সম্প্রদায়ের সভ্য ছিলেন তিনি। ঘড়ির কাঁটা ঘুরে দিনে পাঁচবার প্রার্থনা করতেন। পরিচ্ছদের মধ্যে কখনো রেশম ব্যবহার করতেন না। সোনাদানা বা গহনার প্রতি কোন আকর্ষণ ছিল না তাঁর। মদ খেতেন না, ধূমপান করতেন না, জুয়া খেলতেন না। আধুনিক জগতে সত্যিই এক অবাস্তবীয় বিচিত্র মানুষ।

তলোয়ারের জোরে তিনি নিজের সাম্রাজ্য নিজে রচনা করেছিলেন। তাঁর অতি-বৃদ্ধ প্রপিতামহ মহম্মদ ইবন সাউদ ১৮শ শতাব্দিতে ওয়াহাবি সম্প্রদায়ে যোগ দিয়ে সমস্ত ইসলাম-জগৎকে তাঁর অধীনে আনবার পরিকল্পনা করেছিলেন। মহাপরাক্রমশালী ছিলেন তিনি। মক্কা, মদিনা ও দামাস্কাস দখল ক'রে তিনি পারস্য অভিযানের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছেন, এমন সময় হঠাৎ মারা গেলেন।

তাঁর বংশধরদের যোগ্যতা ছিল না। কাজেই ১৮৮০ সালে ইবন সাউদ যখন জন্মিছ হলেন তখন তাঁদের রীতিমতো দুরবস্থা।

ইবন সাউদ ছোটবেলা থেকেই স্বপ্ন দেখতেন। স্মরণ করতেন সেই পূর্বপুরুষকে যিনি বীরবিক্রমে দেশের পর দেশ জয় করে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মনে মনে সঙ্কল্প করতেন, বড় হ'য়ে তিনিও রাজ্যজয় করতে বেরুবেন।

২১ বছর বয়সে সত্যি সত্যিই এক অশ্চর্য কাণ্ড করলেন। মুষ্টিমেয় কয়েকজন অনুচর নিয়ে তিনি তাঁদের প্রদেশ রিয়াদ-এর সুলতানকে পরাস্ত করে সেই দেশ অধিকার করে নিলেন এবং তাঁর বাবাকে সিংহাসনে বসালেন।

পুত্রের পরাক্রম দেখে পিতা স্বেচ্ছায় সিংহাসন ত্যাগ করে পুত্রকে রাজ্য দান করলেন। তারপর সুরু হ'ল সংগ্রামশীল জীবন। লড়াইয়ের পর লড়াই। পঁচিশ বছর ধরে বহুস্থানে বহু প্রতিপক্ষের সঙ্গে যুদ্ধ করলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে ন'বার আহত হন। কিন্তু কোনবারেই শত্রুপক্ষ তাঁকে কাবুর করতে পারেনি। অবশেষে ১৯২৬ সালে তিনি সমস্ত শত্রুপক্ষের বুকের ওপর দিয়ে হেঁটে, মক্কা, মদিনা অতিক্রম করে নিজেকে আরব দেশের সম্রাট বলে ঘোষণা করলেন। ১৯৩১ সালে নিজের নামানুসারে স্বদেশের নাম পরিবর্তন ক'রে নতুন নাম রাখলেন—সাউদি আরব।

১৯৩৮ সালে সাউদি আরবের মাটির তলায় তেল পাওয়া গেল—"কালো সোনা"। অফুরন্ত তৈলপ্রবাহ। সঙ্গে সঙ্গে সাউদি আরবের অর্থনৈতিক ভাগ্য ফিরে গেল। জলস্রোতের মতো রাজকোষে টাকা আসতে লাগল। প্রথম প্রথম কোটি কোটি টাকা পেয়ে ইবন সাউদ বিলাস-ব্যসনে প্রচুর অর্থব্যয় করতে লাগলেন অকাতরে। তারপর নিজেকে সামলে প্রজাপুঞ্জের উন্নতি বিধানে রত হলেন। রাজধানীতে বৈদ্যুতিক শক্তির আমদানী করলেন। রাস্তাঘাট বাঁধালেন, জল সরবরাহের প্রকাণ্ড যন্ত্র-শালা স্থাপন করলেন, অসংখ্য ছোট ছোট আদর্শ ক্ষেত খামার চালু করলেন।

সভ্যতার আলো সাউদি আরবের অভ্যন্তর এখনো আলোকিত করেনি। এখনো সেখানে অজ্ঞতা, অরাজকতা আর মহামারীর প্রাদুর্ভাব প্রবল, বর্বরতার পরিচয় সেখানে পাওয়া যায় প্রতিদিন, সেখানে চোর ধরা পড়লে বা ব্যভিচারিণী রমনী দোষী সাব্যস্ত হ'লে তাদের আর বিচারের প্রয়োজন হয়না, রাজরাস্তায় তাদের ঠেঙিয়ে মেরে ফেলা হয়। সেখানে এখনো ক্রীতদাস ব্যবসায় দস্তুরমতো চালু।—তা হ'লেও ইবন সাউদের প্রভাব-পরাক্রম আর প্রতিপত্তির জোরে সাউদি আরব আজ জগতের মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে।

———•

রৌদ্রছায়া

মদন চৌধুরী

বোধ এক বেদনা নিয়ে প্রীতি কখন যে পা টানতে টানতে অনিতার দুয়ারে এসে উঠেছে তা সে টেরই পায়নি। প্রীতিকে এতক্ষণ কে যেন একটা লাঠির আগায় হাত ধরিয়ে পথ দেখিয়ে এখানে এনেছে। অথচ প্রীতি চায়নি। একটু আগে পর্যন্ত প্রীতি ভেবেছিল, সে অন্য কোথাও যাবে। সমস্ত মানুষের চোখ এড়িয়ে নির্জনে কোথাও বসবে। কিছু না ভেবে আকাশ দেখবে—রঙের খেলা দেখবে। কামনা বাসনার সঞ্চারিত পারাকে নামিয়ে এনে একটা স্বাভাবিক অবস্থায় পৌঁছবে। আকাশ যদি ভাল না লাগে, প্রজাপতি দেখবে। তার ডানা ছোঁবে। নির্জনে বুকের কাপড় খসিয়ে প্রজাপতিটাকে সেখানে আলতো ভাবে রেখে একটা স্বপ্নের খসড়া তৈরী করবে। এবং—

কিন্তু প্রীতি একটা ভুল ঠিকানায় চলে এসেছে।

অনিতা এখন করুণার চোখে দেখছে প্রীতিকে। প্রীতির উপস্থিতি অনিতার কাছে একটা ইতরামীর মত মনে হচ্ছে। অনিতা এই মাত্র ভ্রূ দুটো ধনুকের মত বাঁকিয়ে আয়নার দিকে ফিরে তাকাল। প্রীতি আয়নায় অনিতাকে দেখতে পেল। অনিতার ঠোঁট দুটো ফুলছে। প্রীতি অনিতার বুকের গর্জন শুনতে পেল। প্রীতি চোখ ফিরিয়ে নিয়ে কি করবে একবার ভাবল। এবং ভাবনার বেলুনে ফুঁ দিতে দিতে প্রীতি শাড়ির আঁচল হাতের আঙুলে পাকাতে পাকাতে সিমেন্টের দুয়ারে পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে ঘুলোর উপর কয়েকটা রেখা টানল। রেখা কটার মধ্যে অদ্ভুত একটা ছবি দেখতে পেল প্রীতি। প্রীতির মনে হোল, রেখা কটায় সে যেন তার যন্ত্রণা ফোটাতে পেরেছে। যন্ত্রণার রেখার উপর দাঁড়িয়ে প্রীতি আর একবার অনিতাকে দেখল।

অনিতা ঠোঁটে রঙ চড়াচ্ছে। আঁকছে পেনসিল দিয়ে। প্রীতি অনিতার মুখের দিকে তাকিয়ে বেশ আরামবোধ করল। প্রীতি এখন সমস্ত রেখাগুলো মুছে একটা গাছ আঁকবার চেষ্টা করল।

অনিতা জুতোয় পা গলাচ্ছে। প্রীতির গাছটা মাড়িয়ে অনিতা এবার তার চোখের সামনে দিয়ে চলে যাবে। প্রীতি চারপাশ তাকাল। এবং মুহূর্তের মধ্যে গাছটা মুছে দিয়ে একটা সাপ আঁকবার চেষ্টা করল। প্রীতি সাপ আঁকল। সাপ এঁকে প্রীতির আনন্দ হোল। সাপ রেখে প্রীতি দাঁত দিয়ে নীচের পাতলা ঠোঁটটা একবার কামড়ে ধরল। কাঁপল। তারপর ধীরে ধীরে বাইরে বেরিয়ে এল। অনিতা তাকে দেখে ঠোঁট উল্টে হাসল। প্রীতির মনে হল অনিতার মুখটা ঠিক তার আঁকা সাপের মত দেখতে।

প্রীতি বাইরে বেরিয়ে আকাশ দেখল। সূর্য অনেকখানি পশ্চিম আকাশে তলিয়ে গেছে। সামনেই একটা কৃষ্ণচূড়া গাছ। অসংখ্য ডালে রক্তের গর্জন। কৃষ্ণচূড়া ফুলের দিকে তাকিয়ে প্রীতি ব্রীড়ানম্র চোখে একবার নিজের শরীরের দিকে তাকাল।

প্রীতি সূর্যের দিকে আবার চোখ ফেরাল। প্রীতি সূর্যের আয়নায় তার মুখ দেখতে পেল। এবং মুখ দেখতে গিয়ে তার ভাবনার সুতোটা হঠাৎ জড়িয়ে গেল। আত্মপ্রবঞ্চনার কারণ হয়ে উঠল।

প্রীতি অন্য কথা ভাববার চেষ্টা করল। দুঃখের পোষা বিড়ালটার থাবার নখে জর্জরিত হয়ে সে ভাবল—এই রুক্ষচূড়া গাছের ছায়া মাড়িয়েই এবার কজন এ পথে হেঁটে যাবে। প্রীতি কোথায় যাবে? বাড়ি? না। বাড়িতে ঢোকার সংগে সংগেই প্রীতির মা তাকে সংসারের খাঁতাকলে ছুড়ে দেবে। কি নিদারুণ সে অভিশাপ! একপাল ভাইবোন। যেন একরাশ এঁটো কাঁটা। প্রীতিকেই পরিষ্কার করতে হয়। কোনটার নাক দিয়ে সর্দি ঝরছে, কোনটা কাদামেখে মাটির দুয়ারে পড়ে আছে, কোনটা আবার কাঁথার পায়খানা করে চিল চিৎকার করছে। কটাকে সামলাবে প্রীতি। ওর পরের ভাইবোনগুলো পাড়ায় পাড়ায় ঘোরে, খিদে চাড়া দিয়ে উঠলে বাড়ি ফেরে।

মোরগ হাঁক পাড়লেই প্রীতিকে উঠতে হয়। মুরগী তাদের একপাল সন্তান নিয়ে দোরগোড়ায় খাঁটতে বের হয়। প্রীতিও কাজ সুরু করে। কাজ! গোবরের বালতি টেনে টেনে ক্লান্ত হয়ে, বাসন মাজে গরু ছাগল বের করে। ঘরদোর পরিষ্কার করেই ছুটী নেই প্রীতির। ছোট ভাই বোনেদের সাজ বাকি ফোটাতে হয়। তারপর আছে বাপ মায়ের চা তৈরী।

আছে রান্নার পাট। বাবার পাখা টানার চাকরী মায়ের রাত, সর্বোপরি তিরিক্ষা মেজাজ।

সমস্ত তিক্ততার মাঝখানে এক জায়গায় সান্ত্বনা আছে প্রীতির। সেখানে গেলেই সে শান্তি পায়। প্রীতি সময় পেলেই তাদের সাই গরুটার গায়ে মাথায় হাত বোলায়। আরামে গরুটা চোখ বোজে। গলা বাড়িয়ে দেয়। কখনো আবার বড় বড় চোখ মেলে প্রীতিকে দেখে। কিন্তু প্রীতি কি পায়? সেবা নয়। যত্ন নয়। পেটপুরে দুটো খেতেও পায়নি। সান্ত্বনা পায়। মায়ের অকথ্য ভাষার গালাগালি শুনতে হয়।

সংসারের কথা আর ভাবতে পারেনি প্রীতি। অরুণাদির স্বামী দেখতে কি চমৎকার! একরাশ কোঁকড়ানো ঘন চুল। বাঁশির মত নাক; আশ্চর্য সুন্দর টানাটানা দুটো চোখ। মাখনের মত চেহারা—কি রঙ! সিল্কের পাঞ্জাবি, সোনার বোতাম। নক্‌শাপাড় ফিনফিনে ধুতি। সোনার ঘড়ি। পথ হাঁটলে বাতাসে কি মিষ্টি গন্ধ ছড়ায়। প্রীতি ভাবছিল। ভাবনার গতিকে একটু আগে ঘুরিয়ে ছিল; প্রায় একটা রঙীন প্রজাপতি ধরে ফেলেছিল প্রীতি। হঠাৎ—

—সত্যিই গুয়োপোকা কি প্রজাপতি হয়? বড় আশ্চর্য লাগে প্রীতির। এবং এই বিশ্বাসটুকু লালন করতে সে কিছুতেই ভরসা পায়নি। ঘিঘ্রি বিষাক্ত গুয়োপোকা কি ভাবে প্রজাপতি হতে পারে? একটা জটীল ধাঁধার উত্তর মেলাবার সংকেতে প্রীতি অনেক কিছু ভাবে। ভাবে আর ভাবে।

এতক্ষণের ছড়ানো ছিটানো ভাবনাগুলোকে এক সাথে ঘানা বাঁধবার চেষ্টা করতে গিয়ে হাঁফিয়ে ওঠে প্রীতি। প্রীতি ভয় পায়। তার ঝাঁকা গাছটার সর্বাংগে একটা সাপ প্যাচ দিয়ে জড়িয়ে হাঁ করে সবুজ পাতার সরলতা ও সেই সংগে ফুলের পাপড়িগুলো গিলছে। মাটি কাঁপছে। সমস্ত গাছটা বিষে জর্জরিত হয়ে থর থর করে কাঁপছে। শিকড়গুলো এই বুঝি পট্ পট্ করে মাটির নাড়ি ছিঁড়ে বেরিয়ে আসে। প্রীতির সমস্ত শরীরের কোষে কোষে ঘাম জমেছে। ঘাম না বিষ। প্রীতি গাছ হয়ে হাঁকাচ্ছে। প্রীতি—

একটা সরষা ফুলের নরম তুলতুলে শরীর নিয়ে কটা প্রজাপতি এদিকেই আসছে। প্রজাপতি তো? প্রীতি লক্ষ করল তার ঝাঁকা সাপটাও কি ভাবে ওদের সংগে চলে এসেছে। সাপ না গুঁয়োপোকা। এ গুঁয়োপোকাটাও কি প্রজাপতি হবে একদিন। প্রীতি আর ভাবতে পারলনা।

কেঁপে উঠল প্রীতি। বুকের মধ্যে ধাপাধাপি। অসহ্য এক যন্ত্রণায় প্রীতি পীড়িত হয়ে কৃষ্ণচূড়া গাছের পাশে কণিমনসার ঝোপের আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে নিলে।

প্রজাপতিকটা কৃষ্ণচূড়া গাছের ছায়া মাড়িয়ে এইমাত্র চলে গেল। সাদা ফুলটাকে ডানায় তুলে নিয়ে প্রজাপতি কটা প্রীতিকে অশেষ বিড়ম্বনার মাঝে রেখে দিয়ে গেল। প্রীতি পরিষ্কার দেখতে পেল প্রজাপতি কটা চমৎকার একটা ঘরের ভিতর ঢুকে পড়বে এবং ফুলের পাপড়ি ঘিরে কিছুক্ষণের জন্যে সুন্দর একটা জগতের ছবি দেখবে। আলো, হাসি, গানের ফুকানে ডানা ডুবিয়ে প্রজাপতি কটা ফিরে আসবে এ পথেই। তখন প্রীতি হয়ত আচের ধোঁয়ায় চোখ লাল করে—

চমৎকার একটা বই হচ্ছে সিনেমায়। প্রীতিদের বাড়ির সামনের বাড়িটার পাকা দেওয়ালে আজই সকালে কটা লোক এসে একটা রঙীন ছবি সেঁটে দিয়ে গেছে। কাজের ফাঁকে ফাঁকে প্রীতি তাদের দুয়ারে দাঁড়িয়ে ছবিটা দেখেছে অনেকবার। আর—

আজ প্রীতি তার মাকে ক'আনা পয়সা চেয়েছিল। সব চেয়ে কম টিকিটের মাশুল। প্রীতির বায়নায় জলে উঠেছে, মারতে বাকী রেখেছে প্রীতিকে। লঙ্কা বাটার মত মায়ের কথাগুলো সেই সকাল থেকে প্রীতির বুকের ভিতর মাখামাখি হয়ে এখনও জ্বলছে।

বাড়ি এখন আর ফিরবেনা একটা চরম সিদ্ধান্তে এসে উপনীত হয়েছে প্রীতি। প্রীতি এখন নদীর ধারে গিয়ে বসবে। অন্ধকার নামবে ধীরে ধীরে। প্রীতির চারপাশে সে অন্ধকার গুঁড়ি মেরে এসে ওকে জড়িয়ে ধরবে। এবং সেই অন্ধকারে প্রীতি অরুণাদির স্বামীকে নিয়ে—

ছিঃ ছিঃ এসব কি ভাবছে প্রীতি! অরুণাদির স্বামী—শ্যামলীদির বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছে। ছবি তুলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রীতিরও ছবি তোলাতে ভারী ইচ্ছা যায়। কিন্তু তার ছবি—শ্যামলীদি দেখতে ভালো, ঠিক পছন্দ হয়ে যাবে। আর একদিন অরুণাদির স্বামীর মত একজন সুন্দর সুদর্শন ছেলে এসে শ্যামলীদির গলায় মালা পরিয়ে দেবে। অথচ—

প্রীতি সব কিছু দেখবে। সমস্ত প্রজাপতি কটাই একদিন এ সহরের আকাশ মাটি ছেড়ে অন্য কোথাও চলে গেছে। এক একটা প্রজাপতি এক একটা ফুল ঘিরে ঘর বেঁধেছে। হয়ত ওঁরোপোকাটাও একদিন আর একটা প্রজাপতি হয়ে যাবে। এবং তারও—

ভাবতে গিয়ে বুকের ভিতর হু হু করে ওঠে প্রীতির। গলা ঠেলে একটা হাহাকার উঠে আসে প্রীতির দু'হাতের মধ্যে প্রীতি মুখ ঢেকে ফুলে ফুলে ওঠে।...

আর, তারাঝলা আকাশ বোবা মেয়েটার খোঁপায় গোঁজা কৃষ্ণচূড়ার গুচ্ছটির দিকে অবাক বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে থাকে।

———

রবীন্দ্র সাধনা

(তত্ত্ব ও গল্প)

শ্রীসতীশচন্দ্র রায় চৌধুরী

আপনাদের আহ্বানে আমরা সুদূর থেকে সাড়া দিয়েছি। কলকাতা এখান থেকে ১৩৪ মাইল। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বলবার কি আছে? তিনি ত, নিজেকে ব্যক্ত করেছেন নানান ভাবে। সবই ত আপনারা জানেন। শুধু একটি আনন্দ-বার্ত্তা বহন করে এনেছি যে আমি রবীন্দ্রনাথকে দেখেছি, তাঁর সঙ্গে কথা বলেছি। এ এক দুর্লভ সুযোগ, গৌরব পূর্ণ বিশেষ অধিকার। প্রায় ৮ বৎসর তাঁর বিদ্যালয়ে কাটিয়েছি শান্তিনিকেতন আশ্রমে তাঁর শিষ্য হয়ে। গুরুদেবের চরণ প্রান্তে বসে তাঁর জীবন সাধনাকে বুঝবার চেষ্টা করেছি। তাঁকে জেনেছি বলে গর্ব্ব করা হয়। তা'বলতে বোধ হয় কেউই পারেন না। এমনই মণি-রত্ন সম্ভব সমুদ্রের মত অসীম ছিল তাঁর ব্যক্তিত্ব; এমনই বিভিন্ন মুখীন ছিল তাঁর সৃজন-প্রতিভা।

উপনিষদের ঋষি ভগবান সম্বন্ধে বলেছেন,

আমি জেনেছি তাঁহারে
মহান্ পুরুষ যিনি আঁধারের পারে
জ্যোতির্ম্ময়। তাঁরে জেনে তার পানে চাহি
মৃত্যুরে লঙ্ঘিতে পারি, অন্য পথ নাহি।

এ বাণী যদি রবীন্দ্রনাথের প্রতি আরোপ করি 'রঘুপতি রাঘব রাজারামের'মত 'মানবেরে-দেব পীঠস্থানে তুলি তা'হলে Blasphemy বা ঈশ্বর-নিন্দা হয়না। কারণ পূর্ণতার আদর্শই ত ঈশ্বর—মানুষের ঈর্ষা করেনা। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন আঁধারের পারে সেই জ্যোতির্ম্ময় প্রভাত। মৃত্যুকে লঙ্ঘন করবার স্পর্দ্ধা রাখে তাঁর জীবন-সাধনা।

ঘাটশিলায় এসে দেখলাম রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে আপনারা কবির শতবার্ষিকী উৎসবের আয়োজন করেছেন। এজন্য সর্ব্ব প্রথম আপনাদের অভিনন্দন জানাই। এর চেয়ে যোগ্যতর স্থান নির্ব্বাচন করা যেতনা।

একটি সুরম্য প্রাকৃতিক আবেষ্টনের মধ্যে আপনারা বাস করছেন, কলকাতা প্রবাসীর দেখলে ঈর্ষা হয়। বিচিত্র পর্ব্বত মালা বেষ্টিত, শাল মহুয়ার বনরাজি পূর্ণ অপূর্ব্ব নিসর্গ দৃশ্য মণ্ডিত, স্বর্ণরেণু মেখলাপরা সুবর্ণরেখার স্নেহধারাসিক্ত সবুজ উপত্যকার কোলে সৌন্দর্য্যময়ী ঘাটশিলা। পাহাড় বন জঙ্গল নদীর সুষমা দিয়ে তৈরী আপনাদের বাসভূমি। আপনারা ভাগ্যবান। কিন্তু এ সৌন্দর্য্যের কিছু আপনাদের সৃষ্টি করতে হয়নি, এ প্রকৃতির স্বহস্তের দান। রবীন্দ্রনাথ তাঁর পিতার সাধনভূমি শান্তিনিকেতনকে করেছিলেন নতুন করে সৃষ্টি। বিরূপ প্রকৃতির রুক্ষ রুক্ষতাকে তিনি করেছিলেন জীবনের আনন্দ-রসে পূর্ণ। দেখেছিলেন 'পূর্ণের ছবি শূন্যময় অসীম প্রান্তরে!' জায়গাটি তাঁর ভাষায় immediate presence or the Eternal. অনন্তের মুখোমুখি আসন পেতে

বলে তিনি অন্তরকে উন্মুক্ত করেছিলেন। যেমন তিনি জীবনকে পেয়েছিলেন আমাদেরি মত 'রিক্ত শূন্য হাতে' তাকে তিনি রূপ দিয়েছিলেন কাব্যময় সৌন্দর্য-সৃষ্টিতে। তিনি পেয়েছিলেন একখানা সাদা কাগজ তাতে তিনি এঁকেছিলেন রূপছবি। প্রথমে কাব্য নিয়ে দেখি। কারণ কবির সাধনা সৌন্দর্য-সাধনা। মূলত তিনি কবি। তাঁর ধর্ম সৌন্দর্যময় জীবন-বিকাশ। কাব্য জিনিষটা কি? কী থাকলে সম্পদটি লভ্য হয়? নানা মুনির নানা মত। তা' বলতে গিয়ে আপনাদের ধৈর্যকে ক্লান্ত করবনা শুধু প্রাচীন কবি আলঙ্কারিক দণ্ডী যা' বলেছেন তা' উদ্ধৃত করি।

তিনি বলেছেন এই সম্পদটি লাভ করতে গেলে চাই মুখ্যত তিনটি জিনিষ "অলৌকিকী চ প্রতিভা শ্রুতঞ্চ বহু নির্মলম্, অমন্দাভিযোগশ্চ কারণং কাব্য সম্পদ।" নব নব উন্মেষশালিনী বুদ্ধি চাই যা নাকি সাধারণের মধ্যে সুলভ নয় যা ঐশ্বরিক, চাই সুনির্মল জ্ঞান আর চাই অশ্রান্ত ভাবে লেগে থাকা। বিদেশী আলঙ্কারিকরাও শেষোক্ত কথাটি প্রতিভার সংজ্ঞা নির্ণয় করেছেন। 'Capacity to take infinite pains. কথাটি ছোট বটে তবু কেলনা নয়। কিন্তু শুধু ঘসে মেজে রবীন্দ্রনাথ হওয়া যায় না ভেতরে ঐশ্বরিক দান থাকা চাই।

তবে প্রতিভা কথাটা একটু গোলমেলে। দেশে বিদেশে অনেকে সেটা স্বীকার করতে চান নি। তাঁরা বলেন perspiration ই সব inspiration এর বিশেষ কিছু মূল্য নেই। কথাটা ঠিক নয়। পৃথিবীতে কবি অনেক হ'য়েছেন, কবিতা অনেকে লিখেছেন। কিন্তু তাঁদের সাধনা বিষয় বস্তুতে, ভাব প্রকাশের অনায়াস সম্ভরনে সেটা অভ্যাস সাপেক্ষ। রবীন্দ্রনাথ সে জাতীয় কবি নন। তিনি উপনিষদের 'কবির্মনীষী', ঋষি-কবি বা সত্যাশ্রয়ী। জীবন-সাধনা থেকে উদ্ভূত তাঁর বাণী; জীবনের মহৎ সত্য প্রকাশেই তাঁর বিশেষত্ব। তাঁর ঘটনা বিন্যাস ভাবনার বাহন মাত্র-সেটাই আসল নয়। ঘটনা সাময়িক কৌতূহল জাগায় সেটা ধার করাও হতে পারে সেক্সপীয়ার যা' করেছেন। কিন্তু ভাব বেঁচে থাকে চিরকাল। কারণ যা জীবন-সত্য তা' চিরকালের। বিগত অতীত, আগত বর্তমান ও অনাগত ভবিষ্যতের। রবীন্দ্রনাথ এই জীবন-সত্যের কবি-সাধনা থেকে উদ্ভূত তাঁর বাণী তাঁর প্রতিভা ঐশ্বরিক দান। জিনিষটা যে, কি কবি রবার্ট ব্রাউনিং তা ভালই বলেছেন—

"There are few — আছে শুধুই দু'চার জনা
Whom God whispers in the ear — যাঁদের কানে মন্ত্র দেন স্বয়ং ভগবান
The rest may reason and welcome — সাধন, ভজন, আরাধনা
It's we musicians know." — বাদ বাকীরা তাইবে দেখা পান!
সত্য যাহা স্বতঃই মোরা জানি
আমরা কবি, নইক মোরা জ্ঞানী।

সেই জন্যই রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'জীবন-দেবতা' কবিতায় এক জায়গায় বলেছেন 'যে কথা ভাবিনি বলি সেই কথা।' প্রসঙ্গ ক্রমে, শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহালানবিশের জীবন দেবতার ব্যাখ্যা, সংক্ষিপ্ত কিন্তু সুষ্ঠু। Jibandevata is personal···জীবন দেবতা' কবির ব্যক্তিগত জীবনের অধিষ্ঠাত্রীদেবী, না, তাও সম্পূর্ণ ঠিক নয় ইনি কবির আত্মস্বরূপ তাঁর অন্তরাত্মার প্রকাশ, যা তাঁর দ্রষ্ট্য জীবনের অবলম্বনের চাইতে বেশী।'

আত্মা সম্বন্ধে বলেও প্রতিভা সম্বন্ধে খাটে। নায়মাত্মা প্রবচনে লভ্য, ন মেধয়া…

২২ শ্লোকঠৈপনিষদ

'ব্রহ্ম প্রাপ্তি নাহি হয় শাস্ত্র অধ্যয়নে, বহুল শ্রবণে কিংবা মেধার চালনে ;
সকাতরে চান যিনি আত্মদরশন, লভেন আত্মাকে তিনি অন্তরে আপন।

কিংবা 'হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যা··হিরণ্ময় পাত্র দিয়ে সে সত্যের মুখ আছে ঢাকা, দর্শন সম্ভব হয় যদি তার সেই আবরণ অপো প্রতি দয়া করে হে পূষণ! কর উন্মোচন দেখি তবে মোর মাঝে কি বিচিত্র ছবিখানি আঁকা!

প্রমথ চৌধুরীর কথাটি মন্দ নয়। 'সবাক জ্ঞানের অন্তরে কোনো দ্বিধা নেই, কোনো ইতস্ততঃ নেই। সেই জ্ঞান শুধু মুখ কলেজে বই পড়ে হয় না। ভগবদ্দত্ত প্রতিভা ব্যতীত কেউ আর যথার্থ জ্ঞানের অধিকারী হতে পারে না।'

Carnal Grossniss যা আমাদের চৈতন্যকে dim করে আছে ঈশ্বরানুগ্রহে সরে গেলেই সেই 'হিরাচলনা'কে দেখা যায়। অনুকম্পের মধ্যে সম্পূর্ণ মানসিক পরিবর্তনের ক্ষমতা রাখে প্রতিভা। কিন্তু এই "অলৌকিক আনন্দের ভার, বিধাতা যাহারে দেয় তার বক্ষে বেদনা অপার! তার নিত্য জাগরণ!" এ রাজভোগে পালিত তরুণ রাজপুত্র সিদ্ধার্থকে করে সন্ন্যাসী বুদ্ধ ;দস্যু রত্নাকর হয় কবি বাল্মিকী ; মরুভূমির মেষপালককে যিশুখৃষ্ট, দরিদ্র উট্ট চালককে মহম্মদ, নদীয়ার নৈয়ায়িক নিমাই পণ্ডিতকে শ্রীচৈতন্য, অশিক্ষিতা গ্রাম্য ফরাসী বালিকাকে জোন অফ আর্ক, বিষয়ী রামমোহনকে, রাজর্ষি রামমোহন, প্রতিমায় বেশ পরিবর্তন কারী পূজারী ব্রাহ্মণ গদাধরকে শ্রীরামকৃষ্ণ। ঐশী অনুগ্রহে অন্তরের কালোপর্দা সরে যায়। দেখা দেয় ইতিপূর্বে যা দেখা যায় নি। প্রতিভাগ্রস্ত লোক বলতে থাকে এমন কথা—যেকথা কেউ তার কাছে ইতিপূর্বে শোনে নি।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সেই ঈশ্বর দত্ত কাব্য-প্রতিভার অধিকারী। সাহিত্য, শিল্পের, ধর্মের যে বিভাগকে তিনি ছুঁয়েছেন তাকে তিনি সোনা করে দিয়েছেন। আর সাহিত্য শিল্পের এমন কোনো বিভাগ নেই যা' তাঁর অজ্ঞাত লেখনী স্পর্শ করেনি। বিশ্বসাহিত্য ভাণ্ডারে তাঁর যা দান তা' আজ সব সাহিত্যিকদের সমস্ত দানকে ছাপিয়ে উঠেছে শুধু ভারে নয় ধারেও। এমন গভীর ভাবে জীবনকে কেউ কখনো দেখেনি, এমন মধুর ক'রে কেউ কখনো বলে নি। Nobel prize পেয়ে তিনি বিশ্বে পরিচিত হয়েছিলেন সত্য কিন্তু নোবেল প্রাইজকে তিনি করেছেন গৌরবান্বিত। বিশ্বের অন্যান্য লেখকেরা যাঁরা এই গৌরবের অধিকারী হয়েছেন তাঁরা রবীন্দ্রনাথের শ্রেণীর নয়। বস্তুত সাহিত্য-রচনার ব্যাপক ক্ষেত্রে তাঁর কোনো শ্রেণী নেই, তিনি অদ্বিতীয়। চিন্তা ও ভাব জগতের এমন এক উচ্চ কোটিতে রবীন্দ্রনাথ বিরাজ করেন যেখানে প্রণাম জানাতে গেলেও 'তোমা কাছে নত হ'তে গেলে যে উর্দ্ধে উঠিতে হয়' তা' অনেক উঁচুতে।—ভারতবর্ষের প্রাচীন অধ্যাত্ম-সাধনার তুঙ্গ হিমালয়ে।

রামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন 'বহুসাধকের বহুসাধনার ধারা যেখানে তোমার মিলিত হয়েছে তারা।' আমার মনে হয় এ তাঁরও আত্মবিশ্লেষণ। বহু সাধকের বহু সাধনার ধারা তাঁর ধ্যানের সঙ্গে মিলিত হ'য়ে তাঁর কাব্যে রূপ নিয়েছে। তাঁর কাব্য একটি বিচিত্র ভাব সমন্বয়। সর্বকালের সর্বদেশের সাধনাকে পাই তাতে—একের মধ্যে অনেককে। সর্বদেশ রাজকর জুগিয়েছে

এই কবি সম্রাটকে। কিন্তু বিশ্বের ভাবসুধা যখন আজ প্রকাশ করেছে তাঁর অন্তরের রক্ত মাংসে গোলাই হয়ে পরিপ্লুত কাব্যরূপে তখন সে সৃষ্টিতে শুধু রয়েছেন তিনি—অন্য কেউ কোথাওও নেই।

তাঁর কাব্যে তিনি সৌন্দর্যরসিক কিন্তু তান্ত্রিক নয়। আমরা কাব্যে খুঁজতে যাই তত্ত্ব। যেন সেইটাই তার উৎকর্ষের নিরিখ। এর মত মূঢ়তা আর কিছু নেই। ইমার্সন বলেছেন 'চোখ যদি দেখবার জন্য সৃষ্টি হয়ে থাকে তবে সৌন্দর্যের দাবীও সমর্থনীয়।' দেহের সৌন্দর্য সমাবেশের জন্য কঙ্কাল চাই অবশ্য; তবু হচ্ছে সেই কঙ্কাল। যেমন ফুলটি ফোটা'র জন্য চাই বৃন্ত। কিন্তু কবির দৃষ্টি থাকে ফুলের গঠন আর তার সৌন্দর্যের দিকে। ফুলের বর্ণ ও সৌরভের দিকে তার মন থাকে সজাগ। কারণ সৌন্দর্য ক্ষণভঙ্গুর অথচ চিরন্তন তাই তা' কাব্যের বিষয়।

(১)

নিজের মনে ডুব দিয়ে যাঁরা পরের মনের কথা বলেন তাঁদের আমরা বলি সাহিত্যিক, কবি জীবনের লীলার দিকটাই আমরা বেশী করে দেখি—মূল্যও দিয়ে থাকি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-সৃষ্টি ছিল তাঁর জীবন-সাধন অন্তর্গত ব্রত।

যদিও মুখ্যত তিনি কবি তবু এই সৃজন-প্রতিভা তাঁর জীবন বিকাশের একটি দিক মাত্র —সমগ্র রবীন্দ্রনাথ নয়। সমুদ্রের তরঙ্গ-লীলাকে যেমন আমরা সমুদ্র বলিনা তার আর একটি নাম রত্নাকর। রজনীর জ্যোৎস্না বিকাশই রজনী নয়—অসংখ্য গ্রহতারকার মণি-মাণিক্যের দ্যোতনা তার মধ্যে।

আমাদের গুরুদেব যেমন রবীন্দ্রনাথ তেমনি তাঁর মানসগুরু ছিলেন রাজনারায়ণমোহন বসু। সেই অন্ধকার যুগে তিনি যে কতদিকে আলো জ্বেলেছিলেন তার আর ইয়ত্তা নেই। রামমোহন ছিলেন বাংলার জাতীয় জীবন-আন্দোলনের প্রথম হোতা। বিধির বিধানে অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সেই তিনি কর্মক্ষেত্র থেকে অপসারিত হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে মাথায় তুলে নিয়েছিলেন তাঁর আরব্ধ অসমাপ্ত কর্মভার—জাতিকে জড়নিদ্রা থেকে জাগাবার দায়িত্ব স্বেচ্ছায় এবং সগৌরবে। নৈবেদ্যের ৫৯ সংখ্যক কবিতায় দেখি—

আমরা কোথায় আছি, কোথায় সুদূরে
দীপহীন জীর্ণ ভিত্তি অবসাদ পুরে
অন্ধগৃহে সহস্রের ভ্রূকুটির নিচে
মূঢ় পৃষ্ঠে নত শিরে, সহস্রের পিছে
চলিয়াছি প্রভুত্বের তর্জনী-সংকেতে
কটাক্ষে কাঁপিয়া লইয়াছি শির পেতে
সহস্র শাসন-শাস্ত্র।

এ বেদনা এ মনস্তাপ তাঁকে পীড়িত করেছিল। সেই জন্য পূর্বে বলা হয়েছে তাঁর সাহিত্য-সাধনা ছিল জীবন-সাধনার অন্তর্গত ব্রত।

রবীন্দ্র-কাব্য জ্ঞানের ও প্রেমের রোমাঞ্চ; আনন্দের ও উৎসাহের দীপাবলী। তাঁর ছিল পূর্ণতার সাধনা। নিজেকে তিনি পেতে চাইতেন সমগ্রভাবে। তাঁর আত্মার আকুল আর্তি

'গুরুগোবিন্দে'র মুখে—'আপনার মাঝে আপনারে আমি পূর্ণ দেখিব কবে?' কিন্তু এ 'স্বর্গসাধন' স্বার্থপর বা আত্মকেন্দ্রী নয়। তার উদ্দেশ্য 'আমার জীবনে লভিয়া জীবন জাগরে সকল দেশ।' পরিপূর্ণ মানবিকতার বিকাশ ছিল তাঁর লক্ষ্য। আমাদের দেশের সাধকেরা চেয়েছেন মুক্তি, নির্বাণ—তাঁরা জীবন-বিরাগী। কবি রবীন্দ্রনাথ মুক্তি চাননি, তিনি ছিলেন জীবন-অনুরাগী। আশা ও আনন্দের আবেগে পূর্ণ স্বর্গ-সন্ধানী গানে তিনি মর্ত্য জীবনকে নূতন মূল্য দিয়েছেন। ভারতবর্ষ শঙ্করের দেশ। 'ব্রহ্ম সত্য জগৎমিথ্যার' 'দেশ' নলিনী দল গত জলমতি তরলম্, তদ্বৎ জীবনমতিশয় চপলম্ এর দেশ। যে দেশে 'সন্ধ্যাত্র বিদ্রুম নিভো বিভবো ভবে অম্বিন - প্রাণাগ্রিপাত জল বিন্দু চল স্বভাবা: যে দেশে 'ইহসংসার দুঃখালয়: অশাশ্বত'; সেই উদাসীন বৈরাগীর দেশে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব চরম আশ্চর্যকর বিধাতার পরম অনুগ্রহ।

বুদ্ধের নির্বাণ, শঙ্করের মোক্ষ লাভ কবির কাম্য নয়। সৌন্দর্য-সন্ন্যাসী কবি চান প্রেম। কবীর, দাদু, রজ্জবের তিনি ছিলেন উত্তর পুরুষ তাঁর কথা ছিল যে জীবনকে আমরা আকস্মিক অসম্পূর্ণ ভাবে পেলাম তাকে পরিপূর্ণ করে পেতে হবে। প্রেমে ত্যাগে সার্থক করতে হবে; সেবায় সৌন্দর্যে উজ্জ্বল করতে হবে; সঙ্গীতে, কবিতায়, শিল্পে, সাহিত্যে সমৃদ্ধ সরস করতে হবে; ধর্মে আদর্শবাদে তাকে করতে হবে মহীয়ান। এক কথায় আমাদের পশুত্বের থেকে উঠ্‌তে সচেষ্ট হতে হবে। 'উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্যবরাণ নিবোধত' এই ছিল তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র।

উদ্ধৃতিটি বিবেকানন্দের বাণীর সঙ্গে মিলিয়ে বোধকরি। তা হ'তে পারে। মনে রাখা দরকার এই দুই মহাপুরুষ ছিলেন সমকালীন। রবীন্দ্রনাথের জন্ম ১৮৬১ সালে বিবেকানন্দের ১৮৬৩ সালে। বয়সে রবীন্দ্রনাথ দুই বৎসরের বড়। কিন্তু মাত্র ৩৮।৩৯ বৎসর বয়সে এই তরুণ সন্ন্যাসীর মৃত্যু হয় ১৯০১ সালে। রবীন্দ্রনাথ বেঁচেছিলেন আরো ৪২ বৎসর বেশী তিনি ৮০ বৎসর বয়সে মানবলীলা সংবরণ করেন।

মহাপুরুষরা মধ্যবর্তী (medium) মাত্র। যুগধর্ম জীবন্ত ও সক্রিয়। এ অনুধাবন করা যায় একটু অবহিত হলেই। যে বাণী বিবেকানন্দের ভিতর অসমাপ্ত,—রবীন্দ্রনাথের অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ জীবনের সাধনায় যুগ আপনাকে প্রকাশ করেছে পূর্ণ প্রস্ফুট ভাবে। তবে একজনের ছিল ত্যাগ, বৈরাগ্য ও মানব প্রেমের পথ; আর একজনের ছিল ব্যক্তিপ্রেম (যা অবশেষে ভগবৎ প্রেমে পৌঁছিয়েছিল) ও রসের সাধনা। পথ ভিন্ন কিন্তু লক্ষ্য এক।

রামমোহনের জন্ম ১৭৭৩ সালে মৃত্যু ১৮২১ মাত্র ৫৮ বৎসর বয়সে ইংলণ্ডে ব্রিষ্টলে এই মনস্বীর মৃত্যু হয়। বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষে যুগান্তর এনেছিলেন এই দুই মহাপুরুষ। দেশের দুর্ভাগ্য দু'জনেই ক্ষণজীবি। তাঁদের পরিণত সাধনার ফলে থেকে দেশ বঞ্চিত হয়েছে কিন্তু যা' পেয়েছে তার তুলনা নেই। তবু আক্ষেপ তার থেকে গেছে চিরকাল।

জাতীয় জীবন-জাগরণের প্রথম শুকতারা রামমোহন, বিবেকানন্দ প্রদীপ্ত প্রভাত, রবীন্দ্রনাথ মধ্যাহ্ন ভাস্কর। ত্রয়ীর সাধনায় অবিচ্ছেদ্য শৃঙ্খলা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মানস-শিক্ষক ও জীবন আদর্শ ছিলেন রাজা রামমোহন রায়। তিনি ছিলেন তাঁর পিতামহ প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের বন্ধু। কবি তাঁকে দেখেন নি কিন্তু একলব্যের মত অদৃষ্ট অবস্থাতেই গুরুর শিক্ষা জীবনে গ্রহণ করেছিলেন। তিনিই তাঁকে অনুপ্রাণিত করেন জীবনের সর্বাঙ্গীন বিকাশে। রবীন্দ্র-সাধনা তাঁর সাধনারই ফল। দুজনেই ছিলেন যুক্তিবাদী, সমাজ-সচেতন ও উদারনীতিপ্রবণ, একটি লক্ষণীয় ঘটনা যে বৎসর বিবেকানন্দ

বেসুর মঠ প্রতিষ্ঠা করে মহর্ষিদেব ত্যাগ করেন ১৯০১ সালে সেই বছরেই কবি রবীন্দ্রনাথ পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের অনুমতি নিয়ে শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম স্থাপন করেন। শান্তিনিকেতন সংলগ্ন গ্রামটির নাম ভুবনডাঙা। ভাঙামানে tableland-বোলপুর ষ্টেশন থেকে ৪০ কিট উঁচু শান্তিনিকেতন স্থানটার নামছিল ব্রহ্মডাঙা। অকর্ষিত নগ্ন জনমানবহীন হয়ে ধূ ধূ করেছে কত যুগ। কে জানত মহর্ষির সাধনা ? (যা রবীন্দ্র-সাধনায় সক্রিয় হয়েছিল) নিখিল ভুবন এসে একদিন সেখানে মিলবে।

কিন্তু কবির আসরণ নগ্ন জীবন রস বিমুখের নয়, তা জীবন-রস-রসিকের। কবি সুন্দরের বন্দনাকারী, ঈশ্বরদত্ত যা'কিছু ভাল্য বস্তুর নির্দেশক। রবীন্দ্রনাথের পরিণত জীবনের কাব্য 'নৈবেদ্যে' এই যৌবন-মন্ত্রের মূল সুরটি বেজে উঠেছিল 'বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়!' কিন্তু তাঁর এই জীবন-দর্শনে উদ্ভ্রান্তিকতা নেই; ভারতের ঐতিহ্যই এর অবলম্বন। মধ্যযুগের ভারতীয় সাধক কবির বলেছেন 'কান না রুধই, আঁখ না মুদই, সুন্দর রূপ হসহস্ দেখই।' দেবতাকে দেখবার জন্য কান রুদ্ধ করতে হয় না, আঁখিও মুদতে হয় না'; হাসতে হাসতেই তাঁর সৌন্দর্যকে দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'অপরূপকে দেখে গেলেন দু'টি নয়ন মেলে।' (গীতাঞ্জলী) সাধন-জগতে কবি মধ্যযুগের ভারতীয় মরমীদের উত্তর পুরুষ।

রবীন্দ্রনাথের জীবন-কথা হ'য়েছে স্তরে স্তরে বিকশিত। ফুটেছে যেন একটি শতদল পদ্ম। সাধকরা যেমন রুদ্রাক্ষ বীজের মালা জপ করেন কবি তেমনি জীবনকে প্রত্যেকটি দিন মালা জপ করার মত সেই সৌন্দর্যময়ের, আনন্দময়ের সাধনা করে গেছেন অক্লান্তভাবে এবং নিষ্ঠার সঙ্গে। বৎসরের ৩৬৫ দিনের মধ্যে একটি দিনও সেই সাহিত্য-সাধনায় বোধ করি বিরাম ছিল না। রচনাবলীর কবিতাগুলির নিচে যে তারিখ দেওয়া আছে তা থেকে খানিকটা বোঝা যায়। তা ছাড়া অন্যান্য সব রকম সাহিত্য সৃষ্টি ত ছিলই। এ এক পরম বিস্ময়। ব্রহ্মার কাছে অমর হ'বার বরলাভের জন্য রবীন্দ্রনাথ সারা জীবন কঠোর সাধনা করেছেন এবং এই তপস্যায় সিদ্ধিলাভও তাঁর হয়েছে।

রবীন্দ্র-সাধনার তত্ত্বের দিক হ'য়ে গেল এবার গল্পের দিক। একবার তাঁকে বলতে শুনেছি, 'সেফটি নিয়ে যদি শুরুগিরি করতাম ত আমাদের দেশে চালার অভাব হ'ত নারে!' রবীন্দ্রনাথ অলৌকিক কিছুতে বা বুজরুকীতে বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ Rational বা যুক্তিবাদী। অর্থাৎ তাঁর কোনো জড়ং ছিল না। এদেশেও বিদেশে ভগবৎ সাধকদের মধ্যে এর প্রচলন দেখা যায়। খোল কর্তাল যোগে সঙ্কীর্তন বা ঈশ্বরের নাম গান ও ভাবাবেশে উদ্দাম নৃত্য বা বৈষ্ণব সাধনায় চিরাচরিত প্রথা সেই বিহ্বলতা প্রকাশে তাঁর রুচি ছিল না। যা' আত্মসমাহিত করে না যা' ভাবময়ে মনকে উন্মত্ত করে তা' ঈশ্বরকে উপলব্ধির পথে ব্যাঘাত ঘটায় এই ছিল তাঁর বিশ্বাস। গল্প বলি একটা।

১৯১৫-১৬ সালে রবীন্দ্রনাথের যথা সময়ে অনুপস্থিতির সুযোগে সন্ধ্যাবেলায় মন্দির উপাসনার আসনে সহসা নগেন্দ্রনাথ আইচ (তদানীন্তন অধ্যাপক) অধিষ্ঠান হলেন। সমবেত ছাত্রও অধ্যাপকবৃন্দ যাঁরা সমবেত হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের উপাসনার ভাষণ শুনবার জন্যে তাঁরা সাময়িকভাবে চঞ্চল হয়ে ওঠেন এই আকস্মিক উপদ্রবে। আইচ মহাশয় ভ্রুক্ষেপও করলেন না। তিনি বলে চললেন, গোপাল, আমার গোপাল কোথায়? আমাদের অন্তরে তুমি দেখা দাও। তোমার বিহনে আমাদের চোখের জল বাধা মানছে না—আমাদের বিরহ দুঃখ দূর কর। এই সব বলে চোখের জল ফেলে বৈষ্ণবোচিত প্রথায় ঈশ্বর আরাধনে আবেগ প্রকাশ করেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর অনুমোদন করেন নি তাঁর প্রগলভতায় ও

অনধিকার আচরণে বিরক্ত হয়েছিলেন। মন্দিরে নিঃশব্দে ঢুকে তাঁর পাশের আসন গ্রহণ করে বলেছিলেন, "মতভা তা' যে কোনো বিষয়েই হোক্ না কেন আমাদের মনকে বিপর্যস্ত করে। বিচ্ছিন্নতার জন্যে আকাঙ্খিত জিনিষকে পেতে দেয় না। তখন তা' দিয়ে সেই পরম পাওয়াকে আমরা কি করে পেতে পারি?" কিন্তু এই মতদ্বৈধতার জন্য তিনি তাঁর কোনো ব্রত বিধান করেন নি। তিনি পর মত অসহিষ্ণু ছিলেন না।

সাধনা কথাটির অর্থ যা স্বভাবের বিরুদ্ধ। স্বভাবকে সুসজ্জিত, সুনির্মল ও সম্পূর্ণ করার জন্যই সাধনার প্রয়োজন। পশু থেকে আমরা পৃথক আমরা বড় শুধু এর দ্বারা যা শ্রেয় নয় কিন্তু যা শ্রেয়। মনুষ্যত্বকে বরণ করে মহৎভাবের উজ্জীবন এর জন্য চাই তপস্যা বা তাপ লাগানো। লোহার যেমন অগ্নিতপ্ত লোহাকে পিটিয়ে গড়ন ঠিক করে, স্বর্ণকার যেমন সোনাকে আগুনে গলিয়ে অলঙ্কার গড়ে তেমনি। রবীন্দ্রনাথ তেমনি তপ্ত করতেন ছেলেদের গড়তে। তাঁর সাধনা দিয়ে তাদের প্রাণে দিব্য প্রতিভার আগুনের পরশমনি ছোঁয়াতেন। 'কঠিন ভূমে কঠিন লোষ্ট অচেতন ছিল লক্ষ যুগের অন্ধকারে সঙ্গোপন ছিল' তিনি তাঁর ঘুম ভাঙাতেন। এও ছিল তাঁর সাধনা। নিজের মুক্তির জন্য স্বার্থপর 'স্বর্গসাধন' সাধক ছিলেন না তিনি। কবি নিজে যেমন নিয়মাঙ্গুল ছিলেন তেমনি নিয়ম শৈথিল্য বরদাস্ত করতে পারতেন না। কিন্তু বড়া এসে কি বাঁধ বেঁধে তা' বোধ করা যায়। ১৯২১ সালে শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম হল বিশ্বভারতী। আগে ব্রহ্মচর্যাশ্রমে ১২ বছরের বেশী ছাত্রদের ভর্তি করা হ'ত না। এখন আর সে নিয়ম থাকল না। নানারকম মনোভাব সম্পন্ন ছাত্রে ভরে উঠতে লাগল বিশ্বভারতন—নদীর মধ্যে যেন সমুদ্রের জোয়ার এল। বিশ্বভারতীর ছাত্র সংখ্যা বেড়ে ওঠার আগের চেয়ে এখনকার ছাত্ররা উশৃঙ্খল হ'য়ে উঠছে দিন দিন, এই সব অভিযোগ কুমুল হয়ে উঠ্‌ল একদিন ছাত্রদের আশ্রম-সম্মিলনীর সভায়। রবীন্দ্রনাথ সে সভায় উপস্থিত। গৌর গোপাল ঘোষ (আশ্রমের প্রাক্তন ছাত্র ও মোহন-বাগানের প্রাক্তন খেলোয়াড়) ছিলেন ছাত্র পরিচালক। তিনি অনেক বিরুদ্ধ সমালোচনা করলেন। বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠ্‌ল ছাত্ররা। একজন উঠে দাঁড়িয়ে বল্‌ল, 'আপনাদের তত্ত্বাবধানে আমরা দীর্ঘকাল আছি। তাতে যদি ঠিকমত মানুষ না হ'তে পারি ত আমাদের দোষ নেই। আপনাদের কর্তব্যের গাফিলতী। আমাদের দায়ী করা নিরর্থক।'

রবীন্দ্রনাথ বল্‌লেন, এখানে এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায় না। এখন তোদের মন সুস্থির নেই। সভা ভঙ্গ হোক। সন্ধ্যাবেলায় আমার সঙ্গে কেউ দেখা করিস—আমি বুঝিয়ে বল্‌ব।

সন্ধ্যায় ছাত্র প্রতিনিধি দেখা করলে তিনি বৈকালের অপ্রীতিকর পরিস্থিতির কোনো উল্লেখ করলেন না। শুধু শুধালেন, 'তোরা ফুটবল খেলিস ত?'

—হাঁ,

—খেলায় নিয়মভঙ্গ হলে কি হয়?

—রেফারী নিয়মানুযায়ী ব্যবস্থা করেন।

—আর যদি তোরা তাঁর সিদ্ধান্ত অমান্য করিস?

—তিনি মাঠ থেকে বের করে দিতে পারেন।

—তবেই দেখ্, তোরা তাঁকে নিজেরাই যে ক্ষমতা দিয়েছিস সেই ক্ষমতা তিনি চালনা করেছেন এতে আপত্তি করলে চল্‌বে কেন? বাদ করবার ত অধিকার নেই তোদের।

কবি ঘুমিয়েও পড়তেন মাঝে মাঝে। কিন্তু অপ্রস্তুত না হ'য়ে তাকে যুক্তির আকার দিতেন। একদিন সন্ধ্যা না হ'তেই তিনি বসে পড়েছেন কি একটা লেখায়। একটি ছাত্র এসে উপস্থিত হল। বেশী বয়স নয়। কিন্তু ছোটদের দলের পাণ্ডা। ছাত্রদের কাছে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন অবারিত দ্বার। 'কে ওখানে?, আমি! আমি কেরে, কাছে আয়!' 'ও তুই! তা' কি মনে করে এলি?' চুপ করে আছে ছেলেটি।

'লজ্জা কি বল না!' ছেলেটি বল্লে আমরা পাকুলে (প্রতিবেশী বনভূমি) বন-ভোজন করব ঠিক করেছি।' 'তা বেশ ত!' 'তাই সকলের কাছে চাঁদা আদায় করছি। আপনার কাছে এলাম কিছু চাঁদা চাইতে!' 'তাই বল্‌না, এত কিন্তু করছিস কেন? এই নে চাবি!—ওই ডেস্কটা খোল।'

ছেলেটি খুবই উৎসাহিত হল। বন-ভোজনের জন্য গুরুদেবের কাছ থেকেও চাঁদা আনতে পেরেছে সে! সে ডেস্কটি খুলে দেখে দু'খানি দশ টাকার নোট। রবীন্দ্রনাথ বললেন কত রে! টাকা কুড়ি আছে বোধ হয়। এখন হিসেব কর (কাল আমি কলকাতায় যাচ্ছি। ট্রেন ভাড়া ১৫৲ (তখন বোলপুর থেকে কলকাতার ফার্ষ্ট ক্লাসের ট্রেন ভাড়া ছিল এবং তিনি ফার্ষ্ট ক্লাসেই যাতায়াত করতেন বরাবর) আর ওখান থেকে জোড়াসাঁকোর ট্যাক্সি ভাড়া—কত যে উঠ্‌বে ঠিকৃত নেই। আবার রাহা খরচও আছে। এখন কি করে তোকে চাঁদা দেই বলত? ওই আমার সম্বল। ছেলেটি চুপ করে রইল—কি বল্‌বে? পালিয়ে আস্‌তে পারলে বাঁচে। রবীন্দ্রনাথের হাতে উদ্বৃত্ত টাকাকড়ি কমই থাকত প্রায় সময়।

তাঁর ট্রেনের ফার্ষ্ট ক্লাসে ভ্রমণ করবার কথা লিখ্‌তে লিখ্‌তে একটা ঘটনার কথা মনে পড়ল। একবার সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (মেজদাদা ভারতের প্রথম I. C. S. দের অন্যতম) শান্তিনিকেতনে এসেছেন। তখন প্রাচীন। ১৯১৫।১৬ সালে তাঁর আশ্রয়েই রবীন্দ্রনাথের যৌবনের প্রথমাংশ কেটেছে। তাঁর সঙ্গেই বিলেতে গিয়েছিলেন ১৭ বৎসর বয়সে সেখানে লেখাপড়া শিখবার জন্য। সত্যেন্দ্রনাথ সেকালের বিলিতী অজদের মত হাইকোর্টের গ্রীষ্মের ছুটির আড়াই মাস সপরিবারে 'হোমে' কাটাতেন। সেখানে বাড়ি ভাড়া করা হোত। তারপর ছুটি ফুরুলে সাহেব অজদের মত ভারতবর্ষের কর্মস্থলে ফিরতেন। সম্পূর্ণ সাহেবী প্রথায় চলাফেরা করতেন তখন। ছেলে সুরেন্দ্রনাথ ও মেয়ে ইন্দিরা (প্রমথ চৌধুরীর স্ত্রী) বিলিতী গ্রাজুয়েট। সত্যেন্দ্রনাথ কনিষ্ঠ ভ্রাতা রবীন্দ্রনাথকে খুবই ভালবাসতেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ত অনেক ছেলেমেয়ে। দ্বিজেন্দ্রনাথের (রবীন্দ্রনাথের বড় দাদা) বড় ছেলে দীপেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ সমবয়সী মহর্ষির বড় নাতি বলে দীপেন্দ্রনাথ (দীনুবাবু) মাসোহারা পেতেন ৪০০৲ করে। তাঁর নিজের ছেলেরা কিন্তু পেতেন মাসিক ২০০৲ করে (অবশ্য এখন তা' হাজার টাকার সমান) সুতরাং বয়সে রবীন্দ্রনাথ মেজদাদার চেয়ে অনেক ছোট। সেই তাঁর মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ একবার বেড়াতে এসেছিলেন শান্তিনিকেতনে আমার অবস্থানকালে। আগেই বলেছি অনুমান ১৯১৫-১৬ সালে সাহিত্য সভায় ছেলেরা তাঁকে ধরে বসল কিছু একটা আবৃত্তি করতে। তিনি রবীন্দ্রনাথের 'বন্দীবীর' কবিতাটি নাটকোচিত ভঙ্গিতে সুস্পষ্টভাবে আবৃত্তি করে সকলকে মুগ্ধ করেন। একবারও prompt করার দরকার হয়নি এমন স্মরণ শক্তি। পরদিন এক ট্রেনেই দুই অসম বয়সী ভাই কলকাতা, ফিরলেন। আশ্চর্য, রবীন্দ্রনাথ ফার্ষ্ট ক্লাসে কিন্তু মেজদাদা জজসাহেব সত্যেন্দ্রনাথ সেকেণ্ড ক্লাসে। তখন দৃষ্টা দৃষ্টি-কটু ঠেকে ছিল। এখন বুঝতে পারি কোনো বিষয়ে বিখ্যাত হ'লে কিছু পরিমাণে নিজেকে লোক-লোচনের অন্তরাল করতে হয়। নইলে জনসাধারণের গায়ে পড়া আলাপ

ও কৌতূহলী দৃষ্টি থেকে আত্মরক্ষা করা যায় না। এই প্রসঙ্গে আমার একটা গল্প মনে পড়ল। (৺তারক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বাংলা এম. এ. ক্লাসের ছাত্রদের বলেছিলেন) নোবেল প্রাইজ পাবার পর কুষ্টিয়া থেকে আসছেন রবীন্দ্রনাথ কলকাতায়—অবশ্য ফার্স্ট ক্লাসে। ট্রেনে দারুণ ভীড়। একটা জংসন থেকে গাড়ী ছাড়বার শেষ মুহূর্তে হুড়মুড় করে উঠে পড়ে একদল গ্রামের লোক তাঁর কামরায়। তারা যে ভুল করেছে তাতে তারা বেশ লজ্জিত। একজন বললে, আপনি সমস্ত বেঞ্চিখানা একলা দখল করে কাৎ হয়ে রয়েছেন কেন? সোজা হ'য়ে বসুন। আমরাও বসতে চাই।

রবীন্দ্রনাথ সন্ত্রস্ত হ'য়ে উঠ্‌লেন কিন্তু কিছু বল্‌লেন না। তাদের মধ্যে একজন যুবক তাঁর ঋষি প্রতিম আকৃতি দেখে বললে, ওকে অমন কথা বলছ কেন? ভদ্রলোক কত দূর থেকে আসছেন। মশায় মাপ করবেন। আপনি কি অসুস্থ?

রবীন্দ্রনাথ সে কথার জবাব দিলেন না। শুধালেন, 'তোমরা কোথা থেকে আস্‌ছ, যাচ্ছই বা কোথায়?—'গ্রাম থেকে। যাচ্ছি কলকাতায়।'—'কারণ টা কী?'—'রবি ঠাকুরকে দেখ্‌তে। শুনেছি নাকি তিনি বিলেতের 'নভেল' প্রাইজ পেয়েছেন। আমরা যুক্তি করে এলাম 'যাই কলকাতায় তাঁকে একবার দেখে নয়ন সার্থক করি।' কবি—'তোমরা কি তাঁকে এর আগে কখনো দেখনি?'—'না আমরা গ্রামের লোক। বারোয়ারীতলায় শিরোমণিমশায় খবরের কাগজ পড়ে শোনালেন অমনি আমরা দল বেঁধে বেরিয়ে পড়লাম।'

রবীন্দ্রনাথ (মনে মনে হেসে)—'বেশ করেছ। কিন্তু তোমরা কি রেলগাড়ীতে এর আগে চড়নি?' '—চড়েছি কালেভদ্রে।' কবি খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বল্‌লেন, 'তোমরা এ গাড়ীতে এত লোক চড়াও হ'লে কেন?—এইটেই যে ফাঁকা পেলায়। গাড়ীতে আজ দারুণ ভীড়—তিল ধারণের জায়গা নেই।' কবি শুধালেন 'এত ভীড় কেন হে?'—যুবকটি বল্‌লে—'অধিকাংশের'ঐ মতলব রবিঠাকুরকে একবার দেখ্‌তে হবে। আপনি কি তাঁকে দেখেছেন বুড়ো কর্তা?'

রবীন্দ্রনাথ এ প্রশ্নের উত্তর দিতে যাবেন এমন সময় ট্রেণ একটা ষ্টেশনে ভিড়ল। এবং টিকিট চেকার সহসা ঢুকে তাদের সকলকেই কামরা থেকে নামিয়ে দিলে। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য বিশেষজ্ঞ। অর্থাৎ সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর চাইতে কেউ জানে না, বল্‌তে পারে না। সুতরাং তখনকার কালের বাংলা সাহিত্যিকদের প্রতি তাঁর উদাসীন দৃষ্টি ছিল। বরং বৈজ্ঞানিকদের তিনি সমাদর করতেন। তাঁর বন্ধু জগদীশচন্দ্র, শিষ্য শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহালানবিশ, শান্তিনিকেতন সর্বাধ্যক্ষ জগদানন্দ রায় সবাই বৈজ্ঞানিক। 'পরশুরাম'কে প্রশংসা করেছেন। কিন্তু তিনি বৈজ্ঞানিক বলেই তা সম্ভব হয়েছে। অবশ্য অভিমতের দাবী নিয়ে কেউ এলে তিনি তাকে নিরাশ করতেন না। কিন্তু ক্লাসিক সাহিত্যের অমর্যাদা করলে তিনি সইতে পারতেন না। স্বর্গীয় রাধাচরণ চক্রবর্তী তাঁকে একবার একরূপি স্বরচিত মেঘদূতের বাংলা অনুবাদ পাঠিয়েছিলেন। সুন্দর, সুচিত্রিত, সুশোভন সংস্করণ। এক পিঠে মূল লেখা ও অনুবাদ, আর এক পিঠ খালি। তিনি সেই লেখাপাতার কয়েকখানি কাপি দিয়ে এড়োএড়ি কেটে খালি পাতায় স্বরচিত অনুবাদ করেছিলেন। বইখানি আমি দেখেছি কবিকে উপহৃত পুস্তক স্তূপের মধ্যে। এখন শান্তিনিকেতন লাইব্রেরীতে আছে কিনা জানি না। একদিন গিয়েছিলাম কবি সন্নিধানে শরৎচন্দ্রের 'পণ্ডিত মশাই' হাতে করে। দু'এক কথার পর জিজ্ঞাসা করলাম শাস্ত্রা ও সীতা দেবীর লেখা আপনার কেমন লাগে? কবি হেসে

বললেন, 'বোধ হয় ভাল। আমি ওদের ভালবাসি রে তাই ওদের লেখা আর পড়িনে।' ও তাঁর ছিল একটা বলবার ধরণ! সেকালে 'প্রবাসীতে' সংযুক্তা দেবীর নামে তাঁদের যুগ্ম রচনা আমরা মুগ্ধভাবে পড়তাম। হাতে বই দেখে শুধালেন 'ওখানা কার বই?'—শরৎচন্দ্রের। কবি—রেখে যা' বইখানা পড়ে দেখব! দু'দিন পরে আসিস, নিয়ে যাবি।

দু'তিন দিন পরে সকালে গিয়ে দেখি তিনি লেখায় ব্যস্ত। ফিরে আসব ভাবছিলাম। তিনি দেখতে পেয়ে কলম রেখে বললেন, 'আহা, তোর বইখানা পড়ে দেখলাম বেশ লিখেছে। লোকটা লিখতে জানে। আর চারু (৺চারু বন্দ্যোপাধ্যায়) প্লট দিন, প্লট দিন বলে আমায় ব্যস্ত করে। আরে লিখতে জানলে কি প্লটের অভাব হয়?'

—আপনি কি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের আর কোনো বই পড়েন নি?

—'পড়ব কখন? সময় কই? নিজের কাজেই সময় পাইনে। আর শরীরও অসুস্থ।' কিন্তু অভিমতের দাবী তিনি অগ্রাহ্য করতেন না। তা' তিনি যিনিই হোন না কেন। শ্রীঅমলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কবিকে তাঁর বইগুলো দিয়ে আবেদন জানিয়েছিলেন অভিমত জানাতে। তাঁর সম্বন্ধে তিনি ভালই লিখেছিলেন প্রথম বার লেখক তাতে সন্তুষ্ট না হ'য়ে আরো ভালো করে বলবার জন্য লিখেছিলেন। এবার সেই যে আমাদের রূপ-কথায় আছে সুখু বলে মেয়েটি লক্ষ্মীর ঘরে পুকুরে একবার দুধ দিয়ে গা ভরা গয়না পেয়েছিল, আর অমন রূপসী হয়েছিল, কিন্তু তা'তে খুশী না হয়ে দ্বিতীয়বার দুধ দেয় আর তার দেহ কদাকার হ'য়ে আঁচিলে ছেয়ে যায় গয়না গাঁটিও হারায়; অতিলোভের দরুণ তাঁরও সেই দশা হয়েছিল। কী কতকগুলো খারাপ কথা ছিল নাকি বইটার মধ্যে। কবি রেগে অগ্নিশর্মা হয়েছিলেন আর দ্বিতীয়বারের লেখায় তা' প্রকাশ করেছিলেন। অমলবাবু প্রথম প্রশংসাটাই বিজ্ঞাপন হিসাবে ব্যবহার করতেন। সরস্বতীর কমল সরোবরে তিনি জল কেলির পক্ষপাতী ছিলেন না। সাপ খেলাতে হ'লে নিপুণ সাপুড়ে হওয়া চাই—যাতে সাপ কামড়াতে না পারে।

আমার একখানি উপন্যাস রেজিষ্টি ডাকযোগে কলকাতা থেকে পাঠাই। প্রাপ্তি স্বীকারোক্তি পর্যন্ত পাইনি। হয়ত তাঁর আদর্শ ৺সতীশচন্দ্রের সঙ্গে বর্ত্তমান সতীশচন্দ্রের মনোভাবের তফাৎ দেখে তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে নীরব ছিলেন। কিংবা নিজে শান্তিনিকেতনে গিয়ে তাঁকে নিবেদন করিনি সে অঙ্গে হ'তে পারে। কিংবা তাঁর হাতে বইটা পৌঁছয়নি। শেষ জীবনে তিনি আর নিজের প্রভু নিজে ছিলেন না।

জনগণের সঙ্গে সংযোগ এও কবির সাধনা, তাই গল্পটির উল্লেখ করলাম। তিনি ত আর মুনি ঋষির মত লোকালয় থেকে বিযুক্ত নন। সাধনা কথাটি যে অর্থে ব্যবহৃত হয় কবির সাধনা তা' থেকে পৃথক, বলা বাহুল্য। শিল্প, সঙ্গীত দিয়ে তিনি সেই লীলাময়ের সঙ্গে যোগ যুক্ত হ'তে চান। শ্রীমদ্ভাগবতে নারায়ণ বলেছেন 'নাহংতিষ্ঠামি নারদ···বৈকুণ্ঠে কি যোগীর হৃদয়ে নহে মোর অবস্থান সেথা থাকি সদানন্দে যেথা ভক্ত করে মোর গান।' গান ছিল রবীন্দ্রনাথের প্রাণের নিঃশ্বাস। একথা তিনি বহু কবিতা ও গানে ব্যক্ত করেছেন। তাঁকে বলতে শুনেছি, কালে হয়ত আমার সমস্ত সাহিত্য-সৃষ্টি লয় প্রাপ্ত হবে কিন্তু গান বেঁচে থাকবে চিরদিন। যাক্ গল্প বলি।

১৯২৫-২৬ সাল। স্বদেশী আন্দোলনে উত্তেজনা জেগেছে দেশে। আলিয়নবাগের ঘটনার পর Knight hood পরিত্যাগ করেছেন। কবি রচনা করেছেন "দেশ দেশ নন্দিত করি মন্দ্রিত তব ভেরী

গানটা। ঠিক হল কবি তাঁর 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' প্রবন্ধটা পড়বেন রামমোহন লাইব্রেরী হলে, সঙ্গে হবে ঐ গানটা। প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন শচীন্দ্রনাথ মিত্র, (কুমুদিনী মিত্রের স্বামী ; কৃষ্ণকুমারীমিত্রের জামাই) প্রথমে স্বদেশী আন্দোলনে (১৯০৫) সুরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের জেলে সঙ্গী সন্তোষনাথ দত্ত, অজিত কুমার চক্রবর্তী, শ্রীপ্রকাশ চন্দ্র মজুমদারপ্রিন্স, শ্রীঅমলাহোম প্রমুখ তদানীন্তন তরুণ ভক্তমণ্ডলীও সঙ্গে ছিলেন। প্রবন্ধটি হ'ল রামমোহন লাইব্রেরী হ'লে। হলটা ছোট। আর অত যে জন সমাগম হবে তাবাই যায়নি। নির্দ্ধারিত সময়ের অনেক আগে থেকেই হ'লটা ভরে গেল উৎসুক জনতায়। তিল ধারণের জায়গা নেই। কবি নিজেই এসে সভার হলে ঢুকতে পারলেননা। অতিকষ্টে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হল। যে উত্তেজনার সৃষ্টি হল তাতে তিনি অভিভূত হয়ে পড়লেন। ভীড়ের চাপে শ্বাস প্রশ্বাসের অসুবিধায় তিনি মুর্চ্ছিত হয়ে পড়েন আর কি! যাক্ ভালোয় ভালোয় শেষ পর্যন্ত অনুষ্ঠানটি হল। গানটি হ'ল অপূর্ব। পরের অধিবেশন কোথায় হবে? ঠিক হল এলবার্ট হলকে। এবার আর দ্বার-সংকুলানের প্রশ্ন নেই—বিরাট অডিটোরিয়াম। জোড়াসাঁকোর কবিভবন বিচিত্রা হলে কবি গানটার তালিম দেবেন। বিকালে সকলে জমায়েত—কবি আর আসেন না। সমবেত সকলে উসখুস করতে লাগল। তবে কি সন্ধ্যার পর এলবার্ট হলে অনুষ্ঠানটি হবে না? এমন সময়ে কবি মোটরে করে ফিরলেন। কোথায় যেন বাইরে গিয়েছিলেন, বোধ হয় নিমন্ত্রণ ছিল কারো বাড়ীতে। কারণ বিচিত্রা হলে ঢুকলেন একমালা ফুলের মালা গলায় দিয়ে। আর সেই মালার গোছা দিলেন অাঁকসির হাতে বললেন নাও অাঁকসি! (ভালোনাম অরুন্ধতী, ডাঃ নীলরতন সরকারের এক কন্যা তখন অবিবাহিতা পরে প্রাক্তন কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়ের স্ত্রী খুব ভালো' গাইয়ে ছিলেন সেকালে এবং রবীন্দ্রনাথ সঙ্গীতজ্ঞার সমাদর করতেন) খুব খুশী হলেন তিনি। কিন্তু সমবয়সী অন্যান্য মেয়েরা এ পক্ষপাতিত্ব বরদাস্ত করতে পারলে না—হিংসেয় জ্বলে পুড়ে মরতে লাগল। অমিতা আর সামলাতে পারল না, বলল 'যাঃ ও একলা কেন? বহুলোকের মেয়ে বলে?' রবীন্দ্রনাথ হেসে বললেন, 'কবিকণ্ঠের মালা' 'পূরস্কার' কবিতায় কে পেয়েছিল মনে নেই?' সুলেখা বললে, 'আমিও ত তাতে অরাজি ছিলাম না!' কবি বললেন, 'না বাপু! তোদের সঙ্গে ঝগড়া করতে আমি আর পারিনে। সে'ত অাঁকসি দু'জনকে দু'ছড়া মালা' অাঁকসি নারাজ। আমরাই বা কি অপরাধ করেছি একটা মিলিত কণ্ঠের চাপা কলরব উঠল কবি-কণ্ঠের মালার লোভে। সকলেই এক এক ছড়া মালা প্রায় কেড়ে নিলে অাঁকসির কাছ থেকে। অাঁকসিকে মুখ কালো করে একগাছি নিয়েই খুশী থাকতে হল। রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'দুঃখ করিসনি অাঁকসি ওরা কেড়ে নিয়েছে আর আমি তোকে দিয়েছি কোনটার দাম বেশী হল?' অাঁকসি জলভরা চোখে বললে, 'আপনি ত ওদের দিতে বললেন।

কবি হেসে বললেন, 'দিতে বলেছি তাতে আর কি হয়েছে? আমার কবিতায় পড়েছিস তঁ? চাওয়ার চেয়ে একের পরেই আমার অভিরুচি! আমি হিন্দু!' এমন সুন্দর রসিকতাটি অল্প লোকেই উপভোগ করতে পারলে। কারণ তখনি গান আরম্ভ হল 'মেল দেশ নন্দিত কবি' মন্ত্রিত তব ভেরী!" যেন রণ ডঙ্কা বাজতে লাগল কর্ণপটাহ বিদীর্ণকারী। বিচিত্রা হল ভাবাবেগে প্রকম্পিত হতে লাগল ঘন ঘন। তালের কাছটায় কবি সাধনের জলচৌকীটার উপর প্রবল মুষ্টাঘাত করতে লাগলেন। খানিক পরে পরিশ্রান্ত হ'য়ে বললেন, একটা পাখোয়াজ থাকলে ভাল হোত।

পাখোয়াজ ত কেউ বাজাতে জানে না। কবি মনে মনে জিজ্ঞাসা করেন। সকলেই ঘাড় নাড়ে। জানলেও স্বীকার করে না। জানে যে ঠিক মত তাল না পড়লে কবি বিষম বিরক্ত হবেন।

এমন সময়ে নিচে মোটরের হর্ণের শব্দ হল। বারান্দার রেলিংকুকে দেখে একজন এসে বলল 'নাটোরের মহারাজ এলেন।' ঠাকুর-বাড়ীর গলির রাস্তা। সেদিন মোটরে মোটরে ছয়লাপ! তবু নাটোরের রাজগাড়ীটার বৈশিষ্ট ছিল। ইতিমধ্যে এই গণ্ডগোলের ভীড়ে কখন যে তিনি দোতলায় উঠে এসেছেন বুঝতে পারা যায়নি। সভাগৃহে উকিমারতেই রবীন্দ্রনাথ তাঁকে দেখে বললেন, 'আসুন মহারাজা, আসুন। আপনি যখন এসে গিয়েছেন তখন আর ভাবনা নেই, জগদীন্দ্রনাথ প্রণামান্তে শুধালেন, কি ব্যাপার?'

রবীন্দ্রনাথ—'বসুন আগে। আপনি বহু আকাঙ্খিত বর্ষার নবীন মেঘ!' জগদীন্দ্রনাথ বিস্মিত হয়ে —'কিরকম। আমার চেহারা দেখে কি আপনার উপমাটা মনে এল?' কবি—'পাখোয়াজের মেঘমন্দ্রস্বর আপনার হাতে যেমন খুলবে এমন ত কেউ পারবে না!' নাটোরের মহারাজ জগদীন্দ্রনাথ একজন বিখ্যাত পাখোয়াজ বাজিয়ে ছিলেন। সেকালে তাঁর সমকক্ষ কেউছিলনা। রবীন্দ্রনাথ বললেন,—'রথী (কবিপুত্র) পাখোয়াজটা বের করে আনবার ব্যবস্থা কর শীঘ্রির।' রথীন্দ্রনাথ তৎপর হলেন।

জগদীন্দ্র (বিনীতভাবে) 'প্রথমেই প্রশংসা করে মাথা ঘুলিয়ে দেবেন না।' রবীন্দ্রনাথ—'দেখুন মহারাজ পারুন আর না পারুন তালের কাছটায় একটা ঘষাস্ করে আওয়াজ করবেন!' পাখোয়াজী জগদীন্দ্রনাথকে এরপর আর বলতে হয়না! শিক্ষিত হাতের সুকৌশল তাড়নে পাখোয়াজের মেঘগম্ভীর মন্দ্র সঙ্গীত সুরের ভৈরবগর্জ্জনের সঙ্গে সমানে তাল দিয়ে চলল। সেদিন সন্ধ্যায় এলফ্রেড রঙ্গমঞ্চ জন সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গের উপর পাখোয়াজের মেঘগর্জ্জন ভৈরব সংগীতটিতে তালদিয়েছিল অব্যাহত ভাবে। হলটি যদিও বেশ বড় ছিল তবু টিকিট করা সত্বেও যাদ রোধকারী জনতা হয়েছিল। শেষের গানটী হয় 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলরে!' শ্রীসুরেন কুমার গুপ্তের কাছে শোনা, কবি-জামাতা নগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী খোল বাজিয়েছিলেন। তিনি ভাল খোল বাজাতে পারতেন। আমাকে তিনি একবার দুঃখ করে বলেছিলেন, 'আমার আশ্রমে এতদিন থাকলি গান শিখ্লিনি রে।' কথাটা যথার্থ। 'সঙ্গীতাৎবিদ্যা পরতরংনহি'—গানের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বিদ্যা আর নেই। রবীন্দ্র সাধনাছিল লীলার পবিত্র সঙ্গীতে সরল; জীবনটা ছিল আনন্দময়ের পূজার উৎসব সভা।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন মজলিশী লোক। তাঁর সাধনা ছিল 'প্রেম সাধনার হোম হুতাশন জ্বালা লোকের অন্তরে। তাঁর নোবেল প্রাইজ পাবার পর বিরাট একদল ভক্ত (চারুবন্দ্যো, অমল হোম, প্রশান্ত মহালনবিশ, সত্যেন বসু প্রমুখ ভক্ত মণ্ডলী) কলকাতা থেকে স্পেশাল ট্রেণ যোগে শান্তিনিকেতনে সমবেত হন তাঁকে অভিনন্দন জানাবার জন্য। বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্র বসু ছিলেন সভাপতি। আম্রকুঞ্জে তাঁদের অভ্যর্থনা করবার জন্য উৎসব সভা সাজানো হয়। কবি সেখানে তাঁর বিখ্যাত গানটী করেন, 'এমনি হার আমার নাহি সাজে এরে পরতে গেলে বাজে, এরে ছিঁড়তে গেলে বাজে!' অভিনন্দনের উত্তরে তিনি যে কথাগুলি বলেন তা' কোনো ছাপানো বইতে আছে কিনা আমার জানা নেই, কিন্তু আমার মনের পটে কথাগুলির ছবি আছে। আমি তখন সেখানে পড়ি বয়স ১৩ কি ১৪। সে প্রসঙ্গ উত্থাপন করলাম এই জন্যে যে কবির সাধনা যে কি বস্তু তা' সুন্দরভাবে বলা হয়েছে। "সম্মান সেত মৃতের জন্যে, কবির জন্যে চাই প্রীতি প্রফুল্ল সূর্যালোক। মরুভূমির মেষপালকের মত আকাশের তারাগুণে আমার যৌবনকাল কেটে গিয়েছে—সেখানকার বন্ধুসভা আমার দোষগুণের বিচারও করেনি আমাকে পুরস্কারও দেয়নি। আপনারা যে সম্মানের সুরাপাত্র আমার মুখের কাছে ধরেছেন তা' আমি ওষ্ঠাধারে স্পর্শ করেছি কিন্তু পান করতে পারিনি। এতে জনমত বিক্ষুব্ধ হয়; বুঝি বা তাঁদের অভিনন্দন অগ্রাহ্য

হল। জনমতকে এ কথা শুনে অভিমান করে অত্যন্ত অবস্থাতেই শান্তি-নিকেতন থেকে কলকাতা ফিরে আসেন। কিন্তু তার বলবার কথা, তিনি বলেছেন। কবির সাধনা ভালবাসা পাবার জন্য। খুব দেশী সেই রাখাল বালক যে বটের ছায়াতলে বসে বাঁশী বাজায় সে যা চেয়েছিল তাই 'সে শুধু কর আর কিছু নয় তোমার গলার মালাখানি।'

রবীন্দ্র সাধনায় আকৃষ্ট হয়ে সাগর পারের কত বিদেশী বিদেশীনী যে শান্তিনিকেতনের কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন তার আর ইয়ত্তা নেই। এণ্ড্রুজ, পিয়ার্সনও ছিলেন দীর্ঘকাল। ক্যাপ্টেন পেটাভেল সস্ত্রীক এসেছিলেন ১৯১৮ সালে। ফ্রান্সথেকে সিলভাঁসেভী, উইন্টার নিল, বাকে, গারমাহুস, কত নাম করব। গ্রামবাসীর উন্নয়নের কাজে এল. কে. এলম্‌হার্ষ্ট এসেছিলেন। মিলগ্রীণও ছিলেন বেশ কিছুদিন। জাপানী মুকুংমুরিদ সিয়েরেন বুদ্ধো তাকায়ে ছিলেন দু'বছর ছেলেমেয়েদের যুকুংসু শেখাতেন। বাসা ঘারা বানো প্রভৃতিও ছিলেন শান্তিনিকেতন 'ভবতোক বিশ্বনীড়ম্' মহামানবের সাগর তীরে আর সেই সাগর "রবীন্দ্র-সাধনা।"

রাজকীয় সৈন্যদলের হাত থেকে বাঁচবার জন্য গ্যারিবল্ডী আশ্রয় নিলেন এক চাষার বাড়ীতে।

—কে গো তুমি ?—দেখে মনে হচ্ছে সারা দিন কিছু পেটে পড়ে নি তোমার।—জিজ্ঞাসা করলেন চাষী-গৃহিনী।

—খাওয়ার চেয়েও বড় জিনিষ আছে,—মৃদু হেসে বললেন গ্যারিবল্ডী।

সেটা কি বাছাধন ? প্রশ্ন করলেন গৃহকর্ত্রী।

—অনেকটা অনুমান করেছেন ম্যাডাম্, স্বাধীনতা—মাকে লাভ করাই হোল আমার জীবনের বড় সাধ।

—সে মাছটার নাম ত কখনো শুনিনি, সমুদ্রের মাছ বুঝি ?

—ঠিক বুঝেছেন ম্যাডাম্—একটা জাতির জীবন সমুদ্রের সেটাই একমাত্র আকাঙ্ক্ষিত মাছ।

—যা বাবু,—তুমি দেখছি পাগল, আবল-তাবল বকছ—সরে পড় এখান থেকে নইলে ! গ্যারিবল্ডী ততক্ষনে বেরিয়ে পড়েছেন।

অথ মেছুনী-পর্বম্

(ভাস্কর—বিরচিতম্)

শ্রীজ্যোতির্ময় ঘোষ ("ভাস্কর")

প্রাতঃকাল। ঘুম ভাঙিয়াও ভাল করিয়া ভাঙিতেছেনা। গৃহিনী সহসা আবির্ভূত হইলেন। পরিধানে শুভ্র কালপেড়ে সাদা ধুতি। কপালে একটি রক্ত বর্ণের টিপ। কপালের উপরিভাগে সীঁথি। তাহাতেও লম্বা এবং মোটা রক্তবর্ণের দাগ। দেখিয়াই চমকিত হইলাম। এ যে সিন্দুর বিন্দুবিধবা ললাটে! একি! স্ত্রী কহিলেন, জান না? আমি যে কাল বৈকাল হতে বিধবা হয়েছি! স্বামী বলিলেন, মানে? আমি যে এখনও বেঁচে রয়েছি, দেখতে পাচ্ছ না?

তা তো পাচ্ছি। কিন্তু কাল বিকেল থেকে মাছ পেটে পড়ে নি।

মানে, বি-মাছ হয়েছ, তাই সাদা কাপড়! আচ্ছা এখুনি যাচ্ছি বাজারে—

বাজারে গিয়ে মাছ কিন্‌বে তুমি?

হ্যাঁ গো হ্যাঁ। দেখি, আমার ডবল-কক্ নাইলনের সার্টটা—হুঁ—বাজারে গিয়ে মাছ কিন্‌তে কি লাগে—একদিন দেখেই আসি—তোমার বৈধব্য আর সহ্য হয় না!

নাঃ, তা হবে কেন? নিজে তো রোজ রোজ যত সব বাজে রেস্তোঁরা থেকে গরু, মুরগী, শূয়রের চপ কাটলেট গিলে বাড়ী এসে একেবারে অম্বলের রুগী। তোমার আর বাজারে গিয়ে কাজ নেই।

রাগে, দুঃখে, অভিমানে কাঁপিতে কাঁপিতে বাজারে গিয়া মাছের বাজারের পাশে দাঁড়াইয়া একটু মুখ উঁচু করিয়া তাকাইলাম। পাশে এক ভদ্রলোক ছিলেন, বলিলেন, কোথায় যাচ্ছেন মশায়?

কোথাও যাচ্ছি নে। ওই যে বঁটির পাশে মুড়োগুলো রয়েছে, তারই দু একটা পাওয়া যায় কিনা—

পাশের ভদ্রলোকটি তাঁহার বাঁ হাতের কনুই দিয়া ভবেশের বুকের বাঁ পাশে একটা গুঁতা দিয়া বলিলেন, বঁটির দিকে ঝুঁকলেই মুড়ো পাওয়া যাবে না। ওখানে যে কটা মুড়ো আছে, সব কটাই আমার কেনা। এ লাইন থেকে সরে অন্য লাইনে দাড়ান না মশাই!

সহযোগীর মূর্তি দেখিয়া ভবেশের আর সাহসে কুলাইল না ওই মুড়োর দিকে দৃষ্টি রাখবার।

দেখিতে দেখিতে মুড়ো, লেজা, গাদা, পেটি—একে একে সবই অন্তর্হিত হইল। বুকের বেদনা চাপিয়া ধরিয়া কোন মতে ভবেশ বাড়ী ফিরিয়াই গৃহিনীকে বলিল, যা হয় দুটো বেড়ে দাও—অফিসের বেলা হ'ল।

গৃহিনী বলিলেন, তা তো হল। কিন্তু—

সহসা গৃহিনী পায়ের দিকে চাইতেই ভবেশচন্দ্র অবাক হইয়া গেল। ও কি! মনে মনে বলিল, যেন ঠিক ঠি—ক সেই মুড়োগুলোরই দুটো চক চক করছে, আর গৃহিনী মিটি মিটি হাসিতেছেন। ঝি'টি তাড়াতাড়ি আসিয়া মাছ কুটিতে বসিয়া গেল। মা গো! কি ভিড় লেগেছে ওই মাছের মুড়োর জন্যে। মা বলছিলেন, যেমন করে কিছু মাছ না আনলে কিন্তু চলবে না। তাই, কোন মতে লাইনের একজনকে একটু ঘুষ দিয়ে এই মুড়ো দুটো এনেছি। বখ্‌শিষ চাই কিন্তু—

বখশিষের পাদা তো সেরেই এসেছো। আচ্ছা, দেখ'খন আর একটা সিকি—

নাও, মা ঠাকরুণ, বাবু আপিসে বেরিয়ে গেলে, তুমিও কাপড় ছেড়ে খেতে বসো, তোমার ও সাদা কাপড় আমারও চোখে বিঁধছে। তোমার খোকাখুকীকেও বসিয়ে দাও। আমি চট করে কিছু মুগের ডাল দিয়ে মুড়িঘন্ট করে দি।

যা ইচ্ছে কর, বেশী বেলা করো না যেন।

নাঃ। এখুনি হয়ে যাবে।

রক্তকমল

সত্যেন্দ্র নারায়ণ মজুমদার

হিমাদ্রির নিভৃত স্বপ্নের সমাধি হল নিঃশব্দ দীর্ঘশ্বাসে। তার মনে বড় আশা ছিল যে নিরুদ্দেশের যাত্রী হবার আগে শমিতার সঙ্গে একবার দেখা হবে। সে আশা অপূর্ণ রয়েই গেল।

যারা সেদিন দেশের স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র বিপ্লবের পথ বেছে নিয়েছিল তাদের অনেককেই ত' এমনি কঠিন মূল্য দিতে হয়েছে। ব্যক্তিগত জীবনের আনন্দ বেদনা, কামনা-বাসনার কণ্ঠরোধ করেই ত' তারা ঝাঁপিয়ে পড়েছে বিষ বিপদে ভরা জীবনের ধরস্রোতে। তবু ত' মানুষের মন, যা পিছনে ফেলে যায় তার জন্য ব্যথা বোধ না করে পারে না।

বারবার মনে পড়ে শমিতার সঙ্গে সেই প্রথম সাক্ষাতের দিনটির কথা। হিমাদ্রি তখন তাদের কলেজে অবিসম্বাদী নেতারূপে স্বীকৃতিলাভ করেছে। নির্বাচিত হয়েছে জেলা ছাত্র-সমিতির সভাপতি পদে। ১৯৩০ সালের সেই অগ্নিগর্ভ দিনগুলি। জাতীয় কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনে পূর্ণ স্বাধীনতার সঙ্কল্প গৃহীত হয়েছে। ছাব্বিশে জানুয়ারী দেশের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে জনসভাগুলিতে অগণিত নরনারীর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে সংগ্রামের অমোঘ শপথ। গুপ্ত বিপ্লবী সমিতীর কর্মীরাও আগুনের হোলি খেলার মাতনের উৎসাহে অধীর হয়ে উঠেছে।

ছাত্রসংগঠনের কাজে হিমাদ্রিকে জেলার নানা শহরে গ্রামে ঘুরতে হয়। এমনি ঘোরার মধ্য দিয়েই শমিতার সঙ্গে প্রথম পরিচয়। সে দুদিনের জন্য গেছে জেলা শহরের কাছেই একটি বর্ধিষ্ণু গ্রামে। বরেন্দ্র ভূমির অতীত কীর্তির অনেক নিদর্শন ছড়িয়ে আছে পথের আশেপাশে। রাজবাড়ীর সামনের সুবৃহৎ পুষ্করিনী ঘাসে দামে শুশ্রে আচ্ছন্ন হয়ে সুপ্রাচীনতার সাক্ষ্য বহন করে। সে এসেছে একজন সহপাঠি বন্ধুর অতিথি হয়ে। কিন্তু যে দুদিন ঐ গ্রামে ছিল রোজই একবেলা কারুর না কারুর বাড়ীতে খাওয়ার আমন্ত্রণ। দ্বিতীয় দিনে যে বাড়ীতে দুই বন্ধু পাশাপাশি খেতে বসেছে সেখানে পরিবেশন করে একটি কিশোরী মেয়ে। হিমাদ্রি প্রথমে তার দিকে ভাল করে চেয়েও দেখেনি। বয়স্কা বিধবা মহিলা সামনে বসে অতিথিদের খাওয়ার তদারকে ব্যস্ত। মেয়েকোমল মাতৃহৃদয়, কথার ফাঁকে ফাঁকে হিমাদ্রির বাড়ীর খবর নিচ্ছেন। আপনজন থেকে দূরে হোষ্টেলে তার না জানি কত অসুবিধা হচ্ছে ভেবে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। কথার জবাব দেওয়ার জন্য এক সময় মুখ তুলতেই হিমাদ্রির চোখ পড়ে দেওয়ালে টাঙানো কার্পেটের উপর লেখনের দিকে। কাঁচের ফ্রেমে বাঁধানো কার্পেটে উল দিয়ে বুনে লেখা হয়েছে 'যারা ডাক দিয়ে গেল, বন্দীশালায় শিকল ঝঙ্কারে।' সেদিকে হিমাদ্রির দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে দেখে মহিলা বলেন 'ওটা শমিতার লেখা। ওত তোমাদেরই দলে, স্বদেশীর ভীষণ ভক্ত।' এইবার হিমাদ্রি মেয়েটির দিকে তাকিয়ে দেখে। শমিতার দুই চোখ এতক্ষণ ওরই মুখের দিকে নিবদ্ধ ছিল, সে অপ্রস্তুত হয়ে মুখ নীচু করে। হিমাদ্রিও খানিকটা অপ্রস্তুত হয়। মহিলাটি জানান যে শমিতা তাঁর নাতনী, জেলা শহরে বালিকা বিদ্যালয়ে উপরের ক্লাসে পড়ে। কয়দিনের ছুটিতে বাড়ী এসেছে।

বিদায় নেওয়ার সময় হিমাদ্রি বৃদ্ধার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে, শমিতাকে নমস্কার করে। সে এবার সপ্রতিভ ভাবেই প্রতিনমস্কার জানায়। চলে আসার পরও বারবার হিমাদ্রির মনের পটে ভেসে

ওঠে একখানি স্নিগ্ধ সুগৌর কমনীয় মুখচ্ছবি, ঘন কালো দুই চোখে পূজারিণীর শুচি শুভ্র দৃষ্টি। ছাত্রনেতা হিসাবে সে অনেক কিশোরের হৃদয়ে বীরের আসন লাভ করেছে। কিন্তু এই কিশোরীর চোখের নীরব ভাষায় সে খুঁজে পায় বীর পূজার শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য।

আবার দেখা হল এক নাটকীয় পরিবেশে। তখন সারা দেশ জুড়ে আইন অমান্য আন্দোলনের তরঙ্গ উত্তাল হ'য়ে উঠেছে। তার অঙ্গ হিসাবে বাংলা দেশের কলেজগুলিতে ছাত্র-ধর্মঘটের জোয়ার চলেছে। তাদের কলেজে ধর্মঘট পরিচালনার দায়িত্ব হিমাদ্রির মাথার উপরে। ঐ শহরের ছাত্র ধর্মঘটই আইন অমান্য আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। কলেজের গেটগুলিতে বিরাট পুলিশ বাহিনী মোতায়েন। রোজই পিকেটিং করার অপরাধে এক এক দল স্বেচ্ছাসেবক কারাবরণ করে। কত কাজ, উত্তেজনা, আবেগ, স্বপ্ন। হিমাদ্রির মনে হয় তার এতদিনের সাধ পূর্ণ হতে চলেছে। আজ সে আর নীরব দর্শক নয়, ইতিহাসের মহারঙ্গমঞ্চে নায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। সকালে পিকেটিংয়ের ব্যবস্থা করা। বিকালে ভূবনমোহন পার্কের জনসভায় বক্তৃতা। অগ্নিবর্ষী ভাষণে হাততালির ঝড় ওঠে। রাতে সংগ্রাম পরিষদের বৈঠক। দিনগুলি কোথা দিয়ে কেটে যায় টেরও পায়না।

ততদিনে গোপন বিপ্লবী সমিতির সাথেও তার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ হয়েছে। জেলার নেতৃস্থানীয় কর্মীদের গুপ্ত বৈঠকেও ডাক পড়ে। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণ যে পথের ডাক দিয়ে গেছে আগুনের অক্ষরে, সেই পথে চলার জন্য তরুণ কর্মীরা অধীর হয়ে উঠেছে। কিন্তু মতভেদ হয় সংগ্রামের পদ্ধতি নিয়ে। কর্মীদের এক অংশের মতে আইন অমান্য আন্দোলনের মাধ্যমে দমননীতির বিরুদ্ধে জনতার বিক্ষোভ যখন চরমে উঠবে তখন তাকে সশস্ত্র বিদ্রোহের রূপ দিতে হবে। হিমাদ্রি সেই মতই সমর্থন করে। উন্মাদনায় যারা অধীর হয়ে উঠেছে তারা আর প্রতীক্ষা করতে রাজী নয়। তারা এখনই খণ্ড ছিন্নভাবে গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক কাজ সুরু করতে চায়।

মাসখানেক এমনিভাবে কেটে যাওয়ার পর সারা বাংলায় ধর্মঘটের বেগ স্তিমিত হয়ে আসে পিকেটিং করার জন্য স্বেচ্ছাসেবকের সংখ্যা কমে আসতে থাকে ক্রমশ। ছাত্রদের এক অংশের মধ্যে ধর্মঘট অনির্দিষ্টকাল চালিয়ে যাওয়ার বিরুদ্ধে মনোভাব দানা বেঁধে ওঠে। হিমাদ্রি ভাবে এরকম পরাজয় মেনে নেওয়ার চেয়ে কারাবরণ করাই ভাল। কিন্তু সমিতির নেতারা বাধা দেন। ছাত্রনেতাদের মধ্যে কেউ কেউ বুঝিয়ে বলে, তুমি জেলে গেলে ব্যক্তিগতভাবে হয়ত তোমার হার হবেনা কিন্তু সমষ্টিগতভাবে হারকে ঠেকানো যাবেনা। তার চেয়ে বরং সংগঠিতভাবে ধর্মঘট প্রত্যাহার করে নিলে হয়ত কলেজ কর্তৃপক্ষের সাথে সম্মানজনক সর্তে নিটমাট হতে পারে। সহকর্মীদের অনেকে সে প্রস্তাব মেনে নেয়। অধ্যাপকদের দুই একজন মধ্যস্থতা করতে রাজী হন।

ইতিমধ্যে ধর্মঘট আন্দোলনে ভাঁটার টান সুরু হয়েছে বুঝে কলেজ কর্তৃপক্ষ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা সুরু করেছে। হিমাদ্রি সহ কয়েকজন ছাত্রনেতাকে কলেজ থেকে বহিষ্কারের আদেশ দেওয়া হয়েছে। হিমাদ্রি বোঝে যে আর অন্তত সপ্তাহখানেক সংগঠিত ভাবে পিকেটিং চালাতে না পারলে ছাত্রদের মনোবল ভেঙে পড়বে। সংগ্রাম পরিষদের বৈঠকে আলোচনা হয় কিন্তু ওরা সমস্যার কোন সমাধান করতে পারে না।

সেই সঙ্কট মুহূর্তে পিকেটিং চালিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব নিতে এগিয়ে আসে কয়েকজন ছাত্রী। ঐশহরে তখন ও সহশিক্ষার প্রচলন হয় নি। ছাত্রীরাও এগিয়ে আসেনি সক্রিয়ভাবে আন্দোলনে

যোগ দিতে। তাই যখন তিন চারটি কিশোরী হঠাৎ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের অফিসে এসে উপস্থিত হয় তখন হিমাদ্রি প্রথমটা হতচকিত না হয়ে পারে না। মেয়েদের পক্ষেও এ একেবারে নতুন অভিজ্ঞতা। তাদের অনেক বাধাবিপত্তি, অনেক পিছুটান কাটিয়ে এগিয়ে আসতে হ'য়েছে। তারাও উত্তেজনায় প্রথমটা ভাল করে কথা বলতে পারে না। উভয় পক্ষেই নিজেদের সামলে নিতে দশেক মুহূর্ত লাগে। তারপর মেয়েদের মধ্যে একজন তাদের উদ্দেশ্যের কথা বুঝিয়ে বলে। হিমাদ্রি মুখ তুলতেই দুজনের দৃষ্টির মিলন ঘটে। হিমাদ্রি দেখে, শমিতাই এসেছে মেয়েদের নেত্রী হয়ে। এবার আর পূজারিণী নয়, এসেছে বীরনারীর বেশে।

হিমাদ্রি তাদের বসতে বলে প্রশ্ন করে, 'আপনারা কি অভিভাবকের অনুমতি নিয়ে এসেছেন?' শমিতা পাল্টা প্রশ্ন করে, ছেলেদের বেলায় কি অনুমতির কথা ওঠে? হিমাদ্রি জবাব দেয় 'কোন কোন ক্ষেত্রে ওঠে বই কি!' তারপর একটু হেসে বলে 'আপনি রাগ করছেন কেন? অন্তত আমাদের এই শহরে মেয়েরা এখনও আন্দোলনে নামেনি। তাই বুঝি নেওয়ার আগে সব জেনে নেওয়া ভাল।' আবার শমিতাও হেসে ফেলে বলে 'আমরা অনুমতি নিয়েই এসেছি। নাহলে কি আসা সম্ভব হত? তবে আমাদের দিয়ে যদি আপনাদের কাজ না থাকে সে আলাদা কথা।' হিমাদ্রি জানায় যে কাজ যথেষ্টই আছে। তাদের এক সঙ্কটের ক্ষণটিতেই এসে উপস্থিত হয়েছে ওরা।

কয়েকটি কথা, একটু হাসি। তবু দুটি তরুণ হৃদয়ের পরস্পরের কাছে আসার পক্ষে তাই যথেষ্ট। শমিতাও অনেকদিন পার্কে হিমাদ্রির বক্তৃতা মুগ্ধ হয়ে শুনেছে, দূর থেকেই দেখেছে, কাছে এসে কথা বলার আগ্রহ সত্ত্বেও সঙ্কোচ কাটিয়ে উঠতে পারে নি। তারপর ভেবেছে, আলাপ যদি কোনদিন করতে হয়, কাজের মধ্য দিয়েই তা হবে। কর্মক্ষেত্রে যোগ্যতার পরিচয় দিয়ে অধিকার করে নেবে মর্যাদার আসন। হিমাদ্রি ত' শমিতার কথা ভুলেই গিয়েছিল। মাঝে মাঝে হয়ত ক্ষণিকের জন্য সেই পূজারিণীর চোখ দুটি মনের পটে ভেসে উঠত। আজ তাকে নতুনরূপে দেখে হৃদয়ে বুঝি অনেন্দেরই দোলা লাগে।

পরের সপ্তাহখানেক দুজনের প্রায় রোজই দেখা হয়। কখনও শমিতা আসে সংগ্রাম পরিষদের অফিসে। কখনও ওরা যখন কলেজের গেটে পিকেটিং করছে তখন হিমাদ্রি সেখানে উপস্থিত হয়। দেখা হয় অনেক লোকের মধ্যে, কথা যা হয় তা নিতান্ত কাজের প্রসঙ্গে। তবু হিমাদ্রি লক্ষ্য করে যে এই সাক্ষাতে দুটি একটি কথার বিনিময়েই তার অন্তরের ভাণ্ডার যেন ভরে ওঠে। এইটুকুর জন্য মন থাকে উন্মুক্ত হয়ে। অনাত্মীয়া তরুণীর সান্নিধ্যে আসা এই তার জীবনে প্রথম। তাতে খুঁজে পায় এক অনাস্বাদিত পূর্ব মিষ্টি মধুর অনুভূতির আস্বাদ। সে লক্ষ্য করেছে যে তার সঙ্গে দেখা হতে শমিতার মুখের উপরেও সলজ্জ আনন্দের রক্তিম আভা ছড়িয়ে পড়ে। হিমাদ্রির চোখে অপরূপ হয়ে ওঠে সেই ছবিখানি। কিন্তু সচেতনভাবে সে মনের রাশ টেনে ধরে। তাদের জীবনে ত' নারীর প্রেমের স্থান নেই। বিপ্লব যে পথের মোড়ে মোড়ে প্রতীক্ষা করে রয়েছে সে পথে চলতে চলতে কি হৃদয়কে অন্যের হাতে চলে যেতে দেওয়া যায়? হয়ত তাহলে এগিয়ে যেতে হবে এক অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষার বেদনাময় স্মৃতিকে বহন করে।

যৌবনের প্রাণচঞ্চল অনুভূতি কি যুক্তির শাসন মানতে চায়? মনের আর এক অংশ বিদ্রোহ করে, বলে 'হোকনা বেদনাময়, তবুও সে মধুর স্মৃতি। যাত্রাপথের দুস্তর চড়াই উৎরাই পার হওয়ার সময় হয়ত সে স্মৃতি একটুখানি স্নিগ্ধতার পরশ বোলাবে।'

অনভিজ্ঞ তরুণ হৃদয়। তখনও জানেনা যে, যে জীবন ওরা বেছে নিয়েছে তাতে বেদনার পেয়ালাই শুধু বার বার কাণায় কাণায় ভরে উঠবে। শমিতার সাথে পরিচয় অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠার আগেই কলেজের বর্মঘট প্রত্যাহৃত হয়ে যায়। হিমাদ্রিকে চলে আসতে হয় ঐ শহর ছেড়ে মহানগরীর বুকে।

যে অধ্যাপকেরা মধ্যস্থতা করছিলেন তাঁরা খবর নিয়ে আসেন যে কলেজের ইংরাজ অধ্যক্ষ মিটমাট করতে রাজী আছেন। বর্মঘট প্রত্যাহৃত হলে অন্য ছাত্রদের বিরুদ্ধে কোনরূপ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবেনা। হিমাদ্রিরা কয়েকজন যদি অন্য কলেজে ট্রান্সফার সার্টিফিকেট নিয়ে যায় তাতে কোন বাধা সৃষ্টি করা হবে না। এই কলেজে থাকতে হলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শৃঙ্খলারক্ষার জন্য একটা মৌখিক প্রতিশ্রুতি দিতে হবে। হিমাদ্রিরা কোন প্রতিশ্রুতি দিতে রাজী নয়, তবে তারা বর্মঘট প্রত্যাহারের পথে বাধা সৃষ্টি করতে চায়না। তাই ঠিক হয় যে অন্য কলেজে ট্রান্সফারের জন্যই অনুরোধ জানাবে।

গুপ্ত সমিতির নেতারাও হিমাদ্রিকে কলকাতায় যেতে পরামর্শ দেন। তারা বলেন যে উগ্রপন্থীরা হয়ত শীগগিরই কোন অ্যাকশন করে বসবে এবং গভর্ণমেণ্ট নেবে তার পূর্ণ সুযোগ। নির্বিচারে ধরপাকড় সুরু হয়ে যাবে। হিমাদ্রির উপর পুলিশের যে রকম বিদৃষ্টি তাতে তাকে নিস্তার দেবেনা। এই অবস্থায় তার পক্ষে অন্যত্র যেয়ে কাজ করাই তাঁরা সমীচীন মনে করেন।

হিমাদ্রি নেতাদের নির্দেশ মেনে নেয়। বিগত কয়েক বছরের প্রিয় পরিচিত কর্মক্ষেত্র ছেড়ে যেতে বেদনাবোধ হলেও উপায় নেই। সমিতির নির্দেশ অমোঘ। সৈনিকের মত শৃঙ্খলা মেনে চলার শপথ নিয়েই ত সে সমিতির সভ্য হয়েছে। পিছনে পড়ে থাকবে পদ্মার উদ্দাম জলরাশি, কলেজের ছায়াঢাকা বিস্তৃত প্রাঙ্গণ, নিউ হোষ্টেলের সেই একান্ত আপনার পরিবেশ। পিছনে ফেলে যেতে হবে কত প্রিয় সঙ্গীকে, কত চেনা মুখ, কত প্রিয় স্মৃতি।

যাত্রার দিন ঘনিয়ে আসে বন্ধুবান্ধব সহকর্মী, পরিচিত জন, অধ্যাপক, সবার কাছে বিদায় নেওয়ার পর্ব শেষ হয়ে গেছে। দেখা হলনা শুধু শমিতার সঙ্গে। তাকে কয়েকদিনের জন্য গ্রামের বাড়ীতে চলে যেতে হয়েছে। বিষন্ন ভারাক্রান্ত মন নিয়েই তাকে জীবনের নতুন অধ্যায়ের দিকে পা বাড়াতে হয়। হৃদয়ের অনেকখানি যেন শূন্য হয়ে থাকে।

কলকাতায় আসার পর হিমাদ্রির উপর সমিতির নির্দেশ আসে যে তাকে প্রকাশ্য আন্দোলন থেকে সরে এসে ক্রমশ গোপন কাজের দায়িত্ব নিতে হবে। প্রকাশ্যে সে এখন কিছুদিন ভাল ছেলে হয়ে পড়াশুনায় মন দিক। বি. এ. পরীক্ষা সামনে এসে গেছে। সুতরাং পরীক্ষার প্রস্তুতিতে সম্পূর্ণভাবে মনোনিবেশ করাটা কারুরই চোখে অস্বাভাবিক মনে হবে না।

হিমাদ্রিদের সমিতি থেকে তখনও কোন বৈপ্লবিক কার্যকলাপ সুরু হয়নি। সেজন্য কর্মীদের মধ্যে দারুণ অসন্তোষ। এদিকে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট বলপ্রয়োগ ছেড়ে দমননীতির সন্ত্রাস প্রবর্তন করেছে রাজপথে আইন অমান্যের ছোটখাটো ঘটনাকে উপলক্ষ্য করে জনতার উপর পুলিশ বে-পরোয়া লাঠিচালনা করে। অন্য বিপ্লবী দলগুলি সে অত্যাচারের প্রতিশোধ নেয় উচ্চপদস্থ ইংরাজ কর্মচারীদের বিরুদ্ধে আক্রমণ করে।

দমননীতির তীব্রতা বেড়ে ওঠে। যে কোনদিন সকালে উঠে দেখা যায় যে মহানগরীর বিভিন্ন অংশে হয়ত কোন মেস, বোর্ডিং, ছাত্রাবাস লাল-পাগড়ীতে ঘিরে রেখেছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা

ঘরে খানাতল্লাসী চলে। তারপর কোন যুবককে রাজ-অতিথি রূপে বাইরের জগতের কাছে বিদায় নিয়ে যেতে হয়। প্রত্যেক বছর বড়দিনের সময় সম্রাটের প্রতিনিধি ভাইসরয় কলকাতায় পদার্পণ করতেন। তার সপ্তাহখানেক আগে থেকে পুলিশ যেন জাল ফেলে ছাত্রাবাস এবং বিপ্লবীদের আড্ডা বলে সন্দেহভাজন স্থানগুলিকে ছেঁকে নিত।

কংগ্রেস এবং ছাত্র সমিতি বে-আইনী ঘোষিত হয়েছে। তাদেরও কাজ করতে হচ্ছে অনেকটা গুপ্ত সমিতির ধরণে। আইন অমান্যের অভিব্যক্তি প্রকাশ্যে হলেও প্রস্তুতি চলে গোপনে। জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রগুলির কণ্ঠরুদ্ধ।

হিমাদ্রির মনে শান্ত জীবন যাপনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ জমে ওঠে। অন্তরঙ্গ সহকর্মীদের সাথে বসাবলি করে যে পুলিশের খাতায় ত নাম উঠেই আছে। কবে পরোয়ানা এসে যাবে তার ঠিক নেই। কিন্তু কিছু না করেই কি ধরা পড়ে যাবে? না, তা হতে দেবে না। ইতিহাসের পাতায় চিহ্ন রেখে যাওয়ার কিছু মত কিছু তাদের করতেই হবে।

কয়েক মাস কেটে গেছে। মাঝে মাঝে বড় ইচ্ছা হয় একবার পদ্মার তীরের সেই শহরে ফিরে যায় কয়েক দিনের জন্য। শমিতার সাথে দেখা করে আসবে। কিন্তু সমিতির নির্দেশ ছাড়া এক পা নড়বার উপায় নেই। মনের বাসনাকে মনেই চেপে রাখতে হয়। তারপর কখন তা অতলে তলিয়ে যায় নিজেই টের পায় না। সমিতির ভারপ্রাপ্ত নেতা খবর পাঠিয়েছেন যে শীগগিরই তারা গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ পাবে। তাদের একজন উচ্চতম নেতা অসুস্থতার জন্য বন্দী শিবির থেকে মুক্তিলাভ করে এসেছেন। তাঁর মারফতে বন্দী নেতারা কর্মের নির্দেশ পাঠিয়েছেন। এবার তাদের সমিতির পক্ষ থেকে সক্রিয় কর্মপন্থা গ্রহণ করা হবে।

নেতার সাথে বহু প্রতীক্ষিত সাক্ষাৎ হ'তে বেশ কিছুদিন সময় অতিবাহিত হয়ে যায়। তিনি চিকিৎসার জন্য কলকাতায় আসার পরও কেটে যায় কয়েক সপ্তাহ। 'কেদারদা' অসুস্থ বলে গভর্ণমেণ্ট মুক্তি দিলেও তাঁর গতিবিধির উপর গোয়েন্দা পুলিশ কড়া নজর রেখেছে। বাসার সামনে চব্বিশ ঘণ্টাই সাদা পোশাকে গুপ্তচরের পাহারা। দেখা করতে হবে তাদের ধরাছুঁই এড়িয়ে।

কেদারদার সাথে দেখা হওয়ার উত্তেজনাপূর্ণ যে সারিবাধে অ্যাডভেঞ্চারের উত্তেজনা, দেখা হওয়ার পর তা অনেকগুণে বেড়ে যায়। তিনি বলেন যে রকসাহুর্গের বন্দীশিবিরে বসে সমিতির উচ্চনেতারা সক্রিয় কর্মপন্থা গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন। যারা এতদিন নেতাদের নিষ্ক্রিয়তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে উদ্যত হয়েছিল তাদের সাথেও একটা বোঝাপড়া হয়ে গেছে। কি করা হবে তার বিস্তৃত বিবরণ কেদারদা না দিলেও বোঝা যায় যে সমিতির যেখানে যেটুকু শক্তি আছে তাকে সংহত করে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে বড় রকমের আঘাত হানা হবে।

ততদিনে গান্ধী-আরউইন চুক্তির ফলে সত্যাগ্রহ আন্দোলন প্রত্যাহৃত হয়েছে। কংগ্রেস ও ছাত্র সমিতির উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয় গভর্ণমেণ্ট। সত্যাগ্রহী বন্দীরা দলে দলে মুক্তিলাভ করে আসেন। দেশের মানুষ তাঁদের দেয় যুদ্ধ প্রত্যাগত বীরের সম্মান।

কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই স্পষ্ট হয়ে যায় যে যুদ্ধবিরতি নেহাৎই সাময়িক। অদূর ভবিষ্যতেই গভর্ণমেণ্টের সাথে আবার বড় রকমের সংঘাত বাধবে। হিমাদ্রিদের সমিতির নেতারা আসামী দিনের সেই গণ-সংগ্রামের দিকে তাকিয়ে সর্বাত্মক অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।

পরীক্ষার পরই হিমাদ্রিকেও অন্য সহকর্মীদের সাথে মিলে প্রস্তুতির কাজে সর্বশক্তি নিয়োগ করতে হবে। লক্ষ্য তাদের বিরাট অথচ সাধন বিশেষ নেই, নেই অভিজ্ঞতা। সময়ও খুব বেশী নেই হাতে। স্বপ্নময় উন্মাদনা আর সঙ্কল্পের দৃঢ়তা এরই উপর ভরসা করে অসাধ্য সাধনের ব্রতে আত্মনিয়োগ করতে হবে। সে নিজের মনের ভিতরটা হাতড়ে দেখে, কোথাও কোন দুর্বলতা ত' নেই? সমস্ত পিছুটানকে ঝেড়ে ফেলে দিয়েই আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে।

সংগ্রামের দেবতা বুঝি তাকে পরীক্ষা করে নিতে চান। অপ্রত্যাশিতভাবে একদিন শমিতার সাথে দেখা হয়ে যায়, শুধু ক্ষণিকের জন্য। হিমাদ্রি এক বন্ধুকে দার্জিলিং মেল এ তুলে দিতে শিয়ালদা স্টেশনে যায়। বন্ধুর কামরার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলতে বলতে আনমনে প্ল্যাটফরমের উপরের জনারণ্যের দিকে তাকিয়ে দেখে। হঠাৎ চোখে পড়ে কাছেই আর একটি কামরার সামনে দাঁড়িয়ে একটি মেয়ে সম্ভবত আত্মীয় স্বজনের সাথে আলাপে মগ্ন হয়ে আছে। অবিকল শমিতার মত দেখতে। হিমাদ্রির বুকের ভিতরটা যেন ধক করে ওঠে। হয়ত সে ভুল করছে, হয়ত কাছে গেলে ভুল ভেঙে যাবে। তবু কয়েক মুহূর্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করার পর সে এগিয়ে যায়। কাছে যেয়ে নিশ্চিত হয়, শমিতাই বটে। তাকে দেখতে পেয়ে শমিতার দুই চোখেও খুশীর দীপালি জ্বলে উঠে।

সে মাসখানেক কলকাতায় কাটিয়ে মা ও ছোট ভাইকে নিয়ে উত্তরবঙ্গের সেই শহরে ফিরে চলেছে। তার দাদা ও বৌদি এসেছিলেন ট্রেণে তুলে দিতে। শমিতার দাদা-বৌদির সাথে পরিচয় করে দিয়ে বলে 'ইনি চলেন একজন খ্যাতনামা ছাত্রনেতা। সবাই বলত ওঁর বক্তৃতায় নাকি আগুন ঝরে।'

আলাপ বেশী জমে ওঠার সুযোগ হয় না। হুকোপতন হয় ট্রেণ ছাড়ার সঙ্কেত সূচক প্রথম ঘণ্টা ধ্বনিতে। কথা অসমাপ্ত রেখে বিদায় নিতে হয়। শমিতার গাড়ীর জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বলে 'পুরণো কর্মক্ষেত্রের কথা কি ভুলেই গেলেন? ওখানে কি আর কোনদিন যাবেন না?' হিমাদ্রি উত্তর দেয় 'কথা দিলাম, নিশ্চয়ই যাবো।'

ট্রেণ ধীরে ধীরে দৃষ্টির আড়ালে চলে যায়। মেসে ফেরার পথে হিমাদ্রির মানসপটে বারবার বিদায় মুহূর্তের ছবিটি ভেসে ওঠে। শমিতার দুই চোখে ছিল কি আকুল মিনতি? অপ্রত্যাশিত সাক্ষাৎ পাওয়ার আনন্দে মন ভরে দিয়ে গেছে। একটা অবুঝ অভিমান জাগে সেই সাথে। শমিতা একবার কলকাতায় ছিল তবু দেখা হয় নি।

হিমাদ্রি নিজেকে সংযত করে। শমিতার কত কথা বলার ছিল, বলা হল না। কত কথা জানার ছিল, অজানা রয়ে গেল। আর একবার কি সে সুযোগ আসবে তার জীবনে? পরীক্ষার পর বাড়ী যাওয়ার পথে একবার দেখা করে যেতেই হবে।

পরীক্ষা শেষ হয়ে যায়। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সমিতির গোপন কেন্দ্র থেকে নির্দেশ আসে। হিমাদ্রিকে অবিলম্বে আত্মগোপন করে চলে যেতে হবে উত্তরবঙ্গের উত্তরতম প্রান্তে। সেখানে পাহাড়ের পাদদেশে অরণ্যে ঘেরা রহস্যলোকে ঘাঁটি গড়ে তুলতে হবে। সেখান থেকে পরিচালনা করা হবে ব্রিটিশ সৈন্য বাহিনীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভিযান।

সমিতির নির্দেশ নিয়তির মতই অমোঘ। দেশমাতৃকার আহ্বান এসেছে। সেই ত' তাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার। অসম্পূর্ণ থাকুক জীবনের প্রথম নারীর সঙ্গে পরিচয়। একান্ত নিজস্ব স্বপ্নের মুকুল মুকুল হয়ে ফোটার আগেই ঝড়ে ঝরে। সেজন্য মুহূর্ত বিলম্ব করা চলবে না। বন্ধনের কাল হল শেষ। অ-যাত্রা পথের যাত্রা হোক সুরু। বেদনার অশ্রু ফুটে উঠুক জননীর পূজার রক্তকমল হয়ে।

খেলা খেলা

সুধাংশুকান্তি ঘোষ

দার্জিলিংয়ে ম্যালের কাছে সুন্দর দোতলা কাঠের বাড়ি একটি। কাঠে লাল আর সবুজ রং করা; তার সঙ্গে রঙিন কাঁচের বাহার। ফুলকাটা পর্দা ঝোলানো দরজায়, জানালায়। দোতলা থেকে কাঠের যে সিঁড়িটে ধাপ লাগানো, তা এসে মেশেছে বড় রাস্তাটায়। আর একতলা থেকে যে ধাপগুলো বেরিয়েছে, তা এসে পড়েছে নিচের ছোট রাস্তায়। ওপরের রাস্তা হচ্ছে গভর্নমেন্ট কলেজে যাবার, নিচেরটা কন্‌ভেন্টে যাবার। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, প্রত্যেকদিন ওই বাড়িটার ফুলকাটা পর্দাটা স'রে যায় ঠিক বেলা নটা পনের মিনিটের সময়, আর হাসতে হাসতে তিনটি বোন বেরোয় দু'জনে নিচের তলা থেকে, বড়দি ওপর থেকে। বড়দি শাড়ি পরা, দুই হাতে, মুখে হাসি, কিন্তু গম্ভীর গম্ভীর। আর দু'বোন স্কুলের অ্যাপ্রন পরা, সাদা ধবধবে মোটা মোটা পায়ে সাদা মোজা আর কালো সু। কাঁধে বইয়ের ব্যাগ। তাদের হাসির বাঁধ মানে না—যেন হাসির ফুল ছড়াতে ছড়াতে ছুটে চলে স্কুলের দিকে।

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, ঠিক ওই সময় ম্যালের এক ধারে বৃদ্ধের জন্য একরকম সংরক্ষিত বেঞ্চ থেকে এক বৃদ্ধ উঠে দাঁড়াবেন, রেলিংয়ের ধার পর্যন্ত যাবেন, এবং যতদূর দৃষ্টি অনুসরণ করতে পারে ততদূর পর্যন্ত তাকিয়ে দেখবেন নিচের রাস্তা দিয়ে ছুটে চলা বোন দুটিকে। দৃষ্টির অন্তরাল হলে তারপর আবার নিজের জায়গায় বসে তিনি রোদ পোয়াতে থাকেন। আনমনে সদা ব্যস্ত ম্যালে আবার কোলাহল জাগায় টাট্টু ঘোড়া, বিদেশিনী মহিলারা, এবং অবকাশ ভোগীর দল।

গত এক বছর হল বৃদ্ধ এইরকম দেখে আসছেন। ছুটির দিনগুলো ছাড়া প্রায় প্রত্যেক দিনই এই একই দৃশ্য। তিনটি বোনকেই দেখতে পান তিনি—তবে ছোট বোন দু'টোকে দেখে তাঁর ভাল লাগে বেশি। কেন, জিজ্ঞেস করলে জবাব দিতে পারবেন না তিনি। তাঁর ভাল লাগার কারণ হয়ত বা ওদের ওই বাধাবন্ধহীন হাসিভরা ছুটে চলা, অথবা তাঁর নিজের জীবন প্রান্তের সঙ্গে ওদের জীবন প্রভাতের একটা অল্প-সজল তুলনা। প্রত্যেক দিন এমনিভাবে দেখেন। তারপর ঘণ্টা দুয়েক পরে আস্তে আস্তে তিনি রওনা হন নিজের বাড়ির দিকে। আসবার সময় ওদের বাড়িটা পথে পড়ে। সাদা পাথরে নেম্‌প্লেট—লেখা আছে ঝলমল অক্ষরে—"মণিকা চ্যাটার্জি।" ফেরবার সময় বাড়িটার দিকে তিনি ভাল করে তাকিয়েও দেখেন না।

এই হচ্ছে দৈনন্দিন ঘটনা। একদিন বৃদ্ধ অন্যদিনের মতই ফিরছিলেন বাড়িটার পাশ দিয়ে। হঠাৎ দোতলার পর্দাটা স'রে গেল এবং এক সুন্দরী তরুণী মধুর কণ্ঠে ভদ্রলোককে সম্বোধন করে ডাকলেন। প্রথমে ভ্রূক্ষেপ না ক'রে, কিন্তু পরে দ্বিতীয়বার ডাক শুনে অবাক হয়ে ভদ্রলোক এগিয়ে গেলেন ভদ্রমহিলার দিকে। ভদ্রমহিলা ওঁকে সাদরে ডেকে বসবার ঘরে বসালেন। তারপর বললেন, "আপনি আমার বাবার মত; একটা কথা জিজ্ঞেস করছি, কিছু মনে করবেন না।" ভদ্রলোক যেন নিজেকে দোষী সাব্যস্ত করে মনমরা হচ্ছিলেন অশান্তিতে। কেন তিনি রোজ তাকিয়ে দেখেন

দুই বোনকে? তাই বুঝি আজ তাঁর শান্তি। ঠিক সেকথা-ই জিজ্ঞেস করেন ভদ্রমহিলা, "আচ্ছা, আমি রোজ লক্ষ্য ক'রে দেখি আমার মেয়েরা যখন ইস্কুলে যায়, আপনি খুব তাকিয়ে তাকিয়ে তাদের দেখেন। আপনার চোখ দেখে মনে হয়, আপনার মনে যেন কিসের দুঃখ রয়েছে। আপনি যদি কিছু মনে না করেন, তবে বলুন না কেন ওদের অমনভাবে তাকিয়ে দেখেন?"

ভদ্রলোকের প্রায় গলিত চক্ষুর গভীর কোটর থেকে অশ্রু নিঃসৃত হতে থাকে। অনেকক্ষণ পরে বলেন, "এমনি দেখি, দেখতে ভাল লাগে বলে। তবে এতে আপনারা যদি কিছু মনে করেন তবে আর আমি আজ থেকে দেখব না।" শিশুর মত ভদ্রলোকের চোখ দিয়ে জল বেরোতে থাকে।

ভদ্রমহিলার এবার অপ্রস্তুত হবার পালা। তিনি বলেন, "না, না, আপনি একথা বলছেন কেন—আপনার দেখার কোনো দোষ নেই—আপনি স্নেহভরে ওদের দেখেন। ছি, ছি, আমাকে আপনি ভুল বুঝবেন না। আমার শুধু একটা কৌতূহল হয়েছিল, তাই আপনাকে ওকথা জিজ্ঞেস করলাম। তা, আপনি আসুন না রোজ আমাদের বাড়িতে, সন্ধ্যার দিকে।"

আশ্চর্য, তার পরদিন থেকে বৃদ্ধ ভদ্রলোক প্রত্যেকদিন ওবাড়িতে সন্ধ্যের দিকে আসতেন। মেয়ে দুটির নাম মিনু আর চিনু। ওদের বড়দিদির নাম প্রতিমা। প্রতিমা থার্ড ইয়ার ফিলজফির ছাত্রী। চিনু পড়ে ক্লাশ টেনে, আর মিনু সিক্সে। বাড়িতে কোনো ছেলে বা পুরুষ মানুষ নেই। ভদ্রমহিলাও সুশিক্ষিতা। বাড়ির কর্তা ব্যবসায়ী মানুষ, তাঁকে প্রায়ই কলকাতা, দিল্লী ও বোম্বাইতে কাটাতে হয়। ছোট্ট বাড়িটায় তাই নির্জন নির্জন ভাব। আমাদের বৃদ্ধ ভদ্রলোক আসতেই বাড়িতে আনন্দের সাড়া পড়ে যায়। ক্রমে ক্রমে সবাই তাঁকে এবাড়ির একজন বলে মেনে নেয়। বৃদ্ধ ভদ্রলোকেরও পরিচয় জানা যায়। তিনি একজন অবসর-প্রাপ্ত সরকারী চাকুরে। ত্রিভুবনে কেউ নেই তাঁর। বিয়ে থা করেন নি। পেন্সনের টাকায় চলে যায়। শেষ জীবনে তিনি দার্জিলিংয়ে একটা ছোট বাড়ি ভাড়া নিয়ে আছেন—শেষ ক'টা দিন এখানেই কাটাবেন ব'লে স্থির করেছেন।

প্রত্যেকদিন সন্ধ্যায় আসেন, রাত আটটার সময় চলে যান। কোনোদিন চা খান, কোনোদিন খান না। কোনোদিন আবার রাত্রের আহারাও সেরে যান। কিন্তু খাওয়াতে যেন ভদ্রলোকের মন নেই। তিনি কেন ওদের এমন ক'রে ভালোবেসেছেন, ওদের দেখে তাঁর মনে কী ভাবের উদ্রেক হয়, এসব কথা কেউ বুঝতে পারে না। প্রতিমার সংগে তিনি দুটো একটা ছাড়া কথা বলেন-ই না একরকম। মিনুর চাইতে চিনুকেই তিনি যেন বেশি ভালবাসেন। চিনুর প্রতিটি চালচলন, কথাবার্তায় তাঁর সতর্ক নজর। প্রতিমা বা মিনুর উপস্থিতি ভুলে গিয়ে মাঝে মাঝে চিনুর সংগেই কথায় মশ্‌গুল হ'য়ে যান। চিনুর কিশোরী মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি কাকে দেখেন একমাত্র তিনি আর ভগবানই তা জানেন। চিনু যদি চেয়ার ছেড়ে উঠে চায়ের কাপ আনতে যায়, ভদ্রলোকের দৃষ্টি তার সংগে সংগে যায়। প্রতিমা দর্শনের ছাত্রী, অনেক সময় মনোবিকলন করতে চায়। সুন্দর সুন্দর মোটা মোটা খাতা বই আর চাকা চিনুর পা দুটোর দিকে ভদ্রলোকের নজর কেন? লোলিটা-ত্ব নয় তো? আবার পরক্ষণেই ভদ্রলোকের জরাবিগলিত অথচ শিশু-সুলভ সরল মুখের দিকে তাকিয়ে প্রতিমা নিজেই নিজের চিন্তাধারার জন্য লজ্জিত হয়। মিনু একদিন দিদিকে বলছিল, "আচ্ছা দিদিভাই, দাদু রোজ এমন ধারা কেন আসেন রে?" প্রতিমা বলে, "কী জানি। তুই বল্!" মিনু জবাব দেয়, "রোজ আমাদের সংগে গল্প করতে চান তাই আসেন না?" বোধহয়

তাই। প্রতিমার মা বলেন, ভদ্রলোক নিঃসঙ্গ বৃদ্ধ, শেষ জীবনে ছোট ছোট মেয়েদের দেখে বোধহয় ওঁর নিজের জীবনের কথাই মনে হয়—হয়ত ইচ্ছা হয়, হায় ভগবান, আমার যদি এমনি ফুটফুটে মেয়ে থাকত, তবে আর বৃদ্ধ বয়সে এত নিঃসঙ্গ লাগত না। প্রতিমা তার মায়ের সঙ্গে একমত নয়। প্রতিমার ধারণা, যে লোক সারাজীবন অবিবাহিত থেকে গেল, তার মনে এ ধরণের অপত্য স্নেহ বা বাৎসল্য জন্মাতে পারে না। কিন্তু যখনই মা তাকে পাল্টা জিজ্ঞাসা ক'রে বসেন, "তবে বল্ ওঁর মনে কী ভাবের উদয় হয়?"—তখন প্রতিমা আর কোনো জবাব খুঁজে পায় না। চিনুর ধারণা, চিনুর চেহারা দেখে, তার বোবাপড়া কথা শুনে (চিনু বরাবর কাই হয়), ভদ্রলোকের ভাল লেগেছে, তাই ওর দিকে তিনি একটু বেশি ঝুঁকে পড়েছেন। প্রতিমা শুধরে দেয় ওকে। বলে, "যখন তোদের পড়াশোনার কথা উনি জানতেন না, তখনো তো উনি তাকিয়ে তাকিয়ে তোদের দেখতেন!"

পৃথিবীতে এত লোক, এত পথঘাট, এত বৈচিত্র্য—শুধু কেন ওই বৃদ্ধ ভদ্রলোক এ বাড়ির প্রতি এতটা আকৃষ্ট—এই হচ্ছে প্রশ্ন। এই প্রশ্ন প্রথমে মিনু প্রতিমাদের মধ্যে সীমিত ছিল, কিন্তু তা ক্রমে ক্রমে সংক্রমিত হতে লাগল প্রতিবেশীদের মধ্যেও। পাশের বাড়ির ভাটনাগর গৃহিণী জিজ্ঞেস করেন মিনুর মাকে, "আচ্ছা মিসি, দাদু তুম্হারী বরকো নহীঁ ছোড়তা কেউ? টনকো মতলব কেয়া?" হো হো করে দু'জনেই হেসে ওঠেন এই প্রসঙ্গে! ম্যানের নির্দিষ্ট আসনে বেশ কিছুদিন তিনি অনুপস্থিত হবার পর থেকেই নিয়মিত আগন্তুক বুড়োরা বলাবলি করতে থাকেন, "ওই ভদ্রলোকের হল কী?" মিনুদের বাড়ির পাশের এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক জানালেন যে তিনি আজকাল মণিকা চ্যাটার্জিদের বাড়িতে কাটান। নানারকম গবেষণা হয়। স্পাইসিরি থেকে আরম্ভ করে দুবেলা চা খাওয়ার মওড়া—সবকিছুই আরোপিত হয় বৃদ্ধের ওপর। হঠাৎ একদিন থেকে ভদ্রলোক অনুপস্থিত হ'তে লাগলেন মিনুদের বাড়িতে। প্রথম প্রথম ওরা ভেবেছিল বোধহয় অসুখ বিসুখ করেছে ভদ্রলোকের। কিন্তু বেশ কিছুদিন পর্যন্ত যখন তাঁকে দেখা গেল না তখন মিনুরা একটু অবাক হয়ে গেল। শ্রীমতী চ্যাটার্জির উৎকণ্ঠা, প্রতিমার ঔদাসীন্য, চিনুর অস্তিরোধ, এবং মিনুর মন খারাপ লক্ষ্য করা গেল। প্রতিমাকে মা একদিন বললেন, "হাঁরে দাদুর ঠিকানাটা নিয়ে একবার যা তো, দেখে আয় কী হল ওঁর।" প্রতিমা বলে, "আর কয়েকটা দিন দেখই না—হয়ত আজই বিকেলে চলে আসবেন।" মিনু মাঝে মাঝে রীতিমত মন খারাপ করে। চিনু আয়নাতে তার নিজের ভরা ভরা মুখের দিকে, গলার দিকে তাকিয়ে দেখে আর ভাবে—দাদু সত্যি কী তার দিকে ঝুঁকেছিল?—নিজের মনেই সে হাসে। ভাটনাগর গৃহিণী এসে উৎকণ্ঠা জানান, বলেন, "কোই বিমারী হোংগা। শোচো মত্।" ম্যানের অবসর সভায় একদিন আলোচনা ওঠে। মিনুদের পাশের বাড়ির বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি জানান যে মাসখানেক হল ভদ্রলোক আর ও বাড়িতে আসছেন না। ম্যানেও তাঁর দেখা নেই। অবসর সভায় প্রবীণতম সভ্য বললেন, "হয়ত ভদ্রলোক টিকিট কেটেছেন!" টিকিট কাটার প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম হতেই অন্যান্যরা আত্মবিস্মৃত হ'য়ে হেসে ওঠেন।

অনেকদিন কেটে গেল। সত্যি এবার অবাক লাগে মণিকা চ্যাটার্জির। যেদিন থেকে ভদ্রলোক আসছেন না, তার আগের দিনেও কোনো কথা বলেন নি তিনি। আগের মতই হেসেখেলে গেছেন। তাঁর কানে ঘুণাক্ষরেও কেউ তোলেনি যে তিনি এ বাড়িতে অবাঞ্ছিত। তবে কেন আসছেন না তিনি?

প্রতিমাকে আবার বলেন তিনি, "ওরে প্রভু, যা না একবার কলেজ-কেরতা। তোরা যে এত মায়া-মমতাহীন জানতাম না!"

সত্যিই অবশেষে একদিন দেখা যায়, কলেজ থেকে এক পিরিয়ড্ আগে বেরিয়ে প্রতিমা এবং তার এক বান্ধবী চলেছে ষ্টেশনের সামনের রাস্তা দিয়ে। একটা বইয়ের ভাঁজে রাখা আছে ছোট একটুকরো কাগজ, যাতে লেখা আছে ভদ্রলোকের ঠিকানা। "প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ, ৩নং বশিষ্ঠ হোটেল লেন।" লেখাটা একবার দেখে নেয় প্রতিমা কাগজটা বার ক'রে। রাস্তার অদ্ভুত নামটা দেখে ওর বান্ধবী হেসে ওঠে। বলে, "মনে হচ্ছে, কবমুনির আশ্রমে নিয়ে যাচ্ছিস রে!" দু'বার জিজ্ঞেস করতেই হদিস মেলে। প্রতিমার প্রশ্নে বিমূঢ় এক পথচারী বলে, "ওই যে দেখছেন হোটেলটা, ওর পিছ দিয়ে রাস্তাটা নেমে গেছে।" পথচারীটি ওদের ওই বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিতে চাইলে প্রতিমাই তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় করে। দু'টি পথচলা মেয়ের সংগে কয়েক পা চলতে কে না চায়!

"হাঁ, ওই তো লেখা রয়েছে বশিষ্ঠ হোটেল লেন।" প্রতিমার বান্ধবী আঙুল দিয়ে দেখায়। ধাপে ধাপে ওরা নেমে যায়। খানিকটা নামতেই বাঁদিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে যায় প্রতিমা। দাঁড়ায় এবং একটু তাকিয়ে দেখে। বিশ্বসংসার বিস্মৃত হ'য়ে দু'জন ভদ্রলোক দাবা খেলছেন বসবার ঘরে বসে। বসবার ঘরটা রাস্তার একেবারে ওপরে। হঠাৎ গম্ভীর হয়ে প্রতিমা বান্ধবীর হাত ধরে হটহট করে ঘুরে দাঁড়ায়। আঙুল টান দিয়ে বলে, "চল্ ভাই ফেরা যাক।"

অবাক্ বান্ধবীর প্রশ্নের জবাব দিতেই হয় তাকে অবশেষে। সিঁড়ি বেয়ে ফের ওপরে উঠে হাঁপ ছেড়ে যেন বাঁচে প্রতিমা। নিবিষ্ট মনে দাবা খেলায় রত বৃদ্ধ দাদুকে না ডেকে ভালই করেছে সে!

বান্ধবী বলে, "তা হলেও তোর উচিত ছিল একবার জিজ্ঞেস করা।" প্রতিমা জবাব দেয়, "যাহে। উনি ভালই আছেন মনে হল। আমিও ঠিকই ভেবেছিলাম—উনি কোনো খেলায় মেতে আছেন।"

ষ্টেশনের ক্যান্টিনিয়ায় ওরা চা খেতে ঢুকল।

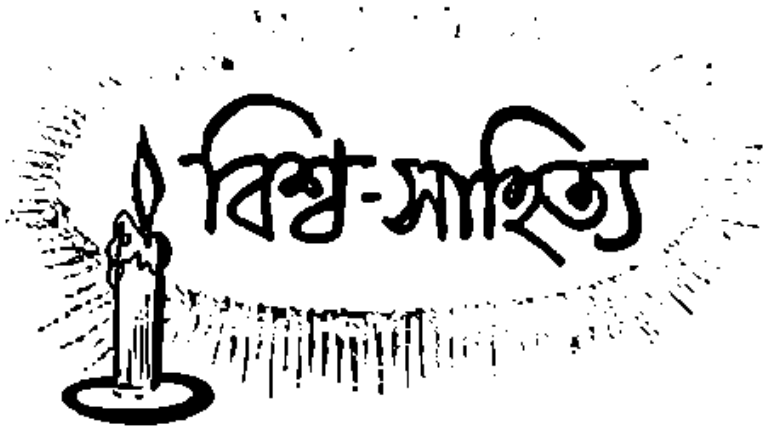

আজকের লেখক ও তার সমস্যা

নীলাদ্রি সোম

লেখক কেন লেখেন আর পাঠকই বা কেন পড়েন এর উত্তর এক কথায় দেওয়া সহজ নয়। এ নিয়ে তর্ক-বিতর্কেরও শেষ নেই। তবে বলা যায় জ্ঞান আহরণ কিংবা আনন্দের সন্ধানই বোধ হয় বেশির ভাগ পাঠকের উদ্দেশ্য। কিন্তু যে পাঠক জ্ঞানান্বেষী, কোনো বইয়ে লেখকের আনন্দ দেবার চেষ্টা বেশী দেখে তিনি বিরক্ত হবেন। আর যে পাঠক আনন্দ সন্ধানী তিনি কোন বইয়ে জ্ঞানের তথ্যটি বেশি থাকলে হয়তো বই শেষ পর্যন্ত পড়বেনই না। সমস্যাটি জটিল হ'য়ে পড়ছে এই খানেই। লেখক কী করবেন! পাঠকের চাহিদা অনুযায়ী সাহিত্য করবেন! কিন্তু যারা আগে থেকেই মাপ জোক করে, বিশেষ বক্তব্য হাজির করার জন্য উদ্দেশ্য মূলক সাহিত্য রচনা করতে বসেন আবিষ্কার করার কোনো সুযোগ তাদের থাকে না। কোনো অভিধানের প্রয়োজন তাদের নেই। কারণ অন্য লোকের অভিধানে আর আবিষ্কারেই তারা সন্তুষ্ট। যা আগে থেকেই পরিচিত, প্রতিষ্ঠিত, যাচানো তা-ই এদের লেখার মূলধন। সাহিত্যের ইতিহাসে এই সব লেখকের দাম নেই, দাম থাকে না। নতুন কোনো অভিজ্ঞতা এরা আমাদের দিতে পারেন না। এদের নিজেদেরই অভিজ্ঞতা নেই ব'লে। এমন কি প্রাণের কোনো নতুন জিজ্ঞাসাও এরা হাজির করতে পারেন না। সাহিত্যে জিজ্ঞাসা জরুরী। সে জিজ্ঞাসার উত্তর পাওয়া গেল কি গেল না সেটা বড়ো কথা নয়। সাহিত্য মাত্রই এক প্রাণবন্ত একটি সত্তা, প্রাণ-তরঙ্গের একটি জগৎ। কাজেই সব প্রশ্নের উত্তর তার দেবার কথা নয়।

উপন্যাস, ছোটগল্প, কবিতা, গানকথা, প্রবন্ধ, চিত্রনাট্য, নাটক—কোনো ধরণের সাহিত্য সৃষ্টির জন্য সবচেয়ে প্রয়োজন আন্তরিকতার। যার যার আন্তরিকতা আছে তার কথা মানুষের কানে পৌঁছাবেই। আন্তরিক হওয়া সব চাইতে প্রবল। অবশ্য সব সময়ই যে মানুষ তা উদগ্রীব হ'য়ে শুনবে এমন মনে করার কারণ নেই। কারণ সত্যের চেহারার, আন্তরিকতার চেহারার আছে অস্বাভাবিকতার, স্বাতন্ত্র্যের ছাপ। যা গতানুগতিক, যা সবাই মেনে নিয়েছে, যা প্রায় ঘিতিয়ে, ফসিল হ'য়ে এসেছে তা চট ক'রে চিনে নিতে কারোই বিশেষ অসুবিধা হয় না। মানুষের স্বভাবের মধ্যেই আছে পুরাতনকে মান্য করবার, পুরাতনের বশ্যতা স্বীকারের, আর নতুনকে অস্বীকার করার ঝোঁক। কাজেই কোনো লেখক যখন আন্তরিকভাবে কিছু বলেন, নতুন কথা উচ্চারণ করেন, একেবারে অপ্রত্যাশিত কিছু হাজির করেন তখন অনেক সময়েই অনভ্যস্ত পাঠক থাকে মুখ ফিরিয়ে। চেষ্টার কী দরকার, নতুনের কী প্রয়োজন

যা আছে তাই তো ভালো—এ—রকম ভাব কম ক'রে পাঠকদের মনে। অধিকাংশ মানুষই আশুতোষ, উত্তম—বিমুখ, অপরিচিত পথে পা বাড়াতে অনিচ্ছুক। কিন্তু সকল লেখকের সাহিত্যের সামনে জেগে পড়ে পাঠকের সব অনিচ্ছা, অনীহা, আলস্য, বিরোধিতা। শেষ পর্যন্ত পাঠক বাধ্য হয় নতুন স্বাদের দিকে কান পেতে দিতে। আকৃষ্ট না হ'য়ে পারে না। যারা বিরূপ করত একদিন, তারাই শেষে মনোযোগী হয়ে ওঠে। যে সাহিত্য মনে হয়েছিল একেবারেই অপরিচিত তা-ই চেনা জানা হ'য়ে ওঠে ধীরে-ধীরে। যে ছিল আগন্তুক সে-ই হয়ে-ওঠে চির-চেনা। যা অসম্ভব তা-ই শেষে মনে হয় স্বাভাবিক।

লেখক নিজেও অবাক হয়ে যান তার লেখার ফলাফল দেখে। তিনি যে সফল হয়েছিলেন এর কারণ আন্তরিকতা ছিল তার রচনায়। আন্তরিকতা মানে নতুনত্ব। যা নতুন তা-ই সত্য। যা মৌলিক তা-ই সত্য। অন্য সবাই যা ক'রে গেছে তার সঙ্গে মিল থাকলে,তা সত্য হতে পারে না। সাহিত্যে গতানুগতিকতাই অসত্য। লেখক যে কথা অন্য লোকের কাছে শুনে বলছেন না তা-ই আন্তরিক, তা-ই সত্য। তোতাপাখি আন্তরিক নয়, কারণ সে যা বলছে তা নিজের থেকে বলছেনা, সে কথার মানে সে জানে না। সাহিত্যের মূল্য তার আন্তরিকতায়, তার মৌলিকত্বে, তার অভিনবত্বে, তার নতুনত্বে। নতুনত্বই সাহিত্যের বিশুদ্ধতা। মনের অতলে ডুব দেন ব'লে সাহিত্যিক ত্রিকালদর্শী, তাই তার মতো বাস্তববাদী আর কেউ নেই।

সাহিত্যিক যেসব চরিত্র সৃষ্টি করেন তারা নিশ্চয়ই কাল্পনিক, কিন্তু অসত্য নয়। বরং আমাদের চেনা-জানা নরনারীর মতোই তারা জীবন্ত। নিজের সৃষ্ট চরিত্রের মাঝখানে নিজেকেই আবিষ্কার করেন লেখক।

যে লেখক কোনো থিসিস সমর্থন করার জন্য বই লেখেন তিনি আসলে জালিয়াত। পূর্বনির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে তিনি তার চরিত্রগুলিকে চালনা করেন। তিনি তাদের চলতে বাধ্য করেন একটি বিশেষ পথ রেখা ধ'রে। তাদের পরিণতি তিনি আগে থেকেই জানেন। ফলে তার চরিত্রগুলির যেমন কোনো স্বাধীনতা থাকে না, তেমনি তার সৃষ্টি-ক্ষমতাও অবাধ বিচরণের কোনো সুযোগই পায় না। তার লেখা আর তখন অজানা সাগরে অভিযান নয়, মানচিত্র আর নক্সার আঁটা জলাশয়ে বিহার মাত্র। তার সৃষ্ট চরিত্র বা সাহিত্য আমাদের নতুনত্বের স্বাদ দিতে পারে না। তিনি যে আন্তরিক নন তার লেখা থেকেই তা ধরা পড়ে। অনেক বড়ো লেখক নির্দিষ্ট বক্তব্য প্রচারের জন্য কলম ধরেছিলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই বক্তব্যের সীমা ছাড়িয়ে তিনি চলে গেছেন অনেক দূরে, তার অধীনতা থেকে নিজেদের মুক্ত ক'রে ইচ্ছা মতো রূপ নিয়েছে চরিত্রগুলি। ফলে তার সাহিত্য, সাহিত্য হ'য়ে উঠেছে।

কাজেই লেখার জগতে নিজের সৃজন ক্ষমতা ছাড়া আর কোনো সঙ্গী লেখকের নেই। লিখতে বসে যখন নতুন চরিত্র ভিড় করে মনে, কল্পনায় নতুন ঘটনা ঘটে, জল-স্থল আকাশ নিয়ে ধীরে ধীরে দেখা দেয় নতুন জগৎ তখন লেখক নিজেই অবাক হয়ে যান নিজের সৃষ্টি দেখে। এরা যে এতদিন তার নিজের অগোচরে লুকিয়ে ছিল মনের অন্ধকারে। লেখক শুধু দরজা খুলে দিয়েছেন, আর অমনি চরিত্রগুলি দলে দলে বেরিয়ে এসেছে বাইরে। পৃথিবী চিরনূতন। নিজের লেখার সেই পৃথিবীকে ঠাই ক'রে দিয়েছেন লেখক। স্বাধীনভাবে কথা বলতে দিয়েছেন নিজের চরিত্রগুলিকে। তারা নিজের নিয়মে, নিজের ভাগ্য অনুযায়ী চলাফেরা করছে।

অন্য পাঁচটা মানুষের মতো লেখকেরও ব্যক্তিগত নানা রকম সমস্যা ছিল। রচনার সময় লেখক তা অতিক্রম ক'রে গেছেন, অতিক্রম ক'রে গেছেন নিজেকে। তার ব্যক্তিগত সমস্যাগুলি একেবারেই তুচ্ছ হ'য়ে গেছে। তিনি এক নতুন পৃথিবী আবিষ্কার করেছেন। রচনা করেছেন দ্বিতীয় ভুবন যা আমাদের পৃথিবীর মতোই, জীবিতের বাসভূমি।

(ই, ইউনেসকো-র দি রাইটার এণ্ড হিজ প্রোব্লেম অবলম্বনে।)

বিশ্বের সেরা গল্প

মিথ্যা

লিওনিড্ আন্দ্রীভ

(অনুবাদ :—অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়)

[শেকভের পরবর্তীকালে, গর্কি (১৮৬৮), মাকসিম্ গোর্কি (১৮৬৮), কুপরিন (১৮৭২) প্রমুখ বিখ্যাত রুশ লেখকদের অন্যতম ছিলেন লিওনিড্ আন্দ্রীভ (১৮৭১)। সাহিত্যে ভয়ঙ্কর এবং অপ্রাকৃতিকের সাধক ছিলেন আন্দ্রীভ। ঘটনার চেয়ে মানসিক প্রতিক্রিয়ার উপরই তিনি জোর দিতেন বেশি। মানুষের মনোজগতের অপ্রকৃতিস্থ কামনার জ্বালা ফুটিয়ে তুলতেন তিনি অসামান্য দক্ষতায়। এই গল্পটিতে তাঁর লিপি-নৈপুণ্যের বিশেষ প্রকাশ আছে। গল্পটি বিশ্বের সেরা গল্প সংকলনে বিশিষ্ট স্থান পেয়েছে।]

—"তুমি আমার কাছে মিথ্যা কথা বলছ! আমি জানি, তুমি মিথ্যা কথা বলছ!"

—"আঃ! চীৎকার করছ কেন! সবাই শুনতে পাবে যে!"

আমারও মিথ্যা কথা বলতে···চীৎকার আমি করিনি; যথাসম্ভব নম্র কণ্ঠেই কথা বলছিলাম। ওর একখানি হাত আমার হাতের মধ্যে ধরে' নীচু সুরে ওর সঙ্গে কথা বলছিলাম। নির্জন ঘরের বাতাসে "মিথ্যা" শব্দটা যেন বিষাক্ত সাপের মতো ফুঁসিয়ে বেড়াচ্ছিল।

ও বলতে লাগল—"আমি তোমায় ভালবাসি; তুমি আমায় বিশ্বাস কোরো!"

ওর নরম ওষ্ঠাধরের তপ্ত স্পর্শ নিজের ঠোঁটের ওপর অনুভব করলাম। কিন্তু হাত বাড়িয়ে যখন ওকে কাছে টেনে নিতে গেলাম তখন ও চলে গেছে।···

অন্ধকার পার হয়ে আলোক-স্নাত ঘরের মধ্যে ঢুকলাম। উৎসব তখন শেষ হ'য়ে আসছে। সেখানে কেউই আমার পরিচিত নয়। একধারে বসে উৎসবের শেষ প্রবাহ দেখতে লাগলাম।

আনন্দ-মেলায় ও আমায় একেবারেই চিনল না; দূর হ'তে ক্ষণে ক্ষণে ওর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আমার পানে ছুটে আসতে লাগল, কিন্তু আর একটি কথাও আমাদের মধ্যে বলা হ'ল না।

উৎসব অন্তে ওর কাছে গিয়ে বললাম—"বাড়ী যাবার সময় হয়েছে। চল তোমায় পৌঁছে দিয়ে আসি।"

ওর দিকে তাকিয়ে মনে হল, ও যেন বিষম অপ্রতিভ হয়ে পড়েছে!

—"কিন্তু উনি যে আমাকে পৌঁছে দেবেন!"

আঙুল বাঁড়িয়ে একজন উন্নত দেহ যুবকের প্রতি ও আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলে। সে লোকটি তখন অন্য একটি তরুণীর সঙ্গে কথায় মত্ত! বুঝলাম ওই নবীন যুবার জন্যই আজ ওর সাজ। অঙ্গের বিশুদ্ধ চঞ্চলতা।

পাশের দুজনকে দুজনে প্রবেশ করলাম। দুহাতে আমার কণ্ঠ বেষ্টন ক'রে বুকের ওপর মুখ রেখে ও আমায় চুমু দিলে।

মৃদু কণ্ঠে বললাম—"তুমি মিথ্যা কথা বলছ। ওই যুবকের সঙ্গে তুমি পরিচিত নও মোটেই।"

সে কথায় কান না দিয়ে ও বললে—"কাল আবার এইখানে দেখা হবে। এস কিন্তু।"

সে রাত্রে কখন কেমন করে বাড়ি ফিরলাম, কিছুই মনে নেই। মাথার ভিতর অসংখ্য চিন্তা জট পাকাচ্ছিল।

* * *

মিথ্যাচারিণী! ও এল না! বৃথা অপেক্ষায় আমার সারা সন্ধ্যাটা কেটে গেল।

নিঃশব্দে রাত্রির অন্ধকার পৃথিবীকে গ্রাস করছে। তীব্র নিরাশায় সারা অন্তর স্পন্দনহীন হয়ে পড়েছে···

আমি ওর জন্ত অপেক্ষা করতে লাগলাম; কিন্তু ও এল না!

ওদের বাড়ীর সামনে পথের ধারে দাঁড়িয়েছিলাম।

শীতের রাত্রি। হিমের হাওয়ার কণে কণে দেহের মধ্যে শিরশির করে উঠছিল। অন্ধকারে প্রেতের মতো কদাচিৎ দু একজন পথচারী পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছিল। চারিদিক কুয়াশায় সমাচ্ছন্ন।

ওর জন্ত দাঁড়িয়ে রইলাম, কিন্তু ও এল না। তীক্ষ্ণ বেদনায় আঘাতে কেন যে চীৎকার ক'রে উঠিনি তাই ভেবে অবাক হয়ে যাই। উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলাম। মনে হল, দুঃখ কিসের; আমি তো অনন্ত সুখের অধিকারী!

হিংস্র সাপের মতো ফোঁস ফোঁস শব্দে যে বিষাক্ত "মিথ্যাটা" আমার চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, হাতের আঙুলগুলোকে বাঁকিয়ে নীচু করে' তাকে ধরতে চাইলাম। সে আমার বুকের বাঁহাতখানায় তার দাঁত বসিয়ে দিলে। বিষের ক্রিয়ায় আমার মাথা ঘুরতে লাগল।

আমার কাপসা দৃষ্টির সুমুখে সংসারের সকল বস্তুই মিথ্যার রূপান্তরিত হয়ে গেল। মনে হল, যুগের পর যুগ যার অপেক্ষায় এখানে দাঁড়িয়ে আছি, সেই নারী জন্ম জন্ম ধরে' আমার উপর আধিপত্য বিস্তার করে এসেছে; তার নাম নেই, ধাম নেই; সে হচ্ছে সেই, যে চিরদিন শুধু মিথ্যাই বলে যায়, অনন্তকাল ধরে তোমার অপেক্ষায় রাখে—কিন্তু ধরা দেয় না।

চোখ মেলে ওর বাড়ীর দীপালোকিত জানালার পানে তাকালাম।

করুণ কণ্ঠে কে যেন আমায় উদ্দেশ করে বলছে:

"সে তোমায় প্রতারিত করেছে; তুমি তার প্রতীক্ষায় হিমের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছ; কিন্তু ঘরের মধ্যে বসে সে সেই দীর্ঘকান্তি যুবকের সঙ্গে প্রেম-আলাপনে বিভোর। যদি ভিতরে গিয়ে মিথ্যাচারিণীকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে পারো, তাহলে একটা কাজ হয়,—মিথ্যার মরণ হয়।

হাতখানা মুঠিয়ে ধরে বললাম—"হবে, হবে; তাই হবে!"

বন্ধ দ্বার খুলে গেল। একজন দীর্ঘাকার লোক বাড়ীর ভিতর থেকে বেরিয়ে এল! চিনলাম। ছলনাময়ী নারীর মিথ্যাভাষী ওষ্ঠের চুম্বন-চিহ্নিত যুবক দৃপ্ত ভঙ্গীতে চলেছে।

তার দেখালাম; অনুনয় করলাম; ভিক্ষা চাইলাম: "একবারের জন্তে সত্যি করে বল···।"

কুয়াশের মতো মিহন্দ মুখে, অন্তরস্পর্শী রহস্য-গভীর চোখে আমার পানে তাকিয়ে ও বলে—"মিথ্যা তো বলিনি আমি!"

ও জানে, ওর মিথ্যা আমি প্রমাণ করতে পারব না; আমার সকল সত্তার সকল যুক্তি এর একটি কথায় ভেঙে যাবে,—একটিমাত্র মিথ্যা কথা! আমি সেই কথাটার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম; এবং পর্বতের-নির্ঝরের মতো ওর ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে সেই কথাটি বেরিয়ে এল,—সত্যের রঙে তার বাহিরাবরণ রঙীন; কিন্তু অন্তস্তল অন্ধকার: "আমি তোমায় ভালবাসি। দেহে মনে আমি কি নিঃশেষে তোমার পায়ে নিজেকে বিলিয়ে দিইনি?"

ঘরের উন্মুক্ত জানালা দিয়ে দূর বনান্ত-রেখার ছবি চোখে পড়ে! পৃথিবীর বুকে রাত্রি তার মায়া বিস্তার করেছে! ঘরের মধ্যে বাতির স্বল্প আলোয় বাইরের মরা অন্ধকার কুণ্ডলী পাকাচ্ছে!

—"সত্যি কথাটা জানতে চাই; এর চেয়ে বড়ো কামনা জীবনে আর আমার নেই! বল! আমার বিশ্বাস, তোমার চুম্বনে মিথ্যা, তোমার দৃষ্টিতে মিথ্যা, তোমার বাক্যে মিথ্যা;—তুমি আমায় ভালবাস না! এ কি ঠিক নয়?"

ও নীরব! অনুচ্চারিত তীক্ষ্ণদৃষ্টি আমার অন্তরের নিভৃততম স্তরে প্রবেশ করেও যেন আমার আত্মাকে বাইরে টেনে নিয়ে এসে অদম্য কৌতূহল ভরে তাকে নিরীক্ষণ করতে লাগল। ওর দৃষ্টির সামনে অনেকক্ষণ পর্যন্ত আমার ভাষা মূক হয়ে রৈল!

সহসা চীৎকার করে উঠে বল্লাম—"উত্তর দাও, নচেৎ আমি তোমায় হত্যা করব।"

শান্তকণ্ঠে ও বলে—"তাই কর! সময় সময় জীবন দুর্বহ হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু ভয় দেখিয়ে সত্য পাবে না!"

আমি ওর পাশে নতজানু হয়ে বসলাম, ওর দু হাত চেপে ধরলাম; সত্য কথাটি বলবার জন্য বারবার কাতর কণ্ঠে ওকে অনুনয় করতে লাগলাম।

—"আহা। বেচারী!!"—আমার মাথায় হাত রেখে ও বলে—"বেচারী!"

বল্লাম—"দয়া কর! দয়া কর! সত্যি কথা জানবার জন্য আমার সারা প্রাণ ব্যাকুল হয়ে উঠেছে।"

মুখ তুলে ওর পানে তাকিয়ে মনে হল যেন ওর ওই সুডৌল ললাটের অন্তরালে সত্য লুকিয়ে আছে—ওই ভ্রূর পর্দার পিছনে।

পর্দাখানা টুকরো টুকরো ক'রে ফেলবার একটা উন্মাদ আকাঙ্ক্ষা মনের মধ্যে জেগে উঠলো! ঐ যে উন্নত বক্ষের ভিতর ওর হৃদপিণ্ড—নখাঘাতে ছিন্নভিন্ন করে যারেকের জন্য তাকে পর্যবেক্ষণ করবার দুর্বার বাসনা অনুভব করলাম।

ঘরের মধ্যে বাতির আয়ু শেষ হয়ে আসছে! দেওয়ালগুলো অন্ধকারে মিশিয়ে যাচ্ছে। দিগ্বিদিকে একটা করুণ আর্ত বিহ্বলতা!!

ও বললে—"আহা! তোমার জন্যে আমার দুঃখ হয়। বেচারী!"

বাতিটা শেষবারের মত জ্বলে উঠে ধীরে ধীরে নিভে গেল। চারিদিকে নিরন্ধ্র অন্ধকার! আমি ওকে দেখতে পেলাম না; শুধু ওর স্পর্শের অনুভূতিখানি আমার সর্বদেহে ব্যাপ্ত হয়ে গেল! কানের কাছে ভীত স্বরে বলে এল:

"আমাকে তোমার বুকের মধ্যে টেনে নাও ; আমার ভয় করছে !"

বাইরে অন্ধকার জোতের মত জানলা দিয়ে ঘরে ঢুকছে। আকাশের ছায়ায় যেন তার রুক্ষমূর্তি উৎকর্ণ হয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। ওকে বুকের মধ্যে টেনে নিলাম। ও কাঁপছিলো !

• • • •

ওকে হত্যা করলাম।

ওর প্রাণহীন দেহখানা জানলার প্রান্তে পড়েছিলো ; তার ওপর নিজের পা রেখে উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলাম। ভাবছ পাগল ?

না, না ! কারণ, এতক্ষণে আমার নিঃশ্বাস প্রশ্বাস সুস্থ মানুষের মত বইতে শুরু করেছে ; অন্তরে স্বচ্ছন্দ শান্তি বিরাজ করছে ; বুকের মধ্যে যে বিরাট কীটের দংশনে বিপর্যস্ত হচ্ছিলাম, তার জ্বালা মিলিয়ে গেছে।

নীচু হয়ে ওর মরণ-স্তব্ধ চোখের পানে তাকালাম—তাদের চোখ দুটি আলোয় অন্ধ আচ্ছন্ন ; তাদের তারায় তারায় মিথ্যার যে শয়তান বাসা বেঁধেছিল, সে পালিয়েছে।

যখন তারা আমায় গ্রেপ্তার করলে, আমি হাসলাম। আমাকে পিশাচ মনে করে' তারা ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিলে, আমাকে উৎক্ষুব্ধ রেখে অনেকে গুজ্ব করে বলাবলি করতে লাগল : "পাগল ! তা না হলে নিজের প্রেমিকাকে খুন করে হাসতে পারে ?"

একজন সদানন্দ গোছের লোক ছুটে দাঁড়িয়েছিল ; সে শুধু আমার ওপর রাগ প্রকাশ করলে না ; অনুকম্পাসূচক কণ্ঠে বললে—"ওর জন্যে আমার দুঃখ হয় ; আহা, বেচারী !"

চীৎকার করে উঠলাম—"বোলো না ; ও কথা আমায় বোলো না।"

সহসা ক্রোধে অন্ধ হয়ে কেন যে তার পানে ধেয়ে গেলাম তার কোন খুঁজে পাইনে—তাকে আঘাত করবার উদ্দেশ্য আমার ছিল না মোটেই। অনভ্যস্ত ভয়ে কোলাহল করে উঠলো শান্ত হয়ে দাঁড়ালাম। যখন তারা আমাকে ঘর থেকে বাইরে নিয়ে গেল তখন সেই সদানন্দের দিকে তাকিয়ে চীৎকার করে বল্লাম—"আমি সুখী ! এ পৃথিবীতে আমি সকলের চেয়ে সুখী।"

চির-অন্ধকারের অতল-পুরীতে নারী চলে গেছে। আমিও যাচ্ছি সেখানে ! কিন্তু যাবার পূর্বে তুমরে এ জগতকে কি দিয়ে গেলাম……?

মনে হল চারিদিক থেকে অসংখ্য সাপের ফণা আমার দিকে ছুটে আসছে ; আতঙ্কে চিৎকার করতে গেলাম, মুখ দিয়ে শুধু সেই অবধ্য কথাটা বার হল :

—"মিথ্যা !"

ক্রোধে নিজের টুঁটি চেপে ধরলাম। বললাম—"মিথ্যা নেই ; তাকে হত্যা করেছি।"

সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর অতল থেকে গম্ভীর ধ্বনি ভেসে উঠল :

—"মিথ্যা !"

ভয়ে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেলাম।—মিথ্যা কি মরেনি ? মিথ্যা কি চিরজীবী—অমর ?'

আঃ ! আঃ ! মিথ্যার বিষে আমার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসছে।

পৃথিবীতে আলো নেই, হাওয়া নেই…

এ-পৃথিবীতে সত্যকে খুঁজে বার করতে যাবার মতো বাতুলতাও আর কিছু নেই……

———

সাহিত্য ও সাহিত্যিক

মহিলাটি বেশীর ভাগ সময়ই থাকেন ঘরে। জানালা দিয়ে দেখা যায় যে-টুকু আকাশ, মেঘ, তারা আর আলো তাই নিয়ে তাঁকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়। ঈশ্বরের প্রতি তাঁর অগাধ ভক্তি, মানুষের প্রতি গভীর ভালোবাসা। দান-ধ্যান করতে ভালোবাসেন। চির-জীবন রইলেন কুমারী। জীবনের মাঝামাঝি সময়ে একটা শক্ত অসুখে পড়ল। প্রায় শয্যা অবস্থায় কাটাতে হল জীবনের বাকি ক'টি বছর। সেই অবস্থায়ও তিনি রচনা ক'রে গেলেন চমৎকার সব কবিতা। তাঁর ক'টত কিছু কবিতা ছাপা হয়েছিল তাঁর জীবিত কালেই। বাকি কবিতা প্রকাশিত হল মৃত্যুর পরে। প'ড়ে কবিতার পাঠকেরা মুগ্ধ হল। এই মহিলাটি হলেন ইংল্যাণ্ডের সুপরিচিতা মহিলা কবি ক্রিশ্চিনা জর্জিনা রসেটি। কবি দান্তে গেব্রিয়েল রসেটি-র বোন।

• • • •

তাঁর জীবনই যেন দুঃখের। ছ'বছর বয়সেই হয়েছেন মাতৃহীন। মা-কে হারাবার দুঃখ কিছুতেই যায় না মন থেকে। ভারি লাজুক ছেলে। একটুতেই কষ্ট পান মনে। অথচ স্কুলে ভর্তি হবার পর যাদের সাথী হিসেবে পেলেন তারা অত্যন্ত অভদ্র। ফলে তাঁর জীবন হ'য়ে উঠল দুর্বিষহ। মনের ওপর চেপে রইল স্কুল জীবনের তিক্ত স্মৃতি। হাউস অব লর্ডস-এ কেরানীর কাজ পেলেন। কিন্তু পরীক্ষা দিয়ে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করতে হবে এই কথা শুনে মনে এমন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হল যে তাঁর মাথা খারাপ হ'য়ে গেল। পাঠাতে হল পাগলা গারদে। জীবনের বাকি দিনগুলিতেও মাঝে মাঝেই ফিরে এসেছে এই ভয়াবহ অবস্থা। অবশ্য সুস্থও থেকেছেন মাঝে মাঝে। তখন রচনা করেছেন আশ্চর্য সুন্দর কবিতা। আর ইংল্যাণ্ডের চিঠি লিখিয়েদের মধ্যে বোধ হয় তিনি সেরা। এই দুর্ভাগা মানুষটি হলেন ইংরেজ কবি কাউপার।

• • • •

দুরন্ত ছেলে। নিয়ম-কানুন, আইন-শৃঙ্খলা ভাঙতেই আনন্দ। প্রথম যৌবনে মেতে উঠল এমন অপরাধের। পুলিশ একবার গ্রেপ্তার ক'রে ক'ষে বেত লাগাল জেলে পুরে। ছাড়া পেয়ে শুরু করল ভবঘুরের জীবন। ঘুরে বেড়াল ইংল্যাণ্ড আর আমেরিকায়। এমনি ক'রে কেটে গেল জীবনের সাইত্রিশ বছর। কানাডায় একখানা পা কাটা গেল ট্রেন থেকে নামতে গিয়ে। বাধ্য হয়ে ফিরে যেতে হল নিজের দেশ ইংল্যাণ্ডে। এই সময় খবর এল দূর সম্পর্কের এক আত্মীয় মারা যাওয়ায় তার সম্পত্তির মালিক হয়েছে সে। ছেলে-বেলায় দু'একটা গল্প লিখেছিল। আবার নজর গেল কবিতা রচনার দিকে। কবিতা তো অনেক লেখা হল, কিন্তু প্রকাশক নেই। বহু প্রকাশক ফিরিয়ে দিল পাণ্ডুলিপি। শেষ পর্যন্ত নিজেই কিছু টাকা সংগ্রহ ক'রে কবি নিজেই ছাপলেন কবিতা সংকলন। সাময়িক পত্রগুলিতে পাঠালেন সমালোচনার জন্যে। কিন্তু প্রাপ্তি-সংবাদ জানিয়েই তারা চুপ ক'রে গেল। তখন কবি নিজেই কবিতা সংকলনটি ডাকে পাঠাতে লাগলেন বিখ্যাত কবি, সাহিত্যিকদের কাছে। সঙ্গে থাকল একটি ক'রে চিঠি। বইয়ের দাম পাঠিয়ে দেবার অনুরোধ জানিয়ে। অনেকে তাঁর অনুরোধে সাড়া দিলেন। ধীরে ধীরে কবি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। এই ইংরেজ কবি উইলিয়ম হেনরী ডেভিস।

সাহিত্য-সংবাদ

মাত্র বত্রিশ বছর বয়েস জন আপ ডাইক এর। তাঁর সাহিত্যিক খ্যাতি আমেরিকার ভৌগোলিক সীমা অতিক্রম ক'রে এখনো পৃথিবীর অন্যান্য দেশে তেমন ছড়িয়ে পড়েনি। তবু তিনি গত দশকের একজন শক্তিমান লেখক হিসেবে ইতিমধ্যেই প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন। তাঁর সাম্প্রতিক কালের প্রতিটি রচনা-ই স্বকীয়তার উজ্জ্বল। মানব-চরিত্র বিশ্লেষণে তিনি আশ্চর্য দক্ষতা দেখিয়েছেন। বিস্ময়কর ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন এ যুগের জটিলতা অংকণে।

জন আপ ডাইক-এর জন্ম ১৯৩২ সালে। পেনসিল ভানিয়ার অন্তর্গত সিলিংটন-এ। শিক্ষা-কাল অতিবাহিত হয়েছে সেখানকারই স্কুলে, হার্ভার্ড কলেজে, পরে অক্সফোর্ড-এর রাস্কিন স্কুল অব ড্রয়িং অ্যাণ্ড ফাইন আর্ট-এ। ১৯৫৫ থেকে ১৯৫৭ এই দু বছর সংশ্লিষ্ট ছিলেন 'নিউ ইয়র্কার' সাময়িক পত্রের সঙ্গে। অসংখ্য ছোটগল্প, সরস প্রবন্ধ লঘু গদ্য এবং কবিতা রচনা ক'রে তিনি এই সাময়িক পত্রটিকে সমৃদ্ধ ক'রে তুলেছিলেন। এই সব রচনার কয়েকটি সংকলন ও প্রকাশিত হয়েছে। 'র‍্যাবিট, রান', 'দি পুয়োরহাউস কেয়ার' ইত্যাদি উপন্যাস, 'পিজিয়ন ফেদার্স,' 'দি কেস ডোর' নামে দু'টি ছোট গল্প—সংকলন, 'দি ম্যাজিক ফ্লুট,' নামে একখানা শিশু-সাহিত্য এবং 'টেলিগ্রাফ পোলস' নামে একখানা কবিতার বই প্রকাশ করে তিনি এর মধ্যেই মনোযোগী পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

জন আপ ডাইক তাঁর স্ত্রী এবং চারটি ছেলে মেয়ে নিয়ে ম্যাসাচুসেট-এর ইপস উইচ-এ বসবাস করেছেন। তাঁর কলম ভবিষ্যতে আরো চমৎকার সব রচনা উপহার দেবে—পাঠকদের এই প্রত্যাশা নিশ্চয়ই অসঙ্গত নয়।

• • • •

ফ্রাঙ্কফুট শহর প্রদত্ত গ্যেটে পুরস্কার এবছর পেয়েছেন ৭২ বৎসরের বৃদ্ধ প্রচারবিদ ও লেখক বেনো রাইকেলবের্গ। গ্যেটের ২১০ জন্মতিথি উপলক্ষে ঐতিহাসিক সাধু পালের গির্জায় গত ২৮শে আগষ্ট তাঁকে এই পুরস্কার দেওয়া হয়।

সাহিত্যের জন্য গ্যেটে পুরস্কার দেওয়া হয়না, দেওয়া হয় কবিতা, বিজ্ঞান বা অর্থনীতির কোন ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি বিশেষের প্রতি শ্রদ্ধায়। পশ্চিম জার্মানীর সাংস্কৃতিক ও বিদগ্ধ জগতে এই পুরস্কার একটি আকাঙ্ক্ষিত বস্তু। ফ্রাঙ্কফুটের শ্রেষ্ঠ সন্তানের নামে এই পুরস্কার দেওয়া শুরু হয় ১৯২৬ সন থেকে। গোড়ায় প্রতি বৎসর এই পুরস্কার দেওয়া হত কিন্তু এখন দেওয়া হয় তিন বৎসর অন্তর। প্রথম পুরস্কার পেয়েছিলেন কবি স্টেফান জর্জ। অন্য আর যারা এই পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন, তাঁরা হলেন, অ্যালবার্ট স্কাইটজার, সিগমুনট ফ্রয়েড, গেরহার্ড হাউপটমান রচয়িতা থমাস মান।' সাম্প্রতিক কালে এই পুরস্কার পেয়েছেন কবি কার্ল জুকমেয়ের পদার্থ-বিজ্ঞানী ও দার্শনিক কার্ল ফ্রিডরিশ ফন ভাইৎসেকের ও স্পেনিশ ওয়াল্টার গ্রোপিয়াস।

রাইকেনবের্গ ১৮৯২ সনে জন্মগ্রহণ করেন ও শিল্পকলা ইতিহাস লেখক রূপে জীবন শুরু করেন। প্রথম মহাযুদ্ধে অংশগ্রহণ করার পর, ১৯১৯ সনে তিনি ফ্রাঙ্কফুর্টের আইনুক সংবাদপত্র অফিসে যোগদান করেন। এরপর বৎসর দুই প্যারিসে কাটিয়ে তিনি ফ্রাঙ্কফুর্ট সংবাদ-পত্র অফিসে ফিরে এসে রাজনীতিক প্রবন্ধ লিখতে শুরু করেন। ১৯৩৮ সন থেকে তিনি বিভিন্ন সংবাদ-পত্রে লেখা দিতে থাকেন এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষ বৎসর থেকে বিজ্ঞান পাঠে মনোনিবেশ করেন। ১৯৪৪ সনে কয়েকজন বন্ধুর সহযোগিতায় রাইকেনবের্গ বর্তমান নামে একটি কাগজ প্রকাশ করেন। ১৯৪৯ সন থেকে ফ্রাঙ্কফুর্টের আলগেমাইনে ফ্রা আইনুক নামে এক সংবাদ-পত্রের সহপ্রকাশক তিনি আত্মপ্রকাশ করেন।

গোটের প্রতি রাইকেনবেগের ভক্তি অসাধারণ। সুযোগ পেলেই তিনি জার্মান যুবশক্তিকে গোটের কর্মজীবন থেকে প্রেরণা লাভ করতে উপদেশ দিয়ে থাকেন। রাইকেনবের্গ একজন পণ্ডিত ব্যক্তি এবং ঈশ্বরের প্রতি তাঁর বিশ্বাস অবিচল। কর্মজীবনে তিনি একজন সংবাদিক হলেও তাঁর শক্তিশালী ও মার্জিত রচনার গুণে সাংবাদিকতাকে তিনি উচ্চ মার্গে স্থাপন করেছেন।

ফরাসীদেশের সম্রাট হবার পর নেপোলিয়ন একদিন ছদ্মবেশে কর্সিকাদ্বীপে বেড়াতে গেলেন। পোষাক ছিল তাঁর সাধারণ গ্রাম্য লোকের মত। অবশ্য তাঁর শরীর রক্ষীরা একটু দূরে দূরেই রইলেন।

সেখানে একটা পাঠশালার গুরুমশায়কে তিনি চিনতে পারলেন তাঁর বাল্য বন্ধু বলে।

এগিয়ে গেলেন তিনি তাঁর কাছে। তারপর পরিচয় না দিয়ে বেশ খানিকটা আলাপ পরিচয় করে নিলেন। তারপর প্রশ্ন করলেন: তোমার এখন চলে কি শুধু মাষ্টারী করে? না আর কিছু কর?

—কি আর করব? ভাবছি একবার বোনাপার্টির কাছে চিঠি লিখব,—সে ছিল আমার বাল্যবন্ধু। কিন্তু ভয় হয়। সে হোল সম্রাট আর আমি একজন নগণ্য গ্রাম্য লোক। সে নিশ্চয়ই আমাকে ভুলে গেছে।

নেপোলিয়ন তখন আবেগে তার গলা জড়িয়ে ধরে বললেন: ভুলিনি বন্ধু— আমিই তোমার সেই পুরানো বন্ধু নেপোলিয় বোনাপার্টি!

এই প্রথম

লগ্ন

সুনীল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

একদা সুন্দরী বয়স্কা মহিলার মত এখন এই বাড়ীটারও সর্বাঙ্গে প্রৌঢ়ত্বের চিহ্ন।

কিছুক্ষণ আগের আলোর সমারোহ মিলে গেছে। এখন নিঝুম। অন্ধকার। কান পাতলে আপাত নিথর রাত্রির বিচিত্র রহস্যময় এক ধ্বনি শোনাও সম্ভব।

"মা, তোমার অনেক দুঃখ আছে জানি—অনেক চিন্তা; কিন্তু তবু আজকের দিনে তুমি কিছু না করলে আমি কেমন করে ওদের কাছে মুখ দেখাবো?…" অনেক দুপুরের কোন এক সময়ে দুলালের সরলমুখে সুরবালাদেবী এই বেদ শুনেছিলেন। সত্যিই তো আজ দুলালের ফুলশয্যা, হাসিখুশির দিন। তখনই তিনি মনে মনে কর্তব্য ঠিক করে ফেলেছিলেন।

সুরবালাদেবীর মনে এই মুহূর্তে সেই চিন্তাগুলি ছুঁয়ে ছুঁয়ে যেতে থাকল। অবসরে পর্যালোচনায় মন দিলেন।

হ্যাঁ, আমি স্থির ইচ্ছাকে কাজে লাগিয়েছি। পুঞ্জীকৃত প্রতিরোধের প্রতিজ্ঞায় সন্তানের জন্য স্বামীকে ঘুমের ওষুধ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখে এসেছি। বারান্দায় তিনি এখন ঘুমিয়ে আছেন বেঘোরে। অচেতন না কি এ একরকমের শুশ্রূষা! ভাগ্য দোষদর্শী। ভগবান সহিষ্ণু।

ওপরে নিজের ঘরে দুলাল আর আরতি বিছানায় এতক্ষণে নিশ্চই ঘুমে কাতর। রজনীগন্ধার গন্ধ এত তীব্র কেন? দুলালের ঘরে পাখা আছে। সোতলার এই ঘরে নেই। দুলালের বাবার ঘুম কি তেমন করে কোনদিন ভাঙবে না…চেতনা…?

সুরবালাদেবীর কল্পনা শরীর একটু দুলে। এখনো যেন মৃত চাঁদের মত সূর্যের কাছে তাপ খুঁজছে। এটা অবশ্য সোপন ব্যাপার। এই ঘরে তার ঠিক দুপাশে অনেকখানি জায়গা নিষিদ্ধ শূন্য।

তিনি হাতটা ছড়ালেন।…বুলবুলি যদি আজ বেঁচে থাকত? থাকলে এই নৈঃসঙ্গে পাশে মেয়ের গায়ে আলতো করে হাত দিলে বেশ খানি পাওয়া যেত। একটি মেয়ে এ বাড়ীতে এসেছে—দুলালের বউ হয়ে। পরের মেয়ে। আরতি। এখন তারও মেয়ে।

অনেক হাসাহাসি, হৈ হৈ এর পরে দুলের পাশাপাশি দুখান বিছানায় এখন দুজনে শুয়ে আছে। একটু আগে ভেবেছেন ঘুমিয়ে আছে। এখন ভাবছেন এত শিগ্‌গির কি আজকের দিনে ঘুমনো সম্ভব? ভাবতেই সুখের ব্যক্তিগত অতীত উঁকি মারে। নিজের জীবনের এই দিনের স্বাদ মনে করে লজ্জায় তিনি কেঁপে উঠলেন। আবার কি এক যন্ত্রণায় শক্ত হয়ে গেলেন।

—উঃ এত সময় কেন? সময় তো বেশী দূরে নয়। কেন এমন হলো…ওনার কি হবে? ভাল পাশ করেছেন…উকীল…অর্থে, প্রতিপত্তিতে উন্নতি করেছেন…নিজে হাউ হয়ে এসেছেন। তারপর?

তারপরের পরিণতির জন্যই আজকে নিষ্ঠুর না হয়ে উপায় ছিল না। দুপুর থেকে ভাবছিলেন। বিকেলে দুলাল, আরতী, নারায়ণের বন্ধুরা আসবে। সুতরাং—।

অনেক কিছু সহ্য হয় সুরবালাদেবীর। সহ্য করতে হয়। কিন্তু সহ্য হয় না স্বামীর দিকে তাকিয়ে তার কথা শুনে কারও মুখ করুণায় নরম হবে, বিরক্তিতে কাল হবে, কেউ পাগল ভাববে। তাই ওষুধে তাকে অচেতন করে রাখতে বাধ্য হয়েছেন। মেরে রেখেছেন।

বিচিত্র স্বামীর পাগলামী। কেবল অন্ধকারের অসংখ্য বিপরীতমুখী চেউকে উনি দেখেন। নিজের মনে অনর্গল কথা বলেন,—প্রলাপ বকেন, হাসেন আর অশ্লীল গালাগাল করেন। এই অর্দ্ধোন্মাদ ঘুম কি তার কখনো ভাঙবে? সুরবালাদেবী ভাবছেন, সব আলা যেন তার। কঠোর হয়ে অভাবের সংসারের হাল ধরলেন, স্বামী পুত্রদের দিকে দৃষ্টি রাখলেন। তবু জীবনের নক্সা কুচিকুচি হয়ে ছিঁড়ে যাচ্ছে। কঠিন মুঠোয় ধরা যায়। তবু অচকল দীপান্বিতায় ভাস্বর। কেবল আপন মনে বোবাপড়া।

সরল বড় ছেলে দুলাল বাবার পাগলামির সমালোচনা করে ও চেঁচায়। ছোট বুদ্ধিদীপ্ত ছেলে নারায়ণ হাত বাড়িয়ে মাকে আগলায়। দাদাকে বোঝায়। মা-ও ছোট ছেলের ইচ্ছাকে খুশী করতে ভালবাসার হাত প্রসারিত করেন। ছেলেকে বন্ধু হয়ে বলেন, 'চেনা-জানা কোন মেয়েকে পছন্দ হলে বলিস। গোপন করিস না; তিনি বোঝেন ছেলেদের খুশী থাকাই তার শান্তি। সংসারে রেখেছেন প্রশ্রয়ের শীতলতা।

আজকের দিনে যে চিন্তার দোলায় নিজে দুলছেন তা ঘড়িতে দেখতে গিয়েই এই রাতটা তাকে তাড়িয়ে তুলছে।

একটি মেয়ে এসেছে এ বাড়ীতে। পরের মেয়ে। শান্ত ভাল মেয়ে। কিন্তু—কিন্তু কেমন করে আরতি শ্বশুরের প্রতি স্নিগ্ধ হবে? যখন অন্ধকার চেউ ওদের ঘরের মধ্যে ফণা তুলবে, চিন্তার বিকৃত দাগগুলি ছোবল মারবে; তখন কেমন করে শ্বশুরের প্রতি স্নিগ্ধ হবে আরতি? তাঁর গালাগালিতে, চিৎকারে ব্যাপ্ত, অস্থির হয়ে ওঠে সকলে। আমার ভোঁতা অনুভূতির চেষ্টা দিয়ে আমি কত সামলাবো!

মনে আছে, একদিন হোটেলের নতুন আলা ভাড়াটে বউ এসে বলেছিলো—'কি কষ্টের কথা দিদি, আপনার স্বামীর মাকি মাথার দোষ।' সেদিন নিঃশব্দে বিষণ্ণ মুখে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলাম। কিন্তু নিজের ঘরে—দুলালের খাটে যে মেয়ে ঘুমিয়ে আছে তার মুখের উপর কেমন করে দরজা বন্ধ করবো? প্রথম প্রথম করুণার নরম হবে, তারপর বিরক্তিতে কমে, নিঃস্পৃহ। ওষুধে সরিয়ে রেখে মাঝখানে একটি অনিবার্য বিবর্ণ পাঁচিল মাথা তুলবে। নিশ্চই। সেটাই স্বতঃসিদ্ধ।

ওপরের বারান্দায় ফিসের আওয়াজ। সুরবালাদেবী অন্ধকার রাস্তা খুঁজে খুঁজে ওপরে উঠলেন। দেখলেন, জানালোয়া রেখায় প্রেতের মত স্বামী দাঁড়িয়ে আছে রেলের হাতল ধরে। খুতাবিষ্ট চাউনি। সর্বাঙ্গে একটা তীব্র অভিযোগের করুণ মুদ্রা। রাস্তার উঁচু পোষ্টের আলোয় সুরবালার ছায়াকে দীর্ঘায়িত করেছে। মস্তিষ্কবাবু অস্পষ্ট।

"আমার ঘর আলো নিবিয়ে অন্ধকার করে রেখেছো কেন? দুলাল আর তার বউকে কেমন দেখাচ্ছে, আমি দেখলাম না তো।"

সেই মুহূর্তে দুলাল এবং আরতি ঘর থেকে বাইরে এলো। বেশবাস অগোছাল। দুলাল এসে

বাবার স্নেহ সংশয় হলো। মণিবাবু ছেলে বউয়ের দিকে তাকাল। তারপর বলল, 'ওদের গলার আওয়াজ কৈ? ওদের বন্ধুরা কোথায়?'

নারায়ণও ঘুম ভেঙে বারান্দা থেকে উঠে এসেছিলো। দু-ভায়ের দৃষ্টি বিনিময় হ'লো। নারায়ণ এগিয়ে এসে বলল, আপনি তো সবই দেখেছেন বাবা। আপনাকে না জানিয়ে এ বাড়িতে কিছু হতে পারে? আপনি বুঝে নেবেন। 'নরস্ত্রিতরা সব চলে গেছে। আপনাকে কেয়ারওয়েল জানাল। শুধু, এখন অনেক রাত। ঘুমিয়ে পড়ুন। খুশীর হাসিতে মণিবাবুর সমর্থনের তথ্য। বিছানায় বাবাকে শুইয়ে দিল নারায়ণ। তিনি বাধ্য শিশু হয়ে গেলেন। মাকে দোতলার ঘরে পৌঁছে দিয়ে বলল, 'তুমি ঘুমোবার চেষ্টা করো।'

খালি মেঝের প্রসারিত শূন্যতার মাঝে এসে সুরবালাদেবী বসলেন। অসহায় যেন এক জাহাজের নাবিক। ভাবছেন এখন কি আর ঘুম আসবে? অন্ধকারে কতক্ষণ মুখ ঢেকে রাখবেন? সকাল হবে। চারিদিকের দৈন্যরা নগ্ন হয়ে প্রকাশ পাবে। প্রকটভাবে অভাব মুখ দেখাবে। নতুন বউ, তার কাছে দৈন্যকে, অমুক স্বামীকে কেমন করে লুকাবে? কপালের দু-পাশ টিপে ধরলেন তিনি।

দুলালের ঘর অন্ধকার হয়েছে। ওরা কি এখন মৃদুগলায় ওনার বিষয়ে কোন কথা বলছে? দুলালকে কিছু জিজ্ঞাসা করছে কি? মনের অন্ধকার থেকে এক আশ্চর্য তীক্ষ্ণ শীতের অনুভব ছড়াতে লাগল সুরবালাদেবীর সারা গায়ে। তিনি উঠলেন। বিছানাড়ান পায়ে চুপিসারে ওপরে উঠলেন। নিজের ইচ্ছায় নিজেকে, নিঃশব্দে দুলালের ঘরজার দেওয়াল ঘেঁসে দাঁড়ালেন। তিনি কাঁপছেন, ভাবছেন।

ওদের মৃদুগলার কথা স্তিমিতে ধরা পড়ল। নরম গলায় আরতি বলছে, "……না, না আমার অত ভেবোনা……, শোন একটা কথা।

—কি?

—বলছি আমি তো টেলারীং স্কুলের টিউশনিটা ছাড়িনি। ছুটি নিয়েছি। তবু ভেবেছিলাম এরপর আর ওখানে ফিরবনা।

—হ্যাঁ, ঠিক কথা। ফিরবেনা ই তো!

—কিন্তু—না, ভাবছি চাকরিটা করি। তুমি অনুমতি দাও। তুমি ছাড়া……সংসারকে সুন্দর করতে হবে তো। বাবার জন্য তোমরা অনেক করেছো বুঝি, এবার এসো দু-জনে মিলে ভাল করবার চেষ্টা করি—।

—আরতি সত্যি তুমি—উঃ—

—এই আস্তে, অসভ্য—।

সুরবালাদেবী তাড়াতাড়ি সরে এলেন। ফিরে এলেন নিজের ঘরে। শূন্য ঘরে তবু মনে হলো সঙ্গে কি যেন মহৎ কিছু নিয়ে এলেন, কিসের এক সুখকর যন্ত্রণায় অভিভূত। নিজেকে হাল্কা মনে হলো। অভিনন্দনের হাসি ছড়িয়ে গেল চেতনে।

আমি জানি, আরতী ওনার চেতনা চিরদিনের জন্য বাঁচাতে পারবেনা। ওর এই মুহূর্তের সততার দৃঢ়তা শিথিল হয়ে যাবে। নিষ্প্রাণ হয়ে পড়বে। সব সময় কি এইরকম স্থির হতে পারবি আরতি? পারা যায় না। তবু আরতী তুই আমার বুলবুলি। তুই আমার মেয়ে—যাকে আমি পনের বছরের করে হারিয়েছি। তুই যে আমাকে মা বলে ডেকেছিস, আমার দুলালকে ভালবেসেছিস এবং ওনাকে ভালবাসতে যাচ্ছিস্, এতেই যেন আমাকে জিতিয়ে দিলি।

ফুলের গন্ধ যেন এতক্ষনে আসছে অনুভব করে। যেন তিমিরাবরণ ছিন্ন করে সন্তর্পণে রক্তরশ্মিকে দেখতে পেলেন তিনি।

বিচারক

মৃত্যুঞ্জয় মাইতি

ষ্টেশনের লাগত ঘরটার সামনে রীতিমত একটা ভীড় জমে উঠেছিল। যে যেখান থেকে পারছে, একে ওকে ঠেলে ঠুলে কোনো ভাবে লাজতে বন্দী প্রাণীটাকে একবার দেখবার চেষ্টা করছে। যে সব অফিস যাত্রী ট্রেন দশ মিনিট লেট হলে লাফালাফি শুরু করতো, তারাও খাবারের ঠোঙাটা হাতে ঝুলিয়ে পড়ছে একবার। ব্যাপারটা এমনি সাংঘাতিক লোভনীয়।

একটা বুড়ো সিপাহী ভীড়টাকে একটু হালকা করার জন্য অবশ্য মাঝে মাঝে 'হট যাও' 'হট যাও' করছিল। তবে তা মেহনৎ নোকরী বজায় রাখার জন্য!

অর্থাৎ ব্যাপারটি এই যে, বিনি পয়সায় রোজ রোজ এমন দৃশ্য দেখার সুযোগত জুটে না। আজ যদি জুটে গিয়ে থাকেত, ক্ষতি!

ভেতর থেকে মেয়েলি গলায় কে যেন এক গ্লাস জল চাচ্ছিল। সিপাহীজী ধমকে উঠল—চিল্লাও মৎ, বলনেসে প্যারি মিল যায়েগা। ক্যা, এ তোর শ্বশুর বাড়ী আছে?

ভীড়ের মধ্যে থেকে একজন রসিক দর্শক বলল—জেলখানাকে ত লোকে শ্বশুর বাড়ী বলে! তা ব্যাপারটা কি হয়েছিল হাবিলদার সাব!

হাবিলদার সম্বোধনে সিপাহীজী গোঁফে একটু তা দিয়ে নিল। যা লোকটা, মান ইজ্জত রেখে কথা বলতে জানে। অতঃপর একটু ভীড় সরিয়ে প্রশ্ন কর্তাকে হাজতের সামনে ডেকে নিয়ে এসে সিপাহীজী বলল—এ জেনানা লোক একদম পাগল হো গিয়া। দেখতে না—সিপাহীজী এবার তার ডান হাতটা তুলে ধরল।

হাঁ, তখনও হাতে ধনধনে লাল দাগগুলো জল-জল করছে।

ইতিমধ্যে আরও কয়েকটী লোকাল ট্রেন আসায় ভীড়টা আরও বেড়ে উঠেছিল। সকলেই একবার করে হাজতের ভেতরটা দেখে যাচ্ছে। এ রকম আগুনের মত কাঁচা বয়সের একটা মেয়েকে হাজতে আটকে রাখার সম্ভাব্য উত্তেজক কাহিনী বলতে বলতে চলে যাচ্ছে কেউ কেউ।

—ছেলেটা কোথায়।

—কোন্ ছেলেটা মশায়!

—আহা বা, এ রকম একটী মেয়েত আর একলা ঘর ছেড়ে আসেনা। সঙ্গে প্রাণের লোক কেউ আছেত। তা সেটাকে পুলিশ ধরেনি?

আর একজন বলে উঠল,—ওসব ব্যাপারই নয়, মশায় ষ্টেশনের এদিকটায় লোকজন বিশেষ কেউ আসে না। চাই চাই কাঠ সাজানো আছে, বেশ আড়াল হয়। বুঝলেন না, দিনের বেলাই ব্যবসা চলে।

কথাটা অবশ্য অনেকের মনে লাগল। কারণ মেয়েটার জামা কাপড় দেখে তাই মনে হওয়া স্বাভাবিক।

কিন্তু কলকাতায় এই প্রথমবার জনতার মত ঔৎসুক্য থাক, অফিস যাবার বেলা এক সময় তাতে ভাঁটা পড়ে। কাজেই কয়েকজন সখজীওয়ালা, কি দু'দশ জন ফিরতি যাত্রী ছাড়া হাজতের সামনে এখন বিশেষ কেউ অবশিষ্ট থাকলনা।

সিপাহীজী বুড়ো বড় বাবুর কানের কাছে মুখ নিয়ে কি যেন বলে একটু হাসল। বড় বাবুও কয়েকবার মাথা নাড়লেন,—ঠিক হ্যায়, ঠিক হ্যায়। মেয়েটা তখনও জল চাচ্ছিল; অবশ্য গলার স্বরে আগের মত জোর ছিল না।

বড় বাবু নিজেই একবার হাজতের সামনে উঠে গেলেন, বেশ রসিয়ে রসিয়ে দেখতে লাগলেন মেয়েটাকে। তারপর খুব দরদ দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলেন—কিরে চা খাবি?

বুড়ো দারোগা বাবুর কথায় দাঁত মুখ খিচিয়ে উঠল কুন্তী—চায়ে কাম নাই ভাঁড়ে করে একটু জল হলেই চলবে। কতক্ষণ থেকে সে জলের জন্ত চেঁচাচ্ছে।

কিন্তু জলটল না দিলেই কথা বের করার সুবিধে হয় বেশি। বিচক্ষণ দারোগা বাবু এ সব অস্ত্র ভালো করেই জানেন।

কিন্তু জানলেও কুন্তীর জন্ত তার দরকার হলনা। কারণ গ্রামের মেয়ে কুন্তী, আইনের প্যাচ সে বোঝেনা, যা ঘটেছে সব বলে গেল।

সেই সিপাহীটাই আবার তাকে বড় বাবুর কাছে নিয়ে এল। কুন্তীর ইচ্ছা করছিল, এবার আর দাঁতের কামড় নয়, ওর বুকে একটা লাথি দিতে পারলে সে বাঁচত। হারামজাদা, বুড়ো বয়সে! সিপাহী ওর হাতের শিশিটা কেড়ে নিল।

না আপত্তিকর কিছু পাওয়া যায়নি কুন্তীর কাছে। কুন্তী গাঁজা আফিঙের চোরাই চালানকারী দলের লোক, এমন কোন প্রমাণও নাই।

চার্জসীটে এ অভিযোগটা দেওয়া সেলনা, কারণ কোর্টে তা টিকবেনা। বুড়ো সিপাহীটা বলল—তবে হুজুর জিনানাটাকে জেলে ঢোকাবার কি হবে? এই দেখুন, কামড়টা, এখনও জ্বলছে, লাল হয়ে আছে! কী বদমাস মেয়ে! ছুটে পালাচ্ছিল, দৌড়ে গিয়ে ধরতেই এক কামড়।

দারোগাবাবু পড়েট পেয়ে গেলেন—হাঁ, নরহত্যার চেষ্টার অভিযোগ, পুলিসের কর্তব্য সম্পাদনে বাধা দান। ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারাগুলো পর পর বসিয়ে দিলেন তিনি! আর টিকিট ছাড়াই ট্রেনে ওঠা!

—হুজুর, সাজা হবে ত?

—হবে, হবে, তেমন ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে পড়লে, ছ'মাস একবছর ঠুকে দেবেন।

সিপাহীজী তার পাকা গোঁফে তা দিতে দিতে হাজতের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। ছেঁড়া জামা কাপড়ে এই সুন্দরী জওয়ান মেয়েটাকে দেখে বুড়ো সিপাহী আবার আগের মতই লুব্ধ হয়ে উঠছে।

প্রৌঢ় ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ বসুর এজলাসে, এই মামলাটা উঠল। সরকার পক্ষের উকীল কাহিনীটিকে বাড়িয়ে সুখরোচক করে একঘণ্টা বক্তৃতা দিয়ে দিলেন। মেয়েটির বয়সের চিত্র এঁকে যত রকমের কাল্পনিক সরস গল্প রচনা সম্ভব কিছু বাদ পড়লনা তাঁর মুখে। এজলাস লোকেভর্তী। সকলেই বিনা পয়সায় এক বিচিত্র প্রদর্শনী দেখতে এসেছে।

বক্তৃতার শেষে তিনি বললেন, আসামীকে ডাক্তারী পরীক্ষার জন্ত মেডিকেল হাজতে পাঠিয়ে দেবার আদেশ দেওয়া হোক। কারণ মেয়েটার মস্তিষ্ক বিকৃত, রেল-রক্ষীবাহিনীর একজনকে আচড়ে কামড়ে ক্ষত বিক্ষত করে দিয়েছে।

সরকার পক্ষের সাক্ষী সেপাহীজীও তার সাক্ষ্য দিয়ে গেল। ম্যাজিষ্ট্রেটকে হাতটা

দেখাতেও ভুললনা। জেল হাজতে পাঠাবার আদেশ দিতে গিয়ে ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ বসু বললেন—আসামীকে একবার দেখতে চাই। কোর্টে হাজির করুন।

—স্যার, আসামী একেবারে পাগল।

—হোক্ পাগল, আমি একবার দেখব।

উকিল, বড় বাবু, সিপাহীজী সব মুখ চাওয়া চাওয়ি করল। কিন্তু মিঃ বসু অত্যন্ত কড়া ম্যাজিষ্ট্রেট। একবার মুখ থেকে আদেশ বেরিয়ে গেলে আর ফিরবেনা।

কুন্তীকে নিয়ে এসে কাঠগড়ায় দাঁড় করান হল। রুক্ষ পিপাসার্ত মাথায় একরাশ রুক্ষ চুল, চোখ দুটো লাল। যেন পাথরে খোদাই করা এক চিরন্তন উত্তপ্ত যৌবন তার সারা শরীরে অক্ষয় হয়ে আছে।

হাঁ, কুন্তীকে দেখলে, পাগল বলেই মনে হয়। মিঃ বসু অনেকক্ষণ কুন্তীকে দেখলেন। তারপর নিজেই জেরা করতে শুরু করলেন।

—আচ্ছা তোমার নাম কি, মা! কুন্তী চুপ করে রইল।

—বল, বল, আমি ম্যাজিষ্ট্রেট। পুলিশ যা বলছে সব সত্যি কথা নাও হতে পারে। তোমার কি বলার আছে শুনতে চাই। তুমি কোথেকে আসছিলে! কুন্তী এতক্ষণে মুখ তুলে চাইল।

—আমি একটু জল খাব।

একজন সিপাহী তাড়াতাড়ি এক গ্লাস জল এনে দিল। মিঃ বসু কুন্তীর জল খাওয়া দেখছিলেন—যেন ওর মধ্যে একটা গ্রীষ্মের মরুভূমির পিপাসা লুকিয়ে ছিল।

—তুমি কোথেকে আসছিলে?

—গড়িয়া থেকে।

—তোমার স্বামীর নাম কি!

—কুন্তী স্বামীর নাম বললনা।

—তুমি টিকেট না কেটেই ট্রেনে আসছিলে। জানত আইন মতে তা অপরাধ।

—কেঁদে ফেলল কুন্তী—হুজুর, টিকেট কাটার মত পয়সা ছিল না।

—কেঁদনা, খুলে বল। তুমি সিপাহীর হাতে কামড়ে দিয়েছিলে?

—হাঁ হুজুর।

—কেন, কামড়ালে কেন?

—ও আমার গায়ে হাত দিয়েছিল।

সরকার পক্ষের উকিল কিছু বলার জন্য দাঁড়াতে, মিঃ বসু ধমকে বসিয়ে দিলেন তাঁকে। আসল ঘটনাটা তিনি জানতে চান। বিচক্ষণ বিচারক তিনি, অনুমান করছিলেন কোথাও কোন ঘটনা আছে!

—কি বললে মা, গায়ে হাত দিয়েছিল?

কুন্তী এবার কোন কথা বললনা। কেবল মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল।

মিঃ বসু, নিশ্চয়ই বুঝলেন, পুলিস জুলুম করেছিল আসামীর উপর। আসামী নিজেকে রক্ষা করার জন্য এ পথ বেছে নিয়েছিল। এ তার সতীত্ব রক্ষার চেষ্টা। তিনি বুঝতে পারলেন কুন্তী পাগল নয়, এরাই তাকে পাগল করেছে। কিন্তু আইনের চোখে কুন্তী অপরাধী। শাস্তি তাকে পেতেই হবে।

—আচ্ছা, তুমি মোড়ে পালাচ্ছিলে কেন!

—হুজুর স্বামীর বড় অসুখ কোলের বাচ্চা ছেলেটাকেও ফেলে এসেছি। এগারটা পঁচিশের ট্রেনে আমাকে ফিরতেই হবে।

ছেলের কথা বলেই কুন্তী আবার কেঁদে ফেলল। তার এগারটা পঁচিশের ট্রেনে ফেরা হয়নি। ছেলেটা কলোনীর উঠোনে ধুলো কাদায় পড়ে কেঁদে কেঁদে হয়ত ঘুমিয়ে পড়েছে এতক্ষণে!

মিঃ বসু ভাবছিলেন, কত বড়লোক, কলেজের ছাত্র, যারা সিগারেট আর সিনেমার পয়সা ওড়ায়, তারা ট্রেনে টিকেট না কেটে ওঠে, পুলিশ তাদের ধরে না। অথচ এই দরিদ্র মেয়েটিকে ধরল কেন।

মিঃ বসু ভাবছেন, আসামীকে জরিমানা দিতে হবে তা এমন কিছু নয়। কিন্তু পুলিশের কাজে বাধা দিবার জন্য আইন মতে ওর জেল হয়। আচ্ছা; স্বামীর অসুখের কথা বলছিল আসামী—তার কোন প্রমাণ আছে!

আবার জেরা করলেন মিঃ বসু—তোমার স্বামীর কি অসুখ।

—টাইফয়েড। আমি ওষুধ আনতে যাচ্ছিলাম।

মিঃ বসু যেন একটা ক্লিউ খুঁজে পাচ্ছেন।

—তুমি ওষুধ আনতে কোথায় যাচ্ছিলে।

—নীলরতন সরকার হাসপাতালে।

ওষুধ কিসে আনতে!

—শিশি ছিল হুজুর। সিপাহী কেড়ে নিয়েছে। সরকার পক্ষের উকীল উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—না, তার আসামীর হাতে কিছু ছিল না।

না, মিঃ বসু আইনের চোখে প্রমাণ করতে পারলেন না। আসামী কোলের শিশুকে রেখে দরিদ্র অসুস্থ স্বামীর জন্য ওষুধ আনতে যাচ্ছিল, দেরি হবে বলেই পুলিশের হাত থেকে পালাতে চেষ্টা করে।

—তোমার কাছে পয়সা আছে না! ট্রেনের ভাড়া আর জরিমানা না দিলে, তোমায় যে অনেক দিনের জেল হয়ে যাবে!

কুন্তী তাড়াতাড়ি জামার ভেতর থেকে ন্যাকড়ায় বাঁধা কয়েকটা খুচরো পয়সা বের করল।

মিঃ বসু চমকে উঠলেন।—ওটা কি! ঐ কাগজটা।

—হাসপাতালে ওষুধ দেবার কাগজ, হুজুর

—দেখি! দেখি, নিয়ে এস ত।

মিঃ বসু দেখলেন, এস আর সরকার হসপিটালের ছাপ মারা একটি পেসেন্ট কার্ড।

হাঁ, এতক্ষণে তিনি লিখিত প্রমাণ পেয়েছেন, কুন্তী সত্যি তার স্বামীর জন্য ওষুধ আনতে যাচ্ছিল।

মিঃ বসু জরিমানার বাকি পয়সা নিজের পকেট থেকেই মিটিয়ে দিলেন।

আবার সরকার পক্ষের উকিল দাঁড়ালেন—স্যার, আসামী নিজে স্বীকার করেছে সে সিপাহীকে আহত করেছে। এ অপরাধে, দণ্ডবিধির ধারা অনুযায়ী আসামীর শাস্তি হওয়া উচিত।

মিঃ বসু গম্ভীর হয়ে বললেন—হাঁ, শাস্তি হবেই। তারপর রায় লিখে দিলেন,—আদালতের কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত আসামীকে আটক রাখার দণ্ডে দণ্ডিত করা হল।

ঘড়ির দিকে তাকালেন তিনি। বেলা একটা। বললেন, আদালতের কাজ আজ এই খানেই শেষ।

মিঃ বসু নিজের কামরায় চলে গেলেন। যাবার সময় টাকা দিয়ে আরদালিকে বলে গেলেন, ওকে টিকেট কেটে ট্রেনে তুলে দিয়ে এস।

কুন্তী কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে, তখন শুধু স্বামী এবং ছেলেটার কথা ভেবে ভেবে কাঁদছিল।

প্রেমেন্দ্র মিত্র

সুতি দোলায়

লণ্ঠনের আলোটার দিকে চম্পাও তখন কেমন যেন শঙ্কিত বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে। অন্ধকারে তার মুখের ভাব ভালো করে, বোঝবার নয়। কিন্তু তার টান হয়ে দাঁড়ানো দেহের ভঙ্গিতে একটা অস্বাভাবিক কিছুর যেন আভাস।

হয়ত আমারই মনের ভুল ভেবে আগের কথার জের টেনে বললাম, আমায় এগিয়ে দিতে চেয়েছিলে তার দরকার নেই। এখানেই দাঁড়িয়ে যত সংক্ষেপে হোক এসব রহস্যের মূলটা কি তা অন্ততঃ জানাও।

চম্পা কোন উত্তর দিলে না। আমার কথাটা মন দিয়ে শুনেছে কিনা তাও বোঝা কঠিন। এক দৃষ্টে সেই লণ্ঠনের আলোর দিকেই সে তখন তাকিয়ে আছে। লণ্ঠনের আলোটা তখন আরো অনেক কাছে এসে পড়েছে।

এ লণ্ঠন কার হাতে জ্বলছে সে বিষয়ে একটা অনুমান আমি তখন করে ফেলেছি।

অনুমান যে ভুল নয় লোকটি লণ্ঠন নিয়ে কাছে এসে দাঁড়াবার পরই তা বোঝা গেল। নদীর চড়া থেকে আসবার পথে যাকে দেখেছিলাম সেই লোকটিই। নদীর পাড়ে ওরকম অসময়ে লণ্ঠন হাতে তার উপস্থিতিই একটু অদ্ভুত লেগেছিল। দূর থেকে লণ্ঠনের আলো দেখেই চম্পার অস্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াটুকুতে কিছুটা অবাক হয়েছিলাম। কাছে আসবার পর লোকটির প্রথম কথাতেই সত্যিই বিস্ময় বিমূঢ় হলাম।

লণ্ঠন নিয়ে চলে যেতে যেতে লোকটি আমাদের দেখতে পেয়েই যেন দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর একটু এগিয়ে এসে লণ্ঠন তুলে চম্পাকে দেখে যেন একেবারে আনন্দে বিস্ময়ে বিহ্বল।

উত্তর বিহারের মেশওয়ালী ভাষায় লোকটি যা বললে, তার সোজা বাংলা হ'ল—তুই! এখানে বেটী! আমায় তাহলে ভুল খবর ওরা দেয়নি।

চম্পা আষাঢ় কাঠের পুতুলের মত তখন দাঁড়িয়ে। লণ্ঠনের অনুজ্জ্বল আলোতেও মনে হ'ল তার মুখটা সমস্ত রক্ত সরে গিয়ে কেমন যেন বিবর্ণ হয়ে গেছে।

ঠোঁট নেড়ে কি যেন সে বলবার চেষ্টা করলে। কিন্তু গলা দিয়ে তার কোন শব্দই বার হ'ল না। এটি আতঙ্ক না বিস্ময় বিহ্বলতা চম্পার মুখ দেখে বোঝবার উপায় নেই।

লোকটি নিজেই আবার ভাঙা খসা গলায় বললে—চার মাস ধরে তোকে কোথায় না

খুঁজেছি মা। যে যেখানে খবর দিয়েছে সেখানে ছুটে গেছি। সব জায়গায় হতাশ হয়ে তোর দেখা পাবার আশা ছেড়েই দিয়েছিলাম।

লোকটি আবেগের মাথায় আরো অনেক কিছু হয়ত বলত কিন্তু চম্পাই এবার বাধা দিলে। এতক্ষণে সে নিজেকে বোধ হয় সামলে নিতে পেরেছে। তার গলার স্বরে অন্ততঃ তাই মনে হ'ল। একটু কঠিন হলেও প্রায় সহজ কণ্ঠে সে বললে, ওসব কথা এখন থাক চাচাজি। মন্দিরে আপনি একটু অপেক্ষা করুন। আমি এঁকে একটু এগিয়ে দিয়ে আসছি।

এঁকে বলে চম্পা আমার দিকে ইঙ্গিত করতে চাচাজি যেন এই প্রথম আমাকে সবিস্ময়ে লক্ষ করলেন। বিস্ময়ের সুরটা জিজ্ঞাসার মধ্যেও প্রকাশ পেল।

—এঁকে ত ঠিক চিনতে পারছি না!

না, এঁকে আপনি চেনেন না। চম্পার গলার স্বর প্রায় রূঢ়, —ইনি নিখিলবাবুর ছেলেবেলার বন্ধু। আচ্ছা আপনি যান। আমি এখনই আসছি।

চাচাজির উত্তরের জন্যেও অপেক্ষা না করে চম্পা আমার আগেই সামনের দিকে এগিয়ে গেল। তার সঙ্গে যেতে গিয়ে শেষবারে পেছন ফিরে দেখলাম চাচাজি লণ্ঠনটা তখনও তুলে ধরে মুখে কেমন একটা অদ্ভুত হাসি নিয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছেন।

অন্ধকারে খানিকদূর পর্যন্ত নীরবেই হাঁটলাম দু'জনে।

বলবার কথা আমার অনেকই ছিল, কিন্তু অপেক্ষা করছিলাম এই অপ্রত্যাশিত সাক্ষাতের পর চম্পা কি বলে তা শোনবার জন্যে।

চম্পাই, অবশ্য প্রথম কথা বলল কিছুক্ষণ বাদে। কিন্তু যা আশা করেছিলাম সে বিষয়ে কিছু না।

কিছুদূর আমার উপস্থিতি পর্যন্ত যেন ভুলে গিয়ে চম্পা নিজের মনে চলে এসেছিল। হঠাৎ এক জায়গায় থেমে গিয়ে বললে, আর যাব না। এবার আপনি পথ চিনে যেতে পারবেন নিশ্চয়।

সত্যিই মেজাজটা গরম হয়ে উঠল। গলার ঝাঁঝটা গোপন না করেই বললাম, আমার পথ চেনাবার যে দরকার নেই সে কথা'ত আগেই বলেছি। আমায় এগিয়ে পথ চেনাতে এসেছিলে না তোমার চাচাজির কাছ থেকে তাড়াতাড়ি সরিয়ে আনবার জন্যে!

যা আপনি বোঝেন!—চম্পার গলাটা বেশ তিক্ত।

আমার বোঝা না বোঝায় তোমার কিছু আসে যায় না জানি!—চম্পার গলার তিক্ততার উপযুক্ত জবাবের সুরেই বললাম—কিন্তু আমি এখন যা বলছি তাতে তোমার হয়ত কিছু আসতে যেতে পারে। তোমার চাচাজির হঠাৎ এই আবির্ভাব আমার কাছে খুব স্বাভাবিক ঠেকছে না। এ বিষয়ে নিখিলের কিছু বলবার আছে কি না আমি জানতে চাই। তাকে গিয়ে আমি সব কথাই বলছি।

বলুন! তাই বলুন! চম্পা যেন অকারণে হঠাৎ উত্তেজিত ব্যাকুল হয়ে উঠল। আগ্রহভরে আমার হাতটা সজোরে চেপে ধরে বললে,—আপনাকে আগেও একবার অনুরোধ করেছি, আবার করছি। আপনার বন্ধুকে যা খুশি বলে এখান থেকে নিয়ে চলে যান। নিয়ে যান ভোর হবার আগেই। সত্য মিথ্যা যা আপনার মনে আসে ওকে বলতে পারেন। বলতে পারেন তাঁর বিরুদ্ধে সরকার

একটা ষড়যন্ত্র হচ্ছে। আর ষড়যন্ত্রের মূল আমি। বলতে পারেন আমাকে না তাড়ালে উনি মেরেও উঠবেন না ওঁর বিপদ কখনো কাটবে না।

স্তম্ভিত হয়ে কোন কথাই এবার বলতে পারলাম না। চম্পাই আমার হাতটা ছেড়ে দিয়ে মিনতির সুরে আবার বললে—পয়সা কড়ির জন্যে ভাববেন না। ওঁর ঘরের আলমারীতে একটা ক্যাশ বাক্স পাবেন। তাতে নগদ টাকা যা আছে তাতে ছ'মাস যে কোন জায়গায় নিশ্চিন্ত ভাবে অজ্ঞাতবাস করতে পারবেন। ছ'মাস বাদে কোন বিপদ যে আর ওঁর থাকবে না এটুকু জোর করে আপনাকে বলতে পারি। এই নিন আলমারী আর ক্যাশবাক্সের চাবি।

সত্যি কোমরে গোঁজা রুমালটা বার করে তা থেকে চাবির রিংটা খুলে নিয়ে চম্পা আমার হাতে দিতে এল।

হাতটা সরিয়ে দিয়ে একটু তিক্ত হাসির সঙ্গে বললাম,—অজ্ঞাতবাসে তোমার হুকুম তামিল করতে চাইলেও ছ'মাস নিখিলকে নিয়ে অজ্ঞাতবাস করা কি আমার পক্ষে সম্ভব!

হ্যাঁ, তা সম্ভব নয় বটে!

বিদ্রূপ কিন্তু নয়, এবার চম্পার গলায় যেন ক্লান্ত হতাশা।

চম্পার সেই অসহায় গলার সুরটিতেই মনের ভেতর কোথায় যেন কি হয়ে গেল। মেয়েটি দুর্বোধ্য। তার চারিধারে একটা রহস্যের আবরণ। সে রহস্য দুর্ভেদ্য বলেই তার বাইরের শীতল কাঠিন্য দেখে তার ওপর বোধ হয় অবিচার করেছি এতদিন।

একটু গাঢ় স্বরেই বললাম এবার,—কোথায় তোমাদের জীবনের ছন্দ তা আমি জানিনা চম্পা, সুযোগ থাকতেও তা আমায় জানাওনি বলে মনে বেশ একটু ক্ষোভও যে তোমার বিরুদ্ধে আছে তা অস্বীকার করব না। তবু বলছি আতঙ্কে ভয়ে হতাশায় যে কঠিন অস্বাভাবিক সমাধানের কথা তুমি বলছ, তোমাদের সমস্যা মেটাবার তার চেয়ে সহজ স্বাভাবিক রাস্তাও থাকতে পারে।

না নেই! নেই!—একটা রুদ্ধ কান্নার স্বরই যেন ঘরের অন্ধকার বিদিয়ে গেল।

চম্পা অমন হঠাৎ চলে যাবে ভাবতে পারিনি।

কেমন বিমূঢ় বিহ্বল হয়েই খানিক দাঁড়িয়ে রইলাম। তারপর নিখিলের ঘরের দিকেই ফিরলাম মনের মধ্যে অস্বস্তিকর একটা প্রশ্ন নিয়ে।

প্রশ্ন আমার নিজেকে নিজের আচরণ নিয়ে।

বহুদিন আগেকার বন্ধুর ডাকেই তার কাছে আমি প্রথম এসেছি সত্য। কিন্তু তারপর নিজের মূল কৌতূহল চরিতার্থ করাই কি আমার কাছে বড় হয়ে ওঠেনি। নিখিলের জীবনে যে রহস্যই থাক তা ভেদ করবার এ উগ্র আগ্রহ এক রকমের কদর্য লোলুপতা নয় কি! কে জানে কি তাদের জীবনের জটিল রহস্য কিন্তু বাইরে থেকে একরকম অনধিকার প্রবেশ করে সাহায্য চুরে থাক আমি শুধু অকারণ উপদ্রবই হয়ে উঠছি বোধ হয়। নিখিল ও চম্পার রহস্য তাদেরই থাক। নাই বা তা আমি জানলাম। নিজের অসুস্থ কৌতূহল সংবরণ করে নিঃশব্দে যদি আমি এখন সরে যাই লাভ হোক বা না হোক কোন ক্ষতি কারুর হবে না। চম্পা নিখিলকে যেমন করে হোক বুঝিয়ে সুঝিয়ে তাকে নিয়ে চলে যেতে বলেছে। তার বদলে আমিই যদি কাউকে কিছু না জানিয়ে চলে যাই! ভোর হতে না হতে চলে গেলে কেউ কিছু জানতেই পারবে না মনে হয়। নিখিল এখন

নিশ্চয় ঘুমের ওষুধ খেয়ে তার ঘরে তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে। চাচাজির সঙ্গে এই সাক্ষাতের পর মন্দিরের পুজো ছেড়ে চম্পাও তোরের আগে বাড়ি ফিরবে বলে মনে হয় না। আর তোর পর্যন্ত অপেক্ষা করবারই কি দরকার। দুখনকে জাগিয়ে এই রাতেও একটা টাঙা নিশ্চয় ডাকানো যায়। নিজের সামান্য মালপত্র নিয়ে নিখিল ও চম্পার জন্যে একটা চিঠি রেখে এখুনি যদি ষ্টেশনে রওনা হই তা হলে বাধা দেবার কেউ নেই। রাত্রে যতদূর জানি কোন ট্রেন নেই। বাকি রাতটা ষ্টেশনের ওয়েটিং রুমে কাটিয়ে দিয়ে তোরের দিকের ট্রেনটা ধরতে পারলেই জীবনের এই পর্বটার ওপর সম্পূর্ণ যবনিকা ফেলতে পারি।

এই সংকল্প নিয়েই নিখিলের বাসার দিকে এগিয়ে গেলাম। চম্পা রুদ্ধ কান্নার স্বরে তার শেষ কথাগুলো বলে চলে যাবার পরই এ সঙ্কল্প অস্ফুট ভাবে মনে জেগেছিল। তা না হলে চম্পার পিছুপিছুই আবার মন্দিরের দিকে ফিরে যেতে পারতাম। তার জন্যে বিশেষ কিছু অজুহাতেরও দরকার হ'ত না। শেষ পর্যন্ত মন্দিরের পুজোয় উপস্থিত থাকতে চাই এই অভিপ্রায়টুকু জানানই যথেষ্ট হ'ত। তারও প্রয়োজন হ'ত কি না সন্দেহ। মন্দিরে আবার ফিরে যাবার জন্যে চম্পা কোন কৈফিয়ৎ তলব করত না নিশ্চয়।

কৌতূহলের কারণও কম ছিল না। কে চম্পার এই চাচাজি! কোথা থেকে হঠাৎ তিনি নিখিল ও চম্পার এই গোপন ঠিকানার সন্ধান পেয়ে অমন অদ্ভুতভাবে এসে উদয় হলেন। তাঁকে দেখে চম্পার ওই অস্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ার মূল কি? এমন অনেক প্রশ্নের উত্তরের জন্যেই মন যে বেশ একটু অধীর হয়ে ওঠেনি এমন নয়। কিন্তু নিজের প্রতি নিজের কঠিন প্রশ্নই সমস্ত কৌতূহলকে স্তিমিত করে দিয়েছে। নিজেকে অকপটভাবে বিচার করে এই সিদ্ধান্তেই পৌঁছেছি যে অতৃপ্ত কৌতূহলের যন্ত্রণা যত তীব্রই হোক তা দমন না করতে পারলে নিজের কাছে আমি কুণ্ঠিত লজ্জিত হয়ে থাকব।

সমস্ত দ্বিধা দুর্বলতা জয় করে নিখিলদের ছেড়ে চলে যাবার দৃঢ়-সঙ্কল্প নিয়ে নির্জন নিরালোক রাস্তাটা পেরিয়ে খানেক বাড়ির বাইরের নিচু কাঠের গেটটা খুললাম।

কাঠের নিচু গেটটা আগলাবার প্রয়োজনে নয় শুধু বাহারের জন্যেই রাখা। দিনের বেলা গেটটা সাধারণতঃ ভেজানই থাকে। রাত্রে একটা ছিটকিনি লাগান হয় নেহাৎ নিয়ম হিসাবে। গেটের কাঠের ফালির ফাঁক দিয়ে হাত গলিয়ে বাইরে থেকে সে ছিটকিনি খোলা যায় অবাধাসে। শুধু হাতলটা নেড়ে নেড়ে খোলবার সময় শব্দ হয় একটা বিশ্রী।

নিস্তব্ধ রাত্রিতে সেই বিশ্রী শব্দটা হবার সঙ্গে সঙ্গে মনের একটা ছোট সামান্য তার যেন কেঁপে উঠল। কিন্তু তাতেই একটা রহস্য তখন পরিষ্কার হয়ে গেছে।

চম্পার চাচাজি বলে জানবার আগে লণ্ঠন হাতে লোকটিকে দেখে কেমন একটু চেনা চেনা মনে হয়েছিল।

ঠিক চেনা না হলেও মনে হয়েছিল লোকটিকে যেন আগে কোথাও কখনও দেখেছি। কোথায় দেখেছি, এবং সত্যিই দেখেছি কিনা স্মরণ করতে না পেরে একটু অস্বস্তিও বোধ করেছিলাম।

গেটের ছিটকিনির শব্দে সেই অস্বস্তির স্মৃতিটা স্পষ্ট হয়ে উঠল।

আগের দিনই সকালে বারান্দায় বসে থাকবার সময়ে লোকটিকে এই গেটের ধারেই দেখেছি বলে মনে হয়।

ডেক চেয়ারে পা এলিয়ে একটা বইএ মনোযোগ দেবার চেষ্টা করছিলাম। হঠাৎ গেট খোলার ওই বিশ্রী শব্দে চমকে তাকিয়ে লোকটিকে গেটের বাইরে দেখতে পাই।

বেড়িয়ে ফিরে আসবার পর আমিই কি খেয়ালে ছিটকিনিটা এঁটে দিয়েছিলাম। লোকটি বাইরে থেকে সেটা খোলবার চেষ্টা করছিল।

আমায় তাকাতে দেখে লোকটি কি ভেবে গেট খোলার চেষ্টা ছেড়ে একটু যেন ভুষ্টিভাবে আমায় ডেকে হিন্দীতে বলেছিল—একটু শুনবেন বাবুসাব।

আমার উঠে যেতে হয়নি। তখন সাইকেল নিয়ে তখন বাজারে বার হচ্ছে। সে-ই গেটের ধারে গিয়ে দু একটা কি কথা বলবার পর লোকটি চলে গেছল গেট থেকেই।

তখনকে ডেকে সেহাৎ সাধারণ কৌতুহলে লোকটি কোথা থেকে কেন এসেছিল জিজ্ঞাসা করছিলাম। তখন জানিয়েছিল যে লোকটির নাকি দেশোতী ঘি এর ব্যবসা আছে। বড় বড় ঘরে ঘি বিক্রী করে। খাঁটি ঘি আমাদের চাই কি না খোঁজ নিতে এসেছিল।

খাঁটি ঘি-এর খবর খুঁজে বেড়ানো একটু মজার লাগলেও ব্যাপারটা মনোযোগ দেবার মত মনে করিনি।

এখন হঠাৎ মনটা তীব্র সংশয়ে ভরে গেল।

চম্পার চাচাজির আগে থাকতেই এ বাড়ির ঠিকানা তা হলে জানা ছিল। চম্পাকে যেন হঠাৎ দেখে বিস্ময় বিহ্বলতা তাহলে তার ভাণ!

কিন্তু কেন এ অভিনয়?

ছদ্মপরিচয় দিয়ে এ বাড়িতে ঢোকবার চেষ্টারই বা অর্থ কি?　　[ক্রমশ

• • • •

প্রসিদ্ধ মুষ্টিযোদ্ধা জনসনকে একবার এক ব্যক্তি প্রশ্ন করেন: আচ্ছা মুষ্ট্যাঘাত করবার সময় আপনার মনে কি একটুও দয়া আসে না।

জনসন বল্লেন: আজ্ঞে হাঁ, আসে বৈকি? কিন্তু যখন ভাবি আমি দয়া দেখালেও প্রতিপক্ষ দয়া দেখাবেন না, তখনি আমার মনে আর দয়ার অধিগতা থাকে না।

এঁর কথা কখনও শুনেছেন কি ?

"মরণ প্রাচীর" বিজয়িনী প্রথম নারী

বয়স বত্রিশ নাম ডেজি। ডেজি কুক, মিউনিখের এক অফিসে সে সেক্রেটারির কাজ করে। গত শীতকালে টেলিভিশনে আল্পস পর্বতমালার আইগার পর্বতের ছবি দেখতে দেখতে হঠাৎ তার খেয়াল হ'ল আইগারের চূড়োয় উঠতে হবে। কোনদিন ডেজি পাহাড়ে চড়েনি। সমুদ্রের ধারে সে মানুষ। শরণার্থী হিসেবে ১৯৪৪ সালে সে জার্মানীতে এসেছিল এবং সেই অবধি সে মিউনিখেই রয়ে গেছে। বছর তিনেক আগের কথা অত্যন্ত দুঃসাহস দেখিয়ে ডেজি ডলোমাইট পাহাড়ে উঠেছিল। ঐ খেলাতেও ডেজি বেশ নাম কিনেছে ও ইতিমধ্যে মোটা পঞ্চাশেক পুরস্কার পেয়েছে। এখন সে পুরোদস্তুর আলপাইন ক্লাবের একজন সভ্য। তবে ডলোমাইট পাহাড়ে ওঠা এক কথা আর আইগার পাহাড়ে ওঠা আরেক কথা। আইগার পাহাড়ে উঠতে গেলে ৫৪০০ ফুট খাড়া দেয়াল আছে যাকে বলা হয় মরণ প্রাচীর।

মেয়ের কথা শুনে মা আৎকে উঠলেন, বন্ধু-বান্ধবরা বারণ করলেন। সবাই তাকে নিরস্ত করার বহু চেষ্টা করা সত্ত্বেও ডেজি কারুর কথায় কান না দিয়ে মিউনিখের ২৪ বছরের ইঞ্জিনীয়ার ভেরনের রিটনেরকে নিয়ে পাহাড়ের পথে একদিন পা বাড়ান। দুজনে দিনেরবেলা সেই বিপজ্জনক পাহাড়ের গা বেয়ে ওঠে আর রাতে পাহাড়ের ফাঁকে-ফোকরে বিশ্রাম করে। এইভাবে তিনদিনের দিন তারা আইগার পাহাড়ের চূড়োয় গিয়ে উঠলো। ডেজি ও তার সঙ্গীরা এখানে সম্বর্ধনা জানালেন মিউনিখের পাহাড়ী পথ-প্রদর্শক টোনি হিবলের। অন্য পথে তিনি তাদের দুজনকে নামিয়ে আনলেন। নিচে এসে ডেজি জানালো যে প্রথমে সে স্নান করে বিয়ার খেয়ে চুল বাঁধবে এবং তারপর সে তার অভিজ্ঞতার কথা বলবে।

আইগার পর্বত জয়ের ফলে ডেজি রাজধানি অসামান্য খ্যাতি লাভ করেছে। এই দুঃসাহসী নারীর বিজয় অভিযান সারা পৃথিবীর সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত হয়েছে। ডেজি জানিয়েছে যে আল্পস অনেক পাহাড়ে ওঠার তার ইচ্ছা আছে কিন্তু মরণ প্রাচীর বেয়ে আর আইগার পাহাড়ে ভুলেও নয়।

একবার পড়ে দেখুন !

জান্তব দেহ-নির্যাসের দ্বারা রোগ নিরাময়

নিহত পশুর দৈহিক নির্যাস থেকে জার্মান, ফরাসী ও সুইস চিকিৎসকরা যে পেটেন্ট ওষুধ তৈরী করেছেন সেটি হৃৎপিণ্ড, রক্তবাহী নালী, যকৃৎ, পাকস্থলী ও পাকস্থলীর ক্ষৈষ্মিক ঝিল্লিসংক্রান্ত রোগ-সমূহে আশ্চর্য উপকার দিয়েছে।

মানব-দেহের ওপর এই নির্যাসের উপকারিতা সম্বন্ধে, চিকিৎসকরা বহুকাল থেকেই অবগত ছিলেন কিন্তু এই চিকিৎসা সম্বন্ধে নানা বাধা-বিপত্তি ও সন্দেহ ছিল। প্রধান বাধা ছিল বহিরাগত পদার্থের সংস্পর্শে দেহে একরকম প্রতিরোধী পদার্থ সৃষ্টি হয়ে যেটি "দৈহিক নির্যাসের" উপকারিতাই শুধু নষ্ট ক'রে না, অত্যন্ত জটিল রক্তসংক্রান্ত রোগের সৃষ্টি করে যাতে সময় সময় মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে। তবে এখন জার্মান ভেষজ রাসায়নিকরা এমন 'দৈহিক নির্যাস' তৈরী করতে সক্ষম হয়েছেন যাতে জান্তব প্রোটিন থাকেনা। ফলে মানব অঙ্গে জান্তব প্রোটিন উত্তেজিত প্রতিরোধী পদার্থের সৃষ্টি অন্তর্হিত হয়েছে।

কার্ডিয়লজের চিকিৎসক সম্মেলনে চিকিৎসকরা এই অভিনব নির্যাসের উপকারিতা সম্বন্ধে নানা তথ্য জানিয়েছেন। সম্মেলনে একজন চিকিৎসক জানিয়েছেন টাটকা নিহত পশুর হৃৎপিণ্ডের নির্যাস মানুষের হৃৎপিণ্ডে আশ্চর্য রূপান্তর ঘটায় ও অদ্ভুতভাবে তার কার্যকারিতা বৃদ্ধি করে ও ধমনীর মধ্যে এমনভাবে রক্ত চলাচলের উন্নতিসাধন করে যাতে দেহস্থ একান্ত প্রয়োজনীয় অক্সিজেন তাড়াতাড়ি ব্যবহার হয়। আসব নির্যাস ব্যবহার করে ধমনীকঠিন্যের মূল কোলেস্টেরিন জমা রোধ করা সম্ভব হয়েছে। হার্টের রোগে বহুক্ষেত্রে আসব নির্যাস থেকে তৈরী ওষুধ প্রয়োগ করে আশ্চর্য সুফল পাওয়া গেছে। হার্টের রোগের প্রথম আক্রমণের মুখে যদি পশুর হৃৎপিণ্ডের নির্যাস থেকে তৈরী ওষুধ ইঞ্জেকশন করা হয় তাহলে রোগ আয়ত্বের মধ্যে আসে ও নিরাময়ের যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে।

আপনি কি বলেন ?

মানসিক অশান্তি কি অকাল বার্ধক্যের কারণ ?

পশ্চিম জার্মানীর বিজ্ঞানী ও চিকিৎসকরা অকাল বার্ধক্যের কারণ অনুসন্ধানে তৎপর হয়েছেন। পূর্বের অনুসন্ধানের ফলাফল বিশেষ আশাব্যঞ্জক না হওয়ায়, অকাল বার্ধক্যের প্রকৃত কারণ খুঁজে বার করার জন্যে জার্মান রিসার্চ সোসাইটি বিজ্ঞানী ও চিকিৎসকদের কাছে আবেদন জানিয়েছে। ইতিমধ্যেই এসম্বন্ধে বহু পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু হয়ে গেছে। ইতিপূর্বে অবশ্য পশ্চিম জার্মানীর বহু বিজ্ঞানী বলেছেন যে মানসিক প্রভাব শুধু যে অকাল বার্ধক্য ডেকে আনে তা নয়, রক্ত চলাচল ব্যবস্থা ও হাড়েরও ক্ষতি করে। এসম্বন্ধে আরও বেশি জানা গেলে অকাল বার্ধক্যকে ঠেকানো চিকিৎসা-বিজ্ঞানের পক্ষে সহজ হবে। এ সম্বন্ধে জার্মান রিসার্চ সোসাইটির উদ্যোগে আরও গবেষণা চালিয়ে দেখা হচ্ছে যে ঔষধপত্র প্রসাধনী ও খাদ্য সংরক্ষক পদার্থগুলি মানুষের স্বাস্থ্যের কতদূর ক্ষতিসাধন করতে সক্ষম এবং সে সব মানুষের বংশগত দৈহিক গঠনের ওপর বাস্তবিক কোন প্রভাব বিস্তার করে কিনা।

এও কি সম্ভব ?

সমুদ্রে না গিয়েও ক্যাপটেন

বড় বড় জাহাজের অবিকল মডেল তৈরী করে পুকুরে কিম্বা নদীতে দূর-নিয়ন্ত্রণের সাহায্যে চালানো পশ্চিম জার্মানীর অনেকেরই শখের খেলা আর আজকাল জাহাজের মডেল তৈরী করা এতো জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে যে পাড়ায় পাড়ায়, খেলায় খেলায়, প্রদেশে প্রদেশে প্রতিযোগিতা হয়।

জাহাজের মডেল তৈরীর শখ সবচেয়ে বেশি রাইন-রুরের শিল্পাঞ্চলে যেখানকার ইস্পাত কারখানা ও কয়লাখনির মজুরদের অনেকেরই মডেল জাহাজের বহর আছে। প্রধানত তারা বড় বড় সমুদ্রগামী জাহাজের আসল মাপের অবিকল মডেল তৈরী করে। এমনি একজন দক্ষ মডেল নির্মাতার নাম সতর্নের মাইশ। কিয়েল বন্দরে তৈরী ক্রিশ্চিয়ানা জাহাজের সে একটা হুবহু মডেল তৈরী করেছে। 'কাজ থেকে ফিরে বাড়ীতে বসে এই মডেলটি তৈরী করতে তেরনেরের লেগেছে পুরো ন'মাস। আসল ক্রিশ্চিয়ানার অনুপাতে মডেলের মাপ হচ্ছে ১:৭৫। গতি, সমুদ্রগামিত্ব ও দক্ষতার প্রতিযোগিতায় এই মডেল জাহাজটি ইতিমধ্যেই জয়লাভ করেছে।

স্বপ্ন নয় সত্য।

হেনসেল ও গ্রেটেল-রূপকথা নয় খুনের কাহিনী

রূপকথায় গল্প লিখেও নিস্তার নেই। এই বিজ্ঞানের যুগে সবকিছুরই সত্যাসত্য যাচাই করা হয়। জার্মানীতে গ্রিম ব্রাদার্স বহুকাল আগে হেনসেল ও গ্রেটেল নামে এক চিত্তাকর্ষক রূপকথা লিখে বিখ্যাত হয়েছিলেন। এক ডাইনীকে ঘিরে এই রূপকথার কাহিনী। তারপর বহুকাল কেটে গেছে।

আজ এই রূপকথার কাহিনী নিয়েই তুমুল আলোড়ন শুরু হয়েছে আর সেই আলোড়নের মূলে রয়েছেন একজন মাষ্টারমশাই। হেন রূপকথা নেই জার্মানীতে যা এই মাষ্টারমশাই পড়েননি। স্পেসার্ট নামে এক জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ এই মাষ্টার মশায়ের মনে হ'ল চারদিকের পরিবেশ যেন বেশ পরিচিত বলে মনে হচ্ছে। হঠাৎ মনে পড়ে গেল যে হেনসেল ও গ্রেটেল রূপকথায় ঠিক এমনি দৃশ্যের বর্ণনা আছে আর অমি তাকে পেয়ে বসলো শিক্ষকের অনুসন্ধিৎসা যে অনুসন্ধিৎসা সার প্রেরণায় রাইনহিয় হ্রীমান নামে আরেকজন শিক্ষক হোমারের ইলিয়াড হাতে নিয়ে ট্রয়নগরীর ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করেছিলেন।

আমাদের এই নতুন ডিটেকটিভ মাষ্টার মশায়ের নাম জর্জ ওসেক। স্পেসার্ট জঙ্গলের প্রায় অর্ধেক জায়গা খোঁড়াখুঁড়ি করে ওসেক খুঁজে পেলেন রূপকথায় বর্ণিত হেনসেল ও গ্রেটেলের বাড়ী। সেই বাড়ীকে নিশানা ক'রে আরও খোঁজ করতে করতে বার করলেন ডাইনীর বাড়ী যার আদা দিয়ে তৈরী ছাদে রূপকথার ছেলেমেয়েরা হেসে নেচে খেলা করে বেড়াত। তারপর সেই ডাইনীর বাড়ীর ভিতের পাশে পাওয়া গেল চারটে বড় বড় চুল্লী আর সেই চুল্লীর মধ্যে একটা মেয়েমানুষের পোড়া কঙ্কাল।

গবেষণাগারের পরীক্ষায় প্রমান হ'ল ঐ মেয়েমানুষটিকে ৩০০ বছর আগে অগ্নিদগ্ধ পুড়িয়ে মারা হয়েছিল। এই সূত্রের ওপর নির্ভর করে সিকের নথিপত্তর ঘেঁটে ওসেক আবিষ্কার করলেন যে আদার রুটির আবিষ্কারক ক্যাথারিনা গ্রাডেরিন ছাড়া ঐ মেয়েমানুষটি আর কেউ নয়। সেই সময়ের এক রুটিওয়ালা ঈর্ষাপরবশ হয়ে তাকে জঙ্গলের মধ্যে ধ'রে নিয়ে যায় ও আদার রুটির প্রস্তুতপ্রণালী জেনে নিয়ে তাকে পুড়িয়ে মারে।

এ নিয়ে খবরের কাগজে কাগজে যখন তুমুল বাদানুবাদ চলছিল তখন ফ্র্যাঙ্কফুর্টের এক প্রফেসর জানালেন যে সমস্ত ব্যাপারটাই অত্যন্ত নগ্ন রসিকতা ছাড়া কিছু নয়। হেনসেল ও গ্রেটেল রূপকথাকে ভিত্তি করে হান্স ট্রাস্লার নামে একজন লেখক এই রহস্য প্রহসনের রচয়িতা। ওসেক আর কেউ নয়, হান্স ট্রাস্লার নিজে।

ব্যাপার খ্যা চলছে

(মতামতের জন্য গল্পভারতী সম্পাদক দায়ী নন)

চক্রপাণি

ইংলণ্ডের সর্বপ্রথম দৈনিক সংবাদপত্র কোনটি? সম্প্রতি এই প্রশ্ন নিয়ে লণ্ডনের কতিপয় সাংবাদিক গবেষণা ও অনুসন্ধান করে সিদ্ধান্ত করেছেন যে আজ থেকে ২৬২ বছর আগে ব্রিটেনে দৈনিক সংবাদপত্র সর্বপ্রথম আত্মপ্রকাশ করে। ১৭০২ সালের ১১ই মার্চ লণ্ডনের চায়ের দোকানে আর রেস্তোরাঁগুলিতে এক নতুনতর আলোচনা শোনা যেতে লাগল। শহরে দৈনিক খবর-কাগজ বেরিয়েছে। প্রত্যহ এই পত্রিকা বেরুচ্ছে এবং বেরুবে। নাম Daily Courant। তারই কথা সকলের মুখে।

অবিকৃত এবং অরঞ্জিত সংবাদ পরিবেশন করাই ছিল Daily Courant-এর প্রচারিত উদ্দেশ্য।

সংবাদগুলি ডাচ ও ফরাসী সংবাদপত্র থেকে সংগৃহীত হত এবং প্রত্যেক সংবাদের শেষে কোথা থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে তা জানিয়ে দেওয়া হত।

এই প্রচেষ্টার উদ্যোক্তার নাম স্যামুয়েল বাক্‌লে। তিনি ছিলেন পুস্তক ব্যবসায়ী ও মুদ্রাকর।

সেই সময় সাপ্তাহিক বা অর্ধ সাপ্তাহিক দু'একখানা পত্রিকা যা বেরুতো সেগুলি ছিল নোংরামির ডিপো—কুৎসা, গালিগালাজ, অশ্লীল রচনা এবং রাবিশে ভর্তি থাকতো তাদের পৃষ্ঠা।

বাক্‌লেই প্রথম তার সংবাদপত্রে উচ্চ সাংবাদিক-আদর্শের প্রবর্তন করলেন। সাংবাদিকতা যে একটি সম্মানজনক বৃত্তি এবং তার কাজও যে সেই অনুপাতে সম্মানজনক হওয়া উচিত এই কথা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন এবং তাঁর সহকর্মীদের মনেও তা সঞ্চারিত করেছিলেন।

বর্তমানে সাংবাদিকতার যে উচ্চ মান আমরা দেখেছি (যদিও সব সময় সেই উচ্চ মান রক্ষিত হয় না) তার পথপ্রদর্শক হচ্ছে Daily Courant।

অনেকদিন পর্যন্ত Daily Courant-এর কোন প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না। তারপরে আর একটি অবয়বস্ত এবং উন্নততর পর্যায়ের দৈনিক বেরুলো—Evening Post।

প্রায় পঞ্চাশ বছর সগৌরবে চলবার পর সাংবাদিকতার এক গৌরবোজ্জ্বল আদর্শ দেশের সামনে রেখে Daily Courant তার যাত্রা শেষ করে।

• • •

মাদ্রাজ থেকে একটি "ঘুষাঘুষির" সংবাদ এসেছে।

অল্পবয়সী ছেলে মহালিঙ্গম। কৃশতনু। কমজোরি। আগের রাত থেকে চালের দোকানের সামনে লাইন দিয়েছে। ক'দিন তাদের খাওয়া হয়নি। তাই রাত থেকে না খেয়ে না ঘুমিয়ে লাইনে দাঁড়িয়েছে সবার আগে। দোকান খুললে সে প্রথম ঢুকেই চাল পাবে।

ক্রমে লোক অমল অসংখ্য। দোকান খোলার সময় লাগল ধাক্কাধাক্কি, হাতাহাতি, মারামারি,

উদ্যম হড়োহড়ি। মহালিঙ্গম সেই টাল সামলাতে পারলে না। পড়ে গেল মাটিতে। পায়ে পায়ে পিষ্ট হল তার দেহ। অচৈতন্য অবস্থায় তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল। সেখান থেকে মহালিঙ্গম চলে গেল সেই দেশে যেখানে মানুষের পায়ের তলায় পড়ে ক্ষুধার্ত মানুষ মরে না, যেখানে মানুষকে না খাইয়ে অথবা বিষ খাইয়ে মারবার ফন্দী মানুষেই করে না, নির্বিকারচিত্তে, বিবেকবর্জিত উদাসীনতায়।

• • •

অনেকদিন আগেকার ট্রান্সভাল সরকারের একটি ইস্তাহার সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে।

যুদ্ধের সময়কার ইস্তাহার। তাতে লেখা: "নির্ধারিত ব্যক্তিকে ধরিয়ে দিতে পারলে পঁচিশ পাউণ্ড পুরস্কার পাওয়া যাবে: ইংরাজ, ২৪।২৬ বছর বয়স, আন্দাজ ৫ ফুট ৮ ইঞ্চি লম্বা, দেহের গঠন সাধারণ, একটু ঝুঁকে হাঁটে। ফ্যাকাসে চেহারা, বাদামী রঙের চুল, খুব ছোট গোঁফ আছে, অল্প নাকে কথা বলে, 'এস' কথাটি ভালমত উচ্চারণ করতে পারে না এবং ডাচ ভাষা জানে না।"

১৮৯৯ সালে বুয়োর যুদ্ধের সময় প্রিটোরিয়া বন্দীশালা থেকে উইনস্টন চার্চিল যখন পলায়ন করেন তখন উক্ত ইস্তাহারটি প্রচারিত হয়।

• • •

বিলাতে তরুণদের একটা বিশেষ দল হয়েছে, তার নাম 'বিট্‌স্'। এরা জীবনে, কর্মে, সাহিত্যে বা ধর্মে কোন প্রচলিত নিয়মকানুন মানে না। নিজেদের জীবনের নীতি এরা নিজেরাই স্থির করে নিয়েছে, অভিভাবকদের এরা তোয়াক্কা করে না। এদের সহজেই চেনা যায়। মাথায় লম্বা চুল, বাবরি ধরণের, এলোমেলো, বেশভূষাও তাই, অর্থাৎ কোন ছিরিছাঁদ নেই। এরা উদাস অথচ বেপরোয়া। এরা রাস্তায় রাস্তায় দলবদ্ধ হয়ে গান করে। সে গানের যে ভাষা তার মানে খুঁজে পাওয়া যাবে না। আমাদের হিন্দি ফিল্মের যেমন গান—'লায়ে লায়া, লায়ে লায়া, লায়ে লায়া লা', ওদেরও তেমনি, 'ইয়া ইয়া লা'। নিজেদের দেশে এরা বড় পাত্তা পায় না, বরং সময় সময় তাড়া খায়। কিন্তু আমেরিকায় এরা অভূতপূর্ব সমাদর পেয়েছে। আজব দেশ আমেরিকা। তাই সেখানে আজব ব্যাপারের আদর বেশী। বিশেষ করে ছেলেমেয়ে মহলে। সম্প্রতি চার বিট্‌সে মিলে আমেরিকা সফরে গিয়েছিল। এবং তাদের ঘিরে কি কাণ্ড হয়েছিল, শুনুন: টিকিট বিক্রি করে গান গেয়ে তারা উপার্জন করেছে এক মাসে প্রায় দু'লক্ষ ডলার। এর আগে বিদেশী কোন শিল্পীই আমেরিকায় গিয়ে এক মাসে এত টাকা রোজগার করতে পারেনি। তারপর, আমেরিকার তরুণীরা হাজারে হাজারে তাদের ঠেকে ধরেছে। শেষে তাদের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে বিট্‌লদের লুকিয়ে থাকতে হয়েছিল নানাভাবে। কখনো বা ঘণ্টার পর ঘণ্টা পুকুরে নেমে সাঁতার কেটেছে, কখনো বা পুলিশ বাড়িতে গিয়ে রাত কাটিয়েছে, কখনো বা রেডক্রসের গাড়িতে চেপে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় পাড়ি দিয়েছে। শেষ পর্যন্ত অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে মেয়েদের ভীড় ঠেকাবার জন্যে পুলিশ বাহিনীকে তলব করতে হয় তাদের হোটেলে। এবং শেষ পর্যন্ত আট প্রহর সিকিউরিটি পুলিশের হেপাজতে থেকে তারা সফর শেষ করে।

• • •

কলকাতা শহরের কেচ্ছা নিয়ে অন্য রাজ্যের এবং বিদেশের কাগজে অনেক লেখাই বেরিয়েছে।

সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে, খাস রাজধানী দিল্লীও বাদ যাচ্ছে না। একটি ইংরাজী পত্রিকায় এক সাম্প্রতিক সংখ্যায় দিল্লীকে নরকরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। সেখানকার ঘরের দেওয়ালের টিকটিকিটা পর্যন্ত নাকি দুর্গন্ধিতে ডুবে আছে। শাসন ব্যবস্থায় মধ্যযুগীয় গলদ, খাবার জল, চানের জল পাওয়া যায় না, ইলেকট্রিসিটি এই আছে এই নেই। পথঘাট নোংরায় দুর্গন্ধ, চারিদিকে যেন বিশৃঙ্খলার রাজত্ব! এসব ছাড়া আরও একটা ব্যাপার সেখানে যা চলছে তা আরও রোমাঞ্চকর। সেখানকার অনেক বাড়িওলা নাকি ঘর ভাড়া দেবার নামে জামাই-ধরা ফাঁদ পেতেছে। সম্প্রতি দিল্লীর এক সাপ্তাহিকে এক চমক লাগানো কাহিনী ছাপা হয়েছে। এক যুবকের অভিজ্ঞতা তারা লিপিবদ্ধ করেছেন। যুবকটি ভাল চাকরি করে। বাবা মা দেশে থাকে। দিল্লীতে সে একা। একখানি ঘর পেলেই সে খুশী। ঘরের সন্ধান সে পেল। জানল, এক বাড়িওলা অবিবাহিত যুবকের উপযোগী একটি ঘর ভাড়া দিতে পারেন। যুবকটি বাড়িওলার কাছে গেল। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বাড়িওলা সব জিজ্ঞেস করলেন। নামধাম, আদিনিবাস, বংশপরিচয় এবং সর্বশেষে আয় কত। আয়ের পরিমাণ শুনে এবং বংশপরিচয় পেয়ে ভারী খুশী বাড়িওলা। গিন্নিকে ডেকে বললেন, একেবারে খাঁটি ঘরের ছেলে। এই রকমই তো খুঁজছিলাম কি বল! গিন্নিও খুশী। যুবক ঘর পেয়ে কৃতার্থ। ভাড়াও কম। খুব সুখ সুবিধা আদর যত্ন। তারপর দু'চার দিনেই আসল ব্যাপার জানা গেল। বাড়িওলার মেয়ে এসে যুবকের সঙ্গে আলাপ করল। মেয়েটির চেহারা দেখে যুবকের তো চক্ষুস্থির! তা সে যাই হোক, বাড়িওলার মেয়ে। যুবকটি কী আর করে, তার সঙ্গে আলাপ করল। তারপর আর বাধ কোথায়। ঘন ঘন মেয়েটি যুবকের কাছে আসতে লাগল, সিনেমা দেখবার বায়না ধরল, রাত্রিবেলা শহর দেখবার জন্যে ছেলেটিকে ধরে টানাটানি করল। তারপর? তারপর একদিন কর্তা গিন্নি এসে ছেলেটির ঘরে ঢুকে বললেন, হেঁ হেঁ, তোমার নিশ্চয়ই আপত্তি হবে না। আমার ওই একমাত্র মেয়ে। তোমার সঙ্গেই হেঁ হেঁ!

যুবকের অবস্থা শোচনীয়। মাথা বোঁ বোঁ করে ঘুরতে লাগল। কোনক্রমে সে জানাল যে দেশে তার বাবা মা তার জন্যে পাত্রী স্থির করে রেখেছেন। আগামী মাসে সে ছুটি নিয়ে দেশে যাবে বিয়ে করতে।

অ্যাঁ। এই ছিল তোমার মনে? ব্যস! পরদিন থেকে কর্তাগিন্নির অন্য মূর্তি! জল বন্ধ। কলঘরে তালা পড়ে গেল। সন্ধ্যা হলেই সদর দরজা বন্ধ। তারপরেই নোটিশ—ঘর ছেড়ে দাও। তুমি লোক ভাল নও। রাত করে বাড়ি ফেরো। তোমার চরিত্র খারাপ। তোমার মতো দুর্জনকে আমার মতো ভদ্রলোকের বাড়িতে রাখা যায় না। অবিলম্বে ঘর ছেড়ে দাও। নচেৎ—

নচেৎ। পরদিন দু'চারজন পাড়ার মাতব্বর এসে জানিয়ে গেল, নচেৎ, তোমার সমূহ বিপদ। ভালয় ভালয় পথ দেখো।

* * *

আমাদের দেশটা যেন খোলা মাঠ, অবাধ বিচরণের ক্ষেত্র, কেউ কিছু বলবার নেই; অথবা যেন একটা বেওয়ারিশ বাড়ি যার সদর আর খিড়কি দরজা অষ্টপ্রহরই খোলা, যেমন ইচ্ছে যে দরজা দিয়ে ঢোকো, সারা বাড়ি ঘুরে বেড়াও, তারপর যখন ইচ্ছে বেরিয়ে পড়। বেরুবার সময় যদি কিছু হাতিয়ে নিয়ে যাও তাতেও আপত্তি নেই, জানাজানি হলেও কেউ কিছু বলবে না। ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার পর থেকে অভিযোগ শোনা গেছে, বিদেশের বিশেষ করে শত্রু রাষ্ট্রের গুপ্তচর এদেশে

এসে নানা কাণ্ডকারখানা করে চলে যাচ্ছে। প্রকাশ্যে এবং অপ্রকাশ্যে। জেনে শুনেও আমাদের উদার বদান্য সরকার বিশেষ কিছু বলেন না বা কোন উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করেন না, পাছে বিদেশীরা নিন্দে করে এই ভয়ে। হাওয়াই জাহাজে চেপে ওয়ালকটের ব্যাপারটা আশা করি কেউ ভুলে যাননি! নাগাভূমিতে পাদ্রী হটকেও ভুলবেন না! আশ্চর্য এই যে লোকটা প্রায় প্রকাশ্যেই নাগাভূমি অঞ্চলে ভারতবিরোধী কার্যকলাপে ব্যাপৃত রয়েছে, অথচ তাকে আমরা কিছু বলছি না! তারপর হাল-আমলের খবরটি অনেকেরই নজরে পড়েছে আশা করি। সেই মহিলাটি পাকিস্তান থেকে আবার ভারতে এসেছেন। এই রহস্যময়ী মহিলাটি কিছুদিন আগে আর একবার দিল্লীতে এসে মহা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিলেন, তাঁর নৈশসভিবিধির বৈচিত্র্যে। বেশ কিছুদিন কাজকর্ম চালাবার পর তিনি যখন দেখলেন যে ভারতীয় নিরাপত্তা দপ্তরের মধ্যে কিছু বিবেকবান কর্মচারী আছেন যাঁরা কোন প্রলোভনেই বশীভূত হবেন না, তখন একদিন রাত্রির অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে তিনি সরে পড়েন। তিনজন ভারতীয় প্রেমিককে তিনি তিনখানি চিঠি লিখে রেখে যান। তাঁকে হারিয়ে সেই তিনজন কি আই পি কী আকশোষ! শেষ পর্যন্ত তাঁদের রাজবপু নিয়ে নিরাপত্তা বিভাগ যখন টানাটানি সুরু করবার উপক্রম করল তখন কর্তাব্যক্তিদের হস্তক্ষেপের ফলে ব্যাপারটাকে বেমালুম চাপা দেওয়া হয়। ইতিমধ্যে নিরাপত্তা বিভাগে কিছু রদবদল ঘটেছে আর অমনি আবার মহিলাটিকে ভারতে আসতে শোনা গেছে! এবারও সঙ্গী! বলেছেন, ভারতে তাঁর স্বামী আছেন এবং তাঁর সঙ্গে ঘর করবার জন্যেই তিনি এসেছেন। স্বামীর নামও বলেছেন। সঙ্গে সঙ্গে স্বামীর কাছে খবর গেল যে তাঁর স্ত্রী এসে গেছেন! স্ত্রী? তিনি তো ঘরেই আছেন। ভদ্রলোক তো অবাক! পাকিস্তান থেকে যিনি এসেছেন তিনি তাহলে···? ঈশ্বর জানেন তিনি কে, কিন্তু ভদ্রলোক জীবনে তাঁকে দেখেন নি, স্ত্রী হওয়া তো দূরের কথা! সুতরাং বোঝা যাচ্ছে, ব্যাপারটা খুব সহজ নয়! ভিতরকার খবর হচ্ছে, এদেশে নাকি ঐ মহিলাটির পৃষ্ঠপোষকের অভাব নেই! কল্পনা করতে পারেন এরকম সব ঘটনা অন্য দেশে? তাই তো বলছিলাম, আমাদের এই আগড়ভাঙা জড়ভরত দেশে সবই সম্ভব!

• • •

যেমন সম্ভব ক্ষুধার্ত অন্নহীন জনতার সামনে হাজার হাজার টাকার ফুলঝুরি পোড়ানো। শুটুরে কংগ্রেসের রাজসূয় যজ্ঞের কথা বলছি। ওদিকে ঘরের পাশেই নরনারী-শিশু না খেয়ে রেশনের দোকানে ভীড়ের চাপে পদদলিত হয়ে মরল, আর এদিকে কর্তারা পঞ্চাশলাখ টাকা ফুঁকে এক সভাপর্ব শেষ করলেন। ঐ মহামাইকেলের একজন কর্মকর্তা জানিয়েছেন, অধিবেশনের জন্যে সর্বসাকুল্যে খরচের অঙ্ক চল্লিশ লাখ ছাপিয়ে যাবে! তা, আর এমন বেশি কি! কি রকম চাকচক্যময়, আরামপ্রদ সব ব্যবস্থা! নেতারা (?) বলেছেন, এরকম ঘটাপটা তারা নাকি আগে কখনো দেখেন নি, এ যে কংগ্রেসের বার্ষিক মূল অধিবেশনেরও বাড়া! ভিতরে মঞ্চের উপর তাকিয়া হেলান দিয়ে কাৎ হয়ে শুয়ে কর্তারা যখন অ্যাটম বোমা নিয়ে গরম গরম আলোচনা করছিলেন তখন ওই যোদ্ধবের পাণ্ডারা বাইরে অ্যাটম বোমা ফাটাচ্ছিলেন। খেলনা বোমা! বাজি! হাউই, তুবড়ি, রংমশাল, উড়নচরকি, তারাবাজি, আরও কত রকমের সব বাজি! আকাশ জ্বলে লাল, তারায় তারায় ছয়লাপ! কর্তারা মহা খুশী; দশ বিশ হাজার টাকা পুড়ে গেল!

তাতে কি! তারাবাজি গুলো সত্যিই ফাস্‌টো কেলাস! আর আটম বোমার কী শব্দ! পিলে চমকে যায়! সেই শব্দে উপোসী লোকগুলোর কারার ক্ষীণ আওয়াজ তালসতই চাপা পড়ে গেল!

• • • •

পঁচিশে নভেম্বর। কিছু শেষ সংবাদ-কাহিনী লিপিবদ্ধ করছি। এই সংখ্যার গোড়ায়, ভারতের বুকে দেশের স্বার্থের পরিপন্থী কার্যকলাপের্ত কয়েক ব্যক্তির সম্বন্ধে লেখার সময় পাদ্রী ষ্টট সম্পর্কে যে উক্তি ছিল, কয়েক দিনের মধ্যেই তার সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে। পাদ্রীর মুখোস খসে পড়েছে। বৈরী নাগাদের তরফে প্রকাশ্যেই তিনি ওকালতি শুরু করেছেন, এবং আশ্চর্য এই যে, এখনো তিনি বহাল তবিয়তে দেশের বুকে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। বিশ্বাস হয়ত শুনবো যে তিনি প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে সমান মর্যাদার আসনে মুখোমুখি বসে ভিন্‌দেশী রাষ্ট্রনায়করূপে প্রধানমন্ত্রীকে ধমক দিচ্ছেন। এ দেশে সবই সম্ভব। তা নাহলে অত পাকিস্তান (প্রকাশ) নারায়ণ কোন্ আস্পর্ধায় রীতিমতো দেশদ্রোহিতামূলক প্রচারকার্যে লিপ্ত থেকেও মুক্ত এবং দেশরোরা ভাবে ঘোরাফেরা করছেন। লোকসভার সদস্যদের ক্ষোভ ফেটে পড়েছে। শুধু লোকসভায় সমস্ত কেন, দেশের প্রত্যেক শুভবুদ্ধি সম্পন্ন নাগরিক কেবলমাত্র ক্ষোভে নয়, বিস্ময়েও হতবাক হয়ে গেছেন। যেখানে অবিলম্বে বিনা দ্বিধায় স্পষ্টিত শত্রুতার গলা টিপে অঙ্কুরেই বিনাশ করা দরকার এবং সে কাজে কোন ঝুঁকি নেই, কোন বিশেষ জোরেরও দরকার নেই, নিরাপত্তাদপ্তরের একজন সাধারণ অফিসর যেকাজ একঘন্টায় অনায়াসে সাধন করতে পারে, সেকাজ না করে সেখানে এখন লোকসভায় চিৎকার চলেছে। সেই তাঁকে ষ্টট-অস্ত্রপ্রকাশের দল অনাবশ্যক প্রাধান্য পাচ্ছে। অন্য দেশ হলে, যারা এই রকম আচরণ করত, আগে তো তাদের গলা ঠেপে ধরে গারদে ভরত, তারপর, অন্য ব্যবস্থা! কিন্তু আমাদের দেশে! সত্য সেলুকাস? তা নাহলে আর নাগাদের সঙ্গে চুক্তি করতে পররাষ্ট্র-দপ্তর আগুয়ান হয়? ভেবে দেখুন ব্যাপারটা! দেশের পররাষ্ট্র দপ্তর কি করে, না, অন্য দেশের সঙ্গে রাজনৈতিক ব্যাপারে মোকাবিলা করে! এক্ষেত্রে নাগাভূমি কি ভারতের বাইরে যে তার নেতাদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে পররাষ্ট্র দপ্তর না গিয়ে পররাষ্ট্র দপ্তর এগিয়ে গেল? এরদ্বারা কি নিজের মূঢ়তায় নিজেরাই জড়িয়ে পড়লাম না? সম্পাদক মশায়, আমরা দেউলে হয়ে গেছি, অর্থে, বুদ্ধিতে, কূটনৈতিক কর্মপদ্ধতিতে, এবং সর্বোপরি আপৎকালীন বিবেচনা জ্ঞানে! তা নাহলে, এই সময়, যে সময় দেশের লোক অর্ধাহারে অর্ধ মৃত, চতুর্দিক ব্যাপী সংকটে আতঙ্কিত অনিশ্চিৎ ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিরাশাকাতর, যে সময় একদিকে পাকিস্তান, মাথার ওপর চীন, অন্যদিকে নাগাদের দল ক্রমশই আমাদের ঘিরে ধরছে, যে সময় দ্রব্যমূল্যের আকাশ-ছোঁয়া দর সাধারণ মানুষের জীবনকে বিপর্যস্ত করে দিয়েছে, সেই সময় দিল্লীতে বাস করবারে বাচের আসর বসে? রোম যখন পুড়ছিল নীরো তখন বেহালা বাজাচ্ছিল। আমাদের দেশে ডজন ডজন নীরো। প্রত্যেক রাজ্যেই এই অবস্থা! দেশের জনসাধারণের চেতনাও মরে গেছে। তা না হলে তারা কান পেতে নীরোদের বাজনা উপভোগ করে? সম্পাদক মশায়, লক্ষ্য করেছেন, এদিকে তো লোক—কোথায় তেল, কোথায় কটি, কোথায় মাছ করে হাহাকার করছে আর অন্যদিকে কলকাতায় সানের আসরের বিজ্ঞাপন বেরুচ্ছে, সদ্যোত সম্মিলনী···পাড়ায় পাড়ায় নাচগান···সারারাত ব্যাপী কৃতি! আর টিকিটের দাম কি! দশ—বিশ—পঁচিশ! তাও পড়তে পারে না! অতএব তবা নাগরদোলা বিজয়ায়

সঞ্জয়:।···কোথায় সেই পরিত্রাতা, সেই মহানায়ক, যিনি আমাদের এই অপার দুর্গতি মোচন করবেন, আমাদের নতুন জীবনের সন্ধান দেবেন, কোথায় সেই সর্বনাশকদুষ্কৃতনাশন মধুসূদন···

যদাযদাহি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত:
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানম সৃজাম্যহম!

• • • •

মধ্যবিত্ত বাঙালীর খাওয়া গেছে। ভগবানের মার নয়। সরকারের ভোজবাজী। তাঁরা হাতে হাত দিচ্ছেন তাই উঠে যাচ্ছে। খাদ্যদ্রব্য যা ছিল একে একে সব অদৃশ্য হল। পাওয়া যায় না যে তা নয়—'বেলাকে' সবই পাওয়া যায়। অর্থাৎ যাদের 'বেলাক মার্কিট' থেকে কেনবার ক্ষমতা আছে তারাই খেতে পাচ্ছে—মধ্যবিত্ত নিম্নবিত্তরা না খেয়ে তিলে তিলে শুকিয়ে যাচ্ছে। সরকারের সাম্প্রতিকতম অভিযান মানুষ ছেড়ে এবার ভগবানের প্রতি ধাবিত হবার উপক্রম হয়েছে। হিন্দুর পূজার উপকরণ অপহরণের অভিযান—আর ছানা তৈরী হবে না—অর্থাৎ সন্দেশ রসগোল্লা আর পাওয়া যাবে না। তার নামে দেবতার ভোগে মিষ্টান্ন দেওয়ার উপায় থাকবে না। ভোগের চূড়ান্তই মিষ্টান্ন, মিষ্টান্নের চূড়ান্তই সন্দেশ। হিন্দুর দেবতা তা থেকে বঞ্চিত হতে চলেছেন। আশ্চর্য রাষ্ট্রীয় কর্মবীরদের মতিগতি! এঁদের ক্রমানুসতিক কাণ্ডকারখানায় সত্যিই তাজ্জব বনে যেতে হচ্ছে! ছানাজাত মিষ্টান্নকে শুধুমাত্র বিলাসের বস্তু বলে গণ্য করা যে কত বড় মূঢ়তার পরিচায়ক সে জ্ঞান পর্যন্ত তাঁদের নেই। নানা অসুখে, রোগমুক্তির পরে, নানাভাবে সন্দেশের প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা সর্বজনস্বীকৃত। বড় বড় বৈজ্ঞানিক, চিকিৎসক এবং আয়ুর্বেদজ্ঞ ব্যক্তিরা রসগোল্লা এবং সন্দেশের ব্যবস্থা দিয়ে গেছেন নানা অসুখে। সুবিখ্যাত চিকিৎসক নীলরতন সরকার রোগীদের সন্দেশ ও রসগোল্লা খাওয়ার শুধু ব্যবস্থা দিয়েই ক্ষান্ত হতেন না, রোগীরা না খেলে অত্যন্ত বিরক্ত হতেন।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র বলতেন স্বাস্থ্য গঠনে ও মৃতস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারে ছানার দ্রব্যাদির স্থান সকলের উপরে। মহামহোপাধ্যায় গণনাথ সেন পরম রসগোল্লার ব্যবস্থা দিতেন তাঁর রুগীদের। এমনকি ডায়াবেটিস রোগীর জন্যেও সন্দেশের ব্যবস্থা ছিল ডা: বিধানচন্দ্রের। কলকাতার এক বিখ্যাত মিষ্টান্ন প্রতিষ্ঠান সেই বিশেষ সন্দেশ তৈরী করত! হায়! আজ যদি থাকতেন তাঁরা আশুতোষ! এই মতিচ্ছন্নতার বিরুদ্ধে আইনকে নিজের হাতে নিতেও, তিনি বোধ করি দ্বিধা করতেন না।

বিপন্ন মিষ্টান্ন ব্যবসায়ীদের এক মহতী সভায় সাহিত্যিক তারাশঙ্কর, সরকারের এই পরিকল্পনাকে "অভিনয়" আখ্যা দিয়েছেন। তাঁর মতে সরকার নিজেই যখন দুধের ব্যবসা খুলেছেন, হরিণঘাটা চালু করেছেন, ঘাটাল উঠিয়ে দিচ্ছেন, তখন দুধ সরবরাহের দায়িত্ব সম্পূর্ণ সরকারের। অত্যন্ত সত্যি কথাই বলেছেন তারাশঙ্কর। তা না হলে বাংলার একটি অতি সুন্দর শিল্প নষ্ট হয়ে যাবে। স্বর্ণশিল্পীদের মতো এই শিল্পে লক্ষ লক্ষ নিয়োজিত মানুষ বেকার হবে। আজ দেশে অন্ন নেই, তেল নেই, মাছ নেই, ডাল নেই, শাকসব্জীও অগ্নিমূল্য। এবার ছানাও গেল। তিনটি পরিকল্পনার শেষে দেশের যখন এই অবস্থা তখন আর একটি বা দুটি পরিকল্পনার পর আমরা কোন্ অবস্থায় উপনীত হব, সেই প্রশ্ন তুলেছেন তারাশঙ্করবাবু।

সব সত্য দেশেই দুধের সরবরাহ বাড়াবার চেষ্টা সফলভাবে করা হয়েছে। ফলে সে সব

দেশে শিশু মৃত্যুর হার খুবই কম। শিশুরা-সুস্থ সবল হয়ে সে-সব দেশের মুখ উজ্জ্বল করে, রোগীরা শুভস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের সুযোগ পায়, ভোগীরা পরিপূর্ণ খাদ্য পেয়ে স্বাস্থ্য রক্ষা করতে পারে। সবচেয়ে জরুরী এই দুধের সমস্যা মেটানো সরকারের দায়িত্ব, সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য। সরকারের উচিত বিভিন্ন প্রদেশ থেকে ভালো-ভালো গোরু এনে নিজেদের তত্ত্বাবধানে বড় বড় গোশালা, ডেয়ারী এবং দুধের কলোনী গ'ড়ে তোলা। এ বিষয়ে সরকার নিশ্চয়ই জনসাধারণের অকুণ্ঠ সমর্থন ও সাহায্য পাবেন। সেই সব পরিকল্পনা গ্রহণ না ক'রে কেবলমাত্র ছানা তৈরি বন্ধ ক'রে দিয়ে কি সরকার দুধের সমস্যা মেটাতে পারবেন? এ ভাবে কতটুকু দুধই বা বাড়তি পাওয়া যাবে? আবহমান কাল থেকে যে সব দেবদেবীর পূজো চ'লে এসেছে তাঁদের ভোগের সন্দেশ কেড়ে নিয়ে সরকার নিশ্চয়ই ধর্ম অনুষ্ঠানে ব্যাঘাত ঘটাবেন না। জন স্বাস্থ্যের কথাও ভেবে দেখবেন। অন্যদিকে দুধ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গেলে প্রাচীনতম ও ঐতিহ্যময় ভারতবাসীর পক্ষে অপরিহার্য মিষ্টান্ন শিল্প সমৃদ্ধ থেকে সমৃদ্ধতর হয়ে উঠবে। ইতিমধ্যেই ভারতীয় এই শিল্পটি বিদেশে বেশ সুনাম ও সমাদর অর্জন করেছে। সরকারের সাহায্য পেলে এই সুনাম উত্তরোত্তর বাড়বে, এই শিল্প এদেশে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ে আসতে সক্ষম হবে। ফলে নিশ্চয়ই দেশের আর্থিক সমৃদ্ধি ঘটবে।

ম্যাকবেথ লেখার পরে সেক্সপীয়ার ভাবলেন এ বইখানা লেখছি চলবে না,—একে পুড়িয়ে ফেলা যাক্।

এক বন্ধুকে পড়িয়ে শোনাতেই তিনি বলেন—ঠিক কথা, আমিই পুড়িয়ে ফেলি এটাকে। দাও ও পাণ্ডুলিপিখানা আমার হাতে।

সেক্সপীয়ার নিশ্চিন্ত হয়ে চলে গেলেন। তারপর বন্ধুর সঙ্গে দেখা।

পুড়িয়েছ তো সেটাকে? প্রশ্ন করলেন সেক্সপীয়ার।

একটু ভুল হয়ে গেছে বন্ধু, আমি সেটা না পুড়িয়ে আজকালকার অন্য সব ছাপাগুলো পোড়াবার ব্যবস্থা করেছি,—

এই বলে বন্ধু হাসতে লাগলেন।

প্রেম প্রতিবন্ধক

পরিচয় গুপ্ত

দু'দিন দেখা হয়নি অথচ দু'দিনের মধ্যে বিরিঞ্চি কেমন যেন বুড়োটে মেরে গেছে। পামেলা পর্দার আড়ালে আত্মগোপন করে, অর্দ্ধশায়িত বিরিঞ্চির মুখের দিকে তাকিয়ে এই কথাই চিন্তা করছিল।

অবশ্য এভাবে দাঁড়িয়ে থাকা বেশীক্ষণ সমীচীন মনে হ'ল না। মেসের ছেলেদের মধ্যে ইতিমধ্যেই গুঞ্জন উঠেছে। এদিক সেদিক থেকে মাঝে মাঝে দু'চার পাইন লাইট মিউজিকও ভেসে আসছে।

পামেলা পর্দাটা সরিয়ে বিরিঞ্চির খাট বরাবর এগিয়ে এসে বলল, আসতে পারি?

বিরিঞ্চি ভূত দেখার মতো চমকে উঠে বলল, পা—আ—আ—মু—

পামেলা কিক্ করে একটু হেসে বললে, কেমন অবাক করে দিলাম। এই দেখ তোমার জন্যে কি এনেছি। তুমি একদিন মটরভাজা খেতে চেয়েছিলে মনে আছে?

পামেলা বটুয়ার ভেতর থেকে ঠোঙাটা বার করে বিরিঞ্চির মুখের কাছে ছুঁড়ে দিয়ে বলল এখনি খেতে হবে কিন্তু।

পামেলা বিরিঞ্চির খাবার টেবিলের ওপর উঠে বসল।

বিরিঞ্চি কিন্তু পামেলার দিকে তাকাল না। উলটো দিকে মুখ ঘুরিয়ে বলল, তোমার সাহস দেখে আমি অবাক হচ্ছি পামু—

পামেলা বটুয়াটা আঙুলে ঘোরাতে ঘোরাতে বলল, কেন, অবাক হবার মতো কি করলাম? করলে অবশ্য খুশীই হ'তাম।

—সবকিছুই খেলা নয় পামু, একটু সিরিয়াস হ'তে শেখ।

—বাবা ভূতের মুখে রাম নাম। তুমিও সিরিয়াস হ'তে বলছ। সিরিয়াস ছেলে কিন্তু আমি বেশী পছন্দ করি।

—তাতে আমার কি

—বারে, একদিন ভিক্টোরিয়া পাচিলে বসে গল্প করতে করতে বললে, আমাদের মতো মনের মিল ত্রিভুবনে কোনো প্রেমিক যুগলের নেই—

—সেটা আমার মনের কথা নাও হ'তে পারে।

—তাহলে গত দশ বছর ধরে তুমি যে কয়েক কোটী কথা বলেছ, সেগুলো কি তোমার মনের কথা নয়?

—যাচাই করে দেখনা—

—ধিক্ তুমি-এসব কি বলছ!'

—ঠিকই বলছি পামু, পাগলামির একটা সীমা আছে।

—পাগলামি কি করলাম?

—কচিখুকী নাকি শিখিয়ে দিতে হবে?

বিরিঞ্চি বালিশে মুখগুঁজে শুয়ে রইল।

বিরিঞ্চির এ ধরণের আচরণ একেবারেই অপ্রত্যাশিত।

অন্ততঃ গত দশবছরে পামেলা বিরিঞ্চির কাছথেকে এরকম কোনো আঘাত পায়নি।

তাছাড়া দু'দিন আগে তার সঙ্গে যখন দেখা হয়েছিল, সেদিনও বিরিঞ্চি পূর্বের মতো স্বাভাবিক ছিল।

অথচ এই দু'দিনে এমন কি ঘটল যার জন্যে বিরিঞ্চি তার সঙ্গে—তবে কি তাকে না জানিয়ে মেসে আসার জন্যেই রাগ হ'ল?

তাতো হবার কথা নয়। বিরিঞ্চিই তো তাকে মেসে আসতে বলত। সেই রাজী হ'তনা। পাঁচটা পাঁচরকম ছেলে থাকে, কখন কে কি বলবে তার কোনো ঠিক আছে।

পামেলা চিন্তার থেই হারিয়ে শুন মেরে বসে রইল।

দশমিনিট কারুর মুখে কথা নেই। দু'জনেই নির্বাক।

মেসের উড়ে চাকর নন্দলাল পর্দা সরিয়ে হঠাৎ ঘরে ঢুকে বললে, এইযে এনেছি—

বিরিঞ্চি চমকে উঠে বললে, চুপ করে দাঁড়া।

পামেলা অভিমানের সুরে 'চলি' বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বিরিঞ্চি প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই লাফ মেরে মাটিতে নেবে, নন্দলালের হাত থেকে প্যাকেটটা নিয়ে বলল, ব্যাটা আর একটু হ'লেই হাটে হাঁড়ি ফাটাচ্ছিলিস আর কি।

প্যাকেটটা খুলে নকল দাঁতের পাটি জোড়া নেড়ে চেড়ে দেখে নিল বিরিঞ্চি। ফিনিসিংটা প্রায় বিদেশী জিনিষের মতোই হয়েছে। আগের মতো নয়।

গুণ গুণ করে গান ধরে বিরিঞ্চি দাঁত লাগাতে যাবে, হঠাৎ পামেলা ঘরে ঢুকে বলল, ঘটরভাজা নিয়ে যাওয়াই ভালো' কি বল?

নকল দাঁতের পাটী হাতে নিয়ে বিরিঞ্চি ফ্যাল ফ্যাল করে, পামেলার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

বিশ্ববিখ্যাত হ্যাভেলক্ এলিস্‌কে একজন তরুণী একবার প্রশ্ন করেন; আচ্ছা মহাশয় আপনি পুরুষ হয়েও নারী মনের এত গোপন কথা জানলেন কি করে?

হ্যাভেলক্ এলিস্ মৃদু হেসে উত্তর দিলেন জানবার সময়টাতে আমাকে নারীই হতে হয়েছিল যে! অর্থাৎ নারীর সঙ্গে আমি একাত্ম হয়ে গিয়েছিলাম।

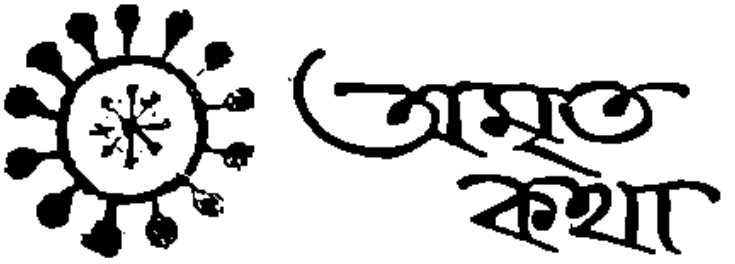

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথা

—"যেমন একজন কাঠ ইত্যাদি সংগ্রহ করে আগুন জ্বেলে বসে থাকে, আর পাঁচজনেও এসে বসে পোহায়; তেমনি সাধু, সন্ন্যাসীরা কঠোর তপস্যা করে ভগবানকে জানেন, আর পাঁচজন এসে তাঁদের সঙ্গ করে তাঁদের উপদেশ শুনে ভগবানে চিত্ত স্থির করে। সাধু মহাপুরুষদের নিকটস্থ আত্মীয় লোকেরা অগ্রাহ্য করে, দূরের লোকদিগের নিকট তাঁদের আদর হয়, কারণ কি? যেমন বাজুকরের বাজী, তাদের কাছের আত্মীয় লোকেরা দেখেনা, দূরের আত্মীয় লোকেরা দেখে অবাক হয়। বহু উঁচুতের বীচি গাছের তলায় পড়ে না, উড়ে গিয়ে দূরে পড়ে ও সেখানে গাছ হয়। সেই রকম ধর্ম-প্রচারকদিগের ভাব দূরেতেই প্রকাশ হয় ও লোকে আদর করে। মঠের নীচে অন্ধকার থাকে, দূরে আলো পড়ে। সেই রকম সাধু মহাপুরুষদের নিকটের লোকেরা বুঝতে পারে না, দূরের লোকেরা তাঁর ভাবে মুগ্ধ হয়। সংসার করলে মনের বাজে খরচ হয়ে পড়ে। এই বাজে খরচ হওয়ার দরুণ মনের যা ক্ষতি হয়। সে ক্ষতি আবার পূরণ হয়, যদি কেউ সন্ন্যাস করে। বাপ প্রথম জন্ম দেন, তারপর দ্বিতীয় জন্ম উপনয়নের সময়। আর একবার জন্ম হয় সন্ন্যাসের সময়। সন্ন্যাসীর সব কর্ম নিষ্কাম করতে হয়। তবে সন্ন্যাসী সংসারীদের মত বিষয় কর্ম করে না। সন্ন্যাসী যদি কারুকে কিছু দেয়, সে নিজে দেয় মনে করে না। দয়া ঈশ্বরের, মানুষে আবার কি দয়া করবে? দান টান সবই রামের ইচ্ছা। ঠিক সন্ন্যাসী মনেও ত্যাগ করে বাহিরেও ত্যাগ করে। যে শুঁড় খায় না, তার কাছে শুঁড় থাকাও ভাল নয়। কাছে শুঁড় থেকে যদি সে বলে বেড়োনা, তা লোকে শুনবে না।

"ঝুনির মধ্যে মাছ, যে পথে ঢুকেছে, সেই পথ দিয়ে বেরিয়ে আসতে পারে, কিন্তু জলের মিষ্টি পথ আর অন্য অন্য মাছের সঙ্গে ক্রীড়া, তাই ভুলে থাকে, বেরিয়ে আসবার চেষ্টা করেনা। ছেলে মেয়ের আধ আধ কথাবার্তা যেন জল কল্লোলের মধুর শব্দ। মাছ অর্থাৎ জীব, পরিবারবর্গ তবে দু'একটা মৌড়ে পালায়, তাদের বলে মুক্ত জীব।

মৃত্যুকে সর্বদা মনে রাখা উচিত। মরবার পর কিছুই থাকবে না। এখানে কতকগুলি কর্ম করতে আসা। যেমন পাড়াগাঁয়ে বাড়ী, কলকাতায় কর্ম করতে আসা। বড় মানুষের বাগানের সরকার বাগান যদি কেউ দেখতে আসে, তা বলে, 'এ বাগান আমাদের'। কিন্তু কোন দোষ দেখে বাবু যদি ছাড়িয়ে দেয়, তার আমকাঠের সিন্দুকটা নিয়ে যাবার যোগাড় থাকে না; দারোয়ান দিয়ে সিন্দুকটা পাঠিয়ে দেয়। মৃত্যু সময়ের জন্য প্রস্তুত হওয়া ভাল। শেষ বয়সে নির্জনে গিয়ে কেবল ঈশ্বর চিন্তা ও তাঁর নাম করা। বাড়ী থেকে যদি আস্তাবলে যায় তা হলে আর ঘুলো কাদা মাখতে পারেনা।"

খেলাধূলা

মোহনবাগান

কোনরকম যুক্তিতর্ক বা তথ্যের অবতারণা না করেই নিতান্ত সোজাসুজি ভাবেই বোধহয় বলা যায়, যে আজকের বাঙালী সংস্কৃতির এক মূল্যবান অংশ মোহনবাগান। শুধু তাই বা কেন বাঙালী জনজীবনে মোহনবাগানের প্রভাব বিস্ময়কর ও প্রবাদ প্রতিম। তাই তো মোহনবাগানের জয়-পরাজয়কে কেন্দ্র করে কত হাসি—কত কান্নার ইতিহাস। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে মোহনবাগানের জন্ম। সেই জন্মলগ্ন থেকে শুরু করে এই শতাব্দীর আজ পর্যন্ত মোহনবাগান সমান ভাবেই বাঙালী মনে বাঁধা রয়েছে। যেন সেই ইন্ডিপেন সমানে চলেছে। ১৯১১ সালে আই. এফ. এ শীল্ড জয় করে মোহনবাগান বাঙালী মনে নূতন চেতনার সঞ্চার করেছিল। ইংরেজ শাসনের নাগপাশে বন্দী বাঙালী যেন সেদিনে সারা অন্তর দিয়ে অনুভব করেছিল মুক্তির চির ইঙ্গিত পরশ।

মোহনবাগানের ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে করে এখন চলছে প্ল্যাটিনাম জয়ন্তী উৎসবের নানা সমারোহপূর্ণ অনুষ্ঠান। কত উত্থান পতন—কত সাফল্য ব্যর্থতার ইতিহাসই না জড়িয়ে আছে এই সুদীর্ঘ ৭৫ বছরের জীবনে। ফিরে যাওয়া যাক সেই আদিযুগে—উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্বে।

১৮৮৯ সালের আগষ্ট মাসে উত্তর কলকাতায় মোহনবাগান তিলা সংলগ্ন মাঠে "মোহনবাগান স্পোর্টিং ক্লাবের" সৃষ্টি হয়। ক্লাব প্রতিষ্ঠাকল্পে প্রথম সভাটিও অনুষ্ঠিত হয়েছিল এই বছরেই। ১৪ নং বলরাম ঘোষ ষ্ট্রীটে স্বর্গত ভূপেন্দ্রনাথ বসুর বাসভবনে এই সভাটি হয়েছিল। ক্লাবের প্রথম সভাপতি স্বর্গত ভূপেন্দ্রনাথ বসু এবং প্রথম সম্পাদক স্বর্গত যতীন্দ্রনাথ বসু। 'মোহনবাগান তিলার' অনুসরনেই মোহনবাগান ক্লাবের নামকরণ হয়। আগাগোড়া মার্বেল পাথরের তৈরী এই বিরাট প্রাসাদ এবং তৎসংলগ্ন মাঠের মালিক ছিলেন স্বর্গত কীর্তি মিত্র। তিলার উত্তরে ছিল কড়িয়াপুকুর ষ্ট্রীট, পূর্বে আপার সার্কুলার রোড, পশ্চিমে কীর্তিমিত্র লেন এবং দক্ষিণে মোহনবাগান লেন। সুতরাং সহজেই অনুমেয় যে কি বিরাট স্থান জুড়ে ছিল এই মোহনবাগান তিলা। প্রথম বার্ষিক সভায় ক্লাবের নূতন নামকরণ হয়। প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক এফ. জে, রো এই সভায় পৌরোহিত্য করেন। তাঁরই পরামর্শ অনুযায়ী ক্লাবের নামকরণ হয় মোহনবাগান এ্যাথলেটিক ক্লাব। ক্লাবের কয়েকজন ছাত্র-সদস্যের সবিশেষ আগ্রহে অধ্যাপক রো প্রথম বার্ষিকী সভায় পৌরোহিত্য করেন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে সেই সময় কেবলমাত্র ছাত্রদেরই ক্লাবের সদস্যরূপে গ্রহন করা হত। কঠোর নিয়মাবলী ও শৃঙ্খলা ছিল ছাত্র-সদস্যদের জন্য। অবশ্য ছাত্র-বহির্ভূত সদস্যও ছিল—কিন্তু তাদের সংখ্যা ছিল সীমিত। বোধহয় এই কারণেই ক্লাবের প্রথম খেলাটি হয়েছিল ইডেন হিন্দু হোষ্টেল দলের বিরুদ্ধে। ১৮৯১ সালে ক্লাব মোহনবাগান তিলা ছেড়ে শ্যামপুকুরের জমিতে উঠে আসে। মহারাজা দুর্গাচরণ লাহা ছিলেন এই জমির মালিক। কিছুকালপরে শ্যামবাজারে কলিকাতা

কর্পোরেশনের 'পাবলিক পার্ক' এর উল্টোদিকে হ'লে মোহনবাগান ক্লাব ওয়েলিংটনে উঠে যায়। এখানে মোহনবাগানের আর দুই শরিক ছিল—এরিয়ান্স ও বাগবাজার ক্লাব।

ক্লাব সূচনায় অন্যান্য ভারতীয় দলের বিরুদ্ধে প্রীতি খেলায় অংশ নিত। এই সব দলের মধ্যে শোভাবাজার ক্লাব (মোহনবাগান অপেক্ষা প্রাচীন) ক্যালকাটা এ্যাথলেটিক ক্লাব, টাউন ক্লাব, এরিয়ান্স, কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ, বি. ই কলেজ (শিবপুর), কুমারটুলি ক্লাবের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মোহনবাগান সর্বপ্রথম যে ইউরোপীয় দলের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে তা হোল প্রেসিডেন্সি রেজিমেন্টের 'সি' কোম্পানী। ১৮৯৩ সালে ক্লাব কুচবিহার কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে। এটাই ক্লাবের সর্বপ্রথম প্রতিযোগিতা মূলক খেলা।

১৯০২ সালে মোহনবাগান কুচবিহার কাপ জয়লাভ করে। পরের বছরেও মোহনবাগান কুচবিহার কাপ ও সেই সঙ্গে গ্লাডস্টোন কাপ জয়ী হয়। ১৯০৭ ও ১৯০৮ সালে কুচবিহার কাপ মোহনবাগানের করায়ত্ত থাকে। এছাড়া ১৯০৩ থেকে ১৯০৮ সাল পরপর তিনবছর তারা ট্রেডস্‌কাপ জয়ী হয়: ১৯০৩ সালে ঐশৈলেন বসু ক্লাবের সম্পাদক নির্বাচিত হন এবং ১৯১৪ সাল পর্যন্ত তিনি এই পদে ছিলেন। বস্তুত পক্ষে তাঁর সুনিপুণ সংগঠন শক্তি ও দক্ষ পরিচালনার জন্য ক্লাব বিশেষ সুনাম অর্জন করে। এদিকে সভ্যসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে এবং সব রকম খেলাধূলার প্রসার হওয়ায় ক্লাব ১৯০৩ সালে ময়দানে (প্রেসিডেন্সী কলেজ মাঠে) উঠে আসে। ১৯১৪ সালে মোহনবাগান ময়দানেই তাদের নতুন ঘাঁটিতে (বর্তমান ইষ্টবেঙ্গল-এরিয়ান্স মাঠ) উঠে আসে।

১৯০১ সালে মোহনবাগান প্রথম আই. এফ. এ শীল্ড প্রতিযোগিতায় যোগদান করে। তখন আই. এফ. এ শীল্ড ভারতীয় দলের অংশগ্রহণে অনেক বাধা ছিল। মোহনবাগানের পূর্বে যে সকল ভারতীয় দল শীল্ড প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিল তারা হোল শোভাবাজার, টাউন ক্লাব, বেয়ার স্পোর্টিং ও চুঁচুড়া স্পোর্টিং। এই সময় পর্যন্ত মোহনবাগান ফুটবার দল হিসেবেই সমধিক পরিচিত ছিল। এ হেন সময় ১৯০৪ সালে মোহনবাগান চুঁচুড়ার গ্লাডস্টোন কাপের ফাইন্যালে সেই বছর আই. এফ. এ শীল্ড জয়ী ডালহৌসী ক্লাবকে ৫-৩ গোলে হারিয়ে বিশেষ গৌরবের অধিকারী হয়। ১৯০৬ সালে বিন্টো কেট ফুটবল প্রতিযোগিতায় সেই বছরের শীল্ডজয়ী ক্যালকাটা এফ. সি কে ১-০ গোলে হারিয়ে দিয়ে মোহনবাগান আর একটা কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখে।

১৯০৯ সালে শীল্ড পর্বের সূচনা মোহনবাগানের ভালো হয়নি। প্রথম রাউণ্ডে ওয়াই. এম. সি. এ দলের বিরুদ্ধে ১-০ জয়লাভ করলেও পরবর্তী রাউণ্ডে মোহনবাগান দল গর্ডন হাইল্যাণ্ডার্সের কাছে ৩-০ গোলে পরাজিত হয়। আই. এফ. এ শীল্ডে যোগদানের শুরু থেকে কয়েকটি ভারতীয় দল পর্যন্ত মোহনবাগান কে টাক্কা করতে ছাড়েনি। মোহনবাগানের এই প্রয়াস তাদের কাছে বিরাট উচ্চাকাঙ্খার সামিল হয়েছিল। দ্বিতীয় বছরে (১৯১০ সালের শীল্ড প্রতিযোগিতায়) মোহনবাগান প্রথম রাউণ্ডেই ইষ্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ের কাছে পরাজিত হয়।

ঐতিহাসিক—১৯১১

এর পর এলো ঐতিহাসিক ১৯১১ সালের অবিস্মরণীয় দিন ২৯শে জুলাই। এইদিন ফাইন্যাল খেলায় দুর্ধর্ষ গোরাদল ইষ্ট ইয়র্কশায়ার রেজিমেন্টকে ২-১ গোলে হারিয়ে মোহনবাগান ভারতীয় দল হিসাবে প্রথম আই. এফ. এ শীল্ড বিজয়ের গৌরবের অধিকারী হয়। হাজারী মনে এলো

নূতন চেতনা। বাঙালী দল তৈরী করার পরিকল্পনার সম্পূর্ণ। প্রাণ প্রাচুর্যে ভরপুর এমারোজন বাঙালী যুবার এই অবিস্মরণীয় কৃতিত্ব বাঙালীর ইতিহাসে চিরকাল লেখা থাকবে। এই সাফল্যের পথ বেয়েই জন্ম নিলো ভারতীয় ফুটবল।

এর পরের যুগে মোহনবাগানের ইতিহাসে বহু সাফল্যময় অধ্যায় সংযোজিত হয়েছে কিন্তু ১৯১১ সালের আই. এফ. এ শীল্ড বিজয়ের গৌরব কাহিনী বাঙালী কোনদিন বিস্মৃত হবে না। এই কীর্তিগাথার নায়ক শীতলাদাস দুখাজী, ভূতি মুখার্জী, সুধীর চ্যাটার্জী, মনমোহন মুখার্জী, সুরেন সেন গুপ্ত, শৈলেন ভট্টাচার্য, কানুরায়, হাবুল সরকার, অভিলাষ ঘোষ, বিজয় দাস ভাদুড়ী ও শিবদাস ভাদুড়ী। একমাত্র সুধীর চ্যাটার্জী ছাড়া আজ সকলেই পরলোকে। মোহনবাগানের প্লাটিনাম জয়ন্তী উৎসবের পুণ্যক্ষণে কীর্তিমানদের স্মরণ করি, ও শ্রদ্ধা জানাই।

প্লাটিনাম জয়ন্তীর নানা অনুষ্ঠান

গত ৭ই নভেম্বর থেকে মোহনবাগান ক্লাবের প্লাটিনাম জয়ন্তী উৎসব আরম্ভ হয়েছে। ৭৫ দিন ব্যাপী নানা অনুষ্ঠানের এক দীর্ঘ কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। ইতিমধ্যে বহু অনুষ্ঠান শেষ হয়েছে। পূজা-হোম দিয়ে জয়ন্তী উৎসবের সূচনা হয়। রাজপথে রীলে দৌড়, কুচকাওয়াজ, শপথ গ্রহণ, তোপধ্বনি, হোমাগ্নি প্রজ্বলন, প্রভৃতি ছিল উদ্বোধন দিনের অনুষ্ঠান। পবিত্র হোমাগ্নি উৎসব শেষ না হওয়া পর্যন্ত অনির্বাণ থাকবে।

ভারত জার্মান দ্বৈতএ্যাথলেটিকস

৭ই ও ৮ই নভেম্বর অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতায় জার্মান ৯টি বিষয়ে এবং ভারত তিনটি বিষয়ে শীর্ষস্থান লাভ করে। পোলভল্ট, ১১০ মিটার হার্ডলস এবং ৪×১০০ মিটার রীলে দৌড়ে ভারত জয়ী হয়। অবশিষ্ট বিষয়ে জার্মান দল জয়লাভ করে। সব সমেত ৫টি অলিম্পিকে যোগদানকারী দুই দেশের কয়েকজন খ্যাতনামা প্রতিযোগী আলোচ্য প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেন।

ভারতীয় অলিম্পিক হকি দল

৮ই নভেম্বর টোকিও অলিম্পিক হকি বিজয়ী ভারতীয় দলের সঙ্গে মোহনবাগানের প্রদর্শনী খেলা অনুষ্ঠিত হয়। ভারতীয় দল এই খেলায় সহজেই ৩-০ গোলে জয়লাভ করে।

তাতাবানিয়া ফুটবল দল

হাঙ্গেরীর খ্যাতনামা ফুটবল দল তাতাবানিয়া ক্লাবের সঙ্গে প্রদর্শনী খেলায় মোহনবাগান ৩-০ গোলে পরাজিত হয়। হাঙ্গেরী টোকিও অলিম্পিকে ফুটবল বিজয়ী। এই দলে কয়েকজন অলিম্পিক খেলোয়াড়ও ছিলেন। অপূর্ব ক্রীড়ানৈপুণ্য এবং দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায় তাতাবানিয়া দলের খেলায়।

মোহনবাগান ছাড়াও আরও দুটি প্রদর্শনী খেলা হয় কলকাতা ময়দানে। ইষ্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় প্রদর্শনী খেলায় ৪-১ গোলে এবং ভারতীয় দলের বিরুদ্ধে তৃতীয় বা শেষ প্রদর্শনী খেলায় ৩-১ গোলে তাতাবানিয়া দল জয়লাভ করে।

প্লাটিনাম উৎসব বছরে

মোহনবাগান আলোচ্য বছরে প্রথম ডিভিসন ফুটবল লীগ বিজয়ী। আই. এফ. এ শীল্ড ফাইনালে ইষ্টবেঙ্গলের সঙ্গে খেলা অমীমাংসিত থাকায় পর খেলা পুনরনুষ্ঠান সম্পর্কে এখনও কিছু সিদ্ধান্ত হয়নি। কিন্তু মীমাংসা না হলে মোহনবাগানকে ইষ্টবেঙ্গলের সঙ্গে আলোচ্য বছরের আই. এফ. এ শীল্ডে যুগ্মবিজয়ী বলে ঘোষণা করা যেতে পারে। ১০ই ডিসেম্বর দিল্লীতে অনুষ্ঠিত দুরাণ্ড কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ইষ্টবেঙ্গলকে ২-০ গোলে হারিয়ে মোহনবাগান দুরাণ্ডী বিজয়ী হয়েছে। মোহনবাগান এইবার নিয়ে মোট পাঁচবার দুরাণ্ডবিজয়ী হোল। প্লাটিনাম জয়ন্তী বছরে মোহনবাগানের এই সাফল্য খুবই উল্লেখযোগ্য। বাকী আছে ভারতীয় ফুটবলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগিতা রোভার্স কাপ।

কমনওয়েলথ দলের প্রদর্শনী ক্রিকেট

মোহনবাগান ক্লাবের প্রতিষ্ঠার জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে কমনওয়েলথ ক্রিকেট দল কলকাতার ইডেন উদ্যানে দুটি প্রদর্শনী খেলায় অংশগ্রহণ করেন। জয়ন্তী দলের সঙ্গে তিনদিন ব্যাপী প্রথম খেলাটি অমীমাংসিত ভাবে শেষ হয়। মুখ্যমন্ত্রী দলের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় প্রদর্শনী খেলায় কমনওয়েলথ দল এক উইকেটে জয়ী হয়। স্থানীয় খেলোয়াড়দের নিয়ে জয়ন্তীদল গঠিত হয়। প্রথম খেলার তুলনায় দ্বিতীয় খেলায় আকর্ষণ ছিল অনেক বেশী। মুখ্যমন্ত্রীদল নামে আখ্যায়িত হলেও এটি ছিল পুরোপুরি ভারতীয় দল। ভারতের খ্যাতিমান টেষ্ট খেলোয়াড়গণ এই দলে অংশগ্রহণ করেন। পিটার রিচার্ডসন কমনওয়েলথ দলের এবং ভারতীয় টেষ্ট অধিনায়ক পতৌদির নবাব মুখ্যমন্ত্রীর দলের অধিনায়কত্ব করেন। দুই দলের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় খেলাটিও বেশ উপভোগ্য হয়। যদিও পাঁচদিনের খেলা চারদিনেই শেষ হয়ে যায়। দুই দলের খেলোয়াড়দের ব্যাটিং দর্শক চক্ষুকে বিশেষ আনন্দ দেয়। মুখ্যমন্ত্রীর দলের চারু বোরদের ১২৪ রান, হনুমন্ত সিংয়ের ১২৪ রান, সেলিম দুরানীর ৯২ রান, রামকান্ত দেশাইয়ের ৬৮ রান এবং জয়সীমা'র ৬৬ রান, বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আগন্তুক দলের পক্ষে সোবার্স (১০২ রান), কলিন কাউড্রে (৬৯ রান), মুস্তাক মহম্মদ (৫৯ রান), স্মিথ (৬৮ রান), ক্লোজ (৪২ রান), ব্যাটিংয়ে কৃতিত্বপূর্ণ নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন।

॥ সংক্ষিপ্ত ফলাফল ॥

প্রথম প্রদর্শনী খেলা

কমনওয়েলথ দল :—১ম ইনিংস ৮ উইকেটে ৪০৪ ডিক্লেয়ার্ড (পিটার রিচার্ডসন ১০০, সেলিম দুরানী ১০২, মুস্তাক মহম্মদ ৬৩, কলিন কাউড্রে ৪০; কল্যাণমিত্র ১৪৭ রাণে ৫ উইঃ)

জয়ন্তী দল :—১ম ইনিংস—২৬৭ (এন ঘোষ ৪০, গোস্বামী ৩৭, এ রায় ৩৪, শ্যামসুন্দর মিত্র ৫৬, সুধীর দাস ২৭, কোন্ডওয়েলে ৩৪ রাণে ৪ উইঃ, বেরীনাইট ২৬ রাণে ২ উইঃ, নিরম ৩৩ রাণে ১ উইঃ) কমনওয়েলথ দল—২য় ইনিংস—৬ উইঃ ২৭২ (কাউড্রে ৬৯, নাইট ৪১, মুস্তাক মহম্মদ ৬৮, ক্লোজ ৪৭ নট আউট এন, ঘোষ ৪২ রাণে ২ উইঃ, এস, সি মিত্র ৩৭ রাণে ১ উইঃ, চুনী গোস্বামী ২৮ রাণে ১ উইঃ কল্যাণ মিত্র ৮০ রাণে ১ উইঃ, জসি সরকার ৪২ রাণে ১ উইঃ)

[খেলা অমীমাংসিত]

দ্বিতীয় প্রদর্শনী খেলা

মুখ্যমন্ত্রীর দল :—১ম ইনিংস—৩৩১ (চারু বোরদে ১২৪, সেলিম দুরানী ৯২, সরদেশাই ৪৬; সিবস্ ৪৭ রাণে ২ উইঃ, মুস্তাক মহম্মদ ৪৮ রাণে ২ উইঃ, পটৌদির ৪৩ রাণে ২ উইঃ, ক্লোজ ৫৫ রাণে ২ উইঃ)

কমনওয়েলথ দল :—১ম ইনিংস—৩১৪ (সোবার্স ৮০, কাউড্রে ৬৬, মুস্তাক মহম্মদ ৫৯, রিচার্ডসন ৪০, মুচার ৪০; দেশাই ৫৮ রাণে ৩ উইঃ)

মুখ্যমন্ত্রীর দল :—২য় ইনিংস—৪৩৯ (হনুমন্ত সিং ১৪৪, রামকান্ত দেশাই ৬৮, জয়সীমা ৫৪, বোরদে ৫৭; কাবার্স ৯৪ রাণে ৪ উইঃ)

কমনওয়েলথ দল :- ২য় ইনিংস—৯ উইঃ ৫২৭ (সোবার্স ১০২, স্মিথ ৬৮, ক্লোজ ৫২, মুস্তাক মহম্মদ ৫১, মুচার ৫৫; বোরদে ৪৭ রাণে ৩ উইঃ)

[কমনওয়েলথ দল এক উইকেটে জয়ী]

বিশ্ব-উৎসব

॥ সচিত্র সংযোজন ॥

খৃস্ট্‌মাস্

"যাঁকে আমরা পরম মানব বলে স্বীকার করি তাঁর জন্ম ঐতিহাসিক নয়, আধ্যাত্মিক। প্রভাতের আলো সদ্য প্রভাতের নয়, সে চিরপ্রভাতের।"

*　　*　　*　　*

আনন্দ করব কী নিয়ে? এক দিকে যাঁকে মারছি নিজের হাতে, আর এক দিকে পুনরুজ্জীবন প্রচার করব শুধু মাত্র কথায়? আজও তিনি মানুষের ইতিহাসে প্রতি মুহূর্তে ক্রুশে বিদ্ধ হচ্ছেন।"

*　　*　　*　　*

"বড়োদিন নিজেকে পরীক্ষা করবার দিন, নিজেকে নম্র করার দিন।"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

খৃস্ট্‌মাস্

গৌরীশংকর দে

রোমানরা তরবারির মুখে জয় ক'রে নিয়েছে এশিয়ার অনেক দেশ। এদের মধ্যে আছে জুডিয়া। ইহুদীদের দেশ। ভূমধ্যসাগরের পূর্ব উপকূলে।

জেরুসালেমের কাছে বেথ্‌লেহেম শহরে একদিন এলেন একজন মহিলা, আর একজন পুরুষ। শহরে তখন লোকগণনা চলছে। একটি শিশু ভূমিষ্ঠ হ'য়ে শহরের লোক সংখ্যা বাড়াল। ভূমিষ্ঠ হয়েছে সে এক সরাইখানার আস্তাবলে। ঘোড়ার 'জাব' খাবার পাত্রে। আকাশে একটি তারার আবির্ভাব দেখে প্রাচ্যদেশের জ্ঞানী ব্যক্তিরা বুঝতে পারলেন এক মহাপুরুষের জন্ম হয়েছে। তারাটি অনুসরণ ক'রে এঁরা গেলেন আস্তাবলে। অনেক উপহার দিয়ে পূজো করলেন নবজাতককে।

...এর পর দু হাজার বছর কেটে গেছে। তবু ওই দিনটি স্মরণ ক'রে আজো উৎসবের আনন্দে উদ্বেল হ'য়ে ওঠে পশ্চিমের অগণন দেশ।

বাস্তবিক, খৃস্টমাস্ পশ্চিমী মানুষদের কাছে বছরের সব চেয়ে পবিত্র, সব চেয়ে আনন্দের দিন। আমাদের যেমন দুর্গাপূজা, মুসলমানদের মহরম, তেমনি খ্রীস্টানদের সব চেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব খৃস্ট্‌মাস। হাজার হাজার মানুষ সারা বছর সাগ্রহ প্রতীক্ষায় থাকে এই অনুষ্ঠানটির জন্য। ডিসেম্বর আসার সঙ্গে সঙ্গেই সাড়া প'ড়ে যায় সর্বত্র। চারদিকে তখন সাজো-সাজো রব। গৃহস্থ, ছাত্র, দোকানদার সবাই যে যার মতো ক'রে দেশে যায় আসন্ন উৎসবটি সব দিক থেকে সুন্দর আর সফল ক'রে তোলার কাজে। খৃস্টোৎসবের মতো ব্যাপক, সুখের, আর বর্ণাঢ্য উৎসব সত্যি কম আছে। এই অনুষ্ঠানটিকে কেন্দ্র ক'রে ডাক-বিভাগের তৎপরতাও কি কম বাড়ে! সুন্দর-সুন্দর সব চিঠির সেতু-পথে হৃদয়ের বার্তা আর শুভেচ্ছা বিনিময় করে সকল বয়সের নরনারী।

সেকালের খৃস্টোৎসব ঃ

খ্রীস্টীয় ষোলো এবং সতেরো শতকের ইংল্যাণ্ডে যেমন ধুমধাম সহকারে আর ব্যাপক আকারে খৃস্টোৎসব উদযাপন করা হত এখন বোধ হয় আর কোনো দেশে আর কখনো দেখা যাবে না। খৃস্ট্‌মাস্ ইভ থেকে শুরু ক'রে বারো দিন পর্যন্ত চলত এর জের। রাজবাড়ি, বড়ো-বড়ো দুর্গ, আর ম্যানরহাউস-এ ক'রেকদিন ধরেই চলত ধুমধাম, হই—হল্লা। প্রত্যেক চাষা ঘরজার ওপর ঝুলিয়ে রাখত এক ধরণের চির সবুজ আগাছা। রান্নার কাজ যারা করত তারা ছাড়া আর সবাই তখন পেত ছুটি।

উৎসবের একেবারে গোড়াতেই নিযুক্ত হত একজন 'বিশৃঙ্খলার রাজা।' রাণী প্রথম এলিজাবেথের সময়কার পিউরিটানরা তাকে বলত 'শয়তানের নাগীর।' ইনি খেলা এবং প্রমোদ অনুষ্ঠান পরিচালনা করতেন। তা ছাড়া ইনি নিযুক্ত করতেন জন ক'রেক প্রহরী। এরা শরীরের নানা জায়গায় জড়াত রঙিন ফিতা, পায়ে বাঁধত ছোট-ছোট ঘণ্টা।

পথে-পথে তখন নাচ—গান—অভিনয় ক'রে বেড়াত মূক অভিনেতার দল। মেয়েরা ছেলেদের আর পুরুষেরা মহিলাদের পোশাক পরত। সেণ্ট জর্জ, হেক্টর, ল্যান্সেলট, আর মহান আলেকজাণ্ডার সাজতেই লোকে বেশি ভালোবাসত।

গরীব ধনী সবার ঘরেই ঘরের মধ আর আপেলের মদে ভরা থাকত পাত্র। কয়েকটি অঞ্চলে ডিম আর ফুলের মালায় সাজানো মদের পাত্র হাতে নিয়ে বাড়ি-বাড়ি ঘুরে বেড়াত নবীন যুবক আর মেয়েরা।

উৎসবের শুরুতে প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় লোকেরা তখন গান করত। রাত্রিবেলা 'ওয়েইটস' নামে পরিচিত গায়কের দলগুলি গান গেয়ে বেড়াত পথে, অভিনয় করত ম্যানর হাউসে। পারিতোষিক মিলবে ব'লে।

এপিফ্যানির সময় ম্যানরহলের দ্বার আর জানালাগুলি মুড়ে দেয়া হত বিচিত্র পর্দায়। জানালাগুলিতে ঝিকমিক করত হলি, বে, লরেল, আর রোজমেরীর শিশিরভেজা পাতা। সিলিং থেকে, আর দরজার ওপর ঝুলত মেরীকাশে সাজানো চিরহরিৎ আগাছা। ওক গাছের পেল্লায় টেবিলে চাকরেরা সাজিয়ে রাখত শূকর, রাজহাঁস ইত্যাদি নানা জীব জন্তুর মাংস দিয়ে তৈরি নানা রকম সুখাদ্য খাবার।

ইউল লগ বা বড়দিন উৎসবের কাঠের গুঁড়ি দড়ি বেঁধে টানাটানি করত ছেলেরা। জমিদার, জমিদার গিন্নী, প্রতিবেশী, আর প্রজারা দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখত। উঁচু টেবিলে বসিয়ে দে'য়া হত ছোট-খাটো একখানা তালগাছের মতো মোমবাতি। সেটা জ্বলত বারো দিন ধ'রে।

মোমবাতি জ্বলে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে যেত খানা-পিনা, আমোদ-প্রমোদ, ভজন গান, সুরাপান। উৎসবের খেলাগুলির মধ্যে সব চেয়ে জনপ্রিয় ছিল স্নাপড্রাগন। এই খেলায় এক পাত্র জ্বলন্ত স্পিরিট থেকে আঙুল দিয়ে কিশমিশ আর মনক্কা তুলে নেবার চেষ্টা করত খেলোয়াড়রা।

রাত একটু বাড়তেই বেজে উঠত ঘণ্টা। শিশু যীশু আসছেন ব'লে গান ধরত গায়কের দল। মধ্যরাতের গির্জায় সবাই হাজির হত প্রার্থনা জানাতে। চিরসবুজ গাছপালার গন্ধে তখন ভরপুর গির্জার অঙ্গন। সকাল বেলা আরেকবার গির্জায় জড়ো হত ভক্তের দল। তারপর ম্যানরহাউসে ঘটা ক'রে শুরু হত প্রাতরাশ।

বেলা এগারোটায় আরম্ভ হত খৃষ্টমাস্ ভোজ। বাদ্য-ভাণ্ড সহকারে হলে ঢুকতেন 'বিশৃঙ্খলার রাজা' বা লর্ড অব মিসরুল। তার পিছে পিছে আসত প্রধান অনুচর। তার মাথায় থাকত একটা রুপোর প্রকাণ্ড থালাকোশ। ওই থালাকোশেই থাকত উৎসবের সব চেয়ে মূল্যবান ভোজের থালাটি। থালাটিতে শোভা পেত রোজমেরী, বে-র পাতা আর ফুলের মালায় সাজানো একটা বুনো শূকরের মাথা। শূকরটার মুখে থাকত আপেল আর লেবু। থালাধারীর পেছন-পেছন থাকত মশালধারীর দল। তার পেছনে থাকত আবার সামন্ত প্রভু, নাইট আর সম্ভ্রান্ত মহিলাদের মিছিল। এই বিচিত্র শোভাযাত্রা এগিয়ে যেত পেল্লায় টেবিলটার দিকে। শুরু হত গান। অনুচর তখন থালাটি রাখত সামন্ত-প্রভুর সামনে। সমবেত মহিলাদের মধ্যে আবার যিনি সব চেয়ে সুন্দরী তিনি মাথায় ক'রে আনতেন একখানা থালা। ওতে থাকত একটা ময়ূর। রোস্ট করার পর পালকগুলি আবার লাগিয়ে দেয়া

হয়েছে। এটি পরিবেশন করার অধিকার ছিল তাঁরই, যিনি সব চাইতে রূপসী। এরপর ভৃত্যেরা নিয়ে আসত পাত্রভরা সুরা। গান—ভোজন চলত রাত পর্যন্ত।

খৃস্ট্মাস্ এর পরের দিনটি হল সেণ্ট ষ্টিফেন ডে। ইংল্যাণ্ডে এই দিনটি বক্সিং ডে নামে পরিচিত। চাকর-বাকর আর দোকানদারদের ওই দিন টাকা দেওয়া হয় বাক্সে ক'রে। ইংল্যাণ্ডে এই প্রথাটি এসেছে প্রাচীন রোম থেকে।

ইংল্যাণ্ডে একিকেনি বা বাদশ দিন'টিও ছিল উপহার বিতরণের দিন। মেজাই-এর স্মৃতিতে ওই দিন ইংল্যাণ্ডের রাজারা বেদীর সামনে দাঁড়িয়ে বিতরণ করতেন সোনা, মুসব্বাতি, ধূপ ইত্যাদি দ্রব্য। সাধারণ মানুষও এই দিন উপহার বিনিময় করত নিজেদের ভেতরে। বাদশ দিনের অন্যতম আকর্ষণ ছিল একখানা প্রকাণ্ড কেক। কেক-এর ভেতরে পুরে দেওয়া হত শিম। যার ভাগে কেক-এর শিম-দেওয়া অংশ পড়ত সে হত ওই দিনের রাজা। তার নামও হত সে-দিন 'শিমের রাজা।' সবাই তার সৌভাগ্যের ঈর্ষা করত।

শেকসপীয়ারের সময়কার বড়োদিনের উৎসব সব চেয়ে বেশি আড়ম্বর দেখা যায়। পিউরিটান আমলে অন্যান্য অনেক আমোদ-প্রমোদের মতো খৃষ্ট্ উৎসব ও নিষিদ্ধ হয়। উৎসবটি আবার পুনরুজ্জীবিত হয় রাজা দ্বিতীয় চার্লসের সময়ে। তবে আগের চেয়ে অনেক স্তিমিত চেহারায়।

প্রাচীন নরওয়েতে খৃস্টোৎসব উপলক্ষ্যে লাঠির ডগায় জইয়ের ছড়া বেঁধে ঘরের চালায় ঠেকাতে ঠেকাতে পথ দিয়ে যেত কৃষকেরা। মনে করত এর ফলে অশুভ শক্তি দূর হ'য়ে যাচ্ছে।

একালের খৃস্টোৎসব :

বেথলেহেম নগরে :

যীশুখ্রীস্টের জন্মভূমি বেথ্লেহেম-এ ওই দিন সন্ধ্যা মিছিল বেরোয় পথে। মিছিলের পুরোভাগে থাকেন বিশিষ্ট সব ধর্ম-যাজকেরা। মোমের আলো লেগে ঝলমল করে তাঁদের পোশাক। একটি ছোট মোম বাতির ভেতর থাকে আবার শিশু যীশুর মোমের মূর্তি। মিছিলটি এসে থামে বেথ্লেহেমের প্রাচীন, ঐতিহাসিক গির্জাটির সামনে। বড়দিন উপলক্ষ্যে নানা দেশ থেকে লোক আসে ওখানে হৃদয়ের ভক্তি আর প্রণতি জানাতে।

আমেরিকায় :

আমেরিকার অধিবাসীদের কাছেও খৃস্ট্মাস্ একটি আনন্দের দিন। বিশেষ ক'রে শিশুদের কাছে। যে সব ছেলে—মেয়েরা ভাগ্যবান, মোটামুটি সচ্ছল পরিবারের সন্তান তাদের কাছে ওই দিনটি আসে বিচিত্র উপহার, ঝলমলে খৃস্ট্মাস্ ট্রি, শাদা আর লাল মিঠাই-মণ্ডা, আর আইনস্ক্রিম বিয়ে। সব অধিকার, সব বয়সের মানুষের সমবেত চেষ্টায় মুখর হ'য়ে ওঠে রাস্তা-ঘাট, বাড়ি-ঘর, সব কিছু। আকাশ—বাতাসও যেন ঐদিন যোগ দেয় মানুষের আনন্দ-উৎসবে। যীশুখ্রীস্টের পুণ্য জীবনের করুণ ঘটনা অবলম্বনে নাটিকায় নানা ভূমিকায় অভিনয় করে স্কুল—কলেজের ছেলে-মেয়েরা। চিঠি লেখে বিদেশের ছেলেমেয়েদের কাছে। স্কুল, চার্চ, আর পৌর কর্তৃপক্ষ গরীবদের জামা-কাপড় আর খাবার বিতরণ করে।

ব্যবসায়ীদের হাতেও দু পয়সা আসে বড়দিনে। রং বেরঙের কাগজ, কাপড়, ফিতা, কার্ড ইত্যাদি কত কিছুই না বিক্রি-হয় ওই সময়। খাবারের দোকানগুলোও কি কম ব্যস্ত থাকে! খৃষ্টমাস্ ট্রি বিক্রি করেও অনেকে ভালো রোজগার ক'রে নেয়।

উত্তর য়ুরোপের দেশগুলিতে :

স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার দেশগুলিতে বড়োদিনের উৎসব শুরু হয় খৃস্টমাস্-এর সন্ধ্যায়, শেষ হয় বারো দিন পর। প্রাচীনকালে সত্যি—সত্যি যে শূকরের মাংসের ভোজ বসত তারই স্মারক হিসেবে উৎসবের দিনে তৈরি হয় মুনো শূকরের আকৃতির কেক আর রুটি। খড় দিয়ে তৈরি করা হয় ছোট—ছোট—ছাগল। অনেক জায়গায় অন্য দিনের চাইতে ভালো খাবার দে'য়া হয় গবাদি পশুদের। আর পাখিদের উদ্দেশে ছড়িয়ে দে'য়া হয় শস্যের দানা। সাদা দাড়ি লাগিয়ে, লাল পোশাক প'রে ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে বুড়োর বেশে ভূত—প্রেত সেজে আসে বহুরূপীর দল। আরেকজন আসে বুড়ি সেজে, উপহারের ঝুড়ি হাতে। গান—বাজনা, আমোদ-প্রমোদের পর রাত নটা দশটা নাগাদ শুরু হয় নৈশ ভোজ। প্রধান খাবার শুঁটকি মাছ। গ্রামের লোকেরা অন্ধকার থাকতে থাকতে যায় গির্জায়। গির্জা থেকে এক রকম ছুটেই তারা বাড়ি ফেরে। কারণ যে আগে বাড়ি ফিরতে পারবে সে-ই নাকি পরের গ্রীষ্মের শস্য প্রথম ঘরে তুলতে পারবে।

পশ্চিম য়ুরোপে :

পাঁচই ডিসেম্বর তারিখে সেন্ট নিকোলাসের পোশাক প'রে একজন লোক ঘুরে বেড়ায় জার্মানীর বাড়ি—বাড়ি। ছেলে—মেয়েদের শুধায় তারা সারা বছর কী রকম আচার-ব্যবহার করেছে। ৬ই ডিসেম্বর, মানে সেন্ট নিকোলাসের ভোজের দিন ভালো ছেলে মেয়েরা উপহার পায়, আর খারাপ ছেলে-মেয়েরা পায় শুধু গাছের ছোট ডাল। বেলজিয়ামে খৃস্টমাস্-এর সন্ধ্যায় ছোট ছেলে মেয়েদের কবরের ওপর পুতে রাখা হয় আলো দিয়ে সাজানো ছোট- ছোট গাছ। অনেক জায়গায় ছেলেরা 'জ্ঞানী'র পোশাক প'রে যীশুর গল্প বলে বেড়ায় লোকের বাড়ি বাড়ি।

বেলজিয়াম আর নেদারল্যাণ্ডস-এ উৎসব উপলক্ষ্যে সিন্টার্ক্লাস ঘ'রে চলে তিন—পুরুষ। ফ্রান্সেও খৃস্টোৎসব বড়ো আনন্দের দিন। উৎসবের ক'য়েকদিন আগে থেকেই দোকানের শো কেস ভ'রে যায় উপহার—সামগ্রীতে।

পূর্ব য়ুরোপে :

পূর্ব য়ুরোপের লোকেরা খৃস্টমাস্কে শুধু একটি উৎসবের দিন বলেই মনে করে না। তারা বিশ্বাস করে ওই দিনটিতে প্রতি বছরই যীশু নতুন ক'রে ভূমিষ্ঠ হন। সেদিন অনেকে ঘরের মেঝে ঢেকে দেয় খড়কুটো দিয়ে। বেথলেহেমের আস্তাবলটির কথা মনে রেখে। রুমানিয়াতে খৃস্টোৎসব উপলক্ষ্যে তৈরি হয় বিশেষ ধরনের কেক।

ইটালী এবং স্পেনে :

ইতালী এবং স্পেনে খৃস্টোৎসব-উপলক্ষ্যে ধার্মিক লোকেরা একদিন উপোস ক'রে। রাখালের পোশাক প'রে বাড়ি থেকে বাড়িতে যায় গায়ক—গায়কের দল। অলিভ গাছকে সাজানো হয় কমলালেবু দিয়ে। স্পেনে সন্ধ্যাবেলা প্রতিটি বাড়িতে জ্বেলে দে'য়া হয় ইয়লগীল। দোকান পসার আলোয় আলোময় হ'য়ে ওঠে রাত্রিবেলা।

পঁচিশে ডিসেম্বর :

যীশুখৃস্টের জন্মদিন ঠিক কবে তা কিন্তু জানা যায়না। যে দু'শ বছর খ্রীস্টানরা বিপদ্জনক অবস্থায় কাটিয়েছে সেই সময়ে চার্চ খৃস্টোৎসব পালন করতনা। ২০০ অব্দের পর খৃস্টোৎসব উদযাপন শুরু হয়। তবে নানা তারিখে। ২৫ শে ডিসেম্বর খৃস্ট্মাস্ ব'লে ধার্য হয় খৃঃ চতুর্থ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে।

উপহার প্রথা :

খৃস্ট্মাস্ উপলক্ষ্যে উপহার দেবার প্রথাটি খুবই পুরোনো। ঈদ-উৎসবে প্রাচীন রোমানরা উপহার বিতরণ করত। বাইবেলে গল্প আছে যীশুর জন্মের বারোদিন পর তাঁর জন্য উপহার নিয়ে হাজির হ'য়েছিলেন পূর্ব দেশের জ্ঞানী ব্যক্তি।

ইটালী আর স্পেনের ছেলেমেয়েরা কিন্তু বড়দিনে কোনো উপহার পায়না। তারা পায় পাঁচই জানুয়ারীতে।

উত্তর য়ুরোপের অনেক দেশের ছেলেমেয়েরা উপহার পায় ছ-ই ডিসেম্বর তারিখে।

খৃস্টমাস ট্রি :

উৎসবের প্রধান আকর্ষণ হিসেবে খৃস্ট্মাস্ ট্রি সাজাবার প্রথাটি কিন্তু খুব বেশি দিনের নয়। প্রথাটির প্রথম প্রচলন জার্মানীতে। অনেকে মনে করেন মার্টিন লুথারই এই প্রথার প্রবর্তক। খৃস্ট্মাস সন্ধ্যার প্রতীক হিসেবে তিনি নাকি একটি চিরহরিৎ গাছের ডালে মোম বাতি জালিয়ে ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই প্রথাটি য়ুরোপের অন্যান্য দেশে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু আজো ইটালী, স্পেন, আর ল্যাটিন আমেরিকার বড়দিনের উৎসবে খৃস্ট্মাস্ ট্রি-র ব্যবহার নেই।

শিল্প-সাহিত্যে খৃস্ট্মাস্ :

যুগে-যুগে খৃস্ট্মাস্ যে শুধু সাধারণ মানুষকেই আনন্দ-দিয়ে এসেছে তা নয়; চিত্র-শিল্পী, কবি, আর গল্প-লিখিয়েদেরও দিয়েছে উদ্দীপনা। ফ্রা আঞ্জেলিকো, জত্তো, বত্তিচেল্লী, ডিউরের প্রমুখ শিল্পীরা খৃস্টের জন্ম-মুহূর্ত অমর ক'রে রেখেছেন তাঁদের প্রাণস্পর্শী তুলিতে। খৃস্ট্মাস্ থেকে প্রেরণা পেয়েছেন মিল্টনের মতো কবি আর ডিকেন্সের মতো কথা-সাহিত্যিক।

রাজ-সভায় খৃস্ট্‌মাস্

নীলিমা দে

য়ুরোপীয় রাজাদের কার কত ক্ষমতা আর ঐশ্বর্য তার একটা চাক্ষুস প্রমাণ পাওয়া যেত গত ক'য়েক শতকে য়ুরোপের বিভিন্ন রাজ-দরবারে, খৃস্ট্‌মাস-এর সময়। স্বপ্ন, মায়া, আর সৌন্দর্যের সংমিশ্রণে ইন্দ্রলোকের মতোই হ'য়ে উঠত এক-একটি রাজ-সভা। খৃস্ট-উৎসব ছিল নবাগত রাজাদের অভিষেকেরও সময়। ১০৬৬ সালের খৃস্ট্‌মাস্-এর দিনে ওয়েস্টমিনিস্টার অ্যাবি-তে অভিষিক্ত হ'য়েছিলেন বিজয়ী উইলিয়াম। ১১৩৫ সালের ২৬শে ডিসেম্বর, সেন্ট স্টিফেন দিবসে, অভিষিক্ত হন রাজা স্টিফেন।

ইংল্যাণ্ডের রাজা দ্বিতীয় হেনরীর অভিষেকও হয়েছিল খৃস্ট্‌মাস্-এর দিনে, ১১৪৪ সালে। ভোজ আর টুর্নামেণ্টের আয়োজন ক'রে তিনি রাজ-সভায় খৃস্ট্‌মাস্-এর প্রকৃত আবহাওয়া সৃষ্টি করেছিলেন। খৃস্ট্‌মাস্ উপলক্ষ্যে কে কত আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করতে পারে এর একটা প্রতিযোগিতা যেন লেগে গিয়েছিল হেনরীর বংশধর রাজাদের মধ্যে। ১৩৪৬ সালে খৃস্ট্‌উৎসব উপলক্ষ্যে তৃতীয় এডওয়ার্ড 'গার্টার সম্প্রদায়'-এর প্রতিষ্ঠা করেন।

জাঁকজমকের জন্য খ্যাত ছিল দ্বিতীয় রিচার্ডের রাজ-সভা। তিনি যে খৃস্ট্‌-উৎসবের আয়োজন করেছিলেন সে রকম খৃস্ট্‌মাস্ খুব কমই দেখা গেছে। ১৩৮৯ সালে লণ্ডনে তিনি একটি টুর্নামেণ্টের আয়োজন করেছিলেন। ষাটজন সুন্দরী রূপোর শেকল দিয়ে ষাটজন নাইটকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল টুর্নামেণ্টের ময়দানে। তারপর মেয়েরা গিয়ে দাঁড়িয়েছিল সুসজ্জিত প্যাভিলিয়নে। বিদেশী নাইটদের সঙ্গে ক্রীড়াযুদ্ধে নেমে ইংল্যাণ্ডের সেই ষাটজন নাইট সেদিন প্রচুর আনন্দ দিয়েছিল দর্শকদের।

রিচার্ডকে বিতাড়িত ক'রে যিনি ইংল্যাণ্ডের সিংহাসন দখল করেছিলেন সেই চতুর্থ হেনরী এলথাম প্রাসাদে খৃস্ট-উৎসব উপলক্ষ্যে আপ্যায়িত করেছিলেন বাইজেনটাইন-সম্রাটকে। শেক্সপীয়রের নাটক প'ড়ে পঞ্চম হেনরী যেমন বীর এবং আদর্শ পুরুষ ব'লে মনে হয় আসলে তিনি তা ছিলেন না। তাঁর আমলে খৃস্ট-উৎসবের গুরুতা অনেক সময়ই কলঙ্কিত করেছে রক্তলিপ্সা। তবে জীবনে একবার তিনি এই পবিত্র উৎসব উপলক্ষ্যে উদারতা দেখিয়েছেন। ফরাসীদের সঙ্গে তখন লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিলেন। গোটা একটা ফরাসী ফৌজ অবরুদ্ধ। ইতিমধ্যে খৃস্ট্‌মাস্ এসে গেছে। ওই উপলক্ষে যে ক'দিন ধ'রে উপবাস চলবে সে ক'দিনের জন্য যুদ্ধ-বিরতি ঘোষণা করেছিলেন হেনরী।

যথারীতি য়ুরোপের রাজসভা-গুলিতে বেশ ধুমধাম ক'রে খৃস্ট-উৎসব উদ্‌যাপিত হত। রাজ্যে সমস্ত ক্ষমতার প্রকৃত উৎস যে রাজা—এ—কথা ঘোষণা করার জন্যই যেন রমণীয় ক'রে তোলা হত রাজার অধিষ্ঠান। অভিনয় আর য়ুরোপ-সুলভ টুর্নামেণ্টের স্থান অধিকার করে। অবশ্য রাজা প্রথম জেমসের রাজত্ব-কাল পর্যন্তও টুর্নামেণ্টের চল ছিল। ১৫১১ সালে রিচমণ্ড প্রাসাদে খৃস্ট-উৎসবে যে যুদ্ধ-নাট্যের আয়োজন করা হয়েছিল তার উপলক্ষ্য রাজা হলেও আনন্দ দেয়েছিল অবশ্য নরনারী।

খৃস্ট-উৎসবকে যে সব রাজারা মনোরম ক'রে তুলেছিলেন অষ্টম হেনরীর নাম তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে স্মরণীয়। তাঁর বিখ্যাত কন্যা এলিজাবেথের রাজত্বকালে অনুষ্ঠিত খৃস্ট্‌মাস উৎসবের অসংখ্য বর্ণনা রয়েছে সমসাময়িক সাহিত্যে। ইংল্যাণ্ডের মাটিতে তখন ছড়িয়ে পড়েছে নব-জাগরণের সোনালি আলো। সে আলো পড়েছিল বুঝি সেকালের উৎসব প্রাঙ্গণেও। খৃস্ট্‌মাস্ বহু আনন্দের আলোড়ন তুলেছিল মহাকবির সেক্‌সপীয়রেরও মনে। সেই আলোড়নেরই প্রকাশ তাঁর 'বারশ রজনী।' ওই উৎসব উপলক্ষ্যেই লেখা।

আধুনিক কালের রাজা হ'য়েও প্রথম জেমসের চোখে ছিল মধ্যযুগের স্বপ্ন। নিজের জন্মভূমি স্কটল্যাণ্ড থেকে তিনি নিয়ে এসেছিলেন টুর্নামেণ্ট আর নাইটদের সম্পর্কে রোমাণ্টিক কল্পনা। অতীত-চারী রাজা বিগত-যুগকে প্রত্যক্ষ করার চেষ্টায় রাজ-সভায় আয়োজন ক'রেছিলেন বর্ণাঢ্য টুর্নামেণ্টের। সে আয়োজনে কোথাও এতটুকু খুঁত ছিল না। তাঁর ছেলে ওয়েলস্-এর রাজকুমার হেনরী মুখোশ অভিনয় দারুণ ভালোবাসতেন। রাজকুমারের অভিষেক উপলক্ষ্যে রাজা জেমস যে খৃস্ট্‌মাস্ উৎসবের আয়োজন করেছিলেন সেই অনুষ্ঠান তাঁর রাজত্বকালের মধ্যেই উজ্জ্বলতম ঘটনা। দর্শকদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন স্পেনের রাজদূত এবং ইংল্যাণ্ডের রাজা ও রাণী স্বয়ং। বাটজন নাইট এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। ভাষণ রচনা করেন নাট্যকার বেন জনসন।

১৬০০ সালে ইংল্যাণ্ডে আবার রাজতন্ত্র স্থাপিত হল। সিংহাসনে বসলেন দ্বিতীয় চার্লস। কিন্তু তাঁর সময়ে আর ফিরে এলনা আগেকার রাজাদের আমলে অনুষ্ঠিত খৃস্ট-উৎসবের দীপ্তি, হল না মুখোশ-অভিনয় আর টুর্নামেণ্টের আয়োজন। যেন রঙিন চিত্রের অন্তর্ধানের পরে পাওয়া—কালোয় আঁকা মামুলি ছবি টাঙানো হল দেয়ালে।

হ্যানোভার রাজাদের আমলে খৃস্ট্‌মাস্ হ'য়ে পড়ল একেবারেই ঘরোয়া ব্যাপার। চোখ-জুড়ানো-নৃত্য উৎসব থেকে একেবারেই বাদ পড়ল। চতুর্থ উইলিয়মের রাণী তাঁর মাতৃদেশ জার্মানী থেকে ইংল্যাণ্ডে আমদানী করেছিলেন খৃস্ট্‌মাস ট্রি। তবে তা জনপ্রিয় হয়েছিল মহারাণী ভিক্টোরিয়া আর প্রিন্স অ্যালবার্ট-এর সময়ে। খৃস্ট্‌মাস্ তখন একেবারেই পারিবারিক উৎসবে দাঁড়িয়েছে। এখনও তাই। তবে রেডিয়ো আর টেলিভিসনের মাধ্যমে ইংল্যাণ্ডের রাণী প্রতিবছর কমনওয়েলথ দেশগুলির উদ্দেশে ভাষণ দেন খৃস্ট্‌মাস্ উপলক্ষ্যে।

———

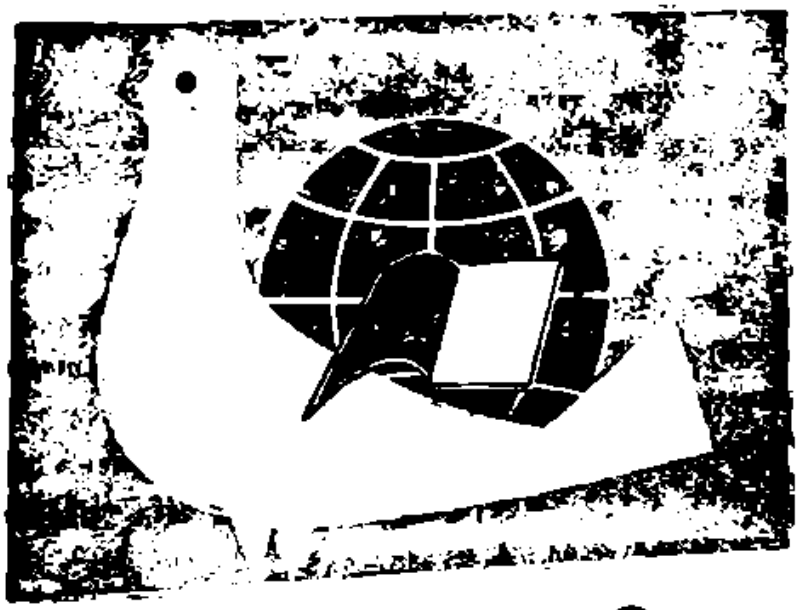

ভারত-সোভিয়েত
মৈত্রীর সচিত্র পাক্ষিক পত্রিকা

সোভিয়েত দেশ

গ্রাহক হোন ও পড়ুন। গ্রাহকরা বিনামূল্যে পাবেন
বহুবর্ণে ছাপা সুদৃশ্য রঙিন ক্যালেণ্ডার ও ডায়েরী

● বিশেষ সুবিধাজনক চাঁদার হার ●
১৫-১১-৬৪ হইতে ৩০-৪-৬৫

ইংরাজী সংস্করণ			অন্যান্য ভাষার সংস্করণ		
	হ্রাসকৃত	স্বাভাবিক		হ্রাসকৃত	স্বাভাবিক
বাৎসরিক	৫·০০	৬·০০	বাৎসরিক	৪·০০	৫·০০
দ্বি-বাৎসরিক	৯·০০	১১·০০	দ্বি-বাৎসরিক	৭·০০	৯·০০
ত্রৈ-বাৎসরিক	১২·০০	১৬·০০	ত্রৈ-বাৎসরিক	৯·০০	১০·০০

আপনার এজেন্টের নিকট চাঁদা জমা দিন অথবা নিম্নঠিকানায় পাঠান:
সোভিয়েত দেশ ১।১ উড স্ট্রীট, কলিকাতা -১৬

প্রকাশিত হয় : ইংরাজী, বাংলা, হিন্দী ভারতীয় ভাষা ও নেপালী ভাষায়

CALCUTTA
CENTRAL
LIBRARY
UNIVERSITY

৭৫৬.৩
.০০৪/৪

বিংশতিতম বর্ষ । প্রথম সংখ্যা

আষাঢ় । ১৩৭১

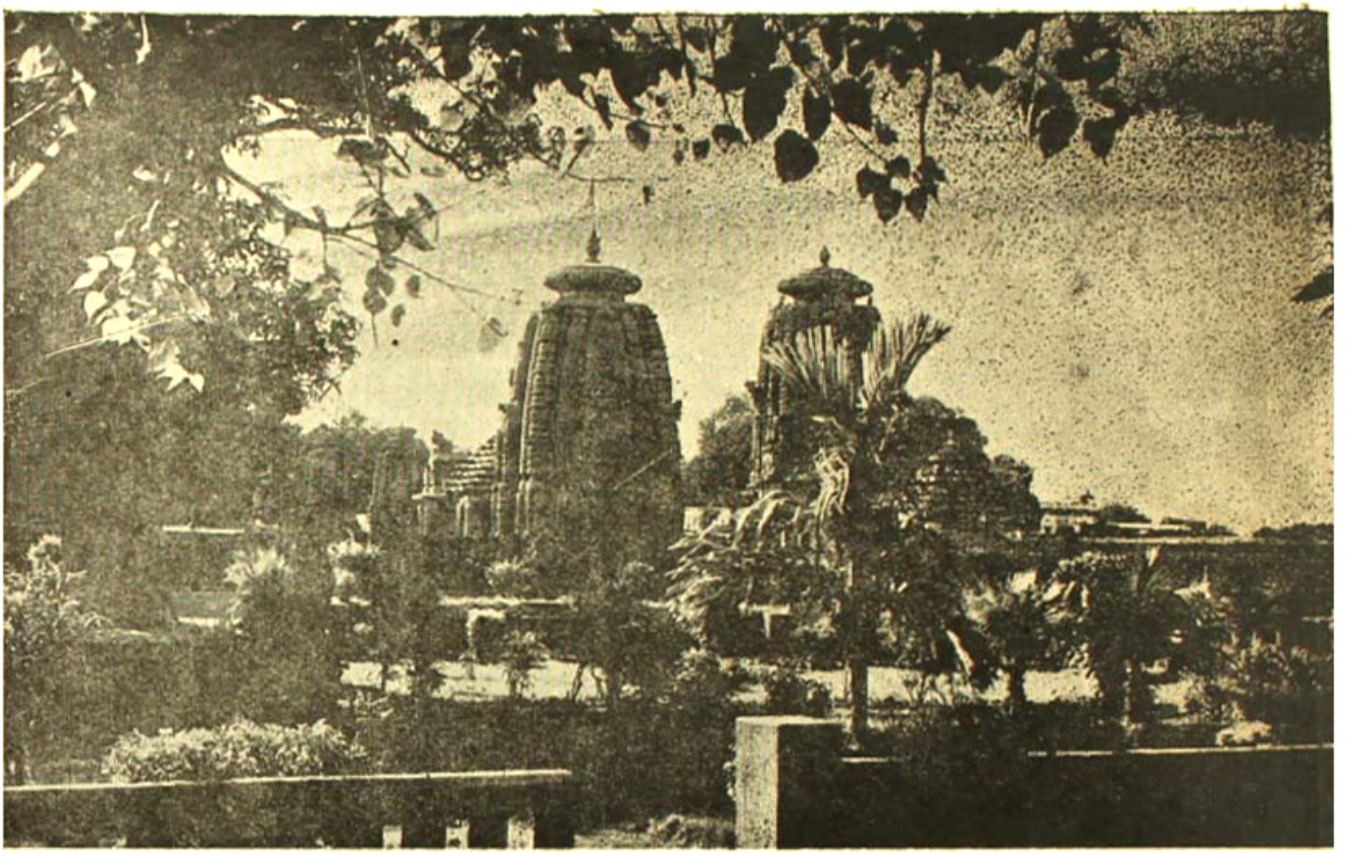

॥ দেবভূমি

মুক্তেশ্বর মন্দির (ভুবনেশ্বর)

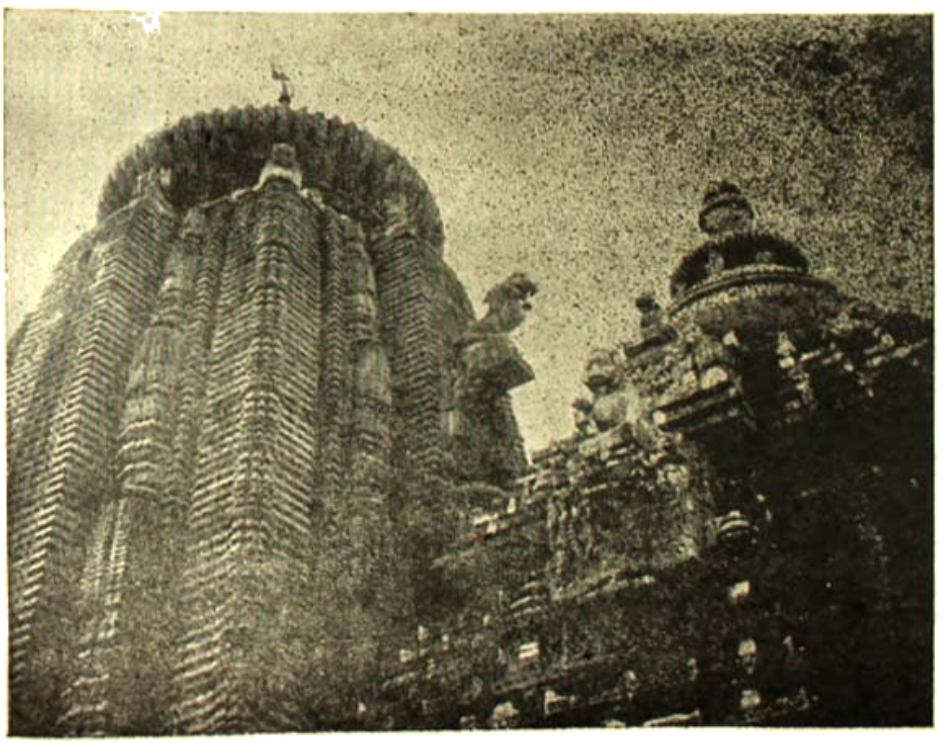

সিদ্ধরাজ মন্দির
(ভুবনেশ্বর)

॥ দেবভূমি ॥

কোনার্কের জগমোহন

রাজারাণীর মন্দির (ভুবনেশ্বর)

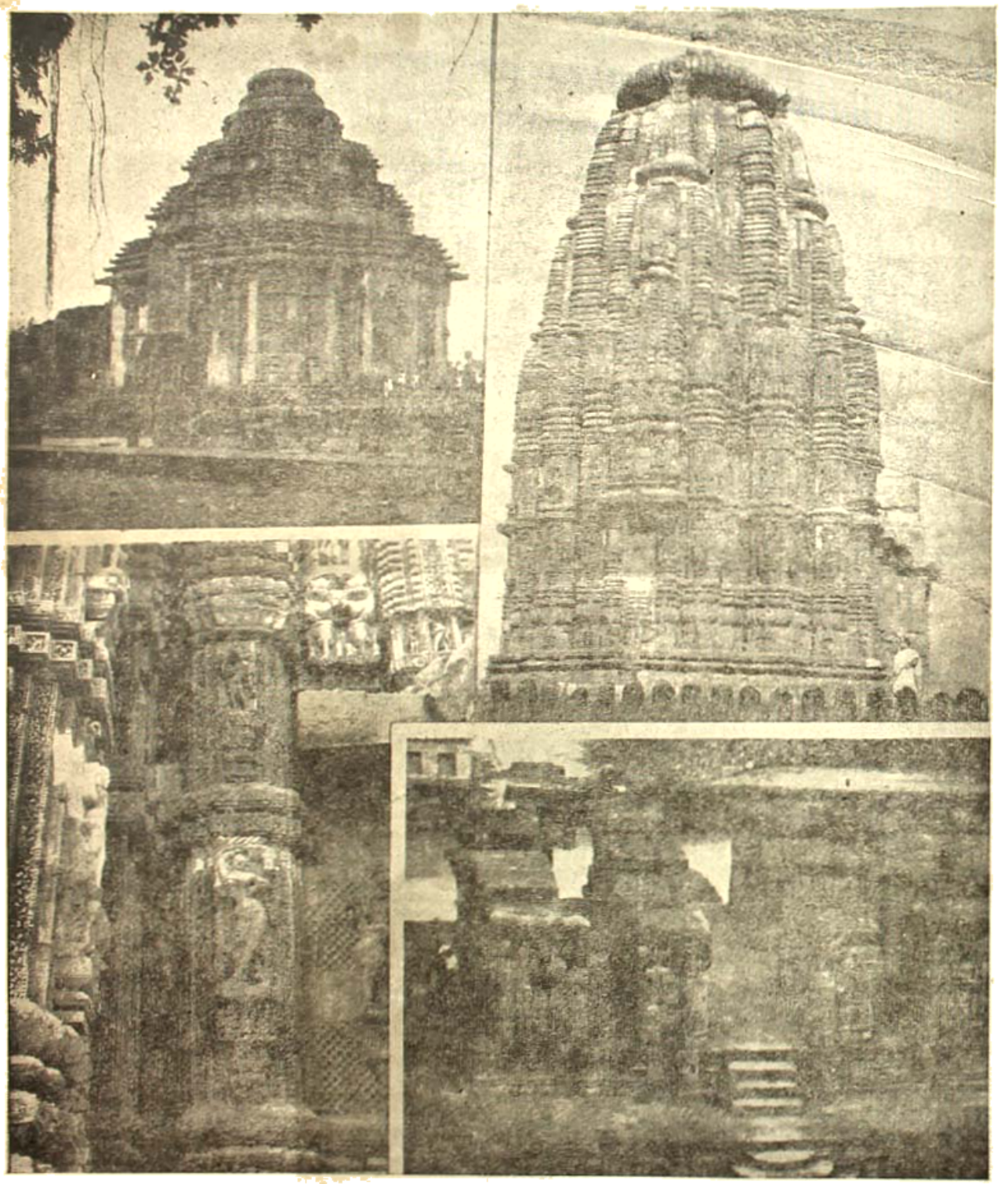

রাজারাণীর মন্দিরের কারুকার্য

কোনার্কের নাটমন্দির

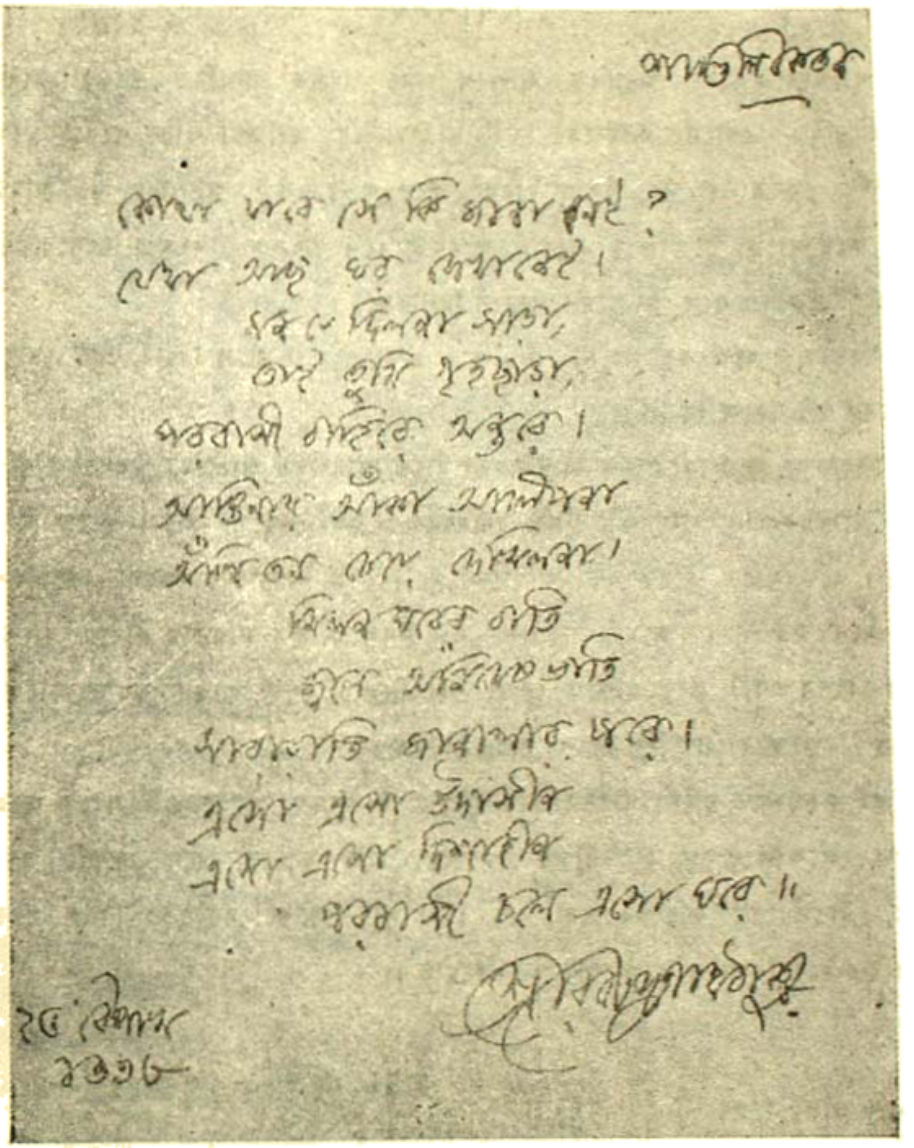

বরণীয় যাঁরা স্মরণীয় তাঁরা

জগৎ পথিক রামেন্দ্র সুন্দর

ডঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

দেশ নয়, মহাদেশ নয়, মহাজগৎ। পর্যটক নয়, অভিযাত্রী নয়, বিশ্বপথিক। রামেন্দ্রসাহিত্য আলোচনা করলে মনে হয়, মহাজগতের কোন্ এক দূরনিরীক্ষ্য মহাপ্রাঙ্গনে কোনো এক বিশ্বপথিক যেন অভিসারে বেরিয়েছেন। দর্শনের তরীতে বিজ্ঞানের পাল খাটিয়ে কোনো দার্শনিক-বৈজ্ঞানিক জগৎ-পরিক্রমা করছেন যেন। পরি-ক্রমণের সেই ইতিহাস লেখা আছে রামেন্দ্র সাহিত্যে। সে ইতিহাস ইতিহাস নয় শুধু। এমনকি দর্শন বা বিজ্ঞানও নয়। একেবারে খাঁটি সাহিত্য। রামেন্দ্রসুন্দরের দর্শন চিন্তা সাহিত্য, আবার বিজ্ঞান-চেতনাও সাহিত্য। আসলে সাহিত্যিকের কলম তাঁর, দার্শনিকের বোধ, আর বুদ্ধি বৈজ্ঞানিকের। তাই রামেন্দ্রসুন্দর বিজ্ঞানের মামুলী প্রবন্ধ লেখেন নি। দার্শনিকের বোধ নিয়ে বিজ্ঞানকে দর্শন করেছেন, বৈজ্ঞানিকের বুদ্ধি নিয়ে জগৎ-পরিক্রমা করেছেন। অর্থাৎ,রামেন্দ্রসুন্দর বিজ্ঞানবিদ্যাকে জানতে চান নি শুধু, বুঝতে চেয়েছেন, তাই তিনি করেছেন বিজ্ঞানের বিচার। বিজ্ঞান-বিদ্যার মর্মসন্ধান করেছেন, বিজ্ঞানবুদ্ধির ফাঁকি ধুলে ধরেছেন। যে ভাষায় খুলে ধরেছেন, তা'তে দার্শনিকের কাঠিন্য নেই, বৈজ্ঞানিকের টেক্‌নিক্যালিটিও নেই। আছে সাহিত্যিকের সহজবোধ্যতা। এই যে সহজবোধ্যতা, রচনায় এই যে প্রসাদ-গুণ, এরই জন্যে রামেন্দ্রসুন্দর যখন যা' লিখেছেন তা'-ই সাহিত্য হয়ে উঠেছে। তাঁর জগৎ-পরিক্রমার ইতিকথা হয়ে উঠেছে রসের সামগ্রী। তথ্যের ভার হালকা হয়ে আনন্দময় মহাসত্য আজ প্রকাশ করেছে সেখানে। জগৎ ও জীবনের এই চিরন্তন সত্যকে নিয়েই রামেন্দ্র সাহিত্য।

সে সাহিত্য কেমন? না মহাকাব্যের মতো গম্ভীর। আবার গীতিকাব্যের মতো রঙে-রসে ভরা। রামেন্দ্র সাহিত্যের পটভূমি বিশ্বভুবন। পাত্র-পাত্রী প্রধানতঃ তিনটি,—জড়, প্রাণ এবং প্রজ্ঞা। এই ত্রয়ীর ইতিকথা নিয়েই রামেন্দ্রসাহিত্য। জড়-জগতের রহস্যলোকের কথা আছে সেখানে। আবার আছে, প্রাণজগতের বিচিত্র কাহিনী। প্রাণের কান্না-হাসি ও দুঃখ-সুখের ইতিকথা আছে আবার আছে প্রাণের সঙ্গে জড়ের বিরোধের কাহিনী। প্রজ্ঞার কথা আছে, আবার আছে মানব-মনোলোকের কথা। অর্থাৎ, জড় থেকে প্রাণ ও প্রাণ থেকে জ্ঞানের জগতে রামেন্দ্রমানস অভিসারে বেরিয়েছে। মহাকাব্যের স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতালের স্থান এখানে নিয়েছে জ্ঞানজগৎ প্রাণলোক ও জড়জগৎ। মহাকাব্যের দেবতা এখানে প্রজ্ঞা, দানব জড় পদার্থ। আর প্রাণজগৎ হ'ল মানবের প্রতিনিধি।

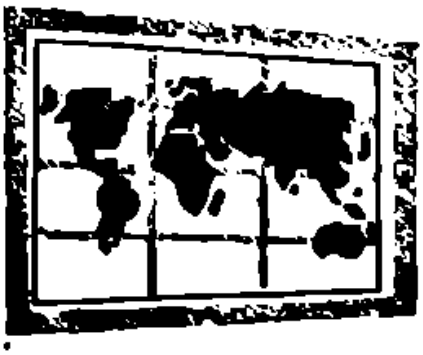

বিশ্ব-বাতায়ন

চাঁদের দেশে

চন্দ্রলোক পর্যটকের চোখে রহস্যময় গ্রহ-জগত আজ আর চেনা জানার বাইরে নয়। চন্দ্রাকৃতির এই প্রতিচ্ছবিটি

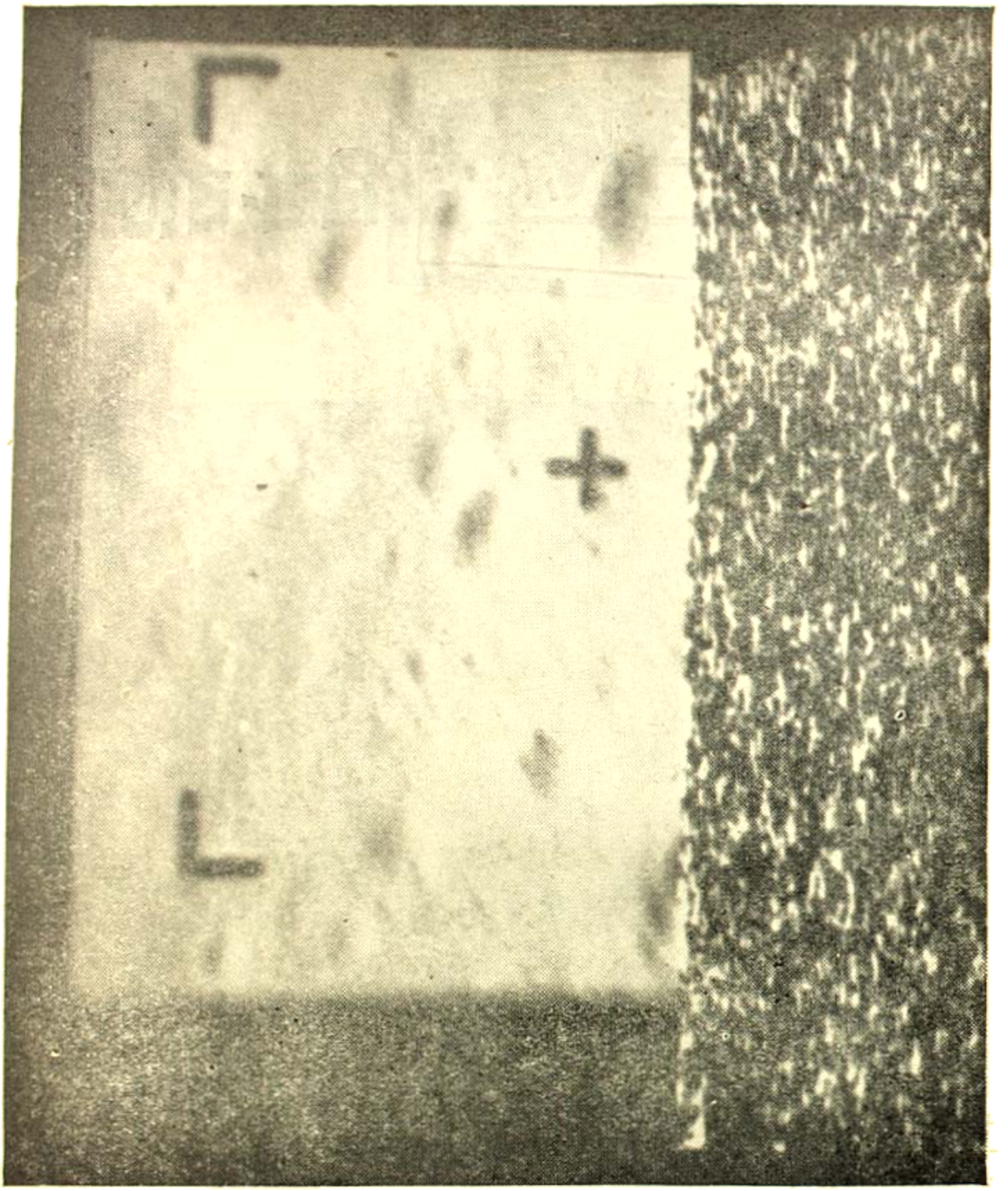

চাঁদের দেশে | একহাজার ফিট উচ্চতা থেকে চাঁদের দেশের ছবি।

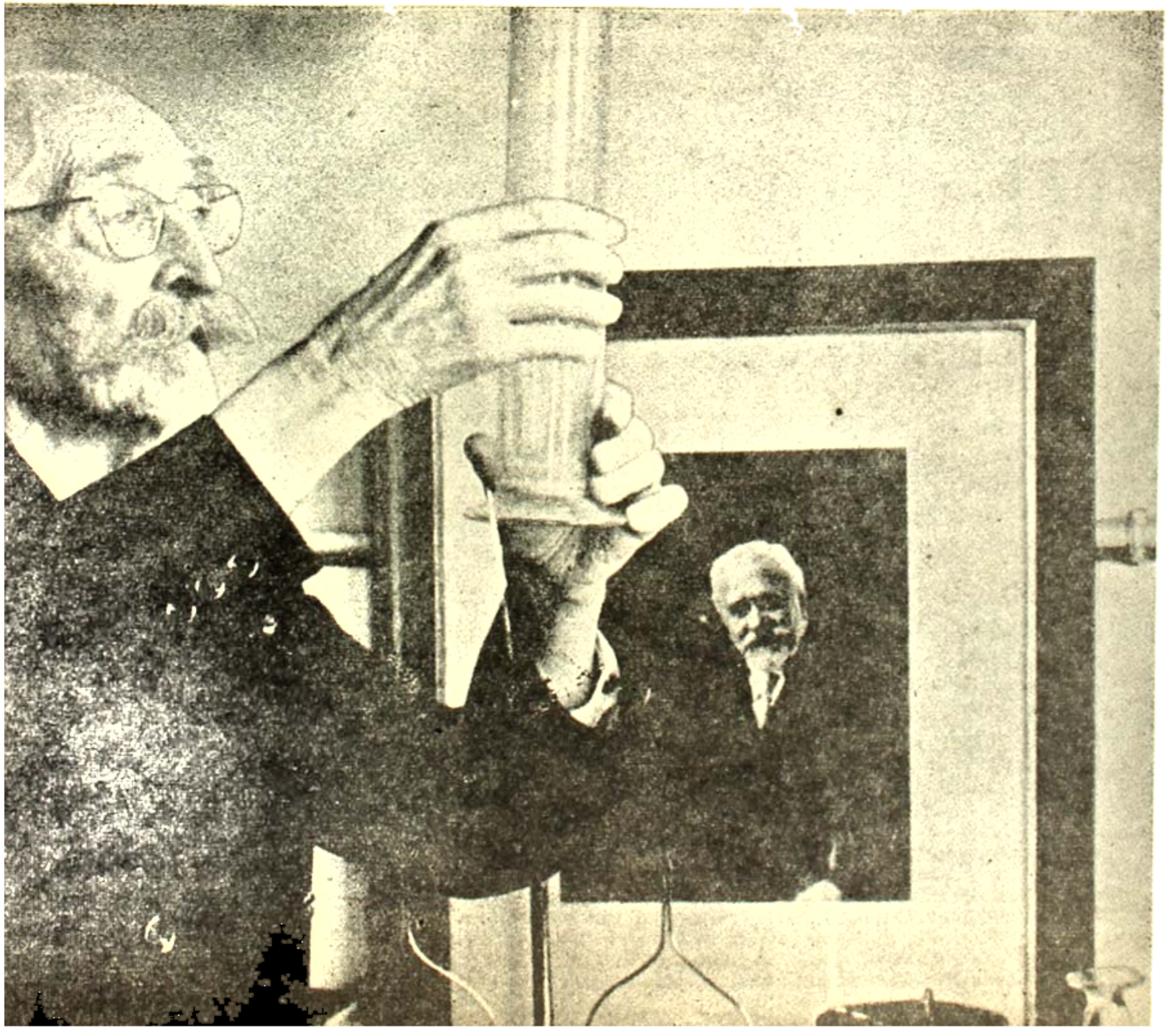

বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিকদ্বয়

প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধের ঠিক পরেই ব্রাসেলসে কাজেট এবং সলভে কংগ্রেসের বিশ্ব-বিখ্যাত জার্মান বৈজ্ঞানিক ফ্রিৎজ আবেকের পরিচয় করার ফলে আমার কি টিকা আবিষ্কার হেবার চিত্রে গবেষণারত বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে সর্বনাশা প্রতিযোগিতার ভয়ঙ্কর

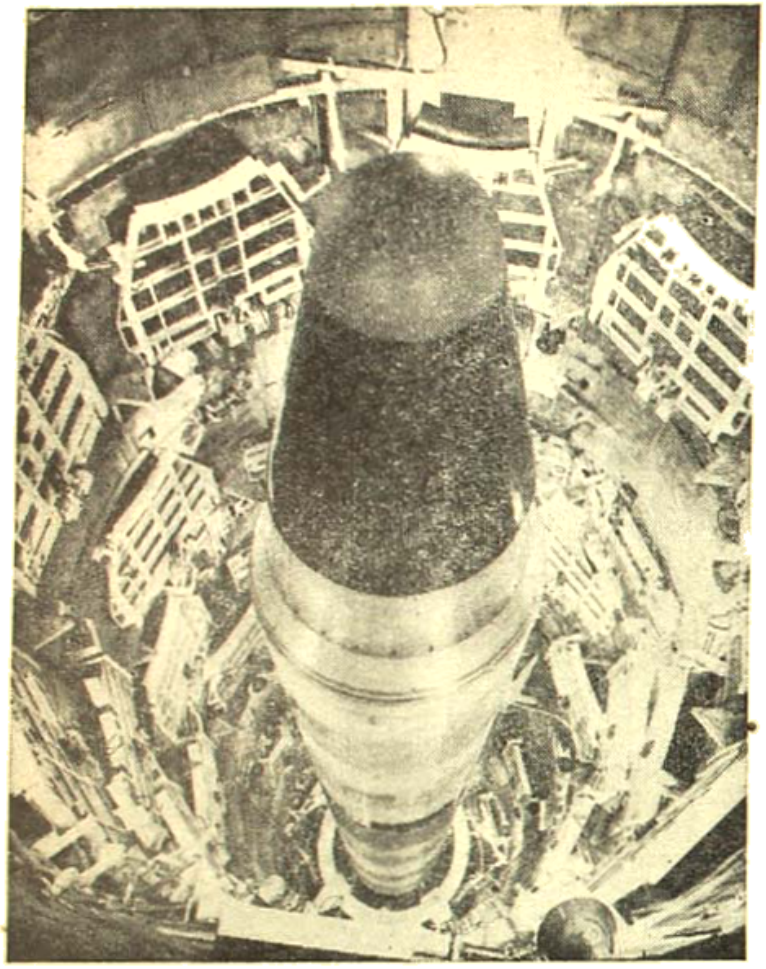

বিস্ময়কর ক্ষেপনাস্ত্র

আমেরিকার স্ট্র্যাটিজিক এয়ার কমাণ্ড আন্তঃমহাদেশীয় এই ভীষণাকার ক্ষেপণাস্ত্র ভূগর্ভের প্রায় দশ তলার নীচে বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রস্তুত করেন।

পৃথিবীর বিস্ময় এই ক্ষেপণাস্ত্র।

প্রায় ৫০০০ মাইল বেগে এর ছুটে চলার ক্ষমতা।

বিমান থেকে অবতরণের প্যারাস্যুট

এই নতুন-ধরণের প্যারাস্যুট দুজন আরোহী বহনের উপযোগী।

সাম্প্রতিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের এটি একটি অভিনব আবিষ্কার।

ক্যালিফোর্ণিয়ার বিমান ক্ষেত্রে এই নব-আবিষ্কৃত প্যারাস্যুট মহড়া দেখবার মতনই বটে।

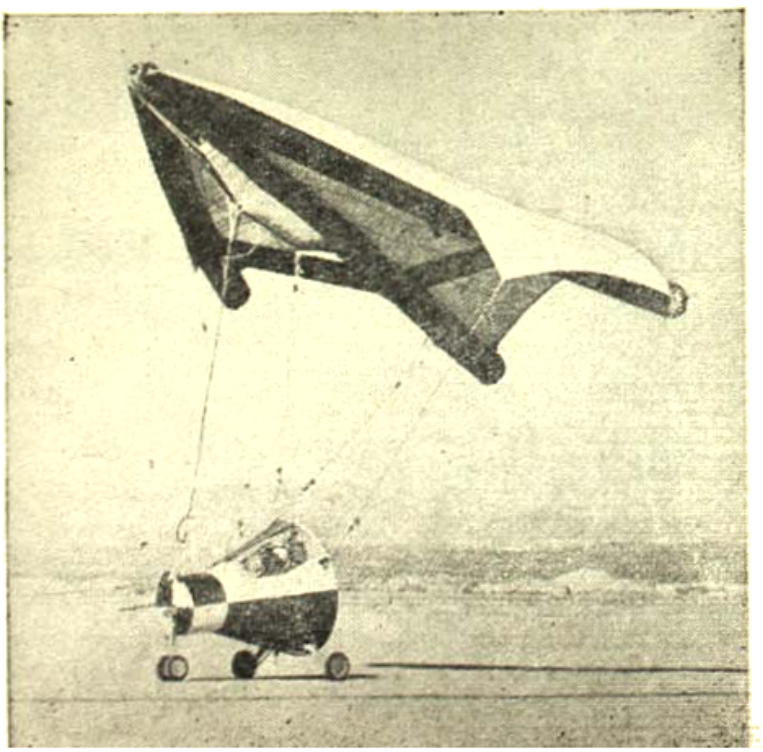

গল্প-ভারতী

বীর-পূজা

শ্রীনগেন্দ্রকুমার গুহরায়

তখন এদেশে ইংরেজ রাজত্ব চলেছে। মফঃস্বল শহর কৃষ্ণনগরে সকাল গড়িয়ে বেলা দিয়েছে দুপুর। জনাকীর্ণ পথ। স্কুল-কলেজ আর আপিস-কাছারী একটু পরেই কর্মব্যস্ত হ'য়ে উঠবে। স্থানীয় একজন উকিল বাবুর তেজীয়ান ঘোড়া ছাড়া পেয়ে হঠাৎ ছুটে এল ঝড়ের বেগে। প্রাণের ভয়ে সবাই পালাচ্ছে এদিকে ওদিকে। ঘোড়াটা পথ দিয়ে যে রকম ছুটে আসছে নির্ঘাত কেউ খুন-জখম হবে। অথচ তা জেনেও কেউ সেই ঘোড়াটাকে থামাবার সাহস পাচ্ছেন না। হঠাৎ সবাইকে অবাক আর হতভম্ব ক'রে দিয়ে হাতের বই পত্র ফেলে রেখে একটি স্কুলের ছেলে এসে দাঁড়াল ঘোড়াটার সামনে। ওর কি ভয়-ডর কিছু নেই? তা যে নেই সে-কথা প্রমাণ ক'রে দিয়ে বেশ ধ'রে ঘোড়াটাকে অবলীলাক্রমে বাগ করিয়ে দিল ছেলেটা। রাস্তায় দাঁড়িয়ে যারা এই আশ্চর্য দৃশ্য দেখছিল সবাই ধন্য ধন্য ক'রে উঠল। ছেলেটি কিন্তু সেই প্রশংসায় কান না দিয়ে বই-পত্র কুড়িয়ে নিয়ে চ'লে গেল নিজের পথে।

যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের মর্মর মূর্তি।

ভদ্রাগ্রামে দেখা দিয়েছে ভয়ংকর বাঘের উৎপাত। খবর পেয়ে এক ভদ্রলোক দিনের বেলা সেখানে হাজির হলেন বন্দুক নিয়ে। সঙ্গে তাঁর ভাই সেই ছেলেটি যে কৃষ্ণনগর শহরে ঘোড়া থামিয়ে ছিল। তার হাতে শুধু একটা ভোজালী। ছেলেটি যে দিকে দাঁড়িয়েছিল তাড়া খেয়ে হঠাৎ সে-দিক দিয়েই বেরিয়ে পড়ল বাঘটা। ভদ্রলোক গুলি করলেন। কিন্তু তাতে সাঘাত আহত হ'য়ে ফেপে গিয়ে বাঘটা সামনে দাঁড়ানো ছেলেটির ওপর হুঙ্কার ছেড়ে লাফিয়ে পড়ল। ছেলেটিও কম যায় না। পালানো তো দূরের কথা বাঘের মাথাটাকে বাম বগলে চেপে ধরে মাথার ওপর কোপ মেরে যেতে লাগল একের পর এক। লড়াই চলল বাঘে আর মানুষে;—কে হারে কে জেতে। বাঘকেই হার মানতে হল মানুষের কাছে। কিন্তু বাঘের দাঁত আর নখের আঁচড়ে বীর কিশোরও জান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

---

* যতীন্দ্র স্মরণ দিবসে কলিকাতা আজাদ-হিন্দবাগে বীর-প্রতিমূর্তিকে সন্ন-ভারতীর পক্ষ থেকে মাল্য ভূষিত করা হয়।

বরণীয় যাঁরা স্মরণীয় তাঁরা

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

গৌরীশংকর দে

১৯২০—২২ সাল। দেশব্যাপী চলেছে বিরাট আলোড়ন—অসহযোগ আন্দোলন। উত্তেল হ'য়ে উঠেছে জনসমুদ্র। সোৎসাহে গান্ধীজীকে নেতৃত্বে বরণ ক'রে নিয়েছে দেশ। বাংলা দেশে আন্দোলনের তরঙ্গশীর্ষে দাঁড়িয়ে আছেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। এমন উদ্দীপনা বুঝি আর কখনো এমন ভাবে ভারতবাসীকে স্পর্শ করেনি। দলে দলে লোক ছেড়ে আসছে ইংরেজের আদালত, পরিহার করছে সরকারী উপাধি, নতুন ক'রে তৈরি করতে চাচ্ছে দেশের অর্থনীতি। তাদের সঙ্গে সঙ্গে হাজার হাজার ছাত্রও বেরিয়ে আসছে সরকারী গোলাম-খানা ত্যাগ ক'রে। কারাবরণ চলেছে প্রতিদিন।

একদিন ক'য়েক হাজার ছেলে এসে ঘেরাও করল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। তারা রীতিমতো উত্তেজিত। হৈ হট্টগোলে ভ'রে উঠছে চারদিক। ছাত্রদের রুদ্রমূর্তি দেখে কেউ তাদের বাধা দিতে সাহস করছেনা। সেই মুহূর্তে বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন একজন বলিষ্ঠ চেহারার লোক। বাঘের মতো গর্জন ক'রে বললেন: "তোরা আমার ইউনিভার্সিটি ভাঙতে এসেছিস! এত বড় দুঃসাহস তোদের! দেশকে কি তোরা আমার চেয়ে বেশি ভালবাসিস? জানিস আমি স্বদেশী ছাড়া পরিনা, স্বদেশী ছাড়া খানি না।" —মাথা নিচু করে ছেলেরা চলে গেল। যেন একটা নির্দিষ্ট জায়গা পর্যন্ত এসে থেমে গেল নদীর ভাঙন।

যাঁর তেজদৃপ্ত কণ্ঠস্বর সেদিন ক্ষুব্ধ তরুণদের মনে অমন যন্ত্রের মতো কাজ ক'রেছিল তিনিই ছিলেন স্যার আশুতোষ। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়কে যে কতখানি ভালোবাসতেন 'আমার ইউনিভার্সিটি' কথাটির ব্যবহারই তার জাজ্বল্যমান প্রমাণ। আবার, খুব কম লোকই পেরেছেন তাঁর মতো অমন হৃদয় দিয়ে দেশকে ভালোবাসতে। হাড়-বজ্জাত নিজের মন তিনি সর্বদাই যেন উর্দ্ধমুখী করে রেখে ছিলেন হোমারি-শিখার মতো। দেশপ্রেম তাঁর কাছে ছিল ধর্মের সামিল, প্রাণ-বায়ুর সমান।

খেলাধূলা

ডায়নামো ফুটবল ক্লাব

বিশ্ব ফুটবল ক্রীড়াঙ্গনে সোভিয়েট রাশিয়ার 'ডায়নামো ক্লাব' এক দুর্ধর্ষ নাম। বহু কীর্তির অধিকারী এই দল। সোভিয়েট রাশিয়ার ফুটবল প্রতিযোগিতায় ডায়নামো দলের একটানা সাফল্যের খতিয়ান সত্যিই বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। এই দলের মাধ্যমেই প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন বহু খেলোয়াড়।

১৯৩১ সালে ডায়নামো ফুটবল ক্লাবের সৃষ্টি হয়। ১৯৩৬ সালে সোভিয়েট রাশিয়ায় সর্বপ্রথম ফুটবল প্রতিযোগিতা চালু হয়। এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ ক'রে ডায়নামো দল সর্বপ্রথম জাতীয়

সম্মানের অধিকারী হয়। ১৯৩৬ সাল থেকে সুরু ক'রে সুদীর্ঘ ২৮ বছর ধ'রে ডায়নামো দলের বিজয় অভিযান সমানে চ'লে আসছে। এদের কীর্তি আজও অম্লান রয়েছে।

১৯৪৫ সালে ডায়নামো দল ইংলণ্ড সফরে যায় এবং সেই সঙ্গে তাদের সাফল্যের তালিকায় আর একটি গৌরব-অধ্যায়ের সংযোজনা করে। ইংলণ্ড সফর কালে ডায়নামো দলের সঙ্গে যাঁরা খেলেছিলেন তাদের মধ্যে কন্‌স্টান্‌টিন বেসকভ (এখন জাতীয় দলের শিক্ষক), ভ্যাসিলি ট্রোফিমভ, সিওনিড সোলোভায়ভ প্রমুখের নাম সমধিক উল্লেখযোগ্য। ১৯৪৫, ১৯৪৯, ১৯৫৩, ১৯৫৭, ১৯৫৯ এবং ১৯৬৩ সালে ডায়নামো দল সোভিয়েট চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করে। এ হেন দুর্ধর্ষ দলের ভাগ্যেও

নিকষে আঁচড় দিয়ে দেখলেন
গাঁটি নন, ইনি খাঁটি সোনা।

সেই কেমিক্যাল

এই কবি সেই গল্পটি বলে, সেটি পরম শ্রদ্ধাভাজন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর মৃত্যুশয্যায় একটি বিশেষ অর্থ। রবীন্দ্রনাথ তখন লাইটহাউস তৈরিতে, সমস্ত অন্তর দিয়ে যেমন মথিত করে লিখেছেন—

The time has come when badges of honour make our shame glaring in their incongruous contest of humiliation.

বুকের মধ্যে অনেক ব্যথা জমেছিল—উপাধির ভার আর বহন করতে পারছিলেন না। রামেন্দ্রসুন্দর কবির মুখে তাঁর চিঠিটি শুনলেন, পদধূলি নিলেন এবং মনে মনে করলেন—তাঁর হৃদয় সুন্দর, বাক্য সুন্দর, হাস্য সুন্দর বলে কিছুদিন আগেই অভিনন্দন কবি জানিয়েছিলেন। এই রামেন্দ্রসুন্দরই একদিন রবীন্দ্রনাথকে প্রতিবাদ করতে ছাড়েন নি যেমন কবি লিখলেন।

বন্ধু খোঁজা রাজ্য ভাঙাগড়া
মতের লাগি দেশবিদেশে লড়া
আলবালে জল সেচন করা
উচ্চশাখা স্বর্ণচাপার গাছে
পরিমল আর চলতে দিবার পাছে।

কতো গল্প, কতো কথা, কতো কাহিনী আছে। পরে সময় ও সুযোগমতো আরো কিছু পরিবেশন করা যাবে। তাছাড়া যাঁরা কবিকে অন্তরঙ্গ ভাবে জানতেন তাঁদের উচিত আরো শোনানো। পাঁচজন যে সুখ পায় কাছে বসে ডেকে।

আপনাকে স্বপ্নবিভোর করে তুলবে...

বেঙ্গল কেমিক্যাল কলিকাতা • বোম্বাই • কানপুর

এক ঝাপটায় তুলবে প্রিয়া—যার কোমল ঐশ্বর্যেই আপনাকে স্বপ্নাবেশে করে তুলবে, মনে আনবে কতদিনের কত হারানো সুখ স্মৃতি। সকল প্রীতের প্রিয়া আপনাকে সারাদিন তুলবে মধু স্নিগ্ধ রাখবে।

প্রিয়া যে দেখে তার মুখে উদাসী কেন পাউডার মাখলে প্রসাধন নিখুঁত থাকে। দুধ মুখতে ভরা এই অপূর্ব ক্রীম ত্বক মসৃণ ও কোমল রাখে, অল্পবয়সের মুখের রং, রূপ ও লাবণ্যের মুখের ঔজ্জ্বল্য বেশী দূর করে।

প্রিয়া

সেন্ট ও স্নো

১৮০ বছরেরও বেশী ভারতের সেবায় নিযুক্ত মার্টিন বার্ন

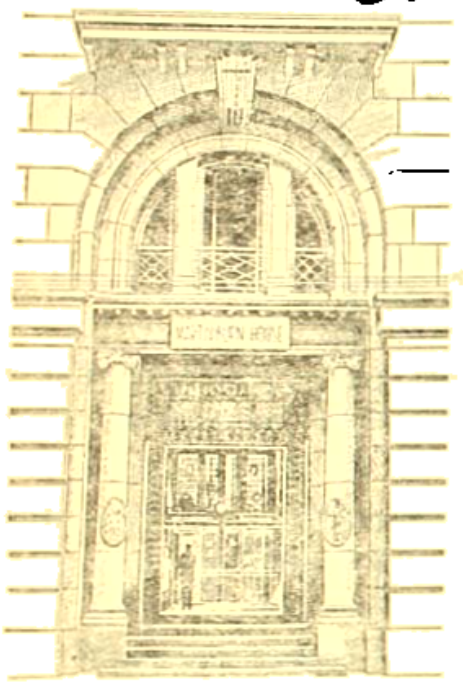

ভারতবর্ষে মার্টিন বার্ন প্রতিষ্ঠানের বহুমুখী শিল্পপ্রয়াসের পরিমাপ বছরের হিসেবে না করে যুগের হিসেবে করাই সমীচীন। এই সুদীর্ঘকাল একাগ্র সাধনায় বিভিন্ন প্রকারের এঞ্জিনীয়ারিং ও আনুষঙ্গিক শিল্প উদ্যোগের সহায়তায় মার্টিন বার্ন ভারতের শিল্পোন্নতি ত্বরান্বিত করেছে। মার্টিন বার্নের অন্তর্গত বিভিন্ন শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলির চমকপ্রদ সাফল্যের মূলে রয়েছে দূরদর্শিতা ও সংগঠন-নৈপুণ্য। নিজ নিজ ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠান আজ অগ্রণী তো বটেই, তাদের কোন কোনটি গত শতাব্দীতেও ছিল সবার আগে। আজ তাই মার্টিন বার্ন প্রতিষ্ঠান পিছন দিকে তাকিয়ে শুধু যে অতীত কীর্তির তৃপ্তই গর্ব বোধ করে তা নয়, আরও এগিয়ে যাবার প্রেরণাও পায়।

মার্টিন বার্ন কোম্পানীর অন্তর্গত শিল্প-প্রতিষ্ঠান ঃ

দি ইণ্ডিয়ান খাকরস অ্যাণ্ড স্টীল কোম্পানি লিমিটেড ঃ কাজের সময়ে ৫ হাজার। কাঁচামাল হাজারীবাগ কয়লা এবং দেশ ও বিদেশের উৎপাদন হয়। কুইনিন ওষুধ, রেলওয়ে মাল বহনে বহুমুখী ব্যবহার হয়ে থাকে। উৎপাদনক্ষমতা ৫৫ হাজার টন। অন্য পরিচয় ঃ

বার্ন অ্যাণ্ড কোম্পানি লিঃ—হাওড়া ঃ ১৮৫৩ সালে। কাজের সময়ে ৫ হাজার—হাওড়ায় ইঞ্জিনি সরঞ্জাম কোম্পানী এবং বিদেশের বহু বড় কারখানে ইঞ্জিনি সরঞ্জামের।

বার্ন অ্যাণ্ড কোম্পানি লিমিটেড : ইস্ট্যাকটারি দোষ্টি ঃ বার্ন অ্যাণ্ডকোম্পানির অন্যতম—কারীগর ইঞ্জিনিয়ারিং কাজে ১৫০০ জন। বিদেশ থেকে, বিদেশী উৎপাদন থেকে, কোম্পানি—এর কারখানে,কোম্পানি কারখানে কাজ হয় কোম্পানী এই কোম্পানির ইঞ্জিনিয়ারিং সুবিধার।

দি ইণ্ডিয়ান স্ট্যাণ্ডার্ড ওয়াগন কোম্পানি লিমিটেড, হাওড়া ঃ ওয়াগন এবং রেলওয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজে ১৯৩৫ সালে প্রতিষ্ঠিত। বিশ্ব বিখ্যাত ইঞ্জি. ফার্ম এর ইঞ্জিনিয়ারিং কারিগরি কারখানায় কাজের তৈরী ও মেরামতের কারখানা।

ব্রবার্ট হাডসন (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড ঃ ব্রবার্ট হাডসন লিঃ (ইংলণ্ড) কোম্পানির সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠিত। বিশ্বে খ্যাত শিল্প ব্যবস্থা ও নিয়ন্ত্রণের যন্ত্র।

ব্রেকওয়ে কোম্পানি ঃ ব্রেকওয়ে কোম্পানি লিঃ (ইংলণ্ড) কোম্পানির সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠিত। ব্রেকওয়ে কোম্পানি লিঃ (ইংলণ্ড) কোম্পানির সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠিত।

ইলেকট্রিক ব্যাটারী কোম্পানি ঃ বিদেশী ইঞ্জিনিয়ার ও কারিগরের তত্ত্বাবধানে কাজ হয়। বিদেশ ও আমদানিকৃত ১৫৫ জন কর্মী বিদেশের ও দেশজাত কাজ।

দি ভ্যাকুয়াম ব্রেক কোম্পানি লিঃ— ব্রেকওয়েল্ড ভ্যাকুয়াম ব্রেক কোম্পানির সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠিত....ব্রেকওয়েল্ড ও বিদেশী ইঞ্জিনিয়ার ব্রেকওয়েল্ড ব্রেক এবং কোম্পানি কাজ।

মার্টিন বার্ন লিমিটেড কলিকাতা কলিকাতা কোম্পানী কোম্পানী কারখানা শাখা

আগে ছিল কলকাতায় পুজোর অন্য কেতা। পুজোর দিন ঘনিয়ে এলেই ঢুলী আর বাজনদারদের ভিড়। লোকে লোকারণ্য রাস্তা। দুদিকে পদ্ম, চাঁদমালা, বিল্বিপত্র আর কুচো ফুল। বনেদী বাবু বসেছেন দালানে ; সামনে সোনার আলবোলা, ডাইনে পান্নাবসানো ফুরসি, বাঁয়ে একটা হীরেবসানো টোপদার গুড়গুড়ি। দোকানে শোভা পাচ্ছে চিনির মিঠাই, খুরিভরা গুড় আর মধুপর্ক। বারকোশে দুর্গামণ্ডা আর আগাতোলা সন্দেশ।

এখন কেতা অন্য। এখন বাবুর বাড়ির পুজো নয়—বারোয়ারি পুজো। সেই সঙ্গে রুচিও আলাদা। এখন পুজোয় চাই খাঁটি ছানার রসগোল্লা আর সন্দেশ।

দেবভোগ্য মিষ্টান্নে দুর্গোৎসবের আনন্দ হোক মধুময়।

কে, সি, দাস প্রাইভেট লিমিটেড
রসোমালাই-এর স্রষ্টা
কলিকাতা

JWTKCD 1217R

উৎসবের আনন্দে ও
যে কোন অনুষ্ঠানে

খাটাউ

ভয়েল

দি খাটাউ মাকাঞ্জী স্পিনিং
এণ্ড উইভিং কোং লিঃ

খুচরা দোকান
মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিঃ-৭
ফোন : ৩৪-১২২৯
১৮এল, পার্ক ষ্ট্রীট, প্রবেশ পথ
মিডলটন রো, কলিকাতা-১৬
(শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত)
ফোন : ২৩-৫২৮৩

। আমেরিকা ।

। 'কলম্বাস দিবস' উৎসব ।

লোকরঞ্জনে
আমেরিকার
লোক-উৎসব

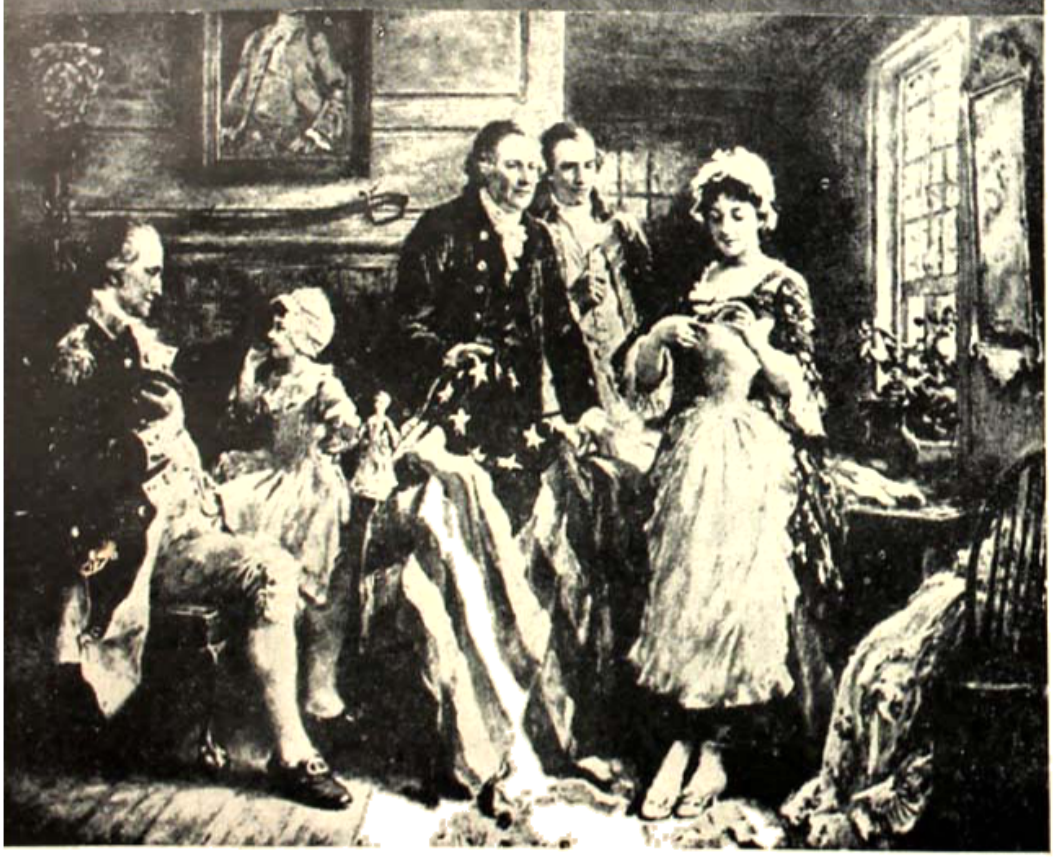

উৎসবের সাজে
প্রাচীন আমেরিকার
একটি পরিবার।

॥ ফুলের দোলা লাগলো গায়ে ॥

আমেরিকার ফুল-উৎসব

। রাশিয়া ।

। সঙ্গীত-উৎসব ।

БРАТСТВО
СЧАСТЬЕ

ছবি ৭৮ ঢাকা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত ফানুস উৎসব রাত্রি।

। ব্রিটেন।

গত উৎসবে বৃক্ষ সজ্জা

। চিত্র ।

'সিণ্ডারেলা' মূক অভিনয়ের সেই আশ্চর্য দৃশ্য—
একটা লাউ এক মুহূর্তে সোণার গাড়ি হয়ে গেছে।

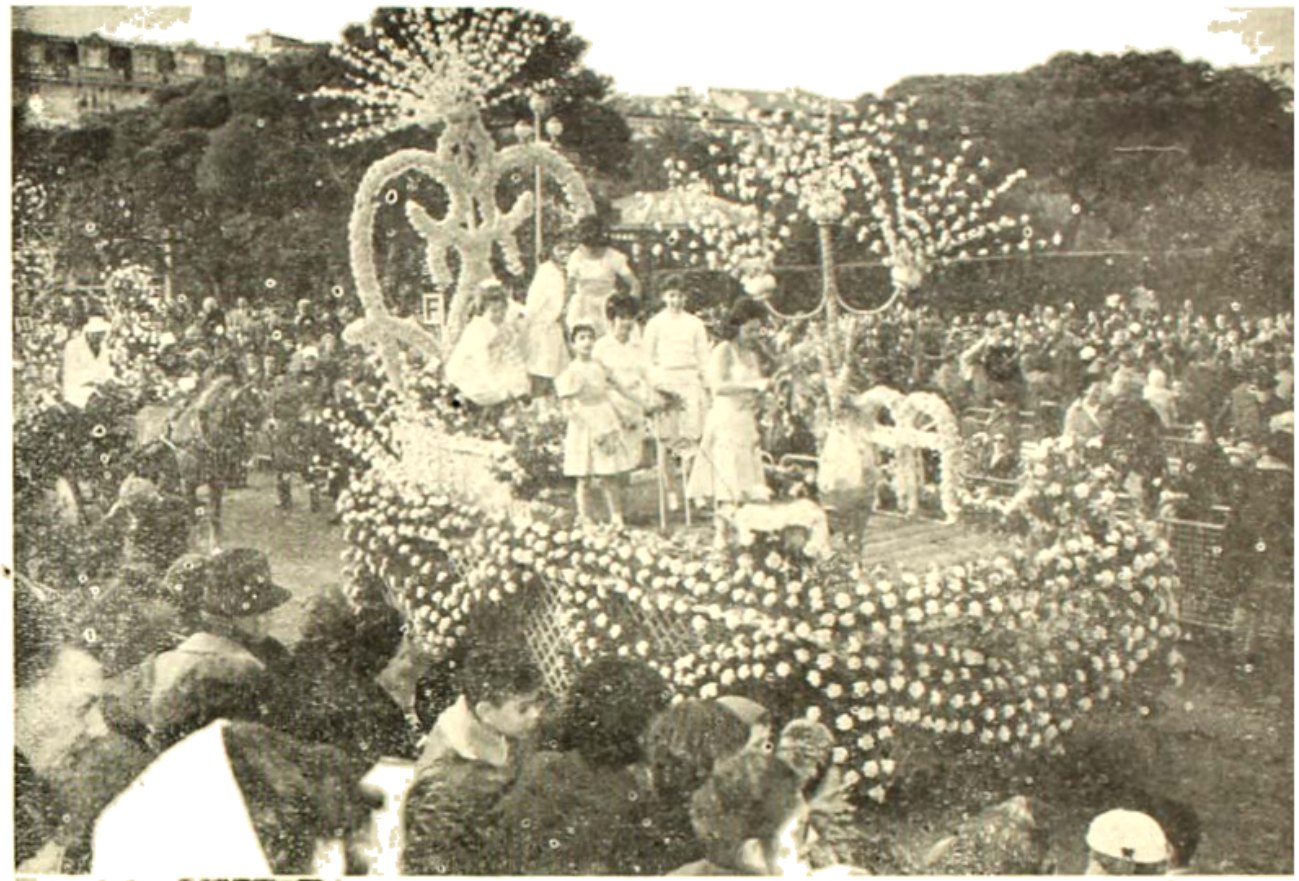

১। জার্মানী।

১। কার্নিভ্যাল উৎসব

উৎসবের আনন্দ-রস আরো বাড়ে

! জাপান।

। গে-ই-সা উৎসব-রতা বিনোদিনী জাপানী নর্তকী।

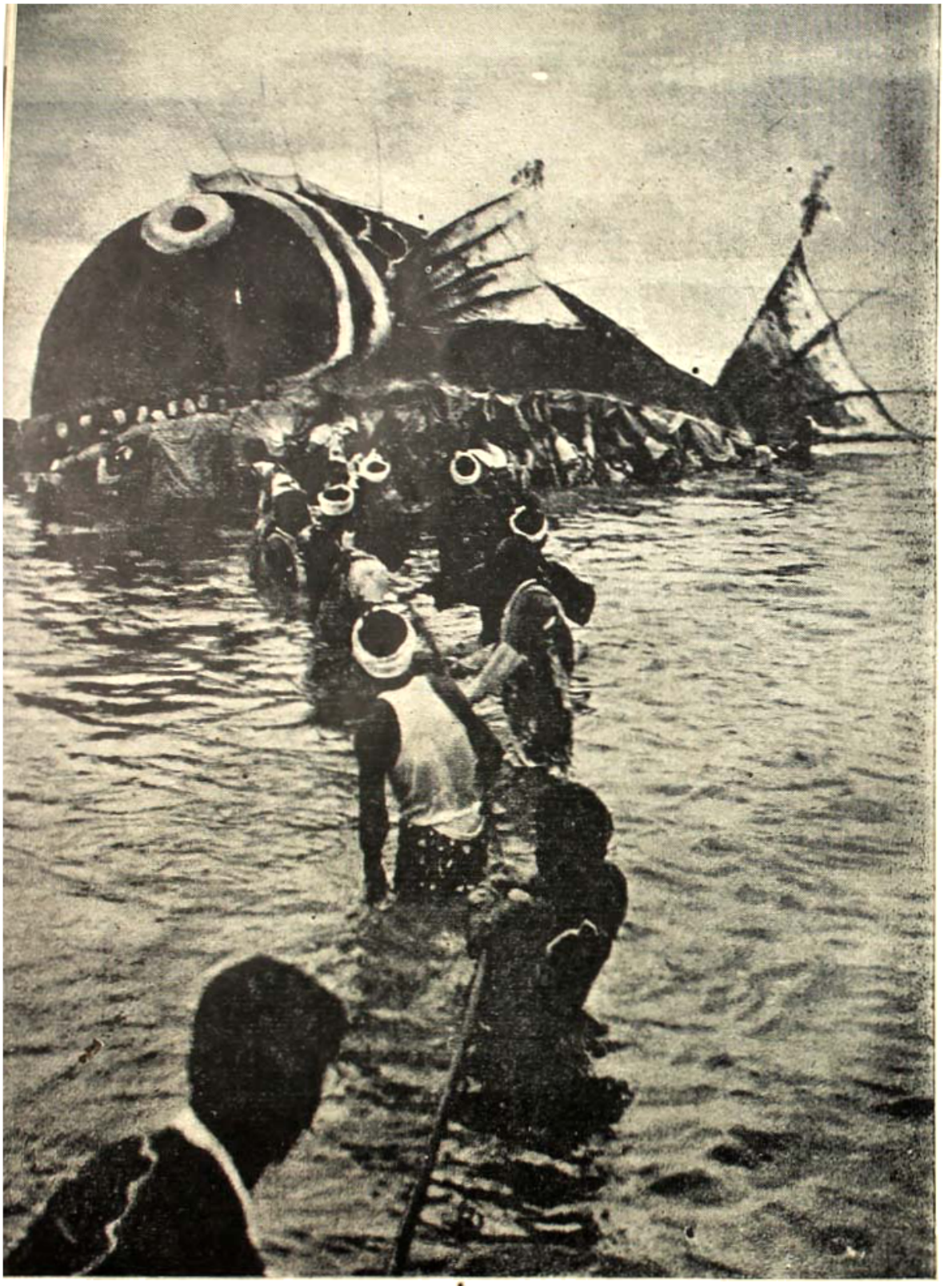

। জাপান ।

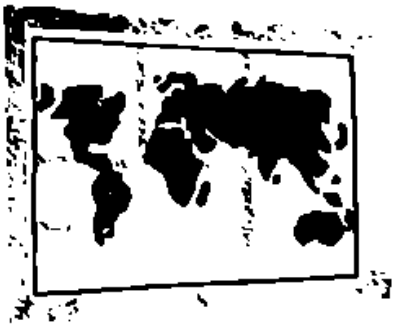

বিশ্ব-বাতায়ন

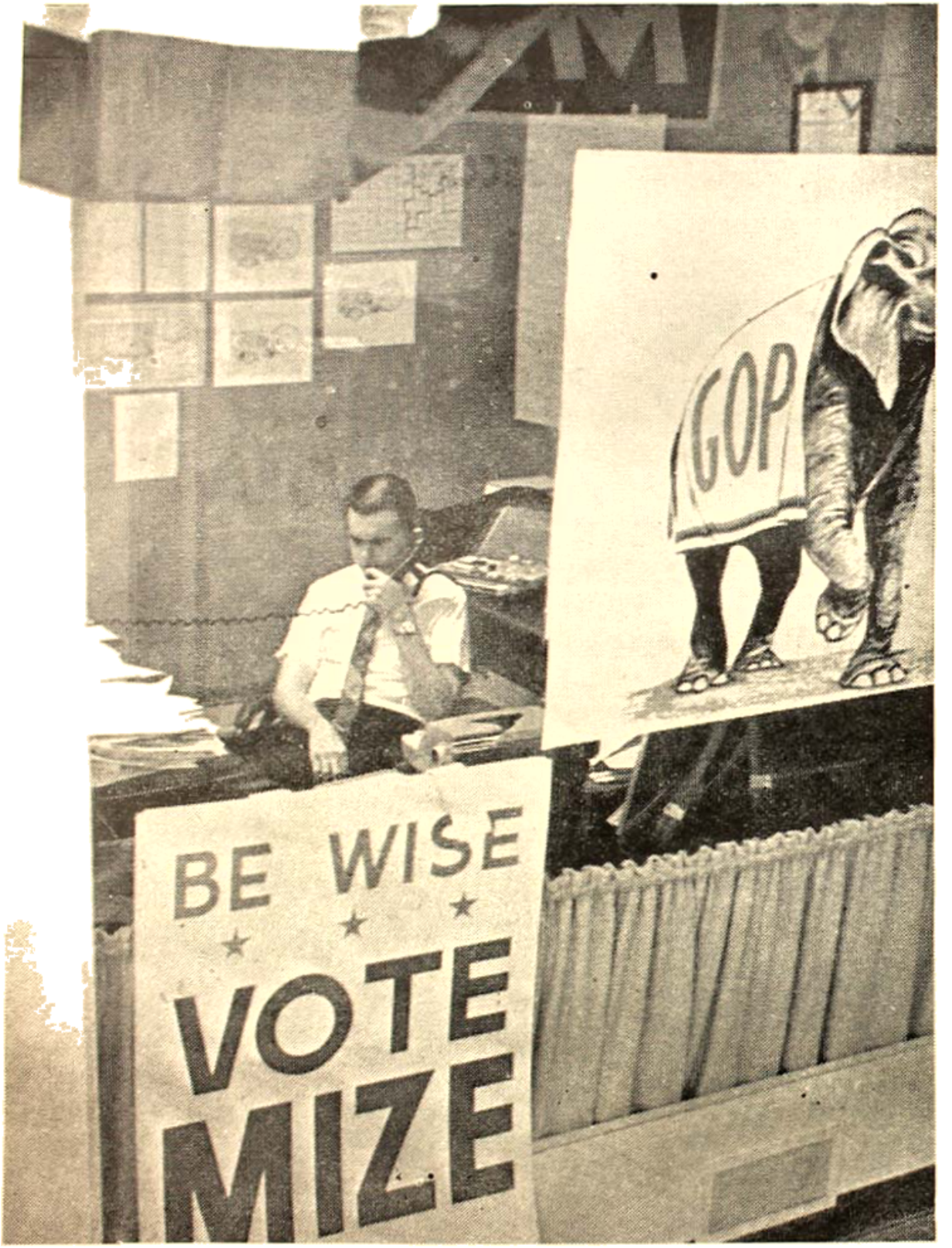

রিপাবলিকান প্রার্থী চেস্টার মিজের
নির্বাচনী অফিসারের মাধ্যমে

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট এবং তাঁর স্ত্রী

ডিমোক্রেটিক পার্টির গুরুত্বপূর্ণ সভা করছেন শ্রীমতী ভিভিয়েন চেম্বারলেন মেরী ম্যান্ড ডেভিস

আমেরিকার
প্রেসিডেন্ট
নির্বাচনী
অভিযান

মহাকাশের
তিন অভিযাত্রী

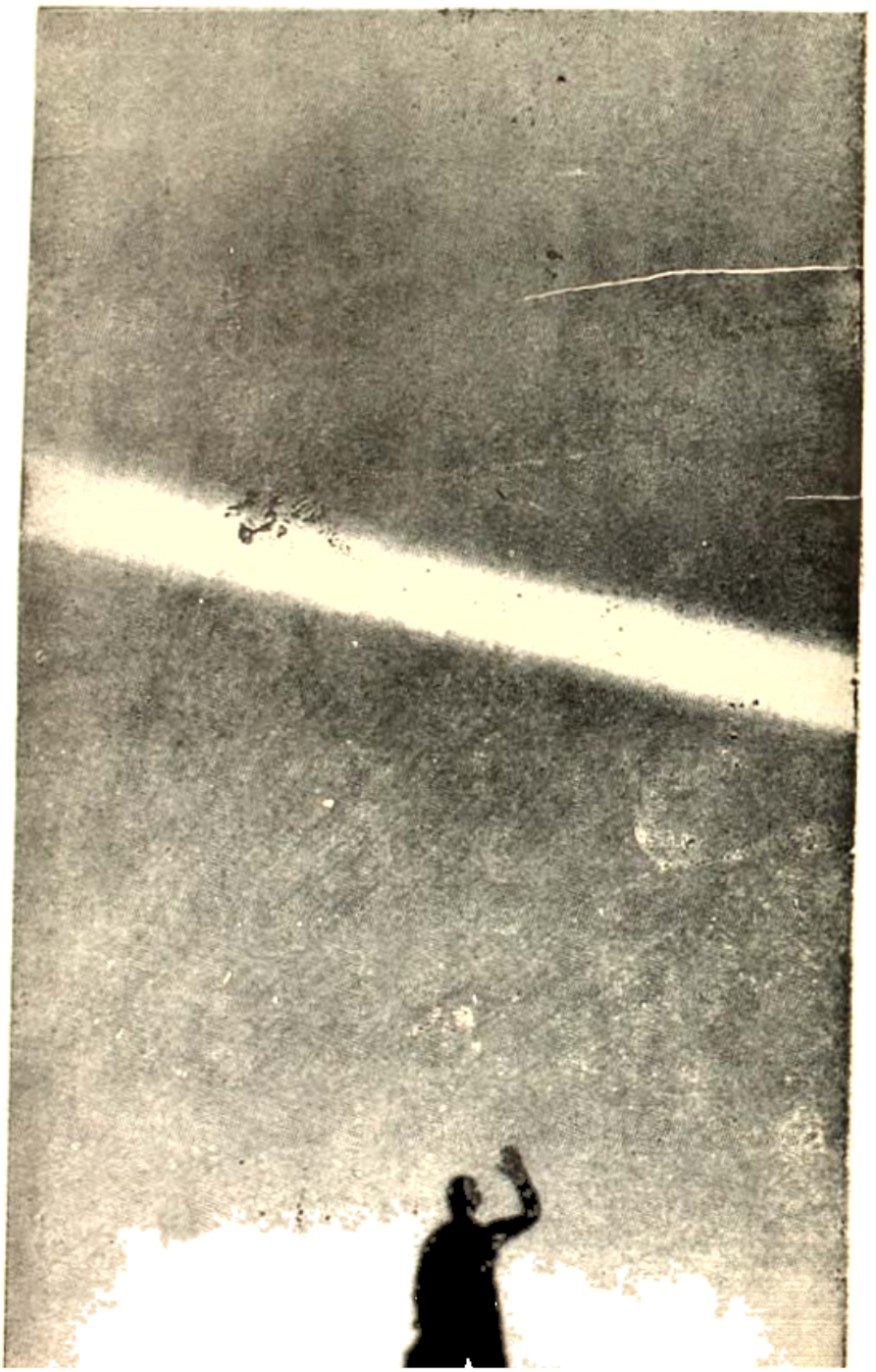

মেঘের মহাকাশ ও তার
মাঝে একটি চিল।

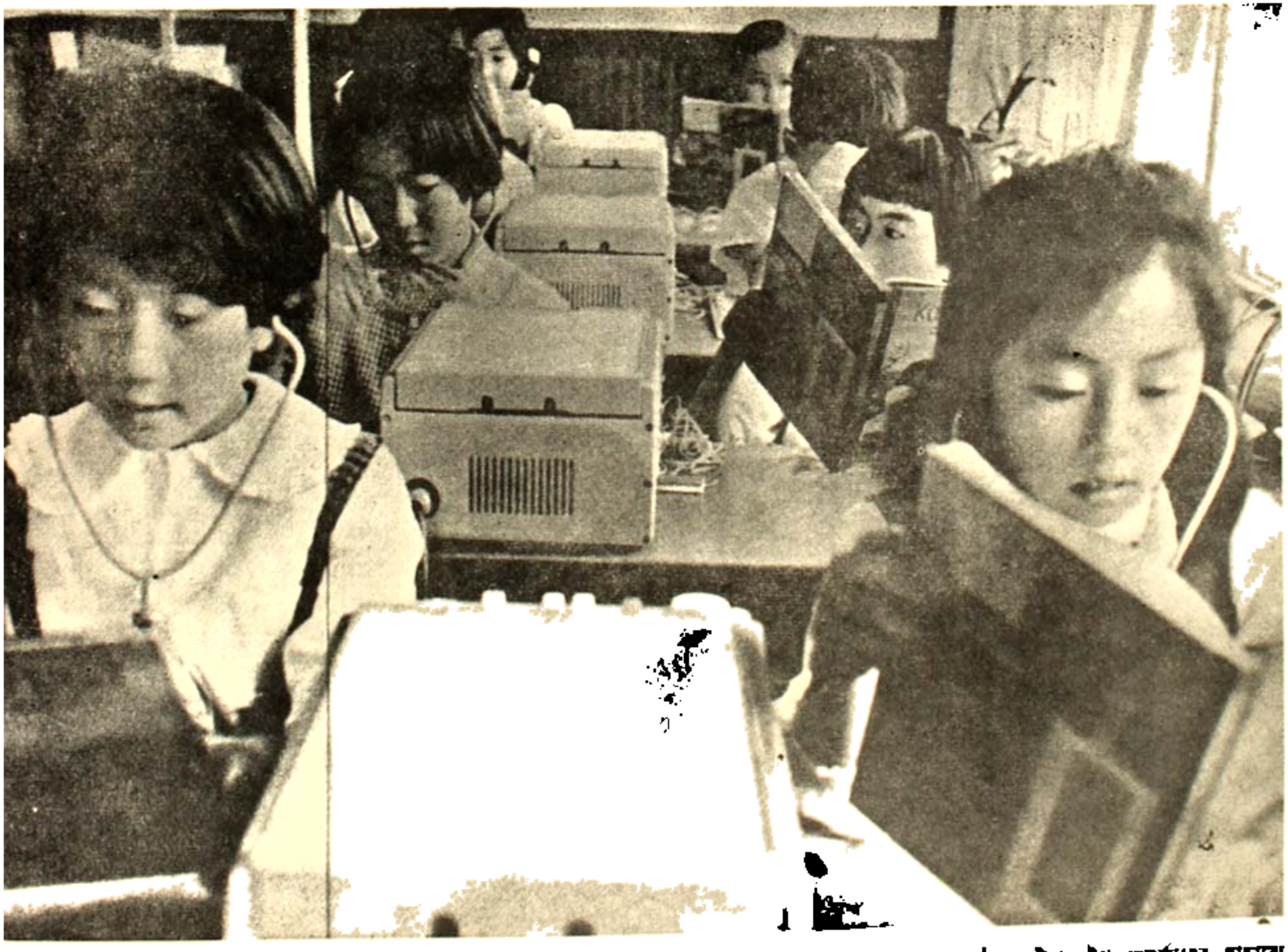

জাপানে শিক্ষা ব্যবস্থার নূতন রূপ

ছাত্রীরা টেপ রেকর্ডারের সাহায্যে সম্পূর্ণ আধুনিক প্রণালীতে শিক্ষালাভ করছে।

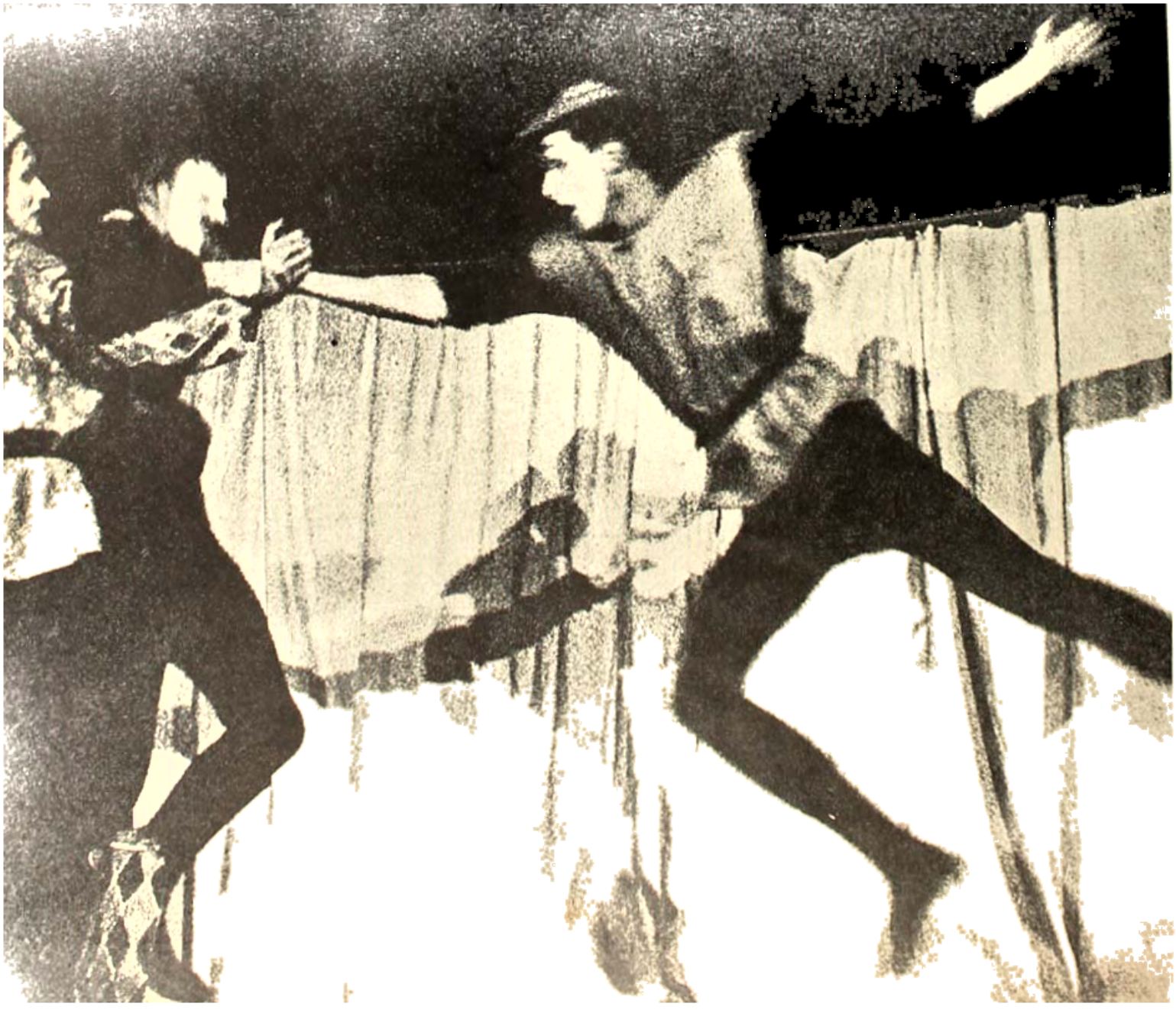

জার্মানীর বিখ্যাত মূক অভিনয়ের একটি দৃশ্য

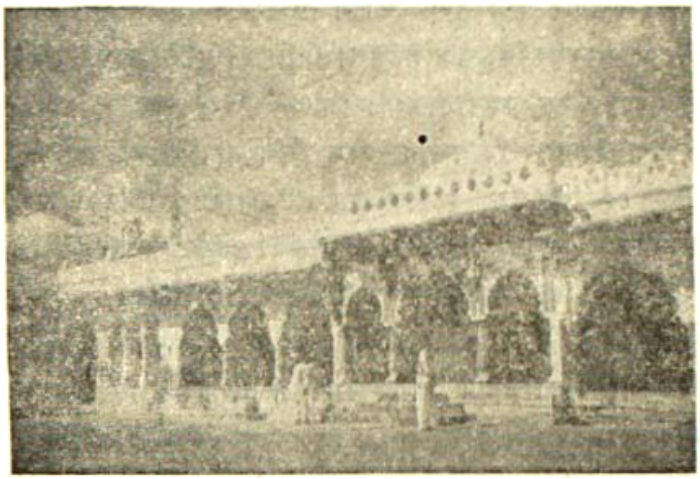

ঔরঙ্গজেবের সমাধি ভবনের প্রবেশ পথ—খুলদাবাদ

গিরীশেশ্বর মন্দির—ইলোরা।

রাবণের কৈলাস উত্তোলন—ইলোরা

কৈলাস মন্দিরের সম্মুখ ভাগ—ইলোরা

সেই নতুন বাণীর উদ্গাতা হলেন জ্যাঁ পল সার্তর। তিনি দার্শনিক এবং সাহিত্যিক। ফরাসী সাহিত্য-ক্ষেত্রে তিনিই আজ সবচেয়ে আলোচ্য ব্যক্তি। তাঁর আসন আজ সবার পুরোভাগে। তাঁর বিরুদ্ধবাদীরাও আজ তাঁর প্রতিভাকে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। এই কৃতবী দার্শনিকের মতবাদ কিছু দিন ধরে ফরাসী দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে বিষম আলোড়নের সৃষ্টি করেছে।

শুধু প্যারীতেই নয়, লণ্ডনের সাহিত্য জগতেও এই নতুনতর মতবাদ-সম্বলিত নাটক ও উপন্যাসের মুখর আলোচনা চলেছে। অনেকে বলছে, এ মতবাদ নতুন নয়, বহু আগেই জার্মান দার্শনিকের কণ্ঠে তা ভিন্নরূপে ধ্বনিত হয়েছে। তবে শিল্পের মাধ্যমে উপন্যাসের ভিতর দিয়ে নাটকের আকারে তার পরিপ্রকাশ এই প্রথম।

জ্যাঁ পল সার্তর

বাগানের ধারে ছোট একটি রেস্তোরাঁ। কাফে দ্য ফ্লোর। সেইখানে এই নতুন অস্তিত্ববাদী সম্প্রদায়ের ওঠা-বসা, আনাগোনা। সেই অখ্যাতনামা হোটেলের এক নির্জন অংশে এই নতুন মতবাদীদের নিয়মিত বৈঠক বসে এবং সেই সকল আলোচনার মাঝখানে দেখা যায় তাদের নেতা জ্যাঁ পল সার্তরকে, পুরু লেন্সের চশমার অন্তরালে তীক্ষ্ণ দুই চোখে কিছু অন্যমনস্ক দৃষ্টি, ভারী মুখ, চওড়া কপাল। তাঁর উপন্যাস নিয়ে নাটক নিয়ে প্যারী নগরে তুমুল সমালোচনার ঝড় বইছে আজকাল।

জ্যাঁ পল সার্তর এক ফরাসী নৌ-সেনা-নায়কের ছেলে। লেখাপড়া শেখার অবকাশ তিনি নিজের চেষ্টাতেই সৃষ্টি ক'রে নিয়েছিলেন। যুদ্ধের আগে এক নগণ্য বিদ্যালয়ে অল্প মাহিনার অধ্যাপকের কাজ করতেন। প্রথম থেকেই ছিল সাহিত্যিক উচ্চাশা। ১৯৩৮ ও ১৯৩৯ সালে তাঁর দুখানি বই প্রকাশিত হয়। প্রথমখানি উপন্যাস। দ্বিতীয়খানি ছোট গল্পের সমষ্টি। বই দুইখানি সম্বন্ধে বিশেষ কোন আলোচনা শোনা যায়নি তখন।

তারপর এলো দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। দেশের ডাকে সার্তর সাড়া দিলেন। যুদ্ধে গেলেন। হলেন বন্দী। ন'মাস কাটল শত্রুকারাগারে।

কারাগার। বহু নতুন চিন্তাধারার লালনক্ষেত্র, স্ফুরণক্ষেত্র বহু সুপ্ত প্রতিভার। উত্তরকালে তাঁর মতবাদ সম্বন্ধে ৭০০ পৃষ্ঠার যে অসমাপ্ত গ্রন্থ সার্তর রচনা করেছিলেন।' এই কারাগারে বসেই পেয়েছিলেন তার প্রেরণা। দুর্বোধ্য গবেষণার জটিলতায় ভারাক্রান্ত এই গ্রন্থ। একান্ত যারা সার্তরের ভক্ত, তারা ভিন্ন এ গ্রন্থের মর্ম উপলব্ধি করেছে এমন পাঠকের সংখ্যা অতি বিরল।

তাঁর নতুন জীবনবেদের মূল কথা হল এই :

ইটালী ঃ

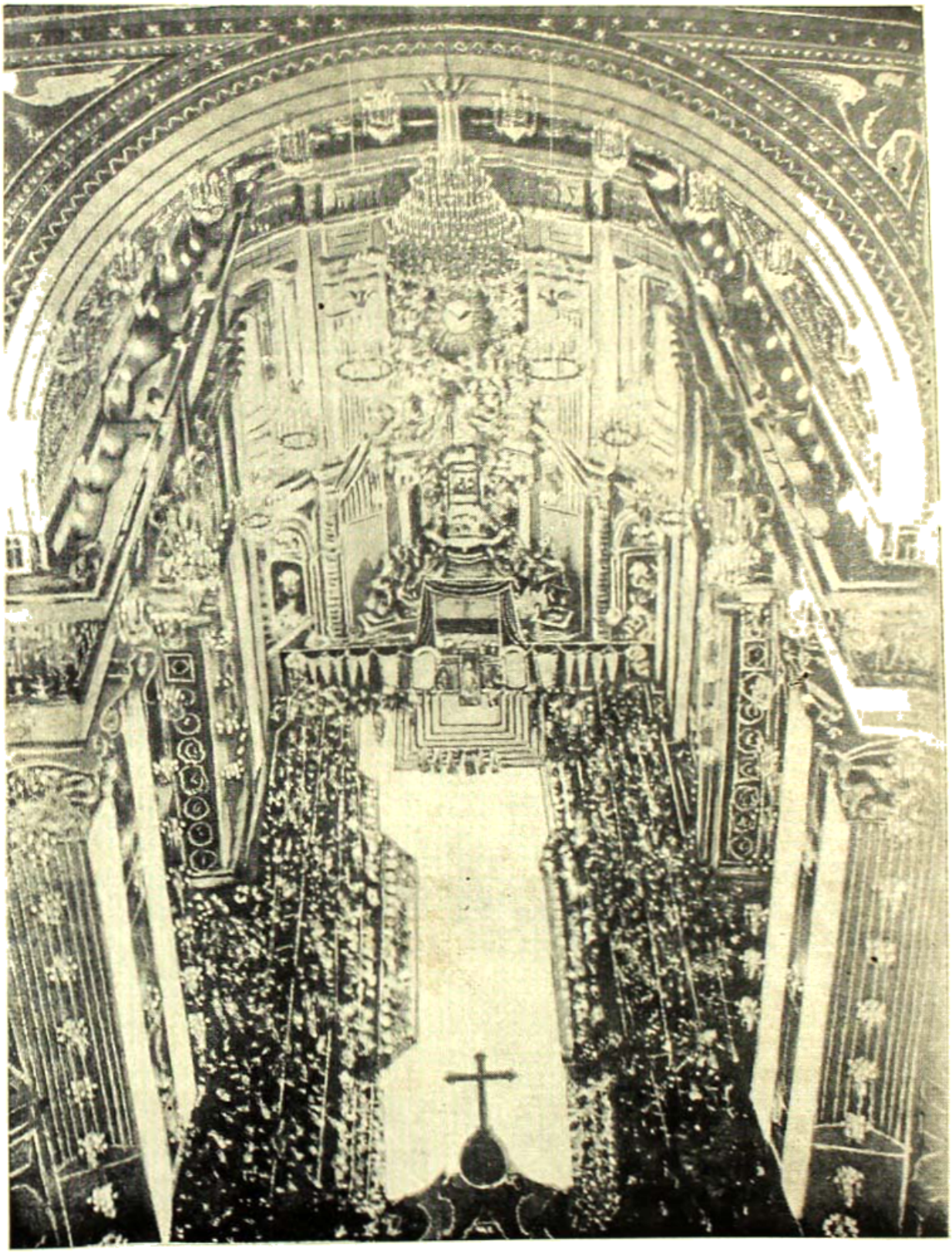

উৎসব মুখর রোমের সেণ্ট পিটার্স গীর্জা

ক্রিসমাসের ধর্মোৎসবে রোমীয় ছাত্রীগণ

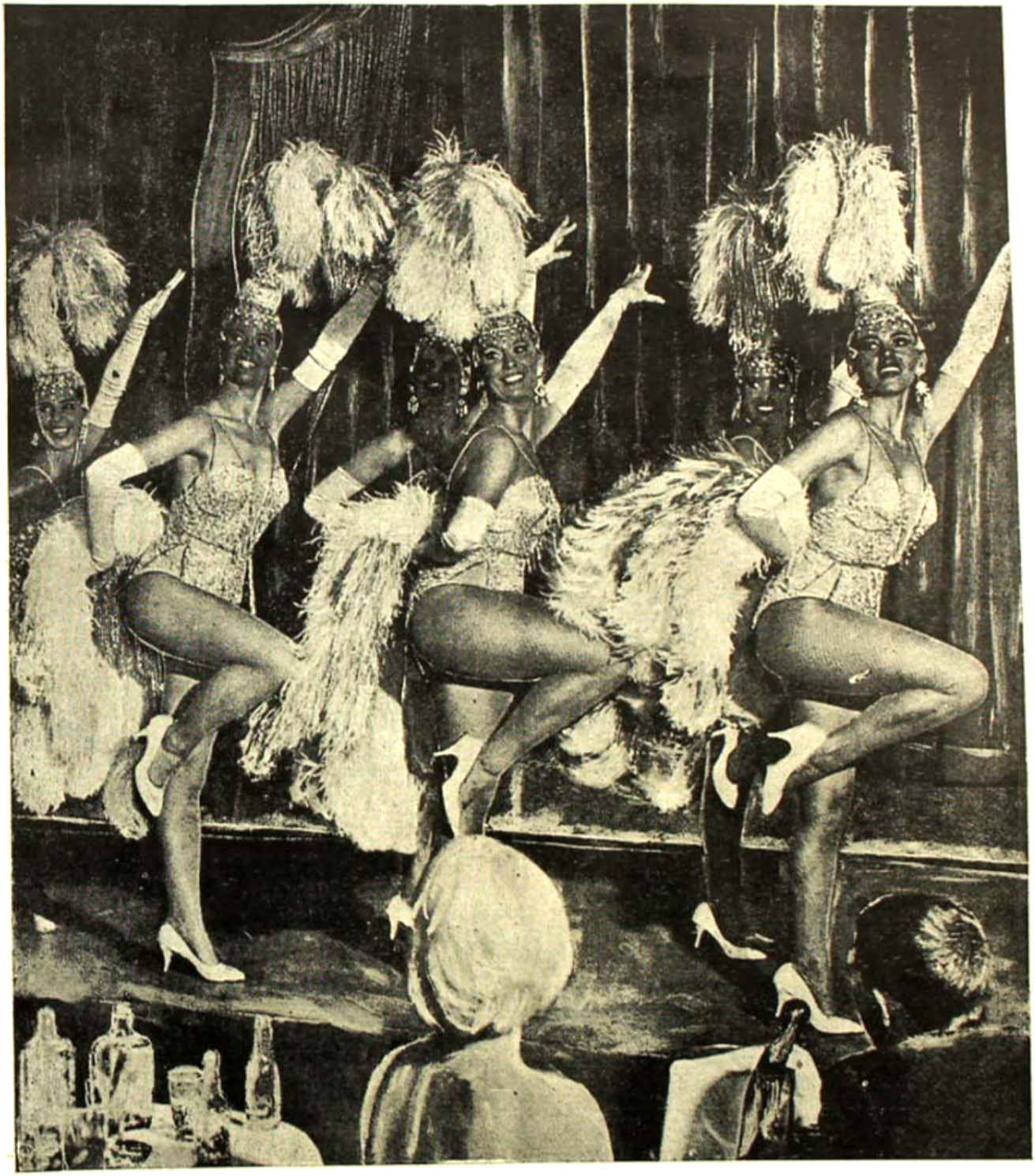

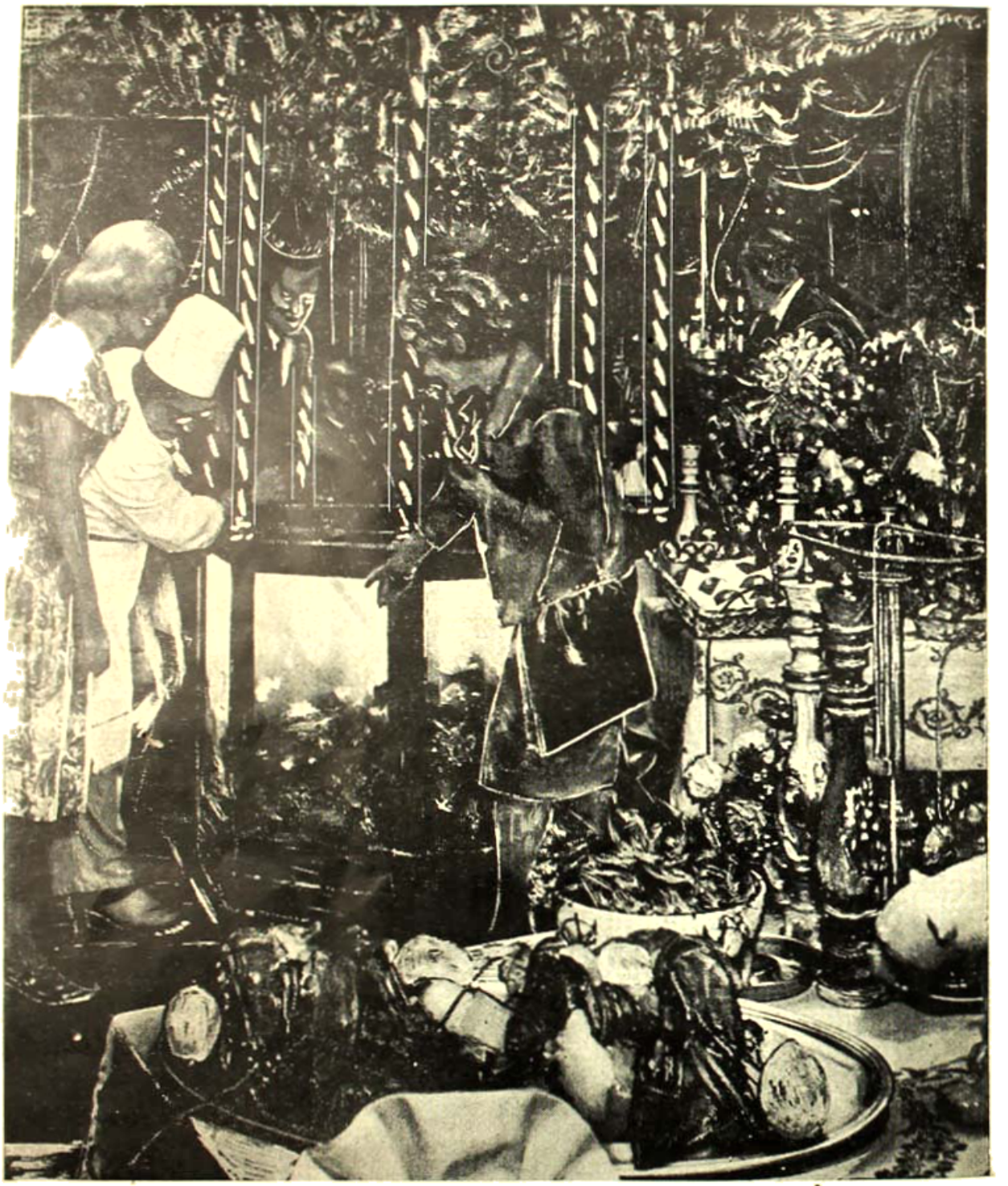

ডেনিসদের ভোজন উৎসবের একটি দৃশ্য

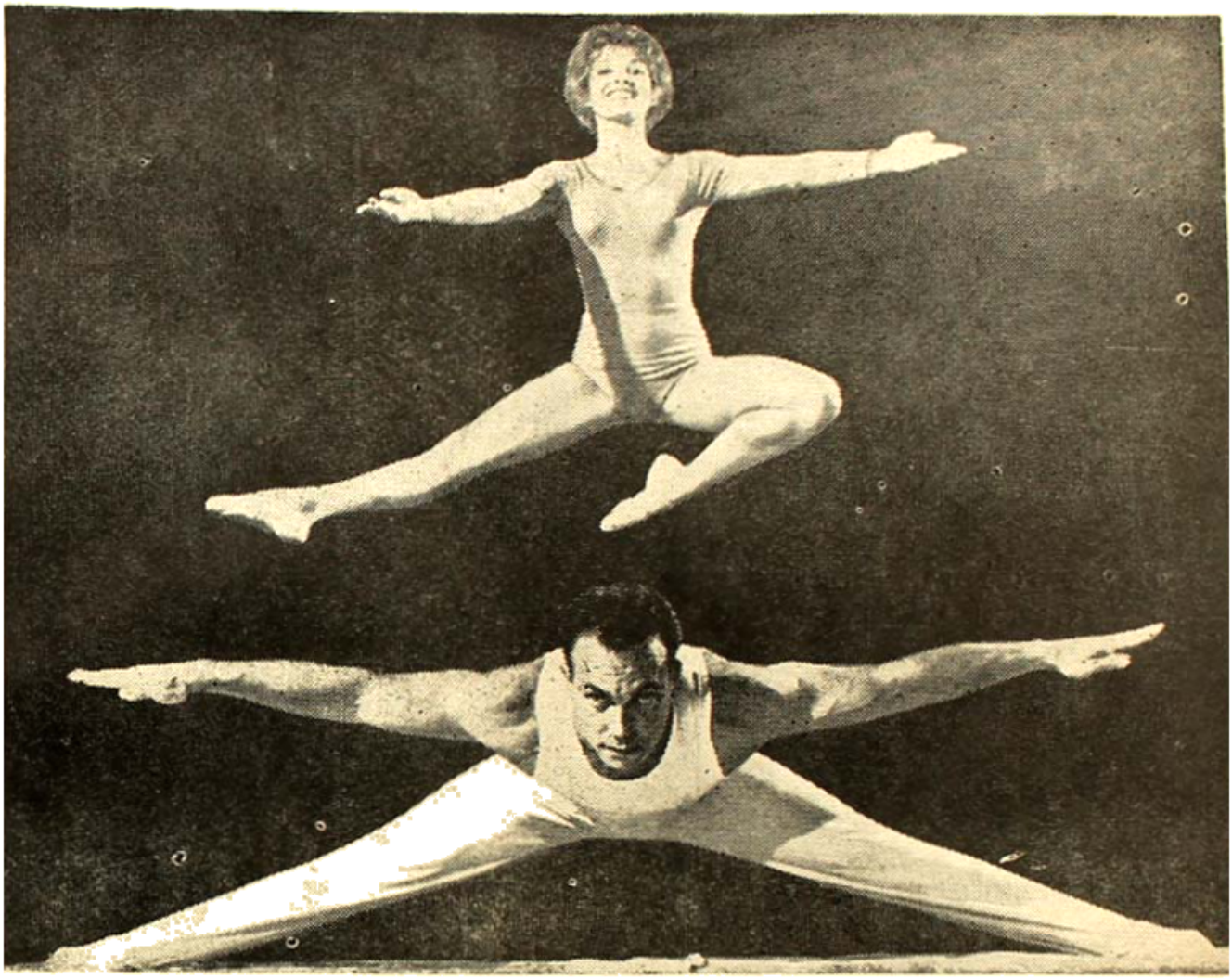

: অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় জিমনাষ্টিকের কলাকৌশল দেখিয়ে স্বর্ণপদক লাভ করেছেন—যুক্তরাষ্ট্রের এবি এবং মুরিয়েল গ্রসফেল্ড দম্পতী।

অলিম্পিক
প্রতিযোগিতা
টোকিয়ো। ১৯৬৪

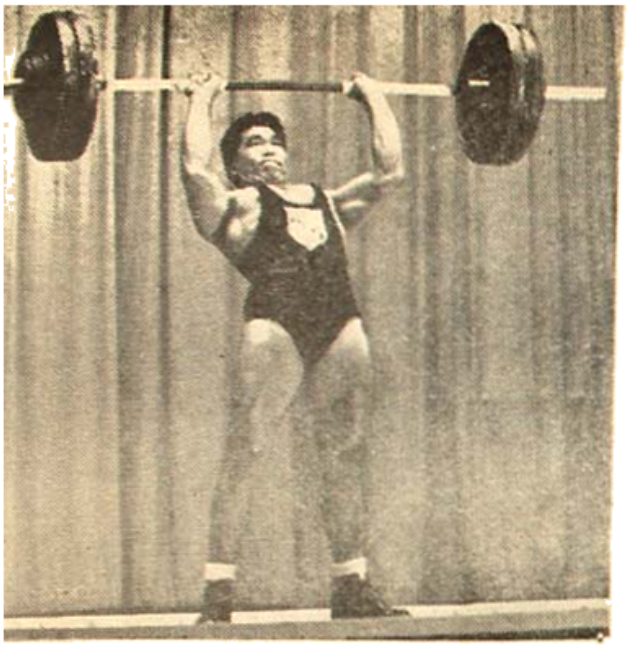

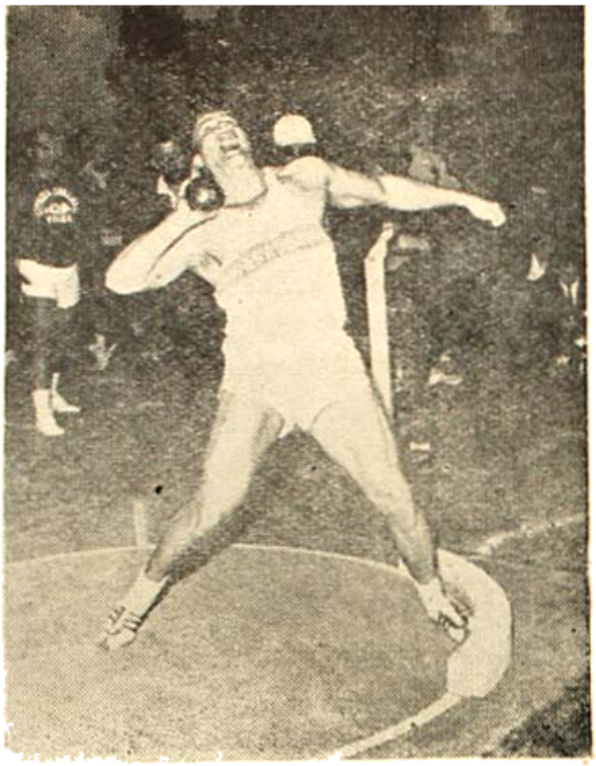

লট্‌পাটে নতুন রেকর্ডের অধিকারী
ক্যালিফোর্নিয়ার পালাস নং

যুক্তরাষ্ট্রের পঞ্চদশী শারন স্টোভার। ইনি ১০০ মিটার 'বাটারফ্লাই' স্টোকে নূতন রেকর্ড স্থাপন করেছেন।

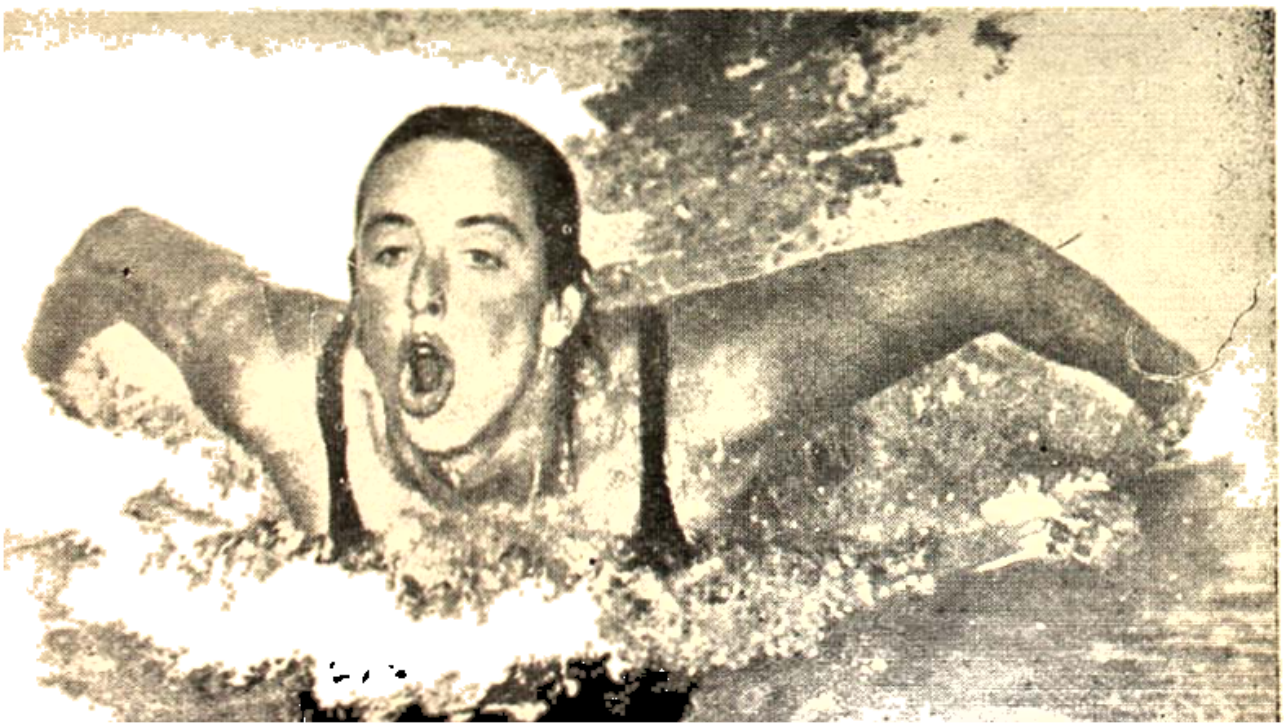

অলিম্পিকে স্বর্ণপদক জয়ী
রাশিয়ার এ. আইভানোভস্কি

পেন্টাথলন দ্বিতীয়ী ক্রস প্রতিযোগিনী
ইরিনা প্রেস্

অলিম্পিক দ্বিতীয়ী যুক্তরাষ্ট্রের দুজন দৌড়বাজ—
ডাইরোল বার্নেস ও এক ইয়র্কার

রাশিয়ার অলিম্পিক কুস্তীবীর
এ. রোমানভ

অলিম্পিক বিজয়ী
রুশ ক্রীড়াবিদগণ

অলিম্পিক বিজয়ী
এ. মেংডেভ

গ্যালিনা প্রজুমো শিকোভা

ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতায় জয়ী

টোকিও অলিম্পিকে
সোভিয়েত
ক্রীড়াবিদগণ

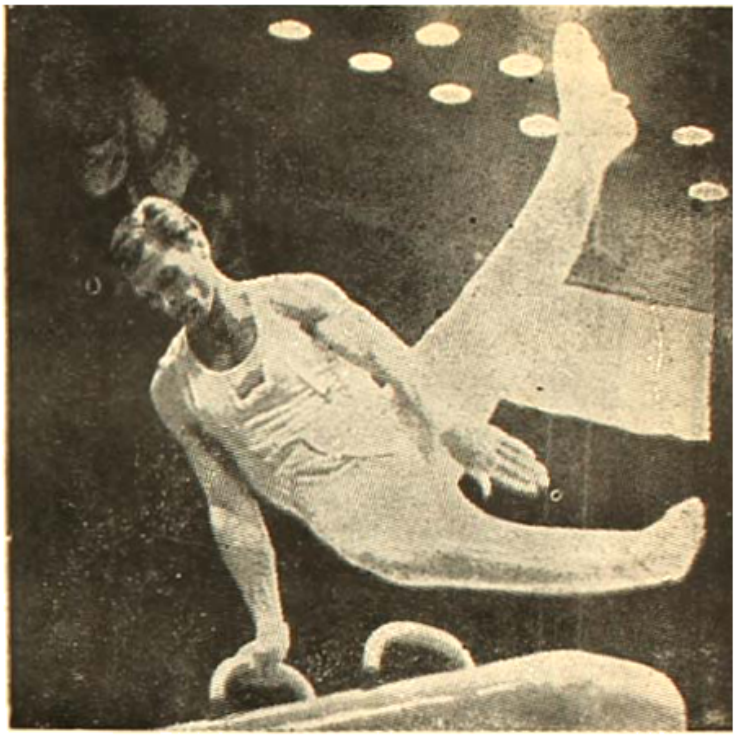

অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন বরিস সাকলিন্

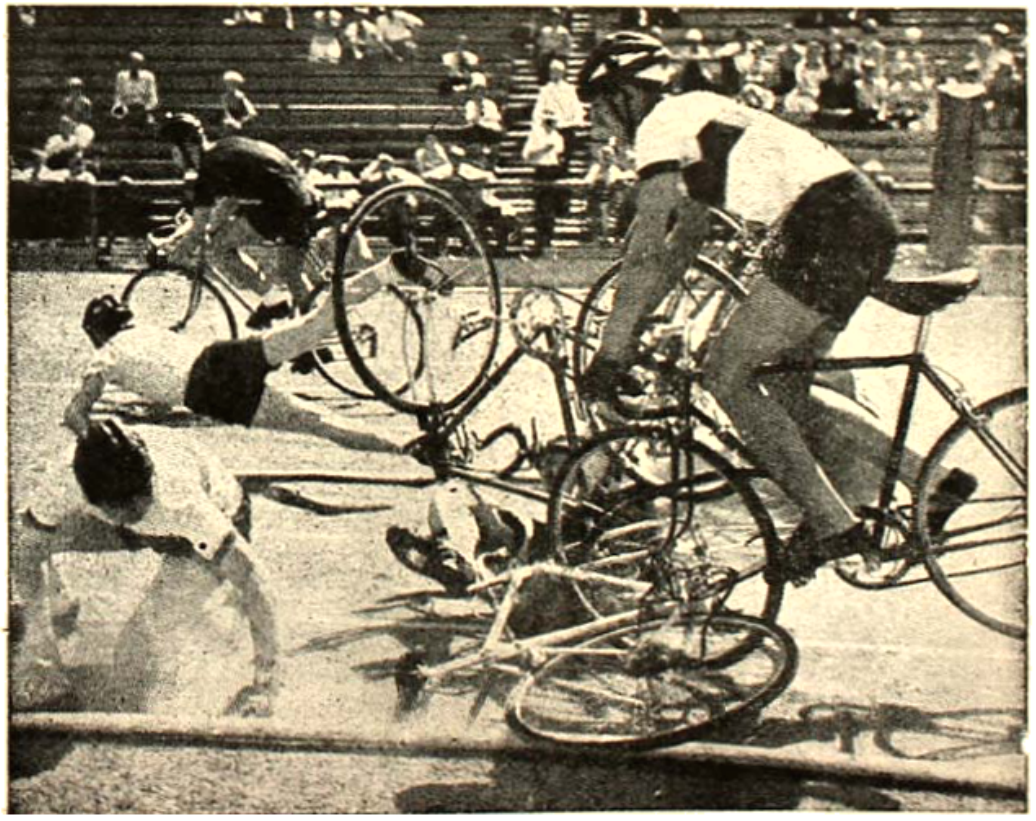

অলিম্পিক সাইকেল
প্রতিযোগিতায় রুশ
সাইক্লিস্টদল।

অলিম্পিক প্রতিযোগিতায়
রুশ ঘোড়সওয়ার

অলিম্পিকে হাইজাম্পে
বিজয়ী রাশিয়ার
ভি. ক্রনেভ

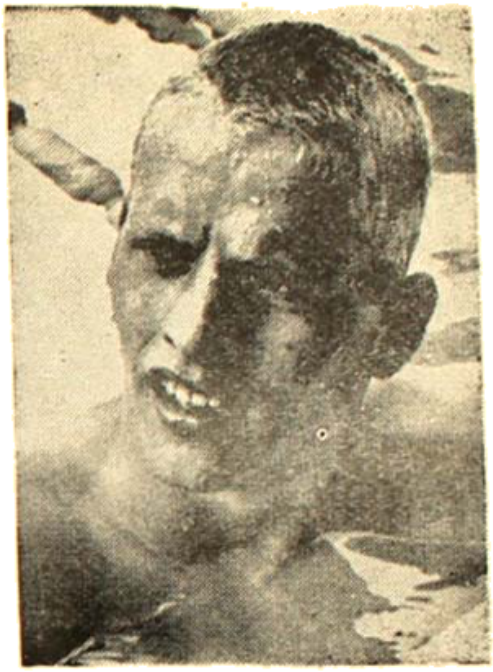

অলিম্পিকের
চারটি স্বর্ণপদক বিজয়ী
আমেরিকার
জন ফ্ল্যাণ্ডার

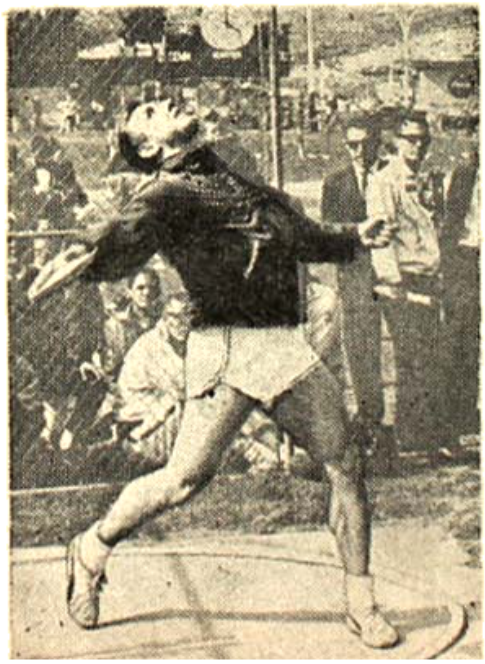

আমেরিকার অ্যাল অরটার
এবারের অলিম্পিকে একজন
বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদ।

অলিম্পিক বিজয়ী রুশ ক্রীড়াবিদগণ :—

মারিয়া মাটিনিনা

বক্সিং চ্যাম্পিয়ন
বি, লাগুটিন

বিশ্ব-বাতায়ন

নির্বাচনে জয়লাভের পর
বসর আনন্দে
প্রেসিডেন্ট জনসন।

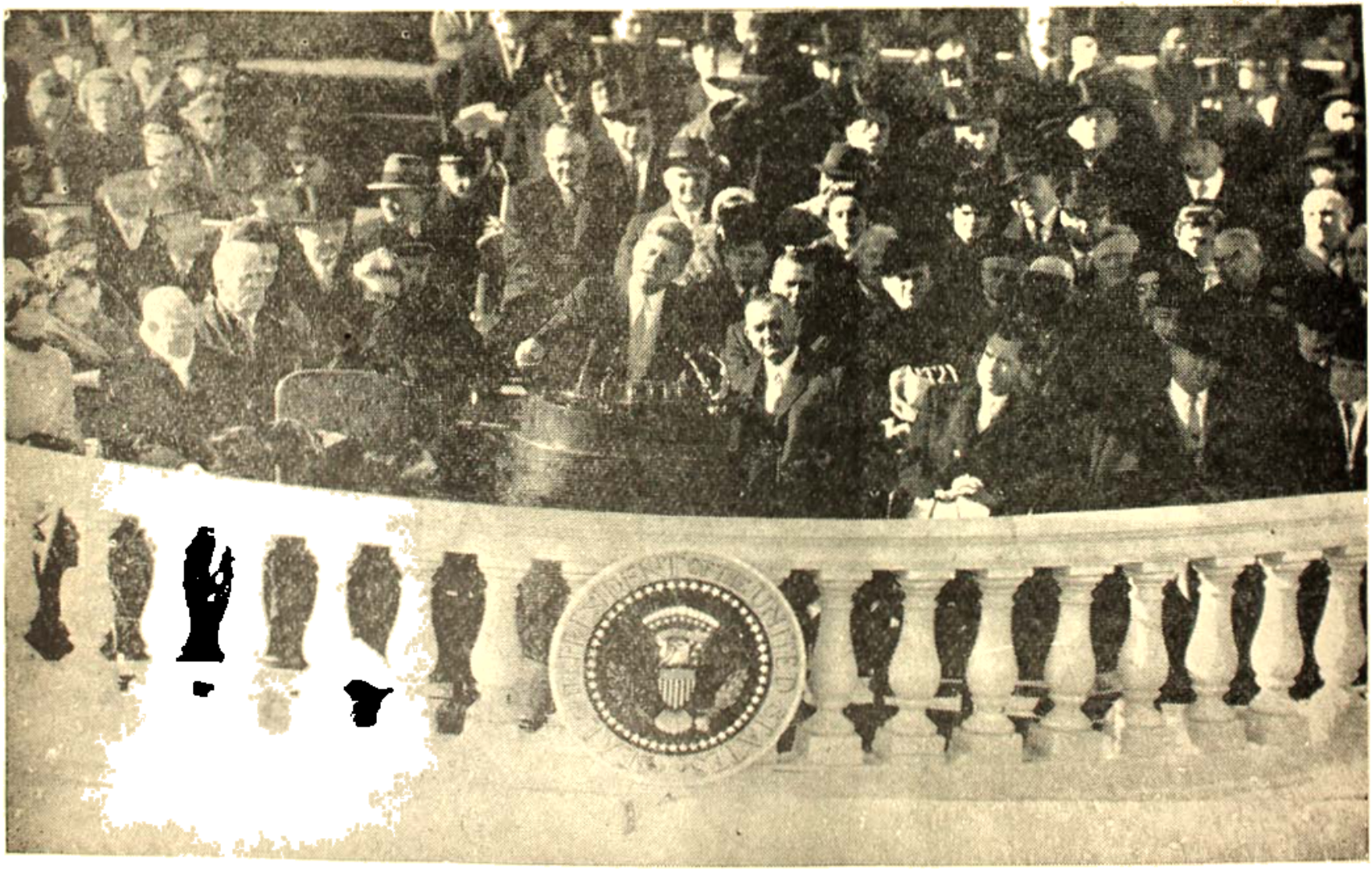

ওয়াশিংটনে ঐতিহাসিক সম্মেলনে
প্রেসিডেন্ট কেনেডী ভাষণ দিচ্ছেন

কেনেডীর সমাধি মন্দিরে
অনির্বাণ দীপশিখা।

রাশিয়ার সাম্প্রতিক ফ্যাসন প্রতিযোগীতা

বিভিন্ন ফ্যাসনে সুসজ্জিতা রুশ তরুণীরা।

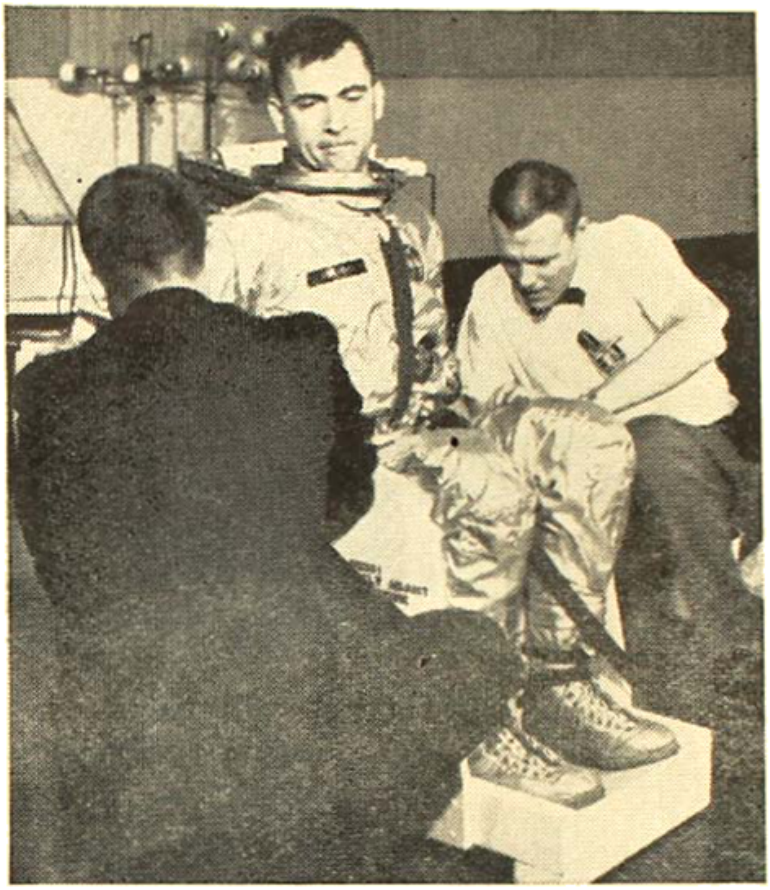

মহাশূন্যে যাত্রার প্রস্তুতি

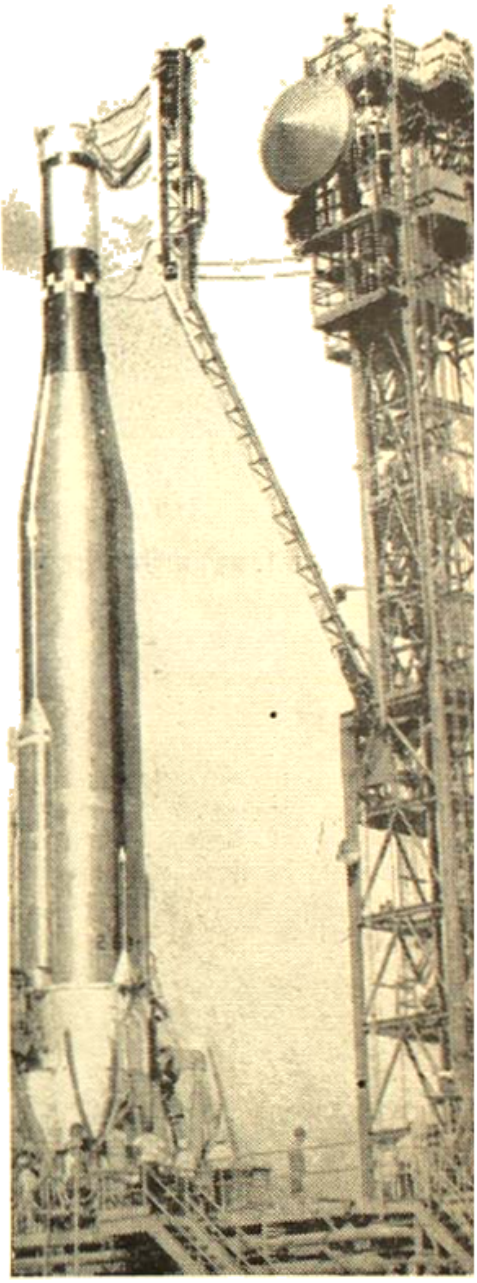

মঙ্গলগ্রহাভিমুখে যাত্রার পূর্বে কেপকেনেডিতে—'মেরিনার'। 'মেরিনার' পনের কোটি মাইল ভ্রমণ করে মঙ্গলগ্রহ থেকে টেলিভিশনে চিত্র পাঠাবে

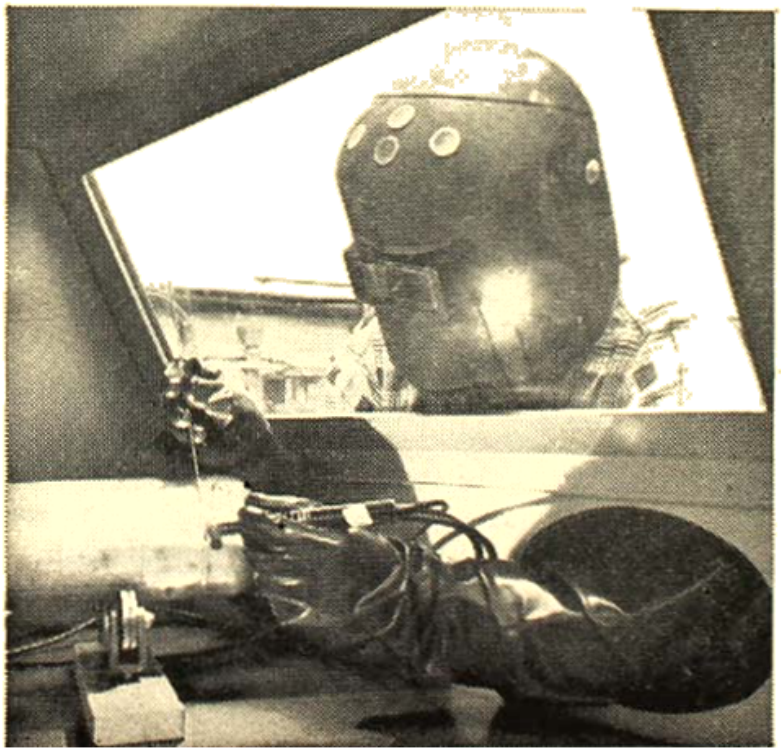

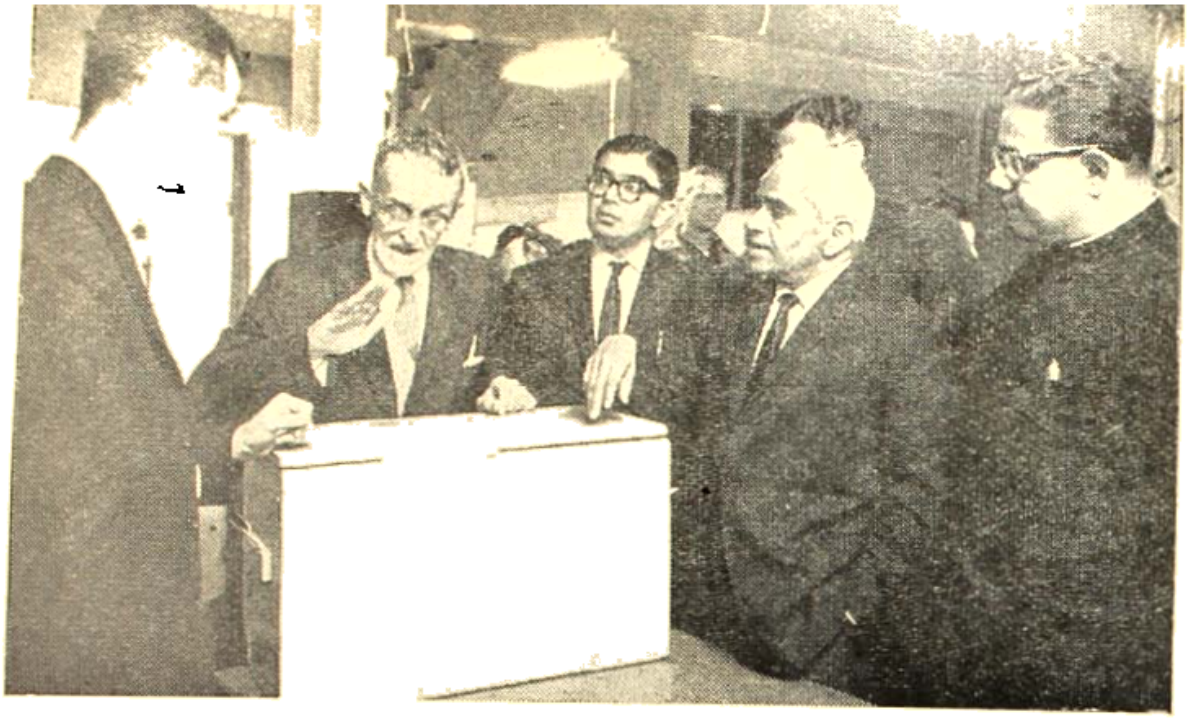

আমেরিকার নির্বাচন পদ্ধতি পর্য্যবেক্ষণে
ভারতীয় নির্বাচন কমিশনার ও তাঁর সহযোগীগণ।

নোবেল পুরস্কার বিজয়ী মার্টিন লুথার কিং

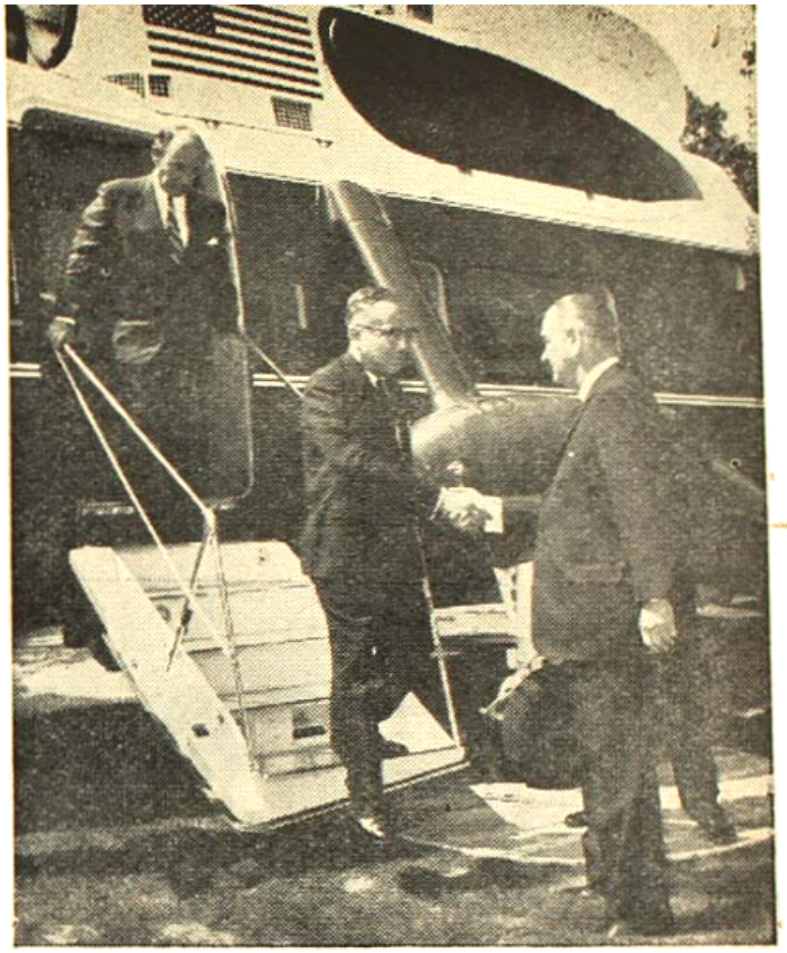

নিউইয়র্ক সফরে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সম্পাদক উ. থান্ত। অভ্যর্থনা করছেন প্রেসিডেন্ট জনসন।

দক্ষিণমেরুতে ইলেকট্রনিক পরিমাপ যন্ত্রসহ দুজন মার্কিন বৈজ্ঞানিক।

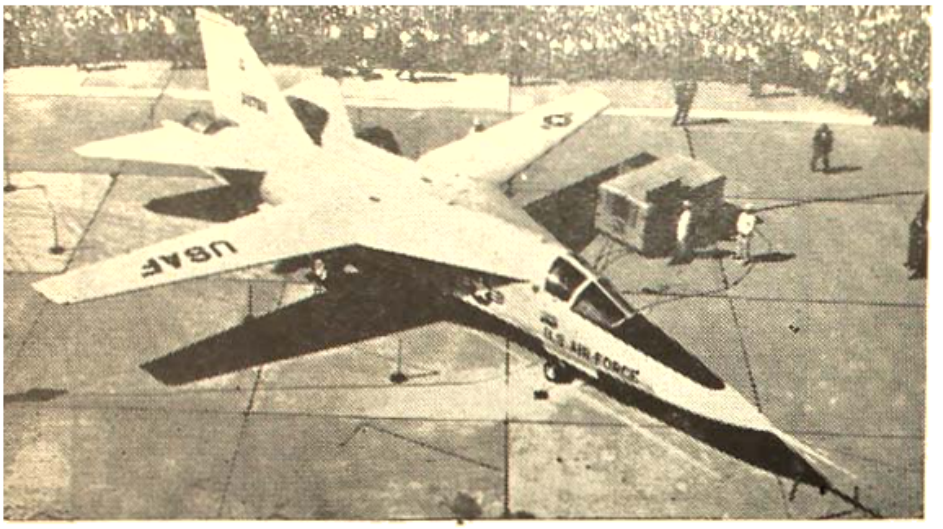

সারাবিশ্বে যা
চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে
এই সেই আমেরিকার
সুপার সোনিক
জঙ্গী বিমান।

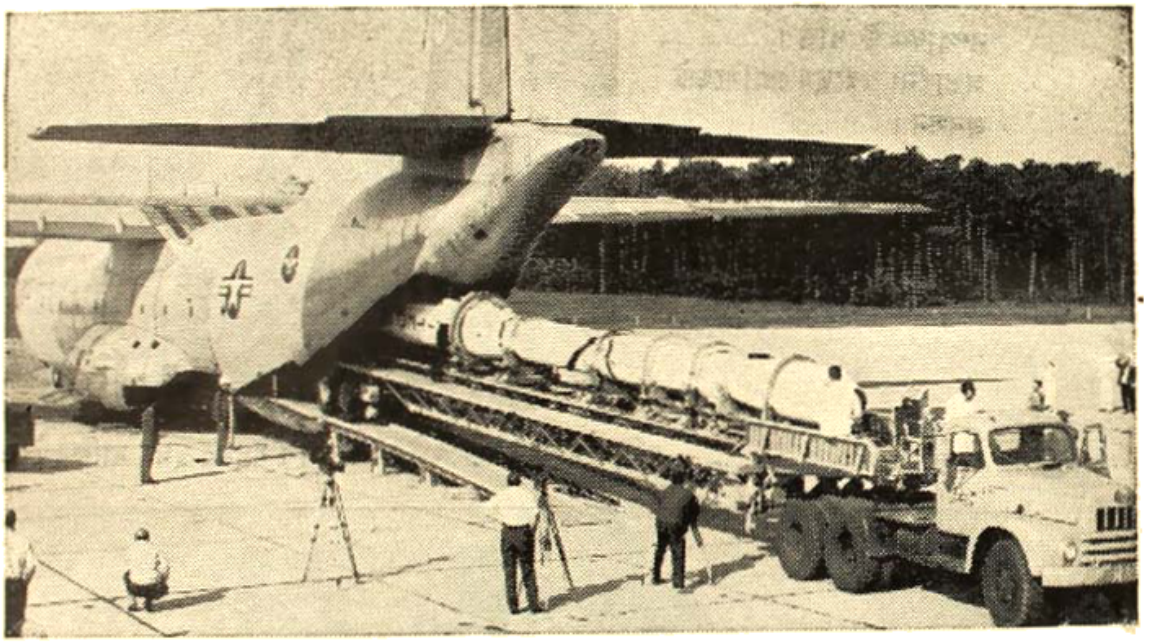

ই বিমানের
নাগুলি
ছামত গুটিয়ে
যা যায় এবং
লা যায়।

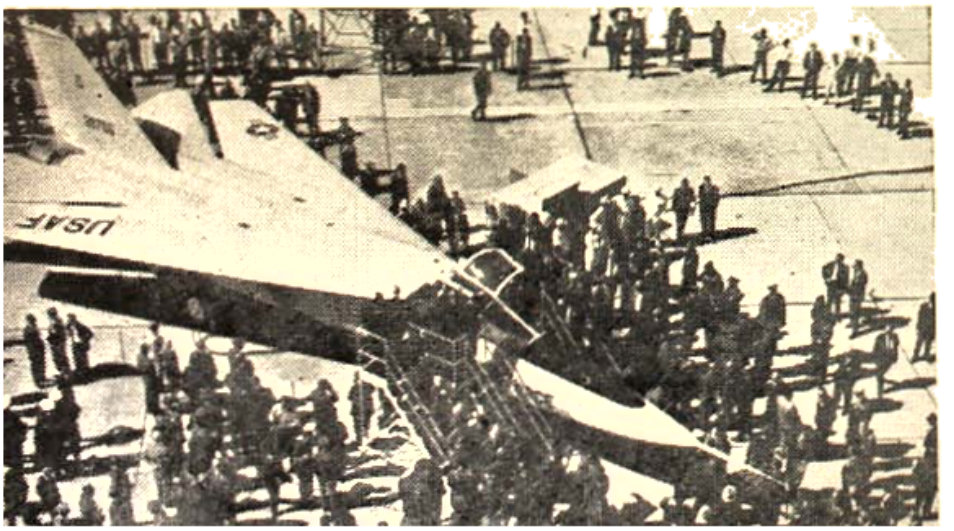

খুব উঁচু দিয়ে ঘণ্টায়
১৬৫০ মাইল বেগে
উড়ে যেতে পারে।

খৃষ্টের এই পবিত্র উৎসবে
এসো অমৃতময় প্রাণ,
কলুষ দৈন্য মুক্তি সাধিতে
করো নির্মল আলো দান !

রিচমণ্ড প্রাসাদে বড়দিন (১৪১১ খৃষ্টাব্দ)

রাজকীয় দরবারে খৃষ্ট উৎসব

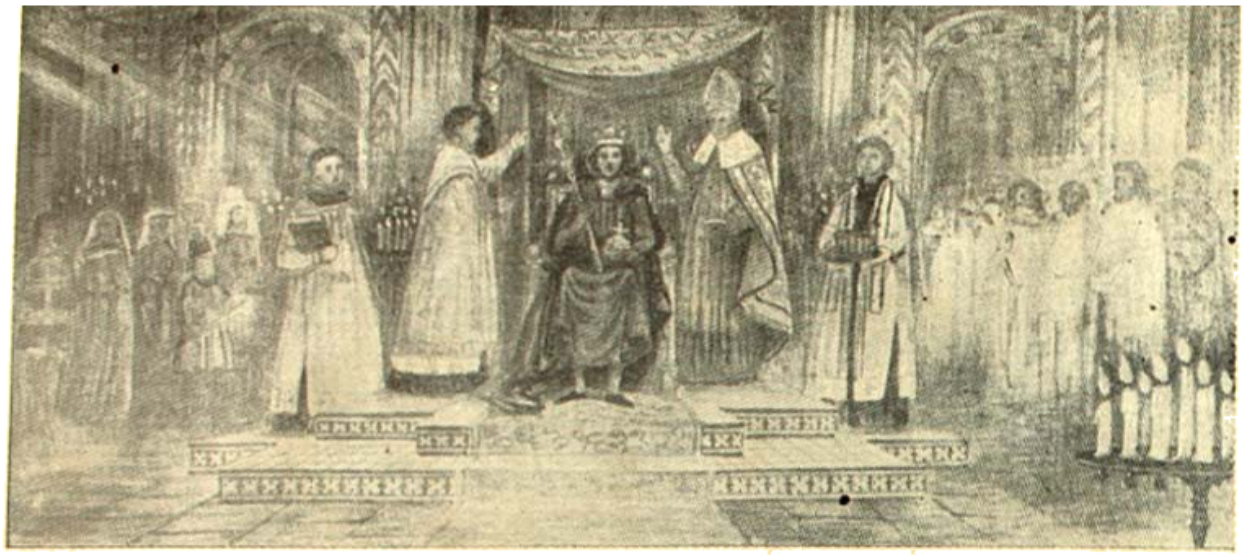

'ওয়েষ্টমিনষ্টার এবে'তে রাজা হিষেনের অভিষেক উৎসব (১১৩৫ খৃষ্টাব্দ)

জেমসের রাজত্বকালে বড়দিন উৎসবে ক্রীড়া যুদ্ধ